শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম্‌-এ

ভজনরতা মীরাবাই

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

পৌষ—১৩৬১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

আনন্দমঠের ঐতিহাসিক ভিত্তি

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস

"আনন্দমঠ"এর ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিতর্কের সুরু হইয়াছে উপন্যাসখানা প্রকাশের পর অবধি। উপন্যাসখানার প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের "বঙ্গদর্শনে"—সমাপ্তি হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম—১২৮৯ বঙ্গাব্দ (১৮৮২ খৃঃ), দ্বিতীয়—১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৩ খৃঃ), তৃতীয়—১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬ খৃঃ), চতুর্থ—ডিসেম্বর ১৮৮৬ খৃঃ এবং পঞ্চম ১৮৯২ খৃঃ। প্রতি সংস্করণেই বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তৃতীয় সংস্করণে। "আনন্দমঠ"এর ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি জানা দরকার।

অনেকে বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই "আনন্দমঠ"কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলেন নাই। এই যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করা হয় "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে বঙ্কিমের মুখবন্ধ :

"'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে পর অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।...পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'আনন্দমঠ'কে বা 'দেবী চৌধুরাণী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

"রাজসিংহ" চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়ও আমরা দেখিতে পাই :

"আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

এই প্রকার উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের মুখবন্ধেও আছে।

এখন প্রশ্ন এই : তবে কি 'আনন্দমঠ'কে কিছুতেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে ভাবিতে হইবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথার্থ সংজ্ঞা কি। এ বিষয়ে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সংস্করণ 'আনন্দমঠ'এর ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, যে উপন্যাসে অতীত যুগের সমাজের, ঘরবাড়ীর, মানবচিন্তার, আচারব্যবহারের অনেকাংশে সত্য চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সরকার মহাশয় মানিয়া নিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে সেকালের জ্ঞাত জীবন বা ঘটনা ফোটোগ্রাফের মত প্রতিফলিত হইতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তাই সরকার মহাশয় বলিয়াছেন : "যদিও 'আনন্দমঠে' বর্ণিত লোকগুলি ইতিহাস হইতে তুলিয়া ওয়া নহে, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা।...ভারতে মুসলমান শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্ম্মচারীদের অসহ্য অত্যাচারের ফলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিল এটাও ঐতিহাসিক সত্য।"

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে হিসাবে Sir Walter scottএর old Mortality, Lyttonএর Last Days of Pompeii অথবা অধুনাতন Kathleen Winsorএর Forever Amker ঐতিহাসিক উপন্যাস, সেই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যাহাই বলুন না কেন, বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে যাচাই করিলে আমরা 'আনন্দ-মঠ'কে ইতিহাসের গণ্ডী বহির্ভূত বলিয়া কিছুতেই মানিয়া নিতে পারি না। দ্বৈতশাসনের অরাজকতা এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনী অবলম্বনে আনন্দমঠের আরম্ভ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তরের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহার সঙ্গে W. W. Hunterএর বিখ্যাত Annals of Rural Bengalএর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের পরিচয় পাই আবার তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন মন্বন্তরের পরবর্ত্তী তিনটি বৎসরের কাহিনী—যখন সন্ন্যাসী এবং সন্তানদের বিদ্রোহে রাজশক্তি প্রায় অভিভূত হইয়া আসিয়াছিল। ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনস্থ সৈন্যদলের বিরাট পরাজয় এবং তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে ততোধিক বিরাট্ আরেকটি সৈন্যবাহিনীর পরাভবের কাহিনী ও নিছক ঐতিহাসিক সত্য। এই দ্বিতীয় পরাভবের কাহিনীর মধ্যে প্রথম সংস্করণে খানিকটা ঐতিহাসিক অনৈক্য ছিল—তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা নিজেই উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তাহা সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু 'আনন্দমঠ'এ সন্ন্যাসিবিদ্রোহের যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন তাহা কতখানি সত্য? এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে সন্ন্যাসী এবং সন্তানদের যে বর্ণনা শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক মহাশয় দিয়াছেন তাহা নিছক কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোনই সংস্পর্শ নাই। এই মত প্রকাশ করিয়াছেন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Dawn of New India গ্রন্থে এবং শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার Sannyasi Fakir Raiders of Bengalএ। তাঁহাদের মতে ইতিহাসের সন্ন্যাসী ফকিরেরা ছিল এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী, নিরক্ষর, অত্যাচারী, "শৈব"—বঙ্কিমবর্ণিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতাযোগশাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত, লোকহিতৈষী বৈষ্ণব নহে। শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয়ও বলিয়াছেন :

> "সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিধারীর দল একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যাসুবায় জমিদারিও করিত। মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত বঙ্কিমের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশামাত্র।"

এই মত সমর্থন করিতে যাইয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করিয়া

তাঁহাদের নিজেদের শৃঙ্খলা, শৌর্য্য এবং অধ্যবসায়ের নিপুণ পরিচয় দিয়াছিলেন !"

ফকির সন্ন্যাসীদের এই "সত্য" পরিচয়ের পশ্চাতে ঐতিহাসিক ভিত্তি কতখানি আছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে ঐতিহাসিক দলিলপত্রের মধ্যে আছে কেবল তদানিন্তন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের চিঠি এবং রিপোর্ট (যাহা তাঁহারা পাঠাইতেন বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট এবং ডিরেক্টারদের কাছে), Warren Hasitingsএর চিঠি (যাহা সংরক্ষিত হইয়াছে Gleigএর Memoirs গ্রন্থে) এবং ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ঐতিহাসিক W. W. Hunter এর অমর Annals of Rural Bengal. এখানে বলা কর্ত্তব্য যে শেষোক্ত গ্রন্থখানি নির্ভর করিয়াছে প্রধানতঃ বিদ্রোহযুগে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে লিখিত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের চিঠি এবং রিপোর্টএর উপর। কাজেই বলিতে গেলে, ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের চিঠি এবং রিপোর্ট ছাড়া আর কোন লিখিত নথি বা দলিল আমাদের সম্মুখে এখন পর্য্যন্ত উপস্থাপিত হয় নাই। এই একতরফা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসিবিদ্রোহকে লুটপাটের একটা আন্দোলন এই আখ্যা দেওয়া কতখানি সঙ্গত তাহা বিবেচ্য।

এই সম্বন্ধে শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় খানিকটা সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু লজিক্ অনুসারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহাতে তিনি আসেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :

> "কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর। তাহারা বা তাহাদের দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই। তাই আজ আমাদের একমাত্র পুঁজি হেষ্টিংস লাটের কয়খানা চিঠি এবং রেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম্ন ইংরেজ কর্ম্মচারীর কয়খানা রিপোর্ট।"

আমার মতে একতরফা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া বাংলার সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে লুটেরা এবং ডাকাতদের একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন এই আখ্যা দেওয়া কেবল ঐতিহাসিক পক্ষপাতিত্ব দোষ নহে, অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়াও বটে। ইতিহাসের মালমশলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া সিভিলিয়ান Hunter যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। Hunter বলিয়াছেন যে য়ুরোপীয় ইতিহাসে রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষের কাহিনী সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের কথাবার্ত্তার রিপোর্ট এবং তাহাদের লিখিত পুস্তিকা এবং অসংখ্য চিঠি বর্ত্তমান আছে, যাহার মারফতে ইতিহাসলেখক ঐ বিদ্রোহীদের মনের কথা তাহাদের মুখ হইতেই শুনিতে পান্, কিন্তু সেই যুগের বাংলাদেশে ঐ জাতীয় কোন কাহিনীই বর্ত্তমান নাই। সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বর্ণনা করিতে যাইয়া দুঃখ করিয়া Hunter বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষকে দেখিতেন কোম্পানীর চার্টারের চশমার মধ্য দিয়া। মন্বন্তরে কে মরিল, কে বাঁচিল, বাংলার বুকের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল তাহার ফলে যে একতৃতীয়াংশ লোক নিঃশেষ হইয়া গেল, ছয় হাজার জনপদের মধ্যে অন্ততঃ দেড়হাজার জনপদ যে নিশ্চিহ্ন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল, তাহার খবর তাঁহাদের কাণে পৌছাইল না—পৌছাইলেও কোনপ্রকার আলোড়নের সৃষ্টি করিল না।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তরের এবং মন্বন্তরোত্তর সন্ন্যাসিবিদ্রোহের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহার অনেকখানি হুবহু Hunterএর গ্রন্থ হইতে নেওয়া। যদি আমরা এই অংশখানি সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তবে বাকী অংশটুকু নিছক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাজ শুধু ঘটনার বিশ্বস্ত বিবরণ দেওয়া নয়, ঘটনার পশ্চাতে আরও যে ঘটনা, আরও যে কারণ নিহিত আছে তাহা বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন হয় যখন আমরা দেখি যে আমাদের সম্মুখে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই একতরফা। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ যদি লুঠেরা এবং ডাকাতদের একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন মাত্র হইত, তবে সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া কি তাহারা নবাবের এবং কোম্পানীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ করিতে পারিত? কোম্পানীর তরফের উকিল হয়ত বলিতেন যে উৎপীড়নের ভয়ে বাংলার জনসাধারণ সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে

পারেন নাই, কিন্তু এইপ্রকার নজির কি যুক্তিসঙ্গত? যদি আমরা বলি যে জনসাধারণ সন্ন্যাসীদের ভয়ে সতত শঙ্কাকুল হইয়া থাকিত তবে প্রকারান্তরে এ কথাও কি স্বীকার করা হয় না যে তাহাদের সহানুভূতি ছিল এই বিদ্রোহীদের আন্দোলনের পশ্চাতে এবং যাহাকে আমরা বলি নিছক ডাকাতি তাহার পেছনে ছিল উচ্চ এবং মহান্ একটা আদর্শ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুক্তিকামী অনেক কর্ম্মী, অনেক পার্টিই কি এইপ্রকার আখ্যায় অভিহিত হন্ নাই? বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পৌছাইয়া পৃথিবীর নানা অংশে এইপ্রকার বিচারের পরিচয় আজও কি আমরা পাইতেছি না?

তাই আমি মনে করি সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে লুঠের এবং ডাকাতদের আন্দোলন—এই পর্য্যায়ে ফেলা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমার মতে এই বিদ্রোহের যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন তাহা মোটামুটি সত্য। এই বিদ্রোহ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল কিনা তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। আমার বক্তব্য শুধু এই যে এই বিদ্রোহ ছিল জনসাধারণের বিক্ষোভের একটা প্রকাশ—যে বিক্ষোভের পশ্চাতে ছিল মন্বন্তরের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার স্মৃতি এবং তৎকালীন রাজশক্তির অত্যাচারের কশাঘাত। আমরা জাতীয় আন্দোলন বলিতে যাহা বুঝি এই বিদ্রোহকে সেই সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা হয়ত সমীচীন হইবে না, কারণ জাতীয়তার অনুভূতি সেই যুগের য়ুরোপেও জাগে নাই। কিন্তু এই বিদ্রোহকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের পর্য্যায়ে না ফেলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। এইপ্রকার একটা বিরাট্ আন্দোলনে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায় হয়ত অরাজকতার সুযোগ লইয়া কোন কোন স্থানে হয়ত লুঠতরাজ করিয়াছিল, কিন্তু লুঠতরাজের দিকেই বিদ্রোহীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই গভীর অপবাদ কোন নিরপেক্ষ বিচারকই আজ মানিবেন না।

আমার এই যুক্তির স্বপক্ষে আমি আর একটা উদাহরণ দিতে চাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কে, এম্, মুন্সী কুম্ভমেলায় তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে চিঠিগুলি লিখিতেছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে মোগলযুগের পতনের সময় হইতেই পশ্চিমের নানা জায়গায় যোদ্ধা সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই যোদ্ধা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়দের তিনি তুলনা করিয়াছেন মধ্যযুগের ইউরোপের "নাইট্ টেম্প্লার"দের সঙ্গে। এই সম্প্রদায় সশস্ত্রভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্য্যটন করিত। লুঠতরাজ করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারীর হাত হইতে অসহায় বালবৃদ্ধবনিতাদের রক্ষা করা, হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কৃতিকে ধর্ম্মান্ধ নিপীড়নের কবল হইতে উদ্ধার করা এবং অহঙ্কারী মদোন্মত্ত রাজকর্ম্মচারীদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরা। বিদ্রোহী সন্তানেরাও যে এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা আনন্দমঠের ছত্রে ছত্রে পাই।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং সন্তানগণের এই চিত্র যদি আমরা আংশিকভাবেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তবে আনন্দমঠের বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন মতামত প্রকাশের প্রহেলিকাও অপেক্ষাকৃত সহজ ও বোধগম্য হইবে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বলিয়াছিলেন, "বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।" সন্ন্যাসিবিদ্রোহের চিত্র কতখানি সত্য বা মিথ্যা সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তখন কিছুই বলেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি শুধু একজন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা টীকাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—এই সমালোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে "ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের দেশের লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে, তখন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না, তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।" অবশেষে তৃতীয় সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ইতিহাস সম্বন্ধে দুইটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—একটি Geeigএর Memoirs হইতে, অপরটি Hunterএর Annals হইতে।

সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক উপন্যাসের মূলভাগের অদলবদল করা। এই অদলবদলের মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হইতেছে, যে স্থলে "ইংরেজ" শব্দ ছিল সেই স্থলে "যবন" শব্দ ব্যবহার। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন হইতেছে চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ

কয়েকটি পংক্তিতে। আনন্দমঠের যে সংস্করণ আজ আমরা দেখিতে পাই তাহার শেষ হইয়াছে এইভাবে :

"সেই গম্ভীর বিষ্ণু মন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষ-মূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

কিন্তু প্রথম সংস্করণে ইহার পর এই কথাগুলি ছিল :

"বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণু-মণ্ডপের দীপ উজ্জলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

এখন আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে : [দ্বি]তীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই পংক্তিগুলি উঠাইয়া দিলেন [কে]ন? যে আগুনের কথা তিনি বারান্তরে বলিবেন [ব]লিয়াছিলেন তাহা আর বলিলেন না কেন? ইহার উত্তরে আমাদের মনে রাখা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ [র]চনা করিয়াছিলেন তখন কংগ্রেসেরও জন্ম হয় নাই এবং আনন্দমঠের মতবাদকে ঘোরতর রাজদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য করা হইত। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ কর্ম্মচারী—একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র। ইহা অসম্ভব নয় যে আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশের পর তৎকালীন সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তী সংস্করণসমূহে নানাভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে আনন্দমঠে তিনি যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মন্ত্র নহে, তাহা সমন্বয়ের মন্ত্র : "ইংরেজ শত্রু নহে, মিত্র রাজা"।

অনেকে বলিবেন, সন্ন্যাসিবিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক রূপ ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়না, এই সংস্কৃত পরিবেশ হইতে প্রমাণিত হয় শুধু এই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পনাকে খানিকটা সংযত করিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই মতের অনুবর্ত্তী তাঁহারা বলেন যে সত্যানন্দের মধ্যে যে জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত আধুনিককালের বস্তু—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এই প্রকার অনুভূতি বা প্রয়াস সম্ভাব্য ছিল না। তাঁহাদের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কল্পনা এবং ভাবপ্রবণতার সহায়তায় অত্যন্ত অবাস্তব একটা ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণে যে, সে সময় প্রায় সকলেই দেশের কথা এক-প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজের লেখনীর সাহায্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংঘবদ্ধ একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিতে।

আমি শেষোক্ত ব্যাখ্যান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কল্পনার ভাবালুতায় কৃত্রিম একটা চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন একথা মানিয়া নিতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। আমার মতে, বঙ্কিমচন্দ্র যে প[illegible] বিদ্রোহের ছবি আঁকিয়া ছিলেন তাহা মোটে[illegible] বা অসম্ভাব্য ছিল না। কবিশেখর শ্রীকালি[illegible] কথায় আমি বলিব; "দারুণ উৎপীড়নে, দু[illegible] অন্নাভাবে সে সময় নির্বীর্য্য নিস্তেজ বাঙালীর [illegible] বিদ্রোহী হইয়া ওঠা একেবারেই অবাস্তব ছিল না[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছিলেন, যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহারা চাহিয়াছিল সুশাসন, দেশের কল্যাণ, দেশের ধর্ম্ম, মান, প্রাণ রক্ষা। তখন যে অরাজকতা বা সদ্যোমৃত রাজত্বের প্রেতাত্মার শাসন চলিয়াছিল সন্তানগণ করিয়াছিল তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।" তাহাদের এই বিদ্রোহ নিষ্ফল হয় নাই—যে আগুন সত্যানন্দ জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিবে নাই, নানারূপে, নানাছন্দে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে—এবং তাহার উপসংহার হইয়াছিল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতালাভে। হয়ত এইখানেও উপসংহার হয় নাই—হয়ত ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতই কোন প্রতিভাবান্ লেখক অদূর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং "আজি হইতে শতবর্ষ পরে" লেখনী ধারণ করিয়া আর এক অমর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া যাইবেন।

ছবি

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অনেক দিন কলিকাতার বাইরে ছিলাম। হঠাৎ কর্ম্মসূত্রে এসে পড়ে পাঁচজন পুরোণো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর দেখা করতে গেলামও। দেখা করা আর দেখা পাওয়ার মাঝে হঠাৎ এক লাল চিঠি এসে পড়ল হাতে। এক পুরাতন ও কলেজের সময়ের বন্ধু ও সতীর্থের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। দেখা তখনো তাঁর সঙ্গে করে উঠতে পারিনি, তিনি কার কাছে শুনেছেন আমি এসেছি। লাল চিঠির পাশে মস্ত অনুযোগ তাহা মোটামুটিখনো না করার এবং পত্রপাঠ যাওয়ার জন্য কিনা তাহা এ কন্যা আশীর্ব্বাদে, পাত্র আশীর্ব্বাদে, গায়ে হলুদে, এই যে এই বি ো বটেই, তারপর ফুলশয্যায়, তাদের বাড়ী প্রকাশ—তে নিজেদের বাড়ী জোড়ে জামাই যাওয়া হোতে সব ারে তারিখে তারিখে বিশেষ করে দাগ দিয়ে লেখা—বার জন্য। একেবারে এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী দিনপঞ্জী তালিকা। লজ্জিত হয়েই গেলাম দেখা ততদিন না করার জন্য, ভোজের নিমন্ত্রণের আগেই।

প্রকাণ্ড বাড়ী—ভবানীপুরের দিকে। সামনে কেয়ারী-করা ফুল বাগান। বিলিতী ফুলেরা রংয়ে রূপে আলো করে আছে। একপাশে টেনিস কোর্ট। সবই যেমন বড়লোকের বাড়ীতে থাকে।

আমি এর এবাড়ী দেখিনি। পৈত্রিক বাড়ীতে যাওয়া আসা ছিল। সে বাড়ী ছিল উত্তর কলিকাতায়। সেকালের ধরণের বড়লোকেরই বাড়ী। তাতে পূজার দালান, নৈবেদ্য ঘর, শালগ্রাম শিলার নিত্যসেবার ঘর, ভোগের ঘর, চক-মিলানো মস্ত উঠান ছিল। পূজার সময় যাত্রা থিয়েটার কাঙালী ভোজন হ'ত সেখানে। বহু লোকের সমাগম হ'ত পূজার সময়। পূজার দালানের একদিকে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ছিল। সে ঘরে বড় বড় বিলিতী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি পাহাড় পর্ব্বত নদী বন অরণ্যের ছবি, আর মস্ত মস্ত অয়েল পেন্টিং ছিল কর্ত্তাদের অনেকের। কেউ বা দামী শাল জামিয়ার গায়ে মূল্যবান গালিচায় বসে আলবোলায় লম্বা সোনালী নল মুখে দিয়ে ছবি আঁকিয়েছেন। কেউ চোগা চাপকান পরে 'পিরালী' পাগড়ী মাথায় দিয়ে দামী চেয়ারে খাড়া শক্ত হয়ে বসে আছেন, তাঁর সোনার ঘড়ির মোটা চেন গলার হাতের হীরার বোতাম আংটী সব স্পষ্ট আঁকা রয়েছে ছবিতে। একজন কর্ত্তা বাঘছালে বসে নামাবলী গায়ে মালা হাতে করে বসে ছবি আঁকিয়েছেন। রং রূপ গাম্ভীর্য্যে সেসব ছবিগুলি জীবন্ত মনে হ'ত যেন সে সময়।

আরো ছবি ছিল অনেক ছোট বড়—অত মনে নেই ছোট ছিলাম। তবে এগুলো মনে আছে এইজন্য গালিচা ফুলের কারুকার্য্য, গায়ে শালের পাট ফেলা, আর—সোনা ঘড়ির চেনের সোনালী কাজগুলি খুবই আশ্চর্য্য লেগে ছিল সেই ছোট বেলায়। ভাবতুম কেমন করে আঁকে এমন হুবহু। এক কথায়—এখন বুঝতে পারি তাঁদের সময়ে অবসর, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য এতই ছিল যে দিনের পর দিন বসে ছবি আঁকানো তাঁদের কাছে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না। এবং চুপি চুপি বলা যায় ধৈর্য্য এবং অহঙ্কারও কম ছিল না। ধৈর্য্যটা হচ্ছে প্রতিদিন ঐ ভাবে বসে থাকার; আর অহঙ্কার এই, আমার ঐ ছবি চিরকাল সকলে পরমসমাদরে, ভক্তিভরে, ভালবেসে দেখবে!

যাক একথা। এ বারের বাড়ীর ঠিকানায় সে বাড়ী নয় বুঝলাম। এ বাড়ীতে তো পৌছলাম।

আমার বন্ধু মস্তবড় ব্যারিষ্টার। তাঁর বাপ উকীল ছিলেন, এখনো আছেন। এ বাড়ী তাঁরই, শুনলাম পরে কিনেছেন।

লোকজনে বাড়ী গিস্‌গিস্ করছে। এখানে ঝাড়া-ঝুড়ি, এখানে ভারা বাঁধা নতুন করে রং দেওয়ার জন্য, হাঁক-ডাক হৈচৈ চারদিকে। সাজ পোষাকে বাসভবনে

শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তুলসীদাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
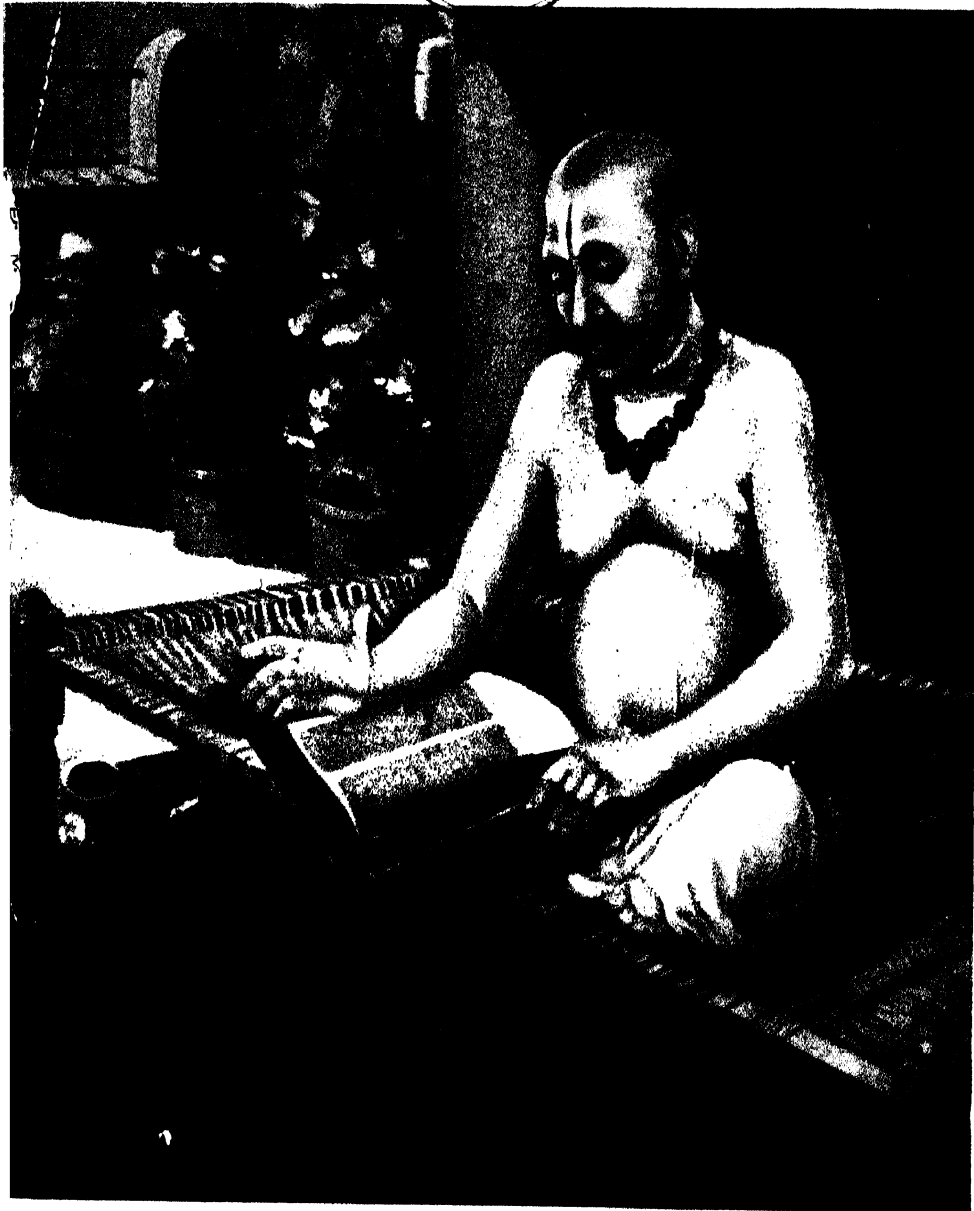
াহেব হলে কি হয়, 'উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে ামরা [ক খাঁটী বাঙালীই আছি।

ভয় পেয়েছিলাম বিলিতী পাড়ার নামে। কার্ড ফার্ড াাগবে কিনা। না, তা আর লাগলো না। উর্দ্দি পরা য়, গেঞ্জি ধুতি পরা চাকর এসে নিয়ে গেল সামনের াস্ত হলঘরে। হলঘরে ঢুকলাম। ঐ প্রকাণ্ড বড় ঘরের াাপেরই গালচে একপাশে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। সাদা থরের ছোট বড় টেবিল, বুককেস, পিতলের উপর মীনে া বড় বড় ফুলের টব রাখা, ডাবর ফুলদানী সব মাটীতে মা করা; সোফা, সেটী, কোচ, ডিভান সব এক একদিকে সরানো। আর দেখলাম চাকররা মহা ব্যস্ত মই লাগিয়ে দেওয়াল থেকে ছবি নাবাতে। এছাড়াও নানাবিধ সৌখীন কাঠের আসবাবেরও সংখ্যা কম ছিল না ঘরে।

বন্ধু সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, মহা খুশী আমাকে দেখে! 'আয় আয়—আজ এসে খুব ভাল করেছিস। এর পরে া লোকজনের ভিড় হবে কথা কওয়ার সময় থাকবে না ইত্যাদি।"

বন্ধুর পিতাও দাঁড়িয়েছিলেন সেইখানেই। প্রণাম করলাম। তিনিও খুব খুসী হলেন। কেমন আছি, এখন কোথায় আছি, কতদিন থাকবো কলকাতায়···? জিজ্ঞাসা করলেন। সহসা এই গেল গেল, ধব্ ধব্ করে উঠল সবাই। সেই মস্ত আলবোলায় সোনালী নল মুখে করা ছবিখানি নাবানো হচ্ছিল। আমার চেনা ছবি।

যাক্ পড়ে যায় নি, ঠিক নাবিয়ে ফেলেছে।

বন্ধু বল্লেন—এ এক জ্বালা হয়েছে সরোজ, জানিস্ ছবির ার শেষ নেই। দেখত, কত পুরুষ হ'ল? ওটা বাবার ঠাকুর্দ্দার ছোট ভাই, তাঁর ছবি। বাপ ঠাকুর্দ্দার ছবি হয় তার মানে বুঝি। তাঁদের কাকা, জ্যেঠা, মামা, পিসে, পিসি, দিদি, ঠাকুমা, দিদিমাতে এমন করে বাড়ার সব ঘর ছবিতে ভরে গেছে—আমাদের আপনার লোকদের ছবি রাখার টাঙানোর জায়গা খুঁজে পাই না।··· দিই বাবা, ঐ বুড়োগুলোর ছবি ফেলে বাইরে?' পিতার দিকে চেয়ে বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন।

বাপ তখন ঘরের ওদিকের কোণে একটী ছবির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

পুত্রের আহ্বানে ও প্রস্তাবে একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, 'তাতো বটেই, ওগুলো সরিয়ে দিতে পার। তবে অয়েলপেন্টিং হিসেবে ওটার খুব সুখ্যাতি ছিল। সেকালের এক বিখ্যাত সাহেবের আঁকা, তাই ওটা রাখা ছিল। এখনো ছবির রং, কাজ দেখনা! তা দাও গেরাজের ওপরের ঘরে পাঠিয়ে এখনকার মত।'

ছেলে বল্লেন, এখনকার মত নয়—ঘোষ সাহেবের আঁকা —চিরকালের মতই পাঠাব। ওটা আবার কার ছবি, ওকোণে রাখলেন? বাবার এক কাণ্ড!'

বাবা ঘরের সেকোণে গিয়ে ছবিটীর কাছে দাঁড়ালেন। কোঁচা দিয়ে ছবির গা থেকে ধুলো মুছে তারপর বল্লেন, 'তুমি তো ওঁকে জান না, দেখনি তো অজয়, ও আমার ছোট পিসি। আমি অবশ্য ওকে কখনো পিসি বলি নি। নাম ধরেই ডাকতুম! আমার চেয়ে ছোটই ছিল দু এক বছরের।···ভারি ভালো মেয়ে ছিল।···মারা গেল খুব কম বয়সেই, আঠার উনিশ বছর হবে। তারপর এই ছবিটা ঠাকুর্দ্দামশাই করান!···ছবিটা কিন্তু একেবারে ঠিক হয়েছিল। এখনো এমন ছবিটা—যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাকে। এসো না সরোজ, তোমরা দেখ না কি সুন্দর চেহারা ছিল তার।'

আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম ছবির সামনে। অজয় বল্লে, 'অনেকবার দেখেছি ও ছবি। চিরকালই তো দেখছি ওবাড়ী থেকেই।' পিতা হাসলেন।

আমি আগে দেখি নি। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমনি ছোট ছবি থেকে বড় করা মাত্র, অয়েল পেন্টিং নয়। কিন্তু কি যে সুন্দর চেহারা। মধুর—সুন্দর। শুধু যেন একটু বিষণ্ণও।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ বয়সেই মারা গেছেন? মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন কোথায় কি কষ্ট লুকোনো আছে।'

বন্ধুর বাবা বল্লেন, 'হ্যাঁ এ ছবি মারা যাবার বছরখানেক আগের। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ীতে মারা যায়। কি হয়েছিল কেউ জানতে পারল না। স্বামীটা অতি বদ ছিল। জমীদারের এক ছেলে, সুন্দর দেখতে, বহু সম্পত্তির মালিক, ঠাকুর্দ্দা লোভ ছাড়তে পারেন নি—দুর্নাম শুনেও। তারাও আমাদের ঘরের সুন্দরী মেয়ের লোভ ছাড়তে পারে নি। বিয়ে হয়ে গেল। তখনকার দিনে এগার বার বছরে বিয়ে হ'ত।—বিয়ে হ'ল। নাম ছিল নিরুপমা। নিরুপমাই

ছিল যেমন স্বভাবে, তেমনি রূপে। বছর দুই বাদে শ্বশুর-ঘর করতে গেল। যাওয়া আসা, জামাই আনা বেশ সমারোহে চলল তিন চার বছর। তারপর কানাকানি কথা ঠাকুর্দ্দার ঠাকুমারও কানে এলো, লোকেও জান্‌ল। শুধু নিরু কোনোদিন কারুকে বলল না, তার স্বামী কেমন, ভাল বা মন্দ অথবা সেখানে কিভাবে থাকে।

তারপর একদিন হঠাৎ খবর এলো নিরু মারা গেছে! কি হ'ল, কি অসুখ কোনো খবরই পাওয়া গেল না। শ্বশুর বাড়ীর দেশ ছিল পাবনার ওদিকে। পদ্মা পারে, যাওয়া আসা, খোঁজ খবর করা এক দিনের ব্যাপার নয়…। ঠাকুর্দ্দার ঐ একমাত্র মেয়ে ছিলেন, তাঁর আর শোকের ক্ষোভের সীমা রইল না। বছরখানেক বাদেই তিনিও মারা গেলেন।

লোকে বল্লে, আত্মহত্যা। কেউ বল্লে, না, রোগে জীর্ণ দেহে মনের কষ্টে মারা গেছে। কিন্তু কিছুই আমরা জানতে পারলুম না। মরবার আগে এই ছবিখানা করিয়েছিলেন। ছোট ছবি থেকে বড় করা ছবি।

গহনা অলঙ্কারের ভারে ভরা সুন্দর একখানি তনুদেহ, শান্ত সুন্দর বিষণ্ণ হাসির আভাস লাগা দুটী চোখ, দুখানি ঠোঁট। কি দুঃখ ছিল তার মনে? মৃত্যু না আত্মহত্যা? কে জানে তার সত্যাসত্য। আমিও অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম তার মাধুরীময় রূপ।

অজয়ের পিতার গল্প শোনার অবসর ও ধৈর্য্য ছিল না —সে অন্যদিকে ছবি নাবানোর নির্দ্দেশ দিতে ব্যস্ত। আমরাও সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে বাইরের ঘরে বন্ধুপত্নী ও কন্যার আগমন হয়েছে। যার বিয়ে সেই এসেছে। বেশ ভাল দেখতে মেয়েটী। অবশ্য ঐ ছবির রূপের কাছে লাগে না। পরিচয় হ'ল, আধুনিকভাবে।

ওদিকে ছোট ছোট দু'পাশের ঘরের ছবিও নামিয়ে এনে জমা হচ্ছিল।

ততক্ষণে যে ছবিগুলোর সামনে আমরা এসেছি, তাতে জপের মালা হাতে করে নিয়ে একটী বৃদ্ধা মহিলা, কোশাকুশী ফুল বেলপাতা নিয়ে নামাবলী গায়ে আর এক বৃদ্ধা মহিলা, গরদের ধুতি পরা চাদর গায়ে গীতা হাতে এক প্রৌঢ় পুরুষ, আর নানা সাইজের নানা মানুষের ছবি। গ্রুপও। ঘোমটা দেওয়া বৌ, মেয়ে, ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে, নাতিনাতিনী কোলে বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমা, সরকার, চাকর, আশ্রিত, আহুত, অনাহুত লোকে ভরা গ্রুপ ছবি। বাড়ীতে কোনো উৎসবের বিবাহ বা ব্রত প্রতিষ্ঠা অথবা কোনো বড় ক্রিয়াকাণ্ডের 'পর একত্র জড় হওয়া স্বজন বন্ধুদের সে 'গ্রুপ' ছবি।

কন্যা আর কন্যার মা তো হেসেই আকুল। বধূমাতা বল্লেন, 'বাবা, এগুলো এবারে বাতিল করে দিন।'

পৌত্রী বল্লে, 'দাদা এগুলো যদি চিরকাল থাকে তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের ছবি কোথায় টাঙাবে?'

পিতামহ হাসলেন। পিতা বল্লেন, 'ছবিগুলোর ফ্রেমের কাজ কিন্তু খুব ভালো—দেখেছেন বাবা? ফ্রেমগুলো খুলে নিয়ে ছবিগুলো ফেলে দিলে কাজ দেয় কি বল?' এবারে পত্নীকে বল্লেন।

স্ত্রী বল্লেন শ্বশুরের দিকে চেয়ে, 'তা মন্দ হয় না, কি বলেন বাবা?'

কোণের দিকে ঠেলে রাখা শ্বেত পাথরের এক টেবিলে মোটা মোটা এলবাম রাখা ছিল, মা আর মেয়ের চোখ পড়েছে তার ওপর।

একটী করে পাতা উল্‌টায়, আর তারা হাসে। বলে, 'বাবা কি সাজ ছিল তখনকার। হ্যাঁ বাবা, একে তোমার? নয়ত হ্যাঁ দাদা—একে বল না? দেখ দেখ মা—পায়ে মল নাকে নথ পরা এক বৌ না মেয়ে?

পিতামহ পরিচয় দিয়ে দেন, পিতার অবসর নেই। মেয়ে আর বধূ হাসে। হাসির মতই ছবি সব। কেউ বা হাত দুখানি কাঠের মত শক্ত করে কোলে করে বসে আছে। কেউ ফুলদানী রাখা টেবিলে আড়ষ্ট ভাবে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো পুরুষ চোগা-চাপকান পরে বইয়ের টেবিলে হাত রেখে বসে আছেন। কেউ বা জরীপাড় ধুতি পরে শাল-জামিয়ার গায়ে দামী চেয়ারে বসে আছেন। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নানা বেশে বসে ছবি তুলেছে! আজকের দিনে কৌতুক ও কৌতূহল ভরে দেখবারই মত ছবি। যে মানুষগুলো সেদিন কত আপনার ছিল, কত হয়ত আদরের ছিল, যে সব শিশুর ছবি ডজন হিসাবে তৈরী করিয়ে সব আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া হয়েছিল, যে সব বৃদ্ধবৃদ্ধার ছবি শ্রাদ্ধ বাসরের পর ছেলেমেয়ে নাতিনাতিনীরা চেয়ে নিয়ে ছিল, আজ

তারা বিরাগ ও কৌতুকের উপাদান যোগাচ্ছে অথবা কৌতুকের পাত্র।

বন্ধুর মা বেঁচে নেই। বন্ধুপত্নী জলযোগের জন্য আহ্বান করলেন। বন্ধু বল্লেন—'কাল বিকেলে মেয়ের আশীর্ব্বাদ, নিশ্চয় আসবি। সকালেও আসিস্। ঘরটা সাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন ছবিগুলো টাঙ্গাতে হবে। কতকগুলো দামী বিলিতী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এনেছি, তোর চোখে ভাল লাগলে সেইভাবে টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করব। আমাদেরও কখানা কোডানকার টাঙ্গাতে হবে। আর বাতিল ছবির ভাল ফ্রেমগুলো দেখা যাক কোনগুলোতে লাগে।'

ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে আয়, বাজে ছবিগুলো তাতে জমা কর্। স্ত্রীকে বল্লেন, 'তুমি আর শিপ্রা বাছ করে ফেল দেখি এলবামের ছবিগুলো। এলবামে আমাদের এখনকার আর শিপ্রার ছোট বেলা থেকে যত ছবি তোলা হয়েছে সেগুলো ভরে দিও।'

পরদিন সকালে বন্ধুর বাড়ী গেলাম। বাড়ী প্রায় পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। টেবিল চেয়ার কৌচ সোফা বুককেস সব যথাস্থানে ফিরে গেছে। ছবি কতক টাঙানো হয়েছে কতক বাকি আছে।

দেখলাম, ভাল ভালো ফ্রেমগুলো খোলা হয়ে গেছে। তার ছবিগুলো ছোট বড় ঝুড়িতে ভরা রয়েছে। এলবামের ছবিও প্রায় বাছাই শেষ হয়ে গেছে। ঘরে বড় বড় আধুনিক আত্মীয় স্বজনের একলা ছবি ও গ্রুপ টাঙাবার জন্য রাখা রয়েছে। কিছু কিছু টাঙানোও হয়েছে।

বন্ধুপত্নী ও কন্যা স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে ছবি বাছাই আর টাঙাবার স্থান নির্ব্বাচনের মতামত দিচ্ছেন।

একটী বিবর্ণ ছবি নাবিয়ে কোণে রাখা ছিল। বন্ধু-কন্যা বল্লেন, 'এটাতো বড় ঝাপসা, বড় ময়লা, পুরোনো দেখাচ্ছে—কি করি?'

'কার ছবি ওটা?'—অজয় জিজ্ঞাসা করলেন, না দেখেই।

উকীলবাবু দেখেছিলেন, বল্লেন, 'ওটা আমার বাবার। ওটা থাক ঘরে।'

অজয় দেখলে—বল্লে, 'ওটা থাক না বাবা। বড় ঝাপসা হয়ে গেছে। অন্য ঘরে দিয়ে দিই, কি বলেন?—ওখানে বরং আপনার ছবি একটা টাঙিয়ে দিই? আপনার ছবিতো এঘরে নেই দেখছি।'

পিতা বল্লেন, 'আমারটাও থাক্ না। ওই ছোট ঘরেই বাবার ছবির কাছেই দাও না!'

পৌত্রী বল্লেন, 'কিন্তু তোমার ছবি একটাও না থাকলে লোকে কি ভাববে? এ যে শুধু আমাদেরই রইল।'

অজয় বল্লে, 'বাবার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে দেখ্‌ত সরোজ। বাবার ছবি ঘরে একটা থাকা উচিত।'

দেশ-বিদেশের দৃশ্যের বড় বড় ছবি, ফাঁকে ফাঁকে দেশ নেতাদের কবি, বৈজ্ঞানিকের ছবি, তারি মাঝে অজয়ের স্ত্রী পুত্রকন্যাদের নিয়ে পারিবারিক গ্রুপ। দেওয়াল প্রায় ভরে গেছে। জায়গা কোথায় আর? ছোট ছোট টেবিলে ভাবী জামাতার, কন্যার, পুত্রের, নিজেদের একা একা ছবি! মনে হ'ল—

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

পাশের ঘরে অজয়ের চেম্বারেও জায়গা নেই। উকীল-বাবুর ছোট্ট ওপাশের ঘরখানিতেও জায়গা পাওয়া কঠিন। কিন্তু অজয়ের বাবার ছবিতো টাঙাতেই হবে। অজয় বল্লে, 'ঠাকুর্দ্দারটা থাক এখন, কোনো জায়গায় পরে দোব টাঙিয়ে। না হয় ওপরে বাবার ঘরে দোব। বাবারটা তোমরা বাইরের ঘরেই দাও! নইলে খারাপ দেখাবে!'

কি খারাপ দেখাবে? ভাবতে লাগলুম। যা হোক একটা জায়গা পাওয়া গেল, একটা বিলিতী পাহাড়ের ছবি বাদ দিয়ে। বৌ ছেলেমেয়েরা এলো, দেখলে। অজয় বল্লে, 'হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। তবে এই সুইজারল্যাণ্ডের ছবিখানা চমৎকার, এটা বাদ পড়ল। তা হোক, বাবার ছবি—ওটাও তো দরকার ঘরে থাকা।' ভাবটা বোধ হয় বাবার ছবি ছবিমাত্র, আর ল্যাণ্ডস্কেপটা হল রুচির খ্যাতি, সংগ্রহের প্রশংসা। তাই কি 'দরকার', 'উচিত', 'খারাপ দেখাবে'?

চকিতে মনে পড়ল, অজয়ের ছেলেরা মেয়েরাও বড় হয়েছে তো!

সহসা কানে এলো, 'ইরাজা কী লেড়কীকা তস্‌বীর হাম লিব।' দেখি অজয়ের বাবার পিসিমার রঙীন ছবি খানার পাশে দাঁড়িয়ে দরোয়ানের ছোট ছেলেটা বলছে, 'ঐ রাজকন্যার ছবিটা সে নেবে।' আশে পাশে বাতিল-করা বহু ছবি সে জড় করেছে ছোট বড় মাঝারি, কেউ বাধা দেয় নি, কিন্তু তাতে তো এত গহনা বসনভূষণের সমারোহ নেই। এটা থেকে তার আর চোখ ফেরে না। ফ্রেম খোলা মাটিতে নাবানো নিরুপমার মুখখানির দিকে আবার আজ কাছ থেকে চেয়ে দেখলাম। ঠিকই বলেছে, রাজকন্যাই বটে। ওর শিশু মন আর কোনো ছবি দেখে কোনো মন্তব্য করেনি, গহনাপরা আর দু' একখানা ছবি যে না ছিল তা নয়।

সে নিজের ভাষায় বাপকে বল্লে, 'তুমি আমার জন্য নিয়ে নিও বাবা।'

কর্ম্মরত পিতা বল্লে, 'আচ্ছা আচ্ছা মাঙ্গ লেব। তু যা আভি।'

এবারে চোখ পড়ল ভৃত্যদের—সেই আলবোলার নল মুখে শাল গায়ে গালিচায় বসা পূর্ব্ব কর্ত্তার ছবি। বংশের উজ্জ্বল্যে, বসার ভঙ্গিমায় মুখের তীক্ষ্ণ চেহারায় রূপের প্রভায় ছবিখানি যেন এতদিনেও ঝলমল করছে, একটু ম্লান হয় নি। দামী ফ্রেমটা খোলা হয়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে। ঝুড়িতে ধরেনি বড় ছবি।

একজন চাকর বল্লে, 'দেখ্ ভাই, কেয়সা 'রইস' কা মাফিক মালুম হোতা। বেয়সে সচ্চে তামাকু পিতে রহা। বেশক খানদানী আদ্‌মী।'

ছবিগুলো নিয়ে গুদামে রাখবার জন্য যে আদিষ্ট হয়েছিল, সে বল্লে, 'আরে ভাই, অব তো ইন্‌কা রাজা 'রইসী' কি দিন কী ত গিয়া। চলো গুদাম ঘরমে।'

সন্ধ্যার আগেই ঘর সাজানো শেষ হ'ল। ঘরে ঘরে নতুন ছবি, বাইরে নতুন মানুষের সমাগমে পুরী ঝলমল করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর আশীর্ব্বাদের নিমন্ত্রিত বাছাবাছা লোক সব জড় হলেন। মাটীতে আসনে, টেবিলে দেশী বিদেশী খাবারের বিপুল আয়োজনে, অট্টহাসি ও কোলাহলে, কৃত্রিম হাস্যে যেমন হয়ে থাকে তেমনি আশীর্ব্বাদের বা পাকা-দেখার ভোজ শেষ হ'ল। 'মেনু' তালিকার বিবরণ নতুন কিছু নয়। তবে আজকাল সবক্ষেত্রেই সংখ্যার মহিমা, এখানেও সংখ্যার গরিমা ও মহিমা বাড়ানোর জন্য কম চেষ্টা হয়নি। নিরামিষ নানারকমের শাক, শুক্ত, ভাজা, চচ্চড়ি, ঘণ্ট, ডাল্‌না থেকে নিয়ে তেরো চোদ্দ রকমের মাছ, পাঁচ সাত রকমের মাংস, চাটনী অম্ল আচার আমিষ নিরামিষ ভোজ্যের সংখ্যার সঙ্গে পায়েস, পরমান্ন, ছানার কমলালেবুর ক্ষীর নানাবিধ মিষ্টান্নের সমাবেশ, সে সব খাদ্য খাবার জন্য তো নয় সবটা, কেননা হাতই পৌছয় না—না টেবিলে না আসনে বসে, অনেকটাই দেখার জন্য। দেখাও হ'ল এবং খাওয়াও হ'ল।

বন্ধুর নির্ব্বন্ধে যজ্ঞি বাড়ীর শেষ দেখা শোনা করে অনেক রাত্রে শ্যামবাজারে নিজের বাড়ী ফিরলাম।

আধ অন্ধকার গলির মধ্যে ছোট সেকেলে বাড়ী। বাগান, লন, গাছপালা ভৃত্য-দ্বারবানহীন বাড়ী।

ক্লান্ত হয়েছিলাম। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর ভালো করে হয় না। বোধ হয় সারাদিনের ক্লান্তি, কাজ, গুরুভোজন ও গুরুভোজ্য দর্শন।

যাই হোক, শেষ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম। অজয়ের বাড়ীতে গিছি। সামনে দরোয়ানের ঘরের জানলার পাশ দিয়ে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটা সেই আলবোলার সোনালী নল মুখে অজয়ের প্রপিতামহের ভাইয়ের ছবি। তাদের রান্নাঘরের উনুনের আলোতে ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মনে হ'ল, তাকি হবে—বোধ হয় অন্য ছবি, আর কারো ছবি। সন্দেহ হ'ল, জানালার পাশে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, ঠিকই তো, ছবিটা তো তাঁর নয়! মুখ যেন আর এক রকমের।

কার ছবি তবে? উনানের আলোটা কমে এসেছে। ঘরেই ঢুকলাম। কৌতূহল আর নিবৃত্ত করতে পারলাম না। কেউ নেই ঘরে। সহসা উনানের কাঠ একখানা জ্বলে উঠ্‌ল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম ছবিটা আমার! হুবহু আমার মুখ। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম, ওটা আমার ছবি কেমন করে হবে? আমি তো তামাক খাই না, আর আমার চেহারাও ওরকম নয়। কিন্তু আবার বারবার

দেখলাম মুখটা আমারি! কিন্তু আমি তো কোন আর্টিষ্টের কাছে কখনো ছবির জন্য বসিনি! আর আমি অত বড়-লোকও নই এই ভাবে ছবি করাবার মত।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দে। ভোর হয়ে গেছে। জেগে উঠলাম। আশ্বস্ত হয়ে মনে হল স্বপ্নই বটে। আর আমার ছবি নেই? না, দু একটা আছে। তবে বড় ছবি নেই। ছোট ছোট ছবি আছে। কর্ম্মক্ষেত্রের তোলাও আছে। সে না থাকারই সামিল। যেন বাঁচলাম। ঐশ্বর্য্যময় পরিবেশে জন্মের, জীবনের, সমারোহ আমার হয় নি। শোকের সমারোহও হবে না। এবং হয়ত পরিণামও ওরকম হবে না। তেমন ছবিই নেই আমার। কিন্তু আর ছবি রাখবও না।

কিন্তু এমন কথা তো ছেলেমেয়েদের বা আপনার লোককে বলাও যায় না!

ভারতের মর্মবাণী

স্বামী যোগজীবনানন্দ

ভারতবর্ষের মর্মবাণী "সত্যম শান্তম শিবমদ্বৈতম।"

কেবল ভারতের নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেই এ তত্ত্ব চরম সত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা আজকাল অনেকেই বলেন। যদি তাই আমাদের আদর্শ হয় তা হলে এর মূলতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং অনুষ্ঠানগুলিও সেই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা সঙ্গত। অনুষ্ঠান স্বভাবত পরম-সত্যের বিরোধী, তথাপি ব্যবহারিক জগতে অনুষ্ঠান চাই এবং সে অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত করা প্রয়োজন যথাসম্ভব সত্যের অনুকূলে এবং সহজভাবে। উপমানকে অতিরঞ্জিত করলে উপমেয়ই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত প্রতীকই অবশেষে সত্যকে আড়াল ক'রে তাঁর বেদী অধিকার ক'রে বসে। এ বিষয়ে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বেলায় যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন, বিশেষ ক'রে শিক্ষায়তনে ও ধর্মায়তনে।

এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত থাকা কখনই ভারতীয় আদর্শের অনুকূল নয়। রাষ্ট্রশক্তি এর সংরক্ষক ও প্রতিপালক হ'তে পারেন, কিন্তু উপদেষ্টা বা নিয়ামক হ'লে অবাঞ্ছিত কুফল ফলে। পরিণামে প্রকৃত স্বাধীনচিন্তক বা যোগ্য সমাজ-সংস্কারক আবির্ভূত হ'তে পারেন না। তৈয়ারী হয় কলের মানুষ ও যান্ত্রিক সমাজ। তাতে পেটের ক্ষুধা ও ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা মেটবার সুযোগ আসতে পারে কিন্তু আত্মিক উপবাস হয় অনিবার্য। অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায় ঘটে এর অত্যন্ত অবসান, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার নাম গন্ধও বিলুপ্ত হয় পৃথিবীর বুক থেকে। এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

বাহ্যিক লাভের চেয়ে আত্মিক পূর্ণতা অনেক বড় প্রাপ্তি। অন্তরের বাঁধন ততই শিথিল হবে, যন্ত্রের বাঁধনকে আমরা যত বেশী দৃঢ় করব। সংস্কৃতির ধারক স্বাধীন সমাজ, সেখানে সাধারণের কল্যাণ সাধারণের হাতেই ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনে তাকে রূপান্তরিত করলে সমাজের মর্মস্থলে আঘাত হানা হবে, ভারতীয় সংস্কৃতির আধার চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসেই তার ইঙ্গিত মেলে। বর্তমান পরিস্থিতি আসে ভয়াবহ। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা যে-ক্ষতি করতে পারে নি, আমরা নিজেরাই "ন্যাশনালিজম্"-এর মোহে সেই ক্ষতি করতে বসেছি।

আদর্শবাদকে চমৎকার বর্ণে চিত্রিত করতে পারলেই তার সার্থকতা আসে না। তাকে সাধারণের কল্যাণরূপে রূপায়িত করার সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টা থাকা চাই। আবার কেবল রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক আদর্শকেই চরম ভেবে গতিপথ নির্ধারণ করা কল্যাণপ্রসূ হয় না। কর্মচঞ্চল পশ্চাতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে জড়কে প্রাধান্য দিয়ে কর্মকে আর যন্ত্রকে মানুষের আত্মার চেয়ে উঁচু আসন দিলেও প্রবঞ্চিত হ'তে হবে। এ পথ শান্তও নয় শিবও নয়। যেখানে স্বার্থ-সংঘাত সুনিশ্চিত, বা উদ্বেগপূর্ণ অকুশল, তা কাম্য হ'তে পারে না। শান্তং শিবম্-ই জীবের একান্ত কামনা এবং তা হওয়া চাই সত্যমদ্বৈতম অর্থাৎ শাশ্বত ও অখণ্ড। কোন কালে কোন দেশে কোন হেতুতেই আর রূপান্তর বা ভেদ দৃষ্ট হবে না। দেশ-বিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষে সত্যের নিয়ম অর্থাৎ প্রকৃত মানবধর্ম পৃথক পৃথক হ'তে পারে না। সত্যের কোন ভৌগোলিক পরিস্থিতি-বিপর্যয় বা দৃষ্টি-কোণের তারতম্য নেই, ব্যক্তিগত রুচি বা বিশ্বাস সাপেক্ষতাও নেই। সত্য যদি বিশ্বজনীন না হয় তবে তা সত্যই নয়। নিয়ম বলা চলে তাকেই যার ভিত্তি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, দল-বিশেষের খেয়ালে যা বিকৃত বা পরিবর্তিত হ'তে পারে না এবং যা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান সুবিধাপ্রদ।

আজকার যান্ত্রিক সমাজ ও তার বিজ্ঞান দূরত্ব ঘুচিয়ে দেশবিদেশের মানুষকে একত্র করেছে কিন্তু এক করতে পারেনি। একত্রিত হওয়াই একতা নয়, আত্মিক ঐক্যই একতা। বিশ্বের মানুষের স্বার্থান্ধ চিত্তে আত্মিক ঐক্য নেই বলেই কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক একত্রীকরণ আজ দুর্যোগের

বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে সংযোগ ঘটেনি, ঘটবেও না, যতক্ষণ না প্রত্যেকে আত্মিক অখণ্ডত্ব অনুভব করবে। একত্ব ঘটায় প্রজ্ঞান—বিজ্ঞান নয়। প্রজ্ঞান উন্মেষের জন্য যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন তাই বিশ্বমানবের আত্মার ধর্ম এবং তারই বিধান আছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যার মূলভিত্তি ধার্মিক-সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়।

প্রশ্ন উঠেছে, ধর্মের প্রয়োজন কি? এর উত্তর—মানুষের মতো শান্তিতে কুশলে সকলে সুখ-সম্পদ ও দুঃখ-দৈন্যের সম-অংশভাগী হয়ে আনন্দে বেঁচে থাকার জন্যই ধর্ম অর্থাৎ মানবধর্ম প্রতিপালন করতে হবে। ঈশ্বর-প্রাপ্তি, পরলোকে স্বর্গ-লাভ মুক্তি বা সুখসম্পদ প্রভৃতি কোন কিছুর জন্য নয়, শুধু আপনাকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্য ধর্ম চাই। যে ধরে রাখে অর্থাৎ সত্তাকে রক্ষা করে তাহাই ধর্ম।—"ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। যদি ভাবি ধর্ম কেবল সুখই দেবে, দুঃখ আসবে না, তা হলে হতাশ হতে হবে। আমরা ধার্মিক হলে প্রকৃতির সকরুণ নিষ্পেষণ হ'তে জড়ত্ব হ'তে প্রাণাত্মাকে মুক্ত রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করবো। প্রাণাত্মিক স্বারাজ্যই পরম সম্পদ। এ ধর্মের পথে দুঃখও আসবে, কিন্তু আমরা মহান ভয় হতে পরিত্রাণ পাব সুরক্ষিত হব। আজকার বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিস্থিতি কি বাঞ্ছনীয়? কে বলবে সর্বব্যাপক দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হয় নি? কী এ দুর্বুদ্ধির কারণ? সত্যধর্ম শিক্ষার অভাবে নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়নি, দুর্বুদ্ধির উদ্ভব হয়েছে। দুর্বুদ্ধিতেই দুর্ঘটনা ঘটায়। জড়কে সর্বস্ব ভেবে জড়বাদীরা যে ভ্রান্ত পথে চলেছে ততোধিক ভ্রান্ত-পথগামী তাঁরাই—যাঁরা চান ধর্মকে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত খেয়ালের উপর ছেড়ে দিতে, যাঁরা ভাবেন "ধর্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা হৃদয়াবেগের বস্তু, যার যেমন বিশ্বাস বা রুচি সে ধর্ম সম্বন্ধে সেই পথে চলবে, এবং ন্যায় হোক অন্যায় হোক সেই মতকে ধর্মমত বলে অন্য সবাই স্বীকার ক'রে নেবে, অন্তত সে-বিষয়ে সহিষ্ণু হবে; এই হল ধার্মিক স্বাধীনতা বা ধর্ম-নিরপেক্ষতা।" প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রয়োজন দেহ, মন ও প্রাণশক্তির সম্যক অনুশীলনের জন্যই। কেবলমাত্র ভাবাবেগের বা অন্ধ বিশ্বাসের উপর যার অস্তিত্ব নির্ভর করে, কতিপয় অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবং বিধর্মমতকে হিতকারী মানবধর্ম বলা যায় না, তা সমর্থন করাও উচিত নয়। এইরূপ স্বীকৃতির দুর্বলতাকে আশ্রয় করেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং তার পরিণতিতে দুঃসহ সাম্প্রদায়িক কলহের উদ্ভব হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক কলহের মূল কারণ কুসংস্কারজাত অনাবশ্যক অনুষ্ঠানের বাহুল্য এবং বিভিন্নতা। প্রত্যেক ধর্মমতের সব অংশই ন্যায় বিচারসহ সত্য নয়, যদিও তার মধ্যে কিছু সত্যের বর্ণনা নিহিত আছে। আজকার প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক ধর্মমতের সার সত্যাংশ অনুসন্ধান ক'রে তার সমন্বয় সাধন করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করা। "এও ভাল, ও-ও ভাল, এও হয়, ও-ও হয়" এরূপ মীমাংসা সত্যিকারের সমন্বয় সাধন নয়।

তবে কি উপায়ে সমন্বয়ের পথ বা সত্যের সন্ধান মিলবে, কি হবে ধর্মের মানদণ্ড? এর উত্তরে বক্তব্য—"প্রত্যেক প্রচলিত বিবদমান ধর্মমত হতে তার অনাবশ্যক প্রথা অনুষ্ঠান ও রূপকগুলি বাদ দিলেই ধর্মের সত্যরূপ ফুটে উঠবে। সত্যে সত্যে হানাহানি নেই উপদ্রব নেই, যত উপদ্রব অনুষ্ঠানের পার্থক্য নিয়ে। পূর্ব ও পশ্চিম দুই বিপরীত বিন্দুর মধ্যে সন্ধি অসম্ভব যতক্ষণ না তাদের পূর্বত্ব ও পশ্চিমত্ব বোধের বিলুপ্তি ঘটে।

সংযম ও সংহতিই অখণ্ড মানবজাতি গঠনের ভিত্তি। (জাতি অর্থে সর্বনাশা "ন্যাশনালিজম" ধরছি না, শান্তিকামী সংযমী বিশ্বমানবজাতির কথা বলছি) যারা খাঁটি মানুষ হতে পেরেছে প্রদেশ ভেদে ভাষা ভেদে তাদের মহান ঐক্য ও বিরাট সংহতি ব্যাহত হতে পারে না। কুসংস্কারক কুশিক্ষাজাত সংকীর্ণতাই পার্থক্য ঘটায়। দেশের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে যে লড়াই হয় তাতে মুখ্য সত্যই হারিয়ে যায়। দেশ কাদের? কোন জাতির কোন বিজেতৃর বা কোন শাসনসম্প্রদায়ের নয়, "সত্যমেব জয়তে"—দেশ সত্যের। সচলতা দুর্বলতার প্রশ্ন নয়, শাসক শাসিতের প্রশ্ন নয়, যা সত্য যা কুশল যা সুন্দর তা সকলের, সমগ্রকে নিয়েই তার পূর্ণত্ব।

চাই চিত্তের উদার উপলব্ধি। জ্ঞানের প্রসার ভিন্ন এ অনুভূতির অন্য উপায় নেই। যে তপস্যা, যে শিক্ষা, যে অনুশীলন, যে অনুষ্ঠান চিত্তে উদার উপলব্ধি প্রদান করে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন না ক'রে সীমাবদ্ধ করা বা তার অধিকার খর্ব করার অর্থ সত্যম শিবম সুন্দরমকে অবজ্ঞা ক'রে কোন দলীয় নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিশ্বজনীন কুশল-নীতিকে উপেক্ষা করা। এ পথ "সত্যম-শান্তং শিবমদ্বৈতম"-এর পথ নয়। সে-পথ—

"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ যেনাক্রম্ন্ত্যৃষয়োহ্যপ্ত কামা যত্রতৎ সত্যস্য-পরমং নিধানম।"
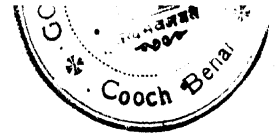
চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

চণ্ডীদাস বঙ্গের আদি ও অদ্বিতীয় কবি। তিনি কোথায় ছিলেন, কবে ছিলেন, লিখে রাখে নাই। কতকগুলি কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। ছাতনাতেও এক কিম্বদন্তী ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি এই কিম্বদন্তীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই।

চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে এখানকার এক যুবক আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কি প্রমাণে চণ্ডীদাসকে ছাতনায় এনেছি। আমি বলেছিলাম সুযোগ পেলে শোনাব। আজ সে সুযোগ পেয়ে' শোনাচ্ছি।

দেশ, কাল, পাত্র এই তিনের জ্ঞানে ইতিহাস, একটি ছেড়ে অপর দুটি খুঁজতে গেলে ভুল হ'য়ে থাকে। আমরা সকলেই জানি চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ে পদ অর্থাৎ গীত রচনা করেছিলেন। কতকাল পূর্বে এবং কোথায় ?

চণ্ডীদাসের কাল

১) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ শুনতে ভালবাসতেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের সমাপ্তিকাল দিয়ে গেছেন—তাহা হ'তে পাই ১৫৩৭ শক (পূর্ণিমান্ত জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপঞ্চমী রবিবার)। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং ৪৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৫৫ শকে তাঁর তিরোভাব হয়। অতএব গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যদেবের ৭২ বৎসর পরে লিখেছেন।

২) জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন—

> "জয়দেব, বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস,
> কৃষ্ণের চরিত্র তারা করিলা প্রকাশ।"

জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন। বয়সে কুড়ি বৎসরের ছোট ছিলেন। অতএব চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩) আরামবাগের অন্তর্গত বদনগঞ্জে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বাস কর'তেন। তিনি সাহিত্যচর্চা কর'তেন। অসংখ্য পুঁথী সংগ্রহ করেছিলেন। এক পুরাতন পুঁথীদৃষ্টে তিনি লিখেছেন, চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের ৮৩ বৎসর পূর্বে ছিলেন। ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়! অতএব চণ্ডীদাস ১৩২৪ শকের পরে আর ছিলেন না।

৪) এক কবি লিখেছেন—

> "বিধুর নিকটে বসি নেত্রপক্ষবাণ,
> নবহু নবহু রস গীত পরিমাণ।"

অর্থাৎ ১৩২৫ শকে ৯৯৬ গীত সমাপ্ত হ'য়েছিল। অর্থাৎ ১৩২৫ শকের পরে চণ্ডীদাস ছিলেন না। পক্ষ শব্দের স্থানে পঞ্চ শব্দ আছে। কিন্তু বিধুর, নেত্র, বাণ এই তিন আঙ্কিক শব্দের সহিত সামান্য পঞ্চ শব্দ বিসদৃশ হ'য়ে পড়ে। অথবা পঞ্চবাণ অর্থে পাঁচটি বাণ অর্থাৎ ৫ × ৫ = ২৫। অতএব ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের তিরোভাব সিদ্ধ হয়।

এই শকের এক পরীক্ষা আছে। এক কবি লিখেছেন, "মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রূপনারায়ণকে সঙ্গে করে' চণ্ডীদাসের সহিত মিলিত হ'য়েছিলেন। রূপনারায়ণ ২৯৩ অব্দে (১৩২২ শকে) মিথিলার রাজা হ'য়েছিলেন। তখন তাঁর নাম শিবসিংহ হ'য়েছিল। ইহার পূর্বে দুই কবির মিলন হ'য়েছিল। দেখা যাচ্ছে সে সময় চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন।

১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের তিরোভাব। এক্ষণে ১৮৭৬ শক চলছে। অতএব আজ হ'তে ৫৫০ বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাস স্বর্গগত হ'য়েছেন। তৎপূর্বে তিনি অন্ততঃ ৬০।৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতএব মোটামুটি বলতে'

---

* গত ৪ঠা কার্তিক আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ষণ্ণবতিতম জন্মদিবসে এক জনসভায় বাঁকুড়াবাসী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধ তাঁহার ভাষণ হইতে সঙ্কলিত এবং তাঁহার নির্দ্দেশে পরিমার্জ্জিত।

পারি চণ্ডীদাস ৬০০ বৎসর পূর্বে ছিলেন। এখন দেশ দেখি।

চণ্ডীদাসের দেশ

বহুকাল হ'তে সাহিত্যসেবীদের বিশ্বাস ছিল, চণ্ডীদাস বীরভূমের 'নান্নুরে' থাকতেন। এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ জাগে নাই।

১৩০০ সালে নদীয়া মেহেরপুর নিবাসী ৺রমণীমোহন মল্লিক 'চণ্ডীদাস' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ হ'তে ও নিজের অনুসন্ধানে প্রায় আড়াইশত পদ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। তিনি পুস্তকে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কয়েকটা কিম্বদন্তীর উল্লেখ করে'ছেন, আর লিখেছেন, চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুরে জন্মগ্রহণ করে'ছিলেন। আমি কয়েকটা পদ পড়ে' মুগ্ধ হ'য়েছিলাম এবং বীরভূম নান্নুরে বিশ্বাসী হ'য়েছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাস পরে টিক্‌ল' না।

১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ 'চণ্ডীদাস পদাবলী' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। বীরভূম নিবাসী ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি-এ, নান্নুরের নিকটবর্তী কীর্ণাহার হাইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি চণ্ডীদাস-পদাবলী পুস্তকে প্রায় আটশত পদ সঙ্কলন করে'ছিলেন। তিনি এই পুস্তকের দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন! চণ্ডীদাস এই নান্নুরে থাকতেন আর সেখানে বাসলীর পূজা ক'রতেন।

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাঁকুড়ার বেলেতোড়-নিবাসী ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ মহাশয় বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ এক গ্রামে ইহার পুঁথী আবিষ্কার করেন। পুঁথীর নাম ছিল না, তিনিই ইহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রেখেছিলেন। তিনি এই গ্রন্থের সম্পাদক। ইহাতে প্রায় চারিশত পদ আছে।

সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করে' বিচলিত হ'য়ে উঠেন। এতকাল আমরা যে চণ্ডীদাসের পূজা করে' আসছি' ইনি কি তিনি নহেন? ভাবে, ভাষায়, রচনা-ভঙ্গীতে ইঁহার পদের সহিত পদাবলীর পদের সাদৃশ্য নাই। এখনও ইহার দেশ বিষয়ে আলোচনা হয় নাই! ভক্তেরা বীরভূম নান্নুর ছাড়েন নাই। বিদ্বৎবল্লভ মহাশয়ও এই চণ্ডীদাসকে বীরভূমে রাখলেন। তাঁরা ভাবলেন না, ছয়শত বৎসর পূর্বে দুই বিভিন্ন চণ্ডীদাস কেমন করে' একস্থানে থাকতে' পারেন। আমি ছাতনায় চণ্ডীদাসকে না পেলে' আমারও সন্দেহ হ'ত না। এখানে দু-তিনটি বিষয় চিন্তনীয়।

(১) নান্নুর নামে গ্রাম আছে কি? ছিল কি?

(২) সেখানে বাসলী আছেন কি?

(৩) সেখানে যে বড়ু চণ্ডীদাস থাকতেন, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে কি? চণ্ডীদাসের বহু পরবর্তী, এখন হ'তে আড়াইশত বৎসর পূর্বে, চণ্ডীদাস-ভক্তেরা যা' শুনেছিলেন তা' পদ্যে লিখে গেছেন। একজন লিখেছেন,—

"নান্নুরের মাঠে, হাটের নিকটে,
বাসলী বসয়ে যথা।"

সেখানে চণ্ডীদাস থাকতেন। অতএব বীরভূমের নান্নুর কি সেই নান্নুর? একটা নগণ্য গ্রামের অর্থহীন নাম ছয়শত বৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকে কি?

যে গ্রামের নাম 'নান্নুর' বল্‌ছি' তার বাস্তবিক নাম 'নাড়ুড়', নান্নুর নয়। সে নাম কত বৎসর পূর্বে এবং কেন পাল্টে গেল? রেনেল সাহেবের ম্যাপে গ্রামটির নাম 'নানোর' আছে। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে সে ম্যাপ অঙ্কিত হ'য়েছিল। শত বৎসর পূর্বেও এই নাম ছিল। সেখানকার দলিলপত্রে এই নাম দেখা যায়। অতএব দেখ্‌ছি' 'নানোর' হ'তে 'নান্নুর' হ'য়েছে। ছয় শত বৎসর পূর্বে কি ছিল জানা নাই। অতএব বীরভূমের 'নাড়ুড়ে' সন্দেহ হ'চ্ছে।

বিশেষতঃ সেখানে বাসলী প্রতিমা নাই। তৎপরিবর্তে চতুর্ভুজা সরস্বতীর প্রতিমা আছে। অগ্নিপুরাণে এই সরস্বতীর বর্ণনা আছে। ঢাকা মিউজিয়ামে এই সরস্বতীর এক সুন্দর প্রতিমা আছে। তাঁর দুই হাতে বীণা, এক হাতে জপমালা, অপর হাতে মস্যাধার। বীরভূম নান্নুরের প্রতিমা বোধ হয় ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়েছে। সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট চিন্‌তে পারা যায় না। নীলরতন বাবু লিখেছেন, এই প্রতিমার তিন হাতে বীণা এক হাতে জপমালা। যে ধ্যানমন্ত্রে এই প্রতিমার পূজা হ'চ্ছে, তাতেও ত্রিহস্তে বীণা ও এক হস্তে জপমালা। এই মূর্তি বিশালাক্ষী নামে পূজিত হ'চ্ছেন। নীলরতনবাবু তন্ত্রসার হ'তে বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র তুলেছেন। তাতে আছে, বিশালাক্ষী দ্বিভুজা;

এক হাতে খড়্গ, অপর হাতে চর্ম বা ঢাল আছে। কণ্ঠে মুণ্ডমালা, শবাসনা, মূর্তি প্রসন্না। এই মূর্তির সহিত বীরভূমের বিশালাক্ষীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। আরও আশ্চর্য্য নীলরতনবাবু এবং তথাকার লোকেও বিশালাক্ষীকে বাসলী মনে ক'রেছেন। ধর্মপূজা বিধানে বাসলীর ধ্যানমন্ত্র আছে। তিনি দ্বিভূজা, এক হাতে খড়্গ, অপর হাতে নরকপাল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, রুধির পান ক'রতে ক'রতে এক শবের উপর নৃত্যশীলা। প্রবিকটদশনা, ভয়ঙ্করী। দেখা যাচ্ছে দুটো ভুল মিশে গেছে। চতুর্ভূজা সরস্বতী বিশালাক্ষী হ'য়েছেন, বিশালাক্ষী বাসলী হ'য়েছেন। বিশালাক্ষী 'বিশালা' এই নামে খ্যাত আছেন, কিন্তু কুত্রাপি 'বাশুলী' এই নাম পান নাই। পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে ১৭০৩ শকে ৺মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর ধর্মমঙ্গলে দু' তিন স্থানের বিশালা ও ছাতনার বাসলীর বর্ণনা ক'রেছেন। তাঁর নিবাস ছাতনা হ'তে পঁচিশ ক্রোশ পূর্বে ছিল।

কেহ কেহ 'বাগীশ্বরী' শব্দে বাসলী আবিষ্কার করেছেন। বাগীশ্বরী শব্দের গ-লোপে বা-ঈশ্বরী। এ হ'তে 'বাশুলী,' 'বাসলী,' কিন্তু এটা যুক্তি নয়, কল্পনা।

১৩২৭ সালে ৺করালীকিঙ্কর সিংহ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, 'চণ্ডীদাস' নামে একখানি ছোট বই দেওঘর হ'তে প্রকাশ করেন। তিনি নান্নুরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, তিনি বীরভূম নান্নুরে অনুসন্ধানকালে শুনেছেন "বিশালাক্ষীর মন্দিরটি ১২৯৯ সালে বাশুলীর বর্তমান পূজক শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রস্তুত।" আর দেখেছেন, তত্রস্থ কোন ভদ্রলোকই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না।

চতুর্ভূজা সরস্বতী মূর্তিটি মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে পাওয়া গেছে। এখনও এক শত বৎসর হয় নাই। দেখা যাচ্ছে বীরভূমে বাসলী নাই, অতএব বড়ু চণ্ডীদাসও ছিলেন না।

কবির চরিত দেশ ও কাল

বাহ্যপ্রমাণ

(১(বাঁকুড়া হ'তে সাত আট মাইল পশ্চিমোত্তরে ছাতনা। ইহা সামন্তভূমের রাজধানী। প্রকৃত নাম ছত্রিনা, অর্থাৎ ছত্রিনগর। এখানে বাসলীদেবী সামন্ত-বাবুদের কুলদেবী, গ্রামদেবীও বটেন। বাসলীর ধ্যানমন্ত্রে পূজা হ'চ্ছে। দেবীপ্রতিমার সহিত ঐক্য আছে। ইনি বহুকাল হ'তে পূজিতা হ'য়ে আসছেন মন্দির তার সাক্ষ্য।

/০—বর্তমান মন্দির ইঁটের, সত্তর আশী বৎসর পূর্বে নির্মিত।

৵০—ইহার পূর্বে পাথরের মন্দির। একটা পাথরে একটা শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। তাতে দেখা যায় দেবীর নাম 'বা-স-লী'; মন্দিরটি ১৬৫৫ শকে নির্মিত হ'য়েছিল। নির্মাণের দোষেই হোক্ আর মন্দির ধ্বংসকারী অশত্থ-বৃক্ষের উৎপত্তির জন্যই হোক্, মন্দিরটি অল্পকালেই ভেঙ্গে গেছে।

৶০—ইহার পূর্বে আদিস্থানের মন্দির। লোকে একে আদিস্থানের মন্দির বলে, কারণ পুরাতন মন্দিরের কিছু চিহ্ন আছে। এখন সে মন্দিরের বেদী ভিন্ন অপর কোন চিহ্ন নাই। ইহার পূর্বদিকে একটি পাথরের খিড়কী দ্বার। তার পূর্বদিকে বাসলীপুকুর বা শাঁখাপুকুর। পশ্চিম দ্বার পাথরের, সেটাই প্রধান দ্বার, বৃক্ষের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই আদিস্থানের চারিদিকে ইঁটের প্রাচীর ছিল। তার একখানিও পড়ে' নাই। বনিয়াদের ইঁট কিছু ছিল। আমি অনেক খুঁড়ে তিনখানি ইঁট পেয়েছিলাম। ইঁটে লেখা আছে "১৪৭৬ শক" রাজার নাম উত্তর রায়। কিন্তু কোন উত্তর রায় তা' পড়তে পারা যায় না। শকটি প্রাচীর নির্মাণের কিংবা মন্দির নির্মাণের। যারই হোক্ চারিশত বৎসর পূর্বের নিদর্শন পেলাম। ইহার পূর্বে বাসলী দেবী কোথায় ছিলেন তা' পরে পাওয়া যাবে।

(২) ছাতনায় রামী চণ্ডীদাসের রোমাঞ্চক কাহিনী প্রচলিত আছে। ইহার প্রমাণে ধোপাপুকুর নামে একটা পুকুর আছে। এই পুকুরে রামী কাপড় কাচত। যে পাথরে কাপড় কাচত লোকে সে পাথরটিও দেখিয়ে দেয়। চণ্ডীদাস ছিপ দিয়ে সে পুকুরে মাছ ধরতেন। ইহার প্রমাণে দেখা যায় বাসলীদেবীর নিত্যভোগে মাছ দিতে হয়। কেহ মাছ যোগায়। কোনদিন না আনলে বাসলীর পূজারীকে জলে নেমে অন্ততঃ একটা পুটীমাছও ধরতে হয়।

কিন্তু ছাতনায় গ্রামের কিংবা মাঠের নাম 'নান্নুর' নাই। ধোবাপুকুরের পশ্চিমে ধানজমির একটা মাঠ আছে। আমি একদিন সেখানকার কয়েকজন বালকের

সহিত কথা কইতে কইতে জানতে পারি, সেখানে 'নন্নুয়ার' মাঠ বা 'নুনুর' মাঠ আছে। ছাতনার লোকেরা এই নাম উচ্চারণ করে না। ইহার অর্থ অশ্লীল।

ইহার পাঁচ ছয় বৎসর পরে, কোলকাতা হ'তে শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম) বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। একদিন তাঁকে ছাতনা দেখাতে নিয়ে যাই। বেলা দুটো আড়াইটা। আমরা বাসলীর আদি স্থানের নিকটে গাড়ী হ'তে নামছি, দেখি একটি পথিক পশ্চিম মুখে যেতে' যেতে' আমাদিগে দেখে দাঁড়াল।

"তোমার ঘর কত দূরে?"

"ক্রোশটাক্ হবে।"

"এখানে কোথায় নুনুয়ার মাঠ নামে একটা মাঠ আছে জান?"

"আজ্ঞে কর্তাদের মুখে শুনেছি, সেটা ঐ মাঠের নাম। কিন্তু এ নাম ক'রতে আমাদের নিষেধ আছে।"

রাজশেখরবাবু সন-তারিখ দিয়ে তাঁর "নোটবুকে" এই সব কথা লিখে রেখেছিলেন।

এই মাঠের দক্ষিণে হাটতলা। এখন সেখানে হাট বসে না। কিন্তু নামটি আছে। সেখানটা ৩।৪ বিঘা সমতল জমি। পূর্বদিকে অল্প ইঁট পড়েছিল। তার পূর্বে এক জলহরি। রন্ধনপানাদির নিমিত্ত যে পুকুরের জল আহরণ করা হয়, যার জল 'সরা' হয়, তার নাম জলহরি। পুকুরটি ছোট নয়।

আমি ত্রিশ বৎসর পূর্বে যা দেখেছি, এখানে সেই কথা লিখলাম। মন্দিরে দেবীর পূজা হ'ত এবং সে পূজাদির নিমিত্ত জলহরি খনিত হয়েছিল। কিন্তু বাসলীদেবী ছাতনায় আসবামাত্র ইঁটের মন্দির হ'তে পারে না। কিছুকাল খড়ের ঘরে পূজা হ'ত এই গণনায় বর্তমান মন্দির, ষষ্ঠ মন্দির। এখন কবির—

> নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে
> বাসলী বসয়ে যথা।" ইত্যাদির মূল

পাওয়া যাচ্ছে।

(৩) অনুসন্ধানকালে জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া বাসলী পূজা ক'রতেন। তিনি মুখোপাধ্যায়, দেবগৃহে কার্য্যহেতু পদবী 'দেঘরিয়া'। তিনি বলেছিলেন, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই ভাই ছিলেন। দেবীদাস জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বেশী বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল; চণ্ডীদাসের বিবাহ হয় নাই। দেঘরিয়া মহাশয় চণ্ডীদাসের বংশধর। কথাটায় আমার প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, দেবীদাস হ'তে তিনি কত পুরুষ। তাঁর উত্তর, "বাইশ তেইশ পুরুষ চলছে। তখন তাঁর বয়স ৫৫।৬০ বৎসর। অতএব তাঁকে ধরে তেইশ চব্বিশ পুরুষ। পঁচিশ বৎসরে একপুরুষ ধরলে, প্রায় ছয়শত বৎসর। তিনি পুরুষ গণনার দ্বারা কালের ব্যবধান নির্ণয় জানতেন না। আমার তাঁর কথায় আর সংশয় রইল না।

(৪) ছাতনার রাজবংশের কাগজপত্র হ'তে একখানি ছোট পুথী পেয়েছিলাম। নাম ছিল না, আমি বর্ণিত বিষয় দেখে 'বাসলী মাহাত্ম্য' নাম রেখেছি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পুথীর অক্ষরদৃষ্টে দুইশত বৎসরের পুরাতন মনে হয়। কিন্তু রচনাকাল ১৩৮৭ শক। লেখকের নাম পদ্মলোচন শর্মা। তিনি লিখেছেন; "যাঁর পিতা নিত্যনিরঞ্জন, মাতা বিন্ধ্যবাসিনী, অগ্রজ দেবীদাস, গোত্র ভরদ্বাজ সেই কবি চণ্ডীদাসের জয় হউক।" হামীর উত্তর রায় ছাতনার রাজা ছিলেন। তিনি দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে বাসলী পূজায় নিযুক্ত করেছিলেন। দেবরিয়া বলেন, পদ্মলোচন দেবীদাসের পৌত্র। ইহা সম্ভব বোধ হয়। দুই তিন পুরুষ গত না হ'লে বাসলীদেবীর কীর্তি প্রকাশিত হ'ত না।* (১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে 'বাসলী মাহাত্ম্য' পুথীর প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য) এই সকল প্রমাণের দ্বারা কবির দেশ ও আনুমানিক কাল সিদ্ধ হ'চ্ছে।

আভ্যন্তর প্রমাণ :—

কোন কবি নিজের দেশ ছেড়ে কাব্য লিখতে পারেন না। অনুবাদগ্রন্থ নয়, মৌলিক কাব্য। তাঁকে স্থানের নাম করতে হয়। উপমা দৃষ্টান্তের জন্য তাঁর পরিচিত দ্রব্যাদির উল্লেখ করতে হয়। সকল লক্ষণ একত্র ক'রে কবির দেশ নির্ণয় করা কঠিন নয়। এইরূপে আমি 'শ্রীকৃষ্ণ

* কেহ লিখেছেন "নিত্যনিরঞ্জন" এইরূপ নাম পূর্বকালে ছিল না। কে জানে, কিন্তু দেখছি, নিত্যনিরঞ্জনের বর্তমান বংশধরের নাম "সত্য-সনাতন"। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশের উপরে। সত্যসনাতন নাম আর শুনি নাই।

কীর্তন' হ'তে চণ্ডীদাসের দেশ অনুমান করেছি। সে সব লক্ষণ কেবল বাঁকুড়াতে বর্তমান, অন্যত্র নয়। ১৩৪২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" প্রায় চারিশত পদ আছে। সকল পদের ভণিতায় তিনি আপনাকে 'বড়ু' বলেছেন। সংস্কৃত "বটু" হ'তে 'বড়ু' শব্দ এসেছে! সংস্কৃত "বটু" শব্দের অর্থ দ্বিজবালক। কিন্তু বাংলায় অর্থ দেবদেবীর পরিচারক। শূন্যপুরাণে 'পুষ্পবটু' ধর্মের পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করতেন। ধর্মপূজা বিধানে 'ভোগবটু' দেবতার ভোগ পাক করতেন। ভুবনেশ্বরে 'পানীবটু' শিবের পূজার নিমিত্ত কূয়া হ'তে জল তোলেন। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ নয়। আমার বোধ হয় চণ্ডীদাস দেবীর ভোগের আয়োজন করে দিতেন। কৃষ্ণকীর্তনে অনেক পদের ভণিতায় তিনি আপনাকে বাসলীগণের মধ্যে ধরেছেন। গণ শব্দের অর্থ দল, অনুচরসমূহ। অর্থাৎ বাসলীর সেবার জন্য অনেক পরিচারক ছিল। অতএব চণ্ডীদাস কোন রাজপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পদের ভণিতায় আছে—

"বাস্‌লী চরণ শিরে বন্দিয়া,
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।"

ইনি আদি কবি চণ্ডীদাস।

জয়তু শ্রীচণ্ডীদাস কবিঃ।

সংযোজন *

চণ্ডীদাস এক ছিলেন। তিনি বাসলীর বড়ু ছিলেন। তিনি ৫০০।৬০০শত বৎসর পূর্বে ছাতনায় বাসলীর বড়ু ছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ে গীত রচনা ক'রেছিলেন। তাঁহার ও চৈতন্যদেবের সময়ের মধ্যে ১০০শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোন কবি ঐ বিষয়ে গীত রচনা করেন নাই। কারণ অন্য কবি রাধাকৃষ্ণের গীত রচনা ক'রে থাক্‌লে জয়ানন্দ তার উল্লেখ ক'রতেন। চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদের রস আস্বাদন ক'রতেন। অতএব তিনি বড়ুর পদই শুনেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সকল পদ বড়ুর নয়। অন্য কবি তাঁর নামে পদ রচনা ক'রেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথীতে সে পদও সংগৃহীত হ'য়েছে। একজন নিজের নামই দিয়েছেন। তাঁর নাম অনন্ত। এইরূপ আরো কে কে দিয়েছেন আমরা জানি না। কিন্তু জানি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথীর বর্তমান আকার ১৫৫০ খৃঃ অব্দের সময় হ'য়েছিল। বড়ু পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের আদ্যে অন্তর্হিত হ'য়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান আকার পেয়েছে। এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে চণ্ডীদাসের রচিত পদের কি পরিবর্তন হ'য়েছিল তা বুঝ্‌বার উপায় নাই। অতএব চৈতন্যদেব বড়ুর পদ কি তাঁর অনুকারক অন্য কোন কবির পদ শুনেছিলেন, তা ব'ল্‌তে পারা যায় না।

চণ্ডীদাসের নাম নিয়ে অনেক মন্দ কবি পদ রচনা করে'ছিলেন। তাঁরা কে কোথায় ছিলেন, কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা তাঁদের পদের ভণিতা হ'তে ব'লতে পারা যায় না। চণ্ডীদাস কহে, বাসলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস এমন কি বড়ু চণ্ডীদাস থাক্‌লেও সে সব মূল চণ্ডীদাসের নহে। ভাষা, ভাব, রচনাভঙ্গী এই সব বিচার ক'রলে মনে হয়, এই সকল নকল চণ্ডীদাস। দুইশত আড়াইশত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। এই সকল যশঃপ্রার্থী কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস এই দুই নামে অনেক পদ পাওয়া গেছে। এঁরা নিজেদের আদর বাড়া'বার অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাসের নাম নিয়েছেন।

রামী চণ্ডীদাস কাহিনী

চণ্ডীদাস বাসলীর বড়ু ছিলেন। তিনি গান বাঁধতেন ও গাইতেন। সে সব গান আদিরসের। তিনি কোথা হ'তে এত রস পে'তেন? লোকে অনুমান ক'রলে কোন যুবতীর সহিত তাঁর ভাব ছিল। তার নাম রামী। এই কাহিনী সত্য হতে পারে।

এইটুকু ছাড়া আর যে সব কাহিনী প্রচলিত হ'য়েছে সে সব কল্পিত। রামী চণ্ডীদাসের উক্তি প্রত্যুক্তি কল্পিত নাটক। চণ্ডীদাস রামীর পদ লিখে, বড়ু চণ্ডীদাস নাম সই করে প্রচার ক'রতেন। নিত্যাদেবীর আদেশে স্বয়ং বাসলী তাঁকে সহজসাধন ক'রতে বলে'ছিলেন। ইহা কোন সহজিয়া বৈষ্ণবের কল্পনা। কেহ ইষ্টমন্ত্র প্রকাশ করে না। সাধনমার্গ ব্যক্ত করে না। কৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাস যোগ উপহাস ক'রেছেন।

আজকাল যেমন রামী চণ্ডীদাস কাহিনী নিয়ে, নাটক, যাত্রা, সিনেমা নাট্য রচিত হ'য়েছে; যে প্রবৃত্তিবশে এদের উৎপত্তি, পূর্বকালের লোকদেরও সে প্রবৃত্তি ছিল।

* গত ১৪ই কার্তিক, কলিকাতা নিবাসী এম-এ পরীক্ষার্থিনী এক ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তর।

আজকের ইউরোপ *

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

(১)

ইডেন হোটেল, রোম
৩০শে মে, ১৯৫৪

কাল বোম্বাই ছাড়ি। সান্টাক্রুজ বিমানঘাঁটী থেকেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা পিছু নেয়, নানা বিষয়ের আলোচনা শুরু করে ও আমার মতামত জানতে চায়।

মেরিণ ড্রাইভে "জাভেরী মহল" নামে সমুদ্রের উপরে এক বাড়ীতে আমি উঠি। ঘরখানি যা আমার ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল, সেটি অতি মনোরম—ঘরে বসেই আরব সাগর ও তৎসংলগ্ন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হর্ম্মমালামণ্ডিত বোম্বাই শহরের অপরূপ শোভা দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

একদিন মাত্র বোম্বাইয়ে থেকে গতকাল প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে রাত্রি ১১টায় এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল (এখন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন) অতিকায় বিমানপোতে ইউরোপ অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে দেখি ডাঃ রাধাবিনোদ পালও আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।

গ্রিমশেল গিরিবর্ত্মের পথে প্রায় ৭৫০০ ফুট উচ্চে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝে ১৮ই তারিখে এই হোটেলে ডি পি গোয়েঙ্কার সঙ্গে লেখক বেড়াতে যান! স্থানটি অতি মনোরম

বিমানটি ছিল বায়ুর চাপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেসারাইজড, গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০ মাইল এবং ১৬০০০ ফুট উঁচু দিয়ে বায়ুবেগে সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করলো। আমরা নিরুদ্বেগে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বল্প-পরিসর চেয়ারে ঠেস দিয়ে কি ঘুমানো যায়?

ভোর না হতেই দেখি আরব দেশের বাসরা শহরে আমরা উপস্থিত। রাত তখনও পোহায়নি। আমাদের ঘড়িতে তখন ৬টা, কিন্তু স্থানীয় সময় ৩-৪০ মিনিট, অর্থাৎ বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা সময় ও দূরত্ব দুই-ই শেষ করতে চলেছি।

আজকাল আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার দরুণ সর্ব্বত্রই যাত্রীদের অসুবিধা ও হয়রাণ ভোগ করতে হয়। passport ও তৎসহ visa না থাকলে ত জাহাজে উঠতেই দিবে না। তা ছাড়া নানারূপ এম্বার্কেসন নোটীশ, পোর্ট ডিকলারেশন প্রভৃতি কড়াকড়ি ব্যবস্থা চলেছে। সবাই সজাগ হয়েছে, তারাও আর বিদেশীকে বরদাস্ত করতে পারছে না। তবে আমেরিকান টুরিষ্টএর সংখ্যাও যেন বেড়ে চলেছে।

বাসরা ছেড়ে ঈজিপ্টের রাজধানী কায়রো'র আন্তর্জাতিক বিমান-

আল্পসের ৮০০০ ফুট উচ্চে চিরতুষরাবৃত গ্রিমশেল গিরিবর্ত্ম

ঘাঁটীতে এসে নামলাম স্থানীয় ঘড়ির ৮টার সময়। প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা হল—ভারতীয় সময় অনুযায়ী তখন বেলা ১২টা বেজে গেছে। ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত ঈজিপ্টের তরুণ সৈনিকরা বিমানঘাঁটী পাহারা দিচ্ছে। সর্বত্র কুচকাওয়াজ ও একটা অনিশ্চয়তার মনোভাব। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ থেকে নীলনদের উভয়কূলের শ্যামল শস্যক্ষেত্র মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মত অপরূপ দেখাচ্ছিল।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় গত মে মাসের শেষে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে জেনিভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (I. L. O.) পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। অধিবেশনের শেষে তিনি জেনিভা হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে মাসাধিককাল পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়কে যে সকল পত্র তিনি লেখেন, আলোচ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রধানত তাহারই সংকলন।—সম্পাদক, "ভারতবর্ষ।"

কায়রো ছেড়ে আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের উপর দিয়ে ভূমধ্যসাগর ও আড্রিয়াটিক সাগর পার হয়ে রোমান টাইম বেলা ২টায় (ভারতীয় সময় সকাল ৭টা) পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি রোম শহরে আমরা এসে উপস্থিত হলাম। ভারতীয় দূতাবাস থেকে অফিসার ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের সৌজন্যে আমরা কাষ্টমসের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেলাম। শুধু নূতন এক অভিজ্ঞতা হল এখানে এসে। আমার বোম্বাইয়ের গৃহস্বামী এক টুকরি বিখ্যাত আলফান্সো আম ও অন্যান্য কিছু ফল আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন—বিমানে আমার কাছেই ছিল সেই ফলের টুকরি। এখানকার সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ফলগুলি ধ্বংস করবার ব্যবস্থা হল। ব্যাপার দেখে তাজ্জব। পরে অনুসন্ধান করে জানলাম যে আমের আঁটিতে নাকি একরকম পোকা জন্মায়—যা ইতালীবাসীদের কমলালেবুর চাষের ক্ষতি করতে পারে। তাই ইতালীতে ভারতীয় ফলের প্রবেশ নিষেধ।

সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ শহরের মধ্যে ভল্লুক-খোঁয়াড়

কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে পেয়ে দূতাবাসের গাড়ীতে রোম শহর ও প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ, ভাটিক্যান প্রাসাদ প্রভৃতি দর্শনীয় বিষয়বস্তু দেখে এলাম। তারপর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি, আর, সেনের সঙ্গে দেখা করে বর্তমান ইতালির অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা গেল। আগামী কাল সকালে আবার জেনিভা রওনা হব।

(২)

হোটেল দ্যু রোঁ, জেনিভা
৪ঠা জুন, ১৯৫৪

রোম থেকে তোমায় যে চিঠি লিখেছিলাম, বোধ হয় এতদিনে পেয়ে থাকবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি রোম সহর আজও প্রাচীন ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনী (Romantic Tales), তার অসংখ্য মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীসমূহের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থ-নৈতিক অবস্থা এখনও ভাল নয়—প্রায় বিশ লাখ বেকার রেজিষ্ট্রিভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া কৃষকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। 'Lira' এখানকার চলতি মুদ্রা—বাজারে তার ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত কমে গেছে—এক পাউণ্ডে ১৭০০।১৮০০ লীরা পাওয়া যায়। ৩১শে সকালে এখানকার ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী শ্রীবাজপাই (ইনি বোম্বাইর গভর্ণর স্যার গিরিজাশঙ্করের ছেলে) আমাদের হোটেল থেকে ক্যাম্পিয়ানো বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে গেলেন—সেখান থেকে সোজা জেনিভার বিমান না থাকায় আমাদের মিলান ও জুরিখ ঘুরে আসতে হলো। মিলান ইটালীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর। শিল্প ও কৃষি-সম্পদে সহরটী খুব সমৃদ্ধ, ইতালীর প্রাণকেন্দ্র বলাও চলে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম—পাহাড় ও তার মাঝে বড় বড় হ্রদ—সর্ব্বত্র ফুলের শোভা স্থানটীকে আরও মনোরম

সুইজারল্যাণ্ডের একটি শহর আঁতরসি শহরের একটি দৃশ্য ! পিছনে ইয়ংক্রো চুড়া দেখা যাইতেছে

করে তুলেছে। জুরিখ সুইজারল্যাণ্ডের বৃহত্তম সহর ও শিল্পকেন্দ্র। আল্পসের উপত্যকার মাঝে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় সুন্দর শিল্পের কারখানা—শীত এখানে একটু বেশী, তার উপর আমরা যখন প্লেন থেকে নামি তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—কাজেই শীতের মাত্রা বাড়া অদৌ অস্বাভাবিক নহে।

জুরিখ এরোড্রম ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম বিমানঘাঁটী, সৌন্দর্য্য ও আরাম ব্যবস্থায় অতুলনীয়, জার্ম্মাণীর সংলগ্ন বলে এখানকার অধিবাসীরা জার্ম্মাণ ভাষাভাষী—তোমরা বোধ হয় জান যে সুইজারল্যাণ্ড ছোট দেশ হলেও এখানকার রাষ্ট্রভাষা তিনটী—উত্তরে জার্ম্মাণ, মধ্যে ফ্রেঞ্চ (French) এবং দক্ষিণে ইতালীয়। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গন্তব্যস্থান জেনিভায় এসে পৌঁছিলাম। তখনও এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে—বিমানঘাঁটিতে কাহাকেও না পেয়ে সোজা এক ট্যাক্সি করে আমাদের হোটেলে (পূর্ব্ব থেকেই ভারতীয় ডেলিগেসনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল) এসে উপস্থিত। হোটেলটী রোণ নদীর উপর, নাম হোটেল ডি রোণ। পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। আমেরিকান আদব-কায়দায় হোটেলটী

তৈরী হয়েছে। নীচে আমেরিকান কন্সাল জেনারেল অফিস। উপরে মার্কিণ প্রতিনিধি ও ধনকুবের আমেরিকান বিশ্বপর্য্যটকদল। কাজেই হোটেলে স্থানাভাব এবং খরচও অত্যন্ত বেশী। হোটেলে পৌঁছে আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার আমাদের ডেলিগেসনের সেক্রেটারী ডাঃ সেরাশী ও কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁরা দুঘণ্টা বিমানঘাঁটিতে অপেক্ষা করে জুরিখে খবর নিয়ে যখন জানলেন যে কোনও ভারতীয় ঐ প্লেনে আসেন নাই, তখন তাঁরা চলে আসেন—এই কথাই আমাদের বলেন। এখানে ১লা তারিখ থেকেই আমাদের কাজ সুরু হয়েছে। সাধারণ অধিবেশনের প্রথমেই I. L. O.এর সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্ব্বাচনের নীতি আছে। তোমরা শুনে সুখী হবে যে আমি I. L. O. সম্মিলনের সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছি এবং সভাপতি হয়েছেন ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামাডিয়ে। পৃথিবীর ৬১টী স্বাধীন রাষ্ট্র এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থায় যোগদান করতে এসেছিল। ডেলিগেট ও উপদেষ্টার সংখ্যা প্রায় ৬০০। বেলা ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত এখানকার সভাসমিতির কাজ চলে। আমার শরীর একরকম ভালই আছে।

(৩)

হোটেল দ্যু রোঁ, জেনিভা
১২ই জুন, ১৯৫৪

অনেকদিন পরে আজ সকালে তোমার একখানি বিস্তারিত পত্র পেলাম। সুদূর প্রবাসে থাকলে মানুষের মন তার ঘরের দিকে ছোটে এটা অতি সত্য কথা। তোমাদের কোন সংবাদ এতদিন পর্য্যন্ত না পাওয়াতে মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সারাদিন এখানে কাজের মধ্যে থাকতে হয়—এখানকার দৈনিক কার্য্যসূচি লক্ষ্য করলে স্তম্ভিত হতে হয়। সাধারণ অধিবেশন প্রত্যহ সকাল ১০টায় সুরু হয় এবং বেলা ১টা পর্য্যন্ত চলে। কোনদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেও বসে। তোমরা ত জান এটা ত্রিদলীয় সম্মেলন। প্রতি রাষ্ট্র থেকে সেই হিসাবে ৪জন করে প্রতিনিধি আসে—গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ২জন, মালিক ও শ্রমিক-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ১জন করে, তাছাড়া পরামর্শদাতা বা দর্শক থাকে। প্রতিদিন সকালে ৯টা নাগাদ পৃথক পৃথক দলের বৈঠক বসে, তারপর ১০টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত এবং বেলা ৩টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটির অধিবেশন চলে—এখানে তর্ক ও বিতর্কের শেষ নাই। তারপর বসে নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাহক কমিটী—বিকাল ৬টায় এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ চলে। এই নির্ব্বাহক কমিটী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর আলোচনা করে এবং কার্য্যসূচী এবং বক্তা—সকল বিষয়ের শেষ ক্ষমতা এই কমিটীর উপর ন্যস্ত থাকে। পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে ১০টি রাষ্ট্র বড় বড় শিল্পপ্রধান দেশ বলে গণ্য হয়—তারা সকলেই এই কমিটিতে স্থান পায়—ভারতও ইহার অন্তর্ভুক্ত, কাজেই আমি কমিটিতে থাকি এবং সকল বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ ছায়ার তলে থাকলেও সব সময় উপভোগ করতে পারা যায় না। সেই কারণে শনি ও রবিবারে ছুটি উপভোগ করতে পর্য্যটক বা কর্ম্মব্যস্ত লোকেরা লেকের ধারে বা পাহাড়ে বেড়াতে যায়। সুইটজারল্যাণ্ডের দুই দিক ঘিরে রয়েছে আলপ্সের অনন্তপ্রসারী তুষারধবল পর্ব্বতমালা। মাঝে মাঝে তার অসংখ্য গিরিবর্ত্ম, কোনটা গেছে ইতালী, কোনটা বা ফ্রান্স, কোনটা জার্ম্মাণীর দিকে। আর দুদিক থেকে পাহাড়ের বরফগলা জল এসে বড় বড় হ্রদ সৃষ্টি করেছে, এই হ্রদগুলিকে আশ্রয় নিয়ে পাহাড়ের গায়ে সব ছোট বড় সহর। সর্ব্বত্র ফুলের সমাবেশ—সর্ব্বত্র ফলফুলে, পাহাড় ও হ্রদে এবং বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জায় দেশটাকে যেন স্বপ্নপুরী করে গড়ে তুলেছে। জেনিভা সহর লেমান হ্রদের উপর অবস্থিত। এই হ্রদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ে নদী রোণ, এই নদীর উভয় কূলই পাথর দিয়ে বাঁধান। মাঝে একটি ব্যারাজের মতন আছে, তার দুই দিকেই আলোকমালা, আর সারি সারি অট্টালিকা ও বড় বড় হোটেল, জেনিভাকে হোটেল-সহর বললে অত্যুক্তি হবে না।

জেনিভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্যালে দ্য নেশানস। এখানেই আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে ইন্দোচীন শান্তি সম্মেলনও এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। পিছনে মণ্ড ব্লাঁ শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়

এই হ্রদটি ৮০ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে ১ মাইল থেকে ১০ মাইল পর্য্যন্ত—এই হ্রদের ধারে ধারে সুইটজারল্যাণ্ডের আরামকেন্দ্র ও বিলাস সহরগুলি গড়ে উঠেছে—Nijou (নিও), Lawssane (লুজান) Montruy (মন্ত্রো) এবং Caux (কো) প্রভৃতি। Moral Re Armament এর (M R. A) সদর দপ্তর ও কর্ম্মকেন্দ্র হলো এই (Caux) "কো" নগরীর পার্ব্বত্য প্রাসাদ। গত শনি ও রবিবারে আমরা খেয়ে-দেয়ে মোটরে করে কো রওয়ানা হই। ৮০।৮৫ মাইল আঁকা বাঁকা সীমেণ্ট বাঁধান চমৎকার পাহাড়ে রাস্তা হ্রদের পাশ দিয়ে চলেছে—লুজান ও মন্ত্রো সহর ঘুরে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা কো নগরীতে উপস্থিত হই। এই মন্ত্রো সহরে সুভাষবাবু অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং এখানেই ভিট্‌লভাই প্যাটেল যক্ষ্মারোগে মারা যান—এই প্যাটেল ট্রাষ্ট নিয়ে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল—যাক সে কংগ্রেসের পুরাতন ইতিহাস। লুজান ও মন্ত্রো সহরে বহু স্বাস্থ্যনিবাস ও যক্ষ্মাচিকিৎসাকেন্দ্র আছে। পণ্ডিত জহরলালের পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরু লুজানেই ছিলেন এবং এখানেই তার জীবনের অবসান হয়। এই সহর দুটি পাহাড়ের গায়ে ও হ্রদের উপর অবস্থিত। সারি সারি পাইন ও দেবদারু গাছ যেন সহরের শোভা ও স্বাস্থ্যসম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে। এই সহর দুটি ঘুরে আমরা যখন 'কো'তে উপস্থিত হলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হতে চলেছে। ক্যাম্পে আমরা M.R.A.এর প্রতিষ্ঠাতা Dr. Frank Buchman-এর বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে প্রচুর আদর আপ্যায়ন পাই, 'কো' নগরী একেবারে হ্রদের মাথায় এক পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত, প্রায় ৩২০০ ফুট উচ্চে, অথচ তলার হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলের উপর ভাসমান অসংখ্য ছোট ছোট পানসী ও পালতোলা নৌকা পর্ব্বতনিবাসী ও আগন্তুকদের কৌতুক বর্দ্ধন করছে। চতুর্দ্দিকে পাহাড় ঘেরা পাইন বনের মাঝে 'কোর' প্রাচীন প্রাসাদ অতি সুন্দর, বিরাট ও আরামদায়ক। ৮ তলা বাড়ী, প্রায় ৪০০।৫০০ ঘর সুসজ্জিত ও পরিপাটি। মাঝে বিরাট বক্তৃতামঞ্চ, নাচঘর, সিনেমাহল ও রঙ্গমঞ্চ—নীচে বিরাট খাবার ঘর—একত্রে ৫০০ লোকের খাবার মতন সাজ সরঞ্জাম, দোতলায় বিরাট লাইব্রেরী ও পাঠচক্র। দেশ-বিদেশের নানা কাগজ এখানে আসে। সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য লোক এখানে আসে এবং মানবতার ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট বিরোধী অহিংস-পন্থী এক আন্দোলন এরা গড়ে তুলতে চায়। আমি দুদিন এখানে ছিলাম এবং এ সম্বন্ধে ডাঃ বুকমানের সঙ্গে আলোচনা করি, মানুষটি খুব সরল ও সুপণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান, কিন্তু তাঁকে ঘিরে আবার এক কর্ত্তাভজার দল সৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের দেশে এর নমুনার অভাব নাই। ডাঃ বুকম্যান আমার সম্বন্ধে খুব যত্ন নিতেন, বাঙ্গালীর খাবার ঘরের মতন করে রান্না করবার হুকুম দিয়েছিলেন—প্রবাসে এসে এখানেই বাঙ্গালী খাবার পাই (ভাত ও পোলাও, কপির তরকারী, মাংসের ঝোল, দৈ, পুডিং প্রভৃতি)। সব সিদ্ধ খাবার পর এ মন্দ লাগেনি। তারপর ওদের নিজেদের তৈরী কয়েকটি নাটিকা—আশ্রমের ছেলেমেয়েরা মিলে অভিনয় করলো, মন্দ লাগল না। প্রায় পৃথিবীর সব জায়গার লোকই এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। ৫০০।৬০০ নরনারী এখানে বাস করছেন। থাকা ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাজসিক ও রাজকীয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগে—এই খরচ যোগায় কে? এর কোন সদুত্তর পেলাম না। কো থেকে ছোট্ট একটি ইলেকট্রিক ট্রেণে "রোসডুনে" (Rocher Du Naye) নামক এক পর্বত চূড়ায় উঠলাম। (৭৫০০ ফুট) সব বরফে ঢাকা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপরূপ ও অবর্ণনীয়। অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় শীতও বেড়েছিল, পর্ব্বতগাত্র পিচ্ছিল হওয়ায় ঘুরে বেড়ান একটু কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে—এ দেশের মেয়ে পুরুষরা বেশ আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাপযন্ত্র সেখানে ছিল, দেখলাম ৩০ ডিগ্রীর কিছু কম। সূর্য্যের কিরণে বরফের জমাট শুভ্রতা যেন চোখকে ঝলসে দেয়। সেইজন্য এখানে গগল্‌স নিয়ে আসা উচিত, সন্ধ্যা নাগাদ আবার নীচে নেমে 'কো'র প্রাসাদে আশ্রয় নিলাম।

আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলনের এই অধিবেশনে লেখক সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। চিত্রে দেখা যাইতেছে সভাপতি রামাদিয়ে'র অনুপস্থিতিতে লেখক সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। লেখকের বামপার্শ্বে I-L-O'র Director General ডাঃ মোর্স উপবিষ্ট রহিয়াছেন

(৪)

আশাকরি তোমরা সকলে শারীরিক কুশলে আছ। এখানকার সংবাদ এক রকম ভালই চলছে। সম্মেলনের কাজ কার্য্যসূচী অনুযায়ী চলেছে, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭॥০টা পর্য্যন্ত Palais Des Nations থাকতে হয়, মাঝে আমাকে সভাপতিত্বও করতে হয়েছে এবং সভাপতি Ramadior বিতর্কমূলক সকল বিষয়েই আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন। রাসিয়া ও তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক শ্রম (I.D.V.) সংঘে যোগদান করায় মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, এবং এবারকার অধিবেশনে সেইজন্য অধিকাংশ রাষ্ট্রের মন্ত্রীরাই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটী পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-শক্তির সংঘাতের নিদর্শন এখানেও আত্ম-প্রকাশ করেছে—ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি স্বতন্ত্র—কাহারও অনুগামী নহে। আমাকেও এখানে সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হচ্ছে। ফলে ভারতের ইজ্জতও মর্য্যাদা বাড়ছে ছাড়া কমে নাই। বৃটিশ, আমেরিকা, কানাডা, জার্ম্মাণী, জাপান, ব্রহ্মদেশ এমন কি সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ করা হয় এবং আদর আপ্যায়নও সঙ্গেই হয়। আমাকে ভারতীয় ডেলিগেশনের লীডার হিসাবে সর্ব্বত্র যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়। কাজেই আমাকেও সকলকে পার্টি দিতে হচ্ছে এবং সান্ধ্য-ভোজে আমন্ত্রণ করতে হচ্ছে।

যাক্ এবার গত সপ্তাহের ভ্রমণ কাহিনী সংক্ষেপে লিখ্‌ছি। তোমায় পূর্ব্বেই লিখেছি যে এদেশের কোন লোক শনিবারে ২টার পর আর কাজ করে না। সবাই ছোট লেকের ধারে বা পাহাড়ের গায়ে কোন আরাম কেন্দ্রে যায়। অনেক সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এই সব কাজে সাহায্য করে। I.L.Oর পরিভ্রমণ বিভাগ আমাদের এই টুরের ব্যবস্থা করলেন—খরচ আমাদের লাগল বটে, তবে অনেক কমে হলো। ভোরে ইলেকট্রিক রেলে রওয়ানা হলাম জেনিভা (Geneva) ষ্টেশন থেকে—একেবারে লুজান হয়ে বেলা ১০টা নাগাদ সুইটজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ (Bern) সহরে পৌছলাম। এ-সব অঞ্চলে সর্ব্বত্র ঝরণা ও জলপ্রপাত; তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টিকরে রেল চালায়; কাজেই কয়লার প্রয়োজন হয় না; বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে সারা-দেশটাকে এরা ঘিরে ফেলেছে। প্রতিটী ছোট-বড় গ্রামে ও-চাষীর ঘরে সস্তা দামে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে জাতির স্বাস্থ্যও সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে। বার্ণ বেশ বড় শহর। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা, সারিবাঁধা অট্টালিকা, তার মধ্যে বেশীর ভাগই আফিস বাড়ী, দোকান ঘর বা বড়-হোটেল, আর অসংখ্য-দূতাবাস, পার্ব্বত্য শহর উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা নেমেছে—প্রাকৃতিক শোভা অতি সুন্দর ও মনোরম। বড় রাস্তায় ট্রাম ও auto-Bus চলে, পাহাড়ের গা বয়ে এক কামরা-বিশিষ্ট ট্রেণ চলাচল করে, তা ছাড়া একরকম Electric-chair আছে, শূন্যে যাত্রীদের নিয়ে চলে—একটু ভয় করে বটে—কিন্তু খুব-বেশী দুর্ঘটনা ঘটে না, দার্জ্জিলিংএ রোপওয়েতে মাল-চলাচল করতে দেখেছ ত? অনেকটা সেই রকমই। তবে ভালভাবে বসবার জন্য মজবুত গোছের একটী করে চেয়ার আছে, বার্ণ শহরের একটু ইতিহাস আছে—এরা জার্ম্মাণ ভাষাভাষী—বার্ণ অর্থাৎ ভল্লুক—বোধ হয় অতীতে এই সব অঞ্চলে বন্য ভল্লুকের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ভালুক পূজা করতে সুরু করে, তাই এখনও তার জের চলেছে, বার্ণে সর্ব্বত্র ভালুকের ছবি টাঙ্গান দেখতে পাবে। সহরের বুকের উপর আজও তাই ভালুক ক্ষেদা-বিরাজ করছে—এখনও সেই ক্ষেদায় কয়েকটী জ্যান্ত ভালুক দেখতে পাবে। দলে দলে দেশ-বিদেশ থেকে এই দৃশ্য দেখতে লোক আসে। সহরের মাঝেই এক-বিরাট পাথরের প্রাসাদ—সুইস্ পার্লামেণ্ট বিল্ডিং—চারিদিকে ফুলের বাগান—নানারঙের ফুলের শোভায় স্থানটীকে সুন্দর করে তুলেছে। রেলের রাস্তা লেমাণ হ্রদের ধার দিয়ে পাহাড়ের কোল দিয়ে দেবদারু ও ঝাউ বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে চাযের জমি, উঁচু নীচু পাহাড়ের কোলে ঢেউ-খেলানো-বিস্তৃত আঙ্গুর ক্ষেত। আঙ্গুরের চাষ ও তারই চোলাই করা মদই এই দেশের লোকের প্রধান ব্যবসায়। আল্‌পসের বুক চিরে এরা রাস্তা করেছে তাই অনেক ক্ষেত্রে সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বার্ণ ছেড়ে এই রকম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে স্পিয়ার সহরে এসে উপস্থিত হলাম।

এখানে কয়েকটি ছোট কারখানা আছে। পাহাড়ের কোলে "থুনা" (Thouna) হ্রদের মুখে এই সহরটি অবস্থিত। ল্যাক লেমেনের মত এটিও এক বিরাট হ্রদ, কয়েক শত বর্গ মাইল হবে এর আয়তন। স্পিয়ারে একটি সুন্দর বন্দর আছে। ছোট ছোট জাহাজ ও ষ্টীমার এই হ্রদে চলাচল করে। স্পিয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা ইণ্টারলেক বা সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবাসস্থলে আসিয়া পৌছিলাম। স্থানটি অপরূপ, চারিদিকে পর্ব্বতমালা, তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ, ইয়াং ফ্র এখান থেকে অস্পষ্ট দেখা যায়—আধুনিক সহর—খুব বড় বড় হোটেলে সহর ঘেরা—উঁচু বেশী বলে স্থানটি একটু ঠাণ্ডা, একটি কাটা খাল দিয়ে থুন হ্রদের জলকে সহরের মধ্যে নিয়ে এসে সহরের শোভা বর্দ্ধন করা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে নানা রংএর ফুল ও নদীগর্ভে সন্তরণরত অসংখ্য অতিকায় রাজহংস ও চতুর্দ্দিকে তুষারধবল পর্ব্বতমালা স্থানটিকে স্বপ্নপুরী করে তুলেছে। এখানকার লোকদের অন্য কোন ব্যবসায় বাণিজ্য নাই—হোটেলই একমাত্র ব্যবসায়। আর স্মৃতিচিহ্ন নাম দিয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিদেশী পর্য্যটকদের কাছে জিনিষ বিক্রী করা। ইণ্টারলেক্‌স ছেড়ে বেলা ৩টা নাগাদ থুন হ্রদের পাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে রেল চল্‌তে সুরু করল। লটাস বার্গ লুপ ধরে ট্রেণ চললো। এ পথে সহর বা লোকের বসতি নেই বললেই চলে। চারিদিকে অনন্তপ্রসারী পর্ব্বতমালা, মাঝে মাঝে ঝরণা, জলপ্রপাত এবং দূরে আঁকাবাঁকা রোণ নদী। প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চে পাহাড়ের বুক চিরে সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্য এই রাস্তা নির্ম্মাণ এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—এই রাস্তাটি প্রায় ২০০ মাইল বিস্তীর্ণ, ছোট বড় প্রায় ৬০টী সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণে বহু লোকক্ষয় হয় এবং ১২ বৎসর সময় লাগে। এই টানেলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সত্যই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হতে হয়। লট্‌সবার্গ দুর্গমবর্ত্ম দিয়ে যাবার সময় প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য যা দেখতে পাওয়া যায় তা বর্ণনাতীত। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। আমাদের দেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে যেতে পেলে মানুষ আর বিদেশে আসতে চাইবে না। কিন্তু আজও তা দুর্গম। বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে সুগম করে তুলতে পারলে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ আপনি এসে জড় হবে।

ভাল কথা আমার ফেরবার কার্য্য সূচী তৈরী হয়ে গেছে। তার এক কপি তোমায় এই পত্রের সঙ্গে পাঠালাম।

(১)

শীতকালের রাত—তবু কাল সারারাত ঘুম হয় নি ভগবতীর। দুঃখই শুধু নিদ্রাকে হরণ করে না, সুখও এমন ভাবে বাদ সাধে মাঝে মাঝে। সুখই তো। বহুদিন ধরে মনে পুষে-রাখা আকাঙ্ক্ষা—তিলে তিলে লয় হয়ে আসছিল মনের মধ্যেই, কোন দিক থেকেও কণামাত্র আশার আলো দেখা যায় নি। হঠাৎ যেন দীর্ঘদিন পরে সেই নিভে-যাওয়া আলো পূর্ণশক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—সে কল্পনা কোনদিনই তো করেন নি ভগবতী। অথচ তাই হ'ল। কঠিন বাস্তবকে চাপা দিয়ে কল্পনাই প্রসারিত হয়ে উঠল অকস্মাৎ। আকস্মিক বলে বেগও তার অসামান্য। সে প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে পারলেন না ভগবতী—সারারাত্রি নিদ্রাহীন চোখে—প্রতিটি প্রহর গুণতে লাগলেন।

দুপুর বেলায় চিঠি এসেছিল—সামান্য কয়েক ছত্রের লেখা একখানি পোষ্টকার্ড। প্রবাসী স্বামী লিখেছেন :

এখানে বাসা ঠিক করিয়া ফেলিলাম। দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইতেছি। সময় অল্প, যতদূর সম্ভব গোছগাছ করিয়া রাখিবে।

একবার দু'বার করে অনেকবার পড়া হয়ে ওই ক'টি ছত্র মুখস্থ হয়ে গেল। শহরে বাসা ঠিক করে—এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যাওয়ার সময় হল এতদিনে! এত সুদীর্ঘ কাল—নিঃশেষিত কামনাটি কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল; —আলো-বঞ্চিত ঘাস যেমন রঙ হারিয়েও রস হারায় না চাপা পড়লে।

পায়ের গতি দ্রুত হল ভগবতীর। ছেলের পড়ার ঘরে ঢুকে চিঠিখানা ওর কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, দেখ তো রে সন্তু—উনি বাসা করার কথা কি যেন লিখেছেন!

বাসা? বই ফেলে লাফিয়ে উঠল ছেলে। কোথায় মা?

কোথায় আর—শহরে। ভগবতী নিশ্চিন্ত স্বরে জবাব দিলেন।

ছেলের চোখেও খুসীর শিখাটি জ্বলে উঠল, অবশ্য মায়ের দৃষ্টি-প্রদীপই তা জ্বালিয়ে দিলে।

বললে, কে কে যাবে শহরে? আমরা সবাই?

জানি না—চিঠিখানা পড়ই আগে—তারপর শুধিও। ওঁর কণ্ঠে তৃপ্তির আমেজ লেগে রয়েছে।

চিঠি পড়ে ছেলে লাফিয়ে উঠল, দিদি—দিদি—শুনছিস?

শুনলে সবাই। পড়ার ঘরে বসেই আর একবার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে সন্তু। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সবাই কলরব করে উঠল। দিদি, মিণ্টু, ঘোঁতন আর টুনু। তিন বছরের অবোধ ছেলে টুনু—তার চোখেমুখেও খুসী উপচে পড়ছে।

কমলা (দিদির নাম) বললে, মা—দেখ দেখ—টুনুও কেমন হাসচে।

হাসবে না? জ্ঞান বুদ্ধি ওরও কিছু কিছু হয়েছে তো। —মা মন্তব্য করলেন। একটা অবোলা পশুও দুঃখু কষ্ট বুঝতে পারে—ওতো মানুষ।

সন্তু বললে, যাই বল—পোষ মাসে এক পশলা বৃষ্টি হলে এখানকার ঠেলাটা বুঝিয়ে দিত।

ভাগ্যিস পোষ মাস অবধি থাকতে হবে না আমাদের। কমলা আশ্বাসের স্বরে বললে।

আগে যাওয়াই হোক বাপু—তার পর তোরা আহ্লাদ করিস।

কেন—এই তো বাবা লিখছেন—এখানে বাসা ঠিক করিয়া ফেলিলাম। তার মানেই তো সব ঠিক হয়ে গেছে। সন্তু উচ্চ মন্তব্য করল।

ভগবতী বললেন, তোদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা—মানুষের মতি যেন বদলায় না। দেখলাম তো আরও কতবার। সব ঠিকঠাক, শেষকালে বললেন, এখন থাক।

না মা, সে ঠাকুরদা ছিল বলে—বুড়ো মানুষ—

তার পরও কাটে নি তিনটে বছর? যতক্ষণ শহরে গিয়ে গুছিয়ে না বসছি—ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।

না মা—আমরা সবাই মিলে বাবাকে বলব।

তাই বলিস। হাসতে হাসতে মা পিছন ফিরলেন। ওরাও কলরব করতে করতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সন্তু তার বন্ধু পটলের কাছে গিয়ে বললে, জানিস পটলা—আমরা কালই কলকাতায় চলে যাচ্ছি।

ধুস্—কে তোদের নিয়ে যাবে? পটল অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

বাবা আজ রাত্তিরেই বাড়ী আসবে—এই দেখ চিঠি লিখেছে।

অকাট্য প্রমাণ হাজির করে সন্তু গর্ব্বিতভাবে হাসতে লাগল।

কথাটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। প্রতিবেশীরা আসতে লাগল।

মুখ-ফোঁড় আশুর মা বললে—তাই যা বাছা, এখানে কি সুখেই বা থাকবি! পেটে যাও একবেলা জোটে তো পরণের কানি জোগাড় হয় না। তবু তোর শ্বশুর মিনসের মান-সম্ভ্রম ছিল—লোকে ছেদ্দাভক্তি করে টাকাটা-সিকেটা দক্ষিণে দিত—কলাটা মুলোটা সিধেয় দিত। এখন টাকা টাকা সের চাল কিনে পাড়াগাঁয়ে আর মান কাঁড়াতে হয় না কারও। তাই যা বাছা—কথায় বলে সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভগবতী বললে, দেশ ছাড়তে কার সাধ দিদি—তবু—

সারা রাত্রি হিসাব করল ভগবতী, অভাবের তাড়নায় কে কে দেশ ছেড়েছে। শহর মানুষকে শুধু অর্থ দেয় না—নির্ভরতা দেয়। সেখানকার সবই আশ্বাসে ভরা। পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর মানুষ-জন। মানুষের কল্পনায় যত বিস্ময়কর বস্তু আছে—সবই তো শহরে ঠাসা। এমন একশোটি পাড়াগাঁ—শহরের কোলে অনায়াসে ঠাঁই পেতে পারে—শহরের মধ্যে হারিয়ে যেতেও বেশীক্ষণ নয়। পুকুর আর নদীর মধ্যে যে আশমান-জমিন ফারাক—পাড়াগাঁ শহরেও তাই। ওখানে জীবন আছে বলেই মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দও মধুর। ওখানকার কত গল্প ভিড় করে জমল মনের মধ্যে—। আশায়—আনন্দে—ঔজ্জ্বল্যে—উচ্ছ্বাসে—ফুলে ফুলে উঠল রাত্রির প্রহরগুলি। সারারাত্রি কাটল উত্তেজনায়—বিনিদ্রভাবে।

ভাবনার তো কূল-কিনারা নাই। ওর স্রোত ঠিক সামনে চলে না—পিছনেও ঠেলে নিয়ে যায় মানুষকে। অনেক বছর আগে—তখন শ্বশুরঠাকুর বেঁচে—সেই প্রথম বিরোধের সূত্রপাত—বাপে ছেলেতে।

শ্বশুর বললেন—পরের দাসত্ব নিয়ে বিদেশে পড়ে থাকবার জন্য তোমায় লেখাপড়া শেখাইনি।

ছেলে ভীরু প্রতিবাদ তুললে—না হ'লে সংসার চলবে কিসে?

এখনও তর্কালঙ্কার বাড়ীর এমন অধঃপতন হয়নি যে—ম্লেচ্ছের দাসত্বগিরি না করলে পেট ভরে না। এখনও দশ বিশ ক্রোশের মানুষ—এক ডাকে এ বাড়ীর মানুষকে চেনে।

হাঁ—বহুদূর থেকে মানুষ আসে—বিধান নিতে—সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থার সম্মান এখনও মানুষ দেয়; কিন্তু দিনকালের পরিবর্ত্তনটা দ্রুততালেই চলেছে। মানুষের মতভেদে সমাজের মধ্যেও খুব বড় ফাটল ধরেছে। সমাজ-বিদ্রোহী মানুষের সংখ্যা যেন বেড়েই চলেছে—দেব দ্বিজে ভক্তি—এখন আর অচলা নয়। বহুর উপর নির্ভর করার দিন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে—তার চেয়ে একের দাসত্ব হাজার গুণে ভাল।

এইসব আলোচনা ভগবতীর সঙ্গে কতদিন হ'য়েছে। এখন কি আর আগের দিন আছে—? দু' টাকা মণ চাল—বারো আনা সের ঘি—টাকা টাকা কাপড়—ন' সিকের জুতো—দু' আনার বাজারে একটা বড় গেরস্তর দু'দিন অঢেল হয়ে যায়। ঘরে ঘরে গরু আর উঠোনের আনাজপাতি—আম কাঁঠালের গাছ···গৃহস্থ বিদেশ বাসের কথা ভাববেই বা কোন্ ফাঁকে। উঠোনের আম কাঁঠাল গাছ আজও আছে—বয়স বৃদ্ধিতে তারা ঝাঁকড়া হয়েছে বেশী—কিন্তু ফলন্ত গাছে পশুর উপদ্রব আর লোভী মানুষের উপদ্রব বেড়েছে। তা'ছাড়া বেড়েছে সংসার।

দু'টি মুখে যা ছিল অপর্য্যাপ্ত—আটটি মুখে তার অকুলান হবেই।

স্বাচ্ছল্যের দিনে দু' হাত ভরে বিলিয়ে বিলিয়েও মানুষ অফুরন্ত আনন্দ সঞ্চয় করে নিয়েছে—আর আজ হাতের মুঠো শক্ত করে মনের অঙ্গনও যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। এমন সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে পরের দুয়োরে হাত পাতায় সম্ভ্রম কখনও অক্ষুণ্ণ থাকে!

বাবাকে না বলেই একদিন অমরনাথ গৃহত্যাগ করলেন। সংসারকে বাঁচাবার জন্য গৃহত্যাগ। যে বিদ্যা অর্জ্জন করেছেন—তাতে চাকরি না-পাবার কথা নয়। তখন তো নানান সমস্যায় মানুষ এমন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠেনি, একটা পাস-দেওয়া ছেলে অনায়াসে একটি চাকরি খুঁজে নিতে পারত।

চাকরি হ'ল—পত্রেই সংবাদ এল। তখন দুপুর বেলা। স্নান আহ্নিক গৃহদেবতা নারায়ণের পূজা ইত্যাদি সাঙ্গ করে তর্কালঙ্কার আহারে বসবার উদ্যোগ করছেন। চিঠিখানা পড়ে—ওঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, শুভ খবর বউমা, অমরের চাকরি হয়েছে।

শ্বশুরের মুখের পানে চেয়ে ভগবতী ভাল মন্দ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনার ভাত বাড়ব বাবা?

হাঁ—নারায়ণকে উপবাসী রাখলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে। গম্ভীর স্বরে তর্কালঙ্কার জবাব দিলেন।

তা আজ সন্ধ্যেবেলায় হরির লুটের ব্যবস্থা করুন না। সাহস সঞ্চয় করে ভগবতী বললেন।

তর্কালঙ্কার হাসলেন, তুমি কি মনে কর মা—ঠাকুর এতে খুশী হবেন! আমাদের রুচি দিয়ে দেবতাকে তৈরী করি বলেই ভাবি—যাতে আমাদের লোভ তাতেই দেবতার লাভ!

দেবতাকে যথারীতি অন্ন নিবেদন করে—সামান্য মাত্র গ্রহণ করলেন তিনি।

ভগবতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আপনার শরীর কি ভাল নেই বাবা?

না, না, ভালই আছে। তবে কি জান মা—একটা অশুভ ছায়া যেন দেখতে পেলাম আজ। কি অশুভ—জানি না। তিনি হাসলেন। অত্যন্ত ম্লান হাসি। একটু থেমে যেন একটা নিশ্বাস বুকে টেনে নিয়ে বললেন, বাস্তু প্রতিষ্ঠার সময় সমস্ত দেবতার শুভদৃষ্টি কামনা করে মানুষ। নারায়ণ পূজা—হোম—স্বস্তি পাঠ—পূর্ব্বপুরুষের প্রসন্নতা ভিক্ষা···শুধু মানুষ বাস করবে এই বলে তো সে গৃহ নির্ম্মাণ করে না—সেই সঙ্গে থাকবেন দেবতা—ধর্ম্ম আর পুণ্য এই দু'টো জিনিসে ভরে উঠবে সংসার। প্রতিদিনকার প্রার্থনায়—পূজায়—জপে—কর্ম্মে—দেবতাকে প্রসন্ন করার প্রথাই আছে। জন্ম ভিটার মহত্ত্ব যাতে বাড়ে তারই জন্য ক্রিয়া-কলাপের আয়োজন—তারই জন্য ব্রত উপবাস নিয়ম।

তা চাকরি করলে সে সব যাবে কেন বাবা!

যায়। বিদেশ বাসে মানুষের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা নষ্ট হয়—জন্মভিটা ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ সে অনুভব করতে পারে না। জেন মা—শুধু অন্নঋণেই মানুষের জীবন রক্ষা হয় না—দেবঋণ—ঋষিঋণ—পিতৃঋণ এগুলিও শোধ করতে হয়।

বিনিদ্র রাত্রি বহু অতীত ঘটনাকে হুবহু মনের আয়নায় প্রতিফলিত করলে। ভগবতী ভাবতে লাগলেন, শ্বশুরঠাকুর কি সত্য কথাই বলেছিলেন সেদিন?

বছর পাঁচেক পরে—তখন কমলা ছুটোছুটি করতে শিখেছে—সন্তু এসেছে কোলে—এমনি দুপুর বেলায় পত্র এল: ইচ্ছা করিতেছি—তোমাদের কলিকাতায় লইয়া আসিব। পিতাঠাকুরের অভিমত জানিয়া পত্র দিয়ো।

বেশ তো যাবে। অদ্ভুত হাসিতে জবাব দিলেন তর্কালঙ্কার।

ঠাকুরকে অন্ন উৎসর্গ করে নিজে কিছুই গ্রহণ করলেন না তর্কালঙ্কার। সন্ধ্যার পূজা পাঠে যেন বড় বেশী সময়-ক্ষেপ করলেন। পূজা সেরে বললেন, আজ রাত্রিতে কিছু খাব না—বউমা।

কেন বাবা—ওবেলা তো হাতে-ভাতে মাত্র করলেন, এবেলাও—

শরীর ভালই আছে—তবে খেতে পারছি না বউমা। কারা যেন জোর করে আমায় বলছে—ওরে আমরা আর থাকতে পারছি না।—তর্কালঙ্কারের গলার স্বর কেঁপে উঠল—খড়মের খটাখট শব্দ তুলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

বছর তিনেক পরে—আর একবার চিঠি এল। মিণ্টু ঘোঁতনকে নিয়ে এখন সংসার বড় হ'য়েছে। দুজায়গায় সংসার চালানো কষ্টকর বলেই—অমরনাথ বাবাকে পর্য্যন্ত অনুনয় করেছেন—শহরবাসের জন্য। ওখানে কাছেই গঙ্গা—নিত্য স্নানের সুযোগ, বাগবাজারের বিখ্যাত মদন-মোহন ঠাকুর—সকাল সন্ধ্যায় তাঁর দর্শন লাভ। ওই মন্দিরে সন্ধ্যায় নিত্য ভাগবত পাঠ—নাম কীর্ত্তন—

তর্কালঙ্কার হেসে বললেন, বুড়োকে লোভ দেখিয়েছে অমর! ছেলেমানুষ—জানে না বাইরে দেবতা খুঁজে নেবার বয়স আমার বহুদিন শেষ হ'য়েছে—নিত্য স্নানের শক্তিও হারিয়েছি। এখন মনেই আমার—গয়া-গঙ্গা-বারাণসী। মনের মধ্যেই সব তীর্থ—সব দেবতা—তাঁদের কাহিনী মহিমা—কীর্ত্তন আলাপ। এই ঘুড়িটাকে কতদূর আর উড়িয়ে নিয়ে যাব মা—সুতো জড়ানো লাটাই যে আমার এইখানে পড়ে রয়েছে। কথা শেষে তিনি দু' হাত জোড় করে বাস্তুভিটার উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

সেবারও ফিরে গেলেন অমরনাথ।

তারপর আরও পাঁচটা বছর কেটেছে। তর্কালঙ্কার দেহ-রক্ষা করেছেন—দেহরক্ষার সময় অমরনাথ কাছে ছিলেন না—তাঁকে তার করে আনাতে হয়।

মৃত্যুর আগে শ্বশুর বললেন, সব বাঁধন কেটে দিয়ে চলেছি বউমা—আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। তবু মা—এ কথাটি ভুলো না—দুঃখ যত পাও—ভিটেয় থাকবার চেষ্টা করো। ভিটে মানুষকে শুধু সম্মান দেয় না—তাকে সান্ত্বনাও দেয়। ভিটেয় মানুষ একলা নয়—পিতৃকুল আর দেবকুল তার সহায়। গাছের পক্ষে যেমন মাটি—মানুষের পক্ষে তেমনি ভিটে। স্বধর্মচ্যুত হয়ে কেউ বাঁচে না—টবের গাছ আর শহরপ্রবাসী মানুষ।

তারপরও তিন বছর কেটেছে। এবার শহর বাসের আপত্তি—নিজে জানিয়েছেন ভগবতী। এক বছর কালাশৌচ—আর দুটি বছর তাকেই অনুসরণ করে—শ্বশুরের শেষ কথা রক্ষার চেষ্টা কিংবা ভাবালুতা, যাই হোক, মৌন বাধাতেই কেটে গেছে।

সত্য কথা বলতে কি—হাসিমুখে প্রবাস-বাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নি ভগবতী। এই তিনটি বছরে গৃহ-বাসের কঠোর মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। দেশের আয় একটি কাণাকড়িও নাই। দুর্ম্মূল্য চালের দায়ে আহার পরিধেয়ে যে কৃচ্ছতা বহন করতে হয়েছে তাতে তর্কালঙ্কার বাড়ীর মর্য্যাদা অটুট থাকে নি। নিজের অর্দ্ধাহার ছাড়াও প্রতিবেশীর দুয়ারে হাত পাতার কলঙ্ক, গাছের আম কাঁঠাল বিক্রয়ের দুর্নাম, হাতের একমাত্র অলঙ্কার রুলি দু'গাছি বাঁধা দেওয়ার অপযশ—কি না বহন করেছেন তিনি। অন্ন-ঋণ যে মানুষের কত বড় ঋণ—সে তথ্য মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছেন তিনি। ক' বছর ধরেই তিনি অনুভব করেছেন—এই পিতৃপুরুষের ভিটার যত মাহাত্ম্যই থাকুক এককালে—অন্যকালের সমস্যা সেই মহত্ত্ব হরণ করে নেয়। পাড়াগাঁয়ে মৃত্যু যেন মুখ ব্যাদান করেই আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে মানুষ পালাল শহরের দিকে। সেখানে কমলার ভাণ্ডার জীবনদানের প্রলোভন দিয়েছিল হয়তো। যুদ্ধের ধাক্কায় মানুষ শহরকেই ত্রাণকর্ত্তা বলে জানল। যে অন্ন মাঠে ছিল দুষ্প্রাপ্য—তা বহু কড়ির বিনিময়ে শহরে হল সুপ্রাপ্য। গ্রামের অর্দ্ধেক খালি হয়ে গেল। উত্তর দিকের দত্তরা—দক্ষিণের পরামাণিক ও কাঁয়েরা, পূবের ভট্টাচার্য্য আর দাসেরা! পশ্চিমে খানিকটা বন—সেই বন আরও খানিকটা বাড়ল বিশ্বাসরা ভিটে ছাড়ার পর। এখন রাত্রিকালে মনে হয়—বিজন বনের মধ্যে রয়েছেন সব। ছোট বড় পাঁচটি শিশুর সঙ্গে একই শয্যায় ঘেঁষাঘেঁষি করে কত সাহসই বা সঞ্চয় করতে পারেন ভগবতী। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে—হাঁক দিয়ে ডাকলে কেউ আসবে না। মানুষ নেই—তার আসবে কে? দুর্ঘটনা যে ঘটেনি—সে ভগবানের করুণা। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। প্রবাস বাসের আনন্দও সেই স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে হয়তো।

না—আরও একটি কারণ রয়েছে—মনের গভীরে। এবং সেইটেই বুঝি মূল কারণ। প্রেক্ষিত-ভর্ত্তার বেদনা—মনে মনে কোন মুহূর্ত্তে কি অনুভব করেন ভগবতী? মাসের সামান্য দু' একটি দিন পতি সমাগমের আনন্দ—তৈলপূর্ণ প্রদীপে—সন্ধ্যাকালীন শিখার মতই খানিকক্ষণের জন্যই জ্বলে উঠত। কিন্তু বুকভরা তেল নিয়ে—আগুনকে আরও বহুক্ষণ ধরে রাখার সামর্থ্য নিয়েও যদি ধরে রাখা না যায় তো—প্রদীপের আক্ষেপ যত তুচ্ছই হোক—মানুষের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কি বেড়ে চলে না? সে আকাঙ্ক্ষা—

সংসারের কাজ ও কর্ত্তব্য মিটিয়ে নিরালা মুহূর্ত্তে দিনে দিনে প্রবলতর হয়ে ওঠেই না কি? সে যেন সংসারের খানিকটা পেয়ে—আর খানিকটা না পাওয়ার বেদনায় মুহ্যমান হয়ে থাকে। নারী সংসারকে আধাআধি পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না। মায়ের দাবি মিটলেই কিন্তু প্রিয়ার দাবি মেটে না। শত অভাব-অনটন—বয়স-বাড়ার অজুহাতেও সে দাবিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা নিস্ফল। তেমনি একটি প্রবল কামনার শিখায় এতকাল দগ্ধ হ'য়েছেন ভগবতী। এতকাল পরে সেই বেদনার শেষ হবে—এই পরম আশ্বাসই কি নিদ্রাহরণের প্রধানতম হেতু নয়।

আজ প্রত্যূষেই সর্ব্ব ক্লেশের অবসান ঘটবে এমনি আশ্বাস ও আনন্দে ভগবতীর রাত্রি জাগরণ-শুষ্ক মুখে প্রসন্ন-মেদুর লাবণ্য ভেসে উঠল।

(ক্রমশঃ)

রাঢ়ের সাহিত্য-সাধক

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রাঢ়ের সাহিত্যসাধনার কথা 'কহনে না যায়।' রাঢ় বাংলার এই বিপুলায়তন সাহিত্য-সেবা বঙ্গ কালচারের একটা মহামহিম দিক। রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) বঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে। কুরু-পাণ্ডবগণের সময়ে বঙ্গে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের অভাব ছিল না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের দ্বারা বসবাসিত বাংলায় সাহিত্যের চর্চ্চাও হইত। গৌড়ে জৈনমতের আধিক্য ঘটে। জৈন পার্শ্বনাথ মানভূমের পার্শ্বনাথ পাহাড়ে মোক্ষ লাভ করেন। মানভূম প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তা মতে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সংকলিত হয়। পার্শ্বনাথ উহার ১২৩০ বর্ষ পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন। অতএব, রাঢ়ে যে সাহিত্যের স্ফুরণ বহু পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, খৃষ্ট জন্মের প্রাক্‌যুগ হইতেও রাঢ়ীয় সাহিত্যে আলোচনা সুরু হয়। জাপানের "ইকরুগ মঠে" আচার্য্য বোধিধর্ম্ম চীন সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ হইতে "প্রজ্ঞা পারমিতা হৃদয়সূত্র" এবং "উষ্ণীষ বিজয়ধারিণী" তন্ত্রগ্রন্থ তথায় লইয়া যান। ঐ গ্রন্থদ্বয় বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই হিসাবে প্রমাণ করা যায় যে, ৫২৬ খৃঃ রাঢ়ে তন্ত্র-সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়।

রাঢ়ের সাহিত্যের বিকাশ ও ব্যাপ্তি accidental আকস্মিক নয়। অধ্যাত্ম ভাব-সাধনা এবং রাষ্ট্রীক আত্ম-চেতনার পরিপ্রেক্ষায় রাঢ়ীয় সাহিত্যের সৃষ্টি। যাহা আকস্মিক তাহা চিরন্তনের সম্মান লাভ করিতে পারে না। হিসাব-নিকাশ বা দপ্তর-দস্তুরের কথা নয়,—কথা হইতেছে—প্রাণ-সত্তার স্ফূর্ত্তি ও ব্যাপকতার। রাঢ়বঙ্গ বলিতে পরিপূর্ণ ভাবে বর্দ্ধমানকেই সম্যক্ ভাবে বোঝায়। বর্দ্ধমানকে বাদ দিয়া রাঢ়ের সাহিত্য সাধনার কথা অব্যক্ত রহিয়া যায়।

জ্ঞানদাস বর্দ্ধমানের কাঁদড়া গ্রামের কবি। ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস ব্রজ বুলিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ব্রজ বুলিতেই অধিক সংখ্যক পদরচনা করেন। কবি ব্রজ বুলিতে প্রায় শতাধিক পদরচনা করেন। কাঁচড়ায় 'মঙ্গলঠাকুরের' বংশরূপে খ্যাত এক গোস্বামী-বংশে ১৫৩০ খৃঃ জ্ঞানদাসের আবির্ভাব। কাঁচড়ায় জ্ঞানদাসের মঠ আজও কবির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

বৈষ্ণব গীতি-কাব্য রচয়িতা ও পদকর্ত্তাদের নির্ভুল সংবাদ আজও তিমিরাচ্ছন্ন। গোবিন্দ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে, একটা কথা এখানে বলা একান্ত প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার বিচার বিবেচনার কোন কারণ দেখি না। গোবিন্দ কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীখণ্ডের নৈয়ায়িক এবং দামোদর দাসের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব ও নরহরি সরকারের শিষ্য। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ "স্মরণ-দর্পণ" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রামচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ কবি। গোবিন্দ কবিরাজ ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন। পরে রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হন। ১৫৭৭ খৃঃ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষালাভ করেন। গোবিন্দের আবির্ভাব কেন্দ্র শ্রীখণ্ড। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ মহাশয় দেহরক্ষা করেন। গোবিন্দের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। গোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় "সঙ্গীত-মাধব" নাটক ও "কর্ণামৃত" কাব্য রচনা করেন। মাতুলালয়ে গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছন্দ লালিত্যে কবিরাজ মহাশয়ের কাব্যের অনুপমতা অতুলনীয়:—

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ॥

গোবিন্দ কবিরাজের কাব্যরসের ছন্দ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীবগোস্বামী ইঁহাকে "কবিরাজ" বা "কবীন্দ্র" উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। গোবিন্দের সহধর্ম্মিণীর নাম মহামায়া।

ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যায়ের পদকর্ত্তা শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন। কবি-ঞ্জনের উপাধি বিদ্যাপতি। ব্রজবুলি রচনায় কবিরঞ্জন বিশেষ ক্ষ ছিলেন।

জগানন্দ জাতিতে বৈদ্য। এঁর আদি নিবাস শ্রীখণ্ড। ১৭৮২ খৃঃ াগদানন্দের মৃত্যু হয়। জগদানন্দ পরে বীরভূমের জোফলাই গ্রামে বাস রিতে থাকেন। বংশীবদন বর্দ্ধমানের পাটুলী জনপদের ছকড়ি চট্টোর ত্র। ১৪৯৪ খৃঃ বংশী চৈত্রমাসে পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। পদাবলী ্যতীত তিনি "দীপাম্বিতা" নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বংশীর পৌত্র ামচন্দ্র একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। রামচন্দ্র ১৫৩৪ খৃঃ প্রকট হন এবং ৫৮৩ খৃঃ মাঘমাসে কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। বাঘনাপাড়া ও রাধানগরের মহোৎসব এই রামচন্দ্রকে ইয়াই সৃষ্টি। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে। াই বাঘনাপাড়াকে লইয়া সাহিত্যের একটা বিশেষ আঙ্গিক-সৌষ্ঠব চিত্রিত ইয়াছে। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দাস আর একজন পদকর্ত্তা। ঁর "গৌরাঙ্গ বিজয়" কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বংশীবদনের পুত্র চতন্যদাসও একজন পদকর্ত্তা। পরমেশ্বরী দাস জাতিতে বৈদ্য। জাহ্নবী ্কুণার মন্ত্রশিষ্য পরমেশ্বরী দাস। পরমেশ্বর দাস নামেও ইনি খ্যাত। ম্ভবতঃ দাস মহাশয় কালনা মহকুমায় ছিলেন। কিন্তু বৈদ্য অথচ দাস দবীর কারণ সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত সন্দেহ পোষণ করেন। বৈষ্ণবগণ াত্যন্ত বিনয়ী, সম্ভবতঃ বৈদ্য হইয়াও তিনি এই দাস পদবী ব্যবহার রিতেন। রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর, অপর নাম চন্দ্রশেখর। র্দ্ধমানের পড়ান গ্রামে শশিশেখরের জন্ম। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন াাস্বামীর শিষ্য ও নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত। ধনঞ্জয় দাস ইনিও বর্দ্ধমানের াঁচড়া—চাঁচড়া গ্রামের কবি। চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর মহাপ্রভুর মেসো শাই। চন্দ্রশেখরকে আবার শশিশেখরের ভ্রাতা রূপে আখ্যা দেওয়া য়। অম্বিকার গৌরীদাস এবং কৃষ্ণদাসও পদকর্ত্তা রূপে খ্যাতি লাভ রেন। অম্বিকা হইতেছে—অম্বিকাকালনা।

রঘুনন্দন গোস্বামী বঙ্গখ্যাত রঘুনাথ গোস্বামী। ইনি কিশোরীমোহন াাস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর পুত্র। রঘুনন্দন পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া ড়াল বাহাদুরপুরের গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন রেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই রঘুনাথ সংস্কৃত ও বাংলায় কবিতা লখিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ প্রবাহধারা—রামরসায়ন'। আনুমানিক ১৮৩১ খৃঃ উহা রচিত। রঘুনন্দন গোস্বামীর াংলা কাব্য গ্রন্থ রাধামাধবোদয় ও গীতমালা। রামরসায়নের ভাষায় কছু কিছু প্রাচীনতার লক্ষণ দেখা যায়। কর্‌য়াছেন মন্ত্র সমাপন॥ কর্‌য়াছেন" শব্দটি উনবিংশ শতকের ব্যবহৃত ভাষার মত নয়। ামনারায়ণের স্মৃতি বাঙ্গালীকে আজ আর কোন নূতন প্রেরণা জোগায় া। পুরাতনের প্রতি বর্ত্তমান বাঙ্গালীর বীতস্পৃহ ভাব আত্ম-বিস্মৃতির কটা অন্যতম দৃষ্টান্ত। রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা, বিমাতা মধুমতী। ঘুনন্দন ছিলেন পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। রঘুনন্দনের অপর নাম াগবত। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষায় রঘুনন্দন অশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন রেন। ভাগবতের সংস্কৃত কাব্যও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। াধামাধবোদয়' ও 'গীতমালা' রঘুনন্দনের বাংলা-কাব্য গ্রন্থ। 'রামরসায়ন' ত খণ্ডে বিভক্ত। বর্দ্ধমানের মানকর এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম। বর্গী হাঙ্গামা কাল হইতে-এই জনপদ ইতিহাস খ্যাত হইয়াছে। ভাস্কর পণ্ডিতের স্মৃতি এই জনপদের সহিত জড়িত হইয়াছে। রঘুনন্দনের পিতা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করেন। রঘুনন্দনের বংশের সকলেই কীর্ত্তিমান ছিলেন।

এবার চৈতন্যচরিতামৃত পরম গ্রন্থের কথা কহিব। ১৫১৭ খৃঃ বর্দ্ধমানের কাটোয়ার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে চৈতন্য-যুগীয় প্রামাণ্যগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাসের পিতা ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্ভবতঃ কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ই ছিল ভগীরথের একমাত্র উপজীবিকা। কৃষ্ণদাসের বয়স যখন ছয়—তখন ভগীরথ মারা যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাদাস চার বছরের। মাতার নাম সুনন্দা। নিত্যানন্দ প্রভুর কিঙ্কর 'মীনকেতন' রামদাস ঝামটপুরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণদাসের আবির্ভাব হয়। প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নাদেশ দিয়া বৃন্দাবনে আসিতে বলেন। ভিক্ষার দ্বারা পথাতিবাহনের ব্যয় সংগ্রহ করেন। "গোবিন্দলীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। অদ্বৈত সূত্র কড়চা, স্বরূপ-বর্ণন, রাগময়ী কণা প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। নয় বৎসর পরিশ্রমের পর ১৬১৫ খৃঃ চৈতন্য-চরিতামৃত সমাপ্ত করেন। তখন কৃষ্ণদাস অশীতিপর বৃদ্ধ। চৈতন্য-চরিতামৃত ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সমাজের এক অমর দর্শন শাস্ত্র। বৃদ্ধকালে চৈতন্য-চরিতামৃত রচিতে গিয়া কবি লিখিলেন,

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু হয় না স্মরণ।

১৬১৫ খৃঃ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা সমাপ্ত হয়—ইহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উহার রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদানে অক্ষমতা জানান। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—"কবিরাজ ঠাকুর বাংলায় বড় নিপুণ ছিলেন না।" আর একদল বলেন—কবিরাজ ঠাকুর হিন্দী ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ে প্রেরণের সময় লুণ্ঠিত হয়। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ উহা লুণ্ঠন করে। এই সংবাদে কবিরাজ মহাশয়—"অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে"।

চৈতন্য-জীবন যুগের ধর্ম্মদর্শনকাব্য ও শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন চৈতন্যচরিতামৃত। রাঢ়ের সাহিত্যিক-মর্য্যাদা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঢ্য করিয়াছে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রেমরসের যে তরঙ্গায়িত প্রবাহধারা বিনা প্রচারে প্রচারিত হইয়াছিল—আজও তাহা অম্লান হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সহিত ষোড়শ শতাব্দীকে বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটা প্রশ্ন জাগে। বর্ত্তমান যুগের ন্যায় চৈতন্য প্রাক্‌ ও পরবর্ত্তী যুগ কি প্রচারধর্ম্মী ছিল? শ্রীচৈতন্য একটা অখণ্ড সত্তা—একটা যুগসূর্য্য!

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন:—১৫৭৭ খৃঃ পর দশ পনের বৎসরের মধ্যেই গ্রন্থসঙ্কলন করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বৈষ্ণব দর্শনের এক অপূর্ব্ব অবদান কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত।

রাঢ়ের সাহিত্য-চর্চ্চার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে না। রাঢ়বঙ্গ সমগ্র বাংলার একটা প্রাণসত্তা,—বাংলার ইতিহাসের মধ্যমণি।

গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী বলিয়াছিলেন—'মানুষ কেবল উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।' অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণের ফলে শরীরটা ঠিক থাকে বটে, কিন্তু মানুষের মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাঁচিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রাথমিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। কিন্তু স্বাধীনতার বিকাশ ইহাই নহে। এগুলি স্বাধীনতা বিকাশের পথের সহায়ক মাত্র। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকাতেই স্বাধীনতার সার্থকতা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়াই তাহা একমাত্র সম্ভব। নিছক সংস্কৃতিকে হারাইয়া তাই কোনো জাতি বড় হইতে পারে না। ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ইংরেজ সেইজন্য প্রথমেই আঘাত দিয়াছিল সংস্কৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। প্রায় দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসনে আমরা আমাদের নিজস্ব ভাবধারা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুগ্র আলোয় ধাঁধিয়া আছে। বিশেষভাবে, সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া একদা ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। শহরকেন্দ্রিক জীবনধারা ও সভ্যতা আমাদের এমনি প্রভাবিত করিয়া আছে যে, গ্রামের কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, সারা দেশটাকে শহুরে ছাঁচে ও সভ্যতায় গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিতে ভাবিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতেছি, গ্রামকে গ্রাম শ্মশানে পরিণত করিতেছি এবং শেষ পর্যন্ত গ্রামের সমস্ত সম্পদ শহর-কেন্দ্রিক লোভ ও চোরাবাজারের গর্ভে তুলিয়া দিয়া নিজেদেরই সর্বনাশ করিতেছি।

অন্নবস্ত্রের অভাব চিরকালের নহে, অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হইবেই। আসল সমস্যা—মানুষের 'স্বদেশী' হওয়ার সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের পথ—স্বদেশীর ধারায় শিক্ষাদানের পথ। কিন্তু শিক্ষার ধারার রূপবদলের পূর্বে আমাদের সমস্যার মূল শিকড়টিকে পর্যন্ত চিনিতে হইবে। আমরা প্রায় সকলেই ইংরেজ-সৃষ্ট বিদেশীয় প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যর্থতার সঙ্গে পরিচিত। ইংরেজ তাহার রাজ্যশাসনের কর্মচারী ও নিজস্ব তাঁবেদার লোক সৃষ্টির জন্য স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা করে। তাহাতে তাহার কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সুষ্ঠুভাবে চালাইবার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। অবশ্য তাহার মধ্য হইতেই আমরা বিখ্যাত মনীষী, সাহিত্যিক, কবি, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মগুরুদের পাইয়াছি। কিন্তু তাহা নিছকই Bye-product অর্থাৎ কাঁচা কয়লাকে পোড়া কয়লায় পরিণত করার সময়ে ন্যাপথলিন পাওয়ার মত।

শিক্ষা মানুষের জীবনকে উন্নত ও প্রগতিশীল করিবে। কিন্তু যে-শিক্ষা আমরা পাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে উলটা ফল ফলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্ররা দশ বৎসরের শিক্ষায় কী বিদ্যা শিখিতে পারে? ইংরেজী ভাষা যাহা শিখে, তাহাতে চাকরী করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। মাতৃভাষায় এক-কলম লিখিতে বলিলে অনেকেই পাঠ্যপুস্তক ও অভিধান খুলিয়া বসে। গণিতের জ্ঞানে সংসারের কোন কাজই হয় না। যাহা হয় তাহা লেখাপড়া শেখার নামে বিদ্যালয়ে যাওয়া। গ্রামের যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের পরের দ্বারে চাকরী করা ছাড়া গতি নাই, তাহাদের ঋণ করিয়া হোক, ভিক্ষা করিয়া হোক, কলেজে পড়াশোনা করিয়া শেষে চাকরী জুটাইয়া লইয়া গ্রামের সম্পর্ক ছাড়িতে হয়। বহু উৎসাহী ও কর্মী যুবক গ্রামে থাকিয়া গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও, গ্রাসাচ্ছাদনের কঠোর সমস্যার চাপে বেদনার সহিত গ্রাম ছাড়িয়া সহরের বুকে নিজেদের বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। চাষীর ছেলে দুইপাতা ইংরেজী ও ইতিহাস-ভূগোল পড়িয়া গ্রামের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলিয়া যায়, পিতা ও অভিভাবকদের মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করে! অন্যান্য বৃত্তিধারী ও শিল্পীর সন্তান নিজের শিল্পের কথা ভুলিয়া সামান্য কেরাণীর চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ভালো ছাত্র উন্নতি করুক, উচ্চাসনে বসুক, দায়িত্ব অর্জন করুক—ইহা সকলের কাম্য; কিন্তু মেকী আত্মসম্মানের মোহে শ্রমের মর্যাদাকে ভুলিয়া গিয়া এই যে আমরা দিন দিন পিছনের দিকে চলিয়াছি, ইহাই সর্বনাশকর।

এই মোহের উপর সর্বপ্রথম সক্রিয়ভাবে আঘাত দিয়াছেন গান্ধীজী। চরকাকে মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করার মূলে যে যুক্তি আছে, তাহার মধ্যে অন্যতম শ্রমের মর্যাদা দান। স্বাবলম্বনের মধ্যে যে শিক্ষা, তাহা মানুষের এক পচা পুরাতন জীবনধারার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ এমনি হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা গ্রামীণ মনোভাবাপন্ন তথা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের মূলেও এই কথা রহিয়াছে। শ্রম ও কর্মকে ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষা, তাহা মানুষকে আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বনের উপর গ্রামিক হওয়ার পথ দেখাইবে। যে ছাত্র যে পরিবেশে মানুষ হইবে, যে বিশেষ শিক্ষা পাইবে, সে তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে: শিক্ষার সার্থকতা এইখানেই। গ্রামের কৃষি ও কুটীরশিল্প কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা যাইবে, গ্রামের সংস্কৃতি ও সভ্যতা কেমন করিয়া পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাইবে, কেমন করিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ জনপদ গড়া যাইবে,—ইহাই তো গ্রামের শিক্ষা।

এই পথের প্রথম ধাপ প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার। গ্রামের টোল, পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পুনরুদ্ধার এবং গ্রামে গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন। পুনরুদ্ধারের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে

এবং সরকার গ্রামে গ্রামে 'নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে আগ্রহশীল বলিয়া জানি। কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আশা করি, শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যে পূর্ব-অনুসৃত শম্বুকগতি পরিহার করা হইবে। দ্বিতীয় ধাপ: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গান্ধীজী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী পদ্ধতি প্রবর্তন করা। এ বিষয়েও সরকার কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। সর্বাপেক্ষা সুখের কথা, এই শিক্ষা-বিস্তারের পশ্চাতে গ্রামের অধিবাসীদের দান ও প্রচেষ্টার তুলনা নাই। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই স্রোতকে গ্রামীণ সংস্কৃতির খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলেই সুফল ফলিবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ধারা মৌলিকত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও সেই তিমিরে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য-সূচি কয়েকবার পরিবর্তন করা হইয়াছে, পরীক্ষা-গ্রহণের রীতিনীতির কিছু অদল-বদল হইয়াছে, কয়েক বৎসর হইল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন' শব্দের পরিবর্তে 'স্কুল ফাইন্যাল' প্রয়োগ অর্থাৎ নাম-বদল করা ব্যতীত বিশেষ মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সেই পুরাতন "চাকরী" করিবার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি এখনও পোষিত হইতেছে। শ্রমকে পরিহার ও ঘৃণা করিবার দৃষ্টিকোণ এখনও মনের গভীরে বদ্ধমূল রহিয়াছে। একমাত্র মনের জড়তা বিদূরিত করিয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারিলে উক্তরূপ সংকীর্ণতা লুপ্ত হইবে। উক্ত নাম পরিবর্তনের মূলে কর্তৃপক্ষের কী চিন্তাধারা ও কী দৃষ্টিভঙ্গী আছে জানি না। কিন্তু যদি নামের অন্তর্নিহিত অর্থের সহিত শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাদানপ্রণালী সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে গ্রামের সমাজ ও গ্রাম্য নরনারী সবিশেষ উপকৃত হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার তাৎপর্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ কলেজী শিক্ষা গ্রহণের দরজা পার হওয়ার অনুমতিপ্রাপ্তি। প্রবেশিকা পাঠ্য-সূচি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, নিজস্ব কোনো সার্থকতা ছিল না, ছিল কলেজী শিক্ষার প্রথম ধাপ মাত্র। ফলে, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের আসলে কোনো দাম ছিল না। 'স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা' হইবে স্বয়ংপূর্ণ পাঠ্যসূচীর পরীক্ষা; স্কুলের পঠিত বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র অধীত বিদ্যাকে পরিপূর্ণভাবে জীবনের ও সমাজের কাজে লাগাইতে পারিবে, সে শুধু কেরানী বা 'শিক্ষিত' হইবে না—হইবে সমাজের একজন মানুষ: সে ভাবিতে শিখিবে—সমাজে সবার মধ্যে সে একজন মাত্র, বিশেষ কেহ 'পৃথক সত্ত্বা' নহে। গ্রামের ছেলেমেয়ে গ্রামের জল, কাদা, মাটি, ধূলা, অরণ্য ও বাতাসকে সর্বাঙ্গ ভরিয়া গ্রহণ করিবে, গ্রামের অবহেলিত মানুষকে আপন বলিয়া ভাবিতে শিখিবে, গ্রামের আত্মা হইতে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শহর সভ্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না। কৃষি ও কুটীরশিল্পে আবার গ্রামকে সে নবভাবে গড়িয়া তুলিবে, সুখী পরিবারের কলগুঞ্জনে সারা পল্লী-ভারত ভরিয়া উঠিবে। সেই স্বপ্নকে সফল করিবার চিন্তাধারাকে যদি নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সংশোধিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আশার আলো দেখিতে পাইব

দার্শনিক জেনো ও গতি

শ্রীশিবচন্দ্র ন্যায়াচার্য্য

গ্রীকদেশীয় দার্শনিক জেনো বস্তুর গতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গতির অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা করিলে ভারতীয় দার্শনিকদিগের সহিত তাঁহাদের বিচারধারার পার্থক্য অনেকটা সুস্পষ্ট হয়। দার্শনিক জেনোর মতে "গতি" বলিয়া কোন বস্তুই স্বীকৃত হয় নাই। গতি বস্তুটিই তাঁহার মতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ যাহাকে আমরা "গতি" বলি, তাহা অপর বস্তুর অতিক্রম ব্যতীত স্বীকার করা চলে না, গতি থাকিলেই অপর বস্তুর অতিক্রম থাকিবে, ইহাই নিয়ম। গতিমান্ বস্তু আছে, অথচ তাহা কাহাকেও অতিক্রম করিতেছে না, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। সুতরাং গতি ও অতিক্রমের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার্য্য, যাহাকে ভারতীয় দার্শনিক ভাষায় বলা হয় "অবিনাভাব"। একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব, একের অভাবে অপরের অভাব, ইহাই হইল এই সম্বন্ধের স্বরূপ। এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত গতি ও অতিক্রম; একটির স্বীকারে অপরটি স্বীকার্য্য, একটি স্বীকৃত না হইলে অপরটি স্বীকৃত হয় না; এমতাবস্থায় জেনো দেখাইয়াছেন, যে অতিক্রম ব্যতীত গতি স্বীকার করা চলে না, সেই অতিক্রমটিই প্রথমতঃ অসম্ভব। যেমন ১ মাইল দীর্ঘ একটি পথ, কোন গাড়ী যখন ইহাকে অতিক্রম করিতে যাইবে। তখন প্রথমত গাড়ীটিকে অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিতে হইবে। এই অর্দ্ধ মাইল অতিক্রমের জন্য আবশ্যক হইবে সিকি মাইলের অতিক্রম। সিকি মাইলের অতিক্রমের বেলায়ও ঐ কথা, সিকির অর্দ্ধেক অতিক্রম ব্যতীত সিকি মাইলের অতিক্রম সম্ভব হইবে না। ফলত এইরূপ অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক করিয়া চলিতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি সূক্ষ্ম অর্দ্ধভাগে আসিয়া পর্য্যবসান হইবে; যাহাকে আর অর্দ্ধেক করা চলিবে না, এই পর্য্যবসিত সূক্ষ্ম অর্দ্ধভাগের অর্দ্ধভাগ না থাকায় ইহার আর অতিক্রম সম্ভব হইবে না;

কারণ অর্দ্ধভাগের অতিক্রম-পূর্ব্বক পূর্ণভাগের অতিক্রম, ইহাই হইল নিয়ম।

এইরূপ ক্রমে ১ মাইল দীর্ঘ পথটির অতিক্রম ও অসিদ্ধ হইবে। অতিক্রম সিদ্ধ না হইলে গতি সিদ্ধ হইবে না ; পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, অতিক্রম ও গতির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠসম্পর্ক আছে ; একটি স্বীকৃত না হইলে অপরটি স্বীকৃত হয় না, সুতরাং অতিক্রমের অসিদ্ধিতে গতির অসিদ্ধি. ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপভাবে দার্শনিক জেনো যুক্তি দ্বারা অতিক্রমের অসম্ভাব্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই অসম্ভাব্যতা নিবন্ধন গতিরও অসম্ভাব্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক, যে জেনো সম্ভবতঃ পরমাণুবাদী ছিলেন, এজন্য তিনি এমন একটি সূক্ষ্মভাবে আসিয়া বস্তুত অর্দ্ধভাগধারার বিশ্রাম স্বীকার করিয়াছেন, যে ভাগকে আর অর্দ্ধভাগ করা চলে না। এই অবিভাজ্য ভাগটি ভারতীয় আরম্ভবাদিগণের মতে জগতের মূলকারণ পরমাণু, তাঁহাদের মতে ইহার আর অর্দ্ধভাগ করা চলে না। এরূপ অবিভাজ্য-সূক্ষ্মভাগ অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না। সূক্ষ্মভাগের ও সূক্ষ্মভাগক্রমে বস্তুর অর্দ্ধভাগধারা নিরন্তর চলিতে থাকে, ইহার কোনস্থলে বিশ্রাম হয় না, এরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতানুসারে ও গতি স্বীকার্য্য কিনা ? এ বিষয়ে জেনো কিছু বলিলেও জেনোর সমর্থনে আমরা একটি সমাধান দিতে পারি, ১ মাইল দীর্ঘ পথের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক ক্রমে নিরন্তর ভাগ চলিতে থাকিলে, ইহাই কোনস্থলে বিশ্রাম স্বীকার না করিলে, গতিমান্ বস্তু যখন এই বস্তুটিকে অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ১ মাইলের অর্দ্ধার্দ্ধিক্রমে অতিক্রম নিরন্তর চলিতে থাকিবে, এ অর্দ্ধার্দ্ধিভাগধারার অতিক্রম অনন্তকালেও শেষ হইবে না, ১ মাইলের অর্দ্ধভাগধারার মধ্যগত প্রত্যেকটি অংশ নিজ নিজ অর্দ্ধ অতিক্রম ব্যতীত অতিক্রমণীয় হইবে না, প্রত্যেকটি অংশেরই ফলতঃ অতিক্রম অনন্তকালেও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাহা অনন্তকালেও অসমাপ্ত, কোনকালেই সম্পূর্ণ নহে ; তাহার সত্তা স্বীকার্য্য নহে, একটি বিশেষ সময়ে অতিক্রম সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ দেখানো যাইবে না ; এজন্য অনন্তকালে অসমাপ্ত অতিক্রমের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইবে না ; এইরূপে বিরামহীন অর্দ্ধার্দ্ধিভাগধারার স্বীকার পক্ষেও অতিক্রমের সত্তা স্বীকৃত না হইলে গতির সত্তা স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং পরমাণুর অস্বীকার পক্ষেও জেনোর মতকে এইরূপে সমর্থন করা চলে। এ পর্য্যন্ত জেনোর মত সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম সবই তাঁহার ভাবার্থমাত্র. এক্ষণে তাঁহার বিরোধি মতের আলোচনায় আসা যাক্। ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিতে জেনোর মতকে গ্রাহ্য করা চলে না। প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকই বস্তুরগতি স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈত বা বৈদান্তিক মতে গতির একটি ব্যবহারিক সত্তা আছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক মাধ্যমিক সম্ভবতঃ বস্তুর গতি স্বীকার করেন নাই কিন্তু কোনও ভারতীয় দার্শনিকই জেনো প্রদর্শিত পথে বস্তুর গতি খণ্ডনে অগ্রসর হন নাই। জেনোর প্রদর্শিত পথ তাঁহাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ ভারতীয় দার্শনিকের একটি প্রধান উক্তি হইতেছে "নহি দৃষ্টে অনুপপন্নং-নাম" যাহা দেখা যায় তাহা কখনও যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। একটি বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ গতি দ্বারা অপরবস্তু অতিক্রম করিতে আমরা দেখিতে পাই সুতরাং গতি ও অতিক্রম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এজন্য গতি ও অতিক্রমকে বিরুদ্ধ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা চলিবে না। যুক্তির সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ হইলে যুক্তিকে সংকুচিত করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টানুসারিণীকল্পনা ভারতীয় দার্শনিক সমাজে একটি বিশেষ সমাদৃত উক্তি। যুক্তি বা নিয়ম যেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে কল্পিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জেনোর মতের আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি ; তাঁহার মতে একটি বস্তুকে অতিক্রম করিতে গেলে বস্তুটির অর্দ্ধভাগ পূর্ব্বে অতিক্রম করা আবশ্যক ; ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয় "সম্পূর্ণভাগের অতিক্রম অর্দ্ধাতিক্রম সাপেক্ষ" এই নিয়ম, এই নিয়মকে বিপরীত ক্রমে বলিলে দাঁড়ায় "অর্দ্ধাতিক্রম ব্যতীত সম্পূর্ণভাগের অতিক্রম অসম্ভব।" কথা একই, যাহা হউক, এ দুটি নিয়ম কল্পনাকে এস্থলে দৃষ্টানুসারিণী বলা চলে না। দৃষ্ট গতি ও অতিক্রমকে এনিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে নাই, গতি ও অতিক্রমের বিরোধেই ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলত প্রত্যক্ষ নিরোধী এ নিয়মকে সংকুচিত করিয়া লইতে হইবে। যাহার অর্দ্ধভাগ আছে তাহার সম্বন্ধেই এ নিয়ম প্রয়োজ্য, নিরংশ পরমাণু সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রয়োজ্য নহে। "যাবদ্দর্শনমভ্যন্থ জ্ঞায়তে" নৈয়ায়িক বাৎস্যায়নের উক্তি, যতদূর দেখা যাইবে ততদূর পর্য্যন্তই নিয়ম স্বীকার্য্য ; যাহাকে দ্বিভাগে বিভাগে বিভক্ত করা চলে, অর্দ্ধভাগের অতিক্রম পূর্ব্বক তাহাকে অতিক্রম করিতে দেখা যায় ; সুতরাং "সাবয়ব বস্তুর অতিক্রমই নিজ অর্দ্ধভাগের অতিক্রম সাপেক্ষ এইরূপ নিয়ম স্বীকার্য্য, ইহা প্রত্যক্ষের অবিরোধী ও প্রত্যক্ষ অনুসারে কল্পিত, প্রত্যক্ষদৃষ্ট গতি ও অতিক্রমের বিরুদ্ধ নহে। নিরংশ বস্তুর অর্দ্ধভাগ করা চলিবে না, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে এ নিয়ম কল্পনীয় ও নহে। নিরংশ বস্তুর অতিক্রম অর্দ্ধাতিক্রম ছাড়াই হইবে। বাস্তবিকপক্ষে অতিক্রম বলিতে বুঝায় বস্তুর একদিক হইতে আরম্ভ করিতে আরব্ধদিকের বিপরীতদিকে চলিয়া যাওয়া। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারিটি দিক্ বস্তুসীমার নির্দ্দেশক। ফলতঃ বস্তুর একসীমা হইতে বিপরীত সীমায় পৌঁছানোর নামই অতিক্রম। ক্ষুদ্রতম নিরংশ পরমাণু ও সাবয়ব বস্তু সকলই দিক কর্তৃক সীমিত ; ফলে ইহাদের এক সীমা হইতে বিপরীত সীমা প্রাপ্তিরূপ অতিক্রম অসম্ভব বস্তু নহে অতিক্রমনীয়বস্তুর অর্দ্ধভাগ থাকা না থাকা উভয়পক্ষেই এরূপ অতিক্রম সম্ভব। এইরূপে ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিতে পরমাণুতে বস্তুর অর্দ্ধভাগধারায় বিশ্রাম স্বীকার পক্ষে, জেনোর মতটি গ্রাহ্য হয় না। আবার "অর্দ্ধাতিক্রম ব্যতীত পূর্ণভাগের অতিক্রম হয় না। এই নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই বিরামহীন বস্তুর অর্দ্ধভাগধারা স্বীকারে নিযুক্তিকতার প্রমাণ করা চলে, নিরন্তর বস্তুর অর্দ্ধভাগধারা স্বীকার করিয়া চলিলে বস্তুর অতিক্রমকালে তাহার অর্দ্ধার্দ্ধক্রমে নিরন্তর অতিক্রম চলিতে থাকিবে, এ অতিক্রমের সমাপ্তি কোথায়ও হইবে না, ফলে বস্তুর অতিক্রম কোনোকালেই সম্পূর্ণ হইবে না ; বস্তুর অতিক্রম প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এজন্য ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিতে "দৃষ্টানুসারিণী কল্পনা"র আশ্রয় লইতে হইবে, দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অতিক্রমের অনুকূলে কল্পনা করিতে হইলে একটি স্থলে বস্তুর অর্দ্ধভাগধারায় বিশ্রাম কল্পনা করিতে হইবে, অন্যথায় অতিক্রমের সিদ্ধি হইবে না। যে স্থলে বস্তুর অর্দ্ধভাগধারার বিশ্রাম স্বীকৃত হইবে, তাহাই হইবে ভারতীয় আরম্ভবাদী দার্শনিকগণের মতে বস্তুর সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ পরমাণু। এইরূপে জেনো মতে একাংশ গ্রহণ করত ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিতে পরমাণু সিদ্ধান্ত হইবে।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

প্রাণ

উপনিষদে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্গস্ঁ প্রাণকে (Elan vital) বিশ্বের মূল শক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য মতে প্রাণ "সামান্যকরণ বৃত্তিঃ", অর্থাৎ অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি।

প্রাণ পাঁচটি। তাহাদিগকে পঞ্চবায়ু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "বায়ু" শব্দ এখানে "শক্তি" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণের নাম প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। ইহারা অন্তঃকরণ তিনটি হইতে উদ্ভূত (অন্তঃকরণ-প্রযত্ন জন্য)—অন্তঃকরণদিগের ব্যাপার বা কার্য্য। প্রাণগণ দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিত থাকিয়া দেহকে ধারণ করে।

বস্তুতঃ প্রাণ এক। শরীরের বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

সাংখ্যকারিকায় প্রাণদিগকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিলেও যোগসূত্রের ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র তাহাদিগকে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ উভয়েরই বৃত্তি বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-দিগের বৃত্তি দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শের "আলোচন" বাহ্য বৃত্তি; আভ্যন্তর বৃত্তি হইতেছে "জীবন"। "জীবন" অর্থে "প্রযত্নভেদ"—শরীরস্থ বায়ুর বিভিন্ন ক্রিয়াজাত ভেদ"। এই ক্রিয়া দ্বারাই শরীর ধারণ হয় বলিয়া ইহা জীবন শব্দবাচ্য। পঞ্চ প্রাণের মধ্যে মুখ্য প্রাণের কার্য্য মুখ ও নাসিকা দ্বারা নিঃসরণ। অপানের কার্য্য অধোমুখ—মলাপনয়ন। ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমনয়ন (assimilation)—সমান ভাবে দেহের সর্ব্বত্র নয়ন—সমানের কার্য্য। খাদ্য রসের ঊর্দ্ধনয়ন উদানের কার্য্য। (পীতং অশিতং উদ্‌গিরতি এষ বাব উদানং—মৈত্রেয় উপনিষৎ)। নাড়ীপথে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ (circulation of blood ?) ব্যানের কার্য্য। এই সকল কার্য্য দ্বারা শরীররক্ষা হয়। উহারা সকলেই করণদিগের সাধারণ বৃত্তি। শরীর রক্ষার জন্য যাহা যাহার প্রয়োজন, সকলই পঞ্চপ্রাণের দ্বারাই হয়।

জীব

দেহেন্দ্রিয়-সংরুদ্ধ পুরুষই জীব নামে অভিহিত।

বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয় ব্যতিরেকাৎ।

সাং সূ—৬।৬৩

এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন—শ্রুতিতে আছে "বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ, স চানন্ত্যায়কল্পতে" অর্থাৎ কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে শতাংশ করিলে, তাহার এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীবও সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ, জীব অনন্ত। এতদনুসারে জীব পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অপরিচ্ছিন্ন। সাংখ্যে ঈশ্বর প্রতিষিদ্ধ এবং সকল পুরুষ একরূপ বলিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদও অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার নিরসনের জন্য সাংখ্যকার বলিতেছেন, যে জীবত্ব হইতেছে অহংকার-বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম, কেবল (absolute) পুরুষের ধর্ম্ম নহে। জীব ধাতুর অর্থ—বল-ও-প্রাণধারণ। এই জন্য জীবত্বের অর্থ প্রাণিত্ব। এই প্রাণিত্ব অহংকার-বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম; কেননা অহংকারযুক্ত পুরুষেরই অতিশয় সামর্থ্য ও প্রাণধারণ দেখিতে পাওয়া যায়। অহংকারশূন্য পুরুষে চিত্তবৃত্তির নিরোধই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রমাণেই জীবকে অহংকারবিশিষ্ট বলিয়া জানা যায়। প্রবৃত্তির হেতু রাগ; অহংকার কর্ত্তৃক রাগ উৎপন্ন হয়। অহংকার না থাকিলে চিত্তবৃত্তি থাকে না। অন্তঃকরণরূপ উপাধি বশতঃই জীব পরিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ উপাধি-বিশিষ্ট জীব পরমাত্মারূপ কেবল (absolute) পুরুষ হইতে ভিন্ন।

"কিন্তু অহংকার-বিশিষ্ট পুরুষ জীব হইলেও এই সূত্রে তাহার ভোক্তৃত্ব বা 'অহং'-"ত্বম্"-প্রত্যয় গোচরত্বের কথা বলা হয় নাই। সাক্ষাৎকাররূপ যে ভোগ, তাহার অহংকার

ধর্ম্ম নাই। আর তমৃ-অহং-ধর্ম্মী যে অহংকার, তাহার কখনও বিবেক উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু "যদাত্ম-ভেদবিজ্ঞানং জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ। ভবেৎ তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি। আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপর-বিভেদতঃ। পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্তঃ অহংকারযুতোঽপরঃ।" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান যখন হয়, তখনই বন্ধনমুক্তি ঘটে। পর ও অপরভেদে আত্মা দ্বিবিধঃ। পরাত্মা নির্গুণ, অপরাত্মা অহংকারযুক্ত। বিজ্ঞান ভিক্ষুর অর্থ এই যে অহংকারযুক্ত পুরুষ কেবল পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহা অপরাত্মা, পরাত্মা নহে। কিন্তু তমৃ-অহংধর্ম্মী অহংকারের যদি বিবেক উৎপন্ন না হয়, তবে বিবেক হয় কাহার? নির্গুণ পুরুষের বিবেকের কথা তো উঠিতেই পারে না। আবার নির্গুণ পুরুষের সহিত প্রকৃতির তথা-কথিত সংযোগ হইতেই তো বুদ্ধিও অহংকারসংযুক্ত জীবের উদ্ভব হয়। কিন্তু চিৎ-মাত্র-স্বরূপ পুরুষের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-স্বভাব প্রকৃতিস্থ অহংকারের সংযোগ কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। সত্বগুণ প্রাকাশাত্মক হইলেও, তাহা অচেতনেরই ধর্ম্ম এবং চৈতন্য অচেতন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, বুদ্ধি কিরূপে চৈতন্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। জবাফুলের প্রতিবিম্ব স্ফটিকে পতিত হইলে স্ফটিক বাস্তবিক রক্তবর্ণ হয় না। অন্যের নিকট রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। চৈতন্যের প্রতিবিম্ব কর্ত্তৃক বুদ্ধি রঞ্জিত হইলেও তদ্দারা বুদ্ধির স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

প্রত্যেক পুরুষের সহিত যে বুদ্ধি সংযুক্ত থাকে, তাহা অন্যান্য বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-বশতঃই এই ভিন্নতা সংঘটিত হয়। (তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ তদর্থম্ অভিচেষ্টা লোকবৎ—সাং সূ ২।৪৬)। প্রত্যেক বুদ্ধির সহিত তাহার "অবিদ্যা" সংযুক্ত থাকে। কিন্তু পুরুষ নিজে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। অবিদ্যাবশতঃই পুরুষকে বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। পুরুষ অপরিণামী, কিন্তু বুদ্ধিতে অনবরত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, একটির পরে একটি মানসিক ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। আমিত্বের বোধ দ্বারা এই সকল ভাব সম্বদ্ধ এবং তাহা হইতে একপ্রকার একত্বের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই একত্ব কালিক; ইহার মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু পুরুষ কালাতীত—transcendental। পুরুষ প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক জগতের বাহিরে অবস্থিত, কিন্তু জীব প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে তাহার এক অংশরূপে বর্ত্তমান। জাগতিক বস্তুসকল যেমন অনিত্য জীবও তেমনি।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয়, যে সাংখ্য মতে প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় নির্দিষ্ট আছে। মনঃ, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটি অন্তঃকরণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ বাহ্যকরণ। প্রত্যেক পুরুষের অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং পুরুষের সহিত এই সংমিলিত করণদিগের প্রকৃত যোগ থাকুক অথবা না থাকুক, উভয়ের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, যাহার জন্য এই অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণগণ চৈতন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণগণ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না।

> চিত্রং যথা আশ্রয়ং ঋতে, স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া,
> তদ্বৎ বিনাঽবিশেষৈঃ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং। *
>
> —সাং কা—৪১

কোনও আশ্রয় ভিন্ন যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, বৃক্ষাদি ব্যতীত যেমন ছায়া থাকিতে পারে না, তেমনি লিঙ্গও "অবিশেষের" আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন, যাহা দ্বারা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহাই লিঙ্গ। অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণদিগের দ্বারা "প্রধানের" অস্তিত্ব সূচিত হয় বলিয়া ইহারা লিঙ্গ। লিঙ্গের জন্য প্রয়োজন আশ্রয়ের। সেই আশ্রয়ই পঞ্চতন্মাত্র। অন্তরিন্দ্রিয়, বাহেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র-গঠিত শরীর সূক্ষ্ম শরীর নামে খ্যাত। পঞ্চতন্মাত্রগণ বিশেষত্বহীন, তাই অবিশেষ। এই অবিশেষকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণগণ থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মের ফল সংস্কাররূপে সঞ্চিত

---

* এই সূত্রের পাঠান্তরে "বিনা অবিশেষৈঃ" স্থলে "বিনা বিশেষৈঃ" আছে। এই পাঠে "বিনা বিশেষৈঃ" অর্থ "স্থূল শরীর বিনা" ইহা শ্রীমৎ শান্ত দাসজীর মত। কিন্তু স্থূল শরীরের ধ্বংসের পরেও লিঙ্গ শরীর বর্ত্তমান থাকে। লিঙ্গের আধার সূক্ষ্ম শরীরই এই পাঠে "বিশেষ" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

থাকে ; এবং কর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেক পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর বিভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে সকল পুরুষ এক-প্রকার, এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের ভেদ নাই। ভেদ আছে পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরদিগের মধ্যে।

পুরুষার্থহেতুকং ইদং নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং।

—সাং কা—৪২

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তের ফলভূত বিভিন্ন স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া লিঙ্গ শরীর প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন নটের ন্যায় ক্রীড়া করে। কেহ বা দেব, কেহ মনুষ্য, কেহ পশু, কেহ বা বনস্পতির দেহ ধারণ করে। প্রকৃতি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হয়। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে স্থূল দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সূক্ষ্ম শরীর একই থাকে এবং তাহাতেই বিভিন্ন জন্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন জন্ম ও মৃত্যু চলিতে থাকিবে। জীবজগতের নিম্নতম স্তরে লিঙ্গ-শরীরে তমোগুণেরই আধিক্য থাকে, ফলে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বল্পতা। স্মৃতি ও কল্পনা শক্তি তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। এইজন্য তাহাদের সুখ বা দুঃখ তীব্র হয় না, দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয় না। সত্ত্বগুণের স্বল্পতার জন্য পশুদিগের জ্ঞান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের প্রয়োজনের অধিক নহে। মানুষে রজোগুণের প্রাবল্য। উহার ফলে মানব-জীবন অশান্ত এবং দুঃখ-মুক্তির উপায়-অন্বেষণে ব্যস্ত। যতদিন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য না ঘটে, ততদিন দুঃখমুক্তি সম্ভবপর নহে। সত্ত্বগুণের যথোচিত আধিক্য হইলে বিবেকের উদ্ভব হয়।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি দুইদিকে হয়—ভৌতিক ও মানসিক। একদিকে গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় "বিষয়ের" উদ্ভব হয়, অন্য দিকে "বিষয়ের" গ্রাহক অথবা বিষয়ী বা জ্ঞাতার উদ্ভব হয়। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তত্ত্ববৈশারদীতে (৩।৪৭) বলিয়াছেন "গুণানাম্ দ্বৈরূপ্যং—ব্যবসেয়াত্মকত্বং, ব্যবসায়াত্মকত্বং চ। তত্র ব্যবসেয়াত্মকতাং গ্রাহ্যতাং আস্থায় পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূত-ভৌতিকানি। ব্যবসায়াত্মকত্বং তু গ্রহণস্বরূপং আস্থায় সাংস্কারাণি ইন্দ্রিয়ানি"। গুণদিগের দ্বিবিধ রূপ, ব্যবসেয়াত্মকত্ব অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপ এবং ব্যবসায়াত্মকত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতারূপ। পঞ্চতন্মাত্র ও ভূতভৌতিক বস্তুসকল গ্রাহ্য বা ব্যবসেয়, বা জ্ঞেয়, অহংকার-সমন্বিত ইন্দ্রিয়গণই গ্রহণস্বরূপ অথবা জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। তবে জ্ঞানের জন্য পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন। জীবের মধ্যে প্রকৃতির উভয় রূপ মিলিত হইয়াছে। পুরুষ উভয় রূপ হইতে স্বতন্ত্র। কার্য্য প্রকৃতির, কর্ম্মের ফলভোগও করে প্রকৃতি। সুখ-দুঃখবোধ প্রকৃতির। অবিবেক বশে পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া মনে করে। নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রকৃতির ক্রিয়া দেখিয়া পুরুষ তাহার নিজের স্বভাব ভুলিয়া যায় এবং সে নিজেই চিন্তা করে, কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে বলিয়া মনে করে—শরীরকেই নিজের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং এইরূপে কালাতীত হইলেও কালের রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু পুরুষের বিষয়-ভোগের অর্থ, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে, বুদ্ধির প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে গ্রহণ করা মাত্র। "কর্ম্ম করে প্রকৃতি, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করে পুরুষ" (অকর্ত্তুরপি ফলভোগ্যাহন্নাদ্যবৎ। (সাং সূ ১।১০৫) এই সূত্রে পুরুষের নিজে ফল ভোগের কথা আছে। এখানেও পুরুষের অপরিণামিত্বের আপত্তি উঠিতে পারে। সুতরাং এই ফলভোগও অবিবেক-প্রসূত বলিতে হইবে। যে জন্যেই হউক, সুখ অথবা দুঃখবোধ পুরুষের সহিত এক অজ্ঞাত উপায়ে সংশ্লিষ্ট থাকে। এই সুখ-দুঃখভোগী পুরুষ জীব। যখন সুখ-দুঃখ-ভোগের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়, তখন জীবের বিনাশ হয় এবং পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই একটির পরে একটি প্রত্যয় মনে উদিত হইয়া বিলীন হইতেছে। এই প্রত্যয়-প্রবাহের মধ্যে কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে সুখ, কাহারও সঙ্গে দুঃখ জড়িত থাকে। কোনটি হইতে সুখ বা দুঃখ কিছুই উদ্ভূত হয় না। সাংখ্যমতে এই প্রত্যয়-প্রবাহ ত্রিগুণান্বিত প্রকৃতির কার্য্য। পুরুষ তাহাদের উদয় ও বিলয়ের সাক্ষী মাত্র। তাহারা পুরুষের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। তবুও পুরুষ কেন আপনাকে এই প্রত্যয়-প্রবাহের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহা দ্বারা পুরুষের সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা একটি প্রহেলিকা। নানা উপমা দ্বারা সাংখ্যকার ও তাঁহার ভাষ্যকারগণ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবিদ্যা বা অবিবেককে ইহার কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই অবিদ্যা বা অবিবেকের স্বরূপও

বোধগম্য হয় না। কাহার অবিবেক? পুরুষ তো চৈতন্য মাত্র। অবিবেক উদ্ভূত হয় প্রকৃতি হইতে। যে প্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন, যাহার সহিত প্রকৃত সংশ্রব পুরুষের কখনও হয় না, তাহা হইতে উদ্ভূত অবিবেকের সহিতই বা তাহার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে। 'দেশ'ও প্রকৃতিসম্ভূত। সুতরাং প্রকৃতির সহিত দেশিক সান্নিধ্যও পুরুষের কখনও খাটিতে পারে না। তবুও এই অবিবেকবশতঃই পুরুষের বন্ধ হয় বলা হইয়াছে। "বন্ধ" অর্থ এখানে মিথ্যা জ্ঞান এবং তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ। আমি প্রকৃতপক্ষে দুঃখভোগ করিতেছি না, অথচ দুঃখভোগ করিতেছি, এই ভ্রান্ত জ্ঞানই বন্ধ। বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহার বোধ হয় প্রকৃতির মধ্যে। পুরুষ তাহার দ্রষ্টা মাত্র। তাহার "অহং" জ্ঞানও নাই, অথচ সে নিজে দুঃখভোগ করিতেছে, এই বোধ তাহার হইবে কেন, তাহা বোঝা যায়-না। পুরুষের সহিত প্রকৃতির বাস্তব সংযোগ হয়, পুরুষেই অহংকারের উদ্ভব হয় এবং তাহার ফলে প্রকৃতির দুঃখ অবিদ্যাবশে নিজের বলিয়া পুরুষ মনে করে, ইহা সম্ভবপর। কিন্তু উহা স্বীকার করিলে পুরুষের কোনও পরিণাম হয় না, বলা চলে না। "যৎ তটস্থং তু চিৎরূপং স্ব-সংবেদ্যাৎ বিনির্গতং। রঞ্জিতং গুণরাজেন স জীবো ইতি কথ্যতে" (নারদ পাঞ্চরাত্র) জীবের এই সংজ্ঞায় জীব চিৎকণিকা মাত্র, তাহা সান্ত বিভু নহে। প্রকৃতিও চৈতন্য হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহা স্বীকার করিলেই জীবের বন্ধ কি, তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

মহাত্মা শুকদেব গোস্বামী

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

এক মহাপুরুষের বৃদ্ধবয়সের সন্তান, শুকদেব। তাঁহার আসল নামটী হইল, শুক এবং উপাধি হইল দেব। এই দেব উপাধি কোন শাস্ত্রীয় নিদর্শন নহে, অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিতে এতাবত্তা বুঝাইবার জন্য কোন ইতিবাচক বিশেষণ নহে। ইহা সমগ্র জাতির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের অভিনন্দন। এই অভিনন্দন যার তার ভাগ্যে লাভ হয় না, প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিসাব ধরিলে, মাত্র কতিপয় ভাগ্যবান পুরুষ এই দৈব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন দেখা যায়—শুকদেব, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব। অবশ্য শুকের পিতাকেও মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেব বলা হয় কিন্তু তাহা বোধ হয় পুত্রের খাতিরে, কারণ ব্যাসদেব, বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ইত্যাদি নামেতেই সর্বত্র পরিচিত।

বেদব্যাস জ্ঞানে, বিদ্যায়, কবিত্বশক্তিতে, রাজনীতিতে, আবার সাংসারিক বুদ্ধিতে ছিলেন এক প্রকাণ্ড ব্যক্তি, অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। তিনি বৃদ্ধবয়সেও যুবার ন্যায় খাটিতে ও হাঁটিতে পারিতেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রীয় কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার বড় আশ্রম ছিল দু'টো-একটা কাশীতে আর একটা হিমালয়ে, একটা লোকালয়ে আর একটা জন-কোলাহলের বাহিরে। হয়তো আরো দু'চারটা আশ্রম ছিল, যেখানে তিনি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতেন বা শিষ্যদের বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত করিতেন।

এইরূপ কোন একটা আশ্রমে মহাত্মা শুকদেবের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা শুনিতেন তাহাই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন বলিয়াই বোধ হয়, স্নেহময় পিতা আদর করিয়া পুত্রের নাম দিয়াছিলেন, শুক। পিতা যখন জৈমিনী, পৈল প্রভৃতি চার শিষ্যের সহায়তায় বিশাল মহাভারত রচনা করেন, তখন শুকদেবের জন্মই হয় নাই, কিন্তু তিনি যখন বেদান্ত রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন শুকের বুদ্ধি বেশ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে এবং বিদ্যাও অনেক দূর আগাইয়াছে, যদিও বয়স আট-দশ পার হয় নাই। তখন সংস্কৃত ছিল মাতৃভাষা, সুতরাং কি দর্শনশাস্ত্র, কি কাব্য, কি পুরাণ, শুকদেব যাহাই শুনিতেন তাহাই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন এবং শব্দের অর্থ তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেন। এই বাল-পণ্ডিত যে শীঘ্রই বাল-মহর্ষিতে পরিণত হইবেন, তাহা আশ্রমের বৃদ্ধ ঋষিরাও অনুমান করিতেন, কিন্তু তিনি যে অচিরকাল মধ্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠিবেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে একেবারে ডুবিয়া যাইবেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই, এমন কি পিতাও নয়।

ব্যাসদেব বেদান্ত রচনায় প্রবৃত্ত। আশে-পাশে পুঁথির রাশি ছড়ান। বেদান্তং নাম উপনিষৎপ্রমাণম্, অর্থাৎ উপনিষদই বেদান্তের উপজীব্য, সুতরাং উপনিষদ ত থাকিবেই, আর তাহাদের সহিত আছে, কপিলের সাংখ্যদর্শনের, পতঞ্জলিই যোগদর্শনের এবং অন্যান্য দর্শনের পুঁথি, আরো কত ধরণের গ্রন্থ। শুকদেব পিতার নিকটে বসিয়া এই সব গ্রন্থের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে দিব্য-ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া উঠিলেন। পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা হইত

এবং মুনিরা তাহা উপভোগ করিতেন। বেদান্তের প্রথম সূত্র আবিষ্কৃত হইল—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। শুকদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, 'অতঃ' বলবার উদ্দেশ্য কি ?" পিতা পুত্রকে উদ্দেশ্য বুঝাইতে লাগিলেন। "উপনিষদে ব্রহ্মের অস্তিত্ব গোড়া হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সাংখ্য পাতঞ্জলে উহা লইয়া কোন আলোচনা করা হয় নাই। সুতরাং উপনিষদ ও সাংখ্য-পাঠে মনের ধাঁধা যায় না, একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ব্রহ্ম কি সত্য সত্যই আছেন, না মানবের কল্পনামাত্র। সুতরাং অতঃ (অতঃপর) লিখিবার উদ্দেশ্য এই—যখন সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও মনের সংশয় ঘোচে না, তখনই কেবল, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা মানবের মনে স্বাভাবিক ভাবে জাগিয়া উঠিবে।" ব্যাখ্যা শুনিয়া পুত্র নিরুত্তর হইতেন।

এইভাবে একটীর পর একটী করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচিত হইতে লাগিল, এবং ভাবী বিশ্বের একমাত্র কল্যাণের দীপবর্তিকা বেদান্তগ্রন্থ রচিত হইল। যেদিন গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইল সেদিন ব্যাস দেখিলেন, শুক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেই, অধিকন্তু ব্রহ্মসূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া বসিয়া আছেন এবং তাহার সহিত উপনিষদের মন্ত্রগুলিও তাহার নখদর্পণে ? পিতা বেশ দেখিতে পাইতেন, উপনিষদের মন্ত্রগুলি যেন সজীব হইয়া শুকের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিত, আর শুক এই মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করিয়া মহানন্দে সচ্চিদানন্দসাগরে সাঁতার দিয়া বেড়াইত। পুত্রের এই প্রত্যক্ষানুভূতি অবগত হইয়া বৃদ্ধ পিতা একদিন মুনিগণের সম্মুখে বলিয়াই ফেলিলেন, "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি, অন্যো বেত্তি ন বেত্তি বা।"

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে শুকদেবের চিত্তবৃত্তিরও এক ঘোরতর পরিবর্তন দেখা দিল, তিনি যেন দিন দিন 'বোবা-কালা' হইয়া যাইতে লাগিলেন। যেখানে দু'দশজন বসিয়া আছেন সেখানে শুক নাই, কেহ ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র উত্তর শুনিত, 'আমি জানি না।' কিন্তু বাল-ব্রহ্মচারীর মুখে এক স্বর্গীয় হাসি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। কি যেন ভাবিতেছেন, কি যেন দেখিতেছেন, কি যেন শুনিতেছেন, আর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছেন। কে পিতা, কে পিতার শিষ্য, কে স্ত্রী, কে পুরুষ, সবই যেন ভুলিয়া যাইতেন, এমন কি দেহবুদ্ধিও একেবারে লোপ পাইতে বসিল। অঙ্গ হইতে কটিবাস বারে বারে খসিয়াই যাইত এবং হুঁস্ করাইয়া দিলে তাহা আবার অঙ্গে ধারণ করিতেন। কিন্তু মুখে স্বর্গীয় হাসিটী লাগিয়াই থাকিত ! বয়স চৌদ্দ কি পোনেরো। অঙ্গসৌষ্ঠব যেন দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে, দেখিলে ভরা-যৌবন বলিয়াই ভুল হয়। বর্ণ শ্যাম। কোঁকড়ান চুলগুলি গুচ্ছাকারে মাথার দুই দিকে ঝুলিতেছে, নাভিদেশটী অপূর্ব সৌন্দর্যভরা, বিস্ফারিত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু—অথচ দিগম্বর, অর্থাৎ দিগম্বর মহাদেবের মত সামান্য একটা অস্থায়ী কটিবাস।

পাছে কেহ মনে করে যে শুকদেব একজন মহাযোগী বা মহাজ্ঞানী এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই নিজের ভাব ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন, ধার্মিকতার কোন চিহ্নই তিনি অঙ্গে ধারণ করিতেন না, মাথায় জটা ত রাখিতেনই না, এমন কি কপালে চন্দনের ফোঁটাও ধারণ করিতেন না। (শুকদেবের এই ভাবটীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের ভাবটী বেশ খাপ খাইয়া যায়। উভয় মহাত্মারই বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, উভয়েই 'পুংলিঙ্গ' ছিলেন।)

এর সঙ্গে আবার আহার নিদ্রা ভুল। পিতার কোন শিষ্য বা শিষ্যের পত্নী খাইয়ে দিলে তবে খাইতেন, কাপড় পরিয়ে দিলে তবে পরিতেন, আর সারারাত্র পলকহীন চক্ষে বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিতেন। ঠিক যেমন রামকৃষ্ণদেবের সাধনাবস্থায় রাত কাটিত। তবে পরমহংসদেব, 'মা, মা, আনন্দময়ী', বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে ডাকিতেন, আর এই কিশোর সাধক কুটীরের বাহিরে বসিয়া নৈশ গগনের দিকে তাকাইয়া স্ফুট বা অস্ফুট স্বরে বলিতেন, "ওঁ শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।" কিম্বা 'ওঁ তৎ সৎ'। এই ভাবে তাঁহার প্রতি রাত্রি কাটিত, কিন্তু ইহাতে শরীর শুষ্ক হওয়া দূরে থাকুক, 'ব্রহ্মবচর্স' আরো ফুটিয়া উঠিত।

কভু বা দিবাবসানে আশ্রমের এক নির্জন স্থানে বসিয়া আপন মনে গাহিতেন—"বৃহচ্চ তদ্ দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি, দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ, পশ্যৎস্বিহৈ'ব নিহিতং গুহায়াম্।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই দূরস্থিত নক্ষত্রাবলীর দিকে চাহিতেন, নিজের আশ-পাশ দেখিতেন, তার পর চক্ষু নিমীলিত করিয়া হৃদয়ে 'শ্রেয় ও প্রেয়'-এর অন্বেষণ করিতেন। কভু বা উচ্চৈঃস্বরে 'রসো বৈ সঃ" উচ্চারণ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে একেবারে ডুব দিতেন—এবং বহুক্ষণ নির্বীজ সমাধি অবস্থায় কাটাইয়া দিতেন।

কখনো বা মুনি শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতেন, "আমাদের একটু ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিন।" তখন হয়তো বা তিনি উপনিষদের একটী মন্ত্র আওড়াইতেন—

> অপানি পাদো জবনগ্রহীতা
> পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
> স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্যাস্তি বেত্তা
> তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্।

এই বলিয়াই উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেন। ঋষিরা আবার হাত ধরিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "সেই নিরাকার ব্রহ্মকে কোথায় অন্বেষণ করবো ?" শুকদেব বয়স্ক ব্যক্তিদের খাতির এড়াইতে না পারিয়া আবার উপবেশন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন :—

"স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এব অদ্য স ঈশ্বর।" শেষের তিনটি কথা, 'স উ শ্বঃ', এমন ভাবে উচ্চারণ করিতেন যাহা শ্রোতাদের কর্ণের ভিতর দিয়া মর্মের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত। শুকের মুখ হইতে উচ্চারিত এই সব অমৃতময়ী উক্তি শুনিতে ঋষিরা এতই ভালবাসিতেন যে আবার তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিতেন, "আচ্ছা, শুক, এই নিরাকার ব্রহ্ম কি জীবের প্রার্থনা শুনিতে পান, বা

জীবের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন?” শুকদেব তখন গীতা হইতে গোটাকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের শোনাইয়া দিতেন—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ
সর্বতোঽক্ষি শিরো মুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমন্ লোকে
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং
সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ।

বলিয়াছি, তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল মাতৃভাষা, সুতরাং এখনকার মত বৈদিক উক্তি বা শ্লোক উচ্চারণ করিয়া পরে আবার তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইত না, শ্রোতারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়া লইতেন। তবে শক্ত শক্ত সন্ধিগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইত। শুকদেবও ঐরূপ মাঝে মাঝে সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

এইভাবে শুকদেবের বাল্য ও কৈশোর কাটিতে লাগিল। তিনি কাহারো বশ নহেন অথচ সকলেই তাঁহার বশ—এমন কি পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা পর্যন্ত। তাঁর সেই অবস্থাটা ঠিকভাবে বুঝাইতে হইলে, উপনিষদেরই উক্তি গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ তিনি ধীরে ধীরে হইয়া উঠিলেন, “আত্মক্রীড়, আত্মারামঃ, আত্মরতিঃ।”

এমন সময় একদিন দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। শুভ্রশ্মশ্রু জটাধারী দুই বৃদ্ধের কোলাকুলি, কুশল জিজ্ঞাসা আর হরিধ্বনি, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! হরি হরি বলিতে বলিতে নারদের দুই চক্ষু হইতে দরদর করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এই দেবর্ষির এমন একটা স্বভাব ছিল যে তিনি বৃক্ষকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে হরি কথা শোনাইতেন, আর তখনো তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। এ হেন ভক্তচূড়ামণিকে পাইয়া ব্যাসদেবের আজ কি আনন্দ! আশ্রমের সকল অধিবাসী ছুটিয়া আসিল এবং হরি হরি ধ্বনির সহিত বীণার তালে তাল দিতে লাগিল। হরিগুণগান সাঙ্গ করিয়া নারদ উপবেশন করিলে এবং স্থান একটু নির্জন হইলে, ব্যাসদেব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, “দেবর্ষে, অনেক দেখলুম, অনেক শিখলুম, অনেক শাস্ত্র ঘাঁটলুম, আবার শাস্ত্র রচনা করলুম, কিন্তু মনের খটকা ত এখনো যাচ্ছে না।” দেবর্ষি হাসিয়া বলিলেন, “তুমি শুষ্ক জ্ঞান নিয়ে মেতে আছ, তাই তোমার হৃদয়গ্রন্থি এখনো ভেদ হচ্ছে না। এইবার বিশুদ্ধ ভক্তি নিয়ে লেগে পড় দেখি, দাদা। তখন দেখবে, মনের সব সংশয় ছেদ হয়ে গেছে।”

বেদব্যাস। সে কি করতে বলেন?

নারদ। তোমার বেদান্তকে আর একটু সরল ও সাধারণের উপযোগী করে তুলতে হবে। তুমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করে আর একখানি গ্রন্থ রচনা কর। অবশ্য তোমার ‘ভারতকথায়’ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কতকটা বর্ণিত হয়েছে সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন, ভীষ্ম প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিই কেবল চিনতে পেরেছিলেন। এখনো ভারতের জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে নি। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীহরি, এই ভাবটী বজায় রেখে এবং ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম, বা কৃষ্ণই পরাবর ব্রহ্ম. ইহাকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় করে, একখানি ভাগবত গ্রন্থ রচনা কর। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে মহানির্বাণ পর্যন্ত লীলাবলি,—যা তোমায় জানা আছে—সবিস্তারে কীর্তন করে সকল বর্ণের সকল আশ্রমের উপযোগী করে গ্রন্থখানি রচনা কর। তোমার এই কাজটুকু বাকী আছে বলেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছ না। এই কাজটী সাঙ্গ হলেই তোমার ইহ জগতের কৃত কৃত্যতা সমাপ্ত হবে এবং তুমি অত্যন্ত পুরুষার্থ লাভ করবে।

এই বিষয় লইয়া আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে ও হরিধ্বনি সহকারে গান করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া, গভীর নিঃশ্বাসের সহিত উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিলেন—“ওঁ শ্রীহরি!”

ইহারই কিছুদিন পরে, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে আসীন হইয়া, তিনি একবার শুকদেবকে নিকটে ডাকিলেন। পুত্র আসিয়া অভিবাদন জানাইলে, ইঙ্গিতে তাহাকে আসন দেখাইয়া আবার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র সবিনয়ে উপবেশন করিলে, পিতা সন্ধ্যাসমাপ্তি ঘটাইয়া ডাকিলেন “পুত্র!”

শুক। কি, বাবা।

পিতা। পুত্র, আমি শেষ জীবনে আর একটা মহৎ কাজে হাত দিতেছি—ইহাই আমার শেষ ব্রতের উদ্‌যাপন। আমার শিক্ষিত শিষ্যবর্গ ‘ভারতকথা’ ও ‘বেদান্তের’ প্রচার কর্মে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি অল্পবয়স্ক হলেও পাণ্ডিত্যে ও কর্মকুশলতায় পরিপক্কতা লাভ করেছ, আর ব্রহ্মসূত্রের সারমর্ম ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছ। সুতরাং তোমাকেই আমার একমাত্র সহায়ক হতে হবে। এই যে আমাদের দেশে কোটি কোটি নরনারী বিদ্যমান, তাদের শ্রেয় ও প্রেয় লক্ষ্য করে আমি ভাগবত নামক গ্রন্থ রচনা করবো। আমি বলে যাবো, তুমি—লিখে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলবে।

শুক। আমি ওসব ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারব না, বাবা।

ব্যাস। না, পুত্র, এখন তোমাকেই আমার পাশে পাশে থাকতে হবে। আমি পিতা, তুমি পুত্র। তোমার উপর আমার এই দাবী।

শুক। আপনি যে ভাগবত লিখবেন, তার প্রতিপাদ্য বিষয় কি হবে?

ব্যাস। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীহরি বা শ্রীবিষ্ণু, বা সনাতন পুরুষ, বা বেদান্তবেদ্য পরাবর ব্রহ্ম, ইহাই হবে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু। তবে অল্প বুদ্ধি, জনসাধারণের ধারণা-শক্তির উপযোগী করে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রভৃতি মধুময় কাহিনী বর্ণনা করতে হবে এবং এর সহিত ভারতের শৈব শাক্ত, গানপত্য প্রভৃতি নানাধর্মের নানাবাদের সমন্বয় ঘটাতে হবে। আমার পরিকল্পনা এখনো মূর্তিমতী হয়ে ওঠেনি—তোমার সহায়তায় ধীরে ধীরে তাবের প্রসার করতে হবে।

শুক। বাবা!

ব্যাস। পুত্র!

শুক। এই যে আপনি বললেন, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, সনাতন পুরুষ, এখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। তিনি যোগেশ্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরব্রহ্ম, যা হতে এই জগতের সৃষ্টি, যাতে ইহার অবস্থিতি, এবং প্রলয়-কালে যার মধ্যে ইহার লয় ঘটবে, সেই বিশ্বস্য-বীজম্ পরব্রহ্ম আর নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কি এক হতে পারেন?

ব্যাস। বৎস, তুমি ত উপনিষদ পাঠ করেছ। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। এক ফোঁটা জলবিন্দু যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন সেই জলবিন্দুই সমুদ্রের সত্তায় সত্তাবান হয় না কি? তখন সেই ফোঁটা কি বলতে পারে না, যে আমিই সমুদ্র? অবশ্য যতদিন শ্রীকৃষ্ণ মায়ায় অধীন হয়ে নররূপে লীলা করে গেছেন ততদিন তিনি হয়তো ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রলয়াদি পুনযুক্ত দিলেন না, কিন্তু তা হলেও তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে, তাঁর সহিত ব্রহ্মের যে অভেদ তাহা বেশ পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর সেই জন্যই অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করেছিল, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।" বুঝলে কি? সে যাহাই হোক্, জীবকে—মায়ায় আবদ্ধ সংসারীকে—ধাপে ধাপে সত্যের সোপানে উঠিয়ে দেবার জন্যই আমি এই মহাব্রত গ্রহণ করেছি। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, আশা করি এ বিষয়ে তুমি আমার পরম সহায়ক হবে। শুক আর অধিক কথা না বলিয়া নীরবে উঠিয়া গেলেন এবং স্ব-ভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

ইহার পর পিতা পুত্রের অদম্য পরিশ্রমে ও অফুরন্ত উৎসাহে সে মহাগ্রন্থ রচিত হইল, তাহার নাম হইল—শ্রীমদ্ভাগবতম্। এই ভাগবত-গ্রন্থ মহাভারত অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্, কারণ মহাভারতে এলো-মেলোভাবে অনেক কথা থাকিলেও, তাহার বিষয়বস্তু একমুখী নহে, কিন্তু ভাগবতের উদ্দেশ্য মাত্র একটী। সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় কীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীমুখের বাণী—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—সহজভাবে আপামর সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া।

গ্রন্থখানি আগাগোড়া শুকদেবই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার স্মৃতিতেও ইহার অক্ষয় ছাপ লাগিয়া রহিল। এখন বাকী রহিল প্রচার! কিভাবে ইহার প্রচার হইবে ব্যাস তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবশ্যই শুকের মুখ চাহিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুকদেব কোথা?

এই শান্তরসাস্পদ আশ্রম যেন তাঁহাকে গিলিয়া খাইতে বসিয়াছে বাহিরের আলো বাতাস বন জঙ্গল নদ নদী নক্ষত্র তারা পাহাড় পর্বত যে তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে—'ওরে, চলে আয়, চলে আয় একটা তীব্র বৈরাগ্য তাঁকে নিরুদ্দেশের দিকে যেন ঠেলিয়া দিতেছে বাল্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আবদ্ধ থাকাকালে বহির্বিশ্ব যেমন রবীন্দ্রনাথকে হাতছানি দিয়া ডাকিত, প্রমোদ-উদ্যানে আবদ্ধ থাকাকালী বহির্বিশ্ব যেমন গৌতমকে ইঙ্গিতে ডাকাডাকি করিত, শচীদেবীর স্নেহে অঞ্চলে আবদ্ধ থাকিবার সময় বহির্বিশ্ব যেমন ভাবে বিশ্বম্ভরকে প্রলোভিত করিত, তদ্রূপ অপর ব্রহ্মের নগ্নমূর্ত্তি, এই নগ্ন বালককে আশ্রমচ্যুত করিবার জন্য কতই না প্রলোভন দেখাইতে লাগিল! বৃদ্ধ পিতার সুদৃঢ় বেষ্টন যেন তাঁহার দম বন্ধ করিবার যোগাড় করিল। শুকদেব প্রব্রজ্যাবলম্বনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। শুকদেবের তখনকার মনের অবস্থা কবি দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষায় আরো সরলভাবে বুঝাইতে পারা যায়। "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে! কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে আয় চলে আয় আমার পাশে" ইত্যাদি। তবে এখানে মহাসিন্ধু বলিতে 'আরব সাগরকে বুঝাইবে না, একেবারে 'সচ্চিদানন্দ সাগর' বুঝিতে হইবে।

অবশেষে, একদিন আর 'নিশির ডাক' এড়াইতে না পারিয়া পিতার অনাবিল স্নেহ, আশ্রমবাসীদের প্রাণঢালা ভালবাসা সমস্তই পদদলিত করিয়া শুকদেব প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক, দিগম্বরবেশে আশ্রম হইতে পলাইয়া গেলেন।

শুকদেব, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব! এই তিনজনই বৃদ্ধ পিতা বা মাতাকে কাঁদাইয়া পলাতক আসামীর মত কারাগার হইতে বে-আইনীভাবে পলায়ন করিয়াছিলেন, অথচ বাছিয়া বাছিয়া ইহাদিগকেই দৈব উপাধি দান করা হইয়াছে। ভারতীয় চরিত্র কি বিচিত্র, কি গূঢ়, কি নিষ্ঠুর।

কামনা

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

উল্লসিত কৃষকেরা সবুজ প্রান্তর-পানে চেয়ে
অঘ্রাণের স্বপ্ন বোনে, বহুতর পায়রার ঝাঁক
গৃহ-চালে উড়ে যায়, দীপ্ত হয় ধূলীকীর্ণ শাঁখ,
নবারুণরশ্মি পড়ে গিনি-ঝরা ধানের গা বেয়ে!
হাহাকার সমাচ্ছন্ন শূন্য, রুক্ষ এ মাটির আশা
মিটেছে সোনালী ধানে, তাই শুধু কৃষকের মনে
বহুতর স্বপ্ন-মালা নব ফসলের দিন গণে—
অঘ্রাণ-গোলায় কবে বাঁধবে মাঠের ধান বাসা।
এই ত শহরে বসে ধোঁয়াটে এক ঘরের কোণে
কবিতার খাতা হাতে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে
বহুদূর হ'তে আসা মৃত্তিকার গন্ধ-স্পর্শ পেয়ে
বার বার পুলকিত হই আমি আপনার মনে।
ওখানে গাঁয়ের মাঠে শত শত প্রাণস্ফূট হ'লো,
আমার কবিতা, তুমি ওখানে আমাকে নিয়ে চলো।

জমিদারি বিলোপ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা।

লক্ষকোটি বছর লেগেছিল সূর্যস্ফুলিঙ্গকে ঠাণ্ডা হ'য়ে জল, পাথর, মাটি হতে। তারপর কাটল আরো অনেক যুগ—জাগল আণবিক প্রোটোপ্লাজমে নাড়ীর স্পন্দন—জন্ম হ'ল প্রাণের। ক্রমে উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী,—সব শেষের ক্রম বিবর্তনে মানুষ। কত সহস্র সহস্র বছর ধ'রে মানুষ ঘুরল অরণ্যে, পর্বত কন্দরে, গাছের মাচায়। শিখল পশু-শিকার, মৎস্য-শিকার, সবশেষে কৃষি, বাণিজ্য। বন্য তৃণগুল্মকে সভ্য ক'রে রূপ দিল ফসলের—ব্রীহি, যব, শাকসব্জী, ইক্ষু, কাপাস, শাল্মলী। পশুচর্মের পশম ছেড়ে বৃক্ষজাত পশম। পশুমাংস, বন্য ফলমূল ছেড়ে সুপক্ক অন্ন। মাটিকে ডাকল ধরিত্রী, যিনি বক্ষে ধ'রে আছেন—জননী, স্বর্গ হ'তেও বড়। গৃহ এল, শান্তি এল, এল পারিবারিক জীবন, জীব-জগতে একাধিপত্য।

এ মাটি কার?

যে কোনদিন এক কোদাল মাটিও কোপায় নি, জানে না মাটির রূপরসগন্ধবর্ণস্পর্শ, মাটি কখনো তার নয়। বন্যপ্রকৃতির সঙ্গে চলছে মানুষের লড়াই রাত্রিদিন, অন্তরে এবং বাইরে। মানুষকে তার সংস্কৃতি আগলে রাখতে হয় অতিশয় যত্নে, অগ্নিশিখাকে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে হয় আঁচলে ঘিরে ঝড় বাতাস থেকে। এমন করে আগলে না রাখলে চষা মাটি অচিরেই বুনো মাটি হ'য়ে যায়, ফুলের বাগান ঘনঘাসের বনবাসের সজ্জা পরে। বন্য প্রকৃতির মধ্যে সভ্য মানুষের লড়াই চলেছে সর্বদিন, যে মানুষ নিজের হাতে সে-লড়াই লড়ে নি, শুধু অন্যের লড়াইয়ের জয়ের অংশটুকু ভোগ করেছে, সেই পলাতককে মাটি কেমন ক'রে বরমাল্য দেবে? মাটি তার নয়।

তবে মাটি কার?

যে চাষ করে, মাটি তার। তার লাঙলের ফলায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে যায়। চলন্ত নৌকার হালের দু'ধারের জল যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে, চলন্ত লাঙলের দুধারে তেমনি চষামাটির ঢেউ খেলে যায়। তারপর ঢিল ভেঙ্গে, আগাছা নিড়িয়ে, মই দিয়ে চৌরস ক'রে, জল ছিটিয়ে, বীজ বুনে বীজাঙ্কুরগুলিকে শীতাতপ থেকে বাঁচিয়ে কত মেহনতে, কত দরদে ফশল ফলায় যে, মাটির সেবা, মাটির ভালবাসা সেই জানে, মাটি তারি। বুনো রাক্ষসীর মুখের গ্রাস থেকে সোনার মাটি সে উদ্ধার ক'রে আনে। দৈত্যপুরী থেকে উদ্ধার ক'রে আনা রাজকন্যে তার গলায় বরণমাল্য দুলিয়ে বলে, ওগো কৃষক, আমি তোমারি।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে রাজা নেই, প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি গভর্ণমেন্ট আছেন। মাটি কি গভর্ণমেন্টের নয়?

হ্যাঁ! মাটি গভর্ণমেন্টেরও। তবে তার অর্থ একটু ভিন্ন। মাটির ওপর ব্যক্তিগত স্বত্ব আর রাষ্ট্রগত স্বত্ব, এ দুয়ের সংঘাত শুরু হ'য়েছিল অতি আদিম যুগে। ঋগ্বেদে দেখি, আর্য সভ্যতা এ দু'য়ের সংঘাতের আশ্চর্য সমাধান করেছে। মাটির ফশলের একটা ভাগ খাজনা নেবার অধিকার রাজার, সমাজ স্বীকার করেছে। এ ছাড়া আর সব স্বত্ব চাষীর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নরপতিও তা স্বীকার করেছেন। এই প্রাচীন কালের নিয়ম মনু মেনে নিয়েছেন।* আজ আমরা ঋগ্বেদের যুগ থেকে হাজার হাজার বছর পার হ'য়ে এসেছি। পালনকর্তা রাজার আদর্শের আজ বহুল পরিমাণে পরিবর্তন হ'য়েছে। রক্ষণ আর পালনের অর্থ আজ অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। আজ আমাদের রাষ্ট্রের লড়াই বহিঃ-শত্রুর সঙ্গে নয়, অভ্যন্তরের শত্রুর সঙ্গে। সেই আভ্যন্তরিক শত্রুকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না,—অথচ তার প্রসার অতি বিপুল। একটা রণক্ষেত্রের একটা লড়ায়ে হারিয়ে দিলেও সে হটে না। বহু বছরের বহু লড়ায়ে তাকে তিলে তিলে নির্ম্মূল করতে হয়, কেন না এ লড়াই হচ্ছে দেশবাসীর ব্যাপক দারিদ্র্যের সঙ্গে, ব্যাধির সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে। মানুষের ভ্রম, মানুষের মোহ বন্ধুর ছদ্মবেশে যে শত্রুকে ঘরে এনেছে, এ লড়াই তারি সঙ্গে ঘরে ঘরে—মানুষের গোঁড়ামির সঙ্গে লড়াই, তথাকথিত ধর্মের গোঁড়ামির সঙ্গে লড়াই। বহুদিনের অবহেলায় মাথায় চুলভর্তি উকুন যেমন একটি একটি ক'রে মারতে হয়, বহুদিনের অযত্নে লুপ্ত হ'য়ে যাওয়া পথঘাটকে যেমন অতিশয় ধৈর্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, বহুযুগের অনাদরে অশ্বথ গজানো ভগ্ন দেউলকে অতি সাবধানে সংস্কার ক'রে হারিয়ে যাওয়া বিগ্রহকে আবার সিংহাসনে বসাতে হয়, বহুবর্ষের রোগে-ভোগা জীর্ণ শীর্ণ মানুষকে অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন ওষুধপথ্য দিয়ে অসীম ধৈর্যে, বহু আয়াসে বহু বাধায় ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে, চাঙ্গা ক'রে তোলেন,—বিশাল ভারতের লুপ্ত শ্রীকে, বিগত সম্পদকে, বিগলিত মনুষ্যত্বকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলবার গুরুভার তেমনি রাষ্ট্র আজ নিয়েছে স্কন্ধে। সেই বহু আয়াসের বহু তপস্যার সুদীর্ঘপথ এক নিমেষে পার হ'য়ে যাবার নেইকো কোন মন্ত্রতন্ত্র। ফাঁকি সেখানে খাটবে না, রাষ্ট্রের চরম শক্তি পরীক্ষা হবে সেইখানে। সাফল্যের জন্য চাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মনিয়োগ, আমাদেরও প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা, সমবেত পরিশ্রম।—আর প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় হ'তে সংগৃহীত বহু বহু কোটি টাকা। কেন না, রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ভাণ্ডার নেই, আমাদের প্রত্যেকের গৃহভাণ্ডার হতে আমরা যা দিতে পারব, আমাদের রাষ্ট্রের ভাণ্ডার তাই দিয়েই গড়ে

* মনু ৮।৩৯

উঠবে। দেশ বলতে প্রধানতঃ বোঝায় মাটি। তাই দেশের উন্নতির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হ'ল জমির উন্নয়ন এবং জমির উৎপন্ন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি। রাষ্ট্র আর রায়তের মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারীর পাঁচিল থাকলে রাষ্ট্রকর্তৃক জমি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ক্রমাগত সেই পাঁচিল ডিঙোতে হবে, যার ফলে আসবে বিস্তর বাধা, বিস্তর ব্যর্থতা। বোর্খা পরা রোগীকে পর্দার আড়ালে রেখে চিকিৎসা যেমন বিড়ম্বনা, রায়তের জমিকে তেমনি মধ্যস্বত্বাধিকারিদের প্রাচীরে ঘিরে উন্নয়নের প্রচেষ্টাও সেই রকম বিড়ম্বনা। ভূমি সম্বন্ধে তাই প্রয়োজন দুটি জিনিষের, এক রাষ্ট্র আর রায়তের মধ্যে মধ্যবর্তী না রেখে নিরঙ্কুশ ভাবে রাষ্ট্র আর রায়তে মিলে ভূমির উন্নতি সাধন ; আর দুই, ভূমি থেকে রাষ্ট্র আর রায়ত উভয়ের আয় বৃদ্ধি। প্রথমটি সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেব যে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ ভূমি উন্নয়নের পরিকল্পনায় আজ বিশেষ ভাবে মনোযোগী। এ বিভাগে বহু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার, বীজ প্রভৃতির উন্নতিসাধন, চাষের শত্রু পোকা, পতঙ্গ বীজাণু প্রভৃতির ধ্বংস কেমন ক'রে করতে হয়, এই রকম নানা বিষয়ে মনোনিয়োগ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক গবেষণা করছেন, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে সংযোগ রাখছেন, এবং নিজেদের কর্মচারীগণকে এ সকল বিষয়ে শিক্ষিত এবং পারদর্শী করে তুলছেন। এঁদের সঙ্গে রায়তদের সুদৃঢ় যোগাযোগ যখন স্থাপিত হবে তখন রায়তরাও ভূমি-উন্নয়ন বিষয়ে নিজেরাই অনেকটা পারদর্শী হয়ে উঠবেন। তার সঙ্গে যুক্ত হবে গবাদি পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান সরকারি Veterenary বিভাগের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি সেচ বিভাগের সংস্রমুখী প্রচেষ্টার ফলে যথাসম্ভব শীঘ্র দেশব্যাপী খাল দিয়ে জমিতে জল সরবরাহ বা জলনিকাশের ব্যবস্থা হবে, সুলভ বিদ্যুত শক্তিতে গ্রামের মাঠে মাঠে পাম্প চলবে। হাত-পা-বাঁধা অসহায় জীবের মত আকাশের মেঘের দাক্ষিণ্যের প্রতীক্ষায় রায়তকে আর বসে থাকতে হবে না। কৃষিফল মৌশুমীবায়ুর করায়ত্ত না থেকে এবার হতে কৃষকের আপন করায়ত্ত হবে। জমি বিষয়ক আইন-কানুনের ওলট-পালট হ'য়ে গিয়ে এমন আইন তৈরি হবে যাতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃষি-উন্নয়ন সহজসাধ্য হয়। যৌথ আর সমবায় ব্যবস্থা এসে যোগদান করবে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল রাস্তাঘাট, প্রচুরতর এবং সুলভতর যানবাহন, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, বাসোপযোগী গৃহনির্মাণ, উপনগরী রচনা—দেশোন্নতির সকল কিছু প্রয়াস, সব কিছু কাষ একটি মহান সঙ্গীতে, এক তালে এক সঙ্গে পা ফেলে উপনীত হবে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে—মহাকবির এ প্রার্থনা তখন সার্থক হবে—

> "দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
> অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।"

এই তো গেল রাষ্ট্রের দিক্। আর রায়তের দিক থেকে আসা চাই এই দৃঢ় সংকল্প যে কারো কাছে ঋণী থাকব না, অমনি কিছু নেব না, দাম দেব আপন সাধ্যমত। বিদেশীর আমলে আমরা বলতাম ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, ভিক্ষায় কখনো নয়,—ভিক্ষার দ্বারা কিছু নেব না,—স্বাধীনতাও নয়। আজ আমাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্টের কাছেও যেমনি তেজের সঙ্গে যেন বলতে পারি,—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, আমাদের জন্যে যা কিছু মঙ্গল বিধান তোমরা করবে, তা আমরা অমনি নেব না, যথাসাধ্য দাম দিয়ে নেব। ভিক্ষা করা,—সে পরের কাছেই হোক আর আত্মীয়ের কাছেই হোক, সে-যে বড়ো লজ্জার কথা, বড়ো ঘৃণার কথা। ভূমির ক্রমোন্নয়নের ফলে রায়তের আয় যত বাড়বে, গভর্ণমেণ্টের আয়ও ততই বাড়বে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সকল সফল হ'তে সফলতর হবে।

এখন দেখা যাক, যা নিয়ে আজ এত ঝামেলা, সেই মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হ'ল কেমন ক'রে।

জমিজমার সৃষ্টির শুরুতে ছিলেন রাজা আর চাষীবাসী রায়ত। রাজার প্রাপ্য রাজস্ব আদায় ক'রে দিতেন গ্রামনী, দশগ্রামী, শতগ্রামী বা অধিপতিরা। রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ তাঁরা বেতন স্বরূপ পেতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাই রাজস্ব বিভাগ এমন সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত ছিল যে আমাদের আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে তা তুলনীয়। রাজস্ব সংগ্রাহকদের ব্যবস্থা কালক্রমে এবং রাজার শৈথিল্যে যখন বংশানুক্রমিক হ'য়ে গেল, তখন তাঁরা মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারী।

সে কালে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, গুরুপুরোহিত প্রভৃতির প্রতিপালন হ'তো রাজকীয় দানে। রাজা এ দান নগদে না দিয়ে তার কোন অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব 'যাবৎচন্দ্রদিবাকর' দান ক'রে দিতেন। এমনি ক'রে অনেক নিষ্কর মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হয়েছিল। সে কালের তক্ষশিলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই রকম রাজকীয় দানে চলত। বহু দেবত্র, ব্রহ্মত্র (চলিত কথায় 'দেবোত্তর,' 'ব্রহ্মোত্তর') এবং লাখেরাজের এই ইতিহাস।

আবার কখনো কখনো সেনা-নায়ক বা উচ্চরাজকর্মচারীদের নগদ বেতন না দিয়ে 'জায়গীর' দেওয়া হ'ত। জায়গীরদার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব আদায় ক'রে নিজের বাদ দিয়ে বাকিটা রাজকোষে জমা দিতেন। এ পদ্ধতি বংশানুক্রমিক হ'লে জায়গীরদারেরা হলেন মধ্যস্বত্বভোগী।

সরাসরিভাবে রাজারা অনেক সময় লোক নিযুক্ত করতেন কোনো বিশেষ অঞ্চলের জন্যে রাজস্ব আদায় ক'রে নিজের পারিশ্রমিক কিছু রেখে বাকি রাজস্ব সরকারে জমা দেবার জন্যে। এঁদের farmers of revenue বলা চলে। এঁদের কাজ বংশানুক্রমিক হ'লে এঁরাও হলেন জমিদার।

এখানে বলা দরকার, অতি অল্পসংখ্যক জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ এককালে ছিলেন তদীয় অঞ্চলের স্বাধীন নরপতি। পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধে বা বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার ক'রে বিজেতার অধীনে মধ্যস্বত্বাধিকারী হ'য়ে গেলেন।

এমনি নানাভাবে হ'য়েছিল মধ্যস্বত্বাধিকারীর উদ্ভব।

জমিদার ছিলেন রাজার ঠিক নীচেই। রাজার দেখাদেখি তাঁরাও নিজেদের অধীনে নানা ধরণের মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করলেন। ক্রম-

পুরোহিত অধ্যাপকদের জন্য নিষ্কর ব্রহ্মত্র, শিক্ষায়তনের জন্যে মহাত্রাণ, —এমনি কত কি মধ্যস্বত্ব। তাছাড়া "পত্তনি"। পত্তনির উদ্ভব হ'ল এমনি ক'রে—জমিদার অনেক সময় সমস্ত মহালের খাজনা আদায় করতে পারতেন না, রাজদরবারের নির্দিষ্ট রাজস্ব অনেক সময় নিজের পকেট থেকেই দিতে হ'ত। তাই যে সব মহাল থেকে খাজনা আদায়ের অসুবিধা ছিল সে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিতেন কোনো অনুগৃহীত লোককে। এই লোকটি সেই সব মহালের প্রজাদের সান্নিধ্যেই বাস করতেন, তাঁর পক্ষে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা সহজ। মনে করুন প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্য বার্ষিক খাজনা পাঁচ হাজার টাকা। জমিদারকে তার জন্য রাজস্ব দিতে হয় বার্ষিক চার হাজার টাকা। খাজনা আদায় পুরা হ'লে জমিদারদের মুনাফা থাকে বার্ষিক হাজার টাকা। জমিদার অনুগৃহীত লোকটিকে ঐ সব মহাল পত্তনি দিয়ে এই রকম লেখা-পড়া ক'রে দিলেন যে বার্ষিক ঐসব মহালের জন্যে জমিদারকে খাজনা দিতে হবে সাড়ে চার হাজার টাকা। এতে পত্তনি-দারের মুনাফা থাকল পাঁচশো, জমিদারের থাকল পাঁচশো। কাগজে কলমে জমিদারের আয় পাঁচশো টাকা ক'মে গেল বটে, কিন্তু আসলে তাঁর সুবিধাই হ'ল। কোনো বছরই পুরা খাজনা আদায় করতে পারতেন না এসব মহাল থেকে, অথচ রাজস্ব গুণতে হ'ত পকেট থেকে পুরা চার হাজার টাকা। এবার থেকে রাজস্ব আর নিজের পকেট থেকে দিতে হবে না, উপরন্তু বার্ষিক পাঁচশো টাকা মুনাফা ঘরে আসবে। পত্তনিদার যদি টাকা দিতে না পারে, কিস্তি খেলাপ করে, পত্তনি কেড়ে নেবেন জমিদার, দেবেন অন্যলোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে। দেশে পত্তনি নেবার লোকের অভাব ছিল না।

পত্তনিদার নিজের মুনাফা বাড়ানো সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কাজেই প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি ক'রে বছর বছর নিজের মুনাফা বাড়িয়ে চললেন। প্রজা বিদ্রোহী হ'লে তার শাসনের ব্যবস্থা ছিল। প্রজার করভার বাড়তেই থাকল। ক্রমে পত্তনিদার তাঁর অধীনে 'দর পত্তনি'র সৃষ্টি করলেন। মধ্যস্বত্ব এমনি করে ধাপে ধাপে নামতে লাগল। আবার বিভিন্ন মধ্যস্বত্বের সংমিশ্রণ ঘটতে লাগল অজস্র। জমিদার আবশ্যক-মত পত্তনি অথবা দরপত্তনি কিনে, পত্তনিদার সাধ্যমত জমিদারিস্বত্ব বা দরপত্তনিস্বত্ব কিনে একাধারে জমিদার-পত্তনিদার-দরপত্তনিদার হ'য়ে বসলেন। তাছাড়া অল্পবিত্তর রায়তিস্বত্বও কিনে নিয়ে ভূমিবিষয়ক সর্ব-স্বত্বেই স্বত্ববান হ'লেন। এমনি ক'রে জমির স্বত্ব সব জটপাকিয়ে গেল।

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা:'—রায়তরাও সেই পন্থা ধরলেন। নিজ নিজ অধীনে কোর্ফা, দরকোর্ফা প্রভৃতি অধস্তন প্রজাপত্তন করলেন। কুচবিহার জেলায় 'চুকানীদার' ব'লে এক শ্রেণীর প্রজা আছেন। তাঁদের অধস্তন প্রজাদের ক্রমানুসারে বলা হয় দরচুকানীদার, দরাদর চুকানীদার, তলীয় চুকানীদার, তস্যতলীয় চুকানীদার ইত্যাদি। স্বত্বের এমন সিঁড়ি-ভাঙ্গা ভগ্নাংশের সম্মুখীন হ'লে জজসাহেবদের এবং রাজস্ববোর্ডের কর্মচারী-দের দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার যুগে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ এর অনুমোদিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের নাম দিয়ে চালু করা হল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট আজো চালু রয়েছে, কর্ণওয়ালিসি চিরস্থায়ী অচিরেই লুপ্ত হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মানে হ'ল জমিদারের রাজস্বের পরিমাণ চির-দিনের জন্যে স্থিরীকৃত করে দেওয়া হ'ল, যা আর কস্মিনকালেও বাড়বে কমবে না। কিন্তু প্রত্যেক নির্দিষ্ট কিস্তির দিন টাকাটা সূর্যাস্তের আগে ট্রেজারিতে জমা দেওয়া চাই, নইলে জমিদারি অনিবার্যভাবে নিলাম হয়ে যাবে। ক্রেতা না জুটলে গভর্ণমেণ্ট নগদ মূল্যে এক টাকায় কিনে নেবেন। আইন বড়ই কড়া। তখনকার দিনের গড়িমসির আবহাওয়ায় লালিত-ভূম্যধিকারীদের পক্ষে এ আইন বিষবৎ হ'য়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাবলীকে নানা রঙে রঙীন করে রঙ্গমঞ্চে নামানো হ'য়েছিল। বলা হ'ল যেহেতু জমিদারের রাজস্ব আর কস্মিনকালেও বাড়বে না, যেহেতু জমিদারি থেকে যা কিছু অতিরিক্ত আয় হবে সে যাবে জমিদারের ঘরে। জমিদারির প্রজার উন্নতিসাধনে এই অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা জমিদারদের দেবে প্রেরণা। এসব যে কতবড় ভুয়ো কথা তা বোধকরি প্রচারকদেরও অজানা ছিল না। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ধার্য হ'য়েছিল খুব চড়া দরে। খাজনা তো আর রবার নয় যে যত টানা যাবে তত বাড়বে। জমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় (Vol. II.-1940—P. 217) যে তখনকার প্রত্যেক জেলাশাসক একবাক্যে রিপোর্ট করেছিলেন দেশ যতটা দিতে সক্ষম তার চেয়ে অনেক বেশী কর ধার্য করা হ'য়েছে। জমিদারির আয় বাড়াতে হ'লে প্রজাপীড়ন ছাড়া উপায় ছিল না। ইংরেজ সরকার জেনে শুনেই জমিদারকে সেই নিদারুণ অন্যায়ের সম্ভাবনাময় পথে নামিয়েছিলেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে জমিদারেরা সে পথ গ্রহণ করেন নি। প্রজার সর্বনাশ তাঁরা করেন নি, বরং নিজের সর্বনাশই ডেকে এনেছিলেন। সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দাখিল করার দায়িত্ব ছিল জমিদারের। প্রজার কাছ থেকে সময় মতো খাজনা পাওয়া যায় নি, পীড়ন করলে পাওয়া যে যেত না, তা নয়। কিন্তু ইতিহাসের গৌরবময় সাক্ষ্য,—পীড়ন তাঁরা করেন নি। সময় মতো রাজস্ব জমা দিতে তাই না পেরে বাংলাদেশের প্রাচীন জমিদারবংশের অর্ধেক জমিদার পথের ভিখারী হ'য়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপুর, রাজশাহী প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশের নাম উল্লেখযোগ্য। ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশানের রিপোর্ট, Vol. II. (1940)—২২৩ পৃষ্ঠা)। এসব প্রাচীন রাজবংশের দুর্দশা দেখে সেকালের জমিদার প্রাণের দায়ে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করবার জন্য জুলুম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এর জন্যে সূর্যাস্ত আইনের নৃশংসতাই ছিল দায়ী। বাংলার চাষীর চোখের জল ইংল্যাণ্ডের মহানুভবদেরও বিচলিত করেছিল। Walpole বর্ণনা করেছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "tyranny and plunder as making me shudder; Chatham বলেছিলেন 'দুরপনেয় কলঙ্ক' আর Burke তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় করেছিলেন প্রতিবাদ।

স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট আজ রায়তের উপরিস্থ সব রকম মধ্যবর্তী স্বত্ব বিলোপে দৃঢ়সঙ্কল্প। পশ্চিম বাংলার আগামী নব বর্ষের পূর্ব মধ্যস্বত্ব

বিলোপ ক'রে উদিত হবেন। সূর্যাস্ত আইন এ বছরের শেষদিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে চিরদিনের মত হবে অস্তমিত।

মধ্যস্বত্বাধিকারিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, যে সব জমি প্রজাবিলি করেছিলেন সে সব যাবে, কিন্তু নিজেদের ঘরবাড়ী, বাগান, পুকুর প্রভৃতি রাখতে পারবেন; তাছাড়া রাখতে পারবেন খাস জমি—আবাদি ও অকৃষি—বিধি নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রত্যেক।

তবু অনেকে জিগেস করবেন, জমিদারের কি দোষে যাবে তাদের জমিদারি?

দোষ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, দোষ একটা অন্যায় সামাজিক প্রথার, অতীতকাল থেকে চলে আসা একটা অন্যায় সরকারি ব্যবস্থার। এমনি অন্যায় ব্যবস্থা,—তা সে যে কোন ব্যবস্থাই হোক্ না,—সেটা দূর করতে গেলে কমবেশিসংখ্যক মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষতি হওয়া অনিবার্য, কিন্তু তাই অন্যায় ব্যবস্থা কায়েমি হ'য়ে থাকার? বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি, ভদ্রতা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ এক এই জমিদারদের ভিতর যে পরিমাণে বর্তমান, বাঙ্গালীর অন্য কোনো শ্রেণীর মধ্যে সে-পরিমাণ ব্যাপকভাবে নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, আজকের মানদণ্ডে লঘু প্রতিপন্ন এবং দণ্ডিত এক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এঁরা সম্পৃক্ত। সে ব্যবস্থাকে যেতেই হবে, তাই এঁদের যাওয়াও অনিবার্য হ'ল।

আমরা শুনেছি, জমিদারিপ্রথা জমিদারের ক্ষতিও কম করে নি। একথা কি ঠিক?

ঠিক যে, এতে সন্দেহ নেই।

ব্যবসা হিসাবে জমিদারির মুনাফা শতকরা তিন কি চার, কিন্তু মুনাফা কম হলেও এ ব্যবসায় বড়ই নিরাপদ, বড়ই নির্বিঘ্ন, ক্ষয়ক্ষতির বিশেষ ঝক্কি নেই। আর এ ব্যবসায় বড়ই আরামের। কাগজপত্র একটু নাড়াচাড়া, মহালগুলি একটু পরিদর্শন, তামাদির সময় একটু বেশি কার্যতৎপরতা, একটু বেশি করে তাগাদা, তারপর বাকি খাজনার নালিশ, আর্জি দাখিল, ওকালতনামা, তদ্বির, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ডিক্রি, জারি, আদায়, দৈবাৎ কয়েকটা ১৭৩ ধারার মামলা—সব চলছিল রুটিন মাফিক পুনরাবর্তিত পথে, করবার কর্মাবার বিশেষ কিছু নেই। ছিল পাকা সেরেস্তা, সুপক্ক নায়েব গোমস্তার দল। সুতরাং জমিদারের নিশ্চিন্ত আরামের ঠাসবোনা অবসর। তাই সকল প্রকার রোমান্সের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল বাংলার জমিদার সমাজ। সেনসাস্ নেওয়া হয় নি তাই সঠিক বলা যাবে না, তবে একথা বোধহয় ঠিক বাংলা সাহিত্যের শতকরা আশীটি নায়কনায়িকার জন্ম জমিদারবংশে। জমিদারি বিলোপের একটি অবশ্যম্ভাবী ফলে বাংলা সাহিত্যের নায়কনায়িকার ক্ষেত্রে বছর কয়েক ধরে মড়ক লাগবে, চিত্রজগতেও বহু তারক-তারকার ঘটবে ভূমিকা-দুর্ভিক্ষ।

জমিদারিরূপ বিঘ্নহীন, আলস্যসমাকুল স্বল্পলাভের যে পথ, সে পথ মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। পুরুষানুক্রমে এই স্বল্প আয়ের অনায়াসের রুটিনে বাঁধা উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন পথের যাত্রী হ'য়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ এক মানবসমাজকোমলকান্ত লালন-লালিত নিবীর্যতার মধ্যে ছিলেন নির্বাসিত। জমিদারি পরিচালনা পুরাঙ্গনা ললনারও সহজসাধ্য। যে-পথে ঝক্কি নেই, বিপদ নেই, অনিশ্চয়তা নেই, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিকাশের অবসর নেই, সে পথ বীরের নয়, তেজস্বীর নয়।

মনুষ্যত্ব বিপদের দ্বারা দুর্লভ, বিঘ্নের দ্বারা অপরাজেয়। কণ্টক-সঙ্কুল পথেই মানুষ পথজয়ী। মনুষ্যত্ব নদীর মত। নদীর পথে বাধা না এলে তার জল ফুলে ওঠে না, তার প্রাণপ্রবাহে বিঘ্নজয়ের ভৈরব মাতন জাগে না। বাধাকে বিপুল বেগে অতিক্রম করে বলেই মনুষ্যত্বের অপরাজেয় গৌরব। ক্ষুদ্র লাভের গণ্ডীকাটা জীবনে সঙ্কীর্ণ স্বচ্ছলতায় আবদ্ধ থেকে বাঙালীর এক বিশিষ্ট সমাজ পাণ্ডবের মত অজ্ঞাতবাসী ছিলেন। আজ তাঁদের নামতে হবে কঠিন রণক্ষেত্রে, পরিচয় দিতে হবে শৌর্যের।

যা মনুষ্যত্বকে বিকল করে সে একটা ব্যাধি। সমাজ দেহের প্রধান অঙ্গের এই কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায় চিকিৎসককে নিতে হয়েছে মস্ত ঝুঁকি,—বহু ইতস্ততঃ ক'রে, বহুবার অগ্রপশ্চাৎ ভেবে চিন্তে, শেষে একটিমাত্র নির্ধারিত পথ এই, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হ'য়ে। রোগ এতে সারবেই,—এ সম্ভাবনা না থাকলে কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক এমন ব্যবস্থা নিতেন না।

জমিদারি গেলে এঁরা করবেন কি?

যাঁদের ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, শিক্ষা আছে, বিত্ত আছে—তাঁরা সবাই যদি জমিদারি নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকেন, তাহ'লে ব্যবসা বাণিজ্য করবে কে? শিল্পোন্নতি গড়বে কে? বড় ব্যবসা একদিনে হয় না, ছোট থেকেই উঠতে হয়, আর ছোট ব্যবসার গোড়াপত্তন করতে গভর্ণমেণ্ট আজ কত যে দৃঢ়সংকল্পতা দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন।

ব্যবসা বাণিজ্যের পথ বিপদসঙ্কুল, পদে পদে বাধা দ'লে চলতে হয়, পদে পদে ঝুঁকি নিতে হয়, তবে আসে সাফল্য। জমিদারদের পূর্বপুরুষরা অনেকেই তো সাফল্য অর্জন করেছিলেন এ পথে, তবে এরাই বা পারবেন না কেন? এঁদের অনেক নামজাদা পূর্বপুরুষ একদিন ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কোটিপতি হ'য়েছিলেন। বেশী সুদূর অতীতে যাবার প্রয়োজন কি, ভাগ্যকুলের রাজা জানকীনাথের দৃষ্টান্ত তো সম্মুখে রয়েছে। শিল্প বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে জমিদারির নিশ্চিন্ত আরামে অবগাহন করার ফলেই আজ বাঙালীর হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য স্খলিত হ'য়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া লক্ষ্মীকে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনবার দায়িত্বও যেমন এঁদের, অধিকারও তেমনি এঁদের।

জমিদারি যায় যদি তো যাক্। ফিরে আসুক বাংলার ধনপতি সওদাগর, বাংলার রামদুলাল সরকার, ফিরে আসুক বাংলার সেই সব কৃতী সন্তানেরা, পৌরুষে যাঁরা অদম্য, বিপদে যাঁরা অনমনীয়, বাণিজ্যে যাঁরা ধনকুবের। সমৃদ্ধ করুন তাঁরা সমাজকে, উপার্জন বাড়িয়ে দেশের জনসাধারণের। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যতই বাড়বে ততই বাড়বে দেশে কর্মসংস্থান। এ আশা অমূলকও নয়, সুদূরপরাহতও নয়।

একটা কথা বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হয়, আজ হতে দশ বিশ বছর আগে প্রবলপ্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি জমিদারি বিলোপের চেষ্টা

করতেন, তাহ'লে মুখের কথায় বা আইনের ভয়েও সূচ্যগ্র পরিমাণ জমি জমিদার ছাড়তেন না, মনে হয় গভর্ণমেন্টকে কামান দাগতে হ'ত। তাছাড়া, যাঁরা বিদেশ থেকে এসে এদেশে বিশাল সাম্রাজ্য-জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুনাফার লোভে, কোন্ লজ্জায় তাঁরা দেশীয় জমিদারদের স্বত্ববিলোপের সাহস করতেন? কাঁচের ঘরে যার বাস, সে কেমন ক'রে অপরের পানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করবে?

কিন্তু আজ?

আজ অসম্ভব সম্ভব হ'ল। বাংলার জমিদার তাঁর কায়েমি স্বার্থ, তার মৌরসী মোকররী, তাঁর লাখেরাজ, তাঁর "রাজধানী" তাঁর "রাজপ্রাসাদ," তাঁর স-সাজপাট 'দরবস্ত-হকুক্', তাঁর শতাব্দী সঞ্চিত মোগলাই-ইংলিশ অনুকরণের আবর্জনা, তাঁর ঝাড়-লণ্ঠন, তাঁর অ্যালাবাষ্টার, তাঁর মর্মরপরী, তাঁর "আঁটা-শোঁটা", তাঁর কামান বন্দুক ছোরাছুরি, সব কিছুর মায়া ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে নিঃশব্দে চ'লে যাচ্ছেন জমিদারিকে পিছনে ফেলে। একটা সামান্য দরোজা খোলার শব্দও শোনা যায় না, একটা প্রতিবাদের অস্ফুট আওয়াজও নয়, দীর্ঘশ্বাস বোধহয় শিক্ষিত চোখের জল বোধহয় রুদ্ধ। আমি বাইরের লোক, অবান্তর লোক—আমি দেখেছি সজলচক্ষে এঁদের আশ্চর্য সংযম, আমার মনে হ'য়েছে, এ দৃশ্য অবিস্মরণীয়, অভূতপূর্ব,—হাঁ, এ প্রশংসার যোগ্য বটে।

রামচন্দ্র যখন স্ত্রীর হাত ধ'রে বনবাসে গিয়েছিলেন, অযোধ্যার প্রজারা কেঁদেছিল। হোক্ না সে feudalism, হোক্ না সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী, কিন্তু আমার তবু মনে হয় সে চোখের জল পবিত্র। আজকালকার যে কোনো-ismএর চেয়েও সে চোখের জল মহত্তর।

বাংলার প্রজাদের আজ বিশেষ কোনো চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণ চোখে পড়ে নি। হয় তো আমার দৃষ্টিবিভ্রম, হয় তো নয়। আমি নিজের দিয়ে বিচার করি। জমিদারও নই, প্রজাও নই, সম্পূর্ণ বাইরের লোক, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ; কিন্তু তবু, কেন জানি নে, আমার চোখও ছলছল ক'রে ওঠে। প্রজাসাধারণের মধ্যেও এই ভাবটা দেখলে বড়ই ভাল লাগত। দেখিনি ব'লে কোনো অনুযোগ নেই। সংসারে এমনিই

জমিদারী বিলোপে জমিদারের কোনো প্রতিপাদ্য নেই কেন? অভিমান? তাঁরা কি ভাবছেন, যখন কেউ চায় না আমাদের, চলেই যাই। তাঁরা কি ভাবছেন বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠান, চি[illegible] প্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, নদীর বাঁধ, সেচের দীঘি—এসব যে তাঁদেরই লোকে আজ সব ভুলে গেছে?

না, ভোলে নি। ইতিহাস কোনোদিন কারো কোন দান না। আর শুধুই কি হাসপাতাল আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান? রবী[illegible] যদি জমিদার না হ'য়ে অতিব্যস্ত ব্যারিষ্টার হতেন, কী পেতাম তাঁর কাছ থেকে? তাঁর সহোদর ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ হ'য়েছিলেন দেশ বিদেশ কী পেয়েছিল তাঁর কাছ থেকে?

জমিদারের নিঃশব্দ প্রয়াণের কারণ অভিমান নয়, কেন না অ[illegible] শুধু নারীকেই সাজে। তবে কি সে কারণ?

বিগত কয়েক বছর ধ'রে ভারতীয় মানুষের মনে এক অদ্ভুত ঘটে চলেছে। লোভের মুঠি আপনি শিথিল হ'ল, স্বাধিকার বজায় উত্তেজনায় মন আর মাতে না। কেমন একটা বৈরাগ্যের সোনার লেগেছে মনে। অনেক দিনের আগ্‌লে রাখা সঞ্চয় সব আজ রাতের ফুলের মতন পড়ছে খ'সে। প্রতিবেশীর দুঃখক্লিষ্ট জীবন আমাদের ভোগকে ধিক্কৃত করেছে। যাদের অন্ন জোটে না, দুঃখে আজ আমাদের অন্নও গলা দিয়ে গলছে না। দুঃস্থের চোখে আজ সুস্থের মনকে উদাস ক'রে দিচ্ছে।

আশ্চর্য এই পরিবর্তন—ঐন্দ্রজালিক ঘোর বিষয়ী মানুষের মনে পরিবর্তন ঘটাল কে? গীতা, উপনিষদের বাণী? রামায়ণ মহাভারত আদর্শ?—এসব তো বহু আগে হ'তেই ছিল, কিন্তু বিষয়ী মানুষের তো বদলাইনি।

তবে কার বিরাট ব্যক্তিত্বের, সুবিপুল ত্যাগে দেশের জন্য আ[illegible] সর্গে এতবড় অসম্ভবও সম্ভব হ'ল? কে সেই অদ্ভুত যাদুকর?

জিজ্ঞাসা কর আপন মনকে, উত্তর মিলবে সেখানেই।

সে যাদুকরের নাম—গান্ধীজী।

নীড়

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অনেক প্রত্যাশা দিয়ে মাটি-খড়ে গড়ে তুলি নীড়,
উপরে উন্মুক্ত থাকে আকাশের বিস্তার নিবিড়।
নিয়ে খরস্রোতা নদী, নক্ষত্রের প্রাচুর্য্য আলোর
চন্দনের মত যেন ললাটে, শরীর সিক্ত ওর।
দিনে খর সূর্য্যদাহ, সন্ধ্যায় উজ্জ্বল হয় চাঁদ।
আমাদের করতাল-গত বুঝি আস্বাদ, আহ্লাদ।

তবুও অপূর্ণ থাকে হৃদয়ের অনেক কিছুই;
একদিন ভরে যায় নীড়-মধ্যে শেফালিকা, জুঁই।
সমুদ্র ঢেউয়ের মত আকাঙ্ক্ষার শেষ বুঝি নেই।
এক গেলে আর লয়ে অভ্যস্ত যে জাল বুনতেই।
অঙ্কুর উদ্গত হয় উজ্জীবিত কত অভীপ্সার,
মানে না দুর্দৈব বাধা দুর্নিবার অগ্রগতি তার।

বিচূর্ণিত হলে নীড় দেখা দেয় আবার নতুন,
শরৎ-হেমন্ত গেলে সমাগত উদ্‌ভ্রান্ত ফাল্গুন।

প্রতিভা-পরিচিতি

অভিনেতা হার্বার্ট ট্রী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটারে "প্রাইভেট সেক্রেটারী" নামে একটি নাটকের অভিনয় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করতেন হার্বার্ট বীরবম ট্রী নামে একজন অনতিবিখ্যাত অভিনেতা যাঁর নাম তখনো পর্য্যন্ত রঙ্গরসিকদের কাছে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠে নি। প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি অভিনয় তেমন জমলো না। সমালোচকরা নাটকখানি বা তার অভিনয় সম্বন্ধে কোন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী খুঁজে পেলেন না।

স্যর হার্বার্ট বীরবম ট্রী

কিন্তু যেখানে আছে সত্যিকার প্রতিভার স্ফুরণ আর আত্মবিশ্বাসের অদম্য উদ্দীপনা, সেখানে সে-প্রতিভার আর আত্ম-বিশ্বাসের শেষ জয় অবধারিত। নিজের অসামান্য প্রতিভা আর বিরাট ব্যক্তিত্বের জোরে সেই সাধারণ নাটক আর অভিনয়কে অসাধারণের পর্য্যায়ে উন্নীত করলেন অভিনেতা ট্রী। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। নানারকম আলোচনা আর সমালোচনা শোনা যেতে লাগল তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে। একজন সমালোচক লিখলেন, তিনি তিন রাত্রি উপর্যুপরি সেই অভিনয় দেখেছেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, অভিনেতা ট্রী একভাবে বা একই রীতিতে রাত্রির পর রাত্রি অভিনয় করেন না, প্রতি রাত্রের অভিনয়ে তিনি নতুন নতুন অভিব্যক্তি, নতুনতর আঙ্গিক সংযোজনা করেন এবং বাকবিন্যাসের পার্থক্য ঘটিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে নিত্য নতুন-ভাবে রূপদান করেন।

মিথ্যা বলেন নি সমালোচক। "রবার্ট" স্প্যালডিং"-এর ভূমিকায় হার্বার্ট ট্রী চরিত্রের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে নিত্য নতুন করে তাকে "সৃষ্টি" করতেন। ভাবের আবেগে যে-রাত্রে যেমন ধারা প্রেরণায় তিনি উদ্দীপিত হতেন তেমনিভাবে অভিনয় করতেন, হয়ত সময় সময় এমন সব বাক্য, এমন সব ভঙ্গী যোজনা করতেন—যা তাঁর সহ-অভিনেতাদের কাছেও অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব, দর্শকদের কাছে তো বটেই! তাঁর সঙ্গে অভিনয় করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। স্বপ্নাবিষ্টের মতো তিনি অভিনয় করতেন। অভিনয়কে কখন্ যে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা আগে থেকে বোঝা যেতো না। তাঁর সেই পূর্ব্ব-প্রস্তুতিহীন স্বতস্ফূর্ত্ত অভিনয়-ধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে তাঁর সহ-অভিনেতৃরা হিমসিম খেতেন রীতিমতো।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্ত্তী হতেন তিনি। "প্রাইভেট সেক্রেটারী"-র অভিনয়ের প্রথম রাত্রে ট্রী সেজেগুজে পোষাক পরে উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রবেশ। পাশে স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ ট্রী চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। স্ত্রীকে বললেন—"জলদি! আমার এই কোটের বোতাম-ঘরে একটা নীল ফিতে চাই। শিগ্‌গির নিয়ে এসো।"

ছুটে এলো মঞ্চাধ্যক্ষ। নীল ফিতে? কিন্তু সে-রকম তো কোন ইঙ্গিত নেই নাটকে! না থাক্, না থাক···ব্যাকুল হলেন ট্রী,···কিন্তু নীল ফিতে তাঁর চাই-ই। এদিকে আর দেরী করবারও উপায় নেই। তাঁর প্রবেশের সময় এগিয়ে এলো। কাতর হয়ে পড়লেন ট্রী। সব বুঝি পণ্ড হয়! এমন সময় বিস্ময়কর উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাঁর স্ত্রী সেই সংকট-মুহূর্ত্তে। তাঁর পরিধানে ছিল শাদা সিল্কের গাউন। তারই একাংশ ছিঁড়ে নিয়ে সরু এক ফালি ফিতা তৈরী করে সাজঘরে গিয়ে সেটিকে নীল রঙে ডুবিয়ে এনে পরিয়ে দিলেন স্বামীর কোটের বোতামঘরে!

অনেক সময়েই ট্রী এমনি ধারা শেষ সময়ের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

অভিনয় করেছেন। তাঁর কাছে প্রতি রাত্রের অভিনয় ছিল নিত্য নতুন মহলা। অভিনীত চরিত্রটিকে জীবন্ত করবার জন্যে প্রতি অভিনয়ে তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর প্রখর কল্পনাশক্তির সাহায্যে নতুন নতুন পরীক্ষায় ব্যাপৃত হতেন। সব পরীক্ষাই যে সফল হত তা নয়, এক এক রাত্রের অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হত, কিন্তু দমতেন না তিনি, সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে নতুনতর প্রেরণায় উজ্জীবিত হতেন, পরের রাত্রে নিজেও মেতে উঠতেন নতুনতর পরীক্ষায়, মাতিয়ে দিতেন দর্শকদের। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে তাই বলা হয়েছে, একাদিক্রমে তাঁর অভিনীত একটি নাটকের পঞ্চাশ রাত্রি অভিনয় দেখবার পরেও তাঁর অভিনয়কে একঘেয়ে বা পুরাতন বলে মনে হ'ত না।

* * * *

শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ফলস্টাফের ভূমিকায় হার্বার্ট টী

১৮৫৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হার্বার্ট বীরবম টী-র জন্ম। পিতা জুলিয়াস বীরবম জাতিতে ছিলেন ওলন্দাজ। তরুণ বয়সেই তিনি ইংলণ্ডে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নিজের একটি বিশেষ লাভজনক শস্যের কারবার গড়ে তোলেন। টী-র জন্মের পরেই তাঁর মা মারা যান। পিতা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে যে ছেলেটি জন্মায় তাঁর নাম ম্যাক্স্ বীরবম। উত্তরকালে ম্যাক্স্ বীরবম ব্যঙ্গ-চিত্রী এবং সাহিত্যিকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। পিতা ছেলেদের জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা নির্ব্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ছোটকাল থেকে নাটকাভিনয়ে হার্বার্ট-এর প্রবল ঝোঁক এবং পটুতা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তাই অপেশাদার অভিনেতা থেকে হার্বার্ট যখন পেশাদার রঙ্গালয়ে ঢুকলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বাধা দেন নি, বরং উৎসাহই দিয়েছিলেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী নাটকে তাঁর প্রভূত সাফল্যের পর বন্ধুরা তাঁকে উপদেশ দিলে যে অতঃপর তিনি যেন কমিক চরিত্র অভিনয়ের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন, কারণ দেখা গেল, অদ্ভুত বিচিত্র এবং হাস্য-রসাত্মক ভূমিকাতেই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু হার্বার্ট টী ছিলেন যেমন জেদী তেমনি খেয়ালী। বললেন, আর বিদূষক নয়, এবার থেকে তিনি শয়তান। বললেন, "স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল" ও "ওথেলো" নাটকের দুটি পার্ট যথা—জোসেফ সারফেস্ এবং ইয়াগো, এই দুটি শয়তানের ভূমিকা তো তাঁরই জন্যে লেখা হয়েছে!

ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট নাটকে শয়তান ফ্যাগিনের ভূমিকায় হার্বার্ট টী

কিন্তু লণ্ডনের দর্শক এই দুই অভিনয়কে তেমন প্রাণখোলা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করলে না। অথচ টীও তাঁর জেদ ছাড়বেন না। মুস্কিলে পড়লেন থিয়েটারের মালিক। এই অশেষ গুণসম্পন্ন অথচ বদমেজাজী অভিনেতাকে যে কেমন করে সঠিকভাবে পরিচালিত করবেন তা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথার চুলে পাক ধরল।

অভিনেতারূপে তিনি যে নিখুঁত ছিলেন তা নয়। তাঁর গলার স্বর ছিল ঈষৎ ভাঙা। কণ্ঠস্বরে জড়তার আভাস ধরা পড়ত অনেকক্ষেত্রেই।

শালতরুর মতো দীর্ঘ বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, কিন্তু সেই অনুপাতে মাঝে মাঝে তাঁর অঙ্গভঙ্গী এবং অভিব্যক্তি দুর্ব্বল দেহ ও নার্ভাস মনের পরিচায়ক-রূপে ফুটে উঠ্‌ত। শুধু তাই নয়, মঞ্চের উপর তাঁর চলন-বলন ও প্রতিটি ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রকাশিত হত তাঁর দুর্ব্বার ব্যক্তিত্ব, আর্টকে প্রচ্ছন্ন করবার আর্ট তাঁর অভিনয়ের মধ্যে ধরা পড়ত না এবং বলা হয়েছে, ইচ্ছা করেই তিনি কোন ভূমিকার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চাইতেন না। নিজের সতেজ ও তীব্র ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল যেন তাঁর সাধনা। ভাঁড়ের কমিক ভূমিকাতেই হোক অথবা হ্যামলেটের কঠোর-করুণ ভূমিকাতেই হোক, তিনি চাইতেন, লোকে হার্বার্ট বীরবম ট্রীকে দেখুক, তার অসামান্য অভিনয় ক্ষমতার আস্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হোক।

* * * * *

লণ্ডনের হে-মার্কেট থিয়েটারে বিখ্যাত মেলোড্রামা "জিম্ দি পেনম্যান-"এর অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। নাটকখানি পাঠ করে ট্রী কর্তৃপক্ষকে বললেন যে, তিনি নায়কের অংশ অভিনয় করবেন। কিন্তু তখন ভূমিকা-লিপি তৈরী হয়ে গেছে। অন্য এক অভিনেতা সেই ভূমিকায় নামবেন। সব স্থির। হার্বার্ট ট্রীকে খুব ছোট একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে—একটি বিশেষ টাইপ-চরিত্রের অংশ। ট্রী ক্রোধভরে প্রথম সে ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের খাতিরে সেই ছোট ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এবং নিজের ক্ষমতার জোরে সেই সামান্য ভূমিকাটিকে এমন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন যে রাত্রির পর রাত্রি দর্শকবৃন্দ তাঁর সেই ছোট্ট ভূমিকার অভিনয় দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগার পূর্ণ ক'রে তুললো। "জিম দি পেনম্যান" নাটকের অভিনয়ে হার্বার্ট ট্রীর

অমর সুরশিল্পী বেঠোফেনের ভূমিকায় অপরূপ রূপসজ্জায় হার্বার্ট ট্রী

ব্যারণ হারজ্‌ফিল্ড্ দর্শকদের কাছে অবিস্মরণীয় "সৃষ্টি"রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

এমন বিচিত্র যাঁর চরিত্র এবং বিরাট যাঁর ব্যক্তিত্ব তিনি কোনদিনই পরের অধীনে নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখাতে পারেন না। রঙ্গমঞ্চ এবং তার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে থাকা চাই। ১৮৮৭ সালে হার্বার্ট ট্রী প্রথমে কমেডি থিয়েটার, পরে হে-মার্কেট থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুরু হল নতুন পরীক্ষা, নতুন সব নাটকের অভিনয়। কয়েকখানা নাটকের সার্থক অভিনয়ের পর ট্রী তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি জর্জ ডু মরিয়রের "ট্রিলবি" উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ ক'রে সারা রঙ্গজগতে প্রচণ্ড চমক লাগিয়ে দিলেন।

একটি নাটকের অভিনয় তিনি বেশীদিন চালাতেন না। কিছুদিন পরে হাই তুলে বলতেন, বড্ড একঘেয়ে লাগছে মঞ্চাধ্যক্ষ, অন্য কোন নাটকের মহলার ব্যবস্থা কর। মঞ্চাধ্যক্ষ হয়ত বললেন যে, যে-নাটক চলছে তাতে পয়সা আসছে প্রচুর, প্রতি রাত্রে হাউস ফুল হচ্ছে, সে-নাটক এখন বন্ধ করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু কে শোনে তার কথা? লাগাও প্রাচীরপত্র। খোল শেকস্‌পীয়র।

দুশো রাত্রি চলবার পরেও "ট্রিলবি" দেখবার জন্য লোকের আগ্রহ কমে নি, তখনো প্রতি রাত্রেই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—"প্রেক্ষাগার পূর্ণ।" কিন্তু আর ভাল লাগল না একই চরিত্রের অভিনয় রাত্রির পর রাত্রি। শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজর মঞ্চস্থ হল নতুনভাবে নতুন ঢংয়ে। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর প্রযোজনায় তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হল তাকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল, দৃশ্যপটের বাহুল্যের দ্বারা তিনি অভিনয়ের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেছেন, নাট্যকারের মনোভাবকে উপেক্ষা করে দৃশ্যের মধ্যে ও অভিনয়ের ভিতরে বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলবার অতি-ব্যগ্রতায় সময় সময় তিনি স্থূলতা ও মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

কঠোর সমালোচনা এবং নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু ট্রী শেক্সপীয়রকে কখনো অসম্মান করেন নি। তাঁর জুলিয়াস সীজারের অভিনয় দেখে লর্ড রোজবেরি বলেছিলেন—"অতীতের রোমীয় ঐতিহ্যকে যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, একজন সত্যিকার রোমানকে যদি দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে জুলিয়াস সীজারের অভিনয় দেখে এসো।"

তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মন্তব্য করেছিলেন যে হার্বার্ট ট্রীর শেক্সপীয়রের নাটকের প্রযোজনায় সেই সেই অংশই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে যে-সব অংশ নাট্যকারের রচনা নয়, হার্বার্ট' ট্রীর কল্পনা-প্রসূত। এ-কথা আংশিক সত্যি। নাটকগুলির মধ্যে ট্রী অনেক সময় নাটক-বহির্ভূত এমন সব ছোট ছোট ঘটনার সৃষ্টি করতেন, নাটকীয়তায় যেগুলি অপূর্ব্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

"দ্বিতীয় রিচার্ড" নাটকের অভিনয়কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে তিনি একটি কুকুরকে ষ্টেজে নামালেন। নাটকে অবশ্য কুকুরের উল্লেখ নেই। দেখানো হল, কুকুরটি রাজার বড় প্রিয়। তারপর দেখানো হল, রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর বিরোধ যখন চরম সীমায় উঠেছে এবং মন্ত্রীই জয়ের সম্মুখীন

হয়েছেন তখন কুকুরটি রাজাকে পরিত্যাগ করে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর হাত চাটতে লাগল, মন্ত্রীর মুখে ফুটে উঠল জয়ের কুটিল হাসি, আর রাজা সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে করতে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন। নাটক-বহির্ভূত এই দৃশ্যের অবতারণা সমালোচকদের বিস্মিত ও স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল।

সময়ে সময়ে একটি-মাত্র চাহনির দ্বারা ট্রী একটি চরিত্রের সমগ্র বেদনাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতেন। 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকে শেক্স্পীয়রের বর্ণনায় আছে, জনগণের বিদ্রূপ ও কটূক্তির ভিতর দিয়ে রাজা ঘোড়ায় চ'ড়ে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল অভিমুখে চলেছেন। দৃশ্যটি একজনের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। ট্রী স্থির করলেন, দৃশ্যটি অভিনয় ক'রে দেখাতে হবে। ঘোড়া বার করলেন ষ্টেজে। মঞ্চের উপর ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরুনো সহজ ব্যাপার নয়। চারদিকে লোকজন চীৎকার ক'রে রাজাকে গাল দিচ্ছে, আর তার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে হেঁটমুখে চলেছেন রাজা। বিষাদে ঘোড়াটার মাথাটাও যেন ঝুলে পড়েছে। একটু দূরে গিয়ে প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজা একবার মুখ তুলে চাইলেন, মাত্র একবার, আর তাঁর সেই একবারের মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিপাতের মধ্যে ফুটে উঠল সমগ্র জীবনের গভীর হতাশা আর বেদনা। বাক্যহীন সেই নীরব অভিব্যক্তি যেন বহু কাতর বাক্যের গুঞ্জন তুলে সমগ্র প্রেক্ষাগারকে অভিভূত করল।

* * *

এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য, নিত্য নবনব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভা, অথচ যেমন অন্যমনস্ক তেমনি অল্পস্মৃতি ছিলেন তিনি। তাঁর আত্মভোলা স্বভাবের জন্য অভিনয়ের সময় এক এক দিন মহা মুস্কিল ঘটত। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সমালোচক হয়ত সাজঘরে এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস! তাঁর সঙ্গে আলাপে মত্ত হলেন, একটু পরেই যে তাঁকে ষ্টেজে প্রবেশ করতে হবে বেমালুম, তা ভুলে ব'সে রইলেন। শেষ পর্য্যন্ত একরকম টানতে টানতে তাঁকে উইংসের পাশে ঠেলে দেওয়া হল।

স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল তাঁর। সহ-অভিনেতা কি বলছে অনেক সময় তা যেন প্রথম শুনছেন! হাঁ ক'রে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, নিজের পার্ট ভুলে গিয়ে, হয়ত একটা মনগড়া উত্তর দিলেন। তার পরক্ষণেই মনে প'ড়ে গেল নিজের ভূমিকার সংলাপ। এমন কথার বাঁধুনি আর অভিব্যক্তির গাঁথনি দিয়ে নিজের স্খলনটুকু মানিয়ে নিলেন যে সেই স্খলনাংশটুকুই সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে অপূর্ব্বতম হোয়ে উঠল।

একবার এক ভারী মজার ব্যাপার ঘটেছিল। বার্ণার্ড শ'র "পিগ্‌মেলিয়ন" নাটকের ড্রেস-রিহারশ্যাল চলছে। ড্রেস-রিহারশ্যাল মানে পুরোপুরি অভিনয়। দর্শকের আসনে বহু বন্ধুবান্ধব উপস্থিত। নাট্যকার শ স্বয়ং সামনেই বসে আছেন। অভিনয় চলছে। ট্রী সেজেছেন অধ্যাপক হিগিনস্, আর শ্রীমতী প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল এলিজার ভূমিকায় নেমেছেন। একটি দৃশ্যে আছে, অধ্যাপক হিগিনস্‌এর দুর্নীতিমূলক কথা শুনে রেগে গিয়ে এলিজা পায়ের শ্লিপার খুলে অধ্যাপককে ছুঁড়ে মারলেন। সেই দৃশ্যটির পালা উপস্থিত হল। কথাগুলো মনে আছে, কিন্তু চটির দ্বারা তাড়নার ব্যাপারটা ট্রী একদম ভুলে গেছেন। যথা-সময়ে তাঁর কথার উত্তরে রেগে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীমতী ক্যাম্পবেল শ্লিপার খুলে ট্রীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলেন ট্রী। বিস্ময়োক্তির সঙ্গে যেন দারুণ আঘাত পেয়ে ধপাস করে ষ্টেজের উপর ব'সে পড়লেন! বিষম ক্রোধ, অপমান, বিস্ময় এবং বিমূঢ়তার ছায়া তাঁর মুখে ফুটে উঠল। কোন্ সাহসে অভিনেত্রী তাঁকে জুতো মারে? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! না ওঠেন, না কোন কথা বলেন। স্মারক ভিতর থেকে তাঁর পার্ট হাঁকছে! কিন্তু কে শোনে তার কথা!—কোন্ সাহসে তুমি? বলে উঠলেন ট্রী! অভিনেত্রীও ঘাবড়ে গেছেন। ট্রী এ কী বলছেন? এ কথা বলার কথা তো নয়! অমনধারা বিচলিত হয়েছেনই বা কেন?

শেষ পর্য্যন্ত ট্রীকে বোঝাতে হল, অভিনেত্রীর কোন অপরাধ নেই। নাটকের মধ্যে এই ব্যাপার আছে এবং তা তো তিনি জানেনই! ঘাড় নাড়লেন ট্রী। বললেন, ভাল কোরে ব্যাপারটা তাঁকে জানানো হয় নি! মহলার সময় মিসেস্ ক্যাম্পবেল কোনদিন তো চটি ছুঁড়ে মারেন নি তাঁকে!

তাঁর এই অদ্ভুত যুক্তি শুনে সবাই হাসতে লাগল। নাট্যকার বার্ণার্ড শ বললেন—"অভিনয়ের সময়ে যদি ঠিক এমনি ভুলে গিয়ে ওই ভাবে ষ্টেজের ওপর ব'সে বোকার মতো চেয়ে থাকতে পারেন তাহলে আমার নাটকের চেয়েও ধন্য হবে আপনার অভিনয়।

বিশ বছর ধরে লণ্ডনের রঙ্গজগতের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে হার্বার্ট বীরবম ট্রী রসিকসমাজকে আনন্দ দিয়েছেন। ১৯০৯ সালে তাঁকে নাইট উপাধির দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে তিনি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। অবশ্য বেশী নয়। তাঁর নির্ব্বাক-ছবি "ম্যাকবেথ" এদেশে দেখানো হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বে। যে-ছবি আমরা দেখেছিলাম, তার ক্ষীণ স্মৃতি মনে পড়ে। ১৯১৭ সালে আমেরিকা সফর শেষ ক'রে দেশে ফিরে দেহে একটি অস্ত্রোপচারের পর সহসা তিনি গুরুতর অসুস্থ হোয়ে পড়েন এবং ২রা জুলাই পরলোকগমন করেন।

কে ?

শ্রীহীরেন বসু

আমি পাপী ? তাই না ! সমস্ত দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকায় করছি সে অভিযোগ। আমি খুন করেছি। আমার হাত আজও রক্তমাখা হয়ে আছে নারীর রক্তে। ঘূর্ণমান রক্তচক্ষুর সরোষ প্রশ্নের জবাবে বলছি না। বলছি অন্তর হতে। বহু দূরে যেন অতীতের বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে-যাওয়া অন্তহীন অন্ধকারের বুকের সেই ছোট্ট ক্ষণটি আমার স্মরণ হচ্ছে। আমরা বসে আছি সুবিস্তৃত হোগলা বনটার মধ্যে। হাত পাঁচেক দূরে একটা ছোট্ট জলাশয়। গভীর নিকষ আঁধারের আবরণ গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত ধরণী। ঝির-র-র। শ্রান্তিহীন ঝিঁঝিঁর ক্লান্তিহীন কণ্ঠস্বর। নিশীথ রাত্রির মূক স্তব্ধতা বার বার ব্যাহত হয়ে পড়ে। জলের মধ্য দিয়ে একটা শেয়াল ডুলকি চালে মিলিয়ে যায়। শব্দ ওঠে ছপ্-ছপ্। ওধারের ভুট্টা জনারের ক্ষেতের উপর হাজারো জোনাকী পোকার সমারোহ। দূরে মহাশ্মশানে একটা মড়া পুড়ছে বুঝি। একটা বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ আসছে। লেলিহান ক্ষুধিত শিখা রূপসী নদীর বুকে কাঁপছে থিরথিরিয়ে। দমকা হাওয়ায় বড় বড় হোগলার পাতাগুলো হেলে পড়ে। সর-র-র। কি রে সাপ না তো ? গন্ধটা আরও তীব্র ভাবে নাকে আঘাত হানছে। আবছা কম্পমান আলোতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মড়ার খুলিগুলি দাঁত মেলে যেন তাদের চিরন্তন জিঘাংসা ব্যক্ত করছে। আঁধারে আত্মগোপন করে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওরা যেন চলা ফেরা করছে। কেন আমাদের ফেলে রেখেছ ? যেন মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে ওদের শাশ্বত কালের প্রশ্ন। আকাশে অল্প অল্প মেঘ পুঞ্জীত হয়ে উঠছে। গায়ের পাশ দিয়া তীব্রবেগে কি যেন ছুটে চলে যায়, অনুভব করি লোমশ গায়ের মৃদু স্পর্শ। ভয়ে ঘেমে উঠেছি। নাঃ। কি যে হয়ে উঠেছি। যত সব বাজে ভাবনা। শ্মশানের লোকগুলো আবার হরিধ্বনি দিচ্ছে। বিশ্রী শিহরণ জাগানো শব্দটা হা হা শব্দে প্রান্তরে প্রান্তরে ভেসে ফিরছে। প্রতিটি লোমকূপে সঞ্চারিত হচ্ছে অজানা ভয়। সে বিরাট শ্মশানচারিণী মূর্ত্তি যেন আমার চোখের সামনে মূর্ত্তি নিচ্ছে একটু একটু করে। গভীর বিপর্য্যস্ত কুন্তলরাশী যেন ছেয়ে রয়েছে—রূপসীর কালো জল। আর ভূলোকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। যেন নিঃশব্দে ঘুরছে সে। বিরাট দ্রংষ্টারাশী মেলে হেসে উঠছে। প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তার বীভৎস ক্ষুধিত হাসি। নাঃ। আমি ভীষণ ভীতু হয়ে গেছি। কি যে সব আজে বাজে ভাবনা। পাশে পিনাকি বসে রয়েছে রাস্তার দিকে শ্যেন দৃষ্টি মেলে। পাশের রেল লাইনটা সাপের মত একে বেঁকে দূরের বাঁকের পেছনে মিলিয়ে গেছে। বুক-পকেটে হঠাৎ হাত পড়ে যায়। খস্ খস্ করে ওঠে মায়ার চিঠিটা। ছলাৎ করে রূপসী নদীর একটি ঢেউ বুকের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে। সদ্য-জেগে-ওঠা নদী তীরটার বুকে অকস্মাৎ ডাহুক-দম্পতি চীৎকার করে ওঠে। মায়া। আজ না ও আসবে। হয়তো জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ষ্টেশনের প্রতিটি লোককে সতর্ক ভাবে দেখবে। না। তারপর বোধ হয় হতাশায় মুখটা গাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে নেবে। অভিমানে থম্‌থম্ করবে ওর কোমল শুভ্র মুখটা। রঘুর পেছনে পেছনে ষ্টেশন ছেড়ে রওনা হবে। আমবাগানের মুকুল-পড়া পায়ে-চলা রাস্তা বেয়ে ; পাশে ফেলে যাবে সাধু বাবার আখড়াটি। লণ্ঠনের মৃদু আলোক ভিজে ভিজে মাঠের উপর আলোকের তরঙ্গ আনবে। হয়তো মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে দৃঢ় কোমল প্রতিজ্ঞা—কিছুতেই বলবো না কথা। অস্বস্তি লাগছে বড়। পিনাকি আড়চোখে চেয়ে দেখছে আমার হাবভাব। আস্তে আস্তে আমার হাতটা স্পর্শ করে। শিউরে উঠি কঠিন কিছুর স্পর্শে। কান দিয়ে উত্তপ্ত আগুনের হল্কা ছুটে বেরোয়। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অন্তরালে

ফটো :—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অভ্যন্তরে

ফটো :—এস, কে, চাটার্জ্জী

এমন দিনে আমার পরীক্ষার পালা এল। কাণের কাছে ঘুরছে রুদ্রের স্থির গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'বুঝলে শৈলেন, তুমি পিনাকির সাথে ছয় নম্বরের গুমটি ঘরের কাছে থাকবে। তারপরে সঙ্কেত পেলেই এগিয়ে যাবে। আর···' হিস্‌হিসে চাপা গলায় বলছেন শঙ্করদা। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে চোখ দুটো ক্ষুধিত হায়নার মত জ্বলে ওঠে। অজিত সোম। আজ গোপনে খবর এসেছে আমাদের গোপন আড্ডায়—অজিতই পাঠিয়েছে প্রচুর অর্থ নিয়ে কোন এক বিজনেস্‌ম্যান নাকি কলকাতা রওয়ানা হয়েছে! আমাদের টাকা চাই। দেশকে পরাধীনতার হাত হতে বাঁচাতে হলে চাই অস্ত্র, আর চাই সম্পদ। অহিংসার বেড়াবন্ধনে পড়ে আজ আমরা কঙ্কালসার। কিন্তু মায়া, দীর্ঘ তিনটি মাস পর বাড়ী ফিরছে ও। হয়তো স্পন্দিত বক্ষে মৃদু হাসি নিয়ে তাড়াতাড়ি যেয়ে ঢুকবে ঘরে। কিন্তু বিছানাতো শূন্য। বাবার রক্তচক্ষু এড়াবার জন্য জানালা গলে পালিয়ে এসেছি। হয়তো রুদ্ধ অভিমানে চোখের কোনে দু-ফোঁটা জল দেখা দেবে। শিক্‌ ধরে বাইরের আঁধারে দৃষ্টি মেলে দাঁড়াবে যেন সব কলো-কল্লোল থেমে যাওয়ায় রিক্তা ঝর্ণা। রাগ-রক্তিম-অধর বার কয়েক কেঁপে উঠবে। কেন এত অবহেলা? এত করে চিঠি লিখলাম। তবু কি একটু···একটু···। পোঁ। বাতাসে তীব্র ভাবে ভেসে আসছে হুইসেলের আওয়াজ। পিনাকি নড়ে চড়ে বসছে। বড় বড় উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমি ঘাড়ের কাছে অনুভব করি। তীব্র আলোর-চ্ছটায় আঁধারের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ডাহুক দম্পতীর উল্লাস-দীপ্ত কাকলি···! মায়া আসছে!! কোটিপতি পালাচ্ছে তার বক্ষপুটে টাকার থলিটি সঙ্গোপনে লুকিয়ে। ছিনিয়ে নিতে হবে আমাদের। গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। ঐ যে গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে আসছে। চেন টেনেছে। ফাষ্ট ক্লাশের দুয়ারে লাল আলোর সংকেত। কমরেড—ফরোয়ার্ড মার্চ্চ!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াই। তীব্র বেগে ক্ষেতের আল ডিঙ্গিয়ে ছুটে চলেছি।

কোটিপতি! রক্ত···। খুন···। বিপ্লবী! প্রচণ্ড আর্ত্ত চীৎকার রাত্রির মূক স্তব্ধতায় আলোড়ন তুলে মিলিয়ে যায়। আমি থরথরিয়ে কাঁপছি। চোখ দুটো দিয়ে জ্বালা করে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। মা···য়া। রক্তাক্ত দেহ ওর লুটিয়ে রয়েছে ফাষ্ট ক্লাশের নরম গদীর উপর। ওধারে গাড়ীর কোনায় আবছা আঁধারে নিজেকে লুকিয়ে কাঁপছে রিক্ত মিলিয়নীয়ার অজয় গাঙ্গুলী। গাড়ীর পাদানীতে পা দিয়ে উঠবার সময় একটা নারী মূর্ত্তি—তীব্র বেগে ছুটে আসে আমাদের বাধা দিতে। আলোকের ঝিলিক্‌ মেরে গুলী ছুটে যায় গুড়ুম্‌। মায়ার শাঁখাটা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোনে অসহায় বীভৎস হাসি। আমায় চিনতে পেরেছে কি? পিনাকি হাত ধরে টানছে। নাঃ নাঃ। ঐ যে, ঐ যে মায়া নড়ছে। ওর নিথর কোমল দেহে সাড়া জাগাচ্ছে জীবনের স্পন্দন। ও বেঁচে আছে। লোকজন ছুটে আসছে বুঝি। কোলাহল আর একাধিক পায়ের শব্দ শোনা যায়। নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা মেরে আমায় নীচে ফেলে দেয় পিনাকি। টেনে নিয়ে চলেছে আমায়। দৌড়···দৌড়। আরো জোরে। কালো গভীর অন্ধকারে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কে নড়ছিল? কে? মায়া। না আমার বংশধর অথবা দৃষ্টিভ্রম। মা···য়া। রাতের স্বপ্ন, আর দিনের কর্ম্মময় জীবনে শান্তির উৎস। সেই মায়া আজ···
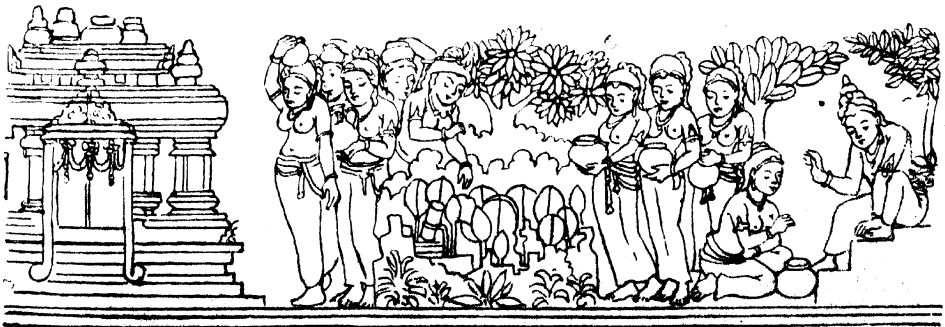
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সিন্ধু উপত্যকা ও সোনামার্গ

সোনমার্গ বা সোনামার্গ নাম কেন হোয়েছিল ; কোন সময় এখানে সোনা পাওয়া যেত কিনা বা মার্গগুলির মধ্যে এটী শ্রেষ্ঠ বোলে এর নাম সোনা-মার্গ তা সঠিক জানতে পারি নাই। সিন্ধু উপত্যকার প্রায় শেষ সীমান্তে সোনামার্গ উপত্যকা ; কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের বুকে ৮৬০০ ফিট

লাদাকের মানুষ

উঁচুতে এই সমতল অধিত্যকা ; এর থেকে আরও প্রায় ২০ মাইল দূরে সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থল ; সিন্ধুনদের তীর ধোরেই এখানে আসতে হয় তাই এ অঞ্চলটীর অন্য নাম সিন্ধু উপত্যকা (Sind valley)। পূর্ব্বে ৬।৭ দিন পায়ে হেঁটে পরিব্রাজকেরা শ্রীনগর থেকে এখানে পৌঁছতেন ; কিন্তু-দিন আগে মহারাজার আমলে সোনামার্গ পর্য্যন্ত সড়ক তৈরী হোয়েছে, যার বুকে মোটর ও বাস বেশ সহজে সঞ্চরমান।

বারামুল্লার দিকে আক্রমণে ব্যর্থ হোয়ে পাকিস্থানীরা শেষে এই পথ দিয়ে শ্রীনগরে সৈন্য পাঠাবার শেষ চেষ্টা কোরেছিল। এর আশেপাশের মুসলমান এলাকায় পাক চরেরা সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে শ্রীনগরের থেকে বহুদূরে অবস্থিত গিলগিট এলাকায় মুষ্টিমেয় রাজসৈন্যকে হটিয়ে এবং রাজ-প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এই বিদ্রোহী দলে শুধু পাকিস্থানী ও উপজাতীয়রাই ছিল না, মহারাজার মুসলমান পুলিশ বাহিনীর প্রায় সকলেই এবং স্কাউটেরাও যোগ দেয়। তারা ক্রমে বালটি-স্থানে ও সোনামার্গ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই পথ ধোরে তারা পূর্ব্ব-দিক থেকে শ্রীনগর দখলের বন্দোবস্ত করে, কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার প্রতিরোধ করে। সোনামার্গের চারধারের পাহাড়-গুলির উত্তরে ও পশ্চিমে শুনলাম এখন পাকিস্থানী অথবা তাদের বেনাম-দার আজাদ কাশ্মীর সরকারের সীমান্ত। সোনামার্গের পথ বেশ দীর্ঘ, তাই বাস ছাড়ার কথা সকাল ৮টায় ; কিন্তু ছাড়ল পৌনে নয়টায়। প্রথমটা উলারের পথ ধোরে গন্ধর্বল এল ; গন্ধর্বল থেকেই পূর্ব্বে 'পয়দলযাত্রীরা' পথের যাবতীয় পাথেয় সঞ্চয় কোরে নিতেন। এখন যাত্রীদের সে দুর্ভোগ ও দুর্ভাবনা নাই। তবে দুপুরের ভোগটা সঙ্গে নিতে হয়, কারণ সোনামার্গে চা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, এত নির্জ্জন। গন্ধর্বলে এখন একটা নূতন জল-বিদ্যুতের কারখানা তৈরী হচ্ছে, এটা চালু হোলে আর নাকি কাশ্মীরে বিদ্যুৎশক্তির সমস্যা থাকবে না। সিন্ধুর জলকে অনেকখানি দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে নালায় নিয়ে এসে এখানে নীচে সিন্ধুর মূল স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হবে। জল-প্রপাতের সেই পতন শক্তিতে ঘুরবে বিরাট চাকা, আর সে চক্রশক্তি উৎপন্ন কোরবে লক্ষ লক্ষ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি।

'ওয়েলের' কাছে সিন্ধুনদের সেতুটী খারাপ থাকায় যাত্রীদের নামতে হোলো। খালি বাস ধীরে ধীরে সেতু পেরিয়ে অপর তীরে আবার যাত্রীদের তুলে নিলে। এই সেতুর দুই প্রবেশ পথে সামরিক শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছে, এর কাছেই একটী ছোট ছাউনী। দক্ষিণে সমতল

সবুজ উপত্যকার প্রান্তে আকাশের কোল জুড়ে পীরপঞ্জলের অবিচ্ছিন্ন অসমান অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি তুষারে ঝক ঝক করেছিল। নদী পেরিয়ে সিন্ধুর দক্ষিণ তীর ধোরে বাস পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চোল্লো। এই পথে গন্ধর্বল থেকে ১৩ মাইল পর 'প্রাং' গ্রাম থেকে ১২ মাইল উত্তরে গেলে হরমুখ পাহাড়ের গায়ে গঙ্গাবল হ্রদ, (১১৭১৪ ফিট উঁচুতে) এবং ভানগ্যাট (Wangat) ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। গঙ্গাবল হ্রদের মাঝে মহাদেবের মূর্ত্তি; হিন্দুদের এটী একটী তীর্থ। স্থানীয় প্রবাদ গঙ্গাদেবী এখান থেকেই মর্ত্ত্যে নামেন, তাই হিন্দুরা এখানে শ্রাদ্ধাদি করেন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও যে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার ছিল তার আরও প্রমাণ—সিন্ধু উপত্যকার হরমুখ পর্ব্বতের ওপর থায়ুন (Thyun) ও ভানগাট অঞ্চলের হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ, এই অঞ্চলের দুটী নদীর নামও বিষেণসর ও কিষেণসর (সম্ভবতঃ বিষ্ণুসায়র ও কৃষ্ণসায়র)।

কংগন ও গুণ্ড সোনামার্গ পথের অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম; পূর্ব্বে দু'টীই ছিল 'পড়াও' বা পথিকদের আশ্রয়স্থল "চটী"। এখন এসব জায়গাতেই সামরিক বাহিনী রোয়েছে; তারা পথের মাঝে ফটকে ফটকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কোরছে। ক্রমশঃ পথ ওপরে উঠেছে; গুণ্ডের উচ্চতা ৬৫০০ ফিট। পথের ধারে কোথাও ঝরণা, কোথাও শস্যক্ষেত্র, কোথাও ন্যাড়া পাহাড়, কোথাও খাড়া পাহাড়, কোথাও বা আগাগোড়া পাইনে ঢাকা পাহাড়। পাহাড়ী পথের সব বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য এই পথটীর আগাগোড়া, সিন্ধুনদটীকে কয়েক বারই এপার ওপার কোরে পাহাড়ের কোলে উঠে, মাথায় পা দিয়ে পথটী শান্ত নির্জ্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই সংকীর্ণ উপত্যকায় প্রবেশ কোরেছে। সোনামার্গ পৌছল—প্রায় বেলা ১২টায়। সোনামার্গের উচ্চতা ৮৭০০ ফিট; আর গুলমার্গের ৮৭০০ ফিট; কাজেই উচ্চতায় উভয় মার্গই মাথায় মাথায়; কিন্তু গুলমার্গ আর সোনমার্গে তফাৎ অনেক। সুন্দরী দুজনেই—একজন সহরে, অন্যজন গ্রাম্য। গুলমার্গ তার হোটেল, বিজলী, বিলাসী বিদেশীদের নিয়ে গুমরে গমগম কোরছে, আর সোনামার্গের আছে শুধু শান্ত শ্যামলশ্রীর মিষ্টি মায়া। সোনমার্গে বিজলী বা হোটেল নাই, ক্লাব নাই, কাজেই বিলাসী বিদেশীদের আড়ম্বরের বাহুল্য নাই, হৈ হৈ আর হুল্লোড় নাই। এখানে আছে শান্ত নির্জ্জনতা, সবুজ সমতল ক্ষেত্রগুলির বুকে বিচিত্র বনফুলের অপরূপ বিন্যাস; চারধারে তুষারমুণ্ডিত কৃষ্ণ পাহাড়ের ধ্যানগম্ভীর মৌন স্তব্ধতা, তাদের পায়ের নীচে দ্রুতছন্দে নেচে চোলেছে সিন্ধুনদ। এখানেও বেশ বড় সামরিক ছাউনী আছে, এদিকের এইটিই শেষ সমতল ও শেষ ছাউনী। এখানে একটিমাত্র ডাকবাংলা আছে; এর দুখানি ঘর ও বারান্দা যাত্রীদের আশ্রয়স্থল। শুনেছিলাম এখানে আগুন পাওয়া যায় না, তাই ষ্টোভ, কেটলী ইত্যাদি সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ডাকবাংলার মালী যাত্রীদের আগুন ও গরম জলের ব্যবস্থা করে কিছু বখশিসের বিনিময়ে; তবু যাত্রীদের ভীড় বেশী থাকলে তার পক্ষে সকলের "খিদমদ" করা সম্ভব না হোতে পারে, এজন্য এখানে নিজেদের আরাম ও আহার্য্যের ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

এখানে যদিও প্রায়ই বৃষ্টি হয়, সেদিন বেশ রৌদ্র ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে রৌদ্রের রুদ্রতা একেবারেই ছিল না। অবশ্য সেই নিস্তেজ রৌদ্র না থাকলে শীতের তেজ যে কত হোত তা বলা মুস্কিল। জুলাই আগষ্টে এখানে বর্ষা, তবে বৃষ্টি খুব বেশী হয় না। গ্রীষ্মকালে এবং সেপ্টেম্বর মাসেও এই অধিত্যকার বিভিন্ন জলধারার তীরে প্রকৃতির নির্জ্জনকোলে তাঁবু ফেলে বাস করেন অনেক সৌন্দর্য্যপিপাসু এবং গ্রীষ্মভীরু যাত্রী। গুলমার্গ থেকে এ অঞ্চলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে—এখানে মাত্র একটাই অধিত্যকা নয়, আশে পাশে পাহাড়ের কোলে, নদীর ধারে অনেকগুলি ছোট বড় সমতল অধিত্যকা আছে; সেখানে ভ্রমণকারীর বা আরামপ্রিয়র দল দুচার দিন কোরে তাঁবু খাটিয়ে ভ্রাম্যমান জীবনের আনন্দ পেতে পারেন। গ্রীষ্ম থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানের আবহাওয়া আরামপ্রদ। এখান থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর না কি চিরতুষারের রাজ্য।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রীরা সেখান থেকে বরফ বয়ে আনায় অনেক বাহাদুরী কোরেছিলেন শ্রীনগরে, কাজেই সেখানে যাবার লোভ হোল; সেদিন দুখানা বাস-বোঝাই যাত্রী গিয়েছিলেম এবং তার বেশীরভাগই বাঙ্গালী; কিন্তু সেই শীতে চিরতুষারের দেশে যাওয়া হবে কিনা এ নিয়ে প্রথমে সকলের মতের বেশ ঐক্য হোল না। তার ওপর ডাকবাংলোর

শঙ্করাচারিয়া থেকে ডালের একাংশ

পহলগামের পথে লিদার নদী

সামনে আগত ঘোড়াওয়ালারা ভাড়া যেন বেশী বোল্লে। যাত্রীরা যাবে না কেউ, এক সময় এমনি মনে হোল। যে যার খাওয়া দাওয়ায় মন দিলেন। কিছুক্ষণ পর ডাকবাংলার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি অর্দ্ধেক ঘোড়া চোলে গেছে এবং বাকী ঘোড়ার সহিসদের সঙ্গে অবশিষ্ট যাত্রীরা কথা-বার্ত্তা কইছেন, আর অনেকেই পায়ে হেঁটেই ৪ মাইল পথ পাড়ি দেবেন বোলে যাত্রা সুরু কোরেছেন চিরতুষারের দেশের দিকে। অগত্যা আমরাও ঘোড়া নিলাম। পুরানো বরফের ওপরে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে গত সনের বরফ আনা হবে ইত্যাদি সর্ত্তে ঘোড়া পিছু ৩॥০ টাকা ভাড়া স্থির হোল। দুটী ঘোড়ায় দুজনে চোড়লাম। গুলমার্গ ও খিলানমার্গে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ায় অনভ্যস্ত শরীরের সব খিল খুলবার যোগাড় হোয়েছিল—বিশেষতঃ আনাড়ী গৃহিণীর, কিন্তু পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতেও সাহসে কুলাল না। মাঝ পথে পা জবাব দিলে বেচারী শরীরকে অশরীরীদের দলে ভীড়তে হবে? সোনমার্গ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে পায়ে চলা পথ চড়াই কোরে উঠে গেছে। এই চড়াইএর মাঝামাঝি দুটী ঘোড়ায় আমরা পাশাপাশি চোলেছি, সহিসরা ঘোড়ার মুখ
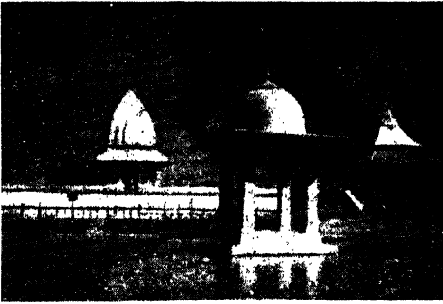
মার্ত্তণ্ডের নবনির্মিত মন্দির ও মচ্ছিকুণ্ড

ধোরে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখি আমার স্ত্রী ঘোড়ার জিন সহ কাৎ মারছেন। "গিরযাতা" "পাকড়ো পাকড়ো" বলে সহিসদের ডাকতে ডাকতে তিনি ভারসমতা হারিয়ে ফেললেন,—ঘোড়াটী কিন্তু তখনও চোলছে। আমার ঘোড়াটীকে তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে ঠেকা দিয়ে ধোরলাম; কিন্তু চলমান ঘোড়ার পিঠ থেকে এভাবে জোর পাওয়া যায় না, কাজেই পতনের গতি কোমল, কিন্তু রুদ্ধ হোল না; এমন সময় সহিসটা এসে তাঁকে ধোরে ফেলে পায়ের নীচের পাথরের এবং অশ্বখুরের আঘাত থেকে বাঁচাল। সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রশক্তি না হোক মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাঁকে আমার দিকেই আকর্ষণ কোরেছিল, বিপরীত দিকে কোরলে এবং সেই অসমান প্রস্তরবহুল পার্ব্বত্যপথে পতন ঘোটলে, বিশেষ কোরে জিনের রেকাবে আটকে যাওয়া পা শুদ্ধ নিয়ে অশ্বতর আরোহীকে যদি খানিকটা টেনে নিয়ে যেত তাহলে কাশ্মীরের বদলে কাশীপ্রাপ্তি তাঁর সেদিন প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। পরে দেখা গেল জিনটী পুরা কষা ছিল না, কিছু আলগা ছিল—অতএব দুর্ঘটনাটা ঠিক আনাড়ী সওয়ারের জন্তে নয়; সহিসের অনবধানতায় অথবা নেহাতই দৈব দুর্ব্বিপাকেই ঘোটেছিল। ভবিষ্যৎ যাত্রীরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, এই জন্তেই এই ঘটনাটীর উল্লেখ কোরলাম। এ অঞ্চলের স্বাভাবিক রুক্ষতার জন্তে বসতি অত্যন্ত বিরল। পাহাড়ের গায়ে গ্রামে যারা আছে তারা অত্যন্ত দরিদ্র। উষর মালভূমিতে ফসল বিশেষ কিছু ফলে না, তাই দিনমজুরীই এদের উপার্জ্জনের প্রধান উপায়—তাও মরশুম ছাড়া মেলে না।

খানিকটা চড়াই উৎরাই কোরে "আজওয়াসের" ডাকবাংলা চোখে পোড়ল—এটী ঠিক সাধারণের জন্তে নয়, সরকারী 'সাহেব'দের" জন্তে। আরও একটু এগিয়ে নদীর তীরে বেশ সমতল খানিকটা জায়গা। সম্প্রতি (আমাদের যাওয়ার কয়েক মাস আগে) পণ্ডিত নেহরু যখন সফরে কাশ্মীর আসেন তখন কয়েকদিন এখানে তাঁবু ফেলে তিনি বিশ্রাম কোরেছিলেন। আরও খানিকটা এগিয়ে পেলাম—বিস্তৃততর সমতলভূমি, প্রায় চারদিকেই তার বিশালবপু পর্ব্বতমালা—মাঝ দিয়ে চোলেছে শাখা প্রশাখা মেলে এক অগভীর পাহাড়ী নদী। গ্রীষ্মকালে এখানে মেষ-পালকেরা মেষ চরাতে বাসা বাঁধে,‧তাদের ফেলে যাওয়া পোড়া কাঠ, কিছু অব্যবহার্য্য তৈজসপত্র এখানে সেখানে চোখে পোড়ল। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এই সব সমতলে সবুজ ঘাসের বুকে ফোটে অজস্র বিচিত্র বর্ণাঢ্য বনফুল। তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং বিন্যাস নাকি মানুষের সাজান বাগানকেও হার মানায়, আবহাওয়াও থাকে আরামপ্রদ। কাজেই সে সময়ে এখানে জন-সমাগমও হয় বেশী। এখন অক্টোবরে সবুজ ঘাস আছে, নির্ঝরিণীর নৃত্য আছে, কিন্তু হিমশীতল হাওয়ার স্বর্গে ফুল শুকিয়ে গেছে—মাঝে মাঝে শুধু শুকনো লাল ফুল মরণোন্মুখ গাছে কয়েক যায়গায় চোখে পোড়ল। আর একটু এগিয়ে পায়ে চলা পথও বন্ধ হোয়ে গেল—সামনে বিরাটকায় তুষারমণ্ডিত এক পাহাড় পথ রোধ কোরে দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলাম সামনের পর্ব্বতের মাথায় ঐ তুষারতরঙ্গের তীরে হয়ত আমাদের যেতে হবে; কিন্তু ঘোড়াওয়ালারা ডাইনের একটী পাহাড়ের নীচের দিকে একটুখানি যায়গায় জমাট বাঁধা বরফ দেখিয়ে বোল্লে "ঐ দেখ গতসনের বরফ", কেউ বা বোল্লে "গ্লেসিয়ার"; ঘোড়া আর যাবে না, ঐটুকু পায়ে হেঁটে চড়াই কোরে বরফ আনতে পারেন। ব্যাপারটা বিদ্রূপের মতই শোনাল। কোথায় সাধের 'গ্লেসিয়ার,'! বিস্তীর্ণ জমাট-বাঁধা চোখ-ধাঁধান ঝকঝকে বরফ দেখবো বোলে এত কষ্ট কোরে আসা, আর পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু জায়গায় বরফের খানিকটা জমাট টুকরো দেখিয়ে বোল্লে "ঐ গ্লেসিয়ার"! কেউ কেউ বেকুব বনার জন্তে সহিসদিগকে বকাবকি কোরতে লাগলেন, কেউ বা ঘোড়া ছেড়ে প্রস্তরবহুল পাহাড়টী চড়াই কোরে ওপরে উঠে রুমালে বরফের খানিকটা অংশ সংগ্রহ কোরে নিয়ে এলেন। তাঁদের সংগ্রহেই আনন্দ, সঞ্চয়ে নয়—কারণ ও সঞ্চয় সম্ভবতঃ বাস পর্য্যন্তও পৌঁছবে না। আমাদের ৩।৪ দিন পর যাঁরা এখানে গিয়েছিলেন তাঁরা আবার এটাও দেখতে পান নাই, তখন এটী গলে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে শুনলাম। নূতন পড়া বরফ ঝকঝকে সাদা, আর পুরাতন বরফ ধুলাবালিতে একটু হলদেটে হয়। এরই কাছাকাছি পাহাড়গুলির অপরদিকে কোলাহই

গ্লেসিয়ার, কাজেই এ অঞ্চলটা চিরতুষারের। সামনের খাড়া পাহাড়-গুলির মাথায় নতুন বরফ অস্তমিত সূর্য্যের সোনালী বর্ণে তখন গলান সোনার মত ঝক্‌ঝক্‌ কোরছিল। এই ৩৪ মাইল পথ যাওয়া আসায় প্রায় ৩ ঘণ্টা লেগেছিল। বেলা ৫॥ টায় বাস ছেড়ে সন্ধ্যায় শ্রীনগর পৌঁছল। এ যাত্রায় বাসের দক্ষিণা মাথা পিছু ৮৲ টাকা।

পহলগামের পথে

পহলগাম তুষারতীর্থ অমরনাথের পথে শেষ সহর। এর পরই হয় হাঁটাপথ সুরু। শ্রীনগর থেকে এর দূরত্ব ৬০ মাইল। পহলগাম যাবার মোটরবাস অনেক কোম্পানিরই আছে; একটু খোঁজ খবর কোরলে ভাড়াও কিছু কম বেশী হয়। ষ্টেট-ট্রান্সপোর্টের বাসের কতকগুলি সোজা পহলগাম যায়, কতক যায় অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদ থেকে আচ্ছাবল বাগান ও কোকরনাগ ঘুরে। আমরা এই দ্বিতীয় পথেই গিয়েছিলাম। যে পথে শ্রীনগরে প্রথম প্রবেশ কোরেছিলাম সেই পথেই বাস চলল। সকাল ৮টায় বেরিয়ে ৮ মাইল এসে পামপুরের জাফরাণ ক্ষেত্রের পাশে বাস দাঁড়াল। ধূম্রবপু বিশাল পাহাড়ের কোলে বিতস্তার (ঝেলামের) তীরে শস্য ক্ষেত্রগুলি ধাপে ধাপে প্রায় ৫ মাইল চোলেছে। ক্ষেত্রের কোথাও আবর্জ্জনা নাই, মাঝে মাঝে মসৃণ মাটী একটু উঁচু কোরে চৌকা-বাঁধা—তাদের বুকে বেগুনে রংএর বড় ফুল। ফুলগুলির বেগুনে পাপড়ীর ভেতর আর একটা কোরে হোলদে রংএর পাপড়ী, তার মধ্যে কেশর। ফুলগুলি একেবারে মাটীর বুকেই যেন ফুটে উঠেছে, গাছের কাণ্ড বা পাতা নাই। মাটীর নীচে গুল্ম জাতীয় এক ধরণের জিনিষ, তার নীচে ছোট-খাটো শেকড়, অনেকটা পেঁয়াজের মত। মাটীর ওপর পেলব বৃন্তের মাথায় একটা কোরে ফুল মাটী থেকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি উঁচুতে ফুটে আছে। একটা মৃদুমিষ্টি গন্ধ মাঠময় ছড়িয়ে পোড়েছে। তখনও সব ফুলগুলি ফোটেনি; সব ফুটলে মাঠের মাটী ঢেকে যায় এদের বিচিত্র বর্ণে। ফুলগুলি পাকলে ঘন বেগুনে রং ক্রমে হলদে বা জাফরাণ রং হয়। এগুলির জীবন মাত্র মাস দেড়েক, বীজ বোনা থেকে ফুল তোলা পর্য্যন্ত! অক্টোবারের শেষের দিকে শীতের হাওয়ার সঙ্গে ফুলগুলি মাটীর ওপর জেগে ওঠে—আর নভেম্বরের প্রথমে সেগুলি তোলা হয়। নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে তখন দিনে এবং রাত্রে জোৎস্নার আলোয় সুন্দরী কাশ্মীর-কন্যারা দলে দলে পুষ্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারা গান গায়, আর ফুল তোলে।

কাশ্মীরের গ্রাম্য জীবনে গান আজও বেঁচে আছে নানা সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে বিভিন্ন উৎসবের মাঝে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ এতে ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে গান হবেই। মাঠের কাজ যখন থাকে না সেই কর্ম্মহীন দিনগুলিতে বা শীতের সন্ধ্যায় প্রায় প্রতি গৃহে বুড়ী দিদিমা ঠাকুরমারদল মাঝখানে বোসে গল্প বোলবে, তার চার ধারে ছেলে বুড়ো সকলে বোসে চরকা কাটবে, উল পরিষ্কার কোরবে, শালে ফুল তুলবে, উইলো গাছের ঝুড়ি বুনবে, নয়ত অন্য কোন হাতের কাজ কোরবে আর গল্প শুনবে, গল্পের মাঝে মাঝে হবে গান, তাতে যোগ দেবে সকলে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরের নিজস্ব অগ্নিগর্ভা কেটলী "সামোভার" থেকে নুন মেশানো সিদ্ধকরা চা চোলবে। 'ছকরী' 'লোল' এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকসঙ্গীত। উৎসবের সময় গানের সঙ্গে থাকে ঢোলক, দাহরা, রাবাব, তাম্বুরা। কখনও হয় গান, কখনও চলে কাহিনী—সুদামা-চরিত, রাধা স্বয়ম্বরা, শিব-লগন (বিবাহ), কিংবা পারস্য কাব্য-ইউসুফজুলেখা, সোরাব-রুস্তম, হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, সিরীন-ফরহাদ, অথবা কাশ্মীরের নিজস্ব উপকথা হিমাল-নাগ্রায়া, বোমবুর-লোলের, জোহরা খোটান ও হায়াবান্দ-এর কাহিনী। 'ছোকরী' হোল গ্রাম্য গান আর কাশ্মীরের খানদানী সঙ্গীত হোল 'সফিয়ানা', এর তাল রাগ-রাগিণী বেশ কসরৎ কোরে শিখতে হয় এবং সিতার, সানটুর, সাজ, সারেঙ্গী, ঘাটা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গৎ কোরতে হয়। জম্মুতে সাধারণতঃ 'পাহাড়ী', আর কাশ্মীরে ছোকরী আর সফিয়ানার চলন বেশী। লাদাকী সঙ্গীত ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কাশ্মীরের চেয়ে তিব্বতের সঙ্গেই এর সামঞ্জস্য বেশী।

কাশ্মীরের গ্রামে গান যে আজও বেঁচে আছে এর কারণ বহু শতাব্দীর
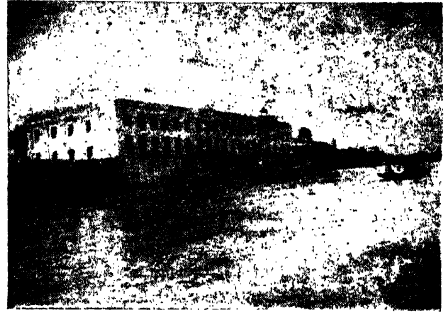
বিতস্তার তীরে শের-গড়। পূর্ব্বতন প্রাসাদ, বর্ত্তমানে সরকারী দপ্তর

সংস্কার ও সাধনা। হিন্দু আমলে গানের আসন ছিল খুব উঁচুতে, এমন কি দেবতার মন্দিরেও ছিল তার স্থান। কাশ্মীরেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানেও সমস্ত মন্দিরেই ছিল গানের চর্চ্চা, ক্রমে তা সামাজিক জীবনেও প্রসারিত হয়। আজও ভারতের পশ্চিমে বা দক্ষিণে দেবতার সামনে আরতি বা আরাধনার সময় নারী পুরুষ একসঙ্গে সমস্বরে ভজন গায়, ভজন হলেও তার ভঙ্গী সঙ্গীত; বাংলাদেশেও কীর্ত্তনের কাল পর্য্যন্ত এ জিনিষ ছিল, আজ বাংলার লোক-সঙ্গীত লোপ পেতে বোসেছে, বাংলার পল্লী আজ গান গাইতে ভুলেছে।

অশোকের পরবর্ত্তী রাজা জালুকা (২০০ খৃঃ পূর্ব্ব) নিজে সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর রাজসভায় বহুশত সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ক ছিলেন। সম্রাট ললিতাদিত্যও শুধু সুরই ছিলেন না সুরজ্ঞও ছিলেন। ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ। শৌর্য্যে সম্পদে, সুরে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছিল এই ভূস্বর্গ; তাঁর দরবারে এক বিখ্যাত নৃত্যবিদ ছিলেন, তার নাম ইন্দ্রপ্রভা। তখনকার ঐতিহাসিকেরা বলেন কাশ্মীরের

প্রতি গ্রামে ছিল নাট্যশালা, সেখানে নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত, যন্ত্রকলা সব কিছুরই নিয়মিত চর্চ্চা চোলত। রাজা হর্ষ, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি নিজেরা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীতের আদর কোরতেন। মুসলমান সুলতানেরাও সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। জৈন-উল-আবদীনের সঙ্গীত-প্রীতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আবুলফজল লিখেছেন, "এঁর রাজত্বকালে ইরাণ, তুরাণ, খোরাসান থেকে বিখ্যাত গায়ক ও বাদকেরা কাশ্মীরে আসেন।" প্রতি বৎসর ইনি সঙ্গীত সম্মেলন কোরে তাতে ইয়ারকন্দ, সমরখন্দ, তালখন্দ, কাবুল, পাঞ্জাব, দিল্লী থেকে গায়কদের আহ্বান কোরতেন। এঁর দরবারে 'তারা' নামে এক বিখ্যাত নটী ছিলেন যিনি ৪৯টী মুদ্রায় পটীয়সী বোলে ঐতিহাসিক শ্রীবর পণ্ডিত উল্লেখ কোরেছেন। জৈন-উল-আবদীনের পৌত্র আলিশাহ্ পারস্য, ভারত, মধ্য এসিয়া থেকে ২০০ সঙ্গীত কুশলীকে দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। এঁদেরও পরবর্ত্তীকালে হাসান শাহার দরবারে ছিল সহস্র সঙ্গীতজ্ঞ। শেষ চকবংশীয় সুলতানের স্ত্রী হাববা খাতুনএর সুর ও সঙ্গীতে আসক্তির কথা পূর্ব্বেই বোলেছি। তারপর মোগল আমলেও সঙ্গীতের সমাদর সর্ব্বজনবিদিত। এই সব সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও লালেশ্বরী, আরনিমল, নূর-উদ-দীন প্রভৃতি ত্যাগী, কবি ও সন্ন্যাসীদের রচিত বহু সঙ্গীতে সমৃদ্ধ কাশ্মীর, তাই আজও তার প্রতিধ্বনি বাজে কাশ্মীর-কন্যার কণ্ঠে প্রতি উৎসবে, নৌকার মাঝির দাঁড়ের তালে তালে, গ্রামীণদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ী শ্রমিকের শ্রান্তির দীর্ঘশ্বাসের মাঝে। গজল, সুফিয়ানা প্রভৃতি উচ্চসঙ্গীত—রাজদরবার ছেড়ে বেঁচে আছে সুরকার ও কলাবিদ্‌দের কণ্ঠে এবং আজও তা ধ্বনিত হয় রেডিও-কাশ্মীরের মারফতে। এই প্রসঙ্গে মনে পোড়ল এদেশের আর একজন ভগবৎ প্রেমিক মুসলমান ফকির কবিকে—যার ছিল না ধর্ম্মের গোঁড়ামি; প্রতি মানুষকে যিনি দেখতেন দেবতার দেউল স্বরূপ, এঁর নাম নূর-উদ-দীন বা নন্দঋষি। কাশ্মীরের রাজশক্তি যখন ছিল জৈন-উল-আবদীনের মত এক শক্তিমান উদার সম্রাটের হাতে তখনই কাশ্মীরবাসীর আধ্যাত্মিক মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন এই নিরক্ষর ফকির। এঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী চলিত আছে; কিন্তু তা বাদ দিলেও এঁর সরল সহজ গ্রাম্য উপমার দ্বারা রচিত গভীর তত্ত্ব কথার সে সব কবিতা আজও লোক মুখে প্রচলিত, তা থেকেই বোঝা যায় এঁর মানবতার প্রতি আন্তরিকতা, পতিতের জন্য বেদনা ও তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা। তাঁর এই সব উক্তি ও রচনা লিপিবদ্ধ আছে "ঋষিনামা" গ্রন্থে। সাহিত্য হিসেবেও এখানি যথেষ্ট মূল্যবান। এই ত্যাগী ফকির তার প্রেম ও জ্ঞানে হিন্দু মুসলমান সকলের চিত্ত জয় করেন। ৬৬ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ কোরলে সম্রাট জৈন-উল-আবদীন স্বয়ং শবযাত্রার পুরোভাগে থেকে এই সন্ন্যাসীর আত্মার প্রতি সম্মান দেখান।

(ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতন

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, এল্, এল্-বি

রক্তিম মৃত্তিকার মাঝে
তালিবন যেথা আপন গরবে রাজে
তারি মাঝে তব তপোবন
টেনে নিল মানবের মহত্তম মন!
পৃথিবীর প্রথম প্রভাতে
সূর্য্য যবে জগৎ-সভাতে
লিখে দিলে বিধি-লিপি সোনার আখরে
সেইদিন জেনেছি তোমারে একটী নমস্কারে!
শান্তির পারাবার মথি
ভারতের ভালে দিলে অলকার শাশ্বতী—
জন্ম নিল শান্তিনিকেতন,
জগতের কামনার ধন!

তারালোকী তটিনীর তালে
তব মৃত্যু জন্ম লয় নিত্য নব প্রাণে
পরাণের সিংহ-দ্বারে রচে নব গান—
মানুষের লাগি আনে বহি পরম পরিত্রাণ!
উত্তরায়ণের উত্তরীয়খানি
ঘুচায়েছে মানুষের গ্লানি—
পৃথিবীর চারিভিতে
জেগেছে জীবন-সুরভি মানুষের চিতে;
তুমি কবি সুখে-দুঃখে রচিয়াছ কত গান
ধরণীর খেলা-ঘরে লক্ষ তব অবদান!
হেথা এসো যেথা যত জ্ঞানী আর গুণী—
মানুষের ভীড় শান্তির নীড়: এই শান্তিনিকেতনী!!

ইন্দ্রবিজয়

"বেদব্যাস"

অতি প্রাচীনকালে ত্বষ্টা নামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকেও স্পর্দ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া ইন্দ্রের কোনও ক্ষতিই করিতে পারেন নাই। ইহাতে ত্বষ্টার ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়—এবং তিনি তাঁহার পুত্র ত্রিশিরাকে ইন্দ্রের চেয়েও বেশী পরাক্রমশালী হওয়ার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিতে প্ররোচনা দেন। ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিশিরা ইন্দ্রকে নির্জিত করিয়া নিজেই ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিশিরার তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র বিপদ গণিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, ত্রিশিরা এইভাবে একাগ্রতার সহিত কঠোর সাধনা করিয়া যাইতে পারে—তবে ত্রিশিরার পক্ষে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার শক্তি অর্জ্জন করা অসম্ভব হইবে না। তাই তিনি ত্রিশিরার মনে চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া তাঁহার মানসিক বল ক্ষুন্ন করিবার জন্য বহু পরমাসুন্দরী অপ্সরাকে ত্রিশিরার নিকট কৌশলে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু অপ্সরাগণ সকলেই ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া অসিল—কেহই ত্রিশিরাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তখন ইন্দ্র নিজেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন—এবং স্বয়ং তাঁহার বজ্রদ্বারা তপস্যারত এক ব্রাহ্মণকুমারকে এই ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া সেই বনের এক কাঠুরিয়া ইন্দ্রকে ভৎ'সনা করিয়া বলিল—মহাশয়—আপনি কে—? এই তপস্যারত ব্রাহ্মণ কুমারকে আপনি কেন বধ করিলেন? আপনার কি পাপের ভয় নাই? অপকর্ম্ম করিলে ইহজন্মেই মানুষকে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে হয়, —ইহা কি আপনি জানেন না? দেবরাজ মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলেন—এবং কাঠুরিয়াকে বলিলেন—আমি দেবরাজ ইন্দ্র—এই ব্রাহ্মণকুমার আমার শত্রু, তজ্জন্যই আমি তাঁহাকে বধ করিয়াছি। এই জন্য আমি সময়ান্তরে প্রায়শ্চিত্ত করিব। কাঠুরিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিল—দেবরাজ—অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়।" বিমর্ষ ইন্দ্র আর কোনও কথা না বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

ত্বষ্টা প্রজাপতি পুত্রের নিধন সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, —এবং ইন্দ্রের বিনাশকামনায় এক কঠোর যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রবল পরাক্রমশালী বৃত্রাসুরের সৃষ্টি হইল।

বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন, —ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে স্বর্গরাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন। তারপরও বহুদিন যাবৎ ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের যুদ্ধ হইল—কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই বৃত্রকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে নিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন—"তুমি দেবতা ও ঋষিগণকে নিয়া বৃত্রের কাছে যাও,—এবং তাঁহার সঙ্গে সন্ধি কর। সম্মুখ সমরে তুমি বৃত্রকে জয় করিতে পারিবে না।"

বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ইন্দ্র ঋষিগণকে বৃত্রের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ঋষিদের চেষ্টায় ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের সন্ধি হইল। সন্ধির একটা সর্ত্ত হইল এই যে—কোনও শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা, প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা রাত্রিতে বৃত্রকে ইন্দ্রাদি কোনও দেবতা বধ করিতে পারিবে না। বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পর দেবরাজ পুনরায় স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

একদিন সন্ধ্যায় ইন্দ্র সমুদ্রতীরে বৃত্রকে অসতর্ক অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র অসতর্ক বৃত্রকে বধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন—এখন সন্ধ্যাকাল—দিনও নয় রাত্রিও নয়—আর সম্মুখে যে সমুদ্রফেন পড়িয়া আছে—তাহা শুষ্কও নয় আর্দ্রও নয়,—আমি এই সমুদ্রফেন দ্বারাই বৃত্রকে বধ করিব। ইন্দ্র সমুদ্রফেন সংগ্রহ করিয়া সেই সমুদ্রফেন দ্বারা তাঁহার বজ্র আবৃত করিয়া বৃত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বৃত্র হত হইলেন।

তপস্যানিরত ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিশিরাকে বধ করার অপরাধের জন্য ইন্দ্রের শক্তির ক্ষয় হইয়াছিল। তাই তিনি বৃত্রের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন পুনরায় মিথ্যাচার করিয়া বৃত্রকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের শক্তি দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। মহাদেবের ভূতেরা চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমাগতই ইন্দ্রকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইন্দ্র সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন যে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অপরাধজনিত শক্তিক্ষয় হইতে তাঁহার নিজেরও নিস্তার নাই—যদিও তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। ত্রিশিরার হত্যার পর বনের কাঠুরিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল—তাহাও ইন্দ্রের মনে ক্রমাগতই উদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র নিজেকে অত্যন্তই শক্তিহীন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন—এবং অবশেষে নিবীর্য্য-অবস্থায় জলের মধ্যে, আশ্রয় নিলেন।

ইন্দ্রের বিহনে ত্রিভুবনে অরাজকতা দেখা দিল। শাসনের অভাবে চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রের স্থলে কাহাকে অভিষিক্ত করা হইবে এই নিয়া বহু আলোচনা হইল। কিন্তু কোনও দেবতাই ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সকল দেবতারা একত্রিত হইয়া স্বর্গবাসী মহারাজ নহুষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেই দেবরাজের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নহুষ খুবই ধার্ম্মিক এবং অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন। তিনি প্রথমে দেবতাদের অনুরোধ মানিয়া নিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"দেবতাদের পদে বসিবার জন্য যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যকতা আছে—আমার, সেই পরিমাণ শক্তি নাই।

আমি ইন্দ্রের চেয়েও দুর্ব্বল। আমি যদি ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করি, তবে আমার পক্ষে তাহা অনাধিকার চর্চ্চা হইবে,—এবং অনাধিকার চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আমার বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইবে—এবং তাহাতে আমার পতন ঘটিবে।" কিন্তু দেবতারা নহুষকে ছাড়িলেন না। তাঁহারা বলিলেন—"আমাদের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তুমি ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিয়া ত্রিলোক শাসন কর। অগত্যা নহুষ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে দেবরাজের পদ গ্রহণ করিলেন।

তেজস্বী ও যশস্বী নহুষ দেবতা ও মহর্ষিদের বলে বলীয়ান হইয়া ন্যায়-পরায়ণতা ও সুবিবেচনার সহিত স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ত্রিলোকে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল ও সর্ব্বত্রই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর নহুষ নিজেকে খুবই শক্তিমান মনে করিতে লাগিলেন,—এবং তাঁহার ধারণা হইল যে তিনি ইন্দ্রের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী—এবং প্রতাপশালী। নহুষের অহমিকা বৃদ্ধি পাইল—এবং ক্রমে ক্রমে তিনি অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়িলেন। স্বর্গের সমস্ত ভোগ বিলাসের উপকরণ ও তাঁহার নিকট—অপর্য্যাপ্ত মনে হইতে লাগিল। একদিন তিনি নন্দনকাননে ভ্রমণরতা শচীকে দেখিয়া তাঁহার সভাসদগণকে বলিলেন—"ইন্দ্রমহিষী আমার গৃহে বাস করেন না কেন? আমি ইন্দ্র হইতেও বিক্রমশালী, তিনি সত্বর আমার গৃহে আসিয়া আমার সেবা করুন।"

শচী এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্তই ভীত হইলেন—এবং দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। নহুষ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবগণকে বৃহস্পতির আশ্রয় হইতে শচীকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। দেবতারা নহুষকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু নহুষ শান্ত হইলেন না। তিনি দেবতাগণকে বলিলেন—"ইন্দ্র যখন অনেক ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নৃশংস কার্য্য করিয়াছিলেন—তখন আপনারা কোথায় ছিলেন। আপনারা ইন্দ্রকে বারণ করিতে পারেন নাই কেন?—শচী আমার সেবা করুন,—তাহাতে তাঁহার ও আপনাদের মঙ্গল হইবে।

দেবতারা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃহস্পতির নিকট গিয়া বলিলেন "নহুষ কিছুতেই শান্ত হইতেছে না—আপনি শচীকে নহুষের নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করুন। নহুষ ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—শচী এখন নহুষকেই পতিত্বে বরণ করুন।" দেবতাদের এই কথা শুনিয়া শচী ভয়বিহ্বলা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি শচীকে বলিলেন, "ইন্দ্রানী, তুমি আশ্বস্ত হও। তোমার কোনও ভয় নাই। আমি কখনও শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিসর্জ্জন দিতে পারি না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, আপনারা চলিয়া যান।"

দেবতারা তখন বিপন্ন হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন—"আমরা বিপন্ন হইয়াছি। কি করিলে সকলের মঙ্গল হয়—এবং আমাদেরও বিপদ কাটিয়া যায়,—সে সম্বন্ধে আপনি উপদেশ দিন।"

বৃহস্পতি বলিলেন,—নহুষ অধর্ম্মের পথে চলিতেছে। দেবরাজের পদের জন্য নহুষের যোগ্যতা ছিল না। আপনাদের নির্ব্বন্ধের জন্যই নহুষ দেবরাজ হইয়াছে। ফলে আজ আপনারাও বিপন্ন হইয়াছেন,—এবং নহুষেরও অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে। কালই এখন নহুষকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিহীন করিয়া ধ্বংশের পথে ঠেলিয়া দিবে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় কালহরণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইন্দ্রানী নহুষের কাছে কিছুকালের সময় প্রার্থনা করুন, তাহাতে সকলের পক্ষেই শুভ হইবে।

শচী দেবতাদের সঙ্গে নহুষের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কৃতাঞ্জলী হইয়া বলিলেন—দেবরাজ, আমাকে কিছুকালের সময় দিন। ইন্দ্র কোথায় কি অবস্থায় আছেন তাহা আমি জানি না। অনুসন্ধান করিয়াও যদি তাঁহার সংবাদ না পাই—তবে নিশ্চিতই আমি আপনার সেবা করিব। অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে নহুষ শচীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন,—এবং শচীও পুনরায় বৃহস্পতির আশ্রয়ে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর দেবতারা বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন—নহুষের অত্যাচার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। ইন্দ্র ত্রিশিরা ও বৃত্রবধের পাপে হীনবীর্য্য হইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন। ইন্দ্রের যাহাতে পাপক্ষয় হয়—এবং তিনি পুনরায় দেবরাজ্য ফিরিয়া পান—তাহার ব্যবস্থা করুন। বিষ্ণু বলিলেন—আপনারা ইন্দ্রের নিকট যান, এবং তাঁহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে বলুন। কর্ম্মের দ্বারাই ইন্দ্রের পাপক্ষয় হইবে—এবং তিনি পুনরায় বলশালী হইবেন। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সম্মিলিত হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন—এবং সকলে মিলিয়া অশ্বমেধাদি অনেক যজ্ঞ করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের পাপক্ষয় হইল—এবং তিনি শক্তি ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি ফিরিয়া পাইলেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে নহুষ তখনও স্বর্গরাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ—এবং বলশালী। তাই তিনি দেবতাগণকে বিদায় দিয়া কালহরণ করিবার মানসে পুনরায় আত্মগোপন করিলেন।

এদিকে শোকার্ত্তা শচী বহু অনুসন্ধান করিয়াও ইন্দ্রের কোনও সন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। রাত্রিদেবী শচীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে উপস্থিত হইলেন, এবং শচীকে সঙ্গে করিয়া মহাসাগরের মধ্যস্থ একটি দ্বীপে একটি সুবৃহৎ সরোবরের নিকট নিয়া গেলেন। শচী দেখিতে পাইলেন যে সেই সরোবরের একটি পদ্মের মৃণালকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। শচী এই অবস্থায় ইন্দ্রকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—বলিলেন,—প্রভু, তুমি স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া আমার রক্ষার ব্যবস্থা কর। তুমি যদি এখন আমাকে রক্ষা করিতে না পার, তবে পাপী নহুষ শীঘ্রই আমাকে তাহার অন্তঃপুরে বাস করিতে বাধ্য করিবে।

ইন্দ্র শচীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—তুমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক,—তোমার কোনও বিপদ ঘটিবে না। নহুষের প্রতি বলপ্রকাশের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নহুষ এখনও খুবই বলশালী। ঋষিরা এখনও নহুষের অপদার্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নহেন। এখনও ঋষিরা নহুষকে হব্যকব্য দিয়া তাঁহার বলবৃদ্ধিই করিতেছেন। তুমি স্বর্গে

ফিরিয়া যাও—এবং নির্জ্জনে নহুষকে বল—সুরেশ্বর, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার নিকটে আসুন, আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হইব। যদি নহুষ ঋষিবাহিত শিবিকায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে—তবে শীঘ্রই নহুষের দাম্ভিকতা ঋষিদিগকে তাহার প্রতি বিরূপ করিবে,—হয়ত বা দুরাত্মা নহুষ ঋষিদিগের দ্বারাই বিনষ্ট হইবে। আর যদি বা ঋষিদের দ্বারা নহুষ বিনষ্ট না হয়—তাহার যে নিশ্চিতই শক্তিক্ষয় হইবে—এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তখন বলপ্রয়োগ করাও সফল হইবে।

শচী নহুষের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—দেবরাজ, আপনি যদি আমার একটা কামনা পূর্ণ করেন—তবে আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হইব! আমার ইচ্ছা যে আপনি এমন বাহনে আরোহণ করিয়া যাতায়াত করুন—যাহা বিষ্ণু, শিব বা কোনও দেবতা বা দৈত্যের নাই। আমার ইচ্ছা—মহাত্মা ঋষিগণ মিলিত হইয়া আপনার শিবিকা বহন করুন। নহুষ উল্লসিত হইয়া বলিলেন—সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—তুমি অপূর্ব্ব বাহনের কথা বলিয়াছ। আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।

ঐরাবত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ হস্তী, হংসবাহিত বিমান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাহনসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া নহুষ মহর্ষিগণকে তাঁহার শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিলেন। শিবিকাবাহক বহু কাঁয়িকশ্রম স্বীকার করিয়া নহুষকে স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিয়া নিয়া যাইতে লাগিল।

নহুষের এই অভিনব বাহনের সংবাদ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি সমস্ত দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—নহুষের পতনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইবার ইন্দ্রকে আহ্বান করা আবশ্যক। সজ্জনের অভিনন্দন লাভ করিলে পরাক্রমশালী ব্যক্তির শক্তির বৃদ্ধি হয়—দুর্ব্বলের পতন হয়। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের নিকট যাই—এবং তাঁহার স্তুতি করিয়া তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করি—এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নহুষকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করি। তখন দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন—এবং তাঁহার বহুবিধ স্তুতি করিলেন। স্তুত হইয়া ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি হইল, এবং তিনি পদ্মের মৃণাল হইতে স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন।

এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং ইন্দ্রকে বলিলেন—পুরন্দর, তোমার ভাগ্য পুনরায় সুপ্রসন্ন হইয়াছে। দুরাত্মা নহুষের পতন হইয়াছে। তুমি এখন স্বর্গরাজ্যে গিয়া সগৌরবে সিংহাসন আরোহণ কর। দেবগণ কৌতূহলী হইয়া নহুষের পতনের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে অগস্ত্য বলিলেন—একদিন নহুষের শিবিকাবাহক মহর্ষিগণ—আমিও তন্মধ্যে ছিলাম—পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শিবিকা নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন একজন মহর্ষি নহুষকে বলিলেন—দেবরাজ, ব্রহ্মা যে যজ্ঞে গোবধ সম্বন্ধে মন্ত্র বলেছেন—তাহা তুমি প্রামাণিক মনে কর কিনা? নহুষ উত্তর দিল—না। এই নিয়া নহুষের সঙ্গে ঋষিদের ঘোরতর তর্ক হইতে লাগিল। হঠাৎ উত্তেজিত নহুষ তর্ক করিতে করিতে তাহার পদদ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিল। তখন ঋষিরা তাঁহাকে এই শাপ দিলেন—দুর্ম্মতি, তুমি মহর্ষিদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নিন্দা করিতেছ, চরণদ্বারা তুমি এক মহর্ষির মস্তক স্পর্শ করিয়াছ, তোমার পুণ্যফল ধ্বংস হউক—তুমি মহাসর্পের রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে পতিত হও। নহুষের তখনই পতন হইল।

ইন্দ্র বৃহস্পতি ও অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া শচী সমভিব্যাহারে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় সগৌরবে ত্রিলোক পালন করিতে লাগিলেন।

অতলান্তিক

শ্রীনবগোপাল সিংহ

সুগভীর মর্ম্ম হ'তে উৎসারিত নর্ম্মদার ধারা
রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে ওতপ্রোত একত্রিত গতি
জীবনের শান্ত পথে উচ্ছলিত প্রেম স্রোতস্বতী
অনাবিল স্নিগ্ধতায় হানে নিত্য বন্ধুর ইশারা।

ক্ষয়িষ্ণু কালের যন্ত্রে আবর্ত্তিত প্রগতির পাখা
কৈশোরের শ্যামবৃন্তে ফুটায়েছে রক্তিম যৌবন,
দিগন্তের বার্ত্তা আনি জাগায়েছে তীব্র আলোড়ন
ধূলিম্লান চাপল্যের শুভ্র শুচি গুঞ্জিত বলাকা।

অনন্তের আকুলতা সীমাবদ্ধ প্রাণের প্রাচীরে
কল্পনার উর্ণা পাতি জাল বোনে শিল্পী উর্ণনাভ
মনের গোপন স্তরে ঝলে তারই স্বপ্নিল প্রভাব
অতন্দ্রিত আঁখি পটে অলস্যের ছায়া নামে ধীরে।

হৃদয়ের শ্যাম মঞ্চে চঞ্চলিত বসন্ত হিল্লোল
কামনার সপ্তবর্ণে স্বপ্ন নভে ইন্দ্রায়ুধ রচে
সায়াহ্নের ক্লান্ত রবি ঝুয়ে পড়ে গভীর সঙ্কোচে
মানবের জ্ঞান সিন্ধু রেখে যায় অনন্ত কল্লোল।

বাঙ্গলা ভাষা প্রসারের কথা

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পি-এচ-ডি, এম-এল-এ

দেশ পররাষ্ট্র শাসনের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া স্বাধীন হইয়াছে আজ সাত বৎসর, কিন্তু ভাষা ও নানা মৌলিক অধিকারে আজ বাঙ্গালী স্বাধীন নহে। রাষ্ট্রে আজ বাংলা ভাষা উপেক্ষিত এবং যে মর্য্যাদা বাঙ্গালা ভাষা বিদেশী শাসনের যুগে পাইয়াছে তাহাও আজ ব্যাহত।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির বিশিষ্ট সভ্য এবং সভ্যাগণ

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন সভায় সম্মানিত সভ্য এবং সভ্যাগণ

তথাপি সমগ্র ভারতে বাংলা ভাষা জানিবার ও শিখিবার এক চাহি দেখা যায়। শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষাগুলির মর্য্যাদা, সংরক্ষ উন্নতিতে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য-বিধি আছে তথাপি বাংলা ভাষা প্রসা উদাসীনতা দেখা যায়।

এইরূপ অবস্থাতে নিখিল ভার বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি প্রীতি দক্ষতার সহিত বাংলা ভাষার ঐশ্ব বিতরণ করিয়া অ-বঙ্গ-ভাষাভা এমন কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদেশীদের মধ্যে বাংলা ভা শিখিবার আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছে সম্প্রতি সমিতির সপ্তদশ বাৎসরি সমাবর্ত্তন উৎসবে তাহার প্রম দেখা গিয়াছিল। সভায় বহু কু নৈতিক বিভাগের প্রতিনিধি, ই কে হাই-কমিশনার, ইউ আই এস, আমেরিকা বা বর্ম্মা ফরাসী কানসেল-জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। তামিল, মালয়ালা গুজরাতি, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ক্লাশে বাঙ্গলা শিখিয়া রবীন্দ্রনাথ, সত্যে

দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পরিষ্কারভাবে আবৃত্তি করেন। শ্রীমতী মৃদুলা পারিখ, শ্রীমতী লক্ষ্মী ভেঙ্কটাসরণ, সিদ্ধলিংগম এন নায়ার, শ্রীমতী জয়া সুনরেশন অতি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কন্যা মায়া দেবীর পরিচালনায় জনগণ মন—নানাভাষী মহিলারা বিচিত্র জাতীয় পোষাক পরিয়া গান এবং গুজরাতি মহিলারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে গর্ব্বা নৃত্য করেন—পূর্ব্ব পশ্চিম ভারতে অপূর্ব্ব মিলন হয়।

এই সমিতি কলিকাতার ৬টা বাংলা শিক্ষার কেন্দ্র পরিচালন করেন। তামিল সংঘ পদ্মপুকুর, মহাবোধিতে, গুজরাতি সমাজে, গুজরাতি মহিলা মণ্ডলে এবং সেণ্ট জেমস কলেজে,—দার্জ্জিলিং জিলায় দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং ঘুম, সোনাদা, ডাড়হিল, মহানদী, কালিম্পং প্রভৃতি স্থানে ১৩টী, সিকিমে ১টী, মালদহে সাওতালদের জন্য ২টী, পুরীতে উৎকল-ভাষীদের জন্য ১, নূতন দিল্লী ২, বোম্বাই ১, সৌরাষ্ট্রে ৩টী বাংলা শিখাইবার ক্লাশ পরিচালনা করিতেছে।

স্বাধীনতা দিবস পালন উৎসবের দিন সমিতি বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরের ন্যায় ৫০০ বাংলা পুস্তক সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত বাংলা পুস্তক সংগ্রহে প্রদান করিয়া বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষার চর্চ্চার সুযোগ দিতেছে।

সমিতি কটক ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি স্মৃতি পুরস্কারের বার্ষিক ১০০৲ টাকা ৬৮০০৲ টাকা দিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং সমিতির জমা সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নামে বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বোম্বাই ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে করিবার কল্পনা করিয়াছে। সমিতির চেষ্টাতেই ৩০০০০৲ টাকার একটি স্থায়ী ভাণ্ডার বাংলা পুস্তক লেখকদের উৎসাহ দিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যাহার সুদে প্রতি বৎসর ১০০০৲ টাকা সে বৎসরের শ্রেষ্ঠ পুস্তক-রচয়িতাকে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত সমাজ ও শিশুশিক্ষা পুস্তকটির জন্য সে পুরস্কার পাইবেন।

সমিতি নেপালী-বাংলা, ইংরাজি-হিন্দি-বাংলা, দোভাষী ও ত্রিভাষী পুস্তক প্রকাশ করিয়া অ-বাঙ্গালীদের বাংলা শিখিবার সুযোগ করিয়া দিতেছে। কলিকাতা সহরে একটি আধুনিক সুখ-সুবিধা-বিশিষ্ট অ-বাঙ্গালীদের বাংলা শিক্ষার কেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন। সমিতি সে বিষয়ে যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত বাঙ্গালী ও বাংলার রাষ্ট্রনায়কগণ সহযোগিতা করিলে বাংলা ভাষারই মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

সুখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে রাষ্ট্রনায়কগণ এখন অনেকটা সচেতনতা দেখাইতেছেন। যদিও হিন্দীকে সরকারী ভাষার পদবী দেওয়া হইয়াছে তথাপি বিভিন্ন প্রদেশীয় অনিচ্ছুক জনগণের উপর বাধ্যতামূলকভাবে ইহাকে শিখানোর অসমীচীনতা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি পুনাতে হিন্দী-রাষ্ট্রভাষা সমিতিতে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি এই বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া নিজ ন্যায়নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে হিন্দীর সাহিত্যিক উৎকর্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহার প্রচলন কেবল আইনের জোরে সিদ্ধ হইবে না—ভাষাতাত্ত্বিক এই সত্য যত শীঘ্র স্বীকৃত হয় ও এই সত্যের দ্বারা ভাষাগত নীতি যত নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। দেশের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু ভারতের উচ্চতর সংস্কৃতি যে ভাষার মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিবে বিদেশে সেই ভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিলে তাহাতে ভারতেরই গৌরব বর্ধিত হইবে। ইহাই ভাষা সম্বন্ধে সত্যিকার উদার ও অসম্প্রদায়িক নীতি; ইহার বিপরীত মতবাদ সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট।

হেমন্তের অপরাহ্নে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অঘ্রাণের অপরাহ্ণ, পড়ন্ত রোদ্দুর;
শূন্য দোপাটির বনে মরণের সুর
নিঃশব্দ কান্নায় ভরা। শেফালি-কানন
খুলিয়া ফেলেছে তার পুষ্প-আভরণ।
নীরবে আসিল গাঁদা ফুলের আসরে।
আরণ্যকপোত কাঁদে সকরুণ স্বরে।

আমার অন্তরে নামে বিষাদের ছায়া!
সরে সরে যায় সব! পুত্র-কন্যা-জায়া
এই আছে, এই নাই। দিগন্ত সীমায়
নামিছে জীবন-সূর্য্য। বিদায়-বেলায়
মন কাঁদে তাঁরই লাগি যিনি চিরন্তন,—
হাতখানি হাতে ল'য়ে সখার মতন

এপার হইতে যিনি লবেন ওপারে,—
যাঁহারে জানিলে ভয় নাহিকো সংসারে!

বিশ্ব সাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

(ওয়াগ্‌নারের বিশ্ববিশ্রুত জার্মান অপেরা—
"দি রিং অফ্ দি নিবেলুঙস্")

জগৎপ্রসিদ্ধ জার্মান গীতিনাট্যকার ও সঙ্গীত-শিল্পী রিচার্ড ওয়াগনার ১৮১৩ খৃঃ অব্দে লাইপজিগে জন্মেছিলেন। ড্রেসডেনে তিনি শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। ১৩ বছর বয়সের ছেলে হোমারের 'ওডিসির' দ্বাদশ পর্ব অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। ১৪ বছর বয়সে নিজেই একখানি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন। কিশোর বয়সেই বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতকার ওয়েবারের তিনি বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, তাঁর সুর-ঝঙ্কারে বালকের চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু, প্রকৃত অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি বীঠোফেনের অনিন্দ্যসুন্দর সঙ্গীত থেকেই। বীঠোফেন ছিলেন বিশ্ব-বন্দিত জার্মান সঙ্গীতকার। এঁর অল্প বয়সের রচিত গীতিনাট্যগুলি রসিক সমাজে ভুবনবিদিত সঙ্গীতকার মোজার্টের রচনাবলীর সমতুল্য বলে গণ্য হয়েছিল। সে যাই হোক, ওয়াগনার আঠারো উনিশ বছর বয়সেই গীতকার রূপে সাধারণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না! দেশে কেউ তাঁর গীতিনাট্যের সমাদর করলে না দেখে তিনি স্থির করলেন প্যারিসে গিয়ে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। ওয়াগনারের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ বছর। কিন্তু প্যারিসের মতো জায়গায় একজন অপরিচিত তরুণ জার্মাণ যুবকের স্থান করে নেওয়া তখন অত্যন্ত কঠিন ছিল। ওয়াগনারের ধৈর্য ছিল অসীম। নিজের শক্তির উপরও ছিল একটা অবিচলিত বিশ্বাস। চার বছর ধরে তিনি প্যারিসে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটালেন। প্যারিসের জন্য তিনি যে নূতন গীতিনাট্যখানি রচনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন কোনও রঙ্গালয়ই তা অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করলে না। অবশেষে হতাশ হয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন আর সেই বছরেই ড্রেসডেনে তাঁর সেই গীতিনাট্যখানি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। এই সাফল্য ওয়াগনারের জীবনেও সাফল্য এনে দিয়েছিল। তাঁকে সসম্মানে আহ্বান করে এনে ড্রেস্‌ডেনের চ্যাপেল-মাস্টারের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। চ্যাপেল-মাস্টারের কাজ ছিল গীর্জার প্রার্থনা-সঙ্গীত ও ঐক্যতান বাদ্য পরিচালিত করা। এই সময় তিনি পর পর অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু সবগুলি সমান ভাবে সমাদৃত হয় নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে 'তানহৌসার' 'লোহেনগ্রীন্' গীতিনাট্য দুখানি এখনও য়ুরোপের নানা অপেরা হাউসে অভিনীত হয়। আমরা যেবারে প্যারিসে ছিলুম, ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমার্দ্ধে, সেবার প্যারিসের গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে আমরা ওয়াগনারের প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য 'লোহেনগ্রীন্' অভিনীত হতে দেখি।

'নিবেলুঙ্ রিঙ্' ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ওয়াগনার লিখেছিলেন। আজ থেকে একশ দু'বছর আগে। অবশ্য তখন এই গীতিনাট্যের কেবল কাব্যাংশ মাত্র রচিত হয়েছিল, সঙ্গীতাংশ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এ গীতিনাট্যখানি বিরাট। একই গল্প অবলম্বনে রচিত হ'লেও গীতিনাট্যখানি তিনটি অংশে বিভক্ত। এ তিনটি অংশ আবার এক একটি ভিন্ন ভিন্ন গীতি-নাট্য রূপে অভিনীত হতে পারে এবং বস্তুতঃ হয়েছেও তাই! ওয়াগনার যখন এই গীতিনাট্যের কাব্যাংশ রচনা করেন তখন তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত। দ্বাদশ বর্ষ তাঁকে নির্বাসনে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটাতে হয়েছিল। তারপর তিনি জার্মানিতে ফিরে আসবার অনুমতি পান। কিন্তু, দেশে ফিরেও দীর্ঘ তিন বৎসর তাঁকে বেকার অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। এই সময় হঠাৎ তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। ব্যাভেরিয়ার রাজ্যেশ্বর দ্বিতীয় লুই তাঁকে আহ্বান করে এনে রাজসভায় প্রধান গীতকার রূপে স্থান দিলেন। শোনা যায় তিনি রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে ওয়াগনারের গীতিনাট্য নিয়েই দীর্ঘকাল মেতে ছিলেন। এইবার ওয়াগনার সুখের মুখ দেখতে পেলেন। গীতিনাট্যপ্রিয় ও বিশেষ করে ওয়াগনারের অনুরাগী নৃপতির পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়াগনারের সকল দুঃখ দূর হল। পরের পর তাঁর এক একখানি গীতিনাট্য মিউনিকে অভিনয় হতে শুরু হয়েছিল।

ওয়াগনার তেইশ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু পঁচিশ বছরকাল একত্র বসবাসের পরও তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। ওয়াগনারের বয়স তখন আটচল্লিশ। প্রায় দশ বৎসর তিনি আর বিবাহ করেন নি। পরে সাতান্ন বছর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ জার্মান পিয়ানো-বাদক ভন বুলোর পত্নী সুন্দরী কোজিমাকে বিবাহ করেন। কোজিমা ছিলেন ভন বুলোর গুরু প্রসিদ্ধ হাঙ্গেরিয়ান পিয়ানো বাদক লিজের কন্যা। ভন বুলো যখন ছাত্ররূপে লিজের নিকট পিয়ানো শিক্ষা করতেন সেই সময় কোজিমার প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিলেন। লিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার কিছুদিন আগে ওয়াগনারের কাছেও ভন বুলো গীতিনাট্য রচনা শিক্ষা করতেন। ভন বুলোর কবি ও সাহিত্যিক বলেও সুনাম ছিল। তিনি বেশ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। লাইপজিগ ও বার্লিনে তিনি আইন অধ্যয়ন করতে করতে হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীত সাধনায় মনোনিবেশ করেন। গীতবাদ্যের প্রতিভা ছিল তাঁর সহজাত। কাজেই

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু, বারো তেরো বছর এক সঙ্গে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবার পর পত্নী কোজিমা যখন তাঁর পূর্ববর্তী গুরু ওয়াগনারের অনুরাগিণী হয়ে উঠে তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ওয়াগনারকে বিবাহ করেন, তিনি মনের দুঃখে দেশত্যাগী হ'য়ে চলে যান এবং বিদেশে নানা শহরে গীতবাদ্যের আসর নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এই সময় ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালি প্রভৃতি দেশে তাঁর খুব সুনাম হয় এবং সর্বত্রই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। পত্নীর ব্যবহারে তিনি এত বেশি আঘাত পেয়েছিলেন যে আর দেশে ফেরেন নি। পঁচিশ বছর তিনি বিদেশেই ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সুদূর কেয়ারো শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্বেই বলেছি 'কোজিমা' যখন ওয়াগনারকে বিবাহ করেন তখন ওয়াগনারের বয়স প্রায় সাতান্ন বছর। ওয়াগনারের সে সময় খুব বোলবোলাও! কেবলমাত্র তাঁরই গীতিনাট্য অভিনয়ের জন্য বেরুথে একটি বিশেষ রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর অপেরাগুলি নিয়ে তখন হৈ হৈ চলছে। ওয়াগনারের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য 'পার্সিফল' সমস্ত পৃথিবীতে একটা সাড়া তুলেছিল। ওয়াগনারের প্রতিভার বিশেষত্ব ছিল সঙ্গীত জগতে নব নব সৃষ্টির নূতনত্বের মধ্যে। তিনি গতানুগতিকের পক্ষপাতি ছিলেন না। সঙ্গীতশাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়ম মেনে তিনি কখনই চলতেন না। তিনি নূতন নূতন সুরসাম্য ও বাদ্যসঙ্গতি উদ্ভাবন করে সঙ্গীত জগতে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁর 'ট্রিস্টান', পার্সিফল প্রভৃতি গীতিনাট্য অতুলনীয়। 'নিবেলুঙ রিং' গীতিনাট্য খানি শেষ করতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগেছিল। গীতিনাট্যের মধ্যে এ এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। যেমনি বিরাট এর কল্পনা তেমনি সুবৃহৎ এর রচনা। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ত্রিধা বিভক্ত গীতিনাট্যখানি রচনা করতে শুরু করেন। এর কাব্যাংশ ও সঙ্গীতাংশ তিন ভাগেরই সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শেষ করতে সময় লেগেছে প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি। এই তিনভাগের নাম যথাক্রমে 'ওয়ালকায়ার', 'সীগ্‌ফ্রেড', ও 'গটার্ ডামেরুঙ্' এ ছাড়া উপক্রমণিকা বা এর প্রস্তাবনা স্বরূপ 'রাইন-গোল্ড' নামে আর একটি ছোট গীতিনাট্যও আছে। সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে সমগ্র গীতিনাট্যখানি অভিনয় করা একরাত্রের মধ্যে সম্ভব নয়। তবু, বেরুথের নবরঙ্গমঞ্চের প্রথম উদ্বোধন রাত্রে নাকি সমগ্র তিনখণ্ড গীতিনাট্যই অভিনীত হয়েছিল শোনা যায়।

এতক্ষণ এই ভুবনবিদিত গীতিনাট্যকারের জীবনী ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল, এইবার তাঁর গীতিনাট্যত্রয় "দি রিং অফ্‌দি নিবেলুঙ" নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যাক। প্রথমেই দেখা যায় তিনি এ গীতিনাট্যের গল্পাংশটুকু প্রাচীন জার্মান পুরাণ ও কিম্বদন্তী থেকে সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে বিশেষ গবেষণা করতে হয় নি, কারণ অজ্ঞাতনামা জার্মান কবি আগেই এ সব প্রাচীন কাহিনী 'নাইবেলুঙগেন কথা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। জার্মানরা এ বইখানিকে পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে আজও পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। রিচার্ড ওয়াগনার এই গ্রন্থে গ্রথিত কাহিনী অবলম্বনেই তাঁর এই আশ্চর্য গীতিনাট্যখানি রচনা করেছেন। গল্পটি এই—

পৃথিবীর প্রথম ঊষায় দেবদেবীরা শৈলশিখরচুম্বী মেঘমালার মধ্যে আনন্দে অবস্থান করতেন। আর ভূগর্ভের গুহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিকৃত-গঠন বেঁটে বামনেরা কঠিন পরিশ্রম করে প্রচুর স্বর্ণসম্পদ সঞ্চয় করতো, যা কোনও কালে কারুর উপকারে আসতো না। কুৎসিত-দর্শন ভয়াবহ নক্র কুম্ভীর ও অজগর সর্পসমূহ পৃথিবীতে বিচরণ করতো। কিন্তু, সাগর ও স্রোতস্বিনীতে রূপসী জলপরীরা খেলা করতো। রাইন নদীর গভীর অতলে যে সুদর্শনা কন্যারা বসবাস করতেন তাঁদের বলা হত 'রাইন-নন্দিনীর দল।' এঁরা সারাদিন অবাধ উল্লাসে হেসে খেলে বেড়াতেন। তাঁদের উপর একটিমাত্র কাজের ভার ছিল, সে শুধু তাঁদের পিতার রেখে-যাওয়া রাইনের স্বর্ণভাণ্ডার পাহারা দেওয়া। এ সুবর্ণ ভাণ্ডার অমূল্য বলে দিবারাত্র পাহারার প্রয়োজন ছিল।

নিবেলুঙদের মধ্যে আল্‌বেরিক নামে এক বামনস্বর্ণ সঞ্চয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে একদা রাইন নদীর তীরে এসে উপস্থিত হল। তার কর্কশ ও বিকট কণ্ঠস্বরে রাইননন্দিনীরা চমকে উঠে চেয়ে দেখে এক অদ্ভুত কৃষ্ণকায় বেঁটে লোক একদৃষ্টে তাদের উদ্দাম নৃত্যলীলা নিরীক্ষণ করছে। রাইন-নন্দিনীরা তাকে দেখে ভারি আমোদ অনুভব করতে লাগলো। তাকে হাতছানি দিয়ে ইসারা করে কাছে ডাকলে। বললে, এস বাচ্ছা মানুষটি! আমাদের সঙ্গে তুমি লুকোচুরি খেলবে এসো। তোমাকে আমাদের বড় ভাল লেগেছে!'

আল্‌বেরিক প্রথমটা তাদের দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তাদের অসামান্য রূপ যৌবন ও প্রাণচঞ্চল লাস্যলীলায় মুগ্ধ হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছিল। এমন সময় সহসা প্রভাত সূর্যের কনক কিরণে রাইনের স্বর্ণ সম্পদ ঝলমল করে উঠলো। সেই দীর্ঘসঞ্চিত সুবর্ণরাশি রবি করস্পর্শে যেন বিপুল এক অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। সেই স্বর্ণ পিণ্ড থেকে যেন অসংখ্য আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হতে লাগলো। আলবেরিক সভয় বিস্ময়ে রাইননন্দিনীদের প্রশ্ন করলে, ওই যে গলা আগুনের মতো বিশাল ও উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ দেখতে পাচ্ছি ওখানে-ওগুলো কি? খেলায় উন্মত্ত চপল রাইনবালারা ভুলে আল্‌বেরিককে তাদের পিতার রেখে যাওয়া দীর্ঘসঞ্চিত বিপুল সুবর্ণ ভাণ্ডারের সব খবরই বলে ফেললে। বলে ফেললে, যে লোক এই সোনা নিয়ে গিয়ে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী গড়তে পারবে সে ঐন্দ্রজালিক জাদুবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করবে। দৈব বলে বলী হবে।

আলবেরিক না এই কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ একলাফে গিয়ে পড়লো সেই স্বর্ণ স্তূপের ওপর।। রাইনবালারা তাকে বাধা দেবার আগেই সে নিমেষের মধ্যে একখামচা সোনা তুলে নিয়ে পাহাড়ের চূড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল!

এই সময় স্বর্গে দেবরাজ 'ওটান' এক বিরাট ইন্দ্রপুরী নির্মাণ করতে চাইলেন।। সেই প্রাসাদের নাম রাখা হবে 'ওয়ালহাল্লা!' দুই বিপুলকায় দৈত্য এসে বললে, "দেবরাজ! আমরা একরাত্রের মধ্যেই এই সমস্ত পাহাড় পর্বত উড়িয়ে দিয়ে এক বিশাল ইন্দ্রপুরী গড়ে দিতে পারি যদি আপনি আমাদের পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা স্বরূপ আপনার

অপরূপ রূপসী ভগ্নী ফ্রাইয়ার সঙ্গে আমাদের বিবাহ দেন।" ফ্রাইয়া সত্যই ছিল সৌন্দর্যের রাণী! শুধু তাই নয়, স্বর্গে সেই ছিল রূপ-যৌবনের অধিশ্বরী। তারই অনুগ্রহে পৃথিবী হয়ে ওঠে প্রতি ঋতুতে তরুণ ও সবুজ।

দেবরাজ ওটান একরাত্রের মধ্যে ইন্দ্রপুরী তুল্য দেবপ্রাসাদ পাবার লোভে দৈত্যদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। দৈত্যরাও রাত্রি শেষ হবার আগেই বিরাট এক স্বর্গ সৌধ নির্মাণ করে ফেললে। দেবরাজ সে প্রাসাদ দেখে খুশী হয়ে ভগ্নী ফ্রাইয়াকে দৈত্যদের হাতে সম্প্রদান করলেন। সেই প্রাসাদের নাম রাখা হল—ওয়ালহাল্লা। একদিন শুভক্ষণে সর্বদেব পরিবৃত হয়ে দেবরাজ 'ওটান' ওয়ালহাল্লা প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে খবর এল যে আলবেরিক নামে একটা বিটলে বামন নাকি রাইনের সোনা চুরি করে নিয়ে গিয়ে এমন এক ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরী নির্মাণ করেছে যার শক্তি প্রভাবে সে শুধু বামনরাজ্যেই রাজা হয়ে বসেনি। স্বর্গ মর্ত পাতাল জয় করে ত্রিলোকের অধিপতি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

ওটানের দুই দৈত্য ভগ্নীপতির কানেও খবরটা পৌঁচেছিল। তারা এসে ওটানকে বললে, দেবরাজ! তোমার ভগ্নীকে আমরা ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি, যদি তুমি ঐ বামনের যাদু আংটিটা আমাদের যোগাড় করে দিতে পারো। দেবতার মেয়ে নিয়ে আমাদের দৈত্যের ঘরে রাখা পোষাচ্ছে না!

ওটান ইতিমধ্যেই আলবেরিকের কথা ভাবছিলেন। বেঁটে বামনটা স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেবে বলেছে। তাছাড়া, দৈত্যের হাতে ভগ্নী ফ্রাইয়াকে দিয়ে পর্যন্ত তাঁর মনে সুখ ছিল না। বোনটির কথা ভেবে মনে কষ্ট হ'ত। দৈত্যের প্রস্তাবে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক বামনকে পরাস্ত করে সেই রাইন সোনার যাদু আংটি আর মোহিনী স্বর্ণমুকুট তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন। দেবরাজেরও লোভ হচ্ছিল জিনিস দুটো নিজের কাছেই রাখবার কিন্তু, ফ্রাইয়া বোনটির বিষণ্ণ মুখখানি মনে পড়তেই তিনি দৈত্যদের ডেকে পাঠিয়ে সেই আংটি ও মুকুট দিয়ে দিলেন এবং ফ্রাইয়াকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

দৈত্যরা মহা আনন্দে জাদু আংটি আর মোহিনী মুকুট নিয়ে চলে গেল। তারা ভাবলে—আর ভয় কি! এইবার স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন জয় করবো। ওটানের 'ওয়ালহাল্লা' প্রাসাদও দখল করবো। ফ্রীয়াকে ফিরিয়ে আনবো। কিন্তু তারা জানতো না যে এই যাদু আংটি আর মোহিনী মুকুট যে রাইনের সোনায় তৈরি হয়েছে সে সোনা হ'ল অভিশপ্ত সুবর্ণ। এ সোনা যার কাছে যাবে তারই সর্বনাশ এবং বিপদ হবে। দুই দৈত্য ভ্রাতারও সেই দুর্দশা হ'ল। আংটি ও মুকুট নিয়ে যাবামাত্র বেধে গেল তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি। এক ভাই আর এক ভাইকে এই আংটি আর মুকুটের লোভে মেরেই ফেললে! দেবরাজ ওটান সংবাদ পেয়ে বুঝলেন ও আংটি আর মুকুট রাখা নিরাপদ নয়। দেবতারাও বিপন্ন হ'য়ে পড়তে পারে। সুতরাং, ও অভিশপ্ত আংটি ও মুকুট রাইনবালাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ওটান চললেন এ আর্দার কাছে। এ আর্দা ছিলেন পৃথিবীর অন্তরাত্মার অধিশ্বরী দেবী। তিনিও পরামর্শ দিলেন—রাইনের সোনা রাইনকেই সমর্পণ করে এস। তখন, ওটান চললেন রাইননন্দিনীদের স্বর্ণকিরীট ও স্বর্ণাঙ্গুরী প্রত্যর্পণ করতে।

দীর্ঘকাল পরে তিনি স্বর্গে ফিরে এলেন। এবার তাঁর সঙ্গে এল একদল সমরকুশলা নারী! যাদের 'রণচণ্ডীও' বলা চলে। নাম এদের 'ভাল্‌কাইরী' অর্থাৎ বীরানুরাগিণী। এদের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল যে, সারা পৃথিবী এরা অশ্বপৃষ্ঠে অনুসন্ধান করে ঘুরে বেড়াবে এবং যেখানে যেখানে দেখবে দুর্দ্ধর্ষ বীর যোদ্ধা সম্মুখ সমরে সাহস ও বীর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্বর্গের এই ওয়ালহাল্লা প্রাসাদে এনে স্থান দেবে। তারাই হবে ওয়ালহাল্লার প্রাসাদরক্ষী বীর।

এই বীরানুরাগিণী রমণীগণের মধ্যে 'ব্রুন্‌হাইল্‌দে নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। এখন, ফাফ্‌নার নামে যে দৈত্যের হাত দিয়ে ওটান রাইনের মেয়েদের কাছে তাদের সোনা ফেরত পাঠিয়েছিলেন পথে যেতে যেতে তার এই সোনার টোপর আর আংটি নেবার ভীষণ লোভ হল। সে করলে কি, এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে একটি দুরারোহ পর্বতগুহায় প্রবেশ করে সেই স্বর্ণমুকুট আর দৈব অঙ্গুরী রাখলে। তারপর নিজে সে ওই দৈব-অঙ্গুরীয় প্রভাবে এক বিরাট অজগর সাপের রূপ ধরে দিবারাত্র সেই গুহার মুখে পাহারা দিতে শুরু করলে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। রাইন নদী বেয়ে কত জলের ঢেউ সোনার কমল ভাসিয়ে চলেছে। দৈত্যদূত ফাফ্‌নার আর ফিরলো না দেখে দেবরাজ ওটান ব্যস্ত হয়ে তার খবর নিয়ে জানলেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। তখন দেবরাজ তাঁর পুত্র বীর যুবক সিগ্‌মুন্দ্‌কে পাঠালেন সেই অজগররূপী দৈত্যকে বিনাশ করে স্বর্ণমুকুট ও অঙ্গুরী উদ্ধার করে রাইন-বালাদের ফিরে দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু সিগ্‌মুন্দ পথে যেতে যেতে দেখতে পেলে 'সীগ্‌লীন্দ্‌' নামে একটি সুন্দরী তরুণীকে একজন বন্য শিকারী অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সিগ্‌মুন্দ সেই তরুণী বন্দিনীকে শিকারীর হাত থেকে উদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু নিজে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে গেলেন। সিগ্‌মুন্দ্‌ আর স্বর্গে ফিরলেন না। অরণ্যের বাইরে পালিয়ে গিয়ে এক মনোরম স্থানে ধরার মেয়েকে নিয়ে আনন্দে রইলেন। ওটান তখন নিরুপায় হয়ে সিগ্‌মুন্দ্‌কে শাস্তি দেবার জন্য বীরনারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী ব্রুন্‌হাইল্‌দেকে পাঠালেন সিগ্‌মুন্দ্‌কে ভুলিয়ে তার শত্রুশিবিরে ধরিয়ে দিয়ে আসবার জন্য, কেননা সিগ্‌মুন্দ্‌কে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার পর থেকে বনের শিকারীর দল তাকে ধরে মারবার জন্য চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ব্রুন্‌হাইল্‌দে কিন্তু সিগ্‌মুন্দের রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে দেবরাজের আদেশ অমান্য করে সিগ্‌মুন্দের প্রেমে বিভোর হয়ে রইল। ওটান এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি পুত্রকে বধ করে ব্রুন্‌হাইদেকে এক নির্জন ও দুরারোহ পর্বতশিখরে নির্বাসিত করে দিলেন। তার শাস্তি হল সেই পাহাড় চূড়োয় সে অজ্ঞান হয়ে অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাক্‌বে।

যতদিন না কোন পর্বতারোহী পথিক এসে তাকে জাগায় ততদিন সে অচেতনে ঘুমোবে। কিন্তু, যে পথিকই প্রথম সেখানে এসে তাকে জাগাবে ব্রুন্‌হাইলদেকে হতে হবে তারই দাসী! ব্রুন্‌হাইলদে যে শৈলশৃঙ্গে নিদ্রিত হয়ে রইল ওটান সেটিকে কণ্টকতরুতে ভরে দিলেন এবং নিদ্রিতা ব্রান্‌হাইলদের চারপাশে এমন এক অহরহ প্রজ্জ্বলিত ভীষণ আগুনের বেড়া দিয়ে রাখলেন যে অত্যন্ত দুঃসাহসী বীর ছাড়া আর কেউ সেখানে কখনো পৌঁছতে পারবে না।

এখন হ'ল কি, সিগ্‌মুন্দের একটি ছেলে ছিল, তার নাম সিগ্‌ফ্রেড। সেএখন এক দুঃসাহসী দুর্দ্ধর্ষ যুবক-বীর হয়ে উঠেছে। সে কেমন করে ঘুরতে ঘুরতে দৈবক্রমে একদিন সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে প্রথমেই সেই অজগর সাপটাকে মেরে সোনার মুকুট আর আংটি হস্তগত করলে—আর সেই দৈব অঙ্গুরীর ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অনল গণ্ডির ভিতর থেকে ঘুমন্ত সুন্দরী ব্রুন্‌হাইলদেকে উদ্ধার করলে। ব্রুন্‌হাইলদে স্বর্গের মায়া ত্যাগ করে সিগ্‌ফ্রেডের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীতেই পরমানন্দে বাস করতে লাগলো। সিগ্‌ফ্রেডকেই সে বিবাহ করবে বললে। সিগ্‌ফ্রেড একদিন কথায় কথায় রাইন সোনার তৈরি মুকুট ও অভিশপ্ত দৈব আংটির গল্প তাকে শোনালে। ব্রুনহাইলদে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল সিগ্‌ফ্রেডের বীরত্ব ও সাহস দেখে। কিন্তু, কিছুকাল পরে বীরের মন উতলা হয়ে উঠলো দুঃসাহসিক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার জন্য। সিগ্‌ফ্রেড সেই দৈব আংটিটি ব্রুনহাইলদেকে উপহার দিয়ে তাকে আবার পাহাড় চূড়োয় ঘুম পাড়িয়ে আগুনের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখে, কেবল সোনার টোপরটি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এইখানে 'নিবেলুঙ্গদের স্বর্ণাঙ্গুরী' গীতিনাট্যের প্রস্তাবনা শেষ হয়েছে। তারপর প্রকৃত নাটক শুরু হবে। (ক্রমশঃ)

গান্ধী-গীতায় কর্ম্মযোগ ও দারিদ্র্য-মীমাংসা

শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়

চিন্তার চিরন্তন স্পর্শে অতীতের অনাদৃত আচ্ছন্ন দিনগুলি আবৃত হয়,—বর্ত্তমানেই যে তাহার আবর্ত্তন ধূপের শেষে গন্ধের মতই সে বর্ত্তমানকে মুগ্ধ করে। একই নিয়মে বর্ত্তমানের ভোগের জন্য অতীতের ত্যাগ ও বর্ত্তমানের বক্ষ হইতেই ভবিষ্যতের চয়ন।

দুঃখের সামান্য ভ্রূকুটিতেই আমরা জগতের উপর দোষারোপ করি—তাহার ত' কোন পরিবর্ত্তন নাই। এ অস্বাভাবিকের জন্য দায়ী তুমি। জীবনের বিভিন্ন বর্ণের ছায়াপাতের মাঝে হয়ত কয়েকটী চমকপ্রদ বর্ণ এক চমকেই বিবর্ণ হইয়া যায় এবং সেই বিবর্ণদেখেই আমাদের মনের সুর ব্যথিত হইয়া উঠে—সেই জন্যই স্থায়ী বর্ণের এত অবহেলা, এত মূল্য কম। মোহপ্রবণ অস্থায়ী দিকের প্রতি আমাদের অধিকতর আকর্ষণ। স্থায়ীদিকেই মানুষের স্বাভাবিক ও অস্থায়ীদিকেই তাহার অস্বাভাবিক মোহ। কথাগুলি দার্শনিকের নীরস উক্তির মত শ্রুতিকটু হইতেছে অতএব এইখানেই একটী গল্প বলিয়া রস পরিবর্ত্তন করিব।

এক ধনী তাঁহার মধ্যবিত্ত বন্ধুর সহিত সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদের রসভঙ্গ করিল। ধনী বিরক্ত হইলেন, তিনি ভিক্ষুকের প্রতি সন্দেহ-কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "পেশাদার ভিক্ষুককে আমি ভিক্ষা দিই না, কাজ ক'রে খাও।"

আপন উক্তিতে প্রীত হইয়া ধনী দৃঢ়পদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শোনা যায় কত দেবমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে এই ধনী নাকি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এত পূর্ণকীর্ত্তি সে অঞ্চলে আর কাহারও ছিল না।

মধ্যবিত্ত ভিক্ষুককে একটী পয়সা দিলেন। তাঁহার নীরব দান ভিক্ষুকের ললাট স্পর্শ করিল।

মৃত্যুর পর ধনী ও মধ্যবিত্তের আত্মা ধর্ম্মরাজের নিকট বিচারার্থে নীত হইলেন। সেথা দুইজনেরই পাপপুণ্যের হিসাব করা হইল। মধ্যবিত্ত অপেক্ষা ধনীর জ্যোতিটা কিছু ম্লান দেখা গেল।

চিত্রগুপ্ত ঘন ঘন তাঁহার খাতা উল্টাইলেন। দেবগণ পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রগুপ্তের পাশেই ছিলেন বৃহস্পতি, তিনিও হিসাব লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন এই যে! ধনীর কার্য্যের ফল অনেকটা মর্ত্তেই মিটে গিয়েছে এবং তাতেই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে! এই যে! মধ্যবিত্তের হিসাবে ভিক্ষুকের জমা দেওয়া পয়সাটী উজ্জ্বল হ'য়ে র'য়েছে।"

কর্ত্তব্যের তাড়নায় কর্ম্ম-কঠোর বর্ম্ম ধারণ করে কিন্তু, ভাবটি তাহার অতি কোমল।

মনুষ্যত্বের পরম উপাদান জ্ঞান ও কর্ম্ম, কিন্তু প্রমাদ ও কর্ম্মচ্যুতির দুর্দ্দিনে মনুষ্যত্বই যে আত্মহারা স্তূপীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় ইন্দ্রিয় ধর্ম্মের চূড়ান্ত, কিন্তু তথাপি মনুষ্য-জগত চকিত নহে। ভারতের ঘরে ঘরেও সে ধর্ম্ম জটিল হইয়া তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। স্বার্থান্ধ সমাজ দরিদ্রের ভারাবনত মস্তকে গুরুভার অর্পণ করিয়া স্বীয় স্বার্থকেই সার্থক দেখিতে চায়, কিন্তু এত বড় অযোগ্যতায় সমর্থন করিয়া সমাজ যে শিথিল হইয়া পড়িল এবং উহারই অনাচারে ভারতের পথে পথে কেবল ভিক্ষাপাত্রের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইল। ইহার প্রতিকার করিবে কে?

অযোগ্যতাকে যোগ্যতায় পরিণত করিতে হইবে, অবস্থায় পার্থক্য নিরোধ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন "অনর্থক অধিকার যে অপহরণেরই সমান, তোমার সঞ্চয়ে যে বহু দুঃখের বন্ধন।" আমরা

কথায় বলি "নিত্য আনি নিত্য খাই" কিন্তু ভাবটি তাহার কতদূর স্থায়ী। নিত্যের নাম লইয়া যাহা আসে তাহাই স্থায়ী, তাহাই আমাদের উপযুক্ত আবশ্যক। ইহার পরেই যে অনিত্যের গণ্ডি সেইটাই অতিরিক্ত, অস্থায়ী ও অর্থহীন। অনেকেই বলিলেন এই অতিরিক্তটাও ত স্থায়ী হয়, কিন্তু আমরা দেখি যে কেবল মনুষ্যত্বের বিভক্তির পথে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতায় তাহার স্থায়িত্ব। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

কৃপণ তাহার অস্থিসার জীর্ণহস্তে ধনভাণ্ডার রক্ষা করিতেছে। তাহার আরাধ্য সঞ্চয় লইয়া সে সশঙ্কিত,—আপন মনের সঙ্কীর্ণতায় সে বাহিরের দুঃখকেও দেখিতে ভয় পায়। কি তীব্র আসক্তি। তাহার যক্ষধনের বিনিময়ে সে সামান্য স্বস্তির জন্য লালায়িত, কিন্তু জানাইবার সাহস নাই। ইহারই পার্শ্বে অভাবসঙ্কুল গৃহস্থ পার্থক্যের অসন্তোষে যেন মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। এ অসন্তোষ কখনও স্থির থাকে না। যেমন করিয়াই হোক পার্থক্যকে হঠাতে চায়। তাহার ত অপরাধ নাই, সে ত আত্মার চিরন্তন সাম্যের অনুকরণ করিতে বাধ্য।

ধনীর দিক দিয়া এই বিচারটা করিয়া দেখিব। তাহার অতিরিক্তটা তাহাকে উত্যক্ত করিয়া মারিল। অতিরিক্তটাকে শীঘ্র বিদায় না করিতে পারিলে সে অপব্যবহারের পথ কাটিয়া লইবে এবং কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে তাহার জীবন বিড়ম্বিত হইবে। দুই দিকেই অশান্তি। এ অশান্তির মীমাংসায় একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক।

প্রকৃতির প্রত্যেক পত্র সঞ্চালনে দান প্রতিদান চলিয়াছে, সেথায় ত' বঞ্চনা নাই। যেটা স্বাভাবিক সেটা কি বাস্তব নয়? এইবার তোমার ক্ষুদ্র সম্পদের সহিত প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্যের তুলনা কর। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কত মূল্য দিলে তটিনীর এক অঞ্জলি নির্ম্মল জল পাইবে? কিন্তু যখন পাওয়া যায় তখন অযাচিতভাবেই পাওয়া যায়। প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্যের দান কিন্তু তোমায় দুই মুষ্টি সম্পদের কার্পণ্য,—তোমার সম্পদের যে কোন সত্তাই নাই।

অভাবের কখনও শেষ হয় না। দান যত প্রশস্ত হইবে অভাবের অভিযোগও বৃদ্ধি পাইবে,—তাহা হইলে যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসে তাহা ব্যতীত অতিরিক্তের সাধ হয় কেন? একথা ধনী ও দরিদ্র দুই জনকেই বলিতে পারা যায়। অভাবের শান্তি দানে বটে, কিন্তু এই দানই আবার অভাবের নূতন করিয়া ইন্ধন যোগায়। বস্তুতঃ অভাব মিটিলেই আসক্তি আসিয়া পড়ে ও অভাবের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে। অতএব "ত্যাগাচ্ছান্তি অনন্তরম্"। এই ত্যাগটাই মাত্র সত্যকে ছাড়পত্র দিয়া মিথ্যার গতিরোধ করে। সত্য অভাবটুকু আসক্তিতে মিথ্যা হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী বলেন "এইরূপ সত্যটাকেই অবলম্বন করিতে হইবে।" সত্যের দ্বিধাশূন্য সরল মূর্ত্তি এবং সত্যই তাহার পরিণতি। অগ্নি কাষ্ঠখণ্ডকে দগ্ধ করিতে করিতে দাউ দাউ করিয়া তাহার সত্য প্রকাশ করিল। অস্বাভাবিকের দূরত্ব ছাড়িয়া নিকটে আসিলেই সত্য সফল হইবে। এই সত্যের কথায় একটা মীমাংসা হইবে। জননী তোমায় স্তন্যপান করাইয়াছেন তাহা সত্য নহে কি? এই ব্যবস্থা স্বাভাবিক নহে কি? কিন্তু ইহাতে জননীর স্বার্থ কি? তাহার এই নিঃস্বার্থ দান ব্যতীত তোমার অস্তিত্ব কোথায়? জননী দেখিলেন কর্ত্তব্য, পুত্র দেখিল নিঃস্বার্থ দান, আমরা বলিব সত্যের নিয়ম। আপনার প্রাণধারণের সহিত অপর প্রাণের ব্যবস্থা করিতে হয়। দীপশলাকা প্রজ্বলিত হইয়া কেবল আপনিই উজ্জ্বল হয় না সকলকেই আলোকিত করে। তাহা হইলে মানিতে হইল সত্যই আসক্তির গতিরোধ করে, কিন্তু তাহার দমন হয় কিরূপে—

"কার্য্যমিত্যের যৎ কর্ম্ম নিয়তম ক্রিয়তেঽর্জ্জন।
সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফল, চৈব সত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ॥"

কর্ম্ম হইতে আসক্তি দোষটা দূরে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কারণ ফলকে নির্ভর করিয়াই যত আসক্তি। অনাসক্ত মনটী হইবে যেন নলিনীদলগত জলের মত নির্ম্মল, পত্রের উপরই সে চপল হইয়া বেড়ায় কিন্তু পত্রের উপর তাহার আসক্তি নাই।

একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—আসক্তি ভিন্ন কর্ম্ম সম্ভব হয় কিরূপে? মুখে হয়ত বলিব, স্বচ্ছন্দ কিন্তু কার্য্যতঃ কারণাভাব হইয়া পড়ে। সেই জন্য একটা পৃথক ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে। কথাটা অন্যদিক দিয়া বুঝিয়া দেখিব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়পরাজয়ের সমষ্টি লইয়াই জীবন। কিন্তু তাহারই মাঝে একটা পরাজয় প্রবল হইয়া জয়ের সমষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়, তখন পরোক্ষভাবে নিজের অসহায় অবস্থার অনুমোদনে অপর এক শক্তিকে মানিয়া লই। বস্তুতঃ ইহা মানিয়া লওয়া হয় ইহাই আমাদের সংস্কার, কারণ যতক্ষণ মনের পূর্ণতা না ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পরাধীন এবং সেই জন্যই বলা যায়—কৈঙ্কর্য্যই মনুষ্যত্বের চরম পথ ও তাহাই ত্যাগের বিভূতি। অমন নৈকট্য বোধ হয় অন্য সম্পর্কে সম্ভব হয় না, ইহার বিপরীতে একটা প্রমাদ আছে এবং তাহারই ক্রোড়ে অহঙ্কারের জন্ম। অধিকার নাই অথচ অহঙ্কার! মন্দ মোহ নয়। একদিন সত্য পথে এই প্রবীণ অহঙ্কারটা লাঞ্ছিত হইবেই। সেই শেষ নির্য্যাতন বড়ই কঠোর। অতএব বিবেক তাহার সূচনা গাহিয়া চলুক না কেন? "অহং কর্ত্তা" যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী—তাহা হইলে বুঝা গেল অনাসক্ত "নৈষ্কর্ম্মের" পথেই ত্যাগের বোধন।

এই ত গেল এক দিককার বিচার। অপর দিককার বিচারে যে ব্যবহারিক যুক্তি আসে তাহাই আলোচনা করিব। আমাদের সামাজিক বন্ধনের মূলে "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"। ইহাই আত্মার সংস্কার এবং তাহাতেই মিলনের আগ্রহ। কিন্তু বাহ্যভাবে সমাজের গঠন দেখাইল অন্য পথে। ব্যক্তিগত অসহায় অবস্থার নিরোধে সমাজের প্রথম ভিত্তি। ইহাতে পরস্পরের সহানুভূতিতে ব্যক্তিগত ব্যবধানকে ভূমিসাৎ করিয়া একটা সাম্যভাবের তৃপ্তি আনিয়া দেয়। বাহ্যভাবে সমাজের এইরূপ গঠনই বুঝা যায় বটে কিন্তু মনের সেই চিরন্তন আগ্রহবশেই ইহা ঘটে। এই মূলকথা লইয়া কত যুগের কত নীতিই প্রচলিত হইল, তবে কিসের এত অভিযোগ। আভিজাত্যের রজত রচিত জীবনে হয়ত কথাটা অসহ্য হইয়া উঠিবে। কুবেরের অপোগণ্ড অপ্সরাবাঞ্ছিত পথে তাহার সর্ব্বস্ব অপচয় করিয়া দুর্ভিক্ষের মাঝে দারিদ্র্যকে আরও উপাদেয় করিয়া দিবে। বিশ্ব নিয়মে এতটা অনাচার সহিবে না। "ময়ি চানন্য যোগেন" বলিয়া জগতে প্রেমের চিদঘনস্রোত বহিতেছে। তাহাত বিফল হইতে পারে না। পার্থক্য যে কষ্ট-কল্পনা।

নিরর্থক ভাবের সৃষ্টি এই অনধিকার অধিকারে। সেই গুপ্ত সঞ্চয় সৎ পথেই হোক বা অসৎ পথেই হোক একদিন জাগিয়া উঠিবে ও চঞ্চলতার মত আপনাকে বিলাইয়া দিবে।—যাহাদের প্রাপ্য অভাবেই তাহাদের আত্মনিবেদন। প্রত্যক্ষে তাহারা পাইল না পরোক্ষে তাহারা লইবেই। এই পরোক্ষ পথটা যখন সরল হইয়া উঠিবে তখন অতিরিক্তকে ছাড়িয়া তাহারা যে রিক্তকেই রিক্ত করিয়া বসিবে। পূর্ব্বের কথায় বলি অনাসক্ত কৈঙ্কর্য্যের ভার লইয়া সাম্যের প্রীতিতে হয়ত শক্তির অনাচার না হইতেও পারে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

এইবার জ্ঞান ও কর্ম্মকেই মিলাইয়া লইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী সেই কথাই উপদেশ দিয়াছেন। কারণ অনাসক্ত কৈঙ্কর্য্য ভাব ইঁহাদেরই উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে কতটা উপযুক্ত হওয়া যায় তাহাই বিচার করিব।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

প্রাচীন ভারতে আর্য্যনারী

চিত্রিতা দেবী

প্রাচীন ভারত বলতে কি বুঝি ? সে ভারতবর্ষ কোথায় ছিল ? কখন ছিল ? কোন দেশের সীমানায়, কোন কালের প্রান্তে তার অবস্থান। কোন শতাব্দী কোন সহস্রাব্দীর পারে—কে জানে। ভারতবর্ষ কোনদিন সন তারিখ মিলিয়ে তার ইতিহাস লিখে রাখে নি। তবু ইতিহাস গড়ে উঠেছে, ভারতের জল-মাটি-বাতাস, তার আর্য্য অনার্য্য দ্রাবিড়কে নিয়ে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে অতি আশ্চর্য্য অতি-বিচিত্র এক ইতিহাসের ধারা রচনা করে চলেছে। আজো তার শেষ হয় নি। কাল কোথাও থেমে থাকে নি। অনেক সময় দূরে তাকিয়ে মনে হয়েছে, বুঝি ওইখানে কালের চক্র থেমে গেছে; বুঝি ওইখানে নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সূর্য্যের অভ্যুদয় একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্য নয়। রাত্রি তার যথাকালে শেষ হয়, সূর্য্যও যথাকালে উদয় হন। শুধু মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা থাকে, বলে আমরা দেখতে পাই না। ভারতের ইতিহাসে এমনি কত সূর্য্যের উদয়াস্ত ঘটল। কত সহস্র যুগ-ধরে, ভালো মন্দ, আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব দোলায় দুলিয়ে জন্ম মরণ প্রলয় সৃজনের তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত করতে করতে ভারত-ভাগ্যবিধাতা কোন পথে, কোন মহৎ উদ্দেশের অভিমুখে আজো ভারতের ইতিহাসকে চালনা করছেন কে জানে।

এ শুধু মানুষের ইতিহাস নয়, মাটিরও ইতিহাস। আর্য্য উপনিবেশের প্রথম দিকে ভারতবর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল আর্য্যাবর্তের দূরতম প্রান্তে, মদ্র গান্ধার কাবুল তক্ষশিলার বেষ্টনীর মধ্যে। ক্রমে সে বিস্তীর্ণ হয়ে সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। গড়ে উঠল কাশী কোশল অযোধ্যা, গড়ে উঠল মৎস্য পাঞ্চাল ইন্দ্রপ্রস্থ। মানুষের চিত্ত জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ আপন মাটীর সীমানা বাড়িয়ে দিল। আর্য্যরা আসবার আগে, গভীর গহন অরণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষ কোন্ জাতির মাতৃভূমি ছিল কে জানে। তাদের সভ্যতা, তাদের গ্রাম নগর ও নগর-ব্যবস্থা, তাদের সমাজের ইতিহাস, কাল তার গোপন খাতার কোন্ পাতায় যে টুকে রেখেছে, আজো তার সন্ধান মেলে নি। মাটির আঁচল সরিয়ে তাদের বাসভূমির নিশানা মিললেও তাদের মনের খবর আমরা পাই নি, তাদের লেখা আজো আমাদের কানে এসে পৌঁছয় নি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-সাধকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় আজ ইতিহাসের গোড়াটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় অন্তত সেই কালে, যে কালে আর্য্যরা ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদীতীরে আশ্রম রচনা করে বসেছেন।

আর্য্যরা এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন আলো এল,—শুধু তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির আলো নয়, শুধু তাদের জ্ঞান ও রূপের আলো নয়। ইতিহাসের আলো। ওরা কোথা থেকে এল সে তর্কের সময় নেই এই ছোট নিবন্ধে, শুধু এইটুকুই যথেষ্ট যে, ওরা সঙ্গে নিয়ে এল বেদ। আজকের দিনের ইয়োরোপ ও এশিয়ার সমস্ত আর্য্য ভাষাভাষীদের প্রাচীনতম গ্রন্থ, বেদ—যার মধ্যে আদিম আর্য্য তার প্রথম প্রাণবার্তা প্রচার করেছে।

বেদরচয়িতারা কিন্তু জন্মবেদে। পৃথিবীতে তাদের সবচেয়ে বড় দান আর্য্যভাষাকে সঙ্গে নিয়ে, পশুপাল সাথে, তাঁরা এদেশ থেকে ওদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। ইয়োরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশগুলি তাঁদের পায়ের নীচে সরে সরে পথ করে দিল। তাঁরা তাদের অন্যতম প্রাচীন আবিষ্কারে ঘোড়ায়-টানা রথে (পণ্ডিতেরা বলেন, তার আগে ঘোড়ার ব্যবহার মানুষের জানা ছিল না) তাদের তৈজসপত্র, তুলে নিয়ে, কাঁধে তীর-ধনুক, কণ্ঠে বেদমন্ত্র, আর হৃদয়ে প্রকৃতির অমোঘ শক্তির প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন দিকে বিশ্বপরিক্রমা করতে করতে একদা পঞ্চনদের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন তাঁদের পাশে ছিল নারী। পরিব্রাজক আর্য্যের পূজা ছিল খোলা আকাশের নীচে। বেদী রচনা করে তাঁরা বিশেষ নিয়মে কুণ্ড গেঁথে আগুন জ্বালতেন (শব্দ ভাষায় যার নাম অগ্নি, আর ল্যাটিনে যিনি ইগ্নিস্) সে আগুনে হবি ও লাজ আহুতি দিয়ে, তিন স্বরগ্রামে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁরা পূজা করতেন। সেই পূজার নাম যজ্ঞ।

অনেক মরুভূমি অনেক তুষার পর্বত পার হয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন তাদের শিয়রে অভ্রংলিহ হিমালয়ের তুষার কিরীট, মধ্যভাগে পঞ্চনদীর কলকল ধ্বনি। তাঁদের চারিপাশে ধরিত্রী শস্য-শ্যামলা। বনে বনে পত্রমর্মর, আর পাখীর ডাক, আর ক্লান্তিহরা স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ। এই অপার্থিব পরিবেশে আর্য্যচিত্তের চরম কবিত্ব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাঁরা তাদের টুকরো টুকরো ছন্দ কাটি খণ্ডিত মন্ত্রের সঙ্গে আরো অজস্র মুক্তাবলী সুললিত ছন্দে সুসংবদ্ধ ভাবে সংযোজনা করতে করতে চতুর্বেদ রচনা করলেন। সেই কুসুমিত অরণ্যে বৃক্ষের

মুকুটপরা পাহাড়ের গায়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে, দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে অসীম বিস্ময়ে তাঁরা বলে উঠলেন—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" সেদিন নারী ছিলেন পাশে তাঁদের চিরসঙ্গিনী। নারী ছাড়া তাঁদের কোন যজ্ঞ, কোন ধর্মকার্য্য সুসম্পন্ন হোত না। তাই রামচন্দ্রের সীতাহীন যজ্ঞের অভাব পূরণ করতে প্রয়োজন হোল স্বর্ণসীতার। এমন কি নারীদেহের অনুরূপ করে তাঁরা যজ্ঞবেদী রচনা করতেন।

অনেকে বলেন, "নেতৃ" থেকেই নারীর উৎপত্তি। যিনি নেতৃত্ব করেন, চালনা করেন, তিনিই নারী। পরবর্তী যুগে নারী-নিন্দাকারীরা বল্লেন, না নিঋতি থেকে নারীর উদ্ভব।—ঋতি ধর্মবিবর্জিতা নারী।

আশ্চর্য্য এই যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সব সমাজেই নারীকে খানিকটা অবহেলা দেখান হয়েছে। অথচ নারীই সমাজের প্রাণ। সমাজ সৃষ্টির মূলে রয়েছে গৃহ এবং গৃহ সৃষ্টির মূলে রয়েছে নারী। নারী যদি নারীমনোবৃত্তিশালিনী না হোতেন তাহলে যাযাবর মানুষ কোনদিন ঘর বাঁধতে পারত না। বস্তুত যে মানুষের জীবনে মাতা, পত্নী, কন্যা বা ভগ্নি কোনরূপেই নারীর ভালোবাসা নেই, সে পুরুষ রাজপ্রাসাদে থেকেও গৃহহীন। মানুষকে রোদ বৃষ্টি থেকে গৃহই বাঁচায় বটে, তবু নারীর হৃদয়েই তার যথার্থ আশ্রয়। জতুগৃহ থেকে উদ্ধার পেয়ে পঞ্চপাণ্ডব যখন মাতৃসঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন, তখন গৃহহীন হয়েও তাঁরা যেন গৃহহারা ছিলেন না। মায়ের ভালোবাসা তাঁদের চারিদিক ঘিরে গৃহের মতই যেন আচ্ছাদন সৃষ্টি করত।

বৈদিকযুগের মানুষের এই তত্ত্বটা জানা ছিল। তাই তাঁরা পত্নীকে বল্লেন অর্দ্ধাঙ্গিনী। তাঁরা জানতেন, নরনারী কেউ এই সৃষ্টিযজ্ঞে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। তাই নরনারী উভয়কে মিলিয়ে তারা কল্পনা করলেন, পূর্ণ মনুষ্যত্বের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। বৃহদারণ্যক বলছেন, —প্রজাপতি নিজের শরীরকে দুই ভাগ করলেন, এবং সেই থেকে পতি-পত্নীর সৃষ্টি হোল।—"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্" প্রজাপতির শরীরের দুইভাগ হোল নর ও নারী। কেউ কারো চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। উভয়ে একসঙ্গে বিধাতার একটী বিশেষ ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে। "যাবন্ন বিন্দতে ভার্য্যা তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান"।— উভয়ের সম্মিলিত হাতে মানববংশ বহনের ভার। এ বংশকে যথার্থ মানবের অক্ষুণ্ণ উত্তরাধিকার দান করতে হলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মিলিত সাধনার প্রয়োজন।

অথচ মনুশাসিত হিন্দুধর্ম একদা নারীর বেদাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। শুধু তাকে শিক্ষা দেয় নি এ নয়, শিক্ষার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিল। কামনা নিজের বুকেপুরে নরকের দ্বার বলে তাকে ঘৃণা করেছিল, বেদপাঠ শুনলে শূদ্রও নারীর দেহ দগ্ধ করা উচিত, এই যাদের মত, তাদেরি পূর্বযুগে, হিন্দুধর্মের সেই শৈশবকালে, আমাদের আর্য্য প্রপিতামহেরা নরনারীর সমানাধিকার উন্নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পুরুষের মতই নারীও মানুষ। মনুষ্যত্বের সকল দিকেই তার পূর্ণ দাবী। আহার বিহার ধর্ম কর্ম প্রেম তপস্যা, ভোগ ত্যাগ, সমস্ত দিকেই সে যুগের নরনারী সমপদক্ষেপে চলেছিল। নারী ঋষি ঘোষা বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া ছিলেন। পতি কামনায় অসঙ্কুচিত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

ঘোষার সূক্তে তখনকার সমাজের আরো একটী বিশেষ দিকের খবর পাওয়া যায়। তাঁর সূক্তে বধ্রিমতী ও বিশপলা এই দুই নারী যোদ্ধার উল্লেখ আছে। যুদ্ধে বধ্রিমতীর হাত কাটা গেলে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সোনার হাত পরিয়ে দেন। বিশপলা হয় নিজে রাণী, কিম্বা রাজার নারীবাহিনীর অন্তর্গত। যুদ্ধে তাঁরও পা কাটা গেলে অশ্বিনীকুমার তাঁকে লৌহজঙ্ঘা দিয়ে চলনশক্তি দান করেন। তবে কি সে যুগের সার্জারিতেও আজকের মতই কৃত্রিম হাত পা লাগাবার, ব্যবস্থা ছিল। আজ আমাদের সৈন্যদলে খাকীকুর্ত্তাপরা নারীবাহিনী দেখে আমরা গর্বভরে মনে করি আধুনিক হচ্ছি, কিন্তু সে যুগের রাজসৈন্যদলেও নারীবাহিনী ছিল, একথার আবিষ্কারে আমাদের মানসিক বল বাড়াতে নিশ্চয় সাহায্য করবে।

তখনকার সমাজ পুরুষের মতই নারীর দোষও সহজে ক্ষমা করতেন। না হলে কুন্তী কখনো মহাসতী বলে গণ্যা হতেন না। সতী অর্থাৎ সত্যে স্থিতা। সীতা সতী। কারণ দুঃখের অগ্নিদহনেও তিনি স্থির অটল। শত প্রলোভনেও তিনি সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। দুঃখের অগ্নিদাহেই সত্যের পরীক্ষা, সতীত্বেরও পরীক্ষা। তাই দ্রৌপদী পঞ্চপতি সত্ত্বেও সতী। পতিদুঃখভার হৃদয়ে বহন করে, রাজনন্দিনী রাজবধূ হয়েও তিনি পথে পথে, বনে বনে ভিখারী স্বামীর ভিখারিণী সঙ্গিনীরূপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, পাণ্ডবেরাও সেই বিপদসঙ্কুল দিনে, তাঁকে কখনো ভার মনে করতেন না। তাঁর সহবাসে পথকষ্ট তাঁদের কাছে আনন্দের ফুল হয়ে ফুটত। সখ্যে, সেবায়, পরামর্শে তিনি ছিলেন তাঁদের পরমবন্ধু।

বৈদিকযুগের পত্নীর আদর্শেই কালিদাস অজপত্নী ইন্দুমতীর চিত্র এঁকেছেন। "গৃহিণী সচিব সখি মিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" তিনি গৃহিণী, তিনি মন্ত্রী, তিনি বন্ধু, ললিতকলায় তিনি প্রিয়শিষ্যা। বিরহী রাম লক্ষ্মণের কাছে সীতার বর্ণনা করছেন, তিনি কেমন—"স্নেহেষু মাতা, করণেষু দাসী, মন্ত্রেষু মন্ত্রী, শয়নেষু রামা, রঙ্গে সখা, লক্ষ্মণ সা প্রিয়ামে"। তিনি মাতার মত স্নেহ করতেন, দাসীর মত কাজ করতেন, মন্ত্রীর মত সুমন্ত্রণা দিতেন, নিশীথে তিনি মনোরমা, সখির মত রঙ্গময়ী, এমনি তিনি প্রিয়া।

বৈদিকযুগের প্রসঙ্গে মহাকাব্যগুলির কথা বার বার বলছি এইজন্যে যে, ওরা বৈদিকযুগেরই অন্তর্গত। মহাভারতকার ব্যাসদেবই হলেন চতুর্বেদের সঙ্কলয়িতা। বেদে আমরা যাঁদের জ্ঞানোদ্দীপ্ত চিত্তের প্রতিফলন দেখতে পাই, মহাভারত রামায়ণে যেন তাঁদেরই জীবনের ছবি। যে বিপুল বিচিত্র সমাজ এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে জীবনযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়েছে, তাদেরি ধর্ম ছিল পুরোপুরি বৈদিক, যজ্ঞই তাঁদের পূজা। এই দুটী কাব্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার যতরকম পথের উল্লেখ আছে, আজকের যুগের নব্য ইয়োরোপও তা বোধহয় ভাবতে সাহস করে না। স্বাধীনতা অবশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা অর্থ মোহবন্ধ থেকে মুক্তি। আচার বিচার ও মিথ্যা লজ্জার হাত থেকে মুক্তি। ভীত

আর্তকণ্ঠের দয়াভিক্ষা তাঁরা জানতেন না। কুণ্ঠিত লজ্জায় ম্রিয়মানা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না—যে বাঙলার ছবি আমাদের মনে আছে, সে যুগের আর্য্যনারীরা ঠিক তেমনি ছিলেন না। সেই বীরত্বই তাদের সতীত্ব। গান্ধারীর সতীত্ব শুধু তাঁর স্বামীর প্রতি নিষ্ঠায় নয়, শুধু অন্ধ স্বামীর সহধর্মিণীত্ব গ্রহণে নয়, সত্যের মধ্যে তাঁর মনুষ্যত্ব ধর্মের একান্ত প্রতিষ্ঠায়। তিনি শুধু সতী-পত্নী নন, সতী-মা—সত্যমা, তাই পুত্রের যথার্থ মঙ্গলকামনা করতে দ্বিধা করেন নি। চরম বিদায় মুহূর্তেও তার সামনে সত্যবাণী ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি। "যতো ধর্ম স্ততো জয়"।

বাল্যবিবাহ সে যুগে প্রচলিত ছিল না। এই তো পণ্ডিত সাধারণের মত। বিবাহের মন্ত্রাবলীতেও তার নিদর্শন, "যদেতদ্ধৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম"। এই মন্ত্রের রচয়িতারা নিশ্চয় আশা করতেন, তাঁদের এ বাণী বরকন্যার হৃদয় স্পর্শ করবে। বিবাহকে বালকবালিকার পুতুল-খেলা মনে করলে কখনোই তারা অকারণে এত শ্রমসাধনা করতেন না! দ্রৌপদী দময়ন্তী ও কাশীরাজ দুহিনদের স্বয়ম্বর, শকুন্তলার গান্ধর্ব-বিবাহ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, সমস্তই যৌবন বিবাহের গতি নির্দেশ করে।

পুরুষের বহুবিবাহ যদিও প্রচলিত ছিল, এমন কি কয়েকজন নারী ঋষি তাঁদের সূক্তাবলীর মধ্যেই সপত্নীবিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন তবু এক বিবাহই যে সমাজের আদর্শ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়েও বিবাহের মন্ত্রাবলী থেকে নির্দেশ পাওয়া যায়। ধর্মে, অর্থে ও কামে আমি কখনো ইহাকে অতিক্রম করিব না। বিবাহকালে বরের এই প্রতিজ্ঞা কি বহু বিবাহপ্রথার মধ্যে একেবারেই মিথ্যা হয়ে যায় না। তাই, আদর্শ মানব রামচন্দ্রের এক পত্নী।

এই তো গেল জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রের কথা। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার ছিল। তবে গুরুগৃহবাস কন্যার পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করলে তাঁরা যতদূর ইচ্ছা বিদ্যাভ্যাস করতে পারতেন। অনেক সময়ে যজ্ঞকর্মেও তাঁরা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করতেন। 'স্রুচ' (অর্থাৎ আহুতি দেবার কাষ্ঠখণ্ড) হস্তে বিশ্ববারা ও শ্রদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষের মতই নারীদেরও যৌবনাগমের পূর্বেই উপনয়ন হোত। এই প্রথা এখনো প্রাচীন ইরানীয়ান অথবা পার্শীজাতের মধ্যে দেখা যায়। পরবর্তী কালে ক্রমে এ প্রথা লোপ পেয়ে গেলেও, বেদপাঠকালে অথবা যজ্ঞকালে নারী তৎকালের জন্য কোমরে দূর্বার উপবীত ধারণ করতেন। অবশ্য মনুর বিধান মতে বিবাহই একমাত্র সংস্কার। অর্থাৎ স্বামীর মনোরঞ্জন ছাড়া স্ত্রীলোকের আর দ্বিতীয় কর্তব্য নাই।

শুধু বেদপাঠেই সে যুগের নারীর জ্ঞানতৃষ্ণা মিটত না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঋকমন্ত্র এবং সূক্তাবলী রচনা করে ঋষি আখ্যা পেয়েছিলেন। ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, গোধা, রোমশা, শচী ও সূর্য্যা প্রভৃতি বহু নারী ঋষির সূক্ত ঋকবেদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এঁদের কবিতায় পার্থিব ভোগসুখের প্রার্থনাই যেন বেশী করে ফুটেছে। এদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন ব্রহ্মবাদিনী বাক। তার অনুভূতি বাইরের সুখসম্পদ কামনার অন্তরালে নিগূঢ় গভীর হৃদয়ের আত্মলোকে আপনাকে বিচিত্র বিশ্বের পরমাশক্তির সঙ্গে এক করে দেখতে পেয়েছিল। বাকের দেবীসূক্ত থেকেই পরবর্তী কালের চণ্ডীর কল্পনা।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামাহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভৌ বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥

ঋগবেদের পুরুষসূক্ত আর অমৃণবল্যা 'বাকে'র এই দেবীসূক্তই উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বীজ স্বরূপ।

উপনিষদোক্ত দুই মহীয়সী নারীর কথা আপনারা সকলেই জানেন। তাঁদের একজন গার্গী, অপরা মৈত্রেয়ী। জনক রাজার আহ্বানে বিশাল ধর্মসভা বসেছে। নানা দিগ্‌দেশাগত পণ্ডিতেরা সভামণ্ডপের চারিদিক ঘিরে বসে আছেন। পাশে অন্য মণ্ডপে স্বর্ণশৃঙ্গমণ্ডিত সহস্র গাভী অপেক্ষা করছে। এই সভায় ধর্মবিচার হবে, যিনি জয়ী হবেন, তার পুরস্কার ঐ গাভীর দল। যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন, শিষ্যকে ডেকে বল্লেন—বৎস, গাভীগুলি ঘরে নিয়ে চল। কারণ এ সভায় আমিই শ্রেষ্ঠ। এত অহঙ্কার! একে একে উঠে দাঁড়ালেন পণ্ডিতেরা। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ হোল। সে সব তর্ক লেখা আছে উপনিষদের শ্লোকে। ইতিমধ্যে উঠলেন ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দুই তীক্ষ্ণ তীরের মত আমি এই দুটী প্রশ্নবাণ নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। যদিও শেষ পর্যন্ত গার্গী পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু একথা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, অন্যান্য পণ্ডিতদের মতই, সেই বিশাল ধর্মসভায় প্রতিবাদিনী নারীকে সকলেই একান্ত সহজে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কেউ তাঁকে বিসদৃশ মনে করেনি।

এই পরম পণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী মৈত্রেয়ী। যাজ্ঞবল্ক মহাধনী, যৌবনে তিনি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি স্থির করলেন, সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থে প্রবেশ করবেন। তাঁর বিশাল ধনসম্পদ দুই স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে যাজ্ঞবল্ক বললেন, এই রইল তোমাদের সব। এখন অনুমতি দাও আমি যাই। মৈত্রেয়ী বললেন—প্রভু এই ধনসম্পদ এই প্রচুর উপকরণরাশি কি আমাকে অমৃতলোকে নিয়ে যেতে পারবে? এদের দ্বারা মৃত্যুবশবর্তিনী আমি কি অমৃতা হতে পারব? যাজ্ঞবল্ক বললেন—"না প্রিয়ে এরা তোমাকে অমৃতা করতে পারবে না, সাধারণ সব ভোগী মানুষদের জীবন যেমন কাটে, তোমারও তেমনি কাটবে। তখন পতিপ্রাণানুবর্তিনী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ থেকে মুক্তিপ্রার্থী মানবের চিরপ্রশ্ন ধ্বনিত হয়ে উঠল। যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহংতেন কুর্য্যাম। সেই প্রশ্ন যুগযুগান্ত ধরে আজও পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত মানুষের চিত্তে কচিৎ কখনো তেমনি আকুল জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই সব উপকরণ দিয়ে আমার কি হবে, যদি এরা না আমায় অমৃত করতে পারে। এই প্রশ্নই পরযুগে ধ্বনিত হয়েছিল বুদ্ধের মনে। মৃত্যু যদি ধ্বংস না হয়, অমৃত না নামে যদি জীবনে, তবে সুখের মূল্য কি?

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী নয়, তাঁর শিষ্যাও বটে। প্রাচীন ভারতের কোন জনপদের কোন তপোবনের ছায়ায় স্বামী স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়ে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিয়ে সত্যগুরুর আসন লাভ করেছিলেন কে জানে, কিন্তু

সেই শিক্ষার মন্ত্রগুলি আজো উপনিষদরূপে আমাদের মনে সেদিনের স্মৃতি বহন করে আসছে—"নবারে মৈত্রেয়ি, পত্যুঃ কামায় পতিঃপ্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃপ্রিয়ো ভাবতি।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজে সংসারে পথে রণক্ষেত্রে, জ্ঞানক্ষেত্রে এবং ধর্মাচরণে সর্বত্রই সে যুগে নারী ছিল পুরুষের পাশে সহচারিণী এবং সহধর্মিণী। সে যুগে নারীর স্থান কোথায় ছিল তার নির্দেশ মেলে 'সহধর্মিণী' কথাটার মধ্যেই। সহ ধর্মং আচরতি ইতি। সেদিনের পুরুষ ধর্ম আচরণ করত, এবং তার পাশে থাকত চির-সহায়রূপিণী নারী। এবং এই পতিব্রতাচারিণী হবার যথার্থ শিক্ষা অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সকল দিকের সকল শিক্ষাই তাঁরা নিশ্চয় যথাকালে যথাসম্ভব পেতেন। যদি সুভদ্রা শৈশবে অশ্বচালনা না শিক্ষা করতেন, তাহলে কি করে প্রয়োজনের সময় পতির সাহায্যে নিপুণ হাতে সারথীর বল্গা ধরেছিলেন। সে যুগের সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই এ যুগের মেয়ের জন্যে দাবী করছেন যুগ কবি রবীন্দ্রনাথ।"

আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী,
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী,
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি,
অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে,
সেও আমি নহি।
যদি পার্শ্বে স্থান দাও সঙ্কটের কালে,
দুরূহ কর্মের যদি অংশ দাও,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

বৈদিক যুগই আমাদের সমাজের সত্যযুগ। অর্থাৎ যে যুগে, আমাদের জীবন এবং কর্ম আদর্শ ও ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে, সত্য হয়ে মিশেছিল। তাই নারীও তার সত্যরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত জীবনব্রতের পূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছিল সে যুগের সমাজে। বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ও হরপার্ব্বতীর কল্পনায় এই আদর্শই ফুটেছে। এই আদর্শেরই জয়গান করেছে কালিদাস। নরনারী তেমনি ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, যেমন ভাবে অর্থ যুক্ত বাক্যের সঙ্গে—

বাগর্থাবিব সংপ্রেক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ *

* রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনস্টিটিউটে শ্রীশ্রীসারদাদেবী শতবার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত।

সোভিয়েট দেশের মাতা ও শিশু

শ্রীইন্দিরা দাশ এম-এ, বি-টি

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট নারী আজ তার যোগ্য সম্মান লাভে সফল হয়েছে। প্রাক্ বিপ্লব যুগে রাশিয়ার আইনে নারী ছিল শৈশবে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে। সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর অনুগামী হওয়াই ছিল নারীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দুঃখ-দারিদ্র্যে লাঞ্ছিত নারী-শ্রমিকের অবস্থা ছিল পশুরও অধম। শিশুর জন্ম দান করা ছিল ভগবানের অভিশাপ। তাই নূতন ক্ষমতা হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রীরা নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও মাতা ও শিশুর সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হলেন।

১৯১৮ সালের আগে অনাহার-অর্দ্ধাহারে জর্জ্জরিত কোটী কোটী শিশু মৃত্যুর করাল গ্রাসে কবলিত হতো। প্রতি বৎসর প্রায় কুড়ি লক্ষ মায়ের অশ্রু জলে রাশিয়ার মাটী নিষিক্ত হতো। এই সব ভগ্নস্বাস্থ্য মায়েদের ও দুর্ব্বল, অসহায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম একটী কমিটী গঠিত হয়। তাতে আইন করে মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা রক্ষার জন্য আইন গঠিত হলো। কারখানাও কার্য্যদপ্তরে গর্ভবতী নারীদের পূর্ব্ববৎ মাহিনাতেই হাল্কা কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের রাত্রে কাজ করানো অথবা অধিক পরিশ্রম করানো আইনবিরুদ্ধ।

সাধারণ মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য ছুটী ছাড়াও মায়েদের প্রত্যেক সাড়ে তিন ঘণ্টার পর আধ ঘণ্টার ছুটী দেওয়া হয় শিশুদের স্তন্যপান করানোর জন্য। এর জন্য মাহিনা কাটা বেআইনী।

নারীশ্রমিকেরা গর্ভবতী অবস্থায় সাধারণ ক্ষেত্রে তিন মাস ছুটী পায়; অস্বাভাবিক প্রসব হলে এই ছুটীর মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেওয়া নিয়ম। এক্ষেত্রেও মাহিনা বন্ধ রাখা হয়না। এই ব্যবস্থা সোভিয়েট দেশের সর্ব্বত্র। কি কারখানা, কি কার্য্যদপ্তর, কি 'সমবায় কৃষি' সর্ব্বত্রই।

গর্ভবতী নারীদের সর্ব্বদা বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রসূতি ও ভাবীমায়েদের শিশুপালন এবং প্রসূতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোয়াক ডাক্তার এবং অশিক্ষিত ধাত্রী রাশিয়ায় বিরল। এর পরিবর্ত্তে প্রায় প্রত্যেক নারীই প্রসবের সময় হাসপাতালে যায়। এ জন্য সেখানে প্রসূতিদের জন্য আলাদা হাসপাতাল এবং সাধারণ হাসপাতালে প্রসূতিদের জন্য বেডের সংখ্যা অগণিত। ১৯১৪ সালে যে জায়গায় প্রসূতি সদনের সংখ্যা ৯, নার্সারীতে বেডের সংখ্যা ৫৫০ এবং হাসপাতালে প্রসবের হার প্রতি বছরে ৪৪ ছিল, ১৯৩৭ সালে সে জায়গায় যথাক্রমে ৪১৭৫, ৬২৭৮১৭ এবং ৮১৩৪২ হয়েছে। শিশুদের দুধ বিলির কেন্দ্র নূতন খোলা হয়েছে ১৫০৯টী। শুধু যে সহরগুলিই এ সমস্ত সুবিধার কেন্দ্র তা নয়, গ্রামে গ্রামেও এই সব কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গ্রামে স্থায়ী মাতৃ-সদন ছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে যখন কাজ বেড়ে যায় তখন [illegible] অস্থায়ী মাতৃ-সদনও খোলা হয়। এর ফলে আজ রাশিয়ায় প্রসূতি-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যু নেই বললেও চলে।

সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ শিশুদের পরিচর্য্যার জন্য বহু দুধ বিলির কেন্দ্র, আরোগ্য নিকেতন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি খুলেছেন। সেখানে রুগ্ন শিশু, পিতৃমাতৃহীন অথবা পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের সযত্নে সুশিক্ষিত সেবিকাদের পরিচর্য্যাধীনে রাখা হয়। প্রত্যেকটী শিশুর স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য দায়ী দেশের কর্ত্তৃপক্ষ। প্রত্যেকটী শিশু [illegible]

বড় হয়ে সুস্থ সবল দেহ ও মন নিয়ে দেশের কাজ করতে পারে সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি।

শতাব্দীর ব্যর্থ চেষ্টার পর আজ এইভাব সোভিয়েট নর-নারী মাতৃত্বকে সুরক্ষিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। নারীকে আজ তার নারীত্ব, ব্যক্তিত্ব ও মাতৃত্বকে পঙ্গু করে ফেলতে হয় না। দেশের প্রত্যেকটী লোকের সঙ্গে আজ তার সমানাধিকার। সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের পার্শ্বচারিণী। এর ফলে সেখানে পণ্যা হিসাবে নারীকে দেখা যায় না। সোভিয়েট নারী "মাদার হিরোইন" হতে গর্ব্ব অনুভব করে। স্বামী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত সুখী দাম্পত্য জীবন আজ আর তাদের কাছে আকাশ কুসুমের কল্পনা নয়।

—

চালকুমড়োর হালুয়া

শ্রীমতী প্রীতি ঘোষ

চাল কুমড়োর ব্যবহার আমাদের দেশে অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু তার বেশীর ভাগই হয় বড়ি দেওয়াতে, নয়তো তরকারীর রান্নায় ব্যবহার হয়। এ দিয়ে কিন্তু মিষ্টিও বানানো যায়!

উপকরণ—দেড় পোয়া পরিমাণ পাকা চাল কুমড়ো কোরা, আধ পোয়া ছানা, ১ সের দুধ, আধ সের চিনি। দু ছটাক ঘি, গোলাপ জল ও কয়েকটি ছোট এলাচ।

প্রণালী—প্রথমে দুধটিকে খুব ঘন করে জ্বাল দিয়ে রাখুন—যেন ১ সের দুধ আধ সের হয়ে যায়। তারপর ঐ কোরা কুমড়ো শিলে ভাল করে বেটে নিয়ে ন্যাকড়ায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। যখন কুমড়ো থেকে সব জল ঝরে যাবে তখন ছানা ও কুমড়ো একটা পাত্রে রেখে হাত দিয়ে ভাল করে চটকে নিন। এবার উননে *কড়া চাপিয়ে ঘি দিন, ঘি গরম হলে তাতে ছোটো এলাচ ও সেই ছানা মেশানো কুমড়ো ঢেলে দিন ও ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। প্রায় ৮ মিনিট পরে তাতে আগে জ্বাল দিয়ে রাখা দুধ ও আধ সের চিনি ঢেলে দিন। কিছু কিসমিসও এই সময় দিতে পারেন। দুধ মরে গেলে অল্প ঘি দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ আঠা আঠা হলে তখন নামিয়ে নিন। অল্প ঠাণ্ডা হলে গোলাপ জল দেবেন।

—

নারিকেল-চিংড়ি

উপকরণ—১ সের চিংড়ি মাছ, ১ পোয়া নারিকেল কোরা, ৪টি কাঁচা লঙ্কা, একটুখানি সরষে ও কিছু সরষের তেল।

প্রণালী—একটু বড় আকারের বাগদা বা গলদা চিংড়ি ১ সের কিনে এনে তার খোলা ছাড়িয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। তারপর ঐ নারিকেল কোরার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাগুলি ও একটু সরষে দিয়ে বেশ মোলায়েম করে বেটে নিন। বাটা হলে তাতে একটু নুন ও সরষের তেল দিন ও মাছগুলিতে পুরু করে মাখিয়ে দিন। এবার একটা ঢাকনি দেওয়া এলুমিনিয়মের কৌটোর তলায় এক চামচ তেল ছড়িয়ে তার উপর মাছগুলি রেখে ঢাকনি বন্ধ করে ভাতের হাঁড়ি বা ডালের কড়ার ফুটন্ত ডালের উপর ভাসিয়ে দিন। মাছগুলো ভাপে সেদ্ধ হবে। ২০।২৫ মিনিট পরে কৌটোটি নামিয়ে নেবেন।

গান
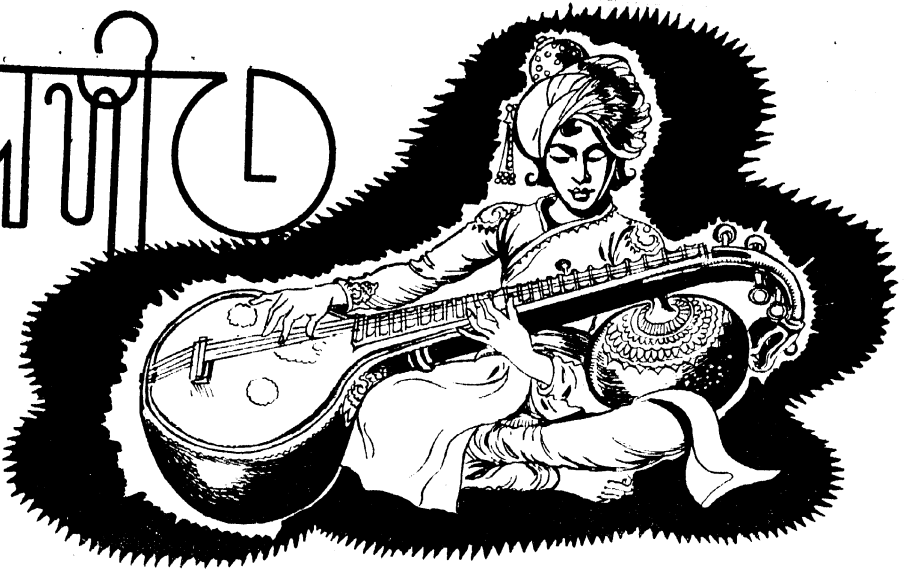
নবীন ভারত জাগে
রক্ত প্রাতের সূর্য-আগুন
পরাণে পরাণে লাগে।
নবীন কালের আসে নব আহ্বান,
এ-মর জীবনে তোলো অমরার
জীবন জ্যোতির গান।
দুর্যোগময়ী ঝঞ্ঝা নিশীথে
উদয় সরণী গাথে
নবীন ভারত জাগে ॥
জাগ্রত আজি ভারত বহ্নি নিখিল বিশ্ব ত্রাতা,
এ-ধূলির বুকে নব ইতিহাস রচিতে চাহে বিধাতা।
লভিছে মানবে বিজয়ের পথে,
রঞ্জিত রবি রাগে।
এ মহা ভারত জাগে ॥

কথা ঃ রবি গুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II	সা	গা	-া	|	পা	ধা	ধপা	I	গা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I II
	ন	বী	ন্		ভা	র	ত		জা	গে	০		০	০	০	

I	সা	গা	-া	|	পা	পা	র্সা	I	র্সা	না	-া	|	-া	-া	-া	I
	ন	বী	ন্		ভা	র	ত		জা	গে	০		০	০	০	

I	সা	গা	-া	|	পা	ধা	ধপা	I	গা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	ন	বী	ন্		ভা	র	ত		জা	গে	০		০	০	০	

I র্গা -া র্গা | র্রা র্সা -া I না -র্রা র্রর্সা | না ধপা -া I
র ক্ ত　প্রা তে র্　সূ র্ য　আ গু ন্

I পা র্সা র্সনা | ধা পা মা I পা গা -া | -া -া -া II
প রা ণে　প রা ণে　লা গে ০　০ ০ ০

II গা পা া | ধা র্সা -া I র্রা র্গা র্সা | র্রা র্গপা পর্মা I
ন বী ন্　কা লে র্　আ সে ন　ব অ০ ঙ

I র্গা -া -া | -া -া -া I র্গা র্পা পর্মা | র্গা র্রা র্রা I
বা ০ ০　০ ০ ন্　এ ম র　জী ব নে

I র্রর্গা গর্রা র্সানা | র্রা র্রর্সা -া I র্গা র্গা র্গা | র্রা র্সনা -র্রা I
তো০ লো অ০　ম রা র্　জী ব ন　জ্যো তি০ র্

I র্রর্সা -া -া | -া -া -া I র্সা -র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I
গা ০ ০　০ ০ ন্　তু র্ যো　গ ম য়ী

I না -র্রা র্রর্সা | না ধা পা I পা র্সা র্সনা | ধা পা মা I
ঝ ০ ঞ্ঝা　নি শী থে　উ দ য়　স র ণী

I পা গা -া | -া -া -া II
গা থে ০　০ ০ ০

ঈষৎ দ্রুত লয়ে

II সা -মা মা | মা মা মা I রা পা পা | পা -া পা I
জা ০ গ্র　ত আ জি　ভা র ত　ব ০ ক্ষি

I মা পা ধা | ণা -র্সা ণা I ধা -পা ধা | -া -া -া I
নি খি ল　বি ০ শ্ব　ত্রা ০ তা　০ ০ ০

I মা ণা ণা | -া ণা ণা I পা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
এ ধূ লি　র্ বু কে　ন ব ই　তি হা স্

I ণা র্রা গা | র্মা র্পা র্পা I র্মা -র্গা র্মা | -া -া -া I
র চি তে চা হে বি ধা ০ তা ০ ০ ০

I র্ধা র্ধা র্ধা | র্পা র্মা র্মা I র্গা র্পা র্পর্মা | র্গা র্রর্সা র্সা I
ল ভি ছে মা ন বে বি জ য়ে র পং থে

I র্সর্গা র্গর্রা র্সা | ধা পা ধা I ধপা মা -া | -া -া -া I
রং ০ ঞ্জি ত র বি রা গে ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা | র্সা র্সা র্মা I র্মা র্গা -া | -া -া -া I
এ ম হা ভা র ত জা গে ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা | র্সা র্রা র্রর্সা I ধা র্সা -া | -া -া -া I
এ ম হা ভা র ত জা গে ০ ০ ০ ০

I সা গা -া | পা পা ণা I ণা ধা -া | -া -া -া I
ন বী ন্ ভা র ত জা গে ০ ০ ০ ০

I সা গা -া | পা ধা ধপা I রা মা -া | -া -া -া IIII
ন বী ন্ ভা র ত জা গে ০ ০ ০ ০

আমরা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমাদের চোখে নেই মায়ার কাজল,—
সৌখিন স্বপন সেথা বাঁধে নাকো বাসা ;
সুন্দরে ক'রেছি দগ্ধ জঠর-অনলে—
মোরা বিংশ-শতাব্দীর জীবন্ত-জিজ্ঞাসা !
অর্দ্ধভুক্ত গন্ধময়ী প্রেয়সী মোদের,—
পদ্মপর্ণে নাহি লিখে প্রণয়-লিপিকা ;—
অনশনক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত জীবনের
ওরা যেন সঞ্চারিণী শরীরিণী টীকা !
অতিবৃদ্ধ আমাদের পঙ্গু ভগবান
অবাস্তব কল্পস্বর্গে নাহি থাকে হায় !—
পথের ভিড়ের মাঝে দেখনি কি তারে ?
দেখনি কি ফুটপাথে অন্তিম শয্যায় ?

সে যে ফিরে উঞ্ছ মাগি' তোমাদের দ্বারে,—
আলোহীন ঘরে ধোঁকে ক্ষুধার জ্বালায় ;
প্রত্যক্ষ—বাস্তব সে যে রক্তমাংসে গড়া,—
আপিসে কলম পিষে—লাঙল চালায় !
মোদের পৃথিবী নয় শ্যামল সুন্দর,
বন্ধ্যা অন্ধকারে সে যে যুগ যুগ ঢাকা,
আমাদের নভে এক যাযাবর পাখী
প্রভাতের লাগি' মরে ঝাপটিয়া পাখা !
সে প্রভাত আসিবে কি ?—শুধাই তোমারে,
শোনোনি কি কান পেতে তার পদধ্বনি ?
শ্মশানের কাপালিক—বসি' শবাসনে
তারি অভ্যুদয় লাগি' মোরা কাল গণি !

নারী-প্রেমিক ফ্রান্স

গী দ্য মোঁপাসাঁ
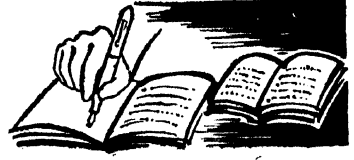
অনুবাদক সুভাষ সমাজদার

আমি এখন বুড়ো হলে কি হয়—বললেন কর্ণেল ল্যাপার্ট —সরু সরু সাপের মত রগ বের হয়েছে হাত পায়ে ; সারা শরীরে পড়েছে বার্দ্ধক্যের ছায়া। কিন্তু এখনও কোন স্ত্রীলোক—বিশেষ করে সুন্দরী কোন তরুণী যদি আমাকে আদেশ করে, একটা স্থচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যেতে হবে তাহলে আমার মনে হয় তাও আমি পারবো। আমি বরাবর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে নারী-প্রেমিক। এখনো এই বুড়ো বয়সেও তন্বী সুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়ানোমাত্র আমার মাথা থেকে সুরু করে পায়ের বুট পর্য্যন্ত সারা শরীরে একটা অদ্ভুত আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বলছি তাই হয়—

'শুনুন, শুধু আমি নয়, সারা ফরাসীজাতির যে কোন ভদ্রলোকের মনে রাণীর মহিমায় বিরাজ করছে নারী। আমরা তাকে ভালবেসেছি, এখনও ভালবাসি এবং যতদিন ইউরোপের ম্যাপে ফরাসী দেশ থাকবে ততদিন আমরা তাকে ভালবাসবো।'

আমার কথা বলতে গেলে মোটামুটি চলনসই রকমের সুন্দরী কোন মেয়ের চোখের ইঙ্গিতে আমি পৃথিবীর দুর্গমতম দেশে পর্য্যন্ত অনায়াসে চলে যেতে পারি। সত্যি বলতে কি আকাশ-নীল সরোবরের মত টানা টানা দুটো হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি আমার স্নায়ুকে মাতাল করে তোলে। আনন্দের কলধ্বনি বাজতে থাকে আমার বুকের রক্তে। সেই সুন্দরী মেয়েটির সামনে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে বড় বীর প্রতিপন্ন করার জন্য চেয়ার টেবিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে দু'তিনটে মানুষের সঙ্গে 'ডুয়েল' লড়ে তাদের খুন করার একটা আসুরিক বাসনা চেপে বসে আমার মনে—

'শপথ করে বলতে পারি শুধু আমি নয়—ফ্রান্সের সমস্ত সৈনিকের মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ এক দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের সকলের—জেনারেল থেকে শুরু করে সামান্যতম সৈনিকের—মনে নারীসান্নিধ্য অদ্ভুত একটা প্রেরণা জোগায়। চিন্তা করে দেখুন, সেই পুরানোদিনের জোয়ান-অফ-আর্কের কথা তো রূপকথা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের আলোয় উজ্জ্বল সে কাহিনী। আমি বাজী রেখে বলতে পারি—আমি যে সৈন্যদলে ছিলাম তার সঙ্গে যদি অন্তত একটা মেয়ে থাকতো তাহলে মার্শাল ম্যাকমেহন যে যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, সেই যুদ্ধে আমরা হারতাম না। সেই রাত্রেই আমরা প্রাসিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে যেতে পারতাম এবং তাদের কামানের সামনে বসে মৌজ করে ব্র্যাণ্ডিও খেতে পারতাম অনায়াসে!

যুদ্ধের কথাই যখন উঠল, তখন একটা গল্প বলি শুনুন। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবেন, একটা মেয়ের উপস্থিতিতে তার সান্নিধ্যে আমাদের অসাধ্য কাজ কিছু নেই—

"আমি সে সময় কেবল ক্যাপ্টেন হয়েছি। ফ্রান্সের উত্তরদিকের জেলাগুলোকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চলছে তুমুল। আমার গ্রুপ নিয়ে আমি যে অঞ্চলে ছিলাম, প্রাসিয়ানরা সে জায়গাটা অধিকার করার উপক্রম করল। আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পিছু হটতে সুরু করলাম। আমাদের সকলের শরীর মন ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে, খিদেয় পেট জ্বলছে। আমরা মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি, কিন্তু তখনও শত্রুদের অস্তিত্ব আমাদের আশে পাশে টের

...য়া যাচ্ছে। সঙ্গে যেটুকু সঞ্চিত খাদ্য ছিল সব নিঃশেষিত হয়ে গেল। এমন অবস্থা হলো যে, আগামীকাল সকালে 'বারমুরটেইন' সহরের ঘাঁটিতে পৌছতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। চোখের সামনে মৃত্যুর ছায়া ভাসতে লাগল। 'বারমুরটেইন' তখন বারো মাইল দূরে। আরো বারো মাইল, কিন্তু না—আর চলছে না। এই দুরন্ত শীতের রাত্রে, অবিরাম তুষারপাত মাথায় করে, খালি পেটে বারো মাইল যেতে হবে ভেবে হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত। আমার মনে হলো, আর বাঁচবার কোন আশা নেই। এই শেষ, আমার দলের এই হতভাগ্য ছেলেরা তাদের স্নেহ মমতা ঘেরা বাড়ীতে আর কোনদিন ফিরতে পারবে না।

গতকাল থেকে আমরা কেউ কিচ্ছু খাইনি। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ আমরা একটা ট্রেঞ্চে লুকিয়েছিলাম। মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে হাড় কাঁপানো কনকনে শীতের বাতাস। পাঁচটা বেজে গেল। তুষারঝরা গোধুলির ম্লান বিষণ্ণ আলো ঝিকমিক করতে লাগল চারিদিকে। আমার দলের ছেলেরা অনেকেই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি তাদের ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কেননা রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে বারো মাইল পথ হাঁটতে হবে। কিন্তু কেউ ট্রেঞ্চ থেকে উঠতে রাজী হলো না। অনেকের নড়ে চড়ে বসার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই। যেন তাদের হাত পায়ের গিঁটগুলো শীতে জমে গেছে। যা হোক অনেক কষ্টে ছেলেদের উপরে নিয়ে এলাম। আমাদের চোখের সামনে বিরাট পৃথিবী যেন মোটা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। বরফে ছেয়ে গেছে চারিদিক। গাছপালাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন এক একটা শ্বেত ভল্লুক হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তুষার ঝরছে তো ঝরছেই। স্তরে স্তরে উঁচু হয়ে উঠছে পৃথিবীর সমতল মাটি। যেন মনে হয় বরফের এই অভিশাপ থেকে কোনদিন আর উদ্ধার পাবে না পৃথিবী, কোনদিন সূর্য্যের সোনালী আলোয় হেসে উঠবে না। আমার মনটা খুব দমে গেল। তবুও হুকুম দিলাম—ফল ইন্—

অল্পবয়সী সৈন্যেরা সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল—যেখান থেকে মেঘ চুঁইয়ে চুঁইয়ে তুষার পড়ছে অবিরাম। হয়তো তারা আকাশের কোন গোপন কোণে লুকিয়ে থাকা বিধাতাকে শেষবারের মত স্মরণ করল, কেননা তারা জানে গতকাল শরীরের উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তার পরে এই হিমে বারো মাইল হাঁটলে বাঁচা অসম্ভব। হুকুম দিলাম—ফরোয়ার্ড মার্চ্চ—কেউ এক পা নড়ল না। তখন আমি কোমর থেকে রিভলবার বের করে বললাম, লাইনের একেবারে সামনে যে আছে সে যদি এই মুহূর্ত্তে পা না ফেলে তা হলে আমি তাকে প্রথম গুলী করবো—

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ছেলেটি পা ফেলল। সবাই চলতে সুরু করল খুব ধীরে ধীরে, যেন সকলের পায়ে কোন কঠিন আঘাত লেগেছে।

চারিদিকের অবিরাম তুষারপাত আমাদের জীবন্ত সমাধির আয়োজন করছে। হ্যাটের উপর বরফ পড়ছে; গায়ের সমস্ত পোষাক থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে বরফ। তুষারশুভ্র নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দিয়ে আমরা যেন কোন রহস্যময় মৃত্যুর রাজ্যে চলেছি। বারে বারে আমার মনে হলো, একমাত্র দৈবী প্রভাব ছাড়া বারো মাইল অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব···যারা দলের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলতে পারছে না তাদের জন্ত মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। শুধু গাছের পাতায় পাতায় বরফ পড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে প্রেমের চাপা ফিসফিসানির মত। তাছাড়া চারিদিকে চেয়ে আছে মৃত্যুর স্তব্ধতা। হঠাৎ নিস্তব্ধতার বুক চিরে বেরিয়ে এল মেয়েলী গলার একটা বুক ফাটা আর্ত্তনাদ। দীর্ঘ করুণ গোমরানো কান্না। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন লোক এবং আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেণ্টকে পাঠালাম সেইদিকে। কয়েক মিনিট পরই একটি বৃদ্ধ আর একটি তরুণী মেয়েকে বন্দী করে নিয়ে এল আমার সৈনিকরা। আমি নীচু গলায় তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে জানতে পারলাম—তারা প্রাসিয়ানদের ভয়ে সহর থেকে পালিয়ে এসেছে। প্রাসিয়ানরা তাদের বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিল। রাত্রি বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা মদ খেয়ে হুল্লোড় করতে সুরু করল। বৃদ্ধ এই ভদ্রলোক তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাড়ীর চাকরবাকরকে পর্য্যন্ত কিছু না বলে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে। তাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি বুঝতে পারলাম এরা মধ্যবিত্ত, কিম্বা তার চেয়েও

উঁচু···আমি তাদের বললাম—আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন—

তাদের দুজনকে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। বৃদ্ধ এ অঞ্চলের গলিঘুঁজি জানে। কাজেই সে আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল। বরফপড়া বন্ধ হয়েছে। আকাশে ফুটেছে তারার চুমকি। শীত আরও তীব্র হয়ে উঠল। মেয়েটি তার বাবার হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে পথ চলছিল। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কাতর গলায় বলছিল—আমার পা দুটো জমে যাচ্ছে বাবা, আমি বোধ হয় আর হাঁটতে পারবো না—মেয়েটির কথা শুনে আমার মনটা সহানুভূতির রসে ভিজে উঠল। একটা মেয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে! হঠাৎ সে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল। বাবাকে বললে—আর আমি হাঁটতে পারবো না বাবা—বৃদ্ধ তাকে পিঠে করে বহন করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে তাকে সমস্ত শক্তি দিয়েও তুলতেই পারল না। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভেতর থেকে। আমার সৈন্যরা তাদের চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি মন স্থির করতে পারলাম না—কি করবো, বুড়ো আর তার মেয়েকে ফেলে যাবো, না নিয়ে যাবো······

আমার দলের একজন, রঙ্গরসের জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছিল শ্লিমজিম। সে হঠাৎ বলল—এই ছেলেরা তোমরা এস। এই মেয়েটিকে আমরা চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবো। না হলে কিসের আমরা ফ্রান্সের যুবক!

তার কথায় আমার মনেও আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। বললাম, ভাল বলেছো ছোকরা। তোমরা গাছের ডালাপালা দিয়ে একটা ট্রেচার মত তৈরী কর। ওকে তার উপরে তুলে নিয়ে চল। আমাকেও মাঝে মাঝে ঘাড় লাগাতে দিও হে—

চারিদিকের ঝাপসা অন্ধকারে আরো এক ছোপ নিকস কালোর ইঙ্গিত দিয়ে রাস্তার পাশেই ওক গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন গিয়ে মোটা মোটা অনেকগুলো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা একটা চলনসই ট্রেচার তৈরী করল। শ্লিমজিম হেঁকে বলল—এই তোমরা কে কে মাথার টুপী, গায়ের অন্তত একটা জামা দিতে রাজী আছো? মনে রেখ, একটা সুন্দরী মেয়ের জন্য হে। সঙ্গে সঙ্গে কতকটা গ্যাবাডিনের গরম টুপী আর পাঁচ ছয়টা কোট তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই সুন্দরী মেয়েটি গরম টুপী আর জামা বিছানো গাছের ডালের ট্রেচারে আরামে গা এলিয়ে দিল এবং ছয়টি ছেলের কাঁধের উপর চড়ে চলতে আরম্ভ করল।

ঐ ছয়জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। সত্যি বলতে কি, সেই হাড়কাঁপানো নিদারুণ শীতের মধ্যেও তার বোঝা বইতে আমি আরাম পেয়েছিলাম। চারিদিকের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্জ্জয় শীত উপেক্ষা করে মহাউৎসাহে আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। আমরা সবাই যেন কোন উত্তেজক মদ খেয়েছি। হ্যাঁ মদের মতই উষ্ণ—আর জ্বালাধরা অনুভূতি জাগিয়ে দিতে যার চেয়ে সেরা আর কিছুই নেই, তাই ছিল আমাদের ঘাড়ের উপরে। বহনকারী ছেলেদের ঠাট্টা রসিকতাও আমার কাণে আসছিল। সেদিন আরও ভাল করে বুঝলাম ফরাসী দেশের পুরুষদের মনে আগুন ধরিয়ে দিতে শুধু প্রয়োজন একটা মেয়ের।

আমার সৈন্যরা সবাই সমান তালে পা ফেলে জোর কদমে মার্চ্চ করে চলেছে। তাদের শরীরও গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাড় বদলে নিচ্ছে। একজন বয়স্ক সৈনিক ট্রেচারের পিছনে পিছনে হাঁটছিল, আর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল কখন ঐ ছয়জন বহনকারীর একজন পরিশ্রান্ত হয়ে ঘাড় বদলাতে চাইবে। আর সে গিয়ে তার জায়গা দখল করবে। সে বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করে বকছিল। কিন্তু সে এত জোরে বলছিল যে সবারই কানে আসছিল তার কথাগুলো। সে বলছিল—অবশ্য আমার আর সে বয়স নেই। কিন্তু তাহলে কি হয়, বুড়োদের মনেও সাহস আর শক্তি জোগাতে মেয়ের চেয়ে সেরা আর কিছু নেই জগতে—

ভোর তিনটে পর্য্যন্ত আমরা একবারও না থেমে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার সৈন্যরা কি একটা দেখে আঁতকে উঠে পেছিয়ে এল কয়েক ধাপ। সঙ্গে সঙ্গে আমার দলের সবাই বরফের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। দূর থেকে মনে হল, বরফ ঢাকা ধূ ধূ মাঠের বুকে অস্পষ্ট একটা কালো দীর্ঘ ছায়া। নিশ্চয়ই শত্রু! আমি ফিস ফিস করে অর্ডার দিলাম—ফায়ার—সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টেপার শব্দ হলো। দেখলাম দূরে প্রাসিয়ান শত্রুদের একটা

দল গুলীর শব্দে চীৎকার করে উঠল। ধপ ধপ করে তাদের অনেকগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর বাদবাকী শত্রুরা সরীসৃপের মত দীর্ঘ একটা কালো রেখায় এঁকে বেঁকে আশপাশের ঝোপের দিকে পালাতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি চীৎকার করে বললাম—ফায়ার—পঞ্চাশটি গুলীর শব্দে শেষরাত্রির জমাট স্তব্ধতা থান থান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। যখন রাইফেলের ভারী ধোঁয়া কিছুটা পাতলা হলো, তখন দেখা গেল, কম করে বারোজন জার্মান আর ছয়টা ঘোড়া মরে পড়ে আছে। আর তিনটা ঘোড়া পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। তার মধ্যে একটা তখনও তার পিঠে মৃত সোয়ারকে বহন করছে আর গুলীর যন্ত্রণায় হিংস্র আক্রোশে চীৎকার করছে। আমার সৈন্যরা সশব্দে হেসে উঠল। আনন্দের হাসি! জয়ের হাসি! কে একজন বলল—কতগুলো জার্মান মেয়ে বিধবা হলো রে?

—বোধ হয়, গোটা বারো হবে—

—তা হোক, জার্মানরা বেশী দিন বিধবা থাকে না। ছেলেদের ঘাড়ের ওপরে গরম জামা কাপড় ঢাকা সেই ট্রেচার থেকে এতক্ষণে সুন্দরী মেয়েটির গলা শোনা গেল—কি হয়েছে? যুদ্ধ হয়ে গেল না কি?

—হ্যাঁ ম্যাডাম—উৎফুল্ল হয়ে আমি বললাম—আমরা এক ডজন জার্মানের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলাম—

—হায় বেচারীরা—সে অস্পষ্ট গলায় আরও কি যেন বলতে গিয়েছিল। কিন্তু চোখে মুখে সূচের ফলার মত শীত এসে বিঁধতেই গরম কাপড়ের ভেতরে মুখ লুকিয়ে ফেলল। আবার আমরা হাঁটতে সুরু করলাম। অনেকক্ষণ আমরা মার্চ্চ করলাম। এবার আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হলো। চারিদিকের তুষার ঢাকা গাছপালার ওপর পড়ল আলোর তিলক। পূবের আকাশে কে যেন আবির ছিটিয়ে দিল। দূর থেকে কে একজন চীৎকার করে উঠল—কে যায়?

আমরা সবাই চমকে দাঁড়ালাম। আমি সান্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, আমরা আমাদের ফ্রেঞ্চ লাইনে পৌঁচেছি নিরাপদে। অশ্বারোহী একজন উচ্চ-পদস্থ অফিসারকে আমি আমাদের এই বরফ ভেঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কথা বললাম। তিনি আমার দলের সৈন্যদের ঘাড়ে ঐ ট্রেচার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

—তোমাদের ঘাড়ের ওপরে ওটা কি হে? গরম জামা কাপড়ের স্তূপের ভেতর থেকে বিদ্যুত ঝলকের মত বেরিয়ে এল সেই মেয়েটির ফুলের মত সুন্দর ছোট্ট মুখখানা। সে বলল—আমি ম্যঁসিয়ে। উপস্থিত সকলের মুখে একটা হাসি খেলে গেল। আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল আমাদের সকলের মনে।

গ্লিমজিম ছিল ঐ ট্রেচারের পাশেই, সে হঠাৎ জয়ধ্বনি করে উঠল—নারী প্রেমিক ফ্রান্সের জয় হোক।

আমি জানি না কেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ নিজেকে খুব সাহসী এবং পৃথিবীতে একজন অদ্বিতীয় বীর বলে মনে হল। মনে হল, আমি একা যেন গোটা ফ্রান্সকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি বা এমন একটা কঠিন কাজ করেছি যা আর কেউ করে নি কখনও—

* * * * *

কতকাল আগের কথা। সেই সুন্দর ছোট্ট মুখখানা কিন্তু আমি আজও ভুলি নি। যদি কেউ আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে, তা হলে আমি বলবো, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের আনন্দ দেওয়ার জন্য ড্রাম আর বিগল না দিয়ে প্রত্যেক রেজিমেন্টে কয়েকটা সুন্দরী মেয়ে দেওয়া দরকার। দেখুন তো, ভাবতেও কী আনন্দ হয়, একটা ম্যাডোনা মূর্ত্তির মত সুন্দরী কোন মেয়ে কর্ণেলের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে। কর্ণেল ল্যাপোর্ট কয়েক মিনিট থামলেন। মাথাটা ঝাঁকিয়ে আবার আনন্দোচ্ছল গলায় বললেন—যাই বলুন, ফ্রেঞ্চ-ম্যানদের মত মেয়েদের এমন করে ভালবাসতে কেউ পারে না—

শ্রীবিনোবাজীর বাংলা ভ্রমণ—

আচার্য্য বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর পদ্ধতিতে সারা ভারত পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া ভূদান যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আগামী ১লা জানুয়ারী মানভূম জেলা হইতে পশ্চিমবঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া তক্ষশীলা গ্রাম হইতে মুল্লু গ্রামে আগমন করিবেন। মুল্লু তক্ষশীলা হইতে ৬ মাইল, বাঁকুড়া জেলার সালতুরা থানায় অবস্থিত। তিনি ১১ দিনে বাঁকুড়া জেলার ৮১ মাইল ও ১৪ দিনে মেদিনীপুর জেলার ১০৫ মাইল পরিভ্রমণ করিবেন। ৪৫০ বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে পথে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই বিনোবাজী যাইবেন। তিনি বাঙ্গালার সীমান্তে আগমন করিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন। তিনি যে কয়দিন বাংলায় থাকিবেন, সর্বত্রই তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা এই ২৫ দিন সর্বত্রই তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ গ্রহণ করিবেন। বিনোবাজী ভারতীয় আদর্শের প্রতীক—ভূদান যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। সেই মহান আদর্শ প্রচারে আত্মদান করিয়া বিনোবাজী আজ ভারতীয় জনগণের নিকট অতিমানব বলিয়া পরিচিত। আমরা তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবঙ্গের সীমা বৃদ্ধিতে বাধা—

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পূর্ব-ভারতে আগমনের সময় যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী রাজ্যের, বিশেষত বিহারের আচরণ সমস্ত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ঐ সকল রাজ্যের কয়েকটি বঙ্গভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার একান্ত ন্যায়সঙ্গত ও অপ্রতিরোধ্য দাবীর কণ্ঠরোধ করার জন্য ঐ সকল রাজ্যে একটা চরম প্রয়াস দেখা যাইতেছে। এই ন্যায্য দাবীকে ঠেকাইবার জন্য কোন চেষ্টাকেই অন্যায় মনে করা হইতেছে না। ঐ সকল অঞ্চলের দরিদ্র কৃষক, ব্যবসায়ী, উকীল বা সাধারণ মানুষ—এক কথায় কোন লোকই যাহাতে মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির দাবী তুলিতে সাহসী না হয়, সেজন্য পুলিশসহ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগ ভীতিপ্রদর্শনের এক সর্বাত্মক অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের প্রতি এই আবেদন জানাইতেছি যে, এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তাঁহারা সমস্ত বিভেদ দূর করিয়া নিজেদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হইবেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দেশের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কপট ও স্বার্থহীন ভাষায় শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজেদের দাবী প্রকাশ করিবেন।

সিংহল ভারত আপোষ মীমাংসা—

সিংহলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ সি, ডবলিউ, কান্দালারা সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটী ভবনে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন—"সিংহল ও ভারতের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধ হইয়াছে সেগুলির শীঘ্রই মীমাংসা করা হইবে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী সদিচ্ছা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সকল সমস্যার সমাধান ঘটাইতে চান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ঐরূপ পন্থায় বিশ্বাসী। ভারত ও সিংহল সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও প্রথা সকল দিক দিয়াই এক। কেহই ভারত ও সিংহলকে পৃথক করিতে পারিবে না। সিংহল ভারতকে তাহার মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে।" এইরূপ উক্তির পর আশা করা যায়, সিংহলবাসী ভারতীয়গণ তথায় পূর্বের মত সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি-দান আন্দোলন—

আচার্য্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের সহিত খ্যাতনামা গঠনকর্মী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পত্তি-দান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ২২শে নভেম্বর বোম্বায়ের খ্যাতনামা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—মিঃ জে-আর-ডি টাটা, মিঃ ধরমসে খাটাউ ও মিঃ মদনমোহন রুইয়া এই সম্পত্তি দান আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাহাদের আয়ের বা ব্যয়ের অংশবিশেষ দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রত্যেক শিল্পপতি, ধনী ও ব্যবসায়ী যাহাতে এই ভাবে দান করেন, সেজন্য সকলকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছেন। বিহারে ভূদান আন্দোলনের ফলে যে ২৩ লক্ষ একর জমী পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ২ লক্ষ একর আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ও বাকী জমী ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। জমীহীন প্রত্যেক পরিবারকে এক একর জমীর সহিত খরচ বাবদ ১০০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। সেজন্য ৫ শত কোটি টাকার প্রয়োজন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পত্তি দান আন্দোলন দ্বারা ঐ টাকা সংগ্রহ করিবেন। ইহার ফলে দেশে যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই মঙ্গলের কথা।

ছাত্রকল্যাণ কমিটী গঠন—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছাত্রকল্যাণ সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে

কমিটী আলোচনা করিবেন—(১) ছাত্রাবাস, (২) উদ্বাস্তু ছাত্রগণের জন্য অতিরিক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৩) উন্নত মানের ছোট কলেজসমূহের প্রসার ও উন্নতি বিধান, (৪) কলিকাতার বাহিরে ৩ বৎসর কোর্সের আবাসিক কলেজ স্থাপন। কমিটীর সদস্য হইয়াছেন—(১) ডক্টর জে-সি ঘোষ আহ্বানকারী (২) শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ (৩) শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) শ্রীবিনয়কুমার সেন—কলিকাতা কর্পোরেশন (৫) শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত আই-সি-এস (৬) শ্রীরঞ্জিৎকুমার গুপ্ত আই-সি-এস (৭) ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন—শিক্ষা-সেক্রেটারী (৮) শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্সট্রাকসান এঞ্জিনিয়ার। আমাদের বিশ্বাস এই কমিটীর নির্দেশ সত্বর গ্রহণ ও কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠ—

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে পুরুষ সন্ন্যাসীদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার পর সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। গত ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী-বাড়ীর সামান্য উত্তরে গঙ্গাতীরে সুরধুনী কানন নামক উদ্যানভবনে শ্রীসারদা মঠ নামে সেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ ঐ নূতন মঠের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ মঠে শুধু সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীরা বাস করিবেন। তাঁহারা ধর্মসাধনার সহিত জগতবাসীর উপকারে নিজেদের নিযুক্ত রাখিবেন। ১৬ বিঘা জমীর উপর এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহা ক্রয় ও মেরামতাদি করিতে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বহু উচ্চবংশের শিক্ষিতা মহিলা ঐ মঠে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীমা সারদা দেবীর শিষ্যা শ্রীসরলা দেবী শ্রীসারদা মঠের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশে একদল মহিলা অবিবাহিতা থাকিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। তাঁহাদের সকলের কার্য্য সংহত করিয়া এই মঠ হইতে নিয়ন্ত্রিত হইলে সর্বত্র কাজ ও কর্মী—উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে।

মার্কিণ কর্ত্তৃক ভারতকে সাহায্য—

গত ২৫শে নভেম্বর নিউইয়র্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আমেরিকার নূতন অর্থনীতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন কম্যুনিষ্ট চীনকে রাশিয়া যে হারে অর্থ সাহায্য করিতেছে, মার্কিণ কর্ত্তৃক ভারতকে অর্থ সাহায্য প্রদান তাহার তুলনায় ৬ বা ৭ ভাগের এক ভাগ। রাশিয়া আফগানিস্তানকেও প্রচুর অর্থ সাহায্য দান করিতেছে। পৃথিবীর সকল দেশকে সর্ববিষয়ে উন্নত করার জন্য এখন আমেরিকা ও রাশিয়া নিজ নিজ তাঁবেদার দেশে অর্থ সাহায্য দান করিতেছেন। ভারত যাহাতে আরও অধিক অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে, সেজন্য মার্কিণ সভাপতি বিশেষ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। অবশ্য বিনা সর্তে এই সাহায্য দান করা হইলে ভারতের তাহা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র—

দক্ষিণ আফ্রিকার ৮০ বৎসর বয়স্ক প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার মালান ৬ বৎসর কাজ করার পর পদত্যাগ করায় মিঃ জোহান ষ্ট্রিজডন্ দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ৩০শে নভেম্বর জাতীয় দলের নেতা হিসাবে দলের সদস্যদিগকে জানাইয়াছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারের আশ্বাস দিয়াছেন। দেখা যাউক, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা এখন কিরূপ হয়।

পূর্ববঙ্গের নূতন গভর্ণর—

সার টমাস হার্বার্ট এলিস পূর্ববঙ্গের গভর্ণর ছিলেন। পাকিস্তানে নানারূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় গত ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি পাকিস্তানের ফেডারেল আদালতের বিচারপতি মিঃ সাহাবুদ্দীনকে পূর্ববঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহাবুদ্দীন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, তাঁহার নিয়োগে পূর্ববঙ্গবাসী কতকটা স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করিবে।

কম্যুনিষ্ট দল ও শ্রীনেহরু—

গত ২৮শে নভেম্বর দিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীজহরলাল নেহরু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সদস্যগণ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থ বড় করিয়া দেখেন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল ইউরোপের পুরাতন নীতি অনুসরণ করেন—তাহার সহিত ভারতীয় নীতির কোন সামঞ্জস্য নাই। যেখানেই কোন বিবাদ হয়, কম্যুনিষ্টরা সেই স্থানে যাইয়া এক পক্ষ লইয়া বিবাদ বাড়াইয়া দেন—ভারত গভর্ণমেণ্টের সকল কাজের নিন্দা করাই তাহারা কর্তব্য মনে করেন। ভারতের একদল সাম্প্রদায়িক নেতা ও ভারতে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন—তাহারা মুসলেম লীগ দলের পুরাতন কর্মী। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যও বরদাস্ত করিবে না। শ্রীনেহরু চীনা কম্যুনিষ্টদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলেন—ভারতে তাহাদের অনুসরণ করা যাইবে না। তাহারা ৪০ বৎসর ধরিয়া গৃহবিবাদ করিয়া এখন দেশকে উন্নত করিতেছে। ভারত ঐ ভাবে গৃহবিবাদ করিবে না—ভারত যে পদ্ধতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়—

দিল্লীর কেন্দ্রীয় উচ্চ আদালতের অন্যতম বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি—পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

৯৭ বৎসর বয়সের ছাত্র—

ত্রিপুরা রাজ্যের ধলেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক এক ছাত্র ভর্তি হইয়াছে। ছাত্রের বয়স ৯৭ বৎসর, সে জাতিতে কৃষক—নাম আকবর আলি। তাহার বড় ছেলের বয়স ৭৮ বৎসর। সে তাহার প্রপৌত্রের সহিত প্রথম বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা করিতেছে। আকবর আলি সাহেবের উত্তম প্রশংসনীয়।

কংগ্রেসে যোগদান—

মাদ্রাজের ৮৫ বৎসর বয়স্ক নেতা ডক্টর টি, প্রকাশম্ কিছুকাল কংগ্রেসদল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আবার কংগ্রেসদলে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি অপর এক প্রবীণ নেতা শ্রীবুলুসু শাম্বমূর্তি ও পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। ৩০ বৎসরের ও অধিক কাল কংগ্রেসে কাজ করার পর ২ বৎসর পূর্বে তিনি ও প্রকাশম্ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বন্দরে জুয়াচুরি—

গত ৬ই নভেম্বর কলিকাতা বন্দরে সাড়ে ১৯ মণ বেআইনি আফিম ধরা পড়িয়াছে—তাহার মূল্য ৪ লক্ষ টাকা—ঐ সম্পর্কে ১৮ জন লোক ধৃত হইয়াছে। গত ২ মাসে ৩নং কিং জর্জ বন্দরে ১০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ সের ৭৫ তোলা আফিম ধরা পড়িয়াছে—জুয়াচোরেরা বেআইনি ভাবে ঐ জিনিষ রপ্তানী করে। ভারতে প্রস্তুত আফিম—প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা ও গোয়ালিয়রে উৎপন্ন হয়। তাহা যে কি ভাবে এইরূপ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ভারতে এক তোলা আফিম উৎপাদনের খরচ ১৩ আনা—তাহার উপর প্রতি তোলায় ৬ টাকা ১২ আনা কর ধরিয়া তাহা ৭৸০ তোলা দরে বিক্রীত হয়। দূরপ্রাচ্যে এক তোলা আফিমের দাম ১৮ হইতে ৪০ টাকা—আমেরিকা ও কানাডায় দর তাহা অপেক্ষা অধিক। ভারত হইতে যেমন বেআইনি আফিন রপ্তানী হয়, তেমনই বেআইনি স্বর্ণ ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। স্বর্ণের প্রতি তোলার উপর আমদানী শুল্ক ৬৪৷০। ১৯৫০ সালে ৩৩ হাজার তোলা স্বর্ণ বেআইনি ভাবে আমদানীর সময় ধরা পড়িয়াছিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসেও ৮৯৮৪ তোলা স্বর্ণ বেআইনি ভাবে ভারতে আমদানীর সময় ধরা পড়িয়াছে। এই সকল জুয়াচোরের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না হইলে ভারতে জুয়াচুরি বন্ধ করা যাইবে না।

গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা—

১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ সমগ্র ভারতে মোট ৮৩০৯৩টি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ছিল। তাহার পর প্লানিং কমিশনের নির্দেশ মত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ গ্রাম-পঞ্চায়েতের সংখ্যা হইয়াছে ৯৮২৫৬—প্রথম ৩ বৎসরে মোট ১৫১৬৩টি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে। সারা ভারতে গ্রামের সংখ্যা ৫৮৩৮৭৪—তন্মধ্যে ২৯৪৮৭০টি গ্রাম এলাকায় পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 'ক' শ্রেণীর সকল রাজ্যে, 'খ' শ্রেণীর সকল রাজ্যে ও 'গ' শ্রেণীর মাত্র ৬টি রাজ্যে (আজমীর, ভুপাল, কুর্গ, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ ও বিন্ধ্যপ্রদেশ) পঞ্চায়েৎ আইন পাশ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ আইন রচিত হইয়াছে—সেখানে ও বিশেষ আদেশে কয়টি পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কার্য্যের ভার পঞ্চায়েৎকে দেওয়া হইতেছে। সেজন্য ভূমি রাজস্বের একটি অংশ পঞ্চায়েতকে প্রদান করা হয়। ১১টি রাজ্যে পঞ্চায়েৎ সম্পাদক ও পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সত্বর পঞ্চায়েত স্থাপন প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় মিউনিসিপালিটী ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলি প্রায় অচল—পুরাতন আইনে তাহাদের বর্তমান অবস্থায় কার্য্যকরী করা যায় না। কাজেই পঞ্চায়েৎ আইন নূতন অবস্থায় উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নূতন সদস্য—

১লা ডিসেম্বর দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। সম্ভবত তাঁহাকে স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে।

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি—

১৯৫৪ সালের প্রথম ৬ মাসে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মোট ৬৬১টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতে ৬৯৭জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। তদন্তের পর ৬৩টি অভিযোগ মামলার জন্য আদালতে দেওয়া হয় ও ১১৩টি অভিযোগ সম্বন্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। আদালতের বিচারে ৯জন সরকারী কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছে। বিভাগীয় ব্যবস্থায় ১৫জন সরকারী কর্মচারীর চাকরী গিয়াছে। ১৩জনকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৫জন আদালতের বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তদন্তের সময় ২২৫টি অভিযোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সংবাদ প্রকাশ করার সার্থকতা আছে। সাধারণত দেশবাসী সামান্য অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কাছে অভিযোগ প্রেরণ করেন না—তাহার ফলে অপরাধীরা ভবিষ্যতে আরও বেশী অপরাধ করার সাহায্য পায়। দেশবাসী সকল সময় সাবধানতার সহিত কার্য্য করিলে ও অভিযোগ জানামাত্র তাহা জানাইয়া দিলে ক্রমে সে সকল অপরাধ কমিয়া যাইবে। অভিযোগসমূহ গ্রহণের জন্য সরকার পক্ষ হইতে ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

চীন অবরোধে আপত্তি—

চীনা কম্যুনিষ্টগণ কর্তৃক যে সকল মার্কিণ বৈমানিক ও সামরিক ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের মুক্তিসাধনের উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট চীনকে নৌবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ করার প্রস্তাব হওয়ায় মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ জন ফষ্টার ডালেস গত ২৯শে নভেম্বর উহার বিরুদ্ধে মত -

প্রকাশ করেন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মার্কিণ অধিকার রক্ষার প্রস্তাব করেন। ৩০শে নভেম্বর প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারও মিঃ ডালেসের উক্তি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা কম্যুনিষ্ট চীনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধের সমতুল্য কার্য্য' করিতে সম্মত হইবেন না। স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কম্যুনিষ্টদের আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতা নূতন ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বের তাহা চিন্তার কারণ হইয়াছে। তথাপি শান্তিকামী দেশসমূহ এখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইবে না। শেষ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্টরাই বিশ্বের তৃতীয় মহাযুদ্ধের কারণ হইবে কিনা কে জানে?

রাশিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান—

সারা ইউরোপ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাশিয়া যে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিল ২৯শে নভেম্বর বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ২৯শে নভেম্বর সোভিয়েট রুশিয়া, আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গারী, পোলাণ্ড ও রুমানিয়া এই ৮টি মাত্র কম্যুনিষ্ট দেশের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। চীনের একজন প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষক রূপে উপস্থিত ছিল। যাঁহারা সম্মিলনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহারা জানাইয়াছেন—আগে জার্মান প্রশ্নের মীমাংসা ও অষ্ট্রিয়া চুক্তি স্বাক্ষর প্রয়োজন, তবেই সারা ইউরোপে নিরাপত্তার কথা আলোচনা করা যাইবে। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ওলন্দাজ, ইটালী, আইসল্যাণ্ড, গ্রীস, তুরস্ক ও লাকসেমবার্গ বৃটেনের সহিত একমত হইয়া সম্মেলন বর্জন করিয়াছে। কাজেই দেখা যায়, রুসিয়ার পক্ষে ৮টি ও বিপক্ষে ১২টি দেশ মত প্রকাশ করিয়াছে। এই মতভেদ দূরীভূত না হইলে ইউরোপে বা সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে না।

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৩৭টি পরিকল্পনা পাওয়া গিয়াছিল—সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঐ কার্য্য বাবদ ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ঋণদান করিবেন। পল্লী অঞ্চলে যথাসম্ভব সস্তাদরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করাই সরকারের নীতি।

অক্ষর ব্রহ্ম

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ এম-এ

যার ক্ষর নাই, চলন নাই অর্থাৎ ধ্বংস নাই, তাকেই বলা হয় অক্ষর। ক্ষর শব্দের অন্তঃস্থ র স্থানে যদি অন্তঃস্থ য ধরা হয় তবে ব্যাখ্যা করতে হবে যার ক্ষয় নাই তাই অক্ষর। ক্ষয় শব্দের অর্থ ক্ষতি বা মৃত্যু। যাঁর মৃত্যু নাই তিনিই অক্ষর। মৃত্যু নাই কার? যার জন্ম নাই তারই মৃত্যু নাই, পক্ষান্তরে বলা যায়—যার জন্ম আছে তারই মৃত্যু আছে—যদ্ যদ্ জন্যং তৎ তৎ ক্ষয়ি (কারণ-নিমিত্তকম্)। যার যার জন্ম আছে, তার তার ক্ষয় আছে। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে জন্ম কার নাই এবং ক্ষর বা মৃত্যু কার নাই, তিনিই হবেন অক্ষর। একেই বলে 'নেতি' 'নেতি' পদ্ধতি। ন+ইতি=নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়, ইহা অক্ষর নয়।

গীতার অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে পরম ব্রহ্ম হলেন অক্ষর। 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম।' এখানে একটা অবান্তর কথা বলে রাখি:—ঐ তৃতীয় শ্লোকটীতে কোনো কোনো পুস্তকে পাঠান্তর দেখা যায় 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।' এই দুইটী পাঠের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ? আমাদের মত ছন্দোবাগীশদের ছন্দ (বা অভিপ্রায়) অনুসারে ছন্দঃ রক্ষার জন্য 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম'ই শ্রেয়ঃ। কেননা ইহাতে অনুষ্টপ্ ছন্দের ষষ্ঠ অক্ষরটি গুরু হয়। আর অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বল্লে সেই লক্ষণটি মারা পড়ে। কবিরা যদিও নিরঙ্কুশ, তবুও ছন্দোরক্ষার জন্য অঙ্কুশের ঘা খেতে হয়; কেননা 'বরং মাষং মষং কুর্য্যাৎ ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।' ছন্দোরক্ষার জন্য যদি কোনও স্থানে মাষ শব্দকে মষ রূপে ব্যবহার করতে হয় তাও ভাল, তবু ছন্দোভঙ্গ করবে না। অতএব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম এরূপ ছন্দঃ মেনেই বরং চলা যাক্।

শ্রীধর স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করলেন—ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং। যিনি ক্ষরিত হন না, চলিত হন না, তিনি অক্ষর। তাহ'লে জীবাত্মাও অক্ষর হ'তে পারে? এই হেতু বিশেষণ পদ দেওয়া হ'য়েছে 'পরমং'। যিনি জীব ও জগতের পরম কারণ বা মূল কারণ তিনিঅক্ষর, তিনি ব্রহ্ম। রাজর্ষি জনকের সভাতে যাজ্ঞবল্ক ঋষি বিদুষী গার্গীকে বলছেন—'এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তীতি শ্রুতেঃ। এই সেই অক্ষর গার্গি, যার নাম বলতে পারি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিদ্ (ব্রাহ্মণ)গণ তাই বলে' গেছেন। ইহাই পরম তত্ত্ব বা পরম সত্য—কেননা শ্রুতিতেও তাই শুনা আছে।

গীতার দশম অধ্যায়টিতে অনেকে তেমন আগ্রহ বা আদর দেখায় না যেহেতু ঐ অধ্যায়ের টীকা-অংশ খুব কম। কিন্তু অনুশীলন করলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, আবিষ্কৃত হয়। বিভূতি যোগের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে পরবর্ত্তী বিশ্বরূপদর্শন চক্ষুর বিষয়ীভূত বা আত্মগত করা অসম্ভব। অতএব বিভূতি যোগের (বা ১০ম অধ্যায়ের) কোনো কোনো অংশকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এই যোগের ২৫তম শ্লোকে বলা হ'য়েছে—'গিরা মস্ম্যেকমক্ষরম্।' গির্

শব্দের অর্থ বাক্য। 'ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীঃ বাক্ বাণী সরস্বতী।' অতএব ঐ শ্লোকাংশের অর্থ ধরা হ'য়েছে যদি লক্ষণাক্রান্ত বাক্যসমূহের মধ্যে আমি (ভগবান্) এক অক্ষর।

সেই অধ্যায়েরই ৩,৩ শ্লোকে বলা হ'য়েছে 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'—অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি 'অকার'। অতএব লক্ষ্য করতে হবে গির্ (গীঃ) ও অক্ষর এই দুইটি শব্দের উপর। গির্‌সমূহের মধ্যে ভগবান্ হ'লেন একটি অক্ষর, আর, অক্ষরসমূহের মধ্যে তিনি হ'লেন অকার।

অক্ষর শব্দের উত্তর বহুবচন দেওয়া আছে 'অক্ষরাণাম্'—আবার এক-মক্ষরম্ স্থলে একবচনও দেওয়া আছে। কিন্তু অকারোঽস্মি স্থলে অকার এক। একাক্ষরকোষে ধরা আছে। 'অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ।' অকার বল্‌তে বাসুদেব। এখন একটু আলোচনার দিকে যাওয়া যাক—বহুবচন স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি বহু বহু অক্ষরের বা বর্ণের সংখ্যা মেনে নিতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সেই সংখ্যাকে ধরা হ'য়েছে পঞ্চাশ। তার মধ্যে আদি অক্ষর অ। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এই অ শব্দটি প্রথম: যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী, মাগধী, সৌরাষ্ট্রী, আসামী, বাঙ্গালা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষামূলক ভাষাতে আদি অক্ষর অ, বৈদেশিক লাটিন, ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইংলিশ প্রভৃতিতে A, আরবি ফারসী, উর্দ্দু প্রভৃতিতে আলেফ্। ইহা হইতে সংখ্যাতত্ত্ব আল্‌ফা, বীটা ইত্যাদি।

গীতার বক্তা ভগবান্ শুধু অ শব্দটিকে আদি বলে' ক্ষান্ত হলেন না। অ প্রভৃতি পঞ্চাশদ্ বর্ণাত্মক পদকদম্ব মধ্যে তিনি এক অক্ষর। বর্ণসমূহ মধ্যে তিনি অ, এবং পদসমূহ মধ্যে তিনি এক, একে তিন। এর অর্থ কি? ব্যাখ্যাকারগণ বলেন তার নাম প্রণব। আচার্য্যপাদ শঙ্কর বললেন প্রণব ওঙ্কার।

গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষরমোঙ্কারোঽস্মি। পদ-লক্ষণাক্রান্ত বাক্যসমূহের মধ্যে আমি এক অক্ষর, অর্থাৎ ওঁ। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু।" সমস্ত বেদের মধ্যে আমি প্রণব (ওঁ)। এই কারণে প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে প্রণব-ব্যবহার। অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বললেন 'ওম্' (=ওঁ) এই একাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মস্বরূপ, এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যে-ব্যক্তি দেহত্যাগ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই স্থানেও বলা হ'য়েছে একাক্ষর ব্রহ্ম ওম্। স্থূল চক্ষুতে এই স্থানে দুইটি অক্ষর দেখা যায় ও এবং ম্ (অথবা ৺), সন্ধি বিশ্লেষ করলে দেখা যায় তিন অক্ষর অ+উ+ম্। সাধারণ ব্যাখ্যায় অকারে বাসুদেব বিষ্ণু, উকারে ব্রহ্মা এবং মকারে রুদ্র। এই তিন দেবতা যেন এক অঙ্গে গলাগলি হ'য়ে বাস করছেন। পালনকর্ত্তা অ, সৃষ্টিকর্ত্তা উ এবং সংহার কর্ত্তা ম, যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তিনে এক, একে তিন।

উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অপর একস্থলে বলেছেন—হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মেরই অনুশাসনে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিধৃত আছে; পৃথিবী এবং আকাশ এরই শাসন মেনে চলছে।

অস্যৈব হি প্রশাসনে গার্গি
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

(পাঠান্তর:—এতস্য হ প্রশাসনে ইত্যাদি)

আচার্য্যপদে শঙ্করের ভাষ্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আনন্দগিরি বলেছেন—পরম ব্রহ্ম জীবদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবাত্মারূপে অনুভূত হন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। সেই পরমাত্মার বিভাব জীবাত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা যেন জীবাত্মাতে প্রবেশ করে আছেন।

তবে কি পরম ব্রহ্মের কোনরূপ অংশাংশীভাব স্বীকার করতে হবে? বেদান্ত দর্শন বলেছেন 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ'। নানা জীবের মধ্যে নানা নামে নানা ভাবে অবস্থিত, সেইজন্য পরমাত্মারও অংশ স্বীকৃত। এই মত পোষণ করেন শ্রীধরাচার্য্য। তিনি লিখলেন—

স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ;
স এব আত্মানমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেন উচ্যতে।
৮ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

পর ব্রহ্মেরই অংশ স্বরূপ জীবাত্মাভাবে যে স্থিতি সেইটি হচ্ছে পরম ব্রহ্মের স্বভাব।

পর-ব্রহ্ম যদি সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রের দীপ্তি-বিধানের হেতু হয়, তবে অনুধাবন করতে হবে ঐ একমাত্র জ্যোতি যা সমস্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মূলীভূত কারণ; এই সূক্ষ্ম জ্যোতিকণা নিখিল জগতে পরিব্যাপ্ত, উহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই। একে যদি কেউ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলে বলুক; কেউ যদি চিন্ময় বা চৈতন্যময় চিৎ পদার্থ বলে বলুক, আমরা ধরব উপনিষদের বাণী—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র-তারকম্,
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ?
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

সেই পরমজ্যোতিতে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকার জ্যোতি নিষ্প্রভ, এই সমস্ত বিদ্যুতের দীপ্তিও সেখানে বিকাশ পায়না, আগুনের কথা আর কি বলব? সেই একমাত্র দীপ্তিমান্ মহাজ্যোতিকে অনুসরণ পূর্ব্বক সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রতিভাত হয়, তাহারই দীপ্তিদ্বারা নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতি ধারণ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে এরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভা-সদৃশী যা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১শ, ১২।

আকাশে যদি এককালে সহস্র সূর্য্যের আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের জ্যোতির তুল্য জ্যোতি হ'লে হ'তে পারে। অস্ ধাতু বিধিলিঙে 'স্যাৎ', এর অর্থ may be=হ'লে হ'তে পারে। যদি অস্তি বা ভবিষ্যতি বলা হ'তো তবে আর 'সদৃশী' বিশেষণের দরকার পড়ত না।

অর্জুনের তপস্যা, ভক্তি ও ভাগ্য ছিল ভালো, সেইজন্য তিনি সেই পরমপুরুষ বিশ্বরূপের অপরূপ রূপ দর্শনে সমর্থ হ'লেন। আমাদের মধ্যে

তেমন তপস্যা কি কারুর হবে যিনি লাভ করবেন ভগবৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু এবং সেই চক্ষুদ্বারা দেখ্‌বেন অপ্রত্যক্ষ পরোক্ষ পদার্থ। নিখিল জগতের আদিভূত এই পরম পদার্থ এবং অক্ষর পদার্থ যে একই তা-ই আরো কিছু নিবেদন কর্‌ছি।

ক্ষর নাই যাঁর তিনিই অক্ষর—এই তথ্যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যিক সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বলেন স্থূলপদার্থ রসপদার্থে পরিণত হয় এবং রস পদার্থ বাষ্পাকারে পরিণত হ'য়ে বাতাসে এবং আকাশে মিশে। দার্শনিক বলেন অনুলোম সৃষ্টি হ'তে প্রতিলোম সৃষ্টি দ্বারা স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যক্তি। সাহিত্যিকগণ বলেন —রসাত্মক বাক্যই হ'লো কাব্য, সেই রস হ'লো 'রসো বৈ সঃ'। একমাত্র আনন্দময় পদার্থই হ'লো রসে ভরপুর রসময়। শ্রুতি বল্‌ছেন—

রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।

নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ আসে ঐ একমাত্র রসের অনুভূতি দ্বারা। মাটী, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ এই পঞ্চভূতের ভদ্র সংজ্ঞা হ'লো ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম। তা ও আবার সব ভূত একত্র আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে পরিণত হয় ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমরূপে। ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্‌ লঘু, অপ্‌ অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা মরুৎ, মরুৎ অপেক্ষা ব্যোম লঘুতর। এর পরেও কিছু লঘু আছে যাকে লঘুতম বলা যেতে পারে? হাঁ তা আছে; বৈজ্ঞানিকগণ বলেন তা Ether (ইথার), দার্শনিকগণ বলেন তা কারণ বায়ু। সাহিত্যিক বলেন—

জল যাবে সেই জলাধারে,
তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে
রন্ধ্রগত বায়ু আমার
মিশ্‌বে মহা সমীরণে;
আমি যাই-রে সেই আনন্দ কাননে।

মৃত্যুর সময় জীবের নব-রন্ধ্রগত স্থূলবায়ু মহাবায়ুতে (মহা সমীরণে) মিলে যায়। সেই মহাবায়ুতে, অর্থাৎ কারণবায়ুতে বা সূক্ষ্মবায়ুর প্রতি অণুতে সূক্ষ্ম আকাশের চির মেশামেশি। সেখানে ধ্বনিত হচ্ছে অনাদি অনন্ত অনাহত ধ্বনি। এই ধ্বনিতে আকাশে ও বাতাসের আঘাতের প্রয়োজন হয় না, তাই অনাহত। এই ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে নিখিল বিশ্বে, নিখিল জীবের অন্তরে, তাই একে অন্তর্যামী নাম দেওয়া যায়। এই ধ্বনিই গম্ভীর নাদ প্রণব ঝঙ্কার—ওঙ্কার।

মানবের নাভিকমল হ'তে এই নাদ ওম্‌ আকারে সহস্রদল কমলে অনুক্ষণ অনুরণিত, নাসারন্ধ্রদ্বারা বহির্গত হ'য়ে এবং পুনরাগত হ'য়ে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত। কেউ বলে' দেয় না, কেউ কিছু দ্বারা আঘাত করে না, তবু এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি চলছে সোঽহং (অহং সঃ), সে-ই আমি, আমিই সেই, জীবাত্মার ভিতরে যে-অক্ষর পরমাত্মাতেও সেই অক্ষর—ওম্‌। পূর্ব্বে বলেছি অ+উ+ম্‌ এই তিনটী বর্ণের সমষ্টি ওম্‌। পঞ্চাশটী বর্ণের মধ্যে এই তিনটীকে শুধু ধরা হ'লো কেন? অ+ই+ক্‌=এক্‌, বা ৠ+অ+প্‌=রূপ্‌ ইত্যাদি তো ধরা হ'লো না? তার উত্তরে আমাদিগকে একটু সূক্ষ্ম অনুশীলনে পৌঁছ্‌তে হয়।

আমরা বল্‌ব অ, উ, ম এই তিন ধ্বনিরই অন্তর্গত ৫০টি ধ্বনি (বা ৫০ বর্গ)। আকারাদি ৪১টী ধ্বনি ওষ্ঠদ্বয়ের বিস্ফোরণে প্রকাশ পায়, উ ঊ ও ঔ ৪টী ধ্বনি ওষ্ঠদ্বয়ের সঙ্কোচনে এবং প ফ ব ভ ম ৫টী ধ্বনি ওষ্ঠদ্বয়ের সম্মেলনে প্রকাশ পায়। বিস্ফোরণের প্রতিভূ 'অ', সঙ্কোচনের 'উ' এবং সম্মেলনের 'ম', এই হ'লো মানবের অভ্যন্তর জগতের নিরন্তর প্রবাহিত নাদ। বহির্জগতের নামও তাই। কাজেই গীতাতে বলা হ'য়েছে 'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্‌।'

সাধক যদি বলে ওম্‌ আমার সাধ্য, আমি সাধক, তবে সাধন কি? ঐ তিনটী অক্ষরকে একটু ওলট পালট করে নিলেই সাধন শব্দটী বের হ'য়ে আসবে, উ+অ+ম্‌=বম্‌। সত্য শিব সুন্দরের সাধনায় বম্‌ বম্‌ ধ্বনিই সাধন। তাই সাধকের গান সার্থক—

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে
গাল বাজালে হয় খুশী,
মান অপমান সবাই সমান,
তার কাছে নয় কেউ দোষী।

তন্ন তন্ন করে' দেখা যায় নিখিল বিশ্বের মূল যিনি তিনিই পরম জ্যোতি চরম পদার্থ, তিনিই অক্ষর, তিনিই ওম্‌।

অক্ষর-ব্রহ্ম-ভাব সর্ব্বসাধারণের অনুভূতির অতীত, কাজেই উপাসনারও অতীত। ওঙ্কাররূপ প্রতীক দ্বারা সেই ব্রহ্ম সগুণ বা সাতিশয় পরমেশ্বরভাবেই ধ্যেয়। বর্ণাত্মক অক্ষরব্রহ্মের চারি অবস্থা। ১। পরা। ২। পশ্যন্তী ৩। মধ্যমা এবং ৪। বৈখরী। পরা বা পরমা অবস্থা বীজ অবস্থা, যাকে বলা যায় চরম তত্ত্ব। পশ্যন্তী বা অনুভাব্য অবস্থা, শুধু অনুভব করা যায়, আধ আধ দেখা যায় এরূপভাব (দৃশ্‌+শতৃ+ই)। তৎপরবর্ত্তী অবস্থা মধ্যমা, ইহা সাধকের অন্তরে ধ্বনিত হয় কিন্তু অপরের অনধিগম্য। বৈখরী বা পূর্ণ প্রকাশ অবস্থা, ইহা সাধকের বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যে প্রকাশ পায় এবং বহির্জগতে অপরের শ্রুতিগম্য।

ওম্‌ নাদের ভিতরে অ পরিপূর্ণ ব্যক্ত স্বর, উ মধ্য-ব্যক্ত এবং ম অব্যক্ত অস্ফুট ধ্বনি। তান্ত্রিকগণ তারও উপরে উঠেন, তাঁরা বলেন ম্‌ স্থানে ং অথবা চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগে ওম্‌ স্থলে ওঁ উচ্চারণ সম্ভব, কিন্তু এই বিন্দুর উপরেও কলা, তারপর নিষ্কল। ওঁ। ম্‌ এবং বিন্দু উভয় সহিত ওঁম্‌।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার উপর চতুর্থ অবস্থা-তুরীয়। তার উপর তুরীয়াতীত, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। এর প্রতীক অ উ ম, নাদ বিন্দু, কলা ও নিষ্কল অবস্থা। স্থূলভাবে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম, ব্যোমাতীত, সৎ। উপনিষদের বাণীতে অন্নময় কোষ, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, চিন্ময় ও সৎ।

বাজে অনাহত ধ্বনি নিরন্তর জগতে ও জীবে,
শব্দব্রহ্ম মহামন্ত্র প্রকাশিত নিত্য সত্যশিবে।
সেই মন্ত্র সাধকের চিত্তে তোলে অব্যক্ত ঝঙ্কার,
ক্ষরদেহে অক্ষরেরে পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই হোটেলের বিরাট কাঁচের জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখি—সোনালী রোদের বদলে সারা আকাশ ছেয়ে আছে বাদলের কালো মেঘে ! বিদেশে বেড়াতে এসে আচম্কা এই বর্ষার ঘনঘটা দেখে, পাছে জল-কাদার উপদ্রবে আমাদের চারিদিক দেখাশোনার অসুবিধা ঘটে—এ-আশঙ্কায় মন গেল রীতিমত মুশড়ে ! তবে, স্নানাদির পালা সেরে হোটেলের খানা-কামরায় সদলে এসে জড় হতেই সোভিয়েট-সহচরী আলেক্জান্দ্রোভা যখন জানালেন যে প্রাতঃরাশের পর আমাদের সবাইকে তাঁরা সেদিন সকালে রুশ-রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় চিত্রশালা—মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 'ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারী' (Tretyakov Art Gallery) দেখাতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন, তখন মুশড়ে-পড়া মন আবার ভরে উঠলো উৎসাহে। কারণ, শুধু পথে-ঘাটে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে মিশে বেড়ালেই কোনো দেশের পুরো-পরিচয় মেলে না…সেখানকার আসল-পরিচয় পেতে হলে সে-দেশের সংস্কৃতি-শিল্পকলা-সাহিত্যের বিষয় জানাও বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাতরাশের পালা চুকিয়ে সোভিয়েট-সরকারের ছু'খানি সুদৃশ্য বিরাট 'Zis' মোটর গাড়ীতে চড়ে ওদেশী-বন্ধু আলেক্জান্দ্রোভা আর আনাতোলীর সঙ্গে আমরা সদলে রওনা হলুম মস্কোর 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার উদ্দেশে। এ-পথ, সে-পথ, সহরের বহু পথ মাড়িয়ে আমাদের মোটর অবশেষে এসে থামলো—প্রাচীন রুশ-স্থাপত্যশিল্পের ছাঁদে গড়া, বিচিত্র কারুকার্য্য-শ্রী-মণ্ডিত বিরাট এক অভিনব-ভবনের সামনে। বাইরে থেকে দেখলে, একালের অভিকায় সোভিয়েট-সৌধরাজির তুলনায় এ-ভবনটিকে আকারে নিতান্তই ছোট বলে মনে হয়…তবে ভিতরে প্রবেশ করার পর ওদেশের প্রাচীন ও আধুনিক চিত্র-ভাস্কর্য্যের অসংখ্য নিদর্শনে ভরে সাতান্নটি সুবিশাল প্রদর্শনী-কক্ষ আর সুপ্রশস্ত দালান যখন নজরে পড়ে, তখনই বোঝা যায় যে এই চিত্রশালাটি আয়তনে কতখানি বিরাট !

মস্কোর ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারীর বাইরের দৃশ্য

'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার অতীত-ইতিহাসও অপরূপ বিচিত্র ! গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'জার্'-সম্রাটদের আমলে, পাভেল ট্রেটিয়াকভ্ (Pavel M. Tretyakov) নামে রুশদেশের সম্ভ্রান্ত-অভিজাত বিশিষ্ট-শিল্পরসিক এক ধনী মস্কো সহরের বুকে এই অভিনব চিত্রশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোক হলেও, পাভেল ট্রেটিয়াকভ্ মনে-প্রাণে ছিলেন জাতীয় শিল্পকলার পরম অনুরাগী। সেকালের অভিজাত রুশ-ধনীদের মত অসার বিলাস-ব্যসন আর অনাবশ্যক সৌখিন খেয়ালের পিছনে অনর্থক অর্থ-অপব্যয় না করে তিনি স্বদেশের নানান্ অপরূপ শিল্প-সম্পদ সংগ্রহে ভরে তুলেছিলেন তাঁর এই প্রাসাদ-ভবনের কক্ষ-অলিন্দগুলি। প্রথমে এটি ছিল তাঁর নিজের সৌখিন ব্যক্তিগত

চিত্রশালা...পরে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে শিল্পানুরাগী ট্রেটিয়াকভ্‌কে যখন ঘন-ঘন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য সফর করে বেড়াতে হয়, তখন সে-সব দেশের বিশিষ্ট চিত্রশালাগুলিতে সেখানকার বিবিধ শিল্প-সংগ্রহের বিচিত্র নিদর্শনরাজি দেখে মোহিত হয়ে তিনি মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করেন যে রাশিয়াতেও এমনি একটি জাতীয় কলা-ভবন প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। নিঃস্বার্থ-স্বদেশপ্রেমী ট্রেটিয়াকভ্‌ আরো অনুভব করেন—রাশিয়ার বুকে এ-ধরণের একটি চিত্রশালার প্রবর্ত্তনে শুধু যে দেশের কৃতী

স্বর্গের দূত মিখাইল—রুশদেশের প্রাচীন 'আইকনের' প্রতিলিপি
(চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিল্প নিদর্শন)

শিল্পী-কারুকার-ভাস্করদের বিচিত্র শিল্প-রচনার অপরূপ কীর্ত্তি-সম্পদ চিরদিনের মত সঞ্চিত রাখার সুযোগ মিলবে তাই নয়, রুশ-অধিবাসীদের মনে স্বদেশী শিল্প-কলার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ-সহানুভূতি আর নিষ্ঠা-অনুরাগের মহান্‌ অনুপ্রেরণা জাগিয়ে জাতীয় কৃষ্টি-ঐতিহ্যের গৌরব-রক্ষার বিষয়েও তাঁদের রীতিমত সচেতন করে তোলা যাবে। তাছাড়া স্বদেশী শিল্প-কলার গরিমাময়-নিদর্শনে সজ্জিত এমনি একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার ফলে, দেশের অশিক্ষিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জন-সাধারণের বিকৃত-রুচি আর পশ্চাদপদ-দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রুশ-রাজ্যের প্রাচীন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও যে সবিশেষ রূপান্তর ঘটবে—দূরদর্শী ট্রেটিয়াকভের এই ছিল বদ্ধমূল ধারণা! তাই রাশিয়ার বুকে জাতীয় শিল্প-কলার অভিনব চিত্রশালা স্থাপনের মহৎ-সঙ্কল্প নিয়ে পরম-উৎসাহে অক্লান্ত-প্রচেষ্টায় সারা দেশ তন্ন-তন্ন ভাবে খুঁজে বেড়িয়ে তিনি বহু কষ্টে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে স্বদেশী-শিল্পের অনেক সব বিচিত্র-অপরূপ শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করে এনে সযত্নে সাজিয়ে রাখেন তাঁর এই মনোরম মস্কো-প্রাসাদের কক্ষ-অঙ্গনে! ট্রেটিয়াকভের বিশেষ ঝোঁক ছিল—রুশদেশের প্রাচীন আমলের 'আইকন্‌' (Iken) বা ঘরোয়া-দেবতাদের মূর্ত্তি-প্রতিলিপি সংগ্রহের দিকে...কারণ, তাঁর মতে, এগুলিই হলো নাকি ওদেশী লোক-কলার সবচেয়ে সেরা নিদর্শন! তাই ট্রেটিয়াকভের সংগৃহীত রুশীয় শিল্প নিদর্শনগুলির অধিকাংশই হলো—পুরোনো যুগের ছোট-বড় নানান্‌ ছাঁদের বিচিত্র কারুকার্য্য-নক্সায় সজ্জিত ওদেশী গৃহ-দেবতাদের মূর্ত্তি-চিত্র বা 'আইকন্‌'...কোনোটি সোনার পাতে গড়া, কোনোটি রূপো বা তামার পাত দিয়ে তৈরী, কোনোটি পাথরে খোদাই করা, আবার কোনোটি বা কাঠের রচিত—অপরূপ বর্ণচ্ছটায় রঙীন! সোভিয়েট আমলের আগে, সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শো বছর ধরে, রুশদেশের প্রতি গৃহেই গৃহ-দেবতাদের এই মূর্ত্তি-প্রতিলিপি বা 'আইকন্‌' রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল বেশ ব্যাপক ভাবে। সুদূর অতীতে ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের 'বাইজান্‌টাইন্‌' (Byzantine) ধর্ম্মযাজকদের কাছে রুশ-রাজ্যের আদি রাজা রুরিকের (Rurik) পুত্রবধূ সম্রাজ্ঞী ওল্‌গার (Princess Olga) খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর সারা দেশের প্রজারা যখন দলে-দলে নিজেদের সাবেকী পৌত্তলিক উপাসনার সনাতন-মন্ত্র বিসর্জ্জন দিয়ে বৈদেশিক 'রোমান ক্যাথলিক' (Roman Catholic) ধর্ম্মের নবীন-মন্ত্র বরণ করে নিলেন—তখন থেকেই ওদেশের ঘরে-ঘরে এই 'আইকন্‌' বা গৃহ-দেবতার মূর্ত্তি-ফলক রাখার সূত্রপাত ও ব্যাপক প্রসারতা ঘটে। 'জার্‌'দের আমোলে যুগ-যুগান্তর ধরে স্বার্থান্বেষী রুশ-ধর্ম্মযাজকদের অপ্রতিহত-ধর্ম্মোন্মাদনার দাপটে ধর্ম্মের গোঁড়ামী আর অন্ধ-কুসংস্কারের মোহ দেশের অশিক্ষিত-পশ্চাদপদ জনসাধারণের মন এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, পাছে কোনো অমঙ্গল ঘটে—এ-আশঙ্কায় 'আইকন্‌'-পূজার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে এতটুকু প্রতিবাদ জানানোরও সাহস ছিল না কারো। শুধু দেশের দীন-দরিদ্র জনসাধারণই স্বয়ং 'জার্‌'-সম্রাট, রাজপরিবারের লোকজন, দরবারের আম্‌লা-অমাত্য, মন্ত্রী-সেনাধ্যক্ষ এবং রাজানুগৃহীত অভিজাত-ধনীরাও প্রতিপদে 'আইকনের' সামনে দাঁড়িয়ে গৃহ-দেবতার আশীর্ব্বাদ কামনা করে সভক্তি-প্রণাম জানাতেন—বিপদে মনের বল আর অভীষ্ট কর্ম্মে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে! সেকালের রুশ-অধিবাসীদের এই অস্বাভাবিক মানসিক-দৌর্ব্বল্য আর কুসংস্কারান্ধ-ধর্ম্মভীরুতার ফলেই 'আইকন্‌'-পূজার রেওয়াজ ওদেশে এমন ব্যাপক-প্রসারতা ও সুদীর্ঘ-স্থায়ী হবার সুযোগ লাভ করে। তবে সুখের বিষয় যে, সোভিয়েট-আমলে ধর্ম্ম-গোঁড়ামীর এই সনাতন-প্রথা আর

রাশিয়ার নয়া লোক সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত হতে চলেছে···মূর্ত্তি-প্রতিলিপি 'আইকন্' এখন আর ভজন-পূজন-আরাধনার উপকরণ নয়—ওদেশের অতীত ইতিহাসের অমূল্য স্মৃতি-সম্পদ···জাতীয় চিত্রশালায় বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শন···কলা-রসিকদের কক্ষ-সজ্জার অভিনব সামগ্রী !

অতীতের এই সব অপরূপ 'আইকন্-মূর্ত্তিলিপি সঙ্কলন ছাড়া, ট্রেটিয়াকভ্ পরম অধ্যবসায়ে রুশদেশের প্রাচীন ও সমসাময়িক যুগের লেভিতান্, শিল্দার্, ক্রাভিৎস্কী, পুকিরেভ্ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিল্পীদের চিত্র রূপ-সৃষ্টির নানান্ নিদর্শনও সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তাঁর চিত্রশালায়। এমনি একনিষ্ঠ-আগ্রহে শিল্প-সংগ্রহের ফলে, ১৮৭২ সালে ট্রেটিয়াকভের কলা-ভবনে সঞ্চিত-চিত্রের সংখ্যা হয়ে ওঠে পাঁচশোরও বেশী ! জাতীয় শিল্প-কলা প্রসারের প্রাথমিক-উদ্যমে সফলতা লাভ করে ট্রেটিয়াকভ্ প্রবল উৎসাহে স্বদেশী শিল্পীদের আরো নানান্ সব নিদর্শন সংগ্রহের নেশায় মেতে উঠলেন। তাঁর এই ঐকান্তিক-চেষ্টায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই চিত্রশালার অপরূপ শিল্প-নিদর্শন-রাজির সংখ্যা এমনই বিপুল হয়ে ওঠে যে ১৮৮০ সালে সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় স্থপতি-বিশারদ ভিক্টর ভাস্‌নেৎসভের (Victor Vasnetsov) পরিকল্পনানুসারে নির্ম্মিত স্বদেশী ছাঁদের সম্পূর্ণ নূতন এক বিশাল কলা-ভবনে দেশের বিচিত্র শিল্প-সম্পদগুলি সযত্নে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেদিনের নূতন এই কলা-ভবনটাই হলো—আজকের প্রসিদ্ধ 'ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারী' ! কালক্রমে এখানকার শিল্প-সম্পদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে, ইদানীং সোভিয়েট আমলে সেকালের এই অভিনব কলা-ভবনটির সম্প্রসারণ ও পরিবর্দ্ধন ঘটেছে সবিশেষ।

যাই হোক্, সে-যুগে রুশ-রাজধানী মস্কোর বুকে ট্রেটিয়াকভের এই স্বদেশী শিল্প-কলার অপরূপ চিত্রশালাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জন-সাধারণের মনে অপূর্ব্ব এক কলানুরাগের ঝোঁক দেখা দিল ! এতকাল দেশের শিল্প-কলার বিষয়ে যাঁরা ছিলেন নিতান্তই উদাসীন, ট্রেটিয়াকভের চিত্রশালার দ্বার-উন্মোচনের পর তাঁরা সাগ্রহে এসে জড় হতে লাগলেন রুশ-শিল্পীদের বিচিত্র রূপ-সৃষ্টির পরিচয় জানতে ! দেশের জন-সাধারণের কাছে চিত্রশালার নব-নির্ম্মিত ভবন খুলে দেবার পর, ১৮৮১ সালে এখানে সারা বছরে এসেছিলেন মাত্র আট হাজার লোক, কিন্তু ১৮৯৮ সালে স্বদেশপ্রেমী কলা-রসিক ট্রেটিয়াকভ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন এই কলা-ভবনে পরিদর্শকের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক লক্ষেরও বেশী ! তাছাড়া বল্‌শেভিক্-বিপ্লবের পর, সোভিয়েট-ব্যবস্থায় 'ট্রেটিয়াকভ্' চিত্রশালার কলেবর ও শিল্প-নিদর্শন-রাজির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জনগণের কাছে এই জাতীয় কলা-কৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তাও বিশেষ বেড়ে ওঠে ! ১৯২০ সালে, সারা বছরে এখানে এসেছিলেন ওদেশের দুই লক্ষ অধিবাসী ; ১৯৩১ সালে এখানকার পরিদর্শকের সংখ্যা ছিল চার লক্ষেরও বেশী··· ১৯৪০ সালে এ চিত্রশালায় এসে জড় হয়েছিলেন পঁচাত্তর লক্ষ কলানুরাগী দর্শক ! ইদানীং-আমলে প্রতি বছর প্রায় এক কোটিরও বেশী লোকজন আসেন রুশদেশের এই সেরা চিত্রশালায়—স্বদেশী শিল্প-কলার অমূল্য সম্পদরাজি দেখতে !

কলা-রসিক ট্রেটিয়াকভের আন্তরিক বাসনা ছিল যে রুশ-রাজধানী মস্কো-সহরের বুকে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন—তাঁর এই অভিনব জাতীয়-শিল্পের চিত্রশালাটিকে ! সে-বাসনা সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্য আজ থেকে সুদীর্ঘ ষাট বছর আগে—১৮৯২ সালে মস্কো-সহরের সহরকর্ত্তাদের হাতে ট্রেটিয়াকভ্ তাঁর এই চিত্রশালাটি নিঃস্বার্থভাবে দান করে দেন···সেই থেকেই এটি হয়েছে এখন রুশ-জনসাধারণের অন্যতম জাতীয়-সম্পদ। চিত্রশালার রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ পরিবর্দ্ধন এবং কার্য্য-পরিচালনার দায়িত্ব-ভার এখন রুশবাসীদের হাতে···তবে তাঁদের হয়ে এ-সব ব্যাপারের দেখাশোনা করেন আজ মস্কো-সহরের সুনিপুণ সহরকর্ত্তারা !

মস্কোর ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারীর ভিতরের একটি চিত্র-প্রদর্শনী-কক্ষ—সামনে ওদেশের একদল কলানুরাগী দর্শককে মহিলা পরিচারিকা চিত্রগুলির শিল্প-কলার বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন

গাড়ী থেকে নেমে চিত্রশালার প্রবেশ-পথের দিকে এগুতেই 'ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারীর' বিশিষ্ট-কর্ম্মীর দল সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন কলা-ভবনের প্রৌঢ়া-অধ্যক্ষার দপ্তর-কক্ষে ! সুমিষ্ট-ভঙ্গিতে আমাদের ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে কলা-ভবনের প্রৌঢ়া-অধ্যক্ষা সাগ্রহে রাশিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-কলা-কৃষ্টির বিষয়ে মোটামুটি কিছু তথ্য-বিবরণ দিলেন। তাঁর কাছেই বিশদ-পরিচয় পেলুম এই 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার সম্বন্ধে। খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর, চিত্রশালার দুজন পরিচারিকা (Guides) এসে স্মিতহাস্যে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে সোৎসাহে আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার অপূর্ব্ব শিল্প-সম্পদ দেখাতে। ওদেশী শিল্প-কলার প্রত্যক্ষ-পরিচয় পাবার আগ্রহে অধ্যক্ষার কাছে তখনকার মত বিদায় নিয়ে, দপ্তর ছেড়ে সদলে এগিয়ে চললুম আমরা চিত্রশালার সুসজ্জিত-সুবিশাল কক্ষ-অঙ্গনের পানে। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যু ও তাঁর শবদাহের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরূপ—

"শরৎচন্দ্রের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া তিনি সুখেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ছিলেন।

সহসা তাঁহার স্ত্রী প্লেগ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া শয্যাশায়ী হইলেন। শরৎচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া মনের আবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশী কেহই নিজেকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা তিনি সেবক সমিতির সাহায্যের জন্য আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—'ভাই গিরিন, আমার বড় বিপদ—স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে।'

—'কি সর্বনাশ! বল কি শরৎদা? কে দেখছে?'

—'এখনও ডাক্তার ডাকতে পারি নি, মাস-কাবার, হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই।'

—'ভয় নেই, আমি অপূর্ব ডাক্তার কিংবা ডাক্তার দে'-কে সঙ্গে নিয়ে এখনই যাচ্ছি।'

—'ভাই, তুমি সৎকার সমিতি করে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছ, আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর।'

শরৎচন্দ্র গালে হাত দিয়া হতাশভাবে একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'কপাল ভাই, সবই কপাল। যেমন ভাগ্য নিয়ে এসেছিলাম—তাই ত হবে।'

আমি সমিতির আলমারী খুলিয়া রোগীর ব্যবহার্য কতকগুলি জিনিষপত্র, কিছু ঔষধ ও অত্যাবশ্যক দুএকটি উপদেশ দিয়া একখানি রিক্সা গাড়ী ডাকিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিলাম, রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ছটফট করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হইতেছে। একটি বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। ...এ পল্লীতে ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে কয়েকবার আসিয়াছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এই প্রথম। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, একটি বড় ঘরকে বেড়া দিয়া ভাগ করা হইয়াছে, ঘরের মধ্যেই রান্নাঘর, স্নানের জায়গা ও পাইখানা—চমৎকার ব্যবস্থা।...

রোগিণীর লক্ষণ দ্বারা ডাক্তার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। আমি কিয়ৎক্ষণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শরৎচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কাতর ভাব দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র রোগশয্যার পার্শ্বে উদাস মনে বসিয়া ছিলেন। এমন সময় একবার চকিতের ন্যায় তাঁর স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—'দেখ, তোমার অনেক অবাধ্য হয়েছি—সে সব আমায় ক্ষমা কর।' শরৎচন্দ্র আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'তুমি অমন করে কথা বললে বড় ভয় পাই যে, শান্তি!'

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ধরা গলায় শান্তি দেবী কহিলেন—'ছিঃ ভয় কিসের। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও, আশীর্বাদ কর।'

কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, আর আশীর্বাদ করিবার কিছুই নাই! কিছুতেই কিছু হইল না, শান্তি দেবী সংসারের দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি বাড়ী ফিরিবার পথে সমিতির দু'একটি স্বেচ্ছাসেবককে এই সংবাদ দিতে তাঁহারা প্লেগাতঙ্কে বড়ই ভীত হইয়াছেন জানাইলেন...। সাধারণ বন্ধুবান্ধব কয়েকজনের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেহ—'শরৎবাবু আবার বিয়ে করলেন কবে?' কেহ বা 'উনি ত আমাদের সমাজের লোক নন' বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন। হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্মশানে গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করিলাম এবং বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম...।

সেই গভীর রাত্রে তখনই শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণীর শবদাহ করিতেই হইবে। শরৎচন্দ্রের বাসা হইতে শ্মশানঘাট প্রায় সাত মাইল দূরে। শববাহী মাত্র আমি ও শরৎচন্দ্র, কি উপায় হইবে ভাবিয়া দিশাহারা হইলাম।

দেখিতে দেখিতে উন্মত্তের ন্যায় শরৎচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, মাথার চুল এলোমেলো, চরণদ্বয় নগ্ন, কণ্ঠস্বর রুক্ষ, বলিলেন—'ভাই, কোথায় সে চলে গেল, একদণ্ডে যেন একটা প্রলয় হয়ে গেল। কে কে শ্মশানে যাবে কিছু বন্দোবস্ত হ'ল কি?'

আমি সমিতির সভ্যগণের অবস্থা জানাইয়া বলিলাম—'শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হ'ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকত, তাহ'লে আজ ভাবতে হ'ত না। অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন বন্ধুবান্ধব তোমার স্ত্রীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেত, কিন্তু তুমি কখনও তাদের সঙ্গে মেশনি, তোমার বিবাহিত জীবনের কথা অনেকে জানেই না।...

আমি একা শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাড়ীতে চলিলাম। এই পথে তখন জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না।

……রাত্রি অনেক হইয়াছে, শান্ত প্রকৃতি নিঝুম, যেন কর্মক্লান্ত দেহখানি, অবশ হইয়া পড়িয়াছে।……শরৎচন্দ্রের চেহারা—পাগলের মত, দৃষ্টি উদাস, কথা অসংলগ্ন।

বারান্দার একপার্শ্বে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর 'ভেলো' সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া মাথা গুঁজিয়া অসাড়ের মত শুইয়াছিল, অন্ধকারে ইহার চোখ দুইটি নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছিল। এতক্ষণে এই জন্তুটিকে শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন। ভেলো শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া অস্বাভাবিক ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এই জন্তুটিও কি তাঁহার এই সর্বনাশে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়া এই অবোধ জীব তাঁহার অন্তরের ভাষা বুঝিতে পারিল।

তাহার পর শরৎচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া শবদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন এবং 'ওগো, কোথা গেলে গো! তুমি যে আমার—সকল অবস্থার সাথী ছিলে' বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহই এই প্লেগ রোগীর শবদাহ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না দেখিয়া,—এই অবস্থা-সঙ্কটে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলাম। তারপর একবার শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শরৎচন্দ্রের বিষাদ দৃষ্টি ও আকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। অগত্যা একখানি ফুরঙ্গী, কুলিদের মানুষটানা ঠেলাগাড়ী ভাড়া করিয়া দুইজনে অতিকষ্টে ধরাধরি করিয়া তাহাতে শবদেহ তুলিয়া শ্মশানে লইয়া গেলাম।

নদীতীরে এই শ্মশানের সন্নিকটে এক মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় ছিল না। এই গভীর নিঃস্তব্ধ নিশীথে বিজন শ্মশানের মধ্যে আমাদের পাহারা দিবার জন্য গাড়ীওয়ালা কুলি দুইটিকে রক্ষী নিযুক্ত করিলাম।

পদব্রজে শ্মশানে পৌঁছিয়াই শরৎচন্দ্র কয়েক রাত্রি জাগরণের ফলে অসুস্থতা বোধ করিয়া ক্লান্তিজনিত অবসাদে একটি চাতালের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। শত সহস্র চিন্তা আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এই শ্মশানে চিতা শয্যার কাষ্ঠ ভিন্ন সৎকারের অন্যান্য উপকরণ সমস্তই সঙ্গে লইয়া আসিতে হয়, কিন্তু লোকাভাবে আমরা শুধু একটিমাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

ইতিপূর্বে বহুবার এই শ্মশানে আসিয়াছি, বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে এখানে বিসর্জন দিয়া গিয়াছি, কতদিনের কত গভীর স্মৃতি এইস্থানে জড়িত আছে, কিন্তু আজ আমি একা। একা বলিয়াই এই নীরব নিশীথে জ্যোৎস্নাময়ী নদী-সৈকতে বসিয়া আত্মচিন্তা করিবার সুযোগ পাইলাম।……

মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ! যে শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত আমোদ কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়, রিপুগণ কম্পিত কলেবরে হাহাকার করে, কুটিল কামনা সকল আর্তনাদ করিয়া মন হইতে অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট কালাকাল নাই।……যে দুঃসাহসিক সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছি, কে জানে—আজি হউক, কালই হউক, দশ দিন পরেই হউক হয়ত অকস্মাৎ একদিন প্লেগ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া এই শ্মশানক্ষেত্রে আসিতে হইবে। কতদিনের জন্য সংসার? কতদিনের জন্য এই জীবন!—

অনন্তকোটি তারকা খচিত নীলাকাশের তলে নীরব শ্মশানে বন্ধু-পত্নীর শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া নিজ মনে প্রশ্ন করিলাম—আমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছার মধ্যে এখন কোন বাসনাটি প্রবল? কোন সাধটি অপূর্ণ থাকিলে মরিয়াও সুখ পাইব না। মনের মধ্যে সুপ্ত পৃথিবীভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, মনে হইল বিশ্বশিল্পীর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যত নদ, নদী, গিরি, প্রস্রবণ, জল-প্রপাত, হ্রদ, মহাসমুদ্র, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি, বিভিন্ন দেশ ও নরনারীর আবাসস্থল আছে তাহা দেখিয়া তবে মরিব। এই দিনে এই শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়াই আমার ভূপর্যটনের সংকল্প স্থির হইল।

শ্মশানতট ধৌত করিয়া ইরাবতী নদী সাগরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, শূন্যবায়ু হো হো করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে শবভুক জন্তুজানোয়ার কলরব করিতেছিল। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তিনি শোকাবেগে চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন—'শান্তি, প্রাণের শান্তি! আমার যে আর কেউ নেই, বুক যে একেবারে শূন্য করে চলে গেছ! শান্তিহীন জগতে থেকে লাভ কি? এ যে অসহ্য জ্বালা! হা ভগবান, তুমি না মঙ্গলময়—তবে তোমার এ রাজত্বে এত অবিচার কেন? শান্তিকে হারাতে হয় কেন? কোন্ পাপে বুকে এ শেল বিদ্ধ করলে?'

…আমার সান্ত্বনা বাক্যে তিনি আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই জনমানবশূন্য শ্মশানে মধ্যে মধ্যে একটি ভাবপাগল সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে উদাসী বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বাবাজীর মুখে অনেক অর্থযুক্ত তত্ত্বকথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইত। তাঁহার কণ্ঠে শ্মশান-সঙ্গীত শুনিয়া মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত।

আমাকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া বাবাজী সুন্দররূপে চিতাসজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, শরৎচন্দ্র ও আমি শবদেহ চিতায় তুলিয়া অগ্নি-সংযোগ করায় মুহূর্তমধ্যে সে বহ্নি গগনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। বাবাজী তাহার পর নদী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া চিতা নির্বাণ করিতে করিতে গাহিলেন—

খেলার ছলে হরি ঠাকুর
গড়েছেন এই জগতখানা,

… … … …

শরৎচন্দ্রকে শোকে অধীর দেখিয়া তিনি বলিলেন—বাবা! বিরাটের চিন্তা কর, সান্ত্বনা পাবে, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ।

জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?

…এই সময়ে শরৎচন্দ্র গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন দেখিয়া, বাবাজী বলিলেন—'কি ছাই গালে হাত দিয়ে বসে চিন্তা করছ? তার চেয়ে একটু শুন শুন করে দেখ দেখি গানে মজাটা কি?…গাও:—

তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত মন্দিরে,—'

বাবাজী ওই দু'লাইন গান গাহিতেছেন আর পায়চারী করিতেছেন।

এক একবার গান গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া আকুল, আওয়াজ যেন আর বাহির হয় না। ভোর পর্যন্ত ঐ ভাবেই কাটিল। বাবাজীর একটু করকোষ্ঠী জ্ঞান ছিল, তিনি শরৎচন্দ্রের হাতের রেখা কয়টি দেখিয়া বলিলেন—'বাবা, আবার তোমায় সংসার করতে হবে।'

সাধু সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তিনি বুকভরা জ্বালা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।"

গিরিনবাবুর বর্ণিত এই কাহিনীটির মধ্যে কোথায় কি সঙ্গতি-অসঙ্গতি আছে এবং কাহিনীটি সত্য কিনা সে সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক্—

গিরিনবাবু লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তি দেবী প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে, পাড়া-প্রতিবেশী কেউই শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করতে অগ্রসর হননি। এমন কি শান্তি দেবীর মৃত্যু হলেও কেউই শবদাহ করবার জন্যও যাননি। অথচ গিরিনবাবু তাঁর এই "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থেই বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র এই সময় "মিস্ত্রী পল্লীতে" থাকতেন এবং শরৎচন্দ্রের নানা সদ্‌গুণের জন্য সেই পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করত। গিরিনবাবু লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরীর দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতেন, সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত ও 'বামুনদাদা' বলিয়া ডাকিত। এই বামুনদাদার প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকা-কড়ির আদান-প্রদান এই বামুনদাদার মারফতেই হইত। ইহাদের একটা কীর্তনের দল ছিল, বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটির দিন ইহারা খোল, করতাল সহযোগে নামসংকীর্তন করিত।"

গিরিনবাবুর কথামতই শরৎচন্দ্র যাদের এতখানি ছিলেন শরৎচন্দ্রের সেই বিপদের দিনে তাদের মধ্যে থেকে একজনও তাঁর সাহায্য করতে এল না, একি কখনো সম্ভব?

গিরিনবাবু লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর প্লেগ হলে "চারিদিকে ছুটাছুটি করে" কারুরই যখন সাহায্য পেলেন না, তখন তিনি "ছুটে এসে রুদ্ধ কণ্ঠে" গিরিনবাবুকে বললেন, "ভাই গিরিন, আমার বড় বিপদ, স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে"…"ভাই তুমি সৎকার সমিতি করে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছ, আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর!"

স্ত্রীর অসুখ করলে কোন "মহাস্ত্রৈণ" স্বামী কখন কি একেবারে সৎকার সমিতির দ্বারস্থ হয়? স্বীকার করছি গিরিনবাবুদের সৎকার সমিতির হয়ত কোন সেবা বিভাগও ছিল; কিন্তু তাই যদি হয়, শরৎচন্দ্র সেই সেবার কথা উল্লেখ না করে এসে "সৎকার সমিতি করে পুণ্য সঞ্চয় করেছ" বলবেন কেন? মনে হয়, গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর শবদেহের সৎকার করার সঙ্গে নিজের ঐ আত্ম-কাহিনীটি বলবার জন্যই শরৎচন্দ্রকে দিয়ে ঐ কথা বলিয়েছেন। শুধু কি তাই—গিরিনবাবু তাঁর গ্রন্থের "পত্নী বিয়োগে শরৎচন্দ্র" অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হলেও শুধু নিজের কৃতিত্বের কথা বলবার জন্যই কোন এক রাহা পরিবারের কয়েকজনের মৃত্যুর সময় নিজে কিরূপ সেবাকার্য করেছেন, তারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

গিরিনবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন—"রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে আমিই তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) প্রথম বন্ধু।" শুধু এই নয় তিনি আরও বলেছেন যে, সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল অর্থাৎ শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যতদিন ছিলেন, ততদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ ছিল।

এ কথা বলেও গিরিনবাবু আবার লিখেছেন—"এ পল্লীতে ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে কয়েকবার আসিয়াছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এই প্রথম।" এ থেকে তো মনে হয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গিরিনবাবুর তেমন কোন প্রীতির সম্বন্ধ ছিলনা, হয়ত পরিচয় মাত্র ছিল। কেন না গিরিনবাবুর কথামতই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অতখানি হৃদ্যতা থাকলে তিনি এক ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে কয়েকবার এসেও পাশেই আর এক বিশিষ্ট ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে আদৌ গেলেন না। এ কি কখন হয়?

এ ছাড়া গিরিনবাবু যে বলেছেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ১৪ বৎসর "অচ্ছেদ্য সম্পর্ক" ছিল। অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে কি করে? গিরিনবাবু তো পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন।

গিরিনবাবু তাঁর সেবক ও সৎকার সমিতি সম্বন্ধে বলছেন—"…মৃত-দেহের সৎকারের জন্য ছয় মাইল পথ শব কাঁধে লইয়া শ্মশানঘাটে যাইতে হইত। এ সমস্ত কারণে দুঃস্থ, অসহায় ও আর্তের সাহায্যের নিমিত্ত… রেঙ্গুন সেবক ও সৎকার সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।…আমি সম্পাদক ছিলাম। অনেক সহৃদয় যুবক আর্তের সেবা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া স্বেচ্ছা-সেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।…

এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সকলেই শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের আদর্শে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে নিজেদের জীবন সর্বতোভাবে বিপন্ন করিয়া অনেক কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগীর সেবা ও সৎকার করায় সমিতির কার্য দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সময় প্রতি মাসে প্রায় ৮।১০টি কেস সমিতির হাতে থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে নির্বান্ধব বাঙ্গালীদের মৃতদেহ হাঁসপাতাল হইতে লইয়া সৎকার করিতে হইত।"

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, গিরিনবাবু তাঁর সমিতির স্বেচ্ছা-সেবকদের সম্বন্ধে এইভাবে লেখা সত্ত্বেও একটু পরেই তিনি আবার বললেন যে, শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর শবদাহের জন্য তিনি যখন সমিতির সভ্যদের কাছে গেলেন, তখন নিজেদের জীবনবিপন্নকারী সেই সেবাব্রতীর দল সৎকার করতে ত গেলেনই না, অধিকন্তু নানারূপ বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

গিরিনবাবুর এই উক্তিটি একটি আপন-বিরোধী উক্তি।

শান্তিদেবীকে যখন পোড়াতে কেউ গেল না, তখন গিরিনবাবু

শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, তিনি যদি ভদ্রপল্লীতে বাস করতেন এবং ভদ্র-সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাহলে তাঁর স্ত্রীকে পোড়াবার জন্যে বহুলোক জুটত। তিনি তাঁদের সঙ্গে মিশতেন না বলেই কোন লোক পাওয়া গেল না।

আচ্ছা, মহান্ আদর্শ নিয়ে যাঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের সেবা করেন, তাঁরা কি কখন ভদ্র, অভদ্র, বিবাহিত কি অবিবাহিত এ সবের খোঁজ করেন? আমাদের তো মনে হয় ঐ ধরণের সেবকরা এ রকম প্রশ্ন কখন মনেই আনেন না। তাছাড়া গিরিনবাবু যে এখানে লিখলেন, তিনি তাঁদের সমাজে মিশতেন না! অথচ তিনি তো তাঁর বন্ধু (গিরিনবাবুর কথা মত) ছিলেনই। এ ছাড়া গিরিনবাবু তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, গানের আসরে, সাধুসঙ্গে প্রভৃতিতেও শরৎচন্দ্রের খুব মেলামেশা ছিল।

গিরিনবাবুর এই কথাটিও একটি স্ব-বিরোধী উক্তি।

গিরিনবাবু লিখেছেন, শরৎচন্দ্র শ্মশানে পৌঁছেই ক্লান্তিজনিত অবসাদে একটা চাতালের উপর ঘুমিয়ে পড়লেন। গিরিনবাবুর বর্ণনা মতই যে-শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর জন্য পাগলের মত অত কান্নাকাটি করলেন, সেই শরৎচন্দ্রই শ্মশানে পৌঁছেই যে কি করে ঘুমোতে পারেন, তা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে এই দিক থেকে কল্পনা করা যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র শ্মশানে পৌঁছেই যদি না ঘুমোতেন, তাহলে গিরিনবাবু ঐ অতক্ষণ ধরে একা "আত্মচিন্তা করবার সুযোগ" পেতেন না এবং তাঁর "ভূ-পর্যটনের সঙ্কল্পও" স্থির হত না।

শান্তিদেবীর মৃত্যুর পর গিরিনবাবু পথে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। আর বাড়ী মানে—শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে। কেননা গিরিনবাবু থাকতেন রেঙ্গুন শহরে, আর শরৎচন্দ্র শহর থেকে ৬ মাইল দূরে বোটাটং ও পোজনডং অঞ্চলে মিস্ত্রী পল্লীতে। গিরিনবাবু বাড়ী ফিরে এসে শ্মশানে গমনোপযোগী কাপড়-চোপড় পরে সেই গভীর রাত্রে তখনই শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণীর শবদাহ করতে হবে এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্র আবার তাঁর বাড়ীতে এলে, তিনি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর সেই "নোংরা পল্লীতে" গেলেন। হয় হেঁটে না হয় বড় জোর রিক্সায়। ঐ ৬ মাইল পথের মধ্যে অন্য কোন যানবাহন ছিল না বলেই মনে হয়। বাড়ীতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর শবদেহের উপর আছাড় খেয়ে আবার কত কাঁদলেন। তারপর গিরিনবাবু সেই গভীর রাত্রেই কোথা থেকে একটা কুলিদের মানুষটানা ঠেলাগাড়ী ভাড়া করে আনলেন। তাতে শবদেহ চাপালেন, তারপর শোকাচ্ছন্ন শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ৭ মাইল দূরে শ্মশানে গেলেন। শ্মশানে গিয়ে শরৎচন্দ্র যখন ঘুমোলেন, সেই ফাঁকে একা শবদেহের পাশে বসে গিরিনবাবু "শত সহস্র চিন্তা" করলেন। গিরিনবাবুর আত্মচিন্তা শেষ হলে, শরৎচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গল। শরৎচন্দ্র আবার 'শান্তি' 'শান্তি' করে কত কাঁদলেন। গিরিনবাবুর সান্ত্বনাবাক্যে শরৎচন্দ্র গিরিনবাবুর গলা জড়িয়েও কাঁদলেন। তারপর চিতা প্রস্তুত হল। শবদাহ হ'ল। উদাসী বাবাজী শরৎচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিলেন। গান শোনালেন। "ভোর পর্যন্ত ঐভাবে কাটল।"

এখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে, আচ্ছা, গিরিনবাবু প্রথম যখন তাঁর বাড়ীতে ফেরেন, তখনই যদি "গভীর রাত্রি" হয়, তারপর থেকে এত সব কাণ্ড হ'ল, তবু ভোর রইল, রাত্রি আর শেষ হ'ল না! আর সে রাত্রিটা যে শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিও ছিল না, গিরিনবাবুর লেখা থেকে এটাও অনুমান করা যেতে পারে।

এই সব ছাড়া আরও কতকগুলো ছোটখাট প্রশ্ন আমাদের আছে। যেমন—রাত্রে একবার করে মাত্র শুনে উদাসীবাবার ঐ অতগুলো গান তিনি কি করে হুবহু উদ্ধৃত করলেন? শরৎচন্দ্রের ঘরে কি সত্যই ঐ ধরণের পায়খানা ছিল? যে-শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে অত ভালবাসতেন, সেই লোক কিনা মাস কাবারের অজুহাতে ডাক্তার ডাকলেন না? তারপর "রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি" দিয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন, কোন বিছানাপত্র দিলেন না? ভেলো কি সত্যই সেই গভীর রাত্রে শরৎচন্দ্রকে দেখে ঐরূপ "অস্বাভাবিক" ভাবে কেঁদে ছিল? আর শরৎচন্দ্র কি তাঁর স্ত্রীর চিতাভস্মের পাশে বসে উদাসী বাবাজীকে করকোষ্ঠীও দেখিয়েছিলেন? গিরিনবাবুর লেখা এই ঘটনাগুলিকেও আমি অসম্ভব বলেই মনে করি।

তাছাড়া প্রথমে আমি যে দেখিয়েছি—শরৎচন্দ্রকে প্রতিবেশীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত দেখানো, সেবক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের শ্মশানে না যাওয়া প্রভৃতির ব্যাপারে গিরিনবাবুর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল আত্মপ্রচার। শুধু এই ঘটনাতেই নয়, "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" বইখানি যে কেউ পড়লে দেখবেন যে, এ বই আগাগোড়া গিরিনবাবুরই আত্মকাহিনীতে ভরা। তাই কবিশেখর কালিদাস রায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেবার সময় এই ত্রুটির দিকে গিরিনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, গিরিনবাবু তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর জীবনাবসান আসন্ন, ভবিষ্যতে তাঁর আর গ্রন্থ রচনা ঘটবে কিনা সন্দেহ। তাই তিনি এই গ্রন্থেই তাঁর আত্মকথাও সন্নিবেশিত করে যান।

এই গ্রন্থে "গল্পপ্রিয় শরৎচন্দ্র" নামে ৭২ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রকে একেবারে নিছক শ্রোতা খাড়া করে এবং শরৎচন্দ্রের মুখ দিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করিয়ে করিয়ে, তিনি তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা খাড়া করানো যে গিরিনবাবুর একেবারে কাল্পনিক, যে কোন পাঠক অধ্যায়টি পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। আত্মপ্রচারের জন্য শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এইরূপ আরও অনেক কাল্পনিক ঘটনা এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে। এই সব কারণেই গিরিনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু এবং শবদাহের ব্যাপার সমস্তই এমনি আরও একটা কাল্পনিক কাহিনী বলেই মনে হয়।

গিরীন্দ্রনাথ সরকারের ন্যায় শ্রীনরেন্দ্র দেবও তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত হ'য়ে রেঙ্গুনেই মারা যান। গিরিনবাবুর বর্ণনার সঙ্গে নরেনবাবুর কথার এই সামঞ্জস্য থাকলেও নরেনবাবু শরৎচন্দ্রের প্রথম বিবাহের একটি বিস্তৃত বিবরণ

দিয়েছেন। এমন কি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্রও জন্মেছিল একথাও বলেছেন।

নরেনবাবু শরৎচন্দ্রের জীবনের কিছু কাহিনী যে কলকাতায় গিরিনবাবুর কাছে শুনেছিলেন, একথা গিরিনবাবু এবং নরেনবাবু উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম বিবাহের ঐ বিস্তৃত কাহিনীটি এবং তাঁর পুত্রের সংবাদটি কোথা থেকে কি ভাবে জানলেন—সেদিন নরেনবাবুকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, ঐ বিবাহের কাহিনী এবং পুত্রের সংবাদটিও তিনি গিরিনবাবুর কাছেই শুনেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রের বিবাহের এমন কাহিনীটি জানা সত্ত্বেও তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে দিলেন না? তবে এমনও হয়ত হতে পারে যে, ঐ কাহিনী বলার মধ্যে গিরিনবাবুর আত্মকাহিনী বলার তেমন কোন সুযোগ না থাকায় তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেন নি। কেন না সত্য কথা বলতে কি—গিরিনবাবুর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থটি একরূপ তাঁরই আত্মকাহিনী।

নরেনবাবু লিখেছেন—"রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। কোমল হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রুবিসর্জন দেখে রেঙ্গুনে তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি। রেঙ্গুনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ, জি, এন, সরকার বা গিরীন্দ্রবাবু এই বিপদে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।"

এখানে নরেনবাবুর লেখায় দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর "সকাতর অশ্রুবিসর্জন দেখে রেঙ্গুনে তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি।" আবার গিরিনবাবুর লেখায় দেখা যায়—শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা তো আদৌ নেই-ই, কেবল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে গিরিনবাবু ছাড়া অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এমন কি জীবন-বিপন্নকারী সেবাব্রতীরাও পর্যন্ত যান নি। এখানেও একই কাহিনীর পরস্পরবিরোধী বর্ণনা থাকায় কাহিনীটিকে অসত্য বলেই মনে হয়।

এবার কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। কালিদাসবাবু বলেছেন—"কলকাতায় এসে তিনি তাঁর দিদি অনিমা দেবীর বাসার কাছে বাজে শিবপুরে নীলকমল কুণ্ডুর লেনে বাসা করলেন। দেবানন্দপুরের বাড়ী ও ভিটে দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল—এসে সেটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা সফল হয় নি।"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্রের দিদির নাম অনিমা দেবী নয়, অনিলা দেবী। আর শিবপুরে অনিলা দেবীদের বাসা কখনও ছিল না। অনিলা দেবী তাঁদের গ্রাম হাওড়া জেলায় গোবিন্দপুরে থাকতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজেশিবপুরে অনেক বছর কাটিয়ে, পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দিদিদের গ্রামের পাশের গ্রামে সামতাবেড়ে বাড়ী করেছিলেন। দেবানন্দপুরের বাস্তুভিটা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১৩০৩ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে ২২৫৲ টাকায় অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রী করেছিলেন। অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মতিলালের কনিষ্ঠ মাতুল। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে ২।১ বার দেবানন্দপুরে গিয়েছিলেন বটে, তবে সে বাস্তুভিটা উদ্ধারের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন, এরূপ কথা শোনা যায় না।

যাক এখন এ সব আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচনার বিষয়—শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে কালিদাসবাবু কি বলেছেন?

কালিদাসবাবু লিখেছেন—"বাজেশিবপুরে বাসা বাঁধলে তাঁর ছোট ভাই প্রকাশ তাঁর কাছে এসে বাস করতে এল। আর একজন এলেন—তাঁর কথা আমরা আগে শুনিনি, আত্মীয়রাও বোধ হয় শোনেনি। তিনি শরৎচন্দ্রের স্ত্রী। শরৎচন্দ্র যে বিবাহ করেছিলেন, তা আমরা জানতাম না। শুনেছি ভবঘুরে অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু তখন তাঁর চালচুলো কিছু ছিল না। কাজেই তাঁর সঙ্গে এতদিন সংসার করা হয়নি। রেঙ্গুনেও তাঁর চালচুলো হয়নি। সেখানে হোটেলে খেতেন ও ১টি ঘরভাড়া করে দরিদ্রভাবে দিনযাপন করতেন। শরৎচন্দ্রের বর্মাপ্রবাসের সঙ্গী সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—

'যেদিন শরৎচন্দ্র মায়ের গঙ্গাজলের চিঠি পাইয়া তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, মাসীমা একমাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, মাসীমায়ের ক্রন্দনে শরৎদা অনন্যোপায় হইয়া কিভাবে মাসীমাকে কন্যাদায়গ্রস্ত হতে মুক্ত করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িয়া পাঠকপাঠিকাগণ অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন।' সতীশবাবুর কথা বেশ স্পষ্ট নয়। তবে অবিশ্বাস্য হইবারও কোন কারণ নাই। আমার কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই। শরৎদাদা আমার স্ত্রী না বলিয়া তোমার বৌদিদি কথাটাই ব্যবহার করিতেন। আমরা বৌদিদি বলিয়াই জানিতাম।"

কালিদাসবাবু সতীশবাবুর কাহিনীটিকে অবিশ্বাস্য হইবারও কোন কারণ নাই বলায়—ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি এ কাহিনী বিশ্বাস করেছেন।

কালিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের বিয়ের কথা বলতে গিয়েই সতীশবাবুর লিখিত "মাসীমাকে কন্যাদায়গ্রস্ত হতে মুক্ত করিয়াছিলেন" এই কথার উল্লেখ করেছেন, তাই শরৎচন্দ্র এই মাসীমার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, এ কথাই যে কালিদাসবাবু এখানে বলতে চেয়েছেন, তাও ধরা যেতে পারে।

কালিদাসবাবু বলেছেন—"সতীশবাবুর কথা বেশ স্পষ্ট নয়।" এখানে অস্পষ্টের তো কিছুই দেখছি না। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন—"কিভাবে মাসীমাকে কন্যাদায়গ্রস্ত হতে মুক্ত করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িয়া পাঠকপাঠিকাগণ অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন।"

তাহলে এখন শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথায় এই মায়ের গঙ্গাজলকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করার কথা আছে দেখা যাক্—

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে এইরূপ একটি কাহিনী আছে। সেখানে আছে—একদিন সকালে শ্রীকান্ত বাইরে যাবার উপক্রম করছেন,

এমন সময় তিনি একটা চিঠি পেলেন। খামে আঁটা চিঠি। খামের উপরে মেয়েলি কাঁচা অক্ষরে শ্রীকান্তের নাম ও ঠিকানা লেখা। খাম খুলতেই তাঁর চিঠির ভিতরে আর একটি ছোট চিঠিও দেখতে পেলেন। এই ছোট চিঠিটি তাঁর যে মা দশ বছর আগে মারা গেছেন, তাঁরই হাতের লেখা এবং চিঠিটি তাঁর গঙ্গাজলকে লেখা। শ্রীকান্ত তাঁর মা'র লেখা চিঠিখানি পড়ে বুঝলেন—সম্ভবতঃ বছর বার তের পূর্বে এই 'গঙ্গাজলের' যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও দুশ্চিন্তা জানিয়ে মাকে বোধ করি চিঠি লিখেছিলেন এবং তারই উত্তরে মা গঙ্গাজল-দুহিতার বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে যে চিঠি লিখেছিলেন এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হয়ে মা উপসংহারে লিখেছিলেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে তাঁর নিজের ছেলে আছে।

মা তাঁর বংশধরটিকে এইভাবে দায়িত্বে বেঁধে দিয়ে যাবার জন্য শ্রীকান্ত প্রথমটায় তাঁর মা'র উপর কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও, পরে গঙ্গাজল মায়ের কিছু করতে পারেন কিনা ভেবে একদিন সারারাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে এবং পরদিন হেঁটে অপরাহ্নে গঙ্গাজল-মা'র পল্লীভবনে গেলেন। সেখানে গেলে গঙ্গাজল-মা শ্রীকান্তের সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে তেমন খুশি হতে পারলেন না। তবে শ্রীকান্তকে একেবারে হাতছাড়া করারও অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।

শ্রীকান্ত কথায় কথায় গঙ্গাজল-মার কাছ থেকেই জানতে পারলেন যে, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু তাকে ৫০০ টাকার কমে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

এই কথা শুনে শ্রীকান্ত যেন একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলেন এবং মাসখানেক পরে যা হোক্ একটা উপায় করবেন বলে, কথা দিয়ে পরদিন সকালে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

শ্রীকান্ত সেখান থেকে সিধা একেবারে পাটনায় পিয়ারীর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে পিয়ারীকে গঙ্গাজল-মায়ের মেয়ের কথা বলে বললেন—এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করে দিও। শ-পাঁচেক টাকা হলেই হবে। আমি গঙ্গাজল-মায়ের মুখেই শুনেছি।

শ্রীকান্তের কথা শুনে পিয়ারী বললেন—"কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। খুড়িমার কথা মিথ্যে হতে দেব না।"

এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকান্ত গঙ্গাজল-মায়ের মেয়েকে বিয়ে করেননি। আর তাছাড়া শ্রীকান্তই যে শরৎচন্দ্র একথা কে বললে? "শ্রীকান্ত" শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস। এটি শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নয়। শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের জীবনের কোথাও কোথাও মিল পাওয়া গেলেও শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্র নয়।

এ তো গেল। কালিদাসবাবুর লেখার মধ্যে আরো যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি রয়েছে, এবার তার উল্লেখ করা যাক্।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সস্ত্রীক যে বাস করতেন, এর প্রমাণ হিসাবে কালিদাসবাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের দুটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। কালিদাসবাবু লিখেছেন—"নিম্নলিখিত পত্রাংশ হ'তে জানা যায়, শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন, তখনও শরৎচন্দ্রের স্ত্রী তাঁর কাছে শেষের দিকে ছিলেন।"

কালিদাসবাবু বলেছেন "শেষের দিকে ছিলেন", কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্ত্রী বিবাহের পর থেকেই যে শরৎচন্দ্রের কাছে ছিলেন না, তার প্রমাণ কি? আচ্ছা, কালিদাসবাবুর কথাই না হয় স্বীকার করা গেল, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী প্রথম দিকে তাঁর কাছে ছিলেন না, শেষের দিকেই ছিলেন। কিন্তু কালিদাসবাবু একই লেখার মধ্যে 'ছিলেন' বলে আবার যে "তাঁর সঙ্গে এতদিন সংসার করা হয়নি।" "এতদিনে শিবপুরে তিনি বাসা বেঁধে দিদির অনুরোধে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। এতদিন বাদে শরৎচন্দ্র নারী হস্তের সেবাযত্ন পেয়ে গৃহস্থ নয়, প্রকৃতিস্থ হলেন।" "কৈশোর কাল হ'তে প্রৌঢ়কালের আরম্ভ পর্যন্ত দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্র নারী হস্তের সেবাযত্ন পাননি—তিনি এই সেবাযত্নের ভিখারী ছিলেন,... বাজেশিবপুরের বাড়ীতে তিনি সেবাযত্ন লাভ করতে লাগলেন।"—এই সমস্ত কথা কি করে বললেন, সেইটেই আশ্চর্যের কথা। কালিদাস-বাবুর ন্যায় একজন প্রবীণ লেখক যে এমন অসংলগ্ন উক্তি করতে পারেন তা ধারণাতীত।

অতএব কালিদাসবাবুর লিখিত শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কিত কাহিনীটি যে ভিত্তিহীন একথা বলা যেতে পারে।

শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র এবং রাজলক্ষ্মীকে তাঁর প্রেয়সী একথা অনেকেই ভেবে থাকেন। এমন কি শরৎচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবরাও অনেক সময় কৌতূহলবশে শরৎচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। শরৎচন্দ্রও মাঝে মাঝে পরিহাস ছলে তাঁর কোন কোন বন্ধুকে বলতেন—রাজলক্ষ্মী সত্যিই তাঁর প্রেয়সী। এমনিভাবে শৈলেশ বিশীর প্রশ্নে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁকে বলেছিলেন—"ও ছাড়ল না, আর উপায়ও ছিল না, তাই ওকে আমি শৈবমতে বিয়ে করেছি।"

শৈলেশবাবু শরৎচন্দ্রের এই পরিহাসটি আদৌ ধরতে না পেরে, সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়ে, তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন" গ্রন্থে কাহিনীটি লিখে গেছেন। কিন্তু এ যে সত্য নয় এবং রাজলক্ষ্মী যে তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়িকা মাত্র, একথা সহজেই বোঝা যায়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে, ফিল্ম তদন্ত কমিটি প্রমোদ কর হ্রাস করার যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। রাজ্যসরকার যাহাতে নূতন সিনেমা গৃহ নির্ম্মাণের বাধানিষেধ প্রত্যাহার করেন তৎসম্পর্কেও আবেদন জানান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া, বর্ত্তমানে যে তিনটি লাইসেন্সিং কর্ত্তৃপক্ষ আছেন তাহার স্থলে মাত্র একটী লাইসেন্সিং কর্ত্তৃপক্ষ করার আবশ্যকতার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এ্যাসোসিয়েসনের প্রস্তাবগুলি রাজ্যসরকার কার্য্যকরী করিলে ফিল্ম ব্যবসায়ীরা সত্যই উপকৃত হইবেন।

*　*　*　*

বৃটেনের শিশু-চলচ্চিত্র তোলায় বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এই দলটী কলিকাতায় মাত্র কয়েক ঘণ্টাকাল অবস্থান করেন। এই অল্প সময় থাকাকালীন তাঁহারা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকের অভিনয় ও শিশু রংমহলের এক অভিনয় দেখার সুযোগ পান। উভয় অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা এতই অভিভূত হন যে বিলাতে ফিরিয়া গিয়া তাহার মাত্র দুই দিন পরেই কলিকাতার আঞ্চলিক সেন্সর অফিসার ডাঃ আর, এম, রায়কে এক পত্রে জানান যে, কলিকাতার সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে তাঁহারা যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়াছেন তাহা সত্যই অনুকরণযোগ্য। ভারতে শিশু-চিত্র নির্ম্মাণে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন।

*　*　*

সানরাইজ ফিল্মস্-এর 'যদুভট্ট' কথা চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে নায়ক বসন্ত চৌধুরী

সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তোলা কতকগুলি চিত্রের প্রযোজকদের পুরস্কারদানে সম্মানিত করিয়াছেন। ভারতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম চলচ্চিত্রের প্রতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। সরকারের পক্ষে ইহা প্রশংসনীয় কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে পুরস্কারগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই প্রশংসনীয় নহে। কেন না, একদিকে যেমন বেসরকারী ছবিগুলির প্রযোজকদের পুরস্কৃত করা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি সরকারের গৃহীত নিউজ বা ডকুমেণ্টারী ছবিগুলির জন্য পরিচালকদের পুরস্কৃত করা হইয়াছে। অর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজক হওয়া যত সহজ, পরিচালক হওয়া তত সহজ নয়—ইহা সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। এ বিষয় অবশ্য তাঁহার বিবেচনা করিয়াছেন নিজেদের গৃহীত ছবিগুলিকে পুরস্কৃত করার

সময়। দেবকী বসু, বিমল রায় প্রভৃতি কৃতী পরিচালকেরা খ্যাতিমান—প্রযোজক হিসাবে না পরিচালক হিসাবে?—সরকার অর্থকে পুরস্কৃত না করিয়া প্রতিভাকে পুরস্কৃত করিলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইতাম।

* * * *

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত, নাটক একাডেমীর উদ্যোগে চলচ্চিত্র সেমিনারের আয়োজন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ছবির বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে। পরিচালনা, প্রযোজনা, পরিবেশনা, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ২৭ জন বিশেষজ্ঞ এতদ্‌সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরাজ কাপুর এবং শ্রীযুক্তা দেবিকারাণীকে যুগ্ম পরিচালক নির্বাচিত করা হইয়াছে। সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর দাঁড় করানই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেমিনার পুরা একসপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে। এই অধিবেশনের পর বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অন্যান্য বৎসর সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনা-সমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইবে—এইরূপ আলাপ-আলোচনা দ্বারা চিত্র-শিল্পের পথ সুগম হইবে এবং উপায় উদ্ভাবনের পন্থা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

* * * *

সম্প্রতি নব-চিত্রভারতীর "গৃহপ্রবেশ" মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'গৃহপ্রবেশে'র কাহিনী রচনা করিয়াছেন কানাই বসু। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচ্য কাহিনীটি নাটকাকারে ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকটি একটি দিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। কাহিনীটি যেমন একদিকে হাল্কা রসসম্বলিত অপরদিকে তেমনি এক বৃদ্ধের দুঃখ দুর্দ্দশার করুণ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। কাহিনীটির মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে একথা অনস্বীকার্য্য। যাঁহাদের মূল নাটকটি পড়ার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারা অবশ্য চিত্র রূপায়নের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটী-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তথাপি চিত্রটি উপভোগ্য হইয়াছে। হাল্কা-রসের চিত্র পরিচালনার কাজে যে সকল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন পরিচালক অজয় কর তাহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করিয়াছেন।

নাটকে পৃথ্বীশ ও সুরমার মধ্যে প্রণয়ের যে ইঙ্গিত আছে, চিত্রে তাহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্বেও যথাযথরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে ইহাদের প্রণয় উঁকিঝুঁকি দিয়াছে। নাটকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। কৌতুক চিত্রের ধর্ম্ম, আগাগোড়া রক্ষিত হইয়াছে। ঘটনাগুলির সংস্থাপনা ভাল। যার ফলে পরিবেশের সহিত খাপ খাইয়া অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। অভিনয়াংশে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, জহর

এইচ, এন, সি প্রোডাকসনের 'মন্ত্রশক্তি' চিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সন্ধ্যারাণী

গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী ও অপর্ণা দেবী সুঅভিনয় করিয়াছেন। জগার ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালনা সুষ্ঠু। আলোকচিত্র গ্রহণ সাধারণ ধরণের। শব্দ গ্রহণে ত্রুটীবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে কথা অস্পষ্ট। সঙ্গীতাংশ অনুল্লেখ্য। বোম্বাই-এর নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের আমদানী ব্যর্থ হইয়াছে।

* * * *

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর মিনার্ভা থিয়েটারের শীঘ্রই দ্বারোদ্ঘাটন হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পুরাতন এই রঙ্গমঞ্চটি বহুকাল পরে নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। নট-নাট্যকার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের অধিনায়কত্বে এখানে শীঘ্রই কোন ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর পরিচালনাধীনে মিনার্ভা থিয়েটারের জয়যাত্রা শুভ হোক—এই কামনা করি।

মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমংগল কাব্য

করুণাময় ভট্টাচার্য এম-এ-বি-টি

ধর্ম যে আমাদের দেশে কেবল সামাজিক বা আধ্যাত্মিক দিক গঠন করিয়াছে তাহা নহে। ইহা আমাদের সাহিত্য এবং কাব্যের দিক হইতে অনেক রসদ সরবরাহ করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বংগ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। এমনকি আধুনিক যুগেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান।

চণ্ডীমংগলকাব্যে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। কত কবি এই ধর্মপ্রসংগটুকু গ্রহণ করিয়া চণ্ডীমংগলকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এইখানে আমরা দেখিতে পাই যে সে যুগের হিন্দুরা দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা দেশে ছিল না! এই স্বাধীন চিন্তার অভাবে কত কবির সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে নাই। কবি-কংকণের পূর্বে ও পরে বহু কবি চণ্ডীমংগলকাব্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাম সর্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের পূর্বে বলরাম কবিকংকণ রচিত "চণ্ডী" প্রচলিত ছিল। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। মুকুন্দরাম তাঁহার পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন, "গীতের কবি বন্দিলাম শ্রীকবিকংকণ।" ইহাতে অনুমিত হয় যে তিনি বলরাম কবিকংকণের "চণ্ডী" অবলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা করেন। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে মুকুন্দরাম যদিও স্থূল গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার হস্তে "চণ্ডীমংগল" এক অপূর্ব শ্রীধারণ করে।

চণ্ডীমংগলকাব্যের গল্পাংশ "বৃহৎধর্ম" ও "ব্রহ্মবৈবর্ত" পুরাণে পাওয়া যায়! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে যে ধর্মই প্রথমে চণ্ডী পূজার প্রবর্তন করেন। এবং বৃহৎধর্ম পুরাণে আমরা কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান পাই। কবিকংকণ চণ্ডীমংগলকাব্যে মাতৃ পূজারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ ছাড়াও মিশর, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে অনেক মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কবিকংকণ এই প্রচলিত মতবাদ গ্রহণ করিয়া চণ্ডীমংগলকাব্যে ধর্মের সহজ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা তিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের সহিত সমন্বয় রাখিয়া করিয়াছেন। আমরা কতকগুলি অংশ তুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তিনি বরাবর "পুরাণকে" সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

"ব্রহ্মার মানসপুত্র হইল চারিজন" হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ রচনায় কবিকংকণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের সৃষ্টি রচনা নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। ভগবানের বরাহরূপ ধারণ ও জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার প্রসংগে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। মুকুন্দরাম "কালিকা পুরাণে" দুর্গার ধ্যান অবলম্বনে তাঁহার "মহিষমর্দিনীরূপ ধারণ" শীর্ষক কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই তিনি সুপণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মণ কবিকংকণ হিন্দুধর্মানুযায়ী ধর্মব্যাখ্যা করিলেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। চৈতন্যদেবের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি চৈতন্য বন্দনা করিয়াছেন। গ্রন্থের বহুস্থলে "হরি, হরি" ইত্যাদি উল্লেখ দেখা যায়। নীলাম্বরের মৃত্যু সময় তুলসীর মালা ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় যেন কোন বৈষ্ণব দেহত্যাগ করিতেছেন।

সংস্কৃত কাব্যের নিয়মানুসারে কাব্যের নায়ক হয় দেবতা, নয় ব্রাহ্মণ অথবা সৎবংশজাত ক্ষত্রিয়কুমার হইবেন। কিন্তু চণ্ডীমংগলকাব্যে হীন অনার্যকুলোদ্ভব ব্যাধই কাব্যের নায়ক। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কবির পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই গণতান্ত্রিক ভাবধারা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের দান।

অবশেষে তাঁহার গ্রন্থে তান্ত্রিক প্রভাবও দেখা যায়। 'স্বামী বশ' বশীকরণ, মারণমন্ত্র প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদের ফল বলিয়া মনে হয়।

জগতের বিখ্যাত কবিরা তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু নানাদিক হইতে আহরণ করেন। কবিত্বের সার্থকতা বিষয়বস্তুর সার্থক প্রয়োগে। মুকুন্দরাম ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অনেকখানি, কিন্তু তাঁহার সৃজনী প্রতিভায় তাঁহার কাব্য হইয়াছে অনবদ্য ও সার্থক। সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্য হইয়াছে বাস্তবধর্মী। সত্যই তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী।

পরবর্তী যুগে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের সাহায্য লইয়া "অন্নদামংগল" রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের যুগ সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য যুগের পুনরুত্থানের যুগ! তিনি মুকুন্দরামের ন্যায় সৃষ্টিতত্ত্ব, হরগৌরীর বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি অবলম্বনে অন্নদামংগল রচনা করেন। কিন্তু মুকুন্দরামের মধ্যে যে বিশিষ্ট বাস্তবতার ছাপ পাই তাহা ভারতচন্দ্রে নাই। "ফুল্লরার বারমাস্যা" প্রভৃতির খাঁটি বাস্তবচিত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্য ধ্বনিমূলক। তাঁহার কাব্য অশ্লীলতা দোষদুষ্ট। মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা কুরুচির পরিচয় পাই না।

মুকুন্দরামের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিলেও ভারতচন্দ্র অনার্যকে কাব্যের নায়ক করিতে সাহসী হন নাই। তিনি যুগধর্মকে উপেক্ষা করেন নাই। সেদিক হইতে কবিকংকণের কৃতিত্ব অধিক। মুকুন্দরাম যেরূপ বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রভাবান্বিত সেইরূপ ভারতচন্দ্র মুসলমানী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

বাউল একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছে।

(গান)

হায়রে নিধি—দারুণ বিধি—
এ কি হাসি নিরবধি—দারুণ পরিহাসের ছলে।
সুখের ঘরে দুখের বাসা—
গাঁথতে গেলাম ফুলের মালা—
ফুলের বনে কাঁটার জ্বালা—
মণির মালা পরতে গেলাম ফণির জ্বালায় মলাম জ্ব'লে।
ফণির ফণা ছাড়া কি হায় মণি রাখার ঠাঁই মেলে না ?
কাঁটার ঘেরা ছাড়া কি আর ফুল ফুটিতে পথ পেলে না ?
হায়রে বিধি !
দারুণ বিধি সুধার নদী—
হায়রে সৃজন করলি যদি
বাঁধলি মলিন মাটির কূলে—চাতক চাহে ফটিক জলে।
দারুণ পরিহাসের ছলে—।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কলিকাতায় মণিভবন

সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল ঘর।

সঞ্জীব সুরেন প্রতিমা, নরেন জয়া, একপাশে বসিয়া সুমিতা। সঞ্জীব মদ্যপান করিয়াছে। একটা সোফায় বসিয়া আছে। সুমিতা যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। জয়া পিয়ানোর ধারে বসিয়া গাহিতেছে

অভিমানের বদনে আজ
নেব তোমার মালা !

প্রথম কলি গাহিতেই সঞ্জীব টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল

সঞ্জীব। দেব। মালা দেব! আমি বকুলের তলে বসিয়া বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।

ড্রয়ার খুলিয়া বাহির করিল একটি সুদৃশ্য নেকলেস কেস

সঞ্জীব। Here it is.

হারটি তুলিয়া ধরিল

জয়া। (গান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল) বি—উ—টি ফুল! দেখি—দেখি। অগ্রসর হইয়া আসিয়া হারটি লইল—দেখিল) ও—মা—বা—রো—শো টাকা দাম! (হারের টিকিটটা দেখিয়া বলিল) দেখেছ দিদি। দেখ!

প্রতিমা। দিল্লীর দোকান থেকে কেনা। পাথরগুলো নীলা!

জয়া। কি জ্বল জ্বল করছে দেখেছ ?

নরেন। (আসিয়া দেখিয়া বলিল) কাশ্মিরী কারিগরের কাজ!

প্রতিমা। দাও, তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দাও—সুমিতার গলায়।

সঞ্জীব। না বউদি ; This is not for সুমি ; এটা আমার মুখরা কলকণ্ঠী—জয়া সখির কণ্ঠের জন্য। নরেন—naughty boy আজ তুমি জেলাস হতে পাবে না।

জয়া। না—না। সে হতে পারে না। এ আপনি সুমির গলায় পরিয়ে দেবেন।

সঞ্জীব। You naughty girl—don't be silly—সুমিতার জন্যে আছে।

ড্রয়ার খুলিয়া একটা স্যুটকেস বাহির করিল। স্যুটকেস খুলিল

বউদির জন্যে আছে। This is for বউদি।—She is an angel—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তাঁর জন্যে সাগর তলে জন্ম মুক্তোর। সেই মুক্তোর মালা। (দেখাইয়া রাখিয়া দিল।) This is for বড়দা—সিগারেট পাইপ। and this is for Naren—

একখানা কাগজ অর্থাৎ রসিদ তুলিয়া ধরিল

নরেন। কি ওটা ? a piece of paper ? কাগজ ?

সঞ্জীব। কাগজখানা এই দোকানে দেখালেই You

get a brand new Car—আমি জানি—lifeএ speed-এর চেয়ে ভাঁলো তোমার কিছু লাগে না !

নরেন। Oh! I want to drink your health; you are great, you are wonderful—হে বিজয়ী-বীর—আজ স্বীকার করছি—you are great! Come on—

বোতল হইতে মদ ঢালিতে লাগিল

সঞ্জীব। আর এই সব হ'ল সুমিতার।

সে বাহির করিতে লাগিল—গহনার পর গহনা। জয়া দেখিতে লাগিল। বিস্ময়ের অবধি ছিল না তার। সঞ্জীব আসিয়া সোফায় বসিল

সুরেন। (এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল) কিন্তু তুমি এ সব কি করেছ সঞ্জীব ?

সঞ্জীব। কি করেছি দাদা ?

সুরেন। এত টাকা খরচ করেছ—

সঞ্জীব। উপার্জ্জন যে অনেক বেশী করেছি দাদা। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। আজ আপনাদের কাছে, সুমিতার কাছে ফিরে এলাম—সেই আনন্দে উৎসবের জন্যে খরচ করেছি কিছু। বেশী নয়। লাখ দেড়েক হবে। করব না? খরচ করব না ?

নরেন। (দাদাকে) Why—why you are raising these questions? দাদা! আজ ওর আনন্দের দিন। let him celebrate; যা ওর ভাল লেগেছে—তাই করেছে।

নরেন। (মদের গ্লাস আগাইয়া দিয়া) Come on old boy—

গ্লাস তুলিল

সুরেন। না। আমি এর উত্তর চাই—সঞ্জীব !

সঞ্জীব। (গ্লাস লইয়াছিল) কিসের উত্তর দাদা ?

সুরেন। Is this your vengeance—? তুমি শোধ নিচ্ছ ?

সঞ্জীব। শোধ ?

সুরেন। হ্যাঁ শোধ! একদিন আমাদের অর্থ ছিল—তোমার ছিল না—সে দিন—তুমি—

সঞ্জীব। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি দাদা! ভগবান সাক্ষী—না! তা নয়!

নরেন। তোমার স্বাস্থ্যপান করছি আমি। You old devil—তুমি এগিয়ে চল। More success—in life—bright future—

পান করিল

সঞ্জীব। স্বীকার করছি দাদা—একদিন—সে Complex আমার ছিল। সেই Complexএর তাড়নায় আমি আপনাদের ঘৃণা করেছি। সেই ঘৃণার বশেই সুমিকে আমি কষ্ট দিয়েছি—তাকেও ভুল বুঝেছি। বাবার জন্মদিনে আসতে দিই নি। আমি স্বীকার করছি। তারপর—বিচিত্র জগৎ—বিচিত্র ঘটনায়—যা ঘটেছে—শুনেছেন। আমার ভাগ্য ফিরল। দাদা, যে ইংরেজকে শত্রু মনে করেছি, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে প্রাণ পণ করেছিলাম। তাদের নিষ্ঠুরতম ভাবে ঘৃণা করেছি। আপনি জানেন। সেই একজন ইংরেজ—সেই আমাকে গ্রহণ করলে সন্তানের মত। আমাকে নতুন পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল। আমি জীবনের নতুন আস্বাদ পেলাম। চোখে আমার বর্ণান্ধতার ব্যাধি ছিল—সব দেখতাম কালো। সে ব্যাধি ঘুচে গেল, পেলাম নীরোগদৃষ্টি—পৃথিবীকে দেখলাম উজ্জ্বল—রামধনুর সাত রঙে রঙানো—

নরেন। No more—please. আমরা তোমার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি—। দাদা—তুমি স্বীকার কর। You must—

সুরেন। না—আর আমার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু—

নরেন। কোন কিন্তু না। No more of buts—please—

একজন বেয়ারা ফুলের ডালা লইয়া প্রবেশ করিল

বেয়ারা। দোকান থেকে ফুল এসেছে হুজুর !

সঞ্জীব। শোবার ঘরে নিয়ে যাও।

বেয়ারার প্রস্থান

জয়া। ফুলশয্যা হবে বুঝি নূতন করে ?

সঞ্জীব। এই গুণেই তোমার আমি মুগ্ধ ভক্ত, জয়া সখি! আজ আমার নূতন করে ফুলশয্যা হবে।

জয়া। আমি সাজিয়ে দেব সুমিতাকে।

সঞ্জীব। কিন্তু হারখানি পরাব আমি। আমি ওর মালঞ্চের হব মালাকর !

লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপ-নার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

এতক্ষণে সকলে পিছনের দিকে ফিরিল। সুমিতা বসিয়াছিল পিছনের দিকে। সঞ্জীব আগাইয়া গেল হার হাতে। পরাইতে যাইতেই—নিশ্চল পাথরের প্রতিমা যেন সজীব হইয়া উঠিল। চকিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল

সুমিতা। (সচকিতভাবে হাত বাড়াইয়া আটকাইয়া বলিয়া উঠিল) না।

সে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে সকলেই চমকিয়া উঠিল

সঞ্জীব। সুমিতা!

সুমিতা। না। আপনি আমাকে ছোঁবেন না।

সঞ্জীব। কি বলছ?

সুমিতা। আমি আপনাকে চিনি না। জানি না। আমাকে আপনি ছোঁবেন না। (পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল) না—না—না—।

নরেন ও সুরেন। সুমি—সুমি—

সুমিতা। না না—তোমাদের কাউকে—আমি—

জয়া প্রতিমা ছুটিয়া কাছে আসিল

সুমিতা। তোমাদের কাউকে আমি চিনি না। না—না—না।

ছুটিয়া বাহির হইতে গেল

সঞ্জীব। সুমিতা—সুমি!

সুমিতা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তুলিয়া লইল—একটা দরজার পাশের দেওয়ালে র‍্যাকে ঝোলানো রিভলভার কেস হইতে রিভলভার টানিয়া বাহির করিল এবং ধরিয়া বলিল

সুমিতা। তুমি প্রেত—! তুমি প্রেত! তুমি প্রেত!

সঞ্জীব পিছাইয়া গেল

সুমিতা বাহির হইয়া গেল। বাহিরে রিভলভারের আওয়াজ হইল ও পতন শব্দ হইল

সঞ্জীব ও সকলে। সুমিতা।

নেপথ্যে পরমানন্দ। কালী কালী কালী! এ কি করলি—সুমিতা দিদি! (ক্রমশঃ)

নীলকণ্ঠ

শ্রীতারক ঘোষ

মৃত্যুহরা সুধা ভেবে কালকূট করেছি যে পান,
নীলকণ্ঠ! সারা দেহ পুড়ে যায় অসহ জ্বালায়।
মনপ্রাণ সবি জ্বলে অনির্বাণ অযুত শিখায়।
চেতনায় বিঘোষিত সর্বনাশা মরণের গান।
নিশ্বাসে গরল ঝরে—দুই চোখে মৃত্যুর আহ্বান।
জীবনের পথে পথে এ বিষের আগুন ছড়ায়॥
কণ্ঠ নয়—বিষদগ্ধ সারা সত্তা নীল হয়ে যায়।
মৃত্যু নেই—দাবদাহে পুড়ে যায় পুড়ে যায় প্রাণ॥
মৃত্যুঞ্জয়! এ দহনে তিলে তিলে পুড়ে অবশেষে
অভিশপ্ত এ জীবন হয়ে যাবে তেজোহীন ছাই?
মৃত্যু ছাড়া শান্তি নেই? এ সত্তার সার্থকতা নেই?
জীবনের সব সাধ ব্যর্থ হয়ে ফুরোবে নিমেষে?
কণ্ঠে যদি নাই বাজে আনন্দের—অমৃতের গান।
নটরাজ! তুলে দাও বেদনার প্রলয়বিষাণ॥

যক্ষ

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিলুপ্ত বিদিশা-স্বপ্ন। স্মৃতি—ম্লান জ্যোৎস্নার মতন
তোমাকে রেখেছে ঘিরে, আমারো আচ্ছন্ন করে মন।
তবু ভাবি, ভ্রান্তি নয়,—তোমার স্বপ্নিল তনু-তটে
যে-নদী উচ্ছল ছিলো—(যদি আজ বলি অকপটে)
রেবা নয়, শিপ্রা নয়, তবু-তা আলোর মোহনায়
টেনেছে আমার মন অবন্তীর বন্ধ দরজায়।
মহাকাল-মন্দিরের সোপানে নৃত্যের অবকাশ
মনে পড়ে, কার চোখে দেখেছি সে-বিদ্যুৎ-বিকাশ!
শয্যা-প্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-লেখা—কে সে নারী?
ইতিহাস জানে, আমি তারি পথে আকাশ-সঞ্চারী—
যুগে যুগে পেতেছি অঞ্জলি। তুমি পূর্ণ কর তায়,—
মেঘে হানো আঁখির বিদ্যুৎ; বাঁধি বুক দুরাশায়।
স্মৃতির দুয়ার খুলে বুকে পাই বন্দিনী তোমাকে
উজ্জয়িনী; নির্বাসিত যক্ষ আমি, চেনো কি আমাকে?

উপানন্দ

বৃত্তি ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অবতারণা

ামরা ছাত্রছাত্রীরা জানো, শিক্ষার ওপরই রয়েছে তোমাদের অনাগত বিষ্যতের সাফল্য—আর তোমাদের সমগ্র সমাজের শিক্ষা অর্জ্জনের পরই নির্ভরশীল স্বদেশ ও স্বজাতি। শিক্ষার সার্থকতা নিয়ে মানবোচিত র্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনই নিশ্চয়ই তোমাদের লক্ষ্য, আর আমরাও তাই ান্তরিকভাবে কামনা করি। এজন্যে তোমাদের প্রত্যেক দিনটীর শেষ মূল্য আছে—যেদিনটা হেলা-ফেলায় কেটে যাবে, সেদিন আর রে আস্‌বে না, জ্ঞানের হিসাবের খাতায় যেদিন জমার দিকে কোন ঙ্কপাত হবে না, সেদিনটা হয়ে উঠ্‌বে ব্যর্থ—এর অপচয়ের জন্যে হয় া অনুশোচনা কর্‌তে হবে আগামী দিনে। ছাত্র জীবনের ব্রত হচ্ছে ধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জন। এরপর তোমরা যখন সোপানের পর সোপানে ঠ শেষে ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা নিয়ে রিয়ে আস্‌বে, তখন তোমরা আর থাক্‌বে না কিশোর কিশোরী, রিপূর্ণ যৌবন তোমাদের ডাক্‌ দেবে গার্হস্থ্য জীবনের ভিতরে প্রবেশ র্‌বার জন্যে—তোমাদের সম্মুখে তখন প্রতিভাত হবে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। না দায়িত্বের বোঝা নিয়ে তোমাদের চল্‌তে হবে জীবনের পরম গ—সুরু হবে নতুন পথে তোমাদের যাত্রা—এ যাত্রায় পথ-চলাদের ন্তি এলেই তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী,—সমাজ সংসারের এমনই নিয়ম। পথ দিয়ে তোমাদের চল্‌তে হবে সংসারের সকল রকম দায়িত্ব য়ে, সে পথ তোমাদের কাছে আজও অপরিচিত, অনাবিষ্কৃত ও হস্যময়। এতদিন তোমাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যারা অক্ষরের মালা গেঁথে মাদের নিরক্ষরতা দূর করেছে, তারাই মূর্ত্ত হয়ে দাঁড়াবে এসে একদিন মাদের জীবনযাত্রায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে—তাদের কাছে তোমাদের ল ধর্‌তে হবে জ্ঞানের প্রদীপ—সংস্কৃতির আলোক শিখা। দ্বিধা দ্বন্দ্ব, র মনের যত মেঘ—জাগতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিতে হবে য়ে,—উপলব্ধি কর্‌তে হবে সত্যিকারের জ্ঞান আসে ভিতর থেকে, হিরে থেকে নয়, আর বুদ্ধি দিয়ে বোঝার সমষ্টিও জ্ঞান নয়। এ-সংসার বিচিত্র—বিস্ময়কর। অরুণাচলমের, মহর্ষি রমণ বলেছেন—'যাকে আমরা সচরাচর নিয়তি বলি, তার গোড়ার দিকে আছে একটি মূল কারণ বা প্রাথমিক একটি কর্ম্ম। স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার না করলে এই কর্ম্মের অর্থ হয় না। অতএব প্রথম কারণরূপে স্বাধীন ইচ্ছাটিকে বিশেষভাবে স্বীকার কর্‌তেই হয় এবং স্বাধীন ইচ্ছার প্রবল প্রয়োগে নিয়তিকে জয় করাও নিশ্চয়ই যায়—

এই স্বাধীন ইচ্ছাকে সেদিন নিজেদের শক্তি দিয়ে বলিষ্ঠ করে তুল্‌তে হবে যেদিন তোমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে গৃহী হয়ে বৃত্তি ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে। যাতে দাঁড়াতে না পারো, তার জন্যে বইতে থাক্‌বে প্রতিকূল আবহাওয়া। তখন দেখ্‌তে পাবে কত ধরাধরি, কত ছুটোছুটি, কত দ্বন্দ্ব, কত পরীক্ষা—উপলব্ধি কর্‌বে সীতার অগ্নিপরীক্ষা বা অভিমন্যুর প্রতি সপ্তরথীর আক্রমণ, বোধ হয় এত কঠিনও ছিল না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জটিল প্রশ্নভারে, শুধু কাগজে কলমে নয়, মুখোমুখিভাবেও তোমরা হবে ভারাক্রান্ত। আর এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হোতে পার্‌লে, আজ্‌কের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা নিয়েও দাঁড়ানো অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুল্‌বে তোমাদের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। মহর্ষি রমণের মতে এর প্রবল প্রয়োগে নিয়তিকেও নিশ্চয়ই জয় করা যায়।

তোমাদের ভেতর একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে তোমরা কিছু কাজের মত কাজ করে জীবনের উন্নতিসাধন কর্‌তে চাও,—এই মনোভাবটা ধরে নিয়েই আমার বক্তব্য হচ্ছে কেমন করে তোমরা অনুশীলন করে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট উন্নত ব্যক্তি হতে পারো। যে বৃত্তি অবলম্বন কর্‌বে, তার মাধ্যমে পূর্ণভাবে সাফল্যলাভের জন্যে, তোমাদের এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে হবে, যাতে এর পরিধিটা তোমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ না হয়ে বৃহত্তর হয়ে ওঠে। তোমরা যারা বুককিপার বা হিসাবরক্ষক হবে, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হবার জন্যে নিজেদের তৈরী কর্‌বে; ইঞ্জিনিয়ার হোলে, যাতে আরও টেক্‌নিক্যাল জ্ঞান আহরণ কর্‌তে পারো তার চেষ্টা কর্‌বে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ

'সেল্‌সম্যান' বা বিক্রেতা হও, তা হোলে ভালো করে পড়ে নেবে 'সায়েন্স অব সেল্‌সম্যানসিপ' অর্থাৎ বিক্রয় বিজ্ঞান। যদি কেউ আইন-ব্যবসায়ী হও, তা হোলে আইনের কয়েকটি বিভাগে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করবে। কেরাণী যদি হও তা হোলে তোমাদের ওপর ন্যস্ত কাজগুলো করেই দিনগত পাপক্ষয় করো না, তা হোলে চিরদিনই যে স্তরে আছ, সেই স্তরে পড়ে থাক্‌বে—তোমাদের সন্ধান রাখ্‌তে হবে অফিসে কত রকম কাজ হয়, আর সেই সব কাজের প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হয়ে, এমনভাবে সেগুলোকে আয়ত্ত করে রাখ্‌বে, যাতে ভবিষ্যতে সামান্য কেরাণী থেকে হোমরা-চোমরা অফিসার পর্য্যন্ত হোতে পারো। কর্ম্মক্ষেত্রে কারও দয়া আশা করো না,—এমনভাবে কর্ম্ম আয়ত্ত করো যাতে তোমাদের দয়ার ওপর কর্ম্মচালকেরা নির্ভরশীল হ'ন। মোটের ওপর আমার বক্তব্য হচ্ছে—যে কাজই করো না কেন, তোমাদের মনে সর্ব্বদাই এই কথাটী যেন জেগে থাকে—এ কাজে অমোঘ ইচ্ছাশক্তির সুদৃঢ় প্রয়োগ করে উর্দ্ধস্তরে উঠে যাবো। জেনো ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃত বন্ধু।

তোমরা জানো, বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে আজ যাঁরা সশরীরে গ্রহে উপগ্রহে গিয়ে সেখানকার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার জন্যে অসম্ভবকে সম্ভব করছেন, তাঁদেরই একজনের জীবনের সত্য ঘটনা তোমাদের কাছে বলে তাঁর আদর্শটা তোমাদের মনে গেঁথে দিতে চাই—এই পাশ্চাত্যবাসী মিষ্টার শীলার বিজ্ঞানের গবেষণায় পুরস্কার পাবার সময়ে বলেছিলেন—

"অনেক সময়ে আমি প্রলুব্ধ হয়েছি আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা মোটা মাইনে পাচ্ছে দেখে—ভেবেছি স্কুল ছেড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে কাজে যাবো, হোলোও তাই। কিন্তু সব সময়েই আমার পিতামাতা আমাকে বলেছেন, ভালো করে লেখাপড়া শিখে কাজে লাগলে আমি ওর চেয়ে অনেক টাকার বেতন পাবো, আর ওদের মোটা মাইনের মত অঙ্ক, সব কিছু বাবদ ব্যয় করেও, আমার ব্যাঙ্কে জমবে। তাই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে পড়া-শুনা করে চার বছরের মধ্যে গ্রামার স্কুলের পড়া শেষ করলাম। এই সময়ের মধ্যে নানারকমের কাজও করেছি। একশো পাউণ্ডও জমে গেল (ধরো পনরশো টাকা)—হাইস্কুলে পড়বার সময়ে বুঝলাম আমাকে বেশ খাটতে হবে, হুজুগে মাত্‌লে চল্‌বে না। স্কুল থেকে বাড়ীতে করবার জন্যে যে সব কাজ দেওয়া হোতো, অনুশীলন করে সেসব কাজের সমাধা করতে, আমাকে অন্ততঃ চার পাঁচ ঘণ্টা খাটতে হোতো। বয়েস আছে, শক্তি আছে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আছে—পিছপাও হব কেন—শিক্ষান্তে যেমন সুনাম অর্জ্জন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেও মোটা টাকার মাইনে পেয়ে সংসারের দুঃখকষ্ট দূর করতে লাগলাম। হাইস্কুলে প্রবেশ করেই প্রথম বছরে আমি খুব ভোরে উঠ্‌তাম আর বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত স্কুলের দেওয়া কাজ করতাম। তারপর রেস্তোরাঁয় বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত কাজ করতাম—এঁটো থালা-ডিস ধুয়ে ফেলা থেকে সুরু করে খরিদ্দারদের আহার্য্য পরিবেশন করা পর্য্যন্ত একটানা সব কাজ করেছি। তারপর স্কুলে পড়তে যেতাম, আবার বাড়ী এসে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত একটানা পড়তাম। মন এম্নি ডুবে যেতো অঙ্ক কষায় আর পড়ায় যে, দেশটা বোমায় উড়ে গেলেও হয়তো আমার হুঁস হোতো না। শনি ও রবিবারে আমাকে রেস্তোরাঁয় বেলা একটা থেকে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করতে হোতো—"

একজন কর্ম্মী মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে তোমরা বুঝতে পারবে, মানুষের মত মানুষ হবার আশা আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লে, আর থাক্‌লে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি—আর্থিক, মানসিক, পারিবারিক বা সামাজিক কোন বাধা-বিপত্তি কোন মানুষকে প্রতিহত করতে পারে না। যারা আলালের ঘরের দুলাল হয়ে নিশ্চেষ্ট জীবন নিয়ে সংসারে দু কুড়ি সাত বজায় করে পৃথিবী থেকে চলে যেতে চায়,—যাদের পাশ ফিরিয়ে দিলে পাশ ফেরে, খাইয়ে দিলে খায়, আর প্রাইভেট টিউটর রাখ্‌লে তবে পড়ে, আর পরীক্ষার জন্যে নোট কিনে প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে বিষয়বস্তুগুলি মুখস্থ করিয়ে না দিলে পাশ করে না, তাদের বিষাক্ত মানসিক বীজাণুগুলি যেন তোমাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত না হয়। মনে রেখো যা প্রতিজ্ঞা করবে তার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হবে) সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করলে চলবে কেন?—অবশ্য আশার কথা এই যে, আমাদের দেশে কিশোর ছেলে রিকসা চালিয়ে, সংবাদপত্র বেচে, আর সেই সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়ে মানুষ হ'তে আরম্ভ করেছে।

রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ নিম্নের ছয়টি অনুশীলন সুসম্পন্ন করবে—এই রকম অনুশীলনের দ্বারা তোমাদের মনে ইচ্ছাশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

প্রথম দিন—নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে চরিত্রগত দোষগুলি নিজের ভেতর থেকে খুঁজে বের করে একটি কাগজে লিখ্‌বে, আর সেই সব দোষ সংশোধন করবার জন্যে কি ভাবে অগ্রসর হবে নিজেরাই ঠিক করে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করবে। প্রতিজ্ঞাগুলি ঐ কাগজে লিখে রাখ্‌বে।

দ্বিতীয় দিন—তোমাদের চরিত্রের মধ্যে সব চেয়ে যে মানসিক বৃত্তি দুর্ব্বল হ'য়ে আছে, সেইটী দূর করবার জন্যে নিজেকে আদেশ করে কিছু লিখ্‌বে আর তাই পালন করবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তোমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এই অনুশীলনটী বিশেষ কার্য্যকরী।

তৃতীয় দিন—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে কি কি করা প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করবে, আর স্থির করবে কি কি কারণের জন্যে শরীরের পোষণ হচ্ছে না। তারপর এর
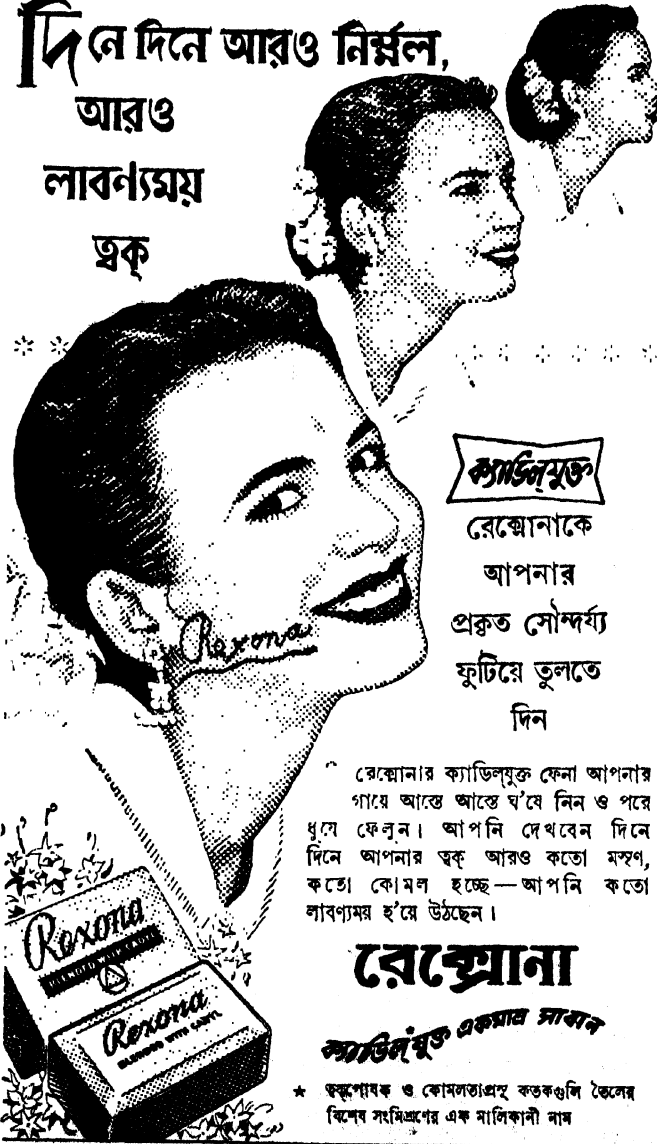
দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
R.P. 123A-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

প্রতীকারের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে একটি কাগজে লিখ্‌বে। এ দিন বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞা কর্‌বে যাতে ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্যক্ ভাবে কর্‌তে পারো, আর শরীরের পুষ্টির পক্ষে ব্যাঘাতজনক কোন উত্তেজনা-মূলক গ্রন্থ পাঠ যাতে বর্জ্জন কর্‌তে পারো।

চতুর্থ দিন—যে সব বিষয়ে কাঁচা আছ সেগুলো শুধ্‌রে ফেল্‌বার জন্যে প্রতিজ্ঞা করে লেখো।

পঞ্চম দিন—আগামী পাঁচ বছরের ভিতর তোমাদের নির্ব্বাচিত বৃত্তি অবলম্বনের পক্ষে সহায়ক ও হিতকর কি কি বিষয়বস্তু বা গ্রন্থ পড়ে আবৃত্তি ও আলোচনার দ্বারা নিজেদের তৈরী করে রাখ্‌তে হবে, সে সম্বন্ধে লিখে রাখো।

ষষ্ঠ দিন—এ দিনে তোমাদের পরিকল্পনাগুলিকে লিখ্‌বে কখন কোথায় আর কেমন করে তোমরা উপরোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে পারো।

জান্‌বার কথা

মহাভারত প্রায় ৫০০০ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ।

* * *

তোমরা ওজন হও, ওজন হোতেও দেখেছ, অথচ এটা কেমন করে সম্ভব হোলো তা জানো কি? এটা হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণের ফল। প্রত্যেক জিনিষই পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলে প্রত্যেক জিনিষেরই ওজন থাকে। তোমরা হয়তো মনে কর্‌তে পারো বাতাস এত হাল্‌কা যে এর ওজন হয় না। জেনে রেখো, বাতাসেরও ওজন হয়। পৃথিবীতে এক ঘন ফুট বাতাসের ওজন হচ্ছে মাত্র তিন তোলা। জলেও একটা ওজন আছে। তিন ঘনফুট জলের ওজন হচ্ছে প্রায় ৬২ পাউণ্ড, কাজেই জলের মধ্যে কোন জিনিষ থাকলে, নীচের জলের ধাক্কায় তার ওজন অনেকখানি কমে যায়।

* * *

মানুষের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে পুরুষ জন্মায় বেশী, আর স্ত্রীজাতির চেয়ে পুরুষই মরে বেশী।

* * *

মৌমাছিদের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ। এদের অনিষ্ট না কর্‌লে সাধারণতঃ এরা কারও অনিষ্ট করে না।

* * *

আমাদের পৃথিবীর ওপর তিন শো মাইল পর্য্যন্ত বাতাস, তারপরই সূর্য্য পর্য্যন্ত মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত সূর্য্যের তাপ আমরা পাচ্ছি।

* * *

কয়লা সম্পদে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

* * *

পৃথিবীতে ৭৩০ রকমের তাসখেলা প্রচলিত আছে।

* * *

আফ্রিকায় একরকম হিংস্র পিপ্‌ড়ে আছে। ইংরাজীতে এদের বলা হয় ড্রাইভার অ্যাণ্ট। সিংহ, বাঘ, হাতী এই সব বড় বড় জানোয়ারকে মানুষের ভয়েই অস্থির হোতে দেখেছ? কিন্তু মজার কথা, এই সব বড়ো বড়ো জানোয়াররা এই পিঁপ্‌ড়ের ভয়ে অস্থির।

* * *

আমাদের মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে আছে স্মরণশক্তি।

* * *

পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনের 'ডেলিমেল' সবচেয়ে বড় খবরের কাগজ।

* * *

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ২,০০,০০০ রকম গাছপালা পাওয়া গেছে।

* * *

আকবরের সময় ১৯ বৎসর অন্তর জমির নূতন বন্দোবস্ত হোতো। কেননা ১৯ বছর অন্তর চন্দ্রের গতি পরিবর্ত্তন হয়—সুতরাং ১৯ বৎসর অন্তর ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়—শস্যোৎপাদনেরও তারতম্য ঘটে। গ্রহণের গণনা মোটামুটি ঐ ১৯ বৎসর কয়েকদিন হোলে প্রায় তারিখ সমান হয়ে যায়।

* * *

মেঘে যে বিদ্যুৎ আছে তার প্রথম প্রমাণ করেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর নিবাস ছিল আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনি এটা আবিষ্কার করেন।

আমার ছড়া

বিশ্বনাথ দে

রোজ রোজ সকালেতে পাঠশালে রোদ্দুর এলে
মজাদার ছড়া কতো লিখে দিই ডাকঘরে ফেলে,
হলদে-সবুজ-নীল-রাঙা টুকটুকে সব খামে—
ছোট-বড় কাগজের কতো সম্পাদকের নামে।

ছাপ্‌তে পাঠাই ছড়া, তারপরে কতো দিন গুণি
নিঝ্‌ঝুম রাত্তিরে বিছানায় কতো আশা বুনি,

মনে হয় সকালেতে উঠে আমি চিঠি পাবো ঠিক—
ছাপ্‌বে আমার ছড়া, নাম হবে দিক্ হতে দিক্।

কিন্তু সকাল কেন? তারও পরে কতো দিন যায়
ছাপিয়ে আমার ছড়া আসেনি কাগজ কোনো হায়,
না ছাপুক ছড়া আর পাঠাবো না কারো কোনো নামে—
বড় বড় আখরেতে ছড়া লিখে মেরে দেবো খামে!

পুলকের সখা-সাথী

জ্যোতি বাচস্পতি

(নাটিকা)

দৃশ্য:—প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড সাদা তাঁবু খাটান হ'য়েছে। পিছনে একটু দূরে পাহাড় ও জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

একটি মধুমক্ষী তাঁবুর চারপাশে প্রদক্ষিণ ক'রে সামনে এসে বসল।

মধুমক্ষী। (গুঞ্জন স্বরে) জ্বালাতন! জ্বালাতন!

প্রবেশ—একটি পিপীলিকা

পিপীলিকা। কী হ'য়েছে বোন্? কী হ'য়েছে বোন্?

মধুমক্ষী। দেখছ না মানুষের কাণ্ড? সব পাষণ্ড! করেছে যা-তা। মাঠের মাঝখানে কেন কে জানে, তুলেছে মস্ত ব্যাঙের ছাতা।

পিপীলিকা। ব্যাঙের ছাতা নয়, ও তাঁবু।

মধুমক্ষী। কে জানে, বাবু। ঐখানে ছিল আমার বনফুলের বাগান, দিত সারা বছরের মধুর যোগান। সব দিয়েছে ফেলে তুলে, এখন বল্ দেখি মধুর জোগাড়ে যাই কোথায় কোন্ ফুলে?

পিপীলিকা। এই মানুষগুলো, এই তো সব সেদিন জন্মালো। এরই মধ্যে গোটা ধরা দেখেছে যেন সরা। তুমি আমি, আমরা বনেদী বংশ, নই অত বেচাল বর্বর। আহা মরি, হায় হায়! ভাবলে হাসিও পায়।—আমাদের নকল ক'রে আজ, গড়ে তুলেছে মানুষের সমাজ! যা হবার নয়—তা কি হয়?

মধুমক্ষী। থাক্ ও কথা, ঘুরে উঠছে মাথা। যেতে হবে কতদূরে কোন ঠাঁই, দেখি কোথা মধু পাই। জ্বালাতন! জ্বালাতন!

প্রস্থান

পিপীলিকা। এসো এসো বোন্! আমি কিন্তু ছাড়ছি নি, লুট করব যতটুকু পারি চিনি।

প্রস্থান

প্রবেশ—তাঁবুর মধ্য হ'তে রাজা ও পুলক। দু'জনেই তরুণ এবং দুজনেরই পোষাক সাদাসিধে। দু'জনেই সুদর্শন। রাজার দেহ একটু পুষ্টতর।

রাজা। (নিশ্বাস ফেলে) হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেছে, কী বল পুলক?

পুলক। তা বলতে পারেন, মহারাজ। দাঁড়ান, বসার জায়গা নিয়ে আসি।

পুলক ভিতরে গিয়ে দুটো চেয়ার ও একটা টেবিল নিয়ে এলো

রাজা। মন্ত্রীরা চারপাশ ঘিরে গুরুগম্ভীর মন্ত্রণা শুরু করেন, সে তবু স'য়ে আসছিল। কিন্তু এখন আবার ঘাড়ের উপর মণ দেড়েক ওজনের একটি রাণী চাপাতে চান! এ সওয়া যায়?

পুলক। কিন্তু পালিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে থাকবেন ক'দিন? রাণীও তো একটি চাই, নইলে রাজ্য মানাবে কেন?

রাজা। রাণীর সম্বন্ধে—তুমি তো জানো—আমার একমাত্র বাণী! হয় রাজকন্যা রজনীগন্ধা, না-হয় চিরকুমার!

পুলক। কিন্তু সে রজনীগন্ধার শুনেছি তো আবার পণরক্ষা করতে হবে। দুরূহ সব পণ।

রাজা। নিশ্চয় দুরূহ। কোন্ এক জঙ্গলে তাঁর মুক্তোর মালা গিয়েছিল ছিঁড়ে, মুক্তোগুলো পড়েছে কোথায় ছিটকে কে জানে, সেই মুক্তোগুলি সব খুঁজে এনে হাজির করতে হবে একটিও কম থাকলে চলবে না।

পুলক। তার চেয়ে ভাল একছড়া মালা কিনে দিলেই তো চুকে যায়।

রাজা। না, তা চলবে না, তাঁর সেই মুক্তোগুলিই চাই। শুধু তাই নয়, তাঁর একটা মাণিকের আঙটি দিয়ে গেছে কাকে, সেটাও উদ্ধার ক'রে এনে দিতে হবে।

পুলক। অর্থাৎ তাঁকে যদি কেউ পেতে চায়, তাহ'লে

তার কাজ হবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে পিপড়ে আর ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে দেখা, আর গাছে গাছে কাকের বাসা হাঁটকানো!—আমি বলি কি—মহারাজ, তার চেয়ে রাজনীতি ধরুন।

রাজা। রাজনীতি?

পুলক। মন্ত্রীরা তো বলেন, 'যেই দেখবে গণ্ডগোল, অমনি পথটা দেবে ছেড়ে, আর মতটা ফেলবে বদলে', এই হচ্ছে সেরা রাজনীতি।

রাজা। মন্ত্রীরা গর্দভ।

পুলক। তাঁদের বক্তৃতা শুনলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সে কথা মুখে আনতে ভরসায় কুলোয় না।

রাজা। আমার ঐ এক কথা, হয় রজনীগন্ধা না হয় কেউ না।

পুলক। তা ঠিক। বাত আর দাঁত যতক্ষণ স্থির থাকে ততক্ষণই তার কদর—নড়লেই মুস্কিল—

রাজা। দাঁতের কথায় ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল। আজ রান্না করছ কী, বল দেখি?

পুলক। সে ঠিক আছে, রান্না প্রায় তৈরী। মাছের ঝোল আর ভাত।

রাজা। মাছের ঝোল!—কী মাছ?

পুলক। মাগুর, মহারাজ!

রাজা। এঁ্যা, শেষকালে এই রাজভোগ রান্না করেছ? মাগুর মাছের ঝোল! রুই, কাতলা, ইলিস, ভেটকী, কিছুই মিলল না? মাগুর মাছ!

পুলক। মহারাজ কিছুই খোঁজ রাখেন না দেখছি। আজ আর সেদিন নেই যে ছ' আনা, আট আনায় মাগুর পাবেন। এ আট টাকা সেরের মাগুর!

রাজা। তাই বল। আট টাকা সের! বেশ, বেশ! তবে কিনা ঝোল কথাটা শুনতে খারাপ।

পুলক। ভাববেন না মহারাজ চারটে বাটিতে সাজিয়ে দেব, ওই একই ঝোল হ'য়ে উঠবে কারি, কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়া।

রাজা। (পুলকিত ভাবে) বহুত খুব, বহুত খুব! তোমার কথায় রসনা লালায়িত হ'য়ে উঠছে। দেখ কত দেরী।

পুলক। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

প্রস্থান

রাজা। রজনীগন্ধা! রজনীগন্ধা!

প্রবেশ—বেদেনীর সাজে এক কুব্জদেহা বৃদ্ধা

রাজা। এ্যাই বুড়ি! এ্যাই বুড়ি! এদিকে নয়—

বেদেনী। ঠ্যাঁটা ছোকরা! বুড়ী বলছ কাকে? আজও এ শিক্ষা হ'ল না যে, মহিলাকে বুড়ি বলতে নেই?

রাজা। (নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে) মহিলা! দেখলে তো মোটেই তা মনে হয় না।

বেদেনী। তোমাকেই কি দেখলে রাজা ব'লে মনে হয় না কি?

রাজা। তা নইলে তুমি বুঝলে কি ক'রে আমি রাজা?

বেদেনী। তোমাদের মত বিচার বিবেচনা ক'রে আমাদের—বুঝতে হয় না, ছোকরা। আমরা পরীরা দেখলেই বুঝে নিই।

রাজা। (বিস্মিত ভাবে) পরী! পরী তো শুনেছি সুন্দরীই হয়।

পরী। আর আমি কুৎসিৎ, কদাকার, কেমন? মূর্খ! কে সুন্দর কে কুৎসিৎ তা চেনার চোখ আছে?—রাঙা মূলো হ'লেই সুন্দর হয় না। বুঝেছ ছোক্‌রা? সত্যিকার সুন্দর সেই, সুন্দর যার ভাব, সুন্দর যার কাজ।

রাজা। ভাবও তো নেহাৎ সুন্দর ঠেকছে না। পরীই যদি হও, তাহ'লে নিশ্চয়ই অপ-পরী। অপদেবতার মত—

পরী। দ্যাখো রাগিও না বলছি। একটি ফুঁয়ের ওয়াস্তা। তোমার ঐ রাঙা-মূলো দেহ সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া হ'য়ে ভ্যা-ভ্যা জুড়ে দেবে, না হয় ব্যাঙ হ'য়ে থপাস্ থপাস্ ক'রে লাফাতে শুরু করবে। তোমার মা ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারই খাতিরে তোমায় মাপ ক'রে যাচ্ছি।—বাপ মার বন্ধুকে বাপ-মার মতই শ্রদ্ধা করতে হয়, পাঠশালে সে শিক্ষাও হয় নি বোধ হয়?

রাজা। মাপ করবেন, চিনতে পারি নি। কখনও দেখি নি কি-না।

পরী। এইবার চিনলে তো। এখন এক কাজ কর দেখি—তোমার বাবার বোমার মলাট দেওয়া তালপাতার পুঁথিটি আমার চাই, একটা হুকুমনামা লিখে দাও দেখি।

রাজা। সে পুঁথি তো আমরা ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করি। আপনি তা নিয়ে করবেন কী?

পরী। পুজো করব না, নিশ্চয়।
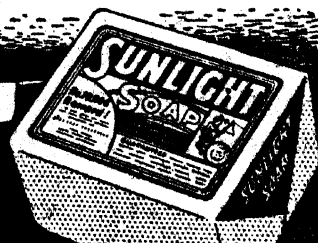
রাজা। তবে কী করবেন ?

পরী। পুঁথির মধ্যে আছে জ্ঞান আর আনন্দ—পূজো ক'রে তার কাছ থেকে তা আদায় করা যায় না।

রাজা। তবে কী ক'রে ?

পরী। সে জেনে তোমার লাভ নেই। বরং পুঁথিটা আমায় দিলে কিছু লাভ করতে পার। আমি বিনা মূল্যে নোব না। (নিজের আঁচলের মধ্য থেকে একটা থলি বের ক'রে) এই নাও।

রাজা। কী আছে ওতে ?

পরী। খাদ্য।

রাজা। (আগ্রহের সঙ্গে) খাদ্য! সত্যি ? কী খাদ্য ? (হাত বাড়িয়ে) দেখি, দেখি—

পরী। অতি উপাদেয় খাদ্য—! অতি সারবান। চর্বিওয়ালা হৃষ্টপুষ্ট ময়াল সাপের একখণ্ড মাংস—

রাজা। (হাত গুটিয়ে নিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে) অ্যা ছিঃ ছিঃ।

পরী। (চটে উঠে) ছিঃ ছিঃ তোমার রাজ্যের বৈষ্ণব বণিকদের দৌলতে ময়ালের চর্বি তো ঘিয়ের সঙ্গে দু'বেলাই উদরস্থ হচ্ছে—মাংসের বেলায় অত নাক সেঁটকানো কিসের ?—এ যে-সে ময়াল নয় ছোক্‌রা, এর মাংস এক ছিটে যদি পেটে যায়, তাহ'লে যত পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গের ভাষা তখুনি বুঝতে পারবে, তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে।

রাজা। (বিস্ময়ের সঙ্গে) অ্যাঁ সত্যি! তাহ'লে তো বেশ মজা! কিন্তু সাপের মাংস! সাপ!

পরী। সাপ মনে করছ কেন ? মনে কর না দেড়মণি মাগুর! চর্বি যখন ঘি বলে চ'লে যাচ্ছে—তখন মাংসটাও—

রাজা। মাগুর ব'লে চলুক! ঠিক!

পরী। (টেবিলের উপর থলিটা রেখে) দাও তাহ'লে হুকুমনামা।

রাজা। (পকেট থেকে কাগজ কলম নিয়ে লিখে) এই নাও।—আচ্ছা, এ মাংসের এক টুকরা যদি অপর কেউ খায় ? তাহ'লে সে-ও তো ঐ সব ভাষা বুঝতে পারবে ?

পরী। নিশ্চয়।

রাজা। তাহ'লে আর কাউকে খেতে দেওয়া হবে না। একলা আমিই বুঝব পশুদের ভাষা, আমিই হ'ব সব চেয়ে জ্ঞানী।

পরী। তা জানি সস্তায় কিস্তিমাত করতে পারলে আর কিছু তোমরা চাও না। কিন্তু জ্ঞান অত সস্তা নয়। যাক্ চললুম।

প্রস্থান

রাজা। (ডাক দিয়ে) পুলক! পুলক!

পুলক। (প্রবেশ ক'রে) রান্না তৈরী মহারাজ! আনব ?

রাজা। সে মাগুর মাছের ঝোল তুমিই খেও। আমার জন্য এর একটা আলাদা কারি বানিয়ে নিয়ে এসো চট্ ক'রে। এই নাও (থলি দেখালেন)

পুলক। (থলি নিয়ে তার ভিতরে দৃষ্টিপাত ক'রে) কী এ ? সাপ নয় তো ?

রাজা। চুপ। ও মাগুর, দেড়মণি মাগুর। যাও—(পুলক প্রস্থানোদ্যত) আর দ্যাখ, খবরদার! এর একটা কণাও যদি মুখে দাও তোমার গর্দান নোব। যাও। (পুলকের প্রস্থান) আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে বসছি।

প্রস্থান

সঙ্গে সঙ্গেই পুলকের প্রবেশ, তার হাতে ভাতের থালা এবং তার উপর বসানো একটি তরকারির বাটি

পুলক। (থালা বাটি টেবিলে রেখে) মজার জিনিস তো। উনুনে চড়াতে না চড়াতেই কারি তৈরী। নুণ দিয়েছি তো ? (বাটির তরকারিতে আঙুল দিয়ে তা জিভে ঠেকিয়ে) নাঃ ঠিকই আছে।

প্রবেশ—রাজা

রাজা। এর মধ্যে তৈরী ? বেশ বেশ! (খেতে বসলেন)

প্রবেশ মধুমক্ষী

মধু। (গুঞ্জন স্বরে) ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মানুষগুলোর কী বিশ্রী খাওয়া! বিষিয়ে তুলেছে সব হাওয়া! দেখলেও ধরে রাগ, না আছে ফুল, না মধু, না পরাগ! শুধু ঝোল, ঝাল আর শাক! অমন খাওয়া মাথায় থাক্। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

প্রস্থান

পুলক হেসে উঠল

রাজা। (ভর্ৎসনার স্বরে) পুলক! হুকুম অমান্য করেছ! চুরি ক'রে এই কারিতে ভাগ বসিয়েছ!

পুলক। না, মহারাজ!

রাজা। বললেই হ'ল 'না'। নইলে হাসলে কেন? মৌমাছির কথা বুঝলে কী ক'রে?

পুলক। নুন ঝাল বোঝবার জন্যে রাঁধুনিকে একটু ঝোল জিভে ঠেকিয়ে দেখতে হয় যে—

রাজা। জিভে তো ঝোল ঠেকিয়েছ—এখন ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ ঠেকাবে কী করে?

পুলক। এবারকার মত মাপ করুন মহারাজ!

রাজা। উঁহুঁ, তোমার গর্দ্দান আমি নেবই। আমার কথার নড়চড় নেই।

পুলক। কিন্তু মহারাজ, আমার যদি মাথা যায়, আপনার মাথা ঠিক থাকবে তো? আপনার রান্না করবে কে? আপনাকে গল্প শোনাবে কে? গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে কে?

রাজা। (চিন্তিতভাবে) সে একটা কথা বটে! আচ্ছা তোমায় তিন ঘণ্টা সময় দিলুম। এর মধ্যে তুমি যদি রাজকন্যা রজনীগন্ধাকে রাজী করতে পার আমায় বিয়ে করতে, তাহ'লে তোমার দণ্ড মকুব। আমি ঠিক তিন ঘণ্টা পরে আসছি।

উঠে ভিতরে গেলেন

পুলক। উনি তিন বছরে যা পারলেন না, আমায় তিন ঘণ্টায় তা পারতে হবে!—তার মানেই আমার দফা সারা—

প্রবেশ—তিড়িক্ তিড়িক্ ক'রে লাফাতে লাফাতে এক টিয়া, তার পায়ে বাঁধা এক লম্বা শিকল

টিয়া। মাথা খেয়েছে! আমার দফা সারা।

পুলক। তোমারও দফা সারা? ব্যাপারখানা কী?

টিয়া। আমি হারিয়ে গেছি!

পুলক। কে তুমি বাছা? কোথায় থাক?

টিয়া। আমি রাজকন্যা রজনীগন্ধার পেয়ারের টিয়ে গো। থাকি তাঁরই সোনার খাঁচায়। খাঁচার দোর খোলা পেয়ে শেকল কেটে বেরিয়ে পড়েছি এই বিপদে। হাঁটা তো অভ্যেস নেই, হাঁটা পথ চিনতেও পারি নে—কোথায় এসে পড়েছি, কে জানে! উড়ো পথে ফিরতে পারতুম—

পুলক। তাই ফিরছ না কেন?

টিয়া। কী বোকা তুমি! দেখছ না, পায়ে লম্বা শেকল, উড়তে গেলেই ঝোপে ঝাড়ে যাচ্ছে আটকে। টানাটানি ক'রে শেষকালে পাটাও খোয়াব। মুস্কিল আর কী!

পুলক। এর আর মুস্কিল কী? এস শেকল খুলে দিই।

টিয়ার পায়ের শেকল খুলে পকেটে রাখলে

টিয়া। ভারি ভাল লোক তুমি। তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারতুম।

পুলক। তা পার। তুমি তো রজনীগন্ধার টিয়ে? তাকে রাজী করতে পার আমাদের রাজাকে বিয়ে করতে?

টিয়া। ভারী পুরুষচটা মেয়ে ঐ রাজকন্যা। আমায় আদর ক'রে কী বলে জান? "ওরে আমার টিয়ে, থাকব তোমায় নিয়ে, আমি করব নাকো বিয়ে।" অত আদর ভালও লাগে না, এক এক বার দিই কট ক'রে আঙুলটা কামড়ে। রাজকন্যার কুমারী থাকা কী ভাল দেখায়?

পুলক। নিশ্চয় না।

টিয়া। এমনি সব পণ ক'রে রেখেছে, কেউ কাছে ঘেঁসতে পারে না।

পুলক। তা হ'লে উপায় কী?

টিয়া। দাঁড়াও, একটা চালাকি ক'রে তাকে এখানে নিয়ে আসি, তারপর যা পার কোরো।

পুলক। চালাকি—?

টিয়া। উড়ে রাজবাড়ীতে ফিরছি তো? রাজকন্যা আমাকে ধরতে আসবে নিশ্চয়, আমি একটুখানি ক'রে লাফিয়ে স'রে স'রে তাকে এইখানে হাজির করব। তুমি এইখানে থেকো।

উড়ে চলে গেল

পুলক। দেখা যাক্। যতক্ষণ শ্বাস—

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

কালো রাজকন্যা

শ্রীব্রজেন রায়

(রূপকথা)

মস্তবড় এক দেশ।

মস্তবড় সেই দেশের রাজা। কিন্তু হলে কি হবে। রাজার মনে সুখ নেই। এত ঐশ্বর্য, এত ধন-সম্পদ—কিন্তু খাবে কে? একটিও ছেলে নেই তাঁর, একটিও মেয়ে নেই তাঁর।

রাজা বিষণ্ণ মনে চুপ করে বসে বসে ভাবেন। রাজকার্য্যে মন নেই, সংসারে মন নেই। তিনি ভাবেন, শুধু ভাবেন—অন্ততঃ যদি একটি মেয়েও তাঁর থাকতো? তাহলে তিনি তাকেই রাজ্য দিয়ে যে'তেন। তা না হলে তো বারভূতে লুটেপুটে খাবে তাঁর এত সুন্দর রাজ্য!

তিন রাণীর মনেও সুখ নেই, রাজারই সুখ নেই তো তাঁদের মনে সুখ থাকবে কি করে? রাণীরা ভাবেন, তাঁরা যদি রাজাকে একটি মেয়ে অথবা ছেলেকে রাজার কাছে উপহার দিতে পারতেন? তাহলে তো রাজার মনে এই অসুখ থাকতো না। কষ্ট থাকতো না। তিন রাণী নানারকম পরামর্শ করেন, যে করে হোক রাজার অসুখ দূর করতেই হবে। যেমন করেই হোক।

সাধু এলো। সন্ন্যাসী এলো। ডাক্তার বদ্যি সব এলো কত রাজ্য থেকে। কিন্তু কেউ কি কিছু করতে পারলো? কেউ কি পারলো রাজার কষ্ট দূর করতে?

রাজার মনের অসুখ দিনকে দিন বেড়েই চলে। রাজ্যের কাজে শৃঙ্খলা নেই, শান্তি নেই। রাজা বিছানায় শুয়ে থাকেন। সারা দিন রাত্তিরের মধ্যে একটি বার ওঠেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। এমনি রোজ, এমনি নিত্য নৈমিত্তিক। তিন রাণী রাজার বিছানার চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে চুপচাপ বসে থাকেন বিষণ্ণমুখে।

অবশেষে একদিন এক সন্ন্যাসী এলো—সৌম্য শান্ত পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। রাজাকে দেখলেন ভালো করে, তারপর বললেন, তাঁর তো দুঃখ করবার কারণ নেই—ছোট রাণীর অল্পদিনের মধ্যেই একটি মেয়ে হবে। সেই মেয়েই রাজার সব কষ্ট দূর করবে।

রাজ্যে ধুমধাম উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। রাজা উঠে বসলেন। রাজ্য যেমন আগের মত ভালভাবে চলছিল, তেমনি ভাবেই চলতে লাগলো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ছোটরাণীর একটি মেয়ে হল। রাজ্যের লোক দল বেঁধে মেয়ে দেখতে এলো—কিন্তু এঃ মা, ছিঃ ছিঃ! রাজার মেয়ে এত কালো? এতো কুৎসিত? সবাই মনের দুঃখে ঘরে ফিরে গেল। রাজা মনের দুঃখে আবার শয্যা নিলেন। আর ছোটরাণীর স্থান হলো পাতার কুটীরে।

কিন্তু রাজকন্যা কালো হলে, দেখতে বিচ্ছিরি হলে কি হবে। কালো রাজকন্যা ধীরে ধীরে বড় হলেন। ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র শিক্ষা সব কাজই রাজকন্যা ভাল ভাবে শিখে নিলেন।

রাজপুরীর বাইরে বনের ধারে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে কালো রাজকন্যা আর তাঁর মা ছোটরাণী থাকেন। ছোটরাণী মুখ ভার করে ভাবেন বসে বসে। কালো রাজকন্যা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "ভয় কি মা, আমি তোমার কষ্ট, বাবার কষ্ট সব আমি দূর করবো। আমাকে কিছু টাকা দাও মা, আমি বাণিজ্য করে আসি।

ছোটরাণী ঘুঁটে কুড়িয়ে তাল পাতার পাখা তৈরী করে বাজারে বেচে অনেক কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করে মেয়েকে দিলেন। রাজকন্যা পুরুষের বেশ ধরে বাণিজ্য-যাত্রার আয়োজন করলেন।

মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি ঠিক দেখো মা—ফিরবো আমি, তোমাদের সব দুঃখ দূর করবো।" রাজকন্যার চোখে মুখে আশার উজ্জ্বলতা ঝলমল করে ওঠে যেন।

রাজকন্যার ঘোড়া দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল ছোট্ট কালো বিন্দুর মত। ছোটরাণী সেইদিকে আশা-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন।

রাজকন্যা ঘোড়া ছুটিয়ে অবশেষে এক বিরাট নগরে এসে উপস্থিত হলেন। সে রাত্তিরটা সেখানেই কাটালেন

"যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—
লাক্স টয়লেট সাবান—
কি সরের মতো সুগন্ধি ফেনা এর।"
ভারতী দেবী বলেন

স্থির করে এক গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এত বড় একটা শহরে একটাও মানুষের দেখা পেলেন না তিনি? এত বড় বড় বাড়ি, এত বড় বড় রাস্তা সবই নির্জন, সবই অন্ধকার।

হঠাৎ রাজকন্যার খেয়াল হয়, আরে তাঁর পাশেই তো একজন রাজকুমার শুয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ভারী আশ্চর্য্য লাগে কালো রাজকন্যার। এই নির্জন পুরীতে তাহলে একটা মানুষ পাওয়া গেল। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে রাজকন্যার।

অনেক কষ্টে ঘুম ভাঙালেন তিনি। রাজকুমার ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন—দু' চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে।

—"তুমি কি রাজকন্যা, কালো রাজকন্যা?"—অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন রাজকুমার।

—"কেন বলতো? আমাকে তুমি চিনলে কি করে?" রাজকন্যাও বিস্ময়ে ফেটে পড়ে এবার।

—"বারে! তোমার জন্যেই তো আমি কতদিন এইখানে এইভাবে প্রতীক্ষা করছি—তুমি আমার ঘুম ভাঙাবে বলেই তো আমার এতদিনের প্রতীক্ষা। তুমি আমাকে বিয়ে করবে রাজকন্যা?" প্রশ্ন-চোখে চেয়ে থাকে রাজকুমার।

—"কেন বলতো?"

—"তা হলে তুমি তোমার রূপ ফিরে পাবে আবার। আমার এ রাজ্যের ঘুমন্ত মানুষেরা আবার জেগে উঠবে। অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে তুমি, মুক্তি পাবো আমি। বলো বলো রাজকন্যা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

রাজকন্যা সম্মতি জানায়। কালো রাজকন্যার সঙ্গে সেই ঘুমের দেশের রাজকুমারের শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ঘুমপুরীর সমস্ত মানুষ জেগে ওঠে—তারা রাজকন্যা আর রাজকুমারকে অভিনন্দনের জন্যে দলে দলে রাজপুরীতে সমবেত হতে থাকে।

তারপর এক মাস কেটে গেছে।

রাজকন্যা বলে, "এবার চলো আমার মায়ের দুঃখ, বাবার দুঃখ দূর করে আসি।"

রাজকুমার সম্মতি জানিয়ে বলে, "চলো!"

ঘুমপুরীর লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত হয়ে যাত্রা করে কালো রাজকন্যার বাবার রাজ্যের উদ্দেশ্যে।

কালো রাজকন্যার বাবা মেয়ে-জামাইকে দেখেই তো অবাক। ঘুঁটে কুড়ুনি ছোটরাণীকে চতুর্দ্দোল পাঠিয়ে নিয়ে আসলেন। কালো রাজকন্যা আর কালো রাজকন্যা নয়। এখন সে খুব সুন্দরী, রূপবতী।

সমস্ত রাজপুরী উৎসব আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো।

কলিকাতায় বেকার সমস্যা—

কলিকাতায় বেকার সমস্যা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের হিসাব দেখিলে বুঝা যায়। ১৯৫১ সালে প্রতি মাসে ৫ শত লোকের চাকরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত—এখন সে স্থানে প্রতি মাসে ২০০ বেকারের ও কর্ম জোগান যায় না। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী গত আড়াই বৎসর, কলিকাতা ইলেকট্রিক কোম্পানী গত ১ বৎসর ও কলিকাতা পুলিস গত আড়াই বৎসর কোন নূতন লোককে চাকরী দেয় নাই। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ও চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা ১৯৫২ সালের পর কোন নূতন লোক গ্রহণ করে নাই। কলিকাতায় ১২ হাজার বেকার লোক সরকারী বেকার-তালিকায় নাম লিখাইয়াছে—তন্মধ্যে ২ জন প্রাক্তন আই সি এস, ১জন পি এচ্-ডি, ১০০ এম-এ, বি-এল, ৩ জন প্রাক্তন জেলা জজ, ২০০ ডাক্তার, ১৫০ আইনজীবী এবং বহু বি-এ, এম-এ পাশ লোক বেকার তালিকায় নাম লিখাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে ৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক লওয়া হইবে—সে জন্য প্রত্যহ ১০০ হইতে ১৫০ আবেদন পাওয়া যায়। বহু মহিলা নার্সের কাজ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন—ঐরূপ ৮ হাজার মহিলার নাম লেখা আছে—তাঁহারা অল্প শিক্ষিত। ৮ হাজার তৃতীয় বিভাগে পাশ করা মাট্রিক পাশ মহিলার নাম ও লেখা আছে। তাহাদের কি কাজ দেওয়া হইবে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সত্বর এই বেকার সংখ্যা হ্রাস করা না হইলে দেশে বিপ্লব বা অরাজকতা আসাই স্বাভাবিক।

চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা—

কলিকাতার খ্যাতনামা চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার নীহার মুন্সী তিন সপ্তাহ চীনদেশে ঘুরিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। পিকিংয়ে একটি এসিয়াবাসী ছাত্রদের স্বাস্থ্য-নিবাসের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি তথায় গিয়াছিলেন। পিকিং সহর হইতে ১৮ মাইল দূরে একটি তেতালা বাড়ীতে ঐ স্বাস্থ্যনিবাস খোলা হইল—তথায় ৫০ জন ভারতীয় ছাত্র স্থান পাইবে। তথায় ৪০ ডাক্তার, ৬০ নার্স ও ৩০০ সাধারণ কর্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ উৎসবে ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, নাইজিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, ফিলিপাইন, ভিয়েটনাম, জাপান ও উত্তর কোরিয়া হইতে প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিল। চীনে প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণকে আধুনিক প্রথাও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ডাক্তারকে চীন ভাষা ছাড়াও রুশীয় ও ল্যাটিন ভাষা শিখিতে হয়। চীনে ডাক্তারদের মধ্যে অর্দ্ধেক নারী। চীনদেশে এখন আর কলেরা বা বসন্ত হয় না—তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা এতই ভাল হইয়াছে। বি-সি-জি টীকা দিয়া চীনে যক্ষ্মার প্রকোপ বন্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ওদেশে মাত্র ১২৮২৮টি যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। চীনে টাইফয়েড, পাকস্থলীর পীড়া ও প্রসূতি চিকিৎসার ব্যবস্থা এত ভাল যে ঐ সকল রোগে প্রায় লোক মারা যায় না। ডাক্তার মুন্সী এদেশেও জনসেবার কাজ করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এদেশে প্রযুক্ত হইয়া যেন বাঙ্গালা দেশকে রোগ মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়।

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়—

ডক্টর শ্রীনীহার রঞ্জন রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাশিল্প বিভাগের বাগেশ্বরী অধ্যাপক। ব্রহ্ম সরকারের নিমন্ত্রণে তিনি প্রায় ২ বৎসর কাল রেঙ্গুনে থাকিয়া বৌদ্ধ-দর্শন শিক্ষা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কাজ করিতেছেন—তিনি ব্রহ্ম সরকারের সংস্কৃতি প্রচার সম্পর্কেও পরামর্শদাতা। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবে। তাঁহাকে আরও এক বৎসর কাল ব্রহ্মদেশে রাখিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাক্তার রায় নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে ও ঐতিহাসিক কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি সপ্তাহের ছুটী লইয়া ভারতে আসিয়াছেন।

হাওড়া পণ্ডিত সমাজের গৃহ—

গত ৫ই ডিসেম্বর সকালে হাওড়া চার্চ রোডে হাওড়া পণ্ডিত সমাজের নিজস্ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন উৎসব হইয়াছিল। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ভিত্তি স্থাপন করেন। পশ্চিম বঙ্গের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং পূর্ত মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাকালে নবকৃষ্ণবাবু বলেন—"প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতে বন্যার প্লাবনের ন্যায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। আচার্য্য বিনোবাভাবের ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনও ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন সক্রিয় উপায়ে ভারতবাসীকে বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতীয়গণ পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অপেক্ষা কম নহে। ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যে যে জগতে শান্তি ও এক মানব সমাজ গঠন সম্ভবপর।" যে যুগে সংস্কৃত শিক্ষা অবহেলিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ অন্নবস্ত্রের জন্য নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগে বাধ্য—সে যুগে হাওড়ার অধিবাসীরা পণ্ডিত সমাজের উন্নতি-বিধানে আগ্রহশীল হইয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের চর্চাই আমাদের মধ্যে আবার ভারতীয় মনোভাব ও চিন্তাধারা ফিরাইয়া আনিয়া দিবে। সেজন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

কলিকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি—

কলিকাতা সহরের কোন এক উপযুক্ত স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গত ২৪শে নভেম্বর কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে এক সভা হইয়াছিল। খ্যাতনামা উড়িষ্যাবাসী জননেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীপ্রণবেশ সিংহ, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা, শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য সভায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের নির্মাণ কার্য্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন। ঐ সদনের নামের সহিত সুভাষচন্দ্রের নাম সংযুক্ত করা কর্তব্য ও তাহার নিকটে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে একদল কর্মীকে উদ্যোগী হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করি ও বিশ্বাস করি, এ কার্য্যে দেশবাসীর উৎসাহ বা সাহায্যের অভাব হইবে না।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্বর্দ্ধনা—

গত ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে স্কটীশ চার্চ কলেজ আর্ট সোসাইটীর এক অভিনয় অনুষ্ঠানে উক্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বাঙ্গালার নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে এক মানপত্র দানে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মানপত্রের উত্তরে ভাদুড়ী মহাশয় বলেন—"জাতি যেখানে জীবন্ত, সেখানে নাট্যশালাও প্রাণবন্ত—যেখানে নাট্যশালা নাই, সেখানে জাতিও নাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এখনও একথার সঠিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন নাই। এ দেশে এখনও নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা, নাট্যের গৌরব অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয় নাই। অথচ খৃষ্ট পূর্ব সাত শতাব্দীতে গ্রীসে ও ভারতবর্ষে নাটক অভিনীত হইত। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আমার থিয়েটারে আসিবার অন্য কোন কারণ ছিল না।" আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে নাটক ও নাট্যশালার উন্নতিবিধানে অবহিত হইয়াছেন—সেজন্য বাঙ্গালার খ্যাতনামা নাট্যকার, নট প্রভৃতিদের লইয়া শীঘ্রই এ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করা হইতেছে। বাঙ্গালার অভিনয়-জগতে আচার্য্য শিশিরকুমারের দানের কথা কেহ বিস্মৃত হইবে না। স্কটীশ চার্চ কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে সম্মান দান করিয়া গুণেরই আদর করিয়াছেন।

এক সুখী পরিবারের ছবি!

সব হাঁসিরই একটা ইতিহাস আছে। আমার পরিবারের সকলের মুখের হাঁসিরও একটা বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এখনকার মতো চিরদিনই এদের স্বাস্থ্য এত ভালো ছিল না।

কয়েক মাস আগেও আমার স্বামী প্রায়ই অসুখে ভুগতেন, যার জন্য তাঁর আয় কমে যেতে লাগলো। তার উপর আমার তিন ছেলে-মেয়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাদের ওজন কমতে আরম্ভ ক'রেছিল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়াতে কথা-বার্তায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি জিজ্ঞাস ক'রলেন, 'মাপ ক'রবেন, কিন্তু আপনারা রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ কি করে কেনেন বলুন ত? হয়ত তার থেকেই আপনার পরিবারে অসুস্থতা আসছে।'

তিনি শুনে সন্তুষ্ট হবেন ভেবে আমি বললাম যে আমি সর্ব্বদাই রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো স্নেহপদার্থ খোলা অবস্থায় কিনি। 'বড়ো ভালো স্নেহপদার্থই হোক', শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'খোলা অবস্থায় থাকলে তাতে সর্ব্বদাই ময়লা হাত লাগতে পারে ও তাতে মশা-মাছি পড়তে পারে আর তা খেয়ে অসুখ ক'রতে পারে।'

তিনি তক্ষুনি আমাকে ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনতে বললেন। তার প্রথম কারণ ডাল্‌ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল আর শীলকরা টিনে সর্ব্বদা বিক্রী হয় বলে তাতে রোগের বীজাণু ঢুকতে পারে না। আর ডাল্‌ডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বাজারে বে'র করেন না। আমি শুনেই বুঝলাম যে শিক্ষয়িত্রী ঠিক কথাই বলছেন। আর আমার পরিবারের সকলেই ডাল্‌ডায় রান্না খাবার খেয়ে কি খুসী! কারণ ডাল্‌ডা বনস্পতি সব খাবারের নিজস্ব স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীলকরা টিনে ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনলে আপনি যে তাজা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর জিনিস পাচ্ছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডাল্‌ডা বনস্পতিতে রান্না খেয়ে কেমন ক'রে আমার পরিবারের সকলে দিনভোর স্বাস্থ্যের হাসিখুসীতে কাটায় তার প্রমাণস্বরূপ এই ছবিটি আমি কাছে রাখবো। আপনার পরিবারেরও এমন ছবি যদি চান তো ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে সব রান্না করুন। আজই এক টিন কিনুন।

১০, ৫, ২ ১ ও ১/২ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডাল্‌ডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুনঃ

দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস

পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো—খরচ কম

স্থানীয় বেকার লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি দপ্তর কল্যাণীতে স্থানান্তরিত হইবে।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নৈহাটী-কাঁঠালপাড়াস্থ ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষণার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের শাল,
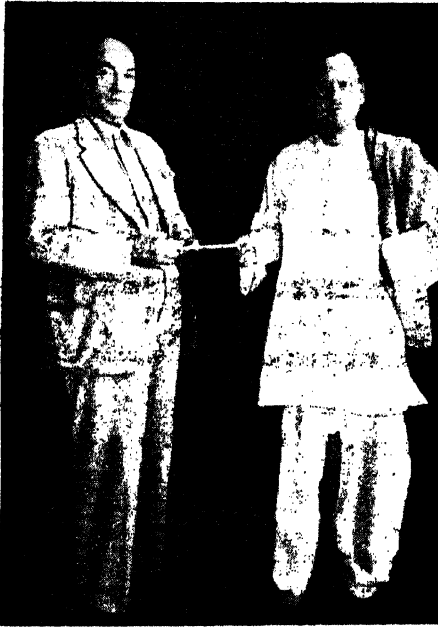
শ্রীশতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে একটি দলিল গ্রহণ করিতেছেন

পাগড়ী, প্রায় ১০০ চিঠিপত্র দলিল, রচিত গ্রন্থাবলী, ব্যবহৃত বাক্স, বহু পুস্তক, তাঁহার এবং তদ্‌বংশীয় আলোকচিত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি গত ১৪ই নভেম্বর সংগ্রহশালার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের নিকট দান করিয়াছেন।

ছাত্রদের ভ্রমণ-ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ-মাধ্যমিক-শিক্ষা-পর্ষদের উদ্যোগে সম্প্রতি শত ছাত্র-ছাত্রীকে দক্ষিণ ভারতে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইবে। ৪টি দলে তাহাদের বিভক্ত করা হইবে—প্রতি দল ১৯ দিনে ৩৫০০ মাইল অতিক্রম করিবে—তাহারা মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম্‌, কাঞ্চিভরম্‌, পণ্ডিচেরী, ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, ত্রিবান্দ্রম ও কন্যাকুমারী দর্শন করিবে। প্রত্যেকের জন্য ব্যয় হইবে ১২৫ টাকা। প্রথম দল ১৭ই ডিসেম্বর ভ্রমণে যাইবে। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এই ভাবে সুলভে দেশ ভ্রমণের সুযোগ অধিকতর পরিমাণে প্রদান বাঞ্ছনীয়। অন্য রাষ্ট্রে লইয়া যাইবার পূর্বে তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরাইয়া আনা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল।

৫ হাজার শিক্ষিত বেকার গ্রহণ—

প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭ হাজার শিক্ষিত বেকারকে কাজ দিয়াছেন—তাঁহারা গ্রামাঞ্চলে যাইয়া শিক্ষকের কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি আবার ৫ হাজার শিক্ষিত বেকারকে ঐ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—প্রার্থী অন্ততপক্ষে ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ হাওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত হারে বেতন দেওয়া হইবে—এম-এ, এম-এসসি, অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট—বেতন ১০০ ও ৩৫ ভাতা। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট—৭০ ও ৩৫। ইণ্টারমিডিয়েট—৬০ ও ২০। ম্যাট্রিক—৪৫ ও ১২৷৷০। নিকটস্থ এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জে ঐ চাকরীর জন্য আবেদন করিতে হইবে। ইহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষাব্রতী করিয়া গড়িয়া তোলাও প্রয়োজন।

শ্যামাপ্রসাদের নামে অধ্যাপকপদ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই স্বর্গত ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে এক অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করিবেন—অধ্যাপকের আলোচ্য বিষয় হইবে—"হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির জন্য উহার চেষ্টা।" ঐ পদের জন্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইতিমধ্যে ৭ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় সেচ-ব্যবস্থা—

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হুগলী জেলায় সেচ ব্যবস্থার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে জেলায় ৯টী খাল পুনরুদ্ধার ও তিন শতাধিক মাইল নূতন সেচ-খাল খনন করা হইবে। তাহাতে ৪২৭ বর্গ মাইল এলাকায়

জল-সেচ সম্ভব হইবে। পূর্বে আরামবাগে কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি তথায় ১০ মাইল নূতন খাল খনন ও কয়েকটি পুরাতন খাল উদ্ধারের দ্বারা ১৮ হাজার একর জমীতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কলিকাতায় উদ্বাস্তু-সমাগম বৃদ্ধি—

গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ৯ই ডিসেম্বর ৯ দিনে কলিকাতায় ৫ শতাধিক উদ্বাস্তু পরিবার ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলা হইতে আসিয়াছে। ক্রমেই উদ্বাস্তু সমাগম বাড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। ৩রা ৫৯ পরিবার, ৪ঠা ৩৯ পরিবার, ৫ই—৫০ পরিবার, ৬ই—৭১ পরিবার, ৭ই —৬৪ পরিবার, ৮ই—৫০ পরিবার ও ৯ই ৫৩ পরিবার আসিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গ কি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-হীন হইবে? প্রতীকারের উপায়ও স্থির করা আশু আবশ্যক।

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী—

মিঃ যোশিদার স্থলে মিঃ ইচিয়ো হাতেয়ামা জাপানের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। ডেমোক্রেটিক ও সমাজতন্ত্রী দল হাতেয়ামাকে সমর্থন করিয়াছে। তিনি গত মহাযুদ্ধের সময় জাপান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—

নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির নাম রবীন্দ্র-ভারতী। কলিকাতা ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনে তাহার কার্য্যালয় অবস্থিত। রবীন্দ্র ভারতীর গঠন হইতে খ্যাতনামা সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাহার সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি খ্যাতনামা কোবিদ, ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ রবীন্দ্র ভারতীর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার কর্মদক্ষতায় দেশবাসীর বিশ্বাস আছে।

কলিকাতায় গমের অভাব—

গত এক মাস যাবৎ কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে গমের অভাবে লোক অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। গত ৭ই ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ একখানি করিয়া স্পেশাল ট্রেণে এক হাজার টন গম বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আনা হইতেছে। ১৫ দিন ঐ ভাবে স্পেশাল ট্রেণে গম আসিবে। তাহা ছাড়া ৫টি ষ্টীমারেও ৫৫ হাজার টন বিদেশী গম কলিকাতায় আনা হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে কলিকাতায় আর গমের অভাব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইলেই জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইবে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিবৃতি—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম-পি গত ৮ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—"বিহারের বাঙ্গালী অধিবাসীবৃন্দকে সাহসের সহিত দৃঢ়ভাবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট রাজ্য পুনর্গঠন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী প্রদত্ত স্মারকলিপি সমর্থন করিয়া ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত অভিমত পেশ করিতে হইবে। বিহারের নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি বিভিন্ন অবাঞ্ছনীয় বিস্ময়কর বিবৃতি ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চরম অন্যায় কার্য্য করিতেছেন—সর্বত্র সেগুলি নিন্দিত হওয়াও দরকার।" পূর্বে ও বিষয়ে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই উভয় বিবৃতিই বাঙ্গালীর জীবনে আশার সঞ্চার করিবে।

চরণ বনাম নয়ন

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

সমস্যায় পড়েছি। যাকে বলে between the horns of a dilemma. একেবারে শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গোছের ব্যাপার।

খুলেই বলছি। 'সে বছর ফাঁকা পেনু কিছু টাকা।' অতএব মনও বাঁকা হয়ে ফোঁস্ করে উঠল,– সহর কলকাতা আর নয়, চলো দুদিন ঘুরে আসি কোথাও।

গেলাম পাটনা। সেখান থেকে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহ। একদা নৃপতি বিম্বিসার সেখানে ভগবান বুদ্ধের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, এ খবর ইতিহাসে পড়েছি। কিন্তু তীর্থদর্শনে আমার কপালে ফললো বিপরীত ফল ;—অর্থাৎ আমি দৃষ্টি হারালাম।

না, একেবারে অন্ধ হইনি। উষ্ণকুণ্ড হতে স্নান সেরে আসবার সময় দৃষ্টি-সহায় চশমা জোড়া হারালাম। দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলাম। হায়রে! এই তো সেদিন নগদ দুই কুড়ি টাকা ঢেলে এসেছি চশমার দোকানে। সে কার জন্যে? এরি মধ্যে সে আমাকে ছেড়ে গেলো? নাঃ, জগতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু আর রইলো না।

চশমাহীন হয়েই কলকাতা ফিরে এলাম।

ডাক্তার-বন্ধু উজ্জ্বল আলোতে ও গভীর অন্ধকারে নানা ভাবে চোখ পরীক্ষা করে বললেন ; শিগ্‌গির চশমা নাও। চক্ষুরত্নকে অবহেলা করো না।

অবহেলা কি আমিই করতে চাই? কিন্তু দুই কুড়ি টাকার ঠ্যালা সামলায় কে? ফাঁকা টাকা তো আসল টাকাশুদ্ধু ফাঁক করে দিয়ে সরে পড়েছে। তাহলে?

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল সমস্যা দেখা দিলো এরও পরে। চল্লিশোর্ধেও ধর্মে মতি না হওয়া দুর্মতির লক্ষণ। তাই বন্ধুর পরামর্শে গেলাম রামায়ণ পাঠ শুনতে। হায়রে কপাল! সীতাহরণের বদলে হয়ে গেলো জুতো হরণ। তাও এই অভাগার। দ্বিতীয়বার চোখে অন্ধকার দেখলাম। মন্দিরের সবগুলো আলো হুস্ হুস্ করে চোখের সামনে নিভে গেলো।

জুতাওলা-বন্ধু পরামর্শ দিলেন ; ক্রেপ্‌সোলের মোকাশিয়ান এলবার্টই একজোড়া নাও। সস্তায় করে দিচ্ছি। গোটা কুড়ি টাকা হলেই হবে।

আমি পকেটের কথা ভেবে আমতা আমতা করতেই তিনি বললেন : মা না, কলকাতার রাস্তা বিষের আড্ডা। কখন পায়ের ভিতর দিয়ে মরমে পশিবে গো—

আর বলবার দরকার করে না। চোখের সামনে কলকাতার রাজপথ জুড়ে হাজার রকমের বিষ ধেই ধেই করে নাচতে সুরু করে দিলো। মাথার ভিতরটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ী ফিরে বাক্স-প্যাটরা হাতড়ে বের করলাম গোটা পঞ্চাশ টাকা। একেবারে ব্যাঙের আধুলি বলতে পারেন। কিন্তু এ সম্বল নিয়ে আমি কোন্ পথে যাই। কাকে রাখি, আর কারে ছাড়ি? জুতো এলে চোখ অন্ধকার। চশমা এলে পা অচল। এ যে চরণে-নয়নে ওসমান-জগৎসিংয়ের পালা! এখন আমি কোন্ পথে যাই, বলুন তো? এ উভয় সংকটের আসান কিসে হবে?

ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে কোন মতে আপিস করি। টাকা পঞ্চাশটি পকেটে নিয়ে রোজই একবার করে চশমাওলা ও জুতোওলা বন্ধুদের সংগে দেখা করে আসি। শো-কেসের চশমাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বালা করে। ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের কাঁটা ফুটে পদতল মাঝে মাঝে রক্তাক্ত হয়। দোটানায় পড়ে সমস্যার সমাধান আর করতে পারি না।

তবু সমস্যা একদিন মিটে গেলো।

এক বন্ধুর বিলাতযাত্রা উপলক্ষে একটি চায়ের আসরে যোগদানের আমন্ত্রণ এলো। আমি তো প্রথম [illegible]

চোখে দৃষ্টি নেই। চরণে আবরণ নেই। এখন উপায়? ভদ্রতা যে অনাবরণ হয়ে যায়?

বুদ্ধি দিলেন স্ত্রী। (সাধে আর বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।) বললেন: তুমি তো আর দুরবীণ চোখে লাগিয়ে আকাশের তারা গুণবে না? যাচ্ছো চায়ের আসরে। চেহারাটাকে ভদ্ররূপ দিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভালো একজোড়া জুতো সেই ব্যবস্থাই করো।

তাই করলাম। ক্রেপসোলের মোকাশিয়ান এলবার্ট একজোড়া নিয়ে এলাম কিনে। চৌমাথার মোড় থেকে একটা ছোকরা 'সু-ব্ল্যাক'কে ধরে মোজ করে তাতে পালিশ চড়ালাম। ছোকরা হেসে বললো: নিন বাবুসাব, একেবারে শিসে মত্তোন করে দিলাম। পায় ভি দিবেন, মুখ ভি দেখবেন।

হেসে চলে এলাম।

চায়ের আসরে সব ফেলে চোখ জোড়া ঘুরতে লাগলো কেবলি মানুষের পায়ে পায়ে। হায়রে! সুন্দর মুখের চেয়ে সপাদুকা চরণযুগল যে মানুষের মনকে এতো করে টানতে পারে তা আগে কে জানত?

রাত্রে খুশি মনে বাড়ী ফিরলাম। ধুলো ঝেড়ে জুতো-জোড়াকে রেখে দিলাম সযত্নে।

অনেক রাতে চোখ দুটো জালা করে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। দুটো চোখেই যন্ত্রণা। ফুলেছেও অনেকটা। জল পড়ছে অবিশ্রাম।

সকালেই গেলাম ডাক্তার বন্ধুর কাছে। দেখেশুনে মুখ গম্ভীর করে বন্ধু বললেন: আগেই বলেছিলাম। তখন তো কান দিলে না আমার কথায়। ভোগান্তি আছে তোমার কপালে।

অজান্তেই পায়ের দিকে চোখ গেলো। চোখের জলে ঝাপ্সা দৃষ্টিতে দেখলাম, মোকাশিয়ান এলবার্টের রঙ্গণ চামড়া ভোরের আলোয় চক্ চক্ করছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া—১ম টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৬০১ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; মরিস ১৫৩, হার্ভে ১৬২, হোল ৫৭, লিণ্ডওয়াল নট আউট ৬৪। বেইলী ১৪০ রানে ৩ উইকেটে)

ইংলণ্ড ঃ ১৯০ (বেইলী ৮৮, কাউড্রি ৪০ ; লিণ্ডওয়াল ২৭ রানে ৩, জনসন ৪৬ রানে ৩ উইঃ) ও **২৫৭** (এডরিচ ৮৮, মে ৪৪ ; বিনড ৪৩ রানে ৩, লিণ্ডওয়াল ৫০ রানে ২, জনসন ৩৮ রানে ২ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪২তম টেষ্ট সিরিজের ১ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ১৫৪ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ব্রিসবেনে এ নিয়ে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৬টি টেষ্ট খেলা হ'ল ; উভয়েরই পক্ষে জয় ৩টি ক'রে। এখানে কোন খেলা ড্র যায়নি।

ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়েও অষ্ট্রেলিয়াকে প্রথমে ব্যাট করতে ছেড়ে দেয়। ইংলণ্ডের অধিনায়ক লেন হাটনের এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেট মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যে সুফল আশা ক'রে হাটন অষ্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা মরীচিকা প্রতিপন্ন হ'ল দু' 'ওভার' বল দেওয়ার পর। হাটন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, উইকেট তাঁকে কি ধাপ্পাই না দিয়েছে! অথচ কুইন্সল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে উইকেট অন্য রকম ছিল।

২৬শে নভেম্বর খেলা সুরু হয়। প্রথম দিনের খেলায় ২ উইকেট হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ২০৮। মরিস ও হার্ভে যথাক্রমে ৮২ এবং ৪১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া ৫০৩ রান ক'রে ৬ উইকেটে। মরিস ১৫৩ রান করেন ; ২টো 'ছয়' এবং ১৮টা 'চার'। তিনি খেলেছিলেন ৬ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট। মরিস এবং হার্ভের ৩য় উইকেটের জুটিতে ২০২ রান ওঠে, ২৪৯ মিনিটের খেলায়। হার্ভের ১৬২ রান করতে লেগেছিল ৬ ঘণ্টা ২০ মিঃ, তাঁর বাউণ্ডারী ছিল ১৭টা। হার্ভে সেঞ্চুরী করার আগে তিনবার আউট হওয়া থেকে বেঁচে যান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, টেষ্ট খেলায় এ নিয়ে হার্ভে ১২টা সেঞ্চুরী করলেন ; ইংলণ্ডের বিপক্ষে এ তাঁর ৩য় সেঞ্চুরী।

মরিসের টেষ্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ১১টা ; ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৮টা।

তৃতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ৬০১ রান ক'রে ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত বোলার লিণ্ডওয়াল ৬৪ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ১০৭। লিণ্ডওয়াল এবং মিলার খেলার গোড়ার দিকেই অল্প রানে উইকেট পান ; ২৫ রানে ইংলণ্ডের ৪টে উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস শেষ হয় ১৯০ রানে। বেইলী দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক ৮৮ রান করেন। এই খেলায় প্রথম দিনে আহত কম্পটন ২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ৪১১ রান পেছনে থেকে ইংলণ্ড ফলো-অন করে। ২য় ইনিংসের খেলার সূচনা পূর্ব্বের থেকে ভাল হ'ল। ২ উইকেট পড়ে ইংলণ্ডের রান হ'ল ১৩০। এডরিচ এবং মে যথাক্রমে ৬৮ এবং ৩৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার পঞ্চম দিনে ২৫৭ রানে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের

খেলা শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস এবং ১৫৪ রানে জয়ী হয়। আলোচ্য টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দলে কোন স্পিন বোলার গ্রহণ করা হয়নি। এ রকমের ঝুঁকি ইংলণ্ড একবার নিয়েছিলো ১৯৩২-৩৩ সালের সফরে মেলবোর্ণের ২য় টেষ্ট খেলায়। এ খেলার মত সে খেলাতেও ইংলণ্ড হেরেছিলো—তবে ইনিংস হার নয়, ১১১ রানে। টসে জয়ী হয়েও ইংলণ্ডের অধিনায়ক হাটন প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেননি—তাঁর এ কাজের প্রতিবাদে ইংলণ্ডের জনমহলে তুমুল ঝড় বহে গেছে। হাটনকে নানা ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে।

তুলনামূলক বিচারে অষ্ট্রেলিয়া দল ছিল ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী ভারসাম্য, ক্রিকেট খেলার তিনটি বিষয়েই—ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং। বোলারদের ভ্রূক্ষেপ না ক'রে খেলার দক্ষতা অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট ছিল। ফিল্ডিংয়ে অষ্ট্রেলিয়া অনেক উন্নত। তাদের অনেকে মাঠের যে কোন স্থানেই দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারেন। প্রত্যেক খেলোয়াড় দ্রুতবেগে নিখুঁত ভঙ্গিতে বল নিক্ষেপ করতে জানেন। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং সে তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের হয়েছে। তারা ১২টা 'ক্যাচ' ধরতে পারেনি। অবিশ্যি সবগুলিই সহজ ছিল না। ইংলণ্ডের ওপর ভাগ্যদেবী ও বিরূপ ছিলেন। তাদের নামজাদা উইকেট-কিপার ইভান্স অসুস্থতার জন্য দলভুক্ত হ'ননি। দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ ছিল না। ডেনিস কম্পটন প্রথম দিনের খেলায় ফিল্ডিং করার সময় আহত হ'য়েছিলেন; কম্পটন এ মরসুমে ভালই খেলেছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ড তাঁকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেনি; দলের সঙ্কট অবস্থায় তিনি আহত আঙ্গুল নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এ নিয়ে উপর্যুপরি ৬বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 'ওয়াটার পোলো' প্রতিযোগিতার ফাইনালে ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েসন ৯-১ গোলে হাটখোলা দলকে পরাজিত করে। হাটখোলার শচীন নাগ ৫টা গোল দিয়ে সব থেকে বেশী গোল করার কৃতিত্ব লাভ করেন। তাঁর পরেই বিজয়ী দলের দিলীপ মিত্রের ৪ গোল উল্লেখযোগ্য।

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন ঃ

টমাস কাপ—বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৯-০ খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত ক'রে এশিয়ান জোন ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে ভারতবর্ষ খেলবে হংকংয়ের সঙ্গে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল ঃ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় ২য় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৫-৯, ১৫-৬ ও ১৫-২ পয়েণ্টে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

বিশ্বমুষ্টি যুদ্ধ ঃ

'লাইট ওয়েট' বিভাগের বিশ্বখেতাবধারী আমেরিকার প্যাডি ডি' মার্কো ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে টেকনিক্যাল নক্-আউটে আমেরিকার জিমি কার্টারের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর বিশ্ব খেতাব হারিয়েছেন। বিশ্বখেতাব রক্ষার জন্য ডি' মার্কোর এই প্রথম লড়াই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কার্টার 'লাইট ওয়েট' বিভাগে বিশ্বখেতাব প্রথম পান ১৯৫১ সালে আইকি উইলিয়ামসকে হারিয়ে। ১৯৫২ সালে লারো সালাস্-এর কাছে হেরে গিয়ে তিনি বিশ্বখেতাব হাতছাড়া করেন, কিন্তু ঐ বছরেই তিনি তাহা পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে কার্টারকে হারিয়ে প্যাডি ডি'মার্কো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হ'ন। জিমি কার্টার ছাড়া এ পর্য্যন্ত অন্য কোন মুষ্টিযোদ্ধা দ্বিতীয়বার বিশ্বখেতাব পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি।

জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেট বল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের ফাইনালে মহীশূর ৩৫-২৪ পয়েন্টে সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি তৃতীয়বার উড কাপ জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে অপর কোন দল এ রেকর্ড করতে পারেনি।

মহিলা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা দল জয়ী হয়েছে, লীগের খেলায় অপরাজেয় অবস্থায়।

বেঙ্গল লন্ টেনিস ঃ

বেঙ্গল লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে নরেশকুমার ৬-২, ১-৬, ৬-০ গেমে খ্যাতনামা খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেছেন এবং সুমন্ত মিশ্রের সহযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস খেতাবও লাভ করেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে গজানন হেমাডী ১০-১৫, ১৫-১১, ১৫-১৩ পয়েণ্টে মনোজ গুহকে পরাজিত করেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে মনোজ গুহ এবং গজানন হেমাডী ১৫-৯, ১৫-৫ পয়েণ্টে গুরুপ্রসাদ এবং ওমপ্রকাশকে পরাজিত করেন।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল ঃ

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জিওলোজিক্যাল সার্ভে (কলিকাতা) ১-০ গোলে হায়দ্রাবাদ ফুটবল এসোসিয়েশনকে পরাজিত করে।

পাকিস্তানগামী ভারতীয় ক্রিকেটদল ঃ

আসন্ন পাকিস্তান ক্রিকেট সফরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ও ম্যানেজারের নাম—ভিনু মানকাদ (অধিনায়ক), পলি উমরীগড়, গোলাম আমেদ, জি রামচন্দ্র, পঙ্কজ রায়, এম কে মন্ত্রী, সি গাদকারী, সুভাষ গুপ্তে, এন তামহানে, পি পাঞ্জাবী, ডি জি ফাদকার, ভি এল মঞ্জরেকার, সি ডি গোপীনাথ, এইচ টি দানী, জস্থ প্যাটেল, প্রকাশ ভাণ্ডারী এবং সি জি বোর্দে। দলের ম্যানেজার লালা অমরনাথ এবং সহ-অধিনায়ক পলি উমরীগড়।

জাগরণ

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

আঁধার রাত্রির পারে নবারুণোদয়,
আলোর জোয়ার আনে—এলো কি সময় ?
তন্দ্রাহারা ছন্দহারা স্বপ্নময় রাতে,
কত বেদনাতে,
লুপ্ত হলো, কত মোর সুরের প্রলাপ,
স্পন্দহীন সঙ্গীতের বিফল আলাপ।
রক্তিম সন্ধ্যায়—
আমার এ হৃদয়ের প্রদীপ শিখায়
স্তিমিত সে মরমের আলো
বিফল আশায়, নিভে গেলো।
কল্পনার সাতরঙা পাল তোলা নাও,
হাল্কা মেঘের মত কোথায় উধাও !
স্তব্ধ মোর গান,
অতল আঁধারে—বিস্মৃতির পারে
হ'লো অবসান।
দুখের দেওয়ালী জেলে
বেদনায় হিয়াখানি মেলে
রাত্রির গুণ্ঠন ছায়ে নিঃশব্দ আঁধারে
কত গান ভেসে গেছে মোর আঁখিধারে।
অকস্মাৎ শিহরিত অস্থির আকাশে,
আলোর জোয়ার ভেসে আসে,
এলো কি পরমক্ষণ ?
তাই এতো আলো আলোড়ন ?
তন্দ্রাতুর মন্থর মুহূর্ত্তগুলি
ভ'রেওঠে ছন্দেছন্দে চেতনার সুর তুলি ?
স্পর্শে তার জাগে অনুভূতি
আজি মোর সত্বা মাঝে স্ফুরিত একি দ্যুতি ?
নূতন গানের ?
নূতন প্রাণের ?
কোথাকার স্বর্ণসূত্র টানে
অজানার পানে !
একি ভোর অমা-রজনীর ?
মোর তরী পেয়েছে কি আলোকের তীর ?

বাংলা গদ্য সাহিত্য ও রামরাম বসু

সলিলপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয় খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে, অর্থাৎ যখন থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু এই বাংলা গদ্য তখন চলিত ছিল বাঙালীর মুখে মুখে, তার কোনও লিখিত রূপ প্রচলিত ছিল না। তখন যা কিছু লেখা হতো সবই কাব্যের আকারে। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা হচ্ছে—"চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। এই পদগুলির রচয়িতা ছিলেন, সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুরু বা সিদ্ধাচার্যগণ। যথা :—

"বাজণাব পাড়ী পউআঁ খালে বাহিউ।
অদঅ বঙ্গাল দেস লুড়িউ॥
আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী॥"

এরপর ধীরে ধীরে দানপত্রে, দলিলে, দস্তাবেজে বাঙালীর মুখের গদ্য একটা লিখিত রূপ নিতে সুরু করে এবং বহু রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এসে অষ্টাদশ শতকে তা ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়ে এক নব রূপ লাভ করে। এই সময়েই শ্রীরামপুরের টমাস্, কেরী ও মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীরা বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় করতে এগিয়ে আসেন, যদিও এঁরা এসেছিলেন নিজেদেরই প্রয়োজনে—ধর্ম প্রচারের তাগিদে, তবু বাংলা নতুন গদ্য সৃষ্টির কাজে এঁদের অবদান কম নয়! বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে এই নামগুলি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

এই টমাস্, কেরী—এঁরা ছিলেন বিদেশী, বাংলা এঁদের মাতৃভাষা নয়, অথচ এঁরাই বাংলা নতুন গদ্য সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন! এই কথায় মনে একটা সন্দেহ আসবে যে, নিশ্চয়ই এঁরা অন্য কারও কাছ থেকে বাংলা শিখেছিলেন? হ্যাঁ, ঠিক তাই ঘটেছিল। টমাস ও উইলিয়ম কেরী, এঁদের দু'জনেরই একজন গুরুমশাই ছিলেন, তিনি হচ্ছেন—রামরাম বসু। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে বাংলা গদ্য প্রবর্ত্তিত হয়েছিল—তার একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা।

এই রামরাম বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্মস্থান ছিল চুঁচুড়া এবং তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ২৪পরগণার নিমতা গ্রামে। এর বেশী তাঁর বাল্যে ও কিশোর কালের কথা বিশেষ জানা যায় না। তাঁকে আমরা প্রথম দেখতে পাই, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী-দোভাষী মিঃ উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্সীরূপে। রামরাম বসু তখন ফার্সীতে পণ্ডিত হয়েছেন, ইংরেজীতে কথা বোলতে শিখছেন এবং বাংলা গদ্য রচনায় হাত পাকাচ্ছেন। চেম্বার্স বাইবেলের 'সেণ্ট ম্যাথু' অনুবাদ করতেন ফার্সীতে, আর রামরাম বসু তাকে আবার বাংলায় রূপান্তরিত করতেন।

এই সময়ে জন টমাস্ কলকাতায় আসেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার' এবং পরবর্ত্তীকালের পরিচালক চার্লস গ্রাণ্টের পরামর্শে জাহাজের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এদেশে খৃষ্টের মহিমা প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু এজন্য টমাসের প্রয়োজন হ'ল বাংলাভাষা শেখার, চার্লস গ্রাণ্ট তারও ব্যবস্থা করলেন, নিজের আত্মীয় উইলিয়ম চেম্বার্সের কাছ থেকে রামরাম বসুকে নিয়ে এলেন টমাসের কাছে, তার বাংলাভাষা শেখার জন্য।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ রামরাম বসু টমাসের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এরপর টমাস্ ও রামরাম বসু দু'জনেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সুরু করেন। টমাস্ এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাই প্রথমেই তিনি তাঁর গুরুমশাই রামরাম বসুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে নিজের হাতযশ পরীক্ষা করতে গেলেন. কিন্তু রামরাম বসু ছিলেন অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি টমাসের মনোগত ইচ্ছা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন তিনি খৃষ্টান হয়েই গেছেন শুধু দীক্ষাটুকু নিলেই হয়। এই সময়ে তিনি কয়েকটি 'খৃষ্ট-বন্দনা' রচনা করলেন। যেমন :—

"এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণ কর্ত্তা, সেই জন
জিজস্ৎও নাম তাঁহার॥"

টমাস্ ও মালদহের ইউরোপীয় সম্প্রদায় এই খৃষ্ট বন্দনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। টমাস্ ভাবলেন, রামরাম বসু আজ হোক, কাল হোক, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু তাঁর মনের সাধ মনেই রয়ে গেল, দীর্ঘ পাঁচ বছর টমাস্ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকেও রামরাম বসুকে ধর্মান্তরিত করতে পারলেন না। শেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যর্থ হয়ে টমাস্ দেশে ফিরে গেলেন। মাত্র এক বছর পরেই তিনি আবার বাংলাদেশে ফিরে এলেন, সঙ্গে উইলিয়ম কেরী।

চেম্বার্স রামরাম বসুকে দান করেছিলেন টমাসের হাতে, এবার টমাস্ তাঁর গুরুমশাইকে দান করলেন উইলিয়ম কেরীকে। মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে রামরাম বসু কেরীর মুন্সীও বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর রামরাম বসু কেরীর সঙ্গে আবার মালদহের মদনা-বাটিতে ফিরে এলেন। বাংলা শিখতে উইলিয়ম কেরীকে বিশেষ বেগ

পেতে হয়েছিল, কিন্তু অসাধারণ অধ্যাপনার গুণে কেরী অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন এবং এজন্য কেরী তাঁর শিক্ষকের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞও ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে রামরাম বসু স্থানীয় একটি বিধবার প্রতি আসক্ত হয়ে এমন একটি অপরাধ করে বসলেন, যে উইলিয়ম কেরী তাঁকে ক্ষমা করতে পারলেন না। মালদহ থেকে রামরাম বসু বিতাড়িত হলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, মদনা-বাটি থেকে কেরী একখানি পত্রে লিখছেন :—

"I have been forced, for the honour of the Gospel, to discharge the Moonshi (Ramram Boshu) who,—was guilty of a Crime which required this step, considering the profession he had made of the Gospel. The discouragement arising from this circumstances is not small, as he is certainly a man of the very best natural abilities that, I have everfouud among the natives and being well acquainted with phrasealogy of scripture, was peculiarly fitted to assist in the translation, but, I have now no hope of him."

এরপর চার বছরের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত, ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আবার দেখা যায়, রামরাম বসু অনুতপ্ত হয়ে শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়ম কেরীর কাছে ফিরে এসেছেন এবং পূর্ব্ব পদেই বহাল হয়েছেন। এই সময়েই রামরাম বসু, টমাস্ এবং কেরী—তিনজনের অনুবাদিত "ম্যাথুলিখিত সুসমাচার শ্রীরামপুর—মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই পুস্তকখানি-ই শ্রীরামপুর মিশনের সর্বপ্রথম বাংলা বই।

এরপর, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লী ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এদেশের শাসনপোযোগী শিক্ষার জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" স্থাপন করলেন, তখন তার বাংলা বিভাগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে রামরাম বসুও সহযোগী পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হলেন এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন,—উইলিয়ম কেরী। অধ্যক্ষ, পণ্ডিত সব-ই হ'ল, কিন্তু তাঁরা পড়াবেন কি? বাংলা বই কোথায়?

উইলিয়ম কেরী তখন নিজে বাংলা কথোপকথন সঙ্কলন করতে সুরু করলেন। সহযোগী পণ্ডিতদের ওপর বাংলা ইতিহাস ও সাহিত্য রচনার ভার দিলেন। এই সময়ে কেরী লিখেছেন :—

"I got Ram Boshu to compose a history of one of the Kings, the first prose book ever written in the Bengali Language........"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং গোলক শর্ম্মাও রামরাম বসুর সঙ্গে পাঠ্য-পুস্তক রচনার কাজ সুরু করেছিলেন, কিন্তু চরিত্র ভ্রষ্ট হলেও রামরাম বসু ছিলেন প্রতিভার পুরুষ, সকলকে পেছনে ফেলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হ'ল রামরাম বসু রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র।" বাংলা ভাষায় এইটি সর্বপ্রথম মৌলিক গদ্য পুস্তক। সামনে কোনও বাংলা গদ্যের আদর্শ ই ছিল না, সেই সময়ে রামরাম বসুই সংস্কৃত, হিন্দী এবং ফার্সী মিশিয়ে বাংলা গদ্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং সেই গদ্য-ই পরিমার্জ্জিত হয়ে পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে—একথা আজ চিন্তা ক'রলে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের এতটুকু সম্পর্ক আছে, তাঁরা সকলেই মনে মনে রামরাম বসুর জন্য গর্ব্ব অনুভব না করে পারবেন না। "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" এর ভাষার একটু নমুনা দেওয়া গেল—

"রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি একচ্ছত্রী রাজা হইব, এদেশের মধ্যে কিন্তু মুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল।"

এই "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" রচনা করবার কৃতিত্বের জন্য কলেজ কাউন্সিল রামরাম বসুকে তিনশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" রচিত হবার একবছর পরেই ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "লিপিমালা" প্রকাশিত হয়। এই এক বছরের মধ্যেই রামরাম বসুর বাংলা গদ্য সে কত উন্নতিলাভ করেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে "লিপিমালা"র প্রতি ছত্রে ছত্রে।

"ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই রামরাম বসুর জীবনের বাকী দিনগুলো কেটে গিয়েছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট রামরাম বসুর ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামরাম বসুর জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই সে যুগের মিশনরীদের পত্র-পত্রিকা মারফৎ জানতে পারা যায়। কিন্তু মিশনারীরা, রামরাম বসু খৃষ্ট ধর্মগ্রহণ না করায়, তাঁর ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। সম্ভবতঃ সেই-জন্যই তাঁদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় রামরাম বসুর নৈতিক-চরিত্রের দোষ ত্রুটিগুলি বড় করে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষ হিসাবে রামরাম বসু ছিলেন,—একেবারে সংস্কার মুক্ত, নীতি ধর্মের কোনও বাধাই তিনি মানতেন না। জাল-জুয়াচুরী থেকে সুরু করে ভ্রূণ-হত্যা পর্যন্ত কিছুই তিনি বাকী রাখেননি।

সেই যুগের সেই পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে, নৈতিক-চরিত্রের দোষ ত্রুটিগুলিকে বড় করে না দেখে, রামরাম বসুর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার কথা আমাদের মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। রামরাম বসু সম্বন্ধে শেষ কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর নাম চিরদিন বাঙালীর মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মধুস্মৃতি ঃ নগেন্দ্রনাথ সোম ঃ

বহুদিন প্রতীক্ষার পর প্রবাস হইতে স্বজনের প্রত্যাগমনে পরিবারে যেমন আনন্দ অনুভূত হয়, ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল পরে কবিবর মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য-কীর্ত্তি সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ সোমের সুবৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পুনঃ-প্রকাশে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে যে তেমনই আনন্দ অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের "স্মৃতি" প্রকাশকালে নগেন্দ্রনাথ যে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক জনসনের চরিতকার বসওয়েলের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বসওয়েলের আদর্শ গ্রহণ করিলেও বসওয়েলের আদর্শের অল্প অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, বসওয়েল জনসনের সান্নিধ্যে আসিয়া প্রশংসায় আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেইজন্য মেকলে বসওয়েলকে উপবৃক্ষ বা পরগাছার সহিত তুলিত করিয়াছিলেন—"His mind resembled those creepers which the botanists call parasites, and which can subsist only by clinging round the stems and imbibing the juices of stronger plants. He must have fastened himself on somebody."

নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি মধুসূদনের ভক্ত ছিলেন (কে তাঁহার ভক্ত নহেন?); কিন্তু তিনি মধুসূদনের প্রতিভা বা রচনা হইতে সাহিত্যিক প্রেরণা বা রস গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হ'ন নাই। তিনি মধুসূদনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোথাও যেমন কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা ছিল না, তেমনই বাহুল্য বা অতিরঞ্জনও ছিল না।

মধুসূদনের মৃত্যুর পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর নীলামে মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বুড়শালিখের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতা?—রচনার গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া রাজকিশোর দে যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহারই "গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত সহিত নূতন সংস্করণে" প্রকাশিত প্রসন্নকুমার ঘোষের লিখিত মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্ত বহুদিন পাঠকদিগের একমাত্র উপজীব্য ছিল। সে বৃত্তান্ত—প্রথম প্রয়াস হিসাবে যত মূল্যবানই কেন হউক না, অসম্পূর্ণ। তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দীর্ঘকাল পরে যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সাহিত্য-সংসারে খ্যাতি লাভ করেন এবং মধুসূদন সম্বন্ধে পাঠক-সমাজের সংবাদ-লাভ লালসা বহুলাংশে পরিতৃপ্ত করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমি যখন দেওঘরে গমন করি, যোগীন্দ্রনাথ তখন তথায় স্কুলে প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি মধুসূদনের পরম বন্ধু ও তাঁহার রচনার প্রথম সমালোচক বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া মধুসূদনের জীবনী-রচনার আয়োজন করেন। যোগীন্দ্রনাথ ঐ সময় রাজনারায়ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথের সহিত একযোগে ফাদার দামিয়েনের জীবনী রচনা করেন। 'বঙ্গবাসীকে' ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত তাঁহার (ধূর্জ্জটী শর্ম্মা ছদ্মনামে লিখিত) "একাদশ অবতারে" তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল। রাজনারায়ণ বাবুর সক্রিয় সাহায্য ও বলিষ্ঠ প্রেরণা ব্যতীত যোগীন্দ্র বাবুর পক্ষে তাঁহার উপাদেয় পুস্তক রচনা ও প্রকাশ সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। তিনি তখন মফঃস্বলে স্কুলে সামান্য বেতনের শিক্ষক—বৃহৎ পরিবারের পালনভারে কতকটা বিব্রত। মফঃস্বল হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বিরলপ্রাপ্য উপকরণ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর ছিল। গ্রন্থ প্রকাশের

ব্যয়ও অল্প ছিল না। সেইজন্য জনসন তাঁহার অভিধানের উৎসর্গপ্রার্থী লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহার সম্বন্ধে কার্লাইলের মন্তব্য—তাহা "the far-famed blast of doom proclaiming * * * that patronage should be no more"—সেরূপ কথা তিনি বলিতে পারেন নাই।

যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থে তিনি মধুসূদনের অসাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনাসমূহের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণে ও রচনার সমালোচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া মনে হইত—

"Thy great design shall stand and day
Flood its blind front from Orients
far away."

নগেন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথের পরবর্তী। "মধুস্মৃতি" পাঠ করিয়া মনে হয়—যাহা কিছু জানিবার ছিল, জানিলাম, তৃপ্তিলাভ করিলাম। তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য, পরিশ্রম, নৈপুণ্য ও নিষ্ঠাসহকারে মধুসূদন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া বিরাট পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতে মধুসূদন সম্বন্ধে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক আর রচিত হয় নাই। আমরা বলি, আর রচিত হইবে না।

নগেন্দ্রনাথ যখন এই পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন তখন তাহার একটি সুযোগ ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আগ্রহে প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় উদ্যোগী হইয়া একখানি "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা" প্রকাশের আয়োজন করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র তিনি সে বিষয় সাহিত্যিকদিগকে জানাইয়া দেন এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশ আরম্ভ হয়। পরিচালকদিগের আগ্রহে ও উৎসাহে নগেন্দ্রবাবুর পুস্তক 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত চিত্রগুলি "গ্রন্থের শ্রী ও সৌন্দর্য্য" বর্দ্ধিত করে। নগেন্দ্রবাবুর রচনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ আরম্ভ হইলে তাহা বাঙ্গালী পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং বহু লোক তাঁহাদিগের নিকট রচিত মধুসূদনের জীবনীর বহু উপকরণ সদ্ব্যবহারার্থ প্রেরণ করেন। সেই কারণে গ্রন্থের সম্পদ পূর্ণ হয়। যাঁহারা এই গ্রন্থ রচনায় নগেন্দ্রবাবুকে কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলেরই নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর "মধুস্মৃতি" ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন—"তখন 'মধুস্মৃতি' পাঠ করিয়া অনেকেই ইহাকে গ্রন্থাকারে দেখিতে অভিলাষী হইয়া আমাকে 'মধুস্মৃতি' মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন।" তদনুসারে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "'ভারতবর্ষে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আরও বহু পরিমাণে নূতন নূতন উপকরণ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ" হইয়া গ্রন্থের পুষ্টি সাধন করে।

তাহার পরে নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয় এবং গ্রন্থও আর বিক্রয়ার্থ পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘ দিন পরে যে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নগেন্দ্রবাবু কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন, তিনিই সন্ধান করিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। এই দীর্ঘকালে মধুসূদন সম্বন্ধে আরও যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, সে সকল এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করায় গ্রন্থখানি আবার মধুসূদন সম্বন্ধে "last word" হইয়া রহিল।

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার গুপ্তের গবেষণাফলও এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মধুসূদনের পৌত্র মিষ্টার ডাটন কবির সমাধিস্থানটির অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া তাহা মনোরম করিয়াছেন। তাহার চিত্র এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশিত মধুসূদনের প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমরা গ্রন্থখানির যে প্রশংসা করিলাম, তাহার সঙ্গে একটি ত্রুটির উল্লেখ, অনিচ্ছায়ও করিতে হইতেছে। ইহাতে বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ সোমের একখানি প্রতিকৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

[মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম : পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১০৲ টাকা।]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গৃহ প্রবেশ (নাটক) ঃ কানাই বসু ঃ

এই নাটক বহুদিন পূর্বে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই ইহা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে এবং বহু সৌখীন সম্প্রদায়ে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত অংশগুলি অবলম্বনে ইহার অভিনয় হইয়াছে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সংসারের এক দিনের প্রভাত হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ইহার ঘটনাকাল। চরিত্র সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই জীবন্ত, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে বিশিষ্ট। ঘটনাগুলির মধ্যে কষ্ট-কল্পনা নাই, ঘরে ঘরেই যে রকম ঘটনা ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতে পারে, তাহাই লইয়া গ্রন্থকার অপূর্ব কৌশলে এমন মনোহর নাট্যবস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নাটকটি প্রধানতঃ হাস্যরস পরিবেশন করিলেও, ইহা প্রহসন বা Farce নহে। ইহা কমেডি; ইহার হাস্য নির্মল নির্দোষ—নিছক আনন্দের হাস্য। কিন্তু এই হাস্যের মধ্যে লেখক এমন সুসঙ্গত অথচ অপ্রত্যাশিত ভাবে করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন যে, পাঠক হাসিমুখে দুই বিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া অপরূপ আনন্দে অভিভূত হন। ইহার সিচুয়েশন ও চরিত্র বিকাশ প্রশংসনীয় এবং সংলাপ অত্যন্ত নাট্যোচিত ও রসসমৃদ্ধ।

গৃহপ্রবেশ লেখকের সার্থক নাট্যসৃষ্টি। সেই সার্থকতাই সম্প্রতি প্রদর্শিত এই কাহিনী অবলম্বনে প্রস্তুত "গৃহপ্রবেশ" সবাক চিত্রকে সফল করিয়াছে। নাটকখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার সুরুচি ও শুচিতা। আদ্যোপান্ত কোথাও কোন মলিনতা বা অপরিচ্ছন্নতা নাই। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলির পক্ষে নাটকখানি অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এই জন্য যে, দুইটিমাত্র স্ত্রী-চরিত্র থাকায় এবং সমগ্র ঘটনা একটি মাত্র কক্ষেই নিবদ্ধ রাখায়, যথেষ্ট সুবিধা আছে।

[প্রকাশক ঃ বই জয়ন্তী ৯৩।২, সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা—১৪
প্রাপ্তিস্থান ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ঃ ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২৲ টাকা]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত ঃ

শ্রীআশালতা সিংহ

বর্তমানযুগে একদিকে যেমন দুর্নীতির অবাধ প্রসার দেখা যায়, তেমনই অন্যদিকে এক এক দল লোক মানুষকে ধর্মপথে চালিত করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও চোখে পড়ে। বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী নামকীর্তন যাত্রা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনের দ্বারা মানুষকে ধর্মপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা [illegible] রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে অবস্থিত জনসেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার পরিচালিত যক্ষ্মা হাসপাতাল তাহার অন্যতম উদাহরণ। শ্রীআশালতা সিংহ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা—তাঁহার লেখার প্রশংসার প্রয়োজন নাই—তিনি কথা-সাহিত্যিক, এই জীবনচরিত ও কথা-সাহিত্যের মতই সহজ-পাঠ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও বহু বৎসর সাংবাদিকতা করিতেছেন, বইখানি তাঁহার দ্বারা সু-সম্পাদিতই হইয়াছে। এই ধরণের বহু সাধু-জীবন প্রকাশিত হইতেছে—সেগুলি পাঠের দ্বারা পাঠকের মন ধর্মাভিমুখী হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সেজন্যই সৎকথা আলোচনার প্রয়োজন। এই জীবনচরিতখানিও সেদিক দিয়া শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে না, পাঠকের মনে ভাবান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। চমৎকার কাগজে ছাপা ১৬ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র সম্বলিত সুবৃহৎ পুস্তক।

[যুগান্তরপত্রের বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সম্পাদিত ও দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডারের শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন ৬৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, হইতে শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—৪॥০ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলরোল ঃ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ঃ

কলরোল একটি কবিতার বই। অনিলবাবু সুলেখক এবং সুকবিও বটে। তাঁর কবিতা এবং গল্প 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। পাঠক সমাজে তিনি সুপরিচিত। এই বইখানির মধ্যে তাঁর যে কবিতাগুলি স্থানলাভ করেছে, সেগুলি যদিও আধুনিক কবিতা কিন্তু উগ্র আধুনিক নয়। রস-সমৃদ্ধ এবং সুলিখিত। বইখানি সম্বন্ধে সুখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: শুধু নিজের মনের নির্জনতার নয়, জনারণ্যে নিজেকে মিশিয়েও যে কাব্যের সাধনা অব্যাহত ও

রাখা যায় 'কল্লোল' তারই প্রমাণ। আধুনিক যুগের যে কলরোল অনেককে উদ্‌ভ্রান্ত করে শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য তার ভেতর থেকেই মহৎ সংগীতের উপাদান খুঁজে যে বার করেছেন, সেইখানেই তার কৃতিত্ব। তিনি আধুনিক কিন্তু নিজের অস্পষ্টতার দম্ভে উন্নাসিক নন। আমরাও প্রেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে একমত।

[প্রকাশক: সোয়ান বুকস্। কলিকাতা—১২ দাম—১৷৹ আনা।]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

গান হোল শেষ: অমলেন্দু মিত্র:

ভাগ্যহত জীবনে কৈশোর ও যৌবনের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী উপন্যাস-খানির উপজীব্য। কখনও সে প্রেম প্রণয়িনীর ঔদাসিন্য বা কপটতায় মর্মদাহী—আবার কখনও বা একনিষ্ঠ স্বীকৃতি ও আত্মোৎসর্জনের দ্বারা উজ্জ্বল—কিন্তু ঘটনাচক্রে সর্বক্ষেত্রেই মিলনের প্রতিবন্ধকতায় মলিন ও করুণ। বিষয়বস্তু হাল্কা হইলেও লেখকের ভাষা স্বতস্ফূর্ত। উচ্ছ্বাসের আবেগ আর একটু কম হইলেই ভাল হইত।

[প্রকাশক: কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ, ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২৷৹ আনা]

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বনফুল প্রণীত উপন্যাস "পিতামহ"—৬৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পথের সাথী" (২য় সং)—৩৲
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নিরুপমা দেবীর কাহিনীর নাট্যরূপ "শ্যামলী" (২য় সং)—১৷৹
নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী" (২২শ সং)—২৷৹
শশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বন্ধু-বিপর্যয়ে মোহন"—২৲, "দস্যু মোহনের দুর্গোৎসব"—২৲
কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রণীত "প্রভাত-চিন্তা" (১৮শ সং)—২৷৹
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "বঙ্গনারী" (৮ম সং)—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বামুনের মেয়ে" (৯ম সং)—২৲, "শেষের পরিচয়" (১০ম সং)—৪৷৹
শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "চিত্ত ও বিত্ত"—২৲
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জীবন-মৃত্যু"—৷৹, "পরপারের পথিক"—৷৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "শিখার আবিষ্কার"—৸৹
শ্রীরেজাউল করীম প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ"—১৸৹
প্রভাত দেবসরকার প্রণীত উপন্যাস "অকুলকন্যা"—২৸৶৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

গুহক-মিলন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

হিন্দু-বিবাহ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এল-এল-এম্

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে অনেকের মতে হিন্দু-বিবাহের ভবিষ্যৎ সেগুলির অন্যতম। তাঁহাদের মতে হিন্দু-বিবাহ ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটী আছে, কারণ (১) বিবাহ-বিচ্ছেদের ইহাতে ব্যবস্থা নাই এবং (২) ইহা বর ও কন্যার পছন্দ ও ইচ্ছার অনুগামী নয়। সেইজন্য এই প্রগতিশীলদলের প্রচেষ্টায় আজ হিন্দু-বিবাহ ও বিচ্ছেদ বিল ভারতবর্ষের লোকসভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। শীঘ্র ইহা আইনে পরিণত হইয়া কার্য্যকরী হইবে আশা করা যায়। কিন্তু সত্যই কি এই আইনের ভারতের অগণিত নরনারীর একান্ত প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয় কারণ মানুষের দূরদৃষ্টি সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি দিয়া যাহা দেখে তাহা অনেক সময় ভুল হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যাহা হউক হিন্দু-বিবাহ-বিধি উপরোক্ত দোষদুষ্ট কিনা তাহা আলোচনা করা উচিত।

হিন্দুর বিবাহ আইন বলিয়া একটী বিধি নাই। ঋক্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সময় পর্য্যন্ত—এই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া—শ্রুতি, স্মৃতি, নিবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কত মহা-মানবের মেধা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি এই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়াছে তাহার ইতিহাস দুর্ভাগ্য ভারতবাসী আজও জানে না। সে ইতিহাস আজও অলিখিত। আজ হিন্দু-বিবাহ বলিতে আমরা বুঝি ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে হিন্দু-বিবাহের যে ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে তাহাই। কিন্তু আজ যদি বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইত, আজ যদি হিন্দু আইনের ক্রম-বিকাশের কথা আমরা সম্যক জানিতাম তাহা হইলে দেখিতাম যে বহু পূর্ব্বকালেও হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আজ অনেকেই পড়িয়াছেন। কৌটিল্য পরিষ্কার ভাষায়

বলিয়াছেন—"পরস্পর্‌ দ্বেষান্মোক্ষঃ"। তিনি দুইজনের ইচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন ইহা আজ অনেক পণ্ডিতই জানেন। ভারতীয় এই স্মৃতিশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায় যে পুরুষত্বহীন পুত্রোৎপাদনে অক্ষম স্বামীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু-শাস্ত্র সম্মত। সেইজন্য এই সেদিনও একটী মামলায় এরূপ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

যদি তাই হয় তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুর আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সেগুলি এমন সব কারণে হইত যাহা একান্ত অপরিহার্য্য। সেইজন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ সচরাচর হইতে পারিত না এবং সচরাচর হইত না বলিয়াই ইহা সাধারণের নিকট অস্বাভাবিক ঠেকিত। ইহার ফলে সমাজে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের কুফলগুলি প্রবেশ করিতে পারে নাই। একান্ত অপরিহার্য্য কারণে নরনারীর বিবাহিত জীবন যখন দুঃসহ ও দুর্ব্বহ হইত তখনই কেবল এই ব্যবস্থার আশ্রয় লওয়া হইত। সমাজের সকলেই জানিত যে মানব-জীবনে যেমন অনেক অনভিপ্রেত ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে, বিবাহ-বিচ্ছেদও সেইরূপ একটী ব্যবস্থা। উচ্চ বর্ণের মধ্যে ধর্ম্ম বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই বিবাহ হিন্দুর আদর্শ বিবাহ। ইহা ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নরনারীর আজীবন মিলন। ইহার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান এবং সেইজন্য এই বিবাহকারীরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারিত না। সেইজন্য কৌটিল্য বলিয়াছেন "অমোক্ষো ধর্ম্ম বিবাহানাম্‌"। দেখা যাইতেছে হিন্দু-বিবাহ বিধিতে বিচ্ছিদের স্থান ঠিকমত করা রহিয়াছে। তথাপি আজ যদি স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ ও আইনসভা নূতন আইন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চান তাহা হইলে ইহাকে কেবল অপ্রয়োজনীয় বলিলে চলিবে না—পরন্তু ইহাকে অপকারী প্রচেষ্টা বলিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় কেননা ইহা ইতোপূর্ব্বে হিন্দু-বিবাহ ব্যবস্থায় স্থান পাইয়াছে। নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিলে আমাদের স্বকীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের হাস্যকর অজ্ঞতার পরিচয় হইবে মাত্র। স্বাধীন ভারতের প্রাড্‌বিবাকগণ যদি সর্ব্বদাই ইংরাজ জজদের পদচিহ্ন অনুসরণের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া নিজেদের শাস্ত্রগুলির যথাযথ অভ্যাস ও আলোচনা করেন তাহা হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবস্থা বিশেষে অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন উপরোক্ত মামলায় কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে। তবে যদি সমাজের অত্যাধুনিক নরনারীদের মত জ্ঞানবৃদ্ধ নেতৃবৃন্দও মনে করেন যে কোনও কারণে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে অপছন্দ করিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া দরকার তাহা হইলে অবশ্যই নূতন আইনের প্রয়োজন।

এইখানে হিন্দু বিবাহের মূলসূত্র কি তাহা বলা দরকার। বিবাহ অন্যান্য জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ চুক্তিগত ব্যাপার! চুক্তি অবস্থাবিশেষে ভঙ্গ করা যায়। সেইরূপ ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে বিবাহও ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ প্রাধানতঃ ধর্ম্মমূলক অর্থাৎ ইহা পার্থিব চুক্তি নয়—ইহা ধর্ম্ম কার্য্য। সেইজন্য ইহাতে বিচ্ছেদের প্রশ্ন নাই। মানুষ ধর্ম্মকার্য্য করে ভগবানের সহিত মিলনের জন্য। হিন্দু-বিবাহের আদর্শ সেইরূপ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ও স্ত্রী স্বামীর মধ্যে পরমা প্রকৃতি ও পরম পুরুষের সন্ধান পাইতে চাহিত বলিয়া সে বিবাহ অচ্ছেদ্য ছিল। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দু-বিবাহের সেই উজ্জ্বল আদর্শের প্রতীক। এইরূপ মিলন কামনা বাসনাকে সংযত করিয়া দম্পতীকে পরম কার্য্য মোক্ষলাভে সহায়তা করিত। ইহা হিন্দুর বিশ্ববাসীর নিকট মৌলিক দান—ব্যবহার শাস্ত্রের সহিত দর্শনের অপূর্ব্ব সমন্বয়। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিলে অজ্ঞতার পরিচয় হইবে যে হিন্দু বিবাহে নরনারীর ইচ্ছার বা আকর্ষণের কোন স্থান নাই। গান্ধর্ব্ব বিবাহ মনু হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক স্মৃতিতেই স্থান পাইয়াছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে স্ত্রী পুরুষের মিলন সম্পূর্ণরূপে বর বধূর ইচ্ছা ও মনোনয়নের উপর নির্ভর করিত। কালক্রমে যখন এই সকল বিবাহের কুফলগুলি প্রকট হইতে লাগিল তখন অনেকেই এই সব বিবাহগুলিকে স্বীকার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু এই সব বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি আমরা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণকে পুরোভাগে স্থান দিই তাহা হইলে কিরূপে আমরা বলিব যে হিন্দুর বিবাহে ভালবাসা, প্রেম বা মনোনয়নের স্থান ছিল না? সেইজন্য আজ আমাদের হিন্দু আইনের যথাযথ চর্চ্চার অধিক প্রয়োজন নূতন আইনের কোন প্রয়োজন নাই। হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রে

যে উদার মনোভাব আছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোন বিধিবদ্ধ আইনে নাই ; কারণ হিন্দুর আইন একজনের তৈরী নয়, ইহা যুগ যুগ ধরিয়া মনীষীদের সৃষ্টি। পরাধীনতার অভিশাপে, কূপথণ্ডকতার অন্ধকারে, ও গোঁড়ামির চাপে হয়ত সেই উদার আইনের অপপ্রয়োগ ও অন্যায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আজ ত আর সেদিন নাই। যে আইনে পাশাপাশি আট রকম বিবাহ অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, যে বিবাহের আদর্শ উমাশঙ্কর হইলেও রাজা দুষ্মন্তের ন্যায় বহু যুবক শকুন্তলার ন্যায় ঋষিকন্যাকে ভালবাসিয়া পত্নীরূপে পাইয়াছিল সেই বিবাহ নূতন আইনের প্রবর্ত্তন সুস্থদেহে অস্ত্রোপচারের ন্যায় অশুভ। প্রাচীন ভারতের আইনকারীরা দূরদ্রষ্টা ছিলেন। সেইজন্য ঐরূপ বিবাহের প্রশ্রয় দেন নাই কারণ ঐ সকল বিবাহে শকুন্তলা যে উপেক্ষা কবি কালিদাসের লেখনীমুখে লাভ করিয়াছিলেন তাহা সত্যসত্যই অনেক রমণীর ভাগ্যে ঘটিত অথবা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত। সেইজন্য তাঁহারা বহু রক্ষাকবচ দ্বারা ঐরূপ বিবাহগুলিকে আবৃত রাখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মে বিধবা-বিবাহও অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। নারদ, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ণ, পরাশর, দেবল প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র প্রযোজকগণ বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতে ও অগ্নিপুরাণেও বিধবা-বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে বিধবা-বিবাহ সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে এবং নিঃসন্তান বিধবাই বিবাহ করিতে পারিতেন। পরে ইহাও লুপ্ত হয়। মহামানব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু ভালভাবে আজও তাহা চলে নাই। ইহার একটী প্রধান কারণ বিদ্যাসাগর কেবল আইনের সাহায্য লইয়া বিধবা-বিবাহ চালাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু আইনের ইতিহাস লোক সমাজে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান নাই, কেবল নূতন আইনের সাহায্যে এই বিধবা-বিবাহ চালাইতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আজও এদেশে সাধারণ মানুষ ইহাকে নিজের বলিয়া লইতে পারে নাই।

আজ স্বাধীন ভারতে আবার সেই চেষ্টাই চলিতেছে। আইন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রবর্তনের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা আজ বলা শক্ত। যদিও ইহা চলে ইহার পরিণাম কতদূর শুভ হইবে তাহা নিরূপণ করা আরও শক্ত। ইহার অবশ্যম্ভাবী কয়েকটি মাত্র শুভ ফলের প্রতি এখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে :—

(১) প্রথমতঃ আইন হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি যথেচ্ছভাবে চালু হয় তাহা দ্বারা সন্তানগণের অবস্থা কতদূর দুর্দ্দশাময় হইবে তাহা ভাবা উচিত। দৈহিক ভোগের আশায় বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অধিকাংশ নরনারী পুনরায় বিবাহ করিবে তখন পূর্ব্ব বিবাহের সন্তানগণের দুঃখের সীমা থাকিবে না। বিবাহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টি—অর্থাৎ সন্তানলাভ ও সন্তান-পালন। জাতি যদি বড় হইতে চায় তাহা হইলে শিশুদের রক্ষা যথোচিতভাবে করিতে হইবে। সন্তানবতী রমণী যদি সহজেই বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারিণী হন তাহা হইলে তাঁহার পুনর্বিবাহের পর পূর্ব সন্তানের সুশিক্ষা ও যথোচিত লালন পালন আশা করা বৃথা।

(২) দ্বিতীয়তঃ আজ যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন হয় তাহা হইলে বহু পুরুষ এই আইনের সুযোগ লইয়া অযথা স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। ইহা দ্বারা বহু ক্ষেত্রে বহু ভোগবিলাসী পুরুষেরই ভোগের পথ উন্মুক্ত হইবে মাত্র। নারীর সুবিধা করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অসুবিধা অধিক ঘটিবে কারণ বিচ্ছেদের পর নারীর বিবাহ এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজসাধ্য হইবে না।

(৩) বহু পুরুষের সংশ্রব সতীত্বের বিরোধী। এ দেশের নরনারী এক স্বামীর সহিত মিলনই বিবাহের আদর্শ বলিয়া জানে। সেই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে সতীত্বের বালাই আর থাকিবে না।

(৪) বিবাহের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া ইহা একটী সাময়িক উত্তেজনার জিনিষ হইবে।

(৫) বহু সমস্যাক্ষুব্ধ দরিদ্র হিন্দুসমাজে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে। সে সমস্যার যথাযথরূপ বর্ণনা করা এখন সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি কার্য্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিবে।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ না হইলে কি অসুবিধা হইতে পারে? যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন যেমন স্বামীর পুত্রোৎপাদনে অসামর্থ্য অথবা স্বামী স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধি—সে সব ক্ষেত্রে স্বামীর

ভারতের প্রাড্‌বিবাক্‌ হিন্দুর শাস্ত্ররাশি মন্থন করিয়া ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করিতে পারে যে এই সব ক্ষেত্রে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন লাভ করিয়াছিল এবং এখন আবার সেইরূপই হইবে। প্রতিকার দিবে বিচারালয়; সেই বিচারক যদি অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা পুনর্গ্রহণ করেন তাহা হইলে একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই প্রতিকার লাভ হয় অথচ ইহার অপকারগুলি সমাজদেহকে দীর্ণ করিবার সুযোগ পায় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত ভারতে একটী আইন করা সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়।

সেইজন্য আজ সর্ব্বাগ্রে দরকার হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের সম্যক পর্য্যালোচনা। ভারত সরকার যদি সেই চেষ্টা করেন তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের উপযোগী কার্য্য হয়। সুখের বিষয় আজ ভারতের রাষ্ট্রচালকগণ সংস্কৃত চর্চ্চার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত ও কলা চর্চ্চার যথেষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু ভারতের ব্যবহার শাস্ত্র সম্যক পর্য্যালোচনার উৎসাহ কেহ এখনও দেন নাই। বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেবল একজন দেশপ্রেমিক নন; তিনি একজন হিন্দুর গৌরব, হিন্দু কৃষ্টির আদর্শ ও আইনজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ একজন বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিক। ভারতের প্রধান মন্ত্রী একজন বরেণ্য লেখক, চিন্তানায়ক ও ইতিহাসজ্ঞ জ্ঞানী। ইহা কি অতীব পরিতাপের বিষয় হইবে না যদি এই সব মনীষীর সান্নিধ্য সত্ত্বেও নূতন আইন করিয়া হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবর্ত্তন করিতে হয়, যদিও হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি নজির বিদ্যমান?

কবিতার জন্ম

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আমার কবিতা তোমারে ঘিরিয়া নাচে,
সাম্‌নে চলার বাড়ে দুরন্ত গতি।
তোমার নয়নে কি আলো লুকানো আছে—
জাগালে যে মোর ছন্দ-সরস্বতী।
অধরের কোণে চির-চেনা স্মিত হাস,
কণ্ঠটি আছে স্নেহে ও সোহাগে সাধা।
যত দেখি তত বেড়ে উঠে উল্লাস—
লাগেনি কি গায় পৃথিবীর ধূলা-কাদা?

তোমারে নেহারি ছন্দ আমার মেলে,
যুগ যুগ ছিনু তোমারি প্রতীক্ষায়।
আঁধার-কারায় শত মণি দীপ জেলে
আজ এলে তুমি, এলে মোর আঙিনায়!
এলো সুর চারু চরণের মঞ্জীরে,
কবির কবিতা জন্ম লভিল ধীরে।

কবি

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস এম-এ

কবি আনে কথাফুল, সুরকার সুর।
নর্ত্তকীর পায়ে বাজে চঞ্চল নূপুর।
ধারাজলে সকরুণ শ্রাবণ বেদনা।
কুমারীর কালো চোখে সচকিত চেনা।

সব কিছু তুলে' বয় সনসনে হাওয়া।
পাওয়া শেষ হোলো তবু শেষ হীন চাওয়া।
পাওয়া সুর গাওয়া গান এই নিয়ে' চলি।
পথে পথে কাঁটা ফুল কানে কানে বলি,

পেয়েছো কি সব কিছু, নিয়েছো কি চিনে?
ঝাউ গাছে মর্ম্মর আজকের দিনে।
তবু কবি মালা গাঁথে নিদাঘের তাপে
নর্ত্তকীর কালো চোখে আলোটুকু কাঁপে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেই আলোয় আলোয় শহরে পৌঁছিলেন ওঁরা। অজানা জায়গা—আলোয় আলোয় ঘর চিনে নেওয়া ভাল। শহর প্রকাণ্ড—বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে তার অবয়ব—সাজসজ্জা জাঁকজমক। শব্দ—মানুষ—যানবাহন আর বাড়ী—এ যেন জীবনের পক্ষেও অপর্যাপ্ত। একসঙ্গে অনেক ঢাক বাজলে—একসঙ্গে অনেক চড়কের মেলা বসলে—একসঙ্গে অনেক চোদ্দ প্রদীপ জ্বালার উৎসব জমলে—এমনি ধারা শব্দ—মানুষ—আলো আর ভিড়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য,—চওড়া রাস্তার গা ফুঁড়ে সরু রাস্তাও বেরিয়েছে অসংখ্য আবার তাদের গা ফুঁড়ে বোবা গলির সংখ্যাও কম নয়। সে গলিতে কোঠা বাড়ির ভিড় আছে—মানুষ কম—যানবাহন চলে না। আলো জ্বলে না—না জ্বালে মানুষ—না দেন ভগবান। দোতলা তিনতলা বাড়ী—যেন ইঁটের স্তূপ। শেওলা ধরে দেওয়ালের গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে—সেই জলে থই থই করছে সঙ্কীর্ণ গলি। সমস্ত গলিটাই বাড়ীগুলো সমেত ভিজে। এমন খটখটে শীতের দিনেও কোন্ চির বাদলের দেশে এসে পড়ল এরা?

এই যে—এই দিকে দুয়োর। একটু হেঁট হয়ে ঢুকো নইলে মাথা ঠুকে যাবে। অমর সতর্ক করে দিলেন।

জবরদস্ত বাড়ী—জোর করে মাথা নুইয়ে নিলে।

কি বিশ্রী অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে! উঠোনের এক পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে—তারই কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোলচর্ম্ম স্থূল কলেবর এক বৃদ্ধা।

ভগবতীকে দেখে দন্তহীন মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, এস, বৌমা এস। হাঁ—এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে যাও দোতলায়—বাঁহাতি যে ঘর পড়বে—

ছেলেরা দুপ্ দাপ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল। নীচে থেকে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আস্তে—গো—ভাল মানুষের ছেলেরা—আস্তে। তিন কেলে পুরনো সিঁড়ি ধকল সইতে পারবে নি।

বাড়ীটারও তিনকাল শেষ হ'য়েছে—না হ'লে একি শ্রী দোতলা ঘরের। দেশের মাটির দাওয়া আর খড়ের চালার সৌষ্ঠব এর চেয়ে বেশী। সে বাড়িতে দারিদ্র্য আছে—নোংরামি নেই, উলঙ্গ হলেও শালীনতাবোধ হীন নয়। তিন দিকের নিশ্ছিদ্র দেওয়াল—কবে পলস্তরার প্রলেপে সমৃদ্ধ ছিল—গবেষণার বিষয়; এই ঘরে যে কুপি জেলে গৃহস্থেরা রাত্রির কাজ সেরেছে তার সাক্ষী ভূষোকালি মাখা দেওয়াল। উত্তর দিকের একমাত্র জানালাটার লোহার গরাদেগুলি জং ধরে ক্ষয়ে গেছে—আর কাঠের কপাটে অসংখ্য ছিদ্র ও ফাটা—শীতের হাওয়া আটকাবার ক্ষমতা তার নেই। জানালার ফাটা কপাটে—তেল চিটচিটে দাগ—গ্রীষ্মের দিনে জানালা ঠেস দিয়ে বসে একটু হাওয়া খাবার আরাম হয়তো উপভোগ করে থাকবে কেউ কেউ। আপাততঃ ছেঁড়া চট বা অন্য কিছু না ঢেকে দিলে—শীতের আক্রমণে কাবু হবে পড়তে হবে।

ভগবতী বিছানার বাণ্ডিলটা খুলে ছেঁড়া সতরঞ্চখানি টাঙিয়ে দিলেন জানালার কপাটের গায়ে।

দোতলা ঘর দেখে ছেলেরা তো মহা খুসী। বললে, মা, আমাদের কাছে শুয়ে একটা ভা—ল গল্প বলতে হবে কিন্তু।

খেয়ে দেয়ে তারাই কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল সব আগে।

অমরনাথ বললেন, কষ্ট যথেষ্টই হবে—কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও তো কিছু খুঁজে পেলাম না।

ভগবতী বললেন, কোল চাপা ঘর—একটু অন্ধকার এই যা—না হলে দোতলা তো।

হাঁ—এমন দোতলা বানাবার জন্য অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে। অন্যের পাঁচীলের ওপর ঘরের ছাদ—একটু করে জায়গা নিয়ে যেন ভেল্কীখেলা।

তা হোক—আমার তো ভালই লাগছে। এত বড় শহর—

অমরনাথ হাসলেন, শহরে আর তোমরা রইলে কই! পাঁচীলের বন্দী-নিবাস, এখানে শহর কই!

কেন—ওই যে ইষ্টিশানে নামলাম—

সে ওই ইষ্টিশানেই পড়ে রইল। শহর তোমার আমার জন্য নয়—আমাদের জন্য এই ঘর।

ভগবতী আবেশপূর্ণ স্বরে বললেন, এই ঘরই আমার শহর—শহরের চেয়ে অনেক বড়।

শুধু কথায় মন বা চিঁড়ে কোনটাই ভেজে না। তবু চেষ্টা করা যাক যদি মুখের কথা দিয়েও মনের খুঁত-খুঁতুনিটাকে ঠেলে ফেলা যায়।

ভগবতী কিন্তু মিথ্যা বলেন নি। এই ক্ষুদ্র ঘর যে বিরাট শহরের চেয়ে অনেক বড়—সে অনুভূতি তাঁর চেয়ে অন্য কারও তো তীব্র হবার কথা নয়। যাকে কেন্দ্র করে মেয়েরা ঘর বাঁধে—স্বপ্ন দেখে—স্বর্গ পায় হাতে—সেই তো পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় সম্পদ। সুদীর্ঘ দিন পরে অমরনাথকে একান্ত করে কাছে পেয়ে···প্রাপ্ত সম্পদের উল্লাসে ভগবতী তেমনি নিখিলহারা হয়ে গেলেন।

ভোরের আলো এই ঘরে উঁকি মারে না—তবু অভ্যাসবশতঃ ঘুম ভেঙ্গে গেলে ভগবতীর ছেলেমেয়েরা জেগে উঠেছে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। আকাশের আলো না পৌছলেও রাত্রিশেষের বার্ত্তা ওরা জানতে পারে। ওরা আলোরই সতীর্থ—তাই তার প্রকাশের ইঙ্গিতে সাড়া দেবেই। একটু বড় হলে আলোর ধর্ম্ম ওরা ভুলতে বসে—ভরা দুপুরে জ্বলন্ত রৌদ্রে—পৃথিবীর দিকচক্র-সীমা কিংবা আকাশ পরিধি থেকে বর্ণ সৌন্দর্য্য আর বিস্তৃতি যেমন মুছে যায়।

সন্তু বললে, মা জানলাটা খুলে দেব?

···অর্থাৎ দিনের আলোয় শহর দেখবার কৌতূহল ওদের তীব্র হ'য়েছে।

ভগবতী বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগবে যে।

না। কমলা আব্দারের ভঙ্গিতে উঠে এসে ছেঁড়া সতরঞ্চখানা গুটিয়ে নিলে। উত্তরমুখী জানালা—তা অসংখ্য ফাটা আর ফুটো দিয়ে—হাওয়ার শীতল শাণি তীরগুলি নিক্ষেপ করলে। কমলা চীৎকার করে উঠল উঃ—বাবারে—কি হাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে সতরঞ্চখানা বিছি দিলে জানালার গায়ে।

আর সবাই তখন উঠেছে বিছানা ছেড়ে। সবাইএ মনে কৌতূহল নূতন জায়গা দেখবার।

সন্তু বললে, আমরা নীচেয় যাব মা?

অমরনাথ বললেন, নীচেয় কোথায় যাবি—উঠোন নে তো। বাড়ির বাইরে গলি—তা সে গলিও তো কা দেখলি।

হাঁ—ছাদ একটা আছে বটে—কোনদিকে তার সিঁ জানি না। আর ছাদে যাওয়া চলবে কিনা—সেটাও জানা দরকার।

ভগবতী বললেন, আমাদের ঘরের একটা ছাদ আ তো,—তবে যাওয়া কেন চলবে না?

এ যে কলকাতার বাড়ি—যারা ঘর ভাড়া নেয় দেয়ালে ওপর অধিকার তাদের নেই। তোমার ঘরের ছাদ তোমারই হবে এ আশা করতে সাহস হয় না, তাই।

সন্তু ক্ষুণ্ন স্বরে বললে—তা হলে ঘরের মধ্যেই আট থাকব আমরা।

না—না—তা কেন, কাছেই একটা পার্ক আছে সেখা গিয়ে খেলাধূলা করবি। একটু জানা-চেনা হলে আর দূরে যেতে পারবি।

ভগবতী বললেন, যে গাড়ীঘোড়া—ছোট ছোট ছেলে পথে চলতে পারে কখনও?

অমরনাথ বললেন, পারে বৈকি—তবে সাবধানে চল হয়। এমন রোজই হচ্ছে—কত ছেলেমেয়ে কত বড় ব লোকও গাড়ী চাপা পড়ছে।

ভগবতী মনে মনে শিউরে উঠে বললেন, কাজ নেই ত পথে বেরিয়ে। ছাদের ওপর থেকেই শহর দেখবি তোরা

খানিক পরে সারা বাড়িটাই জেগে উঠল। বাসন নামানোর শব্দ আর কাকেদের কোলাহল—এর সঙ্গে দিনের প্রকাশ সম্পূর্ণ হ'ল। চারিদিকে দুয়ো জানালা খোলা—আর গলাখাঁকারির শব্দ—বিচিত্র আওয়াজ। তার সঙ্গে টুকরো টুকরো মন্তব্য।

দুয়োর খুলে বাইরে বেরুলেন ভগবতী, পিছনে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল।

কিগো—তোমরাই বুঝি কাল নতুন এলে? গেছনু জোড়াসাঁকোয় দেওর-ঝির বাড়ী—তাই দেখা হয়নি। ফরসা রুপোপেড়ে ধুতি-পরা এক বিধবা এক মুখ পান চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করলেন।

ভগবতী এঁর সজ্জা দেখে অবাক হলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—তবু তাকে তিরিশের নীচেয় নামাবার কি অদম্য প্রয়াস। এলোচুল রুক্ষ নয় মোটেই—সুষ্ঠু ভঙ্গীতে কপালের ওপর এমনভাবে টানা রয়েছে যা অযত্নে পাতা-কাটারই নামান্তর। হাতে দু'গাছি প্লেন সরু বালা—গলায় তেমনি সরু হার চিক্ চিক্ করছে—ফরসা ব্লাউজের ওপর। পানের রসে ঠোঁট দু'খানি এত সকালেও টুক্ টুক্ করছে। কে জানে কেমন বিধবা—পূজা-পাট জপ-মন্ত্রের বাঁধন যার এমন শিথিল।

ভগবতীর বিস্ময়কে আমোলে না এনে উনি বললেন, তা বয়েস তো তোমার তেমন বেশী নয়—এই বয়সে কোলে কাঁকে—মা ষষ্ঠী দয়া করেছেন। মেয়েটি বুঝি বড়? তার কোলে এই ছেলে? তারপর···তা ভাই—মেয়ের তোমার গড়নটি বাড়ন্ত—পাড়াগাঁয়ে থাকে বলে—চেহারায় জলুস কম। আর বিয়ের বয়স তো হল—একটু চেকনাই ফিরিয়ে নাও—কলের জল আর শহুরে হাওয়া খাইয়ে। সত্যি—দেখো ভাই—এক মাসে যদি ছিরি না ফেরে তো···ওই রংই যখন কাঁচ-কাঁচ পারা হবে, লোকে বলবে সুন্দরী। আদর করে ঘরে নে যাবে।

ভগবতী পরিত্রাণ পাবার আশায় বললেন, ছেলেরা ছাদে যেতে যায়—বলে শহর দেখব।

ওমা—শহর দেখবেনি তো ঘরের কোণে কোণঠাসা হয়ে বসে থাকবে। যে পারে সে পারুক বাপু—আমার তো একদিন গঙ্গাস্নানে না গেলে মনটা হু-হু করে ওঠে। বলে রথ দেখা কলা বেচা এক সঙ্গে। তা মিথ্যে বলবনি ভাই—বাইরে বেরুবার একটা ছুতো না থাকলে পচে পচে মরতে হবে এই মুণ্ডলি তাঁতিনীর গোয়ালে। ওই যে কোণের দিকে সিঁড়ি—

ছেলেরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল।

বিধবা বললেন, ছাদেই ছাদ! চারদিকে চার পাঁচতলা বাড়ীর দেয়াল—এক চিলতে আকাশ ছাড়া মানুষজন কি ছাই নজরে পড়ে। কথায় বলেনা শস্তার তিন অবস্থা—এও হয়েছে তাই। একটু থেমে বললেন, তোমরা! বামুন? ওমা তাই তো বলি—এমন ভদ্দর-ভদ্দর চেহারা আর কোন জাতেরই বা হবে! পাঁচ ছটি বিয়েন—বয়স ঢলেছে—তবু মুখের কি ছিরি! কর্ত্তা বুঝি চাকরি করেন আপিসে? কোন আপিসে? জাননি? ওমা—জেনে নিতে হয়। আমার দেওর কাজ করে বাংলার লাটসায়েবের আফিসে। হাজার টাকা মাইনে পায়। চারটে চাকর—দিয়েছে আফিস থেকে—একটা রাঁধুনি বামুন। একটা ঝি ছেলে ধরে—একটা বাসন মাজে। এক পা মাটিতে ঠেকায়না ছেলে বুড়ো মেয়ে মদ্দ সবাই। খালি মটোর আর মটোর। আমি বলি একটু হাঁট বাছা—এমন করলে গতরে যে শোঁপোকা ধরবে। ধরবেনি দিদি? প্যাচ করে দেওয়ালের গোড়ায় পানের পিচ ফেলে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠলেন।

ও-পাশের দুয়োর ঠেলে একটি বউ উঁকি মারলে। ঠাকুরঝি দেখছি. সক্কাল বেলাতেই জমিয়েছ বেশ। এর পর বেলা হলে কল পাবে? এইবেলা উনুনে আগুন না দিলে—হয়ে উঠবে আপিসের ভাত!

এই যাই—দেখনু নতুন লোক—তাই একটু—

নতুন লোক তো পালিয়ে যাচ্ছে না আজই—এর পর বসে বসে আলাপ করো যত খুসী! দেওরের মোটর দেখলে তো তোমার দাদার পেট ভরবে না—তাকে সেই বাদুড় ঝোলা করে ট্রামে যেতেই হবে! বউটি দুয়ার বন্ধ করে দিলে।

বিধবা বললেন, আছে তাই বলি—বাড়িয়ে তো বলিনে। কথার ছিরি শুনলে হাড়পিত্তি রি-রি করে জ্বলে ওঠে।··· গজ গজ করতে করতে আর একবার পানের পিচ ফেলে তিনি নেমে গেলেন।

দেওয়ালের পানে চেয়ে শিউরে উঠলেন ভগবতী।··· এমন সুন্দর প্রাতঃকালটিকে ওরা অযত্নে কুশ্রী করে তুলছে!

শীতের এই ভোরেও গায়ে আঁচল জড়িয়ে উঠোন পরিষ্কার করার কাজটি সুসম্পন্ন করেন তিনি। যেমন তেমন করে সম্মার্জনী বুলানো নয়—প্রত্যেকটি পাতা

প্রত্যেকটি কুটো উঠোন থেকে ঝাঁট দিয়ে তুলে দেন। তার আগে গোবর-জল ছড়িয়ে—ধুলো আর দুর্গন্ধ দূর করেন। সেই পরিচ্ছন্ন শুদ্ধীকৃত অঙ্গনে পা যেন দেবতারা—সারাদিনের কর্ম্মে যোগান আনন্দ। পৃথিবীর ঘর ওঁরা ভালবাসেন—মানুষকেও ভালবাসেন। মানুষের শ্রদ্ধা আর প্রীতি পেলেই সন্তুষ্ট ওঁরা। ওঁদের প্রীতির জন্য উঠোন পরিষ্কার—গোবর-জল দিয়ে দাওয়া নিকানো, উনুনের ছাই ফেলা, বাসি কাপড় কেচে গা ধুয়ে ঠাকুর ঘরের পাট সারা। তারপর রান্না—ভোগ—প্রসাদ পাওয়া। একটি দিনের মধ্যে কি শুচিতা—কি সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন। শুদ্ধ বস্ত্র পরে এমন হাল্কা হাল্কা মনে হয়। মনে হয়—কার গায়ের পদ্ম গন্ধ—কার নূপুরের ধ্বনি—কার কেয়ূর কঙ্কণের রিণিরিণি—কার পীতবাসের চকিত চমক—নাসা শ্রুতি আর দৃষ্টিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। দেহ থাকে সংসারে—মন উড়ে যায় অলকায়। এই কি—সে অলকা এখানে বুঝি কল্পনাতেই ধোঁয়া হয়ে যায়।

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি পুরুষ। পূর্ণ দৃষ্টিতে ভগবতীর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করতে লাগল। একটুও অপ্রতিভ হল না। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ভগবতী ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

প্রভাত স্তোত্র পাঠ শেষ হয়েছে অমরনাথের। বললেন, চল—তোমায় কলতলা দেখিয়ে দিইগে। এই বেলা কাপড় কেচে—দু এক ঘড়া জল নিয়ে এস।

কলতলায় অনেকে আছেন।

তা হোক—কলও রয়েছে দুটো। একটী মেয়েদের।

ছেলেরা আকাশ দেখে ঘরে ফিরল।

সন্তু বললে, মা—একজন লোক ছাদে উঠে আমাদের কি বল্লেন জান? বললেন, কি খোকা—তোমরা বুঝি নতুন এসেছ এখানে? ভাল করে দেখে নাও শহর—দেশে গিয়ে গপ্প করবে—এই দেখলুম—সেই দেখলুম। ওঁরা দেখলুম বলেন কেন মা?

যে দেশের যা ভাষা।

কি বিশ্রী যে শোনায়। কমলা মন্তব্য করলে। আমায় বলে—বায়স্কোপ দেখেছ খুকী? আমি নাকি খুকী! কমলা হেসে উঠল কলকণ্ঠে।

মিণ্টু বললে, আর দাদার মত ওই ছেলেটি কি বললে… দাদাকে। বললে—তোমরা যে পাড়াগেঁয়ে তা চুল ছাঁট দেখেই বুঝেছি। কি করে বুঝলে মা?

ওদের চোখ যে আলাদা—বুঝবে না! তা তোমরা রাগ করনি তো? যে যাই বলুন—রাগ করো না। যাঁরা বেশী দেখেছেন—বেশী জানেন—তাঁরা দু'কথা বললে কি এসে যায়!

সন্তু বললে, তা যাই বল মা, ওরা আমাদের দেখে মজা পায়। এমন হাসে—যা শুনলে রাগ না হয়ে যায় না।

তা হোক—রাগ করো না।

আজ অমরনাথ ছুটী নিয়েছেন। নূতন সংসারে—আনা-নেওয়ার হাঙ্গামা কম নয়। এটা মনে পড়ে তো—সেটা ভুলে যান; একবারের জায়গায় দশবার বাইরে ছোটেন।

অবশেষে ভগবতী বললেন, সন্তুকে সঙ্গে নাও—কাগজে লিখে নিয়ে যাও কি কি আনতে হবে।

রান্না খাওয়া ঘর গোছানো ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। কাজের চাপ পড়লে পারিপার্শ্বিক এমনি করেই মুছে যায়। অবসরক্ষণেই তো মন সামান্য বিলাস করতে ভালবাসে। সে কখনও উধাও হয়ে যায় অনন্ত শূন্যে—কখনও বা নেমে আসে শ্যামল তৃণের আস্তরণে। রূপে-রঙে-রসে আর গন্ধে পৃথিবীকে…চেখে চেখে উপভোগ করতে চায়। কাজ মিটলেও তেমন অবসর আজ ভগবতীর ভাগ্যে এল না। বৈকালে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অমরনাথ বেড়াতে গেলেন। অমনি এ-ঘর ও-ঘরের বাসিন্দারা ভিড় করে জমল ঘরের মধ্যে। কেউ হাত তুলে প্রণাম করলে—কেউ বা পা ছুঁয়ে।…ওদের বেশ-বাসেও খানিকটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সকালের কলহরতা শ্রম পরায়ণীয়া যেন সহসা সুপ্রসাধিতা… সীমন্তিনীর রূপ নিয়েছে।…কর্ম্মের…কর্কশ দায়িত্ব এড়িয়ে ওরা উত্তীর্ণ হয়েছে কোমল অবসরের স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে।

তারপর—আমরা তো সেই থেকে উসখুস্ করছি—কখন তোমার কর্ত্তাটি বার হবেন। আর সময় তো বেশী হাতে নেই—ওঁরাও সব কাজ সেরে ফিরে আসবেন। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি ইস্তক—আবার জুড়বে ঘানি-গাছে।

বলে এক বর্ষিয়সী সুর করে গান ধরলেন:

'ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে গো পাক দিতেছ অবিরত।'

ভারতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত, এখানে সর্বত্র শিক্ষা-প্রসারে আদৌ সমতা রক্ষা পায় নাই। এমন কি প্রতিবেশী রাজ্য-সমূহের মধ্যেও ইহা একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বিরাজ করিতেছে। নিম্নে তাহারই একটা তালিকা দেওয়া গেল।

প্রতি ১০,০০০ হাজার লোকের মধ্যে শিক্ষিতের হার—

১৯০১ ... ... ৮৮৭ জন
১৯১১ ... ... ৯৮১ „
১৯২১ ... ... ১,১৩৬ „

১৯৫১ সালের সমগ্র জনসংখ্যার শিক্ষিতের শতকরা হার

রাজ্য	সাধারণ জনসংখ্যা			পল্লী-অঞ্চলের জনসংখ্যা			শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা		
	মোট	পুং	স্ত্রী	মোট	পুং	স্ত্রী	মোট	পুং	স্ত্রী
আসাম	১৮.১	২৭.১	৭.৮	১৬.৫	২৫.৪	৬.৬	৫০.৩	৫৮.৮	৩৭.৮
মধ্যপ্রদেশ	১৩.৫	২১.৯	৫.০	৯.৯	১৭.৩	২.৬	৩৬.১	৪৯.৭	২১.৩
উড়িষ্যা	১৫.৮	২৭.৩	৪.৫	১৪.৯	২৬.২	৩.৯	৩৭.৫	৫১.৭	২১.৪
মহিশূর	২০.৬	৩০.৪	১০.৩	১৪.৫	২৩.৮	৪.৯	৩৯.৭	৫০.৬	২৭.৮
বোম্বাই	২৪.১	৩৪.৯	১২.৬	১৬.৯	২৬.৬	৬.৯	৪০.৬	৫২.০	২৬.৭
পাঞ্জাব	১৬.৫	২২.৫	৯.৫	১২.০	১৭.৫	৫.৮	৩৫.৬	৪৩.৩	২৬.১
মাদ্রাজ	১৯.৩	২৮.৫	১০.১	১৫.৪	২৩.৯	৬.৯	৩৫.৪	৪৭.১	২৩.৪
উত্তরপ্রদেশ	১০.৮	১৭.৮	৩.৬	৭.৯	১৩.৬	১.৫	৩০.০	৪০.১	১৭.৬
বিহার	১১.৯	১৯.৯	৩.৮	১০.২	১৬.৬	৩.৩	২৯.২	৪০.৮	১৫.১
পশ্চিমবঙ্গ	২৪.৫	৩৪.৭	১২.৭	১৭.৭	২৮.১	৬.৭	৪৫.২	৫১.৮	৩৫.১
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫.৮	৫৪.৮	৩৭.০	৪৪.৮	৫৩.৮	৩৬.০	৫১.৩	৬০ ০	৪২.৪

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে জনবসতি হিসাবেও শীর্ষস্থানীয় এবং শিক্ষাবিষয়েও অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গ এই দুই বিষয়েই ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের পর স্থানাধিকারী। শিক্ষার দিক হইতে অতি সামান্য পার্থক্য রাখিয়া বোম্বাই রাজ্য যদিও পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করিতেছে, তবু বলা যাইতে পারে যে, ইহারা উভয়েই ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেকই অগ্রসর হইয়াছে। বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা প্রায় একই পর্য্যায়ে অগ্রসর হইতেছে; কেবলমাত্র পল্লী অঞ্চলে বোম্বাই অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যার হার বেশী; ইহা ছাড়া অন্য কোথাও তেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, জনবহুল বৃহদায়তন উত্তর প্রদেশ রাজ্যে শিক্ষিতের হার কত নগণ্য। সকল রাজ্যেই স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষিতের হার অতীব হতাশাব্যঞ্জক। শহরাঞ্চলের তুলনায় পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার আলো মোটেই প্রবেশ করে নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু, এমন অনেক নগর ও জনপদ আছে, যেখানে শিক্ষিতের হার বেশী, অথচ জনসংখ্যার চাপ কম। কাজেই, এই সমস্ত প্রভেদমূলক শিক্ষা-বিস্তৃতির অন্তরায়গুলি দূর করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বায়বীয় পদার্থের মত সর্বত্র প্রসারেই শিক্ষার সার্থকতা। নতুবা মানুষের মধ্যে ইহাতে বিভেদাত্মক বীজই একমাত্র উপ্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-প্রসারে গত পঞ্চাশ বৎসরে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহার প্রতি দশ বৎসরের একটা ধারাবাহিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রতি ১০,০০০ হাজার লোকের মধ্যে শিক্ষিতের হার—

১৯৩১ ... ... ১,১৪২ „
১৯৪১ ... ... ১,৮৬২ „
১৯৫১ ... ... ২,৪৫৪ „

১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বৎসরে রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই বলিলেই চলে। ১৯৫১ সালে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৩১ সাল অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে সর্বমোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৬,০৮৭,৭৯৭ জন; তন্মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ কলিকাতায় বসবাস করে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট হইবে যে, কলিকাতা ও অন্যান্য শহরাঞ্চলের শিক্ষিতের সংখ্যা উক্ত মোট সংখ্যা হইতে বাদ দিলে গ্রামাঞ্চলে তাহার কিরূপ আকার দাঁড়াইবে।

শিক্ষিতের মানদণ্ড নিয়া আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। কোন দেশে উত্তমরূপে লিখিতে, পড়িতে ও আঁক কষিতে জানাকেই শিক্ষিত পদবাচ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার, অন্য কোথাও শুধু পড়িতে ও লিখিতে পারিলেই শিক্ষিত বলিয়া ধরা হয়। ভারতে সাধারণ মতে নামসহি জানা লোককেও শিক্ষিত বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই, উক্ত বিরাট সংখ্যার মধ্যে এরূপ ধরণের গৃহীত শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও একেবারে সামান্য নয়, বরং গরিষ্ঠ সংখ্যক। ভারতের এই নিম্ন গর্ব্ববোধ করিবার তেমন কোন কারণ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদিও ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে ছয় হইতে এগার

বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের একটি দশ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তবু বলা উচিত, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট উন্নয়নের কোনরূপ বিশদ ব্যবস্থা না হইলে, গ্রাম্য, সমাজ-জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না ঘটিলে, দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ব্যবস্থা না হইলে, ইহা কতদূর ফলপ্রসূ সন্দেহ আসে।

শিক্ষার বাহক পুস্তক। এই পুস্তকের মাধ্যমেই শিক্ষার আলোক দেশের আনাচে কানাচে প্রবেশ করে। শিক্ষকের শিক্ষা নৈপুণ্য মানুষকে যতটুকু শিক্ষাদানে সক্ষম নয়, একমাত্র পুস্তক পাঠেই তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সঞ্চার ঘটে। ইহা Samuel Johnson এর উক্তি হইতে স্বীকৃত হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "I can not see that lectures can do so much as reading the books from which the lectures are taken." (Boswell's life of Dr. Johnson)। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সহজবোধ্য পুস্তক প্রচারেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এই প্রয়োজনীয়তার মীমাংসা ঘটিতে পারে বহুল পরিমাণে পাঠাগার বা Library এর প্রণয়নে ও অনুমোদনে। ভারতের মত অশিক্ষাচ্ছন্ন দেশে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত। ইহাতে অনেকেরই বিস্ময়বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ যে দেশের লোক শিক্ষাদীক্ষায় রীতিমত অনভ্যস্ত, সেখানে ইহার মর্ম্ম কতজনে বুঝিবে? এই কথার উত্তরে বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অনুসৃত নীতির কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে। সেখানে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রাইমারী শিক্ষা সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়; কিন্তু ইহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে Public Libraries Act প্রণীত হইয়াছিল। সাধারণ পাঠাগার আইন সেখানে শুধু বহুল পাঠাগার প্রবর্ত্তনেই উৎসাহ দেয় নাই, উপরন্তু জনসাধারণের শিক্ষা ও সমৃদ্ধির আগ্রহকে তরান্বিত করিয়াছিল। পাঠাগার একদিকে যেমন নিশ্চেষ্ট, নিরানন্দ মনের খোরাক পরিবেশন করে অন্যদিকে জনসাধারণের মনের কুয়াশা তমসাকে দূর করিবার অঙ্গীকারও দান করে। সুশিক্ষা বিস্তারের ইহাই প্রথম পাদক্ষেপ বলিলে ভুল হইবে না। পৃথিবীর শিক্ষা-উন্নত দেশগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সেই সব স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই পাঠাগারের সহিত শিক্ষার একটা যোগসূত্র রক্ষা করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা ৬,১০০; কানাডাতে ১,১৪৪; অষ্ট্রিয়াতে ১,৬০০; বেলজিয়ামে ২,২৭১, ডেনমার্কে ১,৩১৫; যুগশ্লোভাকিয়াতে ১০,২১২; এবং ভারতে ৫১৯টি।

প্রাক্ স্বাধীনতার যুগ হইতেই সাধারণ গ্রন্থাগার সমস্যা এই দেশে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। তবু যে কয়েকটি এই ধরণের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সেগুলি অনেকক্ষেত্রে উত্তম পরিচালনার উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালিত হয় না বলিয়া পাঠকদের পাঠ-পিপাসা যথাযথ মিটাইতে সক্ষম নয়। সুতরাং, বর্ত্তমান দেশে যাহা সর্ব্বাধিক প্রয়োজন, তাহা হইতেছে জাতীয় গ্রন্থাগার সেবাসমিতির মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী স্থায়ী ছোট বড় পাঠাগারগুলির অভাব-অভিযোগ ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে একটা হিসাব নেওয়া। তারপর ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া ম্রিয়মান পাঠাগারগুলির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ে সুচিন্তিত কার্য্যপন্থা গ্রহণ করা, যাহাতে ইহারা দীর্ঘস্থায়ী হয় ও অপাংক্তেয় দোষ বর্জ্জিত হয়।

পাঠাগারের প্রাথমিক উৎস পুস্তক। পুস্তকবিহীন পাঠাগার আর অন্তঃসারশূন্য বৃক্ষ দুই-ই সমগোত্রীয়। সেইজন্যই পাঠাগারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা বলিতে গিয়া Gretchen Knief schsenk "Three B's in library service—books, brains and building" এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই, সর্ব্বত্রই যে প্রথমটির প্রয়োজন সর্ব্বাধিক—তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এই পুস্তক নির্ব্বাচন ও সঞ্চয়ন পাঠাগার ভেদে বিভিন্ন রূপ হইবে। স্থান, কাল, পাত্র-মিত্রের বিচারের উপরই ইহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিশুপাঠাগার, স্কুল কলেজ পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পাঠাগার ও গ্রামোন্নয়নের জন্য স্থাপিত পাঠাগারসমূহে শ্রেণীভেদে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া পুস্তক সঞ্চয়ন না করিলে পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য যে লোক-শিক্ষা তাহা সিদ্ধ হইবে না। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশে এই বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি সর্ব্বদাই প্রদান করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় 'B'টির গুরুত্বও নেহাৎ সামান্য নয়। সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের অভাবে বহু মূল্যবান গ্রন্থাগার যে অকালে বন্ধ হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নহে। পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতি, পাঠক সাধারণের সহিত অমায়িক সম্পর্কের অভাব পাঠাগারমাত্রেই অনুভূত হইয়া থাকে এবং ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এই বিষয়ে মনোনিবেশের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় 'B'এর সরবরাহ এই দেশে এক দুঃসাধ্য সমস্যা সন্দেহ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে নগরে, শহরপ্রান্তে ও পল্লীতে সুরম্য অট্টালিকায় অথবা বৃহৎ দালান বাড়ীতে পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু, দারিদ্র-পীড়িত ভারতে গৃহ-সমস্যার প্রশ্ন যেখানে প্রবল, সেখানে এরূপ বিরাট দ্বিতল-ত্রিতল গৃহ পাঠাগারের প্রয়োজনে আকাঙ্ক্ষা করা নিতান্তই অনুচিত হইবে। তবে, পাঠাগারের গৃহটি ছোট বা কাঁচা হইলেও স্থানটি নির্জ্জন, জনকোলাহলশূন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার Social Education Scheme অনুসারে গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট পাঠাগারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য পুস্তক পাঠের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বৎসরে ৩০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ নগণ্য হইলেও তাহাদের উৎসাহ ধন্যবাদার্হ। কারণ যে রাজ্যে প্রায় শতকরা ৮৭জন গ্রামবাসী অশিক্ষিত ও তাহাদের শিক্ষার প্রতি বহুদিন অবহেলার পর সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তথায় ইহা আশা সঞ্চারক। উপরন্তু, এতদুদ্দেশ্যে, বাণীপুর একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কলানব গ্রাম, বর্দ্ধমান, শ্রীনিকেতন, বীরভূম ও সরিষা, চব্বিশ পরগণায় তিনটি আঞ্চলিক পাঠাগার এবং এই তিন অঞ্চলের প্রত্যেকটির অধীনে আরও ছয়টি করিয়া Ancillary Feeder Libraries স্থাপনের একটি পরিকল্পনা রাজ্য-সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, ভারতের মত শিক্ষা-অনুন্নত দেশে যত শীঘ্র সর্ব্বত্র শিক্ষার প্রসার ঘটে ততই মঙ্গল ও শুভকর। নতুবা, 'প্রজাতন্ত্রী ভারত' শুধুমাত্র কথারই একটা ফাঁকা আওয়াজ হইয়া থাকিবে। দেশের লক্ষ্মী অশিক্ষার ঘাত বাহিয়া আবার বিদেশের ভাণ্ডারে উঠিলেও ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।

উপসংহারে সুশিক্ষালাভে মানুষের জীবনে কি অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি বিরাজ করে, তাহাই শুধু উল্লেখ করিয়া ইহা শেষ করিব। Emily Dickinson লিখিতেছেন :—

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust;
He knew no more that he was poor,
Nor that his frame was dust.

He danced along the dingy days,
And this bequest of wings
Was but a book. What liberty
A loosened spirit brings.

Poems : First series, "A Book"

নমুনা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বহুদিন বাহির হই না, আত্মীয়-স্বজন বারবার লিখিতেছিলেন একবার যাইতে, অতএব পূজায় সপরিবারে কলিকাতা হইয়া দাদার বাড়ীতে যাইব স্থির করিলাম। পরিবার বলিতে স্ত্রীত আছেনই এবং বার হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত পাচটি সন্তান। তাহারা রেলগাড়ী চড়িয়া জ্যেঠার বাড়ীতে যাইবে অতএব আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু আমি চিন্তিত হইলাম পূজার ভীড়ের কথা স্মরণ করিয়া। লটবহর কিছু হইবেই এবং সন্তানাদি লইয়া একা বৃদ্ধ মানুষ যাইতে পারিলে হয়—

বন্ধুবর ক্ষীরোদবাবু পরামর্শ দিলেন,—২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর জন্মদিন, অতএব ১লা আফিস হইয়া সমস্ত অফিস্ বন্ধ হইবে এবং উক্ত দিনে ভীড় অনিবার্য্য। ৩০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যদি রাত্রের গাড়ীতে অর্থাৎ মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের থ্রু বগীতে যাওয়া যায় তবে ভীড় হইবে না। ইণ্টার ক্লাসে গেলে ত রাজার হালে যাবেন—

আমি কহিলাম—ইণ্টারেই যাব, কিন্তু বৃহস্পতির শেষে বেরুতে হবে, শেষে কপালে কি হবে কে জানে।

—ও সব কিছু না। সন্ধ্যায় বেরুবেন বার দোষ থাকবে না—

ক্ষীরোদবাবু ওয়াকিবহাল লোক, অতএব তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। গ্রাম্যলোক যাতায়াতে ভয় একটু ত আছেই।

অতএব বৃহস্পতিবারে পাঁজি দেখিয়া বারবেলা বাদ দিয়া গো-শকটে আরোহণ করা গেল। দুর্গা নাম স্মরণ, আম্র-পল্লব শোভিত পূর্ণ জলঘটে প্রণাম প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়াই বাহির হইলাম। তথাপি শঙ্কা বৃহস্পতির শেষ—ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবে কি?

গো-শকটে মাইল পাঁচেক সামান্য বৃষ্টিতে ভিজিয়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট করিয়া ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের কৃপায় ট্রেণে ওঠা গেল—কিন্তু থ্রু বগীতে ইণ্টার ক্লাস ঘর মাত্র একখানি—বাছাবাছি করিবার অবসর নাই। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া চক্ষু চড়কগাছ।

সর্ব্বসাকুল্যে বেঞ্চি তিনখানা, বাঙ্কও তিনখানা। একুণে পনরজন যুবক বেঞ্চি বাঙ্ক মেঝেয় বিছানা করিয়া শুইয়া আছেন—সবই সমবয়সী। প্রথম বেঞ্চের এক কোণে এক ব্যক্তি ইঞ্চি ছয়েক স্থানে বসিয়া আছেন। দ্বিতীয় বেঞ্চির কোণে এক ভদ্র মহিলা শিশু-সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া, তাঁহার পায়ের নিকটে মেঝেয় একখানা কাঁথা পাতিয়া যথাক্রমে দুই, চার, ছয় বছরের তিনটি শিশু নিদ্রামগ্ন। তাহাদের অভিভাবক দরজার নিকটে অবস্থিত দুইটি বাক্সের উপরস্থিত বিছানায় বাণ্ডিলের উপর শুইয়া জ্বরে ধুঁকিতেছেন। আমি তিন বৎসরের পুত্রটিকে কোলে করিয়া, স্ত্রী এক বৎসরের পুত্রকে কোলে করিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া আছি, পায়ের কাছে পায়খানার দরজার নিকটে আমার লটবহর, নড়াচড়া করাও কঠিন।

গাড়ী চলিতেছে—যাত্রীগণ নিঃশব্দে ঘুমাইতেছেন। আমি তৃতীয় বেঞ্চির শায়িত যুবকটিকে কহিলাম—মশায়, একটু জায়গা দিন অনুগ্রহ ক'রে, শিশু, মেয়ে-ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে, একটু বসবার স্থান দিন—

গভীর নিদ্রামগ্ন ভদ্রলোকের কানে সে কথা প্রবেশ করিল না। আমি বাক্স বিছানা সরাইয়া শিশু দুইটিকে স্ত্রীসহ তাহার উপর বসাইয়া আগাইয়া গেলাম। গাড়ীতে আলো নিষ্প্রভ। টর্চ্চ বিনা দেখা যায় না—মেঝেয় শায়িত ব্যক্তিকে আর একটু হইলে মাড়াইয়া দিতাম। অতএব টর্চ্চ জ্বালিয়া তৃতীয় বেঞ্চির ভদ্রলোককে একটু স্পর্শ করিয়া কহিলাম—ভাই, ছেলে-পুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, একটু বসতে দিন। সামান্য একটু—এক হাত জায়গা দিন—

—চোখে টর্চ্চ ফেলছেন কেন ?

—মুখে আলো পড়েনি ত—একটু স্থান অনুগ্রহ করে দিন—

—আমরা বড় পরিশ্রান্ত, উঠতে পারবো না মশাই—

—উঠতে হবে কেন ? ছিঃ ছিঃ একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে শোবেন মাত্র—

—বাঙ্ক হইতে একজন কহিলেন—সঙ্কুচিত হওয়ার উপায় নেই মশায়—বড্ড পরিশ্রান্ত।

আর একজন কহিলেন—দেখছেন না মশায় শীল্ড জিতে আস্‌ছি, এখন না ঘুমুলে পারা যায়—

আর একজন টিপ্পনি করিলেন—তার ওপর মশায় মাংস খেয়ে সঙ্কোচনের আর কোন উপায়ই নেই—

আমি সভয়ে কহিলাম—আপনারা ঘুমোবেন বৈ কি ? ফুটবল খেলে পরিশ্রান্ত ; তারপর গুরু ভোজন—তবে দয়া করলে একটু বসতে তবুও দিতে পারেন—আমাকে নয়, শিশু ও মেয়েছেলেকে—

—আরে মশায়, ছেলে-পুলে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে ওঠেন কেন মশায় ?

—আজ্ঞে, গেঁয়ো লোক ভুল হ'য়েছে। বুড়োমানুষ উঠে পড়েছি এখন একটা উপায়, একটা—

কে একজন কহিলেন—ছেলে-পুলে হয় কেন মশায় ? বুড়োমানুষ ত বলছেন—

—আজ্ঞে বুড়োমানুষেরই ত ছেলে-পুলে থাকে, ছেলে-মানুষের ত ছেলে-পুলে থাকে না—আপনাদেরও বয়স হ'লে ছেলে-পুলে হবে, তাদের নিয়ে এমনি পথে চল্‌তে হবে, তখন হয়ত আমার দুর্গতি কিছুটা বুঝবেন—এমনি বিপন্নও হ'তে পারেন—

—আজকালকার ছেলেরা অত বেকুব নয় যে বিয়ে করে ছেলে-পুলের ঝুঁকি পোয়াবে।

—আজ্ঞে আজকালকার কথা ত জানি না, তবে আমাদের সময়ে লোকে বিয়ে করতো—তাই রেওয়াজ অনুসারে করে ফেলেছি। তা আজকার মত ক্ষমা ঘেন্না করে একটু বসতে দিন, একটু চেয়ে দেখুন কি ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই ভাবে মানুষে সারারাত্রি থাক্‌তে পারে, ছেলে-পুলে সব—নেহাত শিশু। আর আমাদের সময়ে একটু বসতে লোকে দিত—

—খুব বললেন ত মশায়, চেয়ে দেখলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে না।

একটা হাসির হুল্লোড় ঘরখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। আমি নিরুপায়ের মত কি বলিব খুঁজিতেছি—এমন সময় গৃহিণী কহিলেন—কেমন ভদ্রলোক সব—টানটান হ'য়ে শুয়ে আছেন একটু বসতে দেবেন না—

—সে ত দেখতেই পারছ,—বিদ্যাদের শেষ, যাবে কোথায়। তা নইলে ক্ষীরোদ এত খবর দিলে, আর ফুটবল খেলার কথাটা ব'ল্‌লে না—

যুবকগণের উদ্দেশ্যে কহিলাম—একটু দয়া করুন, তা নইলে যে ছেলেপুলেগুলো মারা যায়—

গালাগালি ক'রছেন, তার আবার দয়াটা কি ?

—আজ্ঞে ওটা গালাগালি নয়, কথাটার অর্থ হ'চ্ছে—আপনারা ভদ্রলোক, শিক্ষিত যুবক এবং সর্ব্বোপরি খেলোয়াড়,—আপনাদের কাছেই ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহানুভূতি ও ত্যাগ আশা করতে পারি আমরা—অর্থাৎ অক্ষম ও স্ত্রীলোকেরা। শরৎচন্দ্রও বলেছেন—যৌবনেই মানুষের মন সর্ব্বাপেক্ষা উদার থাকে—

কে একজন কহিল—ও ব্বাবা, এ যে সাহিত্য কপ্‌চাচ্ছে গো—

তৃতীয় বেঞ্চির শেষ প্রান্ত হইতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে একজন কহিলেন—কিরে তারক, কি হ'য়েছে—

—গুরুদেব, কি ব'লছেন ?

—কি হ'য়েছে—

—নারী ও শিশু ও বৃদ্ধের জন্য স্থান দিতে হবে—

—বলে দে স্থান-টান হবে না—আমরা তিরিশজন আছি, দরকার হলে মারামারি করবো—স্থান দেওয়া যাবে না। ফুটবলের পর মাংসভোজনে শরীর অতিশয় বিকল—

এতক্ষণ শিষ্যগণই যাহা হয় বলিতেছিলেন এইবার স্বয়ং ভীষ্ম অবতীর্ণ হইলেন। তবুও কহিলাম—আমি বুড়োমানুষ, মারামারির কথাই উঠে না—তবে দাঁড়িয়ে আছি আপনি চোখ খুলে একবার যদি দেখতেন তবে নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জায় একটু স্থান দিতেন,—তাই বল্‌ছিলাম—

গুরুদেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—চক্ষুলজ্জা ? ও সব অত্যন্ত সেকেলে ব্যাপার।

বাদানুবাদের ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু নিরুপায়। আমার স্ত্রী

দাঁড়াইয়া আছি, ছেলেমেয়েগুলি দাঁড়াইয়া আছে—মেঝের ভদ্রলোক পা দুইখানি সম্প্রসারণ করায়, বড়ছেলেটা এক পায় একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে ও বড়কন্যা কিছু বোঝে, বাবার দুর্গতি দেখিয়া তাহারা ম্রিয়মান অবস্থায় চুপ করিয়া আছে—অবুঝ দ্বিতীয় কন্যা অভিযোগ করিল, কোথায় বসব বাবা ? শিশু-পুত্র দুইটি কোলেই ঝিমাইতেছে—

কি জানি কেন তৃতীয় বেঞ্চির ভদ্রলোক শিয়রের ব্যাগটা সরাইয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া শুইলেন এবং এক হাত জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। ছেলেমেয়ে দুটি সেখানে কোন মতে বসিল। মুড়ির টিনের উপর ছোট বিছানাটা দিয়া পত্নীকে বসাইলাম—তিনি এক বছরের কনিষ্ঠ পুত্রটি কোলের মাঝে করিয়া বসিলেন। আমি চার বছরের পুত্রকে কোলের উপর শোয়াইয়া বাক্স বিছানার উপর বসিলাম—সুটকেশটার উপর মেঝো মেয়েটাকে বসাইয়া দিলাম। মনে মনে এই অযোগ্য শিষ্যটির এক হাত স্থান দান করায় ভূয়সী প্রশংসা করিলাম। গাড়ি চলিতেছে—

মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ শক্তিবলে বিছানার বাণ্ডিলটায় ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই—অতএব সেটার একদিক উঁচু,—কোলের মাঝে ছেলে ঘুমাইতেছে। প্রথমে দক্ষিণ উরু পরে বাম উরু ধীরে ধীরে অবশ হইয়া আসিল—নিতম্বের অর্দ্ধেকে ভারকেন্দ্রের অসামঞ্জস্যহেতু প্রথমে বেদনা পরে জ্বালা করিতে লাগিল।

রাত্রি ১টা—গাড়ী ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতেছে—অণ্ডাল।

ছেলেটিকে বেডিংএর উপর শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—নিম্নাঙ্গ শিথিল, ঝিঝি ধরিয়াছে। জ্বরে কম্পমান ভদ্রলোকের পায়ের কাছে একটা শূন্যোদর পিতলের কলসী আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইলাম। সেটাকে বিছানার তলায় দিয়া ভারকেন্দ্রকে কতকটা স্থির করা গেল—পুনরায় বসিলাম। পত্নীর পায়ে ঝিঝি ধরিয়াছে—তিনি সন্তানসহ কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন—

ছোট মেয়েটা সুটকেশে বসিয়া দেয়ালে মাথা দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইতেছে। স্ত্রী কহিলেন—আহা-হা-মেয়েটার কি দুর্গতি, ঘাড়টা একটু সোজা করে দাও—

—সোজা থাকবে কি করে—

বড় মেয়ে ও ছেলে ঝিমাইতেছে—পা তুলিয়া বসিয়া আছে, কারণ মেঝেয় শায়িত শিষ্যটির গায়ে লাগিতে পারে।

রাত্রি তিনটা—ছেলেমেয়েদের দুর্গতি দেখিয়া পত্নী অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন—এরা কি মানুষ !

যত বড় কষ্টই হোক্ তাহা এক সময় শেষ হয়—ধীরে ধীরে ভোর হইল। সূর্য্যোদয়ও হইল—নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম !

শিষ্যগণের ধীরে ধীরে নিদ্রাভঙ্গ হইতে লাগিল। একজন কহিলেন—গুরুদেব, কিছু ছাড়ুন—ভোর হল—

গুরুদেব জবাব দিলেন—বিড়ি খা সব—ছাড়বে আবার কি ?

অন্যজন ভাঁয়রো রাগিণীতে গান ধরিলেন—ভোর হল ভাই, শুকশারী জাগো—

সকলে জাগিয়া বিড়ি সিগারেট পান করিতে লাগিলেন —এবং নিদ্রান্তে প্রাতঃকৃত্যের প্রয়োজন হইল।

আমার দুর্ভাগ্য বাথরুমের পার্শ্বেই বাক্স ও বিছানার উপর ঘুমন্ত ছেলে লইয়া আমি বসিয়া, পত্নী অন্য দিকে মুড়ির টিনের উপর, উভয়ে না উঠিলে ওই অতি আবশ্যিক ছোট ঘরখানির দরজা উন্মুক্ত হয় না। ইতিমধ্যে তাহাদের সতীর্থগণ, যাহারা অন্য ঘরে ছিলেন আসিয়া সমবেত হইলেন এবং ঘরের মধ্যে জায়গাটা আরও কমিয়া গেল—

তিরিশটি শিষ্যসহ গুরুদেব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন এবং আমি সস্ত্রীক ঘুমন্ত পুত্র দুটিকে কোলে করিয়া নীরবে খাটবার ওঠবস্ করিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিলাম।

ব্যাণ্ডেলে চা পান হইল—

পুত্রটি এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল—দক্ষিণ উরুর হাড় পর্য্যন্ত কালি হইয়া গিয়াছিল সেটাকে মাসাজ্ করিয়া সবশ করিলাম।

ওদিকে খেলার আলোচনা চলিতেছে—আরও তিনটি গোল হওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি। কি যেন কি কথা হইতেছে এবং সহসা তিরিশজন ব্যক্তি হাসিয়া ঘর ফাটাইয়া দিতেছে। সারারাত্রি জাগরণের পরে, কর্ণপট বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যাইতেছে। পত্নী কানে আঙুল দিয়া বসিয়া আছে—

তাহার পর আরম্ভ হইল হিন্দি খেয়ালের ব্যঙ্গ—গুরুদেব ধরাইয়া দিলেন তান, শিষ্য দুইজন তাহার তান স, রি, গমা প্রভৃতি গাইলেন। সোম ও ফাঁকে ঘাটখানি হাতের তালি ও তিরিশটি কণ্ঠে হাস্য চলিতে লাগিল—

অন্য মহিলাটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিলেন—তাহার ছেলেপুলেগুলি রুগ্ন লোকটির পাশে বিছানায় আসিয়া বসিল—

গাড়ী শেওড়াফুলি আসিল—

গুরুদেব কহিলেন—আজ কলেজে আমাদের প্রোগ্রাম কি ? ক্লাস ত হবেই না—

সমস্বরে, হতেই পারে না—

আলোচনায় বুঝিলাম, সকলেই নিঃসন্দেহে গ্রাজুয়েট।

গাড়ী ছাড়িল—

এবার আরম্ভ হইল আধুনিক—কোণের প্রগল্‌ভ ছেলেটি গান ধরিল—

তার জোড়া বেণী দোলে,—
তাতে প্লাষ্টিকের ফিতে দোলে—ইত্যাদি

তালে তালে তিনি আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া হিজড়ে-সুলভ ভঙ্গিতে করতলে তাল রক্ষা করিতে লাগিলেন—সতীর্থগণ অনুকরণ করিলেন। গুরুদেব গানের কলি ধরাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্ত্রী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—এরা কি গো! এই সব বিশ্রী গান ক'রছে—অর্থাৎ মহিলাদের সম্মুখেই এইরূপ গান আরম্ভ করিয়াছে।

আমি চুপে চুপে কহিলাম—এরা সব গ্রাজুয়েট, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, উকিল, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ,—আর গানটা বিশ্রী নয়—আধুনিক গান।

—পোড়াকপাল, এই নাকি গান ?

—তুমি গেঁয়ো বৌ, শহরের হালচাল কি জানবে? তোমাদের দেখেই ত উৎসাহটা বেড়েছে।

—খোকাও ত কলেজে পড়ে। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রও ত কলিকাতা কলেজে পড়ে।

—হ্যাঁ পড়েই ত—

—সেও কি এই সব শিখেছে ? এমনি করে ?

—করে বৈ কি! তোমার ছেলে বলে সে ত যুধিষ্ঠির নয়! তোমার মত এদের বাবা মাও ভাবে, তার ছেলে নিশ্চয়ই খারাপ নয়।

—দরকার নেই এ কলেজে পড়ে, তাকে ঠাকুর মশায়ের টোলে ভর্ত্তি করে দাও—

—বল কি! ভারতের ভবিষ্যতের সে হবে একজন অন্ততঃ দাঁড়ি—আর তুমি বললেই সে কি পড়বে ?

স্ত্রী বিরস মুখে বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী হাওড়ায় আসিল—দুর্ভাগ্যক্রমে প্লাটফরমটা পড়িল আমাদেরই দিকে। আমি বলিলাম—আমি ছেলেপুলে বাক্সটা নামিয়ে নি আপনাদের নামবার সুবিধে হবে—

বলা বাহুল্য তাঁরা গ্রাহ্য করিলেন না এবং ঠেলিয়া ঠুলিয়া, বাক্স বিছানা ডিঙ্গাইয়া একে একে তিরিশ জন নামিলেন—একজন টিকেট কলেক্টর টিকিট চাহিলে কহিলেন, —আছে চলুন দেখাচ্ছি—

কুলির সাহায্যে লটবহর নামাইয়া একটু দাঁড়াইলাম। কোমরটা একটু ছাড়াইয়া লই—দূরে শিল্ড হস্তে ওরা টিকেট কলেক্টরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—

কুলি যাইতে চাহিল—আমি কহিলাম—থাম্, একটু জিরিয়ে নি—

স্ত্রী কহিলেন—বাঁচলুম বাবা—কানটা ফেটে যায় নি এই ঢের। ভদ্রলোকের ছেলে সব এমনি হয় এ আর দেখি নি—

—আর একটু খবর ত জানই না—তা হলে আরও দুঃখ পাবে—

—কি ?

—ওরা সব থার্ডক্লাস টিকিটে এসেছে—পাঁচ টাকা টিকেট কলেক্টরকে দিয়ে চলে যাচ্ছে—

তখন শিল্ডবিজয়ী খেলোয়াড়দল হিশ্ হিশ্ হুররে শব্দে চলিয়া যাইতেছেন।

স্ত্রী কহিলেন—একেবারেই অরাজক রাজ্য!

আমি কহিলাম—চল—

বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সি পাই না—কারণ কি ? ট্যাক্সি মিটারে যাইবে না, থাউকো দামে যাইবে। আর ধৈর্য্য ছিল না, চার টাকা দিয়া শ্যামবাজারের ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

গৃহিণী কহিলেন,—বাবা, আর বেরুবো না। এই সব আলকাচ আর দেখতে চাইনে, খুব হয়েছে। খোকাকে আর পড়াতে হবে না,—ও শিক্ষায় আর দরকার নেই—বুঝলে। না খেয়ে টাকা পাঠাচ্ছি, আর সে এই সবই ক'রছে—

কহিলাম—কিছু না—স্বাধীন ভারতে ও সব সেকেলে ব্যাপার চলবে না। বল—বন্দে মাতরম—চালাও ট্যাক্সি—

নবভারতের তীর্থস্থান দর্শন

শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ভ্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের এই দলে শুধু সাংবাদিক নয়, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিকও ছিলেন। দুইজন মন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রীসহ বিধানমণ্ডলী সদস্য ছিলেন ৭১ জন, সাহিত্যিক ২৮ জন, শিক্ষাব্রতী ৪ জন, সাংবাদিক ৯ জন ও অফিসার ছিলেন ৭ জন। সাংবাদিক অপেক্ষা সাহিত্যিকের সংখ্যা এই দলে বেশি ছিল। সুতরাং সাহিত্যিক সাহচর্যে ভ্রমণ যে সরস হইবে ইহা কল্পনা করিয়া মনে মনে আনন্দ হইল। আরও আনন্দ হইল এই ভাবিয়া যে বিরোধী দলের সদস্যগণ এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে বিরোধিতারও তিক্ত সমালোচনার তীক্ষ্মাস্ত্র তূণে তুলিয়া রাখিয়া প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অস্ত্রে সরকার পক্ষের সদস্যগণকে জয় করিবেন, উভয়পক্ষ অন্ততঃ কয়দিন প্রাণখোলা হাসি ও অনাবিল আনন্দের মধ্যে কাটাইবেন। এই দলের নেতৃত্ব করিলেন সেচ-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। আগষ্ট বিপ্লবের অন্যতম নায়ক, ভারতে বৃটীশ সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আপাত-কঠোর অজয়বাবুর অন্তরের অন্তস্থলে যে বন্ধুবাৎসল্য, প্রীতি ও আতিথেয়তার কোমল বৃত্তির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিতা—তাঁহার অতি নিকটে যাঁহারা না আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে উহা ছিল এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভ্রমণকালে তিনি সকলকে এই প্রীতির বারিসিঞ্চনে স্নিগ্ধ শীতল করিয়াছেন। সকলেই তাঁহারা মধুর ব্যবহারে হইয়াছেন মুগ্ধ। স্পেশ্যাল ট্রেণটি না ছাড়া পর্যন্ত অজয়বাবু প্রত্যেকের খোঁজ খবর লইয়াছেন, কাহারও আসন খুঁজিয়া পাইতে অসুবিধা হইতেছে কিনা, কোন বয়োবৃদ্ধকে উপরের বার্থ দেওয়া হইয়া থাকিলে তাঁহার বার্থটি বয়ঃকনিষ্ঠের সহিত বিনিময় করাইয়া শয়নের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে কিনা—এই সব তদ্বির তদারকের তাঁহার অন্ত নাই।

রাত্রি প্রায় ১১টায় স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ থামিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম ট্রেণ শ্যামলা বঙ্গভূমি ছাড়িয়া কঙ্করময় বিহারের কোডারমায় পৌঁছিয়াছে। পৌষমাসের ভোর সাড়ে পাঁচটা মানে তখনও অন্ধকার। ইতোমধ্যে অজয়দা ট্রেণের কামরায় কামরায় ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছেন। ভোরের চা-পান সারিয়া প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানাইতেছেন। পূর্ব্বরাত্রে হাওড়ায় রীতিমত গরম বোধ হইতেছিল। দেখিলাম কোডারমায় চারিদিক কুয়াশায় আবৃত ও অল্প অল্প শীতের আমেজ বোধ হইল—যদিও পৌষমাসের পক্ষে এত অল্প শীত স্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়বার চা বা প্রাতরাশের রীতিমত ভূরি ব্যবস্থা। প্রাতরাশ সারিয়া সকাল ৮টায় আমাদের বাসে উঠিয়া দামোদর উপত্যকার তিলাইয়া বাঁধ দেখিতে যাইবার কথা। এখানেও তালিকা অনুযায়ী কাহার কোন্ বাসে সীট পড়িয়াছে জানিয়া বাসে সীট দেখিয়া লইতে হইল যেমন হয় পরীক্ষার হলে। বাসগুলি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের 'বাঘমুখো' চিরপরিচিত বাস—সারি সারি চারিখানি দাঁড়াইয়া আছে। তবে কলিকাতায় এই বাসগুলিতে চড়িলে যেমন পয়সা বাহির করিতে হয়, দাঁড়াইয়া যাইতে হয় অথবা স্থানাভাবে লেডীজ সীটে বসিলে কখন উঠিতে হয় এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাইতে হয় এখানে সেরূপ কোন উৎপাত নাই এই যা ভরসা। আমার যে বাসে সীট পড়িয়াছিল সেখানে দেখি আইন সভার সদস্য অপেক্ষা সাহিত্যিকের সংখ্যা বেশি—সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতীও কেহ কেহ ছিলেন। কাজেই আমার পক্ষে এই ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হইবে বলিয়াই মনে হইল। ইঁহাদের মধ্যে আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধুও ছিলেন। অপর সকলের সহিত ফণীদা (ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) হাওড়ায় ট্রেণে উঠিবার পূর্বে পরিচয় করাইয়া দিতে আদৌ বিলম্ব করেন নাই। আমাদের বাসে যাঁহারা ছিলেন সেই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই বাঙলার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইঁহারা শ্রীসুবোধ ঘোষ, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীসরোজ রায় চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, কবি শ্রীগোপাল ভৌমিক (বর্তমানে সহকারী প্রচার অধিকর্তা), সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতি। ইঁহাদের সান্নিধ্য লাভ কম গৌরবের নয়। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সরস হাস্যপরিহাস সকলের রসপরিবেশনকে ছাপাইয়া যায় এবং তিনি একাই দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিয়াছেন বাসের সহযাত্রীদের সকলকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারায় মগ্ন করিয়া। সাহিত্যিকবৃন্দের হাস্যরসিকতায় আমাদের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে। অবশ্য এই রসিকতার মান বেশ উচ্চ ও সূক্ষ্ম ধরণের বলিয়া সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সাহিত্যরসিক ভিন্ন সকলের পক্ষে উপভোগ করার মতো নহে। এই বাসের যাত্রীরা অধিকাংশই সেই শ্রেণীর ছিলেন ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কবি নরেন দেবও বুড়াবয়সে কম যান না, তিনিও তাঁহার রসের ভাণ্ড উদার হস্তে উজাড় করিয়া রস পরিবেশন করিয়াছেন। এই রসের আসর জমাইতে কেহই কম যান নাই, এমন কি প্রবীণ পবিত্রবাবু ও সরোজবাবুও ইহার অংশভাগী হইয়াছেন। আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে এই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর রস বণ্টনের অংশভাগী হওয়া পরম গৌরবের, ইহার স্মৃতি আমার মানসপটে চিরদিনই অঙ্কিত থাকিবে।

প্রায় সকাল ৯টায় আমরা তিলাইয়া পৌঁছিলাম। তিলাইয়ায় বরাকর নদী পাহাড়ের বুক চিরিয়া প্রবাহিতা। পূর্বে এই নদী বাহিয়া বর্ষার জলধারা নিম্নে সমতলভূমির শস্যক্ষেত্র ও গ্রাম প্লাবিত করিত, আর

গ্রীষ্মকালে নদী হইত শীর্ণকায়া ও জলশূন্যা যেমন পার্বত্য নদীর স্বধর্ম। তাই নদীকে পাষাণ-কারায় করা হইয়াছে বন্দী, নদীর বুকে কংক্রীটের বাঁধ দিয়া নদীর জলধারাকে করা হইয়াছে রুদ্ধ। নদীর উভয় তীরে পাহাড়ের প্রাকৃতিক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে ; ইহাতে এই সুবিধা হইয়াছে যে শুধু নদীবক্ষটুকুতে কংক্রীটের প্রাচীর তুলিতে হইয়াছে নদীগর্ভ হইতে। বাকি কাজ সারিয়াছে নদীতীরের দুই দিকের পাহাড়ের প্রাচীর। ফলে নদীর এক কূল হইতে অপর কূল পর্যন্ত নদীবক্ষব্যাপী দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের ব্যয় অনেক বাঁচিয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সব বিচার করিয়াই ইঞ্জিনিয়ারগণ এই স্থানটি নির্বাচন করিয়াছেন ইহা বলাই বাহুল্য। খরস্রোতা পার্বত্য নদীর মাঝামাঝি হঠাৎ এক প্রাচীর নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া দেওয়ায় নদীর উপরের দিকের জলধারা নিম্নে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া দুই কূল উপছাইয়া পড়িয়াছে, উপর দিকের দুই কূলের গ্রাম ভাসাইয়া দিয়া একটি হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের অবশ্য পূর্ব হইতেই সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া উক্ত হ্রদের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হ্রদটিতে এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই হ্রদের মধ্যে পাহাড়ের চূড়া দ্বীপের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, অনেকটা বোম্বাইএর এলিফ্যান্টা পাহাড়ের ন্যায়। বিশেষ করিয়া যখন স্টীমলঞ্চে করিয়া হ্রদটি একবার ঘুরিয়া আসিলাম তখন বোম্বাইএর 'গেট অব ইণ্ডিয়া' থেকে এলিফ্যান্টা দ্বীপে স্টীমলঞ্চযোগে সমুদ্র-ভ্রমণের স্মৃতি মনে পড়িল। হ্রদটি ৩২ বর্গ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত, আর ৭৯ ফুট গভীর বলিয়া শুনিলাম। এই হ্রদটি তিলাইয়া বাঁধের জলাধার (reservoir)। ইহার দরজা খুলিয়া ইচ্ছামত জল ছাড়া ও বন্ধ করা হইয়া থাকে। এই হ্রদে মৎস্যের চাষও করা হইতেছে শুনিলাম। বাঁধের নিম্নদেশে নদীবক্ষেরও নীচে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। আমাদিগকে ইহার বিভিন্ন বিভাগ ও কার্য বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ১২টির মধ্যে ৪টি গেট খুলিয়া আমাদিগকে উন্মুক্ত জলধারা দেখানো হইল। প্রচণ্ড গর্জন করিয়া প্রবলবেগে জলধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া বাঁধের অপর পার্শ্বে নদীবক্ষে উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া ফেনিল উচ্ছ্বাসে গর্জিয়া ফুঁসিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। এই দৃশ্য অতি মনোহর। নির্ঝরের ন্যায় এই জলধারা যেন পাষাণকারা ভাঙ্গিয়া পৃথিবীকে ভাসাইয়া তাহার করুণাধারা সিঞ্চনে শস্যশ্যামলা করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কবির ভাষায় ইহা যেন বলিতেছে—

"আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"

অতঃপর আমরা তিলাইয়া ডাকবাংলোর মনোরম প্রাঙ্গণে অধিকতর মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে—পাহাড়, নদী ও নয়নমনোহর ডালিয়াগুচ্ছের পটভূমিকায় শীতের মিষ্ট রৌদ্রকিরণে মেঘমুক্ত নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে বসিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম।

আহারান্তে বেলা ২টায় আমরা বাসে করিয়া কোনার অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে তিলাইয়া অঞ্চলের উৎখাত গ্রামবাসীদের 'পুনর্বসতি গ্রাম' পাঞ্চমাধো দেখিলাম। খোলার চালের গৃহগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছাত্রগণ হিন্দী গান গাহিতে গাহিতে চরকা কাটিতেছে। কোন শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ডে হিন্দী অক্ষরে পাঠ লেখা আছে ছাত্রগণ দেখিয়া দেখিয়া শ্লেটে লিখিতেছে। গ্রামবাসিগণের অবস্থা জানিবার আগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। কোন কোন বক্তুর ছিদ্র অন্বেষণের অত্যুৎসাহ দেখা গেল। এই সব অঞ্চলে জলাভাব দৃষ্টিগোচর হইল, চারিদিকে ধরিত্রীর রুক্ষ মূর্তি। যদিও বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের চাষীরা পাহাড়ের বুকেই সোনা ফলায়—তাহা তাহাদের একমাত্র শ্রমের গুণেই, অন্য কারণে নহে।

পাঞ্চমাধো হইতে হাজারিবাগ রোড হইয়া আমরা কোনার পৌঁছিলাম সন্ধ্যার কিছু আগে। এখানে দামোদরের শাখা কোনার নদীর উপর বাঁধ তিলাইয়ার চেয়ে অনেক বড়, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায়। ইহাও সেই একই রীতিতে নির্মিত, তবে তিলাইয়ায় যেমন নদীর উভয়তীরে পাহাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধের সুবিধা পাওয়া গিয়াছে এখানে সে সুবিধা নাই, মাটির বাঁধ বিরাটাকারে নির্মিত হইতেছে। নদীবক্ষে অবশ্য কংক্রীটের বাঁধ। ঐ মাটির বাঁধ নির্মাণের জন্য মাটি কাটা হইতেছে যে যন্ত্রটির সাহায্যে তাহা এক অতিকায় দানববিশেষের ন্যায়। একধারে উহা বিরাট মুখব্যাদান করিয়া প্রবল গর্জন করিতে করিতে একই সঙ্গে মাটি কাটিতেছে, মুখ বন্ধ করিয়া মাটির বড় বড় চাঙড় মুখের মধ্যে লইয়া নাড়িয়া ঝাঁকিয়া মাটিগুলি আলগা করিতেছে এবং পুনরায় হাঁ করিয়া মাটির রাশি উদ্গীরণ করিয়া নিম্নে লরীতে বোঝাই করিতেছে। লরী একটার পর একটা দ্রুত মাটি সরাইয়া লইয়া গিয়া বাঁধে স্তূপীকৃত করিতেছে। অপরদিকে আর এক অতিকায় যন্ত্রদানব মড়্ মড়্ করিয়া বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া একই সঙ্গে বন পরিষ্কার ও মাটি সমতল করিয়া চলিতেছে দেখিলাম। ছোট গাছপালা আমরা সর্বদা ভাঙ্গি কাটি, কিন্তু বিরাট মহীরুহকে মনে মনে যেন সম্ভ্রম করিয়া থাকি। সেই মহীরুহের যন্ত্রতলে নিমেষে পতন ও ধ্বংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকের হৃদয় বিশেষ করিয়া নারীহৃদয় যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। কোনার বাঁধের উদ্দেশ্যও তিলাইয়ার ন্যায় মূলতঃ বন্যানিবারণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। বর্তমানে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র 'পাতালপুরী'তে নির্মাণ করিয়া রাখা হইতেছে, উৎপাদনকার্য আপাততঃ এখনই আরম্ভ হইবে না—কারণ ইতোমধ্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ও বোকারো তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা কাজে লাগিবার পর আরও চাহিদা থাকিলে কোনারের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে কাজ আরম্ভ হইবে। এক্ষণে উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত থাকিবে বটে তবে অপচয় করা হইবে না বলিয়া শুনিলাম।

কোনার বাঁধের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে দেখিলাম। পূর্বেই বৃক্ষ উৎপাটন, মৃত্তিকা কর্তন ও স্তূপীকরণের কথা বলিয়াছি। ইহা

ছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে পাথর চূর্ণ করা, সিমেন্ট ও প্রস্তরখণ্ড মিশাইয়া কংক্রীট ঢালাইএর মশলা প্রস্তুত করা এবং ছোট ছোট রেললাইনে রেলযোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া, কপিকলে বাঁধের উপরে তোলা, বৈদ্যুতিক আগুনে লোহা কাটা প্রভৃতি কাজগুলি চলিতেছে। হাজার হাজার শ্রমিক ও যন্ত্র মিলিয়া সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন চলিতেছে। তিলাইয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে—সেই সৃষ্টি দেখিয়া মনে আনন্দ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে বিরাট কাজ সৃষ্টির পথে তাহার কর্মচাঞ্চল্য যেন মনকে আরও নাড়া দেয়, চিত্তকে আরও আকৃষ্ট করে। তাই আমাদের বিরাট পরিদর্শকদল নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এক একটি কাজের চারিধারে ভীড় করিয়াছে। উৎসাহের প্রাবল্যে কেহ কেহ বাঁধের নির্ণীয়মান শীর্ষে মই বাহিয়া উঠিয়া গিয়াছেন। কোন কোন উৎসাহী সদস্য আবার বাঁধের নিম্নদেশে এমন কি নদীবক্ষ হইতেও নিম্নে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহের নিকটে নামিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ মালবাহী লিলিপুটিয়ান ট্রেণের ইঞ্জিনের পা-দানীতে দাঁড়াইয়া চলিয়াছেন এইরূপ কত কী! কী উৎসাহ, কী আনন্দ এই শিক্ষা ভ্রমণের! কোনার বাঁধ হইতে ফিরিবার পথে জনৈক রসিক সদস্য জনৈকা সদস্যাকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের কাহাকেও নাকি অবশেষে ঝুড়ি করিয়া ক্রেণের সাহায্যে বাঁধের উপর হইতে নামাইতে হইয়াছিল? তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। মহিলারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, না, না, না।

কোনারে চা-পান করিয়া সন্ধ্যা ৬টায় বাসযোগে আমরা বোকারো অভিমুখে রওনা হইলাম। অসমতল ও সরীসৃপের ন্যায় পার্বত্যপথে সন্ধানী আলোমুখে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া বাস ছুটিল। রাত্রি ৭টা নাগাদ বোকারোর বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল অতিথিশালায় পৌঁছিলাম। শীতের সন্ধ্যা ৭টা রাত্রি বৈ কি। এখানেও অন্যান্য বাঁধ অঞ্চলের ন্যায় নির্জন অরণ্য-অঞ্চল বসতি-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে, সারি সারি কর্মিগৃহে বিজলী-দীপমালা রহিয়াছে। তাহারই মাঝে অতিথিশালাটি অতি মনোরম। দেশবিদেশের অতিথিগণের থাকিবার উপযোগী করিয়া নির্মিত হইয়াছে। বোকারোতে পৌঁছিয়া আমাদের মধ্যে অনেকে সামান্য অসুস্থবোধ করিতে লাগিলেন। কোনার হইতে বোকারোর পথটি বড়ই আঁকা বাঁকা ও বন্ধুর এই কারণে অথবা একদিনে কর্মসূচির অত্যধিক চাপের দরুণ এই অসুস্থতা হইতে পারে। আমাদের পূর্ববর্তী পরিদর্শকদল যাহা ৪দিনে দেখিয়াছিলেন আমাদের তাহা ৩দিনে দেখাবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। একটু বিশ্রাম লইয়া আমরা কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট কারখানা দেখিতে গেলাম। তখন যদিও রাত্রি কিন্তু রাত্রিতে দিন সৃষ্টি করা হইয়াছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায়। সুতরাং আলোকোদ্ভাসিত বোকারো-তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার প্রত্যেকটি অংশ দেখিতে আমাদের যে কোন অসুবিধাই হইল না ইহা বলাই বাহুল্য। তিলাইয়া, কোনার প্রভৃতি বাঁধে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে তাহাও বোকারো হইয়া বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। শুনা গেল বোকারোতে দৈনিক যত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে ততটা উৎপাদন করা হইতেছে না—বর্তমানে প্রয়োজন না থাকায়। সিন্ধরীও এখান হইতে বর্তমানে রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চল, লয়াবাদ, মাইথন ও চিত্তরঞ্জনে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে এবং জামসেদপুর, ঘাটশিলা, খড়্গপুর ও পরে কলিকাতাকে বৈদ্যুতী-করণের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গেল। ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন—এখানে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়, যে কয়লা জ্বালানির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না তাহা হইতে হয়। তিনি আরও বলিলেন—ভাল কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অর্থ জাতীয় সম্পদের অপচয়। তাই যত শীঘ্র অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ভাল কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা যায় ততই মঙ্গল। বোকারোতেও একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এখানকার জলাধারের জল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বাঁধটিও বন্যানিবারণ করিবে। বোকারোর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গৃহের ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিরাটত্ব আমাদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছে। এইগুলি স্বচক্ষে না দেখিলে কি বিরাট কর্মের আয়োজন ও কি বিপুল কর্মোন্মাদনা তাহা উপলব্ধি করা সত্যই কঠিন। এখানকার বাঁধের কয়েকটি দরজা খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে বিদ্যুৎ-কিরণমালাশোভিত জলপ্রপাতের নয়ন-মনোহর দৃশ্য দেখানো হইল। বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার প্রবেশপথের উর্দ্ধে প্রাচীর-গাত্রে কাচের সার্শির উপর সুন্দর ফ্রেস্কো পেন্টিং দেখিয়া মনে হইল এখানে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুরা এ কয়দিন কেবল কল আর কারখানা, ইঞ্জিন ও যন্ত্র, সর্বত্র 'বিপজ্জনক', 'সাবধান' লেখা দেখিয়া দেখিয়া বুঝি বা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখানে চিত্রকলার সৌন্দর্য দেখিয়া যেন তাঁহাদের ধড়ে প্রাণ আসিল। রাত্রি ১০টায় আহারাদিসম্পন্ন করিয়া আমরা ট্রেণে চাপিলাম। সর্বত্র আমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা স্পেশাল ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দিষ্ট কামরায়, নচেৎ এতগুলি লোককে শীতকালে শুইবার জায়গা দিবে কে?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি আমরা ধানবাদে—প্রাতরাশ সমাপনান্তে ট্রেণ ছাড়িয়া পুনরায় উঠিলাম ষ্টেটবাসে। ধানবাদ হইতে ঝরিয়ার মধ্য দিয়া একেবারে সিন্ধ্রী পৌঁছিলাম। দূরে পরেশনাথ পাহাড়ের সূর্যকরোজ্জ্বল চূড়া যেন মেঘের গায়ে বিজলীরেখার ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে দেখিতে দেখিতে গেলাম। পাহাড়, অরণ্য, নদী—প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কলিয়ারীর কপিকল মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইহারই মাঝে আর এক যন্ত্রদানবের রাজত্ব সিন্ধ্রী। যন্ত্রদানব প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া তাহাকে ধ্বংসের কার্যে অথবা কল্যাণ সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত করিতে পারে। দামোদর উপত্যকায় প্রকৃতিকে মানব কল্যাণ-সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। বোকারোর বা কোনারের যন্ত্রপাতির বিরাটত্ব ও ভীষণত্বের কথা বলিয়াছি। সিন্ধ্রীর যন্ত্রপাতিও উহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় না। সিন্ধ্রী এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম সারপ্রস্তুত কারখানা।

সিন্ধ্রী সার কারখানা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। বিদ্যুৎ উৎ-

পাদন কারখানা, গ্যাস-উৎপাদন কারখানা, এমোনিয়ম উৎপাদন কারখানা এবং সালফেট উৎপাদন কারখানা লইয়া সমগ্র সিন্ধ্রী কারখানা। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা এখানকার বিভিন্ন বিভাগের কাজে লাগিয়াও দামোদর উপত্যকা বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। এখানে প্রতিদিন ১০০০ টন এমোনিয়ম সালফেট উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রত্যহ ৯০০ টন খড়ির স্থায় একরূপ পদার্থ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বাহিরে স্তূপীকৃত করা হইতেছে। ইহা নাকি সিমেন্টের কারখানার পক্ষে প্রয়োজনীয়। নিকটেই একটি সিমেন্টের কারখানা হইতেছে বলিয়া আমরা শুনিলাম। বিভিন্ন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নল ও পাত্র দিয়া গ্যাস ও তরল রাসায়নিক পদার্থকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চিনির মতো সাদা দানা-বিশিষ্ট পদার্থে পরিণত করা হইতেছে। ইহাই এমোনিয়ম সালফেট সার। বর্তমানে ইহা দেশের বিভিন্ন সহর ও পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গত ফসলের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক পরিকল্পনা করিয়া নগদ অথবা একমণ সারে দেড় মণ ধান হিসাবে ঋণ স্বরূপ চাষীদের মধ্যে এই সার বণ্টন করিয়াছিলেন। যাহারা নগদ টাকা দিতে পারিবে না তাহারা ধান উঠিলে ধান দিয়াও ঋণ শোধ দিতে পারিবে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গে গতবার ভাল ধান হওয়ার অন্যতম কারণ এই বৈজ্ঞানিক সার কৃষকগণ কর্তৃক বহুল ব্যবহার। অবশ্য এই সারের সহিত ধঞ্চে জাতীয় সবুজ সার যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহারা ফল খুবই ভাল পাইয়াছে। সিন্ধ্রী কারখানার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সার সংরক্ষণের বিরাট গুদাম, যান্ত্রিক উপায়ে সার বস্তাবন্দী করা—মালগাড়ীর বড় বড় ওয়াগান ক্রেণের সাহায্যে ইচ্ছামত নির্দিষ্টস্থানে লইয়া আসিয়া মাল বোঝাই করা ও যথাস্থানে লইয়া গিয়া লাইনে বসাইয়া দেওয়া। কলের সাহায্যে প্রতিদিন ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার বস্তা ভর্তি করা, ওজন করা ও সেলাই করার ব্যবস্থা আছে। গুদামটির বিশেষত্ব হইতেছে ইহার সমগ্র ছাদ কংক্রীটের খিলানের এবং দৈর্ঘ্যে ½ মাইল, প্রস্থে ১৫০ ফিট এবং উচ্চতায় ৯০ ফিট। ইহাতে ৯০ হাজার টন সার রাখা যাইতে পারে এবং যাহাতে সার জমাট বাঁধিয়া না যায় সেজন্য ভিতরের বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত। এই সিন্ধ্রী কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া চিত্তরঞ্জনের স্থায় এক মনোরম নগর গড়িয়া উঠিতেছে দেখিলাম। এখানে আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক কারখানা নির্মিত হইতেছে। কয়লা হইতে অতিরিক্ত যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে যথা, আলকাতরা, ফিনাইল, ন্যাপথলিন, সুগন্ধি প্রভৃতির কারখানা হইতেছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনে যে সিন্ধ্রীও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিতে চলিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সিন্ধ্রী দেখিয়া আমরা পুনরায় বাসে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিলাম এবং যেপথে গিয়াছিলাম সেই পথেই ধানবাদ হইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া বরাবর বাসে বাঙলার সীমান্তে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেট বাঁধ নির্মাণ-স্থানে পৌছিলাম। এই বাঁধটি দামোদরের উপর এবং পঞ্চকোট পাহাড়ের সান্নুদেশে অবস্থিত। দামোদরের বুকে কংক্রীটের বাঁধ বাঁধিয়া পাশ দিয়া খাল কাটা হইতেছে। এই বাঁধের উদ্দেশ্যও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচন। এই বাঁধ নির্মাণ কার্য অন্যান্য বাঁধের স্থায় একই প্রকার, নূতনত্ব কিছু চোখে পড়িল না। এখানকার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপার্থসারথির সহিত আমার গত বৎসর দুর্গাপুরে আলাপ হইয়াছিল। ইনি সকলকে সমগ্র দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্চেট বাঁধের ইতিহাস সংক্ষেপে অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

পাঞ্চেট বাঁধ হইতে আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া বরাকর নদীর তীরে মাইথন বাঁধ নির্মাণ স্থানে বাসযোগে পৌছিলাম। মিহিজাম ও চিত্তরঞ্জন হইতে ইহা বেশি দূরে নয়। মাইথনে পৌছিলাম যখন তখন সন্ধ্যা সমাগত। চা পান সারিয়া আমরা বাঁধের মডেল দেখিয়া বাঁধ নির্মাণ স্থানে গেলাম। বিজলী বাতিতে সমগ্র এলাকা দিবালোকের স্থায় প্রতিভাত হইল। শত শত শ্রমিক অবিরামগতিতে দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছে। যন্ত্রদানবও এখানে সমান তালে গর্জন করিয়া কর্মোন্মাদনায় মত্ত। কর্মপদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি এখানে সেই একই প্রকার। এখানকার বিশেষত্ব হইতেছে বরাকর নদীর বুকে যথারীতি বাঁধ বাঁধিয়া উদ্বৃত্ত জলধারা খাল কাটিয়া প্রবাহিত করা হইতেছে এবং এই জলধারা পাহাড় কাটিয়া টানেলের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় ভারতের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পাহাড় ভেদ করিয়া জলধারা ঘুরাইয়া দেওয়া অন্য দেশে হইলে আমরা ঢক্কানিনাদে তাহার মহিমাপ্রচারে মত্ত হইয়া থাকি, আর আমাদের দেশের স্থপতিগণ যতই কৃতিত্বের পরিচয় দেন না কেন তাহার প্রশংসা করা দূরের কথা, তাহার ছিদ্রান্বেষণের ধুম পড়িয়া যায়। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য! নৈশভোজন সারিয়া এবার আমাদের বাসে উঠিয়া বরাকর ষ্টেশনে পৌছানোর পালা। যে মাইথন হইতে চিত্তরঞ্জন ৫।৬ মাইলের পথ সেই পথ ট্রেণে মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা প্রদর্শনের স্থায় সারারাত্র ধরিয়া অতিক্রম করিতে হইল। রাত্রিতে নিদ্রার সুবিধার জন্যই এই বিচিত্র ব্যবস্থা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, ভোরবেলায় আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটি চিত্তরঞ্জন উপনগরে পৌছিল।

চিত্তরঞ্জনে আমি ৮ মাস পূর্বে আসিয়াছিলাম। তাই এখানে অপর সকলের স্থায় নূতনত্বের আকর্ষণ আমার ততটা ছিল না। তথাপি এই বিরাট সৃষ্টিযজ্ঞ পুনরায় দেখিবার আগ্রহ আদৌ হ্রাস পায় নাই। বিশেষ করিয়া আমি পূর্বে যেদিন আসিয়াছিলাম সেদিন রবিবার থাকায় চিত্তরঞ্জন উপনগরের আর সব দেখিলেও কর্মরত কারখানার কর্মচাঞ্চল্য সম্পূর্ণ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। এইবার তার এই দৃশ্য না দেখিলে চিত্তরঞ্জন দেখা আমার অপূর্ণ থাকিয়াই যাইত। চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন-নির্মাণ কারখানায় ইঞ্জিনের শতকরা ৭৫ ভাগ অংশ নানারূপ মেসিনে নানা বিভাগে আমাদের দেশের কারিগরগণ নির্মাণ করিতেছেন। বিরাটত্বের দিক দিয়া যেমন, সূক্ষ্ম কাজের দিক দিয়া তেমনই বিভিন্ন মেসিন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আজ পর্যন্ত এই কারখানায় একশত খানি ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে। আমরা যেদিন চিত্তরঞ্জনে গিয়াছিলাম তারপর দিন এখানে শততম ইঞ্জিন নির্মাণ উপলক্ষে উৎসব হইবে

শুনিলাম। সেই শততম ইঞ্জিনখানি পরে কল্যাণীতে প্রদর্শিত হইল। চিত্তরঞ্জন একটি সুপরিকল্পিত উপনগর। ইহার প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ, দুই ধারে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী,৫টি কলোনীতে বিভক্ত উপনগরের প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিপণিসমেত সমগ্র উপনগরটি ছবির ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা ছাড়া সমগ্র উপনগরের একটি আধুনিক হাসপাতাল, উচ্চ বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, সাধারণ সংস্কৃতিকেন্দ্র, লেক, পাহাড়, মলমূত্রাদি বিশুদ্ধীকরণের রাসায়নিক ব্যবস্থা, উপনগরের পাদদেশে অজয় নদ—সবগুলি মিলিয়া চিত্তরঞ্জনকে এক স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হয়। উপনগর ও কারখানা ঘুরিয়া দেখিয়া আমরা একটি অনাড়ম্বর ও পবিত্র অনুষ্ঠানে মিলিত হইলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবক্ষ মর্মর মূর্তির পাদদেশে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্ত। আমাদের সকলের পক্ষ হইতে সেচ-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মূর্তিতে মাল্যদান করিলেন। আহারান্তে আমরা চিত্তরঞ্জন হইতে বিদায় লইলাম। চিত্তরঞ্জনের কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তায় সেবায় যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবারও আমরা সকলেই তাঁহাদের আদর যত্নে ও আন্তরিকতায় অভিভূত হইয়াছি। বাসে করিয়া আমরা পথে সীতারামপুরে কেবল ফ্যাক্টরী (Cable Factory) দেখিয়া সোজা বাঙলা দেশের অন্তর্গত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণস্থলে পৌছিলাম।

দুর্গাপুরে যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যাদেবী অন্ধকারের ঘোমটা টানিয়া দিয়াছেন। বৈদ্যুতিক দীপমালায় দুর্গাপুরের বনস্থল আলোকোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। দুর্গাপুরে আমি পূর্বে একবার আসিয়াছিলাম। তখন কাজ সবে সুরু হইয়াছিল। আজ চেহারা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে যেখানে ছিল অরণ্যানী, ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল—সেস্থান আজ বৈদ্যুতিক দীপালোকিত ম্যালেরিয়া-নির্বাসিত লোকবসতিপূর্ণ। দামোদরের বক্ষ চিরিয়া পাষাণ প্রাচীর তুলিয়া জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। বাঁধের জলাধার হইতে খাল কাটিয়া সেচ ও নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা হইতেছে। এই নাব্য খাল দিয়া কয়লাখনি অঞ্চল হইতে কলিকাতা বন্দরে ভাগীরথীর মাধ্যমে মাল চলাচল করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া বহু ছোট ছোট সেচ-খাল ও জলনিষ্কাশন খাল দ্বারা কৃষির প্রভূত উন্নতি হইবে। দামোদর উপত্যকার অন্যান্য বাঁধের জল দুর্গাপুরে সঞ্চিত করিয়া নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন খাল দিয়া প্রবাহিত করা হইবে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী জেলা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। দুর্গাপুরে বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কার্যের পদ্ধতি একই প্রকার। এখানকার সেচ ও নাব্য খালের বিশেষত্ব পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত বন্যা নিবারণ ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। দুর্গাপুর দেখিয়া আমরা ট্রেণে চড়িলাম। নিজ নিজ কামরায় চা-পান সারিয়া লইতে লইতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তিন দিবসব্যাপী ভ্রমণের পর রাত্রি ১০॥০ টায় হাওড়ায় পৌছিলাম।

নবভারতের অন্যতম তীর্থস্থান দামোদর উপত্যকায় কয়দিন ভ্রমণে যেমন আমরা ভ্রমণের আনন্দলাভ করিলাম তেমনই এখানে যে নবভারত জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া গর্ববোধ করিলাম। ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইবে না এমন নহে, তবে এই পরিকল্পনার বিরাটত্ব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ এদেশে ইহাই প্রথম—এই কথা বিবেচনা করিলে ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয় ও নগণ্য বলিয়াই মনে হইবে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এবং এই উপত্যকায় সিন্ধ্রী সার কারখানা ও চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার বিরাটত্ব ও মহান্ সম্ভাবনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিবেন তাঁহাদের মানসচক্ষে বিরাট সম্ভাবনাময় নূতন ও মহান্ ভারতের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি আমাদের দলে বিরোধীপক্ষের যে সব কঠোর সমালোচক ছিলেন তাঁহাদের অনেকে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সমক্ষে ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে দেশ কি ভাবে উপকৃত হইবে, কি পরিমাণ সম্পদ্ সৃষ্টি হইবে তাহার হিসাব লইলে ক্ষান্ত হইবে সকল মুখরভাষণ। ইহা বন্যানিবারণ করিয়া হাজার হাজার একর জমির শস্য রক্ষা করিবে, ১০ লক্ষ একরের অধিক জমিতে চিরকাল জলসেচন করিবে, ন্যূনপক্ষে ৫৬ লক্ষ মণ চাউল ও ৩৬ লক্ষ মণ রবিশস্য উৎপাদনে সাহায্য করিবে। ইহার ৯০ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া মাল চলাচল করিলে মালগাড়ীর জন্য ভীড় কমিবে। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে বোকারো তাপজবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ১৫০০০০ কিলোওয়াট, তিলায়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ৪০০০ কিলোয়াট, কোনার হইতে ৪০০০০ কিলোওয়াট, মাইথন হইতে ৬০০০০০ কিলোয়াট এবং পাঞ্চেট ৪০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ইহাতে পশ্চিমে রামগড় হইতে পূর্বে বর্ধমান ও খড়্গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে এবং বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলে এখান হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইতে পারিবে। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই পরিকল্পনা হইতে যে সম্পদ্ সৃষ্টি হইবে তাহা ৩৮ কোটি টাকার মতো। শিল্পের সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে এই পরিকল্পনার সম্ভাবনা আরও গুরুত্বপূর্ণ। দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের সদস্য শ্রীপি, পি, বর্মার ভাষায় এই পরিকল্পনার কাজ সম্পদ্ সৃষ্টি, লাভ সৃষ্টি নয়—"The Damodar Valley scheme is a wealth-producing and not a profit-making scheme." তিনি আরও বলিয়াছেন, * * * The potentialities of the industrial development of the valley are tremendous. And they have to be Fully exploited in order to build up a new India" অর্থাৎ "এই উপত্যকা পরিকল্পনার শিল্পপ্রসার ও উন্নতির সম্ভাবনা বিরাট এবং এই সম্ভাবনাকে আমাদের নবভারত রচনার কাজে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।" আমাদের আশার ও আনন্দের কথা এই সম্ভাবনা নবভারত গঠনের কাজেই প্রযুক্ত হইতেছে এবং নূতন ভারত এখানে জন্মলাভ করিয়া ইহাকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে। তিলায়া বাঁধ ও বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যে কথা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন—"A new India was being born in this valley as in other places where river valley projects were being taken up. That new India was the India of our dreams for which millions had shed their blood, the new India where the people would have enough work and enough to eat. "অর্থাৎ" এই উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে যেখানে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে সেখানে নবভারত জন্মগ্রহণ করিতেছে। সেই ভারত জন্মগ্রহণ করিতেছে যে ভারত ছিল আমাদের স্বপ্নের ভারত, যে ভারতের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদের বুকের রক্ত দিয়াছে এবং যে ভারতে লোকে পর্যাপ্ত কাজ পাইবে ও পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।"

মানপত্র

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাট্যচিত্র)

একটি শিক্ষায় অনগ্রসর গ্রামের হাই ইস্কুলের খড়ে-ছাওয়া বেড়ার ঘরের ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস। তিনটি কুঠরি ; তার একটিতে থাকেন সহকারী শিক্ষক ৫২।৫৩ বৎসর বয়স্ক বসন্তবাবু ও অপর দুইটিতে আট দশটি ছাত্র থাকে। বোর্ডিংএর উঠানে কয়েকটি সব্জীগাছ, দুই চারিটি ফুলের গাছও রহিয়াছে। রবিবার বিকেলবেলা। বোর্ডিংএর পাচক ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক বলরাম রান্নাঘরে রাত্রের রান্নার ব্যবস্থা করিতেছে। বসন্তবাবু তাঁহার কক্ষের বাহিরে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। এমন সময় আধময়লা কাপড় ও ফতুয়াপরা প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল

বসন্ত। (মুখ তুলে) কাকে চান ?

বৃদ্ধ। (নমস্কার করে কাঁচুমাঁচু হয়ে) হেডমাস্টরের কাছে এসেছিলাম। তিনি কি নেই ?

বসন্ত। আজ ছুটী, বাড়ী গেলেন তিনি। কি দরকার ?

বৃদ্ধ। (এগিয়ে এসে) দরকার এমন কিছু লয়, তবে কিনা—

বসন্ত। বলতে বাধা না থাকে তো বলুন। না হলে কাল তাঁর কাছেই বলবেন।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, বাধা আর কি ! মাস্টরমশয় বলে কথা, গুরুতুল্যি লোক। আপনার কাছে বলবনি তো বলব কার কাছে !

বসন্ত। বেশ তাহলে বলুন।

বৃদ্ধ। কথাটা হচ্ছে কিনা আজ্ঞে—(মাথা চুলকে) এই আমার ছোট ছেলেটা—ওই যে মোহনে, মোহন রঙ গো ?

বসন্ত। (একটু জোরে) বলরাম !

বলরাম ভিতর থেকে উত্তর দিল, আজ্ঞে যাই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল বলরাম

বলরাম, তুমি এঁকে চেন নাকি ?

বলরাম। আজ্ঞে না। মুরুব্বি, তোমার বাড়ী কুথা ?

বৃদ্ধ। এই শ্যামসুখাতেই বাড়ী।

বলরাম। তাই বল। আমি চাষবাড়ের লোক, আমি আর এখেনের সব্বাইকে চিনব কি করে ! তবে হত [illegible] চাষবাড়ের লোক, তিলেকে চিনে ফেলতুম।

বৃদ্ধ। আমাকে না চেন, আমার ছেলাটাকে নি[illegible] চিনবে—মোহনে, মোহন রঙ।

বলরাম। ও—অ, তাই বল, মোহনে। কেলাস সেভে[illegible] পড়ে। ফাস্টো কেলাস অ্যাক্টো করে মাস্টারমশাই। [illegible] উ বছর যখন জয়কুঁড়ের দল যাত্রা করতে গেল না চাষবা[illegible] এমন উর্ম্মিলার পাট করল মোহনে যে লোকে হু হু ক[illegible] কাঁদতে লাগল। আমাদের ওখানকার পেট্রোলবাবু বল[illegible] কিনা, একটা মেডাল দুবো।

বৃদ্ধ। হতভাগার ওই যাত্রাই কাল করেছে মাস্ট[illegible] মশয়। লেখাপড়ি নেই, সংসারের কাজকম্মো নেই, [illegible] যাত্রা আর যাত্রা।

বলরাম। অদ্ধেক দিন তো ইস্কুলই আসেনি মোহনে[illegible] তা কি কচ্ছে সে ? ডিঙ্গি বাইছে বুঝি ?

বৃদ্ধ। পোড়া কপাল আমার, ডিঙি বাইবে সে[illegible] তা'লে তো দুপয়সা আসত ঘরে।

বসন্ত। ডিঙ্গি নিয়ে কি হয়—মাছ ধরা ?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, মাছ ধরা তেমন না হলেও এই বর্ষাকাল পাঁজারী মেয়েদের ঘাঁটালের বাজারে নিয়ে যাই, দোকানী দের মালপত্তর আনি।

বলরাম। এবার আপনার দুধটা আনতে যাই গয়লার কাছে দুধ দুইবার সময় না দাঁড়ালেই জল দিবে যাই বলুন মাস্টারমশায়, চাষবাড়ের মত দুধ আপনি ভূভার[illegible] পাবেননি—দুধ নয় যেন বটের আঠা।

বৃদ্ধ একটু মুচকি হাসল

হাসলে মুরুব্বি ! যত ভালই বল না কেন তোমাদের গাঁয়ে দুধটি আর মাছটি চক্ষে দেখতে পাওয়া যাবেনি। কি দি[illegible] যে মাস্টারমশায়রা খান, তার ঠিক নেই।

বৃদ্ধ। সব গেরামই এক বাবাধন—কোথাও মা[illegible] পাবেনি, দুধ পাবেনি। ভাল জিনিষের আকাল হয়েছে।

বসন্ত। বলরাম, এঁকে ভেতর থেকে টিনের চেয়ারটা বার করে দাও তো।

বৃদ্ধ। (ঈষৎ লজ্জিত হয়ে) থাক, থাক বাবা, চেয়ারে আর দরকার নেই, আমি এখানেই বসছি।

বলে দাওয়ায় বসতে গেল

বলরাম। (তাড়াতাড়ি একটা তালপাতার চ্যাটা এনে দিয়ে) শুধু ভুঁয়ে বসবেন! বসুন এতে।

বৃদ্ধ। (চ্যাটায় বসে) মাস্টরমশয় গুরুতুল্যি লোক, তাঁর সুমুখে ভুঁয়েই বা বসলম বাবা।

বলরাম। এবার যাই মাস্টরমশায়, দুধটা নিয়ে আসি।

বলরাম বেরিয়ে গেল

বসন্ত। আপনার দরকারটা কি এবার বলুন।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, কথাটা হচ্ছে কি, মোহনে তো আর ইস্কুলে আসতে চাইছেনি। বললম, সামনে উঠোউঠির পরীক্ষা, এটা দে তুই, না'লে লোকের কাছে কি বলি আমি। তা কে শোনে কার কথা! পনের বছরের ছেলা, ঠাঙাব না বেড্ডাব বলুন।

বসন্ত। না, না, এত বড় ছেলে, ঠাঙালে আরও বেহেট হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ। তা'লেই বল মাস্টরমশায়, কি করি আমি। লেখাছেলারা লেখাপড়ি শিখছে, আর তুই বেটা একট জুয়ান মদ্দ, মুখ্যু হয়ে থাকবি!

বসন্ত। আচ্ছা কাল তাকে ইস্কুলে নিয়ে আসুন, দেখি কি করতে পারি।

বৃদ্ধ। বুড়ো হয়েছি, কবে চোখ বুজব, তার ঠিক নাই। আরে হতভাগা, তোর দাদারা কি তোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে। যে যার ছেনাপনা নিয়ে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তোকে দেখবে কে! মা বুড়ীটা মরে হাড় জুড়িয়েছে, এ বুড়াটার আর ছুটী নাই মাস্টরবাবু।

বসন্ত। ওই তো বলছি, কাল একবার ইস্কুলে নিয়ে আসুন।

বৃদ্ধ। মোটে সে আসবেনি ইস্কুলে, সে সে-পাত্তরই লয়। বরং বলদটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কেলাসে বসাতে পারবেন, তবু অকে আনতে পারবেন নি ইস্কুলে। তাই সবাই বলছে কি জান মাস্টরমশায়—বলছে, যেমনি ওটা তেঁদোড়, তেমনি ঘাড়ে একটা জুয়াল দিয়ে দাও।

বসন্ত। (ঠিক বুঝতে না পেরে) কি কাজে লাগাতে চান?

বৃদ্ধ। (ইতস্তত করে) আজ্ঞে, কাজে লয়—তবে কিনা ওই—ওর জন্যে একটি বৌ দেখেছি।

বসন্ত। (বিস্মিত হয়ে) সে কি! বিয়ে দেবেন এই বয়েসে!

বৃদ্ধ। বয়েস কম আর কি! পনের পেরিয়ে ষোলয় পড়েছে এই কার্ত্তিকে। তাছাড়া এই ধরুননা, পেটে তো দু আখর গেছে, বৌ আনতে আর পণ লাগবেনি।

বসন্ত। (ব্যাপারটা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করে) সেটা একটা সুবিধের কথা বটে।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, মুখ্যু ছেলাদের বৌ আনতে পঁচিশ গণ্ডা তিরিশ গণ্ডা টাকা লেগে যায়।

বসন্ত। তাহলে তো লেখাপড়া শিখে লাভ আছে?

বৃদ্ধ। তা নেই আবার! কত করে বললম, ওর দাদা শুদ্ধু বুঝাল, এই বড় ইস্কুলের পাশটা কর তুই মোহনে, ঘটি বাটী বিক্রি করে পড়াব তোকে—তা অকে বলাও যা, আর মুড়ো তালগাছটাকে বলাও তা, রা কাড়লেনি।

বসন্ত। বিয়ের কথা শুনে মোহনে কি বললে?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, বিয়া লিয়েই তো গেরো হয়েছে, তাই তো আপনার কাছে এলম।

বসন্ত। তাহলে আসল কথা এখনও বলা হয়নি?

বৃদ্ধ। তাইতো বলতে যাচ্ছি মাস্টরমশায়। মুখ্যু লোক, ভাল করে কথা বলতে পারিনি, চরণে অপরাধ নেবেননি।

হাত জোড় করল

বসন্ত। আচ্ছা আচ্ছা বেশ, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বৃদ্ধ। বলছিলাম কি—

বলরাম প্রবেশ করতে বৃদ্ধ চুপ করে গেল

বলরাম। (কাঁচের গেলাসে দুধ দেখিয়ে) নিয়ে এলুম। (বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে অপর আঙুলগুলির ডগাগুলি স্পর্শ করে) এই এতটুন ঘাটধোয়া জল দিয়েছে।

বসন্ত। বেশ, রাখো'গে যাও।

বলরাম দাঁড়িয়ে রইল।

(বৃদ্ধকে) কিন্তু বিয়ে যে দেবেন, কোথাকার মেয়ে, তা তো শোনা হল না।

বৃদ্ধ। (বলরামের দিকে একবার চেয়ে) আজ্ঞে, চাষবাড়ের মেয়ে।

বলরাম। (অতি উৎসাহে) চাষবাড়ের মেয়ে! কার মেয়ে বল তো মোড়লমশায়।

বৃদ্ধ। লক্ষ্মণ পাখিরার মেয়ে।

বলরাম। ও—অ, লক্ষ্মণ পাখিরার মেয়ে। ইউ, পি, ইস্কুলে কেলাস ফোরএ পড়ে মাস্টারমশায়। মেয়ের নাম মালা, ফাস্টো কেলাস মেয়ে। এমন মেয়ে ভূভারতে পাবেন নি। মোহনের তা'লে বিয়ে দিচ্ছ মুরুব্বি?

বসন্ত। তুমি যাও বলরাম, আঁচ দিগে যাও।

বলরাম। আজ্ঞে যাই। ফাস্টো কেলাস মেয়ে, ফাস্টো কেলাস মিলবে। মোহন আর মালা, মোহনমালা।

রান্নাঘরে ঢুকল

বসন্ত। তারপর, ব্যাপারটা কি হল তাহলে?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, ওই তো শুনলেন ঐ ছোকরার কাছে, —মেয়াটা ছোট ইস্কুলে পড়ে।

বসন্ত। তাতে কি হয়েছে?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে তাতেই তো সব্বনাশের জট পড়েছে। লিখাপড়া জানা মেয়া, আর ছেলাটা কিনা মুখ্যু হল!

বসন্ত। (কিছুটা বিরক্ত হয়ে) যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন, আমাকে একটু বেরোতে হবে।

বৃদ্ধ। (ব্যস্ত হয়ে) আজ্ঞে, এই যে বলছি। মেয়ার বাপ বলছে কি, অঘ্‌ঘাণে পরীক্ষে দিবে মেয়া, তারপরে বিয়া হুব; তোমার ছেলাটাকেও পরীক্ষে দিতে বল, একটা—ওই যে বলে কিনা, সাট্টপিট, হাঁ, সাট্টপিট পাক।

বসন্ত। কেন, সাট্টপিট না হলে কি বিয়ে হবে না?

বৃদ্ধ। মেয়ার বাপ বলছে, তোমার ছেলেটা তো যাত্রা গেয়ে বেড়ায়, উঠোউঠির পাশটা করে কিনা দেখি। লিখাপড়ি-জানা মেয়া কিনা, তাই দেমাক এত।

বসন্ত। তাহলে তো বিপদের ব্যাপার দেখছি।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, তা সত্যি। তবে কিনা দেবতুল্যি লোক আপনারা, আপনাদের চরণ আশ্রয়ে আছি, বিপদ গায়ে লাগবে নি।

বসন্ত। আমরা কি করতে পারি?

বৃদ্ধ। গরীবের দুঃখু যদি না বুঝেন, তা'লে—

বসন্ত। গরীব যখন এত, তখন ঘাড়ে বোঝা চাপান কেন আবার?

বৃদ্ধ। বোঝা লয় আজ্ঞে, লক্ষ্মী। ছেলাটা বড় অপয়া, বৌ ঘরকে এলে তবু যদি ছত্তিশ দেশ ঘুরে বেড়ান বন্ধ করে, কাজে মন লাগায়, তাই এত আটুপাটু করছি। ছোঁড়া আছোট বলদ, ঘাড়ে জুয়াল না দিলে মাথা নীচু করবেনি, মাস্টরমশায়। তা'লে দিবেন তো আজ্ঞে?

বসন্ত। কি?

বৃদ্ধ। ওই যে বললম, সাট্টপিট।

বসন্ত। সামনের পরীক্ষাটা দিতে বলুন, নাহলে সাট্টপিট হবে কি করে?

বৃদ্ধ। (মাথা চুলকে) পরাক্ষে না দিলে কি সাট্টপিট হয়নি আজ্ঞে?

বসন্ত। হবে না কেন, যে ক্লাসে পড়ছে, সেই ক্লাসের হবে।

বৃদ্ধ। পুরানো কেলাসের দিয়ে চলবেনি আজ্ঞে, নতুন কেলাসের চাই। দেবতুল্যি লোক আপনারা, সাট্টপিট তো হাতের ময়লা আপনাদের, দয়া করে দিবেন নূতন কেলাসেরটা।

বসন্ত। (হাসিমুখে) তা কি করে হয়! কাল ইস্কুলে আসুন একবার।

বৃদ্ধ। ইস্কুলের বকেয়া কিছু রাখবনি, সব কিলিয়ার করে দুব। তেমন লোক ছিচরণ রঙ লয়, ই তল্লাটের লোককে জিগালে জানতে পারবেন।

বসন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, কাল তো ইস্কুলে আসুন।

বৃদ্ধ। হুকুম করছেন, এসব নিচ্চয়, কিন্তু সাট্টপিট দিতেই হবে আজ্ঞে। নইলে বুঝেছেন, ছিচরণ রঙ নামেও যাই, কাজেও তাই, রঙ হয়ে চরণে লেপটে থাকব, ছাড়বনি।

বলে হাত জোড় করলে

বসন্ত হাসিমুখে চেয়ে রইলেন

দুঃখ-আশিস্

(গান)

ভৈরবী—দাদ্রা

ভুল্‌তে তোমায় দেবে না
তাই ফিরে ফিরে ব্যথা দাও
যখনি হই গো আন্‌মনা
অমনি তুমি জাগাও।
এই কৃপা মম জীবনে
পেয়েছি শয়নে স্বপনে
ব্যথা পেলে বন-গহনে
অমনি তুমি ফিরাও!

এ তব মহা আশিস্
সফল করুক প্রাণ—
বন্ধুর পথে চলিতে
জাগায়ে তুলুক গান!
জয় হোক্ তব জয়
জয় মঙ্গলময়—
আর কোনো কথা নয়
—প্রেমসুধা পিয়াও॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

II সা -া সা | -া সা সা I প্‌া দ্‌া সা | -া -া -া I
ভু ল্ তে ॰ তো মায়্ দে বে না ॰ ॰ ॰

জ্ঞা রা জ্ঞা | মা জ্ঞা ঋা I সা -া -া | -া -া -া I
ফি রে ফি রে ব থা দা ॰ ॰ ॰ ও ॰

সাঁ পা পা | পা -া পা I পা -দা পা | মা -া -া I
য থ নি হ ই গো আ ন্ ম না ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | প্া প্া প্দা I সা -া -া | -া -া -া II
অ ম নি তু মি জা ০ গা ০ ০ ০ ও ০

II { সা -া সা | সা সা রা I জ্ঞা মা মা | -া -া -া I
এ ই রু পা ম ম জী ব নে ০ ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা সা | -া -া -া } I
পে য়ে ছি শ য় নে স্ব প নে ০ ০ ০

{ সা পা পা | পা পা পা I দা পা মা | -া -া -া I
ব্য থা পে লে ব ন গ হ নে ০ ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | প্া প্া প্দা I সা -া -া | -া -া -া } II
অ ম নি তু মি ফি০ রা ০ ০ ০ ও ০

II { সা সা সা | সা সা সা I সা -া -া | -া -রা -া I
এ ত ব ম হা আ শি ০ ০ ০ স্ ০

জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা -মা I মা -া -া | -া -া -া I
স ফ ল্ ক রু ক্ প্রা ০ ০ ০ ণ্ ০

পা -ণা দা | পা মা জ্ঞা I জ্ঞা রা জ্ঞা | -া -া -া I
ব ন্ ধু র প থে চ লি তে ০ ০ ০

জ্ঞা মা জ্ঞা | ঋা ঋা -া I সা -া -া | -া -া -া } II
জা গা য়ে তু লু ক গা ০ ০ ০ ন ০

II {	মা	-া	দা	|	-া	দা	ণা	I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	জ	য়্	হো		ক্	ত	ব		জ	০	০		০	য়্	০	
	র্স‍র্জ্ঞা	-া	র্জ্ঞা	|	-া	র্ঋা	র্জ্ঞা	I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া }	I
	জ	য়	ম		ং	গ	ল		ম	০	০		০	য়্	০	
{	পা	-া	পা	|	দা	পণা	দা	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	য়্	কো		নো	ক	থা		ন	০	০		০	য়্	০	
	জ্ঞা	-মা	জ্ঞা	|	ঋা	-া	ঋা	I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া }	II
	প্রে	ম্	স্থ		ধা	০	পি		য়া	০	০		০	ও	০	

ডেনমার্কের শিক্ষাপদ্ধতি

মন্মথনাথ রায়

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে নতুন কিছু জানবার প্রয়োজনে যখনই আমরা বাইরের দিকে তাকিয়েছি তখনই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইংলণ্ড অথবা আমেরিকা। এদেশগুলোর কাছ থেকে আমরা যে কিছু পাইনি তা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে। কিন্তু এর বাইরেও যে দেশ আছে, যাদের কাছে আমরা কিছু শিখতে পারি—সে কথা আমরা ভাবতে শিখেছি স্বাধীনতালাভের পর থেকে। তারপর থেকেই বাইরের পৃথিবীতেও যেখানে যা উৎকৃষ্ট রয়েছে তা' আহরণ করার কাজে লেগেছে ভারতবাসী।

ছোট একটি দেশ ডেনমার্ক। এর আয়তন হল সতের হাজার বর্গ-মাইল, আর লোকসংখ্যা হল তেতাল্লিশ লক্ষ। এত ছোট হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশ এমন সব সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা প্রত্যক্ষ করলে বা আলোচনা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। শিক্ষায় এদের উন্নতি অনুধাবনযোগ্য। এদেশে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে নিরক্ষর নেই একজনও—আর শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার আছে অতি অল্প। অন্ততঃ এদিক থেকে দেখতে গেলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এদেশের শিক্ষাকে এরা কার্য্যকরী করে তুলতে সফল হয়েছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এ অসাধ্য সাধন এরা করেছে সে ব্যবস্থা কেবল ব্যাপক এবং সুষ্ঠু নয়, প্রাচীনও বটে। সে ব্যবস্থা কালের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে সহজে।

নার্সারি শিক্ষা

ডেনমার্কের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াতে রয়েছে নার্সারি বিদ্যালয়। পৃথিবীর অপরাপর উন্নত জাতির মত এরাও মেনে নিয়েছে যে শিশুর প্রথম কয়েক বছরের শিক্ষাই হয় তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি। তাই নার্সারি বিদ্যালয়কে এরা মেনে নিয়েছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শ্রমিক রমণী এবং দরিদ্র জনকজননীর শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য সহরাঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল এ ধরণের বিদ্যালয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তখন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল কারখানার মালিকরা, আর বিভিন্ন বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। গোড়ার দিকে ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একটু উদাসীনই ছিল। কিন্তু এরাও এ শ্রেণীর শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুর শরীর এবং মনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গড়ে তোলার ব্যবস্থা যতই সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর হল, ততই এদেশে নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ফ্রোয়েবল আর মাদাম মণ্টেসরীর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হল। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

নার্সারি বিদ্যালয়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে শিশুর মানসিক এবং দৈহিক শক্তির বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। শিশুর সৃজনী শক্তি যাতে বিকশিত হবার সুযোগ পায় সেজন্য বিভিন্ন খেলার সামগ্রী এমন ভাবে সাজান থাকে, যাতে করে শিশু গৃহ, পুল, রেলগাড়ী প্রভৃতি তৈরী করতে শিখে ক্রীড়ার ছলে। শিশুর কাছে গৃহস্থালীর কাজ বেশ আকর্ষণীয়। সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে থেকে নার্সারি বিদ্যালয়ে শিশুরা "রান্না, রান্না" খেলা করে, ঘর নিকায়, বাসন পরিষ্কার করে।

এভাবে তাদের সৃজনীশক্তি পুষ্টিলাভ করে। তাদের কর্ম্মস্পৃহা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। দেহ চালনার ফলে দৈহিক শক্তির বিকাশ ও সহজ হয়। ক্রীড়ার উপকরণগুলো আবার সাজান থাকে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী করে—যাতে বিভিন্ন শিশুর চাহিদা মিটান যেতে পারে সহজে।

প্রথম দিকটায় এদেশে নার্সারি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করেছিল এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, অর্থাৎ কারখানার মালিকরা আর কয়েকটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। সরকার এগিয়ে এল এদের সাহায্য করতে বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে, আর সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা পাকা হল বছর দশেক আগে। এখন নার্সারি বিদ্যালয়ের জন্য সরকার ব্যবস্থা করেছে অল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের। কতগুলো নার্সারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে নির্দ্দিষ্ট আয়ের কম আয়সম্পন্ন নাগরিকদের শিশুরা। এ ধরণের নার্সারি বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের শতকরা চল্লিশ ভাগ বহন করে সরকার, আর কুড়িভাগ বহন করে স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান। অবশিষ্ট আয়ের চল্লিশভাগ অর্থ আসে শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। যে সকল নার্সারি বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট আয়ের বেশী আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিশুরা শিক্ষালাভ করে সে সকল নার্সারি বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ বহন করে দেশের সরকার, পনের ভাগ বহন করে স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান, আর অবশিষ্ট ব্যয় বহন করে শিশুদের অভিভাবকগণ। সরকারী সাহায্য পায় কেবল সরকার অনুমোদিত নার্সারি বিদ্যালয়গুলো। আজকাল নিয়ম হয়েছে, আগে অনুমোদন লাভ ক'রে তবে নার্সারি বিদ্যালয় খুলতে হবে। অবশ্য অনুমোদন বিহীন যে সব নার্সারি বিদ্যালয় এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হবার আগে চালু ছিল সেগুলোর উপর হস্তক্ষেপ হয় নি। সেগুলো এখন চালাচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

ডেনমার্কে এধরণের শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হল প্রায় আটশত। হাজার চল্লিশেক শিশু এই নার্সারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। এ সকল শিশুর বয়স হল আড়াই বছর থেকে সাত বছর। এই বয়সের মোট শিশুর শতকরা দশজনেরও বেশী আসে এই নার্সারি বিদ্যালয়ে। ব্যবস্থা তেমন ব্যাপক না হলেও সুষ্ঠু বলা চলে নিঃসন্দেহে।

অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের রাখা হয় দৈনিক ৯' ঘণ্টা করে। কোন নার্সারি বিদ্যালয়ে যাতে শিশুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়। বয়স অনুসারে শিশুদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। কোন দলে পনের জনের বেশী শিশু নেই। প্রত্যেক দলের জন্য অন্ততঃ দুটো করে থাকে খেলার ঘর। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পায়খানা, বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য পৃথক কক্ষ, হাত মুখ ধোবার জল এবং অসুস্থ শিশুদের পৃথক রাখার ঘরের ব্যবস্থা রয়েছে সর্ব্বত্র।

নার্সারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বিশেষ ধরণের শিক্ষালাভ করতে হয়। শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য এদেশে আটটি কলেজ রয়েছে। চারটি রয়েছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে, আর চারটি রয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এ সকল কলেজে ভর্ত্তির নিম্নতম বয়স হল বিশ বছর। যারা অন্ততঃ ছ'মাসকাল কোন শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে এবং তার আগে কিছুকাল কোন পরিবারের শিশুর দেখাশুনার কাজ করেছে তারাই এ কলেজে ভর্ত্তি হতে পারে। ভর্ত্তিপ্রার্থিনীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, অথবা কোন উচ্চ গণবিদ্যালয়ের (Folk High School) পাঠ শেষ করতে হয়।

ব্যবস্থাগুলো বেশ ব্যাপক হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ জনপ্রিয়। আজও হয়ত সকল শ্রেণীর লোক এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে না সমভাবে। কিন্তু এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝে সবাই এখন এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যাতে বেড়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য দিয়েছেন। এদেশের শিশুর সুস্থ দেহ এবং সপ্রতিভ মুখ-মণ্ডলের মূলে রয়েছে অনেকটা এদের শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা বলা চলে নিঃসন্দেহে।

প্রাথমিক, প্রাথমিকোত্তর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা

ডেনমার্কে সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের বালকবালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল ৮১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের চাইতেও ছাপ্পান্ন বছর আগে। কাজেই এ ব্যবস্থা বেশ প্রাচীন। অবশ্য সকল বালকবালিকাকেই যে অনুমোদিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে হয় তা নয়। শিশুর পিতা বা অভিভাবক ইচ্ছা করলে অননুমোদিত বিদ্যালয়ে এমন কি আপন গৃহেও শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখতে হয় শিশুর শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট মান অনুসারে চলে।

সাত বছর থেকে এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালকবালিকাকেই এক সঙ্গে একই ধরণের শিক্ষালাভ করতে হয়। শিশুদের প্রথম শিখতে হয় লিখতে পড়তে এবং আঁক কষতে। তারপর তাদের শিখান হয় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত প্রভৃতি। তাছাড়া কিছুটা ধর্ম্মোপদেশ ও বাধ্যতামূলক। তবে কোন শিশুর পিতামাতা ইচ্ছা করলে শিশুর ধর্ম্মশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করতে পারে।

প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার দুটো শাখা রয়েছে। একটি হল পরীক্ষান্ত, অপরটি পরীক্ষা বিহীন। পরীক্ষান্ত শাখার শেষে রয়েছে পরীক্ষার ব্যবস্থা, আর পরীক্ষা বিহীন শাখার শেষে নির্দ্দিষ্ট কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। প্রথম চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষার শেষে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে তারা ভর্ত্তি হতে পারে পরীক্ষান্ত প্রাথমিকোত্তর শাখায়। আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না, তারা ভর্ত্তি হয় পরীক্ষাবিহীন প্রাথমিকোত্তর শাখায়। যারা পরীক্ষান্ত প্রাথমিকোত্তর শাখায় ভর্ত্তি হয় তারা পনের বছর পর্য্যন্ত পড়ে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত এবং পদার্থবিদ্যা। এর সঙ্গে সঙ্গে এদের শিখতে হয় সঙ্গীত, কাঠের কাজ, গৃহকর্ম্ম, আর অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা। এর পর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে দু'টো শাখা। যারা অনতিবিলম্বে সংসারে প্রবেশ করতে যায়, তারা এক বছর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষান্তে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে—যার নাম হল

'রিয়েল এগজামিনেশন'। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হল তারা বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী আফিসে চাকরি পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। আবার যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে চায় তারা চার বছরের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা শেষ করে এগিয়ে যায় মাধ্যমিক শিক্ষার দীর্ঘতর শাখায়। সেখানে তাদের পড়তে হয় তিন বছর। এ শাখায় মাধ্যমিক শিক্ষার উপশাখা রয়েছে তিনটি। যে শাখায় গ্রীক, ল্যাটিন, ডেনিস এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার প্রাধান্য রয়েছে—তাকে বলা হয় ক্ল্যাসিক্যাল শাখা। যে শাখায় ডেনিস, ইংরেজি, জার্ম্মান শরীরতত্ত্ব প্রভৃতির প্রাধান্য রয়েছে তাকে বলা হয় আধুনিক শাখা। তৃতীয় শাখার নাম হল বিজ্ঞান শাখা। এতে প্রাধান্য রয়েছে গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের। আপন আপন অভিরুচি এবং যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শাখায় ভর্ত্তি হয়ে তিন বছর সেখানে শিক্ষালাভ করে। এশিক্ষাতে যে পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সেটা হল প্রবেশিকা পরীক্ষা। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে ছ' থেকে সাত বছর। তারপর তারা বেরিয়ে আসতে পারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছ' বছরের মধ্যে আর কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এগারোত্তর বয়সে যারা পরীক্ষা-বিহীন প্রাথমিকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় তাদের তিন কি চার বছর ধরে পড়তে হয় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক-বিজ্ঞান এবং যে কোন একটি বিদেশী ভাষা। তাছাড়া এদের কাঠের কাজ, শেলাই প্রভৃতি নানা ধরণের ব্যবহারিক বিষয় ও শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে এরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী করতে পারে সহজে। এখানকার শিক্ষা শেষ হয় পনের বছর বয়সে। ইচ্ছা করলে ছাত্রছাত্রীরা চৌদ্দ বছর বয়সেও লেখাপড়া শেষ করতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ পনের বছর বয়স পর্য্যন্তই তারা পরীক্ষাবিহীন শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করে। যারা এখানকার শিক্ষা শেষ করে তারা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পাঠ গ্রহণ করেছে এই মর্ম্মে অভিজ্ঞান পত্র পেতে পারে। এ শাখার শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য হল—বালকবালিকাকে শিক্ষান্তে শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতিতে প্রবেশ করার উপযোগী করে তোলা। পরীক্ষা-বিহীন প্রাথমিকোত্তর শ্রেণীতে যারা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা দেখাতে পারে তারা ইচ্ছা করলে পরীক্ষান্ত শাখায় চলে যেতে পারে। সেখান থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারে, অবশ্য এ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে অতি অল্প বালকবালিকা।

পল্লীঅঞ্চলে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার অনেকগুলোতেই কেবল তিন বছর পড়বার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরণের একই অঞ্চলের চার পাঁচটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের। এই বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম এবং বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ পর্য্যাপ্ত এবং উন্নত ধরণের। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তিন বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করে শিশুরা এসে ভর্ত্তি হয় এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। ডেনমার্কের সকল অঞ্চলেরই রাস্তাঘাট আর যানবাহনের ব্যবস্থা এত সুন্দর যে চার পাঁচ মাইল দূর থেকে শিশুদের এ ধরণের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে আসতে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রাথমিক বা প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি নেই। শিক্ষকগণ আপন আপন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরীক্ষান্ত শ্রেণীর মান নির্ণীত হয় শেষ পরীক্ষার মান দিয়ে, আর পরীক্ষাবিহীন শ্রেণীর শিক্ষার মান নির্ণীত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ হবার যোগ্যতা দিয়ে। মোদ্দা কথা, পরীক্ষান্ত শ্রেণীতে এমন ভাবে শিক্ষাদান করা হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠান্তে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, আর পরীক্ষাবিহীন শ্রেণীতে এমন ভাবে শিক্ষাদান করা হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষান্তে শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যে শিক্ষানবীশ হয়ে প্রবেশ করতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীতে বছরে ক'ঘণ্টা করে পড়ান হবে তা নির্দ্দিষ্ট আছে।

সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়েই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পৃথক ধরণের কক্ষ নির্ম্মিত হয় এবং সেগুলোকে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষোপকরণ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রার্থনা গৃহ, ব্যায়ামাগার, স্নানাগার, শৌচাগার—এ সকল বিদ্যালয়ে অপরিহার্য্য। কাঠের কাজের জন্য এবং গৃহকর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্যও পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। এধরণের এক একটি বিদ্যালয়গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় হয় পঁচিশ হতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সঙ্গীত পাঠ্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ। সঙ্গীত দিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করা হয়, আর সঙ্গীতসহকারে হয় তার সমাপ্তি। সঙ্গীত শিশুর মনে নিবিষ্টতার জন্য এনে দেয় একটা সহজ প্রস্তুতি। ফলে সঙ্গীতান্তে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে নিবিষ্টচিত্তে। তাছাড়া এর পরোক্ষ ফল হল মিলিত-সঙ্গীত শিশুদের মনে একটা 'গোষ্ঠীগতভাব' (Community Feeling) জাগিয়ে দেয়। অতি চমৎকার একটা জিনিস দেখা যায় এই ডেনমার্কে। পাঁচ হাজার লোকের সভায় এককোণ থেকে একজন ডেনিস যখন একটি গান ধরে তখন সমগ্র জনতা মুখর হয়ে উঠে সঙ্গীতে। কোথাও অসঙ্গতি দেখা দেয় না এতটুকু। মনে হয় যেন সমগ্র জনতা এক হয়ে গেছে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক পৃথক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা এখানকার একটা বৈশিষ্ট্য। মানসিক শক্তি অনুসারে শিশুদের বিভিন্ন ধরণের শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা শুরু হয় এদেশে বরং একটু অপরিণত বয়সে। এ ব্যবস্থা যে সকল ক্ষেত্রে ত্রুটিবিহীন একথা বলা শক্ত। সম্ভাব্য ত্রুটি নিরসনের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীর মানসিক শক্তি নির্ণয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে কোন শিশুর বিশেষ কোন ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা না থাকলেও আমরা তাকে সে শিক্ষা লাভের জন্য ভর্ত্তি করে দিই। শিশু শিক্ষালাভে অক্ষম হয়। ফলে অভিভাবকের হয় অর্থ নষ্ট, আর শিশুর হয় অযথা সময় নষ্ট। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্যে পরীক্ষার ফলে ডেনমার্কে শিশুকে তার মানসিক শক্তির উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, ফলে অর্থ বা সময়ের অপব্যয় হবার সম্ভাবনা থাকে না বেশী।

বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা হয় বিনাব্যয়ে। শিশুদের দাঁত পরীক্ষা করা হয় বছরে দুবার।

এদেশে এটার প্রয়োজনও খুব বেশী। দাঁতের রোগ দেখেছি প্রায় শিশুর। এখানটায় একটা বড় ফাঁক রয়েছে বলে মনে হয়। এরা দাঁতের রোগের চিকিৎসা করছে, কিন্তু রোগের আক্রমণটাকে ঠেকাবার চেষ্টা যেন করছে না। আহারের পর দাঁত পরিষ্কার করবার কথা ত দূরে থাক, মুখ ধোয়ারও রীতি নেই এদেশে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি এখানে। এই শীতের দেশে সব চাইতে বেশী ভিড় আইসক্রীমের দোকানে। এ ছুটোই যে দাঁতের ক্ষতি করে এদিকে কেন যে এদের লক্ষ্য নেই তা বুঝা শক্ত। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা সুষ্ঠু এবং ব্যাপক।

এখানে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা ও রয়েছে পর্য্যাপ্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার জন্য রয়েছে সর্ব্বসমেত বিশটি কলেজ। শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে হলে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানের চাইতে এ প্রবেশিকা পরীক্ষার মান একটু উঁচু। যারা 'রিয়েল এগজামিনেশন' অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের ট্রেনিং কলেজে ভর্ত্তি হতে হলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় না। আর যারা বিশেষ সম্মানসহকারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে তাদের সরাসরি ট্রেনিংএর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয়। এ ট্রেনিং চলে চার বছর। শেষের ছুবছর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষাদান করতে হয় এদের। ইংরেজি কিংবা জার্ম্মান একটি বিদেশী ভাষা এ সময় এদের আয়ত্ত করতে হয়।

নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে ছু'বছরের। এদেরও ট্রেনিং ক্লাশে ভর্ত্তি হতে হলে একটা বিশেষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। অবশ্য এ প্রবেশিকা পরীক্ষার মান তত উঁচু নয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে হয়। তাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ছ'মাসের। ইচ্ছা করলে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই এ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

ডেনমার্কে ধনীনির্ধন সকল শ্রেণীর শিশুর শিক্ষার জন্য রয়েছে একই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ডেনমার্কের রাজকুমার সেখানকার সাধারণ কৃষকের পুত্রের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছে। এ বয়সে এরা তাদের মাঝখানে গড়ে উঠতে দেয়না একটা কৃত্রিম প্রাচীর। সকল মানুষের সমান অধিকার একথা জানিয়ে দেয়—কথায় নয়, কাজেও।

সাধারণত রাজধানীর বহির্ভূত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক। বৃহত্তর কোপেনহেগেনের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল অভিভাবকের আয় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী তাদের শিশুদের শিক্ষার জন্য কিছুটা বেতন দিতে হয়। অপর শিশুদের শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষার ব্যয় মোটামুটি বহন করে পৌর প্রতিষ্ঠান, আর দেশের সরকার।

বয়স্ক শিক্ষা

ডেনমার্কে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র এবং ব্যাপক। এজন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান, আর তাতে শিক্ষা লাভ করছে দেশের শতকরা আট থেকে দশজন লোক। চৌদ্দ পনের বছর বয়সেই অনেক বালক বালিকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমাপ্তি হয়ে যায়। তখন এরা বিভিন্ন শিল্পে বাণিজ্যে বা কৃষিতে শিক্ষানবিশী শুরু করে। এদের তখন স্বাভাবিক অবস্থায় লেখাপড়ার চর্চ্চা যায় বন্ধ হয়ে। চর্চ্চার অভাবে অর্জিত বিদ্যা কেবল অকেজো হবার নয়, লোপ পাবারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাছাড়া এরা ত এ বয়সে কৃষ্টিমূলক শিক্ষা পেল না এতটুকু। দেশের সুষ্ঠু নাগরিক হয়ে নিজের মানসিক আর নৈতিক উন্নতি বিধান করার অধিকার ত এদেরও রয়েছে। চর্চ্চার জন্য, কৃষ্টিমূলক শিক্ষার জন্য, আর অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য তাই এদেশে এরা করেছে বয়স্ক শিক্ষার উদার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষা বলতে আজও আমরা বুঝি নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা। তারপর সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষরতাকে কায়েম করার ব্যবস্থা করা। ডেনমার্কে নিরক্ষতার বালাই নেই। অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ ও এর পরিবর্দ্ধনই হল এদের বয়স্ক শিক্ষার কাজ। এদের বয়স্ক শিক্ষা বেশীর ভাগ কৃষ্টিমূলক, কিছুটা কার্য্যকরী।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য ডেনমার্কে যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এ দেশের উচ্চ গণ-বিদ্যালয় বা Folk High School। এ ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল এখন মোট পঞ্চান্ন। বছরে ছ' থেকে সাত হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ গণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। বহু অর্থ ব্যয় করে এ সকল বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর পরিবেশ বেশ মনোরম। উচ্চ গণ বিদ্যালয় আবাসিক। কাজেই বিদ্যালয় গৃহের সঙ্গে ব্যবস্থা রাখতে হয় ছাত্রাবাসের। এ শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ছাত্র শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। কাজেই শিক্ষকের আবাসও তৈরী করতে হয় বিদ্যালয়ের খুব কাছাকাছি। প্রার্থনা কক্ষ, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

উচ্চ গণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য কোন ন্যূনতম যোগ্যতার নির্দ্দেশ নেই। আঠার থেকে পঁচিশ বছরের যুবকযুবতীদের এ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। এ বয়সটাকে কেন এ শিক্ষার উপযোগী বলে মনে করা হয়—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় কৃষ্টিমূলক শিক্ষার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা আবেগময় জাগরণের সৃষ্টি করাই হল এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ বয়সটা আবেগ প্রধান। কাজেই আবেগকে জাগ্রত করার কাজে এ বয়সে বেগ পেতে হয় না বেশী। শুধু আবেগটাকে বাঞ্ছিত খাতে টেনে নিতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—বাল্যে যে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় চার বছরে, এ বয়সে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় ছয় মাসে। শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর করিয়ে দেবার সহায়তা করে জীবনের অভিজ্ঞতা আর মনের আগ্রহ। শিশু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের বর্ণনা শ্রবণ করে অনিচ্ছায়। উপলব্ধির সহায়তা করার জন্য তার নেই জীবনের অভিজ্ঞতা কিন্তু যুবকযুবতীর মনে রয়েছে শিখার আগ্রহ। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার প্রচুর। ফলে বর্ণনা তাদের কাছে হয়ে উঠে জীবন্ত। তাই সে বর্ণনা তারা আয়ত্ত করে অতি সহজে। এ ভাবে প্রায় সকল বস্তুই তারা সহজে আয়ত্ত করে। কারণ তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার আগ্রহ।

উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল আবেগময়ী বাণী বা 'Living Word'। শিক্ষকের প্রেরণাময়ী বাণী ছাত্রছাত্রীর মনে করে আবেগের সঞ্চার। পরস্পরের মধ্যে সংস্থাপিত হয় একটা অদৃশ্য যোগাযোগ। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রভাব বিস্তার করে ছাত্রছাত্রীর মনে। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তাদের মনে প্রবল আগ্রহ জাগে—নিজের, দশের এবং দেশের মঙ্গল সাধনের। ধীরে ধীরে এ আগ্রহ মনে স্থায়ীভাবে আসর জমিয়ে বসে। এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হতে হয় মধুর অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বাগ্মিতার ও প্রয়োজন তাদের অনেকখানি। আবেগ সৃষ্টি ক'রে তাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করাবার ক্ষমতা থাকা চাই প্রচুর।

এ সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে স্থান পেয়েছে সঙ্গীত, সাহিত্য, ঐতিহাস, চলতি সংবাদ, শরীর চর্চা প্রভৃতি বিষয়। এতে পাঠাগার অপরিহার্য, আর পাঠচক্রের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কের অবকাশ পায় ছাত্রীরা প্রচুর এতে। এদের নিজেদের কৃষ্টির জন্য, ধর্মের জন্য, প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি হয়। পাঠ্য সূচীতে সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করার বিষয়। জাতীয় ঐক্য বোধকে সজাগ রাখবার একটা প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে সঙ্গীতের স্থান খুব বিশিষ্ট। দেহ-চর্চার ফলে যে স্বাস্থ্য তারা অর্জন করে তাও জাতির সম্পদ।

বছরে দুবার করে ভর্তি করা হয় ছাত্রছাত্রীদের এই উচ্চ গণ বিদ্যালয়ে। শীতের সময় যারা ভর্তি হয় তারা শিক্ষা লাভ করে পাঁচ মাস। এ সময় কোন কোন বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রীষ্মের সময় যারা ভর্তি হয় তারা শিক্ষা লাভ করে তিন মাস। এ সময় প্রায় বিদ্যালয়েই কেবল মেয়েদেরই ভর্তি করা হয়। ডেনমার্কের আস্কভ (Askov) নামক স্থানে যে বিদ্যালয় রয়েছে সেটা বেশ উন্নত ধরণের। এ প্রতিষ্ঠানকে এদেশে গণ বিশ্ববিদ্যালয় বলে সম্মান দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে পর পর তিনবার ভর্তি হয়ে উত্তরোত্তর উন্নত ধরণের পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই আপন আপন আহারের ব্যয় বহন করে, আর বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বেতন দেয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। রাষ্ট্র শিক্ষকদের বেতনের অর্ধেক বহন করে। বাকী অর্ধেক আসে ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে। এ ধরণের বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবার সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। গৃহ নির্ম্মাণের মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় তিন ভাগ প্রতি বছর সরকারী সাহায্য রূপে পেয়ে থাকে এসকল বিদ্যালয়। কাজেই দেখা যায় এদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সরকারী চেষ্টার অভাব নেই।

শিক্ষান্তে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই গণ-উচ্চ-বিদ্যালয়ে। শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষকদের রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। শিক্ষকদের বাগ্মিতা আর ব্যক্তিত্ব একেবারে অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিয়োগ সরকার-অনুমোদনসাপেক্ষ। অধ্যক্ষ আপন ইচ্ছামত অপর শিক্ষকদের নিযুক্ত করেন।

ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে পাবলিক স্কুলগুলোর প্রাক্তন ছাত্রদের প্রাধান্য লক্ষিত হয় খুব বেশী। আর ডেনমার্কের রাজনীতি, সমবায়, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লক্ষিত হয় উচ্চ-গণ-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের। এদেরই মধ্য থেকে বেরিয়েছে অনেক দেশ-নেতা, অনেক শাসন-পরিচালক, আর অনেক সমবায় সমিতির পরিচালক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ-গণ-বিদ্যালয়ের দানের বিশিষ্টতা সবাই এখানে স্বীকার করে।

উচ্চ গণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি সে প্রসঙ্গে তার জনক গ্রুণ্ডভিকের (Grundtvig) নাম না করা হয়। এই ধর্ম্মযাজক দার্শনিক কবি ডেনমার্কের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্দ্দিনে এই উচ্চ গণবিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ক্রিস্চেন কোল্ড প্রভৃতি কর্ম্মীর সাহায্যে তিনি রূপ দেন তাঁর সঙ্কল্পকে। ফলে ডেনমার্কের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক দুর্দ্দিন যায় কেটে। ভারতে মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতির জনক বলে অভিহিত হন, ডেনমার্কে ও গ্রুণ্ডভিক তেমন ডেনিস জাতির জনক বলেই অভিহিত হন।

আর এক ধরণের বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সান্ধ্য-বিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ব্যাপক। এতে শিক্ষালাভ করে বছরে ন্যূনাধিক তিন লক্ষ ডেনমার্কবাসী। চৌদ্দ বছরের ঊর্ধ্বে সকল নরনারীই এ সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় ব্যতীত বাগানের কাজ, কাঠের কাজ, সূঁচের কাজ, ঘরকরণার কাজ প্রভৃতির কোন একটি বা দুটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ে। নাগরিক শিক্ষা, বিভিন্ন কলকব্জা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও এ সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রত্যেক সান্ধ্য বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দশ জন করে ছাত্র ছাত্রী হাজির থাকতে হয়, আর প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ বিশটি করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হয়। সপ্তাহে দু'বার কি তিনবার করে সান্ধ্য বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। প্রত্যেক ঘণ্টা পাঠদানের জন্য শিক্ষকের নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পারিশ্রমিকের শতকরা তেত্রিশ ভাগ দেয় স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান, আর অবশিষ্ট অংশ দেয় সরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন বেতন দিতে হয় না। ভর্ত্তির সময় সামান্য ভর্ত্তির মাশুল দিতে হয় মাত্র।

সান্ধ্য বিদ্যালয় সমানভাবে গড়ে উঠেছে যেমন গ্রামাঞ্চলে তেমন সহরাঞ্চলে। এগুলো স্থাপন করেছে হয়ত স্থানীয় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, না হয় স্থানীয় যুব সংঘ অথবা কোন মহিলা সংঘ। সান্ধ্য বিদ্যালয়ের গৃহের ব্যবস্থা করে দেয় স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান। এখানে ও পাঠান্তে নেই কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা।

এ ছাড়া আবার আর এক ধরণের বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যার নাম হল বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষালাভ করে প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে এবং যাদের বয়স চৌদ্দ থেকে আঠার বছর। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আবাসিক। আহার বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যয় বহন করে ছাত্র-ছাত্রীরা। অবশ্য সরকার থেকে মোট ব্যয়ের এক তৃতীয় অংশ সাহায্যরূপে দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকার শিক্ষকদের বেতনের অর্ধেক এবং আনুসঙ্গিক ব্যয়ের অংশ বিশেষ

বহন করে থাকে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ও অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে।

সাহিত্য ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয়গুলো ব্যতীত কাঠের কাজ, সূঁচের কাজ, ঘরকরণার কাজ, বুননের কাজ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়গুলো এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় এ বিদ্যালয়গুলো গণ উচ্চবিদ্যালয়েরই মত। পার্থক্য হল—এখানে ছাত্র-ছাত্রীর বয়স হল চৌদ্দ থেকে আঠার বছর, আর গণউচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর বয়স হল আঠার থেকে পঁচিশ বছর। চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সটা একটু সঙ্কটময়। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব এখানে একটু বেশী। এ শ্রেণীর বয়স্কশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আজকাল ডেনমার্কে দাঁড়িয়েছে পঁচাত্তর। ছাত্র সংখ্যা হয়েছে পাঁচ হাজার। এখানেও শীতকালে পাঁচ মাস, আর গ্রীষ্মকালে তিন মাস পড়ান হয়।

অন্য এক ধরণের বয়স্ক বিদ্যালয় রয়েছে যাদের বলা যেতে পারে কৃষি বিদ্যালয়। গণউচ্চবিদ্যালয়ের মত এগুলোতে ভর্ত্তি হয় আঠার থেকে পঁচিশ বছরের যুবক যুবতী—বিশেষতঃ যারা এগারোত্তর বয়সে পরীক্ষাবিহীন শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করেছে। এগুলোও আবাসিক। এ ধরণের সাতাশটি বিদ্যালয় রয়েছে আজকাল ডেনমার্কে। শিক্ষাদান কালও গণ উচ্চবিদ্যালয়ের মত শীতকালে পাঁচ মাস আর গ্রীষ্মকালে তিনমাস। গ্রীষ্মকালে ভর্ত্তি করা হয় মেয়েদের এবং শিক্ষাদান চলে উচ্চগণ-বিদ্যালয়ের রীতিতে। ছেলেদের বেলাও কৃষির বিভিন্ন বিষয় ব্যতীত সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও কিছুটা শিক্ষাদান করা হয়।

আবার কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। এতে যারা শিক্ষালাভ করে তারা দিনের বেলা আপন আপন ক্ষেত খামারে কাজ করে। বিকেল বা সন্ধ্যায় মিলিত হয়ে কৃষি সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করে। এ ধরণের রয়েছে প্রায় তিনশত প্রতিষ্ঠান এবং এদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা হল প্রায় ন'হাজার।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য আর এক রকমের প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যার নাম দেওয়া যেতে পারে—গৃহকর্ম কলেজ। এখানে বছরে দুবার করে মেয়েদের গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। তার সঙ্গে মেয়েরা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে। এগুলোও আবাসিক আর এখানকার ব্যবস্থাও উচ্চ গণবিদ্যালয়েরই অনুরূপ। পার্থক্য হল এখানে ঘরকরণার বিষয়ের উপর একটু বেশী জোর দেওয়া হয়। এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হল তেত্রিশ, আর এতে বছরে শিক্ষালাভ করে তিন হাজার ছাত্রী। ডেনমার্কের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাই অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিচিত্র। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার মত দুর্ভাগ্য এখানে কারও ঘটেনি। বিভিন্ন বয়সের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা যেমন রয়েছে, বিভিন্ন রুচি এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও তেমন রয়েছে। শিক্ষা সর্ব্বক্ষেত্রেই পূর্ণ ফলপ্রসূ। শিক্ষায় বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশে যুবক যুবতীরা ভাগ্যে যে বিড়ম্বনা আসে তার হাত থেকে সেখানকার যুবক যুবতীরা পেয়েছে মুক্তি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতে এগিয়ে যায় শিক্ষান্তে তারা দেখে তাদের সে উদ্দেশ্য হয়েছে সফল। জীবন তাদের হয় সার্থক। এদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরাও যদি কিছুটা গ্রহণ করি ত বোধ হয় আমাদের দেশে ভালই হয়।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মী হিসাবে লেখক সম্প্রতি বিদেশে সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভাঃ সঃ।

বিরাম

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ক্লান্ত-পাখা বিহঙ্গের সারাদিন পক্ষ সঞ্চারণ :
কত দ্বীপ, কত দেশ, উড়ে চলা আরো কতদূর—
ঘুরে ঘুরে শুধু দেখা অবসন্ন ক্লান্তি ঘন বন,
দূরে গাঢ় অন্ধকার—চেতনার অন্ধকার সুর ;
পাখি তাই ফিরে আসে ; খোঁজে কোন শান্ত এক নীড় ;
আমার মনের সুর ক্লান্ত-পাখা একটি পাখির।
এমনি কত না দেশ পথ-হাঁটা রৌদ্র ঝলমল,
যুগ হতে যুগান্তের ইতিহাস শুধু রোমন্থন :
প্রত্যক্ষ দিনের শেষে নামে সন্ধ্যা রহস্য অতল
অন্ধকার-চেতনায় ডুবে যায় মৃত সব ক্ষণ ;
শুধু ভাসে কোন পাখি ডানা মেলি ঘরে ফিরে আসে,
গোধূলির ম্লান আলো পড়ে ঘরে রৌদ্র-দগ্ধ ঘাসে।
অনেক দিনের শেষে ক্লান্ত-মন খুঁজি তাই তট :
একটি পাখির নীড়, জীবনের আরো কিছু সাধ,—
নীল-নদীধারে খোলা আছে কোন ছায়াচ্ছন্ন তট
সেখানেতে লভিবার রোমাঞ্চের একটু আস্বাদ।
অনেক অনেকদিন তারপর আছে ভাবনার
দুদণ্ড লভি না কেন একটু বিরাম শুধু পাখির ডানার॥

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সর্গ

প্রাকৃতসর্গ—লিঙ্গসর্গ ও ভৌতিকসর্গ

সর্গ শব্দের অর্থ সৃষ্টি। মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা প্রকৃতিকৃত (প্রাকৃত) সৃষ্টি। ইত্যেষঃ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি বিশেষভূতপর্যান্তঃ—সাং কা—৫৬। ইহাদের মধ্যে মহৎ হইতে সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা লিঙ্গদেহ গঠিত। স্থূলদেহ ব্যতিরেকে লিঙ্গদেহের ভোগ সাধিত হয় না। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও তদ্‌বিপরীত অধর্ম্মাদি ভাবকর্ত্তৃক অধিবাহিত লিঙ্গদেহ এক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে।

পূর্ব্বোৎপন্নং অসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং।

—সাং কা—৪০

প্রাকৃতসর্গ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—লিঙ্গসর্গ ও ভৌতিক সর্গ।

অষ্টবিকল্পো দৈবঃ তির্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকঃবিধঃ সমাসতো ভৌতিক সর্গঃ।

সাং কা—৫৩

ভৌতিকসর্গ ত্রিবিধ—দৈব, মানুষ্য ও তির্য্যকযোনি। দৈবসৃষ্টি আট প্রকার—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম—ব্রহ্মলোকবাসী। প্রাজাপত্য—প্রজাপতিলোকবাসী। ঐন্দ্র—ইন্দ্রলোকবাসী। পৈত্র—পিতৃলোকবাসী—চন্দ্রলোকবাসী। গান্ধর্ব্ব—গন্ধর্ব্বলোকবাসী। তির্য্যকযোনি পাঁচ প্রকার—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। মৃগ—লোম ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণী। (বনমানুষ, মর্কট ও পশু)। পতঙ্গাদি পক্ষীশব্দের এবং সর্প, মৎস্যাদি সরীসৃপ শব্দের অন্তর্গত। তরু, গুল্মলতাদি উদ্‌ভিদ্ এবং গতিহীন জড়বস্তু স্থাবর শব্দের বাচ্য। মনুষ্য সৃষ্টি এক প্রকার। এই সকলই সংক্ষেপতঃ ভৌতিক সৃষ্টি। ভৌতিক সৃষ্টিকে তন্মাত্র সৃষ্টিও বলে।

প্রাকৃত সর্গ ব্যতীত আর একপ্রকার সর্গের নাম—ভাবসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ।

ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গং, ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যঃ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।

সাং কা—৫২

ভাব বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। বিনা লিঙ্গেও ভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং লিঙ্গ সর্গ ও ভাব-সর্গ নামে দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ত্তিত আছে—"লিঙ্গ" করণদিগের সমষ্টি। করণদিগের কার্য্যই ভাব। ভৌতিক সর্গ বাহ্য সৃষ্টি, ভাবসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি। ভৌতিক সর্গ জড় সৃষ্টি (objective বা material) প্রত্যয় সর্গ Subjective বা Psychologically লিঙ্গ সর্গ ও প্রত্যয় সর্গ, এই উভয় সর্গ বিনা অপবর্গের হেতুভূত বিবেক-খ্যাতি উৎপন্ন হয় না। পুরুষের ভোগের জন্য যেমন ভোগায়তন দেহ ও ভোগ্য রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সূক্ষ্মদেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদিগেরও সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তঃকরণ হইতে অষ্টবিধ ভাব সৃষ্ট হয়—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান ইহারা প্রত্যয় সর্গ। অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য।

ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভাবগুলি যখন সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ হয়, তখন তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বলে। যেমন মহর্ষি কপিলের ছিল। যখন তাহারা নৈমিত্তিক অর্থাৎ প্রযত্নজাত হয়, তখন তাহাদিগকে বৈকৃতিক বলে, যেমন বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিদিগের। এই সকল ভাব করণাশ্রয়ী অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠ। এতদ্ ব্যতীত কলল (চর্ম্মাকার গর্ভবেষ্টন), বুদ্‌বুদ্ (সূক্ষ্ম স্ফোট), মাংসপেশী, করণ্ড প্রভৃতি অঙ্গ এবং অঙ্গুলি আদি প্রত্যঙ্গ সকল শরীরাশ্রয়ী।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥

—সাং কা—৪৩

উপরি উক্ত ভাবসকল বুদ্ধিরই রূপ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য সাত্ত্বিক এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য তামসিক।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং, তামসম্ অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্।

সাং কা—২৩

ধর্ম্মের অর্থ—দয়া, দান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান। অধর্ম্ম ইহার বিপরীত—নিষ্ঠুরতা, কার্পণ্য, হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, ইন্দ্রিয়-লিপ্সা, পরদানগ্রহণ, অশুচিতা, অসন্তোষ, তপস্যা হীনতা, স্বাধ্যায়হীনতা এবং নিরীশ্বরতা। জ্ঞান অর্থে বিবেকজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থ মিথ্যা জ্ঞান— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। বিষয়ে আসক্তিহীন মনোভাবই বিরাগ। বিষয়ে আসক্তিই অবৈরাগ্য। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ ইচ্ছার অবিঘাত—অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ইষ্টসিদ্ধি হয় তাহা। অনৈশ্বর্য্য তাহার বিপরীত অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছা দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না সেইরূপ ইচ্ছা।

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবগণের সংস্কার অন্তঃকরণ ধারণ করে এবং ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার ফল জন্মজন্মান্তর।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবত্যধর্ম্মেণ
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।

সাং কা—৪৪

ধর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি লোকে গমন হয়। অধর্ম্মের ফল নরক-প্রাপ্তি। জ্ঞানের ফল অপবর্গ বা মুক্তি। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানের ফল বন্ধ।

বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতি-লয়। রাগের ফল সংসার অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম ভোগ। ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অবিঘাত এবং তাহার বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয়।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ, সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ।

সাং কা—৪৫

যে জ্ঞানের ফল মুক্তি, তাহা হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান। পুরুষ যে বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহে, এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তি। দেহপাতে এই জ্ঞানের ফলে হয় বিদেহ-কৈবল্য। এই জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিনই প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য চেষ্টা করে। জ্ঞান হইলে প্রকৃতি চেষ্টা হইতে বিরত হয়। "বিবেক-খ্যাতি পর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতি চেষ্টিতং"। বিবেক খ্যাতি (বিবেক-জ্ঞান—প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ জ্ঞান) পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা চলে।

অজ্ঞান হইতে যে বন্ধ হয়, তাহা ত্রিবিধ—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণিক। যাহারা প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহাদের বন্ধ প্রাকৃতিক।

যাহারা অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির বিকারভূত, ইন্দ্রিয়, অহংকার এবং বুদ্ধিকে পুরুষ মনে করিয়া তাহাদের উপাসনা করে, তাহাদের বন্ধকে বৈকারিক বন্ধ বলে। আর ইষ্টাপূর্ত্ত—অর্থাৎ যাগযজ্ঞ এবং পূর্ত্তকর্ম্ম (কূপ তড়াগাদি খনন) দ্বারা যে বন্ধ হয়, তাহার নাম দাক্ষিণিক বন্ধ। পুরুষ তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি যাগযজ্ঞ ও সাধারণের হিতকর পূর্ত্তকর্ম্ম দ্বারাও বন্ধপ্রাপ্ত হয়। পুরুষ তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির বৈরাগ্যের ফলই প্রকৃতি লয়; তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির বৈরাগ্যের ফল তাহা নয়। প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহৎ, অহংকার, ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলই বুঝায়। যাহারা মহৎ আদির উপাসনা করেন, তাহাদের লয় মহদাদিতে হয়। এই "লয়ের" অর্থ পরে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও তাহাদের বিপর্য্যয়কে উপরে প্রত্যয় সর্গ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যয় সর্গ চতুর্বিধ—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। ইহাদের বহুবিধ ভেদ আছে। বিপর্য্যয়ের অর্থ অবিদ্যা, অজ্ঞান। জ্ঞানের মতো অজ্ঞানও বুদ্ধির ধর্ম্ম। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করাই অবিদ্যা। তমঃ কর্ত্তৃক অভিভূত বুদ্ধির পরিণামই অবিদ্যা। অশক্তি অর্থ অসামর্থ্য। পদার্থজ্ঞান-উৎপাদনে অথবা ক্রিয়া-উৎপাদনে অসামর্থ্য। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা বশতঃ অশক্তির উদ্ভব হয়। অশক্তিও বুদ্ধিধর্ম্ম। তুষ্টি ও সিদ্ধিও বুদ্ধিধর্ম্ম।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের মধ্যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য সাতটি বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত।

বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির পঞ্চাশটি ভেদ।

গুণের বৈষম্য বশতঃই এই ভেদ হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের একটি অন্য দুইটি অপেক্ষা, অথবা দুইটি মিলিত হইয়া তৃতীয়টি অপেক্ষা বলবত্তর হইলে, অথবা একটি ন্যূন বল হইলে, অথবা দুইটি মিলিত হইয়াও তৃতীয় কর্তৃক অভিভূত হইলে নানাবিধ ভেদের উদ্ভব হয়। এই সকল ভেদের সংখ্যা পঞ্চাশ।

এষ প্রত্যয়সর্গো—বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টি সিদ্ধিরাখ্যঃ
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাস্ত পঞ্চাশৎ।

সাং কা—৪৬

ইহাদের মধ্যে বিপর্য্যয়ের ভেদ পাঁচটি—তমঃ (অবিদ্যা), মোহ (অস্মিতা), মহামোহ (রাগ), তামিস্র (দ্বেষ), অন্ধ তামিস্র (অভিনিবেশ)। তমঃ = অনাত্মে আত্মখ্যাতি। এই আত্মখ্যাতি আটপ্রকার। অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র—ইহারা অনাত্ম। এই অষ্ট প্রকৃতিতে যে আত্মজ্ঞান তাহাই অষ্টবিধ তমঃ বা অবিদ্যা। এই অনাত্মে আত্মখ্যাতি হইতেই প্রকৃতি-লয় হয়।

বৈকল্যজাত অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার, তুষ্টি নয় প্রকার এবং সিদ্ধি অষ্ট প্রকার।

পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদা ভবন্তি, অশক্তিশ্চ করণ-বৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টিঃ নবধা, অষ্টধা সিদ্ধিঃ।

সাং কা—৪৭

অবিদ্যার অষ্টবিধ ভেদ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। মোহ বা অস্মিতাও অষ্টপ্রকার। বুদ্ধির সহিত পুরুষের একত্বাভিমানই অস্মিতা। "আমি আঢ্য," "আমি অভিজাত" প্রভৃতি আমিমূলক অভিমানই অস্মিতা। আবার "আমার স্ত্রী," "আমার পুত্র" ইত্যাদিরূপ অভিমানই "মমতা"। দেবগণ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন বলিয়া "আমরা অমর" ইত্যাদি ধারণাই তাহাদের অস্মিতা। ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ বলিয়া উহাতে আত্মজ্ঞানও অষ্টবিধ।

মহামোহ অর্থে রাগ বা আসক্তি। সুখ-লক্ষণ দিব্য ও অদিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক, যোগিগম্য, তন্মাত্র-লক্ষণ সূক্ষ্ম শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি, এবং লৌকিক স্থূল শব্দাদি—এই দশরূপ বিষয়ে আসক্তিই মহামোহ।

তামিস্র এবং অন্ধ-তামিস্র উভয়ই অষ্টাদশবিধ। তামিস্র অর্থ দ্বেষ—পূর্ব্বোক্ত লৌকিক পঞ্চবিধ রূপ-রস-গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ বিষয়ে, পঞ্চ নাবক বিষয়ে এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিবতে রূপ অনৈশ্বর্য্যে দ্বেষ—এই অষ্টাদশবিধ তামিস্র।

অন্ধতামিস্র অর্থে অভিনিবেশ বা ত্রাস। সুখ-লক্ষণ উপরিউক্ত রূপ রসাদি দশ বিষয় এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের নাশের শঙ্কাজনিত ভয়।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো, মোহস্য চ দশবিধো, মহামোহঃ।
তামিস্রো অষ্টাদশধা, তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ

সাং কা—৪৮

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যে বিকলতা তাহাই অশক্তি। বুদ্ধির বিকলতা সপ্তদশ প্রকার। তাই অশক্তি মোট অষ্টাবিংশতি প্রকার।

বধিরতা, কুণ্ঠিতা, অন্ধতা, জড়তা (রসনার জড়তা), অজিঘ্রতা (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দোষ), মূকতা, কৌণ্য (পাণি-ইন্দ্রিয় বৈকল্য), পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত (মলমূত্রবায়ু নিঃসরণ-রোধক রোগবিশেষ), ক্লৈব্য, মনের মন্দতা—এই একাদশ-বিধ ইন্দ্রিয় বিকলতা। এই বিকলতাবশতঃ বুদ্ধির অশক্তি একাদশবিধ। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির স্বরূপগত অশক্তি সপ্তদশ প্রকার; নয় প্রকার তুষ্টি এবং আট প্রকার সিদ্ধির বিপরীত বুদ্ধির স্বরূপগত অশক্তি। মোট অশক্তি অষ্টাবিংশবিধ—

একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধেবিপর্য্যয়াৎ তুষ্টি সিদ্ধীনাম।

সাং কা—৪৯

তুষ্টি অর্থে সন্তোষ। মোক্ষ পথে সন্তোষও মোক্ষের বাধাস্বরূপ হয়। তুষ্টি দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতি-তুষ্টি, উপাদান-তুষ্টি, কাল-তুষ্টি, ভাগ্য-তুষ্টি। পঞ্চ বাহ্য বিষয় হইতে উপরতিজনিত পাঁচটি বাহ্যতুষ্টি। মোট নয় প্রকার তুষ্টি। প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হইয়াও যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা পুরুষ সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা না করে পরন্তু আপনার জ্ঞানেই তুষ্ট থাকে, তাহার তুষ্টি আধ্যাত্মিক।

প্রকৃতি হইতে আত্মার পৃথকত্বের যে জ্ঞান, তাহা প্রকৃতির পরিণাম বিশেষ। সে জ্ঞান প্রকৃতি হইতে তো আপনিই হইবে—তাহার জন্য ধ্যানাভ্যাস বা নিদিধ্যাসনের

প্রয়োজন নাই। এই মনোভাবই প্রকৃতি তুষ্টি। ইহার অপর নাম 'অন্তঃ'।

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেই পুরুষ সাক্ষাৎকার হইবে, এই বিশ্বাসে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ধ্যানাভ্যাস না করিয়া যে তুষ্টি, তাহাই উপাদান তুষ্টি। এই তুষ্টিকে সলিলও বলে।

কালে একদিন মোক্ষ হইবেই, এই বিশ্বাসে সাধন বিষয়ে উদ্যমহীনতা ও তদবস্থায় তুষ্টিকে কাল তুষ্টি বলে। ইহার অপর নাম "মেঘ"। মোক্ষলাভ উদ্যম সাপেক্ষ, আপনা হইতে কালবশে হয় না।

মুক্তি ভাগ্যসাপেক্ষ, অর্থাৎ জন্মান্তরকৃত কার্য্যের উপর নির্ভর করে। মদালসা নাম্নী গন্ধর্ব্ব রাজকন্যার পুত্রগণ বিবেক খ্যাতি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। জন্মান্তরকৃত কর্ম্মই তাহার কারণ—সুতরাং ভাগ্যে যদি থাকে মুক্তি হইবে। এই বিশ্বাসে যে উদ্যমহীনতার উদ্ভব হয়, তাহাতে তুষ্টিকে ভাগ্য-তুষ্টি বলে।

এই চারিটি আধ্যাত্মিক তুষ্টি। অনাত্ম বিষয়ে বৈরাগ্য হইতে যে তুষ্টির উদ্ভব হয় তাহা বাহ্য তুষ্টি। ভোগ্য বিষয় পাঁচটি—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই পঞ্চ বিষয় হইতে উপরতিই বাহ্য উপরতি। বাহ্য বিষয়ের দোষ পাঁচটি—অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসা। ধনের উপার্জ্জন করিতে হয় পরের সেবা প্রভৃতি দ্বারা। সকল উপায়ই দুঃখজনক। এই দুঃখের জ্ঞান হইতে যে উপরতি তাহার নাম 'পার'। অর্জিত ধনের রক্ষণও দুঃখজনক। এই চিন্তা হইতে বিষয়ভোগের উপরতিতে যে তুষ্টি, তাহার নাম "সুপার"। বহু কষ্টে অর্জিত ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান হইতে উদ্ভূত বিষয়োপরতিতে যে তুষ্টি, তাহাকে "পারাপার" তুষ্টি বলে। ভোগ দ্বারা ভোগ-কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাম্যবস্তুর অভাবে দুঃখ হয়। এই চিন্তা হইতে যে বিষয়োপরতি হয়, তাহাতে তুষ্টিকে বলে "অনুত্তমাম্ভ"। কোন ভোগই হিংসা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। যেমন মধুর বংশীধ্বনির জন্য বংশী প্রস্তুত করিতে বংশ (বাঁশ) কাটিবার প্রয়োজন। এই হিংসাদোষ দর্শন করিয়া ভোগে উপরতিতে যে তুষ্টি, তাহাকে "উত্তমাম্ভ" তুষ্টি বলে।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ।

সাং কা—৫০

সিদ্ধি আটটি—উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, তিনটি দুঃখ-বিঘাত সুহৃদ্‌প্রাপ্তি ও দান। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সিদ্ধির বিঘাতক।

অষ্টসিদ্ধির মধ্যে প্রধান—তিনটি দুঃখবিঘাত। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। এ ত্রিবিধ দুঃখের বিঘাতও ত্রিবিধ। তাহারাই মুখ্যসিদ্ধি, অন্য সিদ্ধি গৌণ। গৌণ সিদ্ধির সংখ্যা পাঁচ। গৌণ সিদ্ধিদিগের মধ্যে প্রথম অধ্যয়ন। নিয়মানুসারে গুরুমুখ হইতে অধ্যাত্ম বিদ্যাদিগের অক্ষর স্বরূপ গ্রহণই অধ্যয়ন—প্রত্যেক শব্দের অন্তর্গত অক্ষরদিগের যথাযথ উচ্চারণ। তাহার পরে শব্দসিদ্ধি। শব্দ অর্থে—শব্দের অর্থগ্রহণ। "অধ্যয়ন" সিদ্ধিকে "তার" সিদ্ধি এবং শব্দ সিদ্ধিকে "সুতার" সিদ্ধিও বলে। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞানলাভের উপায়। অধ্যয়ন ও শব্দ দ্বারা শ্রবণের দুইটি ক্রম বুঝায়—গুরুমুখ হইতে শ্রবণ ও পরে অর্থগ্রহণ।

উহ শব্দের অর্থ তর্ক। আগমের অবিরোধী যুক্তি দ্বারা আগমের অর্থপরীক্ষাই উহ। সংশয়াত্মক পূর্ব্ব পক্ষের নিরাকরণ করিয়া উত্তর পক্ষের ব্যবস্থাপন। এই তৃতীয় সিদ্ধির নাম তারতার সিদ্ধি। ইহা "মননে"র অন্তর্গত। শ্রুতিতে আছে "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এখানে একমাত্র আত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়, অথবা এক জাতীয় বহু আত্মা, এই সংশয়ে জন্ম-মরণ-করণদিগের ভিন্নত্ব হইতে পুরুষ বহুত্ব সিদ্ধান্তই উহ।

শিষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। ইহাই সুহৃদ্‌-প্রাপ্তি। ইহাও মননের অন্তর্গত। এই সিদ্ধির অপর নাম "রম্যক"।

বিবেক জ্ঞানের শুদ্ধি—প্রকৃতি-পুরুষের বিভেদজ্ঞানের শুদ্ধিই দান। "দান" শব্দ 'দৈপ্‌' ধাতু হইতে উৎপন্ন। "দৈপ্‌" ধাতুর অর্থ শোধন করা। ইহার নামান্তর "সদাপ্রমুদিত।"

বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা অর্থাৎ নির্ম্মল। তাহাই ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির উপায়। সবাসনা সংশয় ও বিপর্য্যয় জ্ঞানই মল স্বরূপ। এই মলহীন বিবেক খ্যাতিই অবিপ্লবা শুদ্ধি। মলহীন অবস্থায় বিবেক খ্যাতি স্বচ্ছ প্রবাহে অবস্থান করে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নতা বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে বিবেক সাক্ষাৎকারে বিচ্ছেদ ঘটে। এই সংশয় উপস্থিত

হয় সংস্কারের ফলে। আমি সুখী, ধনী, মানী—প্রভৃতি যে সকল সংস্কার মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া থাকে, প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান হইলেও, তাহারা মনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সংশয়ের এবং মিথ্যা জ্ঞানের সৃষ্টি করে। তাহার ফলে বিবেকখ্যাতির নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। সবাসনা সংশয় ও বিপর্য্যয়ের তিরোধান হইলে বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা হয়। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল প্রকৃতি-পুরুষের ভিন্নতা চিন্তনের পরিপূর্ণতার ফল এই নির্ম্মলতা। ইহাই সদাপ্রমুদিতা শুদ্ধি—

দুঃখত্রয়-"বিঘাত" তিনটি মূল সিদ্ধির নাম প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান।

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতা স্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানং চ সিদ্ধয়োষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশঃ ত্রিবিধঃ।

সাং কা—৫১

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। এই উপায়-নির্দ্দেশের জন্য দুঃখের উৎপত্তি বর্ণনারও প্রয়োজন হইয়াছে। জগৎ দুঃখময় কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক পদার্থ জগতের উপাদান। তাহাদের সাম্যাবস্থা জগতের অপ্রকাশিত অবস্থা। সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে মহৎ অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। তার পরে নানাবিধ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক সৃষ্টি। আধিভৌতিক সৃষ্টি হইতেছে সূক্ষ্মদেহ, মাতা-পিতৃজ স্থূল দেহ ও অন্যবিধ জড় পদার্থ। আধ্যাত্মিক সৃষ্টির নাম প্রত্যয় সর্গ।

প্রত্যয়সর্গ মুখ্যতঃ আটটি—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদিগকে ভাবও বলে। সূক্ষ্ম শরীরেই ইহাদের অবস্থিতি—সূক্ষ্ম শরীর এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত। এই সকল ভাব আবার পঞ্চবিপর্য্যয়, ২৮ প্রকার অশক্তি, ৯ প্রকার তুষ্টি এবং অষ্ট সিদ্ধিতে বিভক্ত। এই পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয় সর্গ।

সর্গ ও প্রতিসর্গ

(সঞ্চর-প্রতিসঞ্চর)

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি হয়। প্রথমে মহৎ, পরে ক্রমে ক্রমে অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত আবির্ভূত হয়। অহংকার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস, এবং ভূতাদি। বৈকারিক অহংকার হইতে উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয়গণ, ভূতাদি অহংকার হইতে তন্মাত্রগণ। তৈজস অহংকার হইতে নূতন কিছুর সৃষ্টি হয় না। তাহা ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র-সৃষ্টির সহায়ক। তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের উদ্ভব হয়। এই ক্রমে প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা সঞ্চর বা সর্গ হয়। প্রতিসঞ্চর বা প্রলয় ইহার বিপরীতমুখী। প্রলয়ে স্থূলভূতগণ তন্মাত্রে বিলীন হয়, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণ অহংকারে, অহংকার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি অব্যক্তে বিলীন হয়। ধ্বংস কিছুরই হয় না। সকলই অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে সর্ব্বকারণ-কারণ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সৃষ্টি দ্বিবিধ—ভূতসর্গ ও প্রত্যয় সর্গ। প্রত্যয় সর্গ বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধিভেদে চতুর্বিধ। ইহারা আবার পঞ্চাশ প্রকারের। ইহারা আভ্যন্তরীণ (মানসিক) সৃষ্টি, বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। ইহারা বুদ্ধিতে লীন হয়, বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন থাকে একদিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থা রূপ প্রকৃতি ও অন্যদিকে অসংখ্য পুরুষ। তখন কি প্রকৃতি ও পুরুষের তথাকথিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়?

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? প্রলয়ে যদি এই সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত, তাহা হইলে সকল পুরুষই তখন মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইত বলিতে হইবে। মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা থাকে না, এবং তাহার পুনরায় বন্ধনও হইতে পারে না। কিন্তু প্রলয়ে অবিদ্যার ধ্বংস হয় না, তাহা প্রকৃতিতে লীন হয় মাত্র। প্রলয়ান্তে তাহা পুনরুত্থিত হয় এবং প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধির সহিত—যাহা প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়া সুপ্ত থাকে, তাহার সহিত—যুক্ত হয়। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন অবিদ্যার বিনাশ হয় এবং পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। যে সকল পুরুষের সেই জ্ঞান হয় নাই, তাহারা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয় বলা যায় না।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি। সৃষ্টি-প্রবাহ যেমন অনাদি প্রলয়ও তেমনি অনাদি।—অর্থাৎ সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

চিরমুক্ত পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত এই জগদ্ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতির সহিত তাহাদের সংযোগ কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। যাঁহারা সাধনবলে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সহিতও বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ নাই। অবশিষ্ট যাবতীয় পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রলয়ে এই সংযোগ, যতদিন প্রলয় থাকে, ততদিনের জন্য হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়। তখন পুরুষের ভোগ থাকে না। কিন্তু সে বিচ্ছেদ স্থায়ী হয় না। প্রলয়ান্তে তাহার বুদ্ধির সহিত সংযোগের ফলে ভোগ পুনরায় আরব্ধ হয়।

প্রলয়ে প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। কিন্তু তখন প্রকৃতির ক্রিয়ার ফলে নূতন কিছুর উদ্‌ভব (বিসদৃশ পরিণাম) হয় না। তখন প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ একই অবস্থা বারংবার উদ্‌ভূত হয়। কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। প্রলয়কালেও প্রকৃতিতে অনুস্যূত উদ্দেশ্যের (পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন) ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলেই প্রলয় হয় এবং প্রলয়কেও সংসার চক্রের একটি ক্রম বলিতে হইবে। মুক্তিতে মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির ক্রিয়া চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়। সৃষ্টি যেমন পুরুষের প্রভাবের ফল, প্রলয়ও তেমনি প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রভাবের ফল। পুরুষের প্রভাবের অর্থ এই যে ত্রিগুণের মধ্যে যে উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রবিষ্ট, তাহার ফলে প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াই পুরুষের প্রয়োজন-সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলোৎপত্তির জন্য যখন নূতন ভোগের অনুৎপত্তির প্রয়োজন হয়, তখনই প্রলয় হয়। জীবের স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই তাহার মোক্ষ হয়। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল ভোগ দ্বারাই জীবের অন্তরে বৈরাগ্য-সঞ্চার হয় এবং বৈরাগ্য হইতেই বিবেক জ্ঞানের উদ্‌ভব হয়। কর্ম্মফলের পরিপাকের জন্য সময়ের প্রয়োজন। প্রলয় দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম ভাবে প্রকৃতির মধ্যে লীন জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার যখন ফলোন্মুখী হয়, তখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধিসহ তাহার লিঙ্গদেহ তখন পুনরুত্থিত হইয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে প্রলয়ে পুরুষের সহিত তাহার লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না—এক অজ্ঞাত উপায়ে পুরুষ ও তাহার লিঙ্গদেহের মধ্যে স্ব-স্বামী সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, যদিও যতদিন প্রলয় থাকে, ততদিন তাহার ফলে পুরুষের ভোগ কিছু হয় না। কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র সকলই যখন বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া ত্রিগুণে পর্য্যবসিত হয়, তখন প্রত্যেক পুরুষের বিশিষ্ট বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হয় কিরূপে? হয়তো ইহারা বিশিষ্ট অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু কর্ম্মফলে ত্রিগুণের ভাণ্ডার হইতে সংহত হইয়া আবির্ভূত হয়, পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে।

প্রলয়ে স্থূল কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও যাবতীয় ব্যষ্টি অহংকার তাহাদের ব্যষ্টি বুদ্ধির মধ্যে এবং ব্যষ্টি বুদ্ধি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয় অর্থাৎ তাহাদের উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিশ্লিষ্ট হয়। এইরূপে জীবের লিঙ্গ দেহ প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়। লিঙ্গদেহদিগের বাহিরে যে তন্মাত্র ও স্থূলভূত থাকে, তাহারাও প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন বিষয়ের ও বুদ্ধির অভাবে বিষয়ের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হয় না। বুদ্ধির প্রতিবিম্ব ও পুরুষে পতিত হয় না, এবং পুরুষের প্রতিবিম্বও বুদ্ধিতে পতিত হয় না। সুতরাং পুরুষের ভোগ হয় না। প্রলয়ান্তে কিরূপে প্রত্যেক পুরুষের পূর্ব্ব সর্গের বুদ্ধি তাহার অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি সহ পুনর্গঠিত হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য। লিঙ্গদেহের অবিদ্যা ও কর্ম্মের বিনাশ হয় না। এই অবিদ্যা ও কর্ম্ম বশতঃই ইহা সম্ভবপর হয়; কিন্তু কোন প্রণালীতে হয়, তাহা আমরা জানি না। প্রত্যেক পুরুষের লিঙ্গদেহ প্রলয়ান্তে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার সহ তাহার সহিত সংসক্ত হয়, ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে অমুক্ত পুরুষদিগের সহিত তাহাদের লিঙ্গদেহের উপাদানদিগের একটা সম্বন্ধ থাকিয়া যায়, সে সম্বন্ধ যতই ক্ষীণ হউক না কেন। অবিদ্যা ও কর্ম্মই এই সম্বন্ধের ভিত্তি। বুদ্ধিই অবিদ্যা ও সংস্কারের আধার। প্রত্যেক বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলেও কিরূপে ব্যক্তির অবিদ্যা ও সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক পুরুষের সহিত তাহার লিঙ্গদেহের অবিদ্যাও কর্ম্মের সম্বন্ধ যে বিনষ্ট হয় না, প্রলয়ান্তে তাহার সহিত পূর্ব্বকল্পের লিঙ্গদেহের সংযোগই তাহার প্রমাণ।
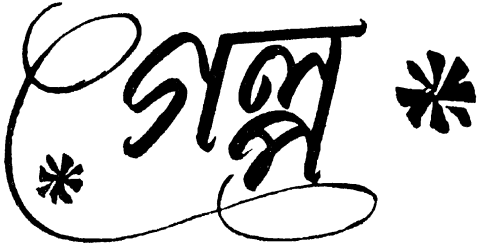
তুলি-আঁকা

মানবেন্দ্র পাল

দশ আঙুলে টাকা উপায়। এক-আধ দিন নয়, তা প্রায় ন' দশ বছর হল বৈকি।

বৈচিত্র্যহীন গদ্যময় জীবন। স্টেট্‌মেণ্ট আর ড্রাফ্‌ট—ইয়ারএণ্ডিং ব্যালান্স সীট—টাকা, আনা, পাই; হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি। মেশিনেরও বিরাম নেই—বিরাম নেই দশটা আঙুলেরও। যন্ত্রের সঙ্গে নিজেও যন্ত্র হয়ে পড়েছি। ভেবেছিলাম, কর্মজীবনের বাকি কটা দিনও কোনরকমে এইভাবে কেটে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু সহসা কোথা থেকে মাধবী এসে পড়ল।

মাধবী এসে পড়ল এই সেদিন, সাতটা রাত্রিও কাটেনি। অথচ এই কটাদিনের মধ্যে দেহে মনে কী যেন একটা পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেল। মনে হল, এ জীবনে আমি ঠিক আর একা নই, আরও যেন কে এক অপরিচিতা আমার এই নিঃসঙ্গ গদ্যময় জীবনের সঙ্গে গ্রন্থি বেঁধে নিয়েছে। এক এক সময়ে ভাবতে ভালো লাগে, এই অপরিচিতা তরুণী বধূ—এ আমারই। এর দেহের এবং মনের ওপর আমারই পূর্ণ অধিকার। আজও ওকে ভালোভাবে চিনতে পারিনি—কিন্তু একদিন এই মাধবীই আমার সবচেয়ে আপনজন—প্রিয়তমা হয়ে উঠবে।

মার্চেণ্ট অফিসের লোয়ার গ্রেডের টাইপিস্ট মৃণাল চৌধুরীর জীবনেও অবশেষে একদিন বসন্তের বাতাস বইল! ভাবতে গিয়ে হাসি পায়—ভয় হয়; প্রেমের রোমাঞ্চ আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

তবু—

তবু আজকের এই প্রথম অগ্রহায়ণের শীত-শীত রাত্রে, আকাশের বুকে কুয়াশা-ঢাকা আধখানা চাঁদের আলোয় আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে রাখা ভালো; মাধবী যে রয়েছে একান্ত কাছে—মৌন! যেন প্রতীক্ষা করছে।

মাধবী খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কী যেন ভাবছিল। এক সময়ে বললে—তুমি কবিতা লেখ, না?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা অদম্য কৌতূহল জেগে উঠল। জিগেস করতে যাচ্ছিলাম, কেমন করে জানলে? কিন্তু মাধবীর মুখের পানে তাকিয়ে উৎসাহ কমে গেল। মাধবী যেন এ জগতে আর নেই। কখন কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্তে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল—সে কৌতূহল মিটল কিনা জানি না, কিন্তু মাধবী অন্য চিন্তায় ডুবে গেছে।

তবু একবার চেষ্টা করলাম। কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললাম—কী জিগেস করছিলে যেন?

মাধবী বললে—তুমি ছবি আঁকতে পার না?

আবার আশ্চর্য হলাম। বললাম—ছবি! না, ছবি তো আঁকতে পারি না।

—কিন্তু তোমায় যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন কি ভেবেছিলাম জান?

—কী?

—ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি আর্টিস্ট! কী জানি কেন আমার মনে হয়েছিল।

ক্ষোভের হাসি হেসে বললাম—যাক আর্টিস্ট না হই, আর্টিস্টজনোচিত গুণ তো চোখে পড়েছে? তা হলেই হল।

মাধবী আর কোনো উত্তর দিলে না। আবার কেমন উন্মনা হয়ে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টি আজকের এই নীরব মিলন-বাসরের নিভৃত কক্ষে বদ্ধ নয়—বহুদূর প্রসারী।

তবু জিগেস করলাম—তুমি বুঝি ছবি আঁকতে পার?

মাধবী মাথা নাড়ল।

—তবে? যারা ছবি আঁকে তাদের বুঝি ভালোবাস?

মাধবী উত্তর দিল না।

কিন্তু—

সহসা আজ এই মধুর রাত্রে আমার উন্মুখচিত্ত যেন

থমকে গেল। নিঃসন্দেহে মাধবী আমার জীবনে প্রথম মেয়ে নয়—

ভাবি, আবার কেন? সে সব অতীত তো মরে গিয়েছে!

তবু—

আজ এই অতিসাধারণ সহজ সরল মেয়েটির কাছে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে এ যেন আমার মস্ত বড়ো পরাজয়।

মাধবী চেয়েছিল যা তা হয়তো পায়নি।—যা কল্পনা করেছিল, মৃণাল চৌধুরী বুঝি তা নয়।

তবু আর একবার বললাম—আচ্ছা, তুমি কি আমার কবিতা পড়েছ?

উত্তর এল না।

মাধবী পাশ ফিরে শুয়েছে।

একবার ভাবলাম, উঁকি মেরে দেখি, মাধবী সত্যি ঘুমিয়েছে কি না, কিন্তু দেখতে ভয় হল।

হয়তো মাধবী ঘুমোয়নি, হয়তো মাধবী তার কবিতা পড়েনি, হয়তো সে সব কবিতা তার ভালো লাগেনি, হয়তো ভেবেছে সামান্য টাইপিস্টের এ শখ আবার কেন? কিম্বা কবিতা হয়তো তার ভালোই লাগে না।

তবে?

মাধবীকে ক্ষমা করা যাক। ও মেয়ে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। কাব্য ওর জন্য নয়। ও তুলির রঙে ভোলে। রঙ দেখলেই মন মেতে ওঠে।

কিন্তু তুলির রঙে কি একা মাধবীই ভোলে; আর কি কেউ কোনোদিন ভোলেনি?

হাসি পেল—কতজন!

কিন্তু তবু তারই মধ্যে একজনের কথা আজ সহসা বহুদিন পর মনে পড়ল।

ভেবে ভেবে সুধাকে আজ মনে করতে হয়নি, সুধা সহসা নিজেই হাজির হল।

সুধার কথা ভাবতে গিয়ে আজ আর একজনের কথাও মনে পড়ছে। সুধার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো অধ্যায় যদি কোনোদিন জড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার সুফল এবং কুফলের জন্যে আমি দায়ী করব তাঁকেই।

সুধা যদি আজও আমায় ভাবতে গিয়ে ঘৃণায় শিউরে ওঠে তবে তার জন্যে দায়ী মালতী চৌধুরী। কিম্বা, কোনো এক নির্জন দ্বিপ্রহরে আজও যদি সুধা আমায় মনে ক'রে আনন্দ পায়—যদি তার সংসারের নিত্য কর্মের কোনো এক টুকরো মূল্যবান মুহূর্ত আমার জন্য নষ্ট করে, তাহলে তার জন্যও দায়ী মালতী চৌধুরী।

জানিনা তাঁর মনে কী ছিল, কিন্তু তিনিই একদিন ঠেলে দিয়েছিলেন মফস্বলের অন্ধকার-ভরা আম-জামরুলের ছায়াঘেরা বাড়ির উঠোন থেকে সুদূর দক্ষিণ কলকাতার এক প্রাসাদপুরীর দিকে।

বলেছিলেন, ঠাকুরপো, তোমার কবিতা সুধা নিশ্চয়ই পড়েছে।

জিগেস করেছিলাম—সুধা! সে আবার কে বৌদি?

বৌদি আশ্চর্য হয়ে বললেন—ওমা সুধার নাম শোননি? আমার বোন সুধা!

না, সুধাকে তখনো চিনিনি। সুধা কেন, মহানগরীর কোনো নাগরিকাকেই তখনো জানতে পারিনি। সে সুযোগ তখনো আসে নি, প্রলোভনও জাগেনি।

বৌদি বললেন—এবার তো কলকাতায় কাজ পাচ্ছ, সুধার সঙ্গে আলাপ কোরো, খুশি হবে।

খুশি হবে!

কিন্তু কে?

হয়তো সুধা রায়।

তারপর একদিন শীতের এক ক্ষণায়ু অপরাহ্নে একডালিয়া-প্লেসের এক আভিজাত্য ঘেরা পরিবেশে ধীর সসংকোচ পদবিক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ালো এক তরুণ। বুক দুরু দুরু—চোখে মুখে কী এক কৌতূহল মেশা উদ্দীপনা!

পরিচয় হতে দেরি হল না। বৌদি আগে থেকেই চিঠিপত্র লিখে ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদির মা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল। কত খবরাখবর—কত গল্প, কিন্তু যার জন্যে আসা, সে কই?

বৌদির মা বললেন—তুমি আসবে খবর পেয়ে সুধার কী আনন্দ! রোজ বলে, মা, ভদ্রলোক হয় তো আজ আসতে পারেন। তোমায় আবার 'ভদ্রলোক' 'ভদ্রলোক' বলে। ভেবেছে, কী না হোমরা-চোমড়া লোক!

মাসীমা হেসে উঠলেন।

অনেক ভেবে মনে মনে বারকতক আবৃত্তি করে জিগেস করে ফেল্‌লাম—তাঁকে তো দেখছি না।

—কাকে ? বৌদির মা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—ওই যে যাঁর কথা বল্‌লেন।

—সুধা ! ওমা, ওকে আবার অত খাতির করে কথা বলা কেন ? বৌদির মা হাসতে লাগলেন।

আমার কেমন লজ্জা হল। বুঝতে পারলাম না, খাতির করে কথা বলায় হাসবার কী থাকতে পারে।

বৌদির মা বললেন—ও বিকেলে একটু বেরিয়েছে, এখুনি ফিরবে। তুমি বরঞ্চ ওপরে গিয়ে বোসো, ও এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মনে মনে ভাবলাম, বেশ ! তাই হোক। কোথায় আমার অফিস—কোথায় সেই শেয়াল-ডাকা বামুন-পাড়া গাঁ, আর কোথায় এই রাজপ্রাসাদ !

চুপচাপ ওপরের ঘরে বসে রইলাম। ঘরভর্তি বই। বৌদির মা আলমারিগুলোর চাবি খুলে দিয়ে গেলেন। বললেন—তুমি ততক্ষণ বই পড়ো বাবা।

কিন্তু বই পড়ব—মনের সে অবস্থা তখন নয়। চারিদিক ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। কাচের ফুলদানি থেকে ইলেকট্রিক বাল্‌ভ পর্যন্ত অপূর্ব। সামনে নীল ঢাকনা দেওয়া রেডিও—বড়ো অদ্ভুত দেখতে। এ পরিবেশে উঠে দাঁড়িয়ে নানা কায়দার আলমারি খুলে বই দেখতে যাওয়ার মতো মনের বল ছিল না।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ বাইরে দ্রুত চটির শব্দ শোনা গেল। কে যেন আসছে। ফিরে তাকালাম। সুধা।

জীবনে সেদিন পর্যন্ত অনেক সুন্দর মেয়ে দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার এই বাড়িতে বসে আজ এই মুহূর্তে যাকে দেখলাম—তার মতো বিচিত্র মেয়ে চোখে পড়েনি।

সুধা সুন্দরী কিনা জানিনা, তার মুখের ডোল, চোখের টান, নাকের গড়ন, গায়ের রঙ কেমন, তার বর্ণনা চলে না ; কিন্তু সবকিছু নিয়ে সে যে আকর্ষণ করতে পারে—এ সত্য বুঝতে দেরি হয় নি।

সুধার চোখের কোনে হাসি ফুটে উঠল ; বললে—নমস্কার !

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা লেগে পেপার-ওয়েটটা ছিটকে পড়ল। লজ্জা পেলাম, তবু তাকালাম সুধার পানে। সুধা তখন ডুকরে ডুকরে হাসছে।

বললে—কী দেখছেন ওমনি করে ? বলে তখনি ছুটে চলে গেল।

জানি, আজ হয়তো ভাবতে গেলে হাসি পাবে, লজ্জা হবে ; লজ্জা সেদিনও বড় কম হয় নি। কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়মাখা মুগ্ধতা আমার শহরবাসের ইতিহাসে প্রথম, বোধহয় শেষও।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বুঝলাম, প্রথম আলাপেই ছন্দপতন ঘটেছে। ভাবলাম, তবু সব লজ্জা ছেড়ে ফেলে নীচে গিয়ে ওদের মাঝখানে দাঁড়াই। বৌদির মা আছেন।

কিন্তু কানে এল নীচে তখন সুধা মুখর হয়ে উঠেছে—ও কী রকম ভদ্রলোক মা ? দিদিটার দেওর এমনি, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বৌদির মা বললেন—চুপ কর্ বাছা ! ছেলেমানুষ, এই প্রথম কলকাতা এসেছে। ভালোভাবে মেলামেশার আদব-কায়দা জানেনা। তা ওসব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেটি খাসা। তার ওপর খুব ভালো কবিতা লেখে।

সুধার কলহাস্য আবার বুকে এসে বিঁধল।

—কবিতা লেখেন উনি ! তা হলে 'কবি' বলো ?

না, আর ওদিকে যাওয়া হল না। লজ্জা—লজ্জা—কী—অপরিসীম লজ্জা ! মনে মনে শিউরে উঠলাম। ভাবলাম, চলে যাই এই বেলা। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।

চোখের সামনে থেকে সে মুহূর্তে একডালিয়া প্লেসের সে-রাজপ্রাসাদ অন্তর্হিত হয়ে গেল— মিলিয়ে গেল সুধা রায়। চোখের সামনে ভাসতে লাগল মার্চেন্ট অফিসের এক লোয়ার গ্রেড টাইপিস্টের সকরুণ মুখ—টেম্পোরারি চাকরীর বাঁকা ভ্রূকুটি যেন বারে বারে তাকে নিঃশব্দে শাসন করছে !

মনে মনে শতবার নিজেকে ধিক্কার দিলাম। কেন আমার কবিতা লেখার পাগলামি ! কে মূল্য দেবে এর ? ষাট টাকা মাইনের টাইপিস্ট আবার কবি হয় কখনো ? ভাগ্যি সুধা জানেনি, মৃণাল চৌধুরী মার্চেন্ট অফিসের এক ক্ষণস্থায়ী টাইপিস্ট মাত্র।

তা যদি জানত—

কিন্তু আবার সুধা ?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনো ও-বাড়ি যাব না। চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে এসেছি। আর নয়। আর সেই সঙ্গে আর একটি শপথ—সুধাকে মনে করব না আর।

কিন্তু সুধাকে ভোলা যায় কই ? পথ চলতে 'সুধা'—রাত্রে ঘুমোবার আগে 'সুধা'—একটু নির্জন মুহূর্ত পেলেই 'সুধা' এসে হাজির। অফিসের এতটুকু অবসর সময়ে কতবার যে ইংরিজিতে ওই নামটা মিথ্যেই টাইপ করে গেলাম, তার ইয়ত্তা নেই। এও একটা খেলা বৈকি।

আশ্চর্য হই, একপক্ষ যখন গভীর ঔদাসীন্যে একজনকে এড়িয়ে যায়, অপর পক্ষ তখন দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে সেই অবহেলাকে বিশ্লেষণ করতে বসে।

তবু সুধার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। আর দেখা করব না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু একডালিয়া প্রেস থেকে চিঠির বিরাম নেই। একটার পর একটা চিঠি আসে—তুমি কি রাগ করলে বাবা ? তুমি কি কিছু মনে করেছ ? তুমি কি কিছু ভুল বুঝেছ ? ভালো আছ তো ? একটিবার এসো না ?

সে-সব চিঠির কোনোটার জবাব দেওয়া হয়,কোনোটার হয় না।

তবু দিনের পর দিন ব্যর্থ আহ্বানের লিপি বন্ধ হয় না।

কিন্তু তাও একদিন বন্ধ হ'ল। সে বন্ধ হবার আগের চিঠিটা এই—সুধা তোমার কবিতা পড়তে চায়। ও অনুতপ্ত। ওকে ক্ষমা করো। তুমি অবশ্য অবশ্য তোমার কবিতাগুলো নিয়ে এসো।

সে চিঠি পড়ে হাসি পেল। দেশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

তার পর ?

তারপর আর যোগাযোগ নেই।

একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ সুধার কথা মনে পড়ল। কিন্তু—

সুধার মুখ আর মনে পড়ছে না। কেমন যেন অস্পষ্ট আবছা। হিসেব করে দেখলাম, একটি বছরের চাকা এরই মধ্যে ঘুরে গিয়েছে কখন।

মনে মনে ভাবলাম, যাক্ চুকে গেল বোধ হয়। কিন্তু তখনও একটু বাকি ছিল।

অবশিষ্ট সেই দিনটির কল্পনা অনেক দিন অনেক ভাবেই করেছিলাম, কিন্তু এত শিগ্‌গির সে দিনটি এগিয়ে আসবে ভাবতে পারি নি।

তাই সেদিন অপ্রত্যাশিত খামখানা পেয়েই তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে লাগলাম।—

সুধার নামের সঙ্গে যে নামটি জড়িয়ে রয়েছে—তিনিও মৃণাল। কিন্তু সে মৃণালের সঙ্গে মৃণাল চৌধুরীর পরিচয় নেই। তবে পরিচয় দেবার মতো যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারী যে তিনি, তার বিশদ বর্ণনা সুধার মা নিজেই দিয়েছেন।

সব শেষে একটি কথা—যদি আমি বা সুধা কোনোদিন তোমার ওপর কোনো অন্যায় করে থাকি বাবা, তা হলে ভুলে গিয়ে অন্তত এই একটি দিন এসো। তোমায় কত দিন দেখিনি ভাবতে পার ?

ভাবতে আমিও পারিনি যে, সত্যিসত্যিই আবার এমনিভাবে আমায় সুধার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

—না, আমি দাঁড়াই নি, সুধাই আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এই গোধূলি লগ্নে সুধাকে দেখলাম আর এক চোখে। আজ দ্বিপ্রহর রাতে এই সুধা সমর্পিতা হবে। সিঁথির ওপর ঝল্‌মল্ করে উঠবে রাঙা সিঁদুর। সোনার চুড়িতে চুড়িতে রিণিঝিনি বাজবে। ঘুম আসবে ওর ওই কাজল টানা চোখের কোলে কোলে।

তবু—

এখনো এই মুহূর্তে সুধা একা। এখনো সে কারও বিশেষ অধিকারের বজ্রমুষ্টির তলায় লুপ্ত হয়ে যায়নি।

—এতদিন পর মনে পড়ল !

সুধা কথা বললে প্রথম।

—মনে পড়ত বলেই এত কাল পর এলাম।

—আমাকে মনে পড়ত আপনার ?

—মনে না পড়বার মতো তো ব্যবহার পাইনি প্রথম দিন।

সুধার মাথা নিচু হয়ে গেল। তারপর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালো। কতক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। হয় তো

আরও কতক্ষণ এমনিভাবে থাকত, কিন্তু হঠাৎ বাইরে সোরগোল উঠল, বর আসছে!

—সুধা—সুধা! সুধা গেল কোথায়?

চাপাগলায় সুধা বললে—আমি যাই।

চলে যাচ্ছিল, ডাকলাম।—একটু শোনো।

সুধা এগিয়ে এল।

—তোমার বিয়েতে অনেকেই অনেক কিছু দেবেন। সেই ভিড়ের মাঝ থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও। এই খাতাটা তোমায় দিতে চাই।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সুধা খাতাখানা নিল। ছোট্ট একটা খাতা। ধরে ধরে লেখা কতকগুলো কবিতার সঞ্চয়ন।

আনন্দে পুলকে সুধার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল—এ কী আপনার কবিতা!

বললাম—অন্যের কবিতা হলে তো ছাপার অক্ষরে বইএ গাঁথা উপহার দিতাম।

—আর এই ছবি?

এইবার মুহূর্ত কয়েক কঠিন নীরবতা।

কবিতার আরম্ভের মুখপত্রে একটি সুন্দর ছবি আঁকা। পাহাড় থেকে ঝর্ণা নামছে। সেই ঝর্ণাধারায় সব কিছু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কত অতীত—কত বর্তমান—কত ভবিষ্যৎ এমনি ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তবু কি গতির শেষ আছে?

তুলির রঙে প্রাণের আবেগে শিল্পীর সাধনায় হাতেলেখা কবিতা-পুস্তকের এই মুখপত্র যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

অবাক হয়ে সুধা সেই ছবি দেখছে। এই মুহূর্তে সেও যেন তলিয়ে গিয়েছে অনেক অ—নেক দূরে। ভুলে গেছে বোধ হয়, আজকের এই সন্ধ্যা তার নীরব অনুভূতির জন্যে নয়।

—কী দেখছ? প্রশ্ন করি।

সুধা তার দুই চোখ মেলে ধরল।

বললে—কী সুন্দর ছবি! আপনি ছবি আঁকতেও পারেন?

বলে ফেললাম—পারি।

আনন্দে বেদনায় সুধা যেন চমকে উঠল। বললে—কই এর আগে তো কোনোদিন বলেন নি, ছবি আঁকতে পারেন?

—তোমার সঙ্গে এই আমার দ্বিতীয়বার দেখা, সুধা।

সুধা সহসা ছবিটা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। বললে, জানেন আমার আর একটা নাম কি?

বললাম—না।

হাসল সুধা এক রহস্যময় হাসি।

বললে—না জানলে ঝর্ণার ছবি আঁকলেন কী করে?

স্থাণুর মতো নীরব নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুঝলাম, জীবনের একটি সত্য অবিস্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে আজ থেকে একটি অকপট মিথ্যাও চিরদিনের হয়ে রইল।

ঈর্ষা হল। সে ঈর্ষা সুধার নবপরিণয়ের সঙ্গীর জন্যে নয়। সে ঈর্ষা এক অখ্যাত শিল্পীর জন্যে।

তবু একটা জ্বালাময় সান্ত্বনা—শিল্পী টের পেল না, তার এই বন্ধু-প্রীতির অনুরোধ-রাখা-সামান্য-প্রয়াস কোনো এক লাস্যময়ী তন্বীর উত্তপ্ত বুকের মধ্যে আসন পেয়ে গেল।

মাধবী সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। কে জানে ওর চোখে আজ নতুন করে কোন্ মিথ্যে শিল্পী আবার মায়াকাজল পরাল!

উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তি ও আতিশয্য দোষ

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যেমন অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, তেম্নি এর আতিশয্য দোষ ঘট্‌লে, নানা অমঙ্গলেরও সৃষ্টি হয়! হিট্‌লারের বিশ্বগ্রাসী ইচ্ছাশক্তির আতিশয্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ। তিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করে পৃথিবীর অধীশ্বর হোতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন নি। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, কাইজার, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতিও তাঁরই মত স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁরাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। তোমরা জানো, যা প্রয়োজন তার মাথা অতিক্রম করাই আতিশয্য। আহার, বিহার, পরিশ্রম প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই হোক, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই বিষয়ান্তরের উপেক্ষা, কর্ত্তব্যের ত্রুটি, আর শারীরিক বা মানসিক অনিষ্ট ঘটে। সকল বিষয়েই আতিশয্য বর্জ্জন করা উচিত। সাধারণতঃ আহার, বিহার, শ্রম, মনশ্চালনা, অর্থব্যয় ও অর্থ সঞ্চয়াদি বিষয়ে মানুষের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে! আহারের আতিশয্য দোষে কেউ বা রসনা পরিতৃপ্তির জন্যে পেটুক হয়ে ওঠে, অতিরিক্ত ভোজনের ফলে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে শেষে বিশেষ কষ্ট পায়; কেউ বা আমোদ প্রমোদে এরূপ আসক্ত হয়ে পড়ে যে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলে গিয়ে কুসঙ্গে পড়ে কুকাজে রত হয়। কেউ বা এত অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, যে দেহের মাংসপেশী ও যন্ত্রাদি শিথিল হয়ে যায়, ফলে বিকল ও রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে সে বিশেষ কষ্ট পায়। জগতে যত রকম আতিশয্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ ইন্দ্রিয়সুখলালসা। সুখ-ভোগের আশায় মানুষ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ও ঘোর স্বার্থপর হয়ে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বহু অপকর্ম্মও করে, আর তার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সদ্‌গুণের আতিশয্যও দোষজনক।

দানশীলতা একটি উৎকৃষ্ট গুণ, কিন্তু অনিয়মিতরূপে অপাত্রে দান কর্‌লে, ওর দ্বারা উপকার না হয়ে বরং অনিষ্ট হয়েই থাকে—অতিরিক্ত দানশীলতার ফলে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হয়ে মানুষ আপনাকে আর আপনার পরিবারবর্গকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করতে পারে। সৌন্দর্য্য জ্ঞান বাঞ্ছনীয় হোলেও, এর আতিশয্য হোলে, এটী বিলাসিতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার আতিশয্য হোলে, স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায়। ক্ষমাশীলতার আতিশয্য হোলে, দুর্জ্জনেরা প্রবল হয়ে ওঠে। সন্তোষের আতিশয্য হোলে, মানুষ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হয়ে বসে থাকে, তার আত্মোন্নতি হয় না। সুতরাং লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে, ইচ্ছাশক্তির আতিশয্য দোষে ও অপপ্রয়োগে, শেষ পর্য্যন্ত নিজের ও পরের কোন অনিষ্ট না হয়, তা হোলে ইচ্ছাশক্তি সাধনার পরিণতি শোচনীয় হয়ে পড়্‌বে। আতিশয্য দোষ উন্নতির পক্ষে বিঘ্নপ্রদ। অধ্যয়নের আতিশয্য দোষে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, শরীর ও মন ভেঙে পড়ে—স্মরণশক্তির প্রখরতাও হ্রাস পায়। দুষ্টচিত্ত ইচ্ছাশক্তি লাভ কর্‌লে মানুষ সর্পের মত অনিষ্টকারী হয়ে ওঠে। অতএব তোমরা ইচ্ছাশক্তি সাধনায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল্‌বে। সামঞ্জস্য রক্ষাই উন্নতির মূল। মানসিক বৃত্তিগুলি অবহেলা করে কেবল শারীরিক শক্তির উন্নতিসাধন করা উচিত নয়, আবার মানসিক শক্তিগুলি উৎকর্ষ সাধন করতে গিয়ে যথোচিত অঙ্গচালনার প্রতি অমনোযোগী হওয়া ও শরীরকে দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করাও, কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের দিকে দৃষ্টি দিলে তোমরা দেখ্‌তে পাবে অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে যখন প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তখন তার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র প্রভৃতি ধীরে ধীরে সমভাবে গড়ে ওঠে। শাখা প্রশাখা যদি কাণ্ড অপেক্ষা মোটা হোতো তা হোলে বৃক্ষটী ভগ্ন হয়ে পড়্‌তো। আমাদেরও আঙ্গুলি যদি হাতের চেয়ে অধিক ভার বিশিষ্ট হোতো, তা হোলে সেই হাত অকেজো হয়ে পড়্‌তো। একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমবিকাশই সৌন্দর্য্য, কার্য্যকারিতা ও উন্নতির মূল। এজন্যেই আমার বক্তব্য হচ্ছে তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে আতিশয্য পরিহার করে উৎকৃষ্ট মধ্যপথ অবলম্বন ক'র্‌বে যাতে পৃথিবীতে মস্ত বড়লোক হ'য়ে উঠ্‌তে পার। যে সব গ্রন্থ পড়্‌লে অন্তঃকরণে জ্ঞানতৃষ্ণা, ভক্তি, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ,

ঈশ্বর আরাধনা প্রভৃতি মহান্ ভাব উদ্‌যাপিত হয় সেই সব গ্রন্থ প্রত্যহ পড়্‌বে, তা হোলে ইচ্ছাশক্তির সাধনায় ফল খুব ভালো হবে।

বিশ বছর বয়সে স্কটল্যাণ্ডের জোসেফ টমসন প্রবল ইচ্ছাশক্তির তাড়নায় আফ্রিকার অজ্ঞাত ভূভাগ আবিষ্কারের জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটীর আনুকূল্যে যাত্রা করলেন আফ্রিকার উপকূলের দিকে। বয়সে নবীন হোলেও তিনি জ্ঞানে প্রবীণ হয়েছিলেন। যে দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর গন্তব্য পথ, তা হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যানীতে সমাচ্ছন্ন, আর সেখানকার অধিবাসীরাও বন্য জন্তুদের চেয়েও হিংস্র। আফ্রিকার জঙ্গলে এসে টমসন ভগ্নোৎসাহ বা নিরুদ্যম হোলেন না! একপ্রকার প্রাণ হাতে করেই তিনি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন। অনেক সময়ে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর মাথার ওপর উদ্যত কুঠার আর তাঁর প্রতি বারে বারে আদিম অধিবাসীদের শরযোজনা তাঁকে কোন রকমই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে তিনি বৃক্ষমূল ভেবে একটি বিশালকায় সাপের ওপর বসতে গিয়েছিলেন। আর একদিন টাঙ্গানাইকার হ্রদে স্নান করবার সময়ে কুমীরের কবলগত হয়েছিলেন। আর একদিন রাত্রে তাঁর কাছে এসে সিংহ গর্জ্জন করেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি সিংহের মুখে যাবার আশঙ্কায় সারারাত্রি উৎকণ্ঠায় জেগে কাটিয়ে ছিলেন, তবুও তিনি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নি। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে থেকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়্‌লো, তিনি ব্যাধিক্লিষ্ট হলেন তথাপি তাঁকে পিছিয়ে আসতে দেখা গেল না। চৌদ্দ মাস ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও কায়ক্লেশে তিনি তিন হাজার মাইল পায়ে হেঁটে চলে শেষে আবার আফ্রিকার উপকূলে এলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর তিনি অনেক নতুন জায়গা আবিষ্কার করলেন, আর বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তারপর যেমনই তিনি দেশে ফির্‌লেন অমনই চতুর্দ্দিক থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হোলো। তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি দেশময় ব্যাপ্ত হোলো। তোমরা জানো, একবার ঘুরেই একটি মহাদেশের সমুদয় অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কার করা যায় না, পুনরায় আবার বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চল্‌লেন আফ্রিকার ভেতর। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ক্রমে ছয়বার আফ্রিকার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, আর প্রত্যেকবারেই নিদারুণ সঙ্কটে মরণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তোমরা যদি এঁর জীবন কাহিনী পড়ো তাহোলে জানতে পারবে কিভাবে এই যুবক বারে বারে লাঞ্ছনা, নিগ্রহ আর মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্য থেকে কার্য্য সিদ্ধি করে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে অমর হয়েছেন. তাঁর এক একটা দিনের ঘটনা শুনলে তোমরা আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে। তৃতীয়বার ভ্রমণকালে একজন বর্ব্বর তাঁর নাক কেটে দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল, একবার তাঁকে বুনো মহিষ ও বাঘ তাড়া করেছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর চতুর্থবার পর্য্যটনের সময়ে পশ্চিম আফ্রিকার মোকোটা ও গান্দু নামক দুটী রাজ্যের লোকেরা তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমবার পর্য্যটনের সময় উত্তর আফ্রিকার সুলতান ও ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা তাঁকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে হত্যা করবার জন্য কোন পর্ব্বতে উঠে অজস্র গুলি বর্ষণ করেছিল। অনেক সময়ে আদিম অধিবাসীরা তাঁর ওপর পাথরও ছুঁড়েছে। তবুও অধ্যবসায়ী টমসন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, আর দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। এই পাঁচবারের ভ্রমণে তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ-দিক ব্যতীত সমস্ত দিকেই ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। দক্ষিণ-দিকে পর্য্যটনের জন্য তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আবার যাত্রা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে এই অধ্যবসায়ী প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাধক কর্ম্ম-বীরের জীবনের শেষ শোচনীয় অধ্যায় রচিত হোলো। এখানে নিদারুণ বসন্তরোগে তিনি আক্রান্ত হোলেন। এই ঘোর প্রাণসঙ্কটরোগে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তেও তিনি কতকগুলি স্থান আবিষ্কার করে শেষে বাধ্য হ'য়ে দেশে ফিরে এলেন। চারি বছর ধরে নানারকম অসুখে ভুগে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এই অধ্যবসায়ী কর্ম্মবীরের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

পুলকের সখা-সাথী

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবেশ—পিপীলিকা

পিপীলিকা। হায় হায়, আমার দফা সারা—!

পুলক। অ্যাঁ দফা সারা—তোমারও নাকি? শুনি কী হ'ল?

পিপীলিকা। মানুষ যেখানে বাধাবেই বাধাবে সেখানে একটা না একটা কাণ্ড—সব জানোয়ার প্রকাণ্ড!

পুলক। তা তোমার তুলনায় প্রকাণ্ড বলতে হবে বৈ কি!

পিপীলিকা। তোমারও তো দেখছি মানুষের সাজ, হয় তো বা তুমিই করেছ এ কাজ।

পুলক। আহাহা, কাজটা কী, সোজা কথায় খুলেই বল না ছাই, দেখি যদি কিছু করা যায়।

পিপীলিকা। মাটির নীচে আমাদের শহর—সেই শহরে ঢোকার গর্তের মুখ ওই দেখ এক পাথর চেপে বন্ধ করেছে কোন উজবুক। এখন কী করি বল দেখি, দলবল সব মাঠে মারা পড়বে কি?

পুলক। হয় ত কেউ না জেনে ক'রে থাকবে। চল দিচ্ছি তোমার পাথর সরিয়ে। দলবল নিয়ে ঢুকে পড়।

পিপীলিকা। নাঃ মানুষের মধ্যে ভাল মানুষও আছে দেখছি। এসো এসো।

প্রস্থান—পিপীলিকা ও পুলক

প্রবেশ—পাখা ঝট্ পট্ করতে করতে একটি কাক

কাক। উঃ উঃ উঃ আর যায় না পারা, হোক্ রাজার রাণী, কি কাকের কাকিনী, মেয়েদের ওই একই ধারা। লেগেই আছে একটা না একটা বায়না, হয় পোষাক না হয় গয়না। পুরুষের দফা করে সারা। সেবার ছিল কপাল জোর, ফাঁকা ঘর খোলা পেয়ে জোর সরিয়েছিলুম রাজকন্যার মাণিকের আংটি। কিন্তু একই চালাকি খাটে কি বার বার? এবার সরাতে গিয়ে সোনার হার, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে প্রাণটি। ছিল দারোয়ান, মস্ত এক যোয়ান, হাঁকরে ছিল মস্ত ইঁটের ঢেলা, বেঁচে গেছে মাথা, খুব সত্যি কথা, কিন্তু লেগেছে যা চোট—ভার হ'য়েছে ডানাটুকু মেলা। এই টানাটানি যদি চলে, তাহ'লে আমার দফা সারা—উঃ উঃ উঃ আর যায় না পারা।

প্রবেশ—পুলক

পুলক। আজ দফা সারার পালা চলেছে দেখছি! তোমার আবার দফা সারলে কে?

কাক। যাও, যাও, তুমি যে রকম জোয়ান, তুমি নিশ্চয় দরওয়ান।

পুলক। জোয়ানের কথা বলতে পারি না, তবে দরোয়ান নই, এ তুমি বিশ্বাস করতে পার।

কাক। ঠিক তো?—আর দারোয়ান হ'লেই বা ভয় কিসের? আমি চোরও নই, রাহাজানও নই।

পুলক। তোমার বিপদটা কী, শুনি?

কাক। বিপদ! না, না, বিপদ কিসের?

পুলক। ওরকম আড়ষ্ট হ'য়ে রয়েছ কেন?

কাক। আড়ষ্ট? (ডানা নাড়তে গিয়ে) উঃ উঃ উঃ

পুলক। কোথাও লেগেছে না কি? কেউ আঘাত করেছে—

কাক। না, না, আঘাত করবে কেন? আমি তো চোর নই যে, ঢিল ছুঁড়ে মারবে। (ফের ডানা নাড়ার চেষ্টা করতেই) উঃ উঃ উঃ—কথা কী জান? একটা দুর্ঘটনা—বৈমানিক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছি—

পুলক। দেখি—

কাক। না, না, তুমি লাগিয়ে দেবে—

পুলক। আমি প্রাথমিক শুশ্রূষা খুব ভাল জানি, দেখ না, এখুনি কেমন আরাম বোধ করবে। (ন্যাকড়া দিয়ে ডানা বেঁধে দিয়ে) কেমন?

কাক। আরাম লাগছে, কিন্তু ব্যথা তো রয়েছে।

পুলক। তুমি ওদিকে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। পরে একটা পাতার রস লাগিয়ে দেব, তার পরেই দেখবে ডানা একেবারে সহজ হ'য়ে গেছে।

কাক। অ্যাঁ বল কী! আচ্ছা আমি একটু পরেই আসছি। নাঃ, তুমি মানুষ বটে, কিন্তু ভালো মানুষ।

প্রস্থান

পুলক। (নিশ্বাস ফেলে) হুঁ—কিন্তু ভাল মানুষের মেয়াদ কতটুকু? টিয়া যদি নাই ফেরে—

প্রবেশ—টিয়া লাফাতে লাফাতে

টিয়া। (চুপি চুপি) তৈরী হও, রাজকন্যা আসছেন—

পুলক। আসছেন?

টিয়া। চুপ!

লাফাতে লাফাতে একটু দূরে চলে গেল

প্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা রজনীগন্ধা অনবগুণ্ঠিত মুখে

পুলক। কী অপরূপ!

রজনী। কী মুস্কিলে যে পড়েছি!

পুলক। (এগিয়ে এসে নতজানু হ'য়ে) আদেশ করুন।

রজনী। পারবেন ধরে দিতে আমার টিয়াটি? যা চাইবেন দিতে রাজি আছি।

পুলক। তার জন্য ভাবছেন কেন? এখুনি ধরে দিচ্ছি। (গিয়ে টিয়াটিকে নিয়ে এসে) এই নিন।

রজনী। ধন্যবাদ! (টিয়াকে বুকের কাছে ধরে আদরের স্বরে) ভারী দুষ্টু তুই!

টিয়া। দুষ্টু তুই!

রজনী। (হেসে ফেললে—হাসিতে তার রূপ যে শতদলে ফুটে উঠল।—পুলককে) শুনছেন পাজির কথা!

পুলক। (প্রশংসমান চোখে রজনীগন্ধাকে দেখে) অপরূপ আপনার রূপ!

রজনী। আমি যে স্বপনপুরীর রাজকন্যা। চিরকা

সবাই জানে আমি সুন্দর। (পুলককে একবার নিরীক্ষণ ক'রে দেখে) অবশ্য আপনিও নেহাৎ কুৎসিত নন।

পুলক। ধন্যবাদ!

টিয়া। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) কী দিবি, দে না!

রজনী। দেখছেন টিয়ার বুদ্ধি! আমি ভুলে গিয়েছিলুম, মনে করিয়ে দিচ্ছে, আপনাকে কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়নি। কী দেব বলুন তো?

পুলক। কথা দিন যে আপনি আমাদের রাজাকে বিবাহ করবেন।

রজনী। বেয়াদব! কে তোমাদের রাজা—সাপ না ব্যাঙ কিছুই জানি না, অমনি কথা দিলেই হ'ল? অন্য কিছু চাও।

পুলক। অন্য কিছু চাই না, রাজকন্যা। তুমি কথা দিয়েছিলে, আমি যা চাইব তাই দেবে। দুঃখ এই যে, রাজকন্যার কথার মর্য্যাদা রইল না।

রজনী। তুমি নিজে যদি রাজা হ'তে, তাহ'লে হয়ত ভেবে দেখতুম। কিন্তু এতে তোমার লাভ কী?

পুলক। লাভ এইটুকু যে, মাথাটা বাঁচবে! তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি তোমার প্রতিশ্রুতি না পাই, তাহ'লে ঘাড়ের উপর এ মাথা আর থাকবে না।

রজনী। আহাহা! সে তো বড় বিশ্রী দেখাবে! এমন সুন্দর মাথা।

টিয়া। দে না, দে না!

রজনী। (টিয়ার মুখে চুমো খেয়ে) চুপ, পোড়ারমুখী! (পুলককে) তুমি যা বলছ তাও ঠিক। রাজকন্যার কথার খেলাপ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ওদিকে আমি যে পণ করেছি, তারই বা খেলাপ করি কী ক'রে।

পুলক। ওঃ! সেই মুক্তোর মালা আর মাণিকের আংটি?

রজনী। তুমি জান দেখছি! বেশ বেশ তাহ'লে তুমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐ মুক্তো আংটি খুঁজে বের ক'রে আনো, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার কথা রাখবো! কেমন ঠিক হয়নি? তোমার কথাও রইলো আমার পণও ভাঙল না। চল্ টিয়া।

প্রস্থান

পুলক। ব্যস যেমন রাজা তেমনি রাজকন্যা। নিজেদের বছরের পর বছর কাটুক ক্ষতি নেই, আমার বেলায় ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

প্রবেশ—লাফাতে লাফাতে কাক

পুলক। এসো এইবার ওষুধ দিই। (পাশের একটা ঝোপ থেকে কতকগুলো পাতা নিয়ে হাতে রগড়ে—কাকের ডানায় লাগিয়ে বেঁধে দিলে)—কেমন?

কাক। হ্যাঁ, বেশ হাল্কা ঠেকছে! এবার মনে হচ্ছে স্বচ্ছন্দে উড়তে পারবো।

পুলক। তা পারবে।

কাক। তুমি খুব উপকার করলে। এর পরে কোনদিন তোমার যদি আমাকে দরকার হয়—

পুলক। এর পর আর কোনদিন আসবে না, আজই আমার শেষ দিন।

কাক। (সহানুভূতির স্বরে) সে কি! কেন কেন?

পুলক। রাজকন্যার একটি মাণিকের আংটি হারিয়েছে—

কাক। (চমকে উঠে) আংটি! সে কি!

পুলক। আংটি জান তো?

কাক। (ভাববার ভাণ ক'রে) আংটি! কই জানি ব'লে তো মনে পড়ছে না! কী রকম বল দেখি? পেতলের আংটা যা দিয়ে পর্দা খাটায়, তা অবশ্য দুটো একটা দেখেছি। আংটাকে আংটি ব'লে ভুল করছ না তো?

পুলক। না, না, এ আঙুলে পরে। রাজকন্যার আংটি একটা কাক মুখে ক'রে নিয়ে পালিয়েছে—সেটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না পেলে আমার মাথাটি কাটা যাবে।

কাক। এ্যাঁ! বল কী!—এ তো কাক-জাতের একটা মস্ত দুর্নাম। পরের জিনিষ না ব'লে নেওয়া! সে তো চুরি!—আংটি! হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলুম বটে, ও পাড়ায়—আমাদের পাড়ায় নয়—কতকগুলো পাতিকাকের একটা দল আছে, তারা ঐ কাজ ক'রে বেড়ায়, কার রূপোর ঝিনুক, কার সোনার হার, কার হীরের আংটি—এই সব চুরি ক'রে এনে জড় করে। নিশ্চয় এ তাদেরই কাজ! দেখি হয়তো উদ্ধার ক'রে এনে দিতে পারবো। তুমি ভেবো না। আমি যাব আর আসব।

উড়ে চলে গেল

পুলক। আংটি পেয়েই বা লাভ কী? মুক্তো কোথায় পাব? নাঃ আশা নেই!

প্রবেশ—পিপীলিকা

পিপী। ভাল মানুষ ভাই! কেন বিরস বদন দেখতে পাই?

পুলক। তুমি শুনে আর করবে কী দিদি।

পিপী। বলই না শুনি, দেখি কিছু করতে পারি যদি।

পুলক। (ঈষৎ হেসে) তুমি!!

পিপী। মানি আমি খুবই ছোট, তবু ছোটকে দিয়েও বড় কাজ হয়, কভু কভু।

পুলক। নেহাৎ শুনবে?—রাজকন্যা রজনীগন্ধার মুক্তোর মালা—

পিপী। ওঃ সে তো হ'য়ে গেছে বহুকাল, মুক্তো ছড়িয়ে বনভূমি হ'য়ে উঠেছিল জঞ্জাল। সবাই মিলে পাতার ঠোঙায় গোছ ক'রে রেখেছি এক গর্তে ভরে।

পুলক। (উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে) সব আছে? সব কটা?

পিপী। হ্যাঁ হ্যাঁ তিনশো পঁয়ষট্টিটা!

পুলক। তাহ'লে তোমাদের আপত্তি নেই, আমি নিতে পারি!

পিপী। খুব, খুব, একশো বার। জিনিষ তো ভারি! ও দূর থেকেই করে চক্ চক্। কাছে গেলে না স্বাদ, না গন্ধ, না মিষ্টি, না টক্। দাঁড়াও আমি এখনি আনছি—দেখো! নেবে তো? কেউ আবার না দেয় ভাংচি।

প্রস্থান

পুলক। কত ছোটর কাছে কত বড় কাজ পাওয়া যায়।

প্রবেশ—আংটি মুখে করে কাক

কাক। (পুলককে আংটি দিয়ে) এই নাও! ওঃ—যা ক'রে আদায় করেছি, সে আমিই জানি!

পুলক। (আংটি দেখে) হ্যাঁ দামী মাণিক বটে! বন্ধু, তুমি যা উপকার করলে—

কাক। (বাধা দিয়ে) না, না, উপকার আর কী? সমাজে থাকতে গেলে ও করতে হয়। তুমি আমার রোগ আরাম করেছ, আমি তোমায় একটা উপহার দিলুম। স্রেফ নেওয়া আর দেওয়া।

পুলক। তা বললে শুনছি না বন্ধু, রাজকন্যা রজনীগন্ধার সঙ্গে আমাদের রাজার বিবাহ। তোমার নিমন্ত্রণ রইল—শুধু তোমার নয়, তোমার কাকিনী আছেন নিশ্চয়, তাঁরও।

কাক। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! খুব আনন্দের কথা! কিন্তু ব্যাপার কী জান? আমাদের পরিবারের সঙ্গে রাজকন্যার পরিবারের একটু মন-কষাকষি চলেছে। সেদিন আমাকে—আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে রাজকন্যার দরোয়ান দারুণ অপমান করেছে!

পুলক। বল কী বন্ধু!

কাক। হ্যাঁ চোট্টা বলে গালাগালি দিয়েছে, সে না-হয় হেসে উড়িয়ে দিতুম। কিন্তু তারপর লাঠি নিয়ে তাড়া করা, ঢিল ছোড়া এসব সহিংস আচরণ তো বরদাস্ত করা যায় না। কাজেই আমরা একজোট হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে যতদিন ঐ রাজকন্যা ঐ সহিংস দারোয়ানের সঙ্গে সংশ্রব রাখবেন ততদিন ওপথ মাড়াব না।—

পুলক। বেশ! বেশ!

কাক। হাসলে যে! মনে করছ ভয় পেয়ে ওপথ ছেড়েছি? মোটেই না। আসল কথা; আমরা পুরো মাত্রায় অহিংস। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেঁচামেচি বকাবকি যত ইচ্ছা আস্ফালন করতে বল করতে পারি। কিন্তু কারো গায়ে ঠ্যাং তোলা বা কারো মাথায় ঠোকর মারা ওইখানেই দাঁড়ি টানতে হবে! মানে হিংসাত্মক নীতি পছন্দ করি না।

পুলক। (হো হো ক'রে হেসে উঠে) সাবাস বন্ধু!

কাক। তবু হাসছ? বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

পুলক। না, না, বন্ধু আমার হাসি সেজন্য নয়। আমি হাসছি এই ভেবে যে রাজার একটি মন্ত্রীর পদ খালি—তোমায় সে পদে বসালে, বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই চালাতে পারবে।

কাক। (গম্ভীর ভাবে) মন্ত্রীর পদ!—ভেবে দেখব। পারি যদি রাজার বিবাহোৎসবে এসে একবার বেড়িয়েও যাব। আচ্ছা—নমস্কার।

প্রস্থান

পুলক। আর কিছু না হোক্; অন্ততঃ বক্তৃতা দিতে পারবে।

প্রবেশ—পিপীলিকা একটা পাতার ঠোঙা নিয়ে

পিপীলিকা। (পুলককে ঠোঙা দিয়ে) এই নাও মুক্তোর ঠোঙা, ভালমানুষ ভাই! বাঁচলুম! গেল জঞ্জাল, ঘুচল বালাই!

পুলক। খুব উপকার করলে!—তা আজ রাজকন্যা রজনীগন্ধার সঙ্গে রাজার বিয়ে, সবান্ধবে এসে একটু মিষ্টি-মুখ করে যেয়ো।

পিপীলিকা। আহাহা! চিনি, মধু, মিষ্টি! বিধাতার সব চেয়ে সেরা সৃষ্টি! গন্ধ যখন ছড়াবে বাতাস, কে আছে পিঁপড়ে ঘরে করবে বাস! আচ্ছা চললুম নমস্কার; ভয় নেই তোমার, এসে সবাই মিষ্টির থালে, ভিড় জমাব পালে পালে। নমস্কার! নমস্কার!

প্রস্থান

পুলক। এইবার রজনীগন্ধা!

প্রবেশ—রজনীগন্ধা

রজনী। পারনি তো উদ্ধার করতে আমার মুক্তোর মালা, মাণিকের আংটি?

পুলক। নিশ্চয় পেরেছি। এই নাও তোমার মাণিকের আংটি আর এই মুক্তোর ঠোঙা।

রজনী। আমার তিনশ পঁয়ষট্টিটি মুক্তো ছিল, একটিও কম হ'লে চলবে না কিন্তু।

পুলক। গুণে ত্যাখ, ঠিকই আছে। তাহ'লে রজনী-গন্ধা, এবার? কথা দাও, আমাদের রাজাকে বিবাহ করবে।

রজনী। না!

পুলক। (ব্যথিত কণ্ঠে) না? রাজকন্যা! রজনীগন্ধা! মনেও করতে পারিনি তুমি প্রতারণা করবে।

রজনী। এখনও একটা পরীক্ষা বাকি আছে। বুদ্ধির-পরীক্ষা!

পুলক। বুদ্ধির পরীক্ষা?

রজনী। হ্যাঁ নির্বোধকে আমি বিবাহ করব না।—দাঁড়াও আসছি।

প্রস্থান

পুলক। কী রকম পরীক্ষা! কে জানে।

প্রবেশ—সন্তর্পণে পা টিপে টিপে টিয়া

টিয়া। (চুপি, চুপি) জানো, রাজকন্যা তোমায় পরীক্ষা করবেন।

পুলক। তা তো শুনেছি। কিন্তু কিসের পরীক্ষা? উত্তীর্ণ হতে পারবো তো? পাঠশালা ছেড়েছি বহুদিন।

টিয়া। রজনীগন্ধার এক মাসতুতো বোন আছে শ্বেত-করবী। দুজনে মাথায় সমান। দু'জনে একই রকমের পোষাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। তোমায় বেছে নিতে হবে কে রজনীগন্ধা।

পুলক। আমি তো কুকুর নই যে গায়ের গন্ধে টের পাব কে রজনীগন্ধা; কে নয়।

টিয়া। আমি চিনিয়ে দোব। নজর রেখো আমার দিকে। যার সামনে গেলে আমি চোখ মটকাব, বুঝবে সেই রজনীগন্ধা।—ওই আস্‌ছে।

একটু দূরে স'রে গেল

প্রবেশ—রজনীগন্ধা ও শ্বেতকরবী। তাঁদের সর্বাঙ্গ একইরকম পট্টবাসে ঢাকা

রজনী ও শ্বেতকরবী } (একই সঙ্গে, বিকৃতকণ্ঠে) আমাদের মধ্যে কে রজনীগন্ধা?

পুলক। (রজনীগন্ধার সামনে যেতেই টিয়া ইঙ্গিত করল) তুমি! তুমিই রজনীগন্ধা? খোল মুখের আবরণ!

রজনী। (মুখের আবরণ খুলে ভৎর্সনার স্বরে) তুমি রাজা হ'লে না কেন?

পুলক। তা তো আমার জানা নেই। সে জানেন বিধাতা।

রজনী। ভাল হ'ত যদি তুমি রাজা হ'তে।

পুলক। তার জন্য বিধাতাকে দোষ দিইনি—কোন দিনও। তবে তোমায় দেখার পর তাই মনে হ'চ্ছে—যাক্ সে কথা, এবার তো রাজাকে বিবাহ করতে আপত্তি নেই?

রজনী। নিশ্চয় আছে।

পুলক। সে কি রাজকন্যা!

রজনী। এ বুদ্ধির পরীক্ষা হ'ল তো তোমার। তোমার রাজার বুদ্ধির দৌড় কতদূর তাও তো দেখা দরকার। আমার মনে হয় এই শ্বেতকরবীই তার উপযুক্ত। (শ্বেতকরবীর মুখের আবরণ খুলে) দেখছ কেমন?

পুলক। (একবার নিরুৎসুকভাবে শ্বেতকরবীকে দেখে নিয়ে) রাজাকে কী বলব?

রজনী। বোলো, তিনি যদি আমাকে বেছে নিতে পারেন, তাহ'লে তাঁকেই বিবাহ করব। যদি না পারেন, তা হ'লে শ্বেতকরবীকেই তাঁর রাণী করতে হবে। আমরা একটু পরেই আস্‌ছি। আয় করবী, আয় টিয়া—(যেতে

যেতে ফিরে পুলকের দিকে চেয়ে) তুমি রাজা হ'লে না কেন ?

প্রস্থান—রজনীগন্ধা, শ্বেতকরবী ও টিয়া

পুলক। রাজা হলুম না কেন ? আমারও তাই মনে হচ্ছে।

প্রবেশ—রাজা

রাজা। তারপর পুলক, খবর কী ? কোনটা দিচ্ছ ? মাথা না রাজকন্যা ?

পুলক। মহারাজের যা মরজি। মাথা চান মাথা— রাজকন্যা চান রাজকন্যা—

রাজা। (পুলকিত ভাবে) তাহ'লে রাজকন্যা আসছেন ? তোমার মাথার উপর আমার বিশেষ কোন লোভ নেই।

পুলক। আমার নিজেরও নেই, মহারাজ ! একেবারে নিরেট !

রাজা। তিনি এখনই আসবেন তো ?

পুলক। তা আসবেন। কিন্তু তিনি একা নন, আসবেন দু'জন। রজনীগন্ধা আর শ্বেতকরবী। দু'জনের মধ্যে কে রাজকন্যা বাছতে হবে আপনাকে।

রাজা। এতদিন রাজ্য চালিয়ে আসছি, একটা রাজকন্যা বাছতে পারব না ? খুব পারব।

প্রবেশ—রজনীগন্ধা ও শ্বেতকরবী

আগের মতই সর্বাঙ্গ পট্টবাসে আবৃত

পুলক। নিন্ মহারাজ, বেছে নিন্।

রাজা। দু'জন একই রকম ঠেকছে যে। (নিরীক্ষণ ক'রে দেখে, শ্বেতকরবীর কাছে গিয়ে) নাঃ—এই বেশী ফরসা, যাকে বলে ধব্‌ধবে সাদা। এই-ই রাজকন্যা ! সরাও অবগুণ্ঠন।

রজনীগন্ধা ও শ্বেতকরবী দু'জনেই অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলল

রজনী। না, রাজকন্যা আমি !

রাজা। তুমি ? তা হোক্, তোমার চেয়ে এ কোন অংশে ছোট নয়। রঙের জলুষ এরই বেশী। আর পদগৌরব ? তুমি র'য়ে গেলে সেই রাজকন্যা, আর ও হ'য়ে গেল রাণী—

রজনী। (ঈষৎ হেসে) ওর বরাবরই রাণী হওয়ার শখ। আমার সে শখ নেই।

প্রবেশ—বৃদ্ধা পরী

পরী। যার ভাবনা যা, সে পায় তা। (রাজাকে) বলেছিলুম না—রাজা, শস্তায় কিস্তিমাত করতে যেও না, ঠকবে।

রাজা। ঠকিনি তো ! (শ্বেতকরবীকে দেখিয়ে) জিতেছি বলেই তো মনে হচ্ছে।

পরী। হ্যাঁ রজনীগন্ধার মত গন্ধ নাই থাক্ শ্বেত-করবীর রঙের জলুষ বেশী।—এবার এসো রজনীগন্ধা তুমি পুলকের ভার নাও।

রজনী। ও রাজা হ'ল না কেন ?

পরী। উত্তর দাও পুলক—কেন রাজা হ'লে না ?

পুলক। রজনীগন্ধার রাণী হওয়ার শখ নেই ব'লে।

পরী। (রজনীগন্ধাকে) পুলক রাজা নয়, তুমিও চাও না রাণী হ'তে। (রজনীগন্ধার হাত পুলকের হাতে দিয়ে) চমৎকার মিল।

প্রবেশ—টিয়া

টিয়া। (উড়ে এসে রজনীগন্ধার কাঁধে ব'সে) চমৎকার ! চমৎকার !

প্রবেশ—পিপীলিকা

পুলক। মহারাজ, এই আমার এক বান্ধবী। এর দৌলতেই আমরা দু'জনে দু'টি অমূল্য রত্ন পেলুম।

রাজা। বেশ ! বেশ ! স্বাগত বান্ধবী। কাল উৎসবে রাজ-বাটীতে যেও।

প্রস্থান—পিপীলিকা

প্রবেশ—কাক

পুলক। এই আর এক বন্ধু।

রাজা। ওঃ তা বেশ—স্বাগত।

কাক। (জনান্তিকে পুলককে) মন্ত্রীত্ব নেওয়াই ঠিক করলুম। তুমি যখন অত অনুরোধ করছ।

রজনী। এ সেই কাকটা না—যে আমার আংটি—

পুলক। থাক রজনীগন্ধা।

কাক। না, না, রাজকন্যা ভুল করছেন—আমরা দেখতে

সব প্রায় একই রকম কিনা। তাই হঠাৎ ভ্রম হ'তেও পারে।

রজনী। কিন্তু আমার আংটি চুরি—

পুলক। থাক্ থাক্ যেতে দাও ওকথা—

কাক। ওঃ রাজকন্যা তার কথা বলছেন যে তাঁর আংটি চুরি করেছিল? বলেছি তো সে এক ছোটলোক কাক। তার সঙ্গে আমাদের মত সম্ভ্রান্ত কাকের কোন সংশ্রব থাকতে পারে না।

পুলক। যেতে দাও ওকথা, কাল উৎসবে এসো বন্ধু—

কাক। নিশ্চয় আসব। কিন্তু রাজকন্যা ভুল করছেন। (পুলককে চুপি চুপি) মন্ত্রাস্ত্রের কথা ভুলো না—বন্ধু।

প্রস্থান

রজনী। কিন্তু এ নিশ্চয় সেই চোর কাক!

পুলক। হোক্—আজ ওকে মাপ কর। আজ আকাশের বুকে রঙের মেলা, হাওয়ার তরঙ্গে সুরের খেলা, গাছের শাখায় ফুলের দোলা, আজ সবাই পুলকের সখা-সাথী।

পরী। রাজা কী বল?

রাজা। ঠিক! আজ সবার সাতখুন মাপ।

শেষ

মুস্‌কিল

শ্রীঅশোক দাশ

মুস্‌কিলে পড়ে লোক, আসে ঝড় ঝাপ্‌টা,
কুকুরেতে তাড়া করে, কামড়ায় সাপ্‌টা,
পথে খেয়ে ঠোক্কোর পায়ে ঝরে রক্ত,
মাথা হয় চৌচির ইট লেগে শক্ত,
হাই তুলে খিল কারো ধরে যায় চোয়ালে,
স্নানে গেলে কাউকে বা গিলে খায় বোয়ালে
জলে ডুবে জল খেয়ে, কারো' প্রাণ অন্ত
পড়ে গিয়ে থাকে কেউ ছিরকুটে দন্ত।
এ রকম মুস্‌কিল ঘটে কত ধরাতে
বলি শোন কি আমার ঘটেছিল বরাতে,—
মাসতুতো ভাই-পোর অন্নপ্রাসনে,
আমি গিয়ে বসেছিনু ভোজনের আসনে।
গোড়া থেকে ঘাড় গুঁজে গিল্‌ছিনু জব্‌বড়,
ডালটা পড়েছে যেই পেট করে চড়-চড়।
আমি তো ভীষণ জোর পড়ে যাই ভাবনায়,
চেয়ে দেখি ভুঁড়িখানা ঠেকে গেছে দাবনায়।
এই তো সন্ধে সবে, বাকী দৈ, দরবেশ,
মিহিদানা, পান্তুয়া, কড়া-পাক সন্দেশ।
পাঁচজনে গপাগপ্ টপাটপ্ খাচ্ছে
বল্‌ব কি দেখে মোর কান্না যা পাচ্ছে!
এ রকম কারে যেন শত্রুও না পড়ে
নিরুপায় বসে আছি কসি খোলা কাপড়ে।
জিভ দিয়ে জল পড়ে চাড়া মারে পেট্‌টা
বেমালুম মাটি হোল এত বড় খ্যাঁট্‌টা।

অভিশপ্ত জীবন

(বিদেশী পুরাণের গল্প)

ছবি দেবী

আজ তোমাদের কাছে যাদের বিষয়ে গল্প করব' তারা, তোমাদের মতই ক'টী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। যদিও তারা ছিল এক সমুদ্র দেবতার সন্তান, কিন্তু হঠাৎ তাদের জীবনে কত বড় এক শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল, সে শুনলে, তোমরা ওদের জন্য দুঃখ না করে পারবে না। আজও হয়ত' তারা, তাদের সেই অভিশপ্ত জীবনের জের দিনের পর দিন টেনেই চলেছে! সত্যিইত' শেষ পর্য্যন্ত তাদের কি হ'ল সঠিক খবরটা যখন কেউ জানিনা, তখন এম্নি ধারা একটা কিছু ভাবতে হবে বই কি!!

যাক্ সে কথা, মোট গল্পটা কি, এখন তাই শোন তোমরা। অনেক অনেক বছর আগে, দেবতাদের বিষয় যখন জানা যেত, সেই তখনকার দিনের এক ঘটনা।

সমুদ্র-দেবতা লারের স্ত্রীটি হঠাৎ যখন, একেবারে অসময়ে, ঘর সংসার ফেলে রেখে মারা গেল, তখন স্ত্রীর শোকে লার ভীষণরকম কাতর হয়ে পড়ল। এখন, এই

সংবাদটি যখন রাঙ্গা বাড়ব পেলে, সে তখনই বিয়ের প্রস্তাব করে এক দূত লারের কাছে পাঠালে। অর্থাৎ বাড়ব যে, আরয়ান্ বাসী আড়ইয়লের মেয়ে তিনটিকে প্রতিপালন করছে, তাদের মধ্যে একজনকে লার যদি বিয়ে করে তাহলে রাঙ্গা বাড়ব খুবই খুশী হবে, এই কথা বলে সে ত' দূত পাঠালে। এখন বুঝতেই পারছ, শোকাতুর নিঃসঙ্গ লার এই প্রস্তাবটি পেয়ে কতটা সান্ত্বনা পেল এবং ঘর সংসারে মন দেবার জন্যে কেমন নতুন করে আবার আকৃষ্ট হ'ল। অতঃপর লার ঐ দূতের মুখেই সংবাদ পাঠালে যে, শিগ্ গিরই রাঙ্গা বাড়বের রাজ্যে সে যাচ্ছে। যথা সময়ে লার রাঙ্গা বাড়বের মেয়েদের দেখতে, তার সেই পরীরাজ্যে উপস্থিত হ'ল।

লারকে পেয়ে রাঙ্গা বাড়ব খুবই খুসী হ'ল। তারপর মেয়েদের সঙ্গে সমুদ্র-দেবতার পরিচয় করিয়ে দিলে। এখন হ'ল কি ব্যাপারটা—ঐভি, ঐভা, অলভা এই তিনটি মেয়ে যেমন সুন্দরী তেম্নিই ছিল গুণবতী। কিন্তু লার পছন্দ করলে বড় মেয়ে ঐভিকে। মানে সে রাঙ্গাবাড়বকে বললে "ঐভি যখন এদের মধ্যে বড় তখন, নিশ্চয়ই সে মহৎ হবে। সুতরাং কনে হিসাবে ঐভিকেই আমি পছন্দ করছি।"

সমুদ্র দেবতার এই কথায়, রাঙ্গাবাড়ব খুসী হ'য়ে তখনই সে তার পালিতা মেয়ে ঐভির সঙ্গে লারের বিয়ের ব্যবস্থা করলে। খুব ঘটা করে, ভোজ দিয়ে বিয়ে ত' হ'ল। তারপর নতুন বৌ নিয়ে লার আনন্দিত মনে নিজের রাজ্যে আবার ফিরে এল। দিন যায়—দিন যায়, বেশ সুখে শান্তিতেই লার নতুন করে আবার সংসার পেতেছে। এর মধ্যে দুটি ছেলেমেয়েও তাদের হয়েছে। বড় মেয়েটির নাম হ'ল ফুয়লা, দ্বিতীয়টি হ'ল ছেলে, তার নাম হচ্ছে ইৎ। কিন্তু এর পরে ঐভির যে যমজ ছেলে দুটি হ'ল, তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐভি মারা গেল। ফিয়াকর এবং কন্ আঁতুড়েই ত মা-হারা হ'ল। এখন, এই কচি কচি বাচ্চা-গুলো নিয়ে সমুদ্র দেবতা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়বে ভেবে, রাঙ্গা বাড়ব এবারেও তার কাছে আবার বিয়ের প্রস্তাব করে দূত পাঠালে। অতএব রাঙ্গা বাড়বের পালিতা মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়া মেয়ে, ঐভাকে লার এবারে পছন্দ করলো এবং যথা সময়ে তাদের বিয়েও হয়ে গেল একটা দিন দেখে।

এখন প্রত্যেক বছর লার আর ঐভা তাদের চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মানান্নানের যে উৎসব পালা ক্রমে সমস্ত পরী রাজ্যে হ'ত, সেই উৎসবে যোগ দিতে তারাও সবাই আসত। এই কচি কচি ছেলে মেয়ে কটিকে দেবী দনুর লোকেরা খুবই ভাল বাসত। এবং তাদের স্নেহ যত্নের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে লারের মাতৃহারা সন্তান ক'টি বড় হয়ে উঠতে লাগল।

এখন এদিকে হ'ল এক মহা মুস্কিল ব্যাপার! মানে, সন্তানহীনা ঐভা তার সপত্নী সন্তানদের ক্রমশ ঈর্ষা করতে সুরু করলে। একেত' ওদের সবাই ভালবাসে, এখন সমুদ্র-দেবতাও হয়ত, স্ত্রীর চেয়ে তার সন্তানদেরই যে বেশী ভালবাসবে, এই হল তার ভয়! কিন্তু কি করা যায় এখন? সে সারাক্ষণ এই বিষয়ই চিন্তা করে শুধু। তারপর হঠাৎ সে স্থির করে ফেলে যে, এদের কোনক্রমে মেরে ফেলতে পারলেই তার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। লারের প্রথম পক্ষের সন্তানদের মেরে ফেলার জন্য, নানা মতলব তখন জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। প্রথমে যদিও ঐভা তার ভৃত্যদের উপর দিয়েই লারের ছেলেমেয়েদের হত্যা করার সহজ চেষ্টাটা করেছিল। কিন্তু, এই হীন কাজ করতে কোন ভৃত্যই রাজি হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত ঐভা নিজেই একদিন চার ছেলে মেয়ে নিয়ে গেল ড্রাভা হ্রদের দিকে। ড্রাভা হ্রদে পৌছে, সে তাদের বললে জলে নেমে স্নান করতে। এরপর তারা আর কি করে! বাধ্য হয়েই সবাই তখন জলে নামলে মায়ের কথা মত স্নান করতে। এখন, সেই সময় ঐভা করলে কি—হঠাৎ চতুর্দ্দিকে সে তার মায়াজাল বিস্তার করে, একটা মন্ত্রপূতঃ যাদুদণ্ড দিয়ে, লারের সন্তান ক'টিকে এক এক করে স্পর্শ করতে লাগল। যাকেই ঐভা তার যাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ করে, সেই মুহূর্ত্তে সে রাজহাঁস হ'য়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চারটি ভাই বোন সবাই তাদের মানুষরূপ থেকে একেবারে রাজহাঁসে পরিণত হয়ে জলে ভাসতে লাগল। যেন একটা মুহূর্ত্তে সব কিছু বদলে দিলে, ঐভার যাদুর প্রভাবে!

এখন যাদুর প্রভাবে লারের সন্তানগুলি ত' রাজহাঁস হয়ে গেল, কিন্তু তাদের মানুষের মত কথা বলারশক্তি, এবং মানুষের মন, এদুটোর কোনটাই ঐভার যাদু নষ্ট না করতে পারার জন্য, সবেগে ঘুরে ফুয়লা শাসিয়ে উঠল—তুমি যে

আমাদের এইভাবে রাজহাঁস করে রাখলে,একথা যখন সমুদ্র-দেবতা আর রাঙ্গা-বাড়ব শুনবে তখন তাদের ক্রোধে তোমাকে পড়তে হবে একথা নিশ্চয়ই জেনো। কিন্তু, কে শোনে ফুন্নলার শাসানি! ঐভার মনটা এম্নিই নিষ্ঠুর ছিল যে, এ কথায় ওদের আবার মানুষ করে দেওয়া দূরে থাক,দিব্বি নির্বিকার মনে সে ফিরেছে দেখে, লারের ছেলেমেয়েরা একেবারে হাল ছেড়ে দিলে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য। শেষ পর্য্যন্ত কোন ভরসা আর না দেখে, হতাশভাবে তারা ঐভাকে প্রশ্ন করলে যে, এইভাবে তাদের সে ক'দিন রাখতে চায়, এটা অন্ততঃ ঐভা বলে যাক্।

তাদের এই প্রশ্নে ঐভা সহজভাবে বললে—তোমরা যদি এই প্রশ্ন আমায় আজ না করতে তবে, মনের দিক থেকে হয়ত স্বস্তি পেতে খানিকটা। যাই হোক্ জানতে চাইছ যখন, বলব বই কি? হ্যাঁ, এই ড্রাভা হ্রদে তোমরা থাকবে তিনশ বছর। তারপর এই ড্রাভা হ্রদ থেকে যাবে, ইরিণ আর আল্‌বার মাঝে, যে ঘোলা বিস্তৃত সমুদ্র ময়লি, সেই বিরাট সমুদ্রে। তারপর যাবে আইরস্ ডোমনান্। সব শেষে যাবে ইরিসের গ্লোরা দ্বীপে। প্রত্যেক যায়গাতেই বাস করতে হবে তিনশ বছর করে। অবশ্য, এই কষ্টকর জীবনের মধ্যে তোমাদের দুটি সান্ত্বনা থাকবে। একটা হচ্ছে, দেহে তোমরা হাঁস হলেও মনের দিক থেকে পুরো মানুষই তোমরা থাকবে। সুতরাং হাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য, তোমাদের মনে কোন আক্ষেপই তেমন থাকবে না আর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, তোমরা এত সুমধুর ও কোমলকণ্ঠে সঙ্গীত করতে পারবে যে, সে সঙ্গীত এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কেউ কোন দিন শোনেনি।"

অতঃপর ঐভা, লারের এই দুর্ভাগা সন্তানদের জীবনে কি কি করতে হবে সব কিছু বলে, সে তার বাড়ী ফিরে এল দিব্বি নির্ব্বিকারচিত্তে যেন কোন কিছুই হয়নি এম্নি ভাব! কিন্তু সমুদ্র-দেবতার কাছে একটা কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে ত! তখন সে করলে কি, বেশ করে বানিয়ে বানিয়ে বললে যে, ড্রাভা হ্রদে ছেলেমেয়েরা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এখন বুঝতেই পারছ এর পরে কোন কথাই আর উঠতে পারে না। কিন্তু, কেন জানি সমুদ্র-দেবতা লারের স্ত্রীর কথাটা তেমন বিশ্বাস হ'ল না। সে তক্ষুণি ছুটে গেল ড্রাভা হ্রদে—যদি কোন পাত্তা পাওয়া যায় তাদের। সে যখন ড্রাভার কাছে এসেছে, তখন দেখলে যে, তীরের কাছে চারটি বড় বড় রাজহাঁস অবিকল মানুষের কণ্ঠে, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখে লার বিস্মিত হয়ে জলের দিকে এগিয়ে যেতেই, ঐ রাজহাঁস কটিও জল থেকে তীরে উঠে এল সমুদ্র দেবতা লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। কাছে এসে রাজহাঁস চারটি লারের স্ত্রী ঐভার এই নিষ্ঠুর আচরণের কথা বললে এবং তাদের বাবার কাছে তারা আবার যাতে মানুষ দেহ ফিরে পায় এই জন্য বারে বারে সবাই কাতর প্রার্থনা করতে লাগল। সন্তানদের এই দুরবস্থা নিজের চোখেই লার দেখলে, আর এর প্রতিকারের চেষ্টাও সে অনেক কিছুই করলে। কিন্তু স্ত্রী ঐভার যাদুমন্ত্রের কাছে লারের যাদু কোন দিক দিয়েই কার্য্যকরী হ'ল না। শেষে কোন উপায় আর না পেয়ে লার ছুটে গেল, রাঙ্গাবাড়বের কাছে সাহায্যের জন্য। সেও কিছু করতে পারলে না ঐভার যাদুমন্ত্রকে। অর্থাৎ, দেবতাদের রাজা হওয়া সত্বেও রাঙ্গা-বাড়ব হেরে গেল যাদুতে। তখন সে এক বুদ্ধি কি করলে শোন, ঐভা যে দুষ্কার্য্যটি করেছে, পুনরায় যাতে করে কেউ আর এই সব কাজ না করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐভার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা সে করলে। তক্ষুণি রাঙ্গা-বাড়ব তার পালিত মেয়েকে ডেকে পাঠাল দূত পাঠিয়ে। বাপের ডাকে ঐভাকেও আসতে হ'ল খবর পাওয়ামাত্র। সে যখন রাঙ্গাবাড়বের সাম্নে এসে দাঁড়াল তখন রাঙ্গাবাড়ব এমনই একটা শপথ করিয়ে নিলে ঐভাকে দিয়ে যে, সত্য কথা বলতে সে বাধ্য হ'ল।

অতঃপর গম্ভীর স্বরে রাঙ্গা বাড়ব তাকে জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা, তুমি স্বর্গে, মর্ত্তে এবং পাতালে যত রকমের প্রাণী আছে, তার মধ্যে কোন রূপটাকে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা কর। আর, সর্ব্বাপেক্ষা কোন আকৃতিটাকে গ্রহণ করতে তোমার আতঙ্ক, বল দেখি?"

এর পর আর চুপ করে থাকা ত যায় না! তখন ভয়ে ভয়ে শুক্‌নো গলায় ঐভাকে বলতে হয় যে, আকাশচারী দানব হাওয়াটাকেই সে বেশী ভয় করে।

ঐভা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাঙ্গা বাড়ব মেয়ের প্রতি কিছুমাত্র দয়া না করে তার যাদুমন্ত্রের লাঠিটা ঐভার গায়ে ছোঁয়ালে। লাঠিটা ছোঁয়ানমাত্র এক অদ্ভুত বিস্ময়কর

ব্যাপার ঘটে গেল। অমন যে রূপবতী মেয়ে, চোখের পলক ফেলার আগেই সে বিকট-কায় একটা আকাশচারী দানবী মূর্ত্তি নিয়ে বিশ্রী কর্কশ স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে কোথায় যেন একেবারে উড়ে পালিয়ে গেল।

থাক্ সে কথা এখন লারের দুঃখী ছেলেমেয়েগুলোর কি হ'ল তাই বলি। এই কথা ত' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, ঐভা ওদের হাঁস করে রেখেছে। তখন দলে দলে থুয়া আজিডানানানেরা লারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করতে ড্রাভা হ্রদে গেল। শুধু কি দেবতারাই ওদের দেখতে গেল, থুয়া আজিডানানান্দের সঙ্গে মাইলিশনরাও ছুটে গেল সমুদ্র-দেবতার অভাগা সন্তানদের দুরবস্থাটা একবার নিজের চোখে দেখার জন্য।

অবশ্য দেবতা এবং মানুষের এই একসঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব হয়েছিল তখনকার দিনে—দেবতা আর মানুষে এখনকার মত এমন দূরত্বের সম্বন্ধ ছিল না বলেই। যাই হোক্ কি ছিল, আর ছিল না, সে নিয়ে আমাদের কথা নয়, শেষ পর্য্যন্ত গল্পটা কি হ'ল তাই হ'চ্ছে কথা। হ্যাঁ যা বলছিলাম, লারের ছেলেমেয়েদের দেখতে, ড্রাভা হ্রদে ক্রমশঃ এত ভীড় জমতে লাগল যে ব্যাপারটা শেষ অবধি বাৎসরিক একটা উৎসবের মত গিয়ে দাঁড়াল।

এম্নি করেই দিন চলেছে। অবশেষে একদিন এই অভিশপ্ত জীবনের তিনশটা বছর কাটল। এবারে দ্বিতীয় নির্ব্বাসনে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। ময়্লি সমুদ্রে যাওয়ার আগে লারের দুঃখী সন্তানেরা, দেবতা এবং মানুষ সকলের কাছেই বিদায় নিল। তার পর চার ভাই বোনে আরও তিনশ' বছর ময়লি সমুদ্রে তাদের নির্ব্বাসনের জন্য বেরিয়ে পড়ল।

লারের এই হংসরূপী ছেলেমেয়েদের মাইলিশনেরা এত বেশী ভালবাসত আর স্নেহ করত যে পাছে তাদের কেউ অনিষ্ট করে, এই জন্য ঐ দেশের লোকেরা একটা আইন করলে যে, কেউ কখন হাঁস মারতে পারবে না। আজও সেই রীতি ঐ দেশের লোকেরা মেনে আসছে একটা প্রচলিত ধারা অনুসারে।

সমুদ্র দেবতার অভিশপ্ত সন্তানেরা ত' ড্রাভা হ্রদ থেকে নিরাপদে এসে পৌছুল ময়্লি সমুদ্রে। কিন্তু এখানে এসে ওরা পড়ল মহা বিপদে! ময়্লি সমুদ্র যেমন ঝোড়ো, তেম্নি ঠাণ্ডা, এতে পড়ে লারের ছেলেমেয়েরা ভীষণ কষ্ট পেলে। আর নিঃসঙ্গতাও যেন বড্ড বেশী ওরা বোধ করতে লাগল। তবু উপায় ত' আর নেই! থাকতে হবে যখন, তখন দুঃখ করে কি লাভ হবে!

দিন এই ভাবেই ওদের কাটছে। একটা কথা বলার মত কেউ কোথাও নেই, সুধু সমুদ্র আর সমুদ্র ধূ ধূ করছে!! অবশ্য এই তিনশ' বছরের নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনের মধ্যে, একবার মাত্র তাদের কটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মানে, রাঙ্গা-বাড়বের ছেলে দুটি যখন, দেবতা থুয়া আজিডানানান্দের কাছ থেকে দূত হয়ে ওদের তারা দেখতে এসেছিল, তখন লারের ছেলেমেয়ে ক'টি তবু ক'টা কথা বলে সুখ পেয়েছিল। রাঙ্গা বাড়বের ছেলে দুটির কাছ থেকেই অনেক কিছু সংবাদ ওরা পেলে এবং ওদের এই নির্ব্বাসনের মধ্যে ইরিনে কি কি ঘটেছে, সে সবও শুনতে পেলে নির্ব্বাসিত দুঃখী ছেলে-মেয়ে ক'টি।

অবশেষে লারের দুঃখী ছেলেমেয়েদের এই দীর্ঘ কষ্ট-ভোগের দিন ধীরে ধীরে এক সময় শেষ হয়ে এল। তারা এবারে আইরস্ ডোমনানে গেল। তার পর সেখান থেকে গেল ইরিসের্ গ্লোরা দ্বীপে। তৃতীয়—এই তিনশ' বছর যেন কাট্‌তেই চায় না ওদের। এম্নি ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছে নিরাপরাধ কচি কচি শিশুগুলো। তবু দিন ঠেলে ওরা এগিয়ে চলতে চাইছে। এক সময় ওদের অভিশপ্ত নির্ব্বাসনের দিন, সত্যি সত্যিই সম্পূর্ণভাবে শেষ হ'ল। অতঃপর সমুদ্র দেবতার ছেলেমেয়েরা আবার যখন মানুষের আকৃতি পেলে, তখন সবাই তারা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কতদিন বাদে আবার সকলের মধ্যে যাচ্ছে, কি আনন্দটাই না হচ্ছে ওদের মনে, বুঝতেই পারছ বোধ হয়। নির্ব্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে লারের ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়ীর পথে ত' যাত্রা করলে। কিন্তু কেমন কেমন যেন চারিদিক লাগ্‌ছে। ঠিক চিন্‌তে যেন পারছে না। তবু পথ ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা সবাই তাদের নিজেদের রাজ্যে ঠিকই এসে পৌছুল। কিন্তু এসে পৌছুলে কি হবে! প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে লারের ছেলেমেয়ে একেবারে স্তম্ভিত! খাঁ খাঁ করছে রাজপুরী, কেউ কোথাও নেই। যেন, জন-মানুষের

সাড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না বহুদূর পর্য্যন্ত! স্তব্ধ থম্‌থমে চারিধার। ঘুরে ঘুরে কোন লোকজনই যখন দেখতে ওরা পেলে না, তখন আত্মীয় স্বজনদের খোঁজে লারের ছেলেমেয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু, সেখানেও বৃথা চেষ্টা! কেউই তাদের চেনে না, কেউই নাম পর্য্যন্ত শোনে নি, এম্নি একটা আশ্চর্য্য আর অচেনা ভাব চতুর্দ্দিকে। যেন, ক'টা বছরে লারের ছেলেমেয়েদের চোখের সাম্নে সব কিছুই বদলে গেছে এবং একটা অচেনা পরিবেশের মধ্যে পড়ে সত্যিই বেচারীরা হাঁপিয়ে উঠল। শেষে কোন উপায় অন্ত আর না পেয়ে, লারের অভিশপ্ত সন্তানেরা ধীরে ধীরে সবাই আবার ফিরে চলল, তাদের নির্ব্বাসনের সেই প্রোরা দ্বীপে। বুঝি জনকোলাহলে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে, অভিশাপের নির্ম্মম বোঝা আঁকড়ে নির্জ্জনে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই বলেই, ভাই বোনে সবাই আবার সেই গ্রোরা দ্বীপে বসে বসে ভাবে তাই ত সবই যে ঐ ভার যাদুতে বদলে গেছে দেখি!!

তেরোতলা বাড়ী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তেরোতলা বাড়ী—ওপরের ঘরে
কাজ ক'রে চলে যারা,
তারা দেখে বহু নীচে নগরীতে
ঝরে বৃষ্টির ধারা।
তারা দেখে ধীরে সোনায় সোনায়
পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যা ঘনায়,
পায়ের তলায় বিরাট্ শহরে
জ্বলে বিজলীর তারা।
মনে পড়ে নাকি অন্ধকারায়
করে প্রতীক্ষা কারা?

কুমারীর চেরা সিঁথির মতন
সরু রাজপথে নীচে
লিলিপুটদের জনপ্রবাহ
নিয়ত উচ্ছ্বসিছে।
সাড়ে ছ আনার মোটরকারে যে
পুতুলের মত বসেছে কে সেজে,
দেখা যায়নাকো, দম্ভ তাহার
দূর থেকে হয় মিছে!
ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব নামে কি
কালো রাস্তার পীচে?

নীচে ধরণীতে আছে হানাহানি,
আছে সুগন্ধ মালা,
আছে চীৎকার, তেরোতলা তার
ধুয়ে মুছে দেয় জ্বালা।
হাওড়ার ব্রীজে, গঙ্গার কূলে
কারা চ'লে যায় কোলাহল তুলে,
কেবা খোঁজ রাখে? দূর-দিগন্তে
কী মায়াকাজল ঢালা!
'ভিক্টোরিয়া' ও ময়দান কার
নৈবেদ্যের থালা?

গঙ্গার হাওয়া, আকাশের আলো
তেরোতলা সব নিলে।
এশিয়ার সেরা উদ্ধত শির
গগনে উঠিয়ে দিলে।
লিফ্‌টে লিফ্‌টে অপেক্ষমান
করণিকদের গুঞ্জন গান;
বিপুল বিরাট্ রহস্য গেল
কৌতুক রসে মিলে।
বাদ্‌শাহরাও তাজ্জব ব'নে
যেত এই মঞ্জিলে!

তেরোতলা বাড়ী, কতদূর থেকে
ডাকিছ পান্থজনে
'এই কলকাতা' 'এই কলকাতা'—
নীরব নিমন্ত্রণে!
তোমার মাথার জাতীয় পতাকা
কত দীপ্তি ও আনন্দ মাখা!
যেন বাঙালীর আত্মপ্রসাদ
পৃথিবীর অঙ্গনে।
তেরোতলা বাড়ী ভূকম্পনেও
কেঁপোনা দুঃস্বপনে।

মনুমেণ্ট আজ হ'য়ে গেল ছোট,
হাইকোর্ট গেল নেমে।
তোমার মাথার গোল বারান্দা
ভুলিবে কাহার প্রেমে?
নগরীর পারে আছে বনভূমি,
একেলা কেবল দেখে যাও তুমি,
দিগলয়ের নীলরেখা দেখো
কোনখানে গেছে থেমে।
সিঁড়ি দিয়ে ওঠা ওপরে তোমার
ভাব্‌তেই উঠি ঘেমে!

বিশ্বসাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

সিগফ্রেড বিদায় নিয়ে যাবার সময় ক্রনহাইলদে তার প্রিয়তমকে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন অশ্ব উপহার দিলে। ঘোড়াটির বিশেষ গুণ ছিল এই যে—সে ঘোড়া আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, জলের উপর দিয়েও যেতে পারে। পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে, আবার জঙ্গল পার হয়ে যেতে পারে! ঘোড়াটির নাম 'গ্র্যাণী'। সে মানুষের কথা বুঝতে পারে।

সিগফ্রেডের স্বর্ণমুকুট ও তরবারি দুটোই ছিল যাদুশক্তিসম্পন্ন। স্বর্ণমুকুটটি যতক্ষণ মাথায় থাকবে সে ইচ্ছামাত্র সকলের দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাকে কেউ দেখতে পাবে না। আর তরবারির গুণ ছিল, যে অস্ত্রের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হবে সেই অস্ত্রই ভেঙে দু'খানা হয়ে যাবে। একদা দেবরাজ ওটানের ভীম ভল্লও এই তরবারির আঘাতে ভেঙে দু'খানা হয়ে গিয়েছিল।

গ্র্যাণী পিঠের উপর দুঃসাহসী বীর সিগফ্রেডকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললো পর্বত উপত্যকা পার হয়ে, নদনদী উত্তীর্ণ হয়ে যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তে সে পৌঁছতে চায়। রাইন নদীর তীরে পৌঁছে সিগফ্রেড রাশ টেনে ধরলে। দেখলে নদীর ওপারের শৈলশিখরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হ'ল এই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গ নিশ্চয়ই সেই দেশের রাজভবন। দুর্গশীর্ষে একটি পতাকা উড়ছিল। নদীর জল এখানে গভীর এবং স্রোতের বেগও প্রখর। কিন্তু সিগফ্রেড যখন দেখলে এপারের ঘাটে একখানি খেয়ানৌকা বাঁধা রয়েছে, সে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো, বোটে উঠতে উঠতে বললে গ্র্যাণী, তুমি সাঁতরে নদী পার হয়ে এসো। আমার মনে হচ্ছে ওপারে পৌঁছতে পারলে আমরা হয়ত দুঃসাহসিক কিছু করবার সুযোগ পাবো। আমি এই বোটে ওপারে যাচ্ছি।

গ্র্যাণী আনন্দে চিঁহিঁহিঁ করে উঠে লাফ দিয়ে জলে পড়লো। চললো দুজনে নদীর ওপারে। একজন বোটে, একজন সাঁতরে।

ওপারের প্রাসাদদুর্গটি সত্যই এক রাজার। তাঁর নাম গান্থার। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ এক বীর জাতির নৃপতি। নিজে যেমনি বলিষ্ঠ তেমনি সত্যনিষ্ঠ। সকল লোকের সঙ্গে তিনি খুব সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর এক পরমা সুন্দরী ভগ্নী ছিল। তার নাম গাড্রুণ এবং একটি বৈমাত্র ভাই ছিল তার নাম হেগেন।

এই হেগেন লোকটি একটি ধূর্ত শয়তান। তার কাজ ছিল কেবল—কি করে কার সর্বনাশ করা যায় তারই ষড়যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে হেগেন ছিল দুর্গপ্রাসাদের একটি শনি! এ আবার সেই নিবেলুঙ আলবেরিক আর মাইমের জ্ঞাতি।

বামন নিবেলুঙ জাতের চরিত্রের মধ্যে যে স্বাভাবতঃই সোনার প্রতি একটা উদগ্র লোভ এবং গুপ্তধনের সন্ধান পাবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে হেগেনের রক্তের সঙ্গেও তা মিশেছিল। রাইনের যে সোনা নিবেলুঙ-আলবেরিক লুট করেছিল হেগেন তার খবর জানতো। আর এ সংবাদও সে পেয়েছিল যে সিগফ্রেড আর ক্রনহাইলদে এখন সেই সোনার অধিকারী। মহারাজ গান্থারকে সে এই সোনার খবর জানিয়ে এদিকে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল।

মহারাজ গান্থার তখনও অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর মনের মতো রূপসী রাণী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হেগেন যখন তাঁকে ক্রনহাইলদের রূপের বর্ণনা শোনাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় সিগফ্রেড রাইন নদী পার হয়ে দুর্গপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হেগেন মহারাজকে ক্রনহাইলদের সৌন্দর্য বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে এখবরও জানালেন যে সেই রূপসী দেবকন্যা এখন এক শৈলশিখরে অগ্নি-বলয় বেষ্টিত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। সেই সুষুপ্ত রূপসীকে জাগিয়ে আগুনের বেড়ার ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেন একমাত্র কোনও নির্ভীক দুঃসাহসী এবং দৈববলে বলীয়ান দুর্জয় বীর! সেরকম মহাবীর একজন মাত্রই এখন আছেন, তাঁর নাম দিগ্বিজয়ী সিগফ্রেড। তারপর রাজকুমারী গাড্রুণকে উদ্দেশ করে হেগেন বললে, 'আমার মনে হয় রাজকুমারীর উপযুক্ত পতি হবার যোগ্যতা একমাত্র সেই মহাবীর সিগফ্রেডেরই আছে। তিনি যেমনি সুপুরুষ, তেমনি দুঃসাহসী ও শক্তিমান যোদ্ধা।

একথা শুনে মহারাজ গান্থার কিন্তু খুশী হতে পারলেন না। তাঁর চেয়েও সাহসী ও শক্তিমান একজন বড় বীর যে পৃথিবীতে আছে একথাটা তাঁর ভাল লাগলো না। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলে শুধু বললেন, সুন্দরী ক্রনহাইলদেকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি সে অগ্নি-বলয় ভেদ করতে না পারি তবে সিগফ্রেডকেই বা আমি কি করে বলি যে আমার বদলে তুমি গিয়ে সে সুন্দরীকে উদ্ধার করে এনে দাও। সে হয়ত ক্রনহাইলদেকে নিজেই গ্রহণ করবে।

হেগেন একথা শুনে হেসে উঠে বললে—"সে ভার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন। তাকে আমি এমন এক পাত্র মন্ত্রপূতঃ সুরা পান করাবো যে সে তার পূর্বস্মৃতি সব বেমালুম ভুলে যাবে। ভুলে যাবে তার জীবনের যা কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের রাজকুমারী গাড্রুণের

দশবামাত্র সিগফ্রেড তাঁর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠবে।" বলতে বলতে সে রাজকুমারী গাড্রুণের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে 'আশা করি রাজকুমারী এ হেন এক মহাবীরের প্রেম প্রত্যাখ্যান করবেন না!'

হেগেনের কথা শুনে রাজকুমারীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। তিনি মৃদু হেসে বললেন, আপনাদের সে বীর পুরুষকে একবার না দেখে আমি কোনও কথা দিতে পারব না।

এমন সময় হঠাৎ দুর্গদ্বারে ঘন ঘন তূর্য নিনাদ হচ্ছে শোনা গেল। এ শৃঙ্গধ্বনি দিগ্বিজয়ীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বানের ইঙ্গিত।

মহারাজ গান্থার এই তূর্যনাদ শুনে সিংহাসন থেকে তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অসি কোষমুক্ত করে হাঁক দিলেন—আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে কার এতবড় সাহস? সে যেই হোক—তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে।

হেগেন বাতায়ন পথে উঁকি মেরে দেখে বললে—'মহারাজ সুবর্ণ-বর্মে সমাচ্ছাদিত এক রণসাজে-সজ্জিত সুপুরুষ বীর মনোহর অশ্ব-পৃষ্ঠে দুর্গদ্বারে সমুপস্থিত। বলছে "যুদ্ধং দেহি!" অনুমতি করুন, আমি গিয়ে তার রণসাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি!

বলতে বলতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে হেগেন দ্রুতবেগে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। মহারাজ গান্থারও তার পশ্চাদনুসরণ করলেন।

সিগফ্রেড তাদের দু'জনকে দেখে অসি দ্বারা বীরোচিত অভিবাদন জানিয়ে বললেন—আমার নাম সিগফ্রেড। আমি আপনাদের যে কোনও একজনের সঙ্গে, অথবা একত্রে দু'জনের সঙ্গেই একা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আপনারা আক্রমণ শুরু করতে পারেন।

মহারাজ গান্থার উন্মুক্ত অসি কোষবদ্ধ করে হাসিমুখে এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে সিগফ্রেডকে, অভিবাদন জানিয়ে বললেন—না না, যুদ্ধ নয় বন্ধু! আপনার নাম যখন সিগফ্রেড, তখন আপনি এ বীরভূমিতে চির-অভ্যাগত! আপনার বীরত্ব কাহিনী শুনে আমরা মুগ্ধ। আসুন আপনি আমাদের গৃহে সম্মানিত অতিথিরূপে বিশ্রাম করবেন। আপনার শুভাগমনে আমার রাজ্য ধন্য হল। আমিই এদেশের রাজা গান্থার।

সিগফ্রেড রাজার প্রসারিত কর সাদরে মর্দন করে বললেন, আপনি যখন আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন মহারাজ, তখন যুদ্ধের কথা আর তুলব না। আমি লড়তেও জানি, আবার বন্ধুত্ব করতেও জানি। আপনার বন্ধুত্ব আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিলুম।"

হেগেন তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সম্মানে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেল। রাজ-অনুচরেরা গ্রানীকে অশ্বশালায় নিয়ে গেল।

হেগেন যা মতলব এঁটেছিল, তা যে এত শীঘ্র সম্ভব হবার উপক্রম হয়ে এসেছে দেখে সে ভারি খুশী।

ভোজনের সময় হেগেন রাজকুমারী গাড্রুণকে নিয়ে এসে সিগফ্রেডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। হেগেনের পরামর্শ ও উপদেশ মতো রাজ-কুমারী সিগফ্রেডকে মহাসমাদরে সুস্বাগতম জানিয়ে হেগেনের তৈরি সেই মন্ত্রপূত সুরা তাঁকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান করতে দিলে।

'ভাল্‌কাইরী' বা সমরকুশলা বীরানুরাগিণী সুরবালার দল
(এঁরা অশ্বপৃষ্ঠে উড়ে চলেছেন মেঘের ধূলি উড়িয়ে স্বর্গপুরী ওয়ালহাল্লার দিকে)

সিগফ্রেড সুরাপাত্র হাতে নিয়ে অধরে স্পর্শ করবার আগে তাঁর প্রিয়তমা ব্রুনহাইলদের স্বাস্থ্য কামনা করে সুরাপাত্রটি নিঃশেষ করলেন। পান করতে করতে বার বার বলতে লাগলেন "ব্রুনহাইলদে, প্রিয়তমে, তোমার প্রেমের স্মৃতি আমার অন্তরে যেন চিরজাগ্রত থাকে।"

কিন্তু মন্ত্রপূত সুরার প্রভাবে সিগফ্রেডের পূর্বস্মৃতি নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল। সে কে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় এসেছে, কেন এসেছে, কিছুই আর মনে করতে পারলে না। সদ্য ঘুম ভেঙে ওঠা মানুষের মতো বলতে লাগলো—"আমি এ কোথায় এসেছি? এখানে কেন এলুম আমি? কবে এলুম? কেমন করে এলুম? সামনে রাজকুমারী গাড্রুণকে দেখে মুগ্ধদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি কে

সুন্দরী ! অপরূপ তোমার রূপ ! আমার যেন মনে হ'চ্ছে আমি তোমাকে জন্মে জন্মে যুগে যুগে ভালবেসেছি। মনে হচ্ছে তুমি আমার পরাণপ্রিয়া ! কে তুমি বলো ? তুমি কি এদেশের রাজরাণী ?

রাজকুমারী লজ্জায় অধোবদন। সিগফ্রেডকে তিনি মন্ত্রপূত সুরা পান করিয়েছেন বলে মনের মধ্যে তাঁর একটা অপরাধের গ্লানি অনুভব করছিলেন। রাজা ভগ্নীর ভাবগতিক দেখে নিজেই উত্তর দিলেন, "না বন্ধু, ইনি আমার একমাত্র ভগ্নী রাজকুমারী গাড্রুণ ! আমি নিজে আজও অকৃতদার।"

সিগফ্রেড ও ব্রুনহাইলদে
(সিগফ্রেড তার স্বর্ণাঙ্গুরীর গোপন ইতিহাস ব্রুনহাইলদকে বলছেন)

সিগফ্রেড বললেন—এ কিন্তু ভাল নয় বন্ধু ! রাজার একটি রাণী থাকা খুবই দরকার।

রাজা গান্থার মৃদু হেসে বললেন—আমার ভাই হেগেন রোজই আমায় সে কথা বলে। কিন্তু, মুস্কিল কি হয়েছে জানেন ? আমি যে মেয়েটিকে ভালবাসি তাকে পাবার আমার কোনও আশা নেই।

সিগফ্রেড উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বলুন তো ?

মহারাজ গান্থার তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগফ্রেডকে জানালেন, কেমন করে হবে বলুন ? তিনি যে এক অত্যুঙ্গ শৈলশিখরে অনির্বাণ প্রচণ্ড অনল-মণ্ডলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন।

'অনল-মণ্ডল' ! কথাটা বার দুই উচ্চারণ করে সিগফ্রেড দুই চোখ দু'হাতে রগড়ে মুছে নিয়ে কি যেন ভাবতে বসলো।

মহারাজ গান্থার বললেন, 'শুনেছি একমাত্র সেই বীরপুরুষই সে ঘুমন্ত মেয়েটিকে জাগাতে পারবে যিনি আগুনের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করবার দুঃসাহস রাখেন, যিনি অজেয় এবং ভয় কাকে বলে জীবনে জানেন না !'

"নির্ভীক ? অজেয় ? যে দুঃসাহসী বীর আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রকম একজনকে মনে হচ্ছে যেন আমি জানতুম !" বলে সিগফ্রেড অনেক চেষ্টা করলেন—তাকে স্মরণ করবার, কে সে ? কিন্তু, কিছুতেই তাঁর কোন কথাই মনে পড়লো না।

মহারাজ গান্থার এইবার একটু অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, তুমি সে মেয়েটিকে হয়ত দেখনি বন্ধু ! তার নাম ব্রুনহাইলদে। অমন সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। সে এক সুরবালা !

'ব্রুনহাইলদে' নামটা শুনে সিগফ্রেড চমকে উঠলেন। বার দুই বললেন—'ব্রুনহাইলদে ? স্বর্গবালা ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ? উঁহু। তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী তোমার এই আশ্চর্য রূপবতী বোন গাড্রুণ !

রাজকুমারী গাড্রুণ একথা শুনে লজ্জায় পালিয়ে গেলেন সে ঘর থেকে।

সিগফ্রেড বললেন—'বন্ধু ! তুমি যদি অনুমতি করো আমি তোমার ভগ্নীর হৃদয় জয় করতে তাঁর অনুসরণে যেতে পারি। আমি তাঁর প্রেমে পড়েছি, আমি তাঁর পাণিপ্রার্থী।'

এই সময় হেগেন বলে উঠলো—উত্তম প্রস্তাব ! এর চেয়ে আনন্দের আর কি হ'তে পারে ? কিন্তু, দাদার বিবাহ হলনা, ছোটবোনের বিবাহ কেমন করে হয় ? আপনি এক কাজ করুন না। আমরা মহারাজের জন্য সেই আগুনে-ঘেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনতে যাচ্ছি, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না, একটু সাহায্য করবেন। তা'হলে ভাই বোনের বিবাহ একই দিনে খুব সমারোহের সঙ্গে হবে !

সিগফ্রেড বললেন—'এখনি চলুন ! আমি সে আগুনে-ঘেরা মেয়েটিকে বন্ধুর জন্য অনায়াসে উদ্ধার করে আনতে পারি, যদি কুমারী গাড্রুণকে আমি পত্নী রূপে পাই।'

হেগেন বললে, আপনিই পারবেন তাকে উদ্ধার করে আনতে, কারণ আপনার ঐ স্বর্ণমুকুট মাথায় থাকলে আপনি যা ইচ্ছা করবেন তাই সফল হবে। আপনি অদৃশ্যও হ'তে পারেন, অথবা যে কোনও পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করতেও পারেন—

সিগফ্রেড বিস্মিত হ'য়ে মুকুটটিতে বার বার হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তাই নাকি ?'

হেগেন বললে, 'শুধু কি তাই ? আপনার তরবারি যে কোনও অস্ত্রের সংস্পর্শে আসবে তা ভেঙে চূর্ণ করে দেবে।'

'বলেন কি আপনি?' বলে সিগফ্রেড নিজের তরবারিখানি খাপ থেকে খুলে বার দুই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন।

এ সবই তাঁর কাছে ভারি মজার খবর বলে লাগছে।

হেগেন বললে—একমাত্র আপনিই পারবেন সে ঘুমন্ত মেয়েটিকে জাগিয়ে তুলে আনতে যদি সে আগুনের বেড়ার মধ্যে ঢোকবার আপনার সাহস থাকে!

"সাহস!" বজ্রকণ্ঠে সিগফ্রেড চিৎকার করে উঠলেন, সাহস আমার কারুর চেয়ে কম নয়! বন্ধু গান্থার তাঁর ভগ্নীকে যদি আমায় দেন, হেন দুঃসাহসের কাজ নেই যা আমি তার জন্যে করতে পারবো না।

মহারাজ গান্থার উঠে দাঁড়িয়ে সিগফ্রেডের দুটো হাত ধরে বললেন—সে ত আমার আর গাড্রুণের পরম সৌভাগ্য বন্ধু! তুমি যদি আমার জন্য অত কষ্ট স্বীকার করে সেই আগুনে-ঘেরা ঘুমন্ত মেয়েকে পাহাড় চূড়ো থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এস—অবশ্যই গাড্রুণ তোমারই হবে।

সিগফ্রেড উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—'উত্তম! চলো তবে। আমি তোমাদের সঙ্গে এখনি যেতে রাজি আছি।'

মহারাজ গান্থার তখন হেগেনকে ডেকে তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করতে বলে দিলেন এবং গাড্রুণকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—"আমার রাজ্যের যা শ্রেষ্ঠ সুরা তাই নিয়ে এস বোন্—আমাদের দু'জনের বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য আমরা উভয়ে তা পান ক'রে শুভযাত্রা করবো আজ। আর, জেনে রাখো—আজ থেকে ইনিই তোমার ভাবী পতি।" বলে মহারাজ সিগফ্রেডকে দেখিয়ে দিলেন।

সিগফ্রেড উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীকে সাদর অভিবাদন জানালেন। রাজকুমারীও প্রসন্ন হাসিমুখে তা গ্রহণ করে সিগফ্রেডকে প্রত্যভিবাদন জানালে।

নেপথ্যে হেগেনের ব্যবস্থা মতো রাজপুরীতে বিবাহের সুরে বাঁশী বেজে উঠলো। (ক্রমশঃ)

কর্ণগড়ের মন্দির

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ভারতবর্ষকে যেরূপ পৃথিবীর 'এপিটোম্' বা সংক্ষিপ্তসার বলা হয়—বঙ্গদেশকে তদ্রূপ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য যেমন ভারতে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ ভারতের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য তাহা আমাদের এই বঙ্গদেশে পরিদৃষ্ট হয়। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ধরাতে" একথা যেমন বলা চলে,—"যাহা নাই বঙ্গে, তাহা নাই হিন্দে" একথাও বলা চলে। ঐরূপ বঙ্গের মেদিনীপুর জেলাকে সামান্যভাবে বঙ্গের সংক্ষিপ্তসার বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তমাল-তাল-বনরাজিনীলা সমুদ্রচুম্বী তটদেশ, স্বচ্ছসলিলা সুপরিসর নদী, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি, সুপ্রশস্ত বেলাভূমি, উচ্চাবচ পার্ব্বত্যভূমি, ক্ষুদ্রপরিসর খরস্রোতা নদী, শ্যামলতাবিরহিত উষর বালুকাভূমি, অনুর্ব্বর কংকরময় ক্ষেত্র, গভীর অরণ্যানী, প্রস্তরময়ভূমি, জলাভূমি বঙ্গের তথা পৃথিবীর যা বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য তাহা একাধারে সামান্যভাবে মেদিনীপুরে পরিদৃষ্ট হয়। তজ্জন্য মেদিনীপুরের নাম মেদিনী অর্থাৎ পৃথিবীর পুর বা আবাসস্থল সার্থক হইয়াছে।

বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল এই মেদিনীপুর। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ইতিহাস যদি কোনদিন নিরপেক্ষভাবে লিখিত হয় তখন মেদিনীপুর সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে, খাস বৃটিশরাজের বজ্রকঠিন শাসনের মধ্যে মেদিনীপুরের ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা যে ত্যাগ, যে তেজ ও সহিষ্ণুতা স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখাইয়াছে তাহা ভারতে সত্যই অতুলনীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহামহারথীগণের কারাবরণ, মেদিনীপুরবাসীগণের দীর্ঘ দিনব্যাপী দুঃখবরণের তুলনায় বিলাস মাত্র। বৃটীশ রাজত্বে এমন এক সময় ছিল, যে সময় সমগ্র মেদিনীপুর একটী কারাগারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মেদিনীপুর সদরটী যেন একটী সেলস্বরূপ হইয়াছিল। তখন মেদিনীপুরের প্রত্যেক যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরীদের সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত, আর দিবাভাগে শাসকবর্গের সঙ্গীনের সম্মুখে শুভ্র, রক্ত, সবুজ বর্ণ পরিচয় পত্রসহ যাতায়াতে বাধ্য থাকিতে হইত। তবুও মেদিনীপুর ছিল স্বীয় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় হিমালয়ের মত অচল, অটল, স্থির এবং ধীর। পৃথিবীতে এমন কোন্ দেশ আছে যে দেশে ক্ষুদিরামের মতো একটী কিশোর বালক ফাঁসীর রজ্জুকে বরমাল্যের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারে? পৃথিবীতে এমন কোন্ দেশ আছে যে দেশে মাতঙ্গিনীর মতো একটী অশীতিপরা বৃদ্ধা জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষার জন্য হোলিগেলার কুমকুমের ন্যায় স্বীয় বক্ষে বুলেটের নির্ম্মম আঘাত গ্রহণ করিতে পারে? কত নাম আর বলিব? এই মেদিনীপুরের রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় বৃটিশ শাসনের ও শোষণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল তিন তিনজন উচ্চতম বৃটিশ রাজপুরুষ তাঁদের সদ্য ক্ষরিত উষ্ণ রক্ত দানে। আর ঐ রক্তের বিনিময়ে রক্ত দান করিয়াছিল কতিপয় মহাপ্রাণ যুবক। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তির অন্যতম প্রধান মূল উৎস ছিলেন মেদিনীপুর ও নাড়াজোলরাজ স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল এবং তাহার পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্রলাল। মেদিনীপুরের যুবশক্তিকে সতেজ, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাদের অর্থ ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও দেশসেবার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা।

এই মহাপ্রাণ রাজবংশের অবিস্মরণীয় প্রাচীনতম কীর্ত্তি কর্ণগড়ের ৺দণ্ডেশ্বর-মহামায়ার মন্দির। এবং অধুনাতম কীর্ত্তি মেদিনীপুরে দীঘার সমুদ্রোপকূলে নাড়াজোল-রাজপ্রাসাদ "অঞ্জলি নিবাস"। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দীঘা বর্ত্তমানে অভিজাতবর্গের এবং রাজপুরুষগণের কর্ম্মময় জীবনের একটী বিশ্রামের স্থান বা তীর্থ ক্ষেত্রস্বরূপ। বর্ত্তমান নাড়াজোল রাজকুমার অমরেন্দ্রলাল খাঁন এবং তদীয় পত্নী রাণী অঞ্জলি খাঁন শ্রীশ্রীদণ্ডেশ্বর মহামায়ার একান্ত ভক্ত।

এই মেদিনীপুর রাজবংশ এবং কর্ণগড়ের মন্দির কতদিনের পুরাতন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মহাভারতের বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ এই মেদিনীপুরে ছিল এরূপ প্রসিদ্ধি আছে এবং তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের অন্যতম মহাবীর দাতাকর্ণের সহিত কর্ণগড়ের সংস্রব থাকা অসম্ভব মনে হয় না। পুরাতন পঞ্জিকায় তীর্থস্থান পরিচ্ছেদে কর্ণগড়কে মহারাজ দাতাকর্ণের বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এ সম্বন্ধে আশা করি আলোকপাত করিবেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের আজ ৮ম বৎসর হইতে চলিয়াছে,—মেদিনীপুরের প্রাচীন এই দুই স্থান অদ্যাবধি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কিছুমাত্র কৌতূহল উদ্দীপিত করে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য!

কর্ণগড়ের মন্দির মেদিনীপুর জেলার সদর হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় ৬ মাইল দূরে। তন্মধ্যে তিন মাইল পীচ্ ঢালা পাকা রাস্তা, বাকী তিন মাইল কাঁচা,—বর্ষাকালে দুর্গম। কোন কালেই এই তিন মাইল রাস্তায় যাতায়াতের কোন যানবাহন নাই—এক পদচালনা বা

সাইকেল বা গোযান ছাড়া। এজন্য এখানে তীর্থযাত্রীর যাতায়াত কম। ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল শ্রীমান্ কাটজু এই কর্ণগড় মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। তখন আশা করা গিয়াছিল এই তিন মাইল দুর্গম কাঁচা রাস্তাটি পাকা হইতে পারে, এক্ষণে মনে হইতেছে ইহা দুরাশা মাত্র। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় মনে করেন হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যের জন্য অর্থব্যয় করিলে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দান করা হইবে। জানি না কতদিনে এই স্বাধীন ভারতে এই অত্যুৎকট সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ হইবে।

পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে কর্ণগড়ের মন্দিরের সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়ের স্থাপত্যশিল্প একরূপ। এজন্য উভয় মন্দিরের গঠনকাল এক সময় বলিয়া মনে হয়। এই স্থান শিবশক্তির লীলানিকেতন। কর্ণগড়ে ৺দণ্ডেশ্বর শিবরূপে এবং ৺মহামায়া শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৺দণ্ডেশ্বর শিব অনাদি লিঙ্গ—এই মন্দিরে একটী গহ্বর ভিন্ন কোন বহির্লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। পূজার্চ্চনা ঐ গহ্বর মধ্যেই করিতে হয়।

কর্ণগড়ের মন্দিরটি পশ্চিমাভিমুখী, পূর্ব্বাস্য হইয়া মন্দিরে ঢুকিতে হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী তোরণদ্বার। তাহার উপর ত্রিতল "যোগমণ্ডপ"। প্রথম তলে গাণপত্য কক্ষ—দ্বিতীয় তলে পাশাপাশি তিনটী কক্ষ—সর্ব্বপশ্চিমে বিষ্ণুসাধন কক্ষ—মধ্যস্থলে শক্তিসাধন কক্ষ—সর্ব্ব পূর্ব্বদিকে শিবসাধন কক্ষ। ইহা বাদে সাধনার্থীদের উত্তরসাধকের জন্য দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট কক্ষ আছে। সর্ব্বোচ্চতলে একটী কক্ষ—ইহা সূর্য্যসাধন কক্ষ। উক্ত কক্ষে বসিয়া ভগবান আদিত্য দেবের উদয়াস্ত সম্পূর্ণভাবে দর্শন লাভ হয়। স্বর্গীয় বালানন্দ স্বামীজী এই যোগমণ্ডপে মাঝে মাঝে আসিয়া অবস্থান করিতেন এবং সাধনা করিতেন। তাঁহার গুরুদেব ব্রহ্মানন্দজী বহু শিষ্যসহ আসিয়া এই মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন।

সমস্ত মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। যোগমণ্ডপের পর আর একটী প্রশস্ত চত্বর। তাহার সম্মুখে শ্রীশ্রীদণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের প্রথমাংশে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ, ইহা পূজারী ভক্ত যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান। এই কক্ষে ঈশান কোণে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন—ইঁহারও নিত্য পূজা করা হয় এবং ঐ কক্ষের অগ্নিকোণে একটী পঞ্চমুণ্ডী আসন। এই আসনে জপ করিয়া দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে তদানীন্তন মেদিনীপুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়া শিবায়ন রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কক্ষে শ্রীশ্রীদণ্ডেশ্বর শিব বিরাজিত। এই কক্ষে পূজার্চ্চনা করিলে স্বভাবতঃ হৃদয় মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই মন্দিরের বামপার্শ্বে ৺মহামায়ার মন্দির। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহারও দুই অংশ—প্রথমাংশে যাত্রীগণের অপেক্ষা-কক্ষ, ভিতরের কক্ষে মহামায়া শক্তিরূপা হইয়া বিরাজিতা। এখানেও একটী পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। কিন্তু এই দুই আসনে বসিয়া জপ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান মানবের সাধ্যাতীত। তান্ত্রিকপ্রবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কিঞ্চিদধিক ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আসনে বসিয়া জপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! তৎপরে অন্য কোন যোগী ঐ আসনে বসিবার বাসনা প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীশ্রী মহামায়ার মন্দিরের সম্মুখে একটী চত্বর এবং ইহার সম্মুখভাগে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত রুধির কুণ্ডিকা। বলিপ্রদত্ত ছাগাদির রুধির ইহাতে প্রদত্ত হয়। ইহাতে পূর্ব্বে নরবলি প্রদত্ত রক্ত নিবেদিত হইত এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই কুণ্ডিকাটী প্রায় ৪ফুট উচ্চ। এই মন্দিরের পশ্চাতে সিদ্ধকুণ্ড। এই কুণ্ডের জল বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব দূর করে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীদণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের পশ্চাতে জামদগ্ন্যের মন্দির। মহাবীর কর্ণের গুরু ছিলেন মহর্ষি জামদগ্ন্য। এই মন্দির মধ্যে জামদগ্ন্যের মন্দিরের অবস্থান এই মন্দিরকে অতি সুপ্রাচীন বলিয়া আমাদের মনকে স্বতঃই ভক্তিরসে অভিভূত করে।

এই মন্দিরের কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে ভূতপূর্ব্ব মেদিনীপুরাধিপতিগণের আবাসদুর্গ ছিল। এই দুর্গে দ্বাদশ সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য যুদ্ধজন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এই দুর্গের এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই দুর্গ কত দিনের প্রাচীন তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস মহাভারতের সময় হইতে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এই স্থানে লুক্কায়িত আছে আশা করি স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা এই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া ইতিহাসের অনেক অমূল্য রত্নের আবিষ্কার করাইবেন।

কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার সৈন্য সামন্ত ও তাঁহার উপাস্যদেব মদনমোহন সহ কর্ণগড় আক্রমণ করেন। রাজা যশোবন্ত দেবীমহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন—তখন তিনি বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূজায় সমাহিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ঐ আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, তখন বিষ্ণুপুররাজের সৈন্যগণ জয়োল্লাস করিতে করিতে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হয়। রাজা যশোবন্ত সিংহ তখন অনন্যোপায় হইয়া দেবীর শরণাগত হয়েন। এইরূপ প্রবাদ, দেবী তখন মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মদনমোহন সহ বিষ্ণুপুরের রাজা রণে ভঙ্গ দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বিষয় বস্তু অবলম্বনে কবি রামেশ্বর যে কবিতা রচনা করেন তাহা অনেক স্থানে গীত হইয়া থাকে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের পরে বাংলা ভাষায় যে প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে তাহা কবি রামেশ্বরের "শিবায়ন"। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল মেদনীপুরে বরদা পরগণায়, পরে তিনি মেদিনীপুরাধিপতি রাজা রামমোহন সিংএর পুত্র এবং রাজা অজিত সিংএর পিতৃব্য রাজা যশোবন্ত সিংএর সভাসদ্ হইয়াছিলেন। কবি রামেশ্বরের গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে"

"মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথ সম ধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়
যাহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে রাজারাম সিংহ মহাশয়,
তস্য পুত্র, যশোবন্ত, সিংহসর্ব্বগুণবন্ত শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ তাত,
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ,
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিব-সংকীর্ত্তন
ভট্টনারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতী চক্রবর্ত্তী নারায়ণ ॥

কর্ণগড়ের মন্দিরের চারি পার্শ্বে নির্জ্জন পরিবেশ সাধনার একটী উপযুক্ত ক্ষেত্র। বর্ত্তমানে আমরা বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ, এজন্য আমরা ভারতের নানা মন্দিরের স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। আমরা অনেক মন্দিরে যাইয়া ইহার স্থাপত্য শিল্পের মাত্র আলোচনা করি—আধ্যাত্মিকতার বিষয় চিন্তামাত্র করি না। এ ঠিক পরমহংসদেবের কথায় আম্র বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আম্র আস্বাদন না করিয়া আম্রের সংখ্যা, গুণাগুণের পর্য্যালোচনা। আজ এই প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয় যিনি বা যাঁহারা এই সকল যোগমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, না অমৃতের সন্তানদের অমৃতের সন্ধান দিবার আশায় ইহা করিয়াছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সম্ভাবনা আমাদের জীবনে কি কখনও আসিবে?

ফটো :—সৌরেন মুন্সী

দিনের শেষে

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ফটো :—সৌরেন মুন্সী

কাজের শেষে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আপেক্ষিক

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

অমরবাবুর টিউবওয়েল পরিকল্পনায় আমি শুধু বিস্মিত হইনি, বিরক্ত হয়েছি।

আমি সামান্য পল্লী-সেবক। পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাই, স্থায়ী উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখি। গ্রামে হাই-স্কুল নেই। ছেলেগুলো নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষা না পেলে বকাটে বোম্বেটে হওয়াই স্বাভাবিক। আমার প্রতিপত্তি না থাকলেও প্রাণ আছে। তাই বহুদিন ধ'রে চেষ্টা করছি, হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠার। কর্তৃপক্ষের সংগে লেখালিখি ও দেখাশুনা করতে বাকী রাখিনি। কেবল টাকার অভাবেই কাজ হচ্ছে না। কি ক'রে হবে? সাধারণের আর্থিক অবস্থা তো তেমন নয়। অমরবাবু রিটায়ার ক'রে দেশে এসেছেন। তাঁর সৎ কাজ করবার ইচ্ছাও আছে, সামর্থ্যও আছে। সেটা বুঝেছিলাম ব'লেই হাই-স্কুলের প্রস্তাবটা পেশ করেছিলাম তাঁর কাছে। তিনি বেশ উৎসাহও দেখিয়েছিলেন। অথচ হঠাৎ মেতে উঠলেন টিউবওয়েল বসানো নিয়ে। শিক্ষিত লোক—আজীবন অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষার উপেক্ষা তাঁর আদৌ শোভা পায় না।

আমার বিস্ময় ও বিরক্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি তো ব্যক্তিগত নয়। দশের কাজে অভিমান ক'রে দূরে থাকা কি ঠিক? হতে পারে কেউ কল টিপেছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করা দরকার। অনেক ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত গেলাম একদিন বিকেলে অমরবাবুর বাড়ি। তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। আমাকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—কি হে, খবর কি?

—শুনলাম আপনি পাড়ায় পাড়ায় টিউবওয়েল বসাচ্ছেন। জলদানে মহাপুণ্য। এক সংগে ইহকাল ও পরকালের কাজ। চৈত্র সংক্রান্তি ও অক্ষয় তৃতীয়ায় কলসি উৎসর্গ ক'রে পিতৃ-পুরুষকে জল দেবার ব্যবস্থা শাস্ত্রকাররা করেছেন। রাজা-বাদশা জমিদারেরাও পুকুর দীঘি কাটিয়ে নাম রেখে গিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের গ্রামের বড় সমস্যা শিক্ষার, জলের নয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঁদারা রয়েছে দু'জায়গায়, পাতকুয়ো রয়েছে অধিকাংশ বাড়িতে। গরমকালে এক একবার কষ্ট হয়, তবে সময়ে বৃষ্টি হলে কোন ভাবনাই থাকে না। এ গ্রামে টিউবওয়েল বসিয়ে লাভ হবে না। হয় গরু-বাছুরে ভেঙে ফেলবে যখন তখন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, না হয় অকেজো হয়ে যাবে নিয়মিত ব্যবহারের অভাবে। আপনার টাকাটা আখেরে ফেলাই যাবে।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে অমরবাবু বললেন—ফেলা যাবে না হে, ফেলা যাবে না। শাস্ত্রের বিধান বা ইতিহাসের উদাহরণ প্রভাব বিস্তার করেনি আমার ওপর। পথ-নির্দেশ করেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এক গ্লাস জলের বদলে যা পেয়েছি তা যদি শোন তো অবাক্ হয়ে যাবে।

—কি রকম?

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে অমরবাবু কাহিনী শুরু করলেন—

*　　*　　*　　*

বছর দুই আগে পাটনায় গিয়েছিলাম প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে একটি বিশেষ শাখার সভাপতি হয়ে। বিরাট প্যাণ্ডেল। অসম্ভব ভিড়। অসহ্য গরম। অসুস্থ বোধ করি। প্রথমে গা-বমির ভাব, পরে মাথাঘোরা। যখন অভিভাষণ শেষ করি তখন চোখের সামনে অন্ধকার। ধপ ক'রে পড়ে যাই টেবিলের ওপর। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানিনে। চোখ মেলে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, খাটে শুয়ে আছি, কাছের চেয়ারে এক ভদ্র-মহিলা। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন?

উত্তর দিলাম—কেন কি হয়েছে আমার? আপনি কে? আমি কোথায়? কিছুই তো বুঝতে পারছিনে।

মহিলা বললেন—আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সাহিত্য সভায়। এখন আমার বাড়িতে আছেন। ভাবনার কারণ নেই। ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বিশ্রাম নিলে কাল সকালেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। তখন শুনবেন সব কথা।

শরীরে তখনও কিছু দুর্বলতা, মনে কিছু অবসাদ। নীরবে পাশ ফিরলাম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙে। স্বাভাবিক সজীবতা ফিরে পাই। ঘরে পায়চারি করতে করতে কতকগুলো জিনিস নজরে পড়ে। খাটের নিচে তুঁষভরা বরফের বাক্স। টিপয়ের ওপর আইস ব্যাগ, ওষুধের শিশি, গ্লুকোজের টিন। রাইটিং টেবিলের টাইমপিসটা চলছে, কিন্তু দেয়ালের ক্লকটা সাতটা বেজে বন্ধ। নিশ্চয় নির্দিষ্ট দিনে দম দেওয়া হয়নি। পাশে কয়েকটা চিঠির খাম ও বুকপোষ্ট প'ড়ে আছে অছোঁয়া অবস্থায়।

অল্পক্ষণ বাদে গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকে বললেন—একি, আপনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। আর কোন অস্বস্তি নেই তো?

আমি মাথা নাড়লাম। তিনি আমার মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা ক'রে বিস্কুট ও ওভালটিন নিয়ে এলেন। খাওয়া শেষ হলে বললাম—দেখুন, বড় সংকোচ হচ্ছে। আপনার পরিচয়টা—

মহিলার মুখে সলজ্জ হাসি। বললেন—আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার ছাত্রী। আমার নাম নমিতা। কলেজে আপনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। আমি এখন বাঁকিপুর গার্লস স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সংগে আমার আলাপ আছে। আপনি যে সম্মেলনে আসবেন সে খবর আগেই পেয়েছিলাম। কাল সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছা ছিল সভা ভাঙলে আপনার সংগে দেখা করব। দারুণ গরম। আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি তখন অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তাদের কাছে গিয়ে বললাম—"ডক্টর রায় আমার অধ্যাপক। ওঁর শুশ্রূষার ভার আমার ওপর ছেড়ে দেন। আমার বাড়ি নিকটে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হবে।" তাঁরা রাজী হলেন। একজন ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দিলেন আমার বাড়ি।

নমিতার কথায় যেমন আশ্চর্য হলাম তেমনি হলাম অভিভূত। বললাম—আমি তোমাকে একটুও চিনতে পারিনি। বড়ই লজ্জার বিষয়। তুমি আমাকে মনে রেখেছ—অচৈতন্য অধ্যাপকের পরিচর্যার দায়িত্ব নিয়েছ উপযাচক হয়ে। তোমার মহত্ত্বের তুলনা নেই। তোমার ঋণ শোধ করবার নয়। কত ছেলেমেয়ে পড়িয়েছি—কে বা মনে রাখে, আর কে বা এমন ক'রে সেবার ভার নেয়! সত্যি নমিতা, আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত ছাত্রী পেয়েছি।

নমিতা বললে—আমার সৌভাগ্যও বড় কম নয়।

আমি বললাম—তোমার সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য। পীড়িত মূর্ছিত বৃদ্ধকে দেখাশোনা করবার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?

নমিতা বললে—এ ঘটনার কথা বলছিনে স্যার, সে আর এক ঘটনা। আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই। বছর পনের আগে। আমার তখন থার্ড ইয়ার। কলেজ হলে ইতিহাস পরীক্ষা দিচ্ছি। আপনার 'ইনভিজিলেশন ডিউটি'। এপ্রিলের মাঝামাঝি। ভীষণ গরম কলকাতায়—টেম্পারেচার ১০৮ ডিগ্রি। মেয়েরা কাগজ চাইছে বার বার, আরও বেশী চাইছে জল। আপনি কাগজ দিতে ব্যস্ত, আর দীনবন্ধু ব্যস্ত জল দিতে। তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে যায়। জলের জন্য উঠে দাঁড়াই। আপনি 'দীনবন্ধু,' 'দীনবন্ধু' ব'লে ডাকলেন, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন আপনি নিজেই বারান্দার কলসি থেকে জল গড়িয়ে গ্লাস হাতে ছুটে এলেন আমার কাছে। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। আপনি বললেন—"দোষ কি, জল নাও। আমি তোমাদের প্রশ্ন দিতে পারি, কাগজ দিতে পারি—আর জল দিতে পারি নে?" ঘরসুদ্ধ মেয়ের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। অনেকে ইশারা করলে জল নিতে। সাধনা ছিল পিছনের বেঞ্চিতে। সে রেগে বললে—"কী হচ্ছে নমি? শিগ্‌গির নে। স্যার কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?" আর সংকোচ না ক'রে আমি গ্লাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসে খালি ক'রে ফেললাম। আপনি হাত বাড়ালেন খালি গ্লাসটা নিতে। আমি লজ্জায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রসন্ন হাসি হেসে আপনি বললেন—"ও, বুঝেছি। এঁটো গ্লাস আমাকে

দেবে না। আচ্ছা, রেখে দাও, দীনু এসে নিয়ে যাবে। আর সময় নষ্ট ক'রো না, লেখ।" ঘটনাটি দাগ কেটেছিল আমার মনে। কাল বিকেলে সভার মাঝখানে যখন আপনার ফিট হ'ল ঠিক সেই সময়ে সেটি সহসা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। কে যেন কানে কানে ব'লে গেল—"ইনি একদিন তোমাকে তেষ্টার জল দিয়েছিলেন। এঁকে ফেলে পালিও না।" মুহূর্তেই আমি কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। দুঃসহ গ্রীষ্মের দিনে পরীক্ষার প্রাণান্ত পরিবেশে অধ্যাপকের হাত থেকে তৃষ্ণার জল পাওয়া মস্ত সৌভাগ্য। এটা পরে বুঝেছিলাম। যৌবনের সংকোচ হয়েছিল পরিণত বয়সের শুভস্মৃতি।

আমি বললাম—জীবনে কত কি ঘটে। কে তার হিসাব রাখে? ওসব তুচ্ছ কথা তুলে আমাকে লজ্জা দিও না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ছাত্রীরা যেন তোমার মতো হয়। তাহলে আমাদের দুর্ভাগা দেশের রূপ বদলে যাবে।

ডাক্তারের নির্দেশ। আর একদিন পাটনায় থাকতে হ'ল। নমিতার যত্নের অন্ত নেই। আসবার দিন আমাকে ট্রেণে উঠিয়ে দিতে এল স্টেশনে। বিদায় বেলায় প্রণাম ক'রে বললে—বয়েস হয়েছে। গরমের সময় এ অঞ্চলে আর আসবেন না স্যার। পাটনায় প্রচণ্ড গরম।

তার মাথায় হাত রেখে সজল চোখে বললাম—নমিতা, তোমার মতো মা পেলে পাটনা কেন, পানিপথ যেতেও আমি প্রস্তুত। * * *

উপাখ্যান শেষ ক'রে অমরবাবু গড়গড়ার দিকে তাকালেন। কলকের আগুন নিভে গিয়েছে বহুক্ষণ। একটু থেমে বললেন—নমিতা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এক গ্লাস জলের বিনিময়ে যা পাওয়া গিয়েছে—তাতে মনে হয় এতগুলো টিউবওয়েল কখনও বিফলে যাবে না।

অমরবাবুর বলিষ্ঠ বিশ্বাসের সুন্দর ভিত্তি আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আবেদন অব্যর্থ। তার ওপর কথা চলে না। বললাম—আপনি ঠিক করেছেন। আমি একটু ভুল বুঝেছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

উদার দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন অমরবাবু—তোমার স্কুলের প্রস্তাবটা আমি ভুলি নি হে। টিউবওয়েলের কাজ চুকলে ওটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা যাবে। 'প্রাইয়েরিটি'র ব্যাপার, অন্য কিছু নয়। রাত হয়েছে। আজ এসো।

জনহীন পথ। ফেউ ডাকে ষষ্ঠীতলার জংগলে। বর্ষার জলে ভরা কৈবর্ত গর্তের ধারে ঘুমে ঢুলে পড়ে জলপিপি-দম্পতি। আবছা আলোয় বিভীষিকা জাগায় বাবুইয়ের বাসাগুলো। বার বার মনে পড়ে অমরবাবুর গল্পের নায়িকা নমিতা দেবীকে। সেই অপরিচিতাই জলের মহিমা বাড়িয়ে দিয়েছেন অমরবাবুর কাছে। তাঁর যত্ন পরাভূত করেছে আমার যুক্তিকে।

ঘাস-ফুল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

নগণ্য ভাবিয়া তুচ্ছ করো, ক্ষতি নাই;
আদরে আবরি' রাখো, অনাদর তা'র
করিব না। এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার
তুলিয়া দিবার তবু নাই কোন ঠাঁই—
অন্তরে—অন্তরে আমি নিরন্তর তাই
অনুভব করি শুধু। এ দেহে আমার
ঢালিয়াছে নীলাম্বর সূর্য্যের সম্ভার;—
সে তো নহে ভুলিবার, তাই ভুলি নাই।
অনন্ত জীবন-ধারা আমারে ঘেরিয়া
চলিয়াছে নিরবধি কাল; মোর হিয়া
ভরিয়াছে সমুদ্রের জল-জাত মেঘে।
ধূলি-ধন্য পথে তাই আনন্দের বেগে
চলিয়াছে আমারও যে ক্রম-বিবর্ত্তন;—
ঘাস-ফুল, তবু মোরে ঘিরেছে গগন।

বহুদর্শী বেন্‌জামিন ফ্র্যাংক্‌লিন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি জীবনে বহু বিষয়ে এতখানি জ্ঞানার্জ্জন, নানা ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার এমন ব্যাপক পরিচয়, কর্ত্তব্যবোধ এবং শ্রমশীলতার এমন প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত, কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের এমন সাফল্যমণ্ডিত বিকাশ সচরাচর দেখা যায় না, যেমন দেখা গিয়েছিল আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বেন্‌জামিন ফ্র্যাংক্‌লিনের জীবনে।

নিজের ভাগ্য তিনি নিজে রচনা করেছিলেন। অনন্যচিত্ত অধ্যবসায় এবং সুকঠিন সাধনার দ্বারা তিনি অতি সামান্য অবস্থা থেকে যশ ও প্রতিপত্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। যে ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে ব'সে উত্তরকালে তিনি দেশের সর্ব্বজনমান্য নাগরিকরূপে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া তৈরী করেছিলেন, সেই শহরে ষোলো বছর বয়সে যখন তিনি কাজের চেষ্টায় প্রথম প্রবেশ করেন তখন তাঁর না ছিল বিত্ত, না ছিল সুপারিশের জোর। পরণের জামাকাপড় ধূলায় মলিন, রুক্ষ চুল, মুখে অপরিসীম ক্লান্তির ছায়া, দুই বগলে দু'খানি পাঁউরুটি সম্বল ক'রে এক রবিবারের সকালে বেন্‌জামিন ফিলাডেলফিয়ায় পদার্পণ করলেন। শুনেছিলেন, সেখানকার ছাপাখানায় কাজ খালি আছে। নাগরিকরা সেই অপরিচিত আগন্তুককে কৌতূহলভরে লক্ষ্য করল। কেউ বা নানা প্রশ্নে তাঁকে বিব্রত করল। কেউ বা করল উপহাস। তখন কি তারা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে এই চকিতভাবগ্রস্ত দরিদ্র-চেহারার কিশোর তিপ্পান্ন বছর পরে এই শহরে ব'সে দেশের স্বাধীনতা-ঘোষণার বাণী রচনা করবেন? এবং সেই অজ-পাড়াগাঁ ফিলাডেল্‌ফিয়া তাঁরই নিরলস কর্ম্মপ্রচেষ্টায় একদিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় মহানগরীতে পরিণত হ'বে?

* * *
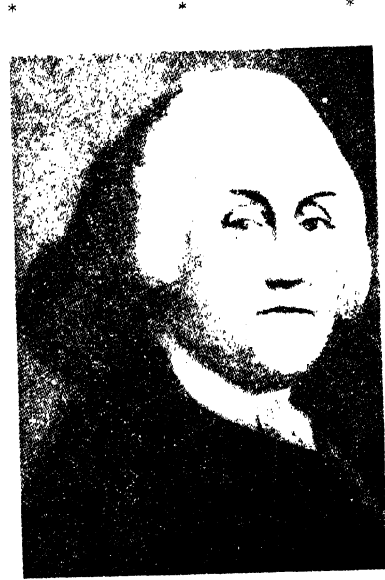
ষোলো বছর বয়সে বেনজামিন ফ্র্যাংকলিন ভাগ্যান্বেষণে যেদিন ফিলাডেলফিয়ায় প্রবেশ করেন সেদিন তিনি ছিলেন একান্ত নির্ব্বান্ধব ও নিঃসম্বল, নগরের অধিবাসীরা সেদিন বিশেষ কৌতুক এবং কৌতূহলের সঙ্গেই তাঁকে লক্ষ্য করেছিল।

পরিণত বয়সে

ছেলেবেলা থেকেই বেন্‌জামিন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন এবং কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। বরাবর যেন বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধি ছিল তাঁর। ন'দশ বছর যখন বয়স, তখন পিতার মোমবাতির কারখানায় বাতির মধ্যে পল্‌তে লাগাবার কাজে বাপকে সাহায্য করতেন। সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করবার ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা যেতো তাঁর জীবনযাত্রায়। অতি-সাধারণ আহার, অতি সস্তার পোষাক, কিন্তু সেজন্য কোনদিন কোন অনুযোগ ওঠেনি তাঁর মুখে। সব তাতেই তিনি খুসী! কাজের ফাঁকে নষ্ট

পড়তেন, যেখান থেকে যা ভাল বই পেতেন, সংগ্রহ ক'রে আনতেন। Plain-living and high-thinking—এই ইংরাজী প্রবচনটি যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছিল।

১৭২৫ সালে ভাগ্যান্বেষণে অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে বেনজামিন ফ্র্যাংকলিন লণ্ডনে পৌঁছে একটি বড় ছাপাখানায় সামান্য বেতনে কাজে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। ছাপাখানার সহকর্ম্মীরা সকলেই ছিল মদ্যপ। মদ তাদের কাছে ডাল-ভাত-জলের সামিল। বেনজামিন জীবনে মদ স্পর্শ করেন নি। তাঁর সেই সাত্তিকতার জন্য সহকর্ম্মীরা তাঁকে অহরহ উপহাস করত। বলত—"আমরা হলাম ছাপাখানার ভূত, আর তুমি হোলে বেহ্মদত্যি। কিন্তু এর যে কী মজা তা তো জানলে না।" দিনে তারা ছ'বার ছ'পাঁট বীয়র খেতো প্রত্যেকে। বলত, এ না খেলে তাদের কাজের ক্ষমতা লোপ পাবে। বেনজামিন হাসতেন। দুধ অভাবে জলে পাঁউরুটি চুবিয়ে নরম ক'রে খেতেন আর বলতেন—"তোমাদের চেয়ে আমার কাজের ক্ষমতা কি কম!" তারা বলত—"তুমি হলে একজন অসাধারণ Water American! জলে চুবিয়ে পাঁউরুটি খাও, তুমি কি সহজ লোক!"

বন্ধুদের কাছে বিশেষপ্রিয় ছিলেন তিনি। মজাদার গল্প বলতে, নানা ক্রীড়া-কৌতুকের অনুষ্ঠান ক'রে আসর জমাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এক বছর বিলাতে থেকে ছাপাখানার কাজ শিখে তিনি দেশে ফেরেন। দেশে ফেরবার আগে ইংরাজীতে একখানি ছোট পুস্তিকা ছাপিয়েছিলেন; তার নাম—A dissertation on liberty and necessity, pleasure and plain! সেই পুস্তিকার দু'কপি মাত্র আজ আছে। কয়েক বছর আগে একটি কপি লণ্ডনের এক নীলামঘরে এক হাজার পাঁচ পাউণ্ড দামে বিক্রি হয়েছিল।

* * *

১৭৩০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় বেনজামিন তাঁর মুদ্রণ-ব্যবসা খুললেন। আমেরিকার সাংবাদিক-জগতের একজন অগ্রণী পথিকরূপে তিনি আজ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। শিক্ষানবিশী করবার সময় তিনি New England Courant নামে যে-সংবাদপত্রের প্রচলন করেছিলেন, সেদিন ছিল সমগ্র দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সংবাদ-পত্র। কাগজের অন্যতম মালিক ছিলেন তাঁর বৈমাত্র ভাই জেমস্। তিনিই প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। তখন অনেকেই তাঁকে এই কাজে রত না হোতে উপদেশ দেন; তাঁরা বলেন, আমেরিকায় তো বহু সংবাদপত্র চালু আছে এবং তাই যথেষ্ট!

"পেনসিল্‌ভেনিয়া গেজেট" নামে সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ বেনজামিনের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। এই পত্রিকার বর্ত্তমান নাম স্যাটারডে ইভ্‌নিং পোষ্ট! সারা বিশ্বে উক্ত পত্রিকার কদর কম নয়। তাঁর প্রকাশিত অপর একখানি মৌলিক ধরণের সাময়িক-পত্র পঁচিশ বছর ধ'রে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল। তার নাম ছিল, Poor Richard's Almanac।

প্রথম যখন স্বাধীনভাবে কাজে নামলেন তখন অর্থের জোর ছিল না; কিন্তু সেজন্যে কোন কাজ আটকে থাকে নি তাঁর। নিজেই কম্পোজ করতেন, সম্পাদকীয় লিখতেন, মুদ্রণ-যন্ত্র চালাতেন এবং কাগজগুলি ছাপা হবার পর হকারদের কাছে পৌঁছে দিতেন। অনন্যসাধারণ মেধার বলে তিনি তাঁর মুদ্রণ-যন্ত্রে, ব্লক-তৈরীর কাজে এবং ছাপাখানার আরও নানা বিভাগে প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন। রাজ্য-সরকার যখন কাগজের টাকা তৈরী করবার পরিকল্পনা করলেন তখন বেনজামিনই প্রথম তামার সাহায্যে ব্লক তৈরী করবার পন্থা উদ্ভাবন করলেন। ছাপাখানার সঙ্গে তাঁর একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ছাপার কাগজ থাকতো সেই দোকানে। প্রয়োজনবোধে তিনি ঠেলাগাড়ি করে দোকান থেকে কাগজের রীম প্রেসে নিজে ঠেলে নিয়ে আসতেও লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কিছুকাল আগে যখন অন্য এক ছাপাখানায় কিছুদিন শিক্ষা-নবীশ ছিলেন তখন তিনি এক বহুল-আলোচিত সাময়িক ঘটনার উপর একটি কবিতা রচনা ক'রে, কয়েক শত কপি নিজেই কম্পোজ ক'রে ছাপিয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে হেঁকে হেঁকে সেগুলিকে বিক্রি করেছিলেন।

* * *

ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইর বিশেষ মিলন-সভায় বেনজামিন ফ্রাংকলিন তাঁর মিষ্ট ব্যবহারে ও মধুর ব্যক্তিত্বে সকলকে পরিতুষ্ট করেছিলেন

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ

শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

ভারতীয় সভ্যতা ভারত মহাসাগরের সংগেই তুলনীয়। ভারতের বিভিন্ন নদী যেমন ভারতমহাসাগরে মিশে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে এবং সংগে সংগে একক ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বরূপের এক জলনিধির পৃথক্ মর্যাদা রক্ষা করেছে,—পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতাও ঠিক তেমনই ভাবে ভারতের মাটিতে আপনাদের জাতীয়তা হারিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে ঢালাই হয়ে এক বৈচিত্র্যময় নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমকালীন ও প্রায় সমজাতীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিলো, কিন্তু সুদীর্ঘকালের সংঘাত ও আবর্তনের অন্তরালে ঐ সকল সভ্যতা প্রায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। একমাত্র পুরাতত্ত্বই মৃতরক্ষণাগারে সে সকল সভ্যতার নির্বাক সাক্ষ্য বহন করছে। ঐ সকল দেশের বর্তমান অধিবাসী আজকাল এমনই এক জীবনরীতিতে অভ্যস্ত যার সংগে তাদের প্রাচীনত্বের কোনো সংযোগ নেই। সামান্য দুই এক ক্ষেত্রে থাকলেও তা' উপেক্ষণীয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নানা সংঘাত ও আবর্তনেও আপনার স্বরূপ বজায় রেখেছে। পুরাতত্ত্ব ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বলবে না,—বলবে আজকের ভারতের গ্রামীণ জীবনযাত্রা। সুপ্রাচীন সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারা আজও সমানভাবেই ভারতে প্রবাহিত হচ্ছে,—সামান্য পরিবর্তন যা ঘটেছে তা' বাইরের—তাকে সহজেই উপেক্ষা করা চলে। এই সংরক্ষণশীলতার মূল কারণ ধর্মের প্রাধান্য। ধর্ম অর্থে নিছক দেবদেবী মাহাত্ম্য নয়,—সকাল থেকে রাত্রির শেষভাগ এবং শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরণীয় কতকগুলো বিধিনিষেধের নিয়মাবলী,—সেই নিয়মাবলীও শুধু নীরস, গতানুগতিক কর্মপদ্ধতি নয়,—তার সংগে প্রতি মুহূর্তের প্রকৃতি, ঋতু ও উৎসবের এমন একটা সৌরভ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তা' ক্লান্তিকর মনে হয় না। ভারতের ধর্ম শ্রুতি নয়—স্মৃতি,—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম শ্রুতি, সমষ্টিগত ধর্ম স্মৃতি! এই সমষ্টির স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষে ব্যষ্টিকে খর্ব করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সংরক্ষণশীলতা নানাক্ষেত্রে নানা সমালোচনার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে! অতি আধুনিক পন্থীরা ভারতের এই পরিবর্তনহীন মনোভাবের নিন্দা করেছেন,—অপরপক্ষে প্রাচীনপন্থীরা ভারতের এই পরিবর্তনহীনতাকে গৌরবজনক মনে করে জয়ধ্বনি করছেন। কিন্তু উভয়পক্ষেই স্বার্থপরতা প্রবল। যে স্বচ্ছ মানসিক প্রবৃত্তি নিয়ে ভারতীয় চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন,—উভয়পক্ষেই তার একান্ত অভাব! সেইজন্যেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে আমরা জানতে পারিনি। মানুষ আজ যুক্তির কাছে মগজের পাঠ নিচ্ছে! এটা হলো 'age of reasoning'। যুক্তি দিয়ে আমাদের তুলনামূলক বিচার করে দেখতে হবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় কি এমন জিনিষ ছিল যার জন্যে আজও তার মৃত্যু ঘটেনি; কিংবা ভারতীয় জাতের চরিত্রে কি এমন উপাদান রয়েছে যাতে সে তার প্রাচীনতাকে আজও বর্জন করতে পারে নি বা সাহস পায় নি। এ প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর দেওয়া কষ্টসাধ্য। খৃষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে এক মানবগোষ্ঠী যে গান গেয়ে কতকগুলো অপরিজ্ঞাত দেবদেবীকে আহ্বান করলো,—সেই গানগুলোকে 'মন্ত্র' হিসেবে মেনে নিয়ে আজও আমরা সেই দেবদেবীকেই আহ্বান ক'রছি। যে আবেগ, অনুভূতি বা ভীতি নিয়ে সেদিনের মানুষ যে দেবদেবীর পরিকল্পনা করেছিলো আজকেও আমরা ঠিক সেই আবেগ, সেই অনুভূতি বা ভীতি নিয়ে সেই দেবদেবীরই স্তুতি করছি।—এ কি করে সম্ভবপর হলো?

এর জন্যে আনন্দে গদ গদ হওয়া অথবা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করা কোনটাই সঠিক পন্থা নয়। এর ভেতরে এমন একটা চমকপ্রদ সত্য রয়েছে যাকে জানতে হবে। পৃথিবীর সব দেশেরই মানুষ এমন কতকগুলো উপাদান বা পারিপার্শ্বিকতায় তৈরী যাতে সকলের আচার ব্যবহার বা মগজে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সকল দেশের মানুষ সব সময়ই পরিবর্তন চেয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষে এমন কি পৃথক সত্য রয়েছে যা' তাকে ঐ স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে সরিয়ে রেখেছে? এটা গভীরভাবে ভাববার কথা। পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা ভারতবর্ষের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানা এর অন্যতম কারণ হলেও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে যুগে ভারতবর্ষে প্রথম বাইরের অভিযান সুরু হয় সেই সময়েই ভারতবাসীরা তাদের সভ্যতা ও দৈনন্দিন রীতিনীতির মর্যাদা সম্বন্ধে আত্মসচেতন ছিলো। কাজেই বাইরের যা উপাদান এসেছে তার ভারতীয়করণ ঘটেছে,—ভারতবর্ষ তার প্রাধান্য স্বীকার করেনি। সবচেয়ে বড়ো সত্য বোধ হয় এই যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রাধান্য কোনদিনই ধর্মীয় প্রাধান্যকে অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হয়নি। রাজার পরিবর্তনে ভারতবর্ষের যে মন বিচলিত হয়নি, সেই মনই ধর্মপ্রচারককে নিয়ে তুমুল আন্দোলন করেছে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়। অল্পায়াসেই যে দেশে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ মেলে, সে দেশের লোক পর্যাপ্ত অবসর সময়ে নিশ্চয়ই অপার্থিব নানা চিন্তা ও সমস্যার মানসবিলাসে জড়িত হয়ে পড়ে। মাটির মায়ায় সেইজন্যে ভারতবর্ষের মন আটকা পড়েনি,—মাটির ঊর্ধ্বে কল্পলোকের সন্ধানে বিহার করেছে। এই ভাবপ্রবণ মনেই সনাতনী-তত্ত্ব তার মূল প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাইরের ছোটখাটো আঘাতে তার চাঞ্চল্য ঘটেনি।

বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা বিশ্লেষণ করলে যে দুই ধারার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাদের উভয়ই সিন্ধুনদের তীরে গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু দুটি ধারা স্বভাব ও সত্তায় পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় দুটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।—একটি বৈদিক, অপরটি সিন্ধু বা মহেন্-জো-দড়ো সভ্যতা। আজকের ভারতীয় সভ্যতা এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে তার মধ্যে কোনটা কোন যুগের বা কোন্ জাতের তা' সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন! ইতিহাসের নজির মিলিয়ে এ বিষয়ে যতো চেষ্টাই করা হোক্ না কেন, তার সাফল্যে সন্দেহের অবকাশ ঘুচবে না। অদ্ভুত সংরক্ষণশীলতার জন্যে এ জাত এমন সুপ্রাচীন এক একটা প্রথা আঁকড়ে আছে যে তার সুপ্রাচীনত্বের কল্পনাও আমরা ক'রতে পারি না। এদিক্ থেকে সম্পূর্ণ সতর্ক হয়েই সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার অবদানের আলোচনা করবো।

বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতাকে তুলনামূলক যে ভাবেই বিচার করা হোক্ না কেন, বৈদিক 'জাতীয় দেবতা' ইন্দ্র পুরন্দর আখ্যায় যে জাতের পুরগুলো ধ্বংস করতে উৎসাহী হয়েছিলেন সে জাত যে ভারতবর্ষেই অবস্থান করেছিলো এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিলো তা' অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সেই আক্রান্ত জাতই যে মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় তাদের কৃতিত্বের অক্ষয় চিহ্ন এঁকে গিয়েছে তা' মনে করে নিলে হয়তো ভুল হবে না। ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব যুগে যে বিরাট দুই মৌলিক সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটে এবং যে সংঘর্ষের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভারতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়,—সেই দু'টি সভ্যতাই এই বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতা। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধপ্রকৃতির সভ্যতা কি ক'রে যে আপনাদের মধ্যে আপোষ করে মিলনের পথ প্রশস্ত করে নিলো তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সত্যটা বোধ করি এই। ভারতবর্ষ যাকে চায় নি তাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেই ধ্বংস করেছে,—তার জন্যে হিংস্র আঘাত হানবার প্রয়োজন বোধ করে নি। বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতা কালের অনুশাসনে মিলিত হলেও, একটু অনুসন্ধানী হলে, এ মিলনের আড়ালে উভয়ের পৃথক চিন্তাধারা ধরা পড়ে। যদিও আজকের ভারতবর্ষ চতুর্বেদের নামে ভক্তিপ্লুত হয়ে ওঠে, তবু স্বীকার ক'রতেই হবে যে বেদ জননী হলেও ধাত্রী হলো পুরাণ,—এবং আজকের শিশু জননীর চাইতে ধাত্রীকেই চেনে বেশী, কারণ ধাত্রীর স্নেহের প্রভাবই তাকে বেড়ে ওঠার বলিষ্ঠ সুযোগ দিয়েছে। পুরাণ আজ ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে,—তাই সে পঞ্চম বেদ। অথচ এই পুরাণের ভিত্তিই গড়ে উঠেছে বৈদিক পরিকল্পনার বাইরে—অন্ধ মন যেখানে অন্ধকারে ভীতি ও শ্রদ্ধার আড়ালে বাস করতে চায়। ভারতবর্ষের সভ্যতায় আজকে আমরা যে উপাদান পাচ্ছি তা' অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী,—সংশয়শীল মন এতে আরও সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ে এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করে। বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতার চারিত্রিক লক্ষণগুলো তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করলে এ সংশয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ভরসা আছে।

বৈদিক গোষ্ঠী সম্পূর্ণ মননশীল! প্রাকৃতিক সত্তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-চাঞ্চল্যই তাকে মুগ্ধ করেছে। বস্তুর স্থূলস্বরূপ তার আকর্ষণ নয়। এই মননশীলতা পরবর্তী যুগে বেদান্তদর্শনের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে এবং আধুনিক ভারতেও সংস্কারপন্থী মনে এই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠী হৃদয়ধর্মী,—আবেগের অন্ধ অনুভূতিই তাদের সমস্ত সভ্যতা ও চিন্তার ভিত্তি! বর্তমান ভারতবর্ষের বিশাল অংশ এই গুণেরই সার্থক উত্তরাধিকারী! বস্তুর বাইরের স্থূলরূপই ছিলো মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠীর আকর্ষণের বস্তু। বৈদিক গোষ্ঠী 'প্রকৃতির সন্তান' হ'য়েও প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে জানবার কৌতূহল প্রকাশ করেছে। কিন্তু মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠী প্রকৃতির অনুশাসন ভীতি ও শ্রদ্ধার সংগে মেনে নিয়েছে। কোনো সংশয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করে নি। বৈদিক গোষ্ঠী ভারতবর্ষকে বিচার বিশ্লেষণের একটা নিজস্ব পদ্ধতি দান করেছে। মহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার কৃতিত্ব ভক্তিতত্ত্বের উদ্ভাবনে। সমগ্র ভারতবর্ষের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য আজও প্রকটভাবে লক্ষ্যণীয় তা' এই ভক্তিতত্ব। ভারত-বর্ষের মাটিতে এই ভক্তিবাদ ঠিক আপনার উপযুক্ত স্থান খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কোনও ভারতবাসীই আজ ভক্তি-তত্ত্বের প্রভাব অতি-ক্রম করে জীবনের সাধনাকে নিযুক্ত করতে পারে না। বৈদিক ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাতে সংরক্ষণশীলতা নেই,—অনন্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু মন কেবল প্রশ্নই করেছে—প্রাকৃতিক নিত্য লীলাবৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে—এবং নিজেই একটা মন-গড়া উত্তরও খুঁজে নিয়েছে—যাকে Henotheism বা Kathenotheism যাই বলা হোক্ না কেন! কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়ের কথা এই যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সত্তার আড়ালে একই চঞ্চল খেয়ালের সাড়া তাদের কাছে ধরা দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচনায় এর মূল্য অপরিমেয়। মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠীর চিন্তায় এ মৌলিকতার অভাব ছিলো। বস্তুর আচরণকেই তারা বস্তুর স্বরূপ বলে জেনেছে। চোখ দিয়ে তারা মনের কাজ সম্পন্ন করেছে,—মননের চাইতে দর্শনই বড়ো হয়ে উঠেছে। বৈদিক গোষ্ঠীর চিন্তার এই অভিনবত্বের জন্য বৈদিক নীতিসমূহকে নিছক যজ্ঞের "ফরমূলা" বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। সরল মানুষমনের আনন্দোচ্ছ্বাস যে সংগীতে ব্যক্ত হয়েছে তা' দৈনন্দিন জীবনায়নের সংগে নিশ্চয়ই যুক্ত ছিলো,—কিন্তু সেগুলোকে অংক কষে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতিতে যুক্ত করার চেষ্টা হয়নি। একাজ অনেক পরের। ভারতবর্ষের মাটিতে অনুষ্ঠানপ্রিয় সিন্ধু সভ্যতার অবাধ প্রভাবকে এর জন্যে দায়ী করা চলতে পারে। এই বিরুদ্ধ সভ্যতার পারিপার্শ্বিকতায় সরল নীতিসমূহ জটিল যজ্ঞজালে আবদ্ধ হয়ে মানুষের প্রাণের ধর্মের পথ রুদ্ধ করে দেয়। যার প্রতিবাদে পরের যুগে মানুষের সুকুমার বৃত্তি অবলম্বন করে নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে। সন্দেহ নেই, বৈদিক গোষ্ঠী শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলে অনিবার্য কারণে অগ্নির উপাসক। এই অগ্নি উপাসনার জন্য গীতিগুলির কিছু কিছু ব্যবহার হতো। কিন্তু যজ্ঞের জটিলতা বা অনুষ্ঠান সর্বস্বতা বৈদিক কল্পনায় স্থান পায়নি। দক্ষিণ ভারতের খৃষ্ট পূর্বীয়—প্রস্তরানুশাসনে যেভাবে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখা যায় উত্তর ভারতে সেরূপ দৃষ্টান্ত মেলে না। মহেন্-জো-দড়োর অনুষ্ঠান প্রিয়তার এই হলো নিদর্শন।

জম্বু দ্বীপের পরিকল্পনা সুপ্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার সংগে তার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিলো। ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের যে যে অংশে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মেলে, সম্ভবতঃ সেই সব জায়গা জুড়েই এই জম্বুদ্বীপের পরিকল্পনা ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শনের সংগে ঐ সকল অংশের প্রাচীন নিদর্শনের মিল পাওয়া যায়। মহেন্-জো-দড়োয় যে নারী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং যাকে "goddess of fertility" আখ্যায় বিভূষিত করা হয়, তার সমপর্যায়ের নারী-মূর্তি ঐ সকল দেশেও পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর শস্যোৎপাদন এবং নারীর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা বোধ করি সে যুগে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু ছিলো। অনভিজ্ঞ মানবগোষ্ঠী তাই সে যুগেই মাতৃমূর্তির উপাসনা এবং মাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। বৈদিক গোষ্ঠীর কাছেও 'পিতা দ্যৌঃ' এবং 'মাতা পৃথিবী' মোহ সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু দ্যৌঃ এর প্রভাব তাদের এভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো যে পৃথিবীর আবেদন সফল হয় নি। তাই বৈদিক সভ্যতায় পিতৃতন্ত্র। পৃথিবী বা মাটির প্রতি এই উপেক্ষা কি এদেশের মাটির সংগে তাদের আন্তরিক যোগের অভাব সূচিত করে ?

প্রাণচঞ্চল বৈদিক জাতির উপযুক্ত বাহন অশ্ব। সেই অশ্বারোহী সূর্যদেবতাই পরবর্তী যুগের সভ্যতায় তাদের সার্থক দান। যাস্কের 'আদিত্য এব দেবতা বেদে'—তারই সাক্ষ্য। বৈদিক সভ্যতায় অশ্বের যে খ্যাতি, সিন্ধু সভ্যতায় বৃষের প্রতিপত্তি ঠিক সেইরূপ। বৃষবাহন পশুপতি সেইজন্য সিন্ধুসভ্যতার প্রধান দেবতা। এই বৃষবাহন পশুপতি প্রাচীন কল্পনায় এভাবে স্থান পেয়েছিলো যে হিন্দুকুশের পশ্চিমপাশে বহু দূরেও তার পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলছে। (হিটাইটে বৃষবাহন পশুপতি মূর্তি পাওয়া গেছে)। বৃষের মাহাত্ম্যেই বোধ হয় গাভীর প্রতি শ্রদ্ধা সেদিনের সমাজে স্থান পেয়েছে। এবং এ শ্রদ্ধাকে উচ্চাঙ্গে যে মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠী তা ভাবতে কষ্ট হয় না। কারণ বৈদিক গোষ্ঠীর কাছে গোহত্যা অবিদিত ছিল না। অথচ পরবর্তী যুগে তাদেরই উত্তরাধিকারীদের চিন্তায় এ অভ্যাসের অনুকৃতি জুগুপ্সাব্যঞ্জক মহাপাপ বলে কি করে পরিণত হলো তা চমকপ্রদ ! স্বীকার করতেই হবে যে বৈদিকান্তর অন্য সভ্যতার দায়িত্ব এতে সবটুকুই। (মিশরের গাভীদেবতা Hathor এর নাম এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য)। সমগ্র ভারতবর্ষ মহেন্ জো-দড়োর পশুপতি পরিকল্পনা আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বৈদিক 'জাতীয় দেবতা' অশ্বারোহী (উচ্চৈঃশ্রবা) ইন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্তা যাই থাকুক না কেন, ধর্মতত্ত্বের অধ্যায়ে ইন্দ্র যে সূর্য ব্যতীত আর কেউ নয় তা' বুঝতে কষ্ট হয় না। এই ইন্দ্রও বৃষবাহন পশুপতির পাশে নিষ্প্রভ। আজকের হিন্দুমনে ইন্দ্রের উপাখ্যানগত মাহাত্ম্য যে পরিমাণ, ধর্মীয় মাহাত্ম্য সে পরিমাণে কিছুই নয়।

নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতার সংগে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতাও মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠীর কাছে কম বিস্ময়কর ছিলো না। "শিশ্নদেবাঃ" পদের আধুনিক যে ব্যাখ্যাই করা হোক্না কেন সমস্ত ব্যাখ্যার গোড়ায় ঠিক সত্যের অভাবই উপলব্ধি করা যায়। দক্ষিণভারতের গুড়িমল্লমের (Gudimallam) শিবলিংগে যথার্থ পুরুষাংগের অনুকৃতি সত্যই এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করে। বেদকে যে হিন্দু অভ্রান্ত মনে করে তার কাছে শিবলিংগের মাহাত্ম্য সমান মর্যাদার অধিকারী। বৈদিক সভ্যতার ওপর সিন্ধু সভ্যতার এ জয়লাভ কম গৌরবজনক নয়। "No uncertainty at least attaches to the divinity of the seated "Siva" of the seals (P. 79), a figure which, even in these small-scale representations, is replete with the brooding, minatory power of the great god of historic India. Here if anywhere may be recognised one of the pre-Aryan elements which were to survive the Aryan invasions and to play a dominant role in the so-called. Aryan culture of the post-vedic period, Another such element was Phallus-worship, a non-Aryan tradition which appears to have obtained amongst the Harappans, if certain polished stones, mostly small but up to 2ft. or more in height, have been correctly identified with the linga and other pierced stones with the yoni. The likelihood that both Siva and linga worship have been inherited by the Hindus from the Harppans is perhaps reinforced by the prevalence of the bull (the vehicle of Siva) or of bull-like animals amongst the seal-symbols.—The Indus Civilisation, Sir Mortimer Wheeler (P 83).

হিন্দু দেবদেবীর জগতে সবচেয়ে বিস্ময়কর উপাদান পশু-প্রকৃতি। কি করে যে নানা পশুপাখী নানা দেবদেবী অথবা তাঁদের সংগী বা বাহনের মর্যাদা অর্জন করে ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক ইতিহাস মূর্তিতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ নতুন অধ্যায় সংযোজনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মহেন্জোদড়ো গোষ্ঠীর। বৃষবাহন পশুপতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিষ্ণুর নানা অবতার,—যার সংগে এই পশুরাজ জড়িত, —এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন্ এক প্রেরণায় বা হৃদয়ের বিভিন্নবৃত্তির অনুশাসনে পৃথিবীর পশুজগতকে দেবজগতের মার্জিত প্রাংগণে প্রবেশ করানো হয়েছে, তা' অযৌক্তিক না হলেও কৌতুকপ্রদ নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কৌতুকপ্রদ ঘটনা শুধু হিন্দুকুশের পূর্বপ্রান্তেই সংঘটিত হয়েছিলো তা নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্য অংশেও এর আবির্ভাব ঘটেছে। বোধ করি, সেদিনের মানুষের সংগে পশুজগতের যে নিষ্ঠুর সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো তারই একটা আপোষ করা হয়েছে এই অভিনব কল্পনায়। কিংবা বন্যপশুর শক্তিমত্তায় মানবীয় বা দৈব সুকুমার-বৃত্তি আরোপ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। এই পশু-মানব মিলিত স্বরূপ দেব বা দেবী যে তাঁদের ভক্তদের কল্যাণকামী তা' তাঁদের আচরিত ঘটনা বা চারিত্রিক গুণাবলী আলোচনা করলে সুস্পষ্ট-ভাবে জানা যায়। (তুলনীয়—Composite, sometimes man

faced animals and "minotaurs" presumably indicate on the one hand the coalesence of initially separate animals-cult and, on the other hand, their progress towords anthropomorphism. The representation of the image of a "unicorn" carried in procession might recall the animal-standards which represented the homes of Egypt, but that the widespread occurrence of these signs in the Indus valley seems to militate against their association with particular districts or provinces.

Other types suggesting links with Mesopotamia or with a common source have already been cited: that of a semi-human, semi-bovine monster attacking a horned tiger, a scene reminiscent of the semi bovine Summerian Eabani or Enkidu, created by the goddess Aruru to combat Gilgamesh, but fighting afterwards as his ally against wild beasts, and of a human figure gripping two tigers after the fashion of Gilgamesh and his lions—Wheeler. P.83-81)

বস্তুতঃ সিন্ধু-গংগা বিধৌত উত্তর ভারতের কিয়দংশ ব্যতীত অবশিষ্ট ভারতবর্ষে ধর্মের একটা স্থায়ীরূপ বৈদিক সভ্যতার যুগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উত্তরভারত দক্ষিণভারতকে যে ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, দক্ষিণ ভারতও উত্তরভারতকে ঠিক সেইভাবেই মেনে নিতে পেরেছে। কোন সময়ে এই বিরাট সাংস্কৃতিক সংঘাত ও মিলন সংঘটিত হয় তা' বলা কঠিন। তবে মনে হয় কুরুক্ষেত্রের মহাসমরই এ সংঘাত ও মিলনের শেষ নিষ্পত্তি। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরই বৈদিক ভারতবর্ষ সমগ্রদেশকে জানবার সুযোগ লাভ করেছে এবং জানতে পেরেছে। মহাভারত মহাকাব্যের বিষয়বস্তু বৈদিক ভারতবর্ষের আলেখ্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি।—এবং সেইজন্যেই বোধ করি, মহাভারত! নারীর স্বাধীনতা মহাভারতে যেভাবে স্বীকৃত হয়েছে তা সমাজের এক পূর্বতন অবস্থারই নির্দেশদান করে। ভারতবর্ষের নরনারী তখনও মনু বা তাঁর পূর্বাচার্য বর্ণিত সমাজবদ্ধ জীব নয়। দ্রৌপদীর বিবাহ একটিমাত্র দৃষ্টান্ত বলে মেনে নিলেও, ব্যাসদেব, কর্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতির জন্ম এমন একটা সামাজিক অবস্থায় নির্দেশ দেয় যখন বিবাহ সম্বন্ধ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত নয়,—এবং মাতৃতন্ত্রই সমাজে প্রবলভাবে প্রচলিত,—পার্থ, কৌন্তেয়, রাধেয় প্রভৃতি নামে এ স্বাক্ষর পরিস্ফুট।

কুরুক্ষেত্রের নিষ্পত্তির পর যে মিলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে সেটাই ভারতবর্ষের আজকের সভ্যতা। পরবর্তীকালে পৃথিবীর নানা চিন্তা, নানাভাবে এর সংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উক্ত সংশ্লেষের ফলে সভ্যতার রংএ কিছু পার্থক্য ঘটলেও বস্তুর স্বরূপে কোনো তারতম্য ঘটেনি। আজ ভারতীয় সভ্যতার যে ধর্ম তা পুরাণতন্ত্রের ধর্ম! সেটাই ছিলো সিন্ধুসভ্যতার ধর্ম। তার মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাস ও ভক্তির প্রাবল্যই প্রধান। এই ভক্তির তীব্রতা ও অন্ধ-বিশ্বাসই ভারতবর্ষের সভ্যতাকে বহু বিপ্লবের পরেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এটা ভালো কি মন্দ তার বিচার বর্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক। কিন্তু এটা সত্য—তত্ত্ব এবং সেইজন্যেই স্বীকার্য। বৈদিক প্রভাবের মোহময় মুহূর্তেই এ সভ্যতার জন্মলাভ ঘটেছে। বেদত্রয়ী,—অথর্ববেদ বৈদিক জগতের বাইরের সৃষ্টি। অথর্ববেদকে স্বীকার করেই বৈদিক গোষ্ঠী তাদের সীমাবদ্ধ উন্নাসিক সভ্যতাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রেছে। সিন্ধুর জয়গানে যে কণ্ঠ মুখরিত ছিলো, তা গংগাকে স্বর্ণদী, পতিতপাবনী বলে মেনে নিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। গংগার মাহাত্ম্য প্রচার বৈদিক কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নয়। গংগা নামের সংগেই একটা অবৈদিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। তা' মহেন্-জো-দড়ো গোষ্ঠীর পরিকল্পনা বলে মেনে নিতে কষ্ট নেই। মোট কথা, আজকের ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের সভ্যতা,—একটা মিলিত সভ্যতা! আর্য—অনার্য, পূর্ব—পশ্চিম—এ বিরোধী মনোভাব আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ধ্বংস হ'তে চলেছে। মানুষের সভ্যতা যেভাবে গড়ে উঠেছে তাকে সেইভাবেই স্বীকার করে নেওয়া সুবিবেচকের কাজ। বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এর উৎপত্তি বা স্বরূপ নির্ধারণ ক'রতে পারি মাত্র, এর গতি বদলাতে পারি না। তাতে সমগ্র জাতের অপমৃত্যু ঘটে।
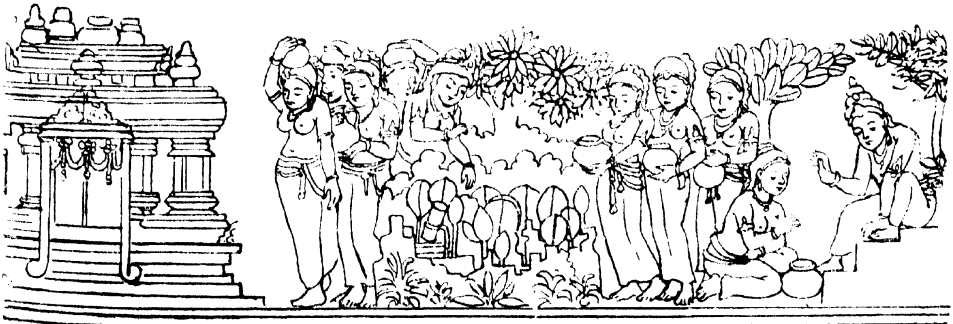
বাস্তব সমাজ-সেবায় রক্তদান

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ

যে সমস্ত উপাদানে মানুষের শরীর গঠিত হয় রক্ত তাহাদের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ। একটী সাধারণ স্বাস্থ্যবান মানুষের দৈহিক ওজনের একচতুর্দ্দশাংশই হইল রক্ত; তরল অবস্থায় ইহা প্রায় ১২।১৩ পাইট হয়। রক্ত লাল নয়, সাদা। জল, লবণ, প্রোটীন প্রভৃতি কয়েকটী রাসায়নিক দ্রব্য এবং বহু লক্ষ জীবন্ত সাদা ও লাল কর্পাসেলের সংমিশ্রণেই রক্ত তৈরী হয়। সাধারণ সুস্থ পুরুষের দেহের রক্তে প্রায় ৩০০০০০০০০০০০০০ লাল সেল থাকে এবং স্ত্রীলোকের দেহে এতদপেক্ষা কিছু কম। প্রতি ৬০০টী লাল সেলের সঙ্গে ১টী সাদা সেল থাকে। রক্তে দেহের মাংসপেশী গঠনের উপযোগী সমস্ত খাদ্য ও অক্সিজেন থাকে। প্রশ্বাসের ফলে দেহে যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড নষ্ট হয় রক্ত তা' ফিরিয়ে আনে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। অক্সিজেন লাংসের দূষিত রক্তকে শোধন করে এবং হার্ট সেই শোধিত রক্তকে আমাদের সমস্ত দেহের ছোট ও বড় শিরা-উপশিরায় পাম্প করিয়া দেয়। টালার ট্যাঙ্ক হইতে পরিশ্রুত জল পাম্প করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বসান অসংখ্য ছোট-বড় জলের পাইপের মাধ্যমে প্রত্যেকটী বাড়ীতে প্রত্যেকটী মানুষের খাওয়ার জল যোগায় এবং পরিশেষে সমস্ত ময়লা ও অপরিষ্কৃত জল আবার যেমন ছোট বড় পাইপের মাধ্যমে বাহির করিয়া দেয়, প্রায় সেই ভাবেই মানুষের দেহ হইতে লাংসে ফিরিয়া আসা অপরিশ্রুত রক্তকে অক্সিজেন দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া মানুষের হার্ট সেই পরিশ্রুত রক্তকে পাম্প করিয়া ঠেলিয়া দেয়। এই রক্ত মনুষ্য-দেহের ৬০০০০ মাইল আর্টারি, ভেন, ক্যাপিলারি ইত্যাদির ভিতর দিয়া সমস্ত দেহের খোরাক সমস্ত মাংসপেশীকে পৌঁছিয়ে আবার ফিরে আসে লাংসে।

এই রক্তের খানিকটা অংশ নানা কারণে প্রায়ই আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্যই এই ক্ষয় পূর্ণ করে। মানুষের এই রক্তমাংসের স্থূল শরীর প্রতিনিয়তই বহুবিধ কারণে অসুস্থ হয়। তখন শরীরবিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী বা অভিজ্ঞ আমরা তাঁদের শরণাপন্ন হই, শরীর যাহাতে আবার ভাল হইয়া যায়। ইহারই নাম চিকিৎসা। চিকিৎসা মনের ও দেহের হইতে পারে। আধ্যাত্মিকতার কোন কথা এখানে তুলিতেছি না, বাস্তবের কথাই বলিব।

শ্রীজহরলাল নেহরুর ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান

বিভিন্ন বিশেষ অভিজ্ঞদের মতে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে; ফলে শরীর বিদ্যায় সৃষ্ট হইয়াছে বহু মতবাদ। সাধারণ প্রথা হিসাবে আমরা দেখিতে পাই আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথি, হাকিমী, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, ইউনানী, অ্যাচারোপ্যাথ ইত্যাদি। সাধারণ ঔষধি ও ভেষজ দিয়া বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগ দ্বারা যে চিকিৎসা হয় তাহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে; যথা—মন্ত্র-চিকিৎসা, দৈব চিকিৎসা, শব্দ-চিকিৎসা, ইচ্ছাশক্তি চিকিৎসা, সূর্য্য বা বৈদ্যুতিক রশ্মি-চিকিৎসা ইত্যাদি। পরবর্ত্তীকালে ইথার ও এটম চিকিৎসাও বাস্তব জগতে হয়ত সম্ভব হইবে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে রক্তসঞ্চালন একটী বিশেষ ফলপ্রদ চিকিৎসা প্রথা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। রক্তসঞ্চালন দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতিকে কি ভাবে বিশেষ ফলপ্রদ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা যায় তাহার জন্য সমগ্র পৃথিবী আজ কর্ম্মচঞ্চল। সাধারণ শল্যচিকিৎসা রক্তহীনতা, চাপ বৃদ্ধি, প্রসব, শকউণ্ড বা অন্যান্য ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চালন বা নিষ্কাষণ পদ্ধতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এবং ১৮৬০ ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। খৃষ্টজন্মের বহু সহস্রাব্দী পূর্ব্বে শরীর হইতে নিষ্কাশণ ও প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কয়েকটী বিশেষ ক্ষেত্রে শরীরের দূষিত রক্তকে বাহির করিবার জন্য শরীরে জোঁক বসান হইত। অংশত তামসিক হইলেও সক্ষম সবলের পক্ষে রক্তরক্ষণ প্রথা ছিল। শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষ বিশেষ পূজা ব্যতীতও শরীর অসুস্থ হইলে নিরাময়ার্থ দেবস্থানে মানসিক অঙ্গীকার করিতেন এবং পরে পশুর রক্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলিয়া দেবদেবীদের উদ্দেশে খর্পরে করিয়া নিবেদন করিতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে উহা পানও করিতেন। পশুবলি ব্যতীত নরবলির প্রথাও ছিল। রক্তপান বা রক্তস্নান প্রথাও প্রচলিত থাকায় একথা ধরিয়া লইলে একবারেই ভুল হইবে না, কোন না কোন কালে শরীরের মঙ্গলার্থ এই প্রথাও বলবৎ ছিল। ইহাকে বর্ত্তমানে কুসংস্কার বলিতেছি। কালক্রমে রক্ত ব্যবহার এত বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে যে এই কুসংস্কার হয়ত একটী জরুরী আবশ্যকতায় পর্য্যবেশিত হইবে।

সরকারী খাদ্য বিভাগের কর্মীদের রক্তদান

গত এক শতাব্দীযাবৎ এই রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ায় উন্নতির জন্য গবেষণা বিশেষ ভাবেই চলিতেছে। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময় এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণের ফলে আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য রক্তসংরক্ষণের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধ ও চালু হয়। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় ভূমধ্যসাগরের আঞ্চলিক যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা আটজন, কিন্তু রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চালু থাকায় ঐ অঞ্চলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আহতদের মৃত্যুর হার দাঁড়ায় মাত্র শতকরা ১.২ জন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে রক্তসঞ্চালন, নিখুঁত ভাবে সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সক্রিয় প্রয়োগের চরম উন্নতি হয় এই যুদ্ধকালীন অবস্থায়। ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে ব্লাডট্রান্সফিউসান বেটারমেন্ট এসোসিয়েশন ভ্রাম্যমান ব্লাড ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা চালু করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে রক্ত সংগ্রহ করেন। সেই সময় বোতলে রক্ত সংগ্রহ হইত এবং ১৯৩৬ সালে এই সংগ্রহ একটী বিশেষ সুষ্ঠুরূপ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে হল্যাণ্ডের ২২৮ জন এবং বেলজিয়ামের ৭০০ জন রক্তদাতাদের ৩৫০ লিটার রক্ত এরোপ্লেনে করিয়া মুমূর্ষুদের দেবার জন্য পাঠান হয়। ১৯৪১ সালে ইউ এস্ আর্মড্ ফোর্সের জন্য রক্ত ও প্লাজমা দিবার প্রথা রেডক্রস ও ন্যাশান্যাল রিসার্চ কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৯৪৫ সালে ইহার শেষ হয়। এই সময় বিনা পয়সায় ১৩৩২৬২৪২ পাইট রক্ত আমেরিকানরা দান করেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় আহতদের অস্ত্রোপচারের জন্য রেডক্রশ শতকরা ৩৫ ভাগ রক্ত সরবরাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্থল, জল ও অন্তরীক্ষের আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য রক্তসঞ্চালন ও প্লাজমা প্রদান পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল।

রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির যে সমস্ত উন্নতি হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯৫৩ সালে রাশিয়ার সংবাদ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। মেডিক্যাল বোর্ড কর্ত্তৃক

রক্ত গ্রহণের পর রক্ত রক্ষা

মৃত বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘোষিত হইবার পাঁচ মিনিট পরে মৃতের দেহে রক্তসঞ্চালন করিয়া রাশিয়ার এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারী চিকিৎসক মৃতব্যক্তির জীবনদান করেন। এইজন্য ষ্ট্যালিন প্রাইজ হিসাবে তিনি বহুলক্ষ টাকা পুরস্কার পান। বর্ত্তমান বিশ্বে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার ইহাই বোধ হয় চরম দান।

পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। সেখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে গৃহীত ও সংরক্ষিত রক্তের মান এক ও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু পরিচালনায় সরকারী ব্যতীত বহু কমার্শিয়াল ব্লাড রহিয়াছে। কমার্শিয়াল ব্লাড ব্যাঙ্কে টাকার পরিবর্ত্তে রক্ত সরবরাহ করা হয় এবং সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন হাসপাতালে বা জোন্যাল সেণ্টারে বা ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে রক্ত গ্রুপ করিয়া পাঠান হয়। তাহারা রক্তগ্রহীতার রক্ত ক্রশম্যাচ্ করিয়া হাসপাতালগুলিকে রক্ত দেন। এতদ্ব্যতীত রক্ত সম্বন্ধে গবেষণা, সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি, রক্তগ্রহণ, রক্তদাতা সংগ্রহের জন্য প্রচার, আনুষঙ্গিক শিক্ষা, রক্ত-প্রদান, তরল ও শুষ্ক প্লাজমা প্রস্তুতি, রক্তদাতা ও গ্রহিতার প্রতি নজর

রাখা, ক্লিনিক ল্যাবরেটারী ও কোল্ড ষ্টোরেজের বিভাগীয় কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত আলাদা আলাদা লোকের দ্বারা কার্য্য করাইয়া থাকেন। কথঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও এই পদ্ধতি বিশ্বস্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছা-রক্তদাতাগণ প্রকৃত সমাজসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আগাইয়া আসেন, কেহ কেহ এই রক্তদানের পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক বা উপঢৌকন গ্রহণ করেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে একজন শ্রমিক বার বৎসরে ২৫৭ কোয়ার্ট রক্ত দিয়া আদৌ অসুস্থ হন নাই, একজন সাধারণ মহিলা সাত বৎসরে প্রতিবারে এক পাইট করিয়া ১৪০ বার রক্ত দিয়াছেন। তাঁহারা ৪।৫।৬ সপ্তাহ পরে পরে রক্ত দেন। যুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনেকেই গড়ে দুইবার, ১৫ লক্ষ জন তিনবার, ১৫ লক্ষ জন প্রত্যেকে কয়েকবার মিলিয়া গড়ে ৮ পাইট রক্ত দেন এবং তিন হাজার লোক ৮ পাইট বা তাহার বেশী রক্ত দিয়াছেন। রক্তদাতাদের বয়স ছিল ১৮ হইতে ৬০ বৎসর (পুরুষ ও মহিলা)।
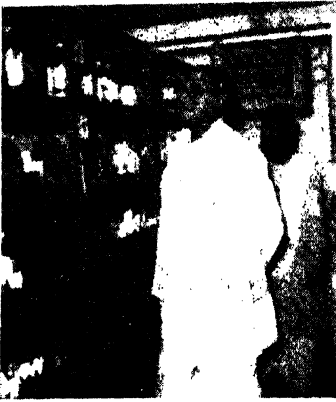
বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্লাড ব্যাঙ্ক পরিদর্শন

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে রক্ত হইতে প্লাজমা তৈরী করিয়া সৈনিকদের দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থে প্রথম ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ভারতীয় রেড-ক্রশ সোসাইটী ইহার পরিচালনা ও প্রচার করিতেন। পরে ইহাকে একটী ব্লাড ব্যাঙ্ক কমিটির হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং যুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একজন অফিসারের উপর ন্যস্ত করেন। এই ব্যাঙ্ক ছাড়াও ২টী ছোট ব্লাড ব্যাঙ্ক কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে ছোট ছোট দুইটী ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ণাঙ্গ ব্লাড ব্যাঙ্ক হিসাবে কলিকাতা ছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, যোধপুর এবং হায়দ্রাবাদে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে।

কলিকাতার ব্লাড ব্যাঙ্ক হইতে রক্ত ছাড়াও প্লাজমা সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে সর্ব্বাধিকবার রক্তদান হিসাবে একজন ৫২ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ৯২ বার রক্তদানের উল্লেখ শুনা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মীয় বলিয়া কথিত একজন ৪৮ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক সমাজসেবার আদর্শ হিসাবে 'স্বেচ্ছারক্তদাতারূপে ১৩ বৎসরে ৪৩ বার রক্ত দিয়াছেন। শরীরে রক্ত প্রয়োগের নজীর হিসাবে একটী ছোট্ট বালিকার শরীরে গত তিন বৎসরের মধ্যে ৫৯ বার রক্তসঞ্চালন করিয়া স্বাস্থ্যবান রাখার নজীর পাওয়া যায়।

কলিকাতায় বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রোপচারে এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের থোরাকোপ্লাষ্টী অপারেশনের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৬০ লক্ষ অধিবাসী-সংযুক্ত কলিকাতার জন্য বৎসরে ১২০ হাজার পাইট রক্ত আবশ্যক; ইংলণ্ডে প্রতি লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে তিন হাজার পাইট রক্ত ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৩ সালে ষ্টেট ব্লাড ব্যাঙ্ক চাহিদার প্রায় দশ ভাগ এবং ১৯৫৪ সালের জুলাই পর্য্যন্ত শতকরা ১৮·২ ভাগ চাহিদা মিটাইতে পারেন নাই। আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধে এই অক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদ পশ্চিম বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে শিক্ষামূলক প্রচার ও রক্তদান আন্দোলন গ্রহণ করেন। ফলে এখন সমস্ত চাহিদা মিটাইবার সক্রিয় ক্ষমতা ব্লাড ব্যাঙ্ক পাইয়াছেন।

অন্য দেশের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে বর্ত্তমানে বাংলা-দেশের অধিবাসীরা গড়ে ২৭০ শিশি রক্ত দিয়াছেন। কলিকাতা ব্লাড ব্যাঙ্কে তিন প্রকারের রক্তদাতা রহিয়াছেন। রুগ্নের জীবনদানে শুভ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কিছু লোক স্বেচ্ছায় রক্ত দেন, স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের আপদকালে কিছু সংখ্যক লোক রক্ত দেন এবং কিছুসংখ্যক লোক অর্থের বিনিময়ে রক্ত দেন। সরকার হইতে কোন অর্থ দিবার ব্যবস্থা এখানে নাই।

শরীর হইতে রক্ত দিলে শরীর খারাপ হইয়া যায় বলিয়া যে প্রচলিত ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত, অন্ততঃ যাহাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন ও পুষ্টি স্বাভাবিক। একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ প্রতিবারে ২৫০ শিশি করিয়া বৎসরে ৫ বার রক্ত দিলে কোনই ক্ষতি হয় না। এই রক্তদানের সময় কিম্বা রক্তসঞ্চালনের সময় শরীরে কোন কষ্ট হয় না। রক্ত-প্রদানের পর যে নূতন রক্ত তৈরী হয় সে রক্ত অধিকতর ভাল এবং এই পরিবেশে যে সমস্ত নূতন সেল জন্মায় তাহাদের পুষ্টি ও শক্তি অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণ আহার্য্য হইতে একপক্ষ-কালের মধ্যেই এই রক্তদানজনিত ক্ষয় পরিপূর্ণ হইতে পারে। বিশেষ জ্ঞানের অভাব এবং সংস্কারসংযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই আমরা রক্ত-দানে নিরত থাকি।

সাধারণ অস্ত্রোপচারে বা যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্য সাধারণতঃ ৫০০ শিশি রক্ত দরকার হয়। ক্যানসার বা অন্য জটিল অস্ত্রোপচারে ১০০০ শিশি বা তাহারও বেশী রক্ত দরকার হইতে পারে।

মানুষের রক্তের গুণ ও অবস্থাভেদে রক্তের ৪টী গ্রুপ বা স্তর আছে। রোগীর রক্তের গ্রুপের সহিত রক্তদাতার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করিয়া রক্ত দেওয়া হয়। রক্তগ্রহণের পূর্ব্বে রক্তদাতার রক্ত, ওজন, উচ্চতা, সাধারণ স্বাস্থ্য, রক্তের চাপ, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া রক্ত লওয়া হয়।

ব্লাডব্যাঙ্কে সংগৃহীত রক্ত অন্যান্য দেশে একমাস পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিলেও আমাদের এখানে দুই সপ্তাহ রাখা হয়। কোন কারণে এই সময়ের মধ্যে কোন ষ্টোরেজের সংরক্ষিত রক্ত যদি ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে সেই রক্ত হইতে শ্বেত জলীয় অংশটুকু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাঁকিয়া বাহির করা হয়। এই নিষ্কষিত রক্তের নাম প্লাজমা। এই তরল প্লাজমা ৪ হইতে ৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে রাখিলে দুই বৎসরেও নষ্ট হয় না। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে গুণ ও উপকারিতার কোন বিশেষ ইতরবিশেষ না ঘটাইয়া এই তরল প্লাজমাকে শুষ্ক প্লাজমার রূপান্তরিত করা যায়। ভারতে একমাত্র বোম্বাই এবং জঙ্গী ব্লাড ব্যাঙ্কে এই শুষ্ককারী যন্ত্র কার্য্যকরী আছে। একজনের শরীর হইতে অপরের রক্ত দিলে গ্রহীতার মানসিক বা শারীরিক গুণের বা প্রবৃত্তির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন—অবশ্য এই রক্ত যদি সম্পূর্ণরূপে জটিল বা দুরারোগ্য বা কোন বিশেষ ব্যাধির জীবাণুশূন্য হয়।

খুড়তুতো ভাই

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

দিনকরলাল এক প্রাচীন দেশাই বংশের সন্তান। তিনি করেন নি বটে, তবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা গুজরাট সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন গুজরাটে মোগলদের আনয়ন করতে এবং সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কাজে পরবর্তী বংশধরেরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। যখন মোগল প্রতিষ্ঠাও টলমল করতে শুরু করেছিল তখন পেশোয়া-গাইকোয়াড়ের এই দেশাইদেরই কোনো এক পূর্বপুরুষের সাহায্য নিতে হয়েছিল। মহারাষ্ট্র সূর্য অস্তমিত হবার পর দেশাইরা কোম্পানি বাহাদুরকেও সাহায্য করেছিলেন। দিনকরলাল দেশাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন দেশাইদের সাহায্য ছাড়া এদের মধ্যে একটি সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। প্রমাণস্বরূপ তিনি অনেক মারাঠীর রাশি রাশি চিঠি, সনদ, সার্টিফিকেট, ফরমান আর পুরণো রাজকীয় লেফাফার বাণ্ডিল প্রভৃতি সবাইকে দেখাতেন। হয়ত এতেও যথেষ্ট হচ্ছে না ভেবে তিনি শ্রোতাদের প্রায় পঁচিশজন দেশাইয়ের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস শোনাতেন এবং শেখাতেন।

শ্রীদিনকরলাল বিস্তারিতভাবে সন্ সম্বৎ এবং তারিখ উল্লেখ করে শ্রোতাদের সমস্ত ইতিহাস শোনাতেন। বলতেন, "মহম্মদ বেগড়ার ক্ষুধার্ত মরণোন্মুখ সেনাবাহিনীর কাছে ঠিক সময়ে অদ্ভুত চালাকি ক'রে খাদ্যদ্রব্যের রসদ পৌঁছে দিয়েছিল কে? ইন্দ্রজিৎ দেশাই। যখন শিকাররত বাদশাহ আকবর জঙ্গলে রাস্তা ভুলে গিয়েছিলেন তখন তাঁর জলপানের সুন্দর বন্দোবস্ত ক'রেছিল কে? পদ্মনাভ দেশাই। বর্ষার সময় ঔরঙ্গজেবের একটা হাতি কাদায় আটকে গেলে একদল গ্রামবাসী জড়ো করে সমস্ত হাতিটাকে কাদার ভিতর থেকে উদ্ধার করেছিল কে? কুমারজী দেশাই। গোবিন্দরাও গাইকোয়াড়ের পরাজিত সৈন্যদলকে উৎসাহিত ক'রে ইংরাজ বাহাদুরকে ভাগিয়েছিল কে? মুরলীধর দেশাই।

অবশ্য এ বিষয়ে এখনো আধুনিক কায়দা অনুযায়ী অন্বেষণ করা হয়ে ওঠেনি যে ঐতিহাসিকেরা এর মধ্য থেকে কোনো ঘটনা নিজেদের ইতিহাসে উল্লেখ করে গিয়েছেন কিনা। সে যাই হ'ক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দেশাইগিরির গৌরব হ্রাসকারী শ্রীদিনকরলালের পূর্বপুরুষেরা বিরাট জমিদারী পেয়েছিলেন, আর এক সময় দেশাইদের বৈভব এবং প্রতিষ্ঠা অত্যুচ্চ ছিল।

অত্যুচ্চ ছিল এই জন্য বলছি যে দিনকরলালের সময়ে এই বৈভব এবং প্রতিষ্ঠা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হতে চলেছিল। তাঁর নিজের একটা বিরাট বাড়ি ছিল। চাকর-বাকরের অভাব ছিল না, গরুর গাড়ি ছিল, ঘোড়ার গাড়ি ছিল—যদিও তার ঘোড়া মরে গিয়েছিল আর নতুন ঘোড়া কেনার কথা চলছিল। বাড়িতে বারো মাস অতিথিদের ভিড় লেগে থাকত। কালেক্টার, অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টার, তহসীলদার, রেলের কর্তা, প্রত্যেকেই দিনকরলাল দেশাইয়ের অতিথি হতেন—আর তাঁদের নিমন্ত্রণেও তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। অনুরোধ উপরোধের কলাতে দিনকরলাল ছিলেন অতি নিপুণ। নিমন্ত্রণ তিনি দিতেন প্রতি মাসেই, আর নিমন্ত্রণ করার সুযোগগুলো দেশাইগিরির গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও বেড়ে চলেছিল ধীরে ধীরে।

নিমন্ত্রিতদের দেশাইয়ের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করার বিন্দুমাত্রও আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাঁর মহাজনদের হঠাৎ এক সময় সে কথা ভাববার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এতদিন জমি বন্ধক রেখে দেশাই ইচ্ছামত টাকা পাচ্ছিলেন, কিন্তু তখন থেকে মহাজনেরা টালবাহানা শুরু ক'রে দিয়েছিল আর তাঁর রুক্কা ফেরৎ পাঠাতে আরম্ভ করেছিল,

ধার দিতে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছিল। বাজারে তাঁর যা সুনাম ছিল তাতে আগে থেকেই সবাই তাঁকে ধার দেওয়া বন্ধ করেছিল, এখন জমিও সব বন্ধক দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, আশে-পাশের সমস্ত মহাজনেরাও তাই হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল—কিছুতেই আর হাত খুলছিল না।

দেশাই জানতেন—এসব হচ্ছে মহাজনদের নীচতার পরিণাম। মহাজনেরা সব সময় নীচই হয়ে থাকে। আসলের তিনগুণ চারগুণ সুদ নিয়েও তাদের ধার উসুল হয় না। তাদের এই কৌশল বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও জানেন না। কী আশ্চর্য, সমস্ত জীবন ধ'রে সেলামী, ঘুষ, দালালি প্রভৃতি মহৎ ধার্মিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকার পরেও যে লোক দ্বিগুণ চতুর্গুণ সুদে টাকা ধার দেয় সে আবার আদালতে নালিশ করারও নীচতা প্রকাশ করে!

—দুই—

দিনকর দেশাই মহাজনদের এই ক্ষুদ্রতা এবং নীচতা সহ্য ক'রে নিতেন কিন্তু তাঁর খুড়তুতো ভাই বিজয়লাল দেশাইয়ের নীচতা একটুও সইতে পারতেন না। প্রথম দিকে কয়েক বছর তাঁরা মিলেমিশে দেশাইগিরি চালিয়েছিলেন কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন বিজয়লাল তাঁরই সমান-বয়সী এবং সমান অংশের অংশীদার দিনকরলালের উদারতায় (যাকে তিনি বাজে খরচ ব'লে অভিহিত ক'রে নিজের মনের ক্ষুদ্রতা প্রকট করতেন) ঘাবড়ে উঠেছিলেন—আর দেওয়ানি আদালত পর্যন্ত গিয়ে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর নিজের অংশের সম্পত্তি নিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ-কারবার শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

দিনকর দেশাই এতে একটুও খুশী হন নি। যে-পরিবার বহু পুরুষ ধ'রে এক সঙ্গে থেকে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি ভোগ ক'রে আসছিল তার এভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া দিনকরলালের ভাল মনে হয় নি। এই ঘটনার ফলে দু' ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, আর দু'জনে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং যদিও পূর্বপুরুষদের মত তলোয়ার হাতে নিয়ে লড়াই করার ক্ষমতা কারুই ছিল না, তবুও তাঁরা গালিগালাজ আর চেঁচামেচির দ্বারা পুনঃপুনঃ নিজেদের বীরত্বের পরিচয় দিতে কসুর করতেন না।

দু' বাড়ির সদর দরজা একটাই। একই বাড়িকে দুটো অংশে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এজন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ ছাড়াও টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে একজন অন্যজনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে যুদ্ধের আনন্দ উপভোগ করতেন।

"কে ওকে দেশাই বলে? ও তো বেনে। ওর মনটা দেখো।" বলতে বলতে দিনকর এমন ভাবে গলা চড়াতেন যাতে দু' বাড়ির লোকেরাই ভাল ভাবে শুনতে পেত কথাটা।

এ বিদ্রূপ যে বিজয়লালের উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে তা বুঝতে পেরে তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠত, আর তিনি রাগে আগুন হয়ে উঠতেন। তাঁর মনে প'ড়ে যেত এই দিনকরই কালেক্টার আর কমিশনারদের পার্টি দেয়, ফুলের মালা পরায়, আর আরামসে দোলনায় বসে পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা গায়। ব্যস, অন্যদিক থেকে তিনি গর্জে উঠতেন:

"ধামাধরা কোথাকার! সমস্ত দেশাইগিরি ডোবাতে বসেছে।"

দিনকর দেশাই দোলনার উপরে একটু উঠে বসতেন আর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "তুই কাকে বলছিস রে?"

"তোকেই বলছি। এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তোর থাকলে তো!"

"ওঃ কত বুদ্ধিমান রে আমার! টাকার কলসী পুঁতে যাবি, না? সাপ হয়ে ব'সে থাকবি হতভাগা কোথাকার।"

আর সেখানেই ছোটখাট একটা যুদ্ধ বেধে যেত।

সে যুদ্ধে যোদ্ধা অবশ্য এই দু' ভাইই হতেন। তাদের স্ত্রী-পুত্রদের উপর এ ধরণের যুদ্ধের কোনো প্রভাবই দেখা যেত না। যখন দিনকর দেশাই আর বিজয় দেশাই একে অপরকে অপমানিত করতেন আর হাতাহাতি করতেন—তখন দুই দেশাই পত্নীকে হয় আচার মোরব্বায় ব্যস্ত দেখা যেত, নয় গয়না কাপড়ের চর্চায়। হয়ত তখন বিজয় দেশাইয়ের স্ত্রী দিনকর দেশাইয়ের মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন, অথবা দিনকর দেশাইয়ের স্ত্রী বিজয় দেশাইয়ের ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। দেশাই-যুদ্ধের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে সেটা তাঁদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কে বলতে পারে আমাদের সূর্য অন্য কোনো সূর্যের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চলেছে কিনা। কিন্তু আমাকে পৃথিবীর সঙ্গে সেই ঝগড়ার

কোনো সম্পর্কই নেই, তাদের ঝগড়ার আভাষটুকু আমরা পাই না। এই দুটি যুদ্ধপ্রিয় ভাইয়ের সংসারের লোকেদেরও ঠিক এই রকম অবস্থাই ছিল—এঁদের যুদ্ধ থেকে তারা একেবারে দূরে স'রে থাকত!

নিমন্ত্রণের দিন দিনকর বিজয়কে নিমন্ত্রণ না ক'রে থাকতে পারতেন না। কিন্তু বিজয় খুব কমই তাতে উপস্থিত হতেন। এসব ক্ষেত্রে দিনকরলাল বলতে থাকতেন:

"ও কেন আসবে? কোন্ মুখে আসবে? কোনোদিন কাউকে বাড়িতে ডেকে দুটো খাওয়ায়?"

আর বিজয় বলতেন:

"দিনকরটা কী বোকা! কবে যে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে! বোকারা খাওয়ায়, আর চালাকেরা খায়।"

কিন্তু যখন কোনো নতুন অফিসারের উদ্দেশ্যে পার্টি দেওয়া হ'ত আর বিজয় দেশাইকে বাধ্য হয়ে তাতে যোগ দিতে হ'ত, দিনকর দেশাই বিশেষভাবে তাঁকে পরিচিত করাতেন। বলতেন, "হুজুর ইনি আমার ভাই। একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি, আর একই পিতার অন্ন খাচ্ছি।"

"তাই নাকি? বেশ বেশ!" ব'লে সাহেব মৃদু হাসতেন আর দেশাইদের সম্বন্ধে উৎসুক হবার ভাব দেখাতেন।

"আজ্ঞে; হ্যাঁ হুজুর। বাপ-দাদার পুণ্য এখন পর্যন্ত ভোগ করছি," বিজয় দেশাইকেও নম্র হয়ে বলতে হ'ত।

কিন্তু নিমন্ত্রণ শেষ হতে না হতেই দু' ভাই যে যার দিকে ছিটকে পড়তেন। পরস্পরের প্রতি দু'জনের এত বিরাগ জন্মেছিল যে একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো সময় তাঁরা কথাটি পর্যন্ত বলতেন না।

দিনকর দেশাই কেবল যে অফিসারদেরই আদর-আপ্যায়ন করতেন তা নয়, অতিথি-সৎকার এবং দান-ধ্যানের সমস্ত রকম কাজে তাঁর নাম সর্বাগ্রে থাকত। তা ছাড়া সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা করা, সপ্তাহভ'র রামায়ণ মহাভারত পাঠরত শাস্ত্রী মহাশয়কে ধুতি-চাদর উপহার দেবার বন্দোবস্ত করা, কোনো ওস্তাদ গাইয়ের পুরস্কারের বা ভাতার ব্যবস্থা করা অথবা রামলীলার বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি কাজে তিনি কখনো পিছিয়ে থাকতেন না। বিজয় দেশাই এসব ব্যাপারে বড় একটা যোগ দিতেন না, আর যখন বাধ্য হয়ে যোগ দিতেই হ'ত টাকাটা আধুলিটা দিয়ে রেহাই পেতেন।

কখনো কখনো উৎসাহী চাঁদা-আদায়কারীরা বিজয় দেশাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত, "এই দেখুন বিজয়দা, দিনকরদা এত দিয়েছেন। আপনি এর চাইতে কম দেবেন কী ক'রে?"

এই তুলনা বিজয় দেশাইয়ের এতটুকুও ভাল লাগত না। তিনি নীরস ভাবে জবাব দিতেন, "ওকে তো ভিক্ষে করতে হবে। আমি ভিখিরী হতে চাই না।"

ওদিকে দিনকর দেশাইয়ের রাগ দেখার মত বটে। উত্তেজিত হয়ে তিনি চাঁদাওয়ালাদের বলতেন, "ওর কাছ থেকে তোমরা কী পাবে? ওটা এমন অপয়া যে সকালে ওর মুখ দেখে উঠলে সারাদিন খাওয়া জোটে না।"

* * * *

কিছুদিন ধ'রে রোজ বিকেল চারটের সময় দিনকর দেশাই এক চারণ কবির কাছ থেকে দেশাই বীরদের কীর্তিগাথা শুনছিলেন। সেদিন তিনি কবিকে একখানা দোশালা উপহার দিলেন। কবি তক্ষুণি দিনকর দেশাইয়ের প্রশংসায় এক কবিতা ব'লে ফেলল। অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন এই দেবীপুত্রটি দিনকর দেশাইকে সূর্য বলল, চন্দ্র বলল, চক্রবর্তী বলল, সমুদ্রের চাইতেও মহান এবং হিমালয়ের চাইতেও উচ্চ প্রমাণ ক'রে কুবেরকেও দেশাইয়ের দেনাদার ব'লে ঘোষণা ক'রে দিল। এদিকে চারণ তার পুরস্কার নিয়ে বিদায় হ'ল, আর ওদিকে দেশাইয়ের এক পুরনো মহাজন দু' একজন সেপাই আর মুহুরি নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করল। ডিক্রি নিয়ে এসেছে সে। মুন্সেফকে পাঁচ সাতবার নিমন্ত্রণ খাইয়ে আর তার ব্যবহারের জন্য বাড়িতে একটা আলমারি উপঢৌকন পাঠিয়ে দিয়ে দিনকর দেশাই নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে ছিলেন, সে যে এত তাড়াতাড়ি ডিক্রির হুকুম জারী ক'রে দেবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কয়েকটা মামলায় রীতিমত দক্ষিণা না পেয়ে দেশাই মহাশয়ের উকিলও তখন কিছুকাল ধ'রে ডুব মেরে রয়েছিল।

দেশাই ভীষণ নারাজ হলেন। মানহানির মামলা করার ভয় দেখালেন। গভর্ণর সাহেবের নামে তার করতে প্রস্তুত

হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার আগেই মহাজনকে তার সমস্ত টাকা চুকিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু মহাজন তাতে একটুও নরম হ'ল না, সম্পত্তি ক্রোক করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিল সে। দেশাইয়ের সমস্ত চেষ্টা বিফল হ'ল, তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

ওদিকে বেলিফ আর মুহুরিরা মহাজনের নির্দিষ্ট করা জিনিসগুলো ক্রোক করতে আরম্ভ ক'রে দিল।

বিজয় দেশাই পাশের উঠানে দোলনায় বসে সমস্ত দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর মুখভঙ্গী ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠোরতর হয়ে উঠছিল। এমন সময় হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বাইরে এসে বললেন, "ভাশুরের ঘরে ডিক্রি এসেছে।"

"ওর কপাল! আমি কী করব ?

"কী বলছ! না না, এ ভাল কথা নয়, কিছু তো করা উচিত।"

"ওর বন্ধু-বান্ধবেরা এসে করুক। কালেক্টার আর কমিশনারদের ও অনেক খাইয়েছে, তারা তো আর মরে যায় নি, সাহায্য করুক না কেন এসে!"

"কিছু দিয়ে এখন আপদটাকে বিদেয় তো করো।"

"চার-চার পাঁচ-পাঁচ বার আমি মাঝখানে পড়েছি, জামিন দিয়েছি, কিন্তু ও কিছুতেই নিজের স্বভাব ছাড়বে না। এখনো যদি ও এইভাবে চলতে থাকে তবে ওর নিজেকেই বিক্রি হতে হবে।"

বলতে বলতে বিজয় দেশাই দোলনা থেকে নেমে এসে বারান্দায় পাইচারি করতে লাগলেন। ডিক্রির কেরাণী বাইরে এসে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাল—"দেশাইজী, এই চুক্তিপত্রটাতে একটু সাহায্য করবেন ?"

"যাও যাও, অন্য কাউকে ডাকো। আমার সময় নেই।" একথা ব'লে দেশাই ভিতরে চ'লে গেলেন। একটু পরে জামাকাপড় প'রে বাইরে এলেন। বারান্দায় তাঁর স্ত্রী একটি যুবতীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জল মুছছিলেন। সে দৃশ্য দেখে বিজয় ব'লে উঠলেন, "কী হয়েছে মা? কাঁদছিস কেন রে ?"

ক্রন্দনরতা যুবতী আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিল, "কিছু নয় কাকাবাবু।"

মেয়েটি দিনকর দেশাইয়ের কন্যা, পদ্মা।

বিজয় দেশাই আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুই ভয় পেয়েছিস? দেশাইয়ের কাজ এই ভাবেই চলে রে। কখনো কখনো ডিক্রিও এসে পড়ে বৈকি।"

"কিন্তু ওর যৌতুকের গয়নাগুলোও যে নিয়ে যাচ্ছে, দেশাইয়ের স্ত্রী বললেন।"

পদ্মার চোখ আবার ভ'রে উঠল। যৌতুকের গয়নাগুলোর দুর্দশা দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

"কাঁদিস নি মা। তোর গয়নায় হাত দেবার আস্পর্ধা কার কাছে?" বলতে বলতে দেশাই একটা চাবির গোছা স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন: "ঐ ছোট বাক্সটায় নোটের বাণ্ডিল রয়েছে। বের ক'রে আনো।"

দেশাই-পত্নী দৌড়ে ভেতরে চ'লে গেলেন, আর একটু পরেই একটা বাণ্ডিল হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। দেশাই বাণ্ডিলটা পদ্মাকে দিয়ে আদেশের সুরে বললেন, "যা বেটি, বাবাকে দিয়ে আয়।"

নোট নিয়ে পদ্মা দৌড়ে চ'লে গেল। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি গিয়েছিল তত তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

দুঃখিত স্বরে বলল, "বাবা নিতে চাইলেন না। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।"

বিজয় গর্জে উঠলেন, "ওঃ বড় যে লাখপতি হয়েছে! বনমালী শেঠ!"

বনমালী শেঠ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। বিজয় দেশাই ধমকে বললেন, "নিচে আয় বেহায়া কোথাকার! আমাকে না জানিয়েই বাড়িতে ঢুকেছিস—এত সাহস তোর!"

শেঠ বলল, "দেশাইজী, আমি যখন এসেছিলাম, আপনি তো সামনেই ব'সেছিলেন।"

"চল্ দেখি চল্। এই নে তোর টাকা, আর দূর হয়ে যা এখান থেকে। সুদে সুদেই লোকের সর্বনাশ করলি! হারামী কোথাকার!"

এমনি সময় দিনকরলাল দেশাই রাগে আগুন হয়ে নিচে নেমে এসেই লেগে গেলেন বিজয়লালের সঙ্গে: "তুই টাকা দেবার কে? আমার ইজ্জত ডোবাতে বসেছিস!"

"যা ভাই যা। ঘরে গিয়ে ব'সে থাক গে যা। তোর ইজ্জত যে কতখানি তা আমার জানতে বাকি নেই।"

"কে তোকে টাকা দিতে বলেছে? আমার বাড়ি নিলামে ওঠে উঠুক, তোর তাতে কী ?"

"তোকে কে টাকা দিয়েছে ?"

"তাহলে কাকে দিয়েছিস ?"

"আমার মেয়ে পদ্মাকে দিয়েছি। তুই ওর গায়ের গয়না ক্রোক হতে দিবি, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব !" বিজয় বললেন।

"মেয়ে ! পদ্মা তোর মেয়ে ?"

"হ্যাঁ ! আমার মেয়ে ! সাত নয়, সাতাশি বার আমার মেয়ে। ও একলা তোরই মেয়ে নয়, ও দেশাইদের মেয়ে, সাত পুরুষের মেয়ে।"

"তা'হলে তুই আত্মীয়তা নিয়েই রইলি শেষ পর্যন্ত ! সবার সামনে আমার মাথাটা কাটালি !" বিড় বিড় করতে করতে দিনকর নিজের দোলনায় গিয়ে বসলেন।

রূপোর পানের ডিবে থেকে পান বের ক'রে তিনি সোনালী রাঙতা দিয়ে ছুটো পান সাজলেন। একটা পান পদ্মার হাতে দিয়ে বললেন। "তোর কাকাকে দিয়ে আয় পদ্মা।"

দু' ভাই এভাবে কথা না ব'লেও পানের আদান-প্রদান করতেন। যত ঝগড়াই তাঁরা করুন না কেন, ঝগড়া সত্ত্বেও এমন একটা দিন তাঁদের যেত না যেদিন দিনকর দেশাইয়ের সাজা পান বিজয় দেশাই খেতেন না।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পূর্বপুরুষদের পরাক্রমের কথা ভাবতে ভাবতে বারে বারেই সেদিন একটা কথা দিনকর-লালের মনে হতে লাগল—বিজয় যে রকমই হ'ক না কেন আসলে দেশাইদেরই সন্তান তো বটে। *

---

* গুজরাটী লেখক শ্রীরমণলাল বসন্তলাল দেশাই কর্তৃক লিখিত গুজরাটী গল্পের "চচেরে ভাই" নামক হিন্দী অনুবাদের ভাবানুবাদ।

ললামভূতা

ধরিত্রী মুখোপাধ্যায়

[Words-worthএর Perfect woman কবিতাটির ভাবানুবাদ]

মনে হয়েছিল—'খুসি দিয়ে গড়া'
প্রথম যেদিন দেখি—
'ক্ষণ-বিদ্যুৎ' সে কি !
সন্ধ্যাতারার সুধাঝরা দু'টি চোখে···
গোধূলির আলো জ্বেলেছে সে যেন
সুদূর স্বপ্নলোকে !
চির প্রদোষের আঁধার দিয়েছে চুলে তার যত কালো
সে গহনে ডুবে মরণ আরো যে ভালো।
ছন্দিয়া ওঠে মনের মুকুল নিখিলের নন্দনে,—
···স্পর্শের স্পন্দনে !

ওগো অপরূপা ! শোন—
যখনি গিয়েছি কাছাকাছি আরো
তোমার রূপের বিভায়
দেখেছি সে কোন দেহাতীতে'
যা' কায়ার কামনা নিভায়।

গৃহ-অঙ্গনে দেখেছি তোমার দীপ্ত উজ্জ্বলতা···
কুমারী মেয়ের স্বাধীনতা যেন পায়ে পায়ে বলে কথা।
প্রীতিভরা মুখখানি···
দরদী ছোঁয়ায় সকলকে চায় কাছে পেতে শুধু জানি।

দেখেছি আবার—দৃষ্টি প্রদীপ রাগে···
যন্ত্রের কোন মন্ত্র যেন সে অন্তর-তলে জাগে।
সুদৃঢ় যুক্তি···সুমিত ইচ্ছা···সহিষ্ণুতা—
নিয়েছে সে এক শক্তির রূপ
দূরদর্শনে কী স্বচ্ছতা !
কোন অমর্ত্ত—সুকল্পনা···
সার্থক ঐ বরতনু-ঘিরে
দেয় যে শান্তি······যে সান্ত্বনা—
জীবন-ক্ষুধার অফুরাণ সুধা···অমাবস্যায় আলোর দ্যুতি !
আমি কবি, তাই আঁকি রূপছবি—
মহিমার তব—হে শাশ্বতী !!

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রূপ ও রূপান্তর

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতসম্পন্ন

প্রাচীন যুগের মানব মনের অনুভূতি ও ঐশ্বরিক জ্ঞান আহরণের নানারূপ আকাঙ্ক্ষা হ'তেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। এই সংগীতকেও তখনকার দিনের মনীষীরা ঈশ্বর সাধনার একটি পথ হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং এরই মাধ্যমে তাঁরা সাধনপথে অগ্রসর হ'য়েছেন।

সাধনার মধ্যে যেমন ভক্তিযোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, সেই রকম যোগাভ্যাস দ্বারা অভীষ্ট লাভের দৃষ্টান্তও বহু পাওয়া যায়। কেহ কেহ যোগাভ্যাস দ্বারা, কেহ প্রার্থনা ও মন্ত্রাদির সাহায্যে, কেহ সুরের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনার পথ গ্রহণ ক'রেছেন। প্রত্যেক সাধকের উদ্দেশ্য একই, যদিও সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং চৈতন্য দেব এঁরা ভক্তিযোগের সাধক ছিলেন। বামাক্ষ্যাপা তান্ত্রিক সাধক। তান্ত্রিক সাধকেরা উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত সমন্বয়ে সাধন-প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক পথ সৃষ্টি ক'রেছিলেন। এজন্য সঙ্গীতকে তন্ত্রসাধনার অঙ্গ হিসাবে ধরা হ'তো। সংগীতকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এর নাম হোলো মার্গ-সংগীত।

এই সংগীত জগতেও তেমনি তন্ত্রসাধকদের দান বহু এবং বহু প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তা' সমভাবে আদৃত। তান্ত্রিক সাধকেরা ও বৈদিক সাধকেরা পশুপক্ষীর স্বর হ'তে স্বর গ্রহণ ক'রে সেই স্বর সংগীতে ব্যবহার ক'রেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত আজও বহু পুস্তকে দেখা যায়। এই সংগীত সাধনপথ ক্রমশঃ তখনকার সমাজের সমসাময়িক মানুষের মনেও বিভিন্ন কার্য্যকারিতার চিন্তা জাগিয়েছিল।

পশুপক্ষীর স্বর হ'তে অনুকরণ ক'রে তাঁরা উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটি স্বর সমন্বয়ে বিভিন্ন রাগ রাগিনী সৃষ্টি ক'রে স্বরশাস্ত্র রচনা ক'রে আমাদের সংগীতের বহুপ্রসারী ক্ষমতা সম্বন্ধে উপদেশ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন।

প্রাচীন যুগের সঙ্গীতজ্ঞরা এটুকু উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে তিনটি বস্তু একত্র সমন্বয় না করলে বোধ হয় কোন কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। "ওঁ" এই প্রণব, এর উৎপত্তিও অ, উ, ম এই তিন স্বর সমন্বয়ে। এই প্রণব ধ্বনিকে প্রাচীন যুগের মনীষীরা অনাহত ধ্বনি নামে অভিহিত করেছেন।

অধুনা বৈজ্ঞানিক রূপে একে causal sound বা Eternal sound বলা বোধ হয় ভুল হয় না।

প্রাচীন যুগের সংগীত-শিল্পী ও স্রষ্টারা, সংগীত সৃষ্টি ও প্রচার ক'রেছেন এক উদ্দেশ্য নিয়ে, বর্ত্তমান যুগে সংগীত শিক্ষা ও প্রচার সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হ'তে এ বিষয়গুলি পড়লেই মনে না হ'য়ে পারে না যে আমরা বর্ত্তমান যুগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কতটা সুচিন্তা ও ধারণা পোষণ করি, অথবা এঁদের লিখিত তথ্যগুলির কোনরূপ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হই কিনা?

কোন কোন মনীষী বিভিন্ন অলংকার সংযোগে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী সৃষ্টি ক'রেছিলেন আবার কোনও কোনও মনীষী ভিন্ন মত পোষণ করে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিনী সৃষ্টি করেছিলেন আবার কেউ বলে-ছিলেন সমস্তই রাগ। সঙ্গীত এরূপ নানা মতামতে পরিপূর্ণ।

যাই হোক্ বা যেরূপেই হোক্ সংগীত বা স্বরশাস্ত্র সম্বন্ধে এটুকু বলে বোধ হয় শাস্ত্রটির রূপ পরিষ্কার বোঝা যাবে। স্বরশাস্ত্রে লিখিত আছে যে "যেমন গৃহ আলোকিত করার জন্য দীপ, তেমন আত্মাকে প্রকাশ বা আলোকিত করার জন্য সঙ্গীত। এই উক্তি হ'তে বোধ হয় বোঝা যায় যে মানব মনের ও আত্মার সাথে সংগীতের সম্বন্ধ কত নিবিড় বা নিগূঢ়ভাবে জড়িত।

আবার—

"শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈস্তথা মিত্রসমাগমঃ।
লক্ষ্মীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃস্বরবলৈস্তথা ॥ ১
স্বরবলৈর্দ্দেবতা সিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপো বশঃ।
কন্যা প্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ স্বরবলৈঃ রাজদর্শনম্ ॥ ২
স্বরবলৈঃ গম্যতে দেশো ভোজ্যর স্বরবলৈস্তথা।
লঘুদীর্ঘ স্বরবলৈঃ মনশ্চৈব নিবারয়েৎ ॥ ৩
সর্ব্ব শাস্ত্র পুরাণাদি স্মৃতি বেদাঙ্গ পূর্ব্বকম্।
স্বর জ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিৎ বরাননে ॥" ৪

এই স্বরই সঙ্গীতের প্রধান এবং পরম বস্তু। এই স্বরাধ্যায় স্রষ্টা অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ ক'রে আমাদের যে প্রভূত উপকার করেছেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ স্বরসাধনার দ্বারা হয় তো আবার শিল্পীরা ঐ সমস্ত গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারবেন। যদি কোনও শিল্পী সংগীতকে পরিপূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলতে চান বা জানতে চান, তবে তাঁকে প্রথমেই জানতে হবে এর মূল উৎস কোথায় এবং স্রষ্টা কি ভাবে একে সৃষ্টি ক'রে রেখে গেছেন বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই।

প্রাচীন, খুব না হ'লেও আজ হ'তে প্রায় চারশ' বছর আগে বা তারও আগে মকরন্দ পাঁড়ের পুত্র রামতনু পাঁড়ে অর্থাৎ তানসেন, বৈজু, হরিদাস স্বামী, গোপাল নায়ক, আমীর খসরু প্রভৃতি গায়ক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শাস্ত্রোক্ত সঙ্গীতের যথাবিহিত ও অন্তর্নিহিত রস ও মোহিনী ক্ষমতা ভোগ করেছেন একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করবেন না। আনন্দ নিজেরাও যেমন পেয়েছেন, তেমনি সমসাময়িক ব্যক্তিদেরও আনন্দ পরিবেশন ক'রে অমর হ'য়ে গিয়েছেন।

সত্যকার শিল্পী যাঁরা, যাঁরা সঙ্গীতপিপাসু, তাঁদের কর্ত্তব্য এই

প্রাচীন সংগীতকে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে সাধকোচিত পদ্ধতিতে অনুশীলন করা এবং যথাযোগ্য পিপাসু ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ যুগে ভারতের আদি ও অকৃত্রিম সঙ্গীত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কতটা সহায়ক তা' জগৎ সমক্ষে প্রচার ক'রে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

চিরদিনই প্রাচীন নূতনকে শিক্ষোপযোগী অবদান জুগিয়ে এসেছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষ নিজ নিজ বিদ্যাপ্রকাশের ও অর্থ আহরণের মোহে প্রাচীন পন্থাকে ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে প্রধান হ'য়ে থাকতে চাইছে। বর্ত্তমান যুগের এই দলগতবুদ্ধি আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাসেও পেয়েছি। কিন্তু এই দলগত ভেদবুদ্ধি সংগীত শাস্ত্রকে বর্ত্তমান যুগে অধিকতর জটিল ক'রে তুলেছে। প্রাচীন যুগে মানবরাও এই দলগত বুদ্ধিকে বা হিংসাকে জয় করতে পারেন নি। এরূপ সংগীত জগতেও হিংসাবৃত্তির প্রমাণও বিরল নয়। এই সব দলগত হিংসা বা ভেদবুদ্ধি থেকে অধুনা যুগে প্রচলিত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য রূপ 'ঘরোয়ানা'র উৎপত্তি এবং শিল্পীসমাজে ঘরোয়ানার মূল্য নাকি অত্যন্ত বেশী। কিন্তু যদি একটু চিন্তা ক'রে দেখা যায় যে এই ঘরোয়ানার মূল উৎপত্তি কি ভাবে এবং কোথা থেকে তবে চেষ্টা ক'রেও তাঁরা এই 'ঘরোয়ানার গর্ব্ব বজায় রাখতে পারবেন না। হিংসা ও দলগত বৈষম্যও হ্রাস পেত এই 'ঘরোয়ানা'র ভুয়া অহঙ্কার ছাড়তে পারলে। সংগীত জগতে এই 'ঘরোয়ানা' এক মজার ব্যাপার। যেমন তানসেনের সাথে বজ্‌বাহাদুর খাঁ ও গোপাল পাটনীর (পরে নায়ক), বৈজুর সাথে আমীর খসরুর, অধুনা রতনজনকার পন্থী (ভাতখণ্ড) এর সাথে হাসসু খাঁ হাদ্দু খাঁ পন্থীর (কলাকার মণ্ডলী) এরূপ বহুদিনকার ব্যর্থ হিংসার জের চলে আসছেই। এরূপ দলগত জ্ঞানকে বড় ক'রে দেখে কেবল নিজেরাই নিজেকে বড় ক'রে দেখতে চাইছে না, গর্ব্বের আড়াল দিয়ে পরিণামে নিজেদের দোষ ত্রুটি সংশোধন করার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলছে। সংগীত জ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধে তানসেন বলেছিলেন "সমুদ্রতীরের অগণিত বালুকণার মধ্য হইতে মানুষ, বিশেষতঃ আমার মত মানুষ কয়টি মাত্র বালুকণা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে? সঙ্গীতশাস্ত্র এতই বিশাল।"

প্রাচীন যুগের ঋষিরা ও সাধকরা এই রাগরাগিনীকে এমন কৌশলে সৃষ্টি ক'রে রেখে গেছেন যে, সকল দেশে সকল কালে এবং সকল সময়ে এই সংগীতের জন্য মানুষের মনে একটা আকুল পিপাসা জেগে থাকবে।

মানুষই বহু শাস্ত্রোক্ত জিনিষ আজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যুক্তিতর্ক দিয়ে, বিচার বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার ক'রছে। ভবিষ্যতে আরও করবে আশা করা যায়। ইন্দ্রজিতের পুষ্পক রথ আজ আর পুঁথির পাতায় নয়, চোখের উপর দিয়ে যায় আসে। এভারেষ্টের গর্ব্ব আজ খর্ব্ব। সেরূপ সংগীতের মূল উৎসও হয়তো একদিন মানুষের জ্ঞানের গোচরে আসবে এবং তখন হয়তো এই জটিলতা কেটে গিয়ে অনেক সোজাপথ শিক্ষা দেবার ও নেবার পাওয়া যাবে। যে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তাঁরা অর্থাৎ প্রাচীনেরা সংগীত সৃষ্টি করে গেছেন তা' আজও আমরা অনুভব করতে পারিনি। তার কারণ আমরা হিংসার মোহে, প্রকৃত সাধকোচিত বিশুদ্ধ একাগ্রতা নিয়ে নিবিষ্টভাবে এর চর্চ্চা ক'রে যেতে পারছি না। এই সংগীত সৃষ্টির মধ্যেও স্রষ্টারা রেখে গেছেন হিংসার বীজ খুব সংগোপনে এবং যাতে ক'রে পরবর্ত্তী যুগের মানুষেরা হিংসা জয় না করা পর্য্যন্ত সংগীতের আদি উৎপত্তির বীজ ও অনুভূতির রস না পেতে পারে। পাওয়া যে যাবে না এমন কোনও কথা নেই তবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রাচীনেরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ও অনুভূতি দিয়ে কল্পনা ক'রে সৃষ্টি ক'রে লিখে রেখে গেছেন ঠিক তাঁদের মত সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি যদি আমরা পাই বা আয়ত্ত করতে পারি তবে আমরাও তা' নিশ্চয়ই পাব।

এখন দেখা যাক্ তাঁরা কি ভাবে সংগীতের সৃষ্টি ক'রে রেখে গিয়েছেন। প্রথম সৃষ্টি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত মাত্র তিনটি স্বর। পরবর্ত্তী যুগে সাতটি স্বর। বর্ত্তমানে বারোটি।

এই সপ্তস্বর সম্বন্ধে কি কি জানতে পারলে আমরা আধ্যাত্মিক ও সাত্ত্বিক উপায়ে স্বরবিশ্লেষণ করতে পারি। 'সা' সংগীতে ব্যবহৃত একটি শব্দ। এর পরিচয় কি হ'তে পারে দেখা যাক। যথা :—১। আকৃতি ২। বাসস্থান ৩। রং ৪। সন্তান ৫। বীজ ৬। উপাস্য দেবদেবী ৭। জাতি ৮। রস ৯। বেদ ১০। কাল ১১। ঋষি ১২। গুণ ১৩। বার ১৪। ধাতু ১৫। ছন্দ ১৬। ঋতু। এখন 'সা'এর যেমন পরিচয়, তেমনি অন্য ছয়টি স্বরেরও এরূপ পরিচয় আছে। এরূপ অন্য যে পাঁচটি বিকৃত স্বর আছে তাদেরও এরূপ বংশপরিচয় আছে। যা' হয়তো খোঁজ করলে অধুনা যুগের কোনও কোনও গুণীর কাছে পাওয়া যেতে পারে। আমি এটি পেয়েছিলাম আমার ৺বারাণসীর গুরু শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হ'তে উত্তরাধিকার সূত্রে। তিনি এটি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু রসুল বক্সের নিকট হ'তে। এই উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কাছে 'কুঠে গোপাল' অর্থাৎ শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তালিম নিতে গিয়েছিলেন অঘোরবাবুর কাছ হ'তে পাঠ নেবার পর।

এই সপ্ত বা বারোটি স্বরই উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত হ'তে এসেছে। আবার এদের পূর্ব্বপুরুষও অনাহত ধ্বনি বা নাদ। এই স্বর্গীয় ধ্বনি থেকে সংগীতের উৎপত্তি বলে একেও স্বর্গীয় বলা হ'তো। এখন মর্ত্ত্যে এসে স্বর্গীয় সংগীত কিরূপ অবস্থায় এসেছে দেখা যাক্। উপস্থিত দেখা যায় কয়েকটি অবিমৃষ্যকারী, সংগীতের কৃষ্টিধ্বংসকারী গায়কের হাতে পড়ে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাবণলাঞ্ছিত সীতার মতই অশোকবনে পড়ে কাঁদছে। সত্ত্বগুণসম্পন্না সীতাদেবীর মত সংগীতকে বাঁচাতে হ'লে বা উদ্ধার করতে হ'লে শুদ্ধাচারী সংযমী রামলক্ষণের মত গায়কের প্রয়োজন। সাধকোচিত উপায় ছাড়া সংগীতের প্রকৃত রূপের ও গুণের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে বৈজ্ঞানিক উপায়েও হয়তো এর সৃষ্টির তথ্য ভেদ করা সম্ভব হ'তে পারে।

এখন দেখা যাক কোনরূপ সাধনার দ্বারা আমরা সঙ্গীতের প্রকৃত প্রাচীন তথ্য খুঁজে বের করতে পারি। ধরা যাক্ সংস্কারের কথা—যেমন ক'রে আমরা আমাদের আরাধ্য দেবদেবীর আরাধনা করি মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা

বা অভীষ্ট লাভের জন্য সেরূপ ক'রে কিছু পাওয়া যায় কিনা ? রুচি ও মতভেদে পথ ও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ চোখ বুজে আসন করে, ধ্যান করে বসে থাকেন মন সংযম ক'রে, আবার কেউ ঘটে পটে প্রতিমা গড়ে মন্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন উপচারে অভীষ্ট দেবদেবীর আরাধনা করেন। এখন রাগ রাগিনীর যখন আমরা একটা রূপ বা আকৃতি পাচ্ছি তা যাই হোক্ না কেন, আমরাও একটি প্রতিমা বা আকৃতির সাথে একে ভেবে নিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক্ ভৈরবের ছবি। আমরা তার জায়গায় দেবদেবীর মধ্য হ'তে মহাদেবের এক ছবি পূজা করতে আরম্ভ করলাম। এখন যার যা অভীষ্ট সে তাই পূজা করতে পারি। সামনে যাই হোক কিছু থাকলে মনঃসংযম করা সহজ বলেই রাগরাগিনী বা দেবদেবীর আকৃতি কল্পনা করে নেওয়া হ'য়েছে মনে করা যেতে পারে। এখন পূজা করতে কি কি লাগে এবং কি উপায়ে পূজা করা হ'য়ে থাকে। পূজার বাহ্যিক উপকরণে গঙ্গাজল, ফুল, দীপ, নৈবেদ্য, আসন, ধূপ, হোম, মুদ্রা, কোশাকুশি ইত্যাদি তেমনি আভ্যন্তরিক শুচিতা, ভক্তি, অনুভূতি এরও প্রয়োজন। এরপর মন্ত্র, মন্ত্র কি ? কয়েকটি শব্দ সমষ্টি যাহার আকর্ষণে দেবদেবীকে সান্নিধ্যে আনয়ন করা হ'য়েছে কল্পনা করা হয়। এই মন্ত্র বা শব্দসমষ্টি এক এক দেবদেবীর এক এক প্রকার। এই শব্দ সমষ্টির দ্বারা দেবদেবীর রূপগুণ আকৃতি ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দেবদেবীর সান্নিধ্য পেতে হ'লে শুধু একমাত্র দেবীর পূজা করলেই হয় না তাদের আবার আবরণ দেবতা বা দেবীর পূজা করতে হয়। পূজায় তুষ্ট হ'য়ে তারা দেবীর সান্নিধ্যে যাবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে না এরূপ মনে করা হয়। এখন দেবদেবীরা যদি স্তব শুনে খুশী হন তবে অভীষ্ট লাভ হবে। মানুষকে যদি বলা হয় আহা কি সুন্দর! কিংবা আহা তোমার কণ্ঠ কি মধুর! তাতে সেও যেমন খুশী হয় তেমনি দেবদেবীরাও তাঁদের প্রকৃত রূপগুণ বর্ণনায় খুশী হন। রাগরাগিনীর মন্ত্র বা শব্দ সমষ্টি হচ্ছে আরোহী এবং অবরোহী এরূপ মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

এখন বড়লোকেরা যেমন আমাদের একটা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনতে চান না বা সময় নেই বলে শোনেন না, সেরূপ দেব-দেবীরাও শুনতে চান না। তাঁদের সমস্ত রূপ-গুণাদি অর্থব্যঞ্জক এক একটি প্রিয় শব্দ আছে তাকেই বলে 'বীজ'। এই বীজ কয়েকটি অক্ষর বা শব্দ সমষ্টি। সাধকরা এই বীজকে মাতৃকাবর্ণের সেতুদ্বারা পুজিত ক'রে যৌগিক উপায়ে সাধনা দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করেন বা করেছেন। আমরা মানব সমাজেও ঠিক এই জিনিস পাই না কি? যথা— বড়লোকের বাড়ীর দরোয়ান, কুকুর, আদালতে পেয়াদা পেশকার সরকার ও মন্ত্রী বাহাদুরদের কেরাণী ইত্যাদি। পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে হ'লে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন আছে এবং এদের জয় না করা পর্য্যন্ত আমরা আসল লোকের দেখা পাই না। দেখা পাওয়ার পর বাঁধা-ধরা সময়, তবে স্তব-স্তুতি রূপ বীজ জানা থাকলে কার্য্যসিদ্ধি নতুবা গলা-ধাক্কা। এই উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও ঠিক এরূপ অবস্থা। এদের পারিপার্শ্বিক আবরণ দেবতা সিদ্ধি করে অর্থাৎ ২২ শ্রুতি ২১ মূর্চ্ছনা, নির্গমক ও সগমকা গিট্‌কিরী, আশ, কম্পন অনুলোম বিলোম, গ্রাম, অঙ্গপ্রাধান্য, মীড়, গমক, প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস এদের আয়ত্ত ক'রে পরে রাগ রাগিনীর আকৃতির সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। সংগীতের এই আবরণ সিদ্ধি বা অলঙ্কারগুলি আয়ত্ত ক'রে প্রকাশ করার নাম প্রয়োগ। এই প্রয়োগগুলি ঠিক ঠিক রাগ রাগিণীর উপযোগী হ'লেই মনোরঞ্জক হয়। এই প্রয়োগকেই ঘরোয়ানা বলা চলে এবং এইগুলির দ্বারাই শিল্পীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন রামের ধনুর্ব্বাণ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, কৃষ্ণের চূড়াবাঁশী ও সুদর্শন চক্র ইত্যাদি এঁদের প্রত্যেকের আভরণ। এই অলঙ্কার ছাড়া এঁরা কেহই সম্পূর্ণ নন্।

প্রয়োগ-শিল্পী হিসাবে স্বর ভাস্কর হাস্সু খাঁ, হাদ্দু খাঁ, এঁদের পুত্র রৈমৎ খাঁ ও শিষ্য বালারাও, শঙ্কর গন্ধর্ব্ব, মৈজুদ্দিন প্রভৃতি গায়কগণ গায়কসমাজ অলঙ্কৃত করেছেন। পরবর্ত্তী যুগে মজঃফর খাঁ, আসথ আলী খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বিষ্ণু দিগম্বর, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও, গিরিজা-শঙ্কর, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতিদের দানও প্রচুর। বর্ত্তমানে কেশর-বাঈ, গঙ্গু বাঈ, ওঙ্কারনাথ, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, নিসার হোসেন, মোস্তাক হোসেন ও দক্ষিণ ভারতীয়গায়ক দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে বিশিষ্ট প্রয়োগ কুশলী।

রাগ রাগিণীর আভ্যন্তরিক রূপ অনুভব না করে শুধু বাহ্যিক প্রয়োগ করলে কখনও রাগ রাগিণী সম্পূর্ণ হয় না। তার জন্য বীজ সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার দ্বারাই আত্মার উন্নতির পথ এবং অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সুগম হবে। সঙ্গীতের যে সব ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারণ নির্দ্দেশ করে রেখে গেছেন প্রাচীন স্রষ্টারা, একমাত্র অলঙ্কার সহকারে বীজ সাধনার দ্বারাই সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোনরূপ রাগ রাগিণী সিদ্ধির সহজ সরল উপায় কেউ যদি আবিষ্কার করে থাকেন তবে সে-কথা বিচার্য্য। তানসেন, হরিদাস, বৈজু প্রভৃতি গায়ক শ্রেষ্ঠ ও সাধক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই গুরুর মুখ থেকে শুদ্ধ-বীজ পেয়ে থাকবেন নতুবা ঐরূপ ঐশী শক্তি তাঁরা আয়ত্ত করলেন কোথা হ'তে ?

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে যে অনাহত ধ্বনি বা নাদ থেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতের সৃষ্টি হ'য়েছে। পরবর্ত্তী যুগে পাই সাত স্বর। তার পর কড়ি কোমল প্রয়োগ ক'রে বারোটি স্বর যা' আমরা অধুনা সঙ্গীতে ব্যবহার ক'রে থাকি। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত কোন কোন স্বরকে বলা যাবে এই নিয়ে বহু মতভেদ আছে। কারণ আর কিছুই নয় কেবলমাত্র মনীষীদের বিভিন্ন চিন্তাধারা। সংগীতের মূল উৎস ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করার জন্য প্রাচীনকাল থেকে আজও পর্য্যন্ত সমানভাবে গবেষণা করে গেছেন বিভিন্ন মনীষীরা এবং তার ফলও পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত পথ তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কেউ বলেছেন এদের তিনটি গ্রাম, কেউ বলেছেন সা, মা, পা, আবার কেউ বলেছেন সা, গা, পা। যদি এদের তিন গ্রাম হিসাবেই ধরে নেওয়া যায়, তবে হয়তো উদারা, মুদারা, তারার মত ক'রেই ধরে নিতে

হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগেও গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল যেমন মন্দ্র, মধ্য ও তার। যদি পরবর্ত্তী গ্রামের নামগুলি ঠিক হয় তবে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতকে গ্রামের পর্য্যায়ে ফেলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হয়না। এখন 'সা মা পা'কে যদি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত হিসাব করে এক জাতের 'দল' সৃষ্টি করা হয় তাতেও সম্পূর্ণরূপে ৪:৫:৬ ও ১০:১২:১৫এর নিকট সম্বন্ধীয় অনুপাত পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সাতটি স্বরের অনুপাত সম্বন্ধে কি বলেছেন তাই লিখিত হ'চ্ছে। 'সা'-এর কম্পন সেঃ—১ হ'লে অনুপাত এরূপ হবে যথা :—সা—১, রে—১ ১/৮, গা—১ ১/৪, মা—১ ১/৩, পা—১ ১/২, ধা—১ ২/৩, নি—১ ৭/৮ র্সা—২। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যেখানে ৪:৫:৬-এর সহজ অনুপাত, সেখানে সা-এর সাথে মিল বেশী। তারপর ১০:১২:১৫-এর মিল। ৪:৫:৬-এর মিল কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং কি কি সুর তাই লিখছি। সা, গা, পা, নি এই ৪টি মুদারার, মা ও ধা উদারার, এবং রে তারার। উদারার মা ও ধা-এর কম্পন সংখ্যাকে দ্বিগুণ ক'রে এবং তারার 'রে'-এর কম্পন সংখ্যাকে অর্দ্ধেক ক'রে মুদারার মা, ধা, এবং মুদারার রে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইভাবে সাতটি স্বর পাওয়া যায়।

এখন যদি 'সা গা পা' দিয়ে এক জাতীয় দল সৃষ্টি করা যায় তবে ৪:৫:৬-এর ন্যায় নিকট সম্বন্ধীয় অনুপাত মত ঠিক একদলীয় গোষ্ঠী রচনা করা যাবে। এই একদলীয় এক গোষ্ঠীকে 'মাতৃকা' বলা যায়। সা গা পা ও সা গা পা এই দুইটি মাতৃকা পাওয়া যায়। প্রথম মাতৃকাটিকে যদি পুরুষ বলা হয়, তবে দ্বিতীয়টিকে স্ত্রী বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। বর্ত্তমানে প্রচলিত বারোটি স্বর থেকে ২৪টি মাতৃকা পাওয়া যায়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই ত্রয়ী স্বরসমন্বিত সঙ্গীত ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও অভীষ্টসিদ্ধি প্রভৃতির প্রকৃষ্ট পথরূপে গণ্য হওয়ায় প্রাচীন যুগে এই সংগীতকেই মার্গ সংগীত নামে অভিহিত করা হ'তো একথা পূর্ব্বেও বলা হ'য়েছে। তৎপরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে এই ত্রয়ী স্বর সমন্বয়কেই বেদপাঠ ও বেদগানে বৈদিকরা ব্যবহার করে বৈদিক সংগীতের প্রচলন করে গেছেন।

বর্ত্তমান যুগে এই ত্রয়ী স্বর হ'তে সৃষ্ট বারোটি স্বর সমন্বয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সৃষ্টি ক'রে মানব মনোরঞ্জন করছেন শিল্পীরা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য সঙ্গীত হ'তে কিছুটা ভিন্ন বা আয়াস সাধ্য বোঝায়। এই উচ্চাঙ্গ, মার্গ ও বৈদিক সঙ্গীতে রাগরাগিণী পৃথকীকরণ রীতি ও পদ্ধতি একই উপায়ে গ্রহণ করা যায়। বৈদিক যুগে, বৈদিকোত্তর যুগে ও বর্ত্তমান যুগে সংগীতের প্রকাশভঙ্গী ও প্রচারভঙ্গী বিভিন্ন হ'লেও মূলতঃ একই রীতি ও পদ্ধতিতে পুষ্ট। বৈদিক যুগের মার্গ সংগীত ও বর্ত্তমান যুগের উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে অলঙ্কার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। এই অলঙ্কার বৈশিষ্ট্যের জন্য অধুনা-প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মানব মনোরঞ্জনের পক্ষে প্রশস্ত হ'য়েছে। উচ্চাঙ্গ তথা মার্গ সঙ্গীত ও বৈদিক সংগীতের ত্রয়ী স্বর সমন্বয়কে অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতকে একত্রে 'মাতৃকা' বলা যাবে। এই মাতৃকা হ'তে খণ্ডমেরুর সৃষ্টি হ'য়েছে। এই খণ্ডমেরুকেই অধুনা আরোহী অবরোহী বলা হয়। এই মাতৃকা সাহায্যে রাগ রাগিণীর জাতি নিরূপিত করা যায়। এক গোত্রীয় দুইটি মাতৃকা মাত্র সমন্বয়ে শুদ্ধ জাতির রাগ রাগিনী সৃষ্টি করা যায়। এই এক গোত্রীয় দু'টি মাতৃকাকে একত্রে জোড় বলা হয়। এইরূপ দুই 'জোড়' অর্থাৎ চারিটি মাতৃকা সমন্বয়ে সৃষ্ট রাগ রাগিণীকে 'সালগ' বা 'সালঙ্ক' বলা হয়। এইরূপ দুই জোড়ের অধিক মাতৃকা সমন্বয়ে সৃষ্ট রাগ রাগিণীকে 'সংকীর্ণ' বলা হয়। রাগ রাগিণীর মধ্যে যেমন শুদ্ধ সালঙ্ক ও সংকীর্ণ জাতি আছে তেমন মাতৃকাগুলিরও দু'টি জাতি আছে। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর হ'তে সৃষ্ট মাতৃকার জাতির মধ্যে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। একটি বলবান পুং মাতৃকা ও একটি দুর্ব্বল স্ত্রী মাতৃকা সমন্বয়ে রাগ সৃষ্ট হয়। একটি বলবতী স্ত্রী মাতৃকা ও একটি দুর্ব্বল পুং মাতৃকা সমন্বয়ে রাগিণী সৃষ্ট হয়। রাগের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী একটি স্ত্রী ভাবাপন্ন রাগ ও অপরটি ক্লীব রাগ। সেরূপ রাগিণীর মধ্যেও একটি পুং ভাবাপন্ন রাগিণী ও একটি ক্লীব রাগিনী। 'মাতৃকা' হ'তে রাগ রাগিণীর পরিচয় বিহীন আর এক প্রকৃতির সুর সঙ্গতির সৃষ্টি হয়। এই সুর-সঙ্গতিকে জারজ নামে অভিহিত করা যায়। এইপ্রকার সুর-সঙ্গতির মধ্যেও রাগ রাগিণীর মত পুরুষ, স্ত্রী, ক্লীব ইত্যাদি রূপের প্রকাশভেদ পাওয়া যায়।

রাগরাগিণীর মধ্যে দু'টি বিভিন্ন স্ত্রীমাতৃকা দুর্ব্বল হ'লেও এ একটি পুং মাতৃকা প্রবল হ'লে তাকে স্ত্রী ভাবাপন্ন রাগ বলা যাবে। একটি বলবতী স্ত্রী মাতৃকা ও দু'টি দুর্ব্বল পুং মাতৃকা সমন্বয়ে সৃষ্ট রাগ রাগিনীকে পুং ভাবাপন্ন রাগিনী বলা যাবে। দুইটি বলবতী স্ত্রী মাতৃকার সঙ্গে একটি পুং মাতৃকা সমবলী হ'লে ক্লীব রাগিনীর সৃষ্টি হয় কিংবা একটি বলবতী স্ত্রী মাতৃকার সঙ্গে একটি পুং মাতৃকা সমবলী হ'লেও ক্লীব রাগিনী হয়। এই ভাবে দুইটি বলবান পুং মাতৃকার সাথে একটি স্ত্রী মাতৃকা কিংবা একটি পুং মাতৃকার সাথে একটি স্ত্রী মাতৃকা সমবলী হ'লে ক্লীব রাগ হবে। জারজ রাগ রাগিনী সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

বৈদিক যুগের একটি আরোহী অবরোহী থেকে এবং বর্ত্তমান যুগের একটি স্বরলিপি থেকে ঠিক একই পদ্ধতিতে সামান্য সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে কি ভাবে রাগরাগিনী ক্লীব জারজ প্রভৃতি পাওয়া গেল উদাহরণ দিয়ে এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'চ্ছে।

বৈদিক (১) রাগ | ধা গা ধা গা, গা পা গা গা, র্সা ধা ধা পা, গা সা ধা সা ॥

বৈদিক (২) রাগ | ধা গা ধা গা, গা পা ধা ধা, র্সা ধা ধা পা, গা সা ধা সা ॥

বৈদিক (৩) রাগিণী | সা সা গা পা, র্সা র্সা ধা পা, গা পা ধা র্সা, পা পা গা সা ॥

বৈদিক (৪) রাগিণী | র্সা ধা পা পা, পা গা পা পা, গা পা র্সা পা, পা গা সা সা ॥

বৈদিক (৫) ক্লীবরাগ | ধা ধা পা গা, গা পা পা ধা, গা পা ধা র্সা, ধা পা গা সা ॥

বৈদিক (৬) ক্লীব রাগিণী | র্সা ধা পা গা, পা ধা র্সা ধা, র্সা ধা ধা পা, পা পা গা সা ॥

বৈদিক (৭) জারজ ক্লীব | র্সা ধা পা গা, পা ধা ধা পা, ধা পা ধা পা, ধা পা গা সা ॥

অধুনা (১) রাগ | র্সা র্সা র্রে র্সা, নি - মা পা,
মা নি মা পা র্সা, নি - মা রে,
মা - মা রে, পা - নি পা,
মা রে মা নি, মা - রে সা ॥

অধুনা (২) রাগ | র্সা - র্রে র্সা, নি - নি পা,
মা নি মা পা, র্সা নি - মা রে,
মা - মা রে, পা - নি পা,
পা নি - -, মা - রে সা ॥

অধুনা (৩) রাগিণী | র্সা র্সা র্রে র্সা, নি নি পা পা
নি পা পা র্সা, নি - পা পা
রে - মা রে, পা - - -,
রে - মা নি, মা রে - সা ॥

অধুনা (৪) রাগিণী | র্সা র্সা র্রে র্সা, নি - পা পা
নি পা পা র্সা, নি - পা রে
মারে - - -, পা - মা রে
রে - মা নি, পা মর - সা ॥

অধুনা (৫) ক্লীবরাগ | র্সা র্সা রে র্সা, নি - পা পা
মানি মা পা র্সা, নি - নি পা
মা - মা রে, পা - পা পা
মা - নি পা, মা - রে সা ॥

অধুনা (৬) ক্লীব রাগিণী | র্সা - রে র্সা, নি - পা পা
নিমা পা পা পা, নি - মামা রে
মারে - মা রে, পা - - -
মারে মা মামা মা, মারে - - সা ॥

অধুনা (৭) জারজ ক্লীব | র্সা র্সা র্সা র্সা, পানি নি পা পা
নিমা পা পার্সা -, পানি পা মা রে
মারে - মা -, পা - - -
মারে মা মানি মা, মারে - - সা ॥

বিচার ক'রে দেখা যাক্ বৈদিক ও অধুনা যুগের স্বরলিপির কত নিকট সম্বন্ধ। বৈদিক (১) সা—৩, গা—৬, পা—২, ধা—৫ এটিতে 'গা' বাদী 'ধা' সমবাদী। বৈদিক (২) সা—৩, গা—৪, পা—২, ধা—৭ এটিতে 'ধা' বাদী 'গা' সমবাদী। বৈদিক (৩) সা—৬, গা—৩, পা—৫, ধা—২ এটিতে 'সা' বাদী 'পা' সমবাদী। বৈদিক (৪) সা—৪, গা—৩, পা—৮, ধা—১ এটিতে 'পা' বাদী 'সা' সমবাদী। বৈদিক (৫) সা—২, গা—৪, পা—৫, ধা—৫, এটিতে ২নং এর গৃহ হ'তে জাত একটি ক্লীব রাগ। 'ধা' বাদীর সাথে 'পা' সমবলী হওয়ায় এটি ক্লীব হ'য়েছে। বৈদিক (৬) সা—৪, গা—২, পা—৫, ধা—৫, এটি 'পা' বাদী ও 'সা' সমবাদী রাগিনী। অর্থাৎ বৈদিক ৪নং এর গৃহ হ'তে জাত এটি ক্লীব রাগিনী। এখানে 'পা' বাদীর সাথে 'ধা' সমবলী হওয়ায় এটি ক্লীব হয়েছে। পরে বৈদিক (৭) ও অধুনা (৭) একসঙ্গে আলোচিত হ'চ্ছে। এখন অধুনা (১) সা—৫, রে—৫, মা—১১, পা—৫, নি—৭ এটিতে 'মা' বাদী 'নি' সমবাদী। অধুনা (২) সা—৫, রে—৪, মা—৮, পা—৬, নি—১০ এটিতে 'নি' বাদী ও 'মা' সমবাদী। অধুনা (৩) সা—৫, রে—৮, মা—৩, পা—১০, নি—৬ এটিতে 'পা' বাদী রে' সমবাদী। অধুনা (৪) সা—৫, রে—১১, মা—৪, পা—৮, নি—৬ এটিতে 'রে' বাদী 'পা' সমবাদী। অধুনা (৫) সা—৫, রে—৩, মা—৯, পা—৯, নি—৭, এটি অধুনা ১নং এর গৃহ হ'তে জাত। 'মা' বাদী 'নি' সমবাদীর গৃহ হ'তে জাত রাগের বাদীর সমবলী 'পা' হওয়ায় এটি ক্লীব রাগ। অধুনা (৬) সা—৪, রে—৯, মা—১০, পা—১০, নি—৫ এটি অধুনা (৩) এর গৃহ হ'তে জাত 'পা' বাদী ও 'রে' সমবাদীর গৃহ হ'তে জাত রাগিনীর বাদীর সাথে মা সমবলী হওয়ায় এটিও ক্লীব রাগিনী। অধুনা (৭) ও বৈদিক (৭) এর আলোচনা করা যাচ্ছে। অধুনা (৭), সা—৭, রে—৭, মা—১১, পা—১১, নি—৪। ভাতখণ্ড মত অনুসারে 'রে' বাদী ও 'পা' সমবাদী। এক্ষেত্রে বাদী ও সমবাদী হিসাব মত 'মা' ও 'পা' সমবাদী। এটি কি হওয়া উচিত ছিল পরে পাওয়া যাবে। বৈদিক (৭), সা—২, গা—২, পা—৬, ধা—৬। আধুনিক (৭) 'সা মা' সঙ্গতি সম্পন্ন পাওয়া যাচ্ছে। বৈদিক (৭) 'সা পা' সঙ্গতি সম্পন্ন। অধুনা (৭) 'সা মা' সঙ্গতিসম্পন্ন হ'লেও 'মা' বাদী ও সা সমবাদী ও 'সা' বাদী, 'মা' সমবাদীর প্রকৃতি জাত রাগ রাগিনী নয়। বৈদিক (৭) ও অধুনা (৭) উভয়েই সমপ্রকৃতির। এই দুইটিকে সূক্ষ্ম বিচারে ক্লীব জারজ বলা বোধ হয় ঠিক হবে। জারজ এই জন্তই বলা বোধ হয় ঠিক হবে কারণ এর বাদী, সমবাদী, কেন্দ্র নির্দিষ্ট গৃহ হ'তে জাত এগুলি বোঝা যাচ্ছে না। অথচ আকারেও ক্লীব পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। এই ক্লীব জারজ যদিও অশুদ্ধ (কেননা এর বাদী সমবাদী নিরূপণ করা যায় না) তথাপি এটি প্রচলিত হয়েছে।

এখন কি ভাবে মাত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সাহায্যে মাতৃকা সৃষ্টি ক'রে রাগ, স্ত্রীরাগ, ক্লীব রাগ, রাগিনী, পুং রাগিনী, ক্লীব রাগিনী এবং জারজ প্রতিটিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানা যাবে এবং তাদের রাগ রাগিনী হিসাবে অলঙ্কার যোজনা করা যাবে তা' উদাহরণ সাহায্যে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে। এই আলোচনা দ্বারা কোনটিকে মার্গ সংগীত পর্য্যায়ে এবং কোনটিকে উচ্চাঙ্গ লোক সংগীত পর্য্যায়ে ফেলা যাবে বিশেষ ভাবে বোঝা যাবে।

বর্ত্তমানে অনেকের ধারণা মার্গ সংগীত লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু লোপ যদি পেয়েই থাকে ত ঠিক সৃষ্টির পরবর্তী যুগ থেকেই লোপ পেয়েছে, অধুনা নয়। কিন্তু আসলে মার্গসংগীত লোপ পেয়েছে বলে মনে হয় না। ঈশ্বরকে জানার বা আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে সংগীতকে তখনকার দিনের সংগীতজ্ঞরা ব্যবহার ক'রেছিলেন ব'লে তার এক নাম সৃষ্ট হয়েছিল মার্গ সংগীত। এই মার্গ সংগীত সুরসমন্বিত স্বর-সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অধুনা অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে যে ভাবেই হোক্ শিল্পীরা তারই প্রয়োগ ক'রে যাচ্ছেন তাই মার্গ সংগীতকে লুপ্ত বলা চলে না বলে মনে হয়। এখন ত্রয়ী স্বর সমন্বিত মাতৃকাধারা যে রাগ রাগিনী বিচার করা যাবে তাই বা আমরা কি ভাবে জানতে পারি? নিম্নে মাতৃকাগুলি দেখানো যাচ্ছে। এগুলি যে কোনও সপ্তকে হ'তে পারে।

সা=সা গা পা (পুং)—গা পা নি (স্ত্রী)
সা গা পা (স্ত্রী)—গা পা নি (পুং)

রে=রে মা ধা (পুং)—মা ধা সা (স্ত্রী)
রে গা ধা (স্ত্রী)—গা ধা নি (পুং)

V V
রে=রে মা ধা (পুং)—মা ধা রে (স্ত্রী)
রে মা ধা (স্ত্রী)—মা ধা সা (পুং)

গা=গা পা নি (পুং)—পা নি রে (স্ত্রী)

V V
গা মা নি (স্ত্রী)—মা নি রে (পুং)

গা=গা ধা নি (পুং)—ধা নি গা (স্ত্রী)
গা পা নি (স্ত্রী)—পা নি রে (পুং)

মা=মা ধা সা (পুং)—ধা সা গা (স্ত্রী)
মা ধা সা (স্ত্রী)—ধা সা গা (পুং)

V V
মা=মা নি রে (পুং)—নি রে মা (স্ত্রী)

মা ধা রে (স্ত্রী)—ধা রে গা (পুং)

পা=পা নি রে (পুং)—নি রে মা (স্ত্রী)
পা নি রে (স্ত্রী)—নি রে মা (পুং)

ধা=ধা সা গা (পুং)—সা গা পা (স্ত্রী)
ধা নি গা (স্ত্রী)—নি গা মা (পুং)

ধা=ধা রে গা (পুং)—রে গা ধা (স্ত্রী)
ধা সা গা (স্ত্রী)—সা গা পা (পুং)

নি=নি রে মা (পুং)—রে মা ধা (স্ত্রী)
নি রে মা (স্ত্রী)—রে মা ধা (পুং)

নি=নি গা মা (পুং)—গা মা নি (স্ত্রী)
নি রে মা (স্ত্রী)—রে মা ধা (পুং)

'সা' হ'তে 'নি' পর্য্যন্ত বারোটি স্বর থেকে এই যে মাতৃকাগুলি পাওয়া গেল এইগুলি 'সা গা' সম্বন্ধবিশিষ্ট ও 'সা গা' সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সা গা পা' ও 'সা গা পা' এর মধ্যে পার্থক্য মাত্র 'গা' ও গা' এর। এজন্য প্রত্যেক মাতৃকার জোড়গুলি পরস্পর 'সা গা' ও 'সা গা' সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মাতৃকাগুলি যেখানে অন্য স্বরের জোড় হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে সেই অন্য স্বরটি পূর্ব্বোক্ত মাতৃকাগুলির জোড় এর উৎপত্তি স্বরের সঙ্গে সা পা সম্বন্ধ বিশিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্ সা এর মাতৃকা সা গা পা‌ও সা গা পা ধা ও ধা এর জোড় হিসাবে পাওয়া যায়। সা এর মাতৃকার জোড় হিসাবে 'গা' ও 'গা'এর মাতৃকা পাওয়া যায়। এখন আমরা পেলাম 'ধা গা' 'ধা গা' এই দু'টি সম্বন্ধ 'সা পা' সঙ্গতি-সঙ্গতিবিশিষ্ট। এই পুং স্ত্রী ও স্ত্রী পুং মাতৃকাগুলির ও তাদের জোড়ের সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের যাবতীয় রাগ রাগিনী সৃষ্ট হ'য়েছে। এই মাতৃকাগুলির সাহায্যে, কোন্ কোন্ রাগ রাগিনীর মিশ্রণে কোন্ কোন্ রাগ রাগিনী উৎপন্ন হ'য়েছে এবং কোন্ রাগ রাগিনী শুদ্ধভাবে প্রচলিত ও কোন্ রাগ রাগিনী অশুদ্ধভাবে প্রচলিত সেটা সঠিকভাবে জানা যাবে। পুং বা স্ত্রী যে কোন একক মাতৃকা সহযোগে সৃষ্ট রাগ বা রাগিনী অসম্পূর্ণ। কেননা একক একটি মাতৃকা সাহায্যে সৃষ্ট রাগ বা রাগিনী-রূপে ও রসে সম্পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে না। যদিও হয় তবে তাকে শাস্ত্রসম্মত মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসমীচীন হবে। বর্ত্তমানে মাতৃকার সাহায্যে একটি রাগ, যথা—'ভূপালী'কে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক্ যে এই রাগের স্বর সমাবেশ থেকে কি কি রাগ রাগিনী পাওয়া যাবে এবং এটি রাগ না রাগিনী। ভূপালীর আরোহী : সা রে গা পা ধা! এই আরোহী থেকে আমরা দু'টি মাতৃকা পাচ্ছি ধা সা গা ও সা গা পা। ধা সা গা থেকে সা মা ও সা পা অর্থাৎ প্রচলিত বাদী সমবাদী নিরূপণ প্রথা হিসেবে আমরা ধা ও রে সা মা সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ধা ও গা সা পা সঙ্গতিসম্পন্ন হিসাবে দেখতে পাই। এখন আমরা ধা সা রে গা পেলাম এর সাথে সা পাএর 'পা' দিলেই আমরা সা রে গা পা ধা পাই। প্রচলিত মত মত, ভূপালীর মতই, বাদী ধা সমবাদী গা, বাদী পা সমবাদী সা, বাদী সা সমবাদী পা, এই কয়টি রাগ রাগিনী পাওয়া যাবে। এইরূপে পূর্ব্বে বর্ণিত বৈদিক বা অধুনা প্রচলিত যে রাগ রাগিনীর বিচার করে দেখানো হ'য়েছে ঠিক সেইভাবে ক্লীব রাগ, ক্লীব রাগিনী, ও জারজ ক্লীবও হ'তে পারে।

এখন দেখা যাক্ ভূপালী রাগ না রাগিনী। ভূপালী গা বাদী ও ধা সমবাদী হিসাবে প্রচলিত। সুতরাং এক্ষেত্রে ধা সা গা এই মাতৃকাটি প্রবল ও সা গা পা এই মাতৃকাটি দুর্ব্বল। ধা সা গা অর্থাৎ স্ত্রী মাতৃকা প্রবল ও সা গা পা এই পুং মাতৃকাটি দুর্ব্বল হওয়ায় একে রাগিনী বলা যাবে। ধা সা গা দুর্ব্বল ও সা গা পা প্রবল হ'লে একে বলা যেত রাগ। সা গা পা ও ধা সা গা সমবলী হ'লে একে ক্লীব বলা যাবে।

এইভাবেই পূর্ব্ব বর্ণিত বিচার অনুসরণ ক'রে বিশ্লেষণ করলেই রাগ রাগিনীর পার্থক্য নিরূপিত হবে। এই মাতৃকাগুলিকে রাগের প্রচলিত কোনও অলঙ্কার বলা চলবে না। অলঙ্কার প্রয়োগের নির্দ্দেশক রাগের স্বরূপ বলা চলবে। রাগকে যখন পুং, স্ত্রী ইত্যাদি মাতৃকার সাহায্যে বিচার ক'রে জানা যাচ্ছে তখন সেই হিসাবে তাদের আকৃতি প্রকৃতি অনুযায়ী অলঙ্কার দিয়ে রূপ সৃষ্টি করা যাবে এবং সেটি নির্ভর করবে কিছুটা শিল্পীর কণ্ঠ মাধুর্য্যের উপর এবং অনুভূতির উপর। রাগ বা রাগিনীর প্রচলিত দশ ও লক্ষণ একটু চিন্তা ক'রে অর্থাৎ রাগ রাগিনীর পার্থক্য হিসাবে অলঙ্কারের পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে প্রয়োগ করলেই বোধ হয় বর্ত্তমানেও গায়ক শ্রেষ্ঠ তানসেন প্রভৃতি সংগীতজ্ঞদের মতন সম্পূর্ণাঙ্গ রস সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। অবশ্য সেটা সাধনা সাপেক্ষ। কারণ অনুভূতি, শ্রুতি, স্মৃতি ও সাধনার কোনটিকে বাদ দিয়েই এর সম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা' এই বাক্যটির সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রাচীন যুগের সঙ্গীতজ্ঞরা তাই সংগীতকে ঈশ্বর উপাসনা, বেদগান প্রভৃতি সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে অতি গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে সাত্ত্বিক গুরুও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছে। ছাত্ররাও যেমন প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছে তেমনি গুরুরাও ঐ প্রয়োগের মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে প্রকৃত সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ছেন।

বর্ত্তমানে যাঁরা শিল্পী, যাঁরা সংগীতপিপাসু, যাঁরা ভবিষ্যত শিল্পীর আসন অলঙ্কৃত করবেন তাঁদের কাছে এটুকু আবেদন জানিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই যে সংগীতের বাহ্যিক আড়ম্বরকেই সব কিছু বলে মনে না ক'রে তার আভ্যন্তরিক রস আস্বাদন করার চেষ্টা করে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যকে কৃষ্টিকে জগত সমক্ষে তুলে ধরবার সাধনার গৌরব থেকে তাঁরা যেন নিজেদের বঞ্চিত না করেন।
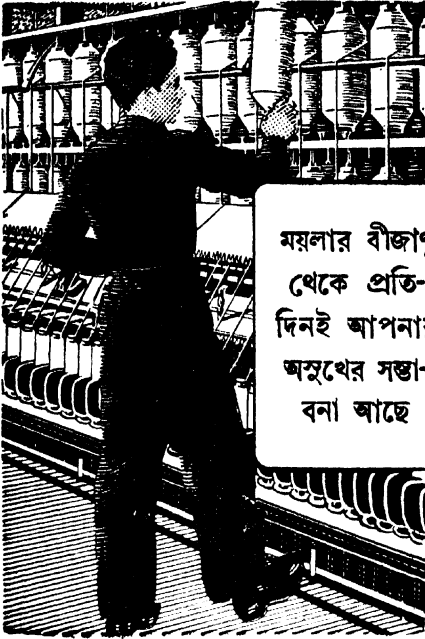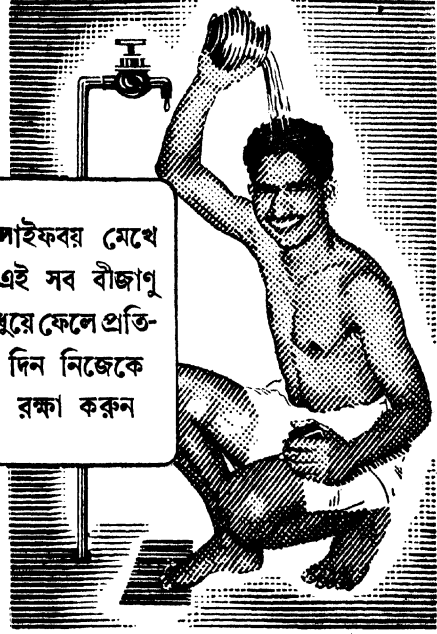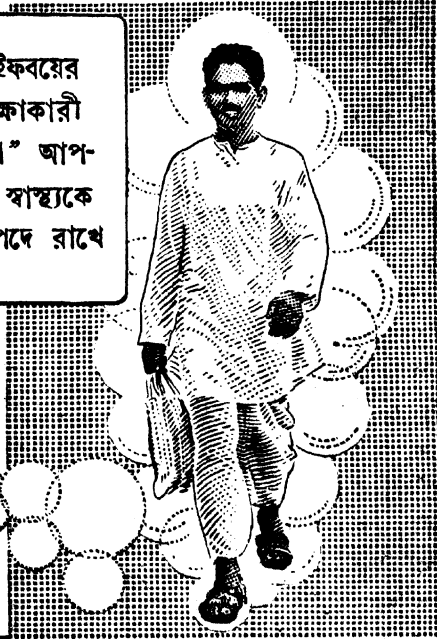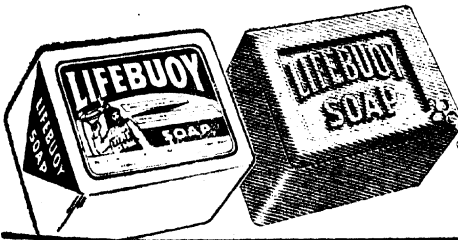
মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

স্ত্রী-শিক্ষায় গলদ

শ্রীকাত্যায়নী দেবী

ট্রেনে বসে আছি, পাশে বসলো একজন তরুণী আধুনিকা, শিক্ষিতাও নিশ্চয় কেননা রিষ্টওয়াচ, ভ্যানিটি ব্যাগ, হাইহিল জুতো আর কেমন যেন নাক সিঁটকে চাহনি অর্থাৎ স্মার্ট! ক্যাড! আমরা কতকগুলো মেয়ে বসে আছি—সেখানে বসাটাও যেন তার পক্ষে অসম্মানজনক!

এগারো হাত শাড়ীখানার দশহাতই নিম্নাঙ্গে কুঁচিয়ে দিয়ে হাতখানেক মাত্র বুকের ওপর দিয়ে কাঁধ স্পর্শ করেছে, উগ্র সেণ্টের গন্ধে গাড়ী শুদ্ধ চমকে তাকিয়ে থাকে তরুণীটির দিকে, মনে মনে কেমন একটা ধিক্কার এলো আধুনিকতার ওপরে, আমাদের মা ঠাকুরমারা সেমিজ শায়া পরতেন না বটে, কিন্তু কাপড়খানা এমন গুছিয়ে পরতেন যে দেহের কোন স্থান অনাবৃত থাকত না। আর আজকাল! একী নির্লজ্জ আচরণ মেয়েদের। হঠাৎ চমকে উঠলাম অপর পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণীর পচ্ করে পানের পিক্ ফেলার শব্দে, তাড়াতাড়ি পা তুলে দেখি কাপড়ের অনেকটা জুড়ে লেগেছে তার পানের রস! বল্লাম "কি করলেন—দেখুন ত!"

চোখ মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটি বল্লো—'গাড়ী কারো কেনা নয়, পয়সা দিয়ে আমিও উঠেছি, চোখ রাঙ্গাচ্ছ কেন?' তারপর রাগে রাগেই পটাপট জামার বোতামগুলো খুলে দিব্যি স্তন্যপান করাতে লাগলো কোলের শিশুটিকে, ভ্রূক্ষেপও কোরল না গাড়ী ভর্ত্তি নারী পুরুষের দৃষ্টির প্রতি! তরুণী অশিক্ষিতা সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে ভাল, কি ভাল—শিক্ষা না অশিক্ষা, শিক্ষিতা না অশিক্ষিতা—তা আজও বুঝি না—অথচ পথে, ঘাটে, পাড়ায় ঘরে এমনি দৃষ্টিকটু চাল চলন রোজই দেখা যায়, সকলেই দেখেন। গরীব গৃহস্থ সংসারে অসংস্থান, রোগ, ঝগড়া, ছেলে মেয়ের কান্না, অফিস স্কুলের তাগাদা উপেক্ষা করে যখন দেখি বধূরা গৃহিণীরা বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো, শনিবারে শনি পুজো, রবিবারে সূর্য্য পুজো—মঙ্গলবারে মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত প্রভৃতি নানাবিধ বার ব্রত করে যাচ্ছেন, শাঁক বাজিয়ে, উলু দিয়ে বসে সুর করে পাঁচালী কথা শুনছেন, গঙ্গাস্নান করে সারা কপালে সিঁদুর লেপে ক্লান্ত চরণ টেনে ঘরে ফিরছেন—

তখন ভাবি এই হাজারো রকম কুসংস্কার হতে কবে এঁরা মুক্ত হবেন—

কবে শিক্ষিত সবল হাতে সংসারের শ্রী বিধান করে হবেন লক্ষ্মীর বরপুত্রী!

সাহসে, শক্তিতে নারী কবে হবে মা চণ্ডীর সমান। কবে প্রতিটি নারী প্রতিটি সংসার করে তুলবে শ্রী ও সুষমামণ্ডিত! কবে! কবে! কবে। কিন্তু!···

আবার যখন দেখি শিক্ষিতা মেয়ের সংসারে কর্ত্তা হয়ে পড়েছে চাকর, গৃহিণীপনার দায়িত্ব পড়েছে দাসীর হাতে, স্বগর্ব্বে গৃহিণী বলছে—"আমি বাবা রান্না-বান্নার কিছু জানি না, যদুর মাই ওসব ঝামেলা চালিয়ে নেয়।"

ছেলে মেয়ের জামার বোতাম নেই সেপটিপিন আঁটা, বালিস কাঁথায় ওয়াড় নেই, সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বলে না বাড়ীতে, মাষ্টার এসে ডেকে পায় না ছেলে মেয়েদের! চাকরে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে গ্লাসটা রেখে দিচ্ছে কুঁজোর মুখে, মাছ, পেঁয়াজ, ফল, তরকারী কোটা হচ্ছে একই বঁটীতে, তখন মনে হয় এ কী অনাচার প্রবেশ করলো বাঙ্গালী গৃহস্থের অন্তঃপুরে। মেয়েরা লেখা পড়ার মধ্যে দিয়ে শিখলো কি তবে সংসার ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে?

কাজ কি তবে এমন শিক্ষায়!

মেয়েদের পক্ষে যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকাই ভাল। অবশ্য এটা সাময়িক তিতিক্ষা ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষাই জীবন! শিক্ষাই আমাদের এখন একমাত্র প্রয়োজন নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে। শিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কিছুই কাম্য নেই, কল্যাণ অকল্যাণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা বেছে নিতে পারব শুধু শিক্ষার দ্বারাই।

কিন্তু তাহলে কেন এমন হয়? মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর যে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন—যা আজ প্রয়োজন—তার ফল দেখে কেন এমন হতাশ হতে হয়?

গলদ কোথায়?

মনে হয়, নারী পুরুষ অর্থাৎ বালক বালিকার জন্যে একই মানে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তনই এর জন্যে দায়ী! পুরুষ জীবিকা অর্জনের জন্যে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, শিক্ষালাভ করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে নারীকেও তাই গ্রহণ করতে হয়। অনেক মেয়ে আজকাল চাকুরী করে সত্যি, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার প্রযোজন বোধ ত চাকুরী করার জন্যে হয়নি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সংসার পরিচালনা, সন্তানের শিক্ষাদান, রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি সংসারের আভ্যন্তরীণ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার জন্যেই মুখ্যতঃ নারীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন।

শিক্ষিতা নারীদের কাছে দেশ যা আশা করেছিল তা পায়নি। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে নারী মর্য্যাদা লাভ করলেও জাতি-গঠনে, সমাজ-গঠনে নারী বিশেষ কিছু করতে পারেনি!

অবশ্য নারীর তাতে নিজস্ব অপরাধ বেশী নেই। বিদেশী শাসকের হাতেই শিক্ষা প্রথা ন্যস্ত থাকায় নারীর প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষালাভ ঘটে ওঠেনি, কিন্তু আজ ত দেশ বিদেশী শাসন মুক্ত। শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আজও স্ত্রী-শিক্ষার মানের উপর কেন পড়েনি?

সকল মেয়েকেই শিক্ষিতা করার প্রয়োজন, অথচ সকল মেয়েই ডাক্তারী পড়বে না, ওকালতি করবে না, শতকরা নিরনব্বুই জনা মেয়ে করবে ঘর সংসার, অথচ সেরূপ কোন শিক্ষাই ছাত্রীজীবনে তারা পায় না। একেবারে অপটু অনভিজ্ঞ অবস্থায় বধূ জীবনে প্রবেশ করে, আবার অনভিজ্ঞ অপটু হলেও অবলা বালিকা থাকে না, অশিক্ষিতা শাশুড়ী দিদি-শাশুড়ীকেও মেনে নিতে পারে না।

এ বিষয়ে হিতৈষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণই হল আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য।

শিক্ষা বিভাগ আজও চিরাচরিত প্রথায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে সহজ সরল গার্হস্থ্যধর্ম্ম সেবা-শুশ্রূষা, সন্তান-পালন প্রভৃতির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীকে বাইরের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন, তাই আজও দেখা যায় না।

নারী পুরুষের শিক্ষার মান একই ধারায় চলেছে আজও। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বলে মেয়েদের জন্য পৃথক যে বিষয়টি আছে, তার কোন মূল্য নেই! 'প্র্যাকটিক্যাল' ভাবেই শিক্ষা দরকার, নার্সিংএর, রন্ধনের, নানাবিধ গৃহকর্ম্মের! ব্যাপার দেওয়া কেতাবী বিদ্যায় কিছুই হয় না, তাই আজকাল এত স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও ঘরে ঘরে এত অশান্তি।

বয়ন শিল্প

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

(নৌকা প্যাটার্ণ)

২৬ ঘরে

এই পালতোলা নৌকাটি বুনতে হলে চার রঙ্গা উলের প্রয়োজন হবে—ফিকে নীল (নী), সাদা (সা), লাল (লা) ও ঘোর নীল বা নেভী ব্লু (নে)।

এখানে ফিকে নীল রঙ দিয়ে সমস্ত সোয়েটারটি বুনতে হবে।

১ সোজা—৭ নী, ১৪ নে, ৫ নী।
২ উল্টা—১ নী, ২২ নে, ৩ নী।
৩ সোজা—২ নী, ২৪ নে।
৪ উল্টা—১০ নী, ২ সা, ১ নী, ৩ সা, ১০ নী।
৫ সোজা—১২ সা, ২ নী, ৩ সা, ৯ নী।
৬ উল্টা—৪ নী, ৮ সা, ২ নী, ১২ সা।
৭ সোজা—১ নী, ১১ সা, ২ নী, ৭ সা, ৫ নী।
৮ উল্টা—৬ নী, ৬ সা, ২ নী, ১০ সা, ২ নী।
৯ সোজা—২ নী, ১০ সা, ২ নী, ৫ সা, ৭ নী।
১০ উল্টা—৭ নী, ৫ সা, ৩ নী, ৮ সা, ৩ নী।
১১ সোজা—৪ নী, ৭ সা, ৩ নী, ৪ সা, ৮ নী।

১২ উল্টা—৯ নী, ৩ সা, ৩ নী, ৭ সা, ৪ নী।

১৩ সোজা—৫ নী, ৬ সা, ৩ নী, ৩ সা, ৯ নী।

১৪ উল্টা—১০ নী, ২ সা, ৩ নী, ৫ সা, ৬ নী।

১৫ সোজা—৭ নী, ৪ সা, ৩ নী, ২ সা, ১০ নী।

১৬ উল্টা—১১ নী, ১ সা, ২ নী, ৪ সা, ৮ নী।

১৭ সোজা—৯ নী, ৩ সা, ২ নী, ১ সা, ১১ নী।

১৮ উল্টা—১১ নী, ১ সা, ২ নী, ২ সা, ১০ নী।

১৯ সোজা—১১ নী, ২ সা, ১ নী, ১ সা, ১১ নী।

২০ উল্টা—১১ নী, ১ সা, ১ নী, ১ সা, ১২ নী।

২১ সোজা—১৪ নী, ১ সা, ১১ নী।

২২ উল্টা—১১ নী, ১ সা, ১৪ নী।

২৩ সোজা—১৪ নী, ৪ লা, ৮ নী।

২৪ উল্টা—১০ নী, ২ লা, ১৪ নী।

এই প্যাটার্ণটি ছোটোদের সোয়েটারের বর্ডারে দিলে সুন্দর দেখতে হবে। ফিকে নীল রঙের বদলে যে কোনো হাল্কা রঙ প্যাটার্ণটিতে ব্যবহার করতে পারেন এবং সেই রঙ দিয়েই সমস্ত সোয়েটারটি বুনবেন।

আঁকা বাঁকা প্যাটার্ণ

২৪ ঘরে

তিন রঙা উল দরকার—সাদা (সা), কালো (কা) ও খয়েরী (খ)।

১ সোজা—৬ সা, ২ খ, ২ সা, ৪ খ, ২ সা, ২ খ, ৬ সা।

২ উল্টা—৫ সা, ২ খ, ২ সা, ২খ, ২ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ৫ সা।

৩ সোজা—৪ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ৪ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ৪ সা।

৪ উল্টা—৩ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ৬ সা, ২ খ, ২ সা ২ খ, ৩ সা।

৫ সোজা—১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা ২ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ১ সা।

৬ উল্টা—৫ম লাইনের মত।

৭ সোজা—৪র্থ লাইনের মত।

৮ উল্টা—৩য় লাইনের মত।

৯ সোজা—২য় লাইনের মত।

১০ উল্টা—১ম লাইনের মত।

১১ সোজা—৬ সা, ২ কা, ২ সা, ৪ কা, ২ সা, ২ ক ৬ সা।

১২ উল্টা—৫ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা ২ সা, ২কা, ৫ সা।

১৩ সোজা—৪ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ৪ সা, ২ কা ২ সা, ২ কা, ৪ সা।

১৪ উল্টা—৩ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ৬ সা, ২ ক ২ সা, ২ কা, ৩ সা।

১৫ সোজা—১ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ২ সা, ২ খ, ২ সা, ২খ, ২ সা, ২ খ, ১ সা।

১৬ উল্টা—১৫ লাইনের মত।

১৭ সোজা—১৪ লাইনের মত।

১৮—উল্টা—১৩ লাইনের মত।

১৯ সোজা—১২ লাইনের মত।

২০ উল্টা—১১ লাইনের মত।

এই প্যাটার্ণটি পুরুষদের সোয়েটারে করলে দেখতে ভাল হবে।

যদি এলে

কালিদাস রায়চৌধুরী

এসেছ যখন থাকো-ই কিছুটা কাল,
অলস বিকেল কাটিতে চাহে না আর ;
তোমার আঁচল সময়ের রাঙা-পাল :
চলো বসি গিয়ে ছায়া-ঢাকা নদীধার।

যদি এলে তবে কিছু সুর ঢালো প্রাণে
ট্রাইশানি সেই সাতটা লগ্নে আছে—
এখন তো এসো কই শ্লোক কানে কানে,
মাটির মায়ায় তোমারে পেলাম কাছে।

এই বিকেলকে অপরূপ করে দাও—
স্মরণ-তীর্থে দুটি হৃদয় উধাও।

কাশ্যমীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই কবি, দার্শনিক, প্রেমিক, ত্যাগী ফকিরের স্মৃতিপূত তাসরার শরীফ আজও হিন্দুমুসলমানের প্রিয়তীর্থ।

কুমকুমের সৌরভ বুঝি মনকে নিয়ে গিয়েছিল সুরলোকে। ফিরে আসা যাক্ কুঙ্কুম বা "কেশরের" বাস্তব বাজারে। কুমকুম ফুলের মাঝের সরু সরু কেশরগুলি (যার মাথায় থাকে রেণু) পাপড়ী থেকে পৃথক কোরে নেওয়া হয়—এগুলিই শুকিয়ে বাজারে বিক্রী হয়। এজন্য এর স্থানীয় অন্য নাম "কেশর"।

ফুলের বৃন্ত ও দলগুলি থেকে জাফরান হয় না, কিন্তু জাল জাফরান

শ্রীনগরে নৌ-ডাকঘর

ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়

হয়, এগুলিকে শুকিয়ে কাঠের বেলনা দিয়ে পিষে ফেললেই চেহারাটা অনেকটা ফুলের মাঝের কেশরগুলির মত হয়, তারপর জাফরানের জলে ডুবিয়ে ওগুলিতে রং ধরান হয়; কাজেই জাফরান বাজারে ২৷৷৹ থেকে ৬৲ টাকা ভরী বিক্রী হয়। জাল জিনিষ ধরার সহজ উপায় একটু জলে এগুলি খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই ওপরের রং ধুয়ে যাবে, আর যা খাঁটী তার রং ধুয়ে যাবার ভয় নাই। জাফরান বা কুঙ্কুম বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের হিন্দুদের সামাজিক জীবনে শুভকাজে ব্যবহৃত হোয়ে আসছে। হিন্দু পতাকার বর্ণ এই রংএর, কারণ কুঙ্কুমের রং মনে জাগায় শৌর্য্য ও ত্যাগ; রাজপুত মারাঠা প্রভৃতি হিন্দুর গৌরবময় অধ্যায়ের পরিচয় বহন কোরে আসছে এই শৌর্য্যের প্রতীক্ কুঙ্কুম কেতন। আজও ভারতীয় হিন্দু-মহাসভার পতাকার বর্ণ এই বর্ণ। জাতীয় কংগ্রেসের তিনরঙ্গা পতাকার একটী রং এই কুঙ্কুম, যা ত্যাগ অথবা হিন্দুদের প্রতীক। ওষুধ হিসেবেও জাফরানের ব্যবহার বহুধা; আর বিলাসীর রন্ধনশালায়ও তার প্রতিপত্তি অনেকখানি।

ভারতের বাইরে মাত্র ইটালী ও মরোক্কোতে জাফরান জন্মে, কিন্তু তা এত উঁচুদরের নয়। এমন কি কাশ্মীরেও এই পামপুর অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও জাফরান জন্মে না। তাই বর্ত্তমানের অর্থনীতির ভাষায় ভারতের এটী একটী 'ডলার আর্ণার' সামগ্রী অর্থাৎ রপ্তানী হোয়ে বিনিময়ে বিদেশী টাকা দেশে আনে। কারু কারু মতে কুমকুমকে সংস্কৃত ভাষায় নাকি "কাশমীর", বা 'কাশমীরাজা' বলে এবং তাই থেকে কুমকুমের জন্মভূমি কাশ্মীরের নামের উৎপত্তি। মধ্যান্তিকা মতে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু নাকি প্রথম এদেশে এর চাষ প্রবর্ত্তন করেন।

যাত্রীদের অনেকে মাঠে দাঁড়িয়েই চাষীদের কাছ থেকে জাফরান কিনতে চাইলেন, কিন্তু তারা জানাল যে মাঠের ফুলগুলি এখনও কাঁচা, তবে গত সনের ফসলের কিছু আছে বাড়ীতে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরলে আনতে পারে। বাস অতক্ষণ অপেক্ষা কোরতে রাজী না হওয়ায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হোল। জাফরান ছাড়াও বাকরখনি রুটী এবং উলের কাপড়ের জন্য পামপুরের খ্যাতি আছে। শ্রীনগর থেকে ১৬ মাইল এসে বাস দাঁড়াল অবন্তীপুরের অর্দ্ধপ্রোথিত মন্দিরের কাছে। অতীতের কবর খুঁড়ে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে বিরাট মন্দির প্রাঙ্গণ; চারধারে পাথরের প্রাচীর, সামনে মস্ত সিংহদ্বার, প্রাঙ্গণের মাঝখানে মন্দিরের উঁচু মণ্ডপ। কালের কালিতে পাথরগুলি কালো হোয়ে গেছে। সিংহদ্বার দিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে নামতে হয়, আবার প্রাঙ্গণ থেকে সিঁড়ি বেয়ে মাঝের মূলমন্দিরে উঠতে হয়। মূর্ত্তিদ্বেষী মুসলমান বাদশাদের আমলে এখানের মূর্ত্তি ও মন্দির বিনষ্ট হোয়েছিল, এমন ব্যাপক বিধ্বংস যে মন্দিরের বা প্রাচীরের

গাঁয়ের কোন মূর্ত্তিই আজ অক্ষত নাই এবং অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন। শ্রীনগরের লালমণ্ডির যাদুঘরে রক্ষিত এখানের প্রায় প্রতিটী মূর্ত্তি বিধর্ম্মীর বিদ্বেষের বিষ-চিহ্ন বহন কোরছে। মন্দিরটীর যে অংশগুলি ভাঙ্গা সম্ভব হয় নাই সেগুলিই শুধু আজ দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা অবন্তীবর্ম্মা (৮৫৫—৮৮৩ খৃঃ অঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন অবন্তীস্বামী বিষ্ণুমূর্ত্তির জন্যে ; তখন এ জায়গার নাম ছিল বিশ্বয়িকা-সর (Vishvaika-sara)। সিংহাসনে আরোহণের পর এর চেয়ে আরও বড় একটী মন্দির অবন্তীশ্বর শিবের জন্য নির্ম্মাণ করান জোবার গ্রামের কাছে। হাজার বছর পরেও হিন্দু স্থাপত্য কৌশলের কাহিনী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সব বিরাট শিলা সাক্ষ্য। বাস খানাবল থেকে বানিহালের পথ ছেড়ে অনন্তনাগের বা ইসলামাবাদের দিকে চোল্ল।

অনন্তনাগ কাশ্মীর উপত্যকার দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী। এখানে একটী ঝরণা ও জলকুণ্ড আছে, তারই নাম অনন্তনাগ। "নাগের" প্রাধান্য কাশ্মীরে খুব ; ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, শেষনাগ, কোকরনাগ—এ নাগের অর্থ ঝরণাই হোক আর সাপই হোক। পাতালের যে অনন্তনাগ—তারই আবাস এখানের এই জলকুণ্ডে—এই এখানের বিশ্বাস। স্বর্গের সব দেবতাই নাকি কাশ্মীরে আছেন—নানা নদ নদী, ঝরণা পাহাড়ের রূপ ধোরে, তাই এদের অধিকাংশেরই নাম হিন্দু দেবদেবীর নামের অনুসরণে,—হরমুখ, মহাদেব, কৈলাস, ভৈরব, হরিপর্ব্বত, অমরনাথ প্রভৃতি পর্ব্বত, গঙ্গাবল, মানসবল, শেষনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি হ্রদ, কিসেন-গঙ্গা, বিষেণ-সর, কিষণ-সর, অমরগঙ্গা প্রভৃতি নদী। কয়েক মাস আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অনন্তনাগের অধিকাংশ বাড়ী পুড়ে যায়। সরকার প্রজাদের গৃহনির্ম্মাণে কাঠ ও ঋণ দিয়ে সাহায্য কোরেছেন শুনলাম। নূতন বাড়ীঘর নানাদিকে তৈরী হোচ্ছে। এটী মুসলমানদেরও তীর্থস্থান ; অনেকগুলি জিয়ারৎ আছে। অনন্তনাগের কাছেই একটী গন্ধকের কুণ্ড আছে। আখরোট কাঠের শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প (Paper machine) প্রভৃতির জন্যেও অনন্তনাগের খ্যাতি আছে। পুরাতন ও ব্যবহৃত কম্বল ও লুই প্রভৃতির ওপর মোটামুটী সূচী শিল্পের সাহায্যে যে কাশ্মীরী গাব্বা তৈরী হয় অনন্তনাগ তার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র।

অনন্তনাগ থেকে বাস আরও ১৭ মাইল এসে কোকরনাগ পৌঁছল। পাহাড়ের কোলে একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণা এবং আশে পাশে নির্জ্জন সমতল-ভূমি ছাড়া এখানে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। শ্রীনগরের কাছাকাছি যাঁরা নির্জ্জনে পাহাড়ী আবহাওয়ায় ঝরণার ধারে তাঁবুতে বাসের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কোরতে চান—এ জায়গাটী তাঁদের পক্ষে ভাল। কোকরনাগ, আচ্ছাবল, ভেরীনাগ মৎস্য শীকারীদের প্রিয়। এখান থেকে ভেরীনাগ ৮ মাইল। শ্রীনগরে আসার পথে যাঁদের ভেরীনাগ দেখা সম্ভব হবে না, তাঁরা অনন্তনাগকে কেন্দ্র কোরে ভেরীনাগ, আচ্ছাবল উদ্যান, কোকরনাগ, আহরবল জলপ্রপাত এবং মার্ত্তণ্ডের মন্দির দেখতে পারেন। শ্রীনগর থেকে এ জায়গাগুলি বেশী দূর পড়ে। অনন্তনাগে থাকবার হোটেল ও ধর্ম্মশালা আছে শুনলাম।

কোকরনাগ থেকে অনন্তনাগ ফেরার পথে আচ্ছাবল গ্রামে বাস থামলো একেবারে এই মোগল উদ্যানের ফটকের সামনে। ইতিপূর্ব্বে যখন কাশ্মীর আসি, এ বাগানটি দেখা হয় নাই, তবে ধারণা ছিল নিশাদ বা শালিমারে দেখার পর এটী দেখার তেমন প্রয়োজন নাই, তা-ছাড়া রাজধানী থেকে অনেক দূরে বোলে এটী নিশ্চয়ই অযত্নরক্ষিত। কিন্তু ভেতরে ঢুকে বিস্মিত হোলাম এর সৌন্দর্য্যে। হেমন্তের হিমস্পর্শে উদ্যানটীর অপরূপ শ্রী যে অনেকখানি ম্লান হোয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা গেলেও—বাগানটী তখনও বিগত যৌবনা নয়, বরং যৌবনের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট সুষমা তার দেহের প্রতি রেখায় রেখায় যাই যাই কোরেও যেন রোয়ে গেছে।

বাগানের বাইরে বড় বড় বুড়ো চেনার গাছ। বয়স হোয়েছে বোলে বুড়ো বোল্লাম, কিন্তু বুড়ো বোলেই বেরসিক নয় ; বড় বড় পাতায় সবুজ রস কস্ কস্ কোরছে। বাগানটী পাঁচীল দিয়ে ঘেরা এবং এ অঞ্চলের মোগল আমলের সব পাহাড়ী বাগানের মতই কয়েকটী চত্বরে বিভক্ত। পেছনের বিরাট বপু পাহাড়টীর কোল থেকে বাগানটী ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। পাহাড়ের কঠিন পাথরের কোল থেকে অফুরন্ত ধারায় বেরিয়ে আসছে

নৌগৃহ ও শীকারা শ্রেণী

ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়
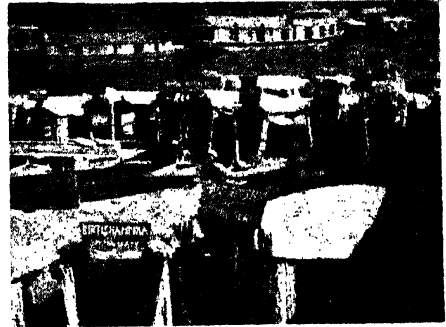
নির্ম্মল নির্ঝরণী। সেই জলধারাকে বাগানটার মাঝ ও দু'পাশ দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হোয়েছে। মাঝের জলধারাটী বিভিন্ন চত্বরের মাঝের বড় বড় অগভীর চৌবাচ্চাগুলিতে ফোয়ারার আকারে উৎক্ষিপ্ত হোয়ে আবার নীচের চত্বরে নেমে যাচ্ছে। মধ্য নালাটির দুধারে রং বেরংএর ফুলের কেয়ারী, তারপর সবুজ ঘাসের সমতল চত্বর ; তার মাঝে মাঝে বিচিত্রবর্ণের ফুলের মালঞ্চগুলি ; ঠিক যেন কারুকার্য্য করা কয়েকখানি কাশ্মীরী কার্পেট বিছান আছে বাগানখানির বুক জুড়ে।

সকলেই এখানে দুপুরের আহার সেরে নিলেন। গ্রামে কোন ভাল হোটেল নাই, কাজেই খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। চায়ের সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম কিন্তু খাবার ছিল না। মালীদের কয়েকজন চেনার পাতায় কয়েকটা আখরোট ভেঙ্গে উপহার

দিলে। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করায় বোল্লে বাজারে ডিমের ওমলেট্ ও কেক্ পাওয়া যাবে। একটা টাকা দিতে সে কিছুক্ষণ পর যা নিয়ে এল তাকে সুখাদ্য বলা চলে না; এজন্যে শ্রীনগর থেকে আহার্য্য সঙ্গে নেওয়া ভাল। বাগানে ফুল তোলা নিষিদ্ধ, কিন্তু মালীরদল সব বিদেশী যাত্রীদিকেই বেশ মুক্তহস্তে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছিল—যাত্রীরা কিন্তু বথশিসে সে পরিমাণে মুক্তহস্ত ছিলেন না। অবশ্য মালীদের এটা পোড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। বাগানটী ঢুকে ডানদিকের দেওয়ালের মাঝামাঝি আছে একটা ভাঙ্গা "হামাম" বা স্নানঘর। জাহাঙ্গীর নাকি এটী তৈরী করান। ওপর থেকে ঠাণ্ডা জলস্রোতকে মাটীর নলের সাহায্যে দেওয়ালের মাঝ দিয়ে এই স্নানঘরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছে। এটী একখানি ঘর নয়, অনেকগুলি ঘরের সমষ্টি। এক ঘরে নীচে কাঠ জ্বালিয়ে জল গরম করার ব্যবস্থা আছে, অন্য ঘর থেকে আসছে ঠাণ্ডা জল; দুটী ধারা এসে স্নানের চৌবাচ্চায় মিলেছে; প্রয়োজন মত ঠাণ্ডা ও গরম জল বাদশা ও বেগমরা এখানে মিশিয়ে নিতেন। ঘরগুলিও আবশ্যকমত গরম করা যেত। এখন অবশ্য শুধু এর কঙ্কালখানি দাঁড়িয়ে
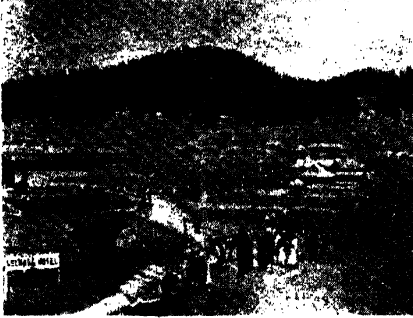
গুলমার্গ উপত্যকা
ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়

আছে। বাগানের মালিরাই কিছু বথশিসের আশায় এগুলি দেখায়, তারা সঙ্গে না থাকলে ঢুকতে ভয় হয় এমনি জীর্ণ এর অবস্থা। বিদেশীর দাক্ষিণ্য এদের দারিদ্র্যকে কিছু লাঘব করে। তাছাড়া এরা প্রসন্ন হোলে বাগানের ফোয়ারাগুলির জলের উচ্চতা ৪।৫ ফিট থেকে ১৭।১৮ ফিট হোতে পারে। পাহাড়ের কোলের মূল ধারাটীর জল সামান্য কয়েকখানা কাঠ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়; এরাই জানে তার কৌশল। বাগানের মধ্যের কয়েকটী প্রাচীন চেনার গাছকে আকবরের আমলের বোল্লে, বৃক্ষতত্ত্ববিদরা বোলতে পারবেন এর সত্যতা। সমগ্রভাবে বাগানটী চমৎকার, নিশাদ বা শালিমারের চেয়ে আয়তনে ছোট, কিন্তু সৌন্দর্য্যে খাটো নয়।

বাগানটীর ওপরেই সরকারী ট্রাউট মাছ পালন কেন্দ্র। স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন ধারাকে ছোট ছোট অনেকগুলি নালার মধ্যে দিয়ে চালান দেওয়া হোয়েছে। নালাগুলির ওপর জাল দেওয়া, মুখগুলিতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথক পৃথক নালায় রাখা আছে। সাধারণতঃ ৪।৫ বৎসর বয়স হোলে এগুলি বিক্রী করা হয়। অক্টোবরে ডিমপাড়ে বলে বিক্রী বন্ধ থাকে। বিক্রীর বাঁধা দর বিজ্ঞাপ্তির বোর্ডে লেখা থাকে। দর্শকরা গেলে পরিচারকের দল কিছু কিছু খাবার দিয়ে মাছের খেলা দেখায় যদিও বিজ্ঞাপন দিয়ে এটা নিষেধ করা আছে। নালাগুলি অগভীর, জল স্বচ্ছ কাজেই জলের ভেতরে সঞ্চরণশীল মাছগুলিকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। এদের বর্ণভেদে জাতিভেদ আছে—কোনটা কালো, কোনটা সোনালী, কোনটা ডোরাকাটা। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী হারওয়ানেও ট্রাউট মাছের পালনকেন্দ্র আছে, কিন্তু সেখানকার আয়তন সংকীর্ণ এবং ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই মাছগুলির আদি নিবাস স্কটল্যাণ্ড—মৎস্যাশী সাহেবলোক কাশ্মীরের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে এখানে এদের আবাসের ব্যবস্থা কোরেছে, ক্রমে এই সব প্রবাসীরা এখানের আদিবাসীতে পরিণত হোয়েছে। বদ্ধ জলে এরা বাঁচে না, বহমান স্রোতেই এদের জীবন, ঠাণ্ডা প্রয়োজন কিন্তু বরফ সইতে পারে না। এরা মাংসাশী জীব, ছোট ছোট মাছ এদের খাদ্য। এই সব কারণে এদের নাম ও দাম দুই ই বেশী খান দানী খানা হিসাবেও এদের খ্যাতি। আচ্ছা বলে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আবার বাস অনন্তনাগ হোয়ে পহলগামের রাস্তায় চোলল।

অনন্তনাগ থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে পাহাড়ের অধিত্যকার ওপর আছে মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাহাড়ে উঠে এটা দেখতে হয়, তার মত সময় হাতে না থাকায় এ মন্দিরটী দেখা এ যাত্রার সামিল নয়। পূর্ব্ববারে আমি এটী দেখেছিলাম, কাশ্মীরের অতীত স্থাপত্যকলার পরিচয় পেতে হোলে মার্ত্তণ্ডের মন্দির অবশ্য দ্রষ্টব্য। এত বড় মন্দির কাশ্মীরে আর একটিও নাই; এর প্রাঙ্গনের দৈর্ঘ্য ২২০ ফিট ও প্রস্থ ১৪২ ফিট। প্রাঙ্গনের মাঝে মন্দির, চারধারের পাথরের অলিন্দের খিলানের কয়েকটা এখনও দাড়িয়ে আছে। ৮৪টী পাথরের প্রকাণ্ড থামের ওপর মন্দিরের ছাদ। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস সম্রাট ললিতাদিত্য এর প্রতিষ্ঠাতা এবং এটী সূর্য্যদেবের মন্দির। কানিংহাম বলেন মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তিই ছিলেন, এবং এখানে জ্যোতিষগবেষণাগার ছিল। হয়ত সেই জন্যেই এর নাম মুখে মুখে দাঁড়ায় মার্ত্তণ্ডের মন্দির—কারণ সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র কোরেই গ্রহ নক্ষত্রের গণনা চোলত এখানে। ঐতিহাসিকেরা বলেন এ মন্দির ললিতাদিত্যের বহু পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা রামাদিত্য এবং তার স্ত্রী অমৃতপ্রভার নির্ম্মিত। পরে ৮ম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য এর সংস্কার করেন। এই বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেড় হাজার বছর আগেকার হিন্দুস্থাপত্য শিল্প এবং কারুকার্য্যের যে গৌরব স্মৃতি বহন কোরে আসছে তা দর্শকদের বিস্মিত করে।

বাস এসে দাঁড়াল ভাওয়াণে বা মাটনে। ইতিপূর্ব্বে যখন এখানে আসি এখানের বর্ত্তমান মার্ত্তণ্ডের মন্দির দেখি নাই। পাহাড়ের কোলেই মার্ত্তণ্ডের মর্ম্মর মন্দির তৈরী করিয়েছেন মহারাজ হরি সিং। মন্দিরটী তেমন বড় না হোলেও দেখতে ভাল। মন্দিরের পেছন থেকে আচ্ছাবলের মতই অবিরাম ধারায় জল বেরিয়ে এসে, সামনের একটী

প্রকাণ্ড সরোবরে সঞ্চিত হোয়ে, তার থেকে আবার একটী ধারায় প্রাঙ্গণের বাইরে বোয়ে যাচ্ছে ; পাণ্ডারা বলেন এই স্রোতধারা অমরনাথ গুহার নীচের অমর-গঙ্গা থেকে আসছে। সরোবরের মাঝেও একটী মার্ব্বেলের মন্দির—বোধহয় শোভার জন্যে। এই সরোবরের বা মচ্ছি-কুণ্ডর মত স্বচ্ছ জল কোথাও দেখেছি বোলে মনে হয় না। কাঁচের ধারের মত জল বোলে যে একটা উপমা আছে, এখানে এলে বোঝা যায় উপমাটা কত বাস্তব। কাঁচের ধারের যে গভীর সবুজ রং এখানের কুণ্ডের গভীর জলের রং ঠিক তেমনি। মচ্ছিকুণ্ডে অসংখ্য মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ এরা অবধ্য। মন্দিরে মার্ব্বেল পাথরের সূর্য্য-মূর্ত্তিটী বেশ সুন্দর। মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা আছে; পাণ্ডারাও যাত্রীদের নিজেদের বাড়ীতে আশ্রয় দেয় এবং এখানে পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করে। পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠলে এখান থেকে মার্ত্তণ্ডের সূর্য্য-মন্দিরও দেখার সুবিধা হয় আর কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পারিবারিক আচার ব্যবহার এবং এদেশী নিজস্ব খাবারের সঙ্গে যথা, গুচ্ছি, করমশাক্ প্রভৃতির সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়। অনেকে

ডালের পথে করণসিং বুগেভার্ড

ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়

মন্দিরের সামনের বড় চীনার বাগানটীতে তাঁবু ফেলে কিছু সময় এখানে কাটান। ভাওয়াণ থেকে এক মাইল দূরে 'বুমজু'তে (আজকাল সরকারী পুস্তিকায় লেখে Bhaumajo) কয়েকটী গুহামন্দির আছে ; এর মধ্যে একটী গুহা বেশ বড় (২০০ ফিটেরও বেশী লম্বা), ভেতরে অনেকখানি যাওয়া যায়। গুহাগুলি ক্রমশ: সরু হোয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে, এর একটীর মুখের কাছে এক তপস্বীর কঙ্কাল এখনও পড়ে আছে। কঠিন তপস্যায় তিনি রক্তমাংসের দেহ ছেড়ে চোলে গেছেন, হাড় ক'খানি আজও পড়ে আছে। এই গুহামন্দিরগুলিও পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে সৃষ্ট। বিস্তৃত লিদার উপত্যকার শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি এখান থেকে চমৎকার দেখায়।

এখান থেকে পহলগামের দিকে চোলাম। ধানের ক্ষেত, পাহাড় নদী ছাড়িয়ে ক্রমে একটী নদীর তীর ধোরে দু'টী উঁচু পাথুরে পাহাড়ের মাঝে লিদর উপত্যকায় ঢুকলাম। এই নদী থেকে একটী জলপ্রণালী পাহাড়ের গা দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হোয়েছে সেচনের জন্যে। পথে আইসমোকাম, বাটকোট, গণেশগাঁও প্রভৃতি কয়েকটী বড় গ্রাম পোড়ল। গণেশগাঁওএর কাছে একটী বিরাট গণেশ মূর্ত্তি ও কাশ্মীরের জনৈক ঋষি 'জনকে'র মন্দির আছে। বাটকোটে মুসলমান মালিকগণ অর্থাৎ প্রধানেরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অমরনাথের যাত্রার সময় ভোগ সরবরাহ কোরে থাকেন।

শ্রাবণের চতুর্থী তিথিতে শ্রীনগর থেকে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে অমরনাথের পতাকা নিয়ে শোভা যাত্রা সুরু হয়। প্রথম রাত্রি পামপুরে, দ্বিতীয় রাত্রি বৈজবেরা, তৃতীয় রাত্রি মাটনে কাটিয়ে নবমীর দিন আইসমোকাম হোয়ে দশমীতে পহলগামে পৌছায়। তবে ইদানিং যাত্রীদের অধিকাংশই শ্রীনগর থেকে 'অমরনাথ যাত্রার' সঙ্গে না এসে, পহলগাম পর্য্যন্ত বাসে এসে সেখান থেকে 'অমরনাথ যাত্রার' সঙ্গে যোগ দেন। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকখানি এসে ক্রমে বিস্তৃততর একটা উপত্যকায় এলাম, তার পরই পহলগামের বাড়ীগুলি চোখে পোড়ল। একটা হোটেলের সামনে বাস দাঁড়াল। পহলগামের তখন ভাঙ্গা হাট ; শীতের বরফান হাওয়ায় যাত্রীরা হাওয়া কেটেছেন, কাজেই দোকানদার হোটেলওয়ালাদের প্রায় সবাই শ্রীনগর চোলে গেছে। অধিকাংশ দোকানই বন্ধ। মাঝে মাঝে দু' চারটে মুদিখানা কি দু' একটা পশমের জিনিষের দোকান তখনও আশায় ভর কোরে দরজা খুলে রেখেছে। মে থেকে সেপ্টেম্বর এখানের মরশুম, তবে অমরনাথ যাত্রার সময় আগষ্ট (শ্রাবণী পূর্ণিমা) মাসই বিশেষ জমজমাট। আমাদের ধারণা ছিল অমরনাথ দর্শনের দিন বৎসরে মাত্র একদিন—শ্রাবণী পূর্ণিমা ; কারণ আমরা যখন ১৯৩০ সালে এখানে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম একই দিনে যাত্রীরা পহলগাম থেকে যাত্রা কোরে একই দিনে ফিরে এসেছিলেন। সঙ্গের দোকান-পাট, সরকারী কর্ম্মচারী, ডাক্তারখানা সবই যাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া আসা কোরেছিল। এবার শুনলাম শ্রাবণী পূর্ণিমা দর্শনের প্রশস্ত দিন বটে, কারণ ঐ দিন অমরনাথ লিঙ্গ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন এবং অমরনাথ 'যাত্রা' অমরনাথে পৌছায়, কিন্তু তার পূর্ব্বে বা পরে দর্শনের কোন বাধা নাই। জুন মাসে অথবা সেপ্টেম্বর মাসেও অমরনাথ দর্শন করা যায়, অবশ্য তখন যাত্রীর সংখ্যা কম কাজেই যাত্রার সব ব্যবস্থা নিজেদের কোরতে হয়, পথের দুর্গমতাও বেশী থাকে।

পহলগাম থেকেই অমরনাথ যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় ঘোড়া, কুলী, তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা কোরতে হয়, কাজেই অমরনাথ যাত্রার কাছাকাছি সময় পহলগ্রাম সরগরম থাকে। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিজলী, মোটর হোটেল এবং সহরের সব সুবিধা সমন্বিত থাকায় বিদেশী বিলাসীদের কাছে গ্রীষ্মকালে এই পার্ব্বত্য সহরটী বেশ প্রিয়। এর উচ্চতা ৭২০০ ফিট, সহরের প্রায় এক মাইল আগে (অমরনাথের দিকে) দু'টী নদী এসে মিলেছে, এবং পহলগ্রামের নীচে দিয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে গেছে। একটী নদী (দুধগঙ্গা) আসছে অমরনাথের পথে শেষ নাগ হ্রদ থেকে

বেরিয়ে ; অপরটী কোলাহাই হিমবাহের তুষার থেকে। এই মিলিত নদী" লিদ্দর পহলগামের একটী বিশেষ আকর্ষণ, এর তীরে ছোট ছোট সমতল উপত্যকাগুলিতে বাগান, বাড়ী, স্নানের ঘাট ইত্যাদি আছে। এখানের সব বড় হোটেলগুলিই কয়েকদিন আগে বন্ধ হোয়েছে, দু'চারটী রেস্তোঁরা খোলা ছিল. তারই একটীতে, বৈকালিক চা পান হোল। এখানের বিদ্যুৎ এখানেই জলধারা থেকে উৎপন্ন হয়। পহলগাম থেকে একটী পথ গেল দুধগঙ্গার তীর ধোরে চন্দনওয়ারী (৮ মাইল, ৯৫০০ ফিট উঁচু) বায়ুযান (৯ মাইল, প্রায় ১৩০০০ ফিট) হোয়ে—১৪৭০০ ফিট মহাগুণাস 'পাস' চড়াই কোরে পঞ্চতরণী (৮ মাইল ১২০০৩ ফিট) এবং সেখান থেকে কয়েক মাইল তুষারের ওপর দিয়ে গিয়ে অমরনাথ গুহা (৫ মাইল, পহলগাম থেকে ২৮ মাইল)—এবং আর একটী পথ কোলাহাই হিমবাহ (১৪০০০ ফিট) বা তুষারের অঞ্চল। কোলাহাই গিয়ে ফিরে আসতে প্রায় তিনদিন লাগে, আর অমরনাথ যাওয়া আসায় লাগে প্রায় ৫দিন। পহলগাম থেকে অমরনাথে যাত্রার পথে চড়াই আরম্ভের আগে যাত্রীরা প্রথম রাত্রি চন্দনওয়ারীতে কাটান ; দ্বিতীয় রাত্রি বায়ুযানে ; তৃতীয় রাত্রি পঞ্চতরণীতে কাটিয়ে অমরনাথ দর্শন সেরে ফিরে রাত্রি কাটান বায়ুযানে এবং তার পরদিন পহলগামে ফিরে আসা যায়।

অমরনাথের পথে চন্দনওয়াড়ীর পর থোড়া চড়াই কোরে জজপাল পাহাড়ের মাথায় এসে খানিকটা সমতল রাস্তা ; তারপর কিছু এগিয়ে প্রায় হাজার ফিট নীচে চোখে পড়ে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা গভীর নীল শেষনাগ হ্রদ। সমুদ্র থেকে ১২৭৩০ ফিট উঁচুতে এই অপূর্ব্ব হ্রদটী (পহলগাম থেকে ১৫ মাইল)। জুন পর্য্যন্ত এর জল তুষারে আচ্ছন্ন থাকে, কাজেই জুলাই আগষ্টেও নীলজলের মাঝে মাঝে শ্বেত-রাজহংসের মত বরফের বহু টুকরো ভাসতে দেখা যায়। পাহাড়ের বেষ্টনীর এক ফাঁক দিয়ে এর জলধারা বেরিয়ে যাচ্ছে দুধগঙ্গারূপে। যাঁরা পূণ্যকর্ম্মের কোন অঙ্গটী বাদ দিতে চান না, তাঁরা তীর থেকে হাজার ফিট নেমে সেই হিমশীতল জলে স্নান করেন। পাহাড় ঘেরা এমনি আরো কয়েকটী হ্রদ কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছে—কোনসার নাগ, গঙ্গাবল, তারসার, মারসার, (১২০০০ ফিট উঁচু) পানগং। ১২০০০ ফিট উঁচুতে কোনসারনাগ হ্রদে ও গ্রীষ্মে তুষারের ভাসমান স্তূপ সমতলের অধিবাসীদের আনন্দে অভিভূত করে। শেষনাগের কাছ থেকেই কৈলাস পাহাড় (এ কৈলাস মানস সরোবরের কাছে কৈলাস নয়) দেখা যায়। শেষনাগের পরই পাহাড়ের মাথায় উঁচু অধিত্যকায় বায়ুযান,—এ যাত্রার মধ্যে কঠিনতম রাত্রি হোল বায়ুযানের। এই অধিত্যকাটীতে প্রায়ই খুব জোর বায়ু চলে এবং তুষার ঝঞ্ঝাও এখানের স্বাভাবিক ঘটনা। কোনবার তুষার ঝঞ্ঝা বা তুষারপাত না হোলে যাত্রীদের সেটা বিশেষ সৌভাগ্য মনে কোরতে হবে। এই শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে ভেসলিন, চা কফি, বা কিছু ব্র্যাণ্ডিও রাখা ভাল এবং ভাল ওয়াটার প্রুফে জিনিষপত্র ঢেকে রাখাও দরকার। রাত্রে হঠাৎ তুষার ঝঞ্ঝা সুরু হোলে নিরাশ্রয় সন্ন্যাসীর দল বা স্বল্পাশ্রয় যাত্রীরা প্রাণরক্ষার জন্যে অন্যের তাঁবুতে ঢুকে পড়েন—এমন ঘটনাও বিরল নয়। বায়ুযান থেকে ৮ মাইল এগিয়ে পঞ্চতরণীর পর কয়েক মাইল তুষারমণ্ডিত পথ। এই তুষার বরণের অন্তরালে প্রবহমান পাঁচটী স্রোতধারা অদূরে এক হোয়ে মিশে হোয়েছে রামগঙ্গা। এ উপত্যকাটীর একদিকে ভৈরব ও অন্যদিকে কৈলাসপর্ব্বত। পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির নির্ম্মিত এক বিরাট গুহায় আছেন অমরনাথের তুষার লিঙ্গ এবং গণেশ ও পার্ব্বতীর তুষার মূর্ত্তি। অমরনাথের মূর্ত্তি যে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে কমে বাড়ে একথা জনৈক কাশ্মীরী সরকারী কর্ম্মচারী—যিনি বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে গেছেন—বোল্লেন ; কাজেই এটা শুধু কিংবদন্তী নয়। এখানের চারিদিকের পাহাড় প্রায় তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তবু এই কঠিন আবহাওয়ায় যে কি কোরে ছাইরংএর কয়েকটা পায়রা উড়তে দেখা যায় এটা বিস্ময়ের বিষয়। অনেকে বলেন পাণ্ডারা এগুলি সঙ্গে নিয়ে যায়—সরল বিশ্বাসী যাত্রীদের ঠকাবার জন্যে ; কিন্তু এমন একাধিক-লোকের সঙ্গে দেখা হোয়েছে যাঁরা যাত্রার সময়ের ১৫।২০ দিন আগে বা পরে অমরনাথ গেছেন ও তাঁরাও এই পায়রা জোড়া দেখেছেন ; কাজেই—অবিশ্বাসী মন নিয়ে এখানে পায়রাগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চোলবে না। এই পায়রা যুগলের দর্শন না পেলে অমরনাথ যাত্রা সফল হয় না ভক্তদের ধারণা। অমরনাথ সম্বন্ধে কাশ্মীরী পৌরাণিক কাহিনী এই—সকল দেবতারা অমরত্বের প্রার্থনা নিয়ে মহাদেবের কাছে এলেন। মহাদেব জটা নিংড়ে তাঁদের জন্যে যে জলধারা বের কোরলেন তাই থেকে হোল অমরাবতী নদী, আর তার কয়েক ফোঁটা এদিকে ওদিকে যা ছড়িয়ে পড়ল তাই থেকে এই পাহাড়ের ভেতর সৃষ্টি হোল মহাদেব, পার্ব্বতী আর গণেশের তুষার মূর্ত্তি। এই পায়রা জোড়ার উপাখ্যান হোল এই যে, একদিন শিবের কোলে মাথা রেখে পার্ব্বতী মহাদেবের মুখ থেকে শুনছিলেন অতি গুহ্য এক তন্ত্র। প্রহরায় ছিল রুদ্রের বিশ্বস্ত দুই গণ অর্থাৎ নন্দী ভৃঙ্গী। গুহ্য কথা শুনবার কৌতূহল দমন না কোরতে পেরে—নন্দীভৃঙ্গী আড়ি পেতে সেই গুহ্য কথা শুনছিল। মহাদেব তা জানতে পেরে ক্রোধে এদের শাপ দিয়ে পায়রা কোরে দিলেন। আর একটী প্রবাদ এই যে, মহাদেবের কোলে শুয়ে পার্ব্বতী এই গুহ্য কথা শুনছিলেন আর হুঁ হুঁ কোরে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন. ক্রমে এক সময় দেবী ঘুমিয়ে পোড়লেন, কিন্তু ভোলানাথ আপন মনে বোলেই চোলেছেন। সেখানে ছিল দুই কপোত কপোতী, তারাও হরপার্ব্বতীর অজ্ঞাতে শুনছিল এই গুহ্য মৃত্যুনাশী তন্ত্র। সবটুকু সোনার লোভে পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে তারাই হুঁ বলতে লাগলো এবং সব শুনলো। পরে মহাদেব দেখলেন পার্ব্বতী নিদ্রিতা, কিন্তু তখন এই কপোত কপোতী যুগল মরনজয়ী মন্ত্র শুনে অমর হোয়ে গেছে। এরা নাকি অন্য সময় মানস সরোবরে থাকে, অমরনাথ পূজার সময় এখানে আসে। দক্ষিণভারতে চিঙ্গলপুটের কাছে পক্ষীতীর্থেও এমনি ধারা দু'টী সোনালী চিল (কেউ বলেন ধূসর, আমার সোনালী ও গোলাপী মনে হয়েছিল।) বহু শতাব্দী ধোরে দৈনিক ভোগের সময় আসে। বেদের অনেক অংশ নাকি অমরনাথের গুহায় রচিত বোলে কথিত।

এখন পঞ্চতরণী থেকে সহজতর পথে অমরনাথ যাবার ব্যবস্থা হোয়েছে। পূর্ব্বে ভৈরব পাহাড় চড়াই কোরে—(১৩৫০০ ফিট) ভৈরোঘাট থেকে খাড়া দুর্গম উৎরাইএ নেমে অমরনাথ যেতে হোতো। এই রাস্তায় পড়ে অমরাবতী বা অমরাওতী নদী। অমরনাথের গুহাটী দক্ষিণমুখী, এর দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট প্রস্থ ৫৫ ফিট, এবং মাঝের উচ্চতা ৪৫ ফিট। এ থেকে বোঝা যাবে এই স্বাভাবিক গুহাটীর বিরাটত্ব। প্রায় সমস্ত গুহাটীরই ছাদ থেকে অল্প সল্প জল চুঁইয়ে পড়ে, সেগুলি গিয়ে জমা হয় রামকুণ্ড নামে একটী ছোট কুণ্ডে। গুহার ভেতরে অমরনাথ, পার্ব্বতী ও গণেশের তুষার মূর্ত্তি আছে। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা ১২৭২৯ ফিট।

ফেরার পথে অধিকাংশ যাত্রীই পূর্ব্বপথ ধোরে ফিরে আসেন ; যাঁরা নূতনত্বের সন্ধানী তাঁরা কিছু কষ্টকর কিন্তু হ্রস্বতর পথ অষ্টানমার্গ দিয়ে চন্দনওয়ারী ফেরেন। পঞ্চতরণী থেকে ২ মাইল এসে এই পথটী ধোরতে হয়। এ পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও শুনেছি চমৎকার, এবং চন্দনওয়াড়ী পর্য্যন্ত দূরত্ব ২ মাইল কম।

শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—"শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন।"

শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখেছেন—"মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য বাঙলা দেশে এসে ছোট ভাই-বোনদের খবর নিয়ে আত্মীয় বন্ধুদের দেখাশুনা করে শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক যাওয়া-আসার মাঝে হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায় দরিদ্রা ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুর নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।"

গিরিনবাবুর কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোথাকার মেয়ে, কার মেয়ে, সে মেয়েরই বা নাম কি—এ সব সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন এবং বাঙলা দেশে যাওয়া-আসার মাঝে একসময় হিরণ্ময়ী দেবী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ রমণীকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন—নরেনবাবু এ কথা বললেও শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে যে কোথায় কি ভাবে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে তাঁর লেখা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে বাঙলায় এসেই হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গিনী করেছিলেন। নরেনবাবু বলেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী মেদিনীপুরের কৃষ্ণদাস অধিকারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। নরেনবাবু এই পর্যন্ত বললেও তিনি কিন্তু তাঁর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের প্রথম বিবাহের সেই কাহিনীটির ন্যায় শরৎচন্দ্রের হিরণ্ময়ী দেবীকে গ্রহণ করার কোনও বিবরণই এবার আর দেন নাই।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার এই যে, নরেনবাবু এবার কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিবাহের কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন, শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত বই দুখানির কথাও মনে পড়ে। ব্রজেনবাবু তাঁর এই দুখানা বইয়েই হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বলে গেছেন। কোথাও স্ত্রী বলেন নি, বা শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এরূপ কোন কথা লেখেন নি। জীবন-সঙ্গিনী শব্দের একটা অর্থ স্ত্রী হয়, কিন্তু স্ত্রী ছাড়া জীবন-সঙ্গিনী অর্থে শুধু জীবন-সঙ্গিনীও হতে পারে। তাছাড়া ব্রজেনবাবু যে ইচ্ছা করেই স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছেন, একথা তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন। তিনি বলতেন—শরৎচন্দ্রের এই বিবাহ ঠিক আমরা যাকে সামাজিক বিবাহ বলি, তা ছিল না। অতএব আমি তাকে বিবাহ বলতে পারি না। এই জন্যই আমি স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছি।

নরেনবাবু লিখলেন, সঙ্গিনী। ব্রজেনবাবু বললেন, জীবন-সঙ্গিনী। এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সত্যই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন নি? শুধু জীবন-সঙ্গিনী হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন?

নরেনবাবু লিখেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী অসহায় দরিদ্রা ব্রাহ্মণ রমণী। তাহলে কি শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে যখন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন হিরণ্ময়ী দেবীর বাপ-মা কি নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ সহায় ছিলেন না? আর একটা কথা নরেনবাবু বলেছেন—ব্রাহ্মণ রমণী। রমণী অর্থে আমরা সাধারণত অল্প-বয়স্কা না বুঝে একটু বেশী বয়সের মেয়েদেরই বুঝে থাকি। শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে যখন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন, তখনকার দিনে মেয়েরা আজকের দিনের মত বেশী বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকত না। বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরে। নরেনবাবুর কথা মতই হিরণ্ময়ী দেবী ছিলেন মফঃস্বলের মেদিনীপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। নরেনবাবু, শরৎচন্দ্র এক "ব্রাহ্মণ রমণীকে" সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলায়, আবার প্রশ্ন ওঠে—তাহলে হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স তখন কত ছিল? তিনি কি তখন কুমারী ছিলেন? না বিধবা ছিলেন? বিধবার প্রশ্ন এই জন্য উঠতে পারে যে, কেন না কানাইলাল ঘোষ শরৎচন্দ্রের বিবাহ-বিষয়ক তাঁর মনগড়া অলীক কাহিনীটির মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিধবা হিসাবেই বর্ণনা করে গেছেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের বিয়ের কাহিনী নিয়ে জনশ্রুতিরও অন্ত নেই!

যাই হোক্ শরৎচন্দ্রের এই হিরণ্ময়ী দেবীকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে, হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখে এবং শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে যা শুনেছি, এখানে আমি এখন সেই কথাই বলছি—

হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুরে গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কৃষ্ণ চক্রবর্তী। হিরণ্ময়ী দেবীর অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। কৃষ্ণবাবুর এক বন্ধু রেঙ্গুনে থাকতেন। সেই সূত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কৃষ্ণবাবু কন্যাকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণবাবুর পরিচয় হয়, এবং এই পরিচয়ের ফলেই কৃষ্ণবাবু রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স ছিল ১৪ বছর।

কন্যার বিয়ের পর কৃষ্ণবাবু দেশে তাঁর গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। কৃষ্ণবাবুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রতি মাসে ১০৲ টাকা করে পাঠিয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে

থাকার সময়ও প্রতি মাসে তাঁর শ্বশুর মশায়কে ঐ ১০৲ টাকা করেই পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময়ই তাঁর শ্বশুর মশায় মারা যান। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন যেদিন তাঁর পাঠানো মণিঅর্ডারের টাকা ফেরৎ আসে। ঐ দিনই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানান।

হিরণ্ময়ী দেবী রেঙ্গুন থেকে এসে বাজে শিবপুরে থাকার সময় একবার তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর মেজ-দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তাঁকে নিজের ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। এই হিসাবে রামকৃষ্ণবাবু তাঁর জ্যাঠাইমাকে জ্যাঠাইমা না বলে মা বলেই ডাকতেন। রামকৃষ্ণবাবুর বয়স এখন প্রায় ৪০ বছর। এখনও তিনি তাঁর জ্যাঠাইমার কথা বলতে গেলে মা বলেই উচ্চারণ করে থাকেন।

রামকৃষ্ণবাবু তাঁর এই মা অর্থাৎ জ্যাঠাইমার কাছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়ে সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন, সে সম্বন্ধে বলেন—শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে বাসা করলে অনিলা দেবী ভাই-এর বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে একদিন তিনি কথায়-কথায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়েটা কিভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে হিরণ্ময়ী দেবী অনিলা দেবীকে বলেছিলেন, হিরণ্ময়ী দেবী যখন রেঙ্গুনে কেবলমাত্র তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হন। দ্বারস্থ হয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন—আমার মেয়েটির এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। একে সঙ্গে নিয়ে একা এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় থাকি! আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তো গরীব ব্রাহ্মণের বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।

হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা শেষে শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও, তিনি বিশেষ করে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যেন, তিনিই তাঁর কন্যাটিকে গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন।

এই গেল আমার শোনা কথা। এ দিকে বেহালার জমিদার শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ও কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে কথা-প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে শুনে মণিবাবু ১৩৬১ সালের আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'হিরণ্ময়ী দেবী' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

"কেন জানিনা এক দুর্বল মুহূর্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি, আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিলো, রেঙ্গুনে না এখানে? এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমি নিজে বহুদিন পূর্বে একবার দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন। এর বেশী কিছু আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেন নি। আজকাল নানা কাগজে শরৎ-প্রসঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মন্তব্য পড়ি, তাই এইটুকু লেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না; এখন পাঠক-সমাজ নিজেরাই এর সত্যাসত্য নির্ণয় করে নেবেন। বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে যান। বললেন, আমার বাবা বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মণিঅর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন। আমি লেখাপড়া জানিনা, বাবার হাতের সই করা টাকা পাওয়ার রসিদ যখন ফিরে যেতো রেঙ্গুনে, তখনই জানতাম যে, বাবা আমার ভালো আছেন—এমন অনেক দিন হয়েছিলো। তারপর একদিন টাকার রসিদ না এসে টাকা সমেত মণিঅর্ডার তোমার দাদার নামে ফিরে এলো। সেইদিনই জানলাম বাবা আমার আর ইহজগতে নেই। সেদিন বেশ মনে পড়ে আজও, কী কান্নাই না কেঁদেছিলাম আমি। ১৪ বছরের মেয়ে বিয়ে করে তোমার দাদা এনেছিলেন—এই দীর্ঘদিন আর বাবাকে দেখিনি; শুধু আশা করে বসে থাকতাম বাবার হাতের সই করা রসিদখানির জন্য। সইটাই তাঁর বার বার দেখতাম—হ্যাঁ বাবারই সই, তিনি ভাল আছেন, কত আনন্দই না পেতাম। তারপর তাও একদিন শেষ হয়ে গেল।"

এখানে মণিবাবুর লেখায় দেখা যাচ্ছে—(১) শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে মেদিনীপুরে বিয়ে করেছিলেন এবং তারপর তিনি তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যান। (২) হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আর দেখেন নি এবং রেঙ্গুনে থাকবার সময়েই তিনি তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন।

এদিকে হিরণ্ময়ী দেবী কিন্তু আমাকে বলছেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ তিনি বাজে শিবপুরে থাকবার সময়েই জানতে পেরেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে বলছেন, রেঙ্গুনেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা থেকেও জানা যাচ্ছে হিরণ্ময়ী দেবী অনিলা দেবীকেও বলেছিলেন, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অনিলা দেবীর মেজ-জা সুকুমারী দেবীর কাছে শুনলাম, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকেও একবার বলেছিলেন যে, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

এখন মণিবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে শুনেছেন বলে যা লিখেছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর বিয়ের

সম্বন্ধে মণিবাবুর কাছে এক রকম কথা বলেছেন, আবার আমার কাছে, অনিলা দেবীর কাছে এবং সুকুমারী দেবীর কাছে আর এক রকম কথা বলেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুকে কি বলেছিলেন জানি না। তবে কিন্তু তাঁকে সেদিন সামতাবেড়েয় মণিবাবুর এই লেখার কথা শোনালে তিনি প্রতিবাদ করে আমাকে বললেন যে, আমাকে যা বলছেন তাই ঠিক।

হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে যখন এই কথা বলেন, তখন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় তাঁর দিদিদের বাড়ীর কাছে গিয়েই বাড়ী করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের দিদির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর দিদির এই দেওর-পোরাই হিরণ্ময়ী দেবী যখন সামতাবেড়েয় থাকেন, তখন তাঁর দেখাশোনা করেন।

মণিবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র নিজেও নাকি তাঁকে একদিন বলেছিলেন যে, তিনি মেদিনীপুরে যখন ছিলেন সেই সময় হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন।

এখন শরৎচন্দ্র মণিবাবুকে সত্য কথা বলেছিলেন কিনা এবং হিরণ্ময়ী দেবীও মণিবাবুকে এই কথাই বলেছিলেন কিনা আর যদি বলেই থাকেন, তাহলে কেনই বা বললেন, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস্ করা যায় কিনা দেখা যাক্।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন তাঁরা জানেন, তিনি মজা উপভোগ করবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য করে কেমন সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে অথবা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে গল্প করে যেতেন।* আমার মনে হয় মণিবাবুর কাছে শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটিও ঐ ধরণের একটি সত্যমিথ্যায় জড়ানো কাহিনী।

এখানে শরৎচন্দ্রের মেদিনীপুরে থাকার কাহিনীটিকে আমি সত্য বলে মনে করি না। কারণ শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরে আবার থাকলেন কখন? কলকাতায় কোনও চাকরী না পেয়ে অর্থোপার্জনের আশায় শরৎচন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে যান। রেঙ্গুনে তিনি ১৪ বছর ছিলেন। এই ১৪ বছরের মধ্যে বার তিনেক মাত্র চাকরী থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কখন যে আবার মেদিনীপুরে গিয়ে থাকলেন, তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে মণিবাবুর—শরৎচন্দ্রের মেদিনীপুরে থাকার সময়—কথাটাকে এইভাবে ধরা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসে হয় তো দু'এক দিনের জন্য বা অল্প কয়েকদিনের জন্য মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথায় "মেদিনীপুরে যখন ছিলেন" এর ভাব ঠিক প্রকাশ পায় না।

এই তো গেল শরৎচন্দ্রের কথা! এখন প্রশ্ন ওঠে, মণিবাবুর কথা সত্য হলে হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুকে—মেদিনীপুরে বিয়ে হয়েছিল একথা বলতে গেলেন কেন? এ সম্পর্কে আমার মনে হয়, মণিবাবু হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বিয়ের কথা প্রশ্ন করেই, তিনি শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা কথাটি অর্থাৎ মেদিনীপুরে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, হয়ত এই কথাটি হিরণ্ময়ী দেবীকে শুনিয়েছিলেন। তাতেই বোধ হয় হিরণ্ময়ী দেবী নির্বিবাদে তাঁর স্বামীর কথাই সমর্থন করেছিলেন।

এবার আর একটা কথা, মণিবাবু বলেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আর দেখেন নি এবং মণিঅর্ডারের টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল, শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন। মণিবাবুর একথা ঠিক নয়। কারণ হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আরও দেখেছেন এবং টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে যখন অবস্থান করছিলেন সেই সময়েই।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁরা উভয়েই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে দেখেছেন। অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন—শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মহাশয়কে যে টাকা মণিঅর্ডার করতেন, অনেক সময় পোষ্টঅফিসে তিনিই মণিঅর্ডার করে আসতেন। শরৎচন্দ্রের পুস্তকের প্রকাশক ও তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন যে, শরৎচন্দ্রের নির্দেশক্রমে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ভূতনাথবাবু একবার হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা তখন বেঁচেছিলেন। অতএব মণিবাবু যে লিখেছেন, হিরণ্ময়ী দেবী রেঙ্গুনে থাকার সময় মণিঅর্ডারের টাকা ফিরে যাওয়ায় তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেন, তা ঠিক নয়।

এখন কথা হচ্ছে—মণিবাবু বলেছেন, হিরণ্ময়ী দেবীর মুখ থেকে শুনে তিনি এই কথা লিখেছেন। তাহলে হিরণ্ময়ী দেবীই কি তাঁকে এই কথা বলেছিলেন? হিরণ্ময়ী দেবী যদি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে মণিবাবুর কাছে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আর মণিবাবু যা লিখেছেন, হুবহু ঠিক এই কথাগুলিই হিরণ্ময়ী দেবী যদি না বলে থাকেন, তাহলে মণিবাবু শুনতে হয় তো কিছু ভুল করেছেন। মণিবাবুর শুনতে একটু আধটু গোলমাল হওয়াটাও একেবারে অসম্ভব নয়। কেননা মণিবাবু তাঁর এই প্রবন্ধেই এক জায়গায় লিখেছেন—

"বৌদি বললেন, মণি মৃত্যুঞ্জয়কে চিনতে তো? জানতাম বটে এই লোকটি দাদার কাছে অনেক সময় থাকতেন। বললেন, দেশের বাড়ীতে আমি তখন একাটি থাকি, হঠাৎ একদিন মৃত্যুঞ্জয় এসে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধরে কী কান্না, পা কিছুতেই ছাড়বে না। আমি ভাই পা ধরে কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। বললে যে, অমু (অমল)* তাকে কি এক ব্যাপারে জেল দেবে; তিনি একছত্র লিখে দিলেই আর তার জেল হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বললে সে ও শেষ পর্যন্ত একখানা সাদা কাগজে আমার সই করিয়ে নিয়ে গেল যেন অমুকে আমি জানাচ্ছি যে, মৃত্যুঞ্জয়কে জেলে দিও না। ওমা, সত্যিই তো

* শরৎচন্দ্রের এই স্বভাবের কথা নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আমি গত শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

* শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেচারা জেলে যাবে, আমি লিখে দিলে যদি সে রক্ষা পায় তো কেন দেবো না। 'আমার কাছে তখন জনাকয়েক ছোট জাতের মেয়ে বসেছিল, তারা সবই দেখছিল ও শুনছিল। মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর তারা সকলেই আমাকে বিরক্ত হয়ে বললে— বড়মা আপনি সাদা কাগজে সই দিলেন কেন? ওঁর যদি কোন বদ মতলব থাকে? অনেক পরে অবশ্য বুঝলাম যে, কাজটা হয় তো ভালো হয়নি আমার।'

অমু কাছেই আমাদের বসেছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে মৃত্যুঞ্জয় সেই সাদা সই করা কাগজে খানকয়েক দাদার অপ্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্ব বাজারে কয়েক দিনের মধ্যেই পাঁচশত টাকায় বিক্রি করেছিল। এখন বুঝলাম যে, সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্বে চলে গেছে।"

এখানে মণিবাবুর—"খানকয়েক দাদার অপ্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্ব বাজারে কয়েক দিনের মধ্যেই পাঁচশত টাকায় বিক্রি করেছিল" এই কথাটির মধ্যেও শোনার কিছু গোলমাল আছে। কেননা শরৎচন্দ্রের খানকয়েক অপ্রকাশিত গ্রন্থের কথা অমলবাবু বলেন নি এবং বলতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের খানকয়েক অপ্রকাশিত গ্রন্থ আদৌ নেই, আর থাকলেও সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে ইতিপূর্বে কোন কারণেই যেতে পারে না। শরৎচন্দ্র একে তো লেখায় অত্যন্ত কুঁড়ে ছিলেন এবং অল্পই লিখতেন। আর তাঁর বই লেখা সম্পূর্ণ হলেই প্রকাশকরা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করতেন। তাই শরৎচন্দ্রের খানকয়েক অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে না। আর থাকলেও এবং 'চোরাই মাল' হিসাবে বিক্রি করলেও মাত্র পাঁচশ টাকায় শরৎচন্দ্রের খানকয়েক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির স্বত্ব বিক্রয় হয় না। বেশ কয়েক হাজার টাকাই দাম হ'ত। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয়ের মত চতুর লোক, যে সাদা কাগজে হিরণ্ময়ী দেবীর সই আদায় করে আনে, সে কি আর শরৎচন্দ্রের খানকয়েক অপ্রকাশিত বই পাঁচশ টাকায় জলের দরে বিক্রি করে!

তবে, শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যে আদৌ নেই তা নয়। আমি যতদূর জানি, শরৎচন্দ্রের একখানি গ্রন্থ আজও অপ্রকাশিত রয়েছে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গা লিখেছেন—

"...'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা—অনেক বন্ধু বান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া গেল না। এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা। বইখানা কি করিলেন তিনিই জানেন,—কিন্তু চাহিতে ভরসা হয় না—তাঁর সিঁদুর-মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাইরে—মহাপুরুষ—ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা।"

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি, এই ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা আজও বেঁচে আছেন এবং তাঁর ঝোলার মধ্যে শরৎচন্দ্রের সেই গ্রন্থটি আজও ঠিক রয়েছে। এই ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা অধিকাংশ সময়ই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। কখন কোথায় যে থাকেন জানা যায় না। গত বৎসর বর্ধমান জেলার এক স্থানে গঙ্গার তীরে এক শ্মশানে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঐ গ্রন্থটির ন্যায় সব সময়ই পাঁচটা মড়ার মাথা আছে, সেই পাঁচটা মড়ার মাথার উপর বসে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করে তিনি ধ্যান করে থাকেন। এই তান্ত্রিক সাধুর কথা শুনে গত বৎসর আমি খুঁজে খুঁজে তাঁর সেই শ্মশানের অস্থায়ী আশ্রমে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম—তিনি কয়েকদিন আগেই প্রয়াগে কুম্ভমেলায় চলে গেছেন। প্রয়াগ হয়ে হরিদ্বার ইত্যাদি কোথায় যে যাবেন তার কোন ঠিক নেই। সেই থেকে এই তান্ত্রিক সাধুর খোঁজ করি, কিন্তু আজও তাঁর কোন খোঁজ পাই নি।

যাক্, যে কথা বলছিলাম— মৃত্যুঞ্জয় শরৎচন্দ্রের খানকয়েক অপ্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্ব পাঁচশ টাকায় বিক্রি করেছেন—মণিবাবু এ কথাটা ভুল শুনেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা আসল কথাটা হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প একত্র করে মৃত্যুঞ্জয় শরৎচন্দ্রের একটি গল্প-সংকলনের বই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এখানে মণিবাবু "শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত গোটা কয়েক গল্পের" বদলে "শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত খানকয়েক গ্রন্থ" এই লিখে ভুল করেছেন। (ক্রমশঃ)

জীবন দর্শন

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

আমি তো দেখেছি জীবন ছুটিছে
শত জীবনের পিছে,
সসীম রঙ্গে অঙ্গ আবরি
অসীম নীলের নীচে!
মহা-জীবনের পারাবারে ওঠে
কত না ঢেউ!
জীবন-তরণী ডোবে তরঙ্গে
হেরে না কেউ!

শুধু মিশে যায়, আপনা হারায়
ভাবিছে সকলি মিছে।
পুনঃ ভাবে মন, অলিক স্বপন
হয় তো নয়!
মরণে জীবন মহা জীবনের
গাহিছে জয়।
বুদ্বুদটিকে উর্ম্মি-বলয়
পিছনে আহ্বানিছে।

প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি রাজ্যসভায় শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সীর 'অবাঞ্ছিত ফিল্ম্' সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় চিত্র-ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। শ্রীভাসান বলিয়াছেন—'কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড ছবি দেখিয়া ছাড়পত্র দেওয়ার পর প্রদর্শিত কোন চিত্রকেই অবাঞ্ছিত বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, সেন্সর বোর্ড অবাঞ্ছিত অংশ ছাট্‌কাট করার পর চিত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কাজেই শ্রীমতী মুন্সীর অভিযোগ কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না।' শ্লীল, অশ্লীল, বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত সর্ব্বপ্রকার শব্দ-রসকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু কাহিনী যেখানে রসোত্তীর্ণ সেখানে একথা খাটে না। এতদ্‌প্রসঙ্গে বসুশ্রী সিনেমার বার্ষিক উৎসবের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিলাম।

* * * *

গত ১৯শে ডিসেম্বর বসুশ্রী চিত্রগৃহের ৭ম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

নৃত্যরতা কুমারী শুক্লা সেন

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীণ চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে বহু চিত্র-সাংবাদিক, পরিচালক ও শিল্পী যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইয়াছিল। বিশিষ্ট শিল্পীগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। কুমারী শুক্লা সেন থালার উপর কথক নৃত্য দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। নৃত্য-সাধনায় কুমারী সেন যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সভাপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আজ ছায়া-চিত্রে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এর বিচার সমগ্র বিষয়টি নিয়ে হওয়া উচিত। কোন দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ নিয়ে বিচার করলে আমরা ভুল করব। কেননা বিচার করতে হবে, সমগ্র বিষয়টা রসোত্তীর্ণ হোল কিনা, দেখতে হবে সেই বস্তু আমাদের জীবনে লাবণ্য আনতে পারল কিনা। এই ব্যাপারে যে বিরূপ আলোচনা হচ্ছে, তাতে বাংলার রসিক-চিত্ত যাতে প্রভাবিত না হয় তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। বাংলা বেঁচে আছে তার রসের কারবার নিয়ে। বাংলা তার শিল্পসৌধের দ্বারা রসের জগতে, লাবণ্যের জগতে, সৌন্দর্য্যের জগতে, চিরজয়ী হয়েই থাকবে।'

* * * *

সম্প্রতি সানরাইজ ফিল্মস্-এর সঙ্গীত-বহুল কথা-চিত্র 'যদুভট্ট' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। যদুভট্ট ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি একবার যা শুনিতেন সঙ্গে সঙ্গে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলেই তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় সারা ভারতের খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্যদের দ্বারে দ্বারে সুর-সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। লাঞ্ছনা অবমাননাকে উপেক্ষা করিয়া সঙ্গীতে বাঙ্গালা-বাঙ্গালীর সম্মানকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে সঙ্গীতে বাঙ্গালা-বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বা 'যদু ভট্টে'র জীবন-কাহিনী বিস্মৃতির অতলতলে তলাইয়া গিয়াছিল। সানরাইজ ফিল্মস্ তাঁহার জীবনালেখ্য চিত্রে রূপায়িত করিয়া সত্যই রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা বাঙ্গালা-বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ। মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে বলিয়াছেন —"বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি। আমাদের জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা বড় উদাসীন। তার এক জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার দিগ্বিজয়ী সঙ্গীত-নায়ক শ্রুতিধর যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।" যাঁহারা সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তাঁহারা ছাড়া যদুভট্ট সম্পর্কে সাধারণ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। কারণ আজ সঙ্গীতের অথবা সঙ্গীতজ্ঞদের আমরা যে মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছি, সেদিন তাঁহাদের অদৃষ্টে সে মর্য্যাদালাভ ঘটে নাই। যা কিছু সম্মান ও মর্য্যাদা তাহা কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত ছিল রাজদরবারে। একশত বৎসর পূর্ব্বে যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের অবির্ভাব ঘটে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় যদুনাথ সম্পর্কে লিখিয়াছেন —"তাঁর কাছে যে মল্লার' শিখেছিলাম তা আমার সমস্ত বর্ষার গানকে আপ্লুত ও স্পন্দিত করেছে।"

আলোচ্য চিত্রকে যদু ভট্টের সঠিক জীবন কাহিনী বলা যায় না। অবশ্য নাটকের প্রয়োজনে নূতন চরিত্র ও নূতন কাহিনী সংযোজিত করিতে হইয়াছে। তথাপি যদুনাথ কে ছিলেন, তাঁহার সাধনা কি ছিল? তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি যদু ভট্টকে একখানি সঙ্গীতবহুল সার্থক চিত্র বলা যায়। বহির্দৃশ্যের সহিত আভ্যন্তরিক দৃশ্যের চিত্র গ্রহণে বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধক, তাঁহারা আলোচ্য চিত্রকে একটি স্থায়ী মর্য্যাদা দান করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সুষ্ঠু চিত্রগ্রহণ ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণের ফলে ছবিখানি চক্ষু-কর্ণকে সত্যই আনন্দদান করিয়াছে। আলিবক্স-এর ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। তাঁহার অভিনয়, বাচন ভঙ্গী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের পরিবেশ উল্লেখযোগ্য। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যদুভট্ট ও ঝিমনরূপে বসন্তকুমার ও অনুভা গুপ্তা সু-অভিনয় করিয়াছেন।

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের আগত 'রাণী রাসমণি' চিত্রে নাম ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা দেবী

তুলসী চক্রবর্ত্তীর যাত্রার অধিকারী সুঅভিনীত। চিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীনীরেন লাহিড়ী ও শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

* * * *

'রাণী রাসমণি' চিত্রে রামকৃষ্ণের রূপসজ্জায় শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ-এন-সি প্রোডাক্সনের 'মন্ত্রশক্তি' সম্প্রতি মুক্তি-লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর এই প্রখ্যাত কাহিনী একদা নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল। স্বর্গত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার নাট্যরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসের মাধুর্য্য, একদিকে যেমন বাণী ও অম্বরের অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি তুলসী ও অজার পতিভক্তির নিদর্শন যা উত্তরকালে বাণীকে স্বামীগতপ্রাণা করিয়া তোলে। অপরেশচন্দ্র মূল উপন্যাসের এই চরিত্রগুলির সহিত মথ্‌রো ও কেলোর মা দুইটী অশিক্ষিত চরিত্রের মধ্যে পতি-পত্নীর প্রেম-মাধুর্য্য অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে 'মন্ত্রশক্তি' যখন চিত্র-রূপায়িত হয় তখন নাটকীয় এই চরিত্র দুইটি বাদ দেওয়া হয়। আলোচ্য চিত্রে মথ্‌রো আছে কিন্তু কেলোর মার অবতারণা করা হয় নাই। অপরেশচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়া-ছিলেন, সব স্তরের মানুষের জীবনেই পতি-পত্নীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই চরিত্রটি চিত্রে না আনায় নাট্যরসিক ব্যক্তি মাত্রই ক্ষুণ্ণ হইবেন। পূর্ব্বে এই কাহিনীর যে চিত্র-রূপায়ণ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমানে আঙ্গিকের দিক হইতে চিত্রটি অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছে। চিত্র-নাট্য রচনা, পরিচালনা, সঙ্গীত পরিবেশনা, আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণ এক-কথায় সুষ্ঠু হইয়াছে। সকলেই চরিত্রানুগ অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

যশস্বী অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় গত ১০ই ডিসেম্বর বেলা ৮-৩০ মিনিটে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি অতি অল্প বয়সে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের সংস্পর্শে আসেন ও সীতা নাটকে অষ্টাবক্রের ভূমিকায় অবতরণ করেন। শিশিরকুমারের

শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি নৈহাটীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে নৈহাটীতে সখের দলের অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘকাল মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের একচ্ছত্র অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি একাধারে সুদর্শন ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। সে যুগের বহু চিত্রে তিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরে নিজের চেষ্টায় তিনি মঞ্চ-মালিক হন। তিনি দীর্ঘকাল রঙ্‌মহল থিয়েটারের সত্বাধিকারী ছিলেন। এই সময় তাঁহার থিয়েটার পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। 'ভোলামাষ্টার' 'সন্তান' (আনন্দমঠ) 'রামের সুমতি' 'রাজপথ' নব-পরিকল্পনায় 'রিজিয়া' প্রভৃতি নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেন। শিল্পীদের মানোন্নয়নের ব্যাপারেও তাঁহার উদ্যোগ ছিল অভূতপূর্ব্ব। তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

* * * *

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'জয়দেব' কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব', নাটকের কাহিনী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদিও ঘোষণা করিয়াছেন, তথাপি আমরা বলিব আংশিকভাবে উক্ত নাটক হইতে কাহিনী ও ঘটনা সংস্থাপনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 'জয়দেব' নাটকটী একাধারে যেমন সর্ব্বজন-সমাদৃত, অপরদিকে তেমনি নাট্যরসিক ব্যক্তিদের নিকট অতি প্রিয়। হরিপদবাবুর বালক কৃষ্ণ ও পরাশর বিমলা উক্ত নাটকের স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ। আলোচ্য চিত্রে পরাশরকে জয়দেবের বন্ধুরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। হরিপদবাবুর নাটকে পরাশরকে দার্শনিক দ্রষ্টা-রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও আলোচ্য চিত্রটি জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ জয়দেবের মাধুর্য্যমণ্ডিত চরিত্রগাথা ও তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত। পরাশরের রূপ-সজ্জা বৈষ্ণবজনচিত্ত হয় নাই। সঙ্গীতাংশ ভাল। আঙ্গিকের দিক হইতে ছবিটি নিরাশ করিয়াছে। পদ্মাবতীর অভিনয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মাবতীর পরণে সিল্কের শাড়ী শুধু অশোভন নয়—অন্যায়। একমাত্র উল্লেখযোগ্য অভিনয়

অরোরা ফিল্মস্‌-এর 'জয়দেব' কথা চিত্রে মাঃ বিভু ও অনুভা গুপ্তা

করিয়াছেন বিমলার ভূমিকায় শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা। বহু চিত্রের বহু বিচিত্র ভূমিকায় রূপদানের মধ্যে তাঁহার আলোচ্য ভূমিকাভিনয় স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রামলীলা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামায়ণী পুণ্যকথা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শুধু আনন্দই জোগায়নি, তাদের কল্পনাকে রঙীন করেছে, তাদের আদর্শকে রূপায়িত করেছে, অবসরকে বিনোদন করেছে, প্রাত্যহিক জীবনকে রসস্নিগ্ধ চঞ্চল উন্মন্ করেছে। সীতার দুঃখে সে কেঁদেছে, বালীর বীর্য্যে-শৌর্য্যে সত্যরক্ষার আদর্শে সে মুগ্ধ হয়েছে, দেবর লক্ষ্মণকে সে ভালবেসেছে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমে, ত্যাগে সে চমৎকৃত হয়েছে, উপেক্ষিতা উর্ম্মিলার জন্য হয়ত দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে, দশাননের পতনে উল্লসিত হয়েছে, কৈকেয়ী মন্থরার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে চেয়েছে, পবন-নন্দনের প্রভু ভক্তিতে গদগদ হয়েছে। তাই যুগে যুগে দক্ষিণে উত্তরে পূবে পশ্চিমে শ্যামে কাম্বোজে, বরবদুরে এই ভাষায় ভাষায় গিঠ বেঁধে রামনামমণিদীপ জ্বলেছে। সুগতি-সুমতি সম্পত্তি কিছুই কাম্য নয়, শুধু "হেতুরহিত অনুরাগ"। আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুন বধ নিয়ে যে পুণ্য-কাহিনী আরম্ভ করলেন তাকেই যুগে যুগে কবি শিল্পীর দল নতুন করে পরিবেশন করলেন গণমনে। কালিদাস ভবভূতি থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কম্বন, পূবে কৃত্তিবাস, মার্ধব কন্দলী উত্তরে তুলসীদাস প্রভৃতি বহু সাধক মনীষীরা এই ধারাটিকে উজ্জীবিত রাখলেন হোমাগ্নি শিখার মত। নিভুনিভু সন্ধ্যাদীপের ক্ষীণ ছায়ার আড়ালে শঙ্খ-ঘণ্টামুখর অবসরের মাঝে গ্রাম্য কথকঠাকুরের ভক্তিগদগদ শ্রদ্ধাপ্লুত রাম-সীতার কাহিনী, বিরহ-মিলন আখ্যান যে অপূর্ব্ব রসলোক সৃষ্টি করতো তার চিত্র ত আমরাও দেখেছি। জাতির জীবনে এই সব রসস্নিগ্ধ চেতনার লোপ যে কতো বড় দুর্দ্দৈব তার পরিমাপ করতে আমরা অক্ষম।

সেইজন্য বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে কলিকাতার মত বিরাট নগরীতে যখন অপূর্ব্ব শিল্পী উদয়শঙ্করের হাতে একে পুনর্জ্জীবিত হতে দেখলাম তখন মন সানন্দে সাধুবাদ দিলে। এর বৈশিষ্ট্য এই নয় যে এই গণনাট্য একটা প্রাচীন সংস্কৃতির রীতিকেই উদ্বুদ্ধ করলে, এই রূপক্ আরো দেখিয়ে দিলে যে দেশের মর্ম্মের মূলকে উৎপাটন না করেও তার সঙ্গে সামগ্রিক যোগ রেখে গণমনের সঙ্গে আদান-প্রদান চলে, বিদেশী ভাবভাষা পরিকল্পনার দরকার হয় না। তা ছাড়া এতে গান আছে, নৃত্য আছে, যাত্রার আঙ্গিক্ আছে, পুতুল নাচের ভঙ্গী আছে এবং যা আজকালকার যুগে অতি সচল সেই সিনেমার আভাসও আছে। এই পঞ্চভূতের রসায়নে যে রসবস্তুটির আবির্ভাব হোল সত্যই তা শুধু উচ্চশিক্ষিত সাংস্কৃতিক মনকে দোলা দেয় না রস-পিপাসু অজ্ঞজন সাধারণকেও মুগ্ধ করে। এই সর্ব্বচিত্তের উপযোগী এক সাধারণ মান তৈয়ারী করাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। অথচ এ অভিনয়ে সিনেমার মত ব্যয়বাহুল্য নেই। সোজা আকাশের নীচে অতি সাধারণ পরিবেশে চলছে এর অভিনয়—দর্শক তার সঙ্গে একাঙ্গীভূত—ভবভূতির কথায় —স্পর্শে স্পর্শে ইন্দ্রিয়গণ পরিমূঢ়, ইউরোপে যেমন যীশু-খ্রীষ্টের প্যাশান্ প্লে (Passion play)। দর্শকরা অভিনয়ের পূর্ব্বেই পাত্রপাত্রীদের ও কুশীলবদের দেখে—তাদের সামনে দিয়েই চলে গেলেন নৃত্যের তালে তালে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র, ঐ তো লক্ষ্মণ তার সঙ্গী, পিছনে আছেন জনকদুহিতা সীতা, ঐ তো দশানন, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ, রাক্ষস রাক্ষসী, শূর্পনখা, বানরের দল, হনুমান সুগ্রীব অঙ্গদ, চেড়ীরা। তাই এই ছায়ানৃত্যকে চিত্র বলেই মনে হয় না, পিছনের মানুষগুলোর উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয় এই নাট্যলীলা অবাস্তব নয়। এর সঙ্গে Back ground music যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তাও প্রশংসনীয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা নিয়ে জনচিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত এইরূপ গণনাট্যের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি, ধন্যবাদ জানাই উদ্যোক্তা ও উদ্যোগীদের।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সদর-দালান পার হয়ে 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার ভিতরে ঢুকতেই একতলার ক'খানি সুপ্রশস্ত অঙ্গনের চারিপাশে চোখে পড়ে, রুশ-দেশের প্রাচীন আমলের নানা বিচিত্র শিল্প-সম্ভার...আদিম ও মধ্য-যুগের বহু অপরূপ 'আইকন্' (Ikon) বা 'দেবমূর্ত্তি প্রতিলিপি' আর কাঠ-পাথর ও বিভিন্ন ধাতু নিয়ে গড়া কত সব প্রতিমূর্ত্তি। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ রুশ

ট্রোপিনিন চিত্রিত—'পেশ্ রচয়িতা'র প্রতিলিপি

দেবমূর্ত্তি-শিল্পী আন্দ্রিউ রুবলেভ্ (Andrew Rublev) রচিত সুবিখ্যাত 'Trinity' বা 'ত্রি-মূর্ত্তির' 'আইকন্'-প্রতিলিপি। ওদেশের শিল্প-কলার ইতিহাসে সেকালের এই 'আইকনটির' বৈশিষ্ট্য আছে সবিশেষ। আমাদের দেশের অজন্তা, ইলোরার গুহা-চিত্রে খৃষ্ট-পূর্ব্ব আমলের সুপ্রাচীন ভারতীয় শিল্প-কলার যে অপরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে রুশ-দেশের আদিম শিল্প-কলার বিকাশ নিতান্তই পশ্চাদ্‌পদ বলে মনে হয়। তার কারণ, সেকালের অনুন্নত রুশ-অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী বিকাশ ঘটবার আগেই, সুদীর্ঘকাল ধরে বাইরের বিদেশী অভিযানী-শাসক—উত্তরাঞ্চলের স্কাণ্ডিনেভিয় (Scandinavian), দক্ষিণাঞ্চলের পারসীক (Persians), গ্রীক (Greek) পূর্ব্বাঞ্চলের তাতার (Tatar). মোঙ্গল (Mongolian)—আর ভারতের বণিক-ব্যবসায়ী-পর্য্যটকদের ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে আসার দরুণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাবধারা-আদর্শের অপরূপ সংমিশ্রণে ওদেশে স্বদেশী এবং বৈদেশিক কলা-কৃষ্টি-সভ্যতার বিচিত্র সমন্বয়ে বিশিষ্ট এক অভিনব 'জাতীয়-দৃষ্টিভঙ্গী' গড়ে ওঠে। যুগ-যুগান্তর ধরে বিদেশীদের এই অবিরাম আনাগোনার স্রোত আর নিবিড় যোগসূত্র-রচনার ফলে, কালক্রমে রুশ-রাজ্য সেকালে হয়ে দাঁড়ায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র ভাবধারা এবং শিল্প-সভ্যতা-সংস্কৃতির মহা-মিলন কেন্দ্র! সেকালের এই সব বিভিন্ন বৈদেশিক-সংস্কৃতির ছাপ আজও সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে রাশিয়ার জাতীয় শিল্প-কলার নানান্ নিদর্শনে। ওদেশী বাসিন্দাদের সাজ-পোষাক-অলঙ্কার, আচার-ব্যবহার আর ঘর-বাড়ী-মন্দির রচনার বিষয়ে এখনও হামেশা নজরে পড়ে—বিদেশী গ্রীক, স্কাণ্ডিনেভিয়, তাতার, মোঙ্গল, তুর্কী, পারসীক ও ভারতীয় কলা-কৃষ্টির বহু বিচিত্র ছোঁয়াচ। রুশদেশের লোককলা এবং জাতীয় আলঙ্কারিক-শিল্পে, উত্তর-ইউরোপের মোরগ, বল্গা-হরিণ আর রাজ-হংসের প্রতীক-চিহ্নের সঙ্গে পারসীক চিহ্ন-প্রতীক সিংহ আর ময়ূর, ভারতীয় শিল্প-প্রতীক ফুল-লতা-পাতার বিচিত্র নক্সা-কারুকার্য্যের যে অভিনব সমন্বয়-সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়, তাই থেকে পরিষ্কার প্রমাণ মেলে—অতীতে ওদেশে বৈদেশিক কৃষ্টি-প্রভাব কতখানি ব্যাপক-প্রসারতা লাভ করেছিল। অবশেষে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অভিনব কলা-কৃষ্টি-সভ্যতায় উন্নত সেকালের শ্রেষ্ঠ রুশ-জনপদ 'কিয়েভ্' (Kiev) রাজধানীতে গ্রীসের 'রোমান-ক্যাথলিক' খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সারা রাশিয়ার বুকে যখন বিদেশী 'বাইজান্টাইন্' (Byzantine) কলা-কৃষ্টি-আদর্শের বিপুল বন্যা বয়ে গেল, তখন সেখানকার নব-দীক্ষিত রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় উৎসাহিত গ্রীক-ধর্ম্মযাজকদের সক্রিয়-প্রচেষ্টার ফলে, রুশ-

রাজ্যের শিল্প-সভ্যতা-রুচিরও আমূল-রূপান্তর ঘটে! বিদেশী ধর্ম্মানুসরণের ফলে, রাশিয়ার মঠ-মন্দির, প্রাসাদ-ভবন গড়ে উঠতে লাগলো গ্রীসের স্থাপত্য-কলার ছাঁদে…রুশ-বর্ণমালা রচিত হলো 'বাইজান্টাইন্'-হরফের অনুকরণে…স্বদেশী সাজ-সজ্জা আর সামাজিক আচার-ব্যবহারেও দেখা দিলো গ্রীক-সভ্যতার বিকাশ…জাতীয় শিল্প-কলাও ক্রমশঃ বরণ করে নিলো বিজাতীয় রূপ-রচনার রীতি-আদর্শ! রাশিয়ার গ্রামে-সহরে বহু বিচিত্র মঠ-মন্দির-ভজনালয় গড়ে তুলে রাজানুগৃহীত গ্রীক-ধর্ম্মযাজক-শিল্পীর দল সেকালের অনুন্নত রুশ-জনসাধারণকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন—'বাইজান্টাইন্' বিদ্যা-চর্চ্চা আর শিল্প-রচনার বিষয়ে। গ্রীসের বিদেশী ধর্ম্মযাজক-কলাবিদদের কাছে রঙ-তুলির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন আর ছেনি-বাটালি চালিয়ে কারু-মূর্ত্তি রচনার পদ্ধতি শেখার পর রাশিয়ার প্রাচীন শিল্পী-কারুকারের দল পরম-উৎসাহে আত্ম-নিয়োগ করলেন—স্বদেশের মঠ-মন্দির-প্রাসাদ-ভবনাদি চিত্রালঙ্কারের কাজে…ধর্ম্মান্ধ-জনসাধারণের উপাসনার উদ্দেশ্যে বিচিত্র-অভিনব সব 'আইকন্' বা 'দেব-মূর্ত্তিলিপি'র রচনায়! এছাড়া দেশের অন্য আর কোন বিষয় নিয়ে চিত্র বা মূর্ত্তি রচনার দিকে রুশ-শিল্পকারদের তেমন বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতো না সেকালে…ধর্ম্মই ছিল তখন তাঁদের রূপ-সৃষ্টির একমাত্র উপাদান! রুশশিল্পীদের মত, দেশের জনসাধারণও সেকালে শুধু 'আইকন্' আর ধর্ম্মালয়ের আলঙ্কারিক-চিত্রাবলী ছাড়া অপরাপর শিল্প-সৃষ্টির সম্বন্ধে ছিলেন নিতান্তই উদাসীন…তবে, রাজ্যের তৎকালীন রাজন্যবর্গ এবং অভিজাত-অমাত্যদের মধ্যে কারো-কারো মনে নিজস্ব প্রতিকৃতি রচনা করিয়ে রাখার প্রবল ঝোঁক থাকার ফলে, প্রাচীন রুশ-শিল্পীদের এ-ধরণের অল্প কয়েকখানি হাতের কাজ আজও চোখে পড়ে ওদেশের চিত্রশালায়। ধর্ম্ম-চিত্র রচনার প্রতি রাশিয়ার শিল্প-কারুকার ও জন-সাধারণের এই অন্ধ-অনুরাগ সারা দেশে ব্যাপক-প্রসারতা লাভ করে বজায় থাকে সুদীর্ঘকাল ধরে…খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত। তখনকার আমলে ওদেশের প্রাচীন 'নোভ্‌গোরোদ্' (Novgorod) সহর আর মস্কো-রাজধানী ছিল রাশিয়ার শিল্পী-কারুকারদের প্রধান কেন্দ্র। সেকালের এই সব শিল্পীদের মধ্যে আন্দ্রিউ রুব্‌লেভ্‌ই সর্ব্বপ্রথম বিদেশী গ্রীক শিল্প-গুরুদের পদাঙ্ক-অনুসরণে 'বাইজান্টাইন্' ছাঁদে 'আইকন'-রচনার গতানুগতিক-পদ্ধতি বদলে নবীন ভাবধারা ও অভিনব ছন্দোময়-লালিত্যের সুষমায় স্বদেশী শিল্প-কলার অপরূপ সংস্কার-সাধন করেন। 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার অমূল্য-সম্পদ 'ট্রিনিটি' 'আইকন্'-প্রতিলিপিটি ওদেশী শিল্প-সমালোচকদের মতে, শিল্পী আন্দ্রিউ রুব্‌লেভের শ্রেষ্ঠ অবদান…রাশিয়ার কারু-কলার ইতিহাসে তাই এটি আজ বিশিষ্ট গৌরবের আসন অধিকার করেছে।

রুব্‌লেভের পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিকালে রুশীয় শিল্প-জগতে বিশিষ্ট 'আইকন্'-প্রতিলিপিকার ডাইয়োনিসিউস্ (Dionysius) সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'আইকন্'-গুলি' অপরূপ বর্ণ-লালিত্যের মহিমায় আজও কলানুরাগীদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে! ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ওদেশের বিশিষ্ট-কলারসিক বিত্তশালী-বণিক-বংশ 'ষ্ট্রোগানোভ্' (Stroganov) পরিবারের সক্রিয়-পৃষ্ঠপোষকতায় রাশিয়ার শিল্প-জগতে পারসিক ও ভারতীয় কারু-কলার আদর্শে অনুপ্রাণিত নবীন একদল 'আইকন্'-প্রতিলিপিকারের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের শিল্প-রচনায় প্রাচ্যের আলঙ্কারিক-কারুকার্য্যের প্রভাব ছিল সবিশেষ…এই শিল্পী-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে রুশ 'আইকন্'-লিপি রচনার পদ্ধতিতে সে-সময় ভারতীয় এবং পারসিক চিত্রকলা-অনুকৃতির রীতিমত রেওয়াজ ঘটে। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাগ্য-বিড়ম্বিত বিত্তহারা 'ষ্ট্রোগানোভ্'-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে রাশিয়ার এই প্রাচ্য-কলা-অনুসরণকারী শিল্পী-গোষ্ঠীর নবীন প্রচেষ্টা চিরতরে বিলীন হয়ে যায় ওদেশের বুক থেকে! এঁদের অন্তর্দ্ধানের পর, তৎকালীন প্রতীচ্য-শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রুশীয় 'জার্'-সম্রাটের অনুগৃহীত—এমেলিয়ান্ (Emelion), মস্কোভটিন্ (Moscovitin), প্রোকোফৈ শ্চিরিন্ (Prokofyi Shchirin), নিকিফোর্ (Nikifor) নাজারি-সাভিন্ (Nazary Savin) প্রমুখ নূতন আর একদল শিল্পী স্বদেশী 'আইকন্' রচনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তবে প্রতীচ্য কারুকলা-আদর্শের অপটু-অনুকরণ আর উপযুক্ত শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে এই সব 'জার্'-অনুগৃহীত শিল্পীদের রস-সৃষ্টিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা উন্নতির আভাস চোখে পড়ে না। উপরন্তু, ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে রাশিয়ার সুপ্রাচীন 'আইকন্'-কারুকলার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটে। সে অবনতির সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে সেকালের 'ফ্র্যায়াজ্' (Friaz) বা ইউরোপের ফরাসী ও জার্ম্মান কারুকলার বৈদেশিক-আদর্শে অনুপ্রাণিত—উশাকভ্, কাজানেৎজ্, কোন্দ্রাতিয়েভ্, পোজনান্স্কী প্রমুখ রাশিয়ার বিশিষ্ট রূপকার-গোষ্ঠী রচিত বিচিত্র 'আইকন্'গুলিতে। বর্ণ-সুষমা এবং কলা-নৈপুণ্যে অপরূপ হলেও 'ফ্র্যায়াজ'-শিল্পীগোষ্ঠীর এই প্রাচীন রূপ-রচনাগুলি থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যে সে-যুগে প্রতীচ্যের বিদেশী বাস্তব-ধর্ম্মী (Realistic) শিল্পের নবীন-আদর্শ

রুশ-শিল্পী আইভানভ অঙ্কিত তৈলচিত্র—জনগণের সামনে যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব

রাশিয়ার প্রাচীন আধ্যাত্মিক-কারুকলার উপর কি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনি ভাবে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সারা রুশদেশ ক্রমশঃ ছেয়ে গেল প্রতীচ্য শিল্প-সংস্কৃতির যুগান্তকারী নূতন ভাবধারা-আদর্শে…রাশিয়ার রূপকারের দলও নবোদ্যমে স্বদেশী মঠ মন্দির-প্রাসাদ অলঙ্কার আর গৃহ-দেবতাদের মূর্ত্তিলিপি রচনার চিরাচরিত পুরোনো-প্রথা বর্জ্জন করে ইউরোপীয় শিল্পীদের বৈদেশিক কলা-পদ্ধতি অনুসরণে মানুষের প্রতিকৃতি ও সামাজিক ঘটনাবলীর রূপায়নে মেতে উঠলেন। সেই থেকেই রুশ-শিল্পকলাতে পাশ্চাত্য-ছাঁদের বাস্তব-ধর্ম্মী রূপ-রচনার সূত্রপাত! 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার একতলায় বিভিন্ন কক্ষ-অঙ্গনে রাশিয়ার প্রাচীন মধ্যযুগীয় শিল্প কলার বহু বিচিত্র নিদর্শন সযত্নে সঞ্চিত রয়েছে…মোটামুটি ভাবে সে সব দেখার পর সোভিয়েট বন্ধুদের সঙ্গে সদলে এগুলুম আমরা দোতলার প্রদর্শনী-কক্ষের পানে।

'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার দোতলায় সুপ্রশস্ত বিরাট কক্ষ-অঙ্গনগুলির গঠন-সৌষ্টব দেখলুম অপেক্ষাকৃত আধুনিক ছাঁদের। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতেই চিত্রশালার সহচরী-পরিচারিকা জানালেন যে, গত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের (World War II) সময় হিট্‌লারের হানাদারী নাৎসী-বাহিনী যখন প্রচণ্ড আক্রোশে মস্কো রাজধানীর উপকণ্ঠে হাজির হয়ে বর্ব্বর আক্রমণ অত্যাচার চালায়, তখন জার্ম্মান-শত্রুদের নির্ম্মম গ্রাস থেকে রাশিয়ার যুগ-যুগান্তকাল ধরে সঞ্চিত অমূল্য শিল্প-সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে লোকান্তরিত রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল স্তালিনের নির্দ্দেশানুসারে সোভিয়েট সরকার 'ট্রেটিয়াকভ্-চিত্রশালার যাবতীয় কারুকলা-নিদর্শন সবই যুদ্ধ-এলাকার বাইরে সুদূর সাইবেরিয়ার সুরক্ষিত-ঘাঁটিতে সযত্নে সরিয়ে রাখেন। সে-যুদ্ধের সময় মস্কোর উপর দুরন্ত নাৎসী-বাহিনীর তুমুল বোমা-বর্ষণের দাপটে 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার বহু অংশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হয়। তবে দুর্দ্ধর্ষ রুশ-বাহিনীর অদম্য-প্রচেষ্টার ফলে মস্কো-সীমান্ত থেকে জার্ম্মান-সৈন্যদল বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট সরকার সুনিপুণ তৎপরতায় অচিরে ধ্বংস-প্রায় 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালাটি আধুনিক-ছাঁদে পুনর্গঠিত করে সাইবেরিয়ার সুরক্ষিত-ঘাঁটি থেকে রাশিয়ার বিচিত্র শিল্প সম্পদগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে এনে এখানকার নব-নির্ম্মিত প্রদর্শনী-আগার আবার অপরূপ শোভায় সাজিয়ে তোলেন।

'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার দোতলায় বিভিন্ন কক্ষ-অঙ্গনে সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক আমল পর্য্যন্ত, রুশ-শিল্পকলার অসংখ্য নিদর্শন। প্রদর্শনী-কক্ষে প্রথমেই চোখে পড়লো —সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশীয় শিল্পীদের নানান্ বিচিত্র রূপ-রচনাবলী। সে-যুগের যে সব রুশ-শিল্পী দেশের শিল্পকলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে আন্ত্রোপভ্, আর্কিমভ্, উপ্‌রিউমফ্, ভেনেৎসিয়ানভ্, ইভানভ্, সাভ্‌রাসভ্, ফিডোটভ্, রোকোটভ্, লেভিৎস্কী ও বোরোভিকোভ্‌স্কীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য! এঁদের কলা-নৈপুণ্যের কথা আলোচনা করার আগে, সেকালের রুশ শিল্প-ইতিহাসের কিছু আভাস পাওয়া প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অনুন্নত রুশ-দেশে তৎকালীন-ইউরোপের উন্নত শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন-প্রয়াসী 'জার' পিটারের (Peter the Great) অভিনব রাজ্য-সংস্কার ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার শিল্প-রচনা-পদ্ধতিতেও প্রতীচ্য ভাবধারা-আদর্শ অনুসরণের ব্যাপক-প্রসারতা ঘটে। উপরন্তু, ১৭৪৮ সালে পিটারের কন্যা সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে রাজ্যের নূতন-রাজধানী সেন্ট পিটার্স্‌বুর্গে (St. Petersburg) রাশিয়ার সর্ব্বপ্রথম শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদেশী শিল্পীদের মধ্যে কারু-কলা চর্চ্চার বিপুল আগ্রহ-অনুরাগ জাগে এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় চিত্রকরদের চিত্রণ-রীতি অনুকরণে, প্রচলিত বৈদেশিক-ছাঁদে স্বদেশের রাজা, রাজ-পরিবারবর্গ আর অভিজাত-অমাত্যবৃন্দের প্রতিকৃতি-রচনার কাজে তাঁরা একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। রাজ-দরবার এবং অভিজাত শ্রেণীর সদয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—বিশেষতঃ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালে রচিত সুপ্রসিদ্ধ রুশ-শিল্পীদের যে সব প্রতিকৃতি-চিত্রণের প্রাচীন নিদর্শনরাজি আজ মস্কোর 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালায় সযত্নে সঞ্চিত রয়েছে—সেগুলিতে শুধু সে-যুগের রাজ-বৈঠকের বিশিষ্ট অভিজনদের আকার-আকৃতির নিখুঁত রূপ, পোষাক-আশাক, সাজ-সজ্জা-অলঙ্কারের আড়ম্বর আর বিচিত্র বিলাস-সম্ভারের পরিচয় মেলে…সমাজের সাধারণ লোকজনের বিষয়ে বিশেষ কোনো হদিশ পাওয়া যায় না! অর্থাৎ, সে-সময়ে রুশ-শিল্পীদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—দেশের রাজন্যবর্গ আর সম্ভ্রান্ত-অভিজাতদের বিচিত্র প্রতিকৃতি-চিত্রণ…তবে, ইভানভ্ প্রমুখ রাশিয়ার কোনো-কোনো বিশিষ্ট-শিল্পী খৃষ্ট-জীবনের বিবিধ আখ্যান-অবলম্বনে খানকয়েক অভিনব-অপরূপ ধর্ম্মমূলক চিত্রও রচনা করেছিলেন। 'জনগণের সামনে যীশু-খৃষ্টের আবির্ভাব' (Christ Appears Before the People) নামে ইভানভের অঙ্কিত সে-যুগের সুবিখ্যাত তৈল-চিত্রখানি কলা-বৈশিষ্ট্যে শুধু 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালারই নয়—রাশিয়ার সুপ্রাচীন শিল্প-ইতিহাসেরও অন্যতম অমূল্য সম্পদ! অভিনব-সুবিশাল এই চিত্রখানির রূপায়ণে রুশশিল্পী ইভানভের সময় লেগেছিল সুদীর্ঘ বিশ বছর। মূল-চিত্রটি অঙ্কণের আগে পরম নিষ্ঠাভরে বিপুল অধ্যবসায়ে শিল্পী ইভানভ্ যে সব অসংখ্য ছোট-ছোট খশ্‌ড়া-নক্সা রচনা করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই আজ সযত্নে সাজানো রয়েছে বিরাট আসল ছবিখানির আশে-পাশে। এ ছাড়া সেন্ট পিটার্স্‌বুর্গের নব-সৃষ্ট রুশীয় শিল্প-শিক্ষাসদনের আর্কিমভ্, উগরিউমভ্, লোজেঙ্কো, কোজ্‌লভ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট-শিল্পীরা গ্রীস ও রোমের প্রাচীন কারু-কলার আদর্শে বহু বিচিত্র পৌরাণিক-বিষয়ের বিভিন্ন চিত্র-রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, রাশিয়ার বুকে পশ্চিম-ইউরোপের নূতন ভাবধারা—গণ চেতনার অভিনব স্রোত প্রবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদেশের শিল্পকলাতেও রুশ-জনসাধারণ ও সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বদেশী চিত্র-রূপায়ণের বিশেষ রেওয়াজ ঘটলো। সে-যুগের সাধারণ মানুষ আর সমাজের বিচিত্র রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে চিত্রানুলেখনের সাধনায় যে সব রুশ-শিল্পীরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন—তাঁদের মধ্যে ভেনেৎসিয়ানভ্, সাভ্‌রাসভ্ এবং ফিডোটভ্‌ই সবচেয়ে প্রধান। 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার অভিনব-সম্পদ, ভেনেৎসিয়ানভের অঙ্কিত সুবিখ্যাত 'Summer' বা 'নিদাঘ বেলা' তৈল-চিত্রখানিতে অপরূপ বর্ণ-লালিত্যে আজও ফুটে রয়েছে সেকালের রুশ-কৃষি-জীবনের মনোরম স্মৃতিচিহ্ন! এঁরই রচিত 'Spring' বা 'বসন্তের দিন', 'The Barn' বা 'খামার-শালা', 'Peasant Lassie' বা 'কিষাণ-কন্যা' চিত্রগুলিতে রাশিয়ার তৎকালীন-সমাজের সাধারণ-জনের জীবনের কথাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া বিশিষ্ট রুশ-শিল্পী সাভ্‌রাসভের সুবিখ্যাত —'The Rooks are back' বা 'মোরগের দল ঘরে ফিরে এসেছে' তৈল-চিত্রখানিতে অপরূপ-সুষমায় রঞ্জিত হয়ে রয়েছে—রাশিয়ার সেকালের ঘর-বাড়ী—প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঘরোয়া-প্রতিচ্ছবি। রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ-চিত্রশিল্পী ফিডোটভের 'The Widow' (স্বামীহারা), 'The Aristocrat's Breakfast' (অভিজাত-সম্ভ্রান্তের প্রাতরাশ), 'The Major's Suit (অমাত্যের আবেদন), 'Encore, Encore' (সাবাস্, সাবাস্), 'The New Cavalier' (নূতন নায়ক) প্রভৃতি অপরূপ চিত্রগুলিতে সেকালের রুশ সমাজ-জীবনের বহু বিচিত্র করুণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে, রেপিন্, সুরিকভ্, পেরোভ্, গ্যে, ক্রাম্‌স্কোই, ভেরেশ্চাগিন্, ভাস্‌নেৎসভ্, আন্তোকোল্‌স্কী, সাভ্‌রাসভ্, শিশ্‌কিন্, লেভিতান্, কিপ্‌রেন্‌স্কী, ট্রোপিনিন্, ব্রিউলভ্, ক্রনি, সেমিরাদস্কী, ইয়াকোবি,

পোলেনভ্, গাগারিন্, তিরানভ্, ফ্লাভিৎস্কী প্রমুখ প্রগতিশীল-সুনিপুণ শিল্পীদের আবির্ভাবে রুশ-শিল্পকলায় বাস্তব (Realistic) চিত্র-রূপায়ণের সঙ্গে কাল্পনিক-ভাবধারা (Romantic) অনুসরণে চিত্র-রচনা পদ্ধতির বিচিত্র সমন্বয় ঘটে। বিপরীত-ধর্ম্মী এই দুই ভাবধারা-আদর্শের অপরূপ সংমিশ্রণের ফলে, রাশিয়ার শিল্প-কলা সেকালে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারীতে রাখা, কিপ্‌রেনস্কীর রচিত সুপ্রসিদ্ধ রুশ-কবি পুশ্‌কিনের প্রতিকৃতি এবং ট্রোপিনিনের অঙ্কিত 'The Lace-maker' বা 'লেস্-রচয়িত্রীর' চিত্রগুলি সে-যুগের কলা-নৈপুণ্যের অপরূপ নিদর্শন। তাছাড়া পেরোভ্, রেপিন্, সুরিকভ্, গে, ভেরেশ্চাগিন্, ক্রামস্কোই, পুকিরেভ্, লেভিতান্ প্রভৃতি স্বদেশী কলা-শিল্পের প্রগতিকামী উৎসাহী-শিল্পীদের ঐকান্তিক-প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশদেশে 'পেরেদ্‌ভিজ্‌নিক' (Peredviznik) নামে এক অভিনব 'শিল্পী-চক্র' গড়ে ওঠে। 'পেরেদ্‌ভিজ্‌নিক'-গোষ্ঠির এই সব নিপুণ শিল্পীদের ব্রত ছিল—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও সমাজের বিচিত্র বিষয়গুলিকে নিখুঁত-ভাবে মনোরম কলা-চিত্রে রূপান্তরিত করে ভ্রাম্যমান কলা-প্রদর্শনীর সাহায্যে রাশিয়ার জন-সাধারণের মনে স্বদেশী শিল্প-চর্চ্চার প্রতি অনুরাগ বাড়িয়ে তুলবেন। এঁদের এই একনিষ্ঠ-ব্রতসাধনার ফলে, সে যুগে রুশ শিল্প-কলায় যে সব অপরূপ চিত্র-সম্পদের রূপায়ণ হয়েছিল—তার বহু নিদর্শন আজ চোখে পড়ে ওদেশের 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার কক্ষ-অঙ্গনে। সে-আমলের মস্কো-অধিবাসী শিল্পী-সঙ্ঘের নেতা বিশিষ্ট-চিত্রকলাবিদ্ পেরোভের অঙ্কিত 'At the Last Pub' বা 'শেষ-প্রান্তের সরাইখানায়' চিত্রখানিতে অভিনব সারল্য-সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত হয়েছে রুশদেশের তৎকালীন-সমাজের একটি সকরুণ গ্রাম্য-জীবনের ঘরোয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী। এমনি ধরণের বিভিন্ন সামাজিক-চিত্র অঙ্কণ ছাড়া শিল্পী পেরোভ্ সমসাময়িক রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি-লিপিও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ডষ্টভিয়েভ্‌স্কী ও অষ্ট্রোভ্‌স্কীর অপরূপ চিত্র দু'খানি রাশিয়ার কলা-কৃষ্টির ইতিহাসে আজও অমর হয়েরয়েছে। প্রতিকৃতি-চিত্রণে, সে যুগের কুশলী-শিল্পী ব্রিউলভের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের হাতে আঁকা 'Self Portrait' বা 'আত্ম-চিত্রটি' দেখলে। তাছাড়া গে রচিত 'লিও টলষ্টয়' আর 'হের্‌জেন' এবং ক্রামস্কোইয়ের অঙ্কিত 'ট্রেটিয়াকভ্', 'লিও টলষ্টয়', 'নেক্রাসভ্' আর 'সাল্টিকভশেচেদ্রিন্' চিত্রগুলি থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে সে যুগের রুশ-শিল্পে প্রতিকৃতি-চিত্রণের কলা-পদ্ধতি কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল। 'পেরেদ্‌ভিজ্‌নিক'-শিল্পীদের মধ্যে রেপিন্ আর সুরিকভ্‌ই তাদের অনন্যসাধারণ রূপসৃষ্টি-প্রতিভার গুণে রাশিয়ার শিল্প-ইতিহাসে আজ অভিনব গৌরবের আসন অধিকার করেছেন। ওদেশের শিল্প-সমালোচকদের মতে, রেপিন্ ও সুরিকভের চিত্রগুলি আজ রুশ-দেশের জাতীয়-শিল্পকলার বিশিষ্ট প্রতীক বলে সবিশেষ সমাদৃত হয়েছে। রেপিনের রচিত—'ভল্‌গা-নদীর মাঝি' (Volga Boatmen) 'সাদকো' (Sadko) 'অবাঞ্ছিতা' (Unexpected), 'কুর্স্ক প্রদেশের ধর্ম্মোৎসব মিছিল' (Religious Procession in Kursk Province), 'দ্বৈত-সংগ্রাম' (The Duel), 'নির্ম্মম আইভান ও তাঁর পুত্র' (Ivan the Terrible and his son), 'জাপোরোঝি-কশাকের দল' (Cossacks of Zaporozhye), প্রভৃতি অমর-চিত্রাবলী আজ 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার অন্যতম অমূল্য সম্পদ। রূপ-রস-বর্ণ ছাড়াও রুশ-শিল্পী রেপিনের প্রত্যেকটি চিত্রেই অপরূপ ভাব ও গতির অভিব্যঞ্জনায় রীতিমত মূর্ত্ত-সজীব হয়ে উঠেছে। রেপিনের মত সুরিকভের চিত্রাবলীতেও রাশিয়ার সমাজ-জীবন ও সাধারণ লোকজনের বিষয় বিশেষ ভাবে রূপা য়ত হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত 'বেরেজভে নির্ব্বাসিত মেন্‌শিকভ্' (Menshikov at Berezov), 'জমীদার-গৃহিনী মেরোজোভার নির্ব্বাসন (The Evile of Boyarinia Morozova) চিত্রগুলিতে সেকালের রুশ সমাজ-জীবনের অপরূপ এমন সব সকরুণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে যে অতি-বড় পাষণ্ডের মনও সদয়-সহানুভূতিতে ভরে তোলে। সেকালের রুশ সমাজ-জীবনে এমনি আরো অনেক সকরুণ-প্রতিচ্ছবির আভাস পাওয়া যায় সুনিপুণ-শিল্পী পুকিরেভের রচিত—'অ-সমান বিবাহ' (The Unequal Marriage), 'বিবাহ-আসরে ডাইনীর আবির্ভাব' (The witch comes to the wedding), সুবিখ্যাত চিত্রগুলিতে। ভাসনেৎসভের কাব্যময় চিত্রাবলী থেকে সন্ধান মেলে রুশদেশের প্রাচীন ইতিহাস, লোক-গাথা আর জনপ্রিয় রূপকথার বহু বিচিত্র বিষয়ের। এই সব উপাদান সংগ্রহ করেই ভাসনেৎসভ্ অপরূপ কলা-নৈপুণ্যে রচনা করে গেছেন—'পেলোভ্‌ৎসী ও ইগরের সংগ্রামের পরে (After Igor's Battle with Polovtsi), 'বোগাতীরের দল' (Bogatyrs), 'আলেনুশ্‌কা' (Alenushka), 'ধূসর-নেকড়ের পিঠে যুবরাজ আইভান' (Ivan Tsarevitch on the Grey Wolf) প্রভৃতি অপরূপ চিত্রগুলি। প্রখ্যাতনামা ভেরেশ্চাগিনের চিত্রাবলীতেও নজরে পড়ে সমসাময়িক-কালের রুশ ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর সৈন্যবাহিনীর প্রতিচ্ছবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কী-বাহিনীর সঙ্গে রাশিয়ার রাজ-সৈন্যদের সংগ্রামের সময় রুশ-বাহিনীর সভ্য হয়ে মধ্য-এশিয়ায় অবস্থানকালে ভেরেশ্চাগিন এই সব চিত্রগুলি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া রুশ-শিল্পে ভেরেশ্চাগিনের অন্যতম অবদান হলো, দিগ্বিজয়ী ফরাসী-বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার রাজ-সৈন্যদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের অপরূপ প্রতিলিপি-চিত্রণ। ভারতীয় সিপাহী-বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষ পর্য্যটনকালে ভেরেশ্চাগিন আমাদের দেশের যে সব চিত্র রচনা করেছিলেন, সেগুলি আজও সযত্নে সঞ্চিত রয়েছে দেখলুম—ওদেশের 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার সুবিশাল প্রদর্শনী-কক্ষে! বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বদেশের এই সব প্রাচীন প্রতিলিপিগুলি দেখে সত্যিই আমরা সেদিন বিশেষভাবে মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম।

(ক্রমশঃ)

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন—

গত ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা ও ২রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ত্রিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভাষণে জানাইয়াছেন—"জীবিকা নহে, জীবনের উপকরণ সঞ্চয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ, জাতির রক্ষা ও অগ্রগতি। ব্যক্তি বা জাতির জীবনীশক্তি হইতেছে তাহার ঐতিহ্য। বাঙ্গালীর স্মরণীয় প্রাণের অন্তরতম সাধনা ও উপলব্ধি শাশ্বত ও মরণজয়ী। বাঙ্গালী জাতি ও বাংলার সংস্কৃতি শত অপমান, শত ক্লেশ ও শত পরাজয়ের মধ্যেও আজ ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমি আশা করি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির নিগূঢ় মর্মবাণীর ধারক ও বাহক হইয়া ভারতবর্ষকে ঐক্যের পথে লইয়া যাইবে। বাঙ্গালী কোন প্রদেশেই প্রবাসী নহে। সব প্রদেশ লইয়া এমন মনোরম দেশ সে নির্মাণ করিতে চাহে, যাহা প্রাকৃতিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া অসীম আকাশকে সর্বদেশের অভিলষিত অমৃতলোককে স্পর্শ করে।" উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার সম্পূর্ণানন্দ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪ শতেরও অধিক প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন, তন্মধ্যে ১২৫ জন ছিলেন মহিলা। ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী বাঙ্গালীদের কথা—বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রচনাবলীর নামোল্লেখ করিয়া বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ণনা করেন। তিনি যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি, ক্রমোন্নতি ও দেশের রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই মহৎ সাহিত্যের প্রভাবের কথা বিবৃত করিতে থাকেন, শ্রোতৃবর্গ হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে বহুবার অভিনন্দিত করে। তাহার পর মূল-সভাপতি ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্য-কর্মীদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বাংলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক ও অখণ্ড। রাষ্ট্র নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে, এই সীমাকে তাঁহারা স্বীকার করেন না। ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের সীমা-রেখার ঊর্ধ্বে। বাংলা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন চেতনা আসিয়াছে—এই নূতন চেতনা হইতেই নূতন জীবনের সৃষ্টি হইবে।" সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অসুস্থতাবশতঃ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই—তিনি যে লিখিত অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্মিলনে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত হয়। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার অভিভাষণে লিখিয়াছেন—"সাহিত্যের উপজীব্য মানুষ এবং মানুষই সাহিত্য রচয়িতা। তাই হৃদয়ের কথাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু। আর প্রধানতঃ মানুষই যখন সাহিত্যের উপজীব্য, তখন মূল মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষটারই প্রয়োজন। মানুষই পরম পুরুষ। সাহিত্যের সৌধ ইদানীন্তনের ভিত্তিতে চিরন্তনের সৌধ। সীমান্বিতা পৃথিবীকে ঘিরিয়া অন্তহীন নীলাম্বরের আয়োজন। বাংলা সাহিত্যের প্রাণধারা বিচিত্র স্রোতে প্রবহমান। কিন্তু সর্বত্রই কেমন যেন একটা হতাশার সুর, নিষ্ফলতার চেতনা। সাহিত্য-কর্মী শুধু সাহিত্য শিল্পী নয়, সে জীবন-শিল্পী। তাহাকে হইতে হইবে সুন্দরের সাধক, আনন্দময়ের সাধক এবং উহাকেই প্রতিফলিত করিতে হইবে তাহাকে নিজের জীবনে।" দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখায় অধ্যাপক গোপাল হালদার, মহিলা শাখায় শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শাখায় বিশিষ্ট হিন্দি লেখক শ্রীঅমৃতলাল নাগর এবং সঙ্গীত শাখায় শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতি হইয়া নিজ নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন। শুক্রবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠান হয়, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ও রাজনীতিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"গত শতাব্দীতে পরিবারের জন্য আত্মত্যাগই ছিল নারীত্বের আদর্শ। নারীর জীবন সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরের জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। প্রথম যুগের লেখিকাদের রচনা তাই নারীর জীবনের গতানুগতিক ভার বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরবর্তী যুগে জীবন সংগ্রামের সংঘাতের মধ্যে অবতীর্ণা নারীর জীবনে ফুটিয়া উঠিল নূতন চেতনা, জীবনের বাস্তবরূপ। পরবর্তী যুগের অনেক লেখিকার রচনাতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, আত্মবোধের সুস্পষ্ট দ্যোতনা।" তৃতীয় দিনের অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। শেষ বক্তৃতায় সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন বাংলার দুঃস্থ লেখক ও সাহিত্যিকবৃন্দকে আর্থিক সাহায্য দান করিতে বাঙ্গালীদিগের নিকট আবেদন জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় লেখকের নাম উল্লেখ করেন—যাঁহারা বাস্তবিকই অর্থাভাবে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতেছেন। শেষ দিনে শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস আই-সি-এসকে পুনরায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি করিয়া নূতন কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে—সহ-সভাপতি হইয়াছেন, নয়া দিল্লীর শ্রীরাসবিহারী সেন, এলাহাবাদের শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর, লক্ষ্ণৌয়ের ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতার ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক—দিল্লীর অধ্যাপক—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী ও বহু সদস্য লইয়া আগামী বৎসরের কার্য ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইভাবে তিন দিনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ তাহাদের সম্মিলন শেষ করিয়াছেন।

পথে পথে নাম-সংকীর্তন—

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পৌত্র, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পুত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ রাজকার্যের অবসরে পথে পথে নাম সংকীর্তন করিয়া দেশবাসীকে ধর্মালোচনার প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। গত ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার ২৪ পরগণার শ্রীপাট পানিহাটী গ্রামে ও ১লা জানুয়ারী শনিবার দক্ষিণেশ্বর ও আরিয়াদহ গ্রামের পথে পথে ঐ ভাবে নাম সংকীর্তন হইয়াছিল। প্রতিদিনই প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল তরুণকান্তির সহিত হাজার হাজার লোক খোল ও করতাল সহযোগে হরিনাম কীর্তন করিয়া গ্রামগুলির পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এ যুগে এই দৃশ্য অসাধারণ

অভিনব। শ্রীমান তরুণকান্তি প্রায়ই ঐ ভাবে গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধর্মহীন, জড়বাদজর্জরিত যুগে এই নাম-সংকীর্তন মানুষের মনে নূতন চেতনা আনিয়া দিবে। তাঁহার মত অল্পবয়স্ক, ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে এই কাজে অগ্রণী হইতে দেখিয়া মানুষের মনে নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতেছে—দেশ ধর্মহীন হইয়া যে দুর্নীতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা দূর হইবার আর বিলম্ব নাই।

আচার্য্য ভাবের পশ্চিমবঙ্গে আগমন—

ভূদান যজ্ঞের নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবে গত ১লা জানুয়ারী সকাল ৫টা ৩৬ মিনিটে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ বহু ভূদান যজ্ঞ কর্মীর সহিত মানভূম (বিহার) জেলা হইতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মুরধু গ্রামে পদার্পণ করেন ও ঐ স্থান হইতে ৪ মাইল দূরে শালতোড়ায় গমন করেন। ঐ পথে বহু তোরণ নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হয় ও শালতোড়ায় শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। ঐ ৪ মাইল পথের দুধারে এই ঠাণ্ডায় হাজার হাজার লোক সমবেত ছিল এবং গৃহসমূহ পত্রপুষ্প সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজগন্নাথ কোলে, ডাক্তার নৃপেন বসু, শ্রীকানাইলাল দে ও শ্রীআশা দেবী সীমান্তে আচার্য্য ভাবেকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সীমান্ত হইতে বিহারের কর্মীরা বিদায় গ্রহণ করেন ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা ভাবেজীর সঙ্গী হন। বিনোবাজী ২৫ দিন ধরিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়া পদব্রজে গমন করিবেন। সর্বত্র তাঁহার বিরাট সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর বার্ষিক অধিবেশনে গত ২৯শে ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীঅতুল্য ঘোষ পুনরায় দুই বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপে কার্য্যনির্বাহক মনোনীত করিয়াছেন। সহ-সভাপতি—শ্রীকালোবরণ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিকদার ও শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক—শ্রীবিজয় সিং। সম্পাদক-গণ—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীআভা মাইতি। সদস্যগণ—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তী, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, জনাব আবদুল সাত্তার, শ্রীবসন্তলাল মুরারকা, শ্রীদুর্গাপদ সিংহ, শ্রীথিওডার মিলিয়ন, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়সিংহ, শ্রীজগন্নাথ কোলে, শ্রীসুহৃদ রুদ্র ও শ্রীমহারাজা বসু। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সংগঠন ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

বিদ্যানগরে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন—

২৪পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার মধ্যে বিদ্যানগর একটি নূতন ও অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। গত ১৮ই ডিসেম্বর তথায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মিলন হইয়াছিল। খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। ২৪পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে অভ্যর্থনা করেন ও অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ উপলক্ষে তথায় একটি প্রদর্শনীও হইয়াছিল! পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুঃখদুর্দশার অবসান এখনও হয় নাই। যাহাতে সত্বর সে ব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থার জন্যই এই বার্ষিক সম্মিলনের প্রয়োজন। ঐ উপলক্ষে বিদ্যানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও সকলকে দেখান হইয়াছে। এইরূপ সুদূর পল্লীগ্রামে যত অধিক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, ততই প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ ঘটিবে।

জলঙ্গীর তীরে—

কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাংলা দেশে সর্বজনপরিচিত। তিনি আজীবন দেশসেবাব্রতী। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য হইয়াছেন। গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখের কথাবার্তা পত্রিকায় তিনি 'জলঙ্গীর তীরে' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকের মনে নূতন ভাব আনয়ন করিবে। কবি বর্তমানে জলঙ্গীর তীরে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে (জেলা নদীয়া) সপরিবারে বাস করিতেছেন। তিনি সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া সহরে বর্দ্ধিত হইলেও পল্লীসেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—"কলিকাতার গলির মধ্যে সেই পুঁথিপত্রের সঙ্গে কারবার করতে করতে জীবনটা যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। চাকুরীর বাঁধাধরা রাস্তায় নিরাপত্তা ছিল। বৈঠকখানার আলাপ আলোচনার মধ্যে আনন্দ ছিল না—এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু প্রাণ চাইছিল, মাটীর নিবিড় সঙ্গ। প্রকৃতির সঙ্গে থাকবো, তাকে নিরন্তর দেখবো, তার সঙ্গে কথা কইবো—এই পিপাসা ভিতরে ভিতরে দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। শহরে জীবনের একটুখানি গণ্ডীর মধ্যে হয়ে যাচ্ছিলাম যেন জরদ্গব। প্রকৃতির কাছ থেকেই কি আমরা প্রাণরস আহরণ করি নে? প্রচুর সূর্য্যালোক ও নির্মল বাতাসের অভাবে আমরা কি জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলি নে? তবু জনাকীর্ণ সহরগুলোতে জীবন দিনে দিনে ধীরে ধীরে যাচ্ছে বিষিয়ে।" এই কথা আজ দেশবাসীর বুঝিবার দিন আসিয়াছে। কবি বিজয়লালের আদর্শ অনুকরণযোগ্য।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হাসপাতাল। মেডিকেল কলেজ—কলিকাতা। টেবিলের উপর সঞ্জীব শুইয়া আছে। পাশে ডাক্তার ও সহকারীরা—তাহার দেহ হইতে রক্ত লইতেছে। রক্ত লওয়া শেষ হইলে—সঞ্জীব উঠিল।

সঞ্জীব। আমি উঠতে পারি?

ডাক্তার। হ্যাঁ—হ্যাঁ। উঠতে পারেন বই কি!

সঞ্জীব। এই রক্তেই হবে? না আরও রক্ত লাগবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। সে তো আমি বলতে পারব না। আমি আপনার শরীর থেকে ম্যাক্সিমাম যতটা নেওয়া যায়—নিয়েছি।

সঞ্জীব। কিন্তু আরও তো দরকার হতে পারে?

ডাক্তার। তা পারে বই কি।

সঞ্জীব। আমি একবার ক্যাপটেন মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করব। আপনি দয়া ক'রে—

ডাক্তার। দেখছি আমি তাঁকে।

প্রস্থান

সঞ্জীব পদচারণা করিতে লাগিল—প্রবেশ করিলেন পরমেশ্বর

পরমেশ্বর। কালী ব'লে একটু স্থির হয়ে নে ভাই।

সঞ্জীব। পরমদাদু!

পরমেশ্বর। কালী ব'লে পরমদাদুর পরমায়ু শেষ হয় না, তোদের এই সব দুঃখ দেখতে বেঁচে থাকতে হয়। কালীকে বলি—মাগো—তোর ক্ষ্যাপামীর নাচন এইবার শেষ কর মা, তা—বাজিয়ে ক্ষ্যাপা মহাকাল—তার ডম্বুরুতে বাজনায় তেহাই দেয় না—টেনে যায় উম্বুরু বাম্বি। পাগলী বেটীর থামা হয় না। পরমকে দেখতে হয়। বেটী এ বয়সেও চোখ নিলে না, কানে খাটো করলে না। বুদ্ধিকে জড়পিণ্ডি বানালে না! কালী কালী বল মন; কালী কালী!

সঞ্জীব। সুমিতা কি বাঁচবে না দাদু?

পরমেশ্বর। জানি না ভাই। কালী বলে—এই পাকা চুল-দাড়ী নিয়ে—তোকে সান্ত্বনা দেবার ছলেও মিছে কথা বলতে পারব না। তবে এই কথাটা কালী বলে জানি—জীবন-মরণের মালিক পাগলী বেটীর ইচ্ছে—কালী বলে কালীই জানে আর কেউ জানে না। সব তার খেলা।

সঞ্জীব। আমি কি করব বলতে পার দাদু?

পরমেশ্বর। কালী বলে—স্থির হয়ে দেখবি। আঘাত আসে কালী ব'লে সহ্য করবি।

সঞ্জীব। পারব না। সে আমি পারব না দাদু।

পরমেশ্বর। পারবি না তো এমন কাজ—কালী বলে—করলি কেন? ওরে সুমিতার অপমান করতে গেলি কেন?

সঞ্জীব। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল, তারপর বলিল) আমার কথা বিশ্বাস করবে দাদু?

পরম। কালী বলে—অবিশ্বাস ক'রে লাভ কি সঞ্জীব? ঠকতে হয় বিশ্বাস ক'রে ঠকাই ভাল। অবিশ্বাস ক'রে ঠকলে—কালী বলে—লাভ শুধু মনের কালীর দারুণ লজ্জা।

সঞ্জীব। ইচ্ছে ক'রে সুমিতার অপমান করতে আমি চাই নি। তুমি বিশ্বাস কর—ইচ্ছে ক'রে আমি চাই নি। একদিন যেদিন সুমিতার কঠোর কথা শুনে ছুটে বেরিয়েছিলাম বমিংয়ের মধ্যে সেদিন মরতে চেয়েছিলাম। তারপর বিচিত্র ঘটনায় কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—আমার সামনে খুলে গেল, উপার্জ্জনের পথ—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দরজা—

পরম। কালী কালী কালী কালী। লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দরজা নয় রে—বল কুবেরের ঘরের তোষাখানার দরজা। ওরে পাগল—লক্ষ্মীর ঘরের দরজা খুলবে কি ক'রে, তোর জীবনের লক্ষ্মী সুমিতা—লক্ষ্মীর ঘরের দরজা কি—সে নইলে খোলে ?

সঞ্জীব। ঠিক বলেছ দাদু। যক্ষপুরীর দরজা। যক্ষপুরীই বটে। যক্ষপুরীর বাতাসে মায়ায় যাদুতে আমার কি হয়ে গেল। আমি অর্থকেই মনে করলাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনে বুঝলাম—সুমিতা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, ঘৃণা করেছে—আমি সম্পদহীন বলে—মনের জ্বালায় মদ খেতাম। ধীরে ধীরে মদকে মনে হল অমৃত। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। জান দাদু—মদ খেয়ে আমি রাত্রে চীৎকার করতাম—সুমিতার নাম ধ'রে।

২য় ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। ডাক্তার সেন বললেন—আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সঞ্জীব। হ্যাঁ ক্যাপ্‌টেন মুখার্জ্জী! আর কি রক্তের দরকার হবে ?

ডাক্তার। সম্ভবত আর হবে না। রক্ত তো অনেকটাই দিয়েছেন আপনারা। আপনি দিয়েছেন—উনি দিয়েছেন। (পরমকে দেখাইয়া দিল)

সঞ্জীব। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ক্যাপটেন মুখার্জ্জী।

ডাক্তার। আপনি কেন উতলা হচ্ছেন সঞ্জীববাবু। উণ্ড্ তো খুব সিরিয়াস নয়। আমি তো জানিয়েছি আপনাকে—গুলিটা বেরিয়ে গেছে পাশ দিয়ে, লাংস ছোঁয় নি। পাঁজরার হাড় ভেঙেছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। একমাত্র রক্তপাত হয়েছে বেশী।

পরমেশ্বর। জয় কালী জয় কালী। কালী করুণাময়ী। আয় ভাই এখন বাড়ী আয়।

সঞ্জীব। আমি একবার এক নজর উঁকি মেরে দেখে যেতে চাই ক্যাপটেন মুখার্জ্জী।

ডাক্তার। সেটা ঠিক হবে না। নিয়ম নেই, আপনার উচিত নয়। আমি বলব ভিজিটিং আওয়ারেও এখন আপনার কাছে আসা উচিত হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

বাউল গান গাহিয়া চলিয়াছে

মিছে কালো চোখের গরব
করিস আমার মন।
কালোর ছলায়—ভুলের ভোলায়
হারায় পরম ধন॥
চোখের তারায় কালোর ছটা
মণি ঘিরে ভুলের ঘটা
পরকে ভোলায়—আমি ভোলে
ভুল হয়ে যায় পর-আপন।
হায় কালো কেশে মন হারালি
ফুলের মালা তায় জড়ালি—
ভুল ভাঙিল চুলের বেণী
হইল ভুজঙ্গম—
ও হায়—কোথায় বাঁধন দিবি, কৈল
মনকে দংশন।

ক্রমশঃ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

১১ই জানুয়ারী বাঁকুড়া জেলার ওন্দায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে ভূদান যজ্ঞের নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলেন—বাংলার খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় আমার সহিত দেখা করিয়াছেন ও কিছু সম্পত্তি দানও করিয়াছেন। ইহা 'বায়না' স্বরূপ। আমি তাঁহার নিকট বাক-দান বা বিচার-দান চাই। বেদে আছে, দেবী সরস্বতী শক্তিমতী—তিনি আক্রমণ ও জয় করিতে পারেন। তিনি বুদ্ধিরও দেবী—কাজেই তাঁহার শক্তি অসাধারণ। বাক-এর মাধ্যমে চিন্তা প্রকাশিত হয়—তাহা মুখেই হউক বা লিখিত ভাবেই হউক। চিন্তা-শক্তি ও বাক-শক্তি মিলিত হইয়া অধিক শক্তিমান হয়। সে জন্য আমরা বাক্ শক্তি, বিচার শক্তি ও জ্ঞান শক্তির উপর নির্ভর করি। বাংলার লোক সাহিত্য দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয়—বাংলা সাহিত্য শুধু বাংলাকে নহে, সমগ্র ভারতকে শক্তি দান করিয়াছে। সর্বত্র সাহিত্যের শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেজন্য আমি বাংলার সাহিত্যিকগণকে ভূদান-যজ্ঞে সহযোগী হইতে আহ্বান করি। সাহিত্যিকরা তীক্ষ্ণ ও ধীর শক্তি ধারণ করেন—আমি তাঁহাদের নাম-দান করিতে অনুরোধ করি। সাহিত্য বাংলা দেশে যে প্রভাব বিস্তার করিবে, অন্য কোন শক্তি দ্বারা তাহা হইবে না।" তারাশঙ্করবাবু আচার্য্য ভাবের সহিত সাক্ষাৎ করায় ভূদান যজ্ঞের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইল।

সংবাদপত্র জগতে বাঙ্গালার গৌরব—

ভারতে সংবাদপত্রশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের পর প্রেস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—বাংলা ভারতীয় সংবাদপত্র ক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনীতিক আলোচনায় অগ্রণী হইবার দাবী করিতে পারে। বাংলা ও ইংরাজি সংবাদপত্র ছাড়াও প্রথম পার্শী সংবাদপত্র, প্রথম উর্দু সংবাদপত্র ও প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংবাদিকতা প্রথম দিকে বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতেই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিল। সর্বাধিক পরিমাণে সংবাদ সরবরাহের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা বিখ্যাত এবং এক স্থান হইতে ভারতের যে কোন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক-প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা। ভারতের মোট ৪৭৬৯ পত্রিকার মধ্যে ৩৩০খানা দৈনিক, ১৬৮৫ মাসিক, ১১৮৯ সাপ্তাহিক। ভারতে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায় হইল সংবাদ-পত্রের মূল্যাধিক্য ও অসন্তোষজনক বন্টন ব্যবস্থা। সাংবাদিকতার ইতিহাস কমিশনের পক্ষ হইতে শ্রীজে- নটরাজমের নির্দেশে রচিত হইয়াছে। এই সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার ভারতের সকল অধিবাসীদের, বিশেষতঃ সাংবাদিকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া সাংবাদিকতার উন্নতি বিধানের উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হইবে।

বাঙালী মহিলার সম্মান লাভ—

কুমারী অণিমা সেনগুপ্তাকে এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

কুমারী অণিমা সেনগুপ্তা

তিনি সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। কুমারী সেনগুপ্তা পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অন্যতম অধ্যাপিকা।

শিল্পীর দান—

গত ১৬ই অক্টোবর দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা) রাজনারায়ণ বসু গ্রন্থাগারে মহাত্মা রাজনারায়ণের একটি প্লাষ্টার নির্মিত আবক্ষ মূর্তি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম মন্ত্রী শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পী শ্রীরাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী স্বহস্তনির্মিত এই মূর্তিটি

রাজ নারায়ণ বসু স্মৃতি স্তম্ভ

গ্রন্থাগারকে দান করেন। রাধিকাবল্লভ শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ও দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কলা বিভাগের শিক্ষক। তাঁহার এই দান প্রশংসনীয়। গ্রন্থাগারের অবস্থাও ক্রমেই অবনতির দিকে—এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজের মনোযোগ দান প্রশংসনীয়।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার প্রবীণ ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্প্রতি ভারত সরকার মাসিক একশত টাকা 'সাহিত্যিক বৃত্তি' দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মণিলালবাবু ৫০ বৎসর কাল সাহিত্য সেবা করিয়াছেন—বর্তমানে তিনি অসুস্থ। তাঁহাকে বৃত্তিদান করিয়া সরকার শুধু গুণের সমাদর করেন নাই, একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিভার জন্য পুরস্কৃত করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। আমরা দাতা ও গ্রহীতা উভয়পক্ষকেই অভিনন্দিত করি।

শরীর-সাধক শ্রীনীতিন মণ্ডল—

সম্প্রতি বরানগর শরৎচন্দ্র বিদ্যামন্দিরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুমার বিশ্বনাথ রায় এম. এল. এ. সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রধান অতিথি ছিলেন। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। নেপাল মহারাজের পারিবারিক ব্যায়াম শিক্ষক সুদেহী শ্রীনীতিন মণ্ডল তথায় নানা প্রকার ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া দর্শকদের অসামান্য প্রশংসা অর্জন করেন। আমরাও শ্রীমান মণ্ডলের সুন্দর স্বাস্থ্য
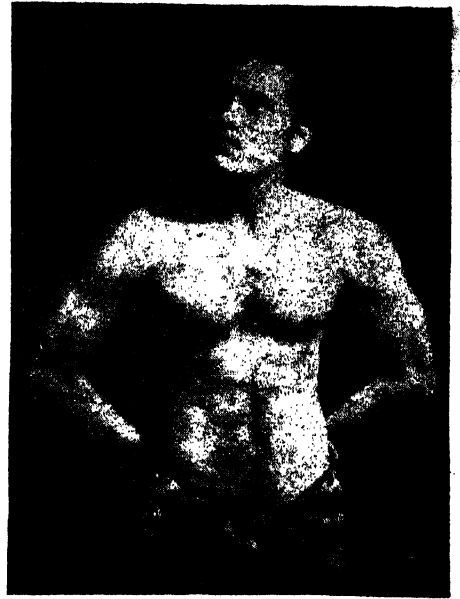
শরীর সাধক নীতিন মণ্ডল

এবং ব্যায়াম ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীমানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ডাঃ এস-কে-গুপ্ত—

ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম-এ, বি-এল (কলিঃ) এম-এ, বি-লিট (অক্সফোর্ড), পি-এইচ-ডি (বার্ণ) সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার, শিক্ষাব্রতী ও দেশের ক্রীড়াবিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান

হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও ৮৬ বৎসর বয়সের অতিবৃদ্ধা জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন। ডাঃ গুপ্ত প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ২৫ বৎসর ধরিয়া আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ৪১ বৎসর কাল কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ বিভাগে পরীক্ষক ও সদস্যরূপে তিনি বহুকাল ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা

ডাঃ এস. কে. গুপ্ত

করিয়াছিলেন। ক্রীড়া বিভাগে ও কলি: ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য বিবিধ ক্রীড়া-সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এক সময় তিনি আই-এফ-এ-রও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

বোম্বায়ে বাঙ্গালী শিল্পী সম্মানিত—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায় বোম্বায়ের খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী ও সার জে-জে-শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি গত ১৯শে মে রাত্রিতে এপোলো বন্দরে সমুদ্র হইতে একটি নিমজ্জমান মুসলেম মহিলাকে একা সাঁতার কাটিয়া উদ্ধার করায় বোম্বায়ের পুলিস কমিশনার এক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে এক বিশেষ পুরস্কার দান করিয়াছেন। বাঙ্গালী শিল্পীর
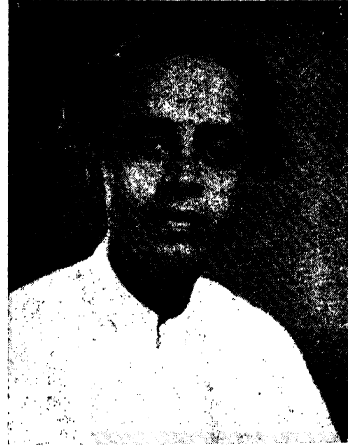
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়

এই দুর্জয় সাহসিকতার জন্য বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব অনুভব করিবে।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ
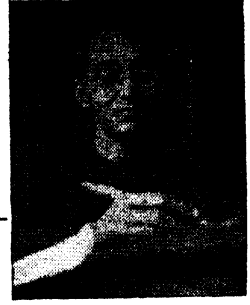
ইংলণ্ড ঃ ১৯১ (কাউড্রে ১০২, বেলী ৩০। আর্চার ৩৩ রানে ৪ এবং মিলার ১৪ রানে ৩ উইকেট) ও ২৭৯ (মে ৯১, হাটন ৪২, ওয়ার্ডলে ৩৮। জনষ্টন ৮৫ রানে ৫ এবং আর্চার ৫০ রানে ২ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৩১ (ম্যাডকস ৪৭, জনষ্টন নট আউট ৩৩। ষ্টেথাম ৬০ রানে ৫ এবং টাইসন ৬৮ রানে ২ উইকেট) ও ১১১ (ফ্যাভেল ৩০। টাইসন ২৭ রানে ৭ এবং ষ্টেথাম ৩৮ রানে ২ উইকেট)

মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড ১২৮ রানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে। অষ্ট্রেলিয়া ১ম টেষ্ট খেলায় ১ ইনিংস ও ১৫৪ রানে জয়ী হয়। ইংলণ্ড ২য় টেষ্ট খেলায় ৩৮ রানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। ফলে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড ২-১ টেষ্ট খেলায় অগ্রগামী আছে। দু'টি টেষ্টম্যাচ আর বাকি।

ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলাতেই ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ১৯১ রানে শেষ হয়। দারুণ বিপর্য্যয় থেকে ইংলণ্ডের মান রাখলেন তরুণ খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে। তিনি ১০২ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১৮৮ রান করে ৮ উইকেটে। ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৩১ রানে শেষ হলে অষ্ট্রেলিয়া ৪০ রানে অগ্রগামী থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের ৩ উইকেটে ১৫৯ রান ক'রে ১১৯ এগিয়ে যায়। খেলার ৪র্থ দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হয় ২৭৯ রানে। অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল অষ্ট্রেলিয়ার ৭৫ রান উঠেছে, ২ উইকেট পড়ে। তখন অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের জন্য ১৬৫ রান প্রয়োজন, হাতে জমা ৮টা উইকেট। খেলার এ অবস্থায় উভয় দলেরই পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা সমান সমান ছিল। কিন্তু ৫ম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত আশা নির্মুল করলেন ইংলণ্ডের দুই বোলার টাইসন এবং ষ্টেথাম। এই দিন টাইসন ৬টা উইকেট পেলেন ১৬ রানে। ২য় ইনিংসে তিনি উইকেট পান ৭টা ২৭ রানে। ৫ম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৮টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৩৬ রানে, ৮০ মিনিটের খেলায়। ২য় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার বিপর্যয়ের মূলে ছিলেন ইংলণ্ডের এই তিনজন খেলোয়াড়—টাইসন, ষ্টেথাম এবং উইকেটকিপার গড্ক্রে ইভান্স। ইভান্স তিনটে ক্যাচ ধরেছিলেন। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৩য় টেষ্ট খেলায় টিকিট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭,৯৩৩ অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড (আনুমানিক ৪,৭৯,৩৩০ টাকা)। অষ্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত কোন ক্রিকেট খেলায় এত অধিক অর্থ টিকিট বিক্রয় বাবদ ইতিপুর্ব্বে পাওয়া যায় নি।

ইংলণ্ড ঃ ১৫৪ (ওয়ার্ডলে ৩৫। আর্চার ১২ রানে ৩, জনষ্টন ৫৬ রানে ৩ এবং ডেভিডসন ৩৪ রানে ২) ও ২৯৬ (মে ১০৪, কাউড্রে ৫৪। আর্চার ৫৩ রানে ৩, লিণ্ডওয়াল ৬৯ রানে ৩ এবং জনষ্টন ৭০ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২২৮ (আর্চার ৪৯। বেলী ৫৯ রানে ৪ এবং টাইসন ৪৫ রানে ৪ উইকেট) ও ১৮৪ (হার্ভে নট আউট ৯২। টাইসন ৮৫ রানে ৬ এবং ষ্টেথাম ৪৫ রানে ৩ উইকেট)

সিডনির ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৩৮ রানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে ২টো উইকেট পড়ে ৭২ রান হয়েছে ; অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্যে তখনও ১৫১ রান প্রয়োজন, হাতে ৮টা উইকেট জমা। খেলার এ অবস্থায় দুই দলেরই পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা সমান সমান ছিল। খেলার ৫ম দিনে ইংলণ্ডের বোলার টাইসনের বোলিং সাফল্য অষ্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অষ্ট্রেলিয়ার বাকি ৮টা উইকেটের মধ্যে টাইসন একাই পেলেন ৫টা। ২য় ইনিংসে তিনি মোট উইকেট পেলেন ৬টা, ৮৫ রানে। ইংলণ্ডের এই আক্রমণের মুখে নির্ভীকভাবে খেলে অজেয় থেকে যান নীল হার্ভে ; ২৫৯ মিনিটের খেলায় তিনি ৯২ রান করেন, বাউণ্ডারী ৯টা। খেলাটা একরকম দাঁড়িয়েছিলো হার্ভে বনাম ইংলণ্ড।

ভারতবর্ষ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান ঃ ২৫৭ (ইমতিয়াজ আমেদ ৫৪, ওয়াকার হাসান ৫২, হানিফ মহম্মদ ৪১। গোলাম আমেদ ১০৯ রানে ৫ এবং রামচাঁদ ১৯ রানে ২ উইকেট) ও ১৫৮ (আলিমুদ্দিন ৫১, ওয়াকার হাসান ৫১। সুভাষ গুপ্তে ১৮ রানে ৫ এবং ফাদকার ৫৭ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ১৪৮ (রামচাঁদ ৩৭, উমরীগড় ৩২। মামুদ হোসেন ৬১ রানে ৬ এবং খান মহম্মদ ৪২ রানে ৪ উইকেট) ও ১৪৭ (২ উইকেটে, পঙ্কজ রায় নট আউট ৬৭, মঞ্জরেকার নট আউট ৭৪। খাঁন মহম্মদ ১৮ রানে ২ উইকেট)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলা হয় ম্যাটিং উইকেটে। টসে জয়ী হয়ে পাকিস্তান প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ২০৭ রান করে ৫ উইকেটে। ২য় দিনের খেলায় বাকি ৫ উইকেটে পাকিস্তানের আর ৫০ রান যোগ হয়। ১ম ইনিংস শেষ হয় ২৫৭ রানে। ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১১৫ রানে। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয় ১৪৮ রানে। ফলে পাকিস্তান ১০৯ রানে এগিয়ে যায়। ৩য় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল পাকিস্তানের ১টা উইকেট পড়ে রান হয়েছে ৯৭। অত্যন্ত মন্থরগতিতে রান ওঠে। খেলার ৪র্থ দিনে অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় পাকিস্তানের ২য় ইনিংস শেষ হয় ১৫৮ রানে। ভারতবর্ষ ২৬৭ রান পিছিয়ে থেকে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে—হাতে সময় ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ২ উইকেট পড়ে যায়, রান হয় মাত্র ১৭। ভারতবর্ষের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। ৩য় উইকেটে পঙ্কজ রায় এবং মঞ্জরেকার জুটি বেঁধে ভারতবর্ষের খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁদের জুটিতে ১২৯ রান ওঠে এবং উভয়ই খেলার শেষ সময় পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। এই দু'জন খেলোয়াড়ের নির্ভীক খেলার দরুণই ভারতবর্ষ খেলাটা ড্র ক'রে শেষ পর্য্যন্ত মানসম্ভ্রম বজায় রাখে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

ত্রয়োদশ বাৎসরিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের দলগত বিভাগে প্রথম স্থান লাভ ক'রে ভিক্টোরিয়া ট্রফী জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুপরি চারবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। পাঞ্জাব ৪৬ পয়েন্ট পেয়ে ১ম, সিংহল ৪১ পয়েন্ট নিয়ে ২য় এবং মহীশূর ২৪½ পয়েন্ট নিয়ে ৩য় স্থান পায়।

এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে উপর্যুপরি তিনবার কলম্বো কাপ জয়ী হ'ল। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বছরের খেলায় ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান যুগ্মভাবে কলম্বো কাপ লাভ করে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় মোট তিনটী খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ ২টিতে জয়ী হয়, সিংহলের বিপক্ষে খেলা ড্র করে। এই খেলায় ভারতবর্ষের দু'জন খেলোয়াড় ভেঙ্কটাস ও লায়েক আহত হ'ন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতবর্ষ দশজন নিয়ে খেলে, আহত লায়েক রাইট আউট হিসাবে খেলতে নামেন। তিনটি খেলাতেই ভারতবর্ষ গোল দেওয়ার অনেক সুযোগ নষ্ট করে। সেণ্টার হাফে চন্দন সিংয়ের খুব খারাপ খেলা স্বত্বেও তিনটি খেলাতেই তাঁকে নির্ব্বাচন করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় (যেখানে দুই দলেরই সমান সমান পয়েণ্ট) হঠাৎ লেফট আউটে জগন্নাথনকে নির্ব্বাচন করায় দর্শকরা যা আনন্দের খোরাক পেয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতবর্ষের তিনটি গোলই দেন সার্ভিসদলের পুরণ বাহাদুর।

লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ভারতবর্ষ	৩	২	১	০	৬	৩	৫
সিংহল	৩	১	১	১	৪	৪	৩
পাকিস্তান	৩	১	১	১	৪	৫	৩
ব্রহ্মদেশ	৩	০	১	২	৩	৫	১

ডেভিস কাপ ঃ

আন্তর্জ্জাতিক লন টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা ৩-২ খেলায় গত তিন বছরের (১৯১০ সাল থেকে) বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ পেয়েছে। মোট ৫টি খেলা হয়—৪টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডবলস। আমেরিকা ২টি সিঙ্গলস এবং ডবলস খেলায় জয়ী হয়ে ৩-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। অষ্ট্রেলিয়া শেষ সিঙ্গলস খেলা দুইটিতে জয়ী হয়।

নিরুদ্দেশ ঃ শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঃ

লেখক আপনার বৈশিষ্ট্যে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। নিরুদ্দেশ তাহার নবতম উপন্যাস। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—যাঁহারা দিবানিদ্রার অনুপানরূপে বা রেলগাড়ীতে চড়িয়া সময় ক্ষেপণের অবলেহরূপে এই উপন্যাসে সুষ্ঠু সঙ্গত গল্প খুঁজিবেন তাহারা হতাশ হইবেন। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কোন গল্প ইহাতে নাই সত্য, কিন্তু যে গল্প আছে তাহা একটি গ্রামের একশত বৎসরের ক্রম বিবর্ত্তনের গল্প—যাহা প্রতি পৃষ্ঠায় ভাবাইয়া তুলে এবং প্রশ্ন জাগায় আমরা কোন নিরুদ্দেশের পথে চলিতেছি?

একদা আমাদের গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ—স্নেহ মমতা সহানুভূতিতে নিকটতর। তেমনি একগ্রাম গোপালপুরের জমিদার ভগবতী চাটুয্যে। তিনি পুত্রাধিক স্নেহে গ্রামকে পালন করিয়াছেন শাসন করিয়াছেন এবং বিপদে আপনার সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়াছেন। প্রজারা, গ্রামবাসী তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ভয় করিত ভালবাসিত। গল্পের প্রথম পর্ব্বে এই শান্ত সুন্দর গোপালপুরের ছবি অনবদ্য সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেখানে ছিল ত্যাগ, ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

তাহার পর আসিল নূতন বৈদেশিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি—সমাজে ভাঙ্গন ধরিল, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক জগতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাঙ্গন ধরিল অন্তরে। মানুষ অকস্মাৎ তাহার ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ছাড়িয়া হইল আত্মকেন্দ্রিক—সমাজ ও পরিবারে বাড়াইয়া তুলিল নিজের দুঃখ।

পুরুষানুক্রমে চলিল এই পরিবর্ত্তন, মন হইল আত্মসর্ব্বস্ব, নিজের স্বার্থপরতা ও লোভই তাহার জীবনকে করিয়া তুলিল দুর্ব্বিবহ। প্রাচুর্য্যের মাঝে আসিল দৈন্য। জনারণ্যে মানুষের জীবন ভরিয়া উঠিল নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য তাহার হৃদয় শোষণ করিয়া করিল বিশুষ্ক। জগৎ আগাইতেছে—হৃদয় পিছাইতেছে—ইহাই বর্ত্তমানের প্রতিচ্ছবি। বিগত এক শতাব্দীর ইতিহাসের মাঝে আত্মগোপন করিয়া আছে শাশ্বত—সত্য। লেখক নিষ্ঠুর চরিত্র-সংঘাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মানুষের মনের এই দৈন্য এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন দৈনন্দিন জীবনের গভীর একাকীত্ব, দুঃসহ নিঃসঙ্গতা।

জমিদার ভগবতী চাটুয্যে, পুরোহিত গোপাল, জমিদার তনয় চাঁদমোহন, পণ্ডিত মতি ঠাকুর, পুত্র হরিহর প্রভৃতির চরিত্র আপন আপন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ হইয়া জাগতিক এই পরিবর্ত্তনকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার মধ্যে তুচ্ছ পুরোহিত গোপালের চরিত্র ও উদারতা অরণ্যের বনস্পতির মত বৃহৎ ও সুন্দররূপে উন্নতশীর্ষ ও নমস্য হইয়া রহিয়াছে।

উপন্যাসের পটভূমিকা বিরাট, বহু চরিত্র তাহার মধ্যে ভীড় পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহাদের পরস্পর ধুধু সংঘাতের মাঝে সমাজের ক্রম বিবর্ত্তনের যে রূপটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা চিন্তাশীল পাঠককে ভাবাইয়া তুলিবে, অভিভূত করিবে। বার বার প্রশ্ন জাগাইবে—উজ্জ্বল রেডিও সিনেমা অষ্টিন ক্যাডিলাকময় বর্ত্তমান অর্থলোলুপ জগতে আমরা কোথায় যাইতেছি? আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা আমরা আমন্ত্রণ করিয়াছি দুঃখ, নিঃসঙ্গতা ও অন্তরের দারিদ্র্য। বর্ত্তমান চলিয়াছে তেপান্তরের কোন নিরুদ্দেশের পথে?

বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে ও রচনা ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে 'নিরুদ্দেশ' বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব উপন্যাস একথা নিসংশয়ে বলা যায়। লেখক বলিয়াছেন," ধৃষ্টতা হইলেও বলিব ইহাতে অবসর বিনোদনের মত গল্প নাই। অবসর চিন্তার উপাদান আছে।" আপনার অন্তরকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিবার উপাদানও ইহাতে আছে। বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম সমস্যা সম্পৃক্ত এই উপন্যাস বর্ত্তমানের প্রত্যেক পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করিবে, তাহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রেরণা দিবে। এইরূপ উপন্যাসের সৃষ্টি সমাজ কল্যাণের অঙ্গ। আজ হোক্, কাল হোক, 'নিরুদ্দেশ' বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন সংগ্রহ করিবে।

[প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৪৲ টাকা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কার ভুলে ঃ শ্রীক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায় ঃ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'কার ভুলে' উপন্যাসখানি পড়ে আনন্দ পেয়েছি। আমাদের বৃহৎ সাহিত্যশালায় উৎকৃষ্ট ডিটেকটিভ্ রচনার সংখ্যা খুব বেশী না হলেও অন্তত কিছু পরিমাণ আছে তা বলা চলে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। কিন্তু তিনি জাত সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকের বোধ ও রুচি নিয়ে ডিটেকটিভ কাহিনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর রচনায় কাহিনীর মুখমণ্ডল ও গাঢ়তা যতখানি সাহিত্যিকের সার্থকতাযুক্ত, ঠিক সেই পরিমাণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কালো ছায়ার ছাপ হয়তো সেখানে নাই। এ দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দাকাহিনী রচনা করেছেন বিখ্যাত পুলিশ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল। তিনি যে ধারায় উপন্যাস রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ

চট্টোপাধ্যায় সেই ধারাতেই একটি সার্থক রচনা সংযোজন করলেন। কাহিনীর রাঁধুনী শক্ত, চরিত্রগুলি সুপরিস্ফুট ও ক্রাইম সম্পর্কে লেখকের সুস্পষ্ট ধারণাও প্রকাশিত। তিনি ভবিষ্যতে উৎকৃষ্টতর গোয়েন্দা-কাহিনী লিখতে পারবেন বলে আশা করি।

[প্রকাশক: পর্ণ-কুটীর। ৬, কামারপাড়া লেন, কলিকাতা—৩৬। দাম—১৷৷০ আনা]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাণ: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত:

শিক্ষাদীক্ষায় একান্ত অনগ্রসর গ্রামের ছেলে রাজকুমার। রাজকুমারের পিতা অশিক্ষিত মদ্যপ চরিত্রহীন। গৃহের সমস্ত শান্তি তার দ্বারা বিনষ্ট। বিষয় সম্পত্তি, এমন কি গৃহের জিনিসপত্রও একে একে সবই গেছে এবং তার নেশার খোরাক জোগাতে এখন রাজকুমারের জননীকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। এমন পিতার পুত্র হয়েও কিন্তু রাজকুমারের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'য়ে গোড়ে উঠলো। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র প্রাথমিক ইস্কুল। সে ইস্কুলের পণ্ডিত পরাণ। পরাণ গাঁয়ের সকল ছেলেমেয়ের দাদু। সেই পরাণদাদুর শিক্ষার গুণে এবং মাতার সস্নেহ উপদেশের বলে রাজকুমার দেশকে ভালোবাসতে শিখলে। শুধু নিজে শিখলে না, গ্রামের মধ্যেও সে শিক্ষা ছড়িয়ে দিলে। ফলে দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে বাধলো সংঘর্ষ। এই সময় রাজকুমারের মাতৃবিয়োগ ঘটলো এবং সে উন্নততর কাজের আহ্বানে কলকাতায় যাত্রা করল। সেখানে তার শুরু হ'ল নতুন জীবন। যে জীবনে দেখা দিলে বহু সমস্যা। রাজকুমারের জেল হ'ল। জেল থেকে বেরিয়ে ধনী নির্ধনী বহু লোকের সংস্পর্শে এলো সে। বিচিত্র বহু চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বহু নারীর সংস্পর্শেও আসতে হয়েছিল তাকে। তার মধ্যে সতী, সুরভী এবং মিনতি উল্লেখযোগ্য। নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে কাহিনী আগাগোড়া স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন এবং পরিণতিও সুন্দর।

বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব না থাকলেও কাহিনীটি পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ সজ্জা সুন্দর।

[প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা—১২। দাম—৩৷৷০ আনা।]

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব: শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল:

গুরু ভিন্ন কোনো শিক্ষা আরম্ভ করা যায় না। সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়ার প্রারম্ভেও গুরুর প্রসন্নতা একান্ত প্রয়োজন। গুরুবাদ আর্য-ঋষিদের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠমত। তাঁরা জানতেন গুরুর কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার উপায় নাই।

গুরু এবং গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক এই গ্রন্থখানিতে গল্পের ছলে বর্ণনা করেছেন। ফলে গল্প পাঠের আনন্দও এই বইখানিতে যেমন আছে তেমনি আছে সাধন পদ্ধতির উপদেশ।

আমরা বইখানি পাঠ করে তৃপ্ত হয়েছি। আশা করি পাঠকদেরও বইটি ভালো লাগবে।

[প্রকাশক: উত্তরায়ণ লিঃ। ১৭০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম—৸০ আনা।]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদসঞ্চার"—৫৲
কানাই বসু প্রণীত নাটিকা "গৃহপ্রবেশ"—২৲
সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীড় ও নারী"—৩৲,
"চিরবান্ধবী"—৩৷৷০
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ"—৫৲
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম প্রণীত "বৈষ্ণবসাহিত্যে ভক্ত-চরিত" (১ম খণ্ড)—১৷৷
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জমাট অশ্রু"—৷৷০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রনাথ" (২৬শ সং)—১৷০,
"বিন্দুর ছেলে" (উপন্যাস—২৪শ সং)—৸৵

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে মেলা

শিল্পী— শ্রীরণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ফাল্গুন—১৩৬১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারতে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

লোকসভাগৃহে ভারতের আর্থিকনীতি বিবৃত করিবার কালে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী দশ বছরে বেকার-সমস্যা দূর করিয়া দেশে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার মতে, আর্থিকনীতি স্বয়ংই কোন লক্ষ্য নহে—লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় মাত্র এবং আগামী দিনের সে সমাজচিত্র সরকার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার রূপায়নে ইহা সহায়তা করিবে। শ্রীদেশমুখ ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী দশ বছরে অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার দেশ হইতে বেকার-সমস্যা দূরীকৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং তজ্জন্য আগামী দশ বছরে বার্ষিক অন্ততঃ ২০ লক্ষ নূতন কর্ম্মের সংস্থান করিতে হইবে এবং সেই বাবদ সরকার লগ্নীখাতে প্রতি বছর আরও ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। বাস্তবিক, গত কয়েক বৎসরে দেশের বেকার-সমস্যা এমন ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে একদিকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বিস্তার ও অপরদিকে জনসাধারণের আর্থিক ক্রমাবনতি—উভয়ে মিলিয়া দেশে এক ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে নিদারুণ অভাব, অন্যদিকে এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে বিপুল অর্থ সংগ্রহ প্রয়োজন। এদিকে সরকারও প্রতি বৎসরই বিরাট ঘাটতির সম্মুখীন হইতেছেন। গত কয়েক বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি নাই, জীবিকার নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের তাহা কিনিবার সামর্থ্য নাই। একদিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা আগাইয়া চলিতেছে, অন্যদিকে

বেকার-সমস্যা ও মানুষের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে—রাষ্ট্রযন্ত্রের ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। বলা বাহুল্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে আসল সমস্যার সমাধান হইবে না। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে দেশে বিরাট শিল্পবাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রসার আবশ্যক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী অবশ্য আভাষ দিয়াছেন। সেজন্যই দেশের জনসাধারণ তাহার 'পূর্ণনিয়োগ' প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।

এখন দেখা যাউক পূর্ণনিয়োগ বলিতে আমরা কি বুঝি। অধ্যাপক পিগু বলিয়াছেন, পূর্ণনিয়োগ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি বাজার-প্রচলিত হার অনুযায়ী মজুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। অতএব বলা যায়, দেশের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেখানে কর্ম্মবিহীন অবস্থা বা অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মহীনতা মোটেই থাকিবে না। থাকিলেও তাহা অতি সামান্যতম বা নামে মাত্র থাকিবে, কারণ (১) উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা শ্রমিকের যোগান অনুযায়ী পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইবে; (২) শ্রমিকের চাহিদা সুষ্ঠুরূপে নিরূপণ করিতে হইবে, এবং (৩) শ্রমিক ও উৎপাদন ব্যবস্থা এমন সুসংবদ্ধভাবে সম্পর্কিত থাকিবে যে সাময়িকভাবে শ্রমিকের চাহিদার রদবদল হইলেও উহা যোগানের রদবদলের সহিত ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। অবশ্য 'পূর্ণনিয়োগ' ব্যবস্থার মধ্যেও একধরণের বেকারাবস্থা দেখা যায় ইংরাজীতে যাহাকে বলে Frictional Unemployment. কিন্তু তাহা অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে লর্ড বিভারিজ তাহার Full Employment in a Free Society নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রথম পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সময় প্রথম ব্রিটেনের চিন্তাশীল লোকদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখন হইতেই ইহা সেখানে জনপ্রিয়তা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিমের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির উৎপাদন প্রথার বৈশিষ্ট্য ছিল—শিল্পে অত্যধিক পরিমাণে মূলধন ও আনুষঙ্গিক উপকরণ নিয়োগ ও পরবর্ত্তী ধাপে বিরাট ও ব্যাপক হারে মন্দা ও বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। মন্দা ও বাণিজ্য-স্ফীতি—বাণিজ্যচক্রের পথ ধরিয়া ইহাদেরই পুনরাবর্ত্তন হইত। বস্তুতঃ, শিল্পবিদ্‌গণ সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন, ব্যক্তিগত উদ্যম পরিচালিত শিল্পব্যবস্থার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু যুদ্ধকালীন অর্থনীতিক ব্যবস্থাতে সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল, বিরাট ব্যয়বহুল কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে বাণিজ্যচক্র এড়াইয়াও পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থাতে উপনীত হওয়া সম্ভব। তাই যুদ্ধ সমাপনান্তে সকলের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দিল—যদি যুদ্ধের সময় প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকেই কর্ম্ম জুটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে শান্তিকালীন অবস্থায়ই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? বিভারিজও দেখাইলেন, শান্তিপূর্ণ সময়েও পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্ভব, কিন্তু তাহার জন্য সরকারকে কয়েকটি সর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে।

প্রথম সর্ত্ত এই যে, উৎপাদনক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রয়োজন হইতে সরকারের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক উপকরণসমূহকে প্রাধান্য দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জনবল সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। তৃতীয়তঃ, সরকার তাহার ব্যয়সূচী যথাযথরূপে বৃদ্ধি করিবেন এবং অত্যধিক করভার চাপাইয়া বা ঋণগ্রহণ করিয়া তদনুপাতে জনসাধারণের ব্যয়সূচী হ্রাস করিবেন। অবশেষে, সরকারের হাতে আরও এমন কতকগুলি ক্ষমতা থাকা দরকার যাহাতে প্রয়োজনমত যাবতীয় উপকরণ মানবিক বা বস্তুগত—বিভি[illegible] পরিকল্পনার জন্য সুষ্ঠুরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়। এখন অনেকেই প্রশ্ন করিবেন, উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে অর্থনীতিক্ষেত্রে তাহা স্বৈরাচারেরই নামান্তর হইবে। বিশেষতঃ, মার্কসের অনুগামীগণের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিকের চাহিদার রদবদল শ্রমিকের যোগানের পরিবর্ত্তনের সহিত সমতালে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। ফ[illegible] একজন শ্রমিক একবার কর্ম্মচ্যুত হইলে অন্যত্র তাহার ক[illegible] জুটাইতে তাহার বহুদিন বেকার বসিয়া থাকিতে হ[illegible] দ্বিতীয়তঃ তাহারা বলেন, অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদন, ব[illegible] ও মুদ্রাব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে কো[illegible] সরকারের পক্ষেই দেশে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন [illegible] সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ তাহারা রাশিয়া বা নয়াচী[illegible] নজীর তুলিয়া দেখান।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, বহু [illegible] যাহাদের আর্থিক ব্যবস্থা মার্ক্সীয় অর্থনীতি দ্বারা প্রভা[illegible] নহে, পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়া

আমরা জানি, একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যমকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া থাকে। সেখানেও আজ পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার নীতি সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ক্যানাডা, নরওয়ে বা নেদারল্যাণ্ডস্ যুদ্ধোত্তর কালে আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল কথাও 'পূর্ণনিয়োগ' লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। অতএব দেখা যাইতেছে, কোন স্বাধীন দেশের পক্ষেই পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার ও তাহা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের হাতে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন—যাহাতে সর্ব্বক্ষেত্রে পরিচালনা, বিভিন্ন কাজের সংযোগসাধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, সর্ব্বস্তরের কাজের জন্য উপযুক্ত মূলধন সহজলভ্য করা প্রয়োজন, তেমনি বেসরকারী খাতে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহারও উপযুক্ত তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন যাহাতে উভয়ক্ষেত্রেই একই দেহের দুই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই দুই অঙ্গের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিলেই বোঝা যাইবে, কর্ম্মপ্রার্থী লোকের চাহিদার পরিমাণ কত। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকগণ যাহাতে নিজ নিজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তজ্জন্য শিল্পসমূহের স্থাননির্ব্বাচন সময় সময় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার কোন স্থান অবাঞ্ছিত বলিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, অথবা অন্যত্র স্থান নির্ব্বাচনে উৎসাহিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, জনবল পরিচালনা করিবার জন্য সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার। সর্ব্বশেষে বলা যায়, দেশের মুদ্রা ও কর ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো প্রয়োজন যাহাতে একদিকে জনগণের হাতের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ নূতন নূতন লগ্নীখাতে নিয়োগ করা যায় এবং অপরদিকে লোকের ক্রয়ক্ষমতাও যেন বৃদ্ধি পায়। অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সরকারের যাহা যাহা করণীয়, সেই গতানুগতিক পদ্ধতি ছাড়াও প্রয়োজন বোধে নূতন নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণ আবশ্যক হয়। নতুবা 'পূর্ণনিয়োগ' ব্যবস্থার নীতি নির্ব্বিঘ্নে অনুসরণ করা সম্ভব নহে।

এইবার আমরা ভারতে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলি অপেক্ষা ভারতের মত অনগ্রসর দেশে পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য। কারণ ভারতে যে বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান, তাহা অনেকটা লুক্কায়িত বা চিরাভ্যস্ত বেকার-সমস্যা এবং উৎপাদনক্ষেত্রের সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে ইহার উৎপত্তি। পরন্তু পাশ্চাত্যের বেকার-সমস্যার উদ্ভব বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রের লাভ-লোকসান হইতে অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার অভাব বা অনিশ্চয়তা হইতে। যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়, মূলধন সংগঠন বা অন্যান্য পরিপূরক উপকরণের অভাবের দরুণ সে সব দেশে কদাচিৎ বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। ভারতের সহিত ঐ সব দেশের আরেকটি মূলগত পার্থক্য এই যে, ভারতে জনসংখ্যার চাপ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে গত ১৯৪০-১৯৫০এর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫৫ ভাগ। কিন্তু তথাপি সেখানকার জনসংখ্যার চাপ এখনো ভারতের মত এত তীব্র নহে। তাহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি সুবিধা এই যে, খুব উন্নত আর্থিক ব্যবস্থার দরুণ সেখানে মাথাপিছু জাতীয় আয় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের মাথাপিছু আয় তাহার তুলনায় অতি নগণ্য। সম্প্রতি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও দেখাইয়াছেন যে, গত বিশ বছরে অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৫১-৫২ সাল পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহা একপ্রকার অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। অত্যধিক জনবহুল দেশের পক্ষে এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ প্রকৃতই উদ্বেগের কারণ।

শ্রীদেশমুখ বলিয়াছেন, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়—সরকারী ও বেসরকারী—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লগ্নীখাতে ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১৮০০ কোটি টাকা এবং উভয় ক্ষেত্রেই যতটা সম্প্রসারণ অনুমান করা গিয়াছিল তাহার প্রায় সম্পূর্ণই লাভ করা গিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এখন হইতে দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদের অন্ততঃ বৎসরে ২০ লক্ষ নূতন কর্ম্মের সংস্থান করা প্রয়োজন এবং তাহার সবটাই হইবে অকৃষিমূলক ক্ষেত্রে। পরিকল্পনা কমিশন এবং আরও

২১১টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অবশ্য দেশের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি নমুনা জরীপ করিয়াছেন। যদিও তাহা দ্বারা প্রকৃত সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, এবং শ্রীদেশমুখও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাহার ফলে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা রীতিমত ভয়াবহ। অর্থমন্ত্রী মোটামোটি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া হিসাব করিয়াছেন যে, দেশের ১৫ কোটি কর্ম্মক্ষম লোকের মধ্যে দেড় কোটি লোককে কৃষি ব্যতীত বিকল্প কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়। তাহার মতে আগামী দশ বৎসরে ভারতের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়াইবে ৯০ লক্ষ। ইহার সহিত দেড় কোটি লোক যোগ করিলে দাড়ায় মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ। দশ বৎসরে এই ২ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্ম্মের সংস্থান করিতে পারিলে তবেই আমরা পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। বর্ত্তমানে অকৃষিমূলক ক্ষেত্রে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা এবং যে সব নূতন কর্ম্ম সৃষ্ট করা হইবে তাহার আয়ের মাত্রাও ইহার সমান রাখিতে হইবে। ইহার ভিত্তিতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্ম্মসৃষ্টি করিতে লগ্নীখাতে অন্ততঃ জাতীয় আয়ের শতকরা দশভাগ অর্থাৎ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন এবং সে ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে লগ্নীখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫০০০ হইতে ৬০০০ কোটি টাকার মধ্যে।

এখানে বলা প্রয়োজন, বেকারের সংখ্যা সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রীর হিসাব নির্ভুল নহে। অবশ্য এত বড় বিরাট দেশে সংখ্যাতত্ত্বের নির্ভুল হিসাব পাওয়াও এক কঠিন ব্যাপার। তথাপি তিনি নিজেই হিসাব করিয়াছেন, পরিকল্পনা কমিশনের নমুনা জরীপ অনুসারে এত বড় বিরাট পরিকল্পনা প্রণয়ন সমীচীন নহে। গত কয়েক বছরে দেশে যে পরিমাণ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে, বর্ত্তমানে ইহা এক বিরাট ও ব্যাপক সমস্যা। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কখনও এত বিরাট আকারে জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের পরীক্ষা হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহাও বিদেশী সরকারের পরিচালনাধীনে। সেই সব পরিকল্পনার সহিত আমাদের নাড়ীর টান অতি অল্পই ছিল। কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিরাট পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে যে পরিমাণ অর্থনাশ ও আশাভঙ্গ হইবে তাহা চিন্তা করাও কঠিন। পূর্ব্বে অন্ততঃ দোষ দিবার জন্যও হাতের কাছেই ইংরাজ ছিল। এখন আর তাহাও নাই। অতএব এখন যদি কিছু হইবার থাকে, তাহা হইবে জাতীয় মর্য্যাদার হানি। সুতরাং এইদিক হইতে প্রথমেই আমাদের ধীর স্থির পদক্ষেপে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বিদেশী মূলধনের কথা বলিতে যাইয়া শ্রীদেশমুখ বলিয়াছেন, আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতের গত কয়েক বৎসরের ক্রমোন্নতি দেখিয়া বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতে তাহাদের লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছেন এবং তিনি আশা করেন, প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশী মূলধন আমদানীর দ্বারা অব্যাহত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার, নরওয়ে সরকার, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক, কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ও আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন হইতে প্রধানতঃ এতদিন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য বিদেশী মূলধন অপরিহার্য্য—প্রধানমন্ত্রী নেহরু হইতে সুরু করিয়া বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধানগণ সকলেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক উন্নত দেশেও ইহার নজীর আছে। সম্প্রতি কয়েকজন বামপন্থী নেতা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের মারফৎ আমাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য ঋণদান করিয়া আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রে আধিপত্য করিবার জন্য আমেরিকা উদ্‌গ্রীব। ইহা কতদূর সত্য জানি না, তবে, আর্থিক সাহায্যের নামে বিদেশী মূলধন যেন শোষণযন্ত্র হইয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্য সতর্কতা আবশ্যক। গত চারি বৎসরে আর্থিক ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সঞ্চয় ও মূলধন সংগঠন যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমবর্দ্ধমান কর্ম্মপ্রার্থীদের কর্ম্ম সংস্থানের পক্ষে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। সম্প্রতি দেশের ও বিদেশী শিল্পপতিদের সহায়তায় ও ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুমোদন লাভ করিয়া শিল্পোন্নয়নের জন্য একটি ঋণদান সংস্থা গঠিত হইয়াছে। অনুরূপ সংস্থা আমাদের দেশে এই প্রথম এবং আশা করা

যায়, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে ইহা এক উল্লেখ-যোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে। আরেকটি ব্যাপারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ অত্যন্ত তীব্র। ইহার সহিত অবশ্য নানা কারণ বিজড়িত। তথাপি কোনরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে এই চাপ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বিবৃতিতে সে রকম ব্যবস্থার কোন আভাস নাই। অথচ পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি মাপকাঠি দেশের জনসংখ্যা।

পূর্ণনিয়োগ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দেশের বেকার-সমস্যা যাহারা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বিদূরিত করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে আর্থিকক্ষেত্রের পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ়তর এবং আরও ঘনিষ্টতর করা প্রয়োজন। যে সব দেশ অচিরকালেই সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই সব দেশের ন্যায় এখানেও সে সব ক্ষেত্র এখন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহাতে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এবং তাহার ফলেই জাতীয় উৎপাদনের বর্দ্ধিতাংশ দ্বারা লগ্নীখাতের ব্যয়ভাণ্ডার স্ফীতকায় করা সম্ভব। আগামী দশ বৎসরে প্রকৃতই যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়, তবে দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে দুই হাত তুলিয়া অর্থমন্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীনীলরতন দাশ

কল্যাণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গো, তোমার অশ্রুধার
নদীয়ার বুকে রহিয়াছে শুচি করুণার পারাবার।
সেই করুণার অমৃত-প্রবাহে প্লাবিত নদীয়াধাম,
প্রেমের প্লাবনে ভেসে গেছে হায় তোমার পুণ্য নাম!

সন্ন্যাসী স্বামী চাহে নাই ফিরে কভু তব মুখপানে,
তপোবাধা জ্ঞানে তোমারে রেখেছে দূরে অতি সাবধানে।
আর্ত্ত অধম পাপী তাপী জনে করুণায় দিয়া কোল
মহা-উৎসবে মাতে মহাপ্রভু, মুখে শুধু হরিবোল।

সে মহানন্দ-মেলা হ'তে তুমি ছিলে দূরে, বহু দূরে—
রুদ্ধ ব্যথার হাহাকার বুকে একাকী অন্তঃপুরে।
দীন হীন তরে দীর্ণ হৃদয় নিমাই নিরন্তর—
তব বেদনায় কাঁদে নাই হায় কভু তা'র অন্তর!

সংসারে রহি যোগিনী-জীবন যাপিয়াছ নিশিদিন,
আশা-অভিমান হৃদয়ে উদিয়া হৃদয়ে হয়েছে লীন।
বিরহ-অনলে জ্বলি' পলে পলে দগ্ধ তোমার হিয়া,
তব পতি-প্রেম হলো খাঁটি হেম, কামনা আহুতি দিয়া।

পতিপরায়ণা সতীরাণী তুমি শোকের মূর্ত্তগীতা,
শ্রীচৈতন্য-জীবনকাব্যে তুমি যে উপেক্ষিতা।
স্মরি তব কথা নিগূঢ় ব্যথায় প্রাণ করে হাহাকার—
বেদনাবিধুর ভক্ত-হৃদের লহ গো নমস্কার!

শেষ পরিক্রমা

মিনতি দেবী

সাগরের ফেনপুঞ্জ উদ্বেলিয়া ওঠে বারে বার—
মুক্তি পেলো যে রাগিনী ছিন্ন করি' সাগর-বন্ধন,
যুগধরা অতীতের ছন্দোহীন জীবন-বীণায়
জড়াতে চেয়েছি বৃথা সে সুরের রুদ্র আলাপন।

মেঘমুক্ত মহাকাশে তমসার জীর্ণ বক্ষ ভেদি'
স্খলিত আলোক-রেখা জ্বেলে যায় কী যে রোশনাই—
চেয়ে থাকি নিষ্পলক তন্দ্রাহীন সারা নিশি জাগি'
অজানার কিছু স্বাদ তার মাঝে যদি খুঁজে পাই!

পাহাড়ের বক্ষতলে চির-মৌন শিলালিপি যত
স্পন্দিত হোল আজ মুখরিত শব্দ সমারোহে,
প্রভাতের পথ-চাওয়া মধুলোভী মধুকর সম
ছুটে গেছি যেথা শুধু বুক-ভরা আকুল আগ্রহে।

পৃথিবীর ছাদে ছাদে নিশাচর প্রেতের মতন
ঘুরে ফিরি সঙ্গোপনে একা একা শুধু অন্যমনা,
কুহেলীর যবনিকা যে বাণী রেখেছে গোপন
তাহারে জানিতে, হায়, হিয়া জুড়ি' একি উন্মাদনা!

তৃষাতুর এ প্রাণের সীমায়িত পানপাত্র ভরি'
উচ্ছলিয়া দিলে তুমি অকৃপণ তব আশীর্ব্বাদ—
তোমার প্রভাতী রাগে পেয়েছি যে, ওগো জ্যোতিষ্মান্,
পংকিল আবর্ত হতে পূর্ণতর জীবনের স্বাদ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩

বাড়ী আর মানুষের সঙ্গে প্রথম আলাপের সঙ্কোচটা কেটে গেছে। গৃহকর্ম্মের সুবিধা-অসুবিধাগুলি ভগবতীর আয়ত্তে এসেচে—ছেলেমেয়েদের চোখেও স্বাভাবিক দৃষ্টি। ছোট-খাটো অসুবিধা আছে বহু—কিন্তু তা নিয়ে খুঁত খুঁত করলে চল্‌বে না। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে চলার নামই সংসার ধর্ম্ম পালন। অনেকখানি ছেড়ে—অনেক অসুবিধা নিয়ে এই ধর্ম্ম পালন না করলে—অশান্তি ভোগ করতেই হবে। শ্বশুর বাড়ীতে বিনা প্রতিবাদে সকলের কথাই শুনে এসেছেন ভগবতী; নম্র নিরুত্তরে কাজের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করে আনন্দই পান তিনি। তাঁর কাছে পারিপার্শ্বিক যে সহজ হয়ে আসবে অল্পদিনেই সে আর আশ্চর্য্য কি!

সন্তুকে ইস্কুলে দেওয়া নিয়ে অমরনাথ কিছু দ্বিধায় পড়লেন। বললেন, কাছে-পিঠে একটি ইস্কুল আছে—শুনলাম তেমন সুবিধের নয়, দূরে অবশ্য ভাল ইস্কুল আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ ছেলে—

ভগবতী বললেন, তুমি তো সব জান না—কোথায় কি আছে। আমি বলি তার চেয়ে এক কাজ কর—ওই যে বিনয়বাবু—যিনি কলেজে পড়ান, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বরং—

ঠিক বলেছ। ইস্কুল যদি আমার আপিস যাবার পথে হয়—ওকে পৌছে দিয়েও যেতে পারি।

মিণ্টুকেও কি ভর্ত্তি করিয়ে দেবে?

হ্যাঁ—ইস্কুলের আবহাওয়ায় খানিকটা দুরন্ত হোক্ না।

বিনয়বাবু কলেজ থেকে এসে—মুখ হাত ধুয়ে বেড়াতে বার হন! কোন কোনদিন—স্ত্রীকেও সঙ্গে নেন। সিনেমা কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ী যাওয়া—কিংবা এমনিই পার্কে মাঠে চক্কর দেওয়া—সে কথা কেউ সঠিক বলতে পারে না। মেয়েমহলে এ নিয়ে ঈষৎ তীব্র আলোচনা হয়।

সেনদি বলেন—লেখাপড়া জানা মানুষের ধাঁচই আলাদা! ওরা কি শুধু ভাত ডাল খেয়ে থাকতে পারে—হাওয়া খাওয়াও চাই বই কি! সায়েব বিবিরা কি করে? হাত ধরাধরি করে—রাজ্যের লোকের সামনে না বেড়ালে পেটের ভাত হজম হবে কেন লো?

সন্তুকে অগ্রবর্ত্তী করে অমরনাথ ওদের ঘরের সামনে এলেন। দুয়ার ভেজানো রয়েছে—হ্যারিকেন জলছে ঘরে। কবাটের ফাটা দিয়ে তারই সরু কয়েকটি রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে মিষ্ট হাসির রেশ তখনও বাজছে—সেই সঙ্গে সোনার চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ। অবসর মুহূর্ত্তকে ওরা হয়তো উপভোগ করছে। সঙ্কুচিত অমরনাথ বারণ করবার আগেই—সন্তুর হাতের ঠেলায় দুয়োরের খানিকটা খুলে গেছে। ঈষৎ চমকিত হয়ে তরুণ অধ্যাপক চাইলে এদিকে; মেয়েটিও ঘাড় ফিরিয়ে সন্তুকে চিনে ফেলে বললে, কি—সন্তুবাবু, কি খবর?

বাবা এসেছেন?

তোমার বাবা? বলেই হাসিমুখে মেয়েটি অধ্যাপককে কি ইসারা করলে। অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে বললে, আসুন—আসুন, নমস্কার।

নমস্কার। একটু এগিয়ে এলেন অমরনাথ।

আসুন—বসবেন না?

একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম আপনাকে—পরামর্শ দিন তো। ছেলেটিকে কোন ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিই বলুন তো। মানে কাছে পিঠে ভাল ইস্কুল—

ঘরে বসুন এসে—বলছি। বিনয়বাবু অমরনাথকে ঘরে এনে বসালে। বললে, চা চলবে কি?

না। শহরের চাকরি অনেকদিনের হলেও সম্পূর্ণ শহুরে হতে পারি নি এখনও।

মন্দ কি! শহরই শুধু পরিপাক করবে আমাদের, আমরা শহরকে পরিপাক করব না? বিনয় হাসলে।

অমরনাথ বললেন, আপনি তো শহরকে দেখছি অনেকখানি পরিপাক করেছেন। অমরনাথ কৌতুকভরে চারিদিকে চাইলেন।

বিনয় ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বললে, ওঃ—বুঝেছি। রবীন্দ্রনাথের ছবি আর বই দেখে ভাবছেন বুঝি—

জলের মধ্যেও আপনি যে পদ্মপাতা—সে বুঝতে দেরী হয় না—আপনার ঘর দেখে লোভ হচ্ছে।

আসবেন দয়া করে—এলে খুসী হব।

একটি প্লেটে—কিছু কুচো নিমকি আর নারকেল নাড়ু নিয়ে মেয়েটি এগিয়ে এল। আসন পেতে সামনে রাখলে প্লেট দু'খানি। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করে বললে, দাদা সামান্য কিছু মুখে দিন—এ সব ঘরে তৈরী—বাজারের জিনিস নয়।

অমরনাথ হাসিমুখে বললেন, বাজারের জিনিসেও খুব আপত্তি নেই—তবু এখন তো খেতে পারব না—দিদি?

কেন?

এখনও পাড়াগাঁয়ের কুসংস্কার কিছুটা আছে যে! বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাইটা একেবারে ঘোচাতে পারিনি যে। থাক না খাবার—প্লেটশুদ্ধ নিয়ে যাব—নিয়মপর্ব সেরে সবাই মিলে খাব আনন্দ করে। ভারি আনন্দ হবে তাতে।

যা ভাল বোঝেন। মেয়েটি যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হল।

লক্ষ্য করে বিনয় বললে, বেশ তো—আরও কিছু খাবার না হয় দিয়ে দাও।

মেয়েটি ফিক করে হেসে উঠল। বলল, ঘটে সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে—এতো ঠাকুরের প্রসাদ নয় যে কণিকা মাত্র খেয়েই পেট ভরবে!

তাই নাকি! তাহলে সত্যি কথা বলি—যা খাবার তোমার স্টকে আছে—সবটা খেলে আমারই পেট ভরে না তো—

মেয়েটি রাগ করে উঠে গেল।

বিনয় অতঃপর প্রশ্ন করলে সন্তকে, কোন ক্লাসে পড় তুমি? ক্লাস এইট? কত বয়স তোমার? তেরো? তাহলে ষোল বছরে ম্যাট্রিক দেবে।

হ্যাঁ—পাড়াগাঁ বলে—একটা বছর ম্যালেরিয়াতে ভুগেছিল খুব—প্রমোশন পায় নি—না হলে পনেরো বছরেই—

তাতে কি, বিনয় হাসলে। একটু বয়স হওয়া ভালই। পড়াটা তোতার মত মুখস্থ না করে ওর ভেতরে প্রবেশ করে যদি—মানে—জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যা অর্জিত হলেই সেই বিদ্যার মূল্য। না হলে দেখি তো—নাম করার জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম করে ছেলেরা—তার সিকি ভাগও পরীক্ষার খাতা ছাড়া মনের খাতায় জমিয়ে রাখতে পারে না। ভাল চাকরি পাবার ঝোঁকে পরীক্ষা দেয় ছেলেরা—চাকরি পেলেই পড়ার দায় থেকে যেন নিষ্কৃতি পেয়ে বর্তে যায়। এর ফল যা দাঁড়াচ্ছে—

মেয়েটি ফিরে এল বাইরে থেকে। বললে, আপনার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় বয়ে যাচ্ছে দাদা—সারারাত লেকচার শুনিয়েও যাদের আশ মেটে না—তাদের কাছে এত সহজে রেহাই পাবেন না।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে বললে, ঠিক বলেছ সুরমা। কাল আসবেন দাদা—আমি সব ঠিক করে দেব। কাছে পিঠেই একটি ভাল ইস্কুল আছে।

বেশ ভাই—কাল আসব। অমরনাথ উঠলেন। তাঁর মনে হল নূতন পরিচয়ে লাভবান হয়েছেন যথেষ্ট।

বারান্দা দিয়ে বাপের পিছনে পিছনে আসছিল সন্ত—পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, এই খোকা—শোন।

অমরনাথ পিছনে চেয়ে বললেন, কে যেন তোকে ডাকছে সন্ত।

ও কেষ্ট। সন্ত অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিলে।

কি বলছে শুনে এস। বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল কেষ্ট। সন্তর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়—কিন্তু দেখলে মনে হয় রীতিমত একজন যুবক। মাথায় অনেকখানি লম্বা চওড়া চুল—শক্ত দু'হাত পেশীর বাঁধনে দৃঢ়তর। মাথার চুল চক্ চক্ করছে—বাঁ পাশে একটি সযত্ন রচিত টেরি। সামনে

এসে সে বললে, আচ্ছা ক্যাবলাকান্ত ছেলে তো তুই—বন্ধুকে বুঝি বলে—ও কেষ্ট!

বন্ধু! সন্তু আশ্চর্য্য কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুললে।

বন্ধু নয় তো শত্রু নাকি? বা রে মাণিক! আমি ইংরেজ আর তুই বুঝি জার্ম্মান? মানে—চার্চ্চিল আর হিট্‌লার?

সন্তু হেসে ফেললে ওর কথায়। বললে, কিছু বলবে কি?

বললে শুনবি তুই! তোরা যে আবার গুড বয়। এ গুড বয় অলওয়েজ মাইণ্ড হিজ লেসনস্‌।

সন্তু বললে, ভুল হ'ল—একটি বালকের ক্রিয়াবাদও সিঙ্গুলার হবে।

তবে আর কি—নম্বর কেটে দাও। ওসব তিলুনি রেখে একটা কথা শোন। বাবাকে বলবি—আমি হরিশ এ্যাকাডেমিতে পড়ব। মানে ওখানেই আমি পড়ি কিনা। বেশ একসঙ্গে ইস্কুলে যাব। কিরে—কথা বলছিস না যে? ভাবছিস ও ইস্কুল ভাল নয়। হরিশ এ্যাকাডেমি ভাল নয়—তবে কি শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা ভাল! জানিস :—

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা
বিদ্যে হবে কাঁচকলা!

খবরদার ওখানে ভর্ত্তি হবিনে। হরিশ এ্যাকডেমি ছাড়া যেখানে ভর্ত্তি হবি—সেখানকারই—ক্ষ্যাপানো ছড়া বার হবে—বুঝলি?

সন্তু চলে আসছিল—কেষ্ট ফের ডাকলে, এই—শোন। ডাংগুলি খেলতে জানিস? না? চু-কপাটি? না? ক্যারম? ফুটবল? ক্রিকেট? কিচ্ছু না? দূর—দূর ট্যাড়স কোথাকার!···তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করে কেষ্ট হেসে উঠল।

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল সন্তর। কে যেন ওর ক্ষুদ্র পৌরুষে প্রচণ্ড একটি আঘাত হানলে। কেষ্টর কথা বলার ধরণ এমন বিশ্রী। ওসব খেলা না জানলেই বা ক্ষতি কি! তবু—মনটা টন্‌ টন্‌ করছে কেন—কে জানে! কেষ্টর থেকে খেলায় কৃতিত্ব ওর কম বলে? কেষ্ট যা পারে, ও তা পারে না এই লজ্জায়?

হাসতে হাসতে কেষ্ট আর একবার এগিয়ে এল। বললে, ইস্কুলে পড়ানো-টড়ানো ও প্রোফেসারের কম্মো নয়—বাবাকে বলব আমি। জানিস না বুঝি—বাবাও ইস্কুলে মাষ্টারি করে—খুব ভাল মাষ্টার।

তোমার বাবা মাষ্টার? তা তোমাকে পড়ান না কেন?

পড়াবে কখন। সময় পেলে তো? ইদিকে দশটা—চারটা ইস্কুল—ওদিকে সকালে ভোরে উঠেই কোচিং ক্লাস—বিকেলে ইস্কুল থেকে ছাত্রের বাড়ী। ফেরে রাত্তির দশটা—এগারোটা। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়ি।

তাহলে তোমার বাবাকে বলবে কখন?

সে হবে'খন। মাকে বলে রাখলেই—আচ্ছা তুই আসিস তো। বলে শিস্‌ দিতে দিতে নেমে গেল কেষ্ট।

বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকছিলেন সেই বিধবা—একটু থমকে দাঁড়ালেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, কেষ্টা বুঝি? না হলে এমন কাঁটি-ওটা ছেলে আর কে হবে। যমের অরুচি! সন্তকে দেখে বললেন, হাঁরে খোকা—ওই ছোঁড়া—আমাদের ঘরে ঢোকে নি তো?

না তো।

তবু ভাল—ভাবতে ভাবতে আসছিনু নাবো থেকে, বলি—ঘরের ছেকলটা তুলে তো আসিনি—যে বাড়ী—হাত সাফাই হতে কতক্ষণ!···একটু থেমে বললেন, খপরদার বাবা, ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়ার সঙ্গে মিশবে নি—একেবারে হাড়-বয়াটে—

কে হাড়-বয়াটে দিদি?···চওড়া লালপাড় শাড়ীতে আধঘোমটা দেওয়া একটি মাঝারি বয়সী বউ··· নীচে থেকে বারান্দায় উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলে।

কে আবার—এ বাড়ীতে গুণধর বলতে তো ওই একটিই আছে। ওর সঙ্গে যে মিশেছে—তারই ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। তাই বলছিনু আমাদের নতুন খোকাকে—যে খপরদার—ওর সঙ্গে মিশেছ কি অধঃপাতে গিয়েছ—

চুপ কর দিদি—ওর মা শুনতে পেলে—তোমার পেটে পা দিয়ে দেবে।

ইস্‌—অমন পা দিউনি ঢের দেখেছি আমি। চোখ রাঙাবে আর পথেও অকম্ম করবে—সে মনে করবার মেয়ে আমি নই।

সন্তু পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে চলে গেল। বাবা এক কোণে বসে আহ্নিক করছেন—কমলাকে ঘিরে ছোট ভাই-

বোনগুলি বসেছে। কমলার হাতে একখানি ছবির বই—সেইখানির পাতা উলটে উলটে ছবি দেখছে সবাই নিঃশব্দে। বাবা আহ্নিকে বসলে—ওরা গোলমাল করে না। সন্তু এসে ওদের পাশে বসল।…দু'মিনিট নিঃশব্দে কাটল। কিন্তু এই ঘরটাই এই পাড়ার একমাত্র জায়গা নয়—যেখান থেকে কোলাহল জন্মলাভ করে। বাইরে উঠল কলহের সুর—উত্তর-প্রত্যুত্তরে তার মাত্রা ক্রমশঃ স্বরগ্রামের সীমা অতিক্রম করলে।

কই—বলুক না কোন চোখখাকী—চোখের মাথা খেয়ে দেখেছে—আমার কেষ্ট—ওদের ঘরের মধ্যে গিছল। কালামুখীর বলতে বাঁধল না! আমার দুধের ছেলে—ওর ঘরের মধ্যের কি জানবে বল! ঢলানির রঙ ঢং বোঝবার বয়েস তো ওর হয়নি!

অপর পক্ষও দুর্ব্বল নয়! কেষ্টর মাকে শাণিত বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত করতে লাগল।

—হাড়-বয়াটে ছেলে—ওই নিয়ে আবার গুমোর দেখনা। যে ছেলে শিস্ দেয়—রসের গান গায়—সে তো চেকে-চুকে গোল্লায় গেছে। ছেলের যদি হাত টান না থাকবে তো—সিগ্রেট আসে কোত্থেকে—গন্ধ তেল—সাবান পাউডার, ঠোঙা ঠোঙা খাবার—এসব আসে কোত্থেকে? সবাই তো ঘাসের বিচি খায়না—বোঝে কিছু কিছু।

অমরনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, খোকা দুয়োরটি ভাল করে বন্ধ করে দাও। বই নিয়ে এস এদিকে তোমায় পড়াব।

৪

সেনদিদি বললেন, সত্যি মিথ্যে জানি না—তবে কথায় আছে না—যা রটে—তা বটে। ছেলেটা বয়াটে মিথ্যে নয়—ওকে সিগ্রেট খেতে দেখেছি কতবার—হাতটান তাও আছে। আরও কি বিদ্যে শিখেছে—জানি না ভাই। ব্রাহ্মণের ছেলে—যা চোখে দেখিনি—সে অপবাদ দিয়ে কি নরকে পড়ব! বলছ—বাবা দেখে না কেন? ক'টাকে দেখবে! বছরে বছরে একটা করে হচ্ছেই—রাম ছাগলের মত। একলা মানুষ—সংসার করবে—না, ইস্কুল ঠেকাবে—না, ছেলে পড়াবে—ভোর থেকে রাত্তির ইস্তক? বউটা কি সাধে খাণ্ডার হ'য়েছে? নানান জ্বালায় বকে মরে। আর তুই বিধবা মানুষ—নরুণপাড় ধুতি পরিস—গলায় সোনা ঝোলাস—ধেয়ে নাচিয়ে পথে ঘাটে ফিরিস—তোকে নিয়ে যে নানান কথা ওঠে—তা ক'টা মুখে চাপা দিবি বল? বেচাল দেখলেই বলবে লোকে।

তা এসব ঝগড়া করা, খারাপ কথা বলা—আপনারা সহ্য করেন কেমন করে?

কথা শোন। ওরা কি আমার রেয়ত—না আমি ওদের খেতে পরতে দিচ্ছি—তাই আমার মন্দ লাগার ভয়ে ওরা চুপ করবে। আর আমাদের মত গেরস্থ ঘরে এসব তো নিত্যি-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই হাসি—এই কান্না—এতো আছেই।

ভগবতী ভাবেন—তাই বা কেন! হাসি আনন্দ সৃষ্টি করবার শক্তি যার আছে—দুঃখ অপবাদকে অগ্রাহ্য করবার সাহসই বা তার কেন থাকবে না? যে দুঃখ অনিমন্ত্রিত অতিথির মত আসে—তার সঙ্গে কলহ করে শুধু নিজেকেই তো ক্ষতবিক্ষত করা। পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গা ঘরে থেকেও—মন ছিল প্রসন্ন। অন্ততঃ দুঃখকে তীব্রভাবে অনুভব করে নি, কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে এই দুঃখের তুলনাও মিথ্যে। এতো দুঃখ নয়, গ্লানি। এ শুধুই মনের প্রসন্নতা নষ্ট করে না—পঙ্কিল করে তোলে মনকে। অর্থের দারিদ্র্য মানুষকে সামাজিক সম্মানের খানিকটা নীচেয় নামায়—কিন্তু চরিত্রের দারিদ্র্য তাকে কোন রসাতলে পৌছে দেয়—সে ভাবতেও পারা যায় না। নীতি-কলুষিত আবহাওয়া শুধু একটি মানুষকেই নষ্ট করে না, যারা থাকে তার চারপাশে তার মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এত কুৎসিত পৃথিবী!

সেনদিদি গল্প বলে চলেছেন! ওরা যখন প্রথম এল—সাত আট বছর আগেকার কথা, সঙ্গে দু'টি ছেলে—আর একটি মেয়ে। ধীর শান্ত বউ—কর্ত্তার গলার স্বরও শুনতে পাইনি মাসখানেকের মধ্যে। সকালে করে বাজার হাট—দুপুরে ইস্কুল—আর সন্ধ্যের পর দু'জায়গায় ছেলে পড়ানো। খায়-দায়—নিজের ঘরটিতে থাকে—কারও সাতেও থাকে না—পাঁচেও থাকে না। তারপর তখন যুদ্ধ চলছে—দু'তিন বছর হবে। জিনিসের দাম পত্তর চড়ে নি তেমন। তারপর বিয়াল্লিশে বিষ্টি হ'ল না—পরের বছর হ'ল অজন্মা। শহরে লোক এল পালে পালে—পয়সা দাও—কাপড় দাও—ভাত দাও—ফেন দাও। লোকে লোকে ছেয়ে গেল শহর। গলিতে গলিতে উপোসী মানুষের কান্না—মাগো একটু ফ্যান

দেও—গরীবের বাছার মুখ চেয়ে একটি পয়সা দেও। সেই বারেই আমাদের মত গেরস্তরা বুঝলে—সত্যিকারের অভাব কাকে বলে! মাখনবাবুর বউয়ের তখন কোলে একটি হামা টানছে—পেটে এসেছে আর একটি। উপার্জ্জনের টাকা সব চালেই শেষ হয়ে যায়—কচিদের দুধ হরলিক্স আসে কোত্থেকে? কর্ত্তা সকালে আরও দু'জায়গায় ছেলে পড়ানোর কাজ নিলে। এদিকে সংসারের আনা নেওয়া করে কে? ন'বছরের ছেলে কেষ্ট ছাড়া আছেই বা কে। ছেলেটা গোড়া থেকে এমন বকে যায় নি ভাই। পড়াশোনায় ধার ছিল। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে—মা বল্লে, বার্লি নিয়ে আয় তো কেষ্ট। বার্লি আনলে তো—বাজারটা সেরে দে বাবা। বাজার সেরে এসেই কি নিস্তার আছে? সরষের তেল নিয়ে আয়—না হলে কর্ত্তার খাওয়া হবে না। কর্ত্তার খাওয়া না হলে—ইস্কুল যাবে কি করে—ইস্কুলে না গেলে পেট চলবে কিসে। কেষ্ট বাজার হাটই করে—পড়তে বসতে পায় না। দুর্ভিক্ষ শেষ হল—বাজার দর নামল না। যে টাকায় চাল কিনতে কিনতে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল—শহরের পথে ঘাটে না খেতে পেয়ে মরে পড়েছিল—সেই টাকাতেই বাঁধা পড়লেন মা-লক্ষ্মী। চাল চল্লিশের নীচেয় নামল না। কোম্পানী রেশন বেঁধে দিলে। তখন তো রেশন আনতে গেলেই একটি বেলা কাবার। শুধু চাল আটা চিনির রেশন। তখন নুন রেশনে—কেরাসিন তেল রেশনে—কাপড় রেশনে—সরষের তেল রেশনে—যাবতীয় দ্রব্য রেশনে। তাই কি সব সময়ে পাওয়া যায়। খবর এল—অমুক দোকানে তেল এসেছে—ছোট ছোট—ছেলে বুড়ো আদি করে সবাই ছুটল। কচি কচি ছেলেগুলো পড়াশুনো করবে কি ভাই—রেশন আনতেই দিন কাবার! কেষ্টর মার মেজাজ গেল বিগড়ে—আয়ব্যয় ঠিক মত না হওয়াতে বাপের মেজাজও রুক্ষ হল—কেষ্টরও পড়াশোনার দফা গয়া হ'ল।

ভগবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আহা!

শুধু কেষ্টই বা কেন—এবাড়ি ওবাড়ির অনেক ছেলেকেই তো দেখলাম—নিজের ছেলেদেরও দেখেছি; এই বয়সে ওদের কি সংসারের ঝক্কি পোয়াবার সময়? বলে:

কত হাতী ঘোড়া গেল তল,
এখন মশা বলে দেখ বল!

তালেবর তালেবর লোকেরা কোথায় তলিয়ে গেল—তা ওরা তো দুধের বাছা!

তাই বলে—ছেলেরা ভাল শিক্ষা পাবে না।

আহা রে আমার শিক্ষে! পেটে টান ধরলে কি আর শিক্ষের বড়াই সাজে। ওই ভিরকুটি দানা পেটে না পড়লে ত্রিভুবন অন্ধকার যে ভাই। একদিন রাগ করে কর্ত্তা আপিসে গেলেন, না খেয়ে—ফিরে এসে সে কি তম্বী! অমুক কর—তমুক কর। তবু আপিসে কলা সন্দেশ ডিম চপ পুরী আলুর দম হরদম চালিয়েছেন। হলে হবে কি—ওই যে ভিরকুটি দানা পড়ে নি পেটে।

গল্পের সবটা শোনা হল না ভগবতীর। এ গল্প স্বামীর মুখেও একবার শুনেছেন—অন্নচিন্তা চমৎকারা। বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসের প্রতিভাও এই চিন্তার ভারে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। অন্নগতপ্রাণ কলির জীব, তাই কি যত মহৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম্ম এরই রসে পরিপুষ্টি লাভ করে। কি জানি কেন, ওঁর কেবলই মনে হতে লাগল—সন্তুর কথা। এই অভাবের তাড়নায় সন্তুর ভবিষ্যৎ কি ওঁরা নষ্ট করে ফেলবেন? সন্তু মানুষ হবে কেমন করে—কেমন করে দশজনের একজন হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে?

অমরনাথকে বললেন কেষ্টর কথা। বললেন, হ্যাঁগা, এমনি করেই তো ছেলেরা নষ্ট হয়?

অমরনাথ বললেন, হয়। কিন্তু আমাদের মত ঘরে বাজার হাট না করলেও তো ছেলেদের চলে না। শিক্ষা শুধু ইস্কুলের নয়—সংসারেরও নানান কাজের মধ্যে রয়েছে।

তা হোক, ছেলেকে আমি বাজারে পাঠাব না কখনো।

আমি যদি না পারি? যদি আমার অসুখ হয়?

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলেন ভগবতী। না—না—অমন কথাও বলো না।

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন অমরনাথ, আচ্ছা আর বলব না। কি পাগল—চুপ কর। আমাদের সংসার ফুলে মোড়া গদি নয়—তবু তুমি এমন করে আঁৎকে ওঠ কেন!

কলতলায় দেখা হল পুরুত-গিন্নীর সঙ্গে। মোটা সোটা মানুষ—সরু লাল পাড় শাড়ী পরণে—মুখে এক গাল পান। দোক্তা খান বলে পানের বোঝা মুখ থেকে সরাবার ফুরসত হয় না। চওড়া সিঁথি—সিঁদুরে ভর্ত্তি, মাথার সামনেটা টাক পড়তে সুরু হ'য়েছে—নাকে একটা ফাঁদি নথ—কান

আভরণহীন। হাতে দুগাছি ক্ষয়া রুলির কোলে মোটা শাঁখা—নইলে ঘাটের কিনারায় এসে কর্ত্তা আজও দূর দূরান্তরে যজনযাজন করে তিন প্রহর বেলায় বাড়ী ফিরে এমন সচল ও সুস্থ রয়েছেন কি করে।

ভগবতীকে দেখে বললেন, শুনলাম নতুন এসেছ—সময় পাইনি যে দেখে আসি। একটু সবুর কর বাছা—মুখটা ধুয়ে কাপড়খানা কেচে নেই। আমাদের তো আবার কারও ছোঁয়া-নেপা কল নিয়ে কাজ করলে চলবে না। ঘরে দামোদর রয়েছেন—তাঁর নিত্যি সেবা—নিত্যি ভোগ।

ভগবতী বললেন, আমি দাঁড়াচ্ছি।

তাহলে এক কাজ কর না বাছা—ওই পেতলের বাসন কখানায় একটু ছাই ঘষে দাও না। ঠাকুরের বাসন—মেজে দিলে পুণ্যিই হবে। তারপর আমি জল বুলিয়ে নেব'খন।

ভগবতী উত্তর না দিয়ে একটু হাসলেন। চুপ করে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল। বসে বসে মাজ্‌ছে—সেই মোটা বুড়ি উঁকি মেরে বললে—ভসচাজ্জি মা বুঝি নাইছ? একটু হাত চালিয়ে নাও মা—আমি আবার—

পুরুত গিন্নি কোন কথা বললেন না। ঘটিতে জল ভরে কলের মাথায় ঢালতে লাগলেন। তারপর জল ঢাললেন চৌবাচ্ছার পাড়ে—দেয়ালের গায়ে—সারা উঠোনে। চারিদিক শুদ্ধ করে নিয়ে নিজে বসলেন স্নানে। সে স্নান আর শেষ হয় না। উপর নীচেয় অনেকে গলা খাঁকারি দিয়ে জানালেন- আর নয়—ওঠ। কিন্তু যার চেহারা দশাসই—তার সব জিনিসেরই গুরুত্ব বেশী। চান করতে করতে মন্তব্য করলেন, একি শুদ্দুরের চান—যে এক ঘটি জল ঢেলেই গামছা বুলিয়ে উঠে যায়! ঠাকুর দেবতা মানে না বলেই না মানুষের এই দুগ্‌গতি! হয়েছে কি—আরও হবে—পথের শেয়াল কুকুর কেঁদে কেঁদে ফিরবে দুঃখে।

গলা খাঁকারি ঘন ঘন ও প্রবল হয়ে উঠতেই উনি সরোষ মন্তব্য করে উঠে পড়লেন, মরণ—গলায় যেন সব খড় আটকেছে। হাঁ—বাসন ক'খানা থাক একধারে—আমি ফের এসে জল বুলিয়ে নিয়ে যাব।

বামুন মা—আজ কি একাদশী? সেই বিধবা নীচের রান্নাঘর থেকে শুধোলে।

না—কাল বেলা দু'টা অবদি আছে—শেষ ধরেই তো হবে।

—বাঁচালে মা, কাল ইতুর পালুনি করে ফলার খেয়েছি—আজ রুটি খেতে হলে হয়েছিল আর কি!

তোর আবার পালুনি কিসের—না সোয়ামি—না পুত—

তবু মা—আর জন্মের জন্যে—

ভাল—তোরা আদিম বলেই ধম্মো আছে তবু—না হলে কবে পিথীমী উল্টে যেত। কলির শেষে চার পো পূর্ণ হলে—তাই যাবে কিনা।

মোটা মোটা পা ফেলে পুরুত-গিন্নী ওপরে উঠে গেলেন।

সেনদিদি বললেন, ওই গতরই সার—আর আচার-বিচেরই সর্ব্বস্ব। জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে পায়ে তো কুট হয়েছে—ওই হাতে কোন্ মুখে যে খান ঠাকুর। বামুন বলে সকলের মাথায় পা দিয়ে চলেন। সবাইকে ভাবেন ঝি চাকর। ওই এক ডাঁই এঁটো বাসন তুমি মেজে দিলে!

ঠাকুরের বাসন—

হুঁ—ঠাকুর তো ওরা সবাই। না ঘেন্না—না পিত্তি—বললে কোন্ মুখে? যাক—যা করেছ বেশ করেছ—ওধারে আর যেয়ো না যেন। কথায় বলে না—ঘোড়া দেখলে খোঁড়া, উনিও তাই। তুতিয়ে পাতিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কেন? ওই গতরই হয়েছে ওর কাল। তারপর দেহি দেহি রব। কত্তা গিন্নি দুটিই সমান। যেমন হাঁড়ি—তেমনি সরা। একদিন পেসাদ দিতে হলে নানান টাল বাহানা—কিন্তু সিধে নেবার বেলায় দড়। একখানা কাপড় কিনতে হয় না—এক ছটাক চাল নয়—বাজার নয়। উনি বলেন, আসচে জন্মে বামুন হয়ে জন্মাব—ভসচাজ্জি বামুন। বলি, তা তোমার যা খুসী করো—আমি কিন্তু আলো-চালের পিণ্ডি গিলে গতর বাড়াতে পারব না। আর সরু ফ্যাকাসে লাল পাড় শাড়ী পরে জন্ম কাটানো, তাও সইবে না। বলেন, আর জন্মে এসে দেখো যজমানেরা জিনিসের মূল্য ধরে দিচ্ছে।

বলি, তাই নাকি?

আর জন্মে এসে দেখবে—পুজো পাঠই নেই। দেবতারা

চলে গেছেন সগ্‌গে—রেখে গেছেন—ছুনিয়ার মজুরকে—মানুষের খবরদারি করতে। ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ।

খিল খিল করে হেসে উঠলেন সেন-দিদি।

৫

একটা বাড়ী নয়—একখানি গ্রামই যেন। গ্রামের দুঃখসুখ নিয়েই বাড়ীর মর্য্যাদা। কখনও সময় চলে ভারমন্থর গরুর গাড়ীর চাকার তালে তালে—কখনও তা থেকে ওঠে আর্ত্তনাদ। আর উঁচু নীচু পথে পড়ে সেই গাড়ীই সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জানায় চলার প্রতিবাদ—ওঠে কোলাহল। কিন্তু উপায় কি। যে মসৃণ পথে ঐশ্বর্য্যবানের দামী শকট চলে—সে পথে সাধারণের গাড়ী চালানো নিষেধ। তবু সাধারণে নিয়ম ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে। মসৃণ পথ পেয়েও গাড়ীর চাকার বেসুরো আর্ত্তনাদ ওঠে তবু।

দোতলার প্রান্তে বড় ঘরখানিতে একদিন কিছু সুবেশ লোকের সমাগম হ'ল। একটি ডবল রীডের হারমোনিয়াম থেকে সুরের ঝঙ্কার উঠল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল বাড়ীর বাসিন্দারা।

নীচে থেকে বাড়ীওয়ালী বুড়ি শুধোলে, কার ঘরে পোঁ পোঁ বাজছে লো? রমাকে কেউ দেখতে এল বুঝি?

এমন আরও কয়েক বার হ'য়েছে। রমা—ভূপতিবাবুর মেয়ে। সেন দিদি বললেন, আহা মা মরা মেয়ে—বিয়ের বয়স্ কবে পেরিয়েছে। সৎমার সংসার—দাসীগিরি বাঁদীগিরির ঝক্কি পোয়াতে পোয়াতে গতর জল হয়ে গেল। ও পক্ষের সংসারও কম নয়। বাপের আয় যতই থাক—সৎমায়ের হাতেই তো বাক্সের চাবি। তবু মেয়েটাকে যা হোক দু'পাতা পড়িয়েছে—একটা হারমোনিয়ামও দিয়েছে কিনে—ওরই জোরে যদি পার হ'য়ে যায়।

সবাই দোতলার কোণে এসে জড়ো হলেন। কারা মেয়ে দেখতে এসেছে—কোথায় বাড়ী—কত আয়, ছেলের রূপ ও বিদ্যা এবং চরিত্র এইগুলি মিলিয়ে সম্বন্ধ মনোমত হবে তো?

তোদের যেমন কথা—কথায় আছে না—ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। বিয়ে যদি হয়ে যায় এই না কত ভাগ্যি। সেন দিদি মাথা ঝাঁকিয়ে সব প্রশ্নের অনৌচিত্যকে যেন শাসন করলেন। মেয়ের বয়স চলছে—একুশ—একটা ঘর যদি পায় বর্ত্তে যাবে।

উই যে দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে—ঠিক রামকৃষ্ণের ছবির নীচেয় বসে আছে যে লোকটি—গায়ে জামিয়ার—কব্জিতে ড্যাবডেবে ঘড়ি—বর ওরই ভাই হবে হয় তো? একটি বউ কৌতূহল প্রকাশ করলে।

যার ভাই-ই হোক—পছন্দ হলেই ভাল।

ঘরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হল। নাম—শিক্ষার কথা—শিল্প পরিচয়—সঙ্গীত ও রন্ধন—সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে গেল যেন—তা যাক—এই তো রীতি। রন্ধনে গৃহস্থের রসনাতৃপ্তি এবং সঙ্গীতে অতিথির মনোরঞ্জন—ও না করতে পারলে বাড়ীর মানসম্ভ্রম বজায় রাখা দুষ্কর। আজকালকার বউ—ঘরের মধ্যে পরদা ঘেরা দিয়ে রাখা চলে না—বাইরের জগতের পরিচয় তাকে নিতে হয়। যদি সুযোগ ঘটে, বাইরের জগতেই তার খ্যাতিও হয় প্রসারিত। গানের নমুনাও দিতে হল। পরীক্ষা শেষে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে রমা বাইরে এল। কৌতূহলীর দল তাকে মণ্ডলাকারে মধ্যবর্ত্তিনী করে অন্য ঘরে নিয়ে চলল।

মুখ রাঙা হ'য়েছে মেয়ের—পরিশ্রমে, কিংবা পরীক্ষা দেবার লজ্জায়। এত প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিচারক যদি রায় দেয়। অনেকগুলি কৌতূহলী-প্রশ্নের একটা জবাবও দিলে না রমা—মাথা হেঁট করে বসে রইল।

রমার সৎমা উমা দেবী বেরিয়ে এসে বললেন—যাও, কাপড় জামা ছেড়ে উনুনে আঁচ দাওগে।

কি বললে দিদি?

যা চিরকাল বলে আসচে—তাই। বললে, গিয়ে চিঠি দেব। মানে···

মানেটা সবাই জানেন। রূপের ক্ষতিপূরণ দাবি রূপেয়াতে। দান-সামগ্রীতে নূতন ঘর গুছিয়ে নেবার কৌশল। শিক্ষা-বা-শিল্প-নমুনা গ্রহণের চেষ্টা শিক্ষার প্রতি প্রীতিবশতঃ নয়—নিজেদের আভিজাত্য-গৌরবকে প্রচার করবার চেষ্টা। এই চেষ্টা নানাভাবে চলে আসছে—পুরাকাল থেকে। রন্ধন, বিদ্যা, নৃত্য, সাধন, গীত এবং সাধারণ জ্ঞান—এক সংসার থেকে আর এক সংসারে প্রবেশ মুখে—কিছু কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে বৈকি! যেখানকার যা রীতি—যার যেমন রুচি—সঙ্গীতের যেমন

তাল-মান লয়—সংসারের তেমনি সেবা-প্রীতি-ভালবাসা। সমস্ত জীবন ধরে যে সঙ্গীত বয়ে চলবে—তার গতিবেগে জীবন সঞ্চার করে রাখতেই হবে। না হলে—যেমন আমরা —সুর নাই—ছন্দ হারা—তাল বিচ্যুত—অসমতল পথে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি নিরুদ্দেশের দিকে—ওদিকে আলো কি অন্ধকার জানি না। ভয়ঙ্কর অথবা মনোহরের দেখা মিলবে সে হিসাব রাখি না, পূর্ণ হব কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাব সে বোধ নাই—চলেছি তো চলেছি—উদ্বৃত্ত থেকে অপচয়ের দিকে—ক্ষতির সহচরটাকে বৃহৎ করে—কঠিন শিলাবর্ষণে সর্বস্ব ক্ষয় করে দিয়ে···

সরুপাড় কাপড়-পরা বিধবাটি বললে, পাওনা-থোওনা না হ'লে আবার বিয়ে নাকি! যেখান থেকে হোক, একটা ধরে এনে ঘরে তোলে যেমন—এই নিকে করা যাকে বলে—তাই আর কি।

সেনদিদি বললেন, যে দিন কাল—লোকে দেবে কোত্থেকে শুনি! সাধ হয়—সাধ্যি নেই!

তুমি তো একথা বলবেই দিদি—তোমাকেও যে দু'টি পার করতে হবে। একটি বউ মন্তব্য করলে।

তা যাই বল—যা দেবে মেয়ের বিয়েয়—তার চারগুণ উশুল হবে ছেলের বিয়েতে।

সেনদিদি হাসলেন, গেল জন্মে পাওনার ঘরে শূন্য পুঁজি চেয়েছিলাম—হাতের মুঠো আলগা করে—এ জন্মে তাই—মুঠো বাঁধবার উপায় করে দিয়েছেন ভগবান। কিন্তু এ-ও বলে রাখি—ছেলের বিয়েতে আমি—

দেখা যাবে—রাজকন্যে দেখে কেমন পিতিজ্ঞে রক্ষে হয়। রহস্য করে অন্যজন জবাব দিলে।

এমন সময় ভূপতিবাবুর ঘরে একটা গোলমাল উঠল—কৌতূহলীর দল সেইদিকে গিয়ে আড়ি পাতল।

বিয়েয় ওরা মত দিয়ে গেছে—ষোলভরি সোনা চাই।

কোথায় পাবে সোনা?

আপিসে ধার করব—দেশের জমি-জমা বাঁধা দেব।

আমাকে পথে বসাবার ফন্দী করছ?

কেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি—

মানুষের জীবনের ওপর ভরসা কি।

সোনাটাই তোমার কাছে বড় হল?

কার কাছে বা নয়? উমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে। যাদের আছে—তারা আরও চায়। লক্ষ্মীর আশ্রয় হল সব চেয়ে বড় আশ্রয়—একথা ভূ-ভারতে না জানে কে?

জানতাম না—আজ জানলাম।

কথান্তর ক্রমশঃ কলহে পরিণত হল। এইমাত্র সুর সাধনার পরীক্ষা হয়ে গেছে—সে কথা কারও মনে রইল না।

রমা সেনদিদির কাছে এসে বললে—বাবাকে একটা কথা বলবেন জ্যেঠিমা?

কি কথা?

আমি বিয়ে করব না। সত্যি বলছি, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ল।

বালাই—ষাট—ওকি অলক্ষুণে কথা। সেই ঘর তো আসল ঘর মেয়েমানুষের। নিজের আঁচলে রমার চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিলেন সেনদিদি।

সে ঘরের দাম দেওয়ার ক্ষমতা তো সকলের থাকে না জ্যেঠাইমা! সে আমি চাই না।

তাহলে সারা জীবন এই দাস্যবিত্তি করবি? গরু ভেড়ার মত খাটবি, কুকুর শেয়ালের মত দূর ছেই শুনবি—

এ ছাড়া আমাদের গতি কি! লেখাপড়া শিখিনি—হাতের কাজ জানিনে—কোন যোগ্যতাই নেই—

আচ্ছা থাম—

না—কিছুতেই শুনব না আমি। আপনি বলুন গে মাকে—

উমা দেবী কথাটা অন্যভাবে নিলেন। বললেন, কারো সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হয়েছে বুঝি?

ওকেই জিজ্ঞেস করো। সেনদিদি বিরক্তি ভরে চলে এলেন।

রমা একথা শুনে আঘাত পেলে না—আনন্দই হ'ল ওর। ওর কুড়ি একুশ বছর নিঃসঙ্গ জীবনে—এটি যেন পরম বার্তা। কাজের অবসরক্ষণে স্বপ্ন দেখার তৃষ্ণা। শুধু কি রমাই স্বপ্ন দেখে? কোন্ কুমারী মেয়ে না মনের আকাশে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটানো রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়? সে রূপের সমারোহ কোন্ কুমারীর আকাঙ্ক্ষাকে না উদ্দীপ্ত করে তোলে? বধূ-সন্ধানী রাজপুত্রকে অনুরাগের নিগড় পরিয়ে কন্যারা বন্দী করে নিজ প্রাসাদে। হীরা মণি মুক্তার ঐশ্বর্যে প্রাসাদ যখন ঝলমল করে—প্রেম প্রীতির স্নিগ্ধ প্রদীপে মনের মণিকোঠাও তেমনি আলোকিত

হয়ে ওঠে। সেই আলোই তো নিখিলের বরবধূর স্বপ্নকে করে সুন্দর।

কাজের ফাঁকে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রমা। জানালার বাইরে এক টুকরো আকাশ আছে—পথের ওপারে যে প্রাসাদ তার কোন একটি ঘরে রাজপুত্তও তো বন্দী হয়ে আছে। অনেক দূরে দৃষ্টির আলোয় ধরা পড়ে রাজপুত্র; কিন্তু সে অনেক দূরে নয়। আকাশের চাঁদের আলো—একটি চোখ বন্ধ করলে আর একটি চোখে যেমন আলোর দীর্ঘ রেখায় বন্দী হয়—তেমনি দৃষ্টির দর্পণে ওর প্রতিবিম্ব। কল্পনার রসাস্বাদন করে পুলকিত হয় রমা—ওই কল্পনাই কেন চিরজীবী হোক না!

ভূপতিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, মতিচ্ছন্ন হয়েছে মেয়েটার। তুমি ভাল করে বুঝিও।

উমাদেবী হাসলেন, বিয়ের কথা মেয়েরা ভুল বোঝে না।

তাহলে কি—চিন্তা-বিব্রত ললাটের রেখাগুলি তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

জানি না। তোমার মেয়ের মন আমি জানব কেমন করে!

মেয়েদের মন মেয়েরাই তো জানে।

আমার বিয়ে হ'য়েছে ষোল বছরে—একুশ বছরের মেয়ের মনের খবর দিতে পারব না।

মনের খবর কেউ দিতে পারলে না—সম্বন্ধ ভেঙে গেল। উমা হারমোনিয়ামটা বিক্রী করে দেবে জানালে।

সেনদিদি বললেন, আমি ওটা কিনব মনে করছি। দু'টি মেয়েকে পার করতে হবে তো। শুধু রূপ—শুধু বিদ্যে কি কাজকর্ম্ম—এসব তো চায় না আজকালকার ছেলেরা—ওরা চায় গান বাজনা—একটু নাচ…তা গানের মাষ্টারও তো শুনছি আখছার মেলে। তাই না হয় মাসকতক রেখে দেখি—যদি হিল্লে করতে পারি মেয়ে দু'টোর।

কোণের ঘর থেকে মাঝের ঘরে এল হারমোনিয়াম। অমরনাথের ঘরের পাশাপাশি।

অমরনাথ বললেন, দুয়োরটা বন্ধ করে দাও তো সন্তু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মসংহিতার আবিষ্কার স্থান

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পয়স্বিনীর তীরস্থ শ্রীআদিকেশবের মন্দির হইতে 'শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা' (পঞ্চম অধ্যায়) পুঁথি আবিষ্কার করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং বহু যত্নে সেই পুঁথির প্রতিলিপি করাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব আদিকেশব দর্শন করিবার পর অনন্তপদ্মনাভে শুভবিজয় করেন। ইহা আমরা 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'(১) পাঠে অবগত হই।

'তিরু অনন্তপুর' বা 'ত্রিবেন্দ্রাম্' নগরে শ্রীঅনন্তপদ্মনাভদেব অধিষ্ঠিত আছেন। ত্রিবেন্দ্রাম হইতে 'তিরুবত্তি' ২৪ মাইল ৪ ফার্লং এবং তিরুবত্তি হইতে তিরুবট্টর অন্য শাখাপথে ৪ মাইল। সুতরাং ত্রিবেন্দ্রাম নগর হইতে তিরুবট্টর প্রায় ২৮॥॰ মাইল পূর্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই তিরুবট্টরেই শ্রীআদিকেশবদেব অধিষ্ঠিত আছেন। অদ্যাপি এই ভূ-খণ্ডের চতুর্দিকে নদী প্রবহমানা রহিয়াছে। তামিল ভাষায় সেই নদীর নাম 'পার্লার। কোন বিশেষ কারণে এই নাম হইয়াছে। নদীর আদি নাম ছিল—PEAZHAYAR। কথিত হয়, বহু পুরাকালে 'কেশন্' ও 'কেশী' নামে দুইটী অসুর ছিল। কেশন ভ্রাতা ও কেশী ভগ্নী; এই দুই অসুর বিষ্ণুর সেবকগণের প্রতি নানাভাবে অত্যাচার করিত। সাধুভক্তগণের প্রার্থনায় মহাবিষ্ণু এইস্থানে আবির্ভূত হইয়া কেশনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কেশন পরাজিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। মহাবিষ্ণু সেই পরাজিত কেশন দৈত্যের উপর নিদ্রাগত হইলেন। ভক্ত মাত্রের বিশ্বাস, এখনও সেই মহাবিষ্ণু 'আদিকেশব' নাম ধারণ করিয়া এখানে কেশন্ দৈত্যের উপর শায়িত আছেন। কেশনের ভগ্নী কেশী যখন তাহার ভ্রাতার অবস্থা জানিতে পারিল, তখন সে পয়স্বিনী (পয়স্+বিনী অস্ত্যর্থে নদী) রূপে পরিণতা হইয়া পর্বত হইতে লোষ্ট্রাদি খণ্ড শস্ত্ররূপে বহন করিয়া মহাবিষ্ণুর প্রতিহিংসা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। তখনি পয়স্বিনী (নদী) রূপ-ধারিণী অসুরীর নাম হইল 'পার্লার'। এই তামিল শব্দটির অর্থ প্রস্তরখণ্ডের সহিত প্রবহমানা। তামিল পার্লার নদীই সংস্কৃতে পয়স্বিনী নামে কথিত। ঐ স্ত্রী দেত

---

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৯।২৩৪—২৪১ (শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্করণ)।

তাহার মৃত ভ্রাতার উপর সুখে শায়িত মহাবিষ্ণুকে ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। বিষ্ণু সেই উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া যুবকের বেশ ধারণপূর্বক উক্ত নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—যদি সে (অসুরী) তাহার ভ্রাতার ও বিষ্ণুর সন্ধান লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে এই ভূখণ্ডের চতুর্দিকে তাহাকে পরিক্রমা করিতে হইবে। পয়স্বিনীরূপিণী সেই রাক্ষসী বিষ্ণুর পরিক্রমা করিতে গিয়া নদীরূপেই প্রবহমানা রহিয়া গেল এবং বিষ্ণুর শয়ন-স্থান পরিক্রমা করায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপবিত্ররূপিণী হইল। তাহার হৃদয়ে বিষ্ণুর চিন্তা থাকায় সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গেল। পয়স্বিনী-রূপিণী রাক্ষসী আর তাহার পূর্বস্বরূপে পরিণত না হইয়া নদী-স্বরূপেই ভগবদ্দর্শনে কৃতার্থা ও অপরের পবিত্রকারিণী পুণ্যবতী স্রোতস্বিনীরূপেই বিরাজমানা থাকিল এবং আরও দুইটি নদী ও সাগরের সহিত মিলিত হইল। যেস্থানে ঐ তিনটি নদীর একত্র মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে দশদিনব্যাপী আদিকেশবের উৎসবমূর্তির উৎসব হয়। দশম দিবসে শ্রীবিষ্ণু সেই স্থানে বিজয় করিয়া স্নান-লীলা প্রকট করেন।

আদিকেশবের শ্রীমন্দির একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। ১৬টি সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীমন্দিরের প্রাকার ও প্রাঙ্গণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রাকারদ্বার পূর্বাভিমুখী; প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রাঙ্গণের চতুর্দিকস্থ সরণির দুই ধারে তুলসী কানন। এইরূপ তুলসীবন দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন মন্দিরের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় না। ধনাঢ্য বিলাসী ব্যক্তিগণ যেরূপ পাতাবাহারের গাছ দিয়া উদ্যান রচনা করেন, এই স্থানেও সেইরূপ সর্বত্র তুলসীবৃক্ষের দ্বারা শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উদ্যান রচিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বস্থ তুলসী-কাননের মধ্য দিয়া বলিমণ্ডপে যাইবার পথ। পূর্বে বলিমণ্ডপে শ্রদ্ধালু জন-সাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইত। বলি অর্থাৎ উপহার বা প্রসাদ প্রদত্ত হয় বলিয়া মণ্ডপের উক্ত নাম হইয়াছে। চতুর্দিকে প্রশস্ত-মণ্ডপযুক্ত সুদীর্ঘ অলিন্দ। সহস্র সহস্র নরনারী এই স্থানে ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু বর্তমান এই বলিমণ্ডপ নামেমাত্র থাকিয়া শ্রীমন্দির-মণ্ডলের শোভা বর্ধন করিতেছে। বলিমণ্ডপের কৃষ্ণপ্রস্তরের স্তম্ভসমূহে অসংখ্য দীপধারিণী নারী মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। বিশেষ উৎসবের সময় এই সকল দীপ প্রজ্বলিত হইলে লক্ষাধিক দীপের দ্বারা মন্দির-মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়। এখানে একটি পাঠশালা আছে। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রকথাকারে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পশ্চিমাভিমুখী মূল মন্দিরের উচ্চ বিমানে কেশেন দৈত্যের উপরে শেষনাগ এবং শেষনাগের উপরে ভগবান্ আদিকেশব মহাবিষ্ণু শায়িত। শেষনাগ পঞ্চফণাযুক্ত। দক্ষিণাভিমুখে বিগ্রহের মস্তক ও উত্তরে পদযুগল। বাম হস্ত মস্তকের দিকে লম্বমান এবং দক্ষিণ হস্ত অর্ধ উত্তোলিত। বিগ্রহ দ্বিভুজ। মস্তকের উপরে শেষনাগের পঞ্চফণা। উত্তরে কদলীঋষি ও ভূ-দেবী এবং দক্ষিণে শ্রীদেবী বিরাজমান। মূল-বিগ্রহের সম্মুখে শ্রী ও ভূ-দেবীর সহিত চতুর্ভুজ উৎসব-বিগ্রহ।

আদিকেশব মহাবিষ্ণুর মূর্তি এত বিশাল যে তিনটি দ্বারের মধ্য দিয়া তাঁহার দর্শন হয়। প্রথম দ্বার দিয়া মুখকমল ও বাহু, মধ্য দ্বারের মধ্য দিয়া নাভিকমল ও তৃতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া পদকমল দৃষ্ট হয়। এখানে নাভিকমলে শ্রীব্রহ্মা নাই। শ্রীকদলীঋষি নিম্নে উপবিষ্ট দৃষ্ট হয়। আদিকেশবের মুখরাবিন্দের লাবণ্যমাধুর্য ও কৃষ্ণচিক্কণতা শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের শ্রীগোবিন্দের (জয়পুরস্থ) শ্রীমুখ-কমলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জন্যই বোধ হয়, এখানে শ্রীব্রহ্মসংহিতার "গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্লোক প্রকটিত হইয়াছিল।

মূল-মন্দিরের পশ্চিম-উত্তরে একটি পৃথক মন্দিরে দ্বিভুজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমনয়ন শ্রীকৃষ্ণ। সমগ্র দক্ষিণ দেশের দ্বিভুজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমনয়ন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রথম দৃষ্ট হইল। কোন কোন মন্দিরে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-মুরলীধর মূর্তি মন্দির গাত্রে খোদিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু এখানেই শ্রীব্রহ্ম-সংহিতোক্ত নিম্নলিখিত স্তবদ্বয়ের আরাধ্য মূর্তি শ্রীরূপের কথিত—'ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াং গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং' এর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়; শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দের এইরূপ রূপ বর্ণন আছে।

> চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
> লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
> লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণ যিনি পালন করিতেছেন এবং শত সহস্র-লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।)

> বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দ দলায়তাক্ষং
> বর্হাবতং সমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
> কন্দর্প কোটি কমনীয় বিশেষ শোভং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥*

(মুরলী গান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্ল চক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটি কন্দর্প মোহন-বিশেষ-শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।)

দেবস্থান-বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারের নিকট হইতে জানা গেল যে, এ স্থানে শত-অধ্যায় যুক্ত ব্রহ্ম সংহিতার সুপ্রাচীন পুঁথি ছিল। তাহা

---

* শ্রীব্রহ্মসংহিতা (পঞ্চমাধ্যায়)-২৯-৩০ শ্লোক; শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত, ২য় সং, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২।

Trivendrum Central Vernacular Recordsএ Trivendrum নগরীতে স্থানান্তরিত হইয়া রক্ষিত আছে। উক্ত ম্যানেজার মহাশয় এ প্রদেশে 'ভটথারি' নামক একপ্রকার সন্ন্যাসি ব্রাহ্মণগণের বহু পূর্বে অবস্থানের কথা জানাইলেন। তাঁহারা আচার্য অর্থাৎ গুরুর কার্য করিতেন। বর্তমান এই সম্প্রদায় একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ত্রিবেন্দ্রাম্ নগরের দিকে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা ৯ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমনের প্রসঙ্গ-পাঠ এবং ভারপ্রাপ্ত অর্চকের দ্বারা আলোকবর্তিকার সাহায্যে তিনটি দ্বারের মধ্য দিয়া আদিকেশবের মুখকমল, নাভিকমল ও পদকমল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

উৎসব—পুঙ্গুনি বা ব্রহ্মোৎসব দশ দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় উৎসববিগ্রহ বাহিরে বিজয় করেন এবং আনপাসি নামক উৎসবও দশ দিবস ব্যাপী হইয়া থাকে।

ভোগ—প্রত্যহ ২৪০ পাড়ি চাউলের অন্ন তিনবারে ভোগ হয়। ভোগের উপকরণ—শুদ্ধান্ন, মিষ্টান্ন, পুঙ্গল, শবরপুঙ্গল ইত্যাদি। রাত্রিতে শুদ্ধান্ন, মিষ্ট দোষা ও মিষ্ট বড়া ভোগ হইয়া থাকে।

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৫॥টা হইতে ৮॥টা, পুনরায় বেলা ১০টা হইতে বেলা ১২টা এবং অপরাহ্নে ৫॥টা হইতে রাত্রি ৮টা।

এখানে মন্দিরের তত্ত্বাবধানে যাত্রিগণের থাকিবার একটি সুন্দর ছত্র আছে। তাহা মন্দিরের পাদদেশস্থ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। প্রতি ঘর প্রত্যহ একটাকা করিয়া ভাড়া দিতে হয়। এই আয়ের দ্বারা দেবস্থান-বোর্ড দেবসেবার আনুকূল্য করেন।

বেদ ও বিদ্যা

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

বেদ যে আসলে বেদ নয়, এ কথা শুনলেই যে-কোন লোকের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার পরই অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু কেন-যে-নয় সেই কথাই এখানে বলব।

আমাদের ঐতিহাসিক আর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানই আজ সায় দিয়েছে, বেদ আসলে বেদ ছিল না ব'লে। কথাটা হয় ছিল বিদ্যা না-হয় ত' ছন্দ বিদ্যা। আবার দুটিই চালু ছিল এমনও হ'তে পারে। আবার বেদ যে একমাত্র ভারতীয় আর্য্যজাতির সাহিত্যিক সম্পত্তি ছিল, তাও নয়। বরং ভারতীয় আর্য্যদের অবতরণ ঘটেছে যে প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠী থেকে সেই ইন্দো-য়ুরোপীয়দের ছিল এই বিদ্যা। তখন এর পরিধি হয়ত ছিল কিছুটা অন্য রকমের এবং অনেকখানি ছোট। তবে তার মধ্যে যে অগ্নির কি, ইন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী দেবাধিপতি বরুণের আর অন্যান্য রূপকায়িত প্রাকৃতিক দেবতা, যেমন, দ্যোঃ বা দ্যৌস্, পর্যাণ্য, নাসত্য, বুধ্না বা অহিব্রধ্ন, রুদ্র, নিচিন প্রভৃতির স্তবস্তুতি আর নৃত্য নাট্যের উপযোগী কতকগুলি রূপক, যেমন, ঋভু—ঔরুদকি (Orphens-Eurydico), যার থেকে আমরা পাই ঋগ্বৈদিক "পুরুরবা-উর্ব্বশী সংবাদ"; প্রেত-প্রসভনা (Pluto-Persephone), যার থেকে পাই ঋগ্বৈদিক "যম-যামী সংবাদ"; পুলোমা-বহুক্র (Philemon-Baucis), যার থেকে আমরা পাই "পুলোমা-বহুক্র সংবাদ"; ত্বোন্‌স্-দিতেয় (Tens-Titans), যা রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্র-বৃত্র কাহিনীতে; প্রমেধ্য-অভিমেধ্য (Promethens-Epimethens), যা আমরা পেয়েছি পণ্ড-বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন আকারের নচিকেতা ও শ্বেতকেতুর গল্পে, ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। সেদিন কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে দুহাজার আড়াই হাজার বছর

এই ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠী সম্ভবতঃ ন'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে নানা দিগ্দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই নয়টি শাখা ইচ্ছে, (১) ইন্দো-ইরাণীয়, (২) আলবানীয়, (৩) আর্ম্মানীয়, (৪) তুখারীয়, (৫) গ্রীক, (৬) ইতালিক, (৭) তিউতনিক, (৮) কেল্টিক ও (৯) বাল্‌তো-স্লাবিক। এদের মধ্যেকার ইরাণীয় আর্য্যদের বেদের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় যে গাথা-সাহিত্য আছে তার নাম অবেস্তা বা অবস্তা। এই গাথা-সাহিত্যের পেহ্‌লবী টীকা সমেত নাম হচ্ছে, জেন্দবেস্তা (Zendavesta) বা জেন্দবস্তা (Zendavasta)। আবার এই শব্দটির যা প্রাচীন-পারসিক রূপ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে Zainda-Vastaya। এই Zainda-Vastaya ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী আরও আগে ছিল * Xainda-Vetthaya। অবশ্য এরূপ লিখিত-রূপে পাওয়া যায় না, তাই অনুমানের তারকা-চিহ্ন দেওয়া হ'ল। * Xainda-Vetthaya আবার আগে ছিল * Xenda-Vedaya। এই Xenda-Vedaya একদিন বেরিয়েছিল মূল ইঃ-য়ুঃ * Skenda-Vidya বা * Skonda-Vidya থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূল ইঃ-য়ুঃ Skenda বা Skonda থেকে সতম্ বর্গের ভাষাগুলিতে এসেছে "ছন্দ", "কোন্দ", "শন্'ত" এবং কেন্তম্ বর্গের ভাষাগুলিতে এসেছে Canto, Kando ইত্যাদি, আর Vidya থেকে ঐ দু' বর্গের ভাষায় এসেছে বিদ্যা, * Oid (d) a, * Widda, Wit, (অবেস্তা বা অবস্তা—র পূর্ব্বরূপ) * Vesta-Vasta ইত্যাদি। ফলে, দেখা যাচ্ছে,

---

ইঃ-য়ুঃ—ইন্দো-য়ুরোপীয়। ইঃ-আঃ—ইন্দো-আর্য্য। প্রাঃ ভাঃ আঃ—প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য। ইঃ-ইঃ—ইন্দো-ইরাণীয়। অঃ—অবেস্তিক। প্রাঃ পাঃ—প্রাচীন পারসিক। বৈঃ—বৈদিক।

আজকের বা মধ্যযুগের পারসিকরা তাঁদের গাথা সাহিত্যের নামোৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দেন, যে "কোন্দ্" হচ্ছে পেহ্লবী টীকার নাম, আর "অবস্তা" বা "অবেস্তা" হচ্ছে গাথা-সাহিত্যের নাম, অর্থাৎ একই সাহিত্যবোধক দুটি শব্দকে সেই সাহিত্যেরই টীকার ও মূলের দুটি পৃথক্ নাম হিসাবে ধরা, তা' এখন ভুল ব'লে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। মধ্যযুগে বা তার কিছু আগে কি পরে টীকার প্রয়োজন দেখা দিলেও তার আগে এমন সময় নিশ্চয়ই গিয়েছে যখন ঐ গাথার ভাষা পুরাণ হয়ে কঠিন কি, দুর্ব্বোধ্য ছিল না। বিপরীতে ঐ ভাষা সজীব ইঃ-ইঃ ভাষারই বিভাষা বা ভাষা হিসাবে চালু ছিল। অপর পক্ষে, সাহিত্যের ভাষাও ছিল। ঐতিহ্য অনুযায়ী উদ্‌গাতার দল (বৈঃ জরত+ত্বষ্ট্‌,—ত্বষ্টা=Worshipper of fire) জরথুস্ত্ররা যাঁরা আমাদের দেশের বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা প্রভৃতির সমগোত্রীয় ছিলেন, আসলে তাঁরা বৈদিক সূক্তের মতই গাথা মুখে-মুখে রচনা ক'রে অগ্নির উদ্দেশে গাইতেন। ধ্বনিগত তুলনার দ্বারাও এই জ্ঞাতিত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যেমন, অঃ-অদম্=প্রাঃ-পাঃ-অজম্=বৈঃ-অহম্ ; অঃ-হচা=প্রাঃ-পাঃ-হচা=বৈঃ-সচা ; অঃ-মজ্‌দা=প্রাঃ-পাঃ-মজ্‌দা=বৈঃ-মেধা ; অঃ-কেম্ না মজ্‌দা=প্রাঃ ভাঃ আঃ কিম্ নঃ মেধা ; অঃ-যথা অহু বইর্‌য্যো=প্রাঃ ভাঃ আঃ-যথা অসৌ বীরঃ (বা বীর্য্যম্) অঃ-অসেম্ বোহু বোহুসেম্ অস্তি=প্রাঃ ভাঃ আঃ-ঋতং বসুঃ বসুতমঃ অস্তি, ইত্যাদি। তাহ'লে এখন বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কোন্দবেস্তা গোড়ার দিকে প্রাচীন পারস্যের গাথা সাহিত্যের আখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত এবং মধ্যযুগের কাছাকাছি কোন সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কোন্দ ও অবস্তা বা অবেস্তা শব্দ দুটির মৌলিক অর্থ বিস্মরণের ফলে পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

আবার ইরাণীয় কোন্দবেস্তা যে ভারতীয় ছন্দঃ-বিদ্যার সমান তার অনুকূলে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাণিনিয় ব্যাকরণে এবং অন্যত্র ছন্দঃ বা ছন্দস্ শব্দের বেদ বুঝাতে প্রয়োগ। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতে বেদ শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি বিদ্যা শব্দও যে প্রযুক্ত হ'ত, তাও জানা যায়, যেমন, ধনুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বিদ্যা ; গন্ধর্ব্ববেদ—গন্ধর্ব্ববিদ্যা ; আয়ুর্ব্বেদ—আয়ুর্ব্বিদ্যা ; জ্যোতির্ব্বেদ জ্যোতির্ব্বিদ্যা ; ব্রহ্মবেদ—ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদি। আবার, ধ্বনি ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম (phonetic decay and dialectal growth) নিয়মানুযায়ী বিদ্যা শব্দ থেকে বেদশব্দের উদ্ভবও প্রমাণ হয়, যেমন, বিদ্যা=বিদয়া > বেদয়া > বেদ্‌পা > বেদপ > বেদ। অন্যত্র বেদ শব্দকে পাওয়া যায় বিত্ত-এর বিকৃতরূপে (যেমন, উশন্ হবৈ বাতাশ্রবসঃ সর্ব্ববেদ সন্দদৌ-কঠোপনিষৎ-১ম অধ্যায়, ১মা বল্লী,-এর শুদ্ধ রূপ ছিল সম্ভবতঃ উশনা হবৈ বাতাশ্রবা সর্ব্ববিত্তং সন্দদৌ), আবার √বিদ্ ধাতুর মধ্যেও বেদরূপের প্রয়োগ দেখা যায়, আমি জানি বা আমার জানা আছে, এই অর্থে। মোট কথা তা হ'লে এই দাঁড়াল যে, বেদ আসলে হচ্ছে কতকগুলি শব্দের পরিবর্ত্তিত ধ্বনি-রূপ। সুতরাং এমন একটা শব্দকে বিদ্যা শব্দের পরিবর্ত্তে কেমন ক'রে প্রাঃ ভাঃ পাঃ—সাহিত্যের আখ্যা বলে গ্রহণ করি?

আরও অবিশ্বাসের কারণ হচ্ছে এই যে Teutonic শাখার প্রাচীন সাহিত্য বা বীর গাথার নাম হচ্ছে Edda (এড্ডা)। এড্ডা-র প্রাচীনরূপ ছিল Œdda < wedda এই wedda শব্দ প্রাঃ ইঃ-যুঃ vidya থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। এর সাহিত্যরূপ যা পাওয়া যায় তা Old Noose-এই নিহিত। আধুনিক যুগের গোড়াতেই Edda দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই দুটি ভাগ হচ্ছে Prose-Edda ও Poetic-Edda। Iceland-এর যে প্রাচীন সাহিত্য, তার নাম হচ্ছে Saga। Saga শব্দের অর্থ হয়, what has been said—কিনা পুরাণ। এই পুরাণ-সাহিত্যের বিষয় বস্তু হচ্ছে বীর কাহিনী। সুতরাং Saga-র রূপ Prose-Edda-রই অনুরূপ। গ্রীক-রোমীয়দের এরকম কোন স্বতন্ত্র আখ্যাযুক্ত প্রাচীন সাহিত্য না পাওয়া গেলেও, তাদের মধ্যে বেশ সমৃদ্ধ দেবতা ও বীর কাহিনী সম্বলিত প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের প্রাচীন ও পরিপুষ্ট Theogony ও myths মারফতে। Edda-সাহিত্যে যেমন, Lodur (r), Loki, Woden, Odin, Balder, Thor, প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তেমনি গ্রীক-রোমীয়-myth-এ Apollo, Ourauns, Oceanus, Venus, Jens, Saturnus, Gea, Phoebe, প্রভৃতি দেব-দেবীর উল্লেখ দেখতে পাই। সুতরাং বেদ-এর সমগোত্রীয় সাহিত্য হিসাবে ইরাণীয় বা পারসিকদের ঘরে যেমন পাই Zendavesta বা Zendavasta, এর উইজীয়দের কাছে Edda, আইসল্যাণ্ডীয়দের দখলে Saga, আর গ্রীক-রোমীয়দের ঘরে পুরাণ-সাহিত্য। আবার সম্প্রতি সুনী'তবাবুর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, লিথুয়ানীয়দের মধ্যেও দয়নু ব'লে এক প্রাচীন লোক-সাহিত্য প্রচলিত আছে। দয়নু (Doynu) বৈঃ ধেনা-র সমান। ধেনার অর্থ হয় Voice বা Speech। আবার গ্রীকদের পবিত্র Logos ও রোমীয়দের Loguor আমাদের ঋক্, এরই সমান। এ ছাড়া গ্রীঃ-রোঃ-Venus=প্রাঃ ভাঃ আঃ-ভানু ; নঃ—Balder=প্রাঃ ভাঃ আঃ—বৃত্র=অঃ-বেরেথ্ ; নঃ—Lobur (r)=প্রাঃ ভাঃ আঃ-রুদ্র ; গ্রাঃ-রোঃ-Phoebe=প্রাঃ ভাঃ আঃ-ভুবঃ ; গ্রীঃ-রোঃ-Ignis=প্রাঃ ভাঃ আঃ-অগ্নি ; নঃ-woden-odin=প্রাঃ ভাঃ আঃ-বুধ্ন্য, ব্রধ্ন, অহি ব্রধ্ন ; গ্রাঃ-রোঃ Ouranus-Uranus=প্রাঃ ভাঃ আঃ-বরুণ ; রোঃ-Neptune=প্রাঃ ভাঃ আঃ=নিচিন্ ; নঃ-Loki=প্রাঃ ভাঃ আঃ-রোচস্ ; গ্রাঃ-রোঃ-Jens-Jupitor=প্রাঃ ভাঃ আঃ-দ্যৌস্, দ্যৌঃ-পিতর ইত্যাদি।

এতক্ষণে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় আর্য্য ছাড়া অন্যান্য শাখা-উপশাখাতে যখন বেদ-এর বদলে বিদ্যা শব্দের কাছাকাছি কোন ধ্বনি-রূপ বা পণ্যশব্দ বেদ-এর জ্ঞাতি-সাহিত্যের আখ্যা ব'লে পাওয়া যায়, তখন বিদ্যা শব্দই আখ্যা হিসাবে মূলতঃ প্রচলিত ছিল। আবার বিদ্যার পাশাপাশি আদিকালে ছন্দ, গাথা, ধেনা, ঋক্ প্রভৃতি আখ্যা-গুলিও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতেও বিদ্যা-জাত বেদ আখ্যার পাশাপাশি উক্‌থ (তুলনীয় নঃ-এড্ডিক Kvithas)—উদ্‌গীথ, নিবিদ্, শ্রুতি, নিগম, ছন্দস্ গাথা প্রভৃতি আখ্যাও প্রচলিত ছিল।

আবার Edda-র Prose ও Poetic বিভাগ যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণ বিভাগের সঙ্গে মেলে। এই শুক্ল পদটি পরিস্কৃতার্থক এবং কৃষ্ণ পদটি মিশ্রার্থক। আমাদের (১) ঋক্ (২) সাম, (৩) যজুস্ ও (৪) অথর্ব্ব বেদ বিভাগের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় (১) যশ্ন, (২) বেন্দিদাদ, (৩) বিস্পেরেদ্ ও (৪) যস্ত প্রভৃতি আবস্তিক বিভাগের।

শেষ কথা হচ্ছে এই যে—পূর্ব্বোক্ত বেদের জ্ঞাতি সম্পর্ক এড্ডা, সাগা, কোন্দবেস্তা প্রভৃতির সঙ্গে প্রমাণ দিতে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিতদের কাছে প্রথমে উল্লিখিত কাহিনীগুলি মায় ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান আমি উপস্থাপিত ক'রব।

নঃ=নরউইজীয়।
গ্রীঃ=গ্রীক।
রোঃ=রোমীয়।

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমরনাথ যাবার আর একটী দুর্গমতর রাস্তা হোল সোনামার্গ উপত্যকা দিয়ে। সোনামার্গ থেকে বালটাল পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটা-রাস্তা মোটামুটী ভাল (শ্রীনগর থেকে ৫৯ মাইল)। বালটালে একটী সরকারী রেষ্ট হাউসও আছে; সেখানে রাত্রিকাটিয়ে ন' মাইল প্রায় তুষারাবৃত পথ পেরিয়ে সঙ্গম, সেখান থেকে আরও ৩ মাইল গেলে অমরনাথ। এ পথের অধিকাংশই তুষারাচ্ছন্ন বোলে খুব ভোরে যাত্রা সুরু করা দরকার। রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে পথ পিছল হয়। সোনামার্গের ঘোড়াওয়ালারা অক্টোবরেও আমাদের এ পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। একই দিনে বালটাল থেকে বেরিয়ে

গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গের পথে

ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়

এই ১২ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে আবার রাত্রে বালটালে ফিরে আসতে হবে; এ-ছাড়া পথে আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না। গ্রীষ্মে এ পথ আরও বিপজ্জনক, কারণ তখন পথের বরফ আরও পিছল থাকে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে পা পিছলালে গন্তব্যে আর পৌঁছতে হবে না; পাশের পাহাড়ী খাদের অতলতলে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যেতে হবে। সেই প্রচণ্ড শীতে এবং দু'তিনটী কুলীর ওপর নির্ভর কোরে বালটাল হোয়ে অমরনাথ যেতে আমরা ভরসা করি নাই। পরে ট্যুরিষ্টব্যুরোর কর্ম্মচারীরাও এই দুর্গম পথে না যাবারই পরামর্শ দেন।

হাজার হাজার যাত্রী ভারতের দূরদূরান্ত প্রদেশ থেকে প্রতি বছর আসেন এই তীর্থে। পথের পরিশ্রম, বায়ুযানের বায়ুবাত্যা, পঞ্চতরণীর কঠিন তুষার-পিছল পথ, গিরিপথের দুর্গমতা—সব উপেক্ষা কোরে, জীবন তুচ্ছ কোরে তাঁরা যান এই মহাতীর্থের মহাদেবকে দর্শন কোরতে। বড় জোর একঘণ্টা তাঁরা থাকেন এই প্রাকৃতিক মন্দিরে—কিন্তু তাদের অন্তরের আন্তরিক আকুতিতে আচ্ছন্ন হোয়ে থাকে এই পবিত্র গুহা। নবম শতাব্দীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এখানে এসেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অমরনাথ দর্শন কোরে (২রা আগষ্ট ১৮৯৮) বোলেছিলেন "এই তুষার লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। এখানে চোর নাই, ব্যবসাদার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রে এত আনন্দ পাই নাই।" অমরনাথের দর্শন এই মহাযোগীকে কতদূর অভিভূত কোরেছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়। অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজী আরও কিছুদিন শ্রীনগরে বাস করেন। এখানে একটী মঠ ও সংস্কৃত অধ্যাপনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার তাঁর ইচ্ছা ছিল। মহারাজও এ বিষয়ে সাহায্য কোরতে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যে জায়গা পছন্দ করেন ইংরেজ রেসিডেন্ট বার বার তা দিতে অস্বীকার করে। মহারাজ তিনবার চেষ্টা কোরেও এ বিষয়ে সফল হন নাই।

অমরনাথ দর্শনের কিছু পর থেকেই স্বামীজীর মন ক্রমশঃ শক্তিভাবে পূর্ণ হোতে থাকে। শ্রীনগরে মুসলমান মাঝির চার বছরের শিশু কন্যাকে তিনি উমারূপে পুজা কোরতেন। কাশ্মীরের শ্যামল শোভায় তিনি শ্যামার দর্শন পেতেন। শিষ্যদের একদিন বোললেন—"যে দিকেই ফিরি কেবল মাকেই দেখি। তিনি যেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধোরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।" এখানেই তিনি একদিন ভাবের ঘোরে Kali the Mother (মৃত্যুরূপা মাতা) কবিতাটী লেখেন! এ সময় প্রায়ই শিষ্যদের বোলতেন—"তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা শুধু দয়াময়ী- সুখ বিধায়িনী নন, তিনি ভীমা, মৃত্যুরূপা, দুঃখদাত্রী, রোগশোক সন্তাপের জননী।" কখনও উপদেশ দিতেন

ভীমার উপাসনা দ্বারাই ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর, লোলরসনা করালীকে ধ্যান কর, মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান কোরে ফেল, তবে মার দেখা পাবি। স্বামিজীর "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতায় ঠিক এই সুরই বেজে উঠেছে—

সুখতরে সবাই কাতর, কে বা সে পামর, দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্র রূপে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়া দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্নে দেহে দয়া॥

রাজতরঙ্গিণী এবং কাশ্মীরের প্রাচীন পুরাণ নীলমাতা-পুরাণে অমরনাথ যাত্রার অনেক কথা আছে।

কোলাহই ছাড়াও পহলগায়ের কাছাকাছি আরও কয়েকটী প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে অনেকেই যান। ২১ মাইল দূরে ১৩০০০ ফিট উঁচুতে তারসার হ্রদ, ১৪ মাইল দূরে ১০০০০ ফিট উঁচু মালভূমিতে লিদারওয়াট বনভূমি প্রভৃতি এদের মধ্যে প্রধান।

পহলগাম থেকে সন্ধ্যায় বাস ফিরলো শ্রীনগর। বর্ত্তমান যুগ গতির যুগ; কিন্তু এই গতিবেগের ফলে দেশভ্রমণের আনন্দ হোয়েছে ভিন্ন রকমের। পূর্ব্বে তীর্থে হাঁটা পথে চোলতে হোত, ৫০ মাইলের তীর্থ শেষ করে ফিরে আসতে হয়তো ১০ দিন লাগতো, কিন্তু পায়ে চলা পথের প্রতিটী জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হোত নিবিড়; পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে পাওয়া যেত যে পুণ্য তা ছিল প্রিয়তর, অনেক বেশী প্রাণবন্ত। আজ যেখানে বাসে দিন ৬০ মাইল কি ১০০ মাইল ঘুরে যে দর্শন বা তীর্থ ভ্রমণ হয় তার মধ্যে পায়ে চলার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, নাই পরিশ্রমের পারিশ্রমিকে পাওয়া প্রাণের স্বর্গ, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

মোগল উদ্যান

বাসে একদিনে শ্রীনগরের সব মোগল বাগানগুলি দেখলে আর শীকারায় ধীরে সুস্থে ২৷৩ দিনে বাগানগুলি দেখলে বোঝা যায় দু'ভাবে দেখার পার্থক্য। বাসে ৫৷৬ ঘণ্টায় হারওয়ান, শালিমোর (শালিমার), নিষাদবাগ দেখিয়ে শেষে আনে চেসমাসাহী বাগানে, যেটা সহরের সবচেয়ে সন্নিকট। আর শীকারায় গেলে একদিনে শালিমার, নিষাদ দেখা যায়, অন্য দিনে চশমাসাহী, গাগরীবল এবং এর কাছাকাছি নূতন তৈরী বিজলী বাতির মালায় ঝলমল নৌকা রাখার দ্বীপ—যার নামকরণ হোয়েছে "নেহেরু পার্ক"। হাতে সময় বেশী থাকলে আরও ধীরে সুস্থে এক একদিনে একটা বাগান ও নাসিমবাগ নাগিনবাগ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। বেড়ানর বিলাস ঠিকমত উপভোগ কোরতে চাইলে একটু সময় হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে সব দেখা ভাল। অনেকে ১৫৷১৬ দিনের জন্যে কাশ্মীর গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পরে বোলেছিলেন যে সব দেখার জন্যে রোজ দৌড়াদৌড়ি কোরে (অবশ্য বাসে) তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেছেন; অবসর বিলাস বিনোদের বিশ্রাম ও আনন্দ একটুও পান নাই।

শ্রীনগর বা ডালগেট থেকে শীকারায় বাগানগুলি যাবার অনেক জলপথ আছে; তার মধ্যে সাধারণতঃ শীকারা রাইনাওয়াড়ী দিয়ে গিয়ে শালমার ও নিষাদ বাগান দেখিয়ে ডালহ্রদ প্রায় প্রদক্ষিণ কোরে গাগরীবল হোয়ে শ্রীনগরে ফিরে আসে।

জলপথের দৃশ্য বড় চমৎকার। ডালের জলের ওপর ভ্রাম্যমান বাগানের কথা পূর্ব্বে বোলেছি। ডালের স্বচ্ছ জলের তলায়ও যতদূর দৃষ্টি যায় নানারকমের গালপালা দেখা যায়। স্বচ্ছ জলের নীচে সে যেন আলাদা এক সজীব জগৎ। বিভিন্ন ধরণের গাছগুলির মধ্যে ছোট মাঝারি মাছ চোখের সামনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডালের ওপর সূর্য্যাস্ত; এক পরম উপভোগ্য দৃশ্য; পশ্চিমের পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী

খিলানমার্গের একাংশ

ফটো—প্রবোধ মুখোপাধ্যায়

সূর্য্যের লাল আভা যখন নীল আকাশকে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে তখন তার প্রতিচ্ছবি পড়ে ডালের চিকণ কালো জলে। অক্টোবরে এ দৃশ্য আরও রমণীয় কারণ তখন পাহাড়গুলির মাথায় ছিল শুভ্র-তুষার কিরীট, আর অস্তগামী সূর্য্যের অন্তহীন বৈচিত্র্যে ক্ষণে ক্ষণে ঘটছিল তাদের বর্ণ বিবর্ত্তন।

শালিমার যাবার পথে ছোট-খাট সহর পড়ে রাইনাওয়াড়ী। খালের দু'ধারে সহরের বাড়ী, বাসন-মাজার ঘাট, ফসলের মাঠ। ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত বিদেশী দেখে ব্যবসার লোভে তীর থেকে ডাকে "পেপিয়ার মেসি সাব, উডওয়ার্ক সাব"। শাল কার্পেট কাঠের কাজ প্রভৃতি কাশ্মীরী শিল্পের সব কিছুই এখানেও তৈরী হয়। স্থলপথেও এটী শ্রীনগরের সঙ্গে যুক্ত। এ গ্রামটীর মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে যখন নৌকা চোলছিল—দু'ধারে—মাঝে মাঝে চোখে পোড়ছিল কাশ্মীর কন্যাদের, কেউ বাসন মাজছে, কেউ কাপড় কাচছে। এদের দেখে মনে পোড়ল এই গ্রামেরই একটী বধূকে—তার নাম আরনিমল। মেয়েটি ছিল এই গ্রামের বিখ্যাত ফারসী কবিতা লেখক মুন্সি ভবানীদাস কাচরুর স্ত্রী। আরনিমল

জন্মে ছিল সতের দশকের শেষের দিকে শ্রীনগরের সহরে আবহাওয়ায়, কিন্তু বিয়ে হোল তখনকার এই গ্রামে। আরনিমল ছিল স্বভাব কবি; কিন্তু এই কবির কাব্য-গগনে চাঁদ হাসলো না, ফুল ফুটলো না। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে এই কোমল কবিপ্রাণে লাগলো কঠিন আঘাত—সেই আঘাতই রূপ নিল আরনিমলের 'লোল' সঙ্গীতে। আরনিমলের কবি প্রতিভা কাশ্মীরী সাহিত্যে স্বীকৃত। লালেশ্বরীর মত তাঁর কবিতায় ধর্ম্ম বা দর্শনের ইঙ্গিত নাই। ইনি বিরহিণী কবি, মাটীর মানুষ, মানুষের মর্ম্মবেদনায় এঁর দরদী মন তাই কেঁদেছে। বিরহে এঁর জীবন ব্যর্থ, তবু তাঁর দীর্ঘশ্বাস অভিশাপ হোয়ে ওঠে নাই। এই কল্যাণময়ী কবি কারু অকল্যাণ কামনা কোরতে পারেন নাই; তার জীবনের ব্যর্থতা বিষ হয়ে ফুটে ওঠেনি।

আরনিমলের কবিতার মর্ম্ম এই :—

বঁধু, কাহারে কহিব এ মরম ব্যথা,
সকলে আমায় উপহাসে; সে যে কয়না কথা।
তবু তার সুখে আমি সুখী;
হই আমি চিরদুঃখী।
গৃহ ছেড়ে এসেছিলাম শুধু তার তরে
কিন্তু তবু ক্রুদ্ধ চোখে ছুঁড়ে দিল মোরে;
তবু সে সুখে থাক, দীর্ঘ জীবন পাক।
ক্ষতি নাই, আমি হই দুঃখী।
এই আশা করি।

আরনিমলের কবিতায় তার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতাই নানা ছন্দে রূপ নিয়েছে। কাশ্মীরের বসন্তের অপরূপ রূপ তার কবিতায় ফুটে উঠেছে অথচ তার সঙ্গে বেজেছে বিরহীর মর্ম্মবীণা।

কাশ্মীরের কাব্য ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছে এই সব কবির রচনায়। আজও কাশ্মীরের সাহিত্য খুব বেশী পেছিয়ে নাই; সংস্কৃত, পারসীক এবং উর্দ্দু ভাষার ঐতিহ্য ভিত্তি কোরে আজ কাশ্মীরের নিজস্ব যে কথ্যভাষা গোড়ে উঠেছে—সেই ভাষাতেই আজ কাশ্মীরী সাহিত্য সৃষ্ট হোচ্ছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে যে কাব্য রচিত হোত অথবা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রেম ও বিরহের যে রাগিণী সঙ্গীতে রণিত হোত আজকের কাশ্মীরী কবিতায় তার লেশমাত্র নাই। আজকের কবি গায় বঞ্চিতের বেদনা, সে সৃষ্টি করে রাজনৈতিক চেতনা; কল্পনালোক থেকে সে আজ নেমে এসেছে বাস্তব লোকে। বর্ত্তমানকালের বিদ্রোহী কবিদের মধ্যে গোলাম আহমদ্ মাহজুর, আবদুল আহাদ, আজাদ মীর্জ্জা, গোলাম হাসান বেগ (ছদ্মনাম আরিক), আবদুল সাত্তার গুজরী (ছদ্মনাম আসি অর্থাৎ পাপী), দীননাথ (ছদ্মনাম নাদীম) প্রেমনাথ পরদেশী, সোমনাথ জুৎসী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভক্তিমূলক কাব্য রচয়িতা হিসেবে দয়ারাম গাঞ্জু, জিনদা কাউল সুখ্যাতির সঙ্গে পুরাতন ধারাকে আজও জীবিত রেখেছেন। কাশ্মীরী কথ্যভাষায় রচিত দুটী বিখ্যাত প্রাচীন রূপকথার বই 'ওয়াজীরমল' ও 'লালমল'। প্রেমের কাহিনী আছে 'শাসায়ার'-এ এবং 'শাশমান'-এ আছে বহু দুর্দ্ধর্ষ ঠগ দস্যুদের কাহিনী। এ সব নিজস্ব সাহিত্য ছাড়াও আরবের গল্প 'হাতেম-তাই', পারস্যের 'সোহরাব-রুস্তম', 'ইয়ুসুফ-জুলেখা', 'শাহনামা' প্রভৃতি অনেক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান কাশ্মীর সাহিত্য আপন কোরে নিয়েছে। 'কথা সরিৎ-সাগরের' লেখক সোমদেব (১০০০ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরের অধিবাসী। সোমদেব ছাড়া আরও অনেক কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক, যথা দামোদর গুপ্ত (৭৫০ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরী ছিলেন। রত্নাকর (৮৫০ খৃঃ অঃ), দেশোপদেশ লেখক ক্ষেমেন্দ্র (৯৭৫ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরী ছিলেন। সাহিত্য ছাড়া দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও কাশ্মীর সন্তানদের অনেকে আজও স্মরণীয়। বিখ্যাত দার্শনিক পতঞ্জলি, আলঙ্কারিক বামন ভট্ট, চিকিৎসাবিদ্ চরক, শুশ্রুত, নরহরি, জ্যোতির্বিদ্যায় আর্য্য ভট্ট. ভাস্করাচার্য্য সকলেই কাশ্মীরের সন্তান। কাজেই কাশ্মীরের ঐতিহ্য, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ডালের কমল বন ছেড়ে ধীরে ধীরে কখন কাশ্মীর সাহিত্যের কমল বনে ঢুকে পোড়েছি—কিন্তু আর নয়।

(ক্রমশঃ)

উজ্জীবন

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

ম্লান দীর্ণ জীবনেও বেদনার বিষণ্ণ বিক্ষোপ,
ক্লান্ত-ক্লিষ্ট কপোলেও ঘনায় মৃত্যুর কালোছায়া :
শল্যপীড়া কংকালের—ব্যবচ্ছেদ ব্যথা অবলেপ;
জীবনের রুদ্ধদ্বারে ক্ষুধিত মৃত্যুর লুব্ধ কায়া।
বঞ্চনা-বিদগ্ধ-বক্ষে কোথা পুষ্ট প্রাণের স্পন্দন ?
ছিন্নলয় খেয়ালের মতো বারে বারে ব্যর্থ সুর তোলা !

শত-মৈনাকের দণ্ডে হৃদয়ের সমুদ্র মন্থন,
হলাহল-কণ্ঠে ধরি' কোথা নীলকণ্ঠ আত্মভোলা ?
অবীরা এ পৃথিবীতে তবু গাই জীবনের গান,
অস্থি'র পল্লব পরে তবু ওঠে সপ্তপর্ণী দুলে;
কিশোরী রাত্রির বুকে তবু চাঁদ করে অভিমান :
মন্দারের মুগ্ধ মায়া তবু বহে বন্ধ্যা-উপকূলে।

বেদনা হলুদ বৃন্তে সবুজের শ্যামল সুষমা,
পাণ্ডুর তিমির তীর্থে প্রভাতের পুণ্য পরিক্রমা॥

স্বপ্ন-শপ্তক

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

দূরে একটা বাড়ীতে এখনও ঢোলের আওয়াজ শোনা যায়—ধিন্-ধিন্-ধিনত্।

সারাদিনের শ্রান্ত দেহ আর অবসন্ন হাতের বোল, ঠিক তাল-লয়ের মাত্রা মেনে চলছে না; তবুও ভাল লাগে। আর ভাল লাগে চাঁদের আলোয় মসৃণ করে দেওয়া অসমতল প্রান্তর, তাল-তমাল মহুয়ার সারি। শক্ত মাটির দেশের এরূপ ছিল আমার কল্পনার অনেক দূরে। তাই অবাক বিস্ময়ে শুধু দেখছিলাম চারধার; আর ভাল-লাগা মনটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল অনেক রঙিন কল্পনা।

দোলের আগে নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম সাঁওতাল পরগণার এক গ্রামে বন্ধুর বাড়ীতে। সারাদিন রং আবিরের ছড়াছড়িতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম; সন্ধ্যার কিছু পরে।

পরিষ্কার আকাশ একখণ্ড নীল মখমলের মত পড়ে আছে, তার উপর দিয়ে চাঁদের আলো যেয়ে মিশছে দিগন্তে। আমি কবি নই, তবুও সেদিন মনে হয়েছিল, এ শাল মহুয়ার প্রান্তরে বসে বোধ হয় কবিতা লিখতে পারি। কবিতার জন্ম নিশ্চয়ই এমনি এক রাতে। যেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মেতে উঠেছিলেন লীলা রঙ্গে; বৈষ্ণব কবিরা ভাবে বিভোর হ'য়ে উঠলেন সে লীলা রূপায়নে—আবীর কুমকুম রঙে রাঙা হ'য়ে উঠল, নতুন নতুন কবিতার অঙ্কুর।

নিঃশব্দে দু'জনে এগিয়ে চলেছিলাম, ঝির ঝির হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। নীরব রাতের নীরবতা মদির হ'য়ে আসছে; এমন সময় দেখলাম, দূর থেকে এক ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কাছে এলে দেখলাম, আধাবয়সী লোক, কপালে মাটির প্রলেপ, গায়ে দামী পাঞ্জাবী আর ধুতি। উগ্র এসেন্সের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের দেখে আগন্তুক এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর জোরে আবৃত্তি করলেন, "Life is a tale told by an idiot, full of pound and fury signifying nothing.—তারপর হেঁসে উঠলেন হা-হা করে। হাসি থামিয়ে বললেন, তোমরা আমায় মাতাল ভাবছ? আমি মাতাল, তবে সুরায় নয় সুধায়।—চাঁদের আলো আমায় মাতাল করে দেয়।—প্রেমে পড়েছ কখনও? সত্যিকারের প্রেমে। কালিদাসের, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম নয়; প্রেম, রোমিও-জুলিয়েটের—প্রেম, দান্তে আর বিয়াত্রীচের। প্রেমিকাকে নিয়ে যারা মধুচক্র নির্ম্মাণের প্রয়াস পায়, They are simply murderer, they are killing the melody of love. প্রেমকে দর্শনের আওতায় নিয়ে গেলে, তা আর প্রেম থাকে না, হয়ে উঠে জীবন। বৈষ্ণব কবিরা এ কথা বুঝতেন;—প্রেম অতীন্দ্রিয়। চুল বাঁধতে বসে শ্রীরাধার অবশ তনু, কেননা, কালো রং দেখে কৃষ্ণের কথা তাঁর মনে পড়েছে।—বিয়াত্রীচে একটীবার দেখবার জন্যে, দান্তে পথে পথে সারাদিন ঘুরেছেন, কিন্তু দেখা যেই পেয়েছেন, সাথে সাথে সব ভুলেছেন, কথা বলার মত শক্তিও লোপ পেয়েছে। এর নাম রোমাঞ্চ।—প্রেমের সফলতা মিলনে নয়, বিরহে। যুগযুগান্ত ধরে শুধু স্মৃতি নিয়ে কাটান। জীবন বাস্তব, কল্পনা নয়; তাই প্রেমিকাকে সংসারের আওতায় নিয়ে এলে, প্রেম ভঙ্গুর হ'য়ে পড়ে। "Bold lovers never never can'st thou kiss……"

দূরে তাল-তমালের আড়ালে আস্তে আস্তে ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন।

আচ্ছন্নের মত তাঁর কথা ভাবছিলাম। বিষণ্ণতার প্রতিধ্বনি চারিদিক যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গভীর স্তব্ধতা বুকে এসে জমা হ'তে থাকে, কথা বলে এ নিস্তব্ধতা

ভাঙতে সাহস হচ্ছিল না কারও। অবশেষে বন্ধুই প্রথম কথা কইলেন। একটা নিশ্বাসে যেন হালকা হ'য়ে গেল বুক। আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আগে বুঝতে পারি নি, তবে এখন চিনতে পেরেছি। এঁর কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখি নি কোনদিন। জীবনে প্রেমের ব্যাপারে ইনি বিরাট আঘাত পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, কবিতা লেখা বা সাহিত্য রচনায় নিষ্ঠা না থাকলে, তা যে ভঙ্গুর হ'য়ে পড়ে, এঁর জীবন তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। শুধু প্রেরণা পেয়ে আর যাই হোক সাহিত্য রচনা হয় না। যদিও এসব আমার শোনা কথা, যেটুকু জানি বলছি—।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না, তরণী সেনের কবিতা এক সময় বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল দেশে; সে আজ বোধকরি বছর পঁচিশ আগেকার কথা। কবিতার ক্ষেত্রে, একটা নতুন ভাবের জোয়ার এনেছিলেন তরণী সেন। প্রেমের মাধুর্য্য যে বিরহে—এ কথা প্রকাশ পেত তাঁর কবিতায়। আর বলতে কি, রবীন্দ্রপ্রভাববর্জিত, এমন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তখন কল্পনা করা যেত না। কিন্তু কয়েক বছর পর হঠাৎ তরণী সেনের কবিতা বেসুরো হ'য়ে উঠলো, তারপর আস্তে আস্তে বন্ধ হ'য়ে গেল তাঁর লেখা। প্রতিভার চরম বিকাশের আগেই, ঊর্দ্ধগামী হাউইয়ের মত নিঃশেষ হ'য়ে গেলেন তরণী সেন। প্রথমটা লোকে ভেবেছিল, নতুন কিছু লেখবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন হয়ত; কিন্তু তরণী সেনের কবিতা আর প্রকাশ হ'ল না।—অবশ্য কারণ কেউ জানত না, আমিও প্রকৃত ঘটনা শুনেছিলেম এখানে আসবার পর। তরণী সেনের কল্পনার অপমৃত্যু ঘটেছিল, প্রাঞ্জল ভাষায়—রূঢ় বাস্তবে এসে তাঁর কল্পনা নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

বন্ধু একটু চুপ করলেন। বোধকরি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনাপ্রবাহ ভেবে নিতে। দক্ষিণ থেকে ঝিরঝিরে বাতাসটা বইছে একটানা। পায়ের নীচে মহুয়া ফুল পিষ্ট হ'য়ে তুলছে একটা মিঠে আওয়াজ। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় একমুঠো মহুয়া ফুল ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে, মিষ্টি মনমাতানো গন্ধে শরীর অবশ হ'য়ে আসে, সেই সাথে শিশির-ভেজা নরম স্পর্শের সান্নিধ্যে মনটা ভিজে উঠে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।—বন্ধু আবার নীরবতা ভাঙলেন।

তরণী সেন হচ্ছেন সেই স্বভাবের মানুষ, যারা একটু বেশী রকম কল্পনাবিলাসী; জীবনটা যে আর্টের—বাস্তব নয়, একথা যারা সহজে বুঝতে চায় না। সে যাই হোক,—এমনি কোন এক রাতে, হয়ত তরণী সেন আবিষ্কার করলেন একটী তরুণীকে, তাল-তমালের ছায়া ঘেরা পটভূমিতে, মহুয়ার মাতাল করা আবিলতায়। তার চোখে হয়ত দেখেছিলেন কোন অনাগত কল্পনার ভবিষ্যৎ। এই মেয়ে, ওই দূরের সাঁওতাল পল্লীর কোন এক সাধারণ ঘরের। দিনের আলোয় হয়ত ভাল লাগার কল্পনাও মাথায় আসতো না; কিন্তু রাতের মাদকতা আর বিভ্রান্তকারী চাঁদের আলোয়, ওই যৌবন উচ্ছল কিশোরী, তাঁর হৃদয়ে নিঃশব্দে আসন নিল।—কত রাত হয়ত কাটিয়েছে কল্পনায়, আর এই সময় জন্ম নিচ্ছিল এক এক টুকরো কবিতা। তারপর কত রাতে বেরিয়েছেন অভিসারে, তবে দূর থেকেই লক্ষ্য করতেন মানসীকে। পরে হ'য়ে এসেছিল ঘনিষ্ঠতা, সাধারণের চোখের বাইরে। কিন্তু ওই সময়েই তাঁর জীবনের ট্রাজেডীর সুরু।

বাড়ীর পাশের খালি বাড়ীতে এল ভাড়াটে, স্বামী-স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে মালতী। পরিচয় হতে দেরী হ'ল না; ক্রমে মেয়েটির কাছে শুনলেন, সে একজন তার কবিতায় ভক্ত। দু' একটা কবিতা মুখস্ত বলে গেল, আর আলোচনা করল প্রচুর। আস্তে আস্তে এ পরিচয়ের গণ্ডী, চায়ের আসর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল খোলা মাঠের আওতায়। মাঠে বেড়াবার সময় সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে, দূরে একটা ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে আন-মনা হ'য়ে পড়তেন তরণী সেন। মালতী দেবীর দৃষ্টি এড়ায় না, কিন্তু তখনও তিনি ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন না। মাঝে মাঝে দেখতেন, সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে, তরণী সেন বেরিয়ে পড়তেন বাড়ী থেকে, আর ফিরতেন সেই অনেক রাতে। সেই দিন তিনি লিখতেন নতুন কবিতা, শিশির ভেজা তাজা একমুঠো মহুয়া ফুলের মত।

তরণী সেন একদিন মালতী দেবীকে বললেন, তাঁর অভিসারের কাহিনী, আর এই দিনই তিনি জীবনের চরম ভুল করে বসলেন।

অবশ্য মালতী দেবীরও দোষ ছিল না; তিনি তখন

আগুনের খেলায় মেতেছেন, পিছিয়ে যাবার উপায় নেই ; তা ছাড়া একটা সাধারণ মেয়ের কাছে হার স্বীকার করবার গ্লানি, তাঁর কল্পনায়ও অসহ্য।

এমনি কোন এক রাতে, তরণী সেন বেরিয়েছিলেন অভিসারে, মহুয়া গাছ থেকে একমুঠো ফুল হয়ত ঝরে পড়েছিল তাঁদের উপর। মালতী দেবী তাঁর বাড়ী ফিরে আসবার অপেক্ষায় বসে রইলেন। মনের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে স্থির করলেন, অনাস্বাদিত যৌবন চেতনা বিলিয়ে দিয়ে তরণী সেনকে জয় করে নেবেন। এ কল্পনায় নিজেকে অপরাধী মনে হলেও, সফলতার সোপান হিসাবে এ প্রলোভন জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজেকে নীচে নামান ছাড়া, তাঁর আর কোন পথ ছিল না।

সেই রাত থেকেই তরণী সেনের কবিতার মৃত্যু সূচনা হ'ল, তাঁর সেই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ হ'য়ে এল। কবিতায় সেই সহজ প্রাণের সুরটি আর ফুটিয়ে তুলতে পারেন না ; এ ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে, কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলেন।

বন্ধু একটু চুপ করলেন। পায়ে পায়ে প্রান্তর কখন যে শেষ হয়ে এসেছে, এতক্ষণ বুঝতেও পারিনি। সামনেই সড়ক। পেছন ফিরলেই মনে হয় যেন, ওই শাল-তমালের বন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ; ওরা বলতে চায়, এ কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই হোক, এগিয়ে গেলে সুর কেটে যাবে।—

বন্ধু আত্মগত ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন। বাস্তবে যা সহজ ও সত্য, কাহিনীর উপসংহার সেইখানেই এসে শেষ হল। মালতী দেবীকে বিয়ে করা ছাড়া, তরণী সেনের আর কোন পথ রইল না। এর মধ্যে তরণী সেন অবশ্য একেবারেই বদলে গিয়েছেন নিজের বিবেকের কাছে হার স্বীকার করে। মহুয়া বনের ছায়ায় ফেলে আসা স্বপ্নকে ভুলবার চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে।

বিয়ের বাসরে, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই পরিচিত একটা মুখ মুহূর্তের জন্য, তার পরে আর দেখতে পেলেন না। কিন্তু ওই ক্ষণিকের দেখাই, সারাক্ষণ তাঁর মন আচ্ছন্ন করে রাখে। তিনি বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে, বাসর ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেলে, চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। দূর থেকে, চাঁদের আলোয় দেখতে পান, মহুয়া গাছতলায়, সেই ছায়ামূর্তি। এগিয়ে যান। কিন্তু একি ? এতো কল্পনাও করেননি। মহুয়ার ডালে ঝুলছে, কিশোরী সাঁওতাল মেয়ের দেহ। আঁট করে পরা কাপড়ের আঁচল কোমরে রয়েছে জড়ান, এলো খোঁপায় মহুয়ার স্তবক।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, ঘরে ফিরে যাবার কথা ভুলে গিয়েছেন যেন। তারপর পাগলের মত ঘুরতে লাগলেন সারা মাঠে।

পরদিন ভোরে, বাড়ীর লোক এসে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ঘরে।

লোক চক্ষুর অন্তরালে, কোথায় একটা সাধারণ মেয়ে মারা গেল, এ নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ ; তরণী সেনও বোধ করি ভুলে গেলেন কালক্রমে। কিন্তু দোল পূর্ণিমার রাতে, আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে, বিয়ের রাতের পোষাকে ! তার পর, এখান থেকে অনেকদূরে নদীর ধারে, কতদিন আগে মাটিতে মিশে যাওয়া একটা কবরের মাটি কপালে মেখে, সারারাত ধরে ঘুরে বেড়ান, ওই তাল-তমাল আর মহুয়ার ছায়ায় ছায়ায় প্রেতের মত। যে কথা একদিন বলা হয়নি, তাই বলবার আশ্বাস নিয়ে।

বন্ধু গল্প শেষ করলেন। তাঁর কথার রেশ, রাতের অন্ধকারে, সাঁওতাল পরগণার অসমতল প্রান্তরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখের কোণে একবিন্দু জল জমা হ'য়ে রয়েছে যেন।

আর্য্য সঙ্গীতে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

শ্রুতি ও স্বর সম্বন্ধে আলোচনাকালীন স্বর কাহাকে বলে এবং স্বর-সপ্তক শ্রুতিতে কি ভাবে অবস্থিত তাহা দেখান হইয়াছে। এই যে স্বর-সপ্তক ইহারা যে শুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত তাহাও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। উপস্থিত আর্য্য সঙ্গীতে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি ও কোমল স্বর কিভাবে গঠিত তাহাই আলোচনা করিব। ইহার প্রয়োজনীয়তা এই যে আর্য্য সঙ্গীতে স্বর-সপ্তক যেভাবে গঠিত তাহার সহিত প্রচলিত স্বর-সপ্তকের গঠনের কোন সামঞ্জস্য নাই। আর্য্য সঙ্গীতে স্বর-সপ্তক যেভাবে গঠিত তাহা যথা—

"চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চচতুঃশ্রুতিঃ।
চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চ যথাক্রমঃ॥

অর্থাৎ

৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২॥

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়োমতাঃ।
ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারোঃ নিষাদকে॥"

—সঙ্গীত রত্নাবলী—

অর্থাৎ—

ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারিটী করিয়া শ্রুতি; ধৈবত ও ঋষভে তিনটী করিয়া শ্রুতি ও গান্ধার এবং নিষাদে দুইটী করিয়া শ্রুতি।

কিন্তু প্রচলিত সঙ্গীতে স্বর বণ্টন যেভাবে হয় তাহা যথা—

২ ৪ ৪ ২ ৪ ৪ ৪ ॥

অর্থাৎ—

ষড়জ ও মধ্যমে দুইটী করিয়া শ্রুতি এবং ঋষভ, গান্ধার, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদে চারিটী করিয়া শ্রুতি। প্রচলিত সঙ্গীতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী স্বর। সাতটী শুদ্ধ ও পাঁচটী বিশুদ্ধ বা বিকৃত স্বর। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রচলিত সঙ্গীতে দ্বাদশটী স্বর এবং প্রত্যেকটী দুই শ্রুতি সম্পন্ন। কিন্তু আর্য্য সঙ্গীতে দ্বাবিংশ স্বর অর্থাৎ যতগুলি শ্রুতি ততগুলি স্বর। প্রকৃত অর্থে শুদ্ধ স্বর কত শ্রুতি সম্পন্ন তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক বিকৃত স্বর বলিতে কাহাকে বোঝায়। সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা বলেন—

"যেষাং শুদ্ধত্ব হানিস্তাতে স্বরা বিকৃতা মতাঃ॥

—"সঙ্গীত বিলাস"—

যখন কোন স্বরের শুদ্ধত্বের হানি হয় তখন তাহাকে বিকৃত আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, যদি কোন স্বর চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হয় এবং তাহা হইতে যদি এক শ্রুতি কমা হয় তখন তাহাকে বিকৃতস্বর আখ্যা প্রদান করা হয়। শাস্ত্র যথা—

"চতুঃশ্রুতিত্বমায়াতি তদৈকো বিকৃতোভবেৎ॥"

—সঙ্গীত-রত্নাকর—

এইভাবে আর্য্য সঙ্গীতে স্বরের বিকার ঘটান হইয়া থাকে। এতদ্বারা ইহাই দেখা যায় যে আর্য্য সঙ্গীতে যতগুলি শ্রুতি ততগুলি স্বর। আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি সংখ্যা হইল দ্বাবিংশ এবং স্বর সংখ্যাও দ্বাবিংশ। শাস্ত্র যথা—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত বিকারাখ্যা স্বরা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

—সঙ্গীত বিলাস—

কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রুতি সংখ্যা লইয়া একটী শুদ্ধ স্বর গঠিত।

আর্য্য সঙ্গীতে বিকৃত স্বর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে স্বর সপ্তকের অন্তিম স্বরটীর জ্ঞান বিশিষ্টভাবে থাকা প্রয়োজন। কারণ এই স্বরটী লইয়াই বিকৃতস্বরের উৎপত্তি। ইহা ব্যতীত বিকৃত স্বর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা বিশেষভাবে জানা উচিত যে আর্য্য সঙ্গীতে স্বর সমূহ শ্রুতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বর কিভাবে শ্রুতিতে গমনাগমন করে তাহা বুঝিতে হইলে স্বর সপ্তকের অন্তস্বরটীর সম্যক্ জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। যদিও এই স্বরটীর আলোচনা "শ্রুতি ও স্বর" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে তথাপি তাহার আলোচনা আরও বিশদভাবে করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ এই স্বরটী লীন হইবার পরে পুনরায় তাহা কিভাবে প্রস্ফুটিত হয় তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন তদ্ব্যতীত বিকৃত স্বরের ব্যুৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য এই স্বরটীর পুনরালোচনা করিতে হইতেছে।

আর্য্য সঙ্গীতে স্বর সপ্তকের অন্ত স্বরটী হইতেছে নিষাদ। ইহাকে নিষাদ বলিবার হেতু এই যে ইহা স্বর সমূহকে অন্ত করিয়া অন্তে অবস্থিত।

"নিষীদন্তি স্বরাসর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে॥"

যে হেতু স্বর সমূহকে অন্ত করিয়া এই স্বর অন্তে অবস্থিত সেই হেতু স্বর শ্রুতির আদিতে অবস্থিত হইতে পারে না। অনেকের মত স্বর শ্রুতির আদিতে অবস্থিত কিন্তু তাহা শাস্ত্র সম্মত নহে। কেননা স্বর যদি শ্রুতির আদিতে অবস্থিত হয় তাহা হইলে নিষাদ স্বর সমূহকে নিষীদান্ত করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য প্রত্যেক শুদ্ধ স্বর নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি সংখ্যকের অন্তে অবস্থিত এবং ইহাই যুক্তি সম্মত।

শ্রুতি সংখ্যার শেষ শ্রুতি হইতেছে 'ক্ষোভিণী'। ক্ষোভিত অর্থে আন্দোলিত, ধর্ষিত ইত্যাদি। ইহার শক্তিতেই ভাবের আন্দোলন ও আলোচন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রুতিসমূহ গণনার দ্বাবিংশ যাহা গণন বা গণ

বিভাগ করে তাহাই গণদেবতা গণেশ। এই হেতু এই স্বরটীকে গণদৈবত আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

পূর্ব্ব আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে শ্রুতি ও কালচক্রের নক্ষত্রসমূহ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা। ইহা মকর রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বুঝায়।

পুরাণে দেখিতে পাই যে নিষাদ স্বর সপ্তকের সহায়ে স্থিতি ও গতি দেবতার বাহনের রবের অন্ত করিয়া দক্ষিণায়নের অন্তে দক্ষিণান্ত করিয়া কুম্ভগত হইয়াছিল। সেই স্থিতি ও গতির মিলনের বসতির প্রতীক দক্ষিণায়নের অন্তে স্বরান্ত করিয়া কুম্ভক সহায়ে অন্তিমে প্রয়াণ করিয়াছিল। অর্থাৎ তমসাবৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্ফোটরূপে অধিষ্ঠিত হইল।

ছন্দময় জগৎ। নাদই ব্রহ্ম। স্পন্দন হইতে জগৎ বিবর্ত্ত। গতি ও স্থিতি হইতে স্পন্দন। এই স্পন্দন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম হইয়া এমত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে তাহা আর প্রতীতিগম্য হয় না। শব্দ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই তাহার অনিত্যতা, অনেক রূপতার ও কার্য্য রূপতার আবরণ পৃথক হইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহা তাহার নিজস্ব একরূপে অর্থাৎ জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় দৈশিক ও কালিক পরিচ্ছেদের অতীত হইয়া অধিষ্ঠিত হয়। ইহাকেই স্ফোট কহে। এই যে একরূপ প্রতিষ্ঠিত শব্দ ইহাই হইল অনাহত ধ্বনি। ইহা সাধারণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। ইহা যৌগিক ক্রিয়া হেতু সমাধি অবস্থায় শ্রুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এই স্ফোট বা শব্দ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ বিবর্ত্ত। সেইজন্য এই শব্দ ব্রহ্ম সমস্ত জগতের উপাদান। অনাদিকাল হইতে যে সূক্ষ্ম বাসনা ব্রহ্মে লীয়মান থাকে সেই বাসনাই হইল অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই হইল ত্রিগুণাময়ী প্রকৃতি। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় কোন ক্রিয়া নাই। যখন তাহার ক্ষোভ হয় তখন তাহার বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই বিকার হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন উঠে। এই স্পন্দনই হইল প্রকৃতির গুণক্ষোভ।

"The last vibration of the seventh eternity thrills through infinitude. The mother swells expanding from within without like the buds of the lotus."

Proem III, Secret Doctrine.
H. P. Blavatsky.

এই স্পন্দশক্তিই হইল ব্রহ্মের সংকল্প ও বিকল্পময়ী অর্থাৎ আবরণী ও বিক্ষেপণী মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যত প্রকারে বিবর্ত্তিত করে তত প্রকার শব্দ উত্থিত হয়।

ভৌতিক অণুর স্থিতি ও গতির মিলনই স্পন্দনের কারণ। এই স্পন্দন হইতে ধ্বনির উৎপত্তি। বায়বীয় অণু ধ্বনিকে বহন করে। সেই অণুগুলির গন্তব্যস্থানের দিকে সদাই আগু ও পিছু গমনাগমন হইতে বায়ুমণ্ডলে ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। এই ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা হইতে বাক্যের উৎপত্তি যাহা বৃহস্পতি নির্দ্দেশ করে।

বাচস্পতি বৃহস্পতি হইল বৈখরী শক্তি এবং বিষ্ণু হইল প্রাণশক্তি। বিষ্ণু-বিষ (ব্যাপা)+নুক্ ক্। অর্থাৎ যিনি ব্যাপ্ত হয়েন। প্রাণেরই ব্যাপ্তি হয়। আত্মা তাহার আধাররূপ দেহেতে প্রাণশক্তি ব্যাপ্ত করিয়া বায়ুমণ্ডলে শ্রবণ গ্রাহ্য ধ্বনির উৎপত্তি করে। প্রাণশক্তিই বাক্শক্তিকে পরিচালনা করে। গতিরূপ মকর রাশি ও স্থিতিরূপ কুম্ভ রাশির সন্ধি স্থলে ধ্বনি রূপ বসু নক্ষত্র ধ্বনিষ্ঠা অবস্থিত। এই মকর ও কুম্ভ রাশি শনি গ্রহের আবাস। ধনু ও মীনরাশি তাহার দুই পার্শ্বে অধিষ্ঠিত। তাহারা হইল বৃহস্পতির কক্ষ। শনির গৃহে শ্রবণ কার্য্যের অধিপতি শ্রবণা। ইহার দেবতা বিষ্ণু যিনি প্রাণশক্তির দ্বারা অগ্নিরূপী আত্মার শক্তি আহরণ করেন। কাজেই উচ্চারিত বাক্যই হইল হরি হরের মিলন স্বরূপ। ইহাই হইল সৃষ্টি কর্ম্মে আদান ও প্রদানের মূল তত্ত্ব। বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি অর্থাৎ বৈখরী শক্তি। আত্ম চেষ্টা হেতু কণ্ঠনালীতে মৃদু আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়ন হেতু যে মৃদু ধ্বনি নির্গত হয় তাহাই সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতি নামে অভিহিত হয়। শ্রুতি হইল "স্বরারম্ভ কারয়বঃ শব্দ বিশেষঃ।" এই শ্রুতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে বৈদিক কালজ্ঞান ভিন্ন আর্য্য সঙ্গীত শুধু আর্য্য সঙ্গীত কেন—কোন আর্য্যশাস্ত্র সম্যক্ভাবে বোধগম্য হয় না। এই কারণেই আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতির সহিত কাল চক্রের নক্ষত্র সমূহ কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহাও বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

কাল চক্রে প্রথম নক্ষত্র হইল অশ্বিনী। এই অশ্বিনী নক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা প্রয়োজন।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ভাস্কর পত্নী সংজ্ঞা ভাস্কর-তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন রত হইল। ভাস্কর তাহা অবগত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শব্দময়ী আকাশে তাহাতে উপগত হওয়া হেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। এই হেতু অশ্বিনী-কুমার সংজ্ঞা সুত। অতএব দেখা যায় যে চিৎ ও অচিতের মিলন হইতে অহং ও ইদং জ্ঞানের উৎপত্তি। "সংজ্ঞাস্যাশ্চেতনা নামোক্তা দ্বৈরর্থ সূচনা"। ইদং জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। এবং সংজ্ঞা উৎপন্ন না হইলে স্বর শ্রুত হইয়াছে বলা যায় না।

সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি হইল "তীব্রা"। তীব্রা কথাটি তীব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তীব্ অর্থে স্থূল হওয়া। প্রাণের বিকাশ নিমিত্ত স্থূল হইয়া বৈখরী বাকের উৎপত্তি। ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া যে স্বর অধিষ্ঠিত তাহা কৈশিক নিষাদ নামে অভিহিত হয়। কৈশিক কেশ+ষ্ণিক্। কেশ অর্থে অতি সূক্ষ্ম। এই স্বরটিকে কৈশিক বলিবার হেতু এই যে নিষাদ স্বরসমূহকে অন্ত করিয়া অসীমের মধ্যে স্ফোটরূপে বিদ্যমান থাকে। এবং তাহা পুনরায় ধীরে ধীরে পদ্মকোরকের ন্যায় অন্তঃ ও বহিতে বিকসিত হয়। যেমন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বস্তু দিয়া রসাদি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহ সৃষ্ট করে সেইরূপ এই নিষাদ স্বর গমনাগমন করে। অর্থাৎ উর্ণনাভ যেমন তাহার তন্তু বিস্তার করে সেইরূপ এই স্ফোটও তাহার সূক্ষ্ম তন্তু

বিস্তার করে। এই ধ্বনি প্রথমাবস্থায় অতি সূক্ষ্ম থাকা হেতু ইহাকে কৈশিক নিষাদ নামে অভিহিত করা হয়। ইহা শৃঙ্গার রস জ্ঞাপক।

কাল চক্রে দ্বিতীয় নক্ষত্র হইল ভরণী। ইহার দেবতা যম, যাহা সংযমনী শক্তি প্রদান করে। প্রাণ বায়ুর সংযমন ভিন্ন স্বরোৎপত্তি হয় না। দ্বিতীয় শ্রুতি হইল কুমুদ্বতী। কু অর্থে পৃথিবী, শরীর। সংযমন হেতু যাহা দেহকে মুদ্ অর্থাৎ হৃষ্ট করে তাহাই কুমুদ্। আর্য্য সঙ্গীতে দ্বিতীয় শ্রুতিতে যে স্বর অধিষ্ঠিত তাহার নাম হইল কাকলি নিষাদ। কাকলি অর্থে সূক্ষ্ম মধুর অস্ফুট কূজন। ইহাও শৃঙ্গার রস জ্ঞাপক। নট নারায়ণ রাগে এই স্বরটিকে বাদী করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নিষাদ দ্বিশ্রুতিসম্পন্ন। কিন্তু তাহা যখন বিকার প্রাপ্ত হয় তখন ত্রি ও চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হয়। শাস্ত্র যথা—

"বিকৃতো ভেদো নিষাদ স্ত্রিচতুঃশ্রুতি।
কৈশিকে কাকলিত্বে চ দ্বৌ ভেদৌ ভবতস্তথা॥"

—সঙ্গীত বিলাস

আর্য্য সঙ্গীতে তৃতীয় শ্রুতি হইল 'মন্দা'। কাল চক্রে তৃতীয় নক্ষত্র হইল কৃত্তিকা।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে সমুদ্র মন্থন কালে মন্দার পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ডরূপে ব্যবহার করা হয়। সেই মন্থন দণ্ড ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়। সেই হেতু তৃতীয় শ্রুতির নাম হইল মন্দা।

পুরাণে আরও উল্লিখিত আছে যে হৈমবতী দেবাদিদেবের তেজ ধারণে সক্ষম না হওয়ায়—তাহা নদীতে নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা তাহা বহনে অপারগ হাওয়া হেতু শরবনে নিক্ষেপ করেন। তথায় এক সদ্যোজাত শিশুর আবির্ভাব হয়। দক্ষ দুহিতা কৃত্তিকা তাহাকে প্রথম অবলোকন করেন। সেই হেতু অগ্নি তাহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া দাবী করেন। এবং রোহিণ্যাদি চন্দ্রের ছয় পত্নী তাহার মুখে অঙ্গুষ্ঠ দেওয়া হেতু তিনি ষড়ানন নাম প্রাপ্ত হয়েন। কারণ তিনি ছয় মুখ বিশিষ্ট হইয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ সমুদায় চোষণ করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি অগ্নিকুমার সেই হেতু তিনি হেম বর্ণ বিশিষ্ট। এই কারণবশতঃ তৃতীয় শ্রুতিতে যে স্বর অধিষ্ঠিত তাহাকে 'চ্যুত' ষড়জ বলা হয়। কারণ চ্যুত অগ্নি হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

আর্য্য সঙ্গীতে চতুর্থ শ্রুতিতে যে স্বর অধিষ্ঠিত তাহাকে অচ্যুত নামে অভিহিত করা হয়। তাহার কারণ কালচক্রে রোহিণী হইল চতুর্থ নক্ষত্র এবং ইহার দেবতা প্রজাপতি যাহা বিশেষ করিয়া প্রজনন করায় বীজ রোপণ নিমিত্ত। বীজই জীবে পরিণত হয়। এইজন্য ষড়জ স্বর হইল "ষণ্ণাং স্বরাণাং জনকঃ ষড়ভিবর্জিস্ততে স্বরৈঃ"—অর্থাৎ ষড়জ হইতে স্বর-সমূহ উৎপন্ন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ হেতু ষড়জ স্বর হইল ষড়ানন বিশিষ্ট এবং হেম বর্ণযুক্ত ও পাবক ইহার গায়ক এবং রস ইহার শৃঙ্গার। ইহাই হইল আর্য্য সঙ্গীতে শুদ্ধ ষড়জ। ইহার ছন্দোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত হইবার হেতু এই যে কালচক্রে চতুর্থ নক্ষত্র হইল মনরূপ চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র। চন্দ্র হইল আহ্লাদ কারক। তাই শ্রুতি হইল ছন্দোবতী। ছন্দঃ কথাটি চন্দ্ অর্থে আহ্লাদিত করা বা ছন্দ্ অর্থে আচ্ছাদন করা পূর্ব্বক অচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। শ্রবণ মননে যাহা প্রীতিপ্রদ তাহাই ছন্দ।

এইভাবে মধ্যমে ও পঞ্চমে স্বরের বিকার ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিন স্বরই স্বরিতে অবস্থিত ও তাহারা চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন। ইহাদের স্বরিতে অবস্থিতি হইবার হেতু এই যে স্বরোৎপত্তির অব্যবহিত পরেই সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ মাধুর্য্যে ইহাদের বিকাশ হয় প্রথম স্বরিত স্থানে অর্থাৎ কণ্ঠে। ঋষভ এবং ধৈরত ইহাদের অনুগমনকারী হওয়া হেতু তাহারা অনুদাত্তে অবস্থিত ও গান্ধার এবং নিষাদ দুই অর্দ্ধের অন্তস্বর হওয়া হেতু তাহাদের অধিষ্ঠান উদাত্তে।

এই সপ্তস্বর যদি কালচক্রে নক্ষত্র ধরিয়া অবস্থান করা যায় [নক্ষত্রের সহিত শ্রুতির সম্বন্ধ বিশেষভাবে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে] তাহা হইলে দেখা যায় যে ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার উত্তরায়ণে অবস্থিত এবং পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ দক্ষিণায়নে অবস্থিত। উত্তরায়ণের অন্তস্বর হইল গান্ধার। সেই হেতু গান্ধার হইল উদাত্ত স্বর এবং দক্ষিণায়নের আদি স্বর হইল পঞ্চম এবং সেইজন্য তাহার অবস্থিতি স্বরিত স্থানে। এই কারণবশতঃ ষড়জ স্বরের সকল গুণই পঞ্চমে অবস্থিত। এই হেতু শাস্ত্রকারগণ বলেন—"স্বরান্তগণং বিস্তারং যো মিমীতে স পঞ্চমঃ" অর্থাৎ স্বর সমূহের যে বিস্তার সাধন করে তাহাকেই পঞ্চম আখ্যা দেওয়া হয়। এই সমস্ত হেতু ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল ইহার গায়ক। কারণ "নাকারঃ সৃষ্টি কর্ত্তা চ দকারঃ পালক সদা" অর্থাৎ যিনি জনগণকে সৃষ্ট ও পালনকরেন। সেই কারণেই ইহাতে নিবদ্ধ করা হইল আদিরস।

মধ্যম এই দুই অয়নের মধ্যস্থানে অবস্থিত হইয়া মধ্যমরূপে দুই অয়নকে ধারণ করা হেতু স্বার্দ্ধস্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পীড়া যেমন নিজ বোধকে বিকাশ করে সেইরূপ দুই অয়নস্থিত স্বরসমূহ মধ্যমকে প্রকাশ করে। এই কারণেই বোধের জনক ইহার গায়ক ও শান্ত ইহার রস।

এইভাবে শুদ্ধস্বর যখন নিজ শ্রুতি ত্যাগ করিয়া তদূর্দ্ধ কোন স্বরের শ্রুতি গ্রহণ করে তখন তাহাকে তীব্র বলা হয়। যদি এক শ্রুতি গ্রহণ করে তীব্র, দুই শ্রুতি অবলম্বনে তীব্রতর, তীব্রতম ইত্যাদি বলা হয়। অর্থাৎ চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন কোন স্বর তদূর্দ্ধ কোন স্বরের শ্রুতি গ্রহণ করে তখন তাহাকে অতিতীব্র আখ্যা প্রদান করা হয়। সেইরূপ স্বর যদি নিজ শ্রুতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নদিকে গমন করে তখন তাহাকে চ্যুত নামে অভিহিত করা হয়। এই চ্যুত ও অচ্যুত ভেদ কেবলমাত্র চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন স্বরেতেই হইয়া থাকে। কিন্তু অপর স্বরসমূহ যদি তাহাদের নিজ শ্রুতি ত্যাগ করিয়া তন্নিম্ন কোন শ্রুতি অবলম্বন করে তখন তাহা কোমল বা অতি কোমল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র যথা—

স্বরো অগ্রিম শ্রুতিং যাতি তীব্র সংজ্ঞা প্রয়াত্যসৌ।
স্বরো অগ্রিম শ্রুতিং যাতি তদা তীব্রতরো ভবেৎ॥
স্বরো অগ্রিম শ্রুতিং যাতি তর্হি তীব্রতমঃ স্মৃতঃ।
চতস্রঃ শ্রুতয়ো যশ্মিন্নাধিকঃ মূর্ধনা স্বরঃ॥

অতি তীব্র তমাখ্যাং স চাপ্নোতীতি বুধা জগুঃ।
স্বর পশ্চান্নিবর্ত্তশ্চেৎ কোমলাদিভিরীরিতঃ॥
এক শ্রুতি-পরিত্যাগাতস্বরঃ কোমল সংজ্ঞক।
শ্রুতি স্বরঃ পরিত্যাগাত পূর্ব্ব শব্দেন ভণ্যতে॥

—সঙ্গীত পারিজাত—

এইভাবে আর্য্যসঙ্গীতে স্বরের বিকার ঘটান হইয়া থাকে। শ্রুতি সমূহকে পুনরায় জাতি হিসাবে বিভাগ করা হইয়াছে। তাহা যথা

"দীপ্তায়তা চ করুণা মৃদু মধ্যেতি জাতয়ঃ॥"

—সঙ্গীত বিলাস—

অর্থাৎ দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। এই পঞ্চপ্রকার জাতি হইতে পঞ্চভাবের সৃষ্টি। তাহারা যথা—

দীপ্তা—মধুর ভাব
আয়তা—শান্ত ভাব
করুণা—বাৎসল্য ভাব
মৃদু—দাস্য ভাব
মধ্যা—সখ্য ভাব।

এই ভাব সমূহ পরে আলোচিত হইবে। এক্ষণে স্বর সমূহ শ্রুতিতে কি ভাবে অধিষ্ঠিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রুতি সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বর	জাতি
১	তীব্রা	কৈষিক নিষাদ	দীপ্তা
২	কুমুদ্বতী	কাকলি নিষাদ	আয়তা
৩	মন্দা	চ্যুত ষড়জ	মৃদু
৪	ছন্দোবতী	অচ্যুত ষড়জ (শুদ্ধ)	মধ্য
৫	দয়াবতী	অতি কোমল ঋষভ	করুণা
৬	রঞ্জনী	কোমল ঋষভ	মধ্যা
৭	রতিকা	ঋষভ (শুদ্ধ)	মৃদু
৮	রৌদ্রী	কোমল গান্ধার	দীপ্তা
৯	ক্রোধা	গান্ধার (শুদ্ধ)	আয়তা
১০	বজ্রিকা	কৈষিক গান্ধার	দীপ্তা
১১	প্রসারিণী	কাকলি গান্ধার	আয়তা
১২	প্রীতি	চ্যুত মধ্যম	মৃদু
১৩	মার্জ্জনী	অচ্যুত মধ্যম (শুদ্ধ)	মধ্যা
১৪	ক্ষিতি	কৈষিক মধ্যম	মৃদু
১৫	রক্তা	কাকলি মধ্যম	মধ্যা
১৬	সন্দিপনী	চ্যুত পঞ্চম	আয়তা
১৭	আলাপিনী	অচ্যুত পঞ্চম	করুণা
১৮	মদন্তী	অতি কোমল ধৈবত	করুণা
১৯	রোহিণী	কোমল ধৈবত	আয়তা
২০	রম্যা	শুদ্ধ ধৈবত	মধ্যা
২১	উগ্রা	কোমল নিষাদ	দীপ্তা
২২	ক্ষোভিণী	শুদ্ধ নিষাদ	মধ্যা

পরিশেষে পরমাশ্চর্য্য তত্ত্বনিরূপণে বলিতে হয় সঙ্গীত ও সামুদ্রিক অংশুমানের যমজ সন্তানের ন্যায় পরম ব্রহ্মের যুগল কুমার। যেমন পবিত্রের উর্দ্ধদেশ লব ও অধোদেশ কুশ সেইরূপ বৈদিক তত্ত্বের উর্দ্ধদেশ সামুদ্রিক ও অধোদেশ সঙ্গীত।

—শিবম্—

স্বর্ণলতা প্রসঙ্গে জে. ডি. এণ্ডার্সন

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা জ্যোতিতে বাংলা সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাঁর অপূর্ব্ব লিপি কৌশল, কবিত্বময়ী ভাষা—রোমান্টিক পরিবেশপূর্ণ প্রণয় কাহিনী পাঠ করে বাঙালী যেমন পুলকিত ও মুগ্ধ তেমনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গৌরবান্বিত। তাঁকে অনুসরণ করে বাংলার সাহিত্য সেবকগণ সাহিত্য পথে অগ্রসর হন। তাঁর অপ্রতিহত প্রভাবে সেদিন বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ঠিক সেই সময় উপন্যাস ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য প্রতিভাবান এক লেখকের আবির্ভাব হয়; তিনি আর কেউ ন'ন—রোমান্স বিদ্বেষী—বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারকনাথই একমাত্র লেখক যিনি বঙ্কিম যুগে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে কোথাও এক বিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতিক্রিয়া।

অমর কথাশিল্পী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত 'স্বর্ণলতা' সর্ব্বজনবিদিত উপন্যাস। বঙ্কিমযুগের তিনিই একমাত্র লেখক যিনি একশো বছর পর আজও বাংলার পাঠক পাঠিকাদের মনোমন্দিরে আপনজনের মত বিরজিত। একমাত্র 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচনা করেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর 'স্বর্ণলতা'র মত সুখ্যাতি বাংলা সাহিত্যে খুব কম উপন্যাসের ভাগ্যেই ঘটেছে। অথচ 'স্বর্ণলতা' পল্লীবাংলার দরিদ্র নরনারীর হাসি-কান্নাভরা জীবনসংগ্রামের কাহিনী তাদের সুখদুঃখের ঘর সংসারের কাহিনী। 'স্বর্ণলতা'র বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক হৃদয় সংঘাতের যে করুণ কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে তা একান্তই নিখুঁত। এ কাহিনী যে কোন বিদেশী পড়লেই বুঝতে পারবে, বাঙালী জাতি কেমন, কেমন তাদের জীবন। এই কারণেই রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "উপন্যাস রচয়িতা বলিয়া 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অল্প খ্যাতি লাভ করেন নাই। তাঁহার

রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে—তাহার কোন স্থানে—জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদের হিন্দু রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, তাহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন।" 'স্বর্ণলতা'র এই গুণের জন্যই সুবিখ্যাত জে. ডি. এণ্ডার্সন * সাহেব 'স্বর্ণলতা'কে বাংলা দেশে গমনোন্মুখ বিদেশী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীগণের বিশেষ পাঠোপযোগী মনে করে তাঁদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণকে প্ররোচিত করেন।

আজ থেকে সাইত্রিশ বছর আগে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় যখন তারকনাথ জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন সেই সময় তিনি পত্র দ্বারা এণ্ডার্সন সাহেবের নিকট 'স্বর্ণলতা' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর কেম্ব্রিজ থেকে তিনি শ্রীযুক্ত নন্দীকে তাঁর মতামত জানান পত্রযোগে। এই পত্রে তিনি 'স্বর্ণলতা'র একটি সুন্দর সমালোচনা করেন। এর সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে বলে আমরা সেই অপ্রকাশিত পত্রটি বঙ্গানুবাদ করলাম।

"১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি সর্ব্বপ্রথম 'স্বর্ণলতা' পাঠ করি এবং পাঠ করে এমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আজ পর্য্যন্ত 'স্বর্ণলতা' আমার প্রিয় পাঠ্য হয়ে আছে।

"আজকাল 'নভেল' বলতে যা বোঝায়, 'স্বর্ণলতা' ঠিক তা নয়; 'স্বর্ণলতা' একটি চমৎকার কাহিনী, একটি মধুর গল্প। এর চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। কাশীভূষণ ও বিধুভূষণ এবং প্রমদা ও সরলার বৈষম্য অতি নিপুণ অথচ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত। আর শ্যামাদাসী Sir walter scatt কিম্বা Robert Louis stevensonএর মনোমত চিত্র। এই চরিত্রটি এঁদের দুজনের মনকে নিশ্চয়ই উল্লসিত করে তুলবে। বাঙালী গৃহস্থের বিশ্বস্ত আশ্রিতার আদর্শস্থল সে। তার মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি রয়েছে; তবু মানবমনের এই সমস্ত দুর্ব্বলতাগুলিই তার চরিত্রকে আরও মধুরতর করে তুলেছে। আর একটি চমৎকার নারীচরিত্র ঠাকরুণ দিদি। নীলকমল চরিত্রটিও চিত্তাকর্ষক; বেচারা আমাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করে। গদাধর চরিত্রে দুঃখবাদ থাকলেও এটি একটি অপূর্ব্ব ও শ্রেষ্ঠ হাস্য রসাত্মক চিত্র। স্বর্ণলতা, হেম, গোপাল তো আমাদের চির পরিচিত আপনজন। তাছাড়া এই ক্ষুদ্র চমৎকার উপন্যাসটিতে এমন অনেক ভালমন্দ চরিত্রের লোকজন রয়েছে যা সুন্দর ও সুদক্ষভাবে অঙ্কিত। ভয়াবহ দুর্বৃত্ত শশাঙ্কশেখর স্মৃতি গিরি তাদের অন্যতম। এই চরিত্রটি Charles Deckensএর মত সুদক্ষভাবে চিত্রিত। এটি নিপুণভাবে অঙ্কিত স্বার্থপর বীভৎস চরিত্রহীনতার চিত্র হিসাবে অনন্য।

'স্বর্ণলতা'র মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ রয়েছে যা Goldsmithএর Vicar of wakefield ও ফরাসী সাহিত্যের Birnar din de Saint Pierreএর Paul et Virginie পুস্তক দুটিতেও আছে। শেষোক্ত পুস্তক অপেক্ষা প্রথমোক্ত পুস্তকের সঙ্গে 'স্বর্ণলতা'র বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এতে হাস্যরসাত্মক যে সমস্ত ঝগড়াটে, ধড়িবাজ দুষ্ট ঈর্ষাপরায়ণ প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় তা ফরাসী উপন্যাসে বিরল। তারকনাথকে অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের Goldsmith বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির সঙ্গে আমার প্রিয় পুরাতন 'স্বর্ণলতা'র তুলনা করতে আমার সাহস হয় না। এটি সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর উপন্যাস। এর মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' বা 'নৌকাডুবি'র মত মানব জীবনের জটিল সমস্যার ধাঁধাঁ নেই, রোমান্টিক পরিবেশ নেই, নেই ঘটনার বৈচিত্র্য ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির প্রসারতা। তবুও এটি একটি সুন্দর মধুর কাহিনী। যে কোন সাহিত্যে প্রকাশিত হলে এটি যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

"ইংরাজী ভাষায় 'স্বর্ণলতা'র দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা আছে। প্রথমটি এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় অনুদিত The Indian Inner Home আর দ্বিতীয়টি ম্যাকমিলন কোম্পানী কর্তৃক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Svarnalata। কিন্তু কোন অনুবাদেই মূলের সরল, সহজবোধ্য রচনা পদ্ধতির সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় নি।"

"Mr. H. A. D. Philips ও Mrs. M. S. Knight বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ 'স্বর্ণলতা'র ইংরাজী অনুবাদ করেছেন কি না আমার জানা নেই। * জার্ম্মান ভাষায় 'স্বর্ণলতা'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কি না জানতে বিশেষ চেষ্টা করব। তবে বর্ত্তমানে এ কাজ সহজ সাধ্য নয়। কারণ এই সময় প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলেছিল।

আমার মনে হয় 'স্বর্ণলতা'র যথাযথ অনুবাদ হয়নি। বাংলা থেকে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করা খুবই কষ্টকর। কথানুসারে অনুবাদ করলে ভাল অনুবাদ হয় না আবার মর্মানুবাদ করতে গেলে মূলের সঙ্গে গরমিল হবার খুবই সম্ভাবনা। মর্মানুবাদে এই এক ভয়।

বাংলা দেশে গমনোন্মুখ সিভিলিয়ান যুবকগণের পক্ষে এই বইটি বিশেষ উপযোগী। এটি আমারই চেষ্টায় সিভিল সার্ভিস কমিশনার কর্তৃক বাংলা দেশে গমনোন্মুখ সিভিল সার্ভিস শিক্ষানবীশগণের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

---

* কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (Reader) স্বর্গীয় জে. ডি. এণ্ডার্সন বাংলা সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁর মত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত বিদেশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি বাঙালীর প্রতিভা ও মনীষাকে শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় রাধারাণী প্রভৃতি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ করেন। শুধু তাই নয়, স্বদেশে—সাগর পারের দেশ সুদূর ইংলণ্ডে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠে"র ব্যাখ্যা করেন। তারকনাথকে বাংলা সাহিত্যের Goldsmith" বলে—যুগপৎ সম্মানিত ও শ্রদ্ধান্বিত করেন এবং অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দীপ্ত প্রতিভায় মুগ্ধ হন।

* ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ নাইস্ অনুদিত 'স্বর্ণলতা' Journal of the National Indian Association পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় নি। মিঃ ফিলিপস্ 'স্বর্ণলতা'র অনুবাদ করেন নি।
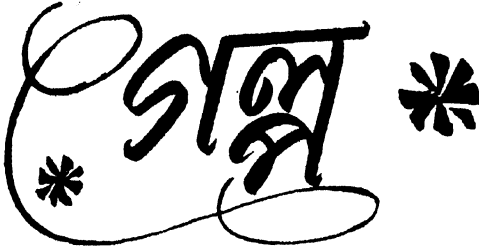
অনন্যা বোরখা

শ্রীযামিনীমোহন কর

অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা হ'ল রহমানের সঙ্গে। চৌরঙ্গীতে, লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে। একসঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছি। বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়। ছেলেটি মিশুকে। বড়লোক, ভাল খেলোয়াড়। সকলের সঙ্গেই চট করে ভাব জমিয়ে ফেলার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। তার মধ্যে আমার সঙ্গে ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা।

সাধারণ কুশলাদি প্রশ্নের পর ধরে বসল, ওর সঙ্গে একবার মিউনিসিপাল মার্কেটে যেতে হবে। তারপর ওর বাড়ী। একটু আড্ডা দিয়ে নৈশভোজন সেরে তবে ছুটি। হাতে কোন কাজ ছিল না। রাজী হয়ে গেলুম।

মার্কেটে একটা দোকানে গিয়ে উঠলুম। ওর স্ত্রীর জন্য ফার কোট কিনবে। দোকানী বললে—"এইটা নিয়ে যান, স্যর। একেবারে ইউনিক। এর জোড়া আর মিলবে না। প্যারী থেকে সদ্য আমদানী—"

দোকানীর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই "ড্যাম্ ইট, ননসেন্স" বলে অত্যন্ত রাগান্বিত ভাবে রহমান হন হন করে বেরিয়ে গেল। অগত্যা আমিও পিছু পিছু চলে এলুম, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে। একি হ'ল? ওকে তো কখনও চটতে দেখি নি। শান্ত মেজাজ, ভদ্র-ব্যবহার ওদের বাড়ীর রীতি। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত জমীদার বাড়ীর ছেলে। আদব কায়দায় বংশের খ্যাতি সর্ব্বজন বিদিত। আজ এর ব্যতিক্রম হল কেন?

একেবারে সোজা প্রায় ছুটতে ছুটতে ও চৌরঙ্গী রোডে গিয়ে পড়েছে। আমি অতি কষ্টে পিছু পিছু ধাওয়া করেছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে কাতর কণ্ঠে বললে,—"ভাই কিছু মনে করিস্ নি। আমার এ অসংযত ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। তুই বাড়ী চল্। আমি সব কথা তোকে খুলে বলব। তখন আমার অপরাধের বিচার করিস্।"

একটা ট্যাক্সি ডেকে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে উঠে বসল। পথে কোন কথা হ'ল না। কি রকম যেন উদাসীন হয়ে পড়েছে। আমিও চুপ করে রইলুম। পার্ক স্ট্রীটের প্রায় শেষে একটা সুদৃশ্য ছোট বাংলোর সামনে গাড়ী দাঁড় করাতে বলল। ভাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়ে আমায় নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল।

এতক্ষণে যেন ওর অনেকটা স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল অবস্থা ফিরে এসেছে। ড্রইংরুমে আমাকে বসিয়ে বেয়ারাকে বলল বেগম সাহেবাকে ডেকে আনতে। আমি এবার আর থাকতে পারলুম না। বেয়ারা চলে যেতেই বললুম—"হ্যাঁরে রহমান, ব্যাপার কি! বেগম সাহেবাকে ডাকলি কেন? তোদের তো পর্দ্দানশীন ফ্যামিলি—"

এক গাল হেসে উত্তর দিলে—"আমাদের এবং শ্বশুর বাড়ীর উভয় ফ্যামিলিই পর্দ্দানশীন। এক আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া। তোকে সব বলব। চা খেতে খেতে। তাহলে আমার আজকের দোকানে যে অদ্ভুত ব্যবহার তারও হদিশ মিলবে।"

বেগম সাহেবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালুম। বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। বুঝি রূপকথার রাজকন্যা মূর্ত্ত হয়ে ধরাধামে নেমে এসেছে। হবেই না বা কেন? রামপুরের নবাববংশের মেয়ে, যে বংশের রূপের এবং অর্থের খ্যাতি একটা কিম্বদন্তীর মত। রহমান আমার সঙ্গে ওর স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলে। কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার কোথাও কোন আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা নেই। একেবারে সাবলীল। অবাক হয়ে যেতে হ'ল। কিছুদিন পূর্ব্বেই তো ইনি ছিলেন অসূর্য্যম্পশ্যা।

কিছুক্ষণ গল্প-স্বল্পের পর বেগম সাহেবা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—"চায়ের বন্দোবস্ত করে আসছি। আপনারা গল্প করুন।" তিনি চলে যেতে রহমান বললে—"খুব অবাক হয়ে গেছিস, না?"

উত্তর দিলুম—"এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কি আছে? অবাক হবারই তো কথা।"

রহমান আমার দিকে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললে—"নে, ধরা?"

দু'জনে সিগারেট ধরালুম। রহমান গল্প আরম্ভ করলে।

লক্ষ্ণৌতে হিউয়েট রোডে আমাদের বাড়ীর কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। নতুন বিয়ে করে বৌ নিয়ে আছি। বাবা আমার জন্য বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেশ সুখেই কাটছিল। পয়সার কার্পণ্য বাবা কখনও করেন নি। আমাকে বেশ মোটা রকম হাত খরচ দিতেন। আমিও কোর্টে বেরিয়ে কিছু কিছু উপায় করতুম। সুতরাং যত রকম সখ হ'ত মেটাতে পারতুম। ফার্ণিচার, গয়না, কাপড় জামা নিত্য নতুন কিনে আনতুম। সাকিনা, মানে আমার স্ত্রী, মধ্যে মধ্যে আপত্তি করত। আমি শুনতুম না। একদিন এক দোকানে দেখি অপূর্ব্ব এক বোরখা। কাপড়টা এমন কোন রকম রেশমের তৈরী যে মনে হয় যেন লালচে আভা বেরোচ্ছে, ভারী পছন্দ হ'ল। দোকানী বললে,—"এ কাপড় ইউনিক। এমনটি আর কোথাও পাবেন না। আমি প্যারী থেকে কিছুটা কাপড় স্যাম্পল হিসেবে পেয়েছিলুম। এই একটি বোরখা তৈরী করতে পেরেছি।" বেশ মোটা রকম দাম দিয়ে কিনে ফেললুম। বাড়ী গিয়ে সাকিনাকে দিতে সে ভারী খুশী হ'ল। বললে যে সব সময় এটা পরবে না, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চট করে এমনটি তো আর মিলবে না। বিশেষ পর্ব্ব উৎসব ছাড়া ব্যবহার করবে না।

কয়েক মাস পরে আমিনাবাদ পার্কে মহিলাদের জন্য এক বিশেষ মেলার ব্যবস্থা করা হয়। পার্কের কাছেই আমার এক পিসীর বাড়ী। ঠিক হল যে সাকিনা পিসীর বাড়ী যাবে এবং সেখান থেকে আমার পিসতুতো বোনের সঙ্গে পার্কে মেলা দেখতে যাবে।

সেদিন রবিবার। খাওয়া দাওয়া সেরে সাকিনা চলে গেল পিসীর বাড়ী মোটরে করে। পরে গেল সেই লালচে রঙের বোরখা। আমি একা দিবা নিদ্রার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘুম এল না। বিয়ের পর থেকে প্রতি রবিবারে সাকিনার সঙ্গে গল্প করে কাটে। কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। শেষে সন্ধ্যার সময় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার অংশ থেকে বাইরে যাবার জন্য একটা আলাদা গেট ছিল। আমি একটা নকল গোঁফ আর দাড়ী পরে নিলুম। কোর্টের ড্রামাটিক ক্লাবের পোষাক পরিচ্ছদের বাক্সগুলো আমার বাড়ীতেই থাকত। আমার উদ্দেশ্য ছিল পিসীর বাড়ী গিয়ে সাকিনাকে ঘাবড়ে দেব। তারপর গোঁফ দাড়ী খুলে বেশ একটা রগড় হবে। পিসীর আমি বিশেষ আদুরে ছিলুম। বকুনির ভয় কম। পার্ক পেরিয়ে পিসীমার বাড়ী। অন্যমনস্কভাবে চলছিলুম। সাকিনা কি রকম অবাক হবে, কেমন রগড় হবে এই সব ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ পার্কের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালুম। একি! সেই আমার কিনে দেওয়া লালচে বোরখা পরা সাকিনা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তবে কি পথ হারিয়ে ফেলেছে! ভাবছি, এমন সময় দেখি একজন যুবক তাকে কি বললে। সেও উত্তর দিলে। যুবক হেসে মাথা নেড়ে চলে গেল! ব্যাপারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সাকিনা, আমার স্ত্রী এত বড় উচ্চ বংশজাত তার এই ব্যবহার! পথের লোকের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা! তবে কি—

আর ভাবতে পারলুম না। রাগে উত্তেজনায় হাত পা কাঁপতে লাগল। কিন্তু পথে কেলেঙ্কারী করা চলতে পারে না। বাড়ী গিয়ে হেস্তনেস্ত করতে হবে। ছদ্মবেশ তো ছিলই! তার কাছে গিয়ে গলাটা বিকৃত করে বললুম—"আদাব।" সেও হেসে উত্তর দিলে,—"আদাব"। তাকে আমার বাড়ী যাবার কথা বলতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে রাজী হ'ল। ট্যাক্সি ডেকে তাকে তুলে নিয়ে বাড়ী চললুম।

পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা শোবার ঘরে নিয়ে গেলুম। তারপর দরজা বন্ধ করে দিতেই সে হেসে উঠল। আমি আর থাকতে পারলুম না। ক্রোধে পাগল হয়ে যাব বোধ হয়। টেনে বোরখা খুলে ফেলতেই একেবারে থ' বনে গেলুম। মাথা ঘুরতে লাগল। একি! এ তো সাকিনা নয়। ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে পদধ্বনি। তারপরেই খট্ খট্ আওয়াজ। সাকিনার গলা। বলছে—"হ্যাগা, এখনও ঘুমোচ্ছ না কি! দরজা খোল। জুবেদা এসেছে।—জুবেদা আমার পিসতুতো বোন। দরজা খুলে ওদের সামনে কি উত্তর দেব। আর বন্ধ করে কতক্ষণ রাখব। এ মেয়েটিকে বাইরেই বা পাঠাই কি করে। অন্য দরজা বার দিক দিয়ে বন্ধ। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু উপায় কি! দরজা খুলতেই হ'ল।

তারপর আর ভাই তোকে কি বলব। অনেক কেলেঙ্কারী রাগারাগি হ'ল। শেষ অবধি অবশ্য সাকিনা আমার কথা বিশ্বাস করলে এবং অবিশ্বাস করার জন্য ক্ষমাও করলে।

সেই থেকে পর্দ্দা প্রথা ত্যাগ করলুম। ফলে বাপ মা, শ্বশুর শাশুড়ী, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ত্যাগ করতে হ'ল। সাকিনাও হাসিমুখে তা মেনে নিলে। বোরখার জন্যই আমাদের জীবন এবং সুখ ধ্বংস হতে বসেছিল। আর সেই থেকে কোন দোকানী যখন বলে—"হুজুর, এমনটি আর কোথাও পাবেন না, একেবারে ইউনিক", তখনই মেজাজ গরম হয়ে যায়। নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের জীবন ওলট পালট হয়ে গেল সেই অনন্যা বোরখার জন্য।

ততক্ষণে বেগম সাহেবা এসে পড়েছেন। পিছনে আর্দ্দালীর হাতে চায়ের সরঞ্জাম। আমরা চা খেতে শুরু করলুম।

প্রতিভা-পরিচিতি

লোক-সেবক লুই পাস্তুর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাস। ফরাসী দেশের এক পার্ব্বত্য-নগরে পাহাড়ের নীচে বনের ধারে কয়েকজন রাখাল-বালক মেষ চরাচ্ছিল। অপরাহ্ন পেরিয়ে গেছে, বাড়ী ফেরবার সময় হয়েছে, এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এলো একটা পাগলা কুকুর। ছেলেদের দলে ছিল ছ'জন। তাদের মধ্যে পাঁচজন ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। কুকুরটার মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে,

পাস্তুর ইন্‌সটিটিউটের উদ্যানে পাগলা-কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধরত রাখাল-বালকের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির নীচে সেই রাখাল-বালক জুপিলি দণ্ডায়মান

লাল লাল চোখ দুটো যেন জ্বলছে! ভয়ঙ্কর তার মূর্ত্তি। ছেলেদের দিকেই কুকুরটা ধেয়ে এলো। তাদেরই কারুকে সে কামড়াবে। ছেলেদের দলে যে ছিল সবচেয়ে বয়সে বড় আর চেহারায় লম্বা, তার নাম জুপিলি। জুপিলি দেখলে, ক্ষ্যাপা কুকুরটা তারই ভাইকে আক্রমণ করেছে, আর সেই দিকেই আছে দলের অন্য সব বন্ধুরা। তাদের বাঁচাবার জন্যে জুপিলি তখন অসমসাহসে ভর ক'রে কুকুরটার গতিরোধ করলে। বাধা পেয়ে কুকুরটা বিশ্রী আওয়াজ ক'রে জুপিলির উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। জুপিলি শক্ত ক'রে তার গলা চেপে ধরে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললে। এদিকে কিছুদূর ছুটে গিয়ে বন্ধুরা পিছন ফিরে যখন দেখলে যে জুপিলি সেই পাগলা কুকুরের সঙ্গে লড়াই করছে তখন

পাস্তুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত তাঁর মায়ের চিত্র

তারা দ্রুতবেগে ফিরে এলো এবং জুপিলির ভাই একটা শক্ত দড়ি দিয়ে কুকুরটার মুখ হাত-পা বেঁধে ফেললে।

উঠে দাঁড়ালো জুপিলি। তার দু'হাত বেয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে। কুকুরটা মোক্ষম কামড়ে দিয়েছে তাকে। জুপিলির সমস্ত মুখ নীল হোয়ে গেছে। পুকুর থেকে জল এনে বন্ধুরা তার ক্ষতস্থান ধুয়ে

দিলে। তারপর তাকে ধরাধরি ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল। ব্যাপার শুনে জুপিলির বাবা মা হায় হায় করতে লাগল। বেশী সাহস দেখাতে গিয়ে ছেলেটা প্রাণ দিলে। পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে এতাবৎ কেউ বাঁচে নি। সুতরাং জুপিলিও যে দু' তিন দিনের মধ্যেই জলাতঙ্ক রোগে মারা পড়বে তা সকলেই অবধারিত বলে মেনে নিলে।

নগরের প্রান্তে ছোট একটি হাসপাতাল ছিল। জুপিলিকে সেখানে ভর্ত্তি করা হল। ডাক্তাররা বললেন, এ রোগে তাঁদের কিছু করবার নেই। নগরের পৌরনায়ক খবর পেয়ে জুপিলির বাবাকে বললেন যে প্যারিসে তাঁর জানা একজন মহাবিদ্বান চিকিৎসক আছেন। তাঁর নাম লুই পাস্তুর। পৌরনায়কের বন্ধু তিনি। হয়ত জুপিলিকে বাঁচাতে পারেন। জুপিলির বাবা পৌরনায়কের পত্র নিয়ে ছেলেকে প্যারিসে পাস্তুরের চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দিলে।

পুত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত তাঁর পিতার চিত্র

ইতিপূর্ব্বে লুই পাস্তুর মাত্র একটি রোগীকে জলাতঙ্কের চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে তাঁর প্রতিষেধকের গুণ প্রমাণিত হয় নি। জুপিলিকে নিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়লেন। চারিদিকে চিকিৎসকমণ্ডলী তখন তাঁর এই নতুন চিকিৎসায় উপহাস-মুখর। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগের কোন ওষুধ নেই বলেই তখনো পর্য্যন্ত সকলের বিশ্বাস; এমত অবস্থায় পাস্তুর যদি ছেলেটাকে বাঁচাতে না পারেন তাহলে উপহাস ও বিদ্রূপের আর অন্ত থাকবে না, তাঁর এতদিনের সুনাম আর সাধনা, সব অতলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেটাকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, অনেক আশা করে তার বাবা তাকে তাঁর কাছে এনেছে। চিকিৎসা শুরু করলেন তিনি। কিন্তু সংশয় আর অস্থিরতার অবধি নেই। দিনের আহার প্রায় বন্ধ, রাতে নেই ঘুম, লুই পাস্তুর নিজের গবেষণাগারে মাঝে মাঝে নিজের ওষুধটিকে পরীক্ষা করছেন আর রোগীকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, ইন্‌জেক্‌সন দিচ্ছেন।

দু' দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন পার হল, জুপিলির শরীরে জলাতঙ্ক রোগের কোন লক্ষণ ফুটে উঠ্‌লো না। পনেরো দিন কাট্‌লো। তখন তাঁর সহকর্ম্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—"এবার তুমি নিশ্চিত জিতেছো, পাস্তুর। জলাতঙ্ক-রোগকে জয় করলে তুমি। জগতের লোক আজ থেকে তোমার কাছে এক মহা ঋণে আবদ্ধ হল।" বেঁচে উঠ্‌ল জুপিলি। বহুলোকের জয়ধ্বনির মাঝখান দিয়ে সে তার বাবার সঙ্গে দেশে ফিরে গেল।

তখন পাস্তুর উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হয়ে জলাতঙ্ক-রোগ সম্বন্ধে

পরিণত বয়সে লুই পাস্তুর

তাঁর গবেষণা ও চিকিৎসার এক দীর্ঘ রচনা তৈরী ক'রে বিজ্ঞান পরিষদে পাঠালেন। তার মধ্যে জুপিলির জীবন-তুচ্ছকরা সাহসের কথাও উল্লেখ করলেন সবিস্তারে। বিজ্ঞান আকাদামি পাস্তুরের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। স্বীকার করে নিলেন তাঁর গবেষণা আর ওষুধের কার্য্যকারিতা। শুধু তাই নয়, রাখাল-বালকের সাহসিকতার জন্যে তাকে "মন্টিয়ন পুরস্কার" নামে একটি বিশেষ পুরস্কার দেবারও সিদ্ধান্ত করলেন। উত্তরকালে এই রাখাল-বালক জুপিলি তার জীবনরক্ষাকারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান রক্ষীরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছিল এবং সারাজীবন সেই পদে কাজ করেছিল। উক্ত গবেষণাগারের বাগানে পাগলা কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ-রত কিশোর

জুপিলির একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সেই মর্ম্মর-ফলকের নীচে দণ্ডায়মান প্রৌঢ় জুপিলির একটি চিত্র এই রচনার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

*　　*　　*　　*

পাস্তুরের পিতা সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন। ভারী তেজী পুরুষ ছিলেন তিনি। নেপোলিয়নের পতনের পর যখন সকল সৈন্যাধ্যক্ষকে অস্ত্র ত্যাগ করতে আদেশ করা হল তখন তিনি সে আদেশ মান্য করেন নি। এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি কোমরের তলোয়ার কোমরে রেখেই বাড়ী ফিরেছিলেন।

১৮২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর লুই পাস্তুরের জন্ম হয়। পাঁচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু হল। কচি বয়স, কিন্তু স্বভাব বড় গম্ভীর, কথা বলেন কম, হাসেন কম, সব সময় যেন চিন্তামগ্ন; ছেলেবেলায় এমনি ছিলেন লুই পাস্তুর। পাঠশালায় ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন মন দেখা গেল না। সময় পেলেই ছবি আঁকতেন। বাল্যকালে প্যাস্টেলে প্রতিকৃতি আঁকবার প্রবল ঝোঁক ছিল তাঁর। পনেরো ষোলো বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবা-মার যে ছবি এঁকেছিলেন তা উঁচুদরের শিল্প-কাজ বলে সমাদৃত হয়েছিল।

আরবয় কলেজে ঢুকে লেখাপড়া শেখার দিকে মন পড়ল তাঁর। নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে লাগলেন। ১৮৩৮ সালে পাস্তুর সেই কলেজের সকল শ্রেণীর পড়া শেষ করলেন। সেখানকার শিক্ষকগণ পাস্তুরের পিতাকে পরামর্শ দিলেন, বালকের যখন মেধা আছে, আগ্রহ আছে, অধ্যবসায় আছে, তখন তাকে প্যারিসে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হোক।

পাস্তুরদের গ্রাম থেকে প্যারিস ছিল অনেক দূরে। তাছাড়া প্যারিস সম্বন্ধে তাঁদের মনের ধারণাও ছিল বড় অদ্ভুত। প্যারিস! সে এক পাপের রাজ্য, সেখানে পদে পদে বিপদ, পদে পদে অনর্থ, পদে পদে শয়তানের আবির্ভাব! সেখানে তাঁদের ছেলেকে প্রাণ ধ'রে পাঠান কেমন ক'রে? শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপকদের কথায় রাজী হলেন জোসেফ পাস্তুর। একদিন এক বর্ষণমুখর দ্বিপ্রহরে এক ঝড়ঝড়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে সারা গ্রামের নরনারীর বিদায়-অভিনন্দনের মাঝখান দিয়ে লুই পাস্তুর বিষণ্ণ মনে, ত্রস্ত চকিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটের রসায়নাগার

পাস্তুরের চিকিৎসাগারে দরিদ্র রোগীদের সমাবেশ। প্রত্যহ তিনি বহু রোগীকে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করতেন ও ওষুধ দিতেন

বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। প্যারিসে দু' একজনের বেশী বন্ধু ছিল না তাঁর। বিজ্ঞানের সাধনা আর গবেষণা—এই নিয়েই তাঁর জীবনের দিনগুলি কাটতে লাগল। পদার্থ বিজ্ঞানের

একজন কৃতী ছাত্ররূপে তিনি সকল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হোয়ে এক বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপকরূপে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। ১৮৪৮ সালে টারটারিক অ্যাসিড সম্বন্ধে তিনি যেসব নতুন তথ্য প্রকাশ করলেন, তার মধ্যে তাঁর গবেষণার মৌলিকতা, সারবত্তা এবং যুক্তির অখণ্ডনীয়তা দেশের নামকরা বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি করল। সকলেই বুঝলেন, আসছেন এক নতুন বিজ্ঞান-সাধক, যাঁর নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী, নতুনতর গবেষণা এবং লোক-সেবার নতুনতর আদর্শ তাঁকে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে নিঃসন্দেহে।

* * * *

খাদ্যদ্রব্যকে নির্বীজিত করবার সাধনাই পাস্তুরের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে তিনি দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন, বিভিন্ন গবেষণাগারে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ফল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন, নিজের পরীক্ষাগারে সারা-দিন-রাত স্নানাহার ভুলে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছেন, এই বিশেষ বিষয়ে পৃথিবীতে যত গ্রন্থ ছিল সব প'ড়ে নিঃশেষ করেছেন। শেষ পর্য্যন্ত জয় হল তাঁর। "পাস্তুরাইজ্‌ড্‌" (পাস্তুরিকৃত অর্থাৎ বীজাণু-শোধিত) —খাদ্য দ্রব্য, বিশেষ ক'রে দুধ ও মাখন সম্বন্ধে এই কথাটি আজ সারা-বিশ্বে পরিচিত। তাঁর আবিষ্কারের সঙ্গেই তাঁর নাম সংযুক্ত হোয়ে তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে।
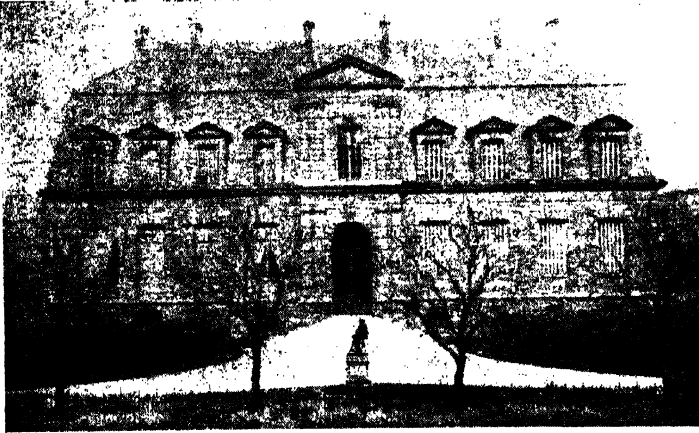
প্যারিসের জগৎ-বিখ্যাত পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট

পাস্তুর কোন একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, পৃথিবীর সকল মানুষের পরমাত্মীয় ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের বন্ধু। কিন্তু তাহলেও নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য ও প্রীতির অভাব ছিল না তাঁর। দেশপ্রেমিক হিসাবে কারুর চেয়ে ছোট ছিলেন না তিনি। পাস্তুরের যশ ও নাম তখন দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, জার্ম্মানীর বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৮ সালে তাঁকে "ডক্টর অব মেডিসিন" উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেছে, এমন সময় বাধলো, ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধ। পাস্তুর সে-সময় তাঁর বাল্যকালের বাসস্থান আরবয় নগরে অবস্থান করছেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে নিজের দেশ হারছে আর তিনি মর্ম্মবেদনায় অস্থির হোয়ে উঠ্‌ছেন; নিজের নোট বইয়ে লিখছেন—"দেশের জন্যে যারা মৃত্যুবরণ করল, তারাই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান, আর তারাই প্রকৃত সুখী।" একদিন সংবাদ পেলেন, একজন জার্ম্মান সেনানী বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী রেগ্‌নল-এর গবেষণাগারে ঢুকে জিনিষপত্র ভেঙে তছনছ ক'রে দিয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকের বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে নষ্ট ক'রেছে। খবরটা শুনে ক্রোধে ক্ষোভে কাঁপতে লাগলেন তিনি। নিরীহ বিজ্ঞান-সাধকের উপর এই বর্ব্বরোচিত অত্যাচার নীরবে সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি? অন্তত প্রতিবাদ তো জানাতে পারেন অত্যাচারীর দেশের প্রতিনিধিদের কাছে? পত্র দিলেন বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, লিখলেন—"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এসে বিদ্যামন্দিরে ঢুকে যারা সেই মন্দির লণ্ডভণ্ড ও অপবিত্র করে তারা মানুষ নয়, বর্ব্বর নয়, তারা এক বীভৎস প্রেতাত্মার বংশধর! যে-দেশের মানুষ তারা, সেই দেশের প্রতি একদিন শ্রদ্ধা ছিল মনে। কিন্তু সে-শ্রদ্ধা আজ অন্তর্হিত হয়েছে। তাই সেই দেশ-প্রদত্ত কোন সম্মানের মূল্য নেই আমার কাছে। শুধু তাই নয়, সেই তথা-কথিত সম্মান আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে আমাকে কলুষিত করছে বলেই মনে করি। তাই আপনাদের দেওয়া "ডক্টর" উপাধি আমি বর্জ্জন ও প্রত্যাখ্যান করলাম।"

যুদ্ধের পর দেশে যখন বিষম বিশৃঙ্খলা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে তখন ইতালীর পিসা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আহ্বান করলেন। সেখানকার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলে তিনি বিশেষ অনুকূল পরিবেশে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকতে পারবেন, এই সম্ভাবনা ক্ষণকালের জন্যে তাঁকে প্রলুব্ধ করল। পারিশ্রমিকের হারও আশাতীত উচ্চ। কিন্তু তিনি সে-পদ গ্রহণ করলেন না। লিখলেন—"দেশে আমি যা রোজগার করি তা পর্য্যাপ্ত নয়। কিন্তু তাহলেও দেশের এই দুঃসময়ে যদি অর্থলোভে দেশ ছেড়ে যাই তাহলে আমি পলাতক রূপে গণ্য হব, অন্য কারুর কাছে না হোলেও, নিজের বিবেকের কাছে। বিবেকবিরুদ্ধ কোন কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

* * *

রোগজর্জ্জর মানুষকে আরাম দেওয়া, তাকে সুস্থ ক'রে তোলা, রোগের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা—এই ছিল লুই পাস্তুরের মহা-

মহিমান্বিত জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁর সময়কালে দেশের হাসপাতাল-গুলিতে রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং শোচনীয়। অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ষাট জন। অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টি, বিসর্প এবং বিষাক্ত ক্ষত প্রায়ই আক্রমণ করত রোগীকে, ফলে তাকে আর বাঁচানো যেতো না। অস্ত্রোপচার-গৃহ, তার সাজসজ্জা, যন্ত্রপাতি, রোগীর বিছানা, কাপড়চোপড় এবং সারা ওয়ার্ডটিকে বীজাণু-মুক্ত করবার জন্যে পাস্তুর নানা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করলেন। অন্যান্য ডাক্তাররা উপহাস করতে লাগল। অনর্থক অর্থ এবং সময়ের অপব্যবহার। বীজাণুশোধক জল ছিটিয়ে কী আর রোগ এড়ানো যায়? ছুরি কাঁচিকে আরকে চুবিয়ে কে আবার কবে ফোড়া কেটেছে? পাস্তুরের পাগলামি যত সব!

ছ'মাস পাস্তুর একটি ওয়ার্ড পরিচালনা করলেন। মৃত্যুর হার শত করা দশজনে নাম্‌লো। ছ'মাসে নাম্‌লো পাঁচে! বিরুদ্ধপক্ষকারী চিকিৎসকের দল তো অবাক! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! শেষ পর্য্যন্ত পাস্তুরের বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে সবই মেনে নিলে। ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতালে পাস্তুরের দ্বারা প্রচলিত প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হল। তাঁর সম্বন্ধে তাই বলা হয়েছে—"পাস্তুর কোন ব্যক্তি-বিশেষের রোগ আরাম করেন নি, সমগ্র মানবজাতির রোগ নিরাময় করবার দুশ্চর তপস্যা ছিল তাঁর, এবং বহুলাংশে সেই তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।"

১৮৮৫ সালের শেষভাগে জলাতঙ্ক-রোগের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এবং সাফল্য সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি আকর্ষণ করল। তাঁর জন্মদিনে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ড মহাসমারোহে তাঁকে অভিনন্দিত করল। জগতের নানাদেশ থেকে চাঁদা তুলে পাস্তুর ইন্‌সটিটিউট স্থাপিত হল। বরণীয় মানুষরূপে লুই পাস্তুর-এর নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হল।

একজন ধনী ফরাসী ব্যাঙ্ক্‌-ব্যবসায়ী উইল করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যতকিছু টাকা থাকবে, তা দিয়ে যেন একটি যুদ্ধ-জাহাজ তৈরী করা হয়। পাস্তুরের কার্য্যকলাপ দেখে এবং তাঁর ইন্‌সটিটিউটের উপকারিতা উপলব্ধি ক'রে সেই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী শেষ পর্য্যন্ত তাঁর উইল বদল ক'রে লিখলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ও নগদ টাকা পাস্তুর ইন্‌সটিটিউটে অর্পিত হবে। সমুদ্রের উপর থেকে গোলাবর্ষণ ক'রে মানুষকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোটি টাকা শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে বাঁচাবার কাজে লাগল—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর দান সম্বন্ধে এই কথাটি মনে ক'রে ভারী গর্ব্ব বোধ করেছিলেন পাস্তুর।

জীবনে দুঃখ এবং শারীরিক ক্লেশ তিনি কম ভোগ করেননি। দুই পায়ে পক্ষাঘাতের আক্রমণে বহুদিন ভুগেছিলেন তিনি। অনেকদিন পর্য্যন্ত তো রীতিমতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন। শোক পেয়েছেন বিস্তর। পর পর দুটি কন্যা টাইফয়েড রোগে মারা যায়। কিন্তু এসব শোকতাপ সত্ত্বেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে কখনো শিথিল হন নি তিনি। কর্ত্তব্যই তাঁর কাছে ছিল একমাত্র ধর্ম্ম। বিজ্ঞান-সাধনা তাঁর কাছে ছিল ঈশ্বর-উপাসনার সমান। বলতেন—"বিজ্ঞান মানুষকে ভগবানের আরও নিকটবর্ত্তী করেছে।" নিজের গবেষণাগার তাঁর কাছে ছিল গির্জ্জার মণিকোঠার মতো প্রিয় ও পবিত্র। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই

প্যারিসের রাজপথে পাস্তুরের মর্ম্মর মূর্ত্তি

গবেষণাগারই ছিল তাঁর গতিপথের চরম লক্ষ্য। জীবনের শেষ দিনে অসুস্থ শরীর নিয়ে গৃহ ছেড়ে তিনি তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় গবেষণা-ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। ছাত্র ও বন্ধুরা তাঁকে গবেষণা-ভবনে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে শুইয়ে দিলেন। তপস্বীর সাধনকক্ষের মতো অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জ্জিত সেই ঘরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের সূর্য্যাস্ত কালে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলেছিলেন—"এ জীবন ছেড়ে যেতে দুঃখ বোধ করছি; দেশের জন্যে আরও কত কাজ করবার সাধ ছিল আমার মনে!"
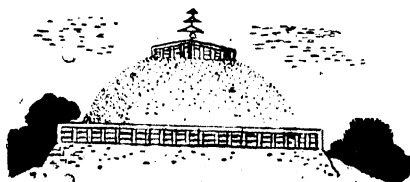
নববর্ষের প্রার্থনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসো প্রাণে উছল তানে থেকো না আর দূরে।
আনন্দময়! দাও পরিচয় বসন্ত-নূপুরে।
অশ্রু-সাঁঝে এসো কাছে বিছিয়ে হাসির আলো।
হে উদাসী! বাজিয়ে বাঁশি বাসাও তোমায় ভালো।

জানি হিয়ায়—প্রেমের প্রভায় কার ধরা উছল:
অমল তোমার আকাশ অপার, নেই সেথা বাদল।

জানি—যদি নিরবধি জপি ও-নাম মধু,
ধরবে কায়া স্বপ্নছায়াময় ঘনশ্যাম বঁধু।

দাও হে আমায় ঠাঁই রাঙা পায়, লও যা আছে সবি।
বুকের তলে যেন ঝলে বন্ধু, তোমার ছবি।
তোমা বিনা আজ মানি না কারেও আপন আর।
ইচ্ছা আমার হোক একাকার বিধানে তোমার।

সুরকারের টীকা (পুণা—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪):—

এ-গানটির সুর অতি সরল ও অপরূপ সুন্দর। আমার ৺পিতৃদেব, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, একটি গান শিখিয়েছিলেন আমার মা-কে, তিনি সে গানটি গেয়ে আমার শৈশবে আমাকে ঘুমপাড়াতেন এই সুরে। সে গানটির মাত্র কয়েকটি চরণ নিচে দিলাম, পুরো গানটি "আর্যগাথায়" আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলীতে।

আয় রে আমার সুধার কণা! আয় রে ননীর ছবি!
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ! আয় রে উষার রবি!
উড়ে উড়ে বনে বনে বেড়াস বনের পাখী!
যাস রে কোথা? আয় রে জাদু! বুকে ক'রে রাখি।

উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে?
পাষাণ ভাঙা নির্ঝরিণী ভাঙা ভাঙা বোলে।
বুকের কাছে হাসিস শিশু, জড়িয়ে আমার গলে।
রচিস তাহে ইন্দ্রধনু আমার অশ্রুজলে।…ইত্যাদি।

সা সা ·। | রা গা মা I রা গা -া | পমা গা মা I রা রা গা | রা রা গা I
এ সো - প্রা ণে - উ ছ ল তা নে - থে কো - না আ র

রা রা -া | -া -া -া I সা সা -া | রা গা -া I গা -া মা | রগা পমা -া I
দূ রে - - - - আ ন ন্ দ ম য় দা ও প রি চ য়

মা মা -া | মা মা -া I মা মা -া | -া -া -া I মা -া মা | মা মা -া I
ব স ন্ ত ন্ - পু রে - - - - অ - শ্রু সাঁ ঝে -

পা পা ধপা | মা গা মা I রা রা গা | রা রগা পমা I মা গা -া | া -া -া I
এ সো - কা ছে - বি ছি য়ে হা সি র আ লো - - - -

সা রা রা | রা রগা সরা I রা রা গা | গা রগা পমা I গা রগা -া | রা সরা -া I
হে - উ দা সী - বা জি য়ে বাঁ শি - বা সা ও তো মা য়

সা সা -া | -া গা গা I গা পা মপমা | গা মা গমগা I রা গা রগরা | সা -া -া I
ভা লো - - বঁ ধু য়া - - - - - - - - - - -

ধ্‌া সা সা | সা সা -া I ধ্‌া সা -া | সা সা -া I রা -া গা | রা -া গা I
জা - নি হি য়া য় প্রে মে র প্র ভা য় কা র ধ রা - উ
দা ও হে আ মা য় ঠাঁ ই রা ঙা পা য় ল ও যা আ ছে -

রা রা -া | -া -া -া I সা সা -া | রা গা -া I গা গা -া | গমা রগা পমা I
ছ ল্ - - - - অ ম ল তো মা র আ কা শ অ পা র
স বি - - - - বু কে র ত লে - যে ন - ঝ লে -

মা -া মা | মা -া মা I মা -া -া | -া -া -া I মা -া মা | মা মা -া I
নে ই সে থা - বা দ ল্ - - - - জা - নি য দি -
ব ন্ ধু তো মা র ছ বি - - - - তো মা - বি না -

পা পা ধপা | মা গা মা I রা রা গা | রা রগা পমা I গা রা -া | -া -া -া I
নি র - ব ধি - জ পি - ও না ম ম ধু - - - -
আ জ মা নি না - কা রে ও আ প ন আ - - - - র

সা রা রা | রা রগা সরা I রা -া গা | গা রগা পমা I গা -া রগা | রা সরা -া I
ধ র বে কা য়া - স্ব প্ ন ছা য়া - ম য় ব ন শ্যা ম
ই - চ্ছা আ মা র্ হো ক্ এ কা কা র্ বি ধা - নে তো -

সা -া -া | -া গা গা I গা পা মপমা | গা মা গমগা I রা গা রগরা | সা -া -া I
বঁ ধু - - বঁ ধু য়া - - - - - - - - - - -
মা - - র বঁ ধু য়া - - - - - - - - - - -

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যের চরিত্রনীতি

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রে বিশেষ আলোচনা নাই। না থাকিলেও উক্ত দর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা হইতে চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে সাংখ্যের মতের একটা ধারণা করা যায়। সাংখ্যমতে সুখ পুরুষার্থ নহে। সুতরাং সুখ সুনীতির কষ্টি নহে। লোকহিত সুনীতি-সম্মত হইলেও তাহা সুনীতির গৌণ-কষ্টি মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন সাংখ্য-দর্শনে স্বীকৃত নহে, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশকে সুনীতির কষ্টি বলা যায় না। ন্যায়ান্যায়-বোধের জন্য মনের কোনও বৃত্তির কথাও (ধর্ম্ম বিবেকের কথা) সাংখ্য-শাস্ত্রে নাই। দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সাংখ্যের পুরুষার্থ। প্রকৃতির সংসর্গের ফলে পুরুষের বন্ধ ও তাহার স্বাধীনতার সংকোচ হয়। সেই বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতার উদ্ধারই সাংখ্যের পুরুষার্থ—তাহাই অপবর্গ। যে কর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের সহায়ক, তাহাই সুনীতি বা ধর্ম্ম, যে কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক, তাহা দুর্নীতি বা অধর্ম্ম।

সাংখ্যের চরিত্রনীতি কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহজন্মে হউক বা পরজন্মে হউক, কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে। সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্মের ফল উর্দ্ধগমন বা স্বর্গবাস, অসৎকর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফল অধো-গমন বা নরকবাস। কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা অপবর্গ অর্জিত হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই অপবর্গলাভ হয়। অজ্ঞানের ফল বন্ধ।

> ধর্ম্মেন গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবত্যধর্ম্মেন।
> জ্ঞানেন চাপবর্গো, বিপর্য্যয়াৎইষ্যতে বন্ধঃ।
>
> সাং কা—৪৪

কর্ম্ম দ্বারা পুরুষার্থ অর্জিত না হইলেও কর্ম্মের গুণাগুণ-সম্বন্ধে সাংখ্য অন্ধ নহেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুদ্ধির দুই রূপ। ধর্ম্ম সাত্বিক—জ্ঞানের সহায়ক। অধর্ম্ম তামসিক—জ্ঞানের প্রতি-বন্ধক। (সাং কা ২৩)। যজ্ঞে পশু হত্যার বিধি আছে। এই জন্য তাহার ফলে স্বর্গবাস হইলেও সে ফল অশুদ্ধিযুক্ত (সং কা—২) তাহা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ইষ্টাপূর্ত্ত (যজ্ঞও লোকহিতকর বাপী, কূপ খননাদি) মোক্ষপ্রাপক না হইলেও সাংখ্য দর্শনে নিরর্থক বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাহারা চিত্তশুদ্ধিকর এবং গৌণভাবে মোক্ষের সহায়ক, হেয় নহে। তাহারা সুনীতি-সম্মত, তাহারা ধর্ম্ম—পুরুষার্থ-সাধনের মুখ্য না হইলেও গৌণ উপায়। সৎকার্য্য ও অসৎ কার্য্য উভয়ের সংস্কারই চিত্তে রক্ষিত হয়, এবং মৃত্যুর পরে জীব চিত্ত সহ জন্মান্তর গ্রহণ করে। কিরূপ যোনিতে জন্মান্তর হইবে, তাহা নির্ভর করে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের উপরে। জন্ম-জন্মান্তরকৃত সৎকর্ম্মের ফলে চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে মোক্ষলাভের পথ পরিস্কৃত হয়। সুতরাং সৎকর্ম্মের মোক্ষপ্রাপকতা গুণ আছে।

অপবর্গ লাভ হয় যখন সত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞান কেবল গ্রন্থপাঠ বা গুরুপোদেশ দ্বারা লব্ধ হয় না। গুরুর উপদেশ শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—অর্থাৎ তাহা শুনিয়া মনে তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাহার সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ধারণা করিতে হয়, এবং তাহার পরে সেই পরিজ্ঞাত তত্ত্বের ধ্যান করিতে হয়। ইহার ফলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে এই জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধনের জন্য পাতঞ্জল দর্শন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। ঈর্ষ্যা-কালুষ্য-নিবৃত্তি ও সর্ব্বজীবের সহিত সৌহার্দ্দ্যই মৈত্রী। দুঃখার্ত্তের প্রতি অনুকম্পাই করুণা। পরকৃত পুণ্যদর্শনে হর্ষপ্রাপ্তি মুদিতা, এবং পরের পাপের প্রতি ঔদাসীন্য উপেক্ষা। যাবতীয় সুনীতির মূল ইহার মধ্যে নিবিষ্ট আছে। হিংসা-কলুষিত ক্ষমতালোভী বর্ত্তমান মানব-সমাজে এই নীতির বহুল প্রচারের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

প্রকৃতি-লয়

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও এই সম্বন্ধ অন্তহীন নহে। অবিবেক বা অজ্ঞান হইতে এই সম্বন্ধরূপ বন্ধের উৎপত্তি হয়, এবং অবিবেকের নাশ হইলে ইহারও নাশ হয়। পুরুষ তখন স্বরূপে অবস্থান করে। এই স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা মুক্তি। যতদিন এই মুক্তি না হয়, ততদিন জীবের সংসৃতি হয়, অর্থাৎ বারংবার তাহাকে দেহ ধারণ করিয়া দেব, মানব অথবা ইতর যোনিতে আবির্ভূত হইতে হয়। বিবেক-খ্যাতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান যখন আবির্ভূত হয়, এবং অবিবেকের নাশ নয়, তখন জীব জীবন্মুক্ত হয়। তখন প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ পঞ্চ বুদ্ধিবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, এবং তাহার ফলে পুরুষ প্রশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ (সাং সূ ২।৩৪) হয়, অর্থাৎ তাহার উপাধিরূপ যে প্রতিবিম্ব, (বুদ্ধির) তাহার নিবৃত্তি হয়, এবং পুরুষ আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থূল ও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। প্রারব্ধ-ক্ষয় যতদিন না হয়, ততদিন তিনি স্থূল দেহে অবস্থান করেন। প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে তাঁহার স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহের নাশ হয়। তখন জীবের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। তখন বুদ্ধিসম্বন্ধ-বিচ্যুত পুরুষ বিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই মোক্ষ।

মোক্ষ ব্যতীত সাংখ্যশাস্ত্রে "প্রকৃতি লয়" নামে আর এক প্রকার মুক্তির কথা আছে।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ, সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ
ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতো, বিপর্য্যয়াৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ। সাং কা ৪৫।

বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি-লয় হয়। রজোগুণোদ্ভব রাগ হইতে সংসার (পুনর্জ্জন্ম), অণিমাদি ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অবিঘাত হয়; অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা, তাহা করা যায়; আর ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে সর্ব্বত্র ইচ্ছার বিঘাত হয়।

বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি-লয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি লয়-প্রাপ্তিতে কৃত-কৃত্যতা হয় না। তাহার পরে পুনর্জ্জন্ম হয়; যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি জল হইতে উত্থিত হয়।

ন কারণ-লয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবৎ উত্থানাৎ।

সাং সূ—৩।৫৪

এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন "বিবেক-জ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি, তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি, বৈরাগ্যাৎ "প্রকৃতি লয়ঃ" ইতি বচনাৎ। যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনঃ উত্তিষ্ঠতি, এবং এব প্রকৃতি-লীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বর-ভাবেন পুন-রাবির্ভবন্তি। সংস্কারাদেঃ অক্ষয়েন পুনঃ আগামি-ব্যক্তেঃ বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তেঃ ইত্যর্থং।" বিবেক জ্ঞানের অভাবে যখন প্রকৃতির উপসনার ফলে মহদাদিতে বৈরাগ্য জন্মে, তখন প্রকৃতিতে লয় হয়। কিন্তু তাহাতে কৃত-কৃত্যতা হয় না। সংস্কারের নাশ না হওয়ায় ভবিষ্যতে বিবেকখ্যাতি দ্বারা দোষের দাহ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি-লীন পুরুষকে জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় পুনরায় আবির্ভূত হইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতি-লয়। প্রকৃতি-লয়ে পুরুষ প্রধান বুদ্ধি, অহংকারও পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়। তাহার মোক্ষ হয় না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গণও সূচিত হয়। আত্মবুদ্ধিতে ইহাদের মধ্যে যাহাকে যে উপাসনা করে, তাহাতে তাহার লয় হয়। গৌড়পাদ বলেন "যথা কস্যচিৎ বৈরাগ্যম্ অস্তি ন তত্ত্বজ্ঞানং, তস্মাৎ অজ্ঞান পূর্ব্বাৎ বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতি লয়ঃ।" তাঁহার মতে প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র বুঝায়, ইন্দ্রিয় বুঝায় না।

পাতঞ্জলদর্শনেও প্রকৃতি-লয়ের কথা আছে। ১।১৮ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে অসমপ্রজ্ঞাত সমাধির ব্যাখার পরে আছে, "স খলু দ্বিবিধঃ, উপায়-প্রত্যয়, ভব-প্রত্যয়শ্চ। উপায় প্রত্যয়ঃ যোগিনাং ভবতি।" এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ কারণ। উপায়—শ্রদ্ধা আদি—যাহার কারণ তাহা উপায়-প্রত্যয়। "ভব" (অবিদ্যা—জায়ন্তে অস্যাং জন্তবঃ ইতি ভবঃ) যাহার কারণ, তাহা ভব-প্রত্যয়। "ভূতেন্দ্রিয়েষু বা বিকারেষু প্রকৃতিষু, বা অব্যক্ত-মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রেষু অনাত্মসু আত্মখ্যাতিঃ তৌষ্টিকানাং বৈরাগ্যসম্পন্নানাং, স খলু অয়ং ভবঃ প্রত্যয়ঃ (কারণং) যস্য নিরোধ-সমাধেঃ স ভবপ্রত্যয়।" ভূতগণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিকারগণ, অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র—এই সকল অনাত্ম বস্তুতে বৈরাগ্যসম্পন্ন লোকদিগের যে আত্মজ্ঞান, তাহাই ভব বা অবিদ্যা। সেই অবিদ্যার ফল যে সমাধি, তাহা "ভবপ্রত্যয়।" "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্"। পাতঞ্জল সূত্র ১।১৯। যাহারা বিদেহ

এবং যাহারা প্রকৃতি-লয়, তাহাদের সমাধি ভবপ্রত্যয়। বিদেহ অর্থে দেবতা। দেবতা এবং প্রকৃতিলয়দিগের অবিদ্যার নাশ না হওয়ায়, তাহাদের যে সমাধি, তাহা ভবপ্রত্যয়। এখানে "বিদেহ" নামে তৃতীয় প্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। বাচস্পতি বলেন প্রকৃতিলীনদিগের মধ্যে যাহারা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে কোনও একটিতে লীন হন, তাহাদের প্রকৃতি-লয়, যাহারা পঞ্চ স্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকারের কোনটিতে লয়প্রাপ্ত, তাহারা বিদেহ।

মোক্ষ চিরস্থায়ী। বিবেক-খ্যাতিজনিত এই মুক্তি নিরবধি। কিন্তু বিদেহ ও প্রকৃতি লীনের মুক্তি সেরূপ নহে। নির্দ্দিষ্ট কালান্তে তাহাদিগকে প্রাদুর্ভূত হইতে হয়। যিনি যে তত্ত্বে লীন, তদনুসারে তাহার মুক্তিকাল নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

দশ মন্বন্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতংপূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ।
বৌদ্ধাঃ দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতংসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ।

ইন্দ্রিয়ের চিন্তা যাহারা করেন, তাহারা দশমন্বন্তর ইন্দ্রিয়ে লীন থাকেন। যাহারা ভৌতিকে লীন, তাঁহাদের প্রকৃতি লীনত্বের অবধি শতমন্বন্তর। অহংতত্ত্বে যাঁহারা লীন, তাহাদের অবধি সহস্র মন্বন্তর। মহৎতত্ত্বে লীনদিগের অবধি দশসহস্র মন্বন্তর। অব্যক্তে লীনদিগের অবধি—শতসহস্র মন্বন্তর। যিনি অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ইহাদের কোনও একটিকে আত্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তিনি তাহাতেই লীন হন, এবং তাহার লীন অবস্থা উপরোক্ত ক্রমে স্থায়ী হয়।

উপরে "বিদেহ" শব্দের অর্থ দেবতা বলা হইয়াছে। ভোজরাজের মতে যাঁহারা আনন্দ-সমাধিতে বদ্ধ-ধৃতি হইয়া প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন না, তাঁহারা দেহাহংকার-শূন্য বলিয়া বিদেহ শব্দ বাচ্য হন। তাহাদিগকেই বিদেহ দেব বা বিদেহলীন দেব বলে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে শরীর নিরপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃত্তি, তদ্যুক্ত মহদাদিই বিদেহ। শ্রীমন্ হরিহরানন্দ আরণ্য বলেন "স্থূলগ্রহণে সমাপন্ন যোগী বিষয়-ত্যাগে আনন্দলাভ করিত, যদি বিষয়ত্যাগই পরমপদ জ্ঞান করেন, এবং শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের (শব্দাদি জ্ঞানের) সম্যক নিরোধ করেন, তখন বিষয়-সংযোগের অভাবে করণবর্গ লীন হইবে, কারণ বিষয় ব্যতীত করণগণ মুহূর্ত্ত মাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাদৃশ বিষয়-গ্রহণ রোধ বা অনাস্রবসংস্কার সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে বিলীন-করণ হইয়া নির্ব্বীজ সমাধি লাভপূর্ব্বক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্ন কাল, কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। ইহারাই বিদেহ দেব।"

কিন্তু প্রকৃতি-লীনদিগের প্রকৃতিতে লীন হওয়ার অর্থ কি? তাহাদের স্থূল শরীরের নাশ হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। তাঁহাদের লিঙ্গদেহের সহিত পুরুষের তথা-কথিত সংযোগেরও বিচ্ছেদ ঘটে না। তাহাদের ব্যক্তিত্বের (Personality) নাশ হয় না। পুরুষ অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার প্রভৃতির মধ্যে গিয়া তাহার মধ্যে লীন হয় না। উপরে দশ মন্বন্তর, শত মন্বন্তর প্রভৃতি লীন থাকিবার যে অবধির কথা বলা হইয়াছে, সেই অবস্থায় পুরুষ থাকে না। কেন না বন্ধ বা 'বন্ধ'-বীজ পুরুষের নহে, জীবের। সুতরাং লিঙ্গদেহ-সমন্বিত জীব লীন হইয়া থাকে। জীব যে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তাহা ভিন্ন অন্য প্রকৃতি তাহার লিঙ্গ-দেহে বর্ত্তমান থাকিলেও নিষ্ক্রিয় থাকে। "লীন" শব্দের এই ভাবেই অর্থ করিতে হইবে।

পরবাদ

বিরুদ্ধ মত খণ্ডন

সাংখ্য সূত্রে যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত হইয়াছে। সেই সকল যুক্তি নিম্নে বর্ণিত হইল।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে কোনও কার্য্যেরই স্থিরত্ব নাই। কোনও পদার্থই স্থির নহে। পদার্থ যখনই উৎপন্ন হইতেছে, তখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। এই মতে প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা হয় না। যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অথবা স্পর্শ করিয়াছি, তাহাই এখন দেখিতেছি, অথবা স্পর্শ করিতেছি, এই বোধ বা প্রত্যভিজ্ঞা যে হয়, যাহা আমি দেখিয়াছিলাম বা স্পর্শ

করিয়াছিলাম, তাহা যদি দেখা অথবা স্পর্শ মাত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

ন, প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। সাং সূ—১।৩৫

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ শ্রুতি ও স্থায় উভয়েরই বিরোধী। "সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ"—এই শ্রুতি অনুসারে যে জগৎ এখন আছে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যে যুক্তি বিরোধী, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতি স্থায় বিরোধাৎ চ। সাং সূ— ।৩৬

দ্রব্যের ক্ষণিকত্ব প্রমাণের জন্য ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিগণ যে দীপশিখার ও নদীপ্রবাহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন, তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রদীপের অঙ্গীভূত দ্রব্যাদির এবং নদীজলের কোনও অংশের বিনাশ নাই। এই জন্যই দীপশিখা ও জলপ্রবাহের অবয়ব সকলের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধের সম্ভব হয় এবং এই সংযোগ সম্বন্ধবশতঃ দীপশিখা ও জলপ্রবাহের একত্বের জ্ঞান হয়।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। সাং সূ—১।৩৭

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ দ্বারা কার্য্য-কারণ-ভাবের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ও তাহার কার্য্য হয় যুগপৎ উদ্‌ভূত হয়, নতুবা একটির পরে আর একটির উদ্‌ভব হয়। যাহারা একই কালে উদ্‌ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব থাকা অসম্ভব। কার্য্যের পূর্ব্বে যে কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার কারণ উদ্‌ভূত হওয়া মাত্রই যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে তাহার বিনাশের পরে উৎপন্ন পদার্থের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

যুগপদ্ জায়মানয়োঃ ন কার্য্যকারণ ভাবঃ।
সাং সূ— ।৩৮

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। সাং সূ—১।৩৯

পূর্ব্বে উদ্‌ভূত বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতে যদি পরে তাহার কার্য্যের উদ্‌ভব হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানমতে পরে উদ্‌ভূত বস্তুর যখন উৎপত্তি হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুর অস্তিত্ব নাই। একের সত্তাতে অপরের সত্তা এবং অসত্তায় অন্যের অভাব হইলেই কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার অভাব হইলে কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে না।

তদ্‌ভাবে তদ্‌যোগাৎ উভয় ব্যভিচারাৎ অপি ন।
সাং সূ—১।৪০

কারণ ও তাহার কার্য্য দুই ভিন্ন ক্ষণে অবস্থিত। কারণ পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত বলিয়াই তাহার সহিত পরক্ষণে অবস্থিত কার্য্যের সম্বন্ধ কল্পিত হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না। কেননা যে ক্ষণে কোনও কার্য্যের উদ্‌ভব হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণে বহু বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে কারণ বলিবে? সকলেই কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত কোনও বিশেষ বস্তুকে পরক্ষণে অবস্থিত এক বিশেষ বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম থাকে না।

পূর্ব্বভাব মাত্রে ন নিয়মঃ। সাং সূ—১।৪১

বাহ্য জগতের প্রতীতি হয়। বিজ্ঞানের যেমন প্রতীতি হয়, বাহ্য জগতেরও তদ্রূপই প্রতীতি হয়। তাহারা বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই প্রতীতি হয়। সুতরাং তাহারা বিজ্ঞান মাত্র নহে।

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। সাং সূ—১।৪২

বাহ্য জগতের প্রতীতি সত্ত্বেও, তাহার বিজ্ঞান-বাহ্য অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই বলিতে হয়। তাহা হইলে তো সকল জগৎই শূন্য হইয়া পড়ে, এক বিজ্ঞাতা মাত্র বর্ত্তমান থাকে।

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। সাং সূ—১।৪৩

শূন্যবাদিগণের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। জগতে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বিনাশই বস্তু-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অর্থাৎ বিনাশই একমাত্র সত্য বস্তু। এই শূন্যবাদ "অবুদ্ধ" লোকদিগের "অপবাদ" মাত্র—কুতার্কিকদিগের প্রলাপ মাত্র। কোন বস্তুই যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ নাই।

শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি। বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্য।
সাং সূ—১।৪৪

অপবাদ মাত্রম্ অবুদ্ধানাম্। সাং সূ—১।৪৫

অপবাদ = মিথ্যাবাদ।

অবুদ্ধানাম্ = মূঢ়ানাম্।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ উভয়ই "সমানাক্ষম" অর্থাৎ উভয়ের নিরসন যুক্তি একই। যে যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের নিরসন করা হইয়াছে, তাহারা শূন্যবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। শূন্যবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি, তাহা ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। শূন্যবাদে প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা হয় না। বাহ্য-প্রতীতি-যুক্তি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

উভয় পক্ষ সমান-ক্ষেমত্বাৎ অয়মপি। সাং সূ ১।৪৬

অয়ম্ = শূন্যবাদ।

অয়মপি = অয়মপি বিনশ্যতি।

পুরুষার্থ বলিয়া যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যাহার জন্য সকলে লালায়িত, এই উভয় মতে তাহা অপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আত্মা ক্ষণিক পদার্থ, সুতরাং তাহার আর মুক্তি কি? আর বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞাতাই যদি একমাত্র হয়, তাহা হইলে তাহার মুক্তিই বা কি? তাহার অনাদি বস্তু-বিজ্ঞান প্রবাহের পরিহারও অসম্ভব।

অপুরুষার্থম্ উ উভয়থা। সাং সূ ১।৪৭

জড়বাদ খণ্ডন

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ! কেহ কেহ বলেন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, ও মরুৎ এই চারিভূতেই দেহ নির্ম্মিত। আকাশ কোনও বস্তুর উপাদান নহে। আবার কাহারও কাহারও মতে কেবল পৃথিবী দ্বারাই দেহ গঠিত। অন্য চারিভূত দ্বারা পৃথিবী ভূতের পরিণাম সংঘটিত হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে পঞ্চভূতের এক একটি দ্বারা এক এক জাতীয় দেহ গঠিত হয়। অন্য ভূত সকল তাহার সহকারী থাকে মাত্র। যেমন মনুষ্য দেহ পৃথিবী দ্বারা গঠিত। সূর্য্যাদির শরীর তেজঃ দ্বারা গঠিত।

পাঞ্চভৌতিকো দেহ। ৩।১৭ সাং সূ

চাতুর্ভৌতিকম্ ইত্যেকে। সাং সূ—৩।১৮

ঐকভৌতিকম্ ইত্যপরে। সাং সূ—৩।১৯

দেহ হইতে স্বাভাবিক উপায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভৌতিক দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেননা প্রত্যেক ভূতের মধ্যে যখন চৈতন্য নাই, তখন তাহাদের সমবায়ে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে না।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। সাং সূ—৩।২০

দেহে যদি চৈতন্য স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহার মরণও সুষুপ্তি হইত না।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ। সাং সূ—৩।২১

নানা দ্রব্যের মিশ্রণে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাতে মাদকতা থাকে, দেখা যায় সত্য। কিন্তু মদ্যের উপকরণের প্রত্যেকের মধ্যে মাদকতাশক্তি থাকে বলিয়াই তাহাদের সংমিশ্রণে মাদকতা প্রকট হয়। কিন্তু ভূতে চৈতন্য যে সূক্ষ্মরূপে থাকে তাহার প্রমাণ নাই।

মদশক্তিবৎ চেৎ, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।
সাং সূ—৩।২২

চৈতন্যময় আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করা যায় না। তাহা শ্রুতিপ্রমাণও অনুমান দ্বারা সিদ্ধ। জড়বস্তুযোগে কেহ চৈতন্যের উৎপাদন করিয়া আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই।

অস্তি আত্মা, নাস্তিত্বপ্রমাণাভাবাৎ। সাং সূ—৬।১

আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। কারণ আত্মাও দেহের ধর্ম্মের বিভিন্নতা আছে। দেহ পরিণামী, কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি জ্ঞাতারূপে অধিষ্ঠিত, তিনি অপরিণামী।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ। সাং সূ—৬।২

অদ্বৈতবাদ খণ্ডন

বিভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়গণ একই সময় বিভিন্নদিকে ব্যাপৃত থাকে। সর্ব্বদেহে যদি একই পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে করণদিগের একই সময় বিভিন্ন পথে গমন সম্ভবপর হইত না। পুরুষের ভোগের জন্যই দেহ। দেহেরই জন্ম অর্থাৎ পুরুষের সহিত সংযোগ এবং

মৃত্যু অর্থাৎ সেই সংযোগের অবসান। জন্ম ও মৃত্যু বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সময়ে হয়। পুরুষ যদি এক হইত, তাহা হইলে এই বিভিন্নতা থাকিত না। দেহ পুরুষের ভোগায়তন। প্রত্যেক আয়তন হইতে যে ভোগ হয়, তাহার ভোক্তা একজনই হইবে। ভোগায়তন যখন বহু, তখন ভোক্তাও বহু, ইহা অনুমান করা যায়।

উপরিউক্ত যুক্তি ব্যতীত আরও একটি যুক্তি দ্বারা পুরুষ-বহুত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা সাংখ্যদর্শনে আছে। "ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবে ত্রিগুণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে এই সকল জীবে বিভিন্ন পুরুষ বর্ত্তমান। কোনও জীব সত্ত্ববহুল, কোনও জীবে রজোগুণের বাহুল্য, আবার কোনও জীব তমঃপ্রধান। পুরুষ যদি একমাত্র হইত, তাহা হইলে এই ভেদ থাকিত না।

নিত্য ঈশ্বরবাদ খণ্ডন

যাঁহারা নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য চেষ্টায় অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য চেষ্টার আশ্রয় স্বরূপ, নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতির নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। বুদ্ধি বা অধ্যবসায় (নিশ্চিত জ্ঞান), ইচ্ছা, চেষ্টা, ইহারা সকলই অনিত্য। তেজঃ বহ্নির আশ্রয়। কিন্তু বহ্নি অনিত্য বলিয়া তেজঃও অনিত্য বলিয়া গৃহীত হয়। সেইরূপ ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি অনিত্য বলিয়া তাহাদের আধার ঈশ্বরও অনিত্য। অনিত্য জ্ঞান, ইচ্ছাদির দ্বারা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

ন বুদ্ধ্যাদি-নিত্যত্বম্ আশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ।

সাং সূ—৫।১২৬

ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রমাণ নাই। যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তাহাকে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয় বলা যায় না। জ্ঞান ইচ্ছাদি যদি নিত্যও হয় তাহা হইলেও তাহাদের আশ্রয় বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায় না।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ। সাং সূ—৫।১২৭

কিন্তু ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টি ক্রিয়ার সম্ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই, যে যোগ-সিদ্ধি (অণিমাদি) অস্বীকার করা যায় না। ঔষধাদি সেবন দ্বারা যেরূপ শরীরের শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ যোগ দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি বিষয়ে উপযোগী। যিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যোগবলে লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি-সামর্থ্য জন্য অর্থাৎ উপার্জ্জনযোগ্য হইতে পারে।

যোগ-সিদ্ধয়োঽপি ঔষধাদি সিদ্ধিবৎ ন অপলপনীয়াঃ।

সাং সূ—৫।১২৮

জীবনায়ন

সনৎকুমার মিত্র

সেদিনের মিঠে রোদে খোলা ছাদে ঝিরি ঝিরি হাওয়া,
খোলা মনে ঘুম চোখে উঠে এসে দাঁড়ালেম যেই :
ভিজে ভিজে কালো চুলে চোখ তুলে মিটি মিটি চাওয়া,
তারপর খুঁজে দেখি এই মন সেই মন নেই!

আর দিন লাল আভা ঢলে পড়া সূর্য্য থেকে মেঘে
লেগেছিলো গোধূলিতে,—কাঁকরের কত মধু-গান
উড়ে এলো সুরে ভেসে, এই মনে তার ছোঁয়া লেগে,
শিশিরের ছোঁয়া পেল, আবীরের রঙ্ পেল প্রাণ।

অন্যদিন সানায়ের কান্না শুনে কেঁদে ওঠে মন :
ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়া ভেঙে যাওয়া পাঁজরের হাড়,
পথের কাঁকর নিয়ে অতীতের স্মৃতি আলোড়ন,—
শেষ নেই সেই ছাদে সেই চাঁদে ঘুম হারাবার।

একদিন যে কথাকে হৃদয়ের সুরে বারবার
বাজিয়েছি আনমনে,—শুনেছিও নিজে অনুক্ষণ ;
সেই কথা শোনাবার অবসর মিলিবে না আর,
বাঁধ-ভাঙা ব্যথা নিয়ে তাই কাঁদে এ অবোধ মন।

শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরণ্ময়ী দেবীকে সেরূপ ভাবে বিয়ে করেন নি। অবশ্য এঁরা এ কথা যে কি ভাবে জেনেছেন তারও কোন প্রমাণ দেন নি।

অপরপক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল, শরৎ-চন্দ্রের আত্মীয়রাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল, শরৎচন্দ্র নিজেও হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে গেছেন। আর সে কথা শুধু মুখেই নয়, লিখিত-ভাবেও তিনি বলেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করেন, তাতে হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি স্ত্রীই বলেছেন এবং তিনি তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জীবন সত্বে দান করে যান। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন একথাও লিখে যান। অতএব ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায় হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক বলে মনে করি।

তবে একথা হয়তো সত্যও হতে পারে যে, দূর দেশে রেঙ্গুনে যেখানে শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় একা ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাও প্রায় ঐ অবস্থাতেই সেই বিদেশে মাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন, সেখানে হিন্দু-বিবাহের সকল প্রকার সামাজিক প্রথা ও লোকাচার-গুলি যথাযথ পালন করা হয়তো সম্ভবপর হয়নি। আজকাল শুনি কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পরস্পর প্রণয়মুগ্ধ বহু যুবক যুবতী কালীকে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে নিজেরাই বিবাহকার্য সমাধা করে নেয়। আর কালের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে বিবাহপ্রথারও তো পরিবর্তন হয়ে চলেছে—যেমন অসবর্ণ-বিবাহ, সধবা বিবাহ, এমন কি বারবণিতা বিবাহ ইত্যাদি। এই প্রকারের সমস্ত বিবাহই আজকাল হিন্দুসমাজে বিবাহ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, শরৎচন্দ্র শৈবমতে বিবাহ করেন। শৈবই হোক আর বৈষ্ণবই হোক, যাই হোক একটা মতে তো বিবাহ হয়। আজকাল তো 'আর্য' সমাজের মতে, রেজেষ্ট্রী মতে নানা প্রকারের বিবাহ হচ্ছে এবং সমাজ সে সবই বিবাহ বলে মেনে নিচ্ছে। তাই ব্রাহ্মণ্য, শৈব, যে মতেই হোক্ শরৎচন্দ্রের বিবাহকে বিবাহ বলাই উচিত বলে মনে করি। বিশেষ করে হিরণ্ময়ী দেবী এবং শরৎচন্দ্র তাঁরা নিজেরা যখন বলছেন বিবাহ।

নরেনবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার নাম বলেছেন—কৃষ্ণদাস অধিকারী। অথচ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরা সকলেই বলেন, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনকড়িবাবু বলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়কে প্রতি মাসে যে টাকা পাঠাতেন, অনেক সময় তিনিই সেই টাকা পোষ্ট অফিসে গিয়ে মণি অর্ডার করে এসেছেন। তাঁর বেশ মনে আছে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি চক্রবর্তীই ছিল। রাম-কৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভবাবু বলেন, শরৎচন্দ্রের শ্বশুর যে 'চক্রবর্তী' ছিলেন, একথা তাঁরা শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী ছিলেন কিনা একথা হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একথা সমর্থন করেন। সামতাবেড়ে গিয়ে আমি যেদিন হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করি, তখন রামকৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভ বাবু এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি চক্রবর্তী একথা এঁরা আগেই বলে ফেলায় হিরণ্ময়ী দেবী এঁদের কথাই সমর্থন করেন। তবে তাঁর বাবার নাম যে 'কেষ্ট' একথা তিনি নিজেই বলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে শুনেছিলাম তাঁর বাপের বাড়ী শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। শালবনীর নিকটে সত্যই শ্যামচাঁদপুর আছে কিনা এবং থাকলে সেই গ্রামে কৃষ্ণদাস অধিকারী বা চক্রবর্তী নামে কোন লোক ছিলেন কিনা জানবার জন্য একদিন শালবনী গিয়েছিলাম। শালবনীতে গিয়ে শুনলাম, সেখান থেকে প্রায় মাইল ছয় দূরে শ্যামচাঁদপুর। তবে একা সে পথে যাওয়া বিপজ্জনক। লোকালয়-বর্জিত একটানা ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে সরু পথ। প্রায় মাইল দুই করে এমনি ঘন দুটো শালবন পার হতে হয়। বাকি পথটা ফাঁকা মাঠ, মাঝে একটা নদী। এই পথে হিংস্র জন্তুর চেয়ে চোর ডাকাতের উপদ্রবই আজকাল বেশী। আমি যেদিন যাই, শুনলাম তার মাত্র দুদিন আগেই একটা লোককে শালবনের পথে ডাকাতে ঠেঙিয়ে মেরেছে। এ বছর শালবনী অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু ফসল না হওয়ায় পথে এই চুরি ডাকাতি একটু বেশী রকম বেড়েছে। যাই হোক্, আমি যেদিন যাই, শালবনীতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে যে বিরাট হাট হয়, সেদিন সেই হাটবার ছিল। শ্যামচাঁদ-পুরের বহুলোক ঐ হাটে আসায় তাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে শ্যামচাঁদপুরে যাই।* গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, কৃষ্ণ অধিকারী নামে একজন লোক সত্যই ঐ গ্রামে ছিলেন। প্রায় বছর ৩৫ আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর চার কন্যার মধ্যে একজনের নাম ছিল মোক্ষদা।

---

* রাত্রি ৯টায় ট্রেন ধরবার জন্য বিকালে শ্যামচাঁদপুর থেকে ফেরার সময় কয়েকটা টাকা দিলে ৬জন লোক লাঠি নিয়ে শালবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে আগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

হিরণ্ময়ী দেবীর নাম যে মোক্ষদা এবং তাঁর যে একাধিক বোন ছিল, একথা তিনি আমাকেও বলেছিলেন। অতএব শ্যামচাঁদপুরের এই কৃষ্ণ অধিকারীই যে হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি সামতাবেড়েয় চক্রবর্তী শুনে এসে, এখানে যে অধিকারী শুনলাম তার কি? এ সম্বন্ধে শ্যামচাঁদপুরে যা দেখলাম তাতে করে ব্যাপারটা এইরূপ ঘটেছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

শ্যামচাঁদপুরে চক্রবর্তী উপাধিধারী অনেক লোক বাস করেন। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আগে তাঁদের উপাধি অধিকারী ছিল। তাঁরা অধিকারী বদলে চক্রবর্তী উপাধি নিয়েছেন। এঁরা নিজেদের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন।*

শ্যামচাঁদপুরের অধিকারীরা সকলেই চক্রবর্তী হলেন দেখে, কৃষ্ণ অধিকারীরও চক্রবর্তী হওয়া এবং ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রকে কন্যাদায়ের জন্য—যদি তিনি বৈষ্ণবই হন, তা'হলে নিজেকে বিদেশে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়াটা এমন কিছুই অসম্ভব নয়।

আর একটা কথা, নরেনবাবু হিরণ্ময়ী দেবীকে অসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণী বলেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী দরিদ্রের কন্যা হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তিনি অসহায় হবেন কেন? হিরণ্ময়ী দেবীর শুধু বিয়ের সময়ই নয়, তাঁর বিয়ের বহু পর পর্যন্তও তাঁর বাবা সুস্থ-সবল দেহেই বেঁচে ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী বলেন, তাঁর বাবার গ্রামে জমিজায়গাও ছিল।

'রমণী'র কথায় আমি আগেই বলেছি, 'রমণী' অর্থে আমরা সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সের মেয়েদেরই বুঝে থাকি। তাই প্রশ্ন ওঠে—বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স কত ছিল? এই বয়সের কথায় হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুর কাছে, আমার কাছে এবং আরও অনেকের কাছে একই কথা অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, একথা বলেছেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের আগে হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা নিবারণ চক্রবর্তী হিরণ্ময়ী দেবীকে আকিয়াবে এক মুসলমানের কাছে দু'শ টাকায় বিক্রি করেছিলেন—এ কথা কানাইলাল ঘোষ তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে আমি কানাইবাবুর লেখা এই মুসলমানের কাছে বিক্রি হওয়ার কথা শোনালে তিনি কানাইবাবুর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে ঘোরতর প্রতিবাদ করেন।

এখন কেউ হয়তো বলবেন যে, হিরণ্ময়ী দেবী যদি সত্যই মুসলমানের কাছে বিক্রীত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কি আর এখন স্বীকার করবেন?

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ—হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার নাম নিবারণ চক্রবর্তী নয়। দ্বিতীয়তঃ:—এক কানাইবাবু ছাড়া শরৎচন্দ্রের অন্য কোন জীবনী-লেখকই মুসলমানের কাছে বিক্রি হওয়ার কথা কোথাও আদৌ বলেন নি। কানাইবাবুর এই কাহিনীটি যে একেবারে ভিত্তিহীন ও আজগুবি, গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমি তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া কানাইবাবুর সমস্ত গ্রন্থটি নিয়ে আমি যখন আলোচনা করব, তখন দেখাবো যে, এই মিথ্যে কাহিনীটির ন্যায় ঐ গ্রন্থের মধ্যে আরও কত অসংখ্য মিথ্যে আজগুবি ও বানানো গল্প রয়েছে। আর সেই আজগুবি গল্পগুলি শুধু শরৎচন্দ্রকে নিয়েই নয়, এমন কি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও একাধিক গল্প রচিত হয়েছে। আর এই গল্পগুলি এত অবাস্তব, ভিত্তিহীন ও মিথ্যে যে, গল্পের চেহারা দেখলেই যে কোন সাধারণ পাঠকই বলে দিতে পারবেন যে, এগুলি কানাইবাবুর স্বকপোল কল্পিত ও বানানো গল্প। এরূপ একটা আজগুবিপূর্ণ বাজে বই অজ্ঞ অথবা দলীয় সমালোচকদের হাতে পড়ে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংশিত হয়ে এডিশনের পর এডিশন হয়ে চলেছে, অথচ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় শরৎ সমিতি, শরৎ সাহিত্য সমিতি এবং দেশের সুধী জনসাধারণ এ বইখানার প্রচার বন্ধ করবার জন্য কেন যে চেষ্টা করছেন না তাই ভাবি! মিথ্যে কাহিনীভরা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে খেলো-করা এই বই এখনি বন্ধ করবার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া দেশবাসীরও একটা মহান কর্তব্য বলে মনে করি।

শরৎচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে এপর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সব ক'টিই তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর জীবিতকালে তাঁর কোনও জীবনী প্রকাশিত হয় নি। শরৎচন্দ্রের এই বিভিন্ন জীবনীগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে যেমন সব রকমারী কাহিনী দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেও তেমনি তাঁর বিবাহিত-জীবন নিয়ে লোকের জল্পনা-কল্পনারও অন্ত ছিল না। বিশেষ করে লোকের এই কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিল তাঁর শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী।

লোকে অনুমান করত এবং এখনও যারা শরৎচন্দ্রের বিবাহের সঠিক সংবাদ জানে না, তারাও ঐ রাজলক্ষ্মীর মধ্যেই হিরণ্ময়ী দেবীকে খুঁজে বেড়ায়। শুনেছি, আজও অনেক লোক নাকি হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে থাকেন—আপনিই কি রাজলক্ষ্মী?

আজ হিরণ্ময়ী দেবীকে লোকে যেমন প্রশ্ন করে শরৎচন্দ্রের জীবিত-কালে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নই করতেন—হিরণ্ময়ী দেবীই কি তাহলে রাজলক্ষ্মী?

শরৎচন্দ্র বন্ধুদের কল্পনার দৌড় দেখবার জন্য অনেক সময়েই হ্যাঁ না কোনও উত্তর দিতেন না। আবার কখন কখন হ্যাঁ বলে বন্ধুদের প্রশ্নের সমর্থন জানিয়ে মজাও উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই মজা করার আসল পরিচয়টি যিনি না জানতে পারতেন, তিনিই বাইরে এসে প্রচার করতেন যে, শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকেই বিয়ে করেছিলেন। ঠিক এই ভুলটাই করেছেন শরৎচন্দ্রের এক বন্ধু শ্রীশৈলেশ বিশী। তিনি তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন" গ্রন্থে লিখেছেন—"তিনি (শরৎচন্দ্র) তাঁকে (রাজলক্ষ্মীকে) বিয়ে করেছিলেন শৈবমতে।"

রাজলক্ষ্মী যে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের নায়িকা মাত্র এবং

* অনেক রাঢ়ী-[illegible]দের অধিকারী উপাধিও রয়েছে।

তিনি যে শরৎচন্দ্রের শৈবমতে বিবাহের স্ত্রী নন, একথা অতি অনায়াসেই বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে কখনও কোন সভা-সমিতিতে যেতেন না। আর অত্যন্ত নিকট বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছাড়াও তিনি হিরণ্ময়ী দেবীর নামও উচ্চারণ করতেন না। তাই অনেকে আবার এমনও জানত যে, শরৎচন্দ্র আদৌ বিয়েই করেন নি। যারা শরৎচন্দ্রকে এইভাবে জানত, শরৎচন্দ্র তাদের কোন সভা-সমিতিতে গেলে, তারা সভায় শরৎচন্দ্রকে অবিবাহিত, চিরকুমার বলে ঘোষণা করত। শরৎচন্দ্র এখানেও এ সম্বন্ধে হ্যাঁ না কোন কথা বলতেন না। শুধু মজা উপভোগ করতেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে তাই লিখেছেন—"...অনেকেরই মনে এই সুদৃঢ় ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধ ছিল যে, শরৎচন্দ্র অকৃতদার। কোনো সভ্য-সমিতিতে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার সময় তাঁর পূর্ব-পরিচিত অনেকেই তাঁকে চিরকুমার জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেন। শরৎচন্দ্র শুনে নীরবে মুখ টিপে হাসতেন, কোন প্রতিবাদ জানাতেন না। এ যেন তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।"

এ তো না হয় তাঁকে অবিবাহিত, চিরকুমার বলে প্রচার করা, কিন্তু সত্যই শরৎচন্দ্রের এমনি স্বভাব ছিল যে, যেখানে তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়েও লোকে নানা রকমের আজগুবি কল্পনা করে প্রচার করত, সেখানেও তিনি চুপ করে থাকতেন, কোন প্রতিবাদ করতেন না। এই চুপ করে থাকার ফলে অনেক সময় তাঁকে অপমানিতও হতে হয়েছে।

যা মিথ্যা তার কোনও প্রতিবাদ না করাই ছিল যেন শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব। তাই লোকে তাঁর জীবনের ইতিহাস নিয়ে তাদের ইচ্ছামত প্রচার করে বেড়ালেও তিনি তার প্রতিবাদ করতেন না। শরৎচন্দ্র তাঁর সাতান্ন বছর বয়সের সময় তাঁর এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধে তাই লিখেছিলেন—"...আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ-লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে, কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের। তাঁদের করতে বলগে! তাঁরা রাগিয়া জবাব দেন—লোকে যে আপনাকে অদ্ভুত ভাবে তার কি? আমি বলি, সে দায়ও তাঁদের, কিন্তু এই সাতান্ন বছরেও যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে ত আর কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো—আপনিই এর সমাপ্তি হবে, কোন চিন্তা নেই।"

শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে লোকে কিরূপ জল্পনা-কল্পনা করত এবং এজন্য তাঁকে যে মাঝে মাঝে কিরূপ অপমানিতও হতে হ'ত তারই একটা কাহিনী এখানে বলছি। এক উচ্চশিক্ষিতা, লেখিকা, বর্ষিয়সী ভদ্রমহিলা মাত্র কিছুদিন আগে আমাকে এই কাহিনীটি বলেছিলেন। এই কাহিনীটি মূলতঃ তাঁরই জীবনের একটি ঘটনা। কাহিনীটির মধ্যে ভদ্রমহিলার শাশুড়ী এবং ননদও জড়িত আছেন বলে, ভদ্রমহিলার আর নাম করলাম না। কাহিনীটি এই—

ভদ্রমহিলা নিজে লেখিকা বলে শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে বালীগঞ্জে বাড়ী করে যখন বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন এই ভদ্রমহিলা তাঁদের যাদবপুরের বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রকে দাদা বলতেন, আর শরৎচন্দ্রও তাঁকে ছোট বোনের মত খুব স্নেহ করতেন।

ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসেন। একবার এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে তাঁদের যাদবপুরের বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন।

নিমন্ত্রণ শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার বাড়ীতে গিয়ে খেতে পারি। কিন্তু আমি যা খাই, তুমি তাই খাওয়াবে তো। আমি সিঙ্গী মাছের ঝোল আর ভাত খাই। তাই যদি খাওয়াতে পারো তো যাই।

ভদ্রমহিলা তাই খাওয়াবেন বললে, শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রকে যেদিন খাওয়াবেন, সেদিন সকালে তিনি বাড়ীর পুরুষদের বাজার থেকে ভাল দেখে সিঙ্গী মাছ কিনে আনতে বললেন।

সিঙ্গী মাছ এল। রান্নাও হ'ল। সেদিনটা রবিবার কি ছুটির দিন ছিল না। তাই যথাসময়ে বাড়ীর পুরুষরা যে যার অফিসে চলে গেলেন।

বাড়ীর পুরুষরা অফিসে চলে গেলে এই ভদ্রমহিলার এক অল্পশিক্ষিতা ননদ তাঁর মা'র কাছে গিয়ে বললেন—ওগো মা, বৌদি কাকে নিমন্ত্রণ করে এনে অত যত্ন করে খাওয়াবে শুনেছ! সেই লেখক শরৎ চাটুজ্যেকে। শুনেছি লোকটা যেমন মাতাল, তেমনি চরিত্রহীন। পতিতাদের মধ্যেই নাকি থাকে।

মা ছিলেন একেবারে অশিক্ষিতা, আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। তিনি মেয়ের মুখে এই কথা শুনে একেবারে আগুন। চীৎকার করে বৌমার কাছে ছুটে গেলেন। গিয়ে বললেন—বৌমা! তুমি গেরস্থ ঘরের বৌ হয়ে একি করছ! ঐ লোকটাকে বাড়ীতে এনে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছ! আমি আগে যদি ঘুণাক্ষরেও এর কিছু জানতে পারতাম তাহলে ছেলেদের ঐ মাছ কিনে আনতেই নিষেধ করতাম। কিন্তু বলে দিচ্ছি বৌমা, তুমি তাকে কিছুতেই এ বাড়ীতে আনতে পারবে না।

ভদ্রমহিলা তো তাঁর শাশুড়ীর এই কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। একেবারে অবাক্। তারপর তিনি তাঁর শাশুড়ীকে অনেক অনুরোধ করে বললেন—মা, আজকের দিনটার মত আপনি অনুমতি দিন। আর কোন দিন আমি তাঁকে আনব না। আজ নিমন্ত্রণ করে তাঁকে না খাওয়ালে, তাঁর যে অপমান করা হবে মা!

ভদ্রমহিলার শাশুড়ী কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। অবশেষে তিনি বৌকে একটা মতলব বাৎলে দিলেন। [illegible] এখনি তাঁর বাড়ী

যাও, গিয়ে বলগে আমার শাশুড়ীর ভারী অসুখ তাই আজ আর আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না।

নিমন্ত্রিত শরৎচন্দ্রকে শুধু সেই দিনটার জন্য একবার বাড়ীতে আনতে দেবার জন্য ভদ্রমহিলা তাঁর শাশুড়ীর কাছে কত অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁর শাশুড়ী কিছুতেই মত দিলেন না।

ভদ্রমহিলা তখন বাধ্য হয়েই শরৎচন্দ্রকে নিষেধ করতে গেলেন। তিনি কিন্তু গিয়ে তাঁর শাশুড়ীর শেখানো তাঁর ভারী অসুখের কথা বললেন না। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে কেঁদেকেটে অকপটে সমস্ত কথাই খুলে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর স্বামী বা ভাসুর—পুরুষদের কেউ যদি বাড়ীতে থাকতেন, তাহলে এমনটা আর হতে পারত না। তাঁরা থাকলে তাঁদের মাকে বোঝাতে পারতেন।

সমস্ত শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে ভদ্রমহিলাকে শুধু এই কথাই বললেন—এ নিয়ে তুমি মনে কোন দুঃখ করো না। এর জন্যে আমি কিছুই মনে করিনি। আমাকে লোকে ঐ রকম ভুলই বুঝে থাকে। আমাকে নিয়ে তারা যে কত জল্পনা-কল্পনা করে তার ইয়ত্তা নেই। এই যে দেখনা, তোমার বৌদিকে আমি ধর্মমতেই বিয়ে করেছি, তবুও লোকে বলে আমি নাকি তাঁকে রক্ষিতা রেখেছি।

দেশের অধিকাংশ মানুষ শরৎচন্দ্রকে এমনিভাবেই ভুল বুঝেছিল।

বিখ্যাত নট অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি 'নীলদর্পণ' নাটকে অত্যাচারী 'রোগ্ সাহেবের ভূমিকায় এমন জীবন্ত অভিনয় করেছিলেন যে, দর্শকের আসন থেকে বিদ্যাসাগর মশায় অভিনয় হচ্ছে ভুলে গিয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবুকে চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বিদ্যাসাগর মশায়ের চটি মাথায় নিয়ে সেদিন বলেছিলেন—আজ আমার অভিনয় সার্থক হ'ল।

সে যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্য-লীলা' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় এরূপ নিপুণ অভিনয় করেছিলেন যে, অনেক দর্শক বিনোদিনীকে সাক্ষাৎ চৈতন্যদেব ভেবে তাঁর পদধূলি নিতে উদ্গ্রীব হ'য়েছিল। বিনোদিনীর এই অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশবাবু নিজেই লিখেছেন—"...বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই?' বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান।...বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব কর-কমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—'চৈতন্য হোক্'।"

এখানে এই অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে আমি বলতে চাই যে, সার্থক অভিনয়ে যেমন দর্শক অভিনেতাকে ভুলে গিয়ে সে যে চরিত্রে অভিনয় করছে চোখের সামনে তারই মূর্তি দেখে, জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির বেলায়ও তেমনি, পাঠক লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে লেখকের নিজেরই অভিজ্ঞতার কথা বা তাঁরই জীবনকথা বলে মনে করে থাকে।

এই জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলতে গিয়েই শরৎচন্দ্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—

"সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত।"

(শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র—পৃঃ ৩২৭)

সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে পাঠকের চোখের সামনে এমনিভাবে বাস্তব ও জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারাই তো লেখকের চরম সার্থকতা। এখানে পাঠকের নিন্দাও লেখকের পরম জয়মাল্য। এই কথা ভেবেই শরৎচন্দ্র তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের কল্পনার দেবার অবকাশ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত সমস্ত নিন্দা ও জনশ্রুতির প্রতিবাদ থেকে বিরত ছিলেন কিনা কে জানে? (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজিকার এ প্রভাত অপূর্ব্ব সুন্দর!
ফাল্গুনের সূর্য্যালোক! ঊর্দ্ধে নীলাম্বর
দিক হ'তে দিগন্তরে পড়িয়াছে ঢলি!
বনে বনে উচ্ছ্বসিত পাখীর কাকলি!
শিমুলের ডালে ডালে পুষ্প-আভরণ!
বাতাবী ফুলের গন্ধে মদির পবন
সর্ব্বাঙ্গে বুলায় স্নিগ্ধ জননীর কর!
জলঙ্গীর নীল জল! শুভ্র বালুচর!
চৈতালী শস্যের ক্ষেতে আনন্দিত চাষী
সারাদিন কর্ম্ম ব্যস্ত। ধন্দ রাশি রাশি
থামারে থামারে আছে হ'য়ে স্তূপাকার!
কাঁটা-মাদারের ফুল অতি-চমৎকার!
'পাব'-এর পল্লবে যেন ছড়ানো আবীর
চেয়ে চেয়ে মেটেনাকো পিপাসা আঁখির।

স্বাস্থ্য-সাধনা

অয়রণম্যান নীরদ সরকার ব্যায়ামসাগর

স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। যে জাতি স্বাস্থ্যবান শক্তিশীল, সে জাতি কোনদিন অনুন্নত ও পরমুখাপেক্ষী থাকে না। আমাদের দেশে আজ ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা যার জন্য অধিকাংশ লোকই কায়িক শ্রমে বিমুখ। অধিকাংশ লোকই জীবনীশক্তিবিহীন রোগগ্রস্ত। রোগ বলতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্ল, যকৃতের রোগ ও স্নায়ুবিক ব্যাধি বোঝা যায়। এ সমস্ত গা সহা রোগে মানুষ তিলে তিলে ধ্বংস হ'তে চলেছে। যার জন্য আজ ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা। এ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য ছাত্রদের মগজের ধারণশক্তি তো কমে গেছেই, সাথে সাথে শিক্ষার মান পর্যন্ত দিন দিন নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে চলে যাচ্ছে; যে জন্য অনেকে কর্মক্ষেত্রে বিফলতা লাভ করছে। এর একমাত্র কারণ স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ও কায়িক শ্রমে বিমুখতা। এই স্বাস্থ্যহীনতা দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন স্বাস্থ্যবিধি পালন, নিয়মিত ব্যায়াম ও কায়িক শ্রম করা। যাদের নিত্য কায়িক শ্রম করতে হয় তাদের কথা আলাদা। শুধু ব্যায়াম ও নিয়মাদি পালন করলেই যে রোগ দূর হয় ও স্বাস্থ্য ভাল হয় তা নয়। ব্যাধিগ্রস্থ দুর্বল ব্যক্তিদের উচিত ডাক্তার দ্বারা নিজের রোগ ও দেহ পরীক্ষা করে' উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা মোটামুটি সুস্থ হওয়া, তারপর নিজ প্রয়োজন ও যোগ্যতামত ব্যায়াম দ্বারা দেহের স্বাস্থ্যগ্রন্থি, পেশী ও হজমশক্তিকে সক্রিয় সবল করা। আবার ব্যায়াম করতে হবে বলেই যে খুব একটা কিছু গদা, বারবেল, ডাম্বেল, কুস্তি করে একটা বিরাটাকৃতি দেহধারী হ'তে হ'বে তা নয়। দেহকে নীরোগ কর্মঠ রাখাই ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে দেখা যায় অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যায়াম করে না, স্বাস্থ্যের প্রতিও যত্ন নেয় না। আর যারা স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয় ও ব্যায়াম করে তারা শুধু এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং একটা দর্শনধারী দেহ গঠন করে। এরূপ অকেজো দেহে প্রয়োজন কি?

ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হ'ল দেহকে কর্মপটু করা ও সর্বকর্মে প্রয়োজনবোধে নিয়োগ করা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যটি ভাল রেখে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা। আমার মতে একেবারে ব্যায়াম না করা—আর সবদিক ফেলে রেখে শুধু ব্যায়াম করে দর্শনধারী দেহ করা—উভয়ের কোনটাই সমীচীন নহে। এমনভাবে ব্যায়াম করা উচিত যাতে নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাজকর্মের ক্ষতি না করে সামান্য সময় ব্যয়ে ব্যায়াম দ্বারা দেহকে নীরোগ ও কর্মপটু রাখা যায়। বর্তমানে অনেকেই ব্যাপকভাবে ব্যায়াম প্রচলন দ্বারা জাতিকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগতভাবেও এ বিষয়ে অনেকেই যত্নবান হ'য়েও তেমন সুফল পাচ্ছেন না। আবার অনেকেই অপরকে স্বাস্থ্যবান করতে গিয়ে রোগা দুর্বল ও কৃশদের যত্ন না নিয়ে মোটামুটি স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর দেহধারীদের যত্ন নিয়ে থাকেন। এতে সর্বসাধারণের উপকার মোটেই হয় না। এতে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হ'তে পারে বা ২।৪জন বিশেষ স্বাস্থ্যবান থাকার চেয়ে সর্বসাধারণ যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সেজন্য রোগা দুর্বলদেরই বেশী যত্ন নেয়া উচিত। এমনভাবে ব্যায়াম করান উচিত যাতে ছোট বড় কিশোর, যুবা, রোগা, দুর্বল প্রত্যেকেই ব্যায়াম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে পারে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক ব্যায়াম প্রচারের। অনেকে পুস্তকাদির সাহায্যে ব্যায়াম করে' তেমন সুফল পায় না। এজন্য ব্যায়ামাদির উপর অনেকের ভীতি আছে। তার কারণ নিজ প্রয়োজনমত ব্যায়াম নির্ধারণে অক্ষমতা এবং যার যার বয়স দেহের গঠন, সহনশীলতা দেহের ক্রটি ও রোগ বুঝে ব্যায়াম নির্ধারণ না করতে পারা। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সর্বসাধারণ্যে এমন ব্যায়াম প্রচার করা উচিত যে ব্যায়াম নিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে আহার নিদ্রা জামা কাপড় পরার মত কাজকর্ম ক্ষতি না করে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এছাড়া এমন সব ব্যায়াম প্রচার করা উচিত। আমাদের জলবায়ুর অনুকুলে ও যে সব ব্যায়ামে দেহের ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় ও রোগ ক্রটি দূর হয় এবং উহা অতি সহজে নিত্য তালিকাভুক্ত করা যায়, বেশী সময়ও ব্যয় না হয়। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত কিশোরদের প্রতি—তার কারণ আমাদের দেশে কিশোরদের স্বাস্থ্যের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শৈশব থেকে যদি এদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে শেখান যায় তাহলে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য এদের আলাদা সময় তো নষ্ট করতে হবেই না, বরং এ সমস্ত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এ করতে হলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এদের নিত্য কর্ম তালিকার মধ্য দিয়ে চলতে শেখান তাহলে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য আলাদা শিক্ষা না দিলেও চলতে পারে। শুধু কিশোরদের কেন ইহা সকলেরই সহায়ক।

নিত্য তালিকা—

সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগের পর মলমূত্রাদি ত্যাগান্তে হাতমুখ ধুয়ে ঘর, উঠোন মেঝেয় বা বারান্দায় ২।১ রকম খালি হাতে ব্যায়াম যেমন, মেরুদণ্ড নমনীয়তার জন্য দেহের উপরাঙ্গ সম্মুখ দিকে বাঁকান, পিছন দিকে বাঁকান, পাশে বাঁকান, একজায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ান, যার যার সাধ্যমত অভ্যাস করবে। কিশোর বয়সে দেহের কোন অঙ্গ বা পেশীতে তেমন চাপ দিয়ে কোন ব্যায়াম করতে নেই। তাছাড়া এমন ভাবেও ব্যায়াম করতে নেই যাতে খুব হাঁফিয়ে পড়তে হয়। সাধারণভাবে এ জাতীয় ২।৫টি ভংগি করে শ্বাস অস্বাভাবিক হলে মোটামুটি বিশ্রাম দ্বারা শ্বাস স্বাভাবিক করে নিয়ে ২।৩টি আসন করলেই যথেষ্ট। এ

ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম করলে দেহের নমনীয়তা কমনীয়তা ক্ষিপ্রকারিতা বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম আসন শেষ করে ভেজান কাঁচা মুগ বা ছোলা সামান্য পরিমাণ খেয়ে পড়তে বসা, আর যাদের হজমশক্তি দুর্বল তাদের পক্ষে আদা কুচি, নুন, কাঁচা হলুদ, আখের গুড় ইত্যাদি প্রশস্ত। এসব শেষ করে পড়তে বসা।

৭।।৮টার সময় যার যার সাংসারিক অবস্থা অনুসারে চিড়া, মুড়ি, রুটি যা জোটে তা দিয়ে জলযোগ করা। তৎপর স্নানের পূর্বে ভাল করে গায়ে তেলমাখা ও স্নান সেরে আহারাদি শেষ করা। মনে রাখতে হবে—বাসি পচা উগ্র জিনিষ খেতে নেই, আবার অধিক ভোজনেও দোষ আছে। আহারান্তে ১০।১৫ মিঃ বিশ্রাম করে বিদ্যালয়ে যাওয়া। টিফিনের সময় ভুলেও ফেরিওয়ালার রান্না করা কোন কিছু না খাওয়া। ছুটির পর বাড়ীতে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করা। বিশ্রামান্তে সুযোগ মত খেলা-ধুলা করা। আর যাদের সুযোগ নাই তাদের ২।১ রকম খালি হাতে ব্যায়াম করে মোটামুটি ২।৪ রকম আসন করা। বিশ্রামের পর পড়তে বসা। যারা ব্যায়াম আসনে সক্ষম নয়, তাদের পক্ষে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করা প্রশস্ত।

এ নিয়মে যদি কিশোর বয়স থেকে চলতে শেখা যায় তাহলে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আলাদা সময় তো ব্যয় করতে হয়ই না, স্বাস্থ্যহীনতার কবলেও পড়তে হয় না। এছাড়া আশা করি এ ধারার ব্যায়াম ও নিয়মাদি পালন করলে ব্যাপক স্বাস্থ্যোন্নতির পথও সুগম সহজ হবে। মনে রাখতে হবে বয়স বাড়বার সংগে সংগে ব্যায়ামের মাত্রা ও গুরুত্ব বাড়াতে হয়। কিশোররা যে সমস্ত ব্যায়াম করবে যুবকরা কিন্তু তার চাইতে একটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম করবে। আবার যুবকরা যে ধারায় ব্যায়াম করবে, প্রবীণদের ব্যায়ামে কিন্তু সে ধারার তারতম্য আছে। তবে যারা বিশেষভাবে উন্নত হতে চায় তাদের কথা আলাদা। যারা চাকরীজীবী, সময় পান না বলে মনে করেন, তারা কিছুদিন এইরূপ একটা তালিকা করে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে চলে দেখবেন, এজন্য সময় ও কাজ নষ্ট হয় না। আহারাদি বিষয়ে একটু সংযম রেখে যেমন বাসি পচা উগ্র জিনিষ বাদ দিয়ে খাওয়া, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমানিশায় নিশিপালন, নিয়মিত আসন, ব্যায়াম অসাধ্য হলে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ। ব্যায়াম যদি করতে হয় তাহলে কিরূপ ব্যায়াম করতে হবে। এমন ব্যায়াম করতে হবে যা-দ্বারা সর্বসাধারণ কর্ম-পটু কষ্ট-সহিষ্ণু দেহ-গঠন করতে পারে ও দেহ মন সুস্থ থাকে। এরূপ ব্যায়াম করতে হলে আমাদের আর্য্যঋষি প্রবর্তিত একমাত্র যোগ ব্যায়ামই শ্রেষ্ঠ ইহাতে তেমন সময় লাগে না, স্নানের প্রয়োজন হয় না। এই ব্যায়াম দ্বারা পুরাকালে আর্য্যঋষিরা শরীরকে অত্যন্ত মজবুত করে গড়ে নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধন করে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতেন। আমাদের দেশের জলবায়ু আহারাদি চাল-চলন সবই প্রায় বদলে গেছে। পুরাকালের ঋষিদের মত অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন স্বাস্থ্যের, তাই তাঁরা যার সাহায্যে হতেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী, আমাদের তার সাহায্যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া তেমন কঠিন নয়। ইহা দ্বারা মানুষের নানা ব্যধি তো দূর করেই—হতেও দেয় না। দেহের আভ্যন্তরীণ কল-কব্জাকে অত্যন্ত মজবুত তো করেই, স্নায়ু গ্রন্থিকেও অত্যন্ত সবল করে। দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ দূর করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দেহের স্নায়ু গ্রন্থি সক্রিয় সবল না হলে বা থাকলে বেশীদিন কর্মক্ষম থাকা যায় না, মগজও দুর্বল হয়ে যায়। যারা বিশেষ-ভাবে দৈহিক উন্নত হতে চায় তাদেরও উগ্র ব্যায়ামের সংগে ২।১টী আসন করা উচিত। যে কোন ব্যক্তি ২।৪টী আসন সকাল বা সন্ধ্যায় করলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। কোন আসন কিভাবে করতে হয় বা হবে পরে বলব, মোটামুটি সুস্থদেহীদের আসন করার পূর্বে ২।১ রকম সহ্য মত ব্যায়াম করে নিলে বেশী ফল হয়।

দীপাবলি

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

অন্ধ-তিমির মেলেছে আকাশ পাখা
উদাত্ত শূন্য রাত্রিতে নিমগন,
মৃত্যুর বুকে প্রাণের স্পর্শ আঁকা,
আশা অনন্ত, অভয় উত্তরণ;
ভীরু-হৃদয়ের ক্ষণিকার অঞ্জলি
জ্বালাই লক্ষ কামনার দীপাবলি।
কত দূরে আর কোন্ অনন্তে ভোর
সূর্য্যোদয়ের সাড়া খুঁজে খুঁজে যায়!
হাজার বছর কেটেছে, অশ্রুলোর
ঝরেছে; নিশীথ ছড়ালো তমিস্রায়।
লক্ষ তারার হৃদয়ের দীপাবলি
কতটুকু? তাতে আঁধার ওঠেনা জ্বলি'।
এসেছি অযুত তমসার বুক চিরে
অমাবস্যায় ভুবন দেখেছি কালো;
যতদূর যাই রাত্রিই আসে ফিরে,
তাই বলি মন, অন্তর্দীপ জ্বালো;
প্রাণের প্রদীপে জীবন রহিবে জ্বলি'
মৃত্যুর কুলে ক্ষণিকার দীপাবলি।

শ্রীশ্রীবাবা

ভাস্কর

১

ধীরেন্দ্র একটি অফিসে চাকরি করে। বেতন ভালই পায়। স্ত্রী অণিমা সুন্দরী গুণবতী। সংসারে বেশি লোক নাই। স্বামী, স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি চাকর এবং একটি ঝি। পুত্রটির বয়স সাত বৎসর। মাঝে মাঝে ধীরেন্দ্রের বিধবা বড়দিদি আসিয়া থাকেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি তাঁহার শ্বশুরালয়েই বাস করেন।

একদিন স্কুল হইতে আসিবার পর পুত্র রমেন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়িল। প্রথমে সামান্য জ্বর বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ অসুখ অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করিল। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, সর্বপ্রকার আধুনিক ঔষধাদি প্রযুক্ত হইল। কিন্তু নিয়তি কে রোধ করিবে? পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া রমেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিল।

অণিমা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিল। পুত্রশোকাতুর মাতাকে কেহই কোনরূপ সান্ত্বনা দিতে পারিল না। কিছুদিন পরেই শোকাভিভূতা অণিমার আচরণে বিবিধ প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে লাগিল। ধীরেন্দ্র ভীত হইল। শেষে তাহার স্ত্রী পাগল হইয়া যাইবে না তো! অবশ্য উন্মাদের কোন লক্ষণ তাহার নাই। শুধু তাহার পুত্রশোক অসহ হইয়াই তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

একদিন পাড়ার একটি মহিলা আসিয়া বলিলেন, অমন করে হা-হুতাশ করে আর কি হবে? এমন করে শরীর মন ভেঙে না ফেলে বরঞ্চ মাঝে মাঝে শ্রীবাবার কাছে যেও। তাঁর কথা শুনলে, তাঁর ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হ'লে মন ভাল হবে।

অণিমা একথা ধীরেন্দ্রকে জানাইল। ধীরেন্দ্র বলিল, বেশ কথা। চল, আজই একবার ঘুরে আসা যাক্।

সন্ধ্যার দিকে যথাসময়ে তাহারা শ্রীবাবার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিতে পাইল, বহু ব্যক্তি পূর্ব হইতেই সমবেত হইয়াছেন। অর্ধেক নর এবং অর্ধেক নারী। সর্বপ্রকার অবস্থার লোকই সেখানে আছেন। উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, নিম্নশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, বিবিধ শ্রেণীর কর্মচারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার লোকই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। ধীরেন্দ্র ও অণিমা একপাশে গিয়া বসিল এবং পার্শ্বে উপবিষ্ট যাঁহারা বহুদিন হইতে এখানে আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তদের পরিচয় ন্যূনাধিক অবগত হইল। সভার একপাশে বসিয়া আছেন শ্রীবাবা। গম্ভীর মূর্তি, অথচ উহারই মধ্যে একটা সৌম্য স্মিত হাসি লাগিয়া আছে মুখে। তাঁহার আসনের পাশে ধূপদানি হইতে মৃদু মিষ্ট সৌরভ বাতাসে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে। সভাস্থ সকলেই অতি বিনীতভাবে শ্রীবাবার দিকে চাহিয়া আছেন।

ধীরেন্দ্র পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কি গৃহী?

হ্যাঁ। ওঁর অনেক রকম বিজনেস আছে।

বিজনেস?

হ্যাঁ। তার মধ্যে পেঁয়াজের ব্যবসাটাই সবচেয়ে বড়।

পেঁয়াজের ব্যবসা করেন, অথচ—

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি স্বয়ং একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। উনি ত্রিমূর্তি!

তাই নাকি?

এমনি কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটি ছোট ঘণ্টার মৃদু শব্দ হইল। সকলেই নীরবতা অবলম্বন করিলেন। এবার শ্রীবাবা কিছু বলিবেন। সকলেই উন্মুখ হইয়া শ্রীবাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্র এবং অণিমাও ব্যাকুল চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

শ্রীবাবা বলিলেন, তোমরা একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি ত্রিমূর্তি। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই মহেশ্বর। আর যত সব লোকের নাম তোমরা মাঝে মাঝে শোন—যেমন যীশু, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—এরা সব বোগাস্। তোমরা হয়তো বলবে, আপনি যদি মহেশ্বর, তবে আপনি গলায় সাপ জড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান না কেন? এর উত্তর হচ্ছে, যে যুগের যা। মহেশ্বর সেকালে ষাঁড়ে চড়তেন, একালে আমি ফোর্ডে চড়ি। এ রকম একটু আধটু তফাৎ যুগধর্ম-অনুসারে হতে বাধ্য। আসল কথা, বিশ্বাস। তোমরা বিশ্বাস কর, আমিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাহলেই হ'ল। তোমরা এখানে আসবে, সংসারের তাপ ভুলতে। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দেবে, তবেই তো শান্তি।

ঠিক এই সময়ে এক ভদ্রলোক শ্রীবাবার পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, ভয়ানক মুস্কিল হয়েছে, সেই তিনশ' মনের পেঁয়াজের চালানটা পুলিশে আটক করেছে। শ্রীবাবা তাহার মুখটি ভক্তবৃন্দের দিক হইতে একটু সরাইয়া সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন, পুলিশকে বল, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর আবার শ্রীবাবার শ্রীমুখ হইতে শ্রীবাণী বিনির্গত হইয়া ধর্মসভায় সমবেত নরনারীবৃন্দের পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীবাবা নীরব হইলেন। পশ্চাৎদিক হইতে একটি অপরূপবেশে সুশোভিতা তরুণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কি রূপ! চক্ষু ঝলসিয়া যায় যেন। কি অপরূপ বেশভূষা! খোঁপায় ফুলের চিরুণী, ঠোঁটে রং, হাতে ফুলের কঙ্কন, চুড়ী ও বালা, গায়ে সিল্কের ব্লাউজ, শাড়ী, গলায় ফুলের মালা, কোমরে ফুলের চন্দ্রহার, পায়ে ফুলের নূপুর। চলিবার সময়ে অতি মৃদু মধুর ঝুম ঝুম শব্দ হইতেছে। ধীরে ধীরে তিনি আসিয়া শ্রীবাবার সম্মুখে বসিলেন। হাতে একখানি সোনার রেকাবী, তাহাতে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন। শ্রীবাবা তাহা হইতে কিছু কিছু খাইলেন এবং অবশিষ্টটুকু তরুণীটি ধর্মসভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে একটু একটু বিতরণ করিলেন। সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন এবং পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তাঁহাদের মন শ্রীবাবার পাদপদ্মে অবনত হইয়া পড়িল।

উপস্থিত মহিলাবৃন্দের মধ্যে একজন বলিলেন, এত ঢং ভাল লাগে না বাপু। এতগুলি পুরুষমানুষের সামনে—

পার্শ্ববর্তিনী বলিলেন, ওঁদের কি আর ওদিকে মন আছে? সবাই সংসারের তাপে তাপিত হয়ে এখানে এসেছেন। শ্রীবাবার মাহাত্ম্য দেখে সবাই আত্মহারা।

এই তরুণীটি চলিয়া গেলে আর একটি তরুণী আসিলেন। ইনিও অপরূপ সজ্জায় সজ্জিতা। আপাদমস্তক বিবিধ প্রকার স্বর্ণালঙ্কারে সমাবৃতা। ঝলমলায়মান রূপরশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে শ্রীবাবার সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং একখানি রৌপ্যনির্মিত রেকাবের উপর একটি সোনার গ্লাস শ্রীবাবার শ্রীমুখে ধরিলেন। শ্রীবাবা এক চুমুকে গ্লাসের সরবৎটুকু শেষ করিয়া দিলে তরুণীটি মৃদু মধুর হাস্যের সহিত ধর্মসভার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সভাস্থ নরনারীর মনে শ্রীবাবার প্রতি ভক্তি আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

একটু পরেই আসিলেন আর একটি তরুণী। এমন রূপ ও এমন সজ্জা অতীব বিরল। আপাদমস্তক বিবিধ মহামূল্য মণিমুক্তাহীরকাদিখচিত মনোরম অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত। একবার চাহিয়া দেখিলে চক্ষু আর অন্যদিকে ফিরিতে চায় না। ধীরে ধীরে অপরূপ ভঙ্গিমায় শ্রীবাবার সম্মুখে আসিয়া একটি হীরকখচিত পানের ডিবা খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন এবং তিনি তাহা হইতে একটি পান ও দুইটি এলাচ তুলিয়া লইলেন। তরুণীটি ধীরে ধীরে উঠিয়া ধীরে ধীরে সভাগৃহ অন্ধকার করিয়া অপসৃত হইলেন।

একজন ভক্ত "শ্রীবাবার কি অপরূপ মহিমা" বলিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পার্শ্ববর্তী ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাঁদছেন?

পূর্বোক্ত ভক্ত বলিলেন, না, কাঁদব কেন? ওটা ভক্তির উচ্ছ্বাস, বুঝেছেন?

ধীরেন্দ্র অণিমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ব্যাপারটা মোটের উপর সুবিধের মনে হচ্ছে না।

অণিমা একটু রাগ করিয়াই বলিল, কেন?

ও মেয়ে তিনটি কারা?

কি দরকার আমাদের তা জেনে? ওরা দাসী হতে পারে, সখী হতে পারে, স্ত্রীও হতে পারে। যা হোক, হলেই হ'ল। ভক্ত নিশ্চয়ই।

আরো কিছুক্ষণ পরে ধর্মসভা শেষ হইল। সমাগত ভক্তেরা অগ্রসর হইয়া শ্রীবাবার পায়ের কাছে, টাকা, নোট, ধুতী, সাড়ী, আংটি, চুড়ী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রণামী দিয়া শ্রীবাবার চরণ স্পর্শ করিলেন। এক ব্যক্তি একখানি ভাঁজ-করা কাগজ শ্রীবাবার পায়ের কাছে রাখিলে, তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটা কি?

ভক্ত বলিলেন, ওটা একটা দানপত্র। আমার যা কিছু ছিল, সবই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি।

শ্রীবাবা পরম আদর করিয়া বলিলেন, আহা! তোমার কল্যাণ হোক।

ভক্ত বলিলেন, কল্যাণ টল্যাণ বুঝিনে বাবা, স্ত্রীটা তো জব্দ হ'ল।

শ্রীবাবা বলিলেন, তা বেশ করেছ, বেশ করেছ।

ধীরেন্দ্র মোটের উপর খুব খুসী হইতে পারে নাই। পুত্র-শোকাতুরা এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা-হীনা অণিমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

২

অণিমা প্রত্যহ শ্রীবাবার ধর্মসভায় যায়। কোনদিন ধীরেন্দ্র সঙ্গে থাকে, কোনদিন থাকে না। অণিমার একা একা সভায় যাওয়া ধীরেন্দ্র পছন্দ করিত না। কিন্তু পুত্রশোকাতুরা অণিমার মনে কষ্ট দিতেও সে চায় না। ওখানে গিয়া যদি একটু শান্তি পায়।

প্রতিদিনই শ্রীবাবার বাণী শ্রুত হইত। কোন কোন দিন সভার পর কয়েকজন পুরাতন ও অন্তরঙ্গ ভক্ত পুরুষ ও মহিলা শ্রীবাবার সন্নিকটে আসিয়া নানাবিধ আলাপাদি করেন এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সান্নিধ্য পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। সেই সময়ে কুসুমেশ্বরী, কনকেশ্বরী, হীরকেশ্বরী দেবীরাও আসিয়া যোগ দেন। বিবিধ প্রকার ধর্ম ও তত্ত্ব আলোচিত হয় এবং সুমিষ্ট হাসি রসিকতায় মনপ্রাণ বিভোর হইয়া উঠে।

কোন কোন দিন সভান্তে কোন কোন ভক্ত একাকী বা একাকিনী শ্রীবাবার সহিত আলাপাদি করেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পদারবিন্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

একদিন সভার পর একাকিনী অণিমা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণাম করিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন, কি খবর পাগলী, মন ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, শ্রীবাবা, আমার মনের সব ভার আপনিই নিয়েছেন যে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ভারই নিয়েছি, কি যে বল?

নিশ্চয়ই।

কই, তোমার হাতের ভার তো রয়েই গেছে।

হাতের ভার?

হ্যাঁ, ওই সোনার চুড়ীগুলো। ওকি কম ভার? জান না, সোনা জলের চেয়ে উনিশ গুণ ভারি?

তাই নাকি? সেই জন্যই হাত দুটো এত ভারি ভারি লাগে, দিন না হালকা করে?

এ আর বেশি কথা কি? ভুবনের ভার ধরে আছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তোমার চুড়ীগুলো আর তার কাছে কি?

এই কথা বলিয়া শ্রীবাবা ধীরে ধীরে অণিমার দুই হাত হইতে চব্বিশ গাছা চুড়ী খুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন, কেমন, বেশ হালকা লাগছে না? শরীর হালকা হলে মনও হালকা হয়।

হ্যাঁ, বেশ হালকা লাগছে।

তারপর শ্রীবাবা সস্নেহে বলিলেন, তুমি এক কাজ কর। আর বাড়ী ফিরে গিয়ে কাজ নেই।

কোথায় থাকব?

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাছে কি স্থানের অভাব? তুমি আমাদের তাপিত-কুঞ্জে গিয়ে থাকবে। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে সেখানে।

সেখানে কারা থাকে?

যারা তাপিত ও তাপিতা।

স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকা যায় না?

দুর পাগলী! তা কি হয়? যে স্বামী স্ত্রী ত্যাগ করেছে—আর যে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করেছে, তারাই সেখানে থাকে।

আমি তো স্বামী ত্যাগ করি নি।

এখন থেকে করলে।

অণিমা একবার শিহরিয়া উঠিল। তারপরেই চক্ষু মুদিয়া আচ্ছন্নের মত রহিল। [illegible]

সেই দিন এবং সেই সময়েই অণিমা তাপিত-কুঞ্জে উপনীত হইল।

৩

অণিমাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া ধীরেন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকট অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিল, অণিমা ধর্মসভার পর সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

ধীরেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া আত্মীয়স্বজন এবং নিকট বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বেশি হৈ-চৈ করিতেও দ্বিধা হয়। একে স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার, তারপর নিজের স্ত্রী! যথাসম্ভব সন্তর্পণে সন্ধান করিতে লাগিল এবং দুই একজন প্রবীণ উকিলের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে লাগিল।

এদিকে অণিমা ভালই আছে। তাপিত মহোদয়গণ এবং তাপিতা মহিলাবৃন্দ শ্রীকুঞ্জে শান্তিতে বাস করিতেছেন। সংসারের ঝামেলা নেই, স্ত্রীর মুখঝামটা নেই, স্বামীর তর্জন গর্জন নেই। উঠান, বারান্দা, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, সবই এক, শুধু শয়নঘর পৃথক।

মাঝে মাঝে ইঁহারা শ্রীবাবার ধর্মসভায় যোগ দেন। কিন্তু খুব কম। শ্রীবাবা প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া কুঞ্জে আসেন। কখনও কখনও কুসুমেশ্বরী, কনকেশ্বরী এবং হীরকেশ্বরীকেও সঙ্গে আনেন।

এমনি করিয়া দিন যায়।

ধীরেন্দ্র ব্যাকুলচিত্তে দিন কাটায়। কোন উপায় পায় না।

একদিন বৈকালে তাপিত-কুঞ্জের বাগানের একপাশে একটি কামিনী ফুলের গাছের তলায়, তাপিত এম.এ., ডি. এল. বিশ্বম্ভরবাবু অণিমাকে একটি সাংঘাতিক কথা বলিয়া ফেলিলেন।

অণিমা তড়িতাহতের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার মনের কিন্তু একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল। পুত্রশোকের 'শক্' এবং বর্তমান 'শক' উভয়ে মিলিয়া 'জিরো' হইয়া গেল। পুত্রশোকে তাহার মনে যে দুর্বলতা ও আবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা মুহূর্তে অপসারিত হইয়া তাহার মন সুস্থ হইয়া উঠিল। শ্রীবাবা, ধর্মসভা, তাপিত-কুঞ্জ প্রভৃতির প্রতি তাহার মনোভাব বেশ সরল ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, যে সে ফাঁদে পড়িয়াছে, কান্নাকাটিতে বা চেঁচামেচিতে কোন ফল হইবে না। নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া বিশ্বম্ভর-বাবুকে বলিল, আমার কি সৌভাগ্য!

কেন?

আমি কদিন থেকে মনে মনে ঠিক যে কথাটি ভাবছি, তাই আপনি আজ আমাকে বললেন।

তুমি বলনি কেন?

মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, জানেন না?

জানি বই কি। বয়স কি কম হয়েছে?

বৌদি বুঝি আপনাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

তাঁর কথা আর মুখে এনো না। আমার সব সম্পত্তি শ্রীবাবার পায়ে দানপত্র লিখে সমর্পণ করেছি।

কোন স্কুলে, বা কলেজে, বা সরকারী হাসপাতালে দান করলেন না কেন? ওই তো রামকৃষ্ণ মিশনের বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে, তাতেও দিতে পারতেন?

কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্কুল কলেজ বা হাসপাতালের চেয়ে অনেক উপরে। তাছাড়া এই তাপিত-কুঞ্জ, এই তুমি—

হিঃ হিঃ, আপনি ভারি দুষ্টু। মাথায় দেখি একটি ছয়-বাই-পাঁচ টাক, এখনো বেশ সখ আছে।

তোমার রূপ দেখলে মুনি ঋষির মন গলে যায়। আমি তো কোন ছার!

হিঃ হিঃ।

অণিমা একটু বিশ্বেম্ভরবাবুর চকচকে টাকে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর বলিল, এখন যাই, কাপড়-চোপড় ছাড়িগে। তারপর আবার শ্রীবাবার ওখানে না গেলে হবে না।

এই কথা বলিয়া অণিমা প্রায় দৌড়িয়াই নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং অবসর বুঝিয়া, শ্রীবাবার উপঢৌকন একটি ছোট পার্স, একটি শাড়ী ও একটি সায়া বগলে করিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কুঞ্জের দরোয়ান সঙ্গে চলিল।

পথে একটি ডাকঘরে গিয়া ছয় পয়সার একখানা এনভেলপ কিনিয়া ধীরেন্দ্রকে পত্র লিখিল—

প্রিয়তম,

অদ্য হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ধর্মসভায় আসিবে। অন্যথা না হয়। তোমারই অণিমা।

শ্রীবাবার কাছে গিয়া বলিল, বাবা, আমার বড় সাধ, কয়দিন আপনার কাছে থেকে আপনার সেবার সৌভাগ্য লাভ করি।

শ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন, বেশ, বেশ।

এখন হইতে অণিমা আধুনিকা দেবীর বেশে কুসুমেশ্বরী, কনকেশ্বরী ও হীরকেশ্বরীর সহিত শ্রীবাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

প্রতি সভার শেষের দিকে যখন উক্ত তিন দেবীর কর্তব্য শেষ হয়, তখন অণিমা ধীরে ধীরে আসেন সভায় তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য লইয়া। খালি হাত, খালি গলা, পাড়হীন রঙীন সাড়ী, পায়ে সাদা সাণ্ডাল, হাতে একটি সুদৃশ্য ব্যাগ ঝুলাইয়া আধুনিকা অণিমা দেবী ধীরে ধীরে আসেন শ্রীবাবার পায়ের কাছে, এবং ব্যাগের ভিতর হইতে একটি প্ল্যাটিনামের মূল্যবান্ সিগারেটের কেস বাহির করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শ্রীবাবার সম্মুখে ধরেন এবং শ্রীবাবা নির্লিপ্তভাবে মুখে চাপিয়া ধরেন। তারপর একটি কলের দেশলাই টিপিয়া আগুন বাহির করিয়া অণিমা দেবী শ্রীবাবার মুখের কাছে ধরেন, শ্রীবাবা তাহা হইতে সিগারেট ধরাইয়া লন। তারপর অণিমা দেবী ধীরে ধীরে সভা হইতে অপসৃত হন।

ধীরেন্দ্র সভায় আসে, পিছনের দিকে বসে, স্ত্রীর চিঠিখানা বুকপকেটে রাখে, কোন কথা বলে না।

অণিমার অনুপস্থিতিতে অধীর হইয়া বিশ্বম্ভরবাবু একদিন সভায় আসেন, অণিমাকে শ্রীবাবার চতুর্থী দেবীরূপে দেখেন, কোন কথা বলিবার সুযোগ বা সাহস পান না। নীরবে দিন গণিতে থাকেন।

ধীরেন্দ্রও নীরবে দিন গণিতে থাকে।

৪

একদিন সভার শেষে অণিমা নিজের কর্তব্য শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া না গিয়া শ্রীবাবার একটু পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। সভান্তে ভক্তবৃন্দ যখন প্রণাম করিবার জন্য এবং প্রণামী দিবার জন্য শ্রীবাবার কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া অণিমা ধীরেন্দ্রর হাতে একটু চাপ দিয়া সভার বাহিরে যাইবার পথের দিকে পা বাড়াইল। ধীরেন্দ্রও অনুসরণ করিল। জোরে পা চালাইয়া তাহারা বড় রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িল এবং ভাগ্যক্রমে একখানি খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। উহারা যখন সভার দ্বার পার হইতেছিল, তখন শ্রীবাবার শ্যেনদৃষ্টি তাহারা এড়াইতে পারে নাই। অথচ প্রণামরত ভক্তের ভীড় ঠেলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করাটাও অশোভন। একটু পরেই তিনি বিশ্বস্ত দুইটি ভক্তকে উহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। দুইজন বলিষ্ঠ ভক্ত ছুটিল তাহাদের পশ্চাতে। যখন তাহারা বড় রাস্তায় পৌছিল, তখন লোকমুখের বিবরণ শুনিয়া বুঝিতে পারিল, বহুক্ষণ পূর্বেই তাহারা ট্যাক্সিতে চলিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া শ্রীবাবার ভি-এইট লইয়া পশ্চাদনুসরণ করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না।

অণিমা যখন বাড়ী পৌছিল, তখন তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর একটু শান্ত হইলে ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি বল ত? কোথায় ছিলে এতদিন? আবার ফিরেই বা এলে কেন?

অণিমা অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

ধীরেন্দ্র বলিল, ভগবানের অসীম দয়া যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি।

অণিমা বলিল, ভগবানের দয়া শুধু নয়।

তবে?

তোমার ভালবাসা।

তাই নাকি?

যাও!

দুপুর রাত্রে সহসা অণিমা অ্যাঁ—বলিয়া ভীষণ একটা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। চীৎকার এত জোরে যে পাশের ঘর হইতে বড়দিদি ছুটিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল? ব্যাপার কি?

ধীরেন্দ্র বলিল, কিছু নয়, বোধ হয় স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে। তুমি শোও গে যাও।

বড়দিদি চলিয়া গেলেন। আলো জ্বালিয়া, অণিমার চোখে মুখে জল দিয়া, পাখার বাতাস করিয়া একটু শান্ত করিয়া ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে?

অণিমা বলিল, একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

কি স্বপ্ন?

অণিমা বলিল, দেখলুম যেন একপাল গরু, গাধা, ভেড়া আর ছাগল সার্ট, পাঞ্জাবী, প্যাণ্ট, কোট, এই সব পরে এক যায়গায় জড় হয়েছে, শ্রীবাবা একটা ধামা থেকে দুটো দুটো দুর্বা তুলে খেতে দিচ্ছেন, ওরা তাই চিবুচ্ছে আর লেজ নাড়ছে। হঠাৎ একটা গরু দুটো বড় বড় শিং বাঁকিয়ে আমাকে তাড়া করেছে—

ধীরেন্দ্র বলিল, যত সব বিতিকিচ্ছে স্বপ্ন! এখন চুপ করে শুয়ে ঘুমোও।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রুশ-শিল্পে প্রাকৃতিক-দৃশ্য চিত্রণে লেভিয়াতান সে-যুগে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁর আঁকা 'সোনালী শরৎ' (The Golden Autumn) চিত্রখানি অপরূপ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সব কুশলী রুশ-শিল্পীরা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে সেরোভের নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত সে যুগের সুপ্রসিদ্ধা ওদেশী-অভিনেত্রী ইয়েরমোলোভা, এবং তখনকার আমলের ধনী গার্শমান্-পত্নীর অপরূপ প্রতিকৃতি-চিত্র দু'খানি আজ রুশ-শিল্পের বিশিষ্ট সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এছাড়া সেকালের নিকোলাস্ রোয়েরিক, ভ্রুবেল্, শার্লিয়ানিস্, গ্রাবার, নেস্তারভ্ প্রমুখ কুশলী-শিল্পীবৃন্দের অসামান্য রূপ-সৃষ্টির প্রতিভায় রাশিয়ার শিল্প-কলা সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। এতকাল রুশ-দেশে বাস্তব ও কাল্পনিক ভাবধারার সমন্বয়ে চিত্র-রচনার যে রীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল, উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটে। সে যুগে ফরাসী-দেশে প্রগতিশীল শিল্পীদের মধ্যে চিত্র-রচনার চিরাচরিত রীতি বর্জ্জন করে নব-প্রবর্ত্তিত 'ইম্প্রেশনিষ্ট' (Impressionist) ও 'স্যুর-রিয়েলিষ্ট' (Sur-realist) ছাঁদের অভিনব সাঙ্কেতিক-পন্থা অবলম্বনে শিল্প-সাধনার যে প্রবল বিপ্লব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তারই উত্তাল ঢেউ এসে লাগে রাশিয়ার তৎকালীন শিল্পীবৃন্দের মনে। তার ফলে, রুশীয় শিল্প-জগতেও প্রাচীন ভাবধারা-আদর্শের আমূল-রূপান্তর ঘটিয়ে নূতন ছাঁদে বিচিত্র সাঙ্কেতিক-পন্থা অবলম্বন করে চিত্র-রচনার রেওয়াজ সুরু হয়। রাশিয়ার এই সব শিল্প-বিপ্লবীদের মধ্যে আনেন্কভ্, এক্সটার, গোন্তচারোভার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে রুশ শিল্প-জগতে চিত্র-রচনার ভাবধারা-পদ্ধতিতে বিপ্লব দেখা দিলেও বাস্তব, কাল্পনিক এবং প্রতিকৃতি চিত্রণের স্রোত অব্যাহত থাকে ঠিক আগেকারই মত…'ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারী'তে রাখা—ইউয়োন্, সোকোলভ্, বাক্‌শিয়েভ্, বিয়ালিনিৎস্কী-বিরুলিয়া, পেত্রোভিশেভ্, তুর্ঝানস্কী প্রমুখ শিল্পীদের রচিত বিচিত্র প্রাকৃতিক-দৃশ্যের প্রতিলিপি, মাল্যিউটিন, মেশকভ্, কোস্টোডিয়েভের অঙ্কিত বিভিন্ন প্রতিকৃতি-চিত্র, গোলুব কিনা, কোনেন্কভের গঠিত অপরূপ ভাস্কর্য্য-নিদর্শন ও অস্ত্রৌমোভা লেবেডিয়েভা কৃত অভিনব নক্সা-খোদাই কারুকার্য্যাবলী সে-যুগের শিল্পোন্নতির সবিশেষ পরিচয় দেয়।

বল্‌শেভিক্-বিপ্লবের সময়, দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মত রাশিয়ার শিল্প-জগতেও 'জার্'-আমলের প্রাচীন ধারাকে ভেঙে সোভিয়েট-যুগের নবীন আদর্শকে গড়ে তোলার আগ্রহে বহু ওলট-পালট ঘটে। বিপ্লবে জয়লাভের পর, রাশিয়ার উত্তেজিত জন-সাধারণ উদ্দাম-

রুশ-শিল্পী কোডোটভের অঙ্কিত—'স্বামীহারা বিধবা' চিত্রের প্রতিলিপি

আক্রোশে দেশের রাজ-পরিবার ও ধনী-অভিজাতবর্গের সৃজিত পুরোনো সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সব কিছু বিলুপ্ত করার নেশায় অতীতের অনেক কিছু ভাল-ভাল শিল্প-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। ক্ষুব্ধ-জনতার এই ব্যাপক-যথেচ্ছাচারীতার ফলে, রুশ-রাজ্যের বহু প্রাচীন-ঐতিহাসিক প্রাসাদ, গীর্জ্জা, মঠ-মন্দির, চিত্রশালা,

যাদুঘর এবং সেকালের অভিজাত-রাজন্যবর্গের সঙ্কলিত অনেক অমূল্য সব শিল্প-সম্পদও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হয়। তবে সোভিয়েট সরকারের সুব্যবস্থার ফলে রুশ-জনসাধারণের এই উচ্ছৃঙ্খল-অরাজকতা দেশে বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। গণ-বিক্ষোভ শান্ত হবার পর, ১৯২৫ সালে রাশিয়ার 'ক্যাম্যুনিষ্ট' দলের কেন্দ্রীয়-পরিষদের নির্দ্দেশানুসারে সোভিয়েট সরকার দেশের জন-সাধারণের হাত থেকে শিল্পকলা ও সাহিত্য চর্চ্চার অবাধ-স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে 'র‍্যাপ' (RAPP) 'ভোয়াপ' (VOAPP) নামে গণ-কৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের বিচিত্র-অভিনব প্রতিষ্ঠান রচনা করে রাজ্যের অধিবাসীদের মনে ক্রমে-ক্রমে 'কমিউনিজম্'-মতবাদের প্রতি বাধ্যতা-অনুরাগ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালান। এই বিধানের ফলে রাশিয়ার শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সে-যুগে নিজস্ব মতামত-বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিয়ে 'RAPP' এবং 'VOAPP' প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ-অনুসারে শুধুমাত্র রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য-সাধনের স্বার্থে সাহিত্য-কলার প্রত্যেকটি বিষয় রচনা করতে হতো। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সে-যুগে লেখক বা শিল্পীর রচনা, হয় বাজেয়াপ্ত, নয় তো বা চিরদিনের মতই অপ্রকাশিত থেকে যেতো। এমনি ফরমাস্-মাফিক শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ফলে সে-আসলে, রুশ চিত্রকলাবিদ্ ও সাহিত্যিকদের রচনাবলী দিন-দিন এমনই প্রাণহীন-অসার হয়ে দাঁড়ায় যে শেষে দেশের জনসাধারণও বিরক্ত হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানায়। অনন্তর, ১৯৩২ সালে বিশেষ আইনের বলে, সোভিয়েট সরকার 'RAPP' ও 'VOAPP' প্রতিষ্ঠান দুটিকে তুলে দিয়ে, রাশিয়ার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আবার নিজেদের ইচ্ছামত রূপ-রচনা করার অবাধ-স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন।

বল্‌শেভিক্-বিপ্লবের আমলে রাশিয়ার শিল্পীরা যে সব শিল্প-রচনা করেছিলেন—সেগুলির বেশীর ভাগই হলো—ওদেশের সমসাময়িক-জীবনের প্রতিচ্ছবি। সে-যুগের বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ব্রোদ্‌স্কী আর চেপ্‌টসভ্ রুশ-দেশে পরম সমাদর লাভ করেছেন। ব্রোদ্‌স্কীর আঁকা-'স্মোল্‌নী-প্রাসাদে লেনিন' (Lenin in Smolny) এবং চেপ্‌টসভে রচিত—'গ্রামের বৈঠক', (Meeting of the Village Nucleus) চিত্র দু'টিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে-যুগের বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। এই ছবি দু'খানি শুধু 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালাতে নয়, রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসেও আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া স্বনামধন্য-শিল্পী গ্রেকভের অঙ্কিত—'তাচান্কা' (Tachanka), 'কুবানের উদ্দেশ্যে' (To the Kuban) এবং 'বুদিন্নির অভিমুখে' (To the Budenniy) চিত্রগুলিতে আভাস পাওয়া যায়—রুশ-দেশের 'মেন্‌শেভিক্' আর 'বল্‌শেভিক্' দলের মধ্যে ঘরোয়া-যুদ্ধের ইতিহাসের। রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর-যুগের শিল্প-নিদর্শনগুলিতে পরিচয় মেলে—দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েট রাজ্যের অধিবাসীদের সক্রিয়-প্রচেষ্টার বিবিধ বিচিত্র প্রসঙ্গের··· রাশিয়ার কৃষক, শ্রমিক, ফশলের ক্ষেত, কল-কারখানা, কলের লাঙ্গল, ট্রাক্টর, যৌথ-খামার, পাঠশালা প্রভৃতি বাস্তব-জীবনের এমনি নানান্ সব বিষয়! আধুনিক রুশ-শিল্পী প্লাসটভের অঙ্কিত—'যৌথ-খামারে ছুটির দিন' (Collective Farm Holiday), 'ঘোড়াদের স্নান করানো' (Bathing the Horses) এবং 'যৌথ-খামারের পশুপাল' (The Collective Farm Herd) চিত্রগুলিতে অপরূপ-সুষমায় প্রতিফলিত হয়েছে ওদেশের নূতন সমাজ-রচনার অভিনব রূপ।

সুপ্রসিদ্ধ রুশ-শিল্পী রেপিনের রচিত চিত্র—'জাপোরোঝর কশাকের দল

রাশিয়ার আধুনিক-যুগের সেরা শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম হলেন—জেরাসিমভ্। (সম্প্রতি কিছুকাল আগে ইনি এসেছিলেন ভারতবর্ষ সফরে।) এঁর আঁকা—'ক্রেমলিন্-প্রাসাদে স্টালিন্ ও ভোরোশিলভ্' চিত্রখানি আজ রাশিয়ার শিল্প-ইতিহাসের এক অপরূপ সম্পদ। এছাড়া সমসাময়িক-ঘটনাবলীর বাস্তব-রূপদানের অপূর্ব্ব নিদর্শন হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—গত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের বিষয় অবলম্বনে রচিত রুশ-শিল্পী প্লাসটভের আঁকা—'একখানি জার্ম্মাণ জঙ্গী-বিমান উড়ে গেছে' (A German Plane Passed by) এবং গ্যাপোনেঙ্কো চিত্রিত—'জার্ম্মাণদের বিতাড়নের পর' (After the Expulsion of the Germans) ছবি দু'খানির কথা।

'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালায়, আধুনিক সোভিয়েট-শিল্পীদের আরো যে সব অপরূপ চিত্রাবলী নজরে পড়ে, তার মধ্যে উক্রাইনের বিশিষ্ট-চিত্রকারিণী ইয়াব্‌লন্‌স্কায়া রচিত 'শস্য' (Grain), খিরগিজিয়া-

অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা কলাবিদ্ চুইকভের আঁকা 'আমাদের দেশের সকাল' (Morning of Our Homeland) এবং সুপ্রসিদ্ধ আর্মেনীয়-চিত্রকর সারিয়ানের আঁকা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলি বিশেষভাবে দর্শকদের মন ভরে তোলে। এছাড়া ওদেশের তরুণ-শিল্পী নেপ্রিন্তসেভের রচিত—'যুদ্ধান্তে বিশ্রাম' (Resting after Battle) ছবিটিতে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীদের বিষয় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এই সব চিত্রাবলী ছাড়া 'ট্রেটিয়াকভ্'-চিত্রশালার সুপ্রশস্ত দালানে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে—সোভিয়েট ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিচিত্র-অপরূপ সব নিদর্শন। এগুলির মধ্যে ওদেশের সুবিখ্যাত ভাস্কর আন্দ্রেইয়েভের গড়া লেনিনের, এবং মার্কুরভ্ ও টম্স্কী রচিত স্তালিনের সুবিরাট প্রতিমূর্ত্তি দু'টি সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া খ্যাতনামা ভাস্কর মুখিনার গঠিত 'ক্রাইলভ' প্রতিমূর্ত্তিটি রুশ ভাস্কর্য্য-শিল্পের অন্যতম অমূল্য সম্পদ।

এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিত্রশালার বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষ-অঙ্গনে ঘুরে বেড়িয়ে সোভিয়েট শিল্পকলাকৃষ্টির মোটামুটি পরিচয় সংগ্রহের পর 'ট্রেটিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারীর' মহিলা-অধ্যক্ষার কার্য্যালয়ে ফিরে আসতেই তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন, তাঁর ঘরের কাছেই তালা-আঁটা মজবুত লোহার দরজা বসানো আর একটি সুবিশাল প্রদর্শনী-কক্ষে। শুনলুম, চিত্রশালার এই সুরক্ষিত-কক্ষে সঞ্চিত রয়েছে রুশ দেশের আদিম যুগের সোনা-রূপা এবং বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী বিচিত্র অলঙ্কারাদি, প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রহ, 'জার্-শাসকদের আমলের অভিনব ঐতিহাসিক রত্ন-সম্ভার এবং অতীতের এমনি আরো সব নানান্ বহুমূল্য সম্পদ! প্রাচীন রত্নাগার বলেই, এ কক্ষটি এমন সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত! শুনলুম, এ মণিকোঠায় প্রবেশের জন্য চিত্রশালার কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন এবং কক্ষের ভিতরে যাবার আগে এবং আসবার পরে প্রত্যেকটি আগন্তুককেই রীতিমত তল্লাসী করে দেখা হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের কাউকেই অবশ্য তল্লাসীর হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি অতটুকু!

ঘরের দরজা তালাবদ্ধ ছিল···চিত্রশালার অধ্যক্ষা স্বয়ং চাবি দিয়ে কুলুপ খুললেন। পরম কৌতুহলে তাঁকে অনুসরণ করে আমরাসদলে সে-কক্ষে প্রবেশ করলুম।

বিরাট প্রদর্শনী-কক্ষের চারিপাশে ছোট-বড় নানান্ সব সুরক্ষিত কাঁচের আধারে সযত্নে সাজানো রয়েছে—ওদেশের আদিম শিল্প-কলার বহু বিচিত্র নিদর্শন। ট্রেটিয়াকভ্-চিত্রশালার অধ্যক্ষা পরম আগ্রহে আমাদের সোৎসুক-দৃষ্টির সামনে একে-একে মেলে দিলেন—খৃষ্টপূর্ব্ব হাজার-দু'হাজার, সাতশো-আটশো, তিন-চারশো বছর আগেকার একরাশ দুর্লভ প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, মূর্ত্তি-কারুকার্য্য আর অস্ত্র-শস্ত্রের অভিনব ঐতিহাসিক-সম্পদ। এগুলির অধিকাংশই দেখলুম, সোনা, রূপো, তামা আর ব্রোঞ্জ ধাতুতে গড়া···সেকালের সামাজিক রীতি আর দৈনন্দিন-জীবনের বিবিধ বিষয়ের বিচিত্র নক্সা-চিত্রে বিভূষিত! ওদেশের এই সব প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনরাজির অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে মুদ্রা, অলঙ্কার আর তৈজসপত্রাদি রচনার পদ্ধতিতে ভারতের অতীত কলা-কৃষ্টির ছাপ সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। এমনি দৃষ্টান্ত থেকেই ওদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজকাল অনুমান করেন যে, প্রাচীন আমলে আমাদের দেশের সঙ্গে ওদেশের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠতা কতখানি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে, অধ্যক্ষার মুখে শুনলুম—ওদেশের অনুসন্ধানী-প্রত্নতাত্ত্বিকের দল কি অসীম অধ্যবসায়ে সোভিয়েট-রাজ্যের ককেশাস্, উরাল্, আল্তাই পার্ব্বত্য-প্রদেশ এবং উক্রাইন্ অঞ্চলের ভূমি-গর্ভ থেকে সযত্নে আহরণ করে এনেছেন—অতীতের এই সব অমূল্য শিল্প-সম্পদ।

প্রাচীন আমলের এ-সব নিদর্শন ছাড়া চিত্রশালার এই বিচিত্র মণি-কোঠায় রাশিয়ার বিভিন্ন 'জার্'-শাসকদের যে সব ঐতিহাসিক রত্ন-মাণিক্য আর বহুমূল্য শিল্প-কারু সম্ভার সুরক্ষিত রয়েছে—সেগুলি দেখবার পর আমরা সদলে অধ্যক্ষার সঙ্গে এগিয়ে গেলুম প্রদর্শনী-কক্ষের অপর প্রান্তে। সেখানে পৌঁছুতেই তিনি সাগ্রহে আমাদের কৌতুহলী-দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন—ওদেশের মধ্যযুগীয় শিল্প-কারুকলার একরাশ অভিনব-বিচিত্র নিদর্শন। এ-সব নিদর্শনরাজির বেশীর ভাগই হলো, সেকালের বিভিন্ন রুশ-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের, রাজানুগৃহীত অভিজাত-অমাত্যবৃন্দ এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ধনীদের সৌখীন বিলাস-আড়ম্বরের বিবিধ উপকরণ···সোনা আর রূপোতে গড়া হরেক রকমের দামী-দামী মণি-মুক্তা-পাথর বসানো বা রঙীন মীনাকারী নক্সায় শোভিত নানা ছাঁদের নানান্ সব গহনা-অলঙ্কার, আয়না, চিরুণী, পাউডারের কৌটা, আতর-দানী প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী, গেলাস, থালা, বাটি, পানপাত্র, ফুলদানী প্রভৃতি তৈজস-পত্র, দোয়াত-কলম, রত্ন-পেটিকা, ঘড়ি, চেন, নস্যদানী, বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ছাতা-লাঠির বাঁট, বন্দুক-পিস্তল-তরোয়ালের খাপ আর হাতল, এমনি আরো কত সব অপরূপ শিল্প-কারু সংগ্রহ! বলা বাহুল্য, এ সব শিল্প-সংগ্রহগুলির প্রত্যেকটি ওদেশের শিল্পী-কারুকারদের হাতে-গড়া।

পরম আগ্রহে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে ট্রেটিয়াকভ্-চিত্রশালার এই সব অভিনব শিল্প-সম্পদ দেখবার পর, অধ্যক্ষার সাদর-আহ্বানে আমরা সদলে আবার ফিরে এলুম তাঁর কার্য্যালয়ে। সেখানে আমাদের আপ্যায়ন ও ক্লান্তি-অপনোদনের উদ্দেশ্যে চিত্রশালার অন্যান্য কর্ম্মীরা ইতিমধ্যেই কফি, চা, লেমোনেড, ফলের সরবৎ এবং কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করে রেখেছিলেন। ওদেশের এবং আমাদের দেশের শিল্প-কলার বিষয়ে নানান্ আলাপ-আলোচনার মাঝে জলযোগের পালা শেষ করে, ট্রেটিয়াকভ্-চিত্রশালার কর্ম্মীবৃন্দের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফেরার সময় ওখানকার অধ্যক্ষা বিরাট একটি বাঁধানো খাতা সামনে মেলে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করে যাবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা সকলেই সানন্দে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত লিখে দিলুম চিত্রশালার খাতার পাতায়। তারপর চিত্রশালার অধ্যক্ষা এবং কর্ম্মীদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা যখন বাইরে পথে বেরিয়ে এলুম—তখন দেখি বিকালের রক্তিম রোদের আভার বদলে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে বাদলের ধূসর-কালো মেঘে···সহরের বুকে আমাদের দেশের 'ইল্শে গুঁড়ি' ধারার মত ঝির্ ঝির্ করে নেমেছে ওদেশী হৈমন্তী তুষার-বর্ষণের (Autumn Shower) জের। সহচর সোভিয়েট-বন্ধুদের মুখে শুনলুম—হেমন্তের এই গুঁড়ি-গুঁড়ি তুষার বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ওদেশে জাগে দুরন্ত শীতের আগমনী-আভাস।

বাইরে পথে বেরুতেই কন্‌কনে বাদ্‌লা-বাতাস আর অবিশ্রান্ত তুষার-পাতের ছিটে-ফোঁটায় রীতিমত শিহরণ জাগলো আমাদের দেহে-মনে। চিত্রশালার প্রবেশ-পথের সামনেই মোতায়েন ছিল আমাদের মোটর-যান··· গাড়ীতে চড়ে বসতেই, মোটরের চালক তৎপর-আগ্রহে গাড়ীর আভ্যন্তরিক 'উষ্ণ তাপ নিয়ন্ত্রক' (Heating System) যন্ত্রটিকে চালু করে দিয়ে আমাদের নিয়ে সোজা পাড়ি জমালেন 'স্তাভয় হোটেলের' পানে। গাড়ীর গরম-আওতায় আরামে গদীয়ান হয়ে, কাঁচের সার্সী আঁটা জানলার বাইরে উৎসুক-দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে হৈমন্তী-বর্ষণ-সিক্ত মস্কো-রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এগিয়ে চললুম আমরা। তুষার-গলা জলে সহরের পথ-ঘাট সব প্যাচ্‌প্যাচে-কর্দ্দমাক্ত···সে-অসুবিধা অগ্রাহ্য করে ওদেশের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ লোকজন সবাই ছাতা আর বর্ষাতি-বস্ত্রে অঙ্গ ঢেকে, পায়ে রবারের লম্বা 'গ্যালোশ্' জুতা এঁটে যে যার নিজের কাজে পথে হেঁটে চলেছে···ট্রাম আর বাস লোকের ভীড়ে ভরপুর···ট্যাক্সী ও মোটর-গাড়ী ছুটেছে অবিশ্রান্ত-স্রোতে···চারিদিকেই জেগেছে বর্ষার ব্যাকুল ব্যস্ত-সমস্ত ভাব!

ক্রমশঃ

নরেন্দ্র দেব

(নিবেলুঙ্গেদের স্বর্ণাঙ্গুরী)

(পূর্বানুবৃত্তি)

সিগফ্রেড চলে যাবার পর থেকে ক্রনহাইলদের দিন যেন আর কাটতে চায় না। নিজেকে সে যেন বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলো। অথচ, অজেয় বীর সিগ্‌ফ্রেডকে নারীর বাহুবন্ধনে বন্দী করে রাখারও সে পক্ষপাতী নয়। বীরজায়ার কর্তব্য পতিকে নব নব দিগ্বিজয়ে উৎসাহিত করে যশের পথে, খ্যাতির চূড়ায়—এগিয়ে দেওয়া। ক্রনহাইলদে তাই করেছে। স্বামীকে সে আপনহাতে সাজিয়ে বিশ্বজয় যাত্রায় পাঠিয়েছে। কিন্তু, তবু সিগ্‌ফ্রেডের জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠছে যেন। যতদিন যায় নির্জনে সে একা বসে বসে ভাবে সিগ্‌ফ্রেড তার নব নব জয় মাল্য কণ্ঠে নিয়ে কবে ফিরে আসবে তার কাছে?

স্বর্গের কথা সে ভুলে গেছে। 'ওয়ালহাল্লার' স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গেছে। সে যে স্বর্গের—সমরকুশলা রণরঙ্গিণী রমণীদের একজন এও সে বিস্মৃত হয়েছে। তার সমস্ত অন্তর জুড়ে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এখন সেই ভয়ডরহীন দুঃসাহসী বীর সিগ্‌ফ্রেডের অনন্যসাধারণ বীরত্ব গাথা। মনের এমনি এক কাতর অবস্থায় একদিন ক্রনহাইলদে বসে বসে যখন সিগ্‌ফ্রেডের কথাই ভাবছে—হঠাৎ তার কানে এল যেন দূর থেকে কোনও রণরঙ্গিণী রমণীর সমর-নিনাদ শোনা যাচ্ছে। সে কানপেতে শুনতে লাগলো। হাঁ, ঠিকই ত! ওইযে 'হোই হো!—হো হো হো!' আওয়াজ বেশ স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। তখন ক্রনহাইলদে কৌতুহলী হ'য়ে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে চেয়ে দেখলে আকাশের মেঘ ভেদ করে তাদেরই এক রণরঙ্গিণী বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। নিমেষের মধ্যে কাছে এসে পড়লো সে। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ক্রনহাইলদেকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

ক্রনহাইলদে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—'তুমি কোন্ সাহসে আমার কাছে এলে? দেবরাজ ওটান তোমার ওপর অপ্রসন্ন হবেন। তুমি তো জানো আমি তাঁর অবাধ্য হয়ে স্বর্গ ত্যাগ করে এসে এখানেই রয়ে গেছি।'

সঙ্গিনী হেসে বললে—"সে ভয় আর নেই! দেবরাজের রাজদণ্ড' মহাবীর সিগ্‌ফ্রেড ভেঙে দিয়ে যাবার পর থেকে তিনি বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। সদাই তাঁকে এখন চিন্তান্বিত দেখি। আমি তোমার কাছে কেন এসেছি শোনো? ওটান বলেছেন, তুমি যদি রাইনকন্যাদের স্বর্ণাঙ্গুরীটি স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দাও, দেবরাজের অভিশাপ থেকে তুমি মুক্তি পাবে এবং স্বর্গরাজ্যও নিরাপদ হবে।"

"কিন্তু, আমি তো এ আংটি ফেরত দিতে পারব না।" ব[illegible] ক্রনহাইলদে আংটি-পরা আঙুল সমেত তার হাতখানিকে নিজের বু[illegible] উপর পরম আদরে চেপে ধরলে। বললে, "এ যে আমার সিগফ্রে[illegible] প্রেমের প্রতীক! এ আমাদের মিলনের অমূল্য স্মরণিকা! আমি এ আংটি সযত্নে রাখবো বলে তাকে কথা দিয়েছি?"

সঙ্গিনী বললে—"কিন্তু, স্বর্গরাজ্য 'ওয়ালহাল্লা'কে' বাঁচাবার এক[illegible] উপায় যে ওই রাইন নদীর স্বর্ণাঙ্গুরীটি! স্বর্গের মঙ্গলের জন্য তুমি এ[illegible] ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না?"

ক্রনহাইলদে বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—"স্বর্গ থাক আর যাক তা[illegible] আমার কি আসে যায়? আমি তো অনেকদিন হল স্বর্গ ছেড়ে চলে এসে[illegible] আমার সঙ্গে স্বর্গের আর কোনও সম্বন্ধ নেই! সিগ্‌ফ্রেডের প্রেম আমা[illegible] যে স্বর্গের সন্ধান দিয়েছে তার তুলনায় তোমাদের স্বর্গকে আমি তুচ্ছ জ[illegible] করি। ওয়ালহাল্লার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান আমার সিগ্‌ফ্রে[illegible] প্রেম! নারী জীবনে এর চেয়ে বড়—এর চেয়ে প্রিয়—আমার কা[illegible] আর কিছু নয়। ওটানকে আমি কিছুতেই এ আংটি দিতে পারবো ন[illegible] তুমি ফিরে যাও ভাই তাঁর কাছে। বলো গে তাঁকে আমার কথা[illegible] বুঝিয়ে।"

"বেশ! আমি তবে চললুম। কিন্তু, জেনে রাখো যে—তোম[illegible] জন্যই স্বর্গের সর্বনাশ হবে এবং আমাদেরও দুর্দশার কারণ হবে তুমিই[illegible] এই কথা বলে সেই রণরঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘোড়ার পিঠে চড়ে মুহূর্তের ম[illegible] মেঘের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রনহাইলদে সঙ্গীনীর এ সব কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হল না[illegible] হাতের সেই আংটিতে সোহাগভরে অধর স্পর্শ করে সিগ্‌ফ্রেডের চিন্তা[illegible] বিভোর হয়ে রইল।

সহসা সে অদূরে এক শৃঙ্গধ্বনি শুনে চমকে উঠে দাঁড়ালো। [illegible] তার প্রিয়তম সিগ্‌ফ্রেডের ভেরিনাদ। তবে কি এতদিনে তার সিগফ্রে[illegible] ফিরে এল তার কাছে?

ক্রনহাইলদে ছুটে গেল একেবারে পর্বত শৃঙ্গের কিনারার কাছে[illegible] আগুনের বেড়া যেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছিল—তার চার ধারে সেই পর্ব[illegible] শৃঙ্গ ঘিরে। হঠাৎ সে দেখলে আগুনের বেড়া দু'ভাগ হয়ে গিয়ে যেন কা[illegible] আসবার পথ করে দিলে। কে যেন আসছে তার কাছে। ক্রনহাইলদে দূর থেকে তাকে দেখে সিগফ্রেড মনে করে আনন্দে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো—সিগফ্রেড! সিগফ্রেড! প্রিয়তম! এতদিনে কি মনে পড়লো

তোমায় অভাগিনী ক্রনহাইলদেকে ? কিন্তু পরক্ষণেই সে সভয়ে পিছিয়ে এল ! নানা, এত তার প্রিয়তম সিগফ্রেড নয় ! এ কে ? মাথায় কিন্তু সিগফ্রেডেরই সেই যাদুশক্তিসম্পন্ন স্বর্ণমুকুট রয়েছে। সভয়ে বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করলে—"কে তুমি ? কোন সাহসে তুমি এখানে এলে ? জানো না কি একমাত্র নির্ভীক বীর ভিন্ন আর কেউ এ অনল বেষ্টনী ভেদ করে এখানে আসতে পারে না ?"

সিগফ্রেডেরই বর্মচর্ম মুকুট ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মহারাজা গাস্থার হাসিমুখে বললেন —"ভয় নেই সুন্দরী ! আমার নাম গাস্থার ! আমিই এ প্রদেশের রাজ্যেশ্বর। তোমাকে আমার রাণী করব বলে নিতে এসেছি।

ক্রনহাইলদে বিরক্ত হয়ে বললে—"তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাও নির্বোধ ! আমি মহাবীর সিগফ্রেডের—বাগ্‌দত্তা পত্নী ! আমি অপর কারো রাণী হওয়া দূরে থাক্, সম্রাজ্ঞীও হতে চাই না।"

মহারাজ গাস্থার উচ্চহাস্য করে উঠে বললেন—"সিগফ্রেড ? তার বাগদত্তা পত্নী তুমি ? কি বলছো সুন্দরী ? তুমি কি উন্মাদ হয়েছ ? সিগফ্রেড তো আর একটি নারীকে নিয়ে উন্মত্ত। তাকেই বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে ! তুমি আমারই রাণী ! এস, আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

ক্রনহাইলদে এবার তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করে' উঠলেন—"দূর হয়ে যাও তুমি ! এ তোমার মিথ্যে কথা ! সিগফ্রেড একমাত্র আমারই ভাবীপতি। এই দেখ তার পরিচয় ! বিবাহের প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ স্বরূপ এই দিব্য-স্বর্ণাঙ্গুরী আমার অনামিকায় তিনি নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি চলে যাও এখান থেকে মিথ্যাবাদী।"

গাস্থার তবুও হাসিমুখে তার কাছে এগিয়ে আসছে দেখে ক্রনহাইলদে কঠিন-ভাবে তাকে নিষেধ করে বললে—"খবরদার ! আর এক পা অগ্রসর হলে তুমি বিপদে পড়বে। জানো কি তুমি এ আংটিমন্ত্রপূত ? এর সাহায্যে যা খুশী করা যায় ?"

গাস্থার একথা শুনে উপহাসের কণ্ঠে বললে—"তাই নাকি ? সত্যি বলছ তুমি ? তাহলে তো তোমার সঙ্গে তোমার ঐ আংটিটিও আমার চাই !" বলতে বলতে গাস্থার একেবারে ক্রনহাইলদের সামনে এসে খপ করে তার আংটি সমেত হাতখানি ধরে ফেললে এবং আঙুল থেকে অনায়াসে সেই রাইন নদীর মন্ত্রপূতঃ স্বর্ণাঙ্গুরীটি খুলে নিলে। তারপর সেই আংটি তাকে দেখিয়ে বললে—"কেমন ? এ যদি সত্যই মন্ত্রপূত আংটি হয় তবে এ আংটিও এখন আমার ! এই আংটির নামেই তোমায় আদেশ করছি তুমি এখন আমার পশ্চাদনুসরণ করো।"

রাইন নদীর সেই স্বর্ণাঙ্গুরী যথার্থই অতি অদ্ভুত যাদুশক্তিসম্পন্ন ছিল। অমন তেজস্বিনী রণরঙ্গিনী ক্রনহাইলদে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে শুড় শুড় করে পোষা বিড়ালের মতো মহারাজ গাস্থারের রূপ ও বেশধারী সিগ্‌ফ্রেডের পিছু পিছু চললো।

সিগ্‌ফ্রেড ক্রণহাইলদের কাছে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে

সিগফ্রেডকে সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন স্বর্ণমুকুট পরিয়ে কূটবুদ্ধি হাগেনই তাকে মহারাজ গাস্থারের রূপধারণ করে সেই পর্বত শিখরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। হাগেনের যাদু বলে সিগফ্রেডের নিজের পূর্ব কথা এখন

কিছুই স্মরণ নেই। সে এখন রূপসী রাজকুমারী গাড্রুনকে পাবার জন্ম পাগল হয়ে রয়েছে। হাগেন তাকে যা বলছে সে তাই করছে?

ক্রুনহাইলদেকে সেই প্রলয় অনল বেষ্টনী থেকে গান্থারবেশী সিগফ্রেড যখন বেশ অনায়াসে এবং নিরাপদে বাইরে নিয়ে চলে এল, ক্রুনহাইলদে বুঝলে আর তার কোনও প্রতিবাদই চলবে না। সে সিগফ্রেডের মতোই কোনও এক মহাশক্তিমান দুঃসাহসীর হাতে পড়েছে! সে তখন আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে "হায় দেবরাজ ওটান? আমি বুঝতে পারছি এ তোমারই অমোঘ দণ্ড। আমি তোমার অবাধ্য হয়েছিলুম! বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! আমায় তুমি ক্ষমা করো!"

সিগফ্রেড তার পূর্বজীবন এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সে ক্রুনহাইলদেকে দেখেও চিনতে পারলে না। দেবরাজ ওটানকে ডেকে ক্রুনহাইলদে যে কাতরোক্তি করলে তার কোনও অর্থ-ই সে বুঝতে পারলে না। ক্রুনহাইলদে নির্বিবাদে তার সঙ্গে চলে আসাতে সে ভারি খুশী হয়ে উঠেছে। সে তার স্বর্ণমুকুটের যাদুশক্তি, মন্ত্রপূত আংটির দেবত্বতার কথা সব ভুলে গেছে। তার মন শুধু এই উল্লাসেই তখন ভরে উঠেছে যে মহারাজ গান্থারের আকাঙ্ক্ষিত রাণী তাকে এনে দিতে পারলেই সে সুন্দরী গাড্রুনকে পত্নীরূপে পাবে।

গান্থার-বেশী সিগফ্রেড তখন চললো ক্রুনহাইলদেকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে। আকাশ ছোঁয়া সে উঁচু পাহাড়। পাথরে পাথরে পা ফেলে নামতে নামতে ক্রুণহাইলদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখে গান্থার-বেশী সিগফ্রেড তাকে একটি ঝর্ণার ধারে বিশ্রাম করতে বলে নিজে অন্য একদিকে চলে গেল।

হাগেনের ষড়যন্ত্রে এই রকম ব্যবস্থাই ছিল। সেই মনোরম ঝর্ণার ধারে নির্জন পাহাড়পুরে এইবার এসে দেখা দিলেন যিনি তিনি সত্যই মহারাজ গান্থার। সঙ্গে তার একটি সুন্দর ঘোড়া। গান্থার অতি মধুর সম্ভাষণে ক্রুনহাইলদেকে বললেন—"সুন্দরী! তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো! এস এইবার এই অশ্বপৃষ্ঠে, আমি তোমায় আরামে নিয়ে যেতে চাই আমার রাজ্যে।"

ক্রুনহাইলদে সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার দেহ মন দুই যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়েছে। সে পালিত মেষশাবকের মতো মহারাজ গান্থারের অনুরোধ অনুসারে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো। গান্থার তাকে আপন রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে চললো।

এদিকে সিগফ্রেড হাগেনের ব্যবস্থা মতো অন্যপথ দিয়ে চট করে প্রাসাদে ফিরে এসে গাড্রুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা ও ভাবি-রাণীর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হাগেন ইতিমধ্যে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে মোটেই চুপ করে বসেছিল না। সে ছুটেছিল সেই নিবেলুঙ সর্দার বামনাধিপতি আলবেরকের কাছে। তারা দুজনে পরামর্শ করে স্থির করে ফেললে যে রাইন নদীর সোনায় গড়া সেই মন্ত্রপূত আংটি যার কাছেই থাক সেটি যেমন করেই হোক হস্তগত করতেই হবে।

রাজকুমারী গাড্রুনকেও সে এমনভাবে অপিয়ে রেখেছিলে যে আগুনের পাহাড় থেকে সিগফ্রেড ফিরে এসে বিবাহের প্রস্তাব করলেই রাজকুমারী যেন তাতে সম্মতি দেন।

হ'লোও তাই। পাহাড় থেকে ফিরে আসবামাত্র রাজকুমারী গাড্রুনের কাছে ঐকান্তিক প্রীতি-সম্ভাষণ ও পরম সমাদরে অভ্যর্থনা পেয়ে মুগ্ধ হয়ে সিগফ্রেড তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে। গাড্রুন সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। উভয়ে পরস্পরের বাগদত্ত হয়ে যখন প্রথম চুম্বন বিনিময় করছেন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে ভেরী বেজে উঠে ঘোষণা করলে মহারাজ প্রাসাদে ফিরে এসেছেন।

হাগেন তখন সম্ভপরিণয়-প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ রাজকুমারী গাড্রুন ও মহাবীর সিগফ্রেডকে সঙ্গে নিয়ে তোরণ দ্বারে অগ্রসর হ'য়ে মহারাজ গান্থার ও তাঁর ভাবী রাজ্যেশ্বরীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

সিগফ্রেড মহারাজের করমর্দন করে বললে—"সুস্বাগতম্ বন্ধু! তোমার ঈপ্সিত রাণীকে তুমি জয় ক'রে আনতে পেরেছো দেখে আমার আর আনন্দ ধরছে না। আমিও তোমাকে এক সুসংবাদ দিচ্ছি ভাই—তোমার এই সুন্দরী ভগ্নিটি অবশেষে এই কুরূপের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে কৃপাপূর্বক রাজী হয়েছেন।"

সিগফ্রেডকে সেখানে দেখে ক্রুণহাইলদে চমকে উঠলো! ছুটে তার কাছে গিয়ে কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"সিগফ্রেড! প্রিয়তম! তুমি নাকি তোমার ক্রুণহাইলদেকে ভুলে আজ অন্য এক রূপসীর প্রণয়াসক্ত হয়েছো?"

সিগফ্রেড বিস্মিত হয়ে বলল—"কে তুমি উন্মাদিনী নারী? তোমাকে তো আমি চিনি না। আমি রাজকুমারী গাড্রুনকে ভালবাসি। তাকেই বিবাহ করবার জন্য আমি প্রতিশ্রুত।"

এ কথা শুনে ক্রুণহাইলদের সুন্দর মুখখানি একেবারে মৃতের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। মনে হল যেন তার সমস্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হচ্ছে। সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সিগফ্রেড ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে।

সিগফ্রেডের বলিষ্ঠ বাহু অবলম্বনে এলিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে ক্রুন-হাইলদে প্রশ্ন করলে—"সিগফ্রেড! প্রিয়তম আমার! তুমি কি সত্যই আমায় ভুলে গেছ?"

ক্রুণহাইলদের এই কাতরোক্তি সিগফ্রেডের হৃদয়তন্ত্রীর কোন এক কোমল পর্দায় যেন একটা তীব্র আঘাত করে উঠলো! কিন্তু, সিগফ্রেড তার সমস্ত অতীত জীবন বিস্মৃত হয়েছিল বলে কিছুতেই বুঝতে পারলে না—এ ব্যথা কিসের? ক্রুণহাইলদেকে নিকটস্থ একখানি আরাম-চৌকিতে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে সিগফ্রেড বেশ প্রশান্তকণ্ঠেই রাজাকে সম্বোধন করে বললে—"গান্থার! তোমার পত্নী হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে বন্ধু!"

গান্থারকে ব্যস্ত হয়ে ক্রুণহাইলদের কাছে ছুটে আসতে দেখে সিগফ্রেড তাকে বললে, "দেখুন! দেখুন! আপনার স্বামী আপনাকে কি রকম ভাল বাসেন! স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুনে বেচারা ছুটে দেখতে আসছে!"

সিগফ্রেড হাত বাড়িয়ে গান্থারের দিকে যখন অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাচ্ছে—ক্রুণহাইলদের চোখের সামনে [illegible] সিগফ্রেডের

আঙুলে সেই রাইন নদীর অভিশপ্ত স্বর্ণাঙ্গুরী! ক্রুণহাইলদে কাতর-কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—"ওই! ওই যে সেই আংটি! আমার সিগফ্রেডের আংটি! সে আমাকে ঐ আংটি নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল! ও আংটি আমার! তুমি—তুমি কোথায় পেলে এ আংটি? তুমি নিশ্চয় আমার সিগফ্রেড ভিন্ন আর কেউ নও! তোমার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী আমাকে বলছে—তুমি আমার সিগফ্রেড, আমার সিগফ্রেড তুমি!"

সিগফ্রেড রাজাকে বললে, "তোমার প্রিয়তমা রাণী নূতন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন দেখছি!" তারপর, কতকটা যেন নিজের মনেই হাতের সেই স্বর্ণাঙ্গুরীটির দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—"তাইত! এ আংটি কার? এ আমার হাতে কেমন করে এল? বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো! ও হোঃ! ঠিক হয়েছে! আমার এইবার বেশ মনে পড়ছে—কোথায় যেন একটা রাক্ষসকে মেরে আমি তার কাছ থেকে এই আংটি কেড়ে নিয়ে ছিলুম! কিন্তু কোথায় সে? তারপর? তারপর কি হল?"

সিগফ্রেড তার পূর্বকথা স্মরণ করবার চেষ্টা করছে দেখে হাগেন তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে এল। মৃদু সুমিষ্ট ভাবে বললে, "ও সব আর আপনি এখানে ভাববেন না আজ। দেখছেন না আপনার বন্ধুর স্ত্রী, এ রাজ্যের ভাবী অধিশ্বরী কি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন? মহারাজও বেশ বিচলিত বোধ করছেন! তার চেয়ে আসুন রাজার বিবাহ বাসরে যোগ দিয়ে আমরা পান ভোজনে স্ফূর্তি করিগে।"

রাজা গান্থার চট করে হাগেনের উদ্দেশ্য বুঝে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন—"এখনি ভেরী বাজিয়ে সারা নগরে ঘোষণা করে দিতে বলো—আজই রাত্রে রাজার শুভপরিণয় উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হবে। প্রত্যেক নগরবাসীকে আজ পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হবে। সকলে যেন আজ সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে এসে সমবেত হয়।"

ক্রুণহাইলদে আর একবার করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সিগফ্রেডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলবার চেষ্টা করলে—"তুমি কি সত্যিই তোমার ক্রুণহাইলদেকে চিনতে পারছো না প্রিয়তম?" কিন্তু সেই মুহূর্তে রাজকুমারী গাদ্রুন এসে সিগফ্রেডের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সোহাগভরা সুরে বললে—"আজ রাত্রে আমাদেরও মিলনোৎসব হবে প্রাণেশ্বর!"

সিগফ্রেড রাজকুমারী গাদ্রুনকে পরম সমাদরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার মুখচুম্বনান্তে বললে—"আজ রজনী আমার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ রাত্রিরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে প্রিয়তমে!"

ক্রুণহাইলদের কাণে এই প্রেমালাপ এসে পৌঁছবামাত্র সে মনে মনে সিগফ্রেডের বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হল! তার নারীসুলভ অভিমানে এবং স্বর্গবাসিনী দেবীর স্বভাবিক গর্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো! একটা মাটির মেয়ের জন্য আমাকে এত অবহেলা? কিসের জন্যে আর এ অপমান সহ্য করবো? আমি দেবকন্যা হয়েও মানুষের প্রেমে মর্ত্যলোকে বন্দী হয়েছিলুম কি এই জন্যে? আমার ভালবাসা তুচ্ছ করে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ এক সামান্যা নারীর প্রেমে পড়বে?—ক্রুণহাইলদে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে—এ অপমানের সে প্রতিশোধ নেবে। তার এতখানি প্রেমের অপমান সে সহ্য করবে না। সিগফ্রেডকে সে জব্দ করবে!

মনে মনে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ক্রুণহাইলদে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলো! মহারাজা গান্থার ব্যাকুল হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে ক্রুণহাইলদে মধুর হাস্যে বললে—"চলুন মহারাজ! তবে বিবাহ-সভাতেই যাওয়া যাক! এত কঠোরতা কষ্ট সহ্য করে অসামান্য বীর্যের সাহায্যে যখন আপনি রাণী সংগ্রহ করেছেন তখন আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" হাগেনের আদেশে প্রাসাদে এই সময় বিবাহের বাদ্য বেজে উঠলো!

(ক্রমশঃ)

মহুয়াবনের রাত

সুনীল বসু

কাঁচঘর থমথম ঝিঁঝি পোকা ডাকছে
উল্কার চকখড়ি সোনালিপি আঁকছে।
নিমডালে ঝাড়লো যে লালপাখী পাখনা,
আলো-জ্বলা তারাকাশ নীলরেখা ঢাকনা,
ঝাউগাছে ঝুমঝুম ঝুমঝুমি বাজছে
নিঝঝুম সিঁড়ি বেয়ে ঘুমপুরী নামছে,—
ডুমডুম বহুদূরে ঢাক্ ঢোল বাজনা,
আজ আর কাজ নয় নেই কারো খাজনা।
সাঁওতাল পল্লীর ছায়া-ছায়া জেল্লা
বহুদূরে ভাঙা সাঁকো পাথরের কেল্লা,
জলে ফোটা ছোটো ছোটো তারকিত নালফুল,
নীল-লাল মাছগুলি চিকচিক তুলতুল;

ঘরে দোরে শীতছায়া নীল মায়া কলকা—
ঝোপে ঝাড়ে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির হলকা,
মৃগনাভি মাখা ছাওয়া ফুরফুর উড়ছে
মাঠভ'রে ঘুমপরী ঘুর ঘুর ঘুরছে।
টুপটুপ পড়ে ফুল, শিশিরের মুক্তো
লতাপাতা বন ঘিরে লাল রাত সুপ্ত—
লাল নীল ফুল ফোটে ফুলঝুরি ফুলকি,
জলছবি মেঘছায়া জাফ্‌রির উলকি,
চোখে জ্বলে স্বপ্নের ধানী রঙ্ দেশলাই
মহুয়ার বনঘিরে নেশাভরা খোশবাই;
রাত যেন ফুল ফোটা মায়াতরু কল্পে
ঠোঁটভরা রূপকথা রূপসীর গল্পে।

পাগলিনী

গী. দ্য. মপাস্‌াঁ.

অনুবাদক—জয়চরণ সরকার

: ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের নৃশংসতার একটি গল্প আমি আপনাদের শোনাতে পারি।

ব্যারণ দ্য রাভোৎএর দুর্গের ধূমপান-ঘরে সমবেত বন্ধুদের উদ্দেশ করে বললেন মঁসিয়ে দ্য এঁদলিঁ।

: আপনারা তো জানেন আমার বাড়ী ফ্যবুর্গ দ্য কর্মেল-এ। প্রুশিয়ানরা যখন এল, আমি তখন সেখানেই রয়েছি। আমার পাশের বাড়ীতে এক মহিলা থাকতেন। ভাগ্যের পর পর কয়েকটি নিদারুণ খেলায় তাঁর স্নায়ুর সকল শক্তি লোপ পায়। সাতাশ বছর বয়সে মাত্র একমাসের মধ্যেই তাঁর বাবা, স্বামী আর সদ্যোজাত একটি শিশু মারা গেল।

মৃত্যু একবার কোন বাড়ীতে ঢুকলে তারপর সে বার বার সেখানে আসতে থাকে, যেন রাস্তাটা তার চেনা আছে বলেই। মেয়েটি শোকে মুহ্যমান হয়ে বিছানা নিল, আর ছ'সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত বিকারের ঘোরে ভুল বকতে লাগল। তারপর সেই ভয়ানক অবস্থা এক অদ্ভুত শান্ত নির্জীবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে নিস্পন্দভাবে শুয়ে রইল, এমন কি খাওয়া-দাওয়াও করত না, কেবল মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। ওরা তাকে তোলবার চেষ্টা করতে সে এমন চীৎকার করলে যেন তাকে খুন করা হচ্ছে! কাজেই তারা আর কিছু না করে তাকে ঐ অবস্থাতেই বিছানায় শুইয়ে রাখল। কেবল মাঝে মাঝে তাকে স্নান করিয়ে জামাকাপড় বদলে দিত, আর মাঝে মাঝে বিছানাটা পালটে দিত।

এক পুরোন ঝি রইল তার কাছে, মাঝে মাঝে সময়মত তাকে খাদ্য আর পানীয় দেবার জন্যে।

সেই ভীতিত্রস্ত মনে কোন চিন্তার উদয় হ'ত? কেউ বলতে পারবে না।—তারপর থেকে সে কথা-কওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল বলতে গেলে। সে কি মৃতদের কথা ভাবত? না, বিষণ্ণ মনে তার ফেলে-আসা দিনের অমূল্য স্মৃতির মধ্যে স্বপ্নচারণ করত? কিংবা হয় তো তার স্মৃতি-শক্তি স্রোতহীন জলের মত স্থির হয়ে গিয়েছিল। তা সে যাই হোক না কেন, এই রকম নির্জীব আর নিস্তব্ধভাবে পনের বছর কেটে গেল।

তারপর যুদ্ধ সুরু হ'ল। ডিসেম্বরের গোড়াতেই জার্মাণেরা কর্মেল-এ এসে গেল। সে সব আমার এখনও এত ভাল মনে আছে, যেন কালকের ঘটনা। তাদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে পাথর শুদ্ধ গুঁড়িয়ে গেল। এদিকে আমি তখন বাতের ব্যথায় ভুগছি, নড়বার শক্তি নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে দেখলাম তালে তালে ভারী পদশব্দ করতে করতে ওরা মার্চ্চ করে যাচ্ছে।

ওরা ওদের অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে অতীতের সকল কিছুই নিরবচ্ছিন্নভাবে কলঙ্কিত করতে লাগল। তারপর অফিসাররা সহরের অধিবাসীদের কে কতজন সৈন্যকে থাকবার জায়গা দেবে, তা ঠিক করলে। আমাকে সতের জন সৈন্যকে স্থান দিতে হ'ল। আমার পাশের বাড়ীর সেই রুগ্ন মেয়েটিকে বারজন সৈন্য রাখতে বলা হ'ল। সেই বারজনের মধ্যে একজন ছিল অধ্যক্ষ। এমনিতেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির, দুঃসাহসিক, দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য।

প্রথম ক'টা দিন বেশ কেটে গেল। ওদের বলা হয়েছিল—মহিলাটি পীড়িত। ওরাও তাই নিয়ে আর কিছু গোলমাল করলে না। কিন্তু শীঘ্রই সেই অদেখা

মেয়েটিই তাদের বিরক্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। ওরা জিজ্ঞেস করলে—ওর অসুখটা কি? বলা হল, এক দুঃসহ শোকের আঘাতে আজ প'নের বছর ধরে তিনি শয্যাগত রয়েছেন। বলা বাহুল্য, ওকথা তাদের বিশ্বাস হ'ল না। ভাবল, মেয়েটি তার গর্ব্বেই বিছানা থেকে উঠছে না।— অর্থাৎ সে প্রুশিয়ানদের কাছে আসবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলবে না, এমন কি ওদের মুখ-দর্শন করবে না!

সেই অফিসার গোঁ ধরলে, তাকে নিজে সৈন্যদের অভ্যর্থনা করতে হবে। ওকে সেই মেয়েটির ঘরে নিয়ে যেতে হ'ল। সে কড়া গলায় বললে: আমি আপনাকে অনুরোধ করছি মাদাম, আপনাকে উঠে, নীচে নামতে হবে। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

কিন্তু, সে কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে রইল।

অফিসারটি আবার বললে: কোন রকম অভদ্রতা বরদাস্ত করার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি নিজে থেকেই ওঠেন, ভাল। নয়তো আমাকে বাধ্য হয়েই এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আপনি কারো সাহায্য না নিয়ে, নিজে থেকেই হাঁটতে পারেন।

কিন্তু মেয়েটি ও সব কথা শুনতে পেল বলে মনে হ'ল না। সে আগের মতই শান্ত, নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে রইল।

অফিসারটি ভয়ঙ্কর খেপে গেল। মনে করল তাকে চরম অপমান করার জন্যেই ও চুপ করে রয়েছে। বললে: কাল যদি নীচে নেমে না আসে—তো—। তারপর ঘর থেকে চলে গেল।

: পরের দিন ভয়ার্ত্ত বৃদ্ধা ঝি তাকে পোষাক পরাতে গেল। পাগলিনী ভীষণ চীৎকার করতে করতে তার সর্ব্বশক্তিতে বাধা দিল।

অফিসারটি তাড়াতাড়ি উপরে ছুটে এল।

পরিচারিকা তার পায়ে ধরে বললে: উনি নীচে নামতে পারবেন না; ম'সিয়ে, উনি পারবেন না। ওঁকে ক্ষমা করুন। ওঁর মত অভাগী আর কেউ নেই।

ও একটু হকচকিয়ে গেল। ভয়ানক রাগ সত্ত্বেও, ওকে ঘর থেকে টেনে বার করতে সৈন্যদের হুকুম করতে সাহস করলে না। তারপর [illegible] হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর জার্ম্মান ভাষায় সৈন্যদের কি আদেশ দিলে। একটু পরেই দেখা গেল জনকয়েক সৈন্য একটা বিছানা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে, যেমন করে আহত লোককে বয়ে নিয়ে যায়। সেই অগোছাল বিছানার উপর পাগলিনী শুয়ে ছিল চুপ করে, একেবারে শান্ত ভাবে। ওকে শুয়ে থাকতে দিলে আর কোন দিকেই সে মাথা ঘামাত না। ওর পিছনে পিছনে একটি সৈন্য মেয়েদের জামা-কাপড়ের একটি পুঁটলি নিয়ে যাচ্ছিল। অফিসারটি হাত ঘষতে ঘষতে বললে: এইবার দেখব তুমি নিজেই নিজের পোষাক পরে হেঁটে বেড়াতে পার কিনা।

তারপর তারা ইমভিল বনের দিকে চলে গেল। ঘণ্টা দু'য়েক পরে সৈন্যরা একলা ফিরে এল। পাগলিনীর আর দেখা পাওয়া গেল না।

ওরা কি করল তাকে? কোথায় নিয়ে গেল? কেউ জানে না।

: সারাদিন ধরে তুষার পড়ছিল। তুষারে মাটি ঢাকা পড়ে গেছে, গাছেরা তুষারের ঘেরা-টোপ পরে সাদা ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেকড়েরা তখন আমাদের দরজার পাশেই চীৎকার করতে সুরু করেছে।

সেই নিখোঁজ অভাগী মেয়েটির কথা আমার মনের মধ্যে ঘুরছিল। প্রুশিয়ান কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমি অনেক দরখাস্ত করেছি, যদি কিছু খবর পাওয়া যায়, সেই আশায়। আর, এই জন্যে আমাকে তো প্রায় গুলী করেই ফেলে ছিল।

তারপর আবার বসন্ত এল, জোর-দখলকারী সৈন্যদের তখন সরিয়ে নেওয়া হ'ল। কিন্তু আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী তখনও তালাবন্ধ হয়ে রইল, ওখানে বাগানের চলন-পথে ঘন হয়ে ঘাস জন্মাল। সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা শীত-কালেই মারা গেছে, আর ও ঘটনা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। কেবল আমার মনে চিন্তাটা তখনও অবস্থান করছিল।—

মেয়েটিকে তারা কি করলে? ও কি ঐ জঙ্গল থেকে পালাতে পেরেছে? কেউ কি দেখতে পেয়েছিল?— তারপর, তার মুখে কোন খবর না পেয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল? আমার সন্দেহ নিরসন করার মত কিছুই ঘটল না। বরং যতই দিন যেতে লাগল, ততই আমার ভয় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

সেকথা যাক্। পরের শরৎকালে দীর্ঘচঞ্চু উডকক্ পাখী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে লাগল। এদিকে আমার বাতও তখন কিছুদিনের জন্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বনের ভিতর যতদূর যাওয়া যায়, আমি গেলাম। ইতিমধ্যে চার-পাঁচটি পাখী মারা হয়ে গেছে। আর একটা মারতে, সেটা নিবিড় পত্রপল্লবে ঢাকা একটা গর্তের মধ্যে পড়ল। সেটাকে তোলবার জন্যে গর্তের মধ্যে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম গর্তটার পাশেই একটা মানুষের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে! তক্ষুণি, বুকে একটা ঘুসি খাওয়ার মত টপ্ করে সেই পাগলিনীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেই দু বৎসরে অনেক, অনেক লোকই হয়ত সেই জঙ্গলের মধ্যে মারা গেছে, কিন্তু তবুও, কেন জানি না, আমার মনে হ'ল নিশ্চয়, এবার নিশ্চয় আমি সেই হতভাগী পাগলিনীর মাথাই দেখতে পাব।

হঠাৎ, হঠাৎ আমি—সব বুঝতে পারলাম, মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।—সেই শীতল, নির্জ্জন বনের মধ্যে ওরা তাকে সেই বিছানার উপর শুইয়ে রেখে চলে গিয়েছিল। আর, নিজের আচরণের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে ধীরে ধীরে সেই তুষারপাতের নীচে তিল তিল করে নিজেকে ধ্বংস করতেও সে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে নি।—তার হাত বা পা নেড়েও একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

তারপর নেকড়েরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে তার দেহ, পাখীরা তার ছেঁড়া বিছানার পশম নিয়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছে, আর আমি তার অস্থিগুলোর ভার নিলাম।

তাই, আজ শুধু প্রার্থনা করি আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন কখনো যুদ্ধের সাক্ষী না হতে হয়।

রবীন্দ্র-দর্শনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিক এবং পুরোপুরিভাবে ব্রহ্মবাদী দার্শনিক। আধ্যাত্মিক শিবিরকে আঁকড়ে ধ'রে মাঝে মাঝে তিনি বস্তুবাদী শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন—বলা চলে, কটাক্ষপাতই ক'রেছেন এবং স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব, ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই অদ্বৈতবাদী মনোভাব নিয়ে বিচার ক'রতে বসলে—না ব'লে উপায় নেই যে এই বিশ্বজগৎ কবির কাছে ব্রহ্মের লীলাস্থল এবং জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের পেছনেই আছে 'তাঁর'-ই ইঙ্গিত, 'তাঁর'-ই প্রেরণা—ব্রহ্মের প্রকাশকেই উপলক্ষ্য ক'রে সমস্ত কিছু ঘটছে, সমস্ত কিছু ঘটবে। সুতরাং কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের বলতেই হবে যে, "ক্ষয় মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা" এবং "সব ক্ষতি তুচ্ছ করি অনন্তে আনন্দ বিরাজে।"

আসলে, কিন্তু দেখা যায় সব ক্ষয়-ক্ষতি তুচ্ছ ক'রতে কবি পারেন নি। যেখানেই তিনি দেখেছেন প্রাণের নিপীড়ন, যেখানেই দেখেছেন আত্মিক ক্ষয়-ক্ষতি, মানবাত্মার মর্ম্মচ্ছেদী হাহাকার, সেখানেই কবি সংগ্রামী হ'য়ে উঠেছেন এবং কঠোরভাবে সংগ্রাম ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গেছেন সত্য-শিব এবং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে। কিন্তু অদ্বৈত-স্তরের উপলব্ধিতে এই সংগ্রাম সম্ভব নয়; কারণ, সেখানে ক্ষয়-ক্ষতির কোন স্থানই নেই। তাহ'লে এই সিদ্ধান্ত করা যায় এবং করা অপরিহার্য্যও যে দ্বন্দ্বাতীত

(Conflict) ট্র্যাজেডির প্রাণ। এই দ্বন্দ্ব আত্মিক ক্ষয়-ক্ষতির দ্বন্দ্ব হ'তে পারে, আবার কোন বাহ্যিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতজনিত দ্বন্দ্বও হ'তে পারে। মোট কথা, ট্র্যাজেডি সৃষ্টি ক'রতে গেলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না ক'রে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি ক'রেছেন, যদিও তাঁর ট্র্যাজেডির স্বরূপ অন্যান্য ট্র্যাজেডির স্বরূপ হ'তে বিভিন্ন। তাঁর ট্র্যাজেডিতে মহাক্ষয় অপেক্ষা মহাশান্তির বাণীই সমধিক উচ্চকিত। "অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান্" এবং এই শান্তির প্রতিষ্ঠাই তাঁর সকল সৃষ্টির মূলে। তাঁর মতে, চরম কথা হ'চ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। এই শান্ত, শিব এবং অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠার জন্য কবি সকল দ্বন্দ্বের শেষে দ্বন্দ্ব শান্তির বা সমাধানের (Reconciliation) ইঙ্গিত দান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছেন সেকথা আমরা আগেই বলেছি এবং তাঁর "মুক্তধারা" রূপক-নাটকখানি নিয়ে আলোচনা ক'রলে আমরা দেখ্তে পাবো, যে তাঁর ট্র্যাজেডি সৃষ্টির পরিকল্পনায় কী গভীর অনুভূতি-শক্তি কাজ ক'রেছে। কিন্তু কি ক'রে তাঁর পক্ষে এ সম্ভব হোল? কি ক'রে তিনি "মুক্তধারা"র দ্বন্দ্ব (Conflict) সৃষ্টি করলেন?

উত্তর দিতে গিয়ে আগেই এ-কথা ব'লে নেওয়া ভালো যে অদ্বৈত-স্তরের উপলব্ধিতে "মুক্তধারা"র জন্ম অসম্ভব। তা'হ'লেই, "মুক্তধারা"র

অদ্বৈতবাদে আস্থাবান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দ্বৈত-স্তরের পরিকল্পনা করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লে তা' কি ভাবে সম্ভব।

একথা আমরা আগেই ব'লেছি যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি ক'রতে গেলে দ্বন্দ্ব (Conflict) সৃষ্টি ক'রতেই হবে এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রতে গেলে দ্বৈত-স্তরের পরিকল্পনা করা বোধহয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও যেহেতু ট্র্যাজেডি সৃষ্টি ক'রেছেন সেই হেতু অদ্বৈতবাদে বিশেষভাবে বিশ্বাসী হ'য়েও তাঁকে দ্বৈত-স্তরের পরিকল্পনা ক'রতে হ'য়েছে এবং সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মময় ব'লেও তার মধ্যে পাপ ও বিকৃতির স্থান ক'রে দিতে হ'য়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই পাপও বিকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম দেখাতে হ'য়েছে।

রবীন্দ্র-দর্শন বলে যে জগৎ ব্রহ্মময় এবং জাগতিক যা' কিছু সমস্তই তাঁর (ব্রহ্মের) লীলাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এইদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে দ্বন্দ্বের অবকাশ-সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য কবিকে বলতেই হবে যে, প্রাকৃতিক জগৎ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর জগৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্মের ইচ্ছা কাজ করলেও মানব-জগৎ থেকে নিজে ইচ্ছে ক'রেই তিনি (ব্রহ্ম) তাঁর শক্তিকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন এবং মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা। তবে, এই ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মেরই দান এবং সেইজন্য ব্রহ্মলীলারই অন্তর্ভুক্ত; তিনি যেন লীলাবশেই মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। এইভাবে দুটো দিকই রক্ষা করা যায়। ব্রহ্মলীলারও কোন হানি হয় না, আবার মানুষও তার স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষমতা পেয়ে যায়।

এই স্বাধীন ইচ্ছার পশ্চাতেই শোনা যায় পাপের পদধ্বনি! স্বাধীন-ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে আপন কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করবার দায়িত্ব। ক্ষমতার প্রাবল্যে সে সৃষ্টি করে পাপের, প্রকৃতির রাজ্যে ঘটায় বিকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বপন করে সীমাহীন দ্বন্দ্বের বীজ। অবকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে প্রকৃতির, পাপের সঙ্গে পুণ্যের, শিবের সঙ্গে অ-শিবের এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, সকলকে পরাজিত ক'রে শিবই মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং সত্য-শিব-সুন্দরেরই জয় বিঘোষিত হ'তে থাকে।

এই ব্যাপারই আমরা লক্ষ্য করি কবির "মুক্তধারা" রূপক-নাটকে। যন্ত্ররাজ বিভূতি রণজিতের প্ররোচনায় এক ভীষণ যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রে মুক্তধারার স্বাধীন গতির পায়ে বেড়ি পরিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবতরাই-এর লোকের জলকষ্টের সৃষ্টি ক'রেছে। মানুষকে অত্যাচার ক'রবার জন্যই এ যন্ত্রের সৃষ্টি এবং অকল্যাণই এর অন্তে। যন্ত্র প্রকৃতিকে ক'রতে চায় পঙ্গু; "কিন্তু কুমার অভিজিৎ প্রকৃতির সন্তান এক অনির্দ্দেশ্য অথচ অনতিক্রমণীয় নাড়ীর টান তাহাকে বিভূতির রাজ্য হইতে লইয়া যায় প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রশান্ত ক্ষেত্রে" (রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত)। অভিজিত সঞ্জয়কে ব'লেছে, "মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখেছেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তার পথ খুলে দেবার জন্যে।" বিভূতির যন্ত্র অনুক্ষণ অভিজিতের অন্তরকে ক'রেছে পীড়িত। প্রকৃতির এই বন্ধনে হাহাকার ক'রে উঠেছে তার অন্তর, কারণ সে যে প্রকৃতিরই সন্তান। যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে বিভূতি, প্রকৃতির মাঝে ঘটিয়েছে বিকৃতি। অভিজিৎ প্রকৃতির প্রতিনিধি, যন্ত্র আকাশে মাথা তুলে প্রতিনিধিত্ব ক'রছে যন্ত্ররাজ বিভূতির। তাই, যন্ত্রের সঙ্গে সুরু হোল প্রকৃতির দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে যন্ত্ররাজ বিভূতির ক্ষমতার গর্ব্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে অভিজিৎ আঘাত হানলো যন্ত্রের উপর। মুক্তধারা মুক্তি পেয়ে ছুটে চল্‌লো দুর্দ্দমবেগে, আর তার সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার আপন শিশুকে আপন বুকে ক'রে।

"রক্তকরবী" নাটকখানির আলোচনা করতেও আমরা দেখতে পাবো যে সেখানেও যন্ত্র তার বিশ্বগ্রাসী শক্তি বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে এবং মানুষকে পীড়ন ক'রে ক'রে চ'লেছে। যন্ত্রের আওতায় পড়ে মানুষ সেখানে আর মানুষ নেই—তারাও যন্ত্রে পরিণত হ'য়ে গিয়েছে এবং সর্ব্ব-আনন্দ-বর্জ্জিত হ'য়ে শুধু তাল তাল সোনা তুলে চ'লেছে। আত্মিক শক্তি তাদের মরে গেছে, আনন্দ লোপ পেয়েছে অন্তর থেকে, আর প্রেম-প্রণয়ের অনুভূতি নিয়েছে বিদায়। এই যন্ত্রই প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে এবং "মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত" (ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়)। জীবনের প্রকাশ নেই সেই যক্ষপুরীতে। কিন্তু "প্রেম ও সৌন্দর্য হইতেছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণরূপ—নন্দিনী তাহার প্রতীক" (ডাঃ রায়)। এই নন্দিনীই এলো সকল ক্ষয়-ক্ষতি থেকে মানুষকে মুক্ত ক'রতে। মানবাত্মার মর্ম্মভেদী হাহাকারে তার অন্তর উঠলো কেঁদে তাই সে এলো যন্ত্রের মোহপাশ থেকে নিষ্পেষিত মনুষ্যত্বকে রক্ষা ক'রতে প্রেম দিয়ে, আনন্দ দিয়ে। কিন্তু তার প্রতিপক্ষরূপে এসে দাঁড়ালো যক্ষপুরীর রাজা। এই রাজাই প্রকৃতির রাজ্যে ঘটিয়েছে বিকৃতি; মানবতা মনুষ্যত্ব ধ্বংস ক'রে সে মানুষকে পরিণত ক'রেছে ৪৭ক, ২৬৯ফ-তে মাত্র। কিন্তু নন্দিনী প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমূর্ত্তি সে। তাই, তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধ্‌লো রাজার, প্রকৃতির সঙ্গে সুরু হোল বিকৃতির দ্বন্দ্ব।

এইভাবে আলোচনা ক'রে ক'রে দেখানো যায় এবং দেখানো বোধহয় অসম্ভব নয় যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভাণ্ডকে ব্রহ্মের লীলাকাণ্ড ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েও তার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং ব্যক্তির পৃথক কর্ম্মক্ষমতার উপরে গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন। পৃথক কর্ম্মক্ষমতা পাওয়ার ফলে মানুষ পৃথক অন্যায় সৃষ্টি ক'রতে বাধ্য। তখন সেই অন্যায়ের সঙ্গে বাধে সনাতন ন্যায়ের দ্বন্দ্ব। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বের অবকাশ সৃষ্টি করার এক পরিশুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী ক'রেছেন।

এই প্রবন্ধ রচনায়, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সুবিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে আমি প্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্যলাভ ক'রেছি; সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রছি।

নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

শ্রীষষ্ঠীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র কয়েকদিনের আয়োজনে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর পৌরসভা প্রাঙ্গণে "নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন" হয়ে গেল। দীর্ঘ কর্ম্মসূচীর ভিতর সাহিত্য, দর্শন, জন-স্বাস্থ্য, পৌরশাসন, সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচিত হবার ফাঁকে ফাঁকে, ভজন, শ্যামা-সঙ্গীত, কথকতা, কবিগান, পুতুলনাচ, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণনগর তথা বাংলার যশস্বী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-তর্পণও এর ভিতর একদিন হয়ে গেল এবং এই সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাত-নামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের সমাবেশও হয়েছিল কম নয়। কেহ এসেছিলেন সভাপতি হয়ে, কেহ প্রধান অতিথি হয়ে এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বিশেষ অতিথি হিসাবেও কারুর কারুর দুর্লভ সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

প্রথমেই, প্রথম দিনের সাহিত্য অধিবেশনের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম কর্ত্তে হয়, যিনি সাহিত্যের দরবারে হাজির করেছেন পল্লীর 'বাগ্দী-দুলে', পল্লীর 'কাহার' প্রভৃতি অপাংক্তেয়দের এবং দেখিয়েছেন যে সুখ-দুঃখের ঐক্যবোধ, আনন্দ, হর্ষ এবং বিষাদের ঐক্য-বোধ এদের ভিতর সমানই আছে এবং দেখিয়েছেন যে সাহিত্যের মাল-মশলা শুধু যে সমাজের উচ্চতর বাসী রাজা মহারাজা শ্রেণীর ভিতর থেকেই নিতে হবে—তা' নয়। শান্তিনিকেতনের শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও উপাচার্য্য ডাঃ প্রবোধ বাগচী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, হৃদয়রোগে বিশেষজ্ঞ ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিখ্যাত শিশু-চিকিৎসক ডাঃ ক্ষীরোদ-চন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা পৌরসভার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী, নবদ্বীপের পণ্ডিত মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য, পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি মহাশয়গণ সকলেই সানন্দে যোগদান করেছিলেন। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণনগরের কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও ত্রাণ বিভাগের মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল, কৃষ্ণনগর পৌরপতি—শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ সরকার, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, এঁরাও ছিলেন এবং এঁদের সুচিন্তিত ভাষণগুলিও শ্রোতৃবর্গকে কম মুগ্ধ করেনি।

এই উপলক্ষে যে সুবিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল—তা দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলাম কম নয়। সমস্ত নদীয়া যেন উন্মুখ হয়েছিল এরই প্রতীক্ষায়। কৃষ্ণনগর পৌরসভা প্রাঙ্গণের আয়তন কম নয়, কিন্তু তার কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না কোনোদিন। কৃষ্ণনগর তথা জেলার বিভিন্ন স্থানের উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বস্তরের নাগরিক জেলা-শাসক প্রভৃতি রাজপুরুষ এবং পুরমহিলাগণের সুবিপুল সমাবেশ একটা দ্রষ্টব্যের বিষয় এবং এঁরা সকলে ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত সব মন দিয়ে শুনেছিলেন।

সত্যিই সিনেমা, জলসা, রাজনৈতিক সভাসমিতি, মিছিল, স্মৃতিসভা, স্মরণীয় দিনগুলির বাৎসরিক উৎসব, আজ এটা, কাল ওটা—এ সবে মানুষ যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। কোথায় আমরা চলেছি, আমাদের আদর্শ কি—অন্তরের সেই অকথিত প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যই যেন এ বিপুল জনসমাবেশ।

এই দীর্ঘ পনের দিনে, প্রত্যহ সন্ধ্যায় (রবিবারে ৪৷৷০ টার পর) এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করা অপেক্ষা শাখা অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভাষণগুলির, বিশেষ বিশেষ অংশগুলি উদ্ধৃত করে দিলেই ভালো হবে মনে হয়।

প্রথম দিনে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য বহু কথার ভিতর বল্লেন—"আজ শুধু Engineers are the priests of modern world, একথা বল্লেই, সব বলা হয় না। কেজো লোকেদের কাজের প্রেরণা দিবার জন্য সাহিত্যিকেরও প্রয়োজন। কুরুক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের পুরোভাগে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, শোনালেন "গীতা"। আমাদের দেশে এইভাবে কর্ম্মের পুরোভাগে কাব্যকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কাব্যহীন কর্ম্মের অনুশীলনে আজ আইসেন্ হাওয়ারের এ্যাটম্ বোম্, উদযান বোম্ বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার কচ্ছে। কেনিয়ায় আজ কৃষ্ণাঙ্গের নরমুণ্ডের পিরামিড দেখতে পাচ্ছি। কর্ম্মকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিলে, এইরূপ অপকর্ম্মের আবির্ভাব হয়।"......ইত্যাদি।

সত্যিই, কর্ম্মের পুরোভাগে কাব্যের স্থান, আমাদের দেশেই দেখতে পাওয়া যায় এবং বিশ্বে তাই আজ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শান্তিকামী জাতি বোধ হয় আর নেই।

সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বসে বসেই তাঁর স্বতস্ফূর্ত্ত ভাষণ দিলেন, যেন কোনও সভাই নয়, বাইরের ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কচ্ছেন। তারাশঙ্করের লেখা বই পড়া এক জিনিষ, আর একই চাঁদোয়ার নীচে আসন নিয়ে, সেই লেখককে চোখের সামে দেখা, তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেক কথা নিজের কানে শোনা, তাঁর হাত-নাড়া, ঘাড়-বাঁকানো প্রভৃতি দেখা, আর এক জিনিষ। সেই তারাশঙ্কর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সপ্রশংস উৎসুক দৃষ্টির সামে বাংলার সাংস্কৃতিতে নদীয়ার গৌরবময় দানের উল্লেখ করে বলে চলেছেন ..." ভাগীরথী তীরের নবদ্বীপ শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের কৃষ্টি একদিন বাংলা ছাড়িয়ে

আসাম, উড়িষ্যা এবং বিহার সীমা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা খড়-মাটীর দেশ—যেখানে খড়ের ঘরে মাটীর প্রতিমা করে, পূজা হোমের পর বিসর্জ্জন, যেখানে শ্যাম-শ্যামার আরাধনা, সেখানের অধিবাসী তার-মাঝে সন্তুষ্ট, সেই সেই স্থান পর্য্যন্ত বাংলার কৃষ্টি বিস্তৃত। পাথরের মন্দির বাংলার নয়, সীতা-রামের আরাধনা, মহাবীরের স্তব, এ সব বাংলার

নদীয়ায় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্যশাখার অধিবেশনে মাইকের সম্মুখে উপবিষ্ট-অবস্থায় ভাষণ দান-রত সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্শ্বে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অধিকারী

নয়। রুটী খেয়ে পুষ্টিলাভ করা বাঙালী পারে না। বাংলার সঙ্গে বিহারের এই সংস্কৃতিগত প্রভেদ।"

বাংলার সীমা রেখা নিয়ে যে যুক্তিতর্ক হ'চ্ছে—অলক্ষ্যে সভাপতি মহাশয়ের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, কে জানে এগুলি তারই প্রতিক্রিয়া কি না! কিন্তু, একথা বলতেই হ'বে যে অত্যন্ত সরল, সহজ বোধগম্য ভাষায় যে যুক্তিগুলি তিনি দিলেন, তা' একদিক দিয়ে অকাট্য।

তিনি ব'লে চলেছেন……"বাঙালী জ্ঞানমার্গ ছেড়ে অসীম বিশ্বাস ও ভক্তিতে সব কথা দেবতার মহিমাকে অবলম্বন করে বলে থাকেন। লোম-পূর্ণ গুহাবাসী মানুষ, গুহা থেকে একদিন বের হয়ে এল, রচনা করল সহর, গায়ের লোম গেল খসে, কামনা করল সুখ, প্রার্থনা হ'লো—ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—এই কামনা মানুষ করে। স্থানে স্থানে মন্দির গড়ে উঠলো, দেব দেবীর বিভূতিকে রূপ দিলেন কবি, আমরা তাকেই ধ্যান বলি ; প্রতিষ্ঠিত হ'লো সেই সব মন্দিরে মন্দিরে দেব এবং দেবী, জীবনের উপচার নিয়ে, মানুষ দলে দলে আসতে লাগলো মন্দির প্রাঙ্গণে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে, এই মন্দির আর মানুষ নিয়ে সৃষ্টি করলেন খাঁটি বাঙালী চিত্র। রবীন্দ্র সাহিত্য আনলো, নতুন কালের জীবন বেদ। তিনি মন্দিরের দেবতাকে নিয়ে হৃদয়ে বসালেন। "তুমি"কে অবলম্বন করে, তাঁর রচনা বিভূতিলাভ করল। অসৎ থেকে সৎএ, অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার প্রার্থনা প্রকট হ'য়ে উঠলো। এর পরিধি আরও বিস্তৃতিলাভ করবে, জলসা ছেড়ে বাড়ী পৌঁছবে। মানুষ তার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য, ক্লান্তি থেকে অবসাদ থেকে মুক্ত হ'বার জন্য, আপন মনে বাড়ীতে বাড়ীতে রবীন্দ্র কাব্য আবৃত্তি করবে। রবীন্দ্রকাব্য হ'য়ে উঠবে আধুনিককালের জীবন বেদ। রবীন্দ্র সাহিত্য হ'বে শোকে সান্ত্বনা, হতাশার আশা, গ্লানি থেকে মুক্তি।"

"আজ পশ্চিমে যুদ্ধ-ক্লান্ত দেশগুলির মধ্যে শান্তি কামনা প্রকট হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ-ক্লান্ত এক জিনিষ, আর অহিংসায় বিশ্বাস আর এক জিনিষ। ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। আমরা যুদ্ধ-ক্লান্ত হইনি, কণ্ট্রোল-ক্লান্ত হয়েছিলাম মাত্র।"

লোক চক্ষুর অন্তরালে সহস্র সহস্র শরণার্থী প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা কচ্ছেন। রসকে গ্রহণ করার শক্তি থাকলে, কেহ দুর্ব্বল হ'তে পারে না। আমি আশাবাদী—এঁদের পুনরুজ্জীবন আসছে…… ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য, তুচ্ছতা কোথায় যেন ভেসে গেল। অনুষ্ঠানের শেষে মালদহের সুমিষ্ট আমের মতই গম্ভীরা পরিষদ কর্ত্তৃক মধুর লোক-সঙ্গীতের পর, খুসীভরা মন নিয়ে যে যার আস্তানায় ফিরলেন।

একদিন সম্মেলন মণ্ডপে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি সভায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিলেন—"কবি স্বয়ং বিলাত-ফেরৎ হইয়াও, বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। ভারতেই যে সভ্যতায় প্রথম বিকাশ এবং ভারতই যে শিল্প, কর্ম্ম ও ধর্ম্মে দীক্ষা দেয়, ভারতের বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, প্রেম, অহিংসা ও ত্যাগের মন্ত্রে সমগ্র জগৎকে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের এই অতীত মহিমায় ও গরিমায় কবি ভারতীয় হিসাবে গর্ব্ববোধ করিয়াছেন। পরাধীন ভারতে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার চোখ ঝলসানো আলোকে অন্ধ আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে, লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন এই দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁহার লেখনীমুখে জাতীয়তার ও দেশপ্রেমের সঞ্জীবনী ধারা একদিন উৎসারিত হইয়া সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। একদা তাঁহারই প্রাণ-মাতানো জাতীয় সঙ্গীতে মুক্তিকামী জাতি, স্বাধীনতার অমৃত সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। হাসির গানের মাধ্যমে একদিকে দুঃখ দৈন্য-জড়িত বাঙালীকে হাসাইবার এবং অপরদিকে সমাজের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের কশাঘাত, দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতার পূজারী, জাতীয়তার সাধক কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বিভিন্ন লেখার ভিতর নিজেই নিজের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া গিয়াছেন।"…ইত্যাদি।

আর একদিন জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, পশ্চিম বঙ্গ-রাজ্যের জন-স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ক্ষীরোদ চন্দ্র চৌধুরী এবং ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রত্যেকে সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। ডাঃ অধিকারী বলেন…"অতীতে একদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া আমরা গ্রামকে এবং গ্রামের কৃষকদের প্রতি ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম, তাহার ফলে আজ এদেশের গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয়।

পল্লীর খাদ্যপ্রাণপূর্ণ দুগ্ধ সহজলভ্য ও প্রচুর ছিল।"—তাহারই জের টানিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন—এই পল্লীজীবন সুন্দরতর করার উদ্যোগে জাতীয় সরকার ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৬টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্য্যকরী কর্চ্ছেন।...

ডাঃ সেনগুপ্ত তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে অন্যান্য কথার ভিতর বলেন...প্রকৃতি কেমন সুন্দরভাবে তাঁর সমতা রক্ষা করিয়া চলেন। পুষ্টিকর এবং পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবে গরীবের ভিতর যেমন যক্ষ্মার প্রসার, ঐ খাদ্যের প্রচুর ব্যবহারে তেমি ধনীলোকের ভিতর "ডায়েবিটিস্" এর প্রকোপ। দ্রুততম গতি, তীব্র আওয়াজ বা শব্দ, সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলো, সিনেমা প্রভৃতিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ প্রভৃতির বিভীষিকাময় চিত্র প্রভৃতি উত্তেজনা বর্দ্ধক দৃশ্যগুলির মধ্যে "করোনারি থ্রম্বসিস্"এর নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলি ধনীলোকের একচেটিয়া ব্যাধি।"...ইত্যাদি।

"পৌরশাসন" সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীঅমলচন্দ্র হোম এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত হোম বলেন... "সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির খ্যাতি একদিন সারা ভারতবর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু সেবার আদর্শ নিয়ে কলিকাতা পৌরসভায় প্রবেশ করেছিলেন। আজ সেই সব পৌর-সভাগুলির ভিতর কতকগুলিকে যেভাবে Supercession করা হইতেছে, তাহার যৌক্তিকতা বিচার-সাপেক্ষ।"...

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন,..."রাজনৈতিক স্বার্থ ও দলাদলির জন্য সব সময়ে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা দেশের পক্ষে শুভ নহে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাধীন যুবক ও বালকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা সকলের চিন্তার বিষয়। আমাদের স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ব্বে স্তব পাঠ করিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নিরপেক্ষতার জন্য উহা বন্ধ করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে শিশুও ছাত্রদের ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া সংযম ও অন্যান্য গুণের প্রতি দিন দিন উদাসীন হইয়া যাইতেছে। এই সকল শিশুও ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মাতৃজাতিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।...পৌর শাসনের দায়িত্বের সহিত নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সম্বন্ধ জড়িত"—এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের দিন ডাঃ রমা চৌধুরী বল্লেন..."সংস্কৃতি সেই বস্তু, যা আমাদের আত্মার সংস্কার করে। দেহ, প্রাণ, মন এদের সমাবেশে গঠিত হলেও, অমর আত্মাই মানবের সমগ্ররূপ। ভারতীয় সংস্কৃতির কথায়, প্রাচীন ঋষিগণ "সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম" বলে গিয়েছেন—এখানে কোনও ভেদ নেই। কে ছোট? কে বড়? সবই ত ব্রহ্ম। এই সেদিনেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের পরম সত্য প্রকাশ কর্ল্লেম, যে মহাবাণী মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠ মারফৎ। বিশ্বধর্ম্মসভায় তাঁর বিঘোষিত বাণী "শান্তি গ্রহণে নয়, বর্জ্জনে—শান্তি বিরোধে নয়, সাম্যে". আজও ধ্বনিত হচ্ছে। এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ঐক্য সাধনই ভারতের প্রধান কাজ।"

মহাত্মাজী বলেছিলেন,—I can see in the midst of death life persists, in the midst of darkness light persists, in the midst of falsehood truth persists......

ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বল্লেন..."পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী অনেকে ভারতবর্ষে নারীজাতির এবং শূদ্রজাতির অবমাননা শিরোধার্য্য করে—যাজ্ঞবল্ক এবং এ যুগের রাজশেখর পর্য্যন্ত কারুর লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁরা ঘোষণা করেছেন, স্ত্রী পুরুষে ভেদ নেই, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডালে ভেদ নেই। অনেকে বলেন মুসলমান সংস্কৃতভাষার বিরোধী। অথচ ইতিহাস-পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে দারাশিকোর সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ রচনার কথা। মুসলমান দরাপ খাঁর গঙ্গা স্তোত্র আজও অনেকে শঙ্করকৃত ব'লে ভুল করে বসেন। দেশ এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আত্মানুশীলক, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মসংস্কার নিঃসন্দেহে প্রয়োজন।"...

প্রধান-অতিথি ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী বল্লেন..."ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত কজনের সত্যিকারের পরিচয় আছে? সংস্কৃতির যে রূপটি ইতিহাসের বন্ধুর পথ পেরিয়ে, আমাদের দরজায় এসে ঘা দিয়েছে, তা'কে আমরা কতটুকু বুঝতে চাই? প্রাচীন ভাস্করদের সাথে পরিচয় নেই বলে আমরা মহিমময়ী "জগদ্ধাত্রী" মূর্ত্তি গড়তে যেয়ে, বিলাসিনী কামিনীর মূর্ত্তি গড়ে ফেলি, প্রাচ্য নৃত্যের ছন্দে পাশ্চাত্যের "ব্যালে" নৃত্যের অনুকরণ করি। সূর্য্য মন্দির নির্ম্মাতা, অজন্তা গুহা নির্ম্মাতা পূর্ব্বপুরুষগণের আমরা কি আজ সত্যই উত্তরাধিকারী। অতীতকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে, তা'হলেই প্রতিদিন সেই অনুভূতিকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা কর্ত্তে পারবো প্রতি কাজে।

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে ভাষাভিত্তিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যাচ্ছে। এই সংস্কৃতি পারবে সমস্ত ভারতকে সুসংহত কর্ত্তে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যদি এক ভাব-বন্ধন সৃষ্টি হয়, তবে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। বাঙালীর প্রান্তিক বৈশিষ্ট্যগুলি তার প্রাদেশিকতাদোষমুক্ত—পক্ষান্তরে সেগুলি সারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধির উৎস। বাঙালী স্বাধীনতা প্রিয়, বাঙালী মানবতার পূজারী। প্রাচীন স্মৃতি ও দায়ভাগ ভারতকে বেঁধে ফেলেছিল—বাঙালী জীমূতবাহন তা'কে পুরোপুরি গ্রহণ কর্লেন না। ভারতবাসী এ জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো, যেন এই জন্যই সকলে অপেক্ষা কর্চ্ছিল। বাঙালী রঘুনন্দন প্রাচীন মতবাদকে খণ্ডন করে, প্রচার কর্লেন মৌলিক আদর্শ—এই হলো বাঙালীর প্রান্তিক বৈশিষ্ট্য। বাংলার ভক্ত এবং সিদ্ধপুরুষগণ—জাতিভেদের শৃঙ্খল ভেঙে দিলেন, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি যে প্রথাগুলি বাংলাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, তাঁরা তা শিথিল করে দিলেন। শ্রীচৈতন্য ভগবানকে নিকটতম করে গেলেন। বাংলার চণ্ডীদাস মানুষের গান গাইলেন, বাংলার রামমোহন, শ্রীবিবেকানন্দ গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করে দেখালেন নূতন পথ। এই বাংলার বৈশিষ্ট্য। নব নব ভাবধারার আহ্বায়ক, ধারক, বাহক ও প্রচারক এই বাঙালী—বাঙালীর জন্য ভারত গৌরবান্বিত।

বহু এবং বিচিত্রের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুর কল্পনা ভারতের বৈশিষ্ট্য—এর সার্থক প্রচার কর্লেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাঙালী এবং তা বাংলাভাষার মাধ্যমে। ভারতের দেবতা এক নন, আবার তিনি বহুও নন—একের সঙ্গে বহুর এবং বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় হ'য়েছে এখানে। একটী মাত্র মতবাদ, একটী মাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং একটী মাত্র গুরু এখানে নয়। ভারতে বহু গুরুর, বহু অবতারের আবির্ভাব হয়েছে—তা হ'লেও প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে এবং নিজ নিজ সময় কালে নিজ নিজ মত প্রচার কর্লেও, মূলে ভারতের উল্লিখিত বিশিষ্ট মতবাদেরই প্রচার করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি যে এত পুষ্ট, এর ভিতর বাংলার দান কম নেই। বাংলা যদি তার বৈশিষ্ট্য হারায়, কি দিয়ে পুষ্ট করবে সে ভারতীয় সংস্কৃতিকে? বাঙালী তার বৈশিষ্ট্য ভুলে যাওয়া অপেক্ষা তার মরণ ভাল।···ইত্যাদি।

"নব্য-ন্যায়" সম্বন্ধে নবদ্বীপের পণ্ডিত মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে, মহর্ষি গৌতমের ন্যায়-দর্শন প্রচার, জীবের দুঃখকে অতিক্রম করার সহজ পথ, ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ, জ্ঞানের স্তর বিভাগ প্রভৃতির আলোচনা করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সংখ্যাতীর্থ বলেন···"বুদ্ধি এবং মনীষার উপর দিয়ে যে শিল্প তৈরী হ'চ্ছে নদীয়ায়, তার সন্ধান জানেন? প্রধানতঃ কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙালী আজ সারা ভারতের নিকট, এমন কি পৃথিবীর নিকট পূজিত? সে, নব্য-ন্যায়। তবু ইহাকে আমরা শুধু নদীয়ার সম্পদ বলিনা, সারা ভারতের সম্পদ বলি। ইহাকে ভাষান্তরিত করিবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন ভাষায় কোনও পণ্ডিতের নাই। মানুষে মানুষে যে সাম্য আছে, নব্য-ন্যায় না পড়লে, এ বোধ জাগে না। নব্য-নৈয়ায়িক অনুমানকে অস্তির পর্য্যায়ে এনেছেন। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, সে যতক্ষণ বুঝতে পাচ্ছে, "ভগবান আছেন, অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন", ততক্ষণ অন্যায় থেকে আপনা-আপনিই প্রতিনিবৃত্ত হ'বে। কোনও রাষ্ট্রীয় আইন এ স্থান নিতে পারে না। সংস্কৃতির তাই শ্রেষ্ঠ দান—"ভগবান আছেন।"···ইত্যাদি।

সভাস্থ সকলের বুক গর্ব্বে যেন ফুলে উঠলো। সর্ব্বশেষ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ প্রবোধ বাগচী উঠে বল্লেন···"দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কত বড় ছিল, এ প্রশ্ন আজ অবান্তর। সংস্কৃতি গতিশীল, সে স্থাণু হ'বে না। আজকে যা আছে, তা আজকের সংস্কৃতি। আমাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর, কতখানি সংস্কৃতি বিস্তৃতিলাভ কচ্ছে, সেইটে ভাববার কথা। বাঙালীকে প্রাদেশিক ভাবাপন্ন এই দোষ যাঁরা আরোপ করেন, তাঁরা সত্যকে বিকৃত করেন। হাজার বছর পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় রচনা কর্তেন। বাঙালীই সেই সময় সর্ব্ব প্রথম প্রাদেশিক ভাষায় রচনা কর্লেন। ভাষা প্রাদেশিক হ'লেও, ভাব সর্ব্বভারতীয়। ব্রজবুলির ভাষা—মথুরা, ব্রজ এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণে এমন তৈরী হ'লো, যা সর্ব্বত্র সমাদর লাভ কর্ল এবং এর ব্যাকরণই তৈরী হলোনা। এই কৃত্রিম ভাষার রচয়িতা বাঙালী। ভাষা ও ভাবে এ সর্ব্বভারতীয় হ'য়ে উঠলো।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মাইকের সম্মুখে সভাপতির অভিভাষণ দান রত দণ্ডায়মান ডাঃ বাগচী। বাম দিক হইতে—কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সর্ব্ব দক্ষিণে—ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ীকে দেখা যাইতেছে

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর সংস্কৃত ভাবধারা যেন রূপান্তরিত হ'য়ে আমাদের কাছে আসছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলা, ভাব কিন্তু সর্ব্বভারতীয়। তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙালী এমন রূপ দিলেন, যার অনুশীলন অনায়াসেই সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে তীব্বত পর্য্যন্ত অবাধে চলছে।

একদা কলিকাতার কোনও সভায় কোনও বক্তাকে বলতে শুনেছিলাম—"বাঙালী শুধু কাঁদতে জানে।" বাঙালী শ্রীচৈতন্যের ক্রন্দন বাঙালীর গর্ব্বের। বাঙালী রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ মনোভাব, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য তাকে বড় করেছে, তাকে প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে, সর্ব্বভারতীয় হ'বার প্রেরণা দিয়েছে"···

সম্মেলন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঐ সম্মেলনে আহুত পণ্ডিতগণের মূল্যবান বাণীসমূহ আজও নদীয়ার শত শত হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে তাদের উৎসাহ কচ্ছে। শত দুঃখ ভারে নুয়ে না পড়ে আবার লাফিয়ে উঠ্‌ছে। অন্তরে যে ভাবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে—সে যে অতীতের গৌরবময় দিনগুলির স্রষ্টা শ্রেষ্ঠ বাঙালীর বংশধর—উত্তরকালের পথপ্রদর্শক—মহাবিশ্বের পটভূমিকায় এক একটী তপস্যারত জ্ঞানকুমার—ঘুমন্ত শিবের সামে শব সাধনার উত্তর সাধক।

জয় হোক্ বাঙালীর—জয় হোক্ বাংলা সংস্কৃতির।

খাদ্য-উৎপাদনের একটি প্রয়াস

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৫০ সালে বাংলাদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার কথা বহু দিন বর্তমান যুগের মানুষের মনে থাকিবে। তাহার অন্যান্য কারণ আর যাহাই থাক না কেন, দীর্ঘকাল হইতে আমাদের খাদ্য-উৎপাদনের বিষয়ে উপেক্ষা—দুর্ভিক্ষের যে অন্যতম কারণ ছিল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়া আমরা কৃষি-বিমুখ হইয়াছি। মাটীর সহিত সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন মনে করি না। যে কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমার জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, তাহাকে আমরা 'চাষা' বলিয়া অবজ্ঞা করি। 'চাষা' শব্দটাই একটি অনাদর, উপেক্ষা ও ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ হইয়াছে। এই কৃষি-বিমুখতা দূর করিতে না পারিলে দেশ সমৃদ্ধ হইবে না—দেশের খাদ্যাভাব দূর হইবে না। সুখের কথা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একদল লোক—সংখ্যায় কম হইলেও—এ কথা বুঝিয়াছেন ও কৃষির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের একজন সেইরূপ কৃষকের উদ্যমের কথাই বলিব।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্র প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এম-এ পাশ করিয়া অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান—পিতা সিভিল সার্জেন ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগে ১৯২১ সালে সরকারী কাজ ছাড়িয়া দেশ-সেবায় ব্রতী হন। তাহার পর নানারূপ সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া বহু বৎসর অতীত হয়। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। নানা কাজে অর্থ উপার্জন করেন, আবার তেমনই ভাবেই তাহা ব্যয় করিয়া থাকেন।

হাজারীবাগ জেলায় তিনি ঠিকাদারী কাজ করিতে যান—মাতুল হাজারীবাগের উকীল। সেখানেও বহু বৎসর বহু কার্য্যে প্রবোধবাবু লিপ্ত ছিলেন। একটি জঙ্গলের জমীদারী-স্বত্ব কিনিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় সে স্থান সরকার দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হইলে প্রবোধবাবু অনেক চেষ্টার পর একটি ৮৫০ একর জঙ্গল সরকারের নিকট হইতে ফেরত পাইলেন। হাতে কিছু অর্থ মজুত ছিল। খাদ্য-উৎপাদন সম্বন্ধে কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু গ্রন্থ পাঠ ও বহু চিন্তা করিয়াছিলেন। ঐ জমী পাইয়াই তাহা কাজে লাগাইতে অগ্রসর হইলেন।

কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে জঙ্গল ও বাড়ির দৃশ্য

তাঁহার জমী হাজারীবাগ জেলার সদর থানার রক্ষণবাই পরগণায় অবস্থিত। মৌজার নাম মরহন্দ—নং ১১৬। উহার উত্তরে নওয়াদা, পশ্চিমে ঢেণ্ডরা ও পুন্দরী, পূর্বে হরহদ ও দক্ষিণে বেস মৌজায় সংরক্ষিত জঙ্গল অবস্থিত। স্থানটি ২০৪০ ফিট উচ্চে অবস্থিত—কিন্তু তথায় বৎসরে ৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। হাজারীবাগ সহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে ঐ স্থান। ভাল পথ নাই—বর্ষাকালে যাতায়াত পদব্রজেই করিতে হয়। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ৮৫০ একর জমীর দখল পাইয়াই মিত্র মহাশয় তথায় একটি উচ্চ গৃহ নির্মাণ করেন। ১৯৫১ সালের জুন মাস হইতে জমীর জঙ্গল পরিষ্কার আরম্ভ হয়। আমরা ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে পূজার পর ঐ কৃষিক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত ৪ শত একর অর্থাৎ প্রায় ১২ শত বিঘা জমী পরিষ্কার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ শত বিঘা জলাশয় করা হইয়াছে। ছোটনাগপুরের জমী কোথাও সমতল নহে। যাহারা পুরুলিয়া, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন, তাহাদের সে বিষয় জ্ঞাত আছেন। প্রবোধবাবু সমস্ত জমী নিজে জরীপ করিয়াছেন—কোথায় জমী উচ্চ ও কোথায় নিম্ন তাহা ঠিক করিয়া লইয়া বাঁধ অর্থাৎ ড্যাম তৈয়ারী আরম্ভ করেন। এ পর্য্যন্ত ১৯টি বাঁধ বা জলাশয় করা

হইয়াছে। সর্ব বৃহৎ জলাশয়টি প্রায় ৩ শত বিঘা—নাম নীলাসাগর। দ্বিতীয়টি প্রায় ৭০ বিঘা—নাম পুখুরিয়া। তৃতীয়টি প্রায় ২০ বিঘা—নাম হাঁসপুকুর। অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। যেখানে প্রায় ৩ দিকে উচ্চ জমী পাওয়া যায়, সেখানে চতুর্থ দিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করাই বাঁধ নির্মাণ বা পুষ্করিণী প্রস্তুত। বাঙ্গালার সমতল ভূমির মত তথায় মাটী খুঁড়িয়া পুকুর তৈয়ার করিতে হয় না। ১৯টি বাঁধ অর্থাৎ প্রায় ৫ শত বিঘা জলাশয় প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ ভাবে বাঁধ তৈয়ারীর পর অপেক্ষাকৃত সমতল জমীর গাছ কাটিয়া ও তাহার গোড়া তুলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে সে সমস্ত জমী সমতল করা হইয়াছে। ৭ শত বিঘা জমীতে চাষের কাজ চলিতেছে। গত বৎসর একটি মাঠে ১ একর জমীতে ৭০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। নীচু জমীর ধান ক্ষেতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধান ফলিয়া থাকে। সেখানে মিত্র মহাশয় ১২ মাস চাষের কাজ চালাইয়া থাকেন। জলাশয়গুলি এমনভাবে প্রস্তুত যে বৈশাখ মাসেও সেগুলি শুকাইয়া যায় না। কৃষির জমীতে ১২ মাসেই সেই সকল জলাশয় হইতে সেচের জল প্রদান করা হইয়া থাকে। এমন ভাবেই বাঁধ বা জলাশয়গুলি নির্মাণ করা হইয়াছে। পাছে মাটি ধ্বসিয়া যায়, সে জন্য উপযুক্ত স্থানে নূতন আম, কাঁটাল, লিচু, কমলালেবু, পাতি-

কৃষিক্ষেত্রে পালিত হাঁস ও মুরগী

কৃষিক্ষেত্রের গাড়ি ও কর্ম্মীবৃন্দ

লেবু, ন্যাসপাতি, পিচ, বাতাবীলেবু প্রভৃতির গাছ বসানো হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে কলা গাছ ও পেঁপে গাছ বসাইয়া বহু ফল উৎপন্ন করা হইতেছে। কাপাস গাছ বসাইয়া তুলার চাষ করা হইয়াছে। পাট, গম, চিনাবাদাম, অরহর, মুগ, মুসুর, কালি কলাই, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবি-শস্যের চাষ করিয়াও তিনি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। নূতন জমী—কাজেই চাষের কাজে এখন প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতেছে। টমাটো, আলু, বাঁধা কপি, মটর শুঁটি, ফুল কপি, গাজর, বিট, ওলকপিও গত বৎসর প্রচুর উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা মাঠে বহু স্থানে বড় বড় বিলাতী কুমড়া দেখিয়া আসিলাম। বেগুন ও ভেণ্ডি বা ঢেঁড়শ প্রচুর পরিমাণেই ফলিয়া আছে দেখিলাম। সীম, বরবটী, লাউ, দেশী কুমড়া প্রভৃতির ও চাষ হইয়াছে। আখ, শণ, তিসি, রেড়ি ও সরিষার চাষ হইতেছে। প্রকাণ্ড এক মাঠে শুধু লঙ্কা চাষ করা হইয়াছে।

কলের লাঙ্গলের সাহায্যে জমী সমতল করিয়া চাষ করা হইয়া থাকে। জাপানী প্রথায় সেখানেও ধানের চাষ হইতেছে।

পাছে শ্রমিকের অভাব হয়, সে জন্য মিত্র মহাশয় নিজ বাসগৃহের অনতিদূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাপরার দোচালা ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন—নিকটস্থ গ্রাম বা জঙ্গল হইতে গৃহহীন শ্রমিক-চাষীরা আসিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতেছে। শুনিলাম, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪ শত। প্রবোধবাবু নিজে একটি দোচালা এস্‌বেস্‌টস ছাওয়া পাকা ঘরে বাস করেন। নিকটেই পরিবারবর্গ ও অতিথি-অভ্যাগতের জন্য একটি বড় একতালা পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ কৃষিক্ষেত্রে যাইতে হইলে হাজারীবাগ সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে কোনার নদী পার হইয়া যাইতে হয়—কোনারের উপর ভাল পাকা পুল আছে। সহর হইতে অল্প দূরে আর একটি ছোট খাল বা নালা পার হইতে হয়—তাহাও নদীর মত—সেখানেও পাকা পুল আছে। কৃষিক্ষেত্রের দক্ষিণে ও পশ্চিমে বোখারো নদী অবস্থিত। দক্ষিণে বোখারো পার হইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ আছে—ঐ পথের দু ধারে বহুদূর সরকারী-

সংরক্ষিত জঙ্গল। শুনিলাম, সহর হইতে বোথারো নদী পর্য্যন্ত ৬।৭ মাইল পথ শীঘ্রই জেলাবোর্ড হইতে পাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা তথায় থাকিতেই শ্রীযুত কিশোরী রাণা নামক একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ঐ বিষয়ে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। প্রবোধবাবু প্রকাণ্ড গোশালা নির্মাণ করিয়া মহিষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতিও পালন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রায় ২ মণ দুধ হইয়া থাকে। ধান কাটা হইয়াছিল—আমাদের দেশের মত আছড়াইয়া ধান ঝাড়া হয় না—রাত্রি ৩টা হইতে দেখিলাম, মহিষের দ্বারা ধান মাড়াইয়া বিচালী হইতে ধান পৃথক করা হইতেছিল। চারিদিকে বিরাট জঙ্গল—সেখানে বাঘ, ভালুক, বন্যবরাহ প্রভৃতি বাস করে। তাহাদের উৎপাত অবশ্যই সহ্য করিতে হয়। আমরা মাত্র ৩দিন জঙ্গল-বাস করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিন শুনিলাম, পূর্ব দিন বাঘ একজন গ্রাম্য-কৃষকের একটি গরু লইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিনে শুনিলাম, একজন পাহাড়িয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিতেছিল, বাঘে তাহাকে কামড়াইয়াছে—লইয়া যাইতে পারে নাই—তাহাকে সহরে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য শারদীয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে ছাদে দাঁড়াইয়া আমরা বাঘ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কিছু দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। দিনের বেলায় বনজঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—অবশ্য ৪ জন একত্র। আমার সঙ্গী আড়িয়াদহের মহাপ্রাণ শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তাপসকুমার মিত্র ও কলিকাতা নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের এটর্ণি শ্রীহেমন্তকুমার দে। সন্ধ্যার পর আমাদের আর বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় নাই। আমরা যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে শ্রীমান তাপসকুমার এক বন্য বরাহ মারিয়াছিলেন, তাহার ওজন ছিল ২ মণ। মধ্যে একদিন দুইটি বড় ভালুক আসিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল ও পরস্পরে মারামারি করিয়াছিল—দূর হইতে প্রবোধবাবু তাহা দেখিয়াছিলেন। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে সাপ থাকাই স্বাভাবিক—কাজেই প্রায়ই সর্পদংশনে মানুষ মারা যায় ও মানুষের লাঠি বা গুলীতে সাপ মারা হয়। শিয়াল প্রভৃতির কথা না বলাই ভাল। জঙ্গলে বহু সজারু, খরগোস প্রভৃতি বাস করে—তিতির, ঘুঘু প্রভৃতি পাখীও অনেক। শিকারীদের পক্ষে স্থানটি লোভনীয় বটে। বন্য কুক্কুট প্রচুর পাওয়া যায়। সংরক্ষিত জঙ্গলে হয়ত শিকার করিতে দেওয়া হয় না—কিন্তু বোথারো ও কোনার নদীর মধ্য দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে ও সঙ্গে বন্দুক থাকিলে বহু জন্তু জানোয়ার হত্যা করা যাইবে।

আমরা এই স্থানে একজন অধ্যাবসায়ী ব্যক্তির একক চেষ্টায় যে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আজ দেশে এই এই প্রকার সাহসী ও উৎসাহী কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, মিত্র মহাশয়ের এই বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টা দেখিয়া বহু লোক প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিবে।

সাগর-কন্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সাগরের ঢেউ গোধূলি-আলোকে ঝল্‌মল্ করে, ঝল্‌মল্,
সাগর-কন্যা, দোলাও সোনালী চুল ?
নয়নের নীল আকাশের নীলে চঞ্চল, হয় চঞ্চল,
সাগর-কন্যা পরেছ ফেনার ফুল ?
মুঠি-ভরা আলো ছুড়ে ছুড়ে দাও আকাশে,
করতালি দিয়ে গান গেয়ে ওঠে বাতাসে,
ঢেউয়ে দুলে দুলে যৌবন তব উচ্ছল, হয় উচ্ছল,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও কূল !
হাতের কাঁকনে শুক্তি-ঝিনুক ঝিক্‌মিক্ করে ঝিক্‌মিক্,
সাগর-কন্যা, পরেছ প্রবাল হার,
সিন্ধু-শকুন সাঁতারু শঙ্খে তুলে নিক্ ঠোঁটে, তুলে নিক্,
রঙিন্ পালকে সাজাক্ অলকভার !

মৎস্য-নারীরা শয্যা রচুক্ নগ্নবুকে,
শুভ্র ফেনার স্নেহ-চন্দন বুলাক্ মুখে,
ভোরের কুহেলি নীল আঁখি হ'তে খুলে দিক্ দ্বার, খুলে দিক্,
সোনালী পূর্ব্বাশার !
সাগর-কন্যা, পথভুলে যদি মধুরাত আসে, মধুরাত,
প্রবাল-প্রদীপ জ্বালো !
জাফ্‌রাণী চাঁদ করিবে কি মনে রেখাপাত, কোন রেখাপাত,
ছড়াবে ও মনে আলো ?
কোন্ লবঙ্গ দ্বীপের বাতাসে এলায়ে কেশ
সাগর-শৈলে বসে রবে একা শিথিল বেশ ?
সাগর-কন্যা, সাথী যদি চাও, ধরো হাত, মোর ধরো হাত,
বাসিবে কি মোরে ভালো ?

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পরিত্যক্ত

ফটো : বজলে. হোসেন

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঘাটের প্রান্তে

ফটো : গৌর দত্ত
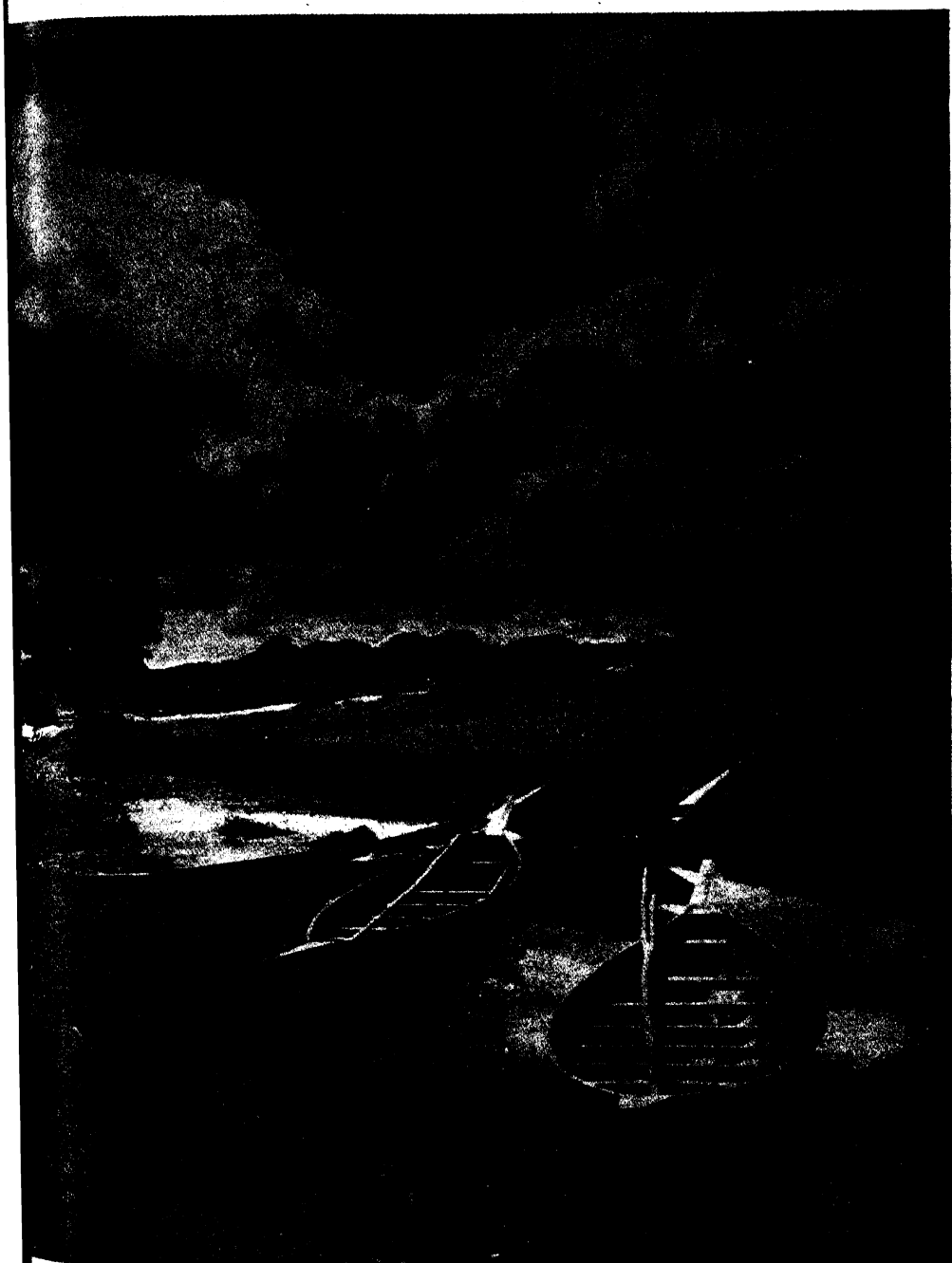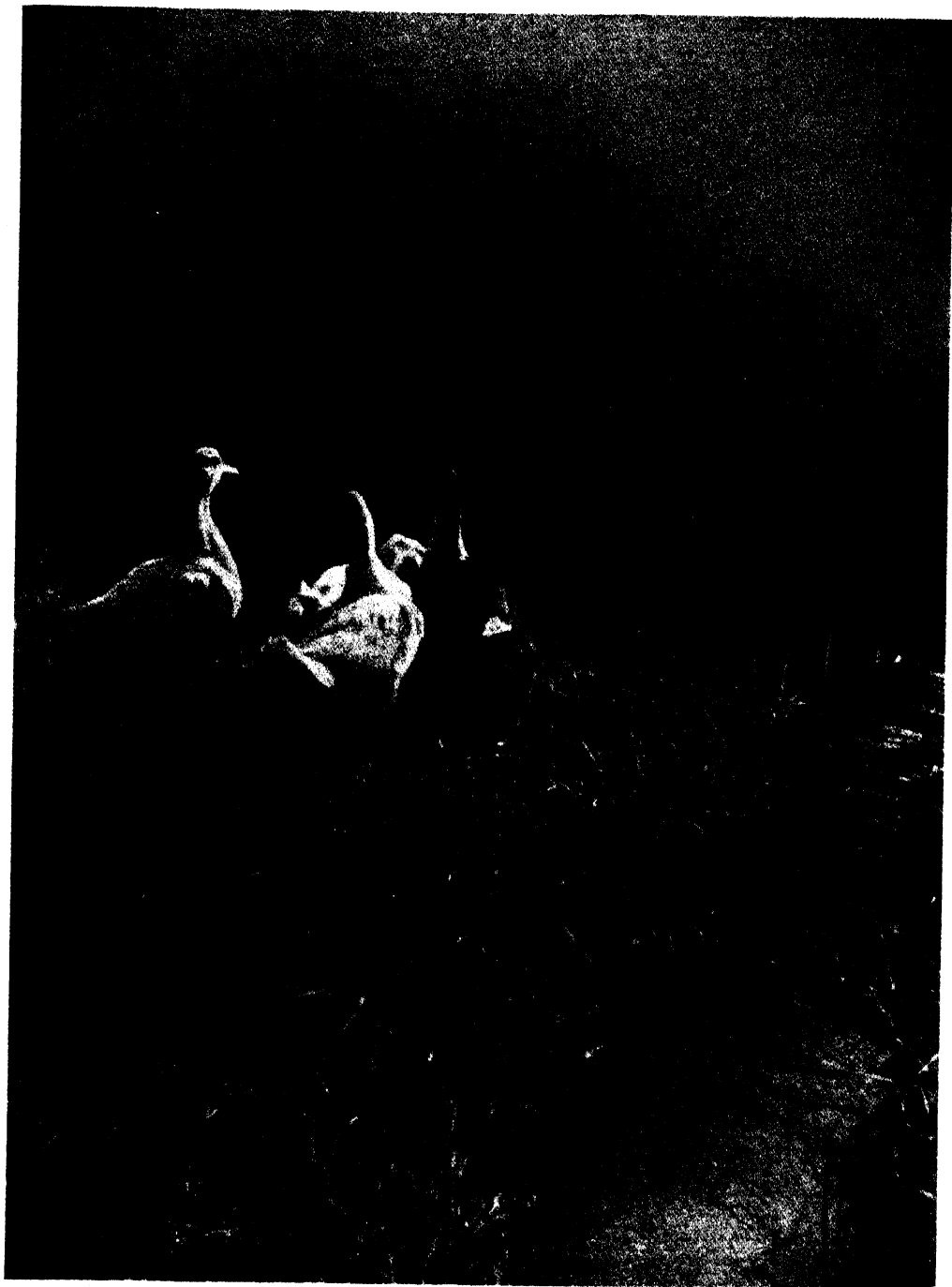
মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

হাস্য-রস পরিবেশনে মহিলা সাহিত্যিক

হাসিরাশি দেবী

শিল্পজগতের মত সাহিত্যজগতেও মেয়েদের দান খুব কম নয়। আমরা জন্মেছি বিংশ শতাব্দীতে। সভ্যতা-গর্ব্বিত নগরীর ধরাবাঁধা সময়ের মাপকাঠি মেপে জীবনযাত্রা সত্ত্বেও মনের রসভাণ্ডারে রূপ-রস-ছন্দ ও গন্ধের যে পথগুলি নিজেকে প্রকাশের আকুলতা নিয়ে মন থেকে বার হ'য়ে আসতে চায়—আনন্দ তার উৎস এবং উৎসাহ তার প্রযোজক। ভাবসম্পদ, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও রচনা-নৈপুণ্য, প্রত্যেককেই প্রত্যেকের সামনে নিয়ে আসে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে ;—কিন্তু এর জন্য বিভিন্ন স্তর নির্দ্দিষ্ট হয়েছে —রসজ্ঞদের বিবেচনা এবং বিচারে।

আজকের কথা হ'চ্ছে সে বিচার নিয়ে নয়, বৈচিত্র্য নিয়ে। মানুষের ব্যবহারে—সঙ্গতি অসঙ্গতি আছেই ; শোভন-অশোভনতার প্রশ্ন এবং মীমাংসাও আছে এই সঙ্গে ; এবং এরই আবেগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রচনা-কৌশলের উপরে। সুখ এবং দুঃখ অনুভবের দৃষ্টান্ত এই ভাবেই রূপায়িত হ'তে দেখা যায় মেয়েদের রচনাতেও—কিন্তু দেখা যায় না কৌতুকানুভূতির সম্পূর্ণ ও নিপুণ প্রকাশ। যুগ থেকে যুগান্তরে মহিলাদের যে লেখনী নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ ক'রে এসেছে, তাতে সুখ এবং শান্তিপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ ঘটেছে যতখানি—তার চেয়ে ঢের বেশী প্রকাশলাভ ঘটেছে দুঃখের। দুঃখকে ভিত্তি ক'রেই বিরহ বা অভিমানের প্রকাশে মেয়েদের লেখনী হ'য়ে উঠেছে মুখর। পাঠক-সমাজের চিত্তও সে কাহিনী পাঠ ক'রে হ'য়ে উঠেছে বেদনাতুর। কিন্তু কৌতুকানুভূতির প্রকাশ সে যুগ থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত কোনও মহিলার লেখনীতে নিবিড় ভাবে ধরা দেওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না। হাস্যরস-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বহু। এদেশের সাহিত্য, গান, গল্প, ছড়া ও কাহিনীতে—হাস্যরস রচনার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে—ভারতীয় আলংকারিকদের মতে। রসসৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সে উদ্যোগ আয়োজন এবং প্রশংসাও কিছু না কিছু দেখা যায় ; কিন্তু মেয়েদের লেখনী এবিষয়ে একেবারে নীরব বলেই মনে হয়। অবশ্য রস-সৃষ্টির প্রয়াসে যে ব্যক্তিগত জীবনই একমাত্র দায়ী বলে অনেকে মনে করেন—একথা সব সময়ে স্বীকার্য্য না হ'লেও আংশিক সত্য। সমাজ, সংসার এবং যে পরিবারভুক্ত হ'য়ে মেয়েদের জীবন কাটাতে হয়—রসপ্রকাশের বেশীর ভাগ সময়ই নির্ভর ক'রতে হয়—তার উপর ; এইজন্য পারিবারিক আবেষ্টনীকে স্বীকার এবং তাকেই আশ্রয় ক'রে তাঁদের যতটুকু হাস্যরসের অবতারণা করা সম্ভব, তার জন্য—কয়েকটি সম্বন্ধও সৃষ্টি করাই আছে সমাজে ; যথা,—বৌদি, 'শালাজ', ঠাকুরমা বা দিদিমা, শ্যালিকা ইত্যাদি। কিন্তু এছাড়াও যে হাস্য-রসের বিস্তারিত দরকার আছে, একথা মেয়েরা কোথাও উল্লেখ করেছেন ব'লেও মনে হয় না।

আমাদের সমাজে যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল বহুকাল থেকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণ মেলে প্রায় সর্ব্বত্র, কিন্তু এর স্পর্শ মেয়েদের লেখনীতে কোথাও স্পষ্ট হয় নি। মেয়েদের লেখনীতে ব্যঙ্গ-কৌতুক বা হাসি-তামাসার যেটুকু ইঙ্গিত ক্বচিৎ কোথাও দেখা দেয়—তাও হাস্যরস রচনায় সার্থক নয় ;—এইজন্য তাঁদের অসার্থক চেষ্টা রুচিবিকৃতি ও ভাষার দৈন্যে মনের নিম্নস্তরের আশ্রয় লাভ করে। হাস্য-সাহিত্যে মহিলারা তাই অত্যন্ত কৃপণা—এবং প্রায় ব্যর্থ।

অবশ্য হাসবার ক্ষমতা সকলের থাকে না,—আবার কেউ কেউ না হেসে থাকতে পারেন না—তা সে যত গভীর

চিন্তা-স্রোতেই তাঁকে ভাসতে হোক। এরকম হাসি হাসবার অধিকার তাই জন্মগত ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে ;—কিন্তু যাঁরা হাসবার কারণ ঘটলেও হাসেন না, পরম ঔদাস্যভরে মুখখানাকে—"রামগরুড়ের ছানা, হাস্‌তে আছে মানা—" এই শ্রেণীভুক্ত ক'রে রাখেন,—তাঁদের কি বলা চ'লবে ? হাসতে গিয়েও যদি সঙ্কুচিত হ'তে হয়,—মনে মনে ভয় থাকে—"এই বুঝি লোকে কিছু বলে",—তাহ'লে কৌতুকানুভূতিই তো লুপ্ত হবে !

আসলে, হাস্যরসসৃষ্টি ও পরিবেশনে যতখানি পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন—মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনে তার একান্ত অভাব। সেজন্য পরিহাস-প্রিয় রচনা তাঁদের রচিত সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু তাঁদেরই উদ্দেশ্যে রচিত এই ধরণের হাস্যরস-সাহিত্যের উদাহরণ পাওয়া যায় বহু। যেমন

"হাট গেছলো জায়ের মা,
সে দেখেছে—বাঘের পা ;
সে দেখেছে, আমি শুনেছি,—
মরি বাঁচি, বাবা ! বাঘ দেখেছি।"

কিম্বা—

"এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী,
পুড়ে ম'লো তার ফ্যান-গালুনী।"

নিতান্ত-ঘরোয়া-আচার, অনুষ্ঠান এবং কার্য্যাবলীকে কেন্দ্র ক'রে এই হাস্যরস রচনাগুলির প্রকাশ। এগুলিকে দেশজ বুড়া হিসাবে ধরা যায়। এছাড়া কবিতা, ব্রতকথা, রূপকথা এবং প্রবাদ'এর সব কয়টিকেই লোক সাহিত্যের অঙ্গ ব'লে ধরা যায়। যদিও এগুলির অধিকাংশই প্রচারিত হ'ত লোক মুখে-মুখে—এবং গ্রাম-বাংলার জীবনধারার সঙ্গে সম-প্রবাহে। মেয়েলী গান ও ছড়া নামে এগুলি খ্যাতিলাভ ক'রেছিল এবং আজও ক'রছে। কিন্তু মানুষের কৌতুকানুভূতি এবং হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস সেখানে যৎসামান্য—এও বেশীর ভাগই ব্যর্থ ব'লে মনে হয়—কারণ সেখানে নিপুণতার অভাব।

ভাষা এবং প্রকাশ-নৈপুণ্য হাস্যরস-সৃষ্টির প্রধান উপাদান, এজন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রতিভার। যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁরা জানেন যে হাসির মধ্যেও স্বাদ-পার্থক্য আছে। রসিকমন না হ'লে রহস্য নিবেদন করা যেমন বিপজ্জনক—তেমনি বিসদৃশও। এজন্য হাস্যরস পরিবেশনের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও সচেতন থাকা দরকার। মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবন এবিষয়ে কিছুটা অনভিজ্ঞ ব'লেই খুব সম্ভব হাস্যরস পরিবেশনে তাঁরা পরাঙ্মুখ। কিন্তু তা হ'লেও—বর্ত্তমান গতি-প্রগতির পথে তাঁরা যখন অনগ্রসর নন, তখন এ সম্বন্ধেও তাঁদের সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার আশা করি।

—

সমাজ ও শিক্ষিতা মেয়ে

শ্রীমহামায়া দে

মেয়েদের সম্বন্ধে আজকাল সকল রকম কাগজে নানা বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরাই এ আলোচনা করছেন নানাবিধ সমস্যায় মেয়েদের জীবন ভারাক্রান্ত—পূর্বাপর চিরদিনই কতবার কত যে কুটকচালী আইন কানুন বিধি নিষেধ সৃষ্টি করা হয়েছে এই মেয়েদের জন্যে—তার আর সীমা নেই। কিন্তু কোনদিনই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি মেয়েদের সম্বন্ধে।

অতীতের কথা ছেড়ে দিই, বর্তমান নিয়েই আমার কথা। বর্তমানে মেয়েদের জীবনে তিনটি বিষয় মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—শিক্ষা, বিবাহ ও অর্থ উপার্জন। কিছুদিন আগেও ছিল মেয়েদের বাল্যে বিবাহ। বয়স্থ কুমারী মেয়ে প্রায় দেখাই যেত না। মেয়েদের শিক্ষার কোন বালাই ছিল না, একটু আধটু অক্ষর পরিচয় হলো তো হলো, না হলো তো কিছু এসে গেল না। আর মেয়েদের অর্থ উপার্জনের কথা বাদই দাও। সে প্রশ্ন কারোর মনে কোনদিন ওঠেও নি। কিন্তু আজ ঐ তিনটি বিষয় মেয়েদের জীবনে এমন এক জটিলতার সৃষ্টি করেছে, যার সুষ্ঠু সমাধানের কথা ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

প্রথম বিবাহের কথা ধরা যাক। একটা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ আজকাল যেন প্রায় থেমেই গেছে। আগে বিবাহের মূলে ছিল পণ সমস্যা। আজও অবশ্য সেটা বলবৎ আছে, তার সঙ্গে আরও এসে যোগ দিয়েছে কিছু, যার ফলে সমস্যাটা হয়েছে আর একটু জটিল। মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করার ফলে—শিক্ষার দিকটা বেশ একটু প্রসারিত হয়ে গেছে। মেয়েদের বিবাহ হবে না—আর অলসভাবে ঘরে বসে থাকবে—এরকম মনোভাব আজকাল অনেক পিতামাতারই নেই, মেয়েদের তো নয়ই। কাজেই যতদিন না বিবাহ হয়, মেয়েদের পড়াশোনা করেই চলে। বিদ্যার ওজন বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার বয়সও বাড়ে। ঠিক এর পরের দিকটা অনামিকা রায় ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যায় বিস্তারিত বলেছেন তাই আমি আর বললাম না। তিনি যা বলেছেন, তা একাধিক মেয়ের আত্মকথা। আমাদের [illegible] এই পরিস্থিতি। কিন্তু

মীমাংসা কি? মেয়েদের লেখাপড়া না শেখানোই কি এর সমাধান? কিন্তু তাতেও তো সমাধান পাওয়া যায় না। আমাদের এক ধনী, রক্ষণশীল, বনেদী ঘরের কথা জানা আছে, মেয়েদের আব্রু সম্বন্ধে তারা এমনই সতর্ক যে বাড়ীর চাকর পুরোহিতের সম্মুখেও তাদের বার হওয়া নিষেধ। 'ঠাকুরের' পরিবর্তে 'ব্রাহ্মণীর' দ্বারা রান্না-কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। এমন ঘরের মেয়েরা যে রাস্তায় বার হয়ে স্কুলে যাবে না বা গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করবে না, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শিক্ষা বলতে হয়তো দ্বিতীয়ভাগের জ্ঞানটুকু—যা নিজেদের মধ্যে হয়। কিন্তু মেয়ের বিবাহের পণ সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত। দশ পনের হাজার পর্যন্ত উঠতে পারার ক্ষমতা তাদের আছে। সেই হেতু শিক্ষিত ধনী পাত্রের দিকে তাদের লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। সম্বন্ধও আসে, মেয়ে দেখানোও চলতে থাকে, কিন্তু শিক্ষিত পাত্র পক্ষ ফিরে যান এই বলে যে —শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে শিক্ষিতা মেয়ে না হলে কেমন করে আমরা রাজী হই। ছেলেই বা তাতে রাজী হবে কেন? টাকা নিয়ে তো আর ধুয়ে খাবো না। অতএব বহু এরকম সম্বন্ধ ফিরে গেছে অশিক্ষিতা মেয়ে দেখে। টাকা দিয়ে শিক্ষিত ছেলে কেনা যায় নি। যুগোপযোগী মেয়েদের শিক্ষিতা হতে হবে এইটাই তারা ইশারা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে গেছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পণের বহরেই সে মেয়ের বিবাহ হয়েছে; কিন্তু বলা বাহুল্য পরিণতি সুখের হয়নি।

তাহলে আমরা দেখছি—মেয়েদের লেখাপড়া না শিখিয়েও পার নেই। তবে নেওয়া হবে কোন পন্থা? শিক্ষায় মেয়েদের কৃতিত্ব আজ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করলেও মেয়েরা সমাজজীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। সমাজও এই শিক্ষিতা মেয়েদের একটা শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে তাদের সামনে বেশ একটা প্রাচীর খাড়া করে তুলছে।

প্রবন্ধ বেশী বড় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি সংক্ষেপেই বলছি —এই পরিস্থিতি সমাজের পক্ষে আদৌ মঙ্গলের নয়, মেয়েরা যতই শিক্ষিত হয়ে উঠবে, তাদের আত্মসম্মানজ্ঞানও ততই বাড়বে। তখন পর-নির্ভরশীলতা হতে তারা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করবে, অর্থাৎ অর্থ-উপার্জনে সচেষ্ট হবে। এতে বিবাহ সম্বন্ধে সমস্যা বেড়ে গেল আরও। যেখানে শিক্ষিতা মেয়েকে বধূ করা ভয়ের কারণ, সেখানে চাকুরে মেয়ের কথা তাদের পক্ষে কি হতে পারে সহজেই অনুমান করা যায়।

আর একটা কথা ভেবে দেখবার আছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ স্বামীর অর্থের প্রতিই দ্বিধাহীন দাবী করতে পারে। স্বামীর ওপরই নিঃসঙ্কোচে নির্ভর করতে পারে। সেখানে শিক্ষিতা অশিক্ষিতা বলে কোন ব্যবধান নেই—সকলেরই সমান মনোভাব। কিন্তু শিক্ষিতা ও সাবালিকা মেয়ে পিতা ভ্রাতার ওপর নির্ভর করতে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করে। কাজেই তারা স্বাবলম্বনের উপায় নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করে। অথচ এই স্বাবলম্বী মেয়েদের সহৃদয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখার মনোভাব আজও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। মেয়েদের শিক্ষা চাইছি, তার ব্যবস্থা ষোলআনা করবার দিকে এগোচ্ছি; এদিকে শিক্ষিতা মেয়েকে গ্রহণ করবার বেলায় ইতস্ততঃ করছি।

দিনের পর দিন সমাজের পরিস্থিতি এই রকমই গড়িয়ে যাচ্ছে; সমাজ ব্যবস্থা এই রকম শিথিল হতে থাকলে দেশের কল্যাণ দাঁড়াবে কোথায়? তাই এর উপায় অন্বেষণ অতি অবশ্য প্রয়োজন।

আমি বলি কি, দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের হাতেই আছে এর মীমাংসার উপায়। আমি জানি তাঁদেরও মনের কথা। পণ সম্বন্ধে একেবারেই যে তাঁরা নির্লোভ, তা নয়। এদিকে শিক্ষিত মেয়েকেও তাঁরা সঙ্গিনী করতে চান। কিন্তু এগোতে পারেন না এই আশঙ্কায় যে শিক্ষিতা বধূর সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলতে পারবেন কিনা। মেয়েদের দাবিয়ে রাখার মনোভাব সংস্কারের আকারে এখনও তাদের রক্ত-ধারার মধ্যে প্রবাহিত।

কিন্তু আমি তাঁদের বলি—অমূলক আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরা এগিয়ে আসুন। গৃহলক্ষ্মী তাঁদেরও প্রয়োজন। ঘরে ঘরে অযথা কুমার কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশের অকল্যাণ যেন তাঁরা ডেকে না আনেন।

মা হওয়া কি মুখের কথা

শ্রীনীলিমা শ্যাম

মা নামের সাথে যে কত মধুর ভাবের সংমিশ্রণ আছে তা সকলেই জানেন, মা কথা উচ্চারণের সাথে, আমাদের দেহে মনে যে একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয় তা সত্যিই অপূর্ব্ব।

কখনও আপনার কোনও আত্মীয়ার রাস্তায় চলতে চলতে রাত্রির আঁধার নেমে এলো, তিনি হয়ত তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথে পা চালাচ্ছেন কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলেন এক ভীষণ আকৃতির লোক পিছু নিয়েছে, ভয়ে তার বুকের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হলো, লাইট্ পোষ্টের কাছে এলে লোকটী আপনার আত্মীয়াকে সম্পূর্ণ দেখতে পেলো, হয়ত বয়স্কা দেখেই লোকটী বল্লো "আপনি কি একা যাচ্ছেন মা?" মুহূর্ত্তে আপনার আত্মীয়া ওর দিকে চাইলেন, আকৃতি ভীষণ হলেও লোকটী যে ভাল তা যেন নিঃশেষে প্রমাণ হয়ে গেলো; যদিও তিনি লোকটী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তবুও মা ডাকটী এতই মধুর।

করুণা ও পবিত্রতার রূপ নিয়ে যে মা নামের সৃষ্টি হলো, তা কি সব সন্তানের মনে একই ভাবে সাড়া দেয়? আপনি যখন সেদিন আপনার পড়ার ঘরের জানালায় বসে রয়েছেন, দৃষ্টি আপনার পাশের বাড়ীর ছোট টোপ ঘেরা বারান্দার উপর, ছোট একটা মাদুর বিছিয়ে তারই উপর খাতায় কালি দিয়ে লিখছে দশ বৎসরের মেয়ে টুলু—"জননী জন্মভূমিশ্চ, স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এমন সময় সেজে-গুজে ভ্যানিটী ব্যাগ্ হাতে নিয়ে এলেন টুলুর মা, চমকে উঠে টুলু—"কোথায় যাচ্ছ মা? আমিও যাবো তোমার সাথে।" মা বল্লেন—"না, তোমার মাষ্টার আসবেন এক্ষুণি,

আজ বাদে কাল পরীক্ষা এতোগুলি পয়সা দিয়ে রেখেছি কি মিছেমিছি?" টুলু প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে বলে "এতো তুমি রোজই বলো, পরীক্ষা হলেও বলো, না হলেও, তুমি রোজ রোজ বেড়াতে যাবে আর আমাকে নেবে না কেন—আমি যাবোই যাবো।" মা খুব জোরে ধমকে ওঠেন, "বেশী বাড়াবাড়ি করোনা, তোমার বাবা শুনলে এমন মার দেবেন আর ভুলবে না, মেয়ে যত বড় হচ্ছে ততই যেন বেয়াড়া হচ্ছে। বড়দের সাথে পাল্লা দেওয়া।" বাবার নাম শুনে টুলু দমে যায়। নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। মা জুতোর খট্ খট্ শব্দ তুলে রিক্সায় ওঠে চলে যান বাবার সাথে। ওদের গতি পথের দিকে চেয়ে থাকে টুলু। এক সময় উঠে আসে নিজের জায়গায়। দৃষ্টি পড়ে খাতার লেখা দুইটী লাইনের উপর। অভিমানে ঠোঁট বাঁকা হয়ে আসে, দৃষ্টি হয়ে যায় ঝাপসা। দোয়াত শুদ্ধ কালি উল্টে দেয় খাতার লেখার উপর।

আপনারও মনের ভিতরটা কেমন যেন করতে থাকে, আহা বেচারী টুলু ওর জন্যই যেন রাজ্যের যত নিয়ম। আর যত আমোদ সব যেন ওর মা বাবার জন্য। আপনার মনটা বিষিয়ে উঠলো। ওদিকের জানালা বন্ধ করে দিলেন। চলে এলেন এবার আপনার ভিতরের দিকের বারান্দায়। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটু আরাম করতে চাইলেন, কিন্তু তার কি উপায় আছে! এদিকটায় যে বাড়ী রয়েছে তাতে কেন এত গোলমাল হচ্ছে দেখার জন্য আপনি রেলিংএ ঝুকে নীচের দিকে চাইলেন। এ বাড়ীর মালিক কৃপানাথবাবুকে আপনি খুব চেনেন। এ তল্লাটে সবাই চেনে—যেমন হাড় কঞ্জুষ তেমন টাকার কুমীর। এত বড় পরিবার অথচ চাকর, মাষ্টার কিছুই এ-বাড়ীতে কেউ রাখার কথা মুখে আনতেও পারে না। তাই বাড়ীর ছেলেরাই হাট বাজার করে। কৃপানাথবাবুর ১৬ বৎসরের ছেলে সন্তোষ, বাপের কাছে মার খাচ্ছে আর ষাঁড়ের মত চ্যাচাচ্ছে। "আর মেরো না বাবা, আর কখনও করবো না—।" দূরে দাঁড়িয়ে ছেলের মা ঝরঝর করে কাঁদছেন আর বলছেন—"মেরে ফেলো ছেলেটাকে তা'হলে তোমার শান্তি হবে। হাড় কঞ্জুষ কোথাকার সবাইকে জ্বালিয়ে খেলো।" আপনার আর সহ্য হলো না ওপর থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন—"ওকি হচ্ছে কৃপানাথবাবু, ছেলেকে মারছেন কেন?" ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন "আর বলেন কেন মশাই! কাল আমার একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল ভাবলাম একটু "ওভেলটিন্" খেয়ে শুয়ে পড়বো, ছেলেকে পাঠালাম ৫৲ টাকার নোট্ দিয়ে, বল্লাম ৩৲ টাকা দাম হবে—একটা নিয়ে আয়। ছেলে ফিরে এলো, বল্লে, "আজ থেকে দাম বেড়ে গেছে, ৫৲ টাকা নিল।" আজ আমি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেসা করলাম, ও বল্লো "দাম বাড়ে নি আগের দাম তিন টাকাই আছে।" দেখলেন তো মশাই এতে লোকের মাথার ঠিক থাকে?" আপনি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"কেন মশাই ঐটুকু ছেলেকে দিয়ে সওদা কিনতে পাঠান! নিজে করলেই তো পারেন, এই করেই ছেলেরা চুরি শেখে।" কৃপানাথবাবু হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়েন। "হয়েছে হয়েছে মশাই, পাদ্রী সাহেবের মত তো লেকচার দিলেন, বলি ব্যাটেলার; মানুষ বুঝবেন কি? আমি তো আর বড়লোক নই যে পাঁচটা চাকর রাখবো? ছেলেকে সওদা করতে পাঠাবো না, হাতির খোরাক দিয়ে পুষবো।" আপনি একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন, বলে কি! বীর বিক্রমে কৃপানাথবাবু ঘরের ভিতর চলে যান। আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন, রেলিং ধরে প্রায় সেই ভাবে। সন্ধ্যার আঁধার নামে পৃথিবীর বুকে। আপনি দেখতে পান সন্তোষের মা ওর হাত ধরে চুপি চুপি দাঁড়ান উঠোনের এক কোণে। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলেন "নে একটাকা চার আনা দিয়েছেন বাজারের জন্য। চার আনার ছোট মাছ নিয়ে আসিস ওর জন্য, আর এক টাকা দিয়ে সব্জী। আর এই নে আট আনা, আর তোর কাছে যে দুই টাকা আছে, তার একটাকা নিয়ে নিস তুই আর একটাকা মানে এই দেড় টাকায় আস্তো একটা ইলশে মাছ নিয়ে আসিস।" তার পর আলগোছে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন "আহা কি মারটাই-না খেলো এর জন্য।" সন্তোষ দাঁত কড়মড় করে বলে, "দেখো, বড় হয়ে নি, এর শোধ একদিন নেবো।" আপনি মনে মনে ভাবেন এই কি করুণাময়ী মায়ের মূর্তি। ছেলেকে অধঃপাতের পথে ঠেলে দিয়ে আর বাপকে অপমানিত করে, নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান! কিন্তু এযে অসম্ভব, যে ছেলে বাপকে শ্রদ্ধা করতে জানেনা সে মাকে শ্রদ্ধা করবে কি করে?

আপনি এখানে বসে মন খারাপ করছেন কেন! আসুন রাত হয়েছে। রান্নাঘরে আপনার মামাতো পিস্‌তুতো ভাই বোনের জটলা করে খাচ্ছে তাদের কাছে চলুন মন শান্ত হবে। আজ আপনার বড়-মামীমা রান্না করছেন, অমায়িক আর ভদ্র ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসে। অতএব আপনারও ভাল না বেসে উপায় নেই। মাছের ভাজা ছেলেমেয়েদের পাতে দিয়ে যাচ্ছেন মামীমা। মামীমার বড়ছেলে চঞ্চল ৭ বৎসর বয়স। এখনই বোঝা যাচ্ছে বড় হলে বেশ উদার হবে, পাশে বসে খাচ্ছে আপনার ন' বছরের বোন রুবী। চঞ্চলের পাতে ভাজা দিতে এসে মামীমা দুটো ভাজা একসাথে দিয়ে দেন তার পাতে। দিয়ে বলেন "আহা দুটো পড়ে গেলো। একটা তোমার রুবীদিকে দিয়ে দাও।" চঞ্চল মাছের বড় টুকরোটা রুবীর পাতে দিয়ে দেয়। দেওয়ার সাথে সাথে রুবী তাতে একটা কামড় বসিয়ে দেয়। ভয় পাচ্ছে বদলী করতে হয়। মামীমা প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে ওঠেন "তুই না বলেছিলি বড় ভাজা খাবি তবে ওটা ওকে দিয়ে দিলি কেন?" চঞ্চল অপ্রস্তুত হয়ে বলে "আগে বলোনি কেন? কোনটা বড়?" তার পর কাঁদো কাঁদো সুরে বলে "ও বড় ভাজাটা মুখে দিয়ে ফেলেছে মা।" মামীমা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আপনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন "আমার ভাগের ভাজা ওকে দিয়ে দিন মামীমা। মামীমা একমুখ হেসে আপনার ভাগের ভাজা ওকে দিয়ে বলেন "নাও দাদার ভাগেরটাই এখন খাও। যেমন চোখ বড় করেছ—তোমার নবাবের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল।" তার পর আপনার দিকে তাকিয়ে বলেন "এই ছেলে এমন হয়েছে কাউকে কিছু দিতে হলে ছোট জিনিস হাতে উঠবে না।" পাশে বসে খাচ্ছিল চঞ্চলের [illegible] দিদি। ও সাথে সাথে

টিপ্পনী কাটে "জানো মা দাদাটা না আজ এতোগুলি চাল একটা ভিখারীকে দিয়ে দিয়েছে।" আপনি চলে এলেন আপনার পড়ার ঘরে। এবার যেন আপনি প্রত্যক্ষই দেখলেন মা স্নেহান্ধ হয়ে কত ভুল পথেই না চালিত করেন আপন সন্তানকে।

আপনি এবার সব কিছু মুছে ফেলতে চাইলেন মন থেকে, ভাব্‌লেন সংসারে থাকতে গেলে অমন অনেক কিছুই হয়, তাই বলে তো আর সব ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যায় না! তবুও আপনার মনের কোণে ভেসে ওঠে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যাওয়া ছোট বেলার এক ছবি। চন্দন আপনার বাল্য বন্ধু। কনট্রাকটারী করে আর ইন্‌কামট্যাক্সকে ফাঁকি দিয়ে আজ সে অনেক টাকার মালিক। আপনি শুনেছেন যে বেশী মিথ্যা কথা বলতে পারে ব্যবসাক্ষেত্রে নাকি তারই তত জয়। কিন্তু আপনি ভাবেন টাকাই কি সব, বিবেক কি কিছু নয়? নির্ধনী সত্যের কাছে ধনী মিথ্যা যে সব সময় মাথা নুয়ে রাখে তা আপনি যেন কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। সে দিনের কথা আজও আপনার মনে আছে। চন্দন আর আপনি একসাথে খেলছিলেন। কি একটা কথা নিয়ে দুজনে খানিকটা মারামারি হয়ে যায়। আপনি পালিয়ে আসেন বাড়ীতে। চন্দনের মা যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন আপনার বাবার কাছে। বল্লেন "দেখুন আপনার ছেলের কাণ্ড, আমার ছেলেকে মেরে খুন করেছে।" ব্যাখ্যা শুনে চন্দন চোখ কচলিয়ে কান্নার ভাণ করতে থাকে। অবশেষে মা আবার বল্লেন "কি যে শিক্ষা দিয়েছেন ছেলেকে জানিনা, আমি বলতে এলাম ওকে মারছিস কেন? অমনি আমাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিয়ে দিল। এমন বেয়াড়া ছেলে আমার হলে আমি খুন করতাম।" চন্দন ও আপনি দুজনেই অবাক হয়ে থাকেন। কারণ ঘটনাক্ষেত্রে মার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। আপনার বাবা আপনাকে সৎশিক্ষা দিতে ভুললেন না। কিন্তু শিশু মনে আপনার যে ধাক্কা লেগে ছিল তা ভুলবার নয়। মা হয়ে কেমন করে এতগুলি মিথ্যে বলে গেলেন, হয়ত চন্দনেরও তাই মনে হয়েছিল। তাইতো আপনি ভাবেন চন্দন আজ এত লোক ঠকাচ্ছে কি করে? আপনি ভাবেন মা যেমন করে আমাদের স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারেন, আবার তেমনি মিথ্যা স্নেহে অন্ধ হয়ে সন্তানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

তাইতো বলি "মা হওয়া কি মুখের কথা।" ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, সংযম ও সৎ-শিক্ষা যিনি দিতে পারেন তিনিই তো মা। তবেই না আমরা বলতে পারবো "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কয়েকটি রান্না

শ্রীমতী অনিলা ঘোষ

ফুলকফির রোষ্ট

বড় ফুলকপির প্রত্যেকটি ফুল আস্ত ভাঙ্গিয়া লউন। ঐ ফুলগুলি ভাপে অল্প সিদ্ধ করিয়া লউন। উহাতে আদা-বাটা, লঙ্কাবাটা, পেঁয়াজবাটা, টোমাটোর রস, পরিমাণ মত নুন ও চিনি মাখাইয়া রাখুন। আধ ঘণ্টা বাদে ফ্রাই-প্যানে ঘি চড়াইয়া (নরম আঁচে) ঐ মসলা মাখানো ফুলগুলি লাল করিয়া ভাজিয়া লউন। ফুলগুলি সিদ্ধ করিবার সময় যেন বেশী সিদ্ধ হইয়া না যায়। তাহাতে ঘাঁটিয়া যাইতে পারে। এই রোষ্ট খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়—ইহার স্বাদ অনেকটা মাংসের রোষ্টের মত।

ছোলার-ডালের কচুরি

প্রথমে ছোলার ডাল ভিজাইয়া রাখুন। তাহার পর ঐ ভিজানো ডাল খুব মিহি করিয়া বাটিয়া লউন। ঐ ডালবাটার সহিত আদাবাটা, লঙ্কাবাটা, পরিমাণ মত নুন ও মিষ্টি এবং ভাজা পেঁয়াজ ও রসুন মিশাইয়া উহা ঘি-তে ভাজিয়া লউন। সব শেষে উহার সহিত কিছু কিস্‌মিস্‌ মিশাইয়া দিন। এইবার ঐ ডালের পুর দিয়া কচুড়ি গড়িয়া ঘিতে ভাজিয়া ফেলুন। এই ছোলার ডালের কচুরি মাছের কচুড়ির মত সুস্বাদু হয়।

নারিকেলের চপ

এক সের আলু সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত আদাবাটা, লঙ্কাবাটা, পরিমাণ মত নুন ও হিং মিশাইয়া রাখুন।

একটি নারিকেল কুরিয়া রাখুন। পরে তাহাতে লঙ্কা-বাটা, আদাবাটা, নুন ও সামান্য হিং মিশাইয়া ঘিতে ভাজিয়া লউন। উনান হইতে নামাইয়া উহার সহিত জিরাভাজার গুঁড়া ও কিস্‌মিস্‌ মিশাইয়া দিন।

পূর্ব্বে সিদ্ধ আলু চপের আকারে গড়িয়া ভিতরে ঐ নারিকেলের পুর দিয়া ভাজিয়া দিন। ইহা খাইতে মাছের চপের মত সুস্বাদু হয়।

বিনোবার সঙ্গে ভ্রাম্যমান*

মনকুমার সেন

হাওড়া হইতে ট্রেণে বাঁকুড়া বাঁকুড়া হইতে পুরুলিয়াগামী বাসে প্রায় ২৮ মাইল। শালতোড়া পৌঁছিলাম বেলা ১০টায়। সঙ্গে বিনোবাজীর পাদপরিক্রমায় প্রার্থনা-সঙ্গীত পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শ্রীপরমেশ বসু, আচার্য বিনোবার জীবনীকার শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন। শালতোড় পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায় বিনোবাজীর প্রথম শিবির—বাস হইতে নামিয়া মাটিতে পা দিতেই চারিদিকের একটা চাপা চাঞ্চল্য টের পাওয়া গেল। তোরণ নির্মাণের কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই,—আজ বিকাল হইতেই মেলা বসিবে—দোকানীরা দোকান সাজাইতেছে। বাঁকুড়ার লোকদের কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়ি খাওয়ার সম্পর্কে ঠিক মনে নাই কাহার একটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা পড়িয়াছিলাম; যতদূর মনে পড়ে তাহাতে চায়ের প্রসঙ্গ ছিল না। সম্ভবত এই আইটেমটি তখন পর্য্যন্ত এতটা লোকপ্রিয় 'জাতীয় পানীয়'তে পরিণত হয় নাই! আশ্চর্য কাণ্ড, যতগুলি নূতন দোকান বসিয়াছে তাহার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই চা-এর, সেই সঙ্গে 'মুখরোচক, হজমকারক, বলহারক ও কোষ্ঠবদ্ধক' হরেকপ্রকার তেলেভাজা! দোকানীদেরও সকলে জাত-ব্যবসায়ী নহেন, আনাড়ীও আছেন, মুহূর্তের মধ্যে তাহাও পরিষ্কার হইয়া গেল। শালবন আর খোলামাঠের কনকনে হাড়-কাঁপুনে হাওয়ায় বাসের মধ্যে প্রায় জমিয়া গিয়াছিলাম,—কাজেই ভূদানযজ্ঞ পরিক্রমায় আমাদের প্রথম কর্তব্য হইয়া পড়িল অগ্নিদেবতার শরণ লওয়া!—তিন কাপ (অর্থাৎ গ্লাস)! চা করিতে গিয়া দোকানী তে-পাঁচ পনের মিনিট সাবাড় করিয়া আমাদের অব্যাহতি দিলেন,—তবুও যা' হউক 'পিত্তি' ঠাণ্ডা হইল।

সন্ধানে জানিলাম, বিনোবাজীর অবস্থান-শিবির শালতোড়া ডাক-বাংলো। কর্মকর্তাদের সকলেই মহান্ অতিথির স্বাগত-রচনার কাজে নানাদিকে ব্যস্ত: নদীয়ার সর্বজনপ্রিয় কর্মী শিশিরদা—শ্রীশিশিরকুমার সেনকে কাছে পাইতেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা গেল—অন্তত একটা আস্তানা এবার জুটিবে নিশ্চয়ই। শিশিরদা বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি যেন বালকের মতো একখানি সাইকেলে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছেন—প্রাথমিক অভ্যর্থনার একটা বড় দায়িত্বভারও তাঁহার উপরে, মুহূর্তকালও নিশ্চিন্তমনে থাকিতে পারিতেছেন না। সদাশিব ধরণের মানুষ, ছোট-বড় সকল কর্মীর পক্ষে তাঁহার উপস্থিতি এবং প্রসন্নতাই কর্ম সম্পাদনের পক্ষে একটি বড় প্রেরণা। ইতিমধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যানের শিবদাসবাবু, পত্রিকার অরুণভাই এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় ডাক্তারবাবুর গৃহে ইঁহাদের আপাততঃ একটি বন্দোবস্ত হইল—আমরাও কাছাকাছি একজন গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম।

রাত্রিশেষে আবাস ছাড়িয়া মুরলুর পথে চলিয়াছি। মুরলু বঙ্গবিহার সীমান্তবর্তী আদিবাসীপ্রধান গ্রাম। ডাইনে—বাঁয়ে, সামনে পিছনে আরও শতশত স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা ভোররাত্রির সেই প্রচণ্ড শীতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সীমান্ত-তোরণ অভিমুখে চলিয়াছে। দূর দূরান্ত হইতে দলে দলে লোক বাসেও আসিয়াছে—তোরণ হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে যাবতীয় যানবাহনের বিরাম স্থান। তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় চারিটার সময় মুরলুর বঙ্গ-বিহার প্রান্তে পৌঁছিলাম প্রাদেশিক এবং জেলার নেতৃবৃন্দ অনেকেই তখন পৌঁছাইয়া গিয়াছেন মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠিতেছে—'সন্ত বিনোবা অমর হউন', 'আমাদের জেলায় ভূমিহীন কেহ থাকবে না—থাকবে না', 'আমাদের গ্রামে ভূমিহীন কেহ থাকবে না, থাকবে না।' এই সমস্ত ধ্বনি সম্বন্ধে চারুদার (শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর) একটি নিজস্ব ঢং ও সুর আছে। অতুল্যবাবু বলেন, 'চারুদা আপনি বলুন—নইলে যেন যুৎসই হচ্ছে না!' চারুদা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ধ্বনি দিতে থাকেন,—কর্মীদল সুউচ্চ কণ্ঠে তাঁহাকে অনুসরণ করে: কিন্তু আসল আর নকলের হের ফের থাকিয়াই যায়—তেমনভাবে মধ্যলয়ে, ছন্দে-সুরে বাঁধিয়া আর কেহ জমাইতে পারেন না।

ভোর ৫॥০টা। সদলবলে বিনোবাজীর এতক্ষণে পৌঁছিবার কথা বিহারের প্রান্তীয় শিবির চেঁকশিলা এখান হইতে চার মাইলের কাছাকাছি, আর যে গতিতে তিনি হাঁটেন তাহাতে সোয়াঘণ্টার অধিক লাগিবার কথা নহে। যুগযাত্রীর দর্শন অভিলাষে জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে,—এই আনন্দোচ্ছল মুহূর্তে তুচ্ছ একটি ব্যাপারে একটু ছন্দপতন ঘটিল: চারুবাবু একটি হাতে-কাটা সূতার মালা এবং অতুল্যবাবু একটি ফুলের মালা হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন আচার্যকে বরণ করার জন্য; ইহাতে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেই কেহ কেহ কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে, এখানে কোন মালা দেওয়া হইবে না ইহাই তাঁহারা জানিতেন—দেওয়া হইবে জানিলে মালা তাঁহারাও আনিতে পারিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটার ঐখানেই সমাধি হইল—আর বেশী জানবার ফুরসুতও ছিল না—সকলে তখন সমস্বরে ধ্বনি তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছে: বিনোবাজী আসিয়া পড়িয়াছেন।

দর্শন-প্রত্যাশায় অধীর জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তিনি, আশেপাশে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীমতী মহাদেবী তাই, শ্রীমতী জানকী দেবী এবং আরও অনেকে। পরিধানে কটিবস্ত্র, আকর্ণ-মস্তক একটি চাদরে মোড়া। ক্ষুদ্রকায়, মুখমণ্ডলে অবিন্যস্ত শুভ্র শ্মশ্রু, দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইলেন: চক্ষুদ্বয়ের অন্তর্মুখী গভীর দৃষ্টিতে ঋষির প্রজ্ঞা,

---

* ১লা জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী প্রত্যূষকাল পর্যন্ত আচার্য বিনোবা ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় পাদ-পরিক্রমা করেন। পরিক্রমাকালীন শ্রীসেন বিনোবাজীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং বিনোবাজীর শিবিরেই অবস্থান করতেন।— সম্পাদক, ভারতবর্ষ।

আর স্থিতপ্রজ্ঞের অনুদ্বিগ্ন মনের ছাপ মুদ্রিত। সামান্যে কী অসামান্য সমারোহ! চারুবাবু ভূ-দানযজ্ঞের এই উদ্‌গাতার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিলেন, 'আপনার পুণ্য পাদস্পর্শে অহিংস বিপ্লবের জন্য বাংলার হৃদয় জাগ্রত হউক।' অতুল্যবাবুও বিনোবাজীকে অভিনন্দিত করিলেন। তোরণদ্বারেই একটি আসন রক্ষিত ছিল, বিনোবাজী তাহাতে বসিলেন: বিহারের বহু কর্মী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন—দীর্ঘ ২৭ মাসের সান্নিধ্যের পরে আজ 'বাবা'র দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে হইবে, মন তাঁহাদের বড়ই ভারাক্রান্ত: এ ভার কত দুঃসহ ভার—প্রকাশ পাইল জয়প্রকাশের ছোট্ট কয়েকটি কথায়। বিহারের পক্ষ হইতে বিনোবাজীকে বিদায় জানাইতে উঠিলেন তিনি—বারবার উদ্গত অশ্রু বক্তব্যের মাঝে তাঁহাকে থামাইয়া দিতেছিল। বিনোবা নিজে কিছু বলিলেন না, সম্ভবত বলার মত মনের অবস্থা তাঁহারও ছিলনা। তাঁহার ব্যক্তিগত সহকারিণী কন্যাধিকা শ্রীমতী মহাদেবী তাই প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন। অতঃপর বিনোবা উঠিয়া একান্তে গেলেন এবং জয়প্রকাশসহ বিহারের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দুই তিন মিনিট কথা বলিয়া শালতোড়ার পথে অগ্রসর হইলেন। ভূ-দান ধ্বনি, গ্রামকীর্তন, সাঁওতালদের মাদল বাজনা, মেয়েদের উলু ও শঙ্খধ্বনিতে মাতোয়ারা হইয়া সকলে তাঁহার আশেপাশে পিছুতে ভীড় করিয়া চলিল। বয়স্কদের চাপে বালকেরা হটিয়া যাইতেছিল, বিনোবাজী একটু দাঁড়াইয়া এবং নিজের দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের কয়েকজনের হাত ধরিলেন এবং দ্রুত চলিতে শুরু করিলেন: বালকদের ইহাতে আনন্দই হইল, তাহারা আরও জোরে চলা আরম্ভ করিল—কিন্তু বিনোবা তাহাতে হার মানিবার পাত্র নহেন, তিনি রীতিমত ছুটিতে লাগিলেন—যেন দশ বারো বছরের বালক। কেবলই সম্মুখপানে ছুটিয়া চলিয়াছেন, পিছনের টান নাই. বালকসঙ্গীরাও মহাস্ফূর্তিতে তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়াছে: বিনোবার নিত্য সাথীরা ছাড়া আর প্রায় সকলেই এই অপ্রত্যাশিত, অভাবিত ঝড়ের মুখে নাটকীয় দুরবস্থার মধ্যে পিছনে পড়িয়া গেলেন!

বাংলোর বারান্দায় আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন-সভা। সমতলভূমি হইতে প্রায় একশত গজ ঊর্ধ্বে একটি টিলার উপর অবস্থিত এই বাংলোটি। চারিধারে অনেকখানি ঢালু জায়গা। প্রভাতের প্রসন্ন সূর্যালোকে ভরিয়া উঠিয়াছে সকল দিক,—নিকটে, দূরে, অতিদূরে ও দিগন্তে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়: কোন কোনটিকে আকাশের খণ্ডমেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। রমণীয় আল্পনা, মঙ্গল-কলস, ফুলবিল্বপত্রাদিতে মহান্ অতিথিকে অভিনন্দিত করার উপযুক্ত কাব্যিক আয়োজন। বিনোবা বসিলেন,—এক পাশে কয়েকটি আদিবাসী বালক। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান কয়েক সহস্র দর্শনার্থী ও শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

"আজ আমি ভগবান বুদ্ধের বিহারভূমি হইতে বৈষ্ণবের বিহারভূমি বাংলায় আসিয়াছি। এক পবিত্রতা হইতে অন্য পবিত্রতায়, এক প্রেমভূমি হইতে অন্য প্রেমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছি। ভারতের সর্বত্র এই পবিত্রতা ও প্রেমের অনুভব রহিয়াছে। স্থানভেদে পার্থক্য শুধু রুচি এবং প্রয়োজনের—প্রেমরস ও ভক্তির অনুভব সর্বত্র একই। বালক বয়স হইতেই বাংলার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ। যৌবনে যখন ব্রহ্মের সন্ধানে বাহির হই তখন ইচ্ছা ছিল হয় বাংলায় যাই, আর না হয় হিমালয়ে। কিন্তু মধ্যপথে কাশীতে নামিয়া গেলাম। কাশী হইতে আমার গতিপথ মহাত্মার দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি বাংলায়ও গেলাম না, হিমালয়েও নয়—গেলাম গান্ধীজীর কাছে। কিন্তু ঐ পথে আমি বাংলার ক্রান্তি এবং হিমালয়ের শান্তি দুইই পাইলাম। গান্ধীজীর আদর্শেই এই দুই-এর সঙ্গম।" অতঃপর ভূ-দানযজ্ঞের মূল ভাবনার কথা বলিয়া বিহারের প্রেম বন্ধনের উল্লেখ করিলেন—"বিহারের জনগণ লক্ষ লক্ষ একর জমি ও লক্ষ লক্ষ দানপত্র দিয়াছেন,—ঐ প্রেরণা লইয়াই আমি আপনাদের সেবা করিতে আসিয়াছি। ইহাতে আমার কত আনন্দ হইতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না।"

"এখানে আসিবার পথে আমি ছোটদের সহিত আনন্দের সঙ্গে ছুটিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছোটরাই শান্তিময় ক্রান্তি সফল করিবে। বয়স আমার ৬০, কিন্তু তখন মনে হইতেছিল যেন ৬ বৎসরের বালক। ছোটদের দীর্ঘদিন আমি শিক্ষা দিয়াছি.—দেখিয়াছি বড়রা যাহা কঠিন মনে করিয়া ছাড়িয়া দেয়, ছোটরা তাহাই তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলে। ব্রহ্মবিদ্যা এবং গীতার ধ্বনি তাহারা দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। ইহার কারণ, তাহাদের মনে ভেদভাব কিম্বা অহংকার নাই। বড়দের এই সকল রিপু পীড়ন করে।"

"বাল্যকাল হইতেই আমার বাংলায় আসার ইচ্ছা। সংস্কৃতে একটি কথা আছে—বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব। দাঁত পড়িয়া যায়, তাই মানুষকে বালকের মত দেখায়। দাঁত উঠার সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে হিংসার উদ্ভব হইতে থাকে। আমি বৃদ্ধ বয়সে বালক হইয়া বাংলায় আসিয়াছি এবং আপনাদেরই ঘরের ছেলের মত। আমি আপনাদের কাছে ভূ-সম্পত্তির অংশ দান চাহিতেছি। বাংলার শিক্ষিত লোকেরা বলেন, 'বাংলায় জমি কম, জমি কোথা হইতে দিব?' কিন্তু ছেলে বাপের কাছে জমি চাহিলে বাপ কি বলেন, যে জমি নাই? সরকার যখন লোকের কাছে চাহেন তখন কম জমি পান—কিন্তু আমার জন্য ষষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশ জমি আছেই। যদি লোকের কথা ঠিকও হয়, তবে আমি বলি, 'কম থাকে তো কমই দিন, আর বেশী থাকিলে বেশী। আমি এই প্রেমের দাবী লইয়াই আপনাদের কাছে আসিয়াছি। আপনারা সকলে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।"

নূতন চীনে জনস্বাস্থ্য

শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র, এম-এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট্-ল, এম-এল-এ

সমগ্রচীনের জনস্বাস্থ্য পরিচালনা মূল চারটি নীতিতে প্রতিষ্ঠিত (১) স্বাস্থ্য-ঘটিত কাজগুলি শ্রমিক, কৃষাণ ও সশস্ত্র সৈনিকদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে (২) প্রতিষেধক ঔষধগুলিতে গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হ'বে (৩) সাবেক চীনের চিকিৎসকরা আধুনিক ঔষধ ব্যবহারে অবহিত হ'বেন (৪) সর্বপ্রকারের জনস্বাস্থ্যঘটিত কার্যাবলী জনগণের সংগে সহযোগিতা রক্ষা ক'রে সম্পাদিত হবে।

জনস্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কাজগুলিও লক্ষ্য করতে হয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য জনগণের আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ ব্যয় হয়ে থাকে। প্লেগ, কলেরা এবং বসন্তের মত সংক্রামক ব্যাধিগুলিকেও প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে সমগ্র চীনে কোথাও কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। মহামারীরূপে প্লেগ-রোগের ব্যাপক আক্রমণও আর সংঘটিত হয় নি এবং ইঁদুরের অত্যাচার একেবারে উচ্ছেদ করা হ'য়েছে। ৩৩৭টি স্বাস্থ্যহিতব্রতী বাহিনী ও ঘাঁটি এবং ২৩০টি রোগপ্রতিরোধদল ও ঘাঁটি বর্তমান আছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্লেগ ও বসন্ত রোগ শতকরা ৯৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সমগ্র দেশে এক দেশাত্মবোধক স্বাস্থ্য-আন্দোলন সুপরিচালিত হ'য়েছে: সরকারের জনস্বাস্থ্যকর্ম এবং জনআন্দোলনের এক সংযুক্ত ভাব জাগানই এর উদ্দেশ্য; এই পরিচালনার মাধ্যমেই বীজাণুর দ্বারা জনস্বাস্থ্য নষ্ট করার চেষ্টা করবার জন্য ইঁদুর, মাছি, মশা এবং সর্বপ্রকারের রোগবাহক শত্রুকে উচ্ছেদ ক'রতে জনসাধারণকে প্রণোদিত করা হয়।

হাসপাতালে শতকরা ৪৪১টি শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নূতন ৩৯০টি পল্লী-আঞ্চলিক হাসপাতাল এবং ৩৮টি সাধারণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ২৬টি স্বাস্থ্যব্রতী দল গঠিত হয়েছে।

জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং কলকারখানাগুলিতে শতাধিক শ্রমিক বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪৮০০,০০০ জন শ্রমিককে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং নারী শ্রমিক ও প্রসূতিরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা পায়। ৫,২৯০,০০৯ সংখ্যক সরকারী কর্মচারী ও কলেজের ছাত্র বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন। অন্যান্য দিকেও আংশিক সুযোগ সুবিধা প্রদত্ত হয়।

চীনে ভারতীয় প্রতিনিধি দল (একাংশ)

সমগ্র চীনা শ্রমিক-সমিতির হাসপাতালে ৩৮,০০০ শয্যাসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে এবং স্বাস্থ্যনিবাসের অন্তর্গত আছে শতকরা ৪৩টি শয্যা। পরন্তু এই সমিতির অধীনে আছে ৮৯০টি বিশ্রামাবাস। কারখানা, খনি ও বৃহত্তর গঠন-মূলক কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া হ'য়ে থাকে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও শিশুর মৃত্যুসংখ্যা বিশেষরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত প্রসূতি হাস-পাতাল ৭'৬ গুণ, শিশুশয্যাগুলি সংখ্যায় ৬'৯ গুণ এবং প্রসূতি ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সংখ্যায় ১৪'৩ গুণ বর্ধিত হয়েছে। এই সময়ে ২১৬ জন ধাত্রীকে পুনরায় ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষাদান করা হয়, ৯০০০ প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যকর্মীকেও শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। সহরের প্রায় প্রতিটি হাসপাতালে আধুনিক প্রথাসিদ্ধ ধাত্রী নিয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩০টি সহরে সোবিয়েৎ প্রথায় বেদনাবিহীন সহজ প্রসব ঘটান চালু হয়েছে। প্রসূতি-মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ৭টির স্থলে হাজারে ৫টিতে কমে এসেছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জন্মকালে ধনুষ্টংকার-জনিত মৃত্যু ঘটত প্রতি হাজারে ৭'২। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এই মৃত্যু হাজারে ১'১ হয়।

সাবেক চীনে চিকিৎসাবিদ্যা ছয় বৎসরের পাঠ্যবিষয় ছিল। এখন উক্ত বিদ্যা মাত্র পাঁচ বৎসরে অধীত হয়। জনস্বাস্থ্য, দন্তচিকিৎসা ও ঔষধ-প্রস্তুতকরণবিদ্যা চারি বৎসরের পাঠ্যবিষয়। শিক্ষাদান ব্যাপারে এখন পুস্তকপাঠ্য ও ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয়েছে। কতকগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয় বৃহত্তর চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণতি লাভ ক'রেছে। বর্ত্তমানে ৩১টি চিকিৎসা বিদ্যায়তনে ২৯,০০০ ছাত্র বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত!

নিয়মিত ভাবে চিকিৎসা বিদ্যা পাঠের ধারা ছাড়াও মাধ্যমিক চিকিৎসা শিক্ষণ কেন্দ্র আছে:—যেমন;—সেবাশিক্ষা বিদ্যালয়, ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষা বিদ্যায়তন ও অন্যান্য চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র। এদের সংখ্যা ২২০টি; ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যার্থী ও রাসায়নিক গবেষণাগারে শিক্ষার্থীর ছাত্র-সংখ্যা ৫৭,০০০।

এ ছাড়াও তিন মাস ও ছয় মাসের পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা যায়। ২০,০০০ জন চীনা চিকিৎসক পুনরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

দেশাত্মবোধক স্বাস্থ্য আন্দোলন গ্রাম অঞ্চলেও দেহশত্রু রোগের বিনাশ সাধনে এবং স্থানীয় উন্নতি-বিধানে প্রযুক্ত করা হয়েছে। যাবতীয় আবর্জ্জনা যাতে সহরের বাহিরে নীত হয় তারও আন্দোলন কার্যকরী হ'য়েছে। ঐগুলি সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্বাস্থ্যবিভাগের উপমন্ত্রী মাদাম ফুং হিয়েনের নেতৃত্বে চীনে পুর্ব্ব-প্রচলিত স্নায়ুঘটিত ও স্ত্রীরোগের গৃহচিকিৎসা সরকারীভাবে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ হইয়াছে।

বেশ্যাবৃত্তি বে-আইনী হওয়ার পরে এবং বিবাহ বিষয়ে নূতন আইন প্রণীত হওয়ায় যৌন ব্যাধি খুবই কদাচিত দৃষ্ট হয়।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে অনুমতি-পত্রহীন চিকিৎসক ও সামরিক চিকিৎসক ছাড়াও সরকার-স্বীকৃত ৫৬,০০০ হাজার চিকিৎসক বর্ত্তমান ছিলেন। মহিলা ও পুরুষ চিকিৎসকদের, অনুপাত ছিল ১: ২।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সংখ্যা প্রায় ১৮০,০০০। সরকারী কুষ্ঠাশ্রমগুলিতে রোগীর জন্য ১০,৬০০ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। এ ছাড়াও কুষ্ঠরোগীদের জন্য আছে নির্দিষ্ট গ্রামঅঞ্চল, আছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত পৃথক কেন্দ্রসমূহ। তা'ছাড়া পরিবারের মধ্যেই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রমিক-বীমা-আইনের সুযোগ সুবিধা দান ইত্যাদির মাধ্যমে যক্ষ্মারোগকে আয়ত্তাধীনে আনবার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। আংশিক বিশ্রাম ও পুষ্টিসাধনের জন্য সরকারী অফিস ও কারখানাগুলির নিজেদের দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সম্পূর্ণ ব্যাপক উপায়ে প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হবার কথা রয়েছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দেও শেষাংশ পর্য্যন্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মন্ত্রিসভা কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল ও ব্যক্তিগত হাসপাতালসমূহ ছাড়াও, যক্ষ্মারোগীদের জন্য সর্বসমেত ১৫৪,০০০ শয্যাসংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। চীনে রাজনীতিক মুক্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্য্যন্ত উক্ত শয্যাসংখ্যা ছিল ৩০,০০০।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল—চীনে সমবেত

জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথা সরকারপক্ষ কর্তৃক উৎসাহিত করা হয় না। কোন আইনও প্রণয়ন করা হয়নি। সে সম্বন্ধে;—কিন্তু জন্ম নিরোধ সম্বন্ধে যে কোনো অনুসন্ধানের উপদেশ হাসপাতালগুলিতে গ্রাহ্য করা হ'য়ে থাকে।

আমাদের সংগে আলোচনায় চীনা-চিকিৎসা-সমিতির সভাপতি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা আমাদের জানিয়েছিলেন, জনস্বাস্থ্য উন্নতির এক ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হ'চ্ছে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা চীনদেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু আসন্ন বৎসরগুলিতে তাঁদের এই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্য্যাদির ক্ষেত্র এবং সে সকলের সম্পাদনা তাঁরা যে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর করবেন, এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়েছেন।

চণ্ডিদাসের দেশ ও কাল

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গত পৌষ (১৩৬১) সংখ্যা ভারতবর্ষে আবার চণ্ডিদাস প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তাহার লেখাটীর নাম "চণ্ডিদাসের দেশ ও কাল"। চণ্ডিদাস নামে তিনি দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করিয়াছেন।

একদল মতলববাজ লোক জাল পুঁথি লিখিয়া বহুদিন পুর্ব্বে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল। একজন কবিতা লিখিয়াছিল, আর একজন পুরাণো হাতের লেখা জাল করিয়াছিল, আর একজন আবিষ্কারক সাজিয়া সেই পুঁথি বিদ্যানিধির হাতে আনিয়া দিয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় সরল বিশ্বাসে সেই সময়ের প্রবাসী পত্রে সেই জাল পুঁথি প্রকাশ করিতেছিলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী (অধুনা স্বর্গত) সুদৃঢ় যুক্তিতর্ক দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। সে সময়ের শনিবারের চিঠিতে সে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই কবিতায় লেখা চণ্ডিদাস-চরিতে জাগো জন্মভূমি গান ছিল, আর ছিল চণ্ডিদাস বাসলীকে বলিতেছেন—

> যে দিনেতে মহম্মদ ঘোর অত্যাচারী।
> সিংহাসনে বসিলেক পিতৃ হত্যা করি ॥
> তার পূর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধু মাসে।
> তুমি কিনা বল মোরে বালক বয়সে।

পাঁচ শত বৎসর পুর্ব্বে খবরের কাগজ নাই, টেলিগ্রাম রেডিওগ্রাম নাই, বেতারে বক্তৃতা নাই, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে বসিয়া এক গরীব বামুনের ছেলে দিল্লীর রাজ পরিবর্ত্তনের তারিখের সঠিক হিসাব রাখিয়াছে। রচয়িতা মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। সেকালের লোক আশ্বিনের ঝড়, ভাদ্রের বান, শ্রাবণের ভূমিকম্প এই সমস্ত মনে রাখিয়া ছেলের জন্মমাস মনে রাখিত। এমন আষাঢ়ে গল্প রচনা করিত না।

(১) চণ্ডিদাসের কাল শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় শত বৎসর পুর্ব্বে হইতে পারে।

(২) চণ্ডিদাসের দেশ বীরভূম, নান্নুরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতেও যাঁহারাই চণ্ডিদাসের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই বীরভূম নান্নুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রমণী মল্লিক, বসন্ত বিদ্বদ্বল্লভ সকলেই বীরভূম নান্নুর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন নান্নুরকে ঠেলিতে না পারিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় মুমুর মাঠের আশ্রয় লইয়াছেন। মুমুর হইতে নান্নুর হইয়াছে, একথা লিখিতে তাঁহার মত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ সুপণ্ডিতের লেখনী বিরত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। বীরভূমে নান্নুর আজিও বর্ত্তমান। বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে তথাকথিত ইতর ভদ্র নরনারী ছেলেকে মুমু বলে, কেহ লজ্জিত হয় না। রাজশেখরবাবু যখন ছাতনায় গিয়াছিলেন, তখন যে শিখাইয়া পড়াইয়া কেহ একজন লোক দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছাতনার লোকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

(৩) বিদ্যানিধি মহাশয় সংস্কৃত চণ্ডিদাস চরিত্রের কথা লিখিয়াছেন। রাধানাথ দাস রচিত বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত বাসলী মাহাত্ম্য পুঁথি বসন্ত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। রাধানাথ ছাতনার লোক। তাহাতে চণ্ডিদাস নাই, দেবিদাস আছেন। সুতরাং সংস্কৃত পুঁথিতে চণ্ডিদাস পরে আসিয়াছেন। আমি যখন প্রথম ছাতনা যাই, জীবন দেঘরিয়া মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "চণ্ডিদাস বীরভূম মামুরিয়ার লোক। ছাতনায় তাঁহার মামার বাড়ী ছিল, তিনি কখনো কখনো আসিতেন।" নান্নুরিয়া বাঁকুড়ায় মামুরিয়া হইয়াছিল।

গত পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। একজন ছাত্র বলিলেন—চণ্ডিদাস লইয়া আলোচনা করিতেছি। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল এম-এ তাঁহার প্রকাশিত পুঁথি পরিচয়ে ১৭১ পৃষ্ঠায় একটী নূতন সংবাদ দিয়াছেন। প্রায় দুই শত বৎসর পুর্ব্বে নান্নুরের একজন লেখক সত্যনারায়ণের পুঁথি লিখিয়াছিলেন। ১১৮২ সালের ৩রা মাঘের লেখা তাহার শেষাংশের নকল পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখক বলিতেছেন—

> পূর্ব্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস।
> করিয়াহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্ব্যাস ॥
> তাহার পুজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষী।
> সেই পাদপদ্ম মোর হৃদে করি থাকি ॥
> ইষ্টদেবের আশীর্ব্বাদ আর রমণীর কৃপাতে।
> রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে ॥
> শিশুমতি অল্প বুদ্ধি কি বর্ণিতে পারি।
> সত্যের আনন্দে বন্দ মুখে বল হরি ॥

নান্নুরের নিকটবর্ত্তী কীর্ণাহার গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গিয়া চণ্ডিদাস দেহ-রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ লেখক স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রমণী বা রামমণির কথাও তিনি উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

নান্নুরে চণ্ডিদাসের ভিটা খনন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখিয়াছেন—ভিটা প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন। এই ভিটায় তিনবার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ভিটা হইতেই বিশালাক্ষী বা বাশলী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নান্নুরের মূর্ত্তি সরস্বতী মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী আজিও অক্ষত আছে। মূর্ত্তির দুই হাতে বীণা, একহাতে জপমালা, একহাতে পুঁথি। ঢাকা মিউজিয়মে এই রকম এক মূর্ত্তি আছে। বাঁকুড়ার পদ্মরণা হইতে এইরূপ একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ছাতনার মূর্ত্তি ধর্ম্ম ঠাকুরের আবরণ দেবতা। বর্দ্ধমান জেলাতে নানাস্থানে এই মূর্ত্তি আছে। নান্নুরের বিশালাক্ষী হইতেই বাশলী আসিয়াছে। এই মূর্ত্তিই চণ্ডিদাসের উপাস্যা। কবির উপাস্যা কি আর ধর্ম্ম ঠাকুরের বাসলী হয়। সরস্বতীর প্রণাম—

> সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
> বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে ॥

চণ্ডিদাসের পদে নান্নুরের উল্লেখ কয়েকবার আছে। অন্যান্য অনেক পদকর্ত্তাও চণ্ডিদাস প্রসঙ্গে নান্নুরের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ছাতনার কথা কেহ বলেন নাই। মুমুয়া হইতে নান্নুর হইবে না। বরং নন্দপুর, নাম্নপুর, জ্ঞানপুর হইতে নান্নুর হইতে পারে। নানোরও নাম হইতে পারে। বীরভূমে হাজার বৎসরের গ্রাম পুরাণো নাম লইয়া আজও বাঁচিয়া আছে।

পরিচালক—উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্র গঠন

ইচ্ছাশক্তি পূর্ণভাবে অর্জ্জন করে জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত কর্‌তে হোলে, চরিত্র গঠন বিশেষ আবশ্যক। এর জন্যেই শিক্ষার দরকার হয়। অনেকের ধারণা যে, মানসিক শক্তির বিকাশ ও অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তা নয়। চরিত্র না থাক্‌লে ধনের উপার্জ্জন ও রক্ষা সম্ভবপর হয় না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তির বলে বহু টাকা রোজগার করলেও তার উন্নতি কখন স্থায়ী নয়। সে মানসিক শক্তিরও অপব্যবহার করে থাকে। তার আর্থিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা সমাজের অনিষ্টই হয়,—তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ অনেক সময়ে অপরের পক্ষে ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। মার্জ্জিত বুদ্ধি বহু চরিত্রহীন বিদ্বান বুদ্ধিজীবী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মণিভূষিত কাল ভুজঙ্গের চেয়েও ভয়াবহ, আর এদের সংস্পর্শে এলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হওয়া সম্ভব নয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ বিশেষ দরকার যাতে মহৎ চরিত্রের আদর্শলাভ হোতে পারে। চরিত্র সুদৃঢ় কর্‌তে হোলে সদভ্যাস গঠনের প্রয়োজন। সত্যকথন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি নিত্যই অনুশীলন কর্‌তে হবে। সচ্চরিত্র ব্যক্তি লোক সমাজে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র হয়ে থাকেন কিন্তু চরিত্র হীন ধনী লোকের কাছে বাইরে নমস্কার পেলেও ভিতরে কখন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হোতে পারেন না। কর্ণবিহীন অর্ণবপোত সামান্য ঝঞ্ঝাবাতেই যেমন ভাবে জলমগ্ন হয় অম্নি ভাবেই চরিত্রহীন ব্যক্তি সংসারের সামান্য প্রলোভনেই পাপে নিমগ্ন হয়ে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। বাইরের শিষ্টাচার আড়ম্বর বা সুমধুর বাক্য বিন্যাস চরিত্রের প্রকৃত পরিচায়ক নয়। জীবনের দৈনিক কার্য্যে আর অন্যের সঙ্গে ব্যবহারেই আমাদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাহ্য আড়ম্বর বা কপটতার আচরণে কেউ নিজের চরিত্র দীর্ঘদিন প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। শৃগালের শঠতা আর মেষের ভীরুতা কার্য্যকালে প্রকাশিত হবেই। দেশকাল, বংশ ও অবস্থাভেদে চরিত্রের বিভিন্নতা হয় সত্য কিন্তু চরিত্র গঠন তো আমাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। বংশগত, জাতিগত বা দেশগত চরিত্রদোষ থাক্‌লেও আমরা ইচ্ছাশক্তির চালনা দ্বারা সংশোধন করতে পারি। চরিত্রগঠন বিষয়ে দৈবের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই যত্নবান হওয়া উচিত। একটীমাত্র দীপ থেকে অসংখ্যদীপ জ্বলে উঠে, অসংখ্য স্থানের অন্ধকার দূর করে। একটী কিশোরের উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্র দেখে বহু কিশোরের চরিত্র মহৎ হোতে পারে। পাষণ্ড জগাই মাধাই ক্ষণকালের জন্যে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের সংসর্গে এসে পাপ আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরম ধার্ম্মিক হয়েছিল। ইতর জীবকে কখনই তোমরা কষ্ট দিয়ে চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান ভেঙ্গে ফেলোনা। কীট, পতঙ্গ, শামুক প্রভৃতি প্রাণীদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া বা বধ করা, পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছানা চুরি করে এনে তাদের কষ্ট দেওয়া, প্রজাপতি দেখলেই তার পিছু পিছু ছুটে তাকে ধরে তার পাখা ছিঁড়ে দেওয়া,—এসব নিষ্ঠুর কাজ কখন করবে না, তা'তে ভবিষ্যতে নিজেরাই কষ্ট পেতে পারো। নির্দ্দোষ আমোদ ও খেলাধূলা চরিত্র গঠনের সহায়ক। এরা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি এনে দেয় তা নয়, চরিত্র গঠনেও বিশেষ সাহায্য করে—ইচ্ছাশক্তিকেও সুদৃঢ় করে। ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা অনেককে একত্র করে থাকে। এর দ্বারা যেমন বিমল আনন্দ সম্ভোগ হয়, তেমনই ক্ষিপ্রকারিতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদে ধৈর্য্য, পরাজয়ে সহিষ্ণুতা, রচনাকুশলতা প্রভৃতি নানা রকমের সদ্‌গুণের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

স্বাবলম্বনের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বিশেষ কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। বাল্যকাল শিক্ষার উপযুক্তকাল। একালে যেরকম শিক্ষালাভ করা যায় ও যে অভ্যাস বদ্ধমূল হয় উত্তরকালে তদনুসারে সুফল বা কুফল ফলে থাকে। বাল্যকালকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলবার জন্যে তোমরা বিশেষ চেষ্টা করবে। ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জনের পক্ষে দৈনন্দিন বিবরণ বা ডায়েরী লেখার অভ্যাস করা দরকার। পত্র লিখে বন্ধুদের সঙ্গে আর ডায়েরী লিখে নিজের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলা যায়। প্রত্যেক দিনের জীবনের সব ঘটনা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ

করে রাখ্‌বে, তাতে শুধু রচনা ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি যে হয় তা নয়, কি পরিমাণে নিজের উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে, তাও পর্য্যন্ত সম্যক্‌ভাবে জানা যাবে। কোন দূর সময়ের ঘটনা স্মরণ করার পক্ষে ডায়েরী বিশেষ সাহায্য করে থাকে। যার দ্বারা নিজের দুর্ব্বলতা লোকে জান্‌তে পারে, এ রকম ঘটনাগুলোও ডায়েরীতে লিখে রাখতে সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়। যা দেখে, যা পড়ে বা যে কাজ করে নিজের মনে যেভাব উদয় হচ্ছে, তাও অবিকৃতভাবে ডায়েরীতে লিখ্‌বে—সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাঁর একটি ছেলের জন্ম সময় থেকে আরম্ভ করে কয়েক বছর পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি কি পরিমাণে হচ্ছিল, তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, আর সেই বিবরণটী অবলম্বনে তাঁর একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অভ্যাসের প্রভাব দুর্দ্দমনীয়; অভ্যাস বলে পশুকেও মানুষ খেলাধুলার সামগ্রী করে তোলে। তোমরা বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করলে জান্‌তে পারবে তিনি জ্ঞান লাভের জন্যে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে, কিরূপভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিনের মানসিকশক্তির উৎকর্ষ সাধনে সফলতার গূঢ় কারণ হচ্ছে, তিনি সর্ব্বদাই সদনুষ্ঠানে সচেষ্ট ও সতর্ক থাক্‌তেন, ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করতেন। কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা পেলে তিনি উপেক্ষা করে সে সুবিধা ত্যাগ করতেন না। তিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন। এজন্যে বই কিন্‌বার ক্ষমতা না থাকাতে তাঁর আহারের ব্যয় সংক্ষেপ করে অন্ততঃ দু'এক পেনি সঞ্চয় কর্‌তেন। সারাদিন ধরে গুরুতর পরিশ্রম করে তিনি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থেকে প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা পাঠের সময় করে নিতেন, আর দৈনন্দিন বিবরণী বা ডায়েরীও লিখ্‌তেন। শেষে তিনি ধনামধন্য ও বিশ্ববরণ্য হয়েছিলেন। সবারই যে তাঁর মতো স্বাভাবিক উদ্ভাবনীশক্তি থাক্‌বে একথা বল্‌ছিনে, তবে ইচ্ছা লক্ষ্য ও আন্তরিকতা থাকলে এ শক্তি অর্জ্জন করাও কষ্টকর হবে না। তাঁর শ্রমশীলতা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায়, আত্ম-সংযম প্রভৃতি তোমাদের সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত। যদিও তাঁর মতো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌বার সৌভাগ্য অল্প লোকেরই ভাগ্যে সম্ভব হতে পারে কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত হোতে তোমরা সকলেই ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা, উপদেশ ও উৎসাহ পেতে পারো। উদ্যমশীলতারও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন মৃগেরা নিজ হতেই গিয়ে নিদ্রিত সিংহের মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, তেমনই নিরুদ্যম পুরুষ সংসারে কোন কাজই সুসম্পন্ন করতে পারে না। এই সব লোকের মুখে শোন যায়, সময় নেই, কিন্তু যারা কর্ম্মনিষ্ঠ আর সংসারে বড় হবার আশা রাখে, তারা একটি দিনের মধ্যে কত প্রকার কাজ করে তা ভেবে দেখ্‌লে, বিস্মিত হোতে হয়। সময়ানুবর্ত্তিতা চরিত্র গঠনে ও ইচ্ছা শক্তির পুষ্টি সাধনে বিশেষ প্রয়োজন। বীর কেশরী নেলসন বলেছেন—"সকল যুদ্ধে আমি যে জয়লাভ করেছি, উপযুক্ত সময়ে কার্য্য সম্পাদনই তার একমাত্র কারণ।" ওয়াসিংটন এরূপ কর্ম্মকুশল ছিলেন যে, একদা তাঁর সেক্রেটারী বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তা'তে ওয়াসিংটন অবগত হোলেন যে, ঘড়িটি ঠিক চল্‌ছে না বলেই সেক্রেটারীর আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে। তখন ওয়াসিংটন বল্‌লেন—'হয় তুমি নতুন ঘড়ি কেনো, না হয় আমি একজন নতুন সেক্রেটারী আনি—' এই সব আদর্শ গ্রহণ করে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তোমরা নিজেদের চরিত্র গঠন করো আর বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করো এইটাই হচ্ছে একান্ত কামনা। উন্নত কিশোর জীবনই পরিপূর্ণ মানবতার অবতরণিকা।

বুড়োর দস্তানা

শ্রীবিমানচাঁদ মল্লিক

একদিন একটা বুড়ো তার পোষা কুকুরকে সংগে নিয়ে বনের ভেতর বেড়াতে বেরিয়েছে। চলেছে তো চলেইছে। হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়ল, "আরে হাতের একপাটি দস্তানা তো দেখছি নে।"

আসলে হয়েছে কি জান? বুড়োর অজান্তে কখন যে দস্তানাটি পড়ে গেছে সে তা বুঝতেই পারে নি।

এদিকে একটা ছোট্ট নেংটি ইঁদুর এই দস্তানাটিকে দেখতে পেল। তার তো খুব আনন্দ। আনন্দে বলে উঠল, "বারে! কেমন মজা! সারাটা শীত এরই ভেতর আরামে কাটিয়ে দেওয়া যাবে!"

দস্তানাটি ভারি অদ্ভুত। সাধারণ দস্তানার মত পাঁচ আঙ্গুলের জন্যে পাঁচটি খোপ নেই; বুড়ো আঙ্গুলের জন্যে একটা, আর একটা বাকি আঙ্গুলগুলোর জন্যে। অনেকটা বক্সিং খেলার গ্লাভ্‌সের মত।

নেংটি ইঁদুর তার ভেতর দিব্যি ঢুকে পড়ল। কিন্তু এ কি? নীচে দিয়ে যে বড্ড ঠাণ্ডা উঠছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সে, আর চারদিক থেকে এক গাদা ডালপালা এনে একটা মাচা তৈরী করে ফেলল। এইবার মাচার ওপর দিল দস্তানাটা চাপিয়ে। কিন্তু তাড়াতাড়ি মাচায় ওঠে কি করে? ভাবনা কি? একটা মই তৈরী করে ফেলল। আর কি? কোন অসুবিধে নেই।

এমন সময় একটা ব্যাং লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। সে দস্তানা দেখে থেমে গেল; বললে, "কে আছ ভাই ওর ভেতর?"

"কিচির মিচির ডাকি আমি,
আমি ইঁদুর ভাই ;
বাইরে তুমি দাঁড়িয়ে কে গো ?
নামটি বলা চাই।"
"ব্যাং বাবাজী নামটি আমার
পুকুর পাড়ে রই ;
ঐ ঘরে আজ থাকতে পেলে
আনন্দিত হই।"

"বেশ ভালই তো, দেরী কেন ? উঠে এসো।"

কোলা ব্যাং আনন্দে মই বেয়ে উঠলো দস্তানাঘরে ; দুই বন্ধুতে রইল তার ভেতর—ভারি মজা !

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো এক খরগোস, যেন ভারি ব্যস্ত ; কাঁধে তার লাঠির ডগায় বাঁধা একটা ছোট্ট পুটলি।

"ওহে, ওর ভেতর কে আছ ভাই ?" বলে উঠল সে।

"আমরা দু বন্ধু, নেংটি ইঁদুর আর কোলা ব্যাং। কিন্তু তুমি কে বাপু ?"

"শশক আমার নামটি যে ভাই,
বনের ভেতর বাস ;
তোমার ঘরে ঠাঁই পেলে আজ
পুরবে মনের আশ।"

"আরে, এই কথা। স্বাগতম্, এক্ষুণি চলে এসো।"

এবার তারা তিন জনে রইল ঘরে। খরগোস চায় একটু লাফিয়ে বেড়াতে। কিন্তু কোথায় বেড়ায় ? বাইরে যে বড্ড শীত। তায় আবার বরফ পড়ছে। অথচ না লাফালেই নয়। তাই তারা আশপাশ থেকে কাঠকুটো যোগাড় করে ঘরের একটা বারান্দা করে ফেলল।

এবার এলো এক খ্যাঁক্‌শিয়াল। দেখল দস্তানার ভেতর কে যেন নড়াচড়া করছে। ভারি অবাক হয়ে গেল সে। গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো,

"কে গো তোমরা, একটু সাড়া দাও তো।"

"আমরা তিন বন্ধু, নেংটি ইঁদুর, কোলা ব্যাং আর খরগোস। আর তুমি কে গো ? নাম কি তোমার ?"

"শিয়াল ভায়া [illegible] আমার
মাটির ঘরে রই ;
তোমার ঘরে থাকতে দিলে
বড়ই খুসী হই !"

শিয়াল ভায়াকে তারা সাদরে ডেকে নিল। থাকতে দিল তাদের ঘরে। শিয়াল বলল, "দেখ, ঘরটা ভাই বড্ড ঠাণ্ডা। ভেতরে একটু আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে।" জ্বলল আগুন। কিন্তু এ কি ? ধোঁয়ায় যে দম বন্ধ হবার যোগাড়। শিয়াল বলল, "ভাবনা কি ?" সংগে সংগে সে একটা চিমনি এঁটে দিল। চিমনি দিয়ে ভুর ভুর করে ধোঁয়া বের হতে লাগল।

এদিকে সেই ধোঁয়ার নিশানা দেখে এক নেকড়ে বাঘ এলো এগিয়ে। বলল,

"কে আছ বন্ধু ঘরের ভেতর ? একটু দেখা দাও।"

"আমরা চার বন্ধু নেংটি ইঁদুর, কোলা ব্যাং, খরগোস, আর শিয়াল ভায়া। কিন্তু তুমি কে ভাই ?"

"আসল বাঘের খুড়তুতো ভাই
নেকড়ে আমার নাম ;
থাকি আমি মনের সুখে
পেলে তোমার ধাম।"

"বেশ, বেশ, ঢুকে পড়ো।"

"এদিকে পাঁচ জনে বড্ড ভীড় হয়ে গেল। তাই দেখে ইঁদুর আর ব্যাং গেল আরো ভেতরে ঢুকে। কিন্তু আলো কৈ ? আলো চাই যে বাইরের। কি করা যায় ? দস্তানার এক জায়গায় একটু গর্ত করে একটা ছোট জানলা বানিয়ে ফেলল। তাদের কি মজা। নেকড়ে বললে, "দেখ, আমাদের বাড়ীতে একটা ঘণ্টা থাকা চাই, তা না হলে বাইরের লোকেরা আমাদের ডাকবে কি করে।" এই বলে সে একটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিল বাইরে।

এমন সময় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত টুপি আর ওভার কোটে ঢেকে এক বড়ো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছুটে এলো। মুখে তার একটা পাইপ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠল,

"ওহে, কারা এর ভেতর থাকো, একবার এসো তো দেখি।"

আমরা পাঁচ বন্ধু, নেংটি ইঁদুর, কোলা ব্যাং, খরগোস,

শিয়াল ভায়া আর নেকড়ে। কিন্তু তোমার পরিচয় কি ভাই ?"

"শূকর বলে ডাকে সবাই,
থাকি বনের মাঝে ;
তোমার ঘরে থাকব আমি
আজ্‌কে শীতের সাঁঝে।"

"ভাল কথা, কিন্তু আর জায়গা কোথায় ?"

"আরে মিথ্যে ভেবো না, একটু জায়গা করে নেব।"

"আচ্ছা এসো, কিন্তু যদি কিছু বিপদ হয়, আমাদের নামে দোষ দিও না।"

"আরে তা কখনো পারি ?"

এবারে ভেতরে একটুও জায়গা রইল না। ইঁদুর জানলা দিয়ে বেরিয়ে ছাদে উঠে পড়ল। আর খরগোস ভেতরে গিয়ে ব্যাঙের সাথে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। এমন সময় চাপাচাপিতে দস্তানার এক জায়গায় খানিকটা ছিঁড়ে গেল। সংগে সংগে ইঁদুর স্চ'সুতো নিয়ে সেলাইএর কাজে লেগে গেল। কি মজা !

এমন সময় ধীরে ধীরে এক ভাল্লুক এসে হাজির। বলল, "ওহে ভালমানুষের দল, তোমরা কারা ?"

"আমরা কয়েকজন বন্ধু, নেংটি ইঁদুর, কোলা ব্যাং, খরগোস, শিয়াল ভায়া, নেকড়ে আর শুয়োর। কিন্তু তুমি কে হে! তোমার নামটি কি ?"

"আশা নিয়ে এলুম আমি,
আমি ভালুক ভাই ;
তোমাদের ওই ভীড়ের মাঝে
দেবে কি মোরে ঠাঁই ?"

"আরে বলো কি ? তাও কি সম্ভব ?"

"আরে ভাই, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।"

ভাল্লুককে জায়গা দিতেই হলো। কিন্তু এবার এমন চাপাচাপি হল যে দস্তানাটি ফেটে পড়বার যোগাড়।

এদিকে বুড়ো দস্তানা খুঁজতে খুঁজতে তার কুকুর নিয়ে এসে হাজির। দেখে কি না মাচার ওপর তার দস্তানা পড়ে রয়েছে, আর তা নড়াচড়া করছে। বুড়ো তো ভারি অবাক ! ভাবল, এটা জ্যান্ত হয়ে গেল নাকি ?

তার পর ভাল করে দেখে কি না—তার দস্তানার মধ্যে রয়েছে এক গাদা জন্তু জানোয়ার। সে তো ভয় পেয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে গেল তাদের কাছে। কুকুরের ডাক শুনে তারাও বেরিয়ে পড়ল, আর চিৎকার করে উঠল ভয়ানক ভাবে। তখন এমন এক ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল যে বুড়ো তো একেবারে—দে ছুট। কুকুরটাও লেজ নীচু করে তার প্রভুর পিছু পিছু ছুট দিল।

এখন জন্তু জানোয়ারদের কি আনন্দ। তারা হো হো করে হাসতে লাগল। এর পর তারা মনের সুখে বাস করতে সুরু করল সেই দস্তানার ভেতর।*

* একটি ইউক্রেন দেশের গল্প অবলম্বনে লিখিত।

প্রভাতে

শ্রীঅরুণা কর্ম্মকার

অরুণ উষার আলোক লেগে উঠ্‌লো বেজে মিলন বাঁশী,
ভুবন ভ'রে মধুর কোরে ছড়িয়ে দিলো মধুর হাসি।
জল-হারা-মেঘ পথ হারিয়ে
দেশ হ'তে দেশ যায় ছড়িয়ে
তাহার সাথে মনটি আমার কোন সুদূরে যাচ্ছে ভাসি'।
নদীর বুকে আকাশ কোলে সবুজ বনের অন্তরালে,
কে যেন গো নিপুণ হাতে পূজার ঘরে প্রদীপ জ্বালে।
রক্ত উষার আবীর মেখে
পাখিরা সব উঠ্‌লো ডেকে
তারই ভাষায় ফুটলো কুসুম এই প্রভাতের ডালে ডালে॥

তথাগতের পাদুকা

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন কি একটা ছুটির দিন। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না। ভাবলুম—তাক্‌টা পরিষ্কার করে ফেলি। অনেক কাগজপত্র জমে নোঙ্‌রা হয়ে আছে। সব নামিয়ে নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে রাখ্‌ছি, ঠিক এমনি সময়ে বাইরে হাঁক দিলে—শিশি, বোতল, কাগজ বিক্রী।

অনেকগুলো দৈনিক কাগজ জমা হয়েছিল; ভাবলুম—এগুলো বিক্রী করে দি। কাগজওয়ালাকে ডাক্‌লুম।

সে তার থলে নামাতেই দেখা গেল কতকগুলো পুরানো বই ও খাতায় সেটা পূর্ণ। বইগুলো সব অনেক দিনের পুরানো মাসিক, পাতাগুলো পোকায় কাটা। খাতাগুলোর অবস্থাও প্রায় সেই রকম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা হল্‌দে রঙের পাণ্ডুলিপির মত বস্তু। লেখাটা পুরানো আমলের হলেও পড়া যায়। পুরানো ভাষার উপর কিছুটা জ্ঞান থাকায় লেখাটা পড়তে বিশেষ কষ্ট হল না। খানিকটা পড়ে বেশ লাগ্‌ল। আমি সেখানি একধারে রেখে দিলুম। দরদস্তুর করে আমার কাগজগুলো মেপে তাকে দিয়ে দিলুম এবং পাণ্ডুলিপিটির বিনিময়ে কয়েকখানি কাগজ দিয়ে সেটি রেখে দিলুম নিজের কাছে।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে বিছানায় শুয়ে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। তাতে লেখা ছিল :—

আজ যে রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ কর্‌ছি, জানি না, কোনদিন ইহা লোকচক্ষুর গোচর হবে কি না। যদি হয়, অনেকে হয় তো কাহিনীটাকে নিছক কল্পনা বলে ভাব্‌বেন। কিন্তু, সত্যই এটা কল্পনা নয়। এর প্রতিটি ঘটনা দিবালোকের মতই সত্য।

আমার বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে, বজ্রযোগিনী গ্রামে। শ্রীজ্ঞান অতীসের বাড়ীর অতি নিকটে।

গ্রামে সেবার দারুণ মহামারী লেগেছে। রোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্রাম উজাড় হয়ে চল্‌ল। একদিন আমাদের বাড়ীতেও রোগের প্রকাশ হলো। তখনই বৈদ্য ডাকা হলো, কিন্তু তিনি কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর সমস্ত হাতযশ ব্যর্থ হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে আমি সর্ব্বহারা হয়ে গেলুম। আপন বল্‌তে এ পৃথিবীতে আর কেউ রইল না। মন কেমন উদাস হয়ে উঠ্‌ল। কিছুতে ঘরে থাক্‌তে পারি না। ঘরে থাক্‌বার কোন মোহও ছিল না।

এক বস্ত্রে একদিন গৃহত্যাগ করলুম। কোথায় যাব কিছুই স্থির করি নি। লাগাম ছেড়ে দিলুম, দু' চোখ যেদিকে নিয়ে গেল সেই দিকেই চল্‌লুম।

কোন গ্রামেই আমি এক রাতের বেশী কাটাই না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত গ্রাম, কত নগর পার হয়ে গেলুম। তখন আমাকে পথের নেশায় পেয়ে বসেছে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একদিন নালন্দায় এসে পৌছুলুম। এখানে কিছুদিন থাক্‌বার পর একদিন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তিব্বতে যাবার পথের কিছু পরিচয় জেনে নিলুম।

দীপঙ্কর তখন তিব্বতে। তিনি না থাকায় মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। সেখানে আর মন বস্‌ল না। একদিন আবার বেরিয়ে পড়্‌লুম। অনেক তীর্থে ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু শান্তি পেলুম না কোথাও। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হিমালয়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলুম।

কি অতিথিবৎসল এই পাহাড়ীরা! যখনই রাত্রে কারো কুটীরে আশ্রয় নিয়েছি, কি যত্ন আর কত যে সেবা পেয়েছি এদের কাছে, তা ভাষায় বলে শেষ করা যায় না। অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজেরা কত কষ্ট অকাতরে সহ্য করেছে। এমনও দেখেছি, নিজেরা অনাহারে থেকে অতিথিকে পেটভরে পরিতুষ্ট করে খাইয়েছে, দারুণ শীত সহ্য করে একখানি কম্বল অতিথিকে দিয়েছে, তার যেন না কষ্ট হয়। কারণ তিনি দেবতা!

চল্‌তে চল্‌তে একদিন এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হলুম—যেখানে ধারে কাছে কোন লোকালয় নেই। আমি এগিয়েই চল্‌লুম। কোথায় চলেছি তার কিছুই ঠিক্ নেই। সন্ধ্যার দিকে একটা বড় গুহা দেখে সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। মনে মনে ভাবলুম—সাম্‌নে রাত্র, এখানে যদি আশ্রয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ সেই গুহা থেকে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাক্‌লেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করলুম। তিনি আমার মাথায় তাঁর মঙ্গল হস্ত রেখে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। তিনি আমার চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। কোন প্রশ্ন না করে আমাকে নিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করে একখানি কম্বল পেতে আমাকে বস্‌তে দিয়ে বল্‌লেন—তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এই গুহায় ঢোক্‌বার সময় খুবই অন্ধকার মনে হয়েছিল,

কিন্তু এখন যেন আবছা আবছা সবই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কোথা থেকে যেন একটা স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা এসে গুহাখানিকে স্বল্পালোকিত করে তুলেছে। জিনিষপত্র বিশেষ কিছু দেখতে পেলুম না। একধারে একটি বড় জলের কলসী রয়েছে এবং একটু দূরে কয়েকখানি কম্বল ও একটা কমণ্ডলু রয়েছে। সন্ন্যাসীর আসনের সামনে একটা ধূনি অল্প অল্প জ্বল্‌ছে, তার এক পাশে কিছু সমিধ স্তূপাকারে রয়েছে, এ' ছাড়া আর কোন জিনিষ দেখা গেল না। বসে বসে আপন মনে কত কি ভাব্‌ছি, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী ফিরে এলেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো—এইমাত্র তিনি স্নান করে এলেন।

আমার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে একবার চেয়ে তিনি বল্‌লেন—তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি ভাল করে বিশ্রাম কর।

সত্যি, আমি আর তখন চুপ করে বসে থাকতে পাচ্ছিলুম না। সেই কম্বল শয্যায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। একটু পরেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাত্রি গভীর। চেয়ে দেখি—সন্ন্যাসী আগুন জ্বালিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। একটু পরেই তিনি চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি। আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—বড় খিদে পেয়েছে না? তার পরই হাতে তিনবার তালি দিয়ে 'সোমা' বলে ডাক্‌লেন। একটু পরেই পরমাসুন্দরী একটি বালিকা এসে সেখানে উপস্থিত হল।

সন্ন্যাসী তাকে বল্‌লেন—এর মত কিছু খাদ্য দাও, এ' বড় ক্ষুধার্ত্ত।

সেই বালিকা মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং একটু পরেই একখানি পাতায় করে কিছু খাদ্যদ্রব্য আমার সাম্‌নে রেখে দিয়ে কমণ্ডলু করে জল এনে দিলে। আমার খুবই খিদে পেয়েছিল। হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে দিলুম। খাবার সময় মনে হচ্ছিল এই স্বল্প খাদ্যে আমার কি হবে? পেটের আধখানাও ভর্‌বে না। সেই সুন্দরী বালিকাটি আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাস্‌ছিল। খাওয়া শেষ করে জল পান কর্‌তেই আমার পেট একেবারে ভরে গেল। আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। এমন তৃপ্তির সহিত আহার আমি জীবনে করেছি বলে মনে হয় না!

মৃদু হেসে ধীরে ধীরে সে বাইরে চলে গেল। আমিও পাতাখানা তুলে নিয়ে তার পিছু পিছু বাইরে গেলুম এটো-পাতা ফেলবার জন্য। বাইরে এসে দেখ্‌লুম—সে আমার দিকে একবার ফিরে তাকালে তার পর মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমি প্রথমে মনে করেছিলুম যে, হয় তো সে পাহাড়ী মেয়ে, নিকটেই কোথাও থাকে। কিন্তু তার সহসা অন্তর্ধ্যান আমাকে চমকিত কর্‌লে। মনে হলো সে কোন দেব-বালিকা। কথাটা ভাবতেই আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। আমি পাগলের মত চীৎকার করে 'সোমা', 'সোমা' বলে ডাক্‌লুম। কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। তখন মনে হলো—যোগের দ্বারা সবই সম্ভব হয়। বিভূতি দ্বারা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করা চলে। এ সন্ন্যাসী সাধারণ লোক নন। তার চরণ উদ্দেশে ভক্তিভরে মস্তক আপনি নত হয়ে এল।

গুহায় ফিরে আমি আমার শয্যায় বসে সন্ন্যাসীর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলুম।

হঠাৎ সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইলেন। আমার দিকে স্মিতহাস্যে চেয়ে বললেন—রাত অনেক হয়েছে, এখন নিদ্রা যাও। মনের চাঞ্চল্য দূর করে ফেলো।

আমি একটু সাহস সঞ্চয় করে বল্‌লুম—আপনি শোবেন না।

তিনি গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—না।

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল চেয়ে দেখি—ভোর হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী গুহায় নেই। আমি কম্বলখানি তুলে রেখে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু সূর্য্যদেব তখনও ওঠেন নি। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। পেটের ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠ্‌ছিল। বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না, ভেতরে চলে এলুম।

একটু পরেই সন্ন্যাসী স্নান করে ফিরে এলেন। সারা রাত তিনি একটুও নিদ্রা যান নি। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কোন অবসাদ বা ক্লান্তি আসে নি। কি অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি!

আমি তাঁর চরণে প্রণিপাত করে বললুম—প্রভু, আমাকে দয়া করুন! দীক্ষা দিন আমাকে।

তিনি হাস্‌লেন। বল্‌লেন—তোমার এখনও সময় হয়

নি বাবা। এখনও বহুদিন তোমাকে সংসারে থাকতে হবে। তোমার অনেক কাজ অসম্পূর্ণ আছে। যাও, ফিরে যাও সেখানে। আবার দেখা হবে।

আমি কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করলুম না। ভক্তি ভরে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আমি গুহা থেকে বেরিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে চললুম। চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হিম-শীতল তুষারের ওপর দিয়ে চলতে পা যেন একেবারে অবশ হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় চলেছি কিছুই জানি না। আপন মনেই এগিয়ে চলেছি। নিকটে কোন লোকালয় নেই, সঙ্গে নেই কোন সাথী।

একা একা চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কোথাও একটু বিশ্রামের স্থান পর্য্যন্ত দেখলুম না—যে বসে একটু বিশ্রাম করে নেব। পা যেন ক্রমেই ভারী হয়ে উঠল, পা আর ফেলতে পারছি না। একটু পরেই একজন পাহাড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে আমার বিপরীত দিক থেকে আসছিল। তাকে দেখে মনে একটু বল পেলুম। তাকে জিজ্ঞেস করলুম—নিকটে কোন গ্রাম আছে কি না?

সে বললে—ক্রোশখানেক গেলেই একটি ছোট গ্রাম পথে পড়বে। তার কথায় মনে একটু আশার সঞ্চার হলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম।

কিছুদূর যাবার পরই দু'একজন করে মানুষের দেখা পাওয়া যেতে লাগল। সকলেই আমার দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে দেখছিল। আমি কাউকে আর কোন প্রশ্ন না করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে আগিয়ে যেতে লাগলুম।

কিছুদূর যেতেই এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর কাছে আশ্রয়ের কথা বললুম। আমাকে খুব ক্লান্ত দেখে তাঁর মনে করুণা হলো। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। কিছুদূর যেতেই একটা উন্মুক্ত প্রান্তর, সেখানে কতকগুলো কুটীর দেখলুম। বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করে একখানি কম্বল পেতে বসতে দিলেন। আমি বসে পড়লুম। তখন আমার এমন অবস্থা, আমি আর কথা বলতে পারছিলুম না। বৃদ্ধ আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বাইরে চলে গেলেন।

আমার তখন কেমন মোহগ্রস্ত অবস্থা। মনে হচ্ছিল বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। একটু পরেই বৃদ্ধ ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট ঘটি, গরম দুধে পূর্ণ। তিনি সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি ঢক্ ঢক্ করে মুখে ঢেলে দিলুম। সমস্ত দুধটা নিঃশেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললুম। আমার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো, অনেকটা সুস্থ বোধ করলুম। তখন ঘুম আমার দু'চোখ ভেঙ্গে আসছে, আমি আর চাইতে পারছিলুম না। সেখানেই ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লুম। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না।

ঘুম ভাঙ্গতে আমি উঠে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বৃদ্ধ আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দি?

আমি বললুম—এখন খিদে নেই, কিছু খাব না। রাত্রে যা হয় খাওয়া যাবে।

বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

চারদিক কুয়াশায় আবছা হয়ে উঠেছে। আমি ঘরের ভেতরে আমার শয্যায় এসে বসলুম। একটু পরেই বৃদ্ধ একটা আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, জানতে চাইলেন। আমি জানালুম যে, বঙ্গদেশ থেকে আসছি, তিব্বতে যাবার ইচ্ছা আছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বেরুইনি, আপন খেয়াল বশেই বেরিয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন—এখান থেকে গ্যাঙচি বেশী দূর নয়। সেখান দিয়েই আপনাকে তিব্বতে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে তো শীত বস্ত্র বিশেষ কিছু নেই, পথে আপনার খুব কষ্ট হবে।

আমি মৃদু হেসে বললুম—এতটা পথ যখন চলে গেছে, বাকীটাও চলে যাবে। ভগবান্ সহায় থাকলে কোন অভাবই হবে না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কি দেখলেন তিনিই জানেন। একটু নীরব থেকে বললেন—ভগবানে বিশ্বাস রাখতে পারলে কোন

অভাব অনুভব হয় না, এ' কথা খুবই সত্য। কিন্তু ক'জনে এ' বিশ্বাস রাখ্‌তে পারে ?

আমার খাওয়া হয়ে যাবার পরই বৃদ্ধ থালা বাটি নিয়ে চলে গেলেন। আমি একাকী বসে তিব্বতের কথাই মনে মনে ভাবছিলুম। আমি তিব্বতে যাবো বলে বেরুইনি, কিন্তু পাকেচক্রে সেইখানেই প্রায় এসে গেলুম। হয় তো ভগবানেরই ইচ্ছা আমি সেখানে যাই !

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ আমার কাছে ফিরে এলেন। তাঁর হাতে দু'খানি কম্বল ও একটা বালিশ। তিনি নিজের হাতে পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে আমাকে ঘুমুবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি আর বাক্য ব্যয় না করে শয্যায় আশ্রয় নিলুম।

পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙ্‌ল।

একটু পরেই দেখি—বৃদ্ধ তামার ঘটি করে একরকম তপ্ত পানীয় নিয়ে এলেন। আমি ঘটিটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে ধীরে ধীরে পান করতে লাগলুম। খেতে মন্দ লাগছিল না। হিমালয়ের বহু স্থানে এ রকম পানীয় আমি পান করেছি এবং প্রস্তুত প্রণালীও দেখেছি। একটা বড় তামার ঘটিতে গরম জল ফুটতে থাকে। তাতে এক মুঠো একরকম পাতা, থানিকটা মাখন ও নুন ফেলে দিয়ে কাঠের কাঁটা দিয়ে বেশ করে মন্থন করে ছেঁকে নিলেই ঐ পানীয় তৈরী হলো। এই পানীয় খেতে খুব সুস্বাদু না হলেও খুব উপকারী কিন্তু। সর্দ্দিতে বিশল্যকরণীর মত কাজ দেয়।

তারপর বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশিত পথে আমি যাত্রা করলুম। তিনি অনেকক্ষণ ছল ছল চোখে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। (ক্রমশঃ)

করুণানিধান

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

রবি-অনুগামাদের, হে পুরোধা কবি,
তোমাতে হেরিয়াছিনু সারল্যের ছবি।
শান্তিপুরে ত্যজি' দেহ গেলে শান্তিপুরে,
তোমার পবিত্র স্মৃতি চিত্ত রহে জুড়ে॥

মহাপ্রয়াণে করুণানিধান

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বাংলার কাব্যলোকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-পতন হ'ল। ২২শে মাঘ রাত্রি দশটায় রবীন্দ্রকাব্য সাধনার উত্তর-সাধক কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হ'ল। বাংলা ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ শান্তিপুরের এক নিভৃত কুটীরে যে আলোক জ্বলে উঠেছিল—নিভে গেল।

সত্যিই কি সে আলোক নিভে গেল ? তবে উদাত্ত-গম্ভীর সুরের সে-মধুর সংগীত ভেসে আসছে কোথা থেকে ? বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-পানে কবি অমর হয়েছেন; অমর হয়েছে তাঁর প্রকৃতির অজস্র রূপ-উৎসারিত ছন্দ-লীলামধুর সুরের ঝংকার। শান্তিপুরে ও প্রকৃতির লীলা নিকেতন রাজকোটে কবির বালক-প্রাণ কবিত্ব-রসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবি রাজকোট ও শান্তিপুর কবিতায় সে ঋণ স্বীকার করেছেন।

কবি করুণানিধানের চিত্ত ছিল প্রকৃতির নিত্যাকাররূপের ছন্দে অবিরাম দোলায়িত; তাই তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে প্রকৃতি-রাণীর বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ-সুরের হ্লাদিনী-রসে ভরপুর। প্রকৃতি-রূপী কবি-প্রাণকে প্রেমে পূর্ণ করেছে; বিরহে করেছে বিধুর। মনোহারিকার বিরহে তিনি গেয়েছেন—

"সে যে আমার গানের মধু
মানস বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন মুকুল মঞ্জরী।

কোন সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে,
কত দিন আর পথের পানে
চাইব দিবাশর্বরী !

ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতি নব-সাজে নতুন রঙে ঝলসিত হয়ে উঠে। সে-পরিবর্তমান রূপ কবিচিত্তকে অবিরত আন্দোলিত করেছে। ঋতুর রূপ-বর্ণনায় কবির কণ্ঠ তাই নিত্য অনুরণিত। বসন্ত-বর্ষার অমোঘ-প্রভাবে কবি কেমন চঞ্চল হয়েছেন, তার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর ঋতু-বন্দনার রচনায়। বর্ষাতেই কবি চিত্ত আকুল হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

"মেঘ মন্থর জল ঝর-ঝরে
যত কেয়া ঝাড় ফুলে গেছে ভরে,
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে
ফুল লুণ্ঠন লাগি।
পাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা কাটাকাটি অলির কটকে
কান্ত-কঠোর কুসুম তোটকে
পরাগের ভাগাভাগি।

বাদলা হাওয়ায় প্রতি-মানুষের চিত্তে যে একটি অজানা বিরহের রাগিণী ঝংকার দিয়ে উঠে কবি তা স্পষ্ট করে অনুভব করেছেন, রূপ দিয়েছেন তাকে মনোজ্ঞ-ছন্দে।

"বাদলা হাওয়ায় বুকে উঠে ঢেউ,
এ ঢেউয়ে ডুবিতে নাহি কি গো কেউ ?
উদাসীন প্রাণ করে আন চান
কারে যেন দিতে ধরা।

প্রাণ 'কারে' ধরা দিতে চায় তাও কবি ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়জনের জন্যেই যে দুর্যোগের মেঘার্দ্র আঁধার রাত্রে অন্তরে বিরহের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে, প্রিয়জনের সোহাগ-সুধার-স্পর্শ ছাড়া সে দহনজ্বালার শান্তি হয় না—তাই কবি প্রতি বিরহীরে দিয়েছেন শান্তির সন্ধান।

আজি এ আঁধার আর্দ্রবাসরে
যে জনা যাহারে ভালবাসে ওরে,
সে তাহারে দিক আশার অধিক
সোহাগ সুধা।
বুকের নিকটে নিক তারে টেনে,
চুম্বন দিক কোলে তুলে এনে
চির জনমের প্রিয়জন জেনে
মিটাক প্রাণের ক্ষুধা।

কবির প্রাণে প্রকৃতির রূপ আর তাঁর প্রেয়সীর রূপের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোথায় দুয়ের মধ্যে ভেদ রয়েছে কবি তা' যেন ধরতে পারছেন না। ফিরে-চাওয়া কবিতায় প্রেয়সীর চোখের তারাকে বুঝি আকাশের তারার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন।

নূতন চাওয়া—চাওগো ফিরে
এই চাওয়া কি—সেই চাওয়া ?
আকাশভরা—তারার আলোয়
চোখের তারার গান গাওয়া ?

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতি সৌন্দর্য রাশি যে কবির প্রাণকে অহর্নিশি উদ্বেলিত মথিত করে তুলেছে, কবি তার পশ্চাতে কোন ঐন্দ্রজালিকের অলক্ষ্য যাদুদণ্ড-স্পর্শ অনুভব করেছেন—

পূর্ণিমার কোন পারে,
ডাকে যেন কে আমারে,—
লুপ্ত অজগর রাত্রিরূপ
মৃত্যু সে চমকি প্রায়
ঝিকি-ঝিকি নিয়ে যায়
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ

আজ শুধু মনে হয়
মানবের এ হৃদয়
বাজায় গো কোন যাদুকর ?
সুরে সুর মিলাইয়া
ঝংকারিয়া উছলিয়া
উদ্বেলিয়া যুগ যুগান্তর।

কবি জন্ম-মৃত্যু, আলো-আঁধার, ঊষা-সন্ধ্যার মধ্যে একটা সুনিবিড় সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। এ সম্বন্ধ চিরন্তন অচ্ছেদ্য। এ দুয়ে যেন কোন পার্থক্যই নেই। এ যেন ঢেউএর উত্থান-পতন মাত্র। সকাল-সন্ধ্যার দুই পাথায় যেন দিবারাত্রির খেলা।

"উঠ্‌তি-বেলা পড়তি-বেলা খেলছে খেলা দুই পাথায়,
কাজের খেলা—নেইকো সুরু শেষ।"

কবি-প্রকৃতির রূপলোক থেকে অন্তরের রূপলোকে প্রবেশ করেছেন—সে অন্তরলোক থেকে দেখেছেন, 'হরিদ্বারেই' গঙ্গাসাগর উথলে উঠেছে। তিনি 'মৃত্যু-জীবন সমান করা' সুরে হয়েছেন বিভোর—অনুভব করেছেন দুঃখ-সুখ, জীবন-মৃত্যু, ফোটা ও ঝরার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়-শক্তির অমোঘ প্রভাব।

"দুঃখ মিলন দোলন দোলে উতল গতি ছন্দ তাল
অনন্তেরি প্রান্ত দুটির মাঝে
মাপকাঠিতে বারে বারে স্পর্শে তারে অবাধ কাল,
সেই পরশে অমৃতরাগ বাজে।
শুকনো বোঁটায় ফোটায় কলি
পুরানো সেই রস-নূতন,
রূপ ধরে সেই সারা যুগের চির অচিন্ চিরন্তন।

রবীন্দ্র যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া করুণানিধানের 'ঢেউ' কবিতার তুলনা মেলা দুষ্কর।

করুণানিধানের রচনার মধ্যে আশুতোষের মৃত্যুশোকে উৎসারিত 'মহাপ্রয়াণে আশুতোষ' কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কবি নিজে আশুতোষের সঙ্গ লাভ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস-পরীক্ষকরূপে। আশুতোষের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা। এই কবিতায় তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও শোক পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ও বেদনাবিধুর রূপ।

"তৃপ্ত তোমার আত্মার তৃষা অমৃত শান্তি-নীরে,
বিরাম লভিছে লোকান্তরের অলকানন্দা তীরে।
এনেছে বহিয়া এ-ভাগ্যহীন তোমার পূজার ডালা,
বাংলার ফুল পদ্ম বকুল চাঁপার সুরভি ঢালা,
এস বরেণ্য এস মোর ধ্যানে, লহ অঞ্জলি মোর,
তোমার গুণের অনুকীর্তনে বিগলিত আঁখি লোর।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন—

যাও আজি, হে কবীন্দ্র! মরণের মহা পরপারে,
যেথানে অক্ষয় ঊষা আলিঙ্গিয়া লইবে তোমারে।
অবনীর রণাঙ্গনে লভিয়া গৌরব উপায়ন,
আলোকের পানে আজি খুলে দাও প্রাণ বাতায়ন,
আনন্দের মধুবর্ণ চন্দ্রমল্লী করিয়া চয়ন,
পিঙ্গল চিতার ধূমে কর দেব শান্তিতে শয়ন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরেও কেঁদেছিলেন—

সত্যসঙ্গ ধর্মজীবন সে চিরঞ্জীব নাহিরে আর,
অহিংসা যাঁর কবচ অজেয়, হারায়ে তাঁহারে দেশ আঁধার।
মর্ত্য হইতে অমর্ত্যপুরে, অনিত্য থেকে নিত্য লোক,
তিমির হইতে জ্যোতির পুলিনে চলে গেছে সেই পুণ্যশ্লোক।

কবি করুণানিধানের তিরোধানে আমাদের অন্তর-বেদনা ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। কবি-কণ্ঠের ঝংকার শুধু অন্তর-কর্ণে ঝংকৃত হয়ে উঠছে বারংবার। প্রার্থনা জাগছে মনে—

হে বাণীর বরপুত্র, হে অমর কবি
সুরলোকে গেছ চলে তুমি,
তোমার মধুর কণ্ঠে মুখরিত রবে
চিরদিন এই বঙ্গ-ভূমি।

পাটি ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি গেভার্ট ফিল্ম-এর কলিকাতার পরিবেশক প্যাটেল ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ কর্তৃক লাইট হাউসে গেভার্ট ফটো প্রোডাক্সনের কমার্শিয়াল ম্যানেজার ডাঃ এ, বেকেনকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পী যোগদান করেন। ডাঃ বেকেন তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—অতীতে গেভার্ট কলারের যে সকল ছবি বাহির হইয়াছে বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা বহু উন্নত ধরণের ফিল্ম তৈয়ারী হইতেছে। ডাঃ

রূপমঞ্চ সংস্কৃতি পরিষদের মাছ ভাত অনুষ্ঠানে রাইকমলের নায়িকা কাবেরী বসু ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বেকেন জানান যে, বর্ত্তমানে বোম্বাইতে ৬ খানি গেভার্ট কলারের ছবি নির্ম্মিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে, গেভার্ট ফিল্মনির্ম্মাণ ফ্যাক্টরীর আভ্যন্তরীণ দৃশ্যসমূহ ও ফিল্ম নির্ম্মাণপদ্ধতিসমূহ দেখান হয়। ইহা দেখিয়া এই কথাই বিশেষ করিয়া মনে হইয়াছে যে, এই শিল্প সম্পর্কে আমরা কত অসহায়! যে দেশে এক ইঞ্চি ফিল্ম প্রস্তুত হয়না, সে দেশে সেই শিল্প আজ ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ফিল্মের অনটন পুনরায় দেখা দিয়াছে এবং ফিল্ম ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আজ কলিকাতা বন্দরের দিকে নিবদ্ধ। কবে জাহাজ বন্দরে ভিড়িবে এই আশায় তাঁহারা দিন কাটাইতেছেন। আজ ব্যবসায়ীগণ 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' এই কথা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন কিন্তু উপায় উদ্ভাবনের কোন চেষ্টা করিতেছেন না, ইহাই দুঃখের কথা!

*　*　*　*

রূপমঞ্চ সংস্কৃতি পরিষদে মাছ-ভাত অনুষ্ঠানে বাংলার চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বম্বের অনিতা গুহ ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

গত ৩০শে জানুয়ারী টেক্‌নিশিয়ান ষ্টুডিওতে সিনে টেক্‌নিশিয়ান এ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গল-এর এক বিশেষ অধিবেশনে, ১৯৫১ সালে ফিল্ম ষ্টুডিওগুলি ফ্যাক্টরীর আওতায় আসা সত্বেও শিল্পশ্রমিকেরা তাহাদের ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে এতদ্‌সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে এ্যাসোসিয়েসনের সাব-কমিটি ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সুপারিশ ক্রমে নিয়মাবলীর ৭, ৮, ১০ ও ১১ ধারার সংশোধন প্রস্তাবগুলি অনুমোদন লাভ করে। এই প্রসঙ্গে চিত্র পরিচালনার কাজে পরিচালকের নিম্ন যোগ্যতা কি

হওয়া উচিত তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সাব-কমিটির উপর এই যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার অর্পিত হয়। এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি প্রবীণ পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় বলেন—"আমরা থাবার চাই নে, চাই মজুরী। প্রযোজক, পরিবেশক ও ষ্টুডিও-মালিকদের নিয়ে আমাদেরকিছু করণীয় নেই—আমরা চাই টেকনিশিয়ান কি করে বাঁচে।" প্রধান-অতিথি শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন—

অগ্রদূত পরিচালিত এম-পির নবতম কথাচিত্র অনুপমার একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

"আপনাদের অভাব-অভিযোগের কথা আমি জানি। সেই জন্য ষ্টুডিওগুলিকে ফ্যাক্টরী আইনের আওতায় আনতে সহায়তা করেছিলাম। আমি জানতাম না এই শিল্প-শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হয়ে আস্‌ছে। এর জন্যে অপর পক্ষও আমার কাছে এসেছেন। আমি তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি—শ্রমিককে তার ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এই আইনের ক্রটী আছে অনেক। এর মধ্যবর্ত্তিতায় অনেকে শিল্প-শ্রমিকদের বঞ্চিত করার চেষ্টাও করে থাকেন। কিন্তু আপনারা যাতে এর যথোপযুক্ত প্রতিকার পান তার চেষ্টা করা হবে। পরিশেষে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিদের নিন্দা করিয়া বলেন—আপনারা যে মিলিত হইয়া নিজেদের কথা, সমগ্র শিল্পগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের কথা। কিন্তু কোনদিন যেন সাময়িক স্বার্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের মিলিত স্বার্থ নষ্ট না করেন।"

শ্রমমন্ত্রীর ভাষণ একদিকে যেমন আশাপ্রদ, অপরদিকে তেমনি সমগ্র শিল্প-শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিনে টেক্‌নিশিয়ান এ্যাসোসিয়েসন সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে শিল্প-শ্রমিকেরা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করি।

* * * *

গত ২৩শে জানুয়ারী রবিবার রূপ-মঞ্চ কার্য্যালয়ে সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে একটি নাট্য-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরিকল্পনার বিষয় লইয়া আলোচনায়

রূপমঞ্চ সংস্কৃতি পরিষদের মাছ-ভাত অনুষ্ঠানে সভাপতি নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী ও চিত্র-সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীযুক্ত সতু সেন ও শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এতদ্‌সম্পর্কে বাংলা সরকারের সাম্প্রতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ২৩ জন সদস্য লইয়া একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বম্বের সি, রামচন্দ্র, ও ম্ প্র কা শ, অনিতা গুহ প্র ভৃ তি বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মু খো পা ধ্যা য় মাছ-ভাতে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

* * *

স্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্যামলী নাটকের ত্রি-শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসবে বক্তৃতারত রাজারাও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বাম হইতে দক্ষিণে : কবি রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়, সভাপতি রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র

গত ১৫ই জানুয়ারী ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকের ত্রিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় মহোদয়া শিল্পী ও কর্ম্মিগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন নাটকের একাদিক্রমে ও একযোগে ৩০০ শততম অভিনয় হয় নাই। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা নূতন রেকর্ড স্থাপনা করায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মণীষীবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে ৫০০৲ টাকা ও রাজ্যপাল তহবিলে ১০০১৲ টাকা প্রদান করেন।

প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব

অজয়কুমার গুপ্ত

যে দেশে নাটককে "পঞ্চম বেদ" বলে মানা হত, যে দেশের বুদ্ধ ক্রাকুছন্দা, ভাস, কালিদাস, ভবভূতির মত বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার নাটক লিখে নাট্যশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে গেছেন,—জনবিরল ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের অন্তরালে মাটি খুঁড়ে যে অতি প্রাচীন এক নাট্যশালার আবিষ্কার হয়েছে, তার শেষ পাদ-প্রদীপ কবে নিবে গিয়েছিল, নট নটী রঙ্গ-মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—সেই ইতিবৃত্ত আমরা ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদের কাছ থেকে শুনবার প্রত্যাশায় রইলাম।

কিন্তু মনে হয় ভারতের নাটকের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ আবার জ্বলে উঠ্‌লো—২২শে নভেম্বর ১৯৫৪ সালে দিল্লীতে যখন প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হল রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আশীর্ব্বাণী নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর এবং রাজধানীর নানা গণ্যমান্য মন্ত্রী উপমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশের রাজদূতের উপস্থিতিতে—কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। বোধহয় এদেশের ইতিহাসে এই প্রথম, রাষ্ট্রের ছায়ায়, জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল। নাট্যোৎসবে ২২টি নাটক, ১৫টি

ভাষায়—সংস্কৃত, আসামী, তামিল, উর্দ্দু, উড়িয়া, গুজরাটী, মারহাঠি, হিন্দী, তেলেগু, কানারী, পাঞ্জাবী, বাংলা, মনিপুরী, মালয়ালম এবং ইংরেজীতে অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্য্যায়ে ভাগকরা হয়েছে—প্রাচীন, লোক এবং আধুনিক নাটক।

চারটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে—লোক নাটকের জন্য দুটি—একটি আসাম নাটক একাডামী কর্তৃক অভিনীত আসামী নাটক "সোনিত কুমারী"কে, দ্বিতীয়টি মনিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন কর্তৃক অভিনীত "হোয়ানপ্‌-লেইসাং-সাক্পাবাই"কে; প্রাচীন নাটকের মধ্যে বোম্বে-মারহাঠি-সাহিত্য-সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত মারহাঠি ঐতিহাসিক নাটক "ভাই-বান্ধী"কে পুরস্কৃত করা হয় এবং আধুনিক নাটকের মধ্যে কলিকাতার "বহুরূপী" সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত রবীন্দ্রনাথের বাংলা নাটক "রক্ত-করবী" পুরস্কার লাভ করে।

জাতীয় নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য নাটকীয় দল সুদূর বোম্বে, শিলং, মাদ্রাজ—এই উপ-মহাদেশের একরকম চার প্রান্তদেশ থেকে এসে দিল্লীতে জমায়েত হয়েছিল। গড়ে এক এক দলে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কারিকর-সহ প্রায় ৪০ জন করে ছিলেন এবং মোট প্রায় ৮০০ জন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আর্থিক অভাবে এবং বাসস্থানের অনাটনে ৮০০ জন শিল্পীকে এক-সঙ্গে একমাসের উপর আগাগোড়া উৎসব দিনগুলিতে দিল্লীতে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি। নাট্যোৎসব শেষ হয় ইংরেজী নাটক "OEDIPUS REX" অভিনয়ে ২৭শে ডিসেম্বর। বর্ত্তমান অবস্থায় মন্দের ভাল এই ব্যবস্থাই করা হল যে দলে দলে নাটকীয়দল কার্য্যক্রম অনুযায়ী দিল্লীতে এসে অভিনয় করে ফিরে গেছে। এই আসা-যাওয়ার মাঝে দিল্লীতে থাকা-কালীন একদল আর একদলের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছে। উৎসবের একমাস প্রতি রবিবার যে নাটক সম্বন্ধে আলোচনার (Symposium) ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে কোন কোন দল যোগ দিতেও পেরেছে।

সঙ্গীত-নাটক-একাডামী এই জাতীয় নাট্যোৎসবের উত্তোক্তা, দিল্লী-নাট্য-সঙ্ঘ তার ব্যবস্থাপক ছিল। নাট্যোৎসবের জন্ত প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা খরচ হয়েছে। রেলভাড়া বাবদ প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা, নাট্য-সম্প্রদায়ের দিল্লীতে থাকা খাওয়ার জন্ত প্রায় ২০,০০০৲ টাকা এবং রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-পট ইত্যাদির জন্ত প্রায় ১০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়েছে। সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী উৎসবের জন্ত ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করেছেন, প্রায় ১৫,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা হয় ধনী ও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে দান গ্রহণ করে, প্রায় ২৫,০০০৲ টাকা উঠে টিকিট বিক্রি থেকে। প্রায় ১৫,০০০৲ ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

যাই হউক, এই অর্থ ব্যয় অপচয় নয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর ভাষায় বলতে হয়—"আমার ব্যক্তিগত মতে যে কোন অর্থ সংস্কৃতির—যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি উন্নয়নের জন্ত ব্যয় হয় তাহা শুধু উপযুক্ত নয়, জরুরী বটে। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে নাটকের প্রভাবে আমি মুগ্ধ। আমাদের এমন গণনাট্যের দল গড়তে হবে যাহা গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতে পারে।" ("For my part think that any money spent on the development of cultural subjects—music, dancing, theatre etc.,—is not only worth while but very important. In this connection I am particularly impressed by the importance of the theatre for educational purposes. We shall have to develop a popular theatre which can go to the villages.")
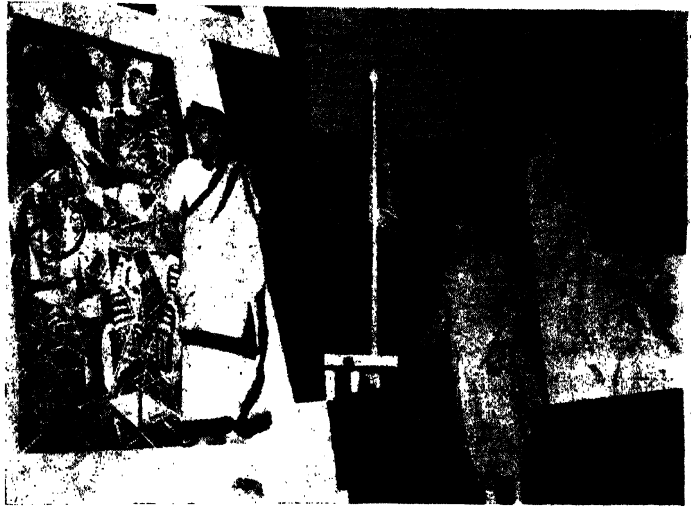
"প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব"-এ 'বহুরূপী' অভিনীত রক্তকরবীর একটি দৃশ্য। নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র ও বিশুর ভূমিকায় শোভেন মজুমদারকে দেখা যাইতেছে

এখানে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—আসাম রাজ্য-সরকার, মনিপুর সরকার, উড়িষ্যা রাজ্য-সরকার এবং হায়দরাবাদ সরকার নিজ নিজ নাটকীয় দলকে যাতায়াতের খরচ এবং অন্তান্ত নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে অন্তান্ত রাজ্য-সরকার নিজ নিজ নাট্য-সম্প্রদায়কে জাতীয় নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্ত অর্থ সাহায্য ও অন্তান্ত সুযোগ সুবিধা দিতে তৎপর হবেন।

নাট্যোৎসবে যোগদানের জন্য ঘোষণা করাতে প্রায় ৭০০ আবেদন পত্র পাওয়া যায় ভারতবর্ষের নানা প্রান্তর থেকে। নাট্যোৎসবের নাটক বাছবার জন্য প্রত্যেক ভাষায়, প্রত্যেক রাজ্যে একটি বিচারক-মণ্ডলী গঠন করা হয়। কোন কোন রাজ্যে স্থানীয় নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা হয় এবং সেই থেকে বিচারক-মণ্ডলী জাতীয় নাট্যোৎসবের জন্য নাটক মনোনয়ন করেন। বাংলা দেশের বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন। জাতীয় নাট্যোৎসবের জন্য মনোনীত নাটকগুলি সবই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। তারপর প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে আমরা প্রবীণ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বিরাজ কাপুর, T. K. Brothers ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত শিল্পীদের পাইনি। অনেক প্রসিদ্ধ নাট্য-সম্প্রদায় এই নাট্যোৎসবে যোগদান করেনি। ভবিষ্যতে আশাকরি জাতীয় নাট্যোৎসবে প্রখ্যাত যশস্বী নট ও নটীদের অভিনয় দেখবার আমাদের সৌভাগ্য হবে।

মৌলিক নাটক, যার ভেতর সেই ভাষাভাষীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় প্রতিফলিত হয় এমন নাটক জাতীয়-নাট্যোৎসবের জন্য মনোনীত করা উচিৎ। হায়দরাবাদের আঞ্জুমান তারিকি-উর্দ্দু কর্ত্তৃক অভিনীত "নয়ি রোসনী" Sheriden লিখিত ইংরেজী নাটক "The Rival" এর উর্দ্দু ভাষ্য। আগা হাসার কাশ্মীরী, ডাঃ আবিদ হুসেন, বা কিষেণ চন্দের কোন মৌলিক উর্দ্দু নাটক অভিনীত হলে সব দিক দিয়ে শোভন হত। তেমনি বিশ্ব-বিশ্রুত ইংরেজী নাটকের ভাণ্ডার উপেক্ষা করে বোম্বের থিয়েটার ইউনিটকে একটি গ্রীক্ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ "Oedipus Rex" অভিনয় করতে দেখলাম। অভিনয় অবিশ্যি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। ইংরেজী নাটক পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করেনি, নতুবা নিশ্চয় এই নাটক একটি পুরস্কার লাভ করত। নাট্যোৎসবে আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে একই গল্প নিয়ে রচিত নাটক, বিভিন্ন ভাষায় হলেও একাধিক দলকে অভিনয় করতে দেওয়া না হয়। গত নাট্যোৎসবে একই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক আসামী ভাষায় "শোণিত কুমারী" এবং তেলেগু ভাষায় "উষা পরিনায়ক" নামে অভিনীত হয়। আসামী নাটক সাবলীল অভিনয়, সুরালী সঙ্গীত ও মনোরম নৃত্যে লোক-নাটক পর্য্যায়ে যথার্থই পুরস্কারলাভ করেছে। কিন্তু তেলেগু সেই তুলনায় অভিনয়েই শুধু নিকৃষ্ট ছিল না, ছেলে মেয়ের ভূমিকায় অবতরণ করায় সমস্ত নাটকীয় মাধুর্য্যই নষ্ট হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে, জাতীয় নাট্যোৎসবে, স্ত্রী চরিত্রে পুরুষের অবতরণ উচিত কিনা কর্তৃপক্ষই বিবেচনা করবেন।

প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বহুরূপী অভিনীত বাংলা নাটক "রক্ত-করবী" আধুনিক নাটক হিসেবে পুরস্কৃত হলেও রাজধানীর জনমত ও পত্র-পত্রিকার মতে জাতীয় নাট্যোৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। অপূর্ব্ব অভিনয়ে, মার্জ্জিত দৃশ্য পরিকল্পনায়, বিস্ময়কর আলোক সম্পাতে, মাত্রা রক্ষা করে গান ও যন্ত্র সঙ্গীত যোজনায়—"রক্ত করবীর" অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এক দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক এবং রূপক নাটক "রক্ত-করবী"কে যে এক-অঙ্ক নাটিকায়, একটি মঞ্চ দৃশ্যের উপর, সোয়া-দুই-ঘণ্টা একটানা অভিনয়ের মধ্যে এমনভাবে মনোরঞ্জন করা যেতে পারে তাহা বহুরূপী সম্প্রদায়ের অভিনীত নাটক "রক্ত করবী" না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সোয়া দুই ঘণ্টার একাঙ্ক নাটিকা একঘেয়েমী হয়ে পড়বার বিশেষ আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দর্শক এই নাটক মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখেছেন। তাপস সেনের আলোক সম্পাত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে।

নাট্যোৎসবে বহুরূপী বাংলা দ্বিতীয় নাটক তুলসী লাহিড়ীর—"ছেঁড়াতার" অভিনয় করেন। এই নাটকের অভিনয়, মঞ্চ-সজ্জা, আলোক সম্পাত, গান ও যন্ত্রসঙ্গীত খুবই উচ্চাঙ্গে হয়েছিল।

"রক্ত-করবীর" পুনরাভিনয়ের জন্য সর্ব্বসাধারণের অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তার ব্যবস্থা করতে পারলেন না রঙ্গ-মঞ্চের অভাবের দরুণ। রাজধানীতে রঙ্গ-মঞ্চের অভাব সত্যই লজ্জার বিষয়। অন্যান্য দিক দিয়ে বিবেচনায় দিল্লী জাতীয় নাট্যোৎসবের উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখানে কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন রঙ্গমঞ্চ আজও নেই। তাই দেখতে পেলাম স্থানীয় "[illegible] হল" [illegible] রঙ্গমঞ্চরূপে একটি "বক্তৃতা

এই সাদা ও বিশুদ্ধ সাবান রোজ ভালো করে মাখলে আপনার মুখে এক সুন্দর শ্রী ফুটে উঠবে। "গায়ের চামড়া রেশমের মতো কোমল ও সুন্দর রাখতে লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধি, সরের মতো ফেনার মত আর কিছু নেই।" রমলা চৌধুরী বলেন। "এতে আপনার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তোলে আর আপনি এর বহুক্ষণ-স্থায়ী মিষ্টি সুগন্ধ নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।"

সুখবর!

নতুন
বড় সাইজ
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য
এখন পাওয়া যাচ্ছে
আজই কিনে দেখুন!

"...সেইজন্যেই ত আমি আমার মুখশ্রী সুন্দর রাখবার জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি।"

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

LTS. 419-X52 BG

কক্ষ", তার উপরই জাতীয় নাট্যোৎসব পর্ব্ব কোন রকমে সারা হলো। দলে দলে নাটকীয় সম্প্রদায় এসেই অপরিসর মঞ্চের কথা জানিয়েছে।

ঐতিহাসিক মারহাটি নাটক "ভাই বান্ধী", সঙ্গীত ও নৃত্যবহুল পৌরাণিক আসামী নাটক "শোণিত কুমারী", মণিপুরী উপাখ্যান নৃত্য-নাট্য "হোয়ানপ্-লেসাং—সানফাবাই", আধুনিক সামাজিক গুজরাটি নাটক "মাজুমরাত" ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের নাটকগুলি প্রমাণ করেছে যে অভিনয় গুণে ভাষার ব্যবধান কাটিয়ে অপর ভাষাভাষির কাছেও নাটক হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে। মণিপুর ও আসামের নৃত্য-ধর্ম্মী নাটক থেকেই বোধ হয় ভবিষ্যতে ভারতীয় অপেরা-নাটকের (Opera Theatre) সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

পুরস্কার বিতরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে—তিনটি পুরস্কার ভারতের পূর্ব্বদেশে এবং একটি পুরস্কার পশ্চিমপ্রান্তে গেছে। দাক্ষিণাত্য কোন পুরস্কার এবার পায়' নি। নাট্যোৎসবে অভিনীত দক্ষিণী-নাটক গুণ বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে অভিনয় শিল্পে এখনও দক্ষিণ একটু প্রাচীন-পন্থী। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ দর্শকদের সম্বোধন করে অভিনয় করে থাকেন, গাঢ় রূপ-সজ্জায় অভিনয়ে অবতীর্ণ হন, স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষের অভিনয় এখনও প্রচলিত, কথক নাচ ও গানে বহুল নাটক, বাদ্যযন্ত্রীরদল প্রাচীন প্রথায় মঞ্চের সামনে বসে বিচিত্র বাজনার দ্বারা নাটকের আকর্ষণ বর্দ্ধনে সচেষ্ট। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পরিকল্পনায় Roll scenes, কাট্ সিন্, ম্যাজিক-লানটারন্, Foot-light, Spot-light আরও অনেক কিছু ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোন কোন পত্র-পত্রিকায় অনুযোগ করা হয়েছে যে জাতীয় নাট্যোৎসবে ২২টি নাটকই রঙ্গমঞ্চে, দৃশ্য-পট, সাজ-সজ্জা, বৈদ্যুতিক আলোক-সম্পাতে এবং কোন কোন অভিনয়ে মাইকের সাহায্যে অভিনীত হয়েছে। এই পদ্ধতির নাটক অভিনয় বৃটিশ রাজত্বের সময় ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানী। ভারতীয় নাটকপদ্ধতির পরিচয় নিতে হলে—বাংলা যাত্রা-গান, মথুরার রাসধারী, উত্তরপ্রদেশের রামলীলা, মহারাষ্ট্রের ললিতা, গুজরাটের ভাবী, অন্ধ্রের বুরাকথা বা কুচিপুদি নাটক ইত্যাদি দেখতে হয়। গত জাতীয় নাট্যোৎসবে এই পর্য্যায়ের নাটকই স্থান পায় নাই?

আধুনিক নাটক বলতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রিটিশ রাজত্বে ইউরোপের অনুকরণে প্রচলিত হয়েছে অস্বীকার না করেও আমাদের এই সত্য উঁচু উদার মনে গ্রহণ করা উচিত, যে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ অভিনয় আমাদের জাতীয় নাটকে একটি অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ইতিহাস তার ছাপ জাতীয় জীবনে রেখে যাবেই—এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। প্রাচীনপন্থীরা যেমন ভারতের প্রাচীন নাট্য-শিল্প—যাত্রাগান, রামলীলা, রাসধারী ইত্যাদির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন, সেই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বটেই, জাতীয় নাট্যোৎসবেও এই সমস্ত নাটকের স্থান থাকবে, তেমনি প্রগতিপন্থীরা যদি দেশ-বিদেশের রঙ্গমঞ্চ শিল্পের নানা কৌশলঅনুশীলন করে জাতীয় নাটককে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াস পান, আমাদের আপত্তির কারণ থাকবার কথা নয়। নতুন ভাবধারা, শিল্পপদ্ধতির আয়ত্ব করবার শক্তির মধ্যে জীবনের স্পন্দন ও উন্নতির ইঙ্গিত আছে।

বাৎসরিক জাতীয় নাট্যোৎসবের কথা শুনা যাচ্ছে। খুবই আনন্দের কথা। দিল্লীতে যথার্থ রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা না করে দ্বিতীয়বার জাতীয় নাট্যোৎসব এখানে করা উচিত হবে না। কলিকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি সহরে ঘুরে ঘুরে জাতীয় নাট্যোৎসব হওয়া উচিত। নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটক সম্বন্ধে তত্ত্ববহুল বইপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে ভারতীয় নাট্যোৎসবে শিশুদের নাটকেরও একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া উচিত।
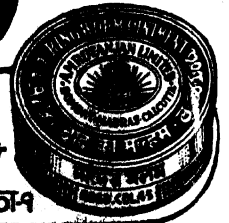
কংগ্রেস অধিবেশন—

এবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্টিতম অধিবেশন হয় মাদ্রাজের আবাদী-সত্যমূর্তিনগরে। শ্রীধেবরের সভাপতিপদে নির্বাচন এবারকার কংগ্রেসের একটি নূতন ধারা বলা চলে। এতাবৎ সর্বভারতের স্বনামধন্য জননায়কগণই সাধারণতঃ কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীনেহরু পুনর্বার কংগ্রেসের সভাপতিপদ গ্রহণ করিতে কেবল অসম্মতই হন নাই, তিনিই আগ্রহ করিয়া সৌরাষ্ট্রের ত্যাগনিষ্ঠকর্মী শ্রীধেবরকে কংগ্রেসের গুরুদায়িত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদে নির্বাচিত করেন। জাতিগঠনমূলক কর্মনিষ্ঠা ও ত্যাগ কংগ্রেসে গুরুত্ব লাভ করুক, ইহাই হয়তো শ্রীনেহরু এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের কামনা। আর ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে কংগ্রেসের সভাপতিপদে শ্রীধেবরের নির্বাচন একান্ত সমীচীন ও সুসংগত হইয়াছে। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রধান প্রস্তাবটিতে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' প্রবর্তনই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য সেকথা বলা হইয়াছে। বিদায়ী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনেহরু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতেই 'সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' প্রবর্তনের কর্মনীতি কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হয়। এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মৌলানা আজাদ যে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোনোই প্রয়োজন হয় না। কেন না, শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা বলিতে কংগ্রেস মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন না, শ্রেণীসংঘর্ষ ও সংঘাতপর্ব শোণিতাক্ত বিপ্লবের অবাঞ্ছিত পথে না গিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যময় শান্তি ও সাম্যের পথেই যে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে কংগ্রেস ইচ্ছুক ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, 'সমাজতন্ত্রবাদ' বলিলে লোকে ভুল বুঝিবে, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রেণীসংঘর্ষ ও রক্তপাতের পথই কংগ্রেস অতঃপর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারে। সেইজন্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদ কথাটা পরিহার করিয়া—সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংজ্ঞা লইয়াছে। পাছে লোকে ভুল বুঝে কিংবা ভুল বুঝায়, সেজন্য শব্দ গ্রহণ ও বর্জন আবশ্যক করে না। আদর্শ এবং প্রয়োগের মাধ্যমেই শব্দ অর্থ পরিগ্রহ করে—ব্যঞ্জনা ও ব্যাপকতা লাভ করে। মার্ক্সীয় 'সমাজতন্ত্রবাদ' বাদে যদি কোনো 'বাদ' চলিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ না চলিবার কী হেতু থাকিতে পারে?

এই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যসম্মত পন্থার উল্লেখ করিয়া সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি।

কংগ্রেস ও শ্রীধেবর—

ষষ্টিতম কংগ্রেস অধিবেশনে সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর তাঁহার ভাষণে যে আদর্শের কথা প্রধান বক্তব্যরূপে নিবেদন করিয়াছেন, তাহা এক বিরাট কর্তব্যের আদর্শ। বর্তমান ভারতের নবজীবন সামাজিক ও নৈতিক যে বৃহৎ এক পরিবর্তনের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই পরিবর্তনের স্বরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে সভাপতির ভাষণে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—নূতন এক অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিণাম বরণের জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের এই অগ্রগতি ভারতের ইতিহাসে এক নবতম বৈপ্লবিক ঘটনা। এই ভারতীয় বিপ্লবের সহিত যদিও অন্য দেশের বিপ্লবের রূপ ও নীতির সাদৃশ্য নাই, তথাপি ইহা বিপ্লব। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাহায্যে এবং পরিকল্পিত উদ্যোগের দ্বারা দ্রুত সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তন সাধনের যে চেষ্টা ভারতে শুরু হইয়াছে, তাহাকে সচ্ছন্দে বিশ্বের বিপ্লব-সমূহের ইতিহাস মধ্যে একটি অভিনব ঘটনারূপে অভিহিত করা চলে। ভারতের জাতীয় জীবনের সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনেরই এক নব পরীক্ষা। সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর দাবী করিয়াছেন যে এইরূপ পরীক্ষা স্বীকার করিবার এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্রুত পরিবর্তন সাধনের স্বাভাবিক যোগ্যতা ভারতীয় জাতি তাহার সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরূপেই লাভ করিয়াছে। নিরস্ত্র ভারতবর্ষ যে অভিনব পন্থায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহা একমাত্র ভারতীয় ইতিহাসেরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীযুক্ত ধেবরের মতে সামাজিক অর্থনীতিক বিপ্লব সাধনেও ভারত তাহার জাতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসসম্মত সুযোগ্য পথে অনুসরণ করিয়াছে। এই পন্থায় ভারতের জাতীয় জীবনের সাত বৎসরের প্রচেষ্টার ফলকেও তিনি সাফল্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিগত সাত বছরের প্রচেষ্টাকে জাতীয় জীবনের সুস্থিতি স্থাপনের এক সার্থক অধ্যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। শিল্প, কৃষি, খাদ্য ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে বিগত সাত বৎসরের প্রচেষ্টাকে যদিও যথার্থ সমৃদ্ধিসূচক সাফল্য বলা যায় না; তবুও এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অন্ততঃ ঐ সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিসূচক উদ্যোগের

ভিত রচিত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি বিগত সাত বৎসরের ভারতীয় জাতীয় জীবনের রাজনীতিক সুস্থিতিকেই প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন। তিনি ভারতের পররাষ্ট্র নীতিকেও ভারতেরই সাংস্কৃতিক প্রকৃতির সহজ ও সরল প্রকাশ বলিয়া মনে করেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রকৃতই যে নিষ্ক্রিয় এবং নিরপেক্ষতার নীতি নয়—তাহা যে পৃথিবীর শান্তির সহায়ক একটি নৈতিক শক্তি—ইহা বাস্তবক্ষেত্রে বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের সাফল্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে নব ভারতের বিশেষ গৌরব বলিয়া সভাপতি মনে করেন।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সেই প্রথম দিন হইতে ভারতকে যে সকল দুর্বহ জটিল সমস্যার ভার ও আক্রমণ সহিতে হইয়াছে, সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর সেই সকল অবস্থার তথ্য সমুদয়ের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। জাতি সংগ্রাম করিয়াছে সেই সকল সমস্যার সহিত, জয় অর্জন করিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। জাতির সে সংগ্রাম ও আত্মশক্তির প্রতি কুণ্ঠাহীন বিশ্বাস ঐতিহাসিক সাফল্যরূপ কীর্তিত হইয়া থাকিবে। সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবরের ভাষণ আদর্শনিষ্ঠ আশাবাদীরই ভাষণ। তিনি জাতির আত্মশক্তির মূল উৎসটির অনুসন্ধান করিতে গিয়া এবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন যে, ভারতের সাধারণ মানুষের নৈতিক বিশ্বাসে বলীয়ান চরিত্র এবং কর্মক্ষমতাই জাতির আত্মশক্তির আধার।

জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গৌরবের স্বীকৃতি সভাপতির ভাষণে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ও সংঘগত কতকগুলি ত্রুটির, অসংগতির এবং আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে গঠনকর্মের অনুশীলনে কংগ্রেসকর্মীরা আগ্রহ হারাইয়াছেন। অথচ গঠনকর্মই জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসকর্মীর তথা কংগ্রেসের অন্তরঙ্গতার প্রধান অবলম্বন। নূতন সামাজিক-অর্থনীতিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করিবার উপযোগী আগ্রহ ও যোগ্যতা জনসাধারণের মধ্যে উদ্বোধিত করার যে দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা যদি উপেক্ষিত হয়, কংগ্রেস তাহার আদর্শভ্রষ্ট হইবে এবং প্রাণবত্তা হারাইবে। রাষ্ট্রীয়-পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করিলেই কংগ্রেসের কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। তাহা হইলে কংগ্রেস মাত্র নির্বাচন-প্রতিযোগী একটি দলেই পরিণত হইবে। কংগ্রেসের ইহা ভূমিকা নহে। তিনি গঠনকর্মের গুরুত্ব বিশেষ যুক্তির সহিত ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসকে সুস্থ, সুপ্রতিষ্ঠ এবং শক্তিশালী হইবার পথ বলিয়া দিয়াছেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার এবং বিশ্লেষণই তাঁহার ভাষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইবে জাতির প্রয়োজনসম্মত পরিকল্পনা। অর্থাৎ যে সকল অভাব অনুভব করা যাইতেছে তাহা পূরণের উপযোগী উদ্যোগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বলা হইয়াছে আর্থিক পরিকল্পনা। সংগতি ও উপায়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীধেবর তাঁহার ভাষণে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে কোনো সুস্পষ্ট অর্থ-নীতিক সংজ্ঞার বা মতবাদের উল্লেখ করেন নাই। কেবলমাত্র বলিয়াছেন—ভারত এই বিষয়ে তাহার নিজস্ব বিশেষ পন্থা অনুসরণ করিবে। সে পথ—পুঁজিবাদী পথ নহে—সে পথ কম্যুনিষ্ট পথ নহে।

কুটীরশিল্পের প্রসারতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তিনি। তাঁহার উক্তি হইতে মনে হয় যে কুটীর-শিল্পই কর্মসংস্থানের প্রধান উপায় বলিয়া তাহার ধারণা। নূতন সামাজিক—অর্থনীতিক পরিবর্তনের আবির্ভাব জাতীয় জীবনে সুবহ করিবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে এবং সেজন্য বুনিয়াদী প্রথারই প্রতিষ্ঠা সভাপতি চাহিয়াছেন। সামাজিক বৈষম্য বিলোপের উদ্যোগে জাতিভেদ প্রথা, নারীদিগের অনগ্রসরতা এবং অনুন্নত সমাজসমূহের সামাজিক অক্ষমতার সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। ইহাও তিনি তাহার ভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেসের নূতন সভাপতির ভাষণ আদর্শনিষ্ঠ গঠনকর্মীর ভাষণ। জাতির আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুরাগ এবং বলিষ্ঠ আশাবাদীর আগ্রহ লইয়া আসন্ন পরিবর্তনকে তিনি অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

প্রসঙ্গ বিহার—

বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন—কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কেমন করিয়া ধাপে ধাপে বাংলাদেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া আজিকার এই ক্ষুদ্রতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাগ্রত বাঙালী যখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখনই তৎকালীন বৃটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙালীকে আঘাত হানিয়া নমিত করিবার চেষ্টা চালাইলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ হইল, কিন্তু বাঙালী তাহা স্বীকার করিল না। ১৯১১ সালে দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদকে বাঙালীর কাছে নতি স্বীকার করিতে হইল। অতঃপর অপমানিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বার বার বাঙালীকে আঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই। সাম্প্রদায়িক দানবকে সঞ্জীবিত করিয়া বাঙালীর শক্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিল এবং দেশ হইতে বিদায় প্রাক্কালে আর একবার বাঙালীকে চরম আঘাত হানিয়া গেল। বাঙালী নিজেকে বিস্মৃত হইল এবং তাহার অন্তরের সাম্প্রদায়িক দানব জাগ্রত হইয়া তাহাকেই আঘাত হানিল। আজ বাঙালী শুধু দ্বিধা বিভক্ত নয়—বহুধা বিভক্ত। পূর্ববাংলার সাড়ে চার কোটি বাঙালী আজ ভিন্ন জাতি—ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। আর পশ্চিমবাংলার আড়াই কোটি বাঙালী—বাঙালী হইতে—পৃথক ভারতীয় জাতি। শুধু কি তাই—৬৭ লক্ষ বাঙালী আজ বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পশ্চিম বাংলা হইতে পৃথক, উড়িষ্যার দেড় লক্ষ বাঙালী বাঙালা হইতে বিচ্ছিন্ন প্রবাসী এবং আসামের সাড়ে চব্বিশ লক্ষ বাঙালী অবাঞ্ছিত জীবনযাপন করিতেছে। ত্রিপুরা [illegible] সাড়ে [illegible] লক্ষ বাঙালী আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য [illegible]

দুই শার্টের গল্প
বিক্রী — শার্ট ৫ টাকা
রাম ও শ্যাম দুজনে একই রকম শার্ট কিনলেন
এইটা
এইটা
এই নিন, মশায়— একটি ক'রে!
তিন মাস পরে — ময়দানে
ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে গেছে— বাবাকে ডাকি।
রাম ও শ্যামের আবার দেখা হ'লো
আপনার শার্ট এখনও নতুন আছে। আমারটাত প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।
দুই গৃহিণী
এর রহস্য কি?
খুব সোজা। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেও সব ময়লা বের ক'রে দেয়। আছড়ালে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে যায় — আর তা বেশীদিন টেঁকে না।
এ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ!
এ কথা সত্যি! সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেও কাপড়কে সাদা ও ঝকঝকে করে দেয়। সবই বেশীদিন টেঁকে, আর তাতে পয়সাও বাঁচে!!
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড় চোপড়কে আরও টেঁকসই করে
S. 227-X62 BG
ভারতে প্রস্তুত
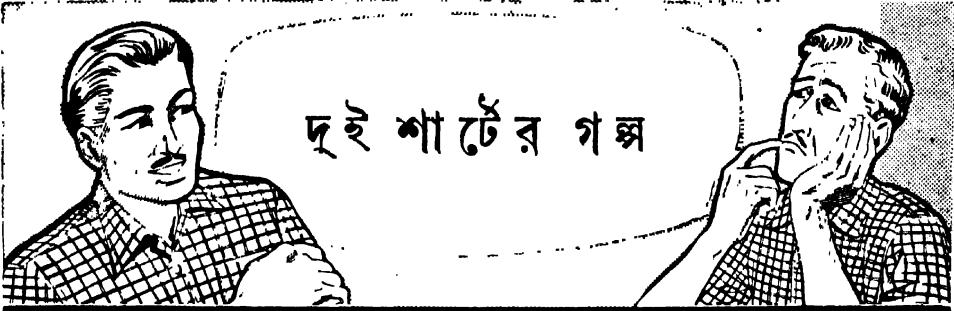
বিহার উড়িষ্যা কিংবা আসামে যে সকল বাঙালী আছেন তাঁহারা বাঙালীই। সেদিনেও তাঁহারা এই বাংলারই অধিবাসী ছিলেন। বাংলার সেই সকল অংশ আজ ভিন্ন রাজ্যের অংশ বলিয়া পরিচিত। শুধু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কিংবা ভৌগোলিক দিক হইতে এই সকল অংশ বঙ্গের অঞ্চল ছিল না—ইতিহাসের দিক হইতেও উহারা বঙ্গের সহিত একই স্মৃতিতে বিজড়িত।

আজ বাঙালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার যে নিদারুণ অপপ্রয়াস বিহার রাজ্যে চলিয়াছে তাহাতে ক্ষুদ্র পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা শঙ্কিত না হইয়া পারে না। বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে বিহার-কংগ্রেস ও কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট একযোগে যে কুশ্রী কাণ্ড শুরু করিয়াছেন তাহা কেবল উদ্বেগজনক নয়, রীতিমত আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবেই বাঙালী ও বঙ্গভাষাভাষীদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এই বলিয়া যে, বিহারের ভৌগোলিক অখণ্ডতা নষ্ট করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা হইলে তাঁহারা যে কোনো পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইয়াও, তাহার প্রতিকার করিতে দ্বিধা করিবেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহারা রক্তস্রোত বহাইবেন, আবশ্যক হইলে প্রাণবলি দিবেন; তথাপি বিহার হইতে এক চুল পরিমাণ জমি বাহিরে যাইতে দিবেন না। নোয়াখালি ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, অথবা কলিকাতায় একদা পাকিস্থানীরা যেরূপ খুনখারাপি, লুঠতরাজ এবং অগ্নিকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে—মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানেও ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা তাঁহারা অসংকোচে ঘোষণা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা ও প্রচারপত্র দ্বারা সাধারণ নরনারীকে একদিকে অবিরামভাবে বাঙালীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইতেছে, অন্যদিকে সভা, শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদের দ্বারা অখণ্ড বিহার কায়েম করিতে উত্তেজিত করা হইতেছে। দলে দলে গাড়ি বোঝাই করিয়া নরনারীকে হল্লা করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং সীমানা কমিশন যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই হল্লা জমাইয়া এই কথা প্রচার করা হইয়াছে যে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি খাঁটি হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল। তাহারা কিছুতেই বাংলায় যাইবে না। এই সকল অঞ্চলের বঙ্গভুক্তি তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না।

প্রধানতঃ বাংলা ভাষাভাষীদের উপরেই জেহাদী জিগির চলিতেছে—সেই সঙ্গে খর সোয়ান ও সেরাইকেল্লা দাবী করার জন্য উড়িয়াদের এবং সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর লইয়া যাঁহারা ঝাড়খণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য-গঠনের দাবী করিতেছেন, সেই আদিবাসীদেরও হাড় ভাঙার হুমকি দেওয়া হইতেছে। ভাড়াটিয়া লোক লাগাইয়া বঙ্গভুক্তি বিরোধীদের হাজার হাজার স্বাক্ষর জোগাড় করা হইতেছে। এই স্বাক্ষর যে না দিবে তাহার ভবিষ্যৎ ভীষণ ভয়াবহ এ ভীতিও প্রদর্শন করা অকুণ্ঠিতভাবে চলিতেছে। আরো শুনা যাইতেছে যে, বিহারের দাবী যে খাঁটি তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহারা নাকি—'প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ' বা ডিরেক্ট অ্যাকসন'এর পন্থা গ্রহণ করিবেন। কারণ এই পথেই যখন পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে তখন ইহাই সফলতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ!

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে—বিহারের এই উন্মত্ত জেহাদের সংবাদ কী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সরকার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অথবা জানিয়া শুনিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বা প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করিতেছেন না? একদা এইরূপে উপেক্ষা আর ঔদাসিন্যের ছিদ্রপথে পাকিস্তানী জিগির শক্তিশালী হইয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিরোধকে উপেক্ষা করিতে করিতে এমন সময় আসা বিচিত্র নয় যখন ভারতের ঐক্য ও ভারতের নিরপত্তাই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। গোড়াতেই ব্যাপারটি দৃঢ়হস্তে নিয়ন্ত্রিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল। যে ভারত সরকার কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন ও ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির জন্য চিন্তিত ফরমোসার সমস্যা যাহাতে যুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় সেই ভাবনায় অস্থির চিন্তিত, তাঁহাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এমন অশান্তি বিপদ ও উৎপাত চলিতেছে, অথচ তাঁহারা নির্বাক! ইহা বাস্তবিক আশ্চর্যের।

যাহা হউক, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহার সফর শেষ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। কমিশনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিশেষভাবেই সচেতন। কমিশনের শুভাগমন পশ্চিমবঙ্গবাসীর অন্তরের শুভেচ্ছার দ্বারাই অভিনন্দিত হইয়াছে। আমরাও স্বাগত জানাইতেছি এবং কমিশনের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে, যেন কমিশন স্বল্লায়তন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুবিবেচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের দাবী অসামান্য নয়। পশ্চিম বঙ্গের দাবী অলেহ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাঁচিতে চায়—বাঁচিতে চায় তাহার ভাষা, তাহার সংস্কৃতি, তাহার ঐতিহ্যকে লইয়া। পশ্চিমবঙ্গ আজ নিজেরই বাসভূমিতে পরবাসী হইয়া যে শঙ্কিত জীবনযাপন করিতেছে—সেই অবিচারের প্রতিকার চায়।

তেলিনীপাড়া খেয়ালী সংঘ—

গত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর হুগলী জেলার তেলেনীপাড়ায় স্বর্গত ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে স্থানীয় খেয়ালী সংঘের বার্ষিক মিলনোৎসব হইয়া গিয়াছে। হুগলীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও চন্দন নগরের শাসক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীগোপিকাবিলাস সেন সভাপতি হন ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সংঘের সভাপতি ও ভদ্রেশ্বর পৌরসভার সদস্য শ্রীসুশীতকুমার মুখোপাধ্যায় সংঘের ইতিহাস বিবৃত করিলে গোপিকাবাবু, উপেন্দ্রবাবু ও ফণীন্দ্রবাবু সময়োচিত ভাষণ দান করেন। তাহার পর কবিগুরুর বিসর্জন নাটক অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিনে শ্রীদেবকীকুমার বসু সভাপতি ও শ্রীকমল মিত্র প্রধান অতিথি হন ও ভোলা মাষ্টার নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয় উভয় দিনই সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। খেয়ালী সংঘ তাঁহাদের সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের দ্বারা ঐ অঞ্চলে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

বলরামপুর রামকৃষ্ণ সাধন মঠ—

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শিষ্য। তিনি ভারত বিভাগের পূর্বে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া ও কুমারখালিতে মঠ স্থাপন করিয়া জনসেবা করিতেন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতেন। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্থান সরকার তাঁহার কুষ্টিয়া ও কুমারখালির মঠগুলির বাড়ী ও জমী দখল করিয়া লইলে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। বর্তমানে তিনি মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের নিকটস্থ বলরামপুর গ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা ভবনের নিকট রামকৃষ্ণ সাধন মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস ও কার্য্য করিতেছেন। স্থানীয় চৌধুরী জমীদারগণ ও মেদিনীপুরের শ্রীযজ্ঞেশ্বর কর তথায় ৫ বিঘা জমী সহ একটি পুরাতন বাটী ও ২টি পুষ্করিণী দান করিয়াছেন। কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া জীর্ণ রাজবাড়ী মেরামত করা হইয়াছে—একটি নূতন অতিথি-নিবাস নির্মিত হইয়াছে ও নূতন ১০ বিঘা জমী খরিদ করা হইয়াছে। এক কালীন দানের দ্বারা সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইতেছে। ১৩৫৬ হইতে ১৩৬০ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে ৯টি উৎসবে ১৮ শত ব্যক্তিকে প্রসাদ দান করা হইয়াছে—বহু অতিথি অভ্যাগতের সেবা করা হইয়াছে, বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ৪৩৯টি বক্তৃতা ও ৯৩১টি আলোচনা সভা করা হইয়াছে। গত ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতাবাসী বহু সাহিত্যিক মঠ দর্শন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। ৬ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বর্তমানে মঠে বাস করেন—তথায় একটি আবাসিক শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে চমৎকার গৃহ ও পুষ্করিণীর সমাবেশে ঐ স্থানে আবাসিক শিক্ষামন্দির অতি সহজে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। খড়্গপুর হইতে সাইকেল-রিকসায় মাত্র ৩ মাইল দূরে ঐ মঠ। স্বামী পরমানন্দ মঠের পরিচালক পরিষদের সম্পাদক ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সভাপতি। ৪ জন সন্ন্যাসী ও ৯ জন গৃহী ভক্ত লইয়া পরিষদ গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ এইরূপ বহু সেবা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা মন্দিরের প্রয়োজন। বলরামপুরের এই মঠ সেই অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদের এই জনকল্যাণ কার্য্যে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হইবে না।

চেঁচানিয়া দেশবন্ধু ছাত্রাবাস—

চেঁচানিয়া নদীয়া জেলার পাকিস্থান সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রাম। উহা হোগলাবেড়িয়া পোষ্টাফিসের মধ্যে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক একজন দেশকর্মী তথায় একটি কৃষি শিল্প বিত্তালয় ও সঙ্গে একটি উচ্চ বিত্তালয় পরিচালনা করিতেছেন। তিনি নানা বাধাবিপত্তি ও অভিযোগের মধ্য দিয়া গত ৭ বৎসর কাল বিত্তালয়টিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন—অর্থনীতিক কারণে পারিবারিক অশান্তি, পড়ার ঘর ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং সর্বোপরি গৃহ-শিক্ষকের [illegible] কারণ। সে জন্য তিনি সামান্ত মাত্র খরচ হইয়া উক্ত বিত্তালয়ের দেশবন্ধু ছাত্রাবাসে হরেন্দ্র ভবন নামে বিভাগ খুলিয়া তথায় কয়েকটি ছাত্র রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছেলেরা যাতে নিজে রোজগার করিয়া তথায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরে মাত্র ১০ জন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। গ্রামটি সহর হইতে দূরে—ঐরূপ স্থানে ছাত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রকৃত আবহাওয়া বর্তমান। সত্যেন্দ্রবাবু ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী এই কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বাধীন দেশের নাগরিক তৈয়ারীর কাজে মন দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই নবোত্তমের সাফল্য কামনা করি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্মান দান—

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের বহু গুণী ব্যক্তিকে গত প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্মানসূচক পদক দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীর ডাক্তার ভগবান দাস ও শ্রী এম বিশ্বেশ্বরায়া সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের ভারতরত্ন পদক পাইয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে পদ্মভূষণ পদক লাভ করিয়াছেন। কয়েকজন বাঙ্গালী পুলিসও পুলিস-পদক পাইয়াছেন। শ্রীরাজাগোপালাচারী, ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ ও ডাক্তার সি-ভি রমনও ভারতরত্ন উপাধি পাইয়াছেন এবং ডাক্তার এস-এন বসু ও ডাক্তার জাকির হোসেন পদ্মবিভূষণ পদক পাইয়াছেন।

নূতন পথে সরকারী বাস—

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতার নিম্নলিখিত ৪টি পথে শুধু সরকারী বাস চলিবে স্থির হইয়াছে—(১) ৫এ—রাসবিহারী এভেনিউ ও রসা রোড হইয়া হাওড়া ষ্টেশন ও বালীগঞ্জ ষ্টেশন, (২) ৮নং—ল্যান্সডাউন রোড হইয়া হাওড়া ষ্টেশন ও বালীগঞ্জ ষ্টেশন, (৩) ১১এ—বীডন ষ্ট্রীট হইয়া হাওড়া ষ্টেশন ও শ্যামবাজার, (৪) ২নং—পাইকপাড়া ও লেক অঞ্চল। তাহার ফলে যাত্রী সাধারণ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হলডেন—

খ্যাতনামা বামপন্থী বৃটীশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জে-বি-এস—হলডেন ২৩শে জানুয়ারী অক্সফোর্ডে যাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদি ভারত তাঁহাকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে, তবে তিনি ভারতে আসিয়া বাস করিবেন। ইউরোপের কোন কোন স্থান অধিকাংশ আমেরিকান সহর অপেক্ষা তিনি ভারতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। তিনি বলেন—ভারতে যে কেহ অনুভব করে যে সে একটি উচ্চ সভ্যতা সম্পন্ন দেশে বাস করিতেছে। তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর—সম্প্রতি তিনি ভারত ঘুরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহসা এই ইচ্ছার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবব্যবস্থা—

গত ৩১শে জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় স্থির হইয়াছে যে অতঃপর বাহিরের ছাত্ররা কলেজে যোগদান না করিয়াই আই. এ, আই. কম., বি. এ., বি. কম পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবেন। অবশ্য এই সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে কতকগুলি সর্তপূরণ করিতে হইবে। আপাততঃ ৫ বৎসর কাল এইভাবে পরীক্ষার্থীদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় বহু ছাত্র পরীক্ষা দিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

কৃষি-শ্রমিক সম্বন্ধে তদন্ত—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শ্রম-মন্ত্রী কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার যে তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের গ্রামে মোট ৫ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার বাস করে, তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করে। ১৯৫১ সালে শতকরা ৩৫,৪ গ্রাম্য পরিবার কৃষি কর্মী, শত করা ২২,২ গ্রাম্য পরিবার জমীর মালিক, শতকরা ২৭'২ গ্রাম্য পরিবার প্রজা ও বাকী শতকরা ২০২ গ্রাম্য পরিবার অকৃষিজীবী ছিল। উত্তর পশ্চিম ভারতে শতকরা ৭৭ গ্রাম্য পরিবার এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতে শতকরা ৮৪ গ্রাম্য পরিবার কৃষিকার্য্য করিত। মধ্য ভারতে শতকরা ৭৮ গ্রাম্য পরিবার এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে শতকরা ৭৯ গ্রাম্য পরিবার কৃষিজীবী। এ অবস্থায় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ব্যতীত ভারতের জনগণের অবস্থা উন্নত হইবে না। ভূমিহীনকে ভূমিদান, কৃষির ক্ষেত্র একত্রীকরণ ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের কৃষকদিগকে বাঁচাইবার যে চেষ্টা আরও হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, তাহার ফলে শুধু দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান হইবে না, নানা প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করিয়া ভারতের কৃষক তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন—

গত ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী অগ্রণী মুখোপাধ্যায় এম-এস (সার্জারী) উপাধি লাভ করেন—মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই উপাধি পাইলেন। ৪ হাজার গ্র্যাজুয়েট উপাধি পাইয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৫০ জন মহিলা আছেন। ৩ জন মহিলা কলাবিভায় ডি-ফিল ও ১জন মহিলা বিজ্ঞানে ডি-ফিল হইয়াছেন। শ্রীযুত সিতেন্দু শেখর ভট্টাচার্য্য এম-বি উপাধির সহিত ৭টি পদক (স্বর্ণ ও রৌপ্য) পাইয়াছেন—মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী শ্রীস মহলানবীশ দর্শনে এম-এ উপাধির সহিত ৪টি পদক পাইয়াছেন—তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদক পাইবেন। খ্যাতনাম্নী লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী 'লীলা পুরস্কার' ও আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' পাইয়াছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক মাদাম জোলিয়েট কুরী সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। ডাক্তার জে সি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীশচন্দ্র শীল 'কোটস স্বর্ণপদক' পাইয়াছেন। ডাঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রসাদজীবন চৌধুরী ও ডাঃ শঙ্কর সেবক বড়াল 'মৌয়াট স্বর্ণপদক' পাইয়াছেন। ডাক্তার অরুণকুমার মিত্র অবস্‌ট্রেটিকস্‌' এ স্বর্ণপদক ও ডাক্তার সমীরকুমার ব্রহ্ম প্রাণী বিদ্যায়' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক' পাইয়াছেন। ৩ জন ডি লিট, ৩জন ডি-এস্‌ সি, ৩ জন এম-এস ও ৫ জন এম-এ উপাধি পাইয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হউক, আমরা ইহাই কামনা করি।

শ্রীকুমারচন্দ্র জানা—

পশ্চিমবঙ্গের প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের এম-এল-এ মেদিনীপুরের নেতা শ্রীকুমারচন্দ্র জানা বিধান সভার সদস্যপদ ও প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া গত ২৫শে জানুয়ারী হইতে ভূদান আন্দোলনে জীবন পণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ২৪ পরগণা ডায়মণ্ডহারবারের এম-এল-এ শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীও সকল প্রকার রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ভূদান আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। চারুবাবু ও কুমারবাবু আজীবন দেশ সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের এ আদর্শ দেশবাসীকে প্রেরণা দান করিবে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব—

উড়িষ্যার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও বর্তমানে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের (কেন্দ্রীয়) সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব বোম্বায়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্যভার গ্রহণ করিবেন। হরেকৃষ্ণবাবু আজীবন দেশকর্মী—তিনি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। তাঁহার মত একজন সরল, অনাড়ম্বর ব্যক্তি রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র দেব—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সমাজসেবী সুরেশচন্দ্র দেব সম্প্রতি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি প্রথম জীবনে 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া সে যুগের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের প্রীতিভাজন হন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী ছিলেন। সারাজীবন তিনি সাংবাদিকতা করিয়া গিয়াছেন। গত ৩৫ বৎসর কাল আমরা তাঁহাকে বহু সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি। তিনি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, মডার্ণ রিভিউ, ন্যাশানালিষ্ট প্রভৃতি পত্রে বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা ছিলেন। সুরেশবাবুর মত সরল, অনাড়ম্বর, সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান লোক অতি বিরল।

কলিকাতার নূতন সেরিফ

১৯৫৫ সালের জন্য খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার এস-সি-উকীল কলিকাতায় সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শুধু চিকিৎসক রূপে নহেন, খ্যাতনামা সমাজ-সেবক হিসাবে ও দেশসেবক হিসাবে সর্বজন পরিচিত। তাঁহার নিয়োগে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।
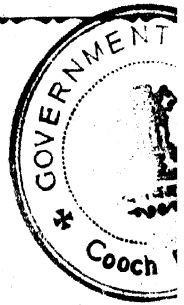
দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিল*যুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
Rexona

বৈদেশিকী

মঃ ম্যালেনকোভ-এর পদত্যাগ—

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অকস্মাৎ পট পরিবর্তন হইল। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকোভ সহসা পদত্যাগ করিয়াছেন। সোভিয়েটের বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বিতর্ক যখন আরম্ভ হইবে ঠিক সেই সময় মঃ ম্যালেনকোভ তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, পদত্যাগ পত্র দাখিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বসম্মতক্রমে তাহা গৃহীত হইল। তাহা প্রত্যাহারের জন্য, কিংবা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করার যে রাজনৈতিক শিষ্টাচারসম্মত একটা প্রথা আছে, তাহা পর্যন্ত এক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। এইরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উপর এমন অশোভন ব্যস্ততার সহিত যবনিকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়—এই ব্যবস্থা পূর্বপরিকল্পিত এবং প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী-পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ সে পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন।

মঃ ম্যালেনকোভ তাঁহার পদত্যাগপত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের অক্ষমতাই এই অপসারণের জন্য দায়ী এবং বিশেষ ভাবে দায়ী তাঁহার প্রবর্তিত ও পরিচালিত কৃষিনীতির ব্যর্থতা। এই স্বীকারোক্তি অবশ্য স্পষ্ট এবং সোভিয়েট ঐতিহ্যের সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। কর্তব্য সাধনে ব্যর্থতা, অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর অন্য যে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করে নাই, এমন সোভিয়েট অপরাধীর কথা জানা নাই। স্বার্থ যেখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সেইখানেই দোষ স্বীকার করাইয়া পদত্যাগপত্র আদায় করা সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ প্যাঁচ।

মঃ ম্যালেনকোভের পদত্যাগ আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্ষেত্রে যে ফলই প্রসব করুক না কেন। বৃহত্তর বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাই লক্ষ্যণীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রের ঘটনাপ্রবাহ হয়তো অচিরেই ভিন্ন পথে মোড় ফিরাবে। গতি পরিবর্তনের আশু উপলক্ষ সম্মুখেই বিরাজমান; পুরোভাগে আছে ঘনায়মান সংকট ফরমোজা, এবং তাহার পশ্চাতে প্রতীক্ষারত পশ্চিম জার্মানীর পুনঃসজ্জা সম্বন্ধীয় প্যারিস চুক্তি। ম্যালেনকোভের পদত্যাগ বৃহত্তর বিশ্বের পরিস্থিতির উপর দীর্ঘ ছায়াপাত না করিয়া পারে না। আরো বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ম্যালেনকোভ প্রধান মন্ত্রীত্বে ইস্তাফা দিয়া সহকারী মন্ত্রীত্বের আসন লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ত্যক্ত প্রধান মন্ত্রীর আসন লাভ করিয়াছেন মার্শাল বুলগানিন।

সোভিয়েট রাজনীতির দাবা খেলায় ইহা এক নূতন চাল। ইহার পরবর্তী পরিস্থিতি কি এবং কোথায় দাঁড়ায় তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যুগোশ্লাভিয়া—

সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়া দেশের গণতন্ত্রের সভাপতি মার্শাল টিটো ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। যুগোশ্লাভিয়া যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের নিম্নলিখিত কয়টি রাষ্ট্র একত্র করিয়া গঠিত হইয়াছে—(১) সার্বিয়া (২) ক্রোয়াসিয়া (৩) শ্লোভানিয়া (৪) বসনিয়া (৫) হারজেগোভিনা (৬) ম্যাসিডোনিয়া ও (৭) মন্টিনগ্রো। প্রাকৃতিক সম্পদে যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া আয়তনে নবম ও লোক-সংখ্যায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐ স্থানের শতকরা ১২জন অধিবাসী মুসলমান। গত মহাযুদ্ধে ঐ দেশের শতকরা ১১ জন লোক মারা গিয়াছে। সুখের কথা মার্শাল টিটো ভারতে আসিয়া শুধু স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের উন্নতির চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হন নাই, শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনার ফলে তিনি বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধ দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না—পরস্পর সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের মনোভাব লইয়া কাজ করিলেই পৃথিবীতে শান্তি চিরস্থায়ী হইবে। টিটোর ভারত পরিদর্শনের ফলে ইউরোপে ও মহাত্মা গান্ধীর নীতি প্রচারিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছেন।

পাকিস্থানে ৫খানি হিন্দু বাড়ী লুঠ—

গত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতায় খবর আসিয়াছে যে পূর্ব পাকিস্থানে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় আড়ংঘাটা গ্রামে ধানকাটা লইয়া বিবাদের ফলে গুলীতে একজন হিন্দু কৃষক (মতিলাল, ২৬ বৎসর) ও একজন পুলিস কনেষ্টবল নিহত হইলে মুসলমান জনতা আড়ংঘাটা, ফুলহাটা, গোলবালিয়া ও একরাম আলি গ্রামের হিন্দুদের প্রায় ৫শত বাড়ী লুঠ করিয়া লক্ষাধিক টাকার দ্রব্য লইয়া যায়। বহু হিন্দু আহত হয় ও বহু হিন্দুবাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়। পুলিস পরে উভয় সম্প্রদায়ের ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে গত বৎসরে (১৯৫৪) বহু হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর এই ঘটনা সকলকে আতঙ্কিত করিবে ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ইহা প্রতিকারের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্র পরিচালকগণের মিলন ও সমবেত চেষ্টার ফল ত কিছুই দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের চিফ সেক্রেটারীদের মিলন ও আলোচনা সভা হয়। তাহার ফল প্রায়ই কিছুই হয় না। এখন উভয় রাষ্ট্রের জনগণ যদি এই অবস্থা বন্ধ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত না হন, তবে উভয় রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।
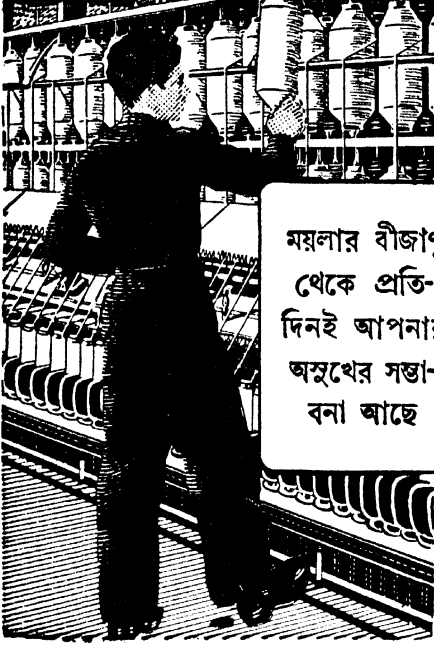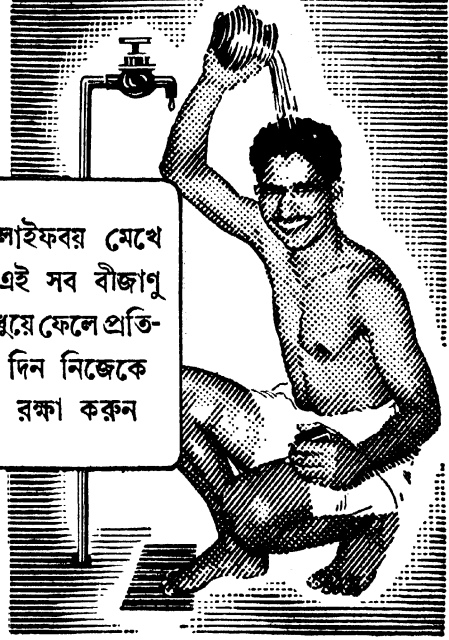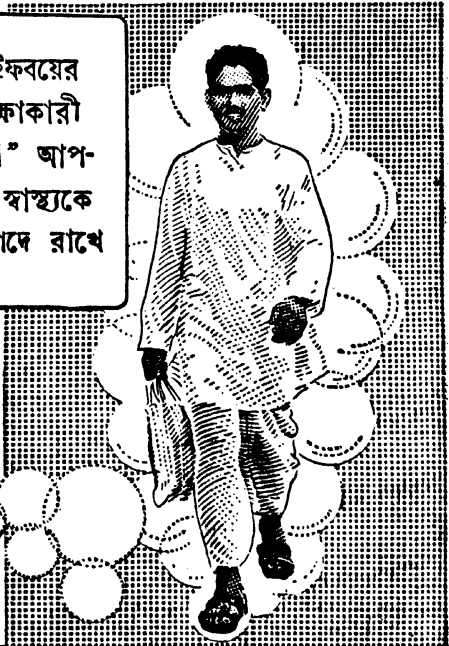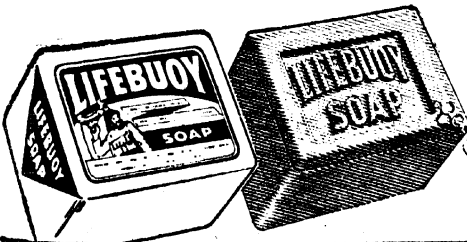
তৃতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের কেবিন। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। কোথাও টাওয়ার ক্লকে ঢং ঢং শব্দে দুইটা বাজিল। বেডে শুইয়া আছে সুমিতা। পাশে একটি ঝি শুইয়া ছিল মেঝের উপর। সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। সুমিতা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপরে রক্ষিত কাগজে কয়েকছত্র লিখিল। এবং এদিক ওদিক চাহিয়া ঝিএর মাথার গোড়ায় রক্ষিত গায়ের চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া লইল, মাথায় ঈষৎ ঘোমটা দিল। আবার একবার চিঠিখানা দেখিয়া—কিছু সংশোধন করিল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার মুখে দাঁড়াইল, এদিক ওদিক দেখিল। এবং বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। গোড়া হইতেই বাহিরে কোথাও হইতে রেডিয়োর প্রোগ্রাম শোনা যাইতেছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। যন্ত্র সঙ্গীত শেষ হইতেই রেডিয়ো হইতে ঘোষিত হইল।—সুমিতা ইহারই মধ্যে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার পরও প্রোগ্রাম চলিল।

রেডিয়ো ঘোষণা। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বলছি। এতক্ষণ আপনারা যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনছিলেন। এইবার একটি বিচিত্র কথিকা পাঠ করছেন—বিখ্যাত কথাশিল্পী সুরঞ্জন ঘোষ। "গ্রীষ্ম দ্বিপ্রহর।"

কথিকা। বৈশাখ মাস, মেষরাশিস্থ ভাস্কর—আজ দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি মহিমায় মধ্যগগনে উপনীত হয়েছেন এই মুহূর্ত্তে। মধ্যগগন অতিক্রম করেছেন—এখন দুটো বাজছে। ফায়ারব্রুে দিয়ে তৈরী লোহা গলানো একটা বিরাট কড়াইয়ের মত চেহারা হয়েছে আকাশের। বিষুব রেখার গণ্ডীর মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি পঞ্চতপায় যোগাসনে বসেছেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্রা বিশ্বপ্রকৃতি। গতকাল তাপমাত্রা ছিল একশো পাঁচ ; আজও তার থেকে কম নয়। ষাট লক্ষ লোকের বাসভূম—কর্ম্মমুখরিত কলিকাতা—বিরাট একটি মধুচক্রের মত ; লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে চঞ্চল পাখার গুঞ্জন শব্দ তুলে উড়ে বেড়ানো মধুসন্ধানী লক্ষ লক্ষ মধুমক্ষিকার মত কল কল করে বিরামহীন বিশ্রামহীন গতিতে ছুটে বেড়ায়। সেই মানুষের সে কলরব সে চঞ্চলতাও স্তিমিত। শুব্ধ কলকাতা। পথে পিচ গলছে। পথ জনবিরল। দোকানে দোকানে দোকানী ঢুলছে, খরিদ্দার নেই ; ট্রাম ছুটে চলেছে, জনবিরল ট্রাম ; যে ক'জন যাত্রী রয়েছে—তাদের চোখে ঘুমের ঝিমুনি লেগেছে। পার্কের গাছগুলির পত্রপল্লব ম্লান-উত্তাপ ক্লিষ্ট ; ময়দানে গাছের ছায়ায় একজন ঝাঁকামুটে তার ঝাঁকার মধ্যেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ অবসন্ন দেহে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে ; ওর চোখেও ঘুমের আমেজ নেমেছে। বড় বাড়ীটার কার্ণিশের তলায় পায়রার বাসা ; পায়রাগুলি নিথর হয়ে বসে আছে ; গলার কাছটা ধুঁকছে। কদাচিৎ একটা আধটা হাঁক শোনা যাচ্ছে—বাস-নে নাম লেখা বে-ন। দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে। কখনও বড় রাস্তায় ট্যাক্সি বা মোটর চলে যাওয়ার শব্দ। গাড়ী থামার শব্দে চোখ মেলে চেয়ে দেখে—আবার চোখ বুজছে—আফিসের বা বড় বাড়ীর—বড় প্রতিষ্ঠানের তন্দ্রাচ্ছন্ন দারোয়ানেরা—(সুমিতার প্রস্থান) বহ্নিমান বৈশাখ সূর্য্য চলেছে—অক্লান্ত পদক্ষেপে। বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। বহ্নিমান বৈশাখ সূর্য্য। রুদ্র বৈশাখের ললাট তিলক। দ্বাদশ ভাস্করে তার ললাট চিহ্নিত।

হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ—যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে—
যাক নদী পার হয়ে—যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী করো শান্তি পাঠ।

রেডিয়ো ঘোষণা। আকাশবাণী কলকাতা। গ্রীষ্ম দ্বিপ্রহর কথিকাটি এইখানেই শেষ হল। এবং আমাদের দুপুরের অনুষ্ঠানেরও এইখানে সমাপ্তি।

রেডিয়ো ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজার শব্দ হইল। আড়াইটা বাজিল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধতার পর একজন নার্স প্রবেশ করিল।

নার্স। মিসেস মুখার্জ্জী! সুমিতা দেবী!

প্রবেশ করিয়াই সে চকিত হইয়া দাঁড়াইল। সুমিতা কই? সে বিস্ময়ে চারিদিক দেখিল। আবার ডাকিল।

নার্স। মিসেস মুখার্জ্জী!

কেবিনের সংলগ্ন বাথরুমের দিকে আগাইয়া গেল।

মিসেস মুখার্জ্জী, মিষ্টার মুখার্জ্জী এসে বসে আছেন। ডাক্তারের স্পেশাল পারমিশন নিয়েছেন—আপনাকে এখনই নিয়ে যেতে চান। আপনাকে প্রস্তুত হতে বললেন। মিসেস মুখার্জ্জী!

সে এবার গিয়া বাথরুমের দরজা ঠেলিয়া উঁকি দিয়া ভিতরটা দেখিল এবং আতঙ্কিত হইয়া ফিরিল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—

নার্স। মিসেস মুখার্জ্জী! (তারপর ঠেলা দিয়া ঝিটাকে ঠেলিয়া তুলিল) এই! এই মেয়ে! এই!

ঝি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল

ঝি। এ্যাঁ!

নার্স। কোথায় গেলেন? মিসেস মুখার্জ্জী?

ঝি ঠিক বুঝিতে পারিল না

নার্স। রোগী। পেশেণ্ট। ইনি (বিছানা দেখাইয়া) কোথায় গেলেন?

ঝি। (উঠিয়া দাঁড়াইল, চারিদিক দেখিয়া) শুয়ে তো ঘুমুচ্ছিলেন!

নার্স। ঘুমুচ্ছিলেন তো গেলেন কোথায়?

ঝি। তা তো—। ওঁকে ঘুমুতে দেখে আমি একটু শুয়েছিলাম। আপনিও তো দেখেছেন। উনি ঘুমুচ্ছিলেন। জমাদার আপনাকে ডাকলে—আপনি বেরিয়ে গেলেন। আমি শুলাম।

নার্স। (তিরস্কারের সুরে) শুয়েছিলে! শুয়েছিলে! মিসেস—মুখার্জ্জী! ডাক্তার! মিষ্টার বোস! মিষ্টার বোস।

দ্রুত বাহির হইয়া গেল

ঝি। (অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যাকুলতার সহিত ডাকিল) মা! মা! মা!

একবার বাহিরে গিয়া ডাকিল। একবার বাথরুমে উঁকি মারিয়া ডাকিল। একবার শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ডাকিল।

ডাক্তার নার্স-সঞ্জীব-পরমেশ্বর প্রবেশ করিলেন

নার্স। উনি চোখ বুজেই শুয়েছিলেন। একটু তন্দ্রাও বোধ হয় এসেছিল। আমাকে বাইরে থেকে ডাকলে। বললে—সায়েব এসেছেন—ডাক্তার সায়েবও আছেন—ডাকছেন আপনাকে। আমি বেরিয়ে গেলাম। হরিদাসী তখন বসে ঢুলছিল। ফিরে এসে দেখি—ঘরে মিসেস মুখার্জ্জী নেই। হরিদাসী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ভাবলাম বাথরুমে গেছেন। ডাকলাম। সাড়া পেলাম না। উঁকি মেরে দেখলাম, দেখলাম, না—সেখানে নেই।

ডাক্তার। কিন্তু যাবেন কোথায়?

সঞ্জীব দ্রুত বাহিরে গেল বাহির হইতে ডাকিল

সঞ্জীব। সুমিতা! সুমিতা!

ফিরিয়া আসিয়া বলিল

ডাক্তার! কি হ'ল? সুমিতা কোথায় গেল?

পরমেশ্বর বিছানা হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইলেন

পরমেশ্বর। পত্র! সুমিতার লেখা!

সঞ্জীব প্রায় ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল পড়িতে সুরু করিল

পরমেশ্বর। কালী কালী কালী! কালী বল মন! আমার সন্দেহ হয়েছিল। কালী যেন কানের কাছে এই কথাটাই ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিল! সুমিতা যখন কিছুতেই তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় নি—তখনই মনে হয়েছিল। আমি কত বললাম—আমায় বললে—না। শুধু 'না'।

সঞ্জীব তীব্র তিক্ততাভরা মুখে স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া চিঠিখানা হাতের মধ্যে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল

ডাক্তার। চিঠিতে কি লিখেছেন—কি লেখা আছে মিষ্টার মুখার্জ্জী!

চিঠিখানা ফেলিয়া দিল সঞ্জীব। ডাক্তার চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

"তুমি আজ আমাকে নিতে আসবে। কাল রাত্রি থেকে আমি ভাবছি। সারারাত্রি ঘুমুই নি। অল্প খানিকটা তন্দ্রা ক'বার এসেছিল, সে তন্দ্রা দুঃস্বপ্ন দেখে ভেঙে গেছে। প্রতিবারই দেখেছি—তুমি আমার হাত ধরেছ—আমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার হাতে হাত তুলে দিয়েছি, ঠিক এই মুহূর্ত্তে কে যেন হেসে উঠেছে। সে হাসি কুটীল নিষ্ঠুর। আমি ভয় পেয়ে চমকে উঠে তোমার বুকে মুখ লুকোতে গিয়ে দেখেছি—তুমি সে নও। তুমি সে নও। এক প্রতারক ছদ্মবেশী আমার স্বামীর ছদ্মবেশে আমাকে প্রতারণা করতে এসেছে। তিনবার এই একই স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে। সকালে নার্স হেসে বললে—সকালেই তুমি ফোন করেছ। বললে—মিষ্টার মুখার্জ্জী বোধ হয় রাত্রে ঘুমোন

নি। আমি শিউরে উঠেছি। সারাদিন ভেবেছি। ভেবে বুঝেছি—আমার স্বপ্ন মিথ্যা নয়। স্বপ্নের মধ্যেই আমি সত্যকে পেয়েছি। তুমি সে-তুমি নও। তোমার প্রথম যৌবনে—তোমার মধ্যে যার আভাস দেখেছিলাম, সেই তুমির কথা বলছি। আমার নারীত্ব তোমার পৌরুষ সাধনার মধ্যে দেখেছিল—পুরুষোত্তমের ছায়া। যে গৌতম বুদ্ধ—গোপাকে রাহুলকে পিছনে ফেলে—রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে—সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করে অরণ্যের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন—তার ছায়া দেখেছিলাম তোমার মধ্যে। যে রাম রাজ্যত্যাগ ক'রে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে নির্ভয়ে পথে বেরিয়ে—রাবণকে বধ ক'রে সীতার ললাটে বিজয়িনীর মুকুট পরিয়ে অযোধ্যা ফিরেছিলেন—তার ছায়া দেখেছিলাম তোমার মধ্যে। তাই সেদিন সকল জনকে ছেড়ে তোমাকে বরণ করেছিলাম। নিজেদের সমাজকে উপেক্ষা করেছিলাম। ধনীর ছেলেকে ঘৃণা করেছিলাম। রূপবানকে অবজ্ঞা করেছিলাম। তোমার মধ্যে বরণ করতে চেয়েছিলাম-নূতন সমাজ স্রষ্টাকে, পরম সম্পদের অধিকারীকে—রূপবানের চেয়েও রূপবান—অপরূপের রূপময়কে। সেই তো পুরুষোত্তম! পৃথিবীর সব নারীই স্বামীর মধ্যে চায় তাকে—পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তমকে। জানি মেলে না। স্বপ্ন ভাঙে। নারীকে পট আর পুতুল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়—দেবতার সাধ তার জীবনে মেটে না। আমার প্রথম জীবনে স্বপ্ন ভাঙতে ভাঙতে তুমি হলে নিরুদ্দেশ। সেই চরম দুঃখের মধ্যে আমি পেলাম পরমধন। তোমার মধ্যে যার আভাস দেখেছিলাম—রক্ত-মাংসের তুমির অভাবে—তোমার ছবির মধ্যে তাকেই আমি মূর্ত্ত করে তুলতে চেষ্টা করলাম। সে ছবি যে-দিন কথা বলবে—চোখের পলক ফেলবে—সেই দিন তুমি এসে দাঁড়ালে—রক্ত-মাংসের তুমি, মিথ্যা তুমি। সে-তুমি হারিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল। এ তুমি—সে-তুমি নও। স্বপ্ন আমার সত্য। আমি মিথ্যা তুমির কাছে আত্মসমর্পণ করতে কি পারি? পারব না! একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েও বাঁচলাম। আবারও কি আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে? তাই—আমি চললাম। গ্রীষ্মের দুপুরে—সমস্ত পৃথিবী ধুঁকছে। ঘরে ঝি-টা ঘুমুচ্ছে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, দারোয়ানেরা ফটকে নেই। পাশে কোথাও ছায়ায় বসে ঝিমুচ্ছে।—নার্স বেরিয়ে গেল। বুঝছি তুমি এসেছ। এই সুযোগে—আমি চললাম। চললাম—পুরুষোত্তমের সন্ধানে।"

পরমেশ্বর। জয় কালী জয় কালী জয় কালী। কালী! আনন্দময়ী কালী অমৃতময়ী।

সঞ্জীব। (চীৎকার করিয়া উঠিল) দাদু!

পরমেশ্বর। সঞ্জীব ভাই!

সঞ্জীব। ওই সব কথা তুমি বলো না। আমি সহ্য করতে পারছি না। ইচ্ছে হচ্ছে—

দুই হাতে গলা টিপিয়া ধরিবার ভঙ্গিতে আগাইয়া গেল

পরমেশ্বর। (অট্ট হাসি হাসিয়া উঠিল) জয় কালী! নে ভাই—তাই দে। কালী বলে দে গলা টিপে শেষ ক'রে। তারপর বস গিয়ে তপস্যায়। জয় কালী জয় কালী। কালী আমার গৌরী হয়ে ফিরে আসুক।

সঞ্জীব থমকিয়া দাঁড়াইল

ডাক্তার। পুলিশে একটা ডায়রী করতে হবে মিঃ মুখার্জ্জী! আসুন। গাড়ী নিয়ে চার দিকে—খোঁজ করুন। কোথায় কতদূর যাবেন মিসেস মুখার্জ্জী! আসুন! মিষ্টার মুখার্জ্জী!

সঞ্জীব। (ইহারই মধ্যে স্তব্ধ হইয়া কিছু ভাবিতেছিল, সে অকস্মাৎ সচেতন হইয়া বলিল) যা করবার,—আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি করুন। আমার কিছু করার নেই ডাক্তার।

পরমেশ্বর। সঞ্জীব। ওরে—

সঞ্জীব। দাদু, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

পায়ের ধূলা লইল

পরমেশ্বর। জয় কালী। জয় কালী! কালী বলে পাগলা। ছেঁড়া বলে কি দেখ! ওরে পাগলা—কালী বলে রাগই যে হয় না তোর ওপর। কিন্তু তুই আবার এ কি ক্ষ্যাপামী করতে চললি কালী বলে?

সঞ্জীব। না দাদু ক্ষ্যাপামী নয়। সঞ্জীবের এই হল পথ—এই হল ধারা। দাদু ছেলেবেলা থেকে নিজের ক্ষ্যাপামী নিয়ে ছিলাম। সুমিতাকে আমি চাই নি, সে নিজে এসে ধরা দিয়েছিল। তারপর সে চলে গেল। ফিরিয়ে আনতে গেলাম এল না। ভাবলাম টাকা চাই। টাকা হ'লে আসবে সুমিতা। টাকা আপনি এল। সুমিতা টাকা চেয়েছিল—কিন্তু টাকা দেখে মুখ ফেরালে—হারিয়ে গেল। যাক। আমি খুঁজতে যাব না। কি জন্যে? না। আমি আমার পথে চললাম। আমার পথে! তার সাধনা পুরুষোত্তমে—আমার—আমারও সাধনা—তিলোত্তমার।

প্রস্থান

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

স্বপ্নোনু মায়ানু মতি ভ্রমশ্চ

কানাই বসু

বেলা বারোটা বাজে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সকাল থেকে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। চমৎকার রোদ। দিন যেন হাসছিল। কে বলবে আষাঢ় মাসের দিন। হঠাৎ কোথা থেকে এমন মেঘ করে এল। আকাশ আদুরে আবদারে ছেলের মত অকারণে গাল ফুলিয়ে কাঁদতে বসে গেল।

পৃথিবীটা এমনিই বটে। যা না হবার মনে হয়েছিল সেটাই হয়ে বসে, আর হবার যেটা সেটা যেন হয়ই না।

সত্যপ্রিয় তাঁর শোবার ঘরে বিছানার একধারে শুয়ে জানলা পথে বৃষ্টিধারা দেখছেন। শুধু বৃষ্টি নয়, স্বপ্নও দেখছেন। কখনও চোখ মেলে, কখনও চোখ মুদে দেখছেন স্বপ্ন।

খাওয়া দাওয়া সেরে ওপরে এসে অফিসের জামা-কাপড় পরে তৈরী হচ্ছেন। বহুদিনের লোক বলে সত্যপ্রিয়র কিছু বেলা করে অফিসে যাবার অনুমতি আছে। এগারো থেকে ক্রমে সাড়ে এগারোতে ঠেকেছে। অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। ছাতাটা সারাবো সারাবো করে সারানো হয়নি। বৃষ্টি খুব জোর না হলেও, বাড়ী থেকে ট্রাম পর্যন্ত গেলে জামা-কাপড় ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কাল সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরবার পথে ভিজে এসেছেন। শরীরটা ভারি ঠেকছে, তার ওপোর আবার আজ সকালে ভিজে গিয়ে, তারপর সেই ভিজে জামা গায়ে শুকোনো, এ বয়সে আর চলবে না।

অফিস যাওয়া নিয়েই ভাবনা। তবে তেমন কিছু ভাবনা নয়। প্রায় ত্রিশ বছরের চাকরী। একদিন দেরী করে গেলে সে চাকরী যাবে না। দেরী কেন, আজ যদি না-ই যান অফিসে, তাতেই বা ক্ষতি কী? চিরটা কাল, প্রত্যহ, ধুলোকাদা খেয়ে, ভিড় ঠেলে, টিফিনের কৌটা, কোঁচা ও প্রাণ হাতে করে ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিস যেতেই হবে? রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছা নেই, যেতেই হবে। কেন? একটা মোটরকার। বিরাট বড় নাই হল, ছোটখাট টাট্টু ঘোড়াটার মতন একটা ছোট্ট মোটরকার বাড়ীর দোরে এলেই তো পারে প্রত্যহ। কেরাণীর মোটর। কেন, কেরাণীই বা থাকতে হবে কেন? ভাগ্যের পরিবর্তন হতেও তো পারে। অসম্ভবটা কী?

ভরা পেটে শোওয়ায় একটা আরামের আমেজ আছেই। তার ওপোর ঐ ঝর ঝর ধারার শ্রবণ-নয়ন-মনোহর ধ্বনি ও রূপ সে আমেজকে ক্রমে আরামের নেশায় পরিণত করিয়ে দিল। উঠতে ইচ্ছে করে না সত্যপ্রিয়র। সামনের বাড়ীর কার্ণিসের নীচে একটা কাক নানা ভঙ্গীতে বসে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। ভিজে গেছে ইতিপূর্বেই, তবু মাথা বাঁচাবার ইচ্ছা। সে-ইচ্ছা পূর্ণ হল না দেখে উড়ে গেল, বোধহয় অন্য কোনও ভালো আশ্রয়ের সন্ধানে।

সত্যপ্রিয় অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে জলধারা দেখতে লাগলেন। মন আবার স্বপ্নরচনায় মগ্ন হল।

সংসারে কত অসম্ভবই যখন বটেছে শোনা যায়, এবং পুরুষের ভাগ্য যখন দেবতারাও জানেন না; তখন তাঁর বেলাই বা কিছু ঘটতে পারে না কেন? এই ধর, এককালে তিনি কবিতা লিখতেন, সেইকালে কলেজ ম্যাগাজিনে তার নিদর্শন আছে। কলেজ ছাড়বার পরও লিখেছেন মধ্যে মধ্যে। সেগুলোও ছড়িয়ে আছে দুচারটে মাসিক সাপ্তাহিকের পাতায়। খুব নিন্দের হয়নি সে সব কবিতা। এখন ধর, এমন কি হতে পারে না, সেকালের কোন সাহিত্যরসিক গুণগ্রাহী সতীর্থ, ইতিমধ্যে প্রভূত বিত্তের মালিক হয়েছেন, খেয়াল হয়েছে পরলোকগতা সাহিত্যপিপাসু স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষা করবেন একটা সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিকপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে। সম্পাদক করবেন কাকে?

বাজার চলন পেশাদার কবি বা কথাশিল্পীদের পছন্দ নয়, মনে পড়েছে কলেজ-ক্লাসের কবি-খ্যাত সহপাঠী সত্যপ্রিয়কে। ব্যস্‌! গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।—বড়লোকের সথ হলো তো আর স্বর সয় না। আর তাঁর ঠিকানা জোগাড় করা মোটেই অসম্ভব নয়, পুরোনো বন্ধুবান্ধব তো কতই রয়েছে। ড্রাইভারের হাতে চিঠি, একান্ত অনুরোধ, স্বয়ং রক্তের চাপে গৃহবন্দী,—এ তো আকছারই হয়, বড়লোকের ব্লাড্‌প্রেসার এ তো হবেই। এ মোটেই অসম্ভব নয়। কত লোকের দোরেই তো কত মোটরকার আসছে, তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত মোটর কি আর থাকে না? থাকে বইকি। আসল কথা, এতদিন মোটর না আসাটা যেমন আসেনি বলেই সম্ভব হয়েছে, এখন এসে পড়লেই, আসাটাও তেমনি সম্ভব হয়ে যাবে।

এবাড়ীর ছাদ থেকে একটা শাড়ী ঝুলছে। পূর্বে শুকোচ্ছিল, এখন ভিজছে। নিশ্চয় বৌমার শাড়ী। সত্যপ্রিয়র চোখের পাতা নেমে আসে। মেয়েটার সব ভালো, কেবল ঐ এক দোষ—অন্যমনস্ক, ভুলো মন। এত বকুনি খায়, শাশুড়ী তো রাতদিন বকছেন। সুরমা রাগলে একটু বেশী বকেন, কোন কথা একবার বলেই ছেড়ে দেন না। ছেলেমানুষ বলে রেহাইও নেই।

ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী সুরমা কী দরকারে ঘরে ঢুকেছেন। কোনদিকে চাইবার প্রয়োজন ছিল না, সোজা আলমারির কাছে গিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে আলমারি খুলে কাপড়ের থাকের নীচে লুকানো একটা ছোট কালো ক্যাশবাক্স হাতে নিয়ে তাতে ক্ষুদ্র চাবিটা লাগাতে যাচ্ছেন, হঠাৎ পরিচিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ঈষৎ শব্দ কানে আসতে চমকে পিছনে চেয়ে দেখে ত্রস্ত ও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাক্স পূর্বস্থানে অদৃশ্য করে ও যথাসম্ভব শব্দ বাঁচিয়ে আলমারি চাবিবন্ধ করে এগিয়ে এসে সুরমা বল্লেন—"ওমা, ই কী কাণ্ড গা? এমন সময় শুয়ে আছ কেন? হ্যাঁ গা?"

সত্যপ্রিয় চোখ না খুলেই বল্লেন—"তা ছেলেমানুষ।"

"শোনো কথা। কে ছেলেমানুষ? তুমি?"

এবার প্রশ্নের জবাব এত সহজে এল না, কারণ তখন সত্যপ্রিয় চোখ খুলেছেন। চোখ খুলে তিনিই প্রশ্ন করলেন—"কী হয়েছে?"

সুরমা বল্লেন—"কী আবার হবে। বলছি এমন সময় ছেলেমানুষটী সেজে শুয়ে আছ কেন?"

সত্যপ্রিয় বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"ছেলেমানুষ সেজে? তার মানে? শুলেই ছেলেমানুষ হয়?"

সুরমা হাসিমুখে বল্লেন—"সে তুমিই জানো। তুমিই তো বল্লে।"

এবার সত্যপ্রিয় বিরক্ত হলেন। বল্লেন—"বল্লুম? আমি বল্লুম আমি ছেলেমানুষ?"

"বল্লে না? এই মাত্তর তো বল্লে?"

"পাগলের মতন যা তা বকো না। আমি কেন অমন কথা বলতে গেলুম?"

সুরমা দেখলেন স্বামী চটেছেন। কিন্তু এখন তাঁকে চটাতে তিনি চান না। তাতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হবে। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করবার জন্য তিনি বল্লেন—"আহা, খামোকা বলতে যাবে কেন? ঘুমের ঘোরে বলেছ। তোমার কি মনে আছে?

সকলেই জানেন যে, মানুষ,—সে ছেলেমানুষই হোক আর বুড়ো মানুষই হোক,—তন্দ্রার মধ্য থেকে যে কথা বলে ফেলে, তন্দ্রা ভেঙে চোখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। তাই সুরমার কথায় স্মৃতি তো জাগলই না, বরং বিপরীত ফল হলো। সত্যপ্রিয় বেশ রাগের সুরেই বল্লেন—"তার মানে? আমি ঘুমোচ্ছিলুম তুমি বলতে চাও?"

এবার সুরমা সতর্ক হলেন। স্বামীর এই দুর্বলতা তিনি ভাল করেই জানেন। অসময়ে নিদ্রিত হলে কিছুতেই তা স্বীকার করবেন না, বলবেন—পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন, এবং সে কথা বিশ্বাস না করলে ক্ষেপে উঠবেন। আজ এই সময়ে কোন বিশেষ কারণে স্বামীকে ক্ষেপাতে চান না সুরমা। তাই তিনি সতর্ক হলেন ও তর্ক ছেড়ে দিয়ে মিঠে কণ্ঠে বললেন—"তুমি যেন দিন দিন কী হচ্ছ। ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লুম, আর তুমি তাই সত্যি মনে করে চটে উঠছো। আমি কি পাগল না কি যে এই অসময়ে তুমি ঘুমুচ্ছ মনে করবো। যাকগে ও কথা। কিন্তু তুমি শুয়ে আছ এমন সময়ে, আফিসে যাবে না?

পত্নীর সুবিবেচনায় সত্যপ্রিয় খুশী হলেন। মানুষ ভালবাসে যাদের, তাদেরই প্রবঞ্চনা করতে এবং তাদের দ্বারাই প্রবঞ্চিত হতে ভালবাসে। চোখ খুলে সব দেখেও অন্ধ সাজতে ভাল লাগে মানুষের। মুখে যাই বলুন, সত্যপ্রিয় মনে মনে বুঝছিলেন যে মাঝে কিছুক্ষণ—কে জানে কত মিনিট কাল—কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন—ঠিক অন্যমনস্ক নন, তার চেয়ে বেশী কিছুই হবে; কিছু যেন দেখতে শুনতে পাননি, সুরমার আগমন জানতেও পারেন নি। এটা সন্দেহজনক। যাই হোক, সুরমা যে ও-কথা নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না, এতে সত্যপ্রিয় সন্তুষ্ট হলেন। প্রসন্নমুখে বল্লেন—"আর আপিস! আপিস যেতে দিলে কই? ঠিক বেরোবার সময়টীতেই বৃষ্টি নামলো না? ছাতাটা গেছে ছিঁড়ে। তাই একটু বসে গেলুম।"

হাসিমুখের জের টেনে সুরমা বল্লেন—"আর বসতে পেলেই শুতে চায় মানুষ, এ তো কথাতেই আছে। কেমন?" বলেও একটু হাসলেন।

সত্যপ্রিয় হেসে বল্লেন—"যা বলেছ। খেয়েদেয়ে ভরা পেটে শুয়েছি, আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। আর দেখ, শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির ধারা দেখতে মন্দ লাগে না। অনেক দিন দেখিনি। ভারি চমৎকার লাগছে। তুমি দেখ!"

"কী? শুয়ে শুয়ে?"

"তা শুতেও পারো।"

সুরমা বল্লেন—"আর সংসার?"

সত্যপ্রিয় বল্লেন—"থাকুক সংসার, সংসারের কথা মন থেকে তাড়িয়ে একদণ্ড প্রকৃতির লীলা দেখ না। না শোও, বসে বসেই দেখ। এই যে এইখানে বসো। বসো না।" বলে সত্যপ্রিয় ঈষৎ সরে শুয়ে তাঁর পাশে স্ত্রীর বসবার স্থান করে দিলেন।

সুরমা বল্লেন—"হ্যাঃ, তা আর নয়। বলে মরবার ফুরসৎ নেই আমার, আমি এখন তোমার পাশে বসে প্রকৃতির লীলাখেলা দেখব বই কি। তোমার মতন কবি তো আর নই। যাক, কাজের কথা বলি। তুমি আছ ভালই হয়েছে। ভেবে মরছিলুম, বেরুবার আগে তোমাকে বলা হল না এখন কোত্থেকে কী করি।"

"কিসের [illegible]?"

"দেখ বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজ যে ষষ্ঠী তা পোড়া একটুও মনে ছিল না। ষষ্ঠীতলায় পুজো দিতে হবে। টাকা একটা চাই।"

শুনে সত্যপ্রিয়র ভ্রু দুটী কুঞ্চিত হয়ে পরস্পরের কাছে সরে এল। বাড়ী থাকাটা অপরাধ, আছ যদি তবে দণ্ড দাও।

সুরমা বল্লেন—"কই দাও না গা টাকা একটা।"

"কেন? বাড়ী থাকার টেক্স? যদি না থাকতুম বাড়ীতে? তা হলে কোথা থেকে পেতে টাকা? কোথা থেকে পুজো হতো?"

"তবে আর ভেবে মরছিলুম কেন? বলি এমনই পোড়া মন হয়েছে, দুর, দুর, ঠাকুরের পুজোর পয়সাটাই চাইতে ভুলে গেলুম। তা ঠাকুর যে তার ব্যবস্থা নিজে করেছেন, তোমাকে বেরুতে দেন নি, তাতো জানি না। দাও টাকাটা দাও, বড্ড বেলা হয়ে গেছে। মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।"

সত্যপ্রিয় শেষ চেষ্টাস্বরূপ বললেন—"তা বেশ তো, তোমার কাছে তো টাকা আছে। তাই থেকেই দাও না।"

শুনে দুই চোখ কপালে তুলে সুরমা গালে হাত দিলেন, তারপর বল্লেন—"শোনো কথা। আমার কাছে টাকা কোথায়? কোত্থেকেই বা আসবে বল? কোন দিন দুটো পয়সা হাত তুলে দিয়েছ বল, যে তাই থাকবে? তাহলে আর তোমার খোসামোদ করে মরি একটা টাকার জন্যে!"

সেই আদায় করে নিয়ে গেল টাকা।

বাড়ীতে থাকার ট্যাক্সই বটে। সত্যপ্রিয় ভালই জানেন সুরমার হাতে আছে কিছু টাকা। এ-ঘরে এসেছিলেন খুব সম্ভব নিজের টাকা থেকেই কিছু বার করতে। কারণ সত্যপ্রিয় যে ঘরে আছেন তা সুরমার জানা ছিল না। এখন তাঁকে দেখেই পতিভক্তি উথলে উঠলো, পতির পকেটটী মারবার সঙ্কল্প করলেন। এবং সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করে তবে গেলেন। সংসার তো এই।

বৃষ্টিটা যেন ধরে আসছে। সামান্য গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে, ওটুকু কিছুই নয়। বেরোতে পারা যায়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না, গা-হাত-পা যেন ভারী হয়ে আসছে।

কেউ একটু গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তো মন্দ লাগে না। মন্দ কেন, ভালই লাগে। কিন্তু দিচ্ছে কে। কার বয়ে গেছে। স্ত্রীর সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ। তাছাড়া তাঁর আছে সংসার, আছে ষষ্ঠী পূজা। লোক তিনি খারাপ নন, কিন্তু—যাক। গাটা শির শির করছে। সত্যপ্রিয় হাত বাড়িয়ে আলনা হতে একটা চাদর টেনে নিলেন।

এদিকে নীচে তখন শাশুড়ী বৌয়ে কথা হচ্ছে। সুরমা বল্লেন—"তা যা করবার তুমি করাও বৌমা। দেখো যেন ভাল যায়গা পাই।"

বধূ নন্দিতা বল্লে—"তাহলে কি তিনখানা টিকিটই আনতে দেব মা?"

"হ্যাঁ, তাই দাও বাপু। বিশুর মা অনেক দিন থেকে ধরেছে, জ্যান্ত ছবি দেখবে।"

"তবে দিন, পয়সা দিন। ভিখুয়ার হাতে লিখে পাঠিয়ে দিই। দিন মা।"

সুরমা টাকাটা বার করে দিলেন। বল্লেন—"এই টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আগে পাঁচ আনার পুজো পাঠিয়ে দাও বৌমা। বাকী পয়সাতে টিকিট—"

নন্দিতা হেসে ওঠে শাশুড়ীর অজ্ঞতার কথায়। সুরমা ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বল্লেন—"তা দু'চার পয়সা কম পড়ে, তুমি দিয়ে দাও বাছা।"

"মা যে কী বলেন। দু'চার পয়সা কী বলছেন, ছ'আনার টিকিট হলেও তিনজনের একটাকা দু'আনা পড়বে। তা ছাড়া ছ' আনার সিটে মেয়েরা যায় না। অন্ততঃ ন' আনার সিট, ওপোরে মেয়েদের—"

"তবে কত দাম পড়বে টিকিটের?"

"ঐ যে বল্লুম ন'আনা করে। তাও এ-হাউসে আছে তাই। নইলে অন্য হাউসে বারো আনা করে লাগতো।"

সুরমা আঁতকে ওঠেন। বল্লেন—"একোজনের? বল কী বৌমা? একোজনের ন'আনা নেবে? তা আমার কাছে তো আর নেই। তুমি দিয়ে দাও বাপু যা ভালো বোঝো। পোড়ারমুখোরা কি ডাকাত নাকি? ঐ তো ভাঙ্গা কাঠের চেয়ার, ছারপোকায় ভর্তি, তাতেই দুদণ্ড বসবো বই তো নয়। তার জন্যে একোজনের ন'আনা? কী অধম্মের কালই পড়েছে মা!"

নন্দিতা বল্লে—"কম লাভের ব্যবসা মা? তার আগেই তো দাদা অত ঝুঁকেছে শোহাউস করবার জন্যে। বলে, দু'বছরে একেবারে লাল। আর কেবল হিন্দি ছবি দেবে। বাবার সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হয় কিনা। দাদা বলে—"

সুরমা জানেন, বৌমা একবার তার বাপ-ভাইয়ের কথা সুরু করলে, সেকথা শেষ হতে চাইবে না। তাই বল্লেন—"ভাল কথা বৌমা, দুধটা ঢাকা দিয়েছ তো?

নন্দিতার উচ্ছ্বসিত বাক্যের উৎসে পাথর চাপা পড়লো। শাশুড়ীর কণ্ঠ চড়লো—"য়্যাঁ, দাওনি ঢাকা?"

অবোধ চোখ মেলে চেয়ে আছে নন্দিতা। সেই চাউনি দেখে সুরমার রাগ বাড়ে। তিনি বল্লেন—"কী জ্বালা! মুখে রা নেই কেন? ঢাকা দাওনি তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু হাঁ করে সঙের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আমার কী মাথা কিনছ? কোন দিশি হাঁদা মেয়ে তুমি? ছুটে যাও, দেখ, বেরালে খেলে নাকি।"

বধূ দুধের অবস্থা দেখতে গেল নয়, পালিয়ে বাঁচলো। শাশুড়ীর ভর্ৎসনা চলতে লাগলো—"এত বড় মেয়ে, কচি খুকিটী তো নও, একটু আক্কেল নেই? কোন দিকে চোখ-কান নেই? এমন অকম্মার ঢেঁকি আমি সাতজন্মে দেখিনি। কাজের মধ্যে জানেন খালি বাপ ভাইয়ের গুমোর করতে।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই সুরমার ক্রোধ গিয়ে পড়লো বধূর বাপ ভাইয়ের উপর। "খবর্দার বলে দিচ্ছি, আমার সামনে বাপের বাড়ীর নাম করবে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। এই বলে দিলুম তোমাকে বৌমা, বাপ ভাই করেছেন কী? খালি আদর করে পেট ঠেসে গিলিয়েছেন, মাথায় এক ফোঁটা আক্কেল দিতে পারেন নি।"

আধ ঘণ্টাটাক পরে। শাশুড়ী বৌয়ে রুটী তৈরী করছে। শেষ রুটীখানা বেলে দিয়ে নন্দিতা বল্লে—"খাবার দাবার তো বিকেলের করা হল, টিকিটও কিনতে পাঠালুম। কিন্তু ভাবছি বাবা যদি—(বাপ ভাইয়ের কথা বলতে শাশুড়ীর নিষেধ স্মরণ করে বলে) এখানকার বাবার কথা বলছি মা—বাবা যদি না আপিসে যান, তাহলে আমাদের যাওয়া হবে কী করে মা? এদের আবার ছুটোর সময় আছে!"

সুরমা বল্লেন—"তোমার এক কথা! আপিসে যাবেন না তো কী? মিছিমিছি আপিস কামাই করে কখনো? বিষ্টির জন্যে বেরোতে পারেন নি। কত আর বেলা হয়েছে, একটাও বাজেনি—"

"বিষ্টি তো ধরে গেছে মা।"

সুরমা চেয়ে দেখলেন, সত্যই বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। বললেন—"এই বেরোবেন এইবার নিশ্চয়।"

নিশ্চয় বল্লেন বটে, কিন্তু নিশ্চিত বোধ করতে পারলেন না। মিনিট দুইচার অপেক্ষা করে সুরমা উঠলেন। উপরের ঘরে এসে দেখলেন সত্যপ্রিয় শুয়ে তো আছেনই, চাদরে গা ঢেকে বেশ তোয়াজ করে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। ওঠ্‌বার কোনও লক্ষণই নেই।

কিন্তু ঘুমোননি, তা বোঝা যাচ্ছে। একটী পায়ের পাতার উপর অপর পায়ের গোড়ালি স্থাপন করে উভয় পা ধীরে ধীরে দোলাচ্ছেন।

সত্যপ্রিয় ভাবছেন। ভাবছেন না, স্বপ্নের পর স্বপ্ন তৈরী করে যাচ্ছেন। সেই যে সাহেবটার সঙ্গে সেবার বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আলাপ হয়েছিল, সেই যার মেমের কোলের ধন বনেদী খানদানী কুকুরছানা প্লাটফর্ম থেকে নেমে লাইনের ওপর চলে গিয়েছিল, সত্যপ্রিয় উদ্ধার করে এনেছিলেন, তারপর সেই হারাধনকে বুকে করে মেমের কী আদর, কী চুম্বন। আর সাহেবের কত ধন্যবাদ। কী সহৃদয় আলাপ। নিজের সিগারেট কেস খুলে সিগারেট অফার করেছিল। পুরস্কার দিতে চেয়েছিল, সত্যপ্রিয় বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সাহেব তখন তাঁর ঠিকানা লিখে নিয়েছিল না? নিয়েছিল বোধ হয়। তারপর সেই সাহেব এতকাল পরে কারবার ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দেশে চলে যাচ্ছে। আর না গিয়েই বা করবে কী? ভারতবর্ষের জমিদারী খতম হয়ে গেল, স্বাধীন ভারতে আর সে রাজাগিরির সুখ তো আর চলবে না, কাজেই দেশে যাচ্ছে। তবে এখনই একেবারে সবস্বত্ব ছেড়ে যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে জাল গুটোবে। সেই সাহেব খুঁজছেন সত্যকার সৎ, সাহসী, নির্লোভ, কর্তব্যনিষ্ঠ, জীবনের অভিজ্ঞতা আছে অর্থাৎ বয়স্ক লোক একটী, বাঙ্গালী হলেই ভালো হয়। মনে পড়ে গেছে বর্দ্ধমান স্টেশনের সেই যুবকের কথা। পুরোণো পকেট বুক থেকে নাম ঠিকানা পেয়েছে বাস [illegible] এ কোটটাই [illegible] নয়।

এই সব চিন্তা বা স্বপ্নের মধ্যে সুরমার ডাক সত্যপ্রিয়র কানে অর্দ্ধ প্রবেশ করলো।

"হ্যাঁগা, এখনো শুয়ে আছ? ওগো শুনছ? বেলা যে অনেক হ'ল। ওঠো।"

সত্যপ্রিয় উঠলেন, কিন্তু স্বপ্ন থেকে। বল্লেন—"কী হয়েছে?"

সুরমা বল্লেন—"বেশ যাহোক। কখন আপিস যাবে? বেলা যে একটা বেজে গেল।"

সত্যপ্রিয় অবিচলিত সুরে বল্লেন—"যাকগে।" বলে পূর্বাপেক্ষা জোরে পা দোলাতে লাগলেন। এবং বল্লেন—"আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

"সে কী গো? মিছিমিছি আপিস কামাই করবে?"

"মিছিমিছি কেন, সত্যি সত্যিই কামাই করব। কেন, ক্ষতি কী?"

"কাজ নয় কম্ম নয়, শুধু শুধু বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে—না, না—"

কথাটা সুরমা শেষ করতে পারলেন না। সত্যপ্রিয় মৃদু হেসে বল্লেন—"তোমার আপত্তি আছে? আমার বাড়ীতে থাকাতে তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে কি?"

সুরমা চমকে উঠলেন। এই সামান্য পরিহাসে এতটা চমকিত হবার কথা নয়। সুরমা তাড়াতাড়ি বল্লেন—"আমার আপত্তি? না, না, কী যে বল তুমি। আমি কেন আপত্তি করব? আমার কিসের অসুবিধে! শোনো কথা! আমার আপত্তি! কী যে বল। এমন অনাছিষ্টির কথাও কখনও শুনি নি। থাকো না শুয়ে, আমার কী?"

এতটা জোর প্রতিবাদ না করলেও চলতো। সত্যপ্রিয় বল্লেন—"দেখ, উঠতে সত্যিই ইচ্ছে করছে না, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।"

শুনে সুরমা উদ্বিগ্ন হন—স্বামীর পীড়া আশঙ্কা করে নয়। বলেন—"ও কিছু নয়। দিনের বেলা শুলেই গাটা ঢিস ঢিস করে তোমার। একটু ঘুরে এস। বরঞ্চ সকাল সকাল আপিস থেকে চলে এস।"

সত্যপ্রিয় কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে বল্লেন—"বেরোবো বলছ? বড্ড বেলা হয়ে গেছে না?"

"কোথায় বেলা।" তুমি তো বেলাতেই বেরোও।"

"তা যাই। আচ্ছা দেখি।"

নিচে আসতেই বৌমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—"কী হল মা? বাবা আপিসে যাবেন?"

"হ্যাঁ, যাবেন না তো কী? মিছিমিছি কখনও আপিস কামাই করে। আলিস্যি, অনেকক্ষণ শুয়ে আছেন তাই আলিস্যি। চোখ দুটো একটু লাল হয়ে আছে, ঘুম পেয়েছে আর কি।"

কিন্তু সত্যপ্রিয় নিরাশ করলেন। উঠবার যে ক্ষীণ ইচ্ছা হয়তো তাঁর হয়েছিল সুরমার কথায়, তা সুরমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই উবে গেল। ভাবলেন, এই জল-কাদায় প্যাচ প্যাচ করতে করতে যাওয়া, পথে হয়তো পাশ দিয়ে মোটর চলে যাবে তাঁর গাময় কাদা ছিটিয়ে। অথচ কে বলতে পারে আজ তিনিই হয়তো যাবেন এই পথ দিয়ে মোটর চড়ে। আর এত বেলায় কী এমন রাজকার্য বয়ে যাচ্ছে আপিসে? তা ছাড়া শরীরটা মোটেই উঠতে চাইছে না।

সংসারের কাজকর্ম্ম, সব সেরে ফেললো শাশুড়ি-বউ। কিন্তু সত্যপ্রিয় তখনও বেরোলেন না। সুরমা মনে মনে বিরক্ত হলেন। কী কাণ্ড দেখ দিকি। কখনও কোথাও যাই না, একদিন একদণ্ড যাব মনে করেছি, আর ঠিক আজই কিনা ঘরে শুয়ে রইলেন। বুড়ো বয়সে মিছি-মিছি আপিস কামাই করা—এ কোনদিশি ছেলেমানুষি! কেবল আমার সঙ্গে শত্রুতা বই তো নয়। স্বামীর অবিবেচনায়,শত্রুতায় সুরমার অভিমান হল,তিনি বল্লেন,—"থাকগে বৌমা, আমি আর যাব না, তোমরা যাও।"

নন্দিতা বল্লে,—"সে কি মা! আপনার টিকিট যে কেনা হয়ে গেছে, নষ্ট হবে।"

"তা ঐ ওবাড়ির মণিঠাকুরঝিকে নিয়ে যাও।"

নন্দিতা কিছুতেই এ কথা মানবে না, প্রবল আপত্তি করল, জোরে মাথা নেড়ে বল্ল—"না, তা হলে আমিও যাব না। ওবাড়ির পিসিমার সঙ্গে আমি কিছুতেই যাব না। আপনি না গেলে আমার কারুর সঙ্গে যেতে ভাল লাগবে না।"

"তা কী করি বল—" সুরমা বিমর্ষ মুখে চেয়ে থাকেন। দেখে নন্দিতা বল্ল—"তা এক কাজ করুন না মা, বাবাকে বল্লেই তো হয়। বলে কয়েই চলুন না, কী হয়েছে?"

সুরমা আঁতকে ওঠেন, বল্লেন—"ও বাবাঃ, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। কে পয়সা দিলে, কত পয়সা নষ্ট করলে, কার সঙ্গে যাচ্ছ, মেয়েমানুষের একলা একলা যাওয়া, তার পর কী বই, কেমন বই,—সে নানান ফ্যারাক্কা। কে সইবে বাপু অত কথা। কাজ নেই আমার ছবি দেখে।"

বউ তখন শাশুড়ীর হাতটী ধরে ছোট মেয়ের মতো আবদারের সুরে বল্লে,—"না মা, আপনি চলুন। আমি কোনও কথা শুনবো না, আপনাকে যেতেই হবে।"

সুরমার মনটা খুশী হল, কিন্তু সে খুশীকে মুখে ফুটতে দিলেন না। মুখ ভার করেই বল্লেন,—"কী করে যাই বল বাছা? এই দেখ না কাপড় বদলাতে হবে, ঐ ঘরেই তো সব। কাপড়-চোপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন, তখন কী বলবো বল?"

নন্দিতার মাথায় বুদ্ধি এল। সে বল্লে—"কিছু বলতে হবে না। ও-ঘরে যেতেই হবে না আপনাকে। সে আমি ঠিক করছি। আপনি আসুন মা, ভাত দিন, আপনার ভাত বাড়ুন। খেয়ে দেয়ে রেডি হয়ে থাকি। তারপর বাবা আপিস যান ভালো, না যান তাতেও ভয় নেই।"

খাওয়া-দাওয়া সারা হল, হাঁড়ী হেঁসেল তোলা হল। সত্যপ্রিয় তখনও বেরোলেন না। সুরমা রাগ করে আর দেখতেও যান নি তিনি কা করছেন। বিশুর মা এসেছে একখানি ধোপদুরস্ত কাপড় পরে। নন্দিতা আদুরে মেয়ের মতো শাশুড়ীর হাত ধরে টানতে টানতে তিন তলায় নিজের ঘরে নিয়ে তুললো। তাঁর হাতে জোর করে চিরুনীটা ধরিয়ে দিয়ে, সে দেখতে গেল শ্বশুর কী করছেন। পা টিপে টিপে দরজা পর্য্যন্ত গেল, কান পেতে শুনলে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ভরসা পেয়ে উঁকি মেরে দেখলো বেশ করে। তার পর লঘু নিঃশব্দ পদে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"কিচ্ছু ভয় নেই মা। বাবা খুব ঘুমোচ্ছেন। দু ঘণ্টা বইতো নয়, ওঁর ওঠবার আগেই আমরা ফিরে আসব।"

সুরমা বল্লেন—"আর যদি ওঠেন? যদি ডাকেন?"

এ যদির ভয় তো আছেই। কিন্তু এর উত্তর যে নেই। এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে একে অস্বীকার করা। নন্দিতা তাই খুব জোরে

জোরে মাথা নেড়ে বল্লে—"না, না, না, ডাকবেন না। কখখনো ডাকবেন না। আমি বলছি ডাকবেন না।"

যুক্তি না থাক, গলা ও ইচ্ছার জোরে বধূ শাশুড়ীকে নীরব ও নিশ্চিন্ত করে দিতে চায়। নিশ্চিন্ত না করুক, নীরব করে দিয়ে সে তাঁকে সাজাতে সুরু করলো। শাশুড়ীও নিশ্চিন্ত হতেই চান, তাই সাজতে সুরু করলেন।

সুরমা বলেন—"ওমা, ইকী? তুমি কি পাগল হলে না কি বৌমা? ঐ জামা আমি পরবো? লোকে যে গায়ে থুথু দেবে মা। বলবে বুড়ো বয়সে মাগী সেজেছে দেখ, ছি ছি।"

নন্দিতা রাগ করে বলে—"কে বলবে বলুক দিকি। আপনি আবার বুড়ো নাকি? আপনার চেয়ে বুড়ো, সত্যিকার বুড়ো কত হাজার গণ্ডা মেয়েরা পরছে। পরুন মা, আপনার পায়ে পড়ি মা।"

অন্তরে খুশী হলেও সুরমাকে বলতে হয়—"কী ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখ। কোথা যাব মা!"

কিন্তু ছেলেমানুষির ছোঁয়াচ থেকে সুরমা আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। হয় তো চাইলেন না বলেই। পেটের মেয়ের মতো আদর আবদার—তার প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধ করা বড় শক্ত। আধুনিক কালের শাড়ী-জামাতে সাজিয়ে-গুজিয়ে, মুখে স্নো ঘষে ও সামান্য পাউডার দিয়ে, (লিপষ্টিক বা রুজ দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না সুরমা) বড় আয়না বসানো আলমারির সামনে দাঁড় করিয়ে বধূ বল্লে—"দেখুন, চেয়ে দেখুন। কে বলবে আমার মাকে বুড়ো। বলুক দেখি একবার।"

নববধূটীর মতো সলজ্জ দৃষ্টিতে সুরমা দর্পণের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন। দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, মন্দ লাগলো না। ভাল করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু লজ্জায় পারলেন না। বধূর দিকে চেয়ে সস্নেহে বল্লেন—"পাগলী মেয়ে আমার। সাজা-গোজার বয়েস কি আর আমাদের আছে মা, বুড়ো বয়েসে—"

নন্দিতা যেন ধমকে বল্লে—"বুড়ো বুড়ো করবেন না বলছি মা। কোথায় বুড়ো? আমার বাবা বলেন, তোর শাশুড়ীকে দেখলে মনে হয় এখনো—"

লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারলো না নন্দিতা। সুরমা জিজ্ঞাসা করলেন—"কী বলেন তোমার বাবা? আমার কথা আবার কী বলেন গো?"

নন্দিতা কুণ্ঠিত হাসিমুখে বল্লে—"ঠাট্টা করে বলেন। বাবার ঐ রকম কথা।"

"কথাটা কী তাই বল শুনি, হ্যাঁ বৌমা?"

"সে কিছু নয় মা।" বলে কথাটা স্মরণ করার দরুণ যে হাসি এসেছিল তাই গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে অত্যধিক মনঃসংযোগ করলো নিজের বেণী রচনায়। বউ হয়ে শাশুড়ীকে সে কথা কি বলা যায়? কিন্তু সুরমার কৌতূহল তখন জাগ্রত হয়েছে, কথাটা না শুনে কি থাকা যায়? তিনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে বল্লেন—"হ্যাঁ গা, কী বলছিলে বৌমা? কী কথা বলেছেন তোমার বাবা? নিন্দে-বান্দা করেন বুঝি খুব?"

"ঈস্! নিন্দে করবেন! নিন্দে করবার কিছু পেলে তো।"

সুরমা সম্পূর্ণ বিগলিত হলেন। বল্লেন—"তবে কী বলেন শুনি।"

বধূর বলবার ইচ্ছাও বড় কম নেই। সে খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে তার ওপোর গোটা দুই জোর থাপ্পড় বসিয়ে যেন একান্ত অনিচ্ছার সুরে বল্লে—"বাবার কেবল ঠাট্টা বই তো নয়। বলেন—তোর শাশুড়ীর এখনো যা রঙ আর চটক আছে, সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে—না মা, সে আমি বলবো না, আপনি রাগ করবেন।"

নিরতিশয় লজ্জায়, কিম্বা পাকা গল্প-লেখকের মতো, তরুণী নন্দিতা আসল কথাটা উহ্য রেখে হাসিমুখ ঘুরিয়ে নিল। উহ্য কথা অবশ্য ব্যক্ত না হলেও অমুক্ত থাকে না। কিন্তু রসাল কথা কানে শোনার যে মিষ্টত্ব সেটা অনুমানে বোঝার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুরমা সেই মিষ্ট রস আস্বাদন করবার জন্য, বুঝেও না বোঝার ভান করে বল্লেন—"না বৌ মা, রাগ করবো না। তুমি বল তো।"

বধূ ঠোঁটের হাসি আঁচল দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে এবং সেই আধো আঁচলে চাপা ঠোঁটে মৃদু হলেও বেশ স্পষ্ট করে বলে—"বলেন, এখনো যা চটক আছে সাজিয়ে গুজিয়ে আবার বিয়ে দেওয়া যায়, বলেন, আমারই লোভ"—ফিক্ করে হেসে নন্দিতা বলে—"ঐ রকম স্বভাব বাবার।

রাতদিন আমাদের সঙ্গে লাগবে, ঠাট্টা বই আর কথা নেই বাবার।"

এ-রকম কথায় গিন্নিবান্নি লোকের হাস্য করা উচিত নয়। মুখখানাকে গম্ভীর করার বৃথা চেষ্টা করে সুরমা বললেন—"বড় আস্পদ্দা হয়েছে বেয়াইয়ের দেখছি। আসুক মিন্‌সে একবার, মজা দেখাচ্ছি।"

বয়সেরই না হয় তফাৎ, জাত তো একই। স্ত্রীজাতি তো বটে। সুতরাং নন্দিতা মনে মনে জানতো একথা শুনে শাশুড়ী খুশী হবেন। আর খুশী হয়েছেনও। সে হাসিমুখে শাশুড়ীর মুখের পানে যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"সত্যি মা, আপনার সঙ্গে কোথাও যেতে আমার লজ্জা করে। এখনো কী রঙ! আপনার পাশে দাঁড়ালে মনে হয় যেন দাঁড়কাক একটা।"

বলতে বলতে সে সিন্দুর কৌটা খুলে চিরুণীর পিঠে সিন্দুর লাগিয়ে শাশুড়ীর সীমন্ত রঞ্জিত করে দিল। সুরমাও অনুরূপ কার্যের দ্বারা প্রতিদান দিয়ে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বল্লেন—"পাগলী মেয়ে আমার। তুমি কি আমার কালো নাকি? তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা মেয়ে।"

বধূ শাশুড়ীর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলো। শাশুড়ী বধূর চিবুকে পাঁচটী আঙ্গুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করে সেই আঙ্গুলগুলি সস্নেহে চুম্বন করলেন ও আশীর্বাদ করলেন। দিনটী আজ উভয়েরই বড় ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগবে নিশ্চয় সবাক ছবির লীলা দেখে। সুরমার মনটা যেন এতখানি বয়সের ভার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হালকা পাখা মেলে উড়তে চাইছে, এমন ভালো লাগছে তাঁর। কিন্তু অবিমিশ্র ভালো কি সংসারে থাকবার জো আছে? ঠিক আজই কিনা কর্তা ঘর জুড়ে শুয়ে রইলেন। কে জানে কী হবে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আরাধনা

শান্তশীল দাশ

আঁখিজলে মোর সকল কামনা
বন্ধু হে, মুছে দিও
দিয়েছ যা তুমি আমার জীবনে,
সে যে চির বরণীয়।
দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বেদনা,
তাই দিয়ে করি তব আরাধনা;
হৃদয় প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার
আরতি করি গো প্রিয়।

তোমার দানের মাঝারে বন্ধু,
নাহি কোন সংশয়;
আঁধারের বুকে চলি হাসিমুখে,
অন্তরে নিরভয়।
দেখি দিকে দিকে আলোকে-আঁধারে
বন্দনা গান ওঠে চারিধারে;
তারই সাথে মোর নীরব আরতি।
বন্ধু হে, তুলে নিও।

পরলোকে কবি করুণানিধান—

বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান খ্যাতনামা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রিতে নদীয়া শান্তিপুরে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণতবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের ১৯শে নভেম্বর শান্তিপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কবির পিতামহ কলিকাতায় সওদাগরী অফিসে কাজ করিতেন ও পিতা শিক্ষকতা করিতেন। মাতা বিখ্যাত কবি রামনাথ তর্করত্নের ভগিনী ছিলেন। কবি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেন। বাংলা ১৩০৯ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি খড়দহ (২৪পরগণা) কুলীনপাড়ার লালবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী, ঝরাফুল প্রকাশিত হয়। প্রসাদী প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহার সহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়—নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে তাঁহার ঝরাফুল কাব্যগ্রন্থের প্রশংসা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি তাঁহার সতীর্থ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের চেষ্টায় স্বর্গত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রীতির পাত্র হন ও ১৯১৫ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরূপে কাজ করেন। তিনি সকল সময়েই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে ভালবাসিতেন। যশ, খ্যাতি, মান তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত না। আমরা যৌবনে প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁহার বাস গৃহে (কলিকাতায়) যাইয়া তাঁহাকে তামাকু সেবনের সহিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে দেখিতাম। ১৯৪৯ সালে তাঁহার জন্মদিনে কলিকাতায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। মাত্র কয় মাস পূর্বে কৃষ্ণনগরের তরুণ সাহিত্যিকগণ তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়—তিনি আর বিবাহ করেন নাই। ১৯৩০ সালে তাঁহার কাব্যসঞ্চয়ন শতনরী প্রকাশিত হইলে দেশবাসী নূতন করিয়া কবি করুণানিধানের সন্ধান পায়—সে সময়ে কবির কাব্যের বিশেষ প্রশংসা সর্বত্র শ্রুত হইত। তাঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ শান্তিজল, ধানদূর্বা, রবীন্দ্র-আরতি, গীতারঞ্জন প্রভৃতি সকল পুস্তকই পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি সরল, অনাড়ম্বর, সাধারণ জীবনযাপন করিতেন—অবসর গ্রহণের পর প্রায়ই তাঁহাকে গ্রামাঞ্চলে বন্ধুবান্ধবগণের গৃহে বাস করিতে দেখা যাইত! যে শান্তিপুরকে তিনি ভালবাসিতেন, সেখানেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। করুণানিধানের কাব্য বঙ্গভাষাভাষীদিগকে চিরদিন আনন্দ দান করিবে। আমরা—তাঁহার স্নেহভাজন বন্ধুরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

খ্যাতনাম্নী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। ইনি এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে লীলা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন

পরলোকে জ্ঞানদাভিরাম বড়ুয়া—

আসামের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ব্যারিষ্টার জ্ঞানদাভিরাম বড়ুয়া গত ২৭শে জানুয়ারি ৭৫ বৎসর বয়সে গৌহাটীতে

পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে বিলাত যাইয়া তথায় শিক্ষালাভ করেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী লতিকা ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯১৪ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত তিনি গৌহাটী আইন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পরলোকে শ্রীমতী উষাবালা সেন—

স্বনামধন্য স্বর্গত রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং স্বর্গত কার্তিকচন্দ্র সেনের পত্নী শ্রীমতী উষাবালা সেন গত ১লা ফেব্রুয়ারী ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাস-ভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তিনি সুলেখিকা ছিলেন; চিত্র-শিল্পেও তাঁহার দক্ষতা

উষাবালা সেন

ছিল। পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিংএ তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত তৈল ও জল রংএর চিত্র কলিকাতার এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ প্রদর্শনীতে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

কলিকাতা সহরের উন্নতি বিধান—

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতা সহরের উন্নতি বিধানের জন্য একটি ৩৬ কোটি টাকার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির জন্য উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অধিকতর জল সরবরাহ, ময়লা জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নতি, আবর্জ্জনা পরিষ্কার ব্যবস্থার উন্নতি, বস্তী অপসারণ, কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও সহরের পার্কগুলির উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বস্তী ভাঙ্গিয়া যে ৩৭৪ বিঘা জমী পাওয়া যাইবে, তাহার ২৩৯ বিঘা জমীর উপর ১২০০ গৃহে ৭২০০ ফ্লাট নির্মাণ করা হইবে। বাকী ১০৮ বিঘা জমী সাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। ১৬৬টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করিয়া দুই পালায় ক্লাস করিয়া আরও এক লক্ষ শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতার উন্নতির সহিত সেখানকার ভিড় কমাইতে না পারিলে লোক সহরে শান্তিতে ও সুস্থভাবে বাস করিতে পারিবে না। আমাদের বিশ্বাস, এই ৩৬ কোটি টাকার পরিকল্পনা সহরকে নূতন রূপ দানে সমর্থ হইবে।

শ্রীগোপিকাবিলাস সেন—

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার ও গণসংযোগ বিভাগের ডেপুটী মন্ত্রী, বীরভূমের জননায়ক শ্রীগোপিকাবিলাস সেন সম্প্রতি স্বর্গত দেবেন্দ্রচন্দ্র দের স্থলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিপ হুইপ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আজীবন দেশ-সেবক, ১৯২১ সাল হইতে কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে স্বল্পকালব্যাপী অধিবেশন হয়, গোপিকাবিলাস তাঁহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য—

কলিকাতার ইটালী ও নদীয়া শান্তিপুর হইতে নির্বাচিত বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্য দেবেন্দ্রচন্দ্র দে ও শশিভূষণ খাঁ পরলোক গমন করায় তাঁহাদের স্থলে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী উপনির্বাচনে কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শান্তিপুর পৌর সভার সভাপতি শ্রীহরিদাস দে অন্য সকল প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত

হইয়াছেন। উভয়েই কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থী। দেশ যে ক্রমে কংগ্রেসের অনুরাগী হইতেছে, তাহা এই নির্বাচন সাফল্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল—

কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী মহাশয় অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী

নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবোধবাবু সুপণ্ডিত। তাঁহার নিয়োগে যোগ্য পাত্রকেই সম্মান দান করা হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হউক—ইহাই আমরা কামনা করি।

গোপেশ্বর জন্মবার্ষিকী—

বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) গত ১০ই জানুয়ারী জেলা শাসক এম, এ, টি, আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীতনায়ক ডাঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ষষ্ঠসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী মহাসমারোহে পালিত হয়। এই সভায় বিষ্ণুপুর পৌরসভার ভূতপূর্ব সভাপতি [illegible] বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা গোপেশ্বরবাবুর অশেষ গুণাবলীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাশেষে সঙ্গীতনায়ক দরবারী কানাড়া ও আড়ানা রাগের দুইটি গান করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করেন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক বেতারশিল্পী

সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী ও শ্রীহরিপদ কর্মকার। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীসন্ধ্যারাণী বসু ও শ্রীমুকুল বিশ্বাসের গান খুব উপভোগ্য হয়।

খলিসানি পাঠাগারের নূতন গৃহ—

হুগলী জেলার রেল ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে খলিসানী গ্রামে গত ৯ই জানুয়ারী স্থানীয় পাঠাগারের নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধক ও পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পাঠাগারের নূতন গৃহনির্মাণে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দেশবাসীর বরেণ্য। পশ্চিমবঙ্গকে নানা ভাবে উন্নত করিতে হইতেছে—শিক্ষা বিস্তার তন্মধ্যে অন্যতম। গ্রামবাসীদের এই প্রচেষ্টা সর্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত হউক—আমরা ইহাই কামনা করি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৩৫ (মঞ্জরেকার ৫০, রামচাঁদ ৫৩, তামহানে নট আউট ৫৪। ফজল মামুদ ৮৬ রানে ৪, খান মহম্মদ ৭৪ রানে ৫ উইঃ) ও **২০৯** (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ পঙ্কজ রায় ৭৮, মঞ্জরেকার ৫৯। ফজল মামুদ ৫৮ রানে ২, খান মহম্মদ ৫০ রানে ২ উইঃ)

পাকিস্তান ঃ ৩১২ (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ হানিফ মহম্মদ ১৪২, আলিউদ্দিন ৬৪, ওয়াকার হাসান ৪৮। উমরীগড় ৭৪ রানে ৬ উইঃ)

ভাওয়ালপুরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের ২য় টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। কিন্তু সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। ১০৭ রানে ৭টা উইকেট পড়ে। প্রথম দিনের খেলায় রান ওঠে ১৫৭, ৭ উইকেট পড়ে গিয়ে। ৮ম উইকেটে রামচাঁদ এবং তামহানে জুটী হ'ন। এই দু'জনের খেলার দরুণই ভারতবর্ষ ধাতস্থ হয়, রানও ভদ্র অবস্থায় পৌছে। ৮ম উইকেটের জুটিতে রামচাঁদ এবং তামহানে ৮২ রান তুলে দেন ১১৬ মিনিটের খেলায়। রামচাঁদের ৫৩ রানের মধ্যে ৪টে বাউণ্ডারী ছিল, খেলেছিলেন ১৪৫ মিনিট। তামহানে শেষ পর্য্যন্ত ৫৪ রান ক'রে নট আউট থাকেন। শেষ উইকেটের জুটিতে গোলাম আমেদ এবং তামহানে ৩৮ রান তুলে দেন এক ঘণ্টার খেলায়। সুতরাং ভারতবর্ষের ল্যাজের দিকের ব্যাটসম্যানরাই শেষ পর্য্যন্ত মুখরক্ষা করেছে। ২য় দিনের লাঞ্চের ১৫ মিনিট পর ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলা [illegible] পাকিস্তান কোন উইকেট না হারিয়ে ৯১ রান করে। ৩য় দিনে পাকিস্তান সারাদিন ব্যাট ক'রে ৩১২ রান করে, উইকেট পড়ে ৯টা। হানিফ প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী ক'রে ১৪২ রানে আউট হ'ন। উমরীগড় ৫৮ওভার বল দিয়ে ৬টা উইকেট পান, রান দেন ৭৪। পাকিস্তান দলের ১ম ইনিংসে ১ম উইকেটের জুটিতে হানিফ এবং আলিমুদ্দিন ১২৮ রান করেন। ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তান দলের টেষ্ট খেলায় এই প্রথম শত রান উঠলো ১ম উইকেটের জুটিতে।

খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্তান পূর্ব্বদিনের ৯ উইকেটে ৩১২ রানের ওপর ১ম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে ভারতবর্ষের থেকে পাকিস্তান ৭৭ রানে এগিয়ে থাকে। ভারতবর্ষ লাঞ্চের পর ৩য় ওভারের খেলায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের বাড়তি ৭৭ রান তুলে দেয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে মানকাদ ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন, তখন রান ২০৯, ৫ উইকেট পড়ে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ২য় ইনিংসে ভালই খেলেন, এটা যেন তাঁদের খেলার ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য টেষ্ট খেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রায়-মঞ্জরেকারের ৩য় উইকেটের জুটিতে আলোচ্য টেষ্ট খেলার ২য় ইনিংসে ১২৩ রান ওঠে। এটা তাঁদের ঢাকার ১ম টেষ্ট খেলারই পুনরাবৃত্তি। খেলায় এ দু'জনের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া আছে। এবং তার সূচনা হয়েছে ১৯৫৩ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ম টেষ্ট খেলার ২য় ইনিংসে থেকে। সে খেলায় রায় (১৫০) ও মঞ্জরেকারের (১১৮) জুটিতে ২৩৭ রান ওঠে ২৫৫ মিনিটের খেলায় ; ভারতবর্ষের মোট

রান সংখ্যা ছিল ৪৪৪। বাস্তবিকপক্ষে এই জুটিই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য ভারত-পাকিস্তান টেষ্ট খেলাতেও তাঁরাই ভারতবর্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

পাকিস্তানঃ ৩২৮ (মাকসুদ আমেদ ৯৯, ওয়াদ্দির মহম্মদ ৫৫, ইমতিয়াজ আমেদ নট আউট ৫৫। সুভাষ গুপ্তে ১৩৩ রানে ৫ উইঃ) ও ১৩৬ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আলিমুদ্দিন ৮। মানকড় ৩৩ রানে ৩ এবং গুপ্তে ৩৩ রানে ২ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ২৫১ (উমরীগড় ৭৮ ; গোপীনাথ ৪১ এবং মানকড় ৩৩। ফজল মহম্মদ ৬১ রানে ৩ ; মহম্মদ হাসান ৭০ রানে ৪) ও ৭৪ (২ উইকেটে ; কারদার ২০ রানে ২ উইঃ)

লাহোরের বাগ-ই-জিন্না (পূর্ব্বনাম লরেন্স গার্ডেনস) মাঠে ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। তৃণাচ্ছাদিত উইকেটে খেলাটি হয়। টসে জয়ী হয়ে পাকিস্তান প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ২০২ রান করে ৫ উইকেটে। মাকসুদ আমেদ ১ রানের জন্যে সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হ'ন। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩২৮ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ৩ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮০ রান করে। ফলো-অনের হাত থেকে রক্ষা পেতে তখনও ভারতবর্ষের ৯৯ রান প্রয়োজন ছিল।

মিরণ বক্স নিজ জীবনের ১ম টেষ্ট খেলায় যোগদান ক'রে ২১ রানে ২টো উইকেট পান।

খেলার ৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২৫১ রানে শেষ হ'লে পাকিস্তান ৭৭ রানে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ৯ রান করে। উমরীগড়ের নির্ভীক খেলার দরুণই ভারতবর্ষ ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পায়।

খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষদিনে পাকিস্তান ২ উইকেটের ১৩৬ রানে ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার আর ৯০ মিনিট সময় ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের ৭৪ রান ওঠে, উইকেট পড়ে ২টো। পাকিস্তান দলের অধিনায়ক ভারতীয়দলের ২ ইনিংসে টেষ্ট খেলার কোন রকম গুরুত্বই দেন দেননি। প্রত্যেক ওভারেই তিনি বোলার বদলী করেন। ফলে খেলাটা একটা তামাসায় পরিণত হয়।

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

ক'লকাতায় সাউথ ক্লাব উদ্যানে অনুষ্ঠিত জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার জ্যাক আর্কিনষ্টল গত বছরের বিজয়ী তরুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত ক'রে গত বছরের ফাইনাল খেলায় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলসে জ্যাক আর্কিনষ্টল (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে রামনাথন কৃষ্ণনকে (ভারতীয় ডেভিস কাপ খেলোয়াড়) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস রীতা দাভর ৬ ৪, ৬-১ গেমে উর্ম্মিলা থাপরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে জ্যাক আর্কিনষ্টল এবং আর হাউই (অষ্ট্রেলিয়া) ২-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ গেমে আর কৃষ্ণন এবং নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস রীতা দাভর এবং উর্ম্মিলা ৬-৪, ৬-৩ গেমে মিস এল উড্‌ব্রীজ এবং মিস ভি এ্যালেক্সিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে সুমন্ত মিশ্র এবং মিস উর্ম্মিলা থাপর ৬-৪, ৭-৫ গেমে আর হাউই এবং মিস এস উড্‌ব্রীজকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

পুণায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই প্রদেশ ৩-১ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি ছ' বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলসে নন্দু নাটেকার (বোম্বাই) ৬-১৫, ১৫-১০, ১৫-২ পয়েণ্টে ত্রিলোকনাথ শেঠকে (উত্তর প্রদেশ) পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দু'বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস সুন্দর পটবর্দ্ধন (বোম্বাই) ১১-৪, ১১-৫ পয়েণ্টে মিস সুমন দেওধরকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

অশ্যদ্যতর ত্রতলয় মালক জড এবং গঞ্জায়ম চেমাডী

(বাংলা) ৬-১৫, ১৫-১২, ১৫-১৩ পয়েণ্টে নন্দু নাটেকার আর ডোংরেকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস এস দেওধর (মহারাষ্ট্র) এবং মিসেস সুন্দর পটবর্দ্ধন (বোম্বাই) ১৭-১৬, ১৫-৩ পয়েণ্টে মিসেস পি পরাশর এবং মিস শশী ভাটকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে বোম্বাই, ৩৩ পয়েণ্ট পেয়ে।

ভারতবর্ষ বনাম অবশিষ্ট দল ঃ

ভারতবর্ষ ৫-৩ গোলে অবশিষ্ট দলকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে ৫টি গোলই দেন গুলাব সিং।

এরিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পাকিস্তান, ব্রহ্ম এবং সিংহল দল থেকে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ক'রে অবশিষ্ট দল গঠন করা হয়। ভারতীয় দলে যাঁরা এইদিন খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাতজন খেলোয়াড় আলোচ্য বছরের চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন নি। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে এ জয় কৃতিত্বের পরিচয়।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩২৩ (এল ম্যাড্ডকস ৬৯, ম্যাক্‌-ডোনাল্ড ৪৮, মিলার ৫৩, আইয়েন জনসন ৪১। টাইসন ৮৫ রানে ৩ এ্যাপলিয়ার্ড ৫৮ রানে ৩ এবং বেইলী ৩৯ রানে ২ উইঃ) ও ১১১ (টাইসন ৪৭ রানে ৩, ষ্টেথাম ৩৮ রানে ৩ এবং এ্যাপলিয়ার্ড ১৩ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৩৪১ (হাটন ৮০, কাউড্রি ৭৯, কম্পটন ৪৪। বেনড ১২০ রানে ৪ উইকেট) ও ৯৭ (৫ উইকেটে)

এডিলিডে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৫ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'এ্যাসেজ' সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ১৯৫৩ সালে, দীর্ঘ ২০ বছর পর ইংলণ্ড স্বদেশের মাটিতে অষ্ট্রেলিয়াকে টেষ্ট সিরিজে হারিয়ে দিয়ে 'এ্যাসেজ' খেতাব পুনরুদ্ধার করে। ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্ব যে, তারা আলোচ্য সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংসে পরাজিত হয়েও পরবর্ত্তী তিনটি টেষ্টে জয়ী হয়েছে। ইংলণ্ডের এ কৃতিত্বের মূলে ছিল, অধিনায়ক হাটনের দল পরিচালনা এবং ফাস্ট বোলারদের বিশেষ ক'রে টাইসনের বোলিং সাফল্য।

এডিলেডের চতুর্থ টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া টসে জয়ী হ'য়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ৪টে উইকেট পড়ে দলের ১৬১ রান হয়। ২য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩২৩ রানে শেষ হয়। ঐদিন কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ডের ৫৭ রান হয়। খেলার ৩য় দিন সারাদিন ব্যাট ক'রে ইংলণ্ড ২৩০ রান করে ৩ উইকেটের বিনিময়ে। কাউড্রি ৭৭ এবং কম্পটন ৪৪ ক'রে নট আউট থাকেন। খেলার ৪র্থ দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৪১ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড মাত্র ১৮ রানে এগিয়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়া ঐদিন ৩টে উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান করে। তখনও খেলা শেষ হ'তে পুরো দু'দিন বাকি। খেলার অবস্থাটা ঘড়ির দোলকের মত দোদুল্যমান। কিন্তু খেলার ৫ম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল ক'রে দিলেন ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার টাইসন এবং ষ্টেথাম। লাঞ্চের আগেই আরও ৬টা উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৩২ রানে। অষ্ট্রেলিয়ার শেষ ৭টা উইকেটে মাত্র ৪২ রান যোগ হয়ে ২য় ইনিংস ১১১ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ডের তখন জয়লাভের জন্য ৯৪ রান প্রয়োজন। খেলা ভাঙ্গার ৩৮ মিনিট আগে উইকেট-কিপার ইভান্সের মারে ইংলণ্ড জয়সূচক রান ছাড়াও বাড়তি তিন রান পেয়ে গেল। খেলার পুরো একদিন এবং ৩৮ মিনিট সময় হাতে থাকতে ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচের জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

দুর্গরহস্য ঃ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

চিত্র চোর ও দুর্গরহস্য এই দুটি অতি চমৎকার রহস্য কাহিনী নিয়ে দুর্গরহস্য। চিত্রচোর কাহিনীর চিত্রচোর ব্যক্তিটিকে সন্দেহ করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কে এমন ছবি চুরি করতে যাবে, কে দক্ষ শিল্পী ফাল্গুনী পালকে কুয়োতে ফেলে হত্যা করতে পারে, এ নিয়ে সুদক্ষ লেখক এমনি রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করেছেন, এমনি আশ্চর্যজনকভাবে আবার তা উন্মোচিত করেছেন, তো একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠা যায় না।

তারপর দুর্গরহস্য! বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা জানকীরামের দুর্গ। এ দুর্গ তিনি রচনা করেছিলেন বংশধর ও বিপুল ধনভাণ্ডার রক্ষার জন্যে সাঁওতাল পরগণারে এক নির্জন পর্বত চূড়ায়। সেই দুর্গে তাঁর বংশধরগণ বাস করছিলেন নিরাপদে। কিন্তু এল সিপাহী বিদ্রোহ। জানকীরামের অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ রাজারাম ও জয়রাম সমস্ত সোনাদানা দুর্গে কোথায় লুক্কায়িত করে রাখলেন; সিপাহীদের ভয়ে পরিবারের লোকদের নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সিপাহীরা এলে পরে এঁদের ভাগ্যে কি ঘটল কেউ জানল না। তার দীর্ঘ ষাট বৎসর পরে ঐ বংশের দুটি ছেলে রামকিশোর ও রামবিনোদ মাথা তুলে দাঁড়াল। ইতিহাস কল্পিত এই পটভূমিকায় কাহিনীর আরম্ভ। দুর্গ স্থিত স্বর্ণের লোভে এক গর্দভ চর্মাবৃত সিংহ কি ভাবে হত্যার পর হত্যায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তাহারই রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পূর্ণ দুর্গরহস্য।

রহস্য সৃষ্টিতে শরদিন্দুবাবুর মত দক্ষ লেখক বাংলাদেশে আজকাল বড় কমই আছেন। চরিত্র সৃষ্টির কৌশলে ও স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষার গৌরবে তাঁহার এ কাহিনী অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মতই রসোত্তীর্ণ। পাঠকমাত্রই এর মাদকতায় মুগ্ধ হয়ে থাকবেন, একথা বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

[প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৩।০]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

চার্বাক দর্শন ঃ শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ঃ

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে সকল সংশয় থাকতে পারে তা সবই তিনি এই গ্রন্থে নিরসিত করেছেন। ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে চার্বাক দর্শন-অনুরাগীদের কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান ও অনেক চিন্তার খোরাক যোগাবে। গ্রন্থকার রচিত সমগ্র "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস" প্রকাশিত হলে দেশবাসী উপকৃত হবেন।

প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত সার্বজনীন গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ পুষ্প।

[প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১২ টাকা।]

দেশান্তরী ঃ ইন্দ্রনাথ ঃ

স্বল্প পরিসরে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ভ্রমণের কাহিনী। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, সুইৎসারল্যাণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, ওএলস্, আমেরিকা ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখক এই ১৭২ পৃষ্ঠার বইটিতে স্বল্প কথায় বেশ রসাল করে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সব সময় পাঠকের মন এত অল্পে তুষ্ট হয় না। ভ্রমণকাহিনী পড়তে পড়তে অনেক সময় মন ভ্রমণের নেশায় মেতে ওঠে—মানস নেত্রে ফুটে ওঠে তখন য়ুরোপ, আমেরিকার সুবিখ্যাত সভ্যতাগর্বিত নগর নগরীর প্রতিচ্ছবি। ভ্রমণেচ্ছু পাঠকের মন জানতে চায় সব কিছু খুঁটিনাটি বর্ণনা—পেতে চায় দূর বিদেশের বহুবর্ণিত, বহু প্রশংসিত নগর ও নাগরিকদের সম্বন্ধে একটা বিশদ ধারণা। বইটি পড়ে অনেকের মনে সেই জানবার ইচ্ছা আরও প্রবল হতে পারে। লেখকের লেখার গুণে এবং অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করার দক্ষতায় বহু ভ্রমণ কাহিনীর মতন এই বইটি বিরক্তিকর একঘেয়েমীর পরিচয় দেয় নি।

[প্রকাশক ঃ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা—৭ দাম—২॥০ আনা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

কন্যারত্ন ঃ শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ঃ

'কন্যারত্ন' উপন্যাসখানি পড়ে সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছি একথা প্রথমেই উল্লেখ করি। কারণ বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যে নানা প্রকারের বিবিধ বিষয়বস্তু নিয়ে, নানা পদ্ধতির লিখন ভঙ্গিতে উপন্যাস রচনার যে প্রচেষ্টা ইদানীং লক্ষ্য করছি তা' বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং তাতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তা নানা দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য ও অভিনব। তা সত্বেও একথা মনে হয় যে প্রচেষ্টা, পরীক্ষা নিরীক্ষার তুলনায় সার্থকতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প। কারণ এই অভিনব মনন ও শিল্প-কর্ম্মের অন্তরালে বহুস্থলে উগ্রতা, অহমিকা, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে উৎকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। 'কন্যারত্ন' এ সব

কিছু থেকে পৃথক ধরার শিল্প-কর্ম। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের সার্থক রচনা-ভঙ্গির অনুসরণ করে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। তাই রচনার মধ্যে অভিনবত্ব সন্ধান করলে তার সন্ধান হয়তো মিলবে না, কিন্তু অভিনবত্বের অভাব পরিপূরণ করেছে উপন্যাসখানির বিষয় ও ভঙ্গি-বৈচিত্র্য। আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহজীবনের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। রচনার মধ্যে আমাদের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবনের প্রতি সপ্রেম ও স্নিগ্ধ সহানুভূতি কাহিনীর মাধ্যমে সুপরিস্ফুট হয়েছে। রচনার আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে। সব মিলিয়ে কন্যারত্ন একটি সার্থক রচনা বলে মনে করি।

[প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল। ১।১৭ কলেজ স্কোয়ার। প্রাপ্তিস্থান : সান্যাল এণ্ড কোং। ১।১এ কলেজ স্কোয়ার। দাম—৪৲ টাকা]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বিহঙ্গী : মনোজ বসু :

এক বিহঙ্গী মনোজ বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নতুন উপন্যাস। উপন্যাসের নায়িকা অনীতা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন উকিল ও ধনী হিমাংশু রায়ের একমাত্র আদরের কন্যা। খেলাধূলা সঙ্গী-সাথী নিয়েই হৈ হৈ করে তার আনন্দের দিনগুলি কেটে যায়। সেই সঙ্গে কলেজে পড়া-শুনাও করে। পিতা হিমাংশু রায় একান্ত আত্মভোলা মানুষ। আদালত, মামলা-মোকর্দমা আর নথিপত্র নিয়েই তিনি দিবারাত্রি ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেই মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরের যে মাধুর্যের পরিচয় ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে তা সত্যই অনবদ্য। কন্যা অনীতার প্রতি তার স্নেহের দৌর্বল্য পরম উপভোগ্য। এই কাহিনীর নায়ক মিহির। মিহির দরিদ্রের সন্তান কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত উদার এবং মহৎচরিত্রের যুবক। কর্মের সন্ধানে একদিন অকস্মাৎ সে ধনী হিমাংশু রায়ের নিকট উপস্থিত হয় এবং অনীতার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হয়। অতঃপর এই দুইটি তরুণ তরুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ দরিদ্র মিহির ও বড়লোকের মেয়ে অনীতার প্রেমানুরাগই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। প্রেমের এরূপ মিষ্টি কাহিনী রচনায় মনোজবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁর ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা ও কাহিনীর গতি পাঠক সাধারণের মন জয় ক'রে। তাঁর কাহিনীর মধ্যে কোনো জটিল সমস্যা বা উদ্ভট কল্পনা নেই—নেই পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষার কষ্টসাধ্য প্রয়াস। সহজ সুন্দর সরল ও দরদী ভাষায় তিনি যে কাহিনী রচনা করেন তা পাঠকের অন্তররাজ্যে আনন্দের বীজই বপন করে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও তিনি যে সব চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন তার প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন জীবন্ত। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি যেমন হিমাংশু, অনীতা আর মিহিরের চরিত্র এঁকেছেন তেমনি নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন পার্শ্ব চরিত্রগুলি। সীতার চরিত্র পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। অন্নপূর্ণা ও কমলবাসিনী—দুটি নারী চরিত্র সার্থক সৃষ্টি।

এই বিহঙ্গী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি। বইখানির প্রচ্ছদপট মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

[প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৪৲ টাকা]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা বর্ষলিপি (১৩৬১) : সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্যচৌধুরী :

আলোচ্য পুস্তকখানি 'বাংলা বর্ষলিপি'র একাদশ সংখ্যা। পূর্বাপর বৎসরের ন্যায় আলোচ্য সংখ্যাটিও নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের কৃষি, খনিজসম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, কুটির-শিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ভাস্কর্য্য, সেচব্যবস্থা, বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা, যানবাহন, বেতার, ডাক ও তার বিভাগ, এবং রাজনীতি প্রভৃতি এই পুস্তকখানির অন্যতম বিষয়বস্তু। ইহা ব্যতীত বাংলা এবং পাকিস্তান সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রকাশক : সংস্কৃতি বৈঠক। ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। দাম—২॥• আনা।

রান্নার বই : শ্রীমতী সুলেখা সরকার :

বাংলাদেশে রকমারী অন্নব্যঞ্জনের প্রচলন আছে; ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ এ বিষয়ে বাংলার সমকক্ষ নয়। বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য—তারা ভোজনবিলাসী। রসনার পরিতৃপ্তির জন্যে রন্ধনশালায় মেয়েদের যেন গবেষণার শেষ নেই। বাঙ্গালী মেয়েদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনের অনেকখানি সময় দিতে হয় এই রন্ধনশালায়। শ্রীমতী সুলেখা সরকার লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানি বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে, মুদ্রণ-পারিপাট্যে এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে। পুস্তক রচনায় লেখিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকে অসংখ্য অন্নব্যঞ্জন-প্রস্তুতপ্রণালী পরিবেশন ক'রে লেখিকা একজন পাকা গৃহিনীর পরিচয় দিয়েছেন।

[প্রকাশক : এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩া• আনা]

লীলাবতী রায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "সুরবিহার" (২য় খণ্ড)—৪৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "বন্ধু-স্মৃতি"—২৲
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" (৩য় সং)—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামের সুমতি" (উপন্যাস—২৬শ সং)—॥৶•, "নিষ্কৃতি" (উপন্যাস—২৮শ সং)—১॥•, "অরক্ষণীয়া" (২১শ সং)—১।•, "পথ-নির্দ্দেশ" (৩য় সং)—১৲
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" (৬ষ্ঠ সং)—৩৲
শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মঞ্জীর"—৩৸•
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্ব-নির্বাচিত গল্প"—৪৲
জ্যোতির্ময় রায় প্রণীত "দৃষ্টিকোণ"—২।•
বিধুভূষণ দাশ প্রণীত "আচার্য্য বিনোবা"—১৲
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যাত্রা হ'ল শুরু"—২॥•
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "নতুন দিনের সাজ"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী— শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

শ্রীরামচন্দ্র ও শবরী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

চৈত্র—১৩৬১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

পদাবলী-সাহিত্যে মধুর রস ও রাধাভাব

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে রাধাপ্রেমে যেথানে জাগিয়াছে পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস, সেইখানে যেমন আন্তরিকতার মোহন স্বরে ভাবের বাঁশি বাজিয়াছে, ঠিক তেমনি জাগিয়াছে পরম সাধনার প্রেমাকুলতা। প্রেমের এবং সাধনার জীবনকে সৌন্দর্য আর অসীমতার বুকে বিছাইয়া দিবার জন্য সেখানে যেন অন্তরের সারাক্ষণের ভাবনাগুলি মুখর হইয়া আছে। প্রাণ-তপস্যার মৌনতার পরিবেশটি স্নিগ্ধ মধুর হইয়া যায় নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মাধুর্যময় দীক্ষায়। সেই হৃদয়-সম্পর্কের সমস্ত ভাব-স্বপ্নকে রতি ও আরতির প্রদীপ-শিখায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া পদাবলী-সাহিত্যের রস-সাধনার বৃন্দাবনে সত্যপ্রেমের রাসোৎসব জাগিয়া আছে। বৈষ্ণব-পদাবলী সেই প্রেমরসের উৎসবকে বুকে লইয়া নিত্যকালের সত্যের সুর শুনাইয়া যায়।

হৃদয়-সম্পর্কের মধ্যে বাৎসল্য, দাস্যভাব যেমন আছে, সখ্যভাবও তেমনি আছে; শান্তরতির মৃদু আলোকে প্রাণ-প্রিয়া আরাধ্যাকে দেখার প্রয়াসও আছে। কিন্তু পরম প্রেমাস্পদকে মনের মালঞ্চে ফুলের মত ফুটাইয়া তুলিয়া, তাঁহারই অনুরাগের সুরভি হইয়া তাঁহারই মধ্যে মিশিয়া যাইবার যে আবেগ-সাধনা, তাহা যেন ঐ ভাবগুলির মধ্যে নাই। সেগুলিতে কান্তের প্রতি নিষ্ঠা আছে, সেবা করার মানসিকতা আছে, বিশ্বাস ও মমতার গভীরতা আছে, কিন্তু সব বিলাইয়া দিয়া আত্মসমর্পণের যে-নিঃস্বতা তাহা নাই। তাই ঐ ভাবে কান্তকে সেবা করা যায়, হয়তো পূজাও করা চলে, কিন্তু পরিপূর্ণ কান্তা হওয়া যায় না। সব কিছু বিলাইয়া দিয়া অন্তরের সমস্ত কামনার সঙ্গে যে কান্তকে জীবনে পাইতে চায় সেই তো কান্তা। পরিপূর্ণভাবে কান্তা হইতে না পারিলে ‘আনন্দ-চিন্ময় রস’কে পাওয়া যায় না, এবং সেই প্রেমময়ের ‘হ্লাদিনীর সার অংশস্বরূপা’ হইয়া মহাভাবের রূপশ্রীকেও গ্রহণ করা যায় না। যিনি অন্তরের জগতে চিরমধুর, যাঁর মাধুর্যের আস্বাদনে জীবনের সমস্ত

চেতনা হইয়া ওঠে মধুময়, সুরভিত হইয়া থাকে ভালোবাসার হৃদয়, তাঁহাকে পাইতে হইলে সাধনা করিতে হয় মধুর রসে। আত্মসমর্পণের মমতায়, সেবা ও নিষ্ঠায়, বিশ্বাসময়তার আনন্দ-মাধুর্যে পরিপূর্ণ যে-রস, তাহাই তো মধুর রস। প্রেম-মাধুর্যের অমৃত-সিঞ্চনে সুধাময় এই রস—ইহা যেন মহাভাবের আরতি-জ্বালানো অতীন্দ্রিয় ধ্যানময়তার একটি আনন্দসত্তা; প্রণম্য ও উপাস্য আশ্রয়ের কাছে চির-নিবেদনের মর্মধ্বনি! এই ধ্বনির আবেশ-মাখানো আত্মশীলতা লইয়া যে-ভাব, তাহাই রাধাভাব। এই ভাব বহু জন্মের, বহু সাধনার, অন্তর্লোকের চেনাজানা ও প্রেম-পরিতৃপ্তির ধ্যান-জড়ানো ভাবনায় ভরপুর। রাধাভাবে তাই প্রেম-সাধনার পথে অতীন্দ্রিয়তার সুরভি-ছড়ানো মহাভাব—আর এই ভাবের যে-রস তাহা শ্রেষ্ঠ বা উজ্জ্বল রস। রাধাপ্রেমে তাই কান্তাপ্রেমের মধুরতম প্রকাশলীলা। কান্তাপ্রেমের প্রকাশ-মাধুরীকে অবলম্বন করিয়াই কবির এই বাণী—

উজ্জ্বল রসের মধ্যে এক বস্তু হয়।
সেই বস্তু না জাগিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।

মধুর রসের পরিপূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে আত্মস্বরূপের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আরাধ্য ও আরাধিকাকে এক করিয়া দেয়। তখন শ্রীরাধার মহাভাবে শুধু এই অনুভূতিই ছন্দ-ঝংকারে বলে—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি ন গেল॥
ন সো মরণ, ন হাম রমণী॥
দুহুঁ মন মনোভব পেসল জানি॥ (রায় রামানন্দ)

এই মধুর ভাবের প্রাণ-ব্যাকুলতার রস-ইতিহাস রচনা করিয়াই পদাবলী-সাহিত্য মধুর হইয়া আছে। এই যে কান্তের সঙ্গে কান্তাপ্রেম, পাশ্চাত্য ভক্তি-আরাধনায় ইহাই spiritual marriage, প্রবচ্যের কথায় আধ্যাত্মিক মিলন।

বৈষ্ণব-কবিরা পরকীয়া রাম-ভেজা তুলিটি হাতে লইয়া শ্রীরাধাকে এক মধুময়ী রূপশ্রীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রাণের যে-মধুর রস, তাহার প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগে। এই পূর্বরাগের প্রথম ভূমিকায় শ্রীরাধাকে বলিতে শুনি—

বিপুল পুলকে পরিপূরয় দেহ।
নয়নে ন হেরি হেরয় জনু কেহ॥ (বিদ্যাপতি)

প্রথম প্রেম-পরিচয়ের রক্তিম রাগেই আত্মবিলোপের রস-মাধুর্য!

তারপর রাধার জীবন ভাসিয়া গিয়াছে বিভিন্ন ভাব-পর্যায়ের তরঙ্গ-দোলায়, প্রাণের অঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে পর পর আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মিলন, প্রেমবৈচিত্র্য ও ভাবসম্মেলনের হাসিঅশ্রুময় ব্যাকুলতা। বিপ্রলব্ধার চিন্তাকুল প্রতীক্ষার অস্বস্তিতে প্রাণ যখন উঠিয়াছে ভরিয়া, তখনও বুকের মধ্যে মিলন-স্বপ্নের চমক আসিয়া নিজ হৃদয়ের একটি সুখ-কল্পনার দিকে তাঁহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া গিয়াছে। শ্রীরাধার কণ্ঠে তখন শুধু ভাবাবেগ-ভরা এই এক কথা—

ফুলের এ-ডালা, ফুলের এ-মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে। (চণ্ডীদাস)

নিশীথরাত্রির দুর্যোগময় তামস-ইংগিতের মধ্যেও তাঁহার অভিসার-যাত্রা বাধা মানে নাই। কেন না, যেখানে সহস্র বাধা-নিষেধের কণ্টকিত পরিবেশ এবং প্রাণ-প্রিয়তমাকে হারাইবার ভয় অবচেতন চিত্তাকে চকিত করিয়া তোলে প্রতিমুহূর্তে, সেইখানেই তো মহাভাবময় কান্তাপ্রেমের পরমতম প্রকাশ। প্রেমভাবের গভীরতা তো সেইখানেই। যেখানে সম্ভোগ-মিলনে তাহারা এক এবং বিরহের বিধুরতায় প্রেমের অসীমতাবোধে ভাবাতুর। কান্তের মিলন ভাবে কান্তাপ্রেম একসঙ্গে ভালোবাসা ও আরাধনার একটি মধুর জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। সেইখানেই দেবতা প্রিয় ও প্রিয় দেবতা হইয়া দেখা দিয়াছেন। সেইজন্যই কান্তাভাবের যে-প্রাণের সুর তাহা বাজিয়া উঠিয়াছে এই ভাবে—

বিগলিত কবরী সম্বরি নহি বান্ধই,
ধরণী লোটায়ই রোই।
পরবেশ দেহ, লেহ-রস লালসে,
জীবন সোঁপল তোই। (গোবিন্দদাস)

এবং—

বিনোদিনী রাধা সব নাগর কান।
বিলাস-উলাস- পুলক তনু,
এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ॥ (জ্ঞানদাস)

আন্তরিকতার যেন এক স্নিগ্ধ ধূপছায়ায় দাঁড়াইয়া প্রাণের পরমারাধ্য-দেবতাটি পূজার অর্ঘ্য হাসিসুন্দর মুখে গ্রহণ করিয়া প্রেম-জগতের একটি প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। মহাভাবময় ঊষার রক্তিমরাগের আনন্দ-স্বপ্নের সঙ্গে সূর্যদেবতা যেন নিজের সমস্ত রূপভাবকে আলোময় করিয়া তুলিয়াছেন।

আন্তরিকতা ছাড়া কখনো প্রেমের গভীরতা আসে না; আর সেই গভীরতার আবেশ ছাড়া প্রেমাবেশের একটি শুচিসুন্দর জ্যোতির্মণ্ডলও গড়িয়া ওঠে না। প্রেমাবেশের অতলে সমস্ত চেতনাকে ঢালিয়া না দিলে নিজের দেহ ও প্রাণ যেন পৃথক হইয়াই থাকে। প্রাণের দিক দিয়া যে-পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা যদি দেহের শুচিশ্রী দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে তো সাধনার কোনো সার্থকতা আসে না। অন্তরের যে-সবচেয়ে বড় প্রেমাস্পদ, তাঁহাকে তো শুধু প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিলে চলে না, দেহের মন্দিরকে পূজার বেদীস্বরূপ করিয়া লইয়া, নিবিড় প্রেমাকাঙ্খার আরতি-দীপ জ্বালাইয়া দিয়া সেই অখিলরসামৃত মূর্তিকে আবাহন করিয়া লইতে হয়। নিজের দেহকেই প্রীতি-আলপনার শুচি-সৌন্দর্য দিয়া সাজাইয়া লইয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলিতে হয়—

> পিয়া যব আওব এ-মঝু গেহে।
> মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
> বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
> ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
>
> (বিদ্যাপতি)

দেহের বেদীর উপর যখন চির আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় হন প্রতিষ্ঠিত, তখনই দেহ হইয়া ওঠে মন্দির; এবং সেই মন্দির প্রাঙ্গণে চির-আরাধ্যকে ডাকিয়া লইয়া শুধু এই কথাই বলিতে ইচ্ছা করে—

> দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
> দয়া জনু ছোড়বি শোয়।
>
> (বিদ্যাপতি)

চির-আরাধ্য প্রিয়তমকে এই যে দেবতার আসনে বসাইবার অকৃত্রিম মানস-সাধনা, ইহাই দেহকে করিয়া তোলে মন্দির। নিজ দেহকে যখন মন্দির বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখনই কান্তাভাবের আরাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ ঘটে। এই সিদ্ধির পর্যায়ে একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের হয় তো স্পর্শলাভ ঘটে না, কিন্তু মানস-মিলনের নিবিড়তায় সমস্ত কিছুই যেন মধুময় হইয়া ওঠে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মধুর ভাবের সাধনা; এবং এই সাধনার যে-ভাব তাহাই রাধাভাব ও মহাভাব।

এই মহাভাবের আকাশে চিরদিনের জন্যই যেন অংকিত হইয়া যায় প্রাণ-প্রিয়তমের চির-সুন্দর ভাবমূর্ত্তি এবং গড়িয়া ওঠে ভাব সম্মেলনের এক স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল। এই পরি-মণ্ডলটিতে মধুর রসের আবেশভরা মহাভাবের একটি জ্যোতিরেখা আছে; সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের পরমতম লগ্নটিকে উপলব্ধি করা যায় এবং তাহাতেই বিস্তার-লাভ করে ভাবোল্লাসের ভাবসুরভি। এই ভাবোল্লাসের যে রাধাভাব তাহাই দেহকে মন্দির করিয়া তোলে, এবং বলে—'The human body is the highest temple of God', এবং 'মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব কপাল কহিয়া গেল।' তাই পদাবলী সাহিত্যে রাধাভাবের যে ভাবোল্লাস, তাহা মধুর রসের অমৃত ভাণ্ডার—চির মিলনের স্বর্গলোক।

স্বপ্নোনু মায়ানু মতি ভ্রমশ্চ

কানাই বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তিনতলায় বৌয়ের ঘর। দামী কাপড়ের খসখসানি শব্দ যথাসাধ্য সম্বরণ করে সুরমা অতি সশঙ্কচিত্তে নেমে এলেন দোতলায়। কী জানি যদি উঠে থাকেন, যদি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন সত্যপ্রিয় এই সময়। স্রুট্ করে সিঁড়ির ধারে ছোট ঘরটাতে ঢুকে পড়েন সুরমা। দেখে ফেল্লেই বিপদ। সেই বিপদের সম্ভাবনা চিন্তা করেই মনটা কাঁটা হয়ে যায়। কিন্তু এমনই মজা মনের যে, এই সাজসজ্জা যাঁর চোখ এড়াবার জন্য—এত সতর্কতা, এত লুকোচরি, সেই মানুষটীরই চোখে না পড়লে এ সাজসজ্জা সবই বৃথা, সবই নিরর্থক। ইচ্ছা করে যে তিনি দেখুন, মুগ্ধ হন, আরও দেখতে চান, কিন্তু সে ইচ্ছা অরণ্যে রোদন। মানুষটা যেন বড় তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়ো হতে পারলে যেন বাঁচেন। মনে তাঁর কোনও আশার স্বপ্ন, কোন সাধের কল্পনা জাগে না। সব আশা ইচ্ছা সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে কেবল আপিস আর ঘর, ঘর আর আপিস, এই নিয়ে আছেন। কেন, এতই কী বয়স হয়েছে, অকালে চুল পাকিয়ে সাধ করে বুড়ো।

পাশাপাশি ঘর। মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে সুরমা দেখলেন। স্বামী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন বলেই মনে হ'ল। কাছে যেতে না পারলেও, দূরের দেখাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সত্যপ্রিয়র নিদ্রা বেশ গাঢ়। বৌমার পরামর্শ অসম্ভব বলে মনে হ'ল না। ঘণ্টা দুই আড়াই বইতো নয়। আর ভিখুয়া পুরোনো লোক। তার ওপোরে এইটুকু নির্ভর করে যাওয়া চলে। যদিই ওঠেন, যদি ডাকেন, ভিখুয়া সামলে নেবে।

শাশুড়ী বধূ মিলে ভিখুয়াকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দিলেন—চোখ কাণ খুলে রাখবে, বাবু উঠেছেন কিনা নজর রাখবে, ডাকলে সাড়া দেবে, কী চান জিজ্ঞাসা করবে, যদি খোঁজ করেন মাইজী কোথায়, বলবে ও-বাড়ী গেছেন, একটু পরেই আসবেন ইত্যাদি।

ভিখুয়া বুদ্ধিমান ও কর্তব্যপরায়ণ লোক। সে কর্ত্রীর আদেশ উপদেশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছে ও তা পালনে ক্রটী করবে না, জানিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করলো। এবং তাঁরা চলে গেলে সদর দ্বার বন্ধ করে, বৈঠকখানার তক্তপোষে দৈনন্দিন দিবাশয্যাটী পেতে, সম্ভবতঃ একটা চোখ ও একটা কাণ খুলে রাখবার সঙ্কল্প নিয়ে, গা ঢেলে দিল।

জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনটা একটা অলীক স্বপ্ন ও এই জগৎটা মায়া মাত্র, অতএব অনিত্য, অসত্য জীবন ও জগৎ পরিত্যাজ্য। তা এসব কথা জ্ঞানীদেরই কথা, আমাদের কথা নয়। আমরা স্বপ্ন, মায়া, অনিত্য ও মিথ্যা নিয়েই গল্প লিখে থাকি। তবে কিনা আমাদের মিথ্যাগুলো অবিমিশ্র মিথ্যা নয়, মিথ্যার গল্পেও একটু আধটু সত্যের গুঁড়ো মেশানো থাকে।

তাই সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, সেই দিনই গভীর রাতে সত্যই এক বৃহৎ মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল সত্য-প্রিয়র বাড়ীর দরজায়, তাঁকেই নিয়ে যেতে।

পাড়ার লোক যারা জেগেছিল, তারা অত রাত্রে গাড়ীর শিঙাধ্বনি শুনে জানালা খুলে দেখলো। সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মায়া। মায়াই বাদ সাধলো। মায়ার বশে সুরমা আপত্তি করলেন এবং গাড়ীতে চড়া হোলে না সত্যপ্রিয়র। এ মায়া মোটেই মিথ্যা নয়।

কিন্তু কেন গাড়ী এলো এবং কেন ফিরে গেল, সেটা বলা দরকার।

সিনেমার ছবি দেখতে দেখতে সুরমা বার বার নীচে তাকিয়ে দেখেন সারি সারি নরমুণ্ডের সীমা নাই। প্রকাণ্ড

চল ঘরটা, তার বারান্দা, দোতলা তেতলা, সব নরমুণ্ডে ভর্তি। কত লোকই এসেছে, বাবা! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ বৌমা, এই এত লোক সবাই টিকিট কিনেছে?" নন্দিতা ছবি দেখতে মত্ত। মৃদু স্বরে বললে—"কিনেছে বই কি।"

সুরমা বল্লেন—"সব ন'আনার টিকিট?"

নন্দিতা ফিস ফিস করে জবাব দেয়—"সব কেন ন'আনা হবে। কিছু কম দামের আছে, আবার একটাকা দুটাকা তিনটাকা কত আছে।"

সুরমার বিস্ময় কণ্ঠ ছাপিয়ে প্রকাশ পায়, বলেন—"সে স-ব টাকা এই বাইস্কোপওলা পাবে? সে যে একরাশ টাকা হবে গো বৌমা?"

নন্দিতা লজ্জা লুকোবার ঠাঁই পায় না। আশে পাশের লোকেরা কী ভাবছে শাশুড়ীর বোকামী দেখে। বিরক্তও হচ্ছে হয়তো সকলে। সে সুরমার কানে কানে বল্লে—"চুপ করুন মা, সব শুনতে পাচ্ছে যে।"

সুরমাও লজ্জিত হন। চুপ করে ছবি দেখতে লাগলেন। কিন্তু ছবি ছেড়ে তখন টাকা ঘুরছে তাঁর মাথার মধ্যে। রাশ রাশ টাকা। চুপ করে থাকতে পারবেন কেন। একটু পরে তিনি বধূর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন—"হ্যাঁ বৌমা, তা কত টাকা হবে তোমার মনে হয়?"

নন্দিতার চক্ষু-কর্ণ হৃদয়-মন ছবির সঙ্গে দৌড়চ্ছে, এ পিছু-ডাক সহ্য করা যায়! কিন্তু কী করবে, শাশুড়ী হন, তা ছাড়া এত লোকের মাঝে—কিছু বলা যায় না। সে প্রাণপণে বিরক্তি গোপন করে জবাব দিল—"পরে বলবো মা, সব বলবো।"

সুরমা চুপ করলেন।

নন্দিতা আবার নিশ্চিন্ত মনে ছবির গল্পে ডুব দিল। কিন্তু সুরমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কতক্ষণে ছবি শেষ হবে, অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ছবি শেষ হলে, ছবির বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে পা দিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁগা বৌমা, ঐ অত লোকের টাকা সব এই বাড়ীওলা মিন্সেরা পাবে?"

বিজ্ঞ বধূ বল্লে—"মা'র এক কথা! তা পাবে না? পাবে বই কি। শুধু কি এই টাকা। আবার বিকেলে সওয়া পাঁচটার সময়ে ছবি দেখানো হবে, তার পর রাত্তিরে নটায় দেখানো হবে, রোজ তিনবার করে শো হয়, তার—"

"শোয়ায়? কাকে শোয়ায় গা?"

রাস্তার মধ্যে কত হাসবে নন্দিতা!

বল্লে—"শোয়ায় না মা, শো হয়, মানে ছবি দেখানো হয়, রোজ তিন বার করে। আবার রোববারে সকালেও একবার। সব টাকাই পাচ্ছে।"

"তা হলে সে কত টাকা হবে বৌমা?"

বৌমা শুধু বিজ্ঞ নয়, সর্বজ্ঞ! বল্লে—"তা খরচা-টরচা বাদ দিয়ে দু তিন হাজার টাকার কম তো নয়ই।"

"মাসে?"

"মাসে কি মা, দিনে। প্রতিদিনই তো টাকা আসছে হুড় হুড় করে। লোকে মারামারি করে টিকিট পায় না। তিন ঘণ্টা লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তা নইলে দাদা কি আর এমনিতে অত ঝুঁকেছে? সব খবর নিয়েছে। দাদার তো খুব জানাশোনা আছে ওদের সঙ্গে। এই সেদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল মিষ্টার—"

ভ্রাতৃগৌরবে গরবিনী বধূ সারা রাস্তা সিনেমা ব্যবসার অনেক গূঢ় তথ্য, অনিবার্য লাভের কথা ব্যক্ত করেছে। সুরমা কৌতূহল, বিস্ময় ও আগ্রহ সহকারে তা শুনেছেন, বৌয়ের বাপ-ভাইয়ের বড়মানুষির ব্যাখ্যানা সমেত। একবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার বাবাই সব টাকা দেবেন নাকি?"

নন্দিতা বল্লে—"সব টাকা দেবার ক্ষমতা কোথায় বাবার? দাদার দু-একজন বন্ধুও টাকা দেবে। ভাগে করবে। তাতেও কম পড়তে পারে বলছিল দাদা।"

সুরমা সাগ্রহে বল্লেন—"আরও একজন লোক চাই তাহলে টাকা দেবার? তারও ভাগ থাকবে তো?"

নন্দিতা বল্লে—"তা থাকবে বই কি।"

সুরমার মাথায় এক মতলব এসেছে।

মাস কয়েক পরে সত্যপ্রিয়র আপিস থেকে ছুটী হয়ে যাবে, অনেক দিন কাজ করেছেন বলে একেবারে ছুটী। সেই সময় এতদিন কাজ করার বখশিস-স্বরূপ কিছু থোক টাকা পাবেন। ঠিক কত তা সুরমা এখনও জানেন না, তবে মোটা টাকাই হবে শুনেছেন। টাকাটা কী ভাবে

রাখা যাবে যাতে আসল অক্ষুণ্ণ রেখে ঐ থেকেই সংসারে একটা বাঁধা আয় হতে পারে—এই চিন্তা স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই করে থাকেন। বলা বাহুল্য, কোনও সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পারেন নি।

তা বৌমার বাপ মানুষ ভালো। খুব আমুদে লোক। ঐ যে ঠাট্টা করে, কই এ-বাড়ীর কর্ত্তার সাতজন্মেও অমন ঠাট্টা মাথায় আসবে না। আর ধর্ম্মভীরু লোক। ফাঁকি-টাকি দেবে না। আর বৌমার দাদা তো সোনার টুকরো ছেলে, যেমন বুদ্ধিশুদ্ধি তেমনি কথাবার্ত্তায়, চৌথস ছেলে। সত্যপ্রিয় যে ভালমানুষ হাবাগোবা মনিষ্যি, ঐ রকম চালাক-চতুর লোকের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ না করলে কিছুই করতে পারবেন না।

এই সব জল্পনা-কল্পনা করতে করতে আশায় উদ্‌গ্রীব মন নিয়ে সুরমা বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীতে পা দিয়ে এতক্ষণে তাঁর মনে উৎকণ্ঠা এলো এই মধ্যাহ্নবিলাস ধরা পড়ে গেছে নাকি? কিন্তু ভিখুয়ার কাছে যখন শুনলেন বাবু ওঠেন নি, ডাকেন নি, এখনও ঘুমোচ্ছেন এবং ভিখুয়া সমস্তক্ষণ জেগে ছিল—তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুরমা বৌয়ের ঘরে যান কাপড়-চোপড় ছাড়তে। সেখানে আবার ঐ কথাই ওঠে। অনেক আশার বাণী শোনেন। আজকালকার মেয়েরা এত খবরও জানে। কোথা দিয়ে কতটা সময় কেটে যায় কে হিসেব রাখে।

আধঘণ্টাটাক পরে সুরমা লঘুচিত্তে নেমে আসেন ও নিজের ঘরে প্রবেশ করেন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে।

দেখেন সত্যপ্রিয় অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছেন। ডাকেন— "ওগো ওঠো, ওঠো। বেলা কি আর আছে,—ধন্যি ঘুম যা হোক।"

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকেন—"ওগো, শুনছো, ওঠো।"

তবুও ঘুম ভাঙ্গাতে না পেরে সুরমা মাথাটা নেড়ে দিয়ে ডাকবার জন্য স্বামীর কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন। কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে! দু মিনিট, কি পাঁচ মিনিট, কিম্বা কতক্ষণ কে জানে, সুরমা নীরব নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকেন স্বামীর মুখের পানে চেয়ে। সে মুখে নিদ্রার ঘোর নয়, প্রবল জ্বরের আচ্ছন্নতা, স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখন মনে পড়ে, দুপুরে সত্যপ্রিয়র চোখ দুটো লাল দেখেছিলেন। মনে পড়ে সত্যপ্রিয় আজ ভাত ভালো করে খাননি। মনে পড়ে সত্যপ্রিয় গায়ে চাদর ঢাকা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শরীরটা কেমন লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করছে না—সব মনে পড়ে সুরমার। আরও স্পষ্ট মনে পড়ে তিনি এ-সকল লক্ষণের সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করতে চান নি বলেই করেন নি, পাগল হয়েছিলেন তিনি। কাছে বসতে বলেছিলেন, বসেন নি। হয়তো বসলে, গায়ে হাত ঠেকলে বুঝতে পারতেন গাটা ছ্যাক ছ্যাঁক করছে। কিন্তু পাগল হয়েছিলেন বলেই বসেন নি। বুড়ো বয়সে সেজেগুজে মরতে গিয়েছিলেন বায়স্কোপ দেখতে। এমনই মতিভ্রম!

ধীরে ধীরে পা দুটো যেন ভেঙ্গে পড়ে। সুরমা স্বামীর শিয়রে বসে পড়েন! তাঁর উত্তপ্ত ললাটে করতল রাখেন। সে করতল স্বভাবতই শীতল, উত্তপ্ত ললাটে তা শীতলতর! সেই শীতল স্পর্শ পেয়ে সত্যপ্রিয় একটু যেন নড়ে ওঠেন। বোধ করি আরামে বলেন—আঃ। সুরমার চোখ জলে ভরে আসে। অকল্যাণ আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নেন।

তারপর ছেলে সুনীল অফিস থেকে ফিরলো, ডাক্তার ডাকলো, এসব তো জানা কথা—বিস্তারিত বলবার প্রয়োজন নেই।

সেই জ্বর বাড়তে বাড়তে রাত আটটা নাগাৎ প্রায় ১০৪ হলো। ইতিমধ্যে সত্যপ্রিয় দু'একবার জেগেছেন, দুটো একটা কথা কয়েছেন, আবার অচেতন পড়ে আছেন। আর কাঠের মূর্তির মত সুরমা শিয়রে বসে আছেন। রাত বারোটার পর জ্বর উঠলো একশো পাঁচের উপরে। ডাক্তারটী পাড়ারই ছেলে, অভিজ্ঞতা ও বয়স বেশী নয়। সুনীলকে চোখের ইঙ্গিতে ডেকে বাইরে এসে বল্লে—"বাড়ীতে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না। মেনিন-জাইটিস যদি হয়, লাম্বার পাংচার করতে হবে, সে অনেক হাঙ্গামা, আর এতখানি দায়িত্ব নিতে সাহস করি না। হসপিটালে রিমুভ করা ছাড়া উপায় দেখছি না।"

সুনীল কেবল বল্লে—"এই অবস্থায়—"

ডাক্তার বল্লে—"সে ব্যবস্থা আমি করছি।" টেলিফোন করে এম্বুলেন্স গাড়ী ডাকবার জন্য ডাক্তার বাড়ী গেল।

রোগীর ব্যবস্থা তো ডাক্তার করবে, এদিকে সুরমাকে নিয়ে মেয়েদের ভাবনা—সেই যে বিকেলে বসেছেন, রাত

দু'প্রহর কেটে গেল, নড়ন চড়ন নেই, একবিন্দু জল মুখে দেন নি। বধূ নন্দিতা, মণি পিসী, বিশুর মা, পাশের বাড়ীর গিন্নী, সকলে বুঝিয়েছে সুরমাকে—কোনও ভয় নেই। অমন কত হচ্ছে, আজকাল সব রোগেরই ওষুধ বেরিয়েছে, যেমন রোগ, যত বড় রোগ, তেমনি চিকিৎসা, তেমনি ওষুধও আছে, অমন ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ইত্যাদি।

ভেঙ্গে পড়েন নি সুরমা। পিঠ খাড়া রেখে বসে আছেন। কিন্তু স্থানত্যাগও না, জলগ্রহণও নয়। সেই প্রথমটা যা চোখে জল ভরে এসেছিল মুহূর্তের জন্য, তারপর থেকে চোখ শুষ্ক, বোধহয় খট্‌খট্ করছে।

সুনীল ঘরে ফিরতে কাছে ডেকে সুরমা ধীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী বল্লে ডাক্তার? হাসপাতালে পাঠাতে চায়?"

সুনীল অবাক হয়ে গেল, বধূ নন্দিতা অবাক হয়ে গেল। সেই বোকা সোকা মা-টা কি অন্তর্যামী!

সুনীলকে উত্তর দিতে হল না। সুরমা বল্লেন—"বাড়ীতে চিকিৎসা হতে পারে না খোকা?"

সুনীল বল্লে—"সে অনেক কাণ্ড, যন্ত্রপাতি ডাক্তার নার্স, বাড়ীতে ঠিক ঠিক করতে পারা—সে অসম্ভব।"

সুরমা বল্লেন—"অসম্ভব কিছুই নয়। উনি বলেন শোন নি? করে না, হয় না, বলেই অসম্ভব। করলেই সম্ভব, হলেই সম্ভব। তুমি খরচের জন্যে ভাবছো? ঐ আলমারীতে ওপরের থাকে কোণের দিকে আমার ক্যাশবাক্স আছে, দুশো তিনশো—কত আছে জানি না, তা ছাড়া গয়নার বাক্সটা আছে নীচের টানাতে। ডাক্তারকে বল ঠিক হাসপাতালের মতনই সব ব্যবস্থা বাড়ীতে করতে হবে।"

ডাক্তারের বাড়ী যাবার আগে সুনীল স্ত্রীকে ডেকে বল্লে—"মাকে কিছু মুখে দেওয়াও, সারারাত এক ফোঁটা জল মুখে দিলেন না, এরপর চোখের ওপর অপারেশনের হাঙ্গাম সইতে পারবেন কি করে?"

নন্দিতা বল্লে—"মিথ্যে বলে কী করবো? মার মুখে জল যাবে না, যতক্ষণ না—" উদ্‌গত কান্নায় গলা বুজে এলো তার। ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে সে কথা শেষ করলো—"যতক্ষণ না বাবা পথ্যি করেন।"

সুনীল বল্লে—"তোমাকে মা বলেছে একথা?"

নন্দিতা ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না, আমি জানি। ঘরের কোণে দেখনি? কুঁজোটা কাত হয়ে পড়ে আছে, দেখনি? শুকনো কুঁজো? মা'র চোখ দিয়ে আমি দেখেছি"

বিমূঢ় সুনীল জিজ্ঞাসা করলো—"কেন? কুঁজোতে কী হয়েছে?"

নন্দিতা বুঝি আর কান্না চাপতে পারে না। বলে—"সে অনেক কথা গো, সব দোষ এই হতভাগীর। বলবোখন। কখন জ্বরের ঘোরে তেষ্টায় বাবা জল খেতে উঠেছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু আজ জল তোলাই হয়নি—"

কথা শেষ হলো না, ক্রন্দনে আকুল হয়ে ওঠে নন্দিতা। সুনীল তখনও কিছু বুঝতে পারে না, বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। তার অনুচ্চারিত প্রশ্নের আঘাতে কাতর হয়ে নন্দিতা বলে—"ওগো, আর জিজ্ঞেস কোরো না, তোমাকে সব বলবো পরে, সব দোষ এই হতভাগীর, হে ঠাকুর আমাকে নিয়ে বাবাকে—" বলতে বলতে সে পালিয়ে গেল।

সুরমার কথাই রইলো।

এম্বুলেন্স গাড়ীকে বারণ করবার সময় হয় নি। তাই গাড়ী এসেছিল। সত্যপ্রিয়র দরজায়, তাঁকেই নিতে অপ্রত্যাশিত প্রকাণ্ড গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সুরমার কথায় ফিরে গেল।

আর, কোমলচিত্ত পাঠিকারা প্রত্যাশিত পরিণতি না পেয়ে দুঃখিত হবেন জেনেও সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যপ্রিয় মরলেন না। সুরমার লুকোনো ক্যাশবাক্সের টাকায় যে বড়ো ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি অনভিজ্ঞ ছোট ডাক্তারের ভয় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, রোগটা মেনিন্‌জাইটিস নয়।

পরবর্তীকালে সত্যপ্রিয় প্রায়ই সুরমাকে চটাবার জন্যে দুঃখ করে বলেন—"আহা, গাড়ীর স্বপ্ন যদি বা সত্যি হলো, তোমার মায়ার জন্যে চড়া হলো না।"

এবারের লক্ষ্ণৌ-সম্মেলন

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

কোথায় মহানদীর তীরবর্ত্তী ঐতিহ্যময় সুপ্রাচীন উড়িষ্যার রাজধানী কটক, কোথায় সেই মরু ঊষর রাজস্থানের রাজপুত-বীর্য্য-গরিমা বেষ্টিত জয়পুর, আর কোথায় এই গোমতী-মালিকা-মণ্ডিত "উদ্যান-নগরী" লক্ষ্ণৌ !

নিখিল ভারত সম্মেলনের সার্থকতাই ত এইখানে ! ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বৎসরান্তে এই যে সমস্ত বাঙালীর একত্র মিলন, তিনদিনের স্বল্পতা নিয়েও এর প্রভাব সারা বছরেও মুছে যায় না ! প্রণাম জানাই এই মহান্ আদর্শের প্রতি, প্রণাম জানাই এর সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা সেই মহান্ বাঙালী-প্রেমিকদের ! সারা ভারতে এ ধরণের সম্মেলন বোধকরি আর কোন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে নেই।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন বসল লক্ষ্ণৌতে উনিশ-শো চুয়ান্ন সালের শেষ দিনে। এবারের সম্মেলনের বিরাটত্ব শুধু প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সংখ্যাতেই নয়, দুটি নতুন শাখার সংযোজনও সেই বিরাটত্বের অনেকাংশের দাবী করতে পারে। শাখা দুটি হ'ল সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য ! সত্যি, এই নূতন শাখা-স্ফীতিতে সম্মেলনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল। এবার শুধু বাঙালীই নয়, ডাক পাঠানো যাবে ভারতের যে কোন নাগরিককে, যে কোন প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষীদের এই মহান্ মিলন-উৎসবে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাব যে সারা ভারতে প্রাদেশিক সাহিত্যের ওপর পড়েছে এটা বোধহয় তারই আরো একটা প্রমাণ !

গোড়ায় অধিবেশন-স্থল লক্ষ্ণৌ নগরীর কিছু পরিচয় দি ! সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে কথিত আছে রামানুজ লক্ষ্মণ এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এবং সেই প্রবাদের স্বপক্ষে অনুমান এই যে বড় ইমামবাড়ার কাছে উচ্চ ভূখণ্ড 'লক্ষ্মণ-টিলা'তেই লক্ষ্মণের প্রাসাদ বা দুর্গ ছিল। পৌরাণিক যুগের গৌরব-ভ্রষ্ট এই অরণ্য-সমাচ্ছন্ন লক্ষ্ণৌএর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় মুসলমান আমলে। পাঠানবিজেতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি দুর্গের স্থপতির নাম 'লিখনা' থেকেই সম্ভবতঃ 'লখ্নউ' নামের উৎপত্তি। এই জনশ্রুতির সত্যতাও সন্দেহ-কণ্টকিত।

যাই হোক, এখনকার লক্ষ্ণৌতে নবাব-যুগের স্থাপত্য-শিল্পই বর্ত্তমান। এবং তার চরম নিদর্শন রয়েছে বিখ্যাত বড় ইমামবাড়ার অপূর্ব গঠন-শৈলীতে। শুধু পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ খিলান-বিশিষ্ট এর বিরাট হল-ঘরটাই নয়, এর অভিনব পরিকল্পনা, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-প্রণালী, সুদীর্ঘ খিলান, বিস্ময়কর "তহখানা" (ভূগর্ভস্থ কক্ষ), এবং 'রুমীদরওয়াজা'যুক্ত সুদৃশ্য তোরণ সত্যই দর্শনীয়। তার ওপর উপরতলায় বিভ্রান্তিকর "ভুলভুলাইয়া" ! 'গাইড'এর কাছে শুনলুম নবাব নাকি তাঁর বেগমের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেই এই ভুল-ভুলাইয়া নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন। যাই হোক, সেখানকার একটা দেয়ালে মুখ রেখে বলা-কথা বহুদূরের দেয়ালে কাণ পেতে শোনা, হলঘরের ওপরের একপ্রান্তের রেলিঙে মুখ দিয়ে কথা-বলা আর অন্যপ্রান্ত থেকে সেই কথা শোনা সত্যিই ভারী মজার। এ ইমামবাড়াটী নবাব আসফউদ্দৌলা ১৭৮৪ সালে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের আশ্রয়স্থল হিসাবে নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কে জানে তাঁর মনের বাসনা যে এ কীর্ত্তি তাঁর অমরতার স্মারকচিহ্ন-রূপে নির্ম্মিত নয় ?

একটু তফাতেই হুসেনাবাদএর ছোট ইমামবাড়া কোনমতেই বড় ইমামবাড়ার পাশে স্থান পাবার যোগ্য না হলেও স্থাপত্য-শিল্পের দিক দিয়ে দর্শনীয়। ভেতরের পরিবেশটিও মনোরম। এটির প্রতিষ্ঠা করেন নবাব মহম্মদ আলী শাহ ১৮৪২ সালে।

লক্ষ্ণৌএর স্থাপত্য-শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে বহু কারু-কার্য্যের মধ্যে যুগ্ম-মৎস্য-চিহ্ন বিদ্যমান। কে জানে এটা কিসের স্মারক-চিহ্ন !

সিপাহীবিদ্রোহের বীরত্বকাহিনীরূপে 'রেসিডেন্সী'ও লক্ষ্ণৌর অন্যতম দর্শনীয় স্থান। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অলিখিত ইতিহাসের লজ্জা ব'য়ে ১৮৫৭র বীর্য্য-গাঁথা আজ 'রেসিডেন্সী'র ধ্বংস স্তূপে ম্রিয়মান। স্থানে স্থানে কামানের গোলারও দাগ রয়েছে। প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ লিখনটুকু থেকে যা জানা যায় তা এই যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন এখানে আক্রমণ হয়। প্রতিরোধের তৃতীয় দিনেই স্যার এইচ্. লরেন্সের মৃত্যু ঘটে। দুর্গাভ্যন্তরে সামরিক ও বেসামরিক মিলে তখন লোকসংখ্যা ছিল ২৯৯৪ জন। দীর্ঘ ও অবিরাম আক্রমণধারায় বিপর্য্যস্ত ও ভগ্নপ্রায় দুর্গ যখন ঐ বছরের ১৭ই নভেম্বর স্যার কলিন ক্যাম্পবেল কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধার হয়, তখন ভেতরের আহত ও অনাহত সর্ব্বসমেত জনসংখ্যা ছিল মোট ৯৭৯ জন। পরাধীন ভারতের এই বিরাট বীরত্বকাহিনীর আজও কোন প্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হয়নি, এ সত্যিই লজ্জার কথা !

তাছাড়া 'ছত্র-মঞ্জিল', গাজীউদ্দীনের সমাধি 'শাহনজফ' ও তাঁর পিতামাতার দুইটি সমাধি, 'লাল বারাদরী, দিলকুশা, মোতিমহল' প্রভৃতি নবাব-আমলের কীর্ত্তি স্তম্ভগুলি বেশ দর্শনীয়।

এবারের সম্মেলনের আরো যে গুরুত্ব আছে তা এই যে, এই লক্ষ্ণৌ নগরীরই এক প্রবাসী বাঙালী এ সম্মেলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক। তিনি স্বর্গতঃ কবি অতুলপ্রসাদ সেন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌতে বাঙালীদের একটি দৃঢ়-বদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠে, 'বেঙ্গলী ক্লাব' তারই একটা অঙ্গ। এই 'বেঙ্গলী ক্লাব' ভবনেই সম্মেলনের অধিবেশন বসে। বাঙালী-

অধ্যুষিত এই হিউয়েট রোডের পাড়ায় বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীদের সঙ্গে মিলতে এখানের বাঙালীরা ভেঙে পড়বে বলে যারা আশা করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছেন। হবারই কথা! কারণ সারা ভারতের বাঙালীদের মিলন-উৎসবের মধ্যে যে লজ্জাকর মতবিরোধ ও আত্মভেদের দৃষ্টান্ত এবার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিল, তার ছোঁয়ায় এবারের সম্মেলন অনেকখানি প্রাণহীন হ'য়ে গেছে। অন্ততঃ লক্ষ্ণৌএর বাঙালীদের কাছ থেকে এ ধরণের পরিচয় আশা করা যায় নি! কারণ, ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এখানের সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হ'য়ে কবি অতুলপ্রসাদ সেন যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিম্বা উপাসকের অভাব হইবে না। কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ের ভক্তি চাই, গভীর নিষ্ঠা চাই, প্রচুর ধৈর্য্য চাই। নতুবা আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হইবে। এই সত্য-শিব-সুন্দরের মন্দির ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"—কিন্তু বলতে ব্যথা পাই, এবারের সম্মেলনের আড়ালে স্থানীয় বাঙালীদের মধ্যে যে মন-কষাকষি ও বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্মেলনের অগ্রগতিকে অনেকখানি ব্যাহত কর্ব্বে বলেই আশঙ্কা হয়! এর ছোঁয়া অল্পবিস্তর সমস্ত প্রতিনিধির মনেই লেগেছে, এতবড় প্রচেষ্টা তাই সামান্য ত্রুটিতেই যেন ব্যর্থ হ'য়ে গেছে!

তবু আশা করব এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, বাঙালী হ'য়ে বাঙলাদেশের বাইরে বাঙালীর মর্য্যাদাকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব!

কিন্তু স্থানীয় বিভেদটুকু বাদ দিলে এবারের সম্মেলনে যোগ দিতে প্রতিনিধিদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। সে হিসেবে এবারের প্রতিনিধি-সংখ্যা সম্মেলনের ইতিহাসে একটা রেকর্ড বলা চলে। আধা-ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধের জন্যেই হোক্ বা প্রবাসী বাঙালীর ডাকেই হোক্ এবার যে পরিমাণ প্রতিনিধির সমাগম হ'য়েছে তাতে ভবিষ্যতে বাঙলার বাইরে বাঙালীর বলিষ্ঠ-আধিপত্যহীন কোন সহর আর সম্মেলন ডাকতে সহজে সাহস পাবে না বলেই মনে হয়! এই প্রতিনিধি-সংখ্যা এখনই পরিমিত না করলে ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না।

বোধ হয় বাদ পড়েনি কোন প্রদেশই—দিল্লী-কল্‌কাতা-পাটনা-এলাহাবাদ ত আছেই, আজমীড়-আসাম পুরী-পুণা—প্রায় সর্ব্বত্র হতেই প্রতিনিধি এসেছেন। মহিলা-প্রতিনিধি-সংখ্যাও নগণ্য নয়! সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বোধ হয় আজমীড়ের শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অশীতিপর বয়সের উৎসাহের জন্যে। তাঁর বয়স ডিঙিয়ে যাবার মত কেউ না থাকলেও প্রতিনিধি শিবিরে এমন অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেখা মিলেছে যাঁরা শারীরিক সামর্থ্যের চেয়ে অন্তরের প্রেরণার ওপর নির্ভর করেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন! কি জানি কিসের আকর্ষণ! তাঁদের সাহিত্য-প্রীতি নিশ্চয়ই নয়, কারণ তার খোরাক এখানে তেমন নেই! বরঞ্চ নেশা বলা যেতে পারে অথবা বাঙালী-প্রীতি! সে হিসেবে এ সম্মেলনের নাম নিখিল ভারত বাঙালী সম্মেলনই বোধকরি যুক্তিযুক্ত!

এসে পৌছনো উচিত ছিল ৩০শে মধ্যাহ্ন অথবা ৩১শের প্রত্যুষেই। কিন্তু চাকুরীজীবীর পক্ষে ছুটিটা কিছু বেকায়দার ছিল, তাই গিয়ে পৌছুতেই অধিবেশন সুরু হ'য়ে গেল। কৈসরবাগের কুইন্‌স্ কলেজে হয়েছে প্রতিনিধি-শিবির, বিরাট হলঘরের মেঝেতে সতরঞ্চ পেতে সকলের জন্যে একেবারে ঢালাও ব্যবস্থা! পৌষার্দ্ধের প্রচণ্ড শীতে এ ব্যবস্থা কতটা কার্য্যকরী হবে এ আশঙ্কায় কয়েকজন শিবির ছেড়ে হোটেলে উঠলেন। কলেজের দু'মহলে থাকার আয়োজন, আর অন্য এক মহলে আহারাদির ব্যবস্থা। মাঝে বিরাট মাঠ উন্মুক্ত পড়ে আছে! অনেকে তাই অনুযোগ জানালেন যে দেড় মাইল তফাতে বেঙ্গলী ক্লাবে অধিবেশনের আয়োজন না করে এই মাঠটাতেই মণ্ডপ বেঁধে অধিবেশনের ব্যবস্থা করলে সবদিক থেকেই সুবিধাজনক হ'ত!

দলাদলির পরিণাম যা হয় এখানেও তার কিছু কম হয় নি। সমস্ত কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হ'তে পারে নি। ষ্টেশনে নেমে দেখি সদস্য
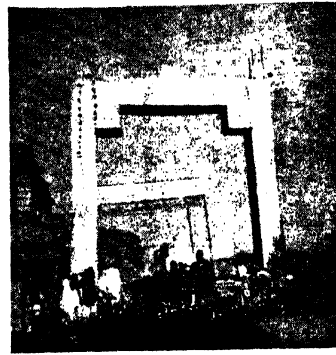
সম্মেলনের তোরণ দ্বার ফটো—অরুণ মিত্র

তালিকায় আমার নাম নেই। তবু রক্ষে শিবির-কার্য্যালয়ে ছিল, নইলে প্রতিনিধি-ব্যাজ মেলা দুষ্কর হ'ত!

অবশ্য এ সবের জন্যে আমরা কলকাতা থেকেই তৈরী হ'য়ে গেছি। যে কারণে দেওয়ালীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে এ অধিবেশনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি এবং প্রস্তুতি-পাঠ সুরু হ'তে অনেক বিলম্ব ঘটেছিল সে কারণটা আমরা জানতুম। কাণাঘুষায় এটাও কানে এসেছিল যে একটা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের হাতে এবারের সম্মেলনের ভার চলে গেছে! বাস্তবধর্ম্মী সেই দলটির কাছ থেকে কোনরকম আন্তরিকতার ছোঁয়া পাবার আশা প্রায় ত্যাগ করেই আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে ছিলাম।

শেষ ডিসেম্বরে ওখানের বাসিন্দারা বৃষ্টির আশা করে! কিন্তু বিনা-বৃষ্টিতেই তাপমানের পারাটা উনচল্লিশের কোঠায় এসে ঠেকেছিল! ভাগ্যিস বৃষ্টি নামে নি।

একত্রিশে ডিসেম্বরের মেঘহীন নির্লিপ্ত অপরিমেয় নীল আকাশের মধ্যে কোথাও এতটুকু গ্লানির চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না! রৌদ্রকরোজ্জ্বল শীত-জর্জ্জর পৌষালী প্রভাত? প্রচণ্ডতা স্বত্বেও শীতটা বেশ উপভোগ্য ও

আরামদায়ক ছিল ! বেশ একটু রোমাঞ্চকর অনুভূতি ! তাছাড়া সুদৃশ্য তোরণ-সজ্জা ও বেঙ্গলী ক্লাবের বিরাট প্রকোষ্ঠের দেয়ালগুলিতে সুচারু শিল্প-নিপুণতার ছাপ বাঙ্গালীরই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। মেঘদূত কাব্য ও বাঙলার গ্রামীণ জীবনের চিত্রাঙ্কণে যে সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল তা এ সম্মেলনেরই উপযুক্ত বটে ! সার্থক শিল্পী !

অধিবেশন উদ্বোধন কর্লেন উত্তর প্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ। মুখ্যমন্ত্রীরূপে প্রকাণ্ড জনসভায় এই তাঁর প্রথম অভিভাষণ ! সেটাও উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণানন্দজী বহুদিন বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন এবং বাংলাভাষা জানেন। রবীন্দ্রনাথ,. বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের বইও তিনি পড়েছেন। সুতরাং তিনি এ কথা বলার ন্যায্য অধিকারী যে ভারতীয় জাতীয়তার উন্মাদনা সৃষ্টির কাজে বঙ্গ-সাহিত্য কতখানি কার্য্যকরী ছিল। তিনিও একই বর্ণমালায় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন, এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, চাই সহযোগিতা ! তাতে দুপক্ষেরই উন্নতি। প্রায় দু'শ বাংলা ও হিন্দী সাময়িকপত্রপত্রিকাটির প্রদর্শনী উদ্বোধন কর্লেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী। তিনিও ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলার নেতৃত্বের কথা স্বীকার কর্তে বাধ্য হ'লেন। সবদিক দিয়ে বাঙলার অতীত যে কত ঐতিহ্যমণ্ডিত ছিল অন্য প্রদেশবাসীর চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত না হ'লে সম্যক জানা যায় না। আর ভবিষ্যৎ ?—কে জানে, সে ত আমাদেরই হাতে !

মধ্যাহ্নে মূল অধিবেশনের সভাপতিত্ব করলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়। অদ্ভুত আশাবাদী তিনি। সুন্দর গঠন-ভঙ্গীতে তিনি জানালেন সেই আশারই কথা যে—বাঙলা বিভক্ত, বাঙালী জীবন বিপর্য্যস্ত, বাঙালীর ক্ষয়-ক্ষতি অতুলনীয়, তবুও বাঙালীর বর্ত্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, ভবিষ্যতেরও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। এই বিপর্য্যস্ত ও ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জীবন থেকেই নূতন চেতনার সঞ্চার হচ্ছে ও হবে। তিনি বাঙলা সাহিত্যে বঙ্গেতর বৃহৎ ভারতবর্ষের ছায়াপাতের দ্বারা সাহিত্যকে পুষ্টতর করে তুল্তে সাহিত্যকদের কাছে আবেদন জানালেন।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অসুস্থতার জন্যে হাজির হ'তে পারেন নি। তাঁর প্রেরিত অভিভাষণটি সভায় পঠিত হ'ল। তাঁর মতে—'মানুষই সাহিত্যের উপজীব্য। তাই সাহিত্যে মানুষের আনাগোনা। কাছের মানুষ, দূরের মানুষ, কিন্তু সব সময়েই আজকের মানুষ। যা সম্যকরূপে আছে তাইতো সমাজ। ওদেরও মধ্যে রয়েছে যে মহতের সত্ত্বা, বৃহতের আয়তন, উল্লেখ করতে হবে সেই বিচিত্রবাণী। কুণ্ঠিত পরিধির মধ্যে বিকৃত করে দেখার অমর্য্যাদা থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সে যে বিরাটের প্রতিনিধি, তার জীবনের বৃত্তবলয় যে বৃহত্তর হবার সম্ভাবনা রাখে—শোনাতে হবে সেই দৈববাক্য। তার শুধু বাঁচবার অধিকার এটুকু ব'লে থামলেই চল্‌বে না, বল্‌তে হবে তোমার অমৃতের অধিকার।' তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন নূতন যুগের নবীন সাহিত্য-শিল্পীদের নবতর জীবন-শিল্পের রূপায়নে। মানুষকেই যে তিনি তাঁর সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, তার প্রতি প্রণতি জানিয়েই তিনি বলেছেন—'তাই বলি মানুষকে প্রণাম, যে মানুষ সাহিত্যের উপজীব্য তাকে। যে মানুষ সাহিত্যের রচয়িতা তাকেও।'

এর পরে আধুনিক সাহিত্যের ধারা নিয়ে যে আলোচনা হ'ল নানাদিক দিয়ে তা উপভোগ্য ! অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ বসু, শ্রীননী ভৌমিক প্রভৃতি এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। মূল সভাপতি মহাশয় আলোচনার শেষে জানালেন, সাহিত্যে সত্য-শিব ও সুন্দরের সাধনা কথাটা নতুন সৃষ্টি ! সুন্দর কথাটা নিয়ে মতদ্বৈধতাই, এ বিতর্কের সমাধানের পক্ষে বাধা ! সাহিত্য মানেই সুন্দরের সাধনা এ কথাটাও অবশ্য স্বীকার ক'রে নিতে বাধে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে !

ট্রামে-বাসে 'লেডিজ্ সীটে'র মত সাহিত্য-সম্মেলনে মহিলা-শাখার অন্তর্ভুক্তি তখনই শোভন হত যখন এটা শুধু মহিলাদেরই সভা হ'ত ! মহিলাদের সমস্যাও এখন সার্ব্বজনীন সমস্যা ; সামাজিক জীবনে যাঁরা [illegible] ভেদ রাখতে চান্ না, সাহিত্যে রেখেছেন কি করে ?

যাই হোক্, 'মহিলা'-শাখার সভানেত্রী শ্রীপুষ্পময়ী বসু ভারী সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন। নারীর কোন্ আদর্শ আজের মানুষ গ্রহণ কর্বে এই কঠিন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কেউ বলেন সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, কেউ বা রুশ-চীনের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেন। কিন্তু না, আমাদের আদর্শকে আমরা পাবো। আমাদের মাটির বুকে, তার স্বাভাবিক গতিধারার মধ্যে ইতিহাসের নিয়মে।

এর আগের অধিবেশন ছিল 'সমাজ ও সংস্কৃতি' শাখার। সভাপতি শ্রীগোপাল হালদার। তিনি মন্তব্য করলেন, এতদিনের সংস্কৃতি [illegible] পরাহত জাতির জীবনকুণ্ঠা, তার মূল-নীতিটা ছিল অধ্যাত্মবাদ ! এখন বিংশ শতকে অতীত যুগের জীবনকুণ্ঠা পরিহার করে সুস্থ ও বীর্য্যবান জীবন-নিষ্ঠা দ্বারা সমাজ ও সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

এবারের সম্মেলনের এই বাস্তবতার নীতি-বোধটাই বোধকরি মূল সুর। জীবনের কথা, আশার কথা যেখানেই উচ্চারিত হয়েছে, সেখানেই স্পষ্ট হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে এই বাস্তব-বোধ, বাস্তব জীবন-দর্শন।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীঅমৃতলাল নাগর মহাশয় বিখ্যাত হিন্দী লেখক। তিনি বহু ভাষাবিদ্। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিষ্কার ভাবে ভারী সুন্দর ক'রে হিন্দীতে জানালেন বাংলা সাহিত্য কিভাবে অন্য ভারতীয় সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই শাখা-অধিবেশনে মূল সভাপতি মহাশয়ের আমন্ত্রণে যখন বিচিত্র পোষাক-পরিহিত শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ মশাই কুণ্ঠিতভাবে তাঁর 'ইণ্ডিয়ানা' কাগজের মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের 'বিব্লিওগ্রাফী' রচনার প্রচেষ্টার কথা জানালেন, তখন অনেকেই তাঁকে চিন্‌তে পারেন নি। তাই নীহারবাবু যখন তাঁর পরিচয়ে জানালেন যে ভারতে এ গবেষণার তিনিই প্রথম উদ্ভাবক ও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে অক্লান্তভাবে এর সাধনা করে যাচ্ছেন, তখন সকলেই বিস্মিত হলেন, বোধকরি সকলের মনও শ্রদ্ধাভরে আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌ল এই শীর্ণ বৃদ্ধ গুহ মশাইয়ের প্রতি।

কোন্ অধিবেশনটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে এ প্রশ্ন আমায় করলে

আমি সহজভাবেই বলব সঙ্গীত-শাখার অধিবেশন। সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেমন সহজ ভাষায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে এই বক্তৃতাটি দিয়েছেন, তেমনি সুরের ব্যাখ্যায় মিঠে তান ছড়িয়েছেন গায়ক শ্রীনির্ম্মলেন্দু চৌধুরী। ভারী জমাট অধিবেশন হয়েছিল এটা।

শেষের দিনের সুরুতে দর্শন ও ইতিহাস শাখা। এই শাখাদ্বয়ের সভাপতি শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই ডাঃ রায়ের শিক্ষক। তাই, এই দুইটি শাখার অধিবেশনকালে নীহারবাবু মূল সভাপতির আসন পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এ দৃষ্টান্ত আধুনিককালে অনুধাবনীয় হ'য়ে থাকবে।

দুপুরে ছিল সম্মেলনের শেষ অধিবেশন শিশু-সাহিত্য। ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিদের মধ্যে ফেরার সুর বেজেছে, অনেকেই ফিরছেন। অনেকেই রাতে ফিরবেন তাই শহরটা ঘুরতে বেরোলেন, আবার অনেকে শিশু-সাহিত্য শাখায় যোগ দেওয়াটা নিছক ছেলেমানুষী মনে করে ক্যাম্পের মাঠেই চেয়ার টেনে রোদ পোয়াতে বস্‌লেন। অধিবেশনের জনসংখ্যাও অনেক কম হ'ল। এ শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি যেভাবে তাঁর দীর্ঘ উনত্রিশ পৃষ্ঠা বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে পড়তে লাগ্‌লেন, এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে পুরো দেড়টি ঘণ্টা কাটালেন তাতে অনেকেই অস্বস্তিবোধ কত্তে লাগলেন। অস্বস্তিবোধটা আগেও ছিল, কারণ অনেকেই শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে একজন পক্বকেশ বৃদ্ধ-শিশুকেই আশা করেছিলেন, কোট-প্যাণ্ট-পরা একজন যুবককে নয়। দেবীবাবু তাঁর বক্তৃতায় জানালেন যে শিশু-সাহিত্য দেশের ভবিষ্যৎ মূর্ত্তিটিকে গড়ে তোলার একটি হাতিয়ার এবং সেইজন্য মনে রাখা দরকার বইটা পণ্য হ'লেও সাহিত্যটা পণ্য নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন।

কিন্তু এর আগেও যা বলেছি, এখনও তার পুনরাবৃত্তি করব যে শুধুমাত্র সভাপতির বক্তৃতাতেই একটা অধিবেশনের পূর্ণতা আসে না। চাই নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে নানা মত-প্রচারের সুযোগ। সেজন্য অধিবেশনের সময়কাল যদি বা বাড়ানো সম্ভব না হয়, সভাপতি মশায়ের বক্তৃতাটি অন্ততঃ একটা সময়ের সীমাবদ্ধ করা উচিত। বহু জ্ঞানী, গুণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিও সম্মেলনে সমাগত হন। তাঁদেরও মত ও চিন্তাধারার সঙ্গে যাতে সকলে পরিচিত হ'তে পারেন সে ব্যবস্থাও করা উচিত। তেমন কোন আয়োজন নেই ব'লে প্রায় ক্ষেত্রেই সময়ের অভাবে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হ'তে পারে না। তাই, আগামী সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে এই অনুরোধই জানাবো যে প্রতিটি শাখা-অধিবেশনের সময়কাল কিছুটা সভাপতির বক্তৃতার ও কিছুটা প্রবন্ধ পাঠ বা সমাগত কারো বক্তৃতার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে যেন রাখা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনকালে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরাধাকমল মুখার্জ্জী যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর সমাপ্তিভাষণ পর্য্যন্ত তা অক্ষুণ্ণই ছিল। যত গোল বাঁধল সমস্ত অধিবেশন-শেষে সম্মেলনের সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে। এ তিনদিনের মিলন-উৎসব ও অন্তরের প্রীতি-বিনিময়ের অভ্যন্তরে যে কতটা ক্লেদ ও গ্লানি জমা ছিল তার সম্যক পরিচয় মিলল সম্মেলনের কর্ম্ম-কর্ত্তা-নির্ব্বাচন পর্ব্বে! চেঁচামেচি, হৈ চৈ, তর্ক-বিতর্ক, রেষারেষি—একদিন যেগুলো বিষয়-নির্ব্বাচনী কমিটির বৈঠকগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ প্রকাশ্য অধিবেশনে আত্মপ্রকাশ ক'রে এক পূতি-গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি করল! দেশ-বিদেশ থেকে আমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান যে এক অপূর্ব্ব আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত হ'তে এখানে একসঙ্গে মিলেছি, সেটা যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ফোর্থ-ক্লাশের সিনেমা-দর্শকরা পাড়ার চায়ের দোকানে একটা ক্লাব গড়ে যেন তার মিটিং করছে! আবরণের ভেতর আমাদের যে কত নগ্নতা ছিল তার তুলনা হয় না। মনে হল, একদল বিশেষ রাজ-

অটোগ্রাফ-দানরত ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—পাশে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ফটো—অরুণ মিত্র

নৈতিক প্রতিষ্ঠান এই সম্মেলনটিকে করায়ত্ত করতে কোমর বেঁধে এসেছে। তাদের গলার জোর আছে, যুক্তির বাহাদুরী আছে, আত্মমর্য্যাদা ও লজ্জাকে তুচ্ছ করার কৌশলও জানা আছে! শুধু তাই নয়, বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে মনোনীত সম্পাদককে পর্য্যন্ত তারা হৈ-হল্লা ও চেঁচামেচি ক'রে বদলে নতুন সম্পাদক নির্ব্বাচিত কর্লেন! এটা কতখানি গঠনতন্ত্র-সম্মত হয়েছে, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিলন-উৎসবের শেষে বিচ্ছেদের করুণ সুরটা ছিঁড়ে খান্ খান্ হ'য়ে সবকিছুই বেসুরো করে দিলে।

এবারের সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণা-

নন্দের অনুমোদনক্রমে উত্তর প্রদেশে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের পথে যে সমস্ত বাধা রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য! এই কমিটি-নির্ব্বাচনেও যে বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হ'ল তাতে সম্মেলনের ঐতিহ্য যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে একথা বলা যায়। কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচনেও একটি বিশেষ দলের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিল! অনুপস্থিত সভ্যও সে সমিতিতে স্থান পেল! কাণ্ডকারখানা দেখে পাশের এক বয়োবৃদ্ধ প্রাচীন প্রতিনিধি সম্মেলনে ভাঙনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁর গভীর সন্দেহের কথা কানে এল। দেখে শুনে মনে হ'ল ঐ বিশেষ দলটি এই পবিত্র সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনীতির ক্লেদাক্ত পোষাক পরাতে চায়! এটা খুবই অন্যায় ও অশোভন! সমস্ত সদস্যের এ বিষয়ে গভীরভাবে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য, যাতে ঐ স্বার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন দলটির হাতে সম্মেলনের আভিজাত্য না ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রত্যেক অধিবেশনের সুরু ও শেষে গান হওয়া ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। কিন্তু লক্ষ্ণৌএ সম্মেলন হওয়ার কথা শুনে যারা অন্ততঃ গান বাজনার দিকটায় জোরদার কিছু পাবার আশা করেছিলেন, তাঁরা রীতিমত হতাশ হয়েছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যেও এমন কিছুই ছিল না যা সর্ব্বভারতীয় এই সম্মেলনে পরিবেশনের উপযুক্ত! তবু তাহার মধ্যে গণ-নাট্য-সঙ্ঘের 'রাণার মিত্র, শম্ভু মহারাজের কথক নৃত্যের আঙ্গিক প্রদর্শন, জি, এন, গোস্বামী বেহালা, মুন্নে খাঁর তবলা এবং জুবিলি গার্লস্ স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের একটি সমবেত নৃত্য উল্লেখযোগ্য! এঁরা আরো অনেক কিছু করতে পারতেন, অনেক কিছু করার অবকাশও ছিল, কিন্তু আত্মকলহের পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয় কিছু না-করার মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে! তাই, যাঁরা আগের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সদাহাস্যময় শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্ন্যালের অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

ঠাস্-বুনোন অধিবেশনের মধ্যে শহর দেখার কোন ফুরসৎ ছিল না। গেলে এদিকে ফাঁকি পড়তে হয়। নেহাৎ আমার থাকাটা কিছু বিলম্বিত ছিল ব'লে কোন অধিবেশনই আমার ফাঁক পড়ে নি। তবু ওখানের কর্ম্মকর্ত্তাদের উচিৎ ছিল একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে সকলকে দ্রষ্টব্য জিনিষগুলো দেখাবার আয়োজন করা! যেটা অন্য সমস্ত সম্মেলনেই প্রায় ছিল।

'গতস্য শোচনাঃ নাস্তি' হিসেবে ক্রটির উল্লেখ বেশী না করাই ভাল কিন্তু যেটুকু না করলে নয় তা এই যে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়নের বিশেষ অভাব দেখা গেছে। কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব তাঁরা আমাদের যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাই যথেষ্ট যেন! তাঁদের কর্ত্তব্য শুধু সভাপতিদের সুখ-সুবিধে দেখেই শেষ হয়ে গেল। এ অনুযোগ অনেকের কাছ থেকেই শুনলুম! তাঁরা সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি এ ধরণের অনাত্মীয় ব্যবহারে। তাছাড়া আহারাদির ব্যবস্থায়ও ক্রটির শেষ ছিল না। অনেকেই উদর-পূর্ত্তির পূর্ব্বেই উঠে আসতে দেখা গেছে। আহার্য্য সামগ্রাও সব সময় পুরোপুরি থাকে নি।

'কন্‌ডাক্‌টেড্ টুর' ছাড়াও প্রতিনিধিদল যে সরকারের কাছ থেকে একটা আমন্ত্রণ পায় সেটার আভাস না পেয়ে অনেকে বিস্মিত হয়েছেন।

তবু যা পাওয়া গেল তাই বা কম কি! এতগুলো মানুষের সঙ্গে মিলনের যে সুযোগ, তার দাম কে দেবে?

এবারের সম্মেলনে একটা জিনিষ বিশেষভাবে চোখে লাগ্‌লে যে সাহিত্য-সভার অধিবেশনে সাধারণ প্রতিনিধিরা ত বটেই; অনেক নাম-করা কবি-সাহিত্যিকদেরও পুরোমাত্রায় বিজাতীয় পোষাক-ব্যবহার! অবশ্য লক্ষ্ণৌ এর বাঙালীদের মধ্যে বাঙালী-পোষাক বোধ হয় একটাও দেখিনি।

আরো একটা জিনিষ। সম্মেলনটা বাঙালীর হ'লেও কিছু স্থানীয় অবাঙালী অধিবাসীদেরও আমরা আশা করেছিলুম। কিন্তু বোধহয় উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই আমাদের সে আশা মেটে নি।

যাক্, লক্ষ্ণৌর সম্মেলন শেষ হ'ল বেশ সমারোহের সঙ্গেই। পরদিনের সম্মিলিত ক্লাবের তরফ থেকে প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা-সভায় যোগ অর্থাৎ কিছু একটা তবু হ'য়েছে প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনার!

একে একে সবাই চলে গেলেও আমি কদিন রয়ে গেছলুম সারা শহরটা ভাল করে দেখতে। ভালই লাগ্‌ল। যা দেখেছি আগেই বলেছি। তাছাড়া যা আরো মনে রাখার মত তা হ'ল ভাতখণ্ডের সঙ্গীত-বিদ্যালয়, মিউজিয়মের ৩০০০ বছরের মিশরের 'মমি', 'জু এ উন্মুক্ত সিংহ, আর ওখানের অধিবাসীদের ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার।

আস্‌ছে বছরের অধিবেশন স্থল নির্ব্বাচিত হয়নি। তবু যখন শ্রীদেবেশ দাশ মশাই সভাপতি আছেন, উপযুক্ত স্থানেই সম্মেলনের আশা কচ্ছি, আর প্রার্থনা কচ্ছি ভারতবর্ষের বাঙালীর সেই মহামিলনতীর্থে সমস্ত পুরোনো ভেদ-বিভেদ দূর হয়ে—

'বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!'

শিকারী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা-রাজ)

দু' মাসের ওপর খুদরাহি ব্লকের ডাক-বাংলোয় পড়ে আছি। মাত্র দু'দিন শিকার পাওয়া গেছে। এখন সকলের উঠি উঠি মনোভাব—শুধু আমি ছাড়া। বন্দুক নিয়ে বন জঙ্গলে বেপরোয়া ঘোরাফেরা আর ব্যর্থমনোরথ হয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে এসে শয্যায় লুটিয়ে পড়া—এই ছিল আমার প্রাত্যহিক কাজ। তার ফাঁকে ফাঁকে, কখনও বা ওস্তাদজীর খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ সঙ্গত করি, কখনও বা কবিতা গল্প লিখি, ওস্তাদজীর সঙ্গে কখনও দাবার ছক পেতে অনাবশ্যক চিন্তায় ডুবে যাই, আর কখনও বা ছেলেপিলেদের মত ক্যারম খেলেই সন্ধ্যা কাটাই।

কেউ ধরে বসলে কোনওদিন বা কোথায় কী শিকার করেছি তার গল্প জুড়ে দি। কতরকমের হরিণ যে মেরেছি তার ঠিকানা নেই। পুরীতে spotted deer, বিহারে আর মধ্যপ্রদেশের ঘন জঙ্গলে সম্বর, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ অংশে বারশিংগা (Swamp deer)—উত্তর-প্রদেশের অযোধ্যার কাছাকাছি জঙ্গলেও মেরেছিলাম কয়েকটা এই জাতীয় হরিণ। বারশিংগা জাতীয় হরিণের ডাল পালায় সাজানো শিংগুলো দেখতে খুব সুন্দর। নীলগাই হ'চ্ছে antelope জাতীয় হরিণের মধ্যে সব চাইতে বড়—প্রায় সব জায়গায়ই দেখা যায়—কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ওদের মারা নিষেধ। হরিণের কথায় যেন একটা থিসিস্ হয়ে যায়। Mouse deer সবচেয়ে ছোট হরিণ—তার চেয়ে কিছুটা বড় চৌশিংগা—তারও বড় চিংকারা—এবং কোথায় কোথায় মেরেছি—সব একে একে বলে যাই। তবে Barking deer মারতে গিয়ে প্রথমবার যে ভীষণ চমক লেগেছিল—সে কথাও বল্লাম। ছোট্ট হরিণ—দেখতে ভারী চমৎকার—কী সুন্দর মিষ্টি টানাটানা স্বপ্ন মাখানো চোখ—পেছনের দিকটা একটু ভারী—বেশ নাদুস্ নাদুস্—নেচে নেচে চলে—শুনেছিলাম মাংস নাকি চমৎকার—খেতে খুব ভাল।

দু'পাশে জঙ্গল—মাঝখান দিয়ে একফালি ফাঁকা জায়গা বোধহয় জল বয়ে যাবার জন্যে—আমি জঙ্গলের মধ্যে আড়াল দিয়ে বসে আছি—সামনের হরিণটা গুটি গুটি পা' ফেলে এগিয়ে আসে আর সচকিত দৃষ্টিতে গ্রীবা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চায়। সর্ব্বজাতীয় হরিণদের স্বভাবই হচ্ছে—সব সময় চঞ্চল করে এদিক ওদিক তাকানো—কী জানি কখন কোন্ হিংস্র জানোয়ারের কবলে পড়ে।

সুযোগ বুঝে গুলী করতেই সেটা পড়ে গেল—কিন্তু ঠিক তার পরই যে একটা আওয়াজ শুনলাম—তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মাদী হরিণটা কাছেই ছিল—সঙ্গীর বিরহে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে উঠেছে। Barking deer-এর ডাক দু' মাইল দূর থেকেও বেশ শোনা যায়।

কৃষ্ণসার হরিণ ফাঁকা মাঠে চরে বেড়ায়, তাই তাদের মারা খুব কঠিন—কারণ দূর থেকে তারা দেখ্‌তে পায়।

যখনই জঙ্গলের মধ্যে Barking deer-এর অদ্ভুত চীৎকার, ময়ূরের গলা ফাটানো একটা অস্বাভাবিক ডাক, বা ফেউ ডাকার আওয়াজ পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে হবে কাছেভিতে কোথাও কোনও একটা হিংস্র জানোয়ার বিরাজ করছেন। হনুমানের বেলায়ও তাই। তখন আর তাদের "হুপ্ হুপ্" শব্দ শোনা যায় না—একটা বিকৃত "খক্ খক্" শব্দ করে তারা বিপদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। ঐ রকম পরিস্থিতিতে আমিও একবার একটা বাঘ মেরেছিলাম। শিকারীর পক্ষে এ একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন—তাই এরকমটা কিছু শুনতে পেলেই তাকে বিশেষ সাবধান হতে হয়।

বনে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হায়েনার পৈশাচিক অট্টহাসি—যাকে বলে "Hiyena Laugh" শুনতে পেয়েছি। হায়েনাও বাঘ জাতীয়—সামনের পা' দুটো ছোট—পেছনের দুটো বড়—মুখটা ছুঁচ্‌লো ধরণের। ওরা হ'ল জঙ্গলের ঝাড়ুদার। অন্যান্য জানোয়ার যখন শিকার খেয়ে চলে যায়, যে সব হাড়গোড় পড়ে থাকে, সে যতই মোটা হোক না কেন—সেগুলি ওরা অবলীলা-ক্রমে চিবিয়ে খায়। ভীষণ হিংস্র জানোয়ার—সুবিধে পেলেই ছেলেমেয়েদের এক লহমায় উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় হায়েনাও শিকার করেছি আমি।

কখনও বা শুনেছি, গভীর রাতে, থেকে থেকে শকুনের ডাক—যেন ছোট ছেলে ঘুম ভেঙ্গে উঠে নিদ্রিতা জননীর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে।

একবার সাপের হাত থেকে কেমন করে বেঁচে গিয়েছিলাম—সে কথাও তাদের বলি।

পুরীর কাছেই পাটনাকীয়া জঙ্গলে গোটা দিনমান শিকার না পেয়ে বিষণ্ণ মনে ফিরে আসছি—নিজের ক্যাম্পে; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। তাড়াতাড়ি চল্‌তে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। উপরে নজর পড়্‌তেই দেখি, পাশের একটা গাছের ডালে আমার মাথার উপরেই দোদুল্যমান একটি মোটা হলদে রংএর কালো ডোরাকাটা সাপ। যদি আমার এই আকস্মিক পদস্খলন না হোত' তাহ'লে, সাপটা কামড় দিলেই আর দেখতে হোত' না—আমারও বনে বনে শিকারের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর সখ জন্মের মত মিটে যেত! ক্রুদ্ধ আক্রোশে, উদ্যত ফণা তুলে সাপটা ফোঁস ফোঁস করছে—তার দুই চোখে যেন কী একটা সম্মোহন আর আগুন ছড়ানো!

বন্দুকে 3 S G Shot ভরাই ছিল—ওই অবস্থায় চিত্ হয়েই

'সট্' করলাম—মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অগ্রদূত সেই বিষধর সর্পটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

বিষাক্ত সাপের হাত থেকে আরও একবার কি রকম দৈবী রক্ষা পেয়েছিলাম—সে কথা মনে হ'লে আজও গা' শিউরে ওঠে।

লালগোলায় একবার শিকার থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে রাত দশটায় শুতে যাচ্ছি। দোতলার শোবার ঘরে যেতে হ'লে, একটা লম্বা, টানা বারান্দা পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ পায়ে ঠাণ্ডা লাগ্‌তেই, আলো-ছায়ার চিকিমিকিতে মনে হ'ল যেন সাপজাতীয় কিছু। আমার চীৎকার শুনে বাড়ীর সবাই ছুটে এসে বৈদ্যুতিক আলো জালিয়ে দিতেই দেখ্‌লাম, একটা কেউটে সাপ তার লেজ দিয়ে আমার পা'টা জড়িয়ে ধরেছে—কিন্তু তার মাথাটা আমার জুতোর তলায় চাপা পড়ায়, সে আর ছোবল দেবার সুবিধে পায় নি। কি জানি কেন, আমি সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম—ভাগ্যিস্ পা' তুলি নি। লেজের ডগায় পা পড়্‌লেই হ'য়েছিল আর কি!

সবাই মিলে সাপটাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিলে—মাথাটা তখনও আমার পায়ের তলায়—এ যেন কালীয় দমনের দ্বিতীয় সংস্করণ! তার পর সুরু হ'ল সুনিপুণ হস্তের অস্ত্রোপচার—ফলে লেজের অংশটুকু টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ভাবলাম—অন্দর মহলের দোতলায় সাপ এল কেমন করে? মনে পড়ে গেল—লখীন্দর বেহুলার কথা—অমন সুরক্ষিত লৌহদুর্গেও ত কৈ নিয়তির ব্যতিক্রম হয় নি।

আর একবার কাশ্মীরে গিয়ে কী বিপদ্! কাশ্মীর ষ্টেটে যেতে হলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট নিতে হয়—এটা শুনেছিলাম। ইচ্ছে ছিল শ্রীনগর যাব—আসবার পথে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে "খাইবার পাস্" "বোলান্ পাস্"টাও ঘুরে আসব। তাই আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এ ডি সাহেবের কাছ থেকে জেনারেল সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম। তাতেও নিস্তার নেই—সে সময় বন্দুকের জন্য—কাশ্মীর ষ্টেটে নাকি আলাদা লাইসেন্স নিতে হয়—সেটা জানা ছিল না। তাই কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের মুখেই নগদ মূল্য ২৫৲ টাকা দিয়ে সেটা করে নিলাম।

কল্‌কাতা থেকে বেরিয়েছি চার দিন হ'ল—যাব শ্রীনগরে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মোটরে চলেছি—পথে ব্যারামুলা থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত সোজা পথ। পাশের গাছপালাগুলো যেন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। হঠাৎ রেডিয়েটারে জল নেবার জন্য সোফার মোটর থামিয়ে দিলে। দেখি পাশেই ঝিলে এক ঝাঁক বন্য হাঁস কিল্‌বিল্ করছে। চার দিনের পথের ক্লান্তি যেন কোথায় চলে গেল। তখুনি নেমে আওয়াজ করেছি কি কাশ্মীর ষ্টেটের দুজন পুলিশ এসে আমাকে হাতকড়া দেবার যোগাড়। আমি ত' অবাক—"অপরাধী জানিল না কিবা দোষ তার—" জিজ্ঞেস করে জান্‌লাম—প্রথম—আমার কাশ্মীর ষ্টেটের লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে কিনা—দ্বিতীয়—এটা রিজার্ভ ঝিল—এ সময়ে পক্ষী শিকার নিষেধ।

প্রথমটার প্রমাণ দেখিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলাম—

—আমি জানি না এটা রিজার্ভ ঝিল। যা' হোক—সেখানেও বেশ মোটা রকমের আক্কেল সেলামী দিয়ে অব্যাহতি পেলাম। তাদের প্রাণটা তখন এত খুসী যে তারাই পাখীগুলোকে কুড়িয়ে এনে মোটরে তুলে দিলে। তার মধ্যেও একটা আবার নজর দিতে হ'ল।

শ্রীনগরেই একবার আমরা ভালুক শিকারে গিয়েছিলাম। সে বড় মজার কথা। আমাকে শিকারী জেনে একজন আমার পেছন লাগ্‌লো—"আমি ভালুক দেখিয়ে দেব—পঁচিশ টাকা দিতে হবে—মারতে পারুন আর নাই পারুন।"

আমি বল্লাম—"না বাপু, আগে পাশ নিতে হবে কিনা সেটা জেনে নিই—"

উত্তর এলো—আমরা হরদম শিকারীদের নিয়ে যাই—আমরা জানি না?

যা হোক, শ্রীনগর থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলটার নাম ঠিক মনে নেই—সে আজ প্রায় একত্রিশ বছর আগের কথা—

তারা এধার ওধার ঘুরিয়ে—সন্ধ্যার মুখে, বেশ কিছুটা দূরে একটা ভালুক দেখিয়েই—হাত বাড়ালে। আমি বন্দুক ওঠাতেই—সে নলটা চেপে নামিয়ে বল্লে—"আগে টাকাটা দিন—"

—আঃ পালিয়ে যাবে যে—এ সময়—

—না, শেঠজী—আগে পঁচিশ টাকা—

পকেটে টাকাটা আলাদাই রাখা ছিল। তৎক্ষণাৎ তার হাতে দিয়ে বন্দুক তুলেই "ধাঁ"—। ভালুকটা পড়ে গেল।

সোল্লাসে ছুটে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি—একটা Stuff করা ভালুক—জঙ্গলের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে রেখেছে যে দূর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই।

পেছনে তাকিয়ে দেখি Guide হাওয়া।

আচ্ছা বোকা বানিয়ে দিলে যাহোক্। Ist. April হলেও না হয় মেনে নিতাম। যাক্ শরীরের ক্লান্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ সব কিছুই হ'ল—অতঃপর সদীর্ঘনিঃশ্বাসে হাউস্ বোটে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন। এও একটা নূতন রকমের অভিজ্ঞতা হ'ল বৈকি। এই গালে চড় মেরে ঠকিয়ে নেওয়ার কথাটা এতদিন গোপন রেখেছিলাম—কাউকে বলি নি!

এই সব শিকারের নানান্ কথায় সময়টা গুজরান হয়। শিকার না পাওয়া গেলেও শিকারের গল্পে দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটে। আর যে সব বন্ধু আমার সঙ্গী হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে তিন জনই "বাড়ীমুখো বাঙালী" হয়েছে—বাধা দেবার উপায় নেই—কে আর বিদেশ বিভুঁয়ে আমার মত ছন্নছাড়া জীবন কাটাবে?

বন জঙ্গল আমার বড় ভাল লাগে। একটা যেন সহজাত আকর্ষণ অনুভব করতাম। সহরে কী রকম একটা আড়ষ্ট ভাব—আমার মনের সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না। আমি বেশীর ভাগ শিকার নিয়েই মেতে থাকতাম—আর অবশিষ্ট সঙ্গীরা বাড়ী যাবার জন্যে মেতে উঠ্‌লো। একদিন ওস্তাদজী প্রকাশ্যেই বলে ফেল্‌লেন—

—অনেক দিন স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে এসেছি—একবারটী ছুটী পেলে —হেঁ—হেঁ—দিন কয়েকের জন্ত তাদের দেখে আসি।

আরও দু' একজন তাতে সায় দিলে। সকলের সেই একই কথা। আমি out-voted—ওস্তাদজীর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঠাট্টা করলাম—

—বুঝেছি! অনেক দিন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছেন, এই তো?—তা' বেশ। তবে যাবার আগে একবার "ফেন ব্লকে" হাতটা বুলিয়ে যেতে হবেই! কালই সেদিকে যাবার কথা আছে। তার পরই ওঠা যাবে, কী বলেন? দেখ্‌লাম, বাড়ী যাবার নামে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

পরদিন ভোর রাত্রে যথারীতি সাজসরঞ্জাম নিয়ে রওনা হলাম—Phen Block-এ—প্রায় ষোল মাইল দূরে। সঙ্গে সেই গোঁড় জাতীয় সর্দ্দার—আমার অরণ্যবাসের একমাত্র সহচর—সহায়ও বল্‌তে পারেন।

এবার ওস্তাদজীকে একরকম টেনে হিঁচড়েই মোটরে ওঠানো গেল।

—চলুন, ওস্তাদজী, এবার বিদায় সঙ্গীত গাইতে হবে।

—বাড়ী যাব বলে তানপুরো যে বাঁধাছাঁদা হয়ে গ্যাছে!

—আরে, জীবন্ত তানপুরোই চলুকনা—ওতেই পুরো তান উঠ্‌বে।

ওস্তাদজী চকিতে তাঁর স্ফীত উদরের দিকে একবার তাকিয়েই গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন।

ওস্তাদজী রঙ্গ-প্রিয়। নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌লেন—শুধু এই তানপুরো নিয়ে কী হবে?—মৃদঙ্গ কই?

—তান ও তালের ঠোকাঠুকিটা আপাততঃ মোটরের সীটেই চালিয়ে নেন। আচ্ছা ওস্তাদজী—মৃদঙ্গ বলেন কেন? মৃৎ-অঙ্গ তো নয়—বরং কাষ্ঠাঙ্গ বল্‌তে পারেন। খোলকেই মৃদঙ্গ বলা উচিৎ নয় কী?

ওস্তাদজী বিজ্ঞ সমজদারের মত আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—

—পুরাকালে তাই ছিল। একদিন এক ওস্তাদী-যশঃপ্রার্থী—সাধনা করবার সময় বোল ঠিকমত না ওঠায় মৃদঙ্গ মাটিতে আছড়ে দিতেই ওটা আধাআধি দু'ভাগ হয়ে গেল—তবুও বোল উঠ্‌ছে দেখে আশ্চর্য হয়ে বল্লে—"অব্‌ ভি বোলা?"—সেই থেকেই নাম হ'ল তব্‌লা।

মোটর উড়ে চলে। আলোর কাছে অন্ধকার যখন বিদায় নিয়ে চলে যায়—সেই পরম সন্ধিক্ষণে নির্জ্জন বায়ুস্তর ভেদ করে তাঁরও কণ্ঠ ললিত-রাগে সুললিত হয়ে ওঠে। দেখলাম এবার আর মজ্‌লিসি গানের সেই ওস্তাদী ঢং নেই। সুরের কসরৎ আর মার-প্যাচেরও বালাই নেই। সহজ সরল গলা ছেড়ে তান বিস্তার করে চলেছেন। আমিও শিকারের চিন্তা এখনকার মত মুলতুবী রেখে বন্দুকের কুঁদোয় তাল দিয়ে চলি। শিকারে চল্‌তি পথেও গান—? মন্দ কী?

মনে পড়ে গেল একবার প্লেনে কাশী হয়ে যাব শিকারে। দমদম এয়ার পোর্টে দেখি শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার—পশ্চাতে এ কানন। তাঁরাও যাবেন Lucknow Music Conference-এ।

শ্রীমতী বিজন আমাকে প্রণাম করতেই বল্‌লাম—আজ তোমাদের সঙ্গটা কাজে লাগিয়ে দি'। মাটীর বুকে বসে অনেক গান শুনেছি—বন্যার জলে বজরা ভাসিয়ে কত সঙ্গত—ভরা ভাদরে কত তবলার লহরা চালিয়েছি—জল স্থল দুটোই হয়ে গেছে—ব্যোম পথটাই বা বাদ যায় কেন? এবার তোমরা গানের পাখায় আমাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চল।

তাই হ'ল; কিন্তু যে রকম পুষ্পক রথের ঘর্ঘর শব্দ!—অগত্যা আমার কানের কাছে মুখ এনে একবার বিজন খেয়াল জুড়ে দেয়—শেষ হতেই এ কাননের মিষ্টি গলার ঠুংরী—এই করেই সারা পথটা আমার সুরে সুরেই কেটে গেল। অন্যান্য আকাশ-যাত্রীর কৌতুকদৃষ্টি—এ রকম গান-পাগ্‌লা সঙ্গী হয়ত জীবনে তারা কখনও পায়নি। মিস্‌ মাউণ্টব্যাটেনও দিল্লী যাচ্ছেন—তাঁর ও অন্যান্য সাহেব মেমের চোখে কী রকম যেন একটা নির্ব্বাক বিস্ময়—ভাব্‌লে, বুঝি ভারতবর্ষে সব কিছুই সম্ভব!

যাক সে কথা—এদিকে গায়কের কথা ও সুর কিছুই বোধগম্য না হওয়ায় গোঁড় জাতীয় সর্দ্দারটি মাঝে মাঝে পেছন ফিরে বার বার অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

ওস্তাদজীর সুর আকাশে বাতাসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছিল—যেন উর্দ্ধে উঠে কোন্‌ নাম-না-জানার চরণে আছড়ে পড়ে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে—আর সেই সুরের ঝর্ণাধারায় স্নান করে যেন আমিও চলেছি—সেই অনাদি, অনন্ত সুরলোকের অভিযানে। এমন সময় গোঁড় সর্দ্দার টম্বু ওস্তাদজীর অপ্রতিহত ওঠানামা-সুরের লীলাভঙ্গীর মুখে "অনাঘাতে সোম" দিয়ে বস্‌ল—

—এখানে নাম্‌তে হবে, বাবুজী!

গায়কের সরসকণ্ঠ নীরস হয়ে উঠ্‌ল—

—আচ্ছা বেরসিক যা হোক্‌!

—তা' হ'লে এবার রুদ্ররসের পুজোয় নামা যাক—কী বলেন, ওস্তাদজী? আপনারা করেন সুন্দরের ধ্যান—আমরা কিন্তু বনে জঙ্গলে শিকারে এসেও তাকেই খুঁজে পেতে চাই—তবে ভঙ্গীটা একটু বীভৎস রসে মেশানো—এই যা!—আসুন ওস্তাদজী, আপনিও সঙ্গে আসুন!

তাঁর মনের ভাবটা—না গেলেই হ'ত ভাল—তবু করেন কি—অগত্যা নেমে পড়লেন—অনুরোধে ত' লোকে ঢেঁকিও গিলে থাকে।

আমি বন্দুকটা বগলে নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে চলি—সঙ্গে টম্বু। ওস্তাদজীও গুণ্‌ গুণ্‌ করে সুর ভেঁজে চরণের মৃদুভঙ্গে পেছনে আসেন।

—দয়া করে চুপ করুন। রাগ রাগিনী দিয়ে শিকারকে কুপোকাৎ করা যায় না—আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যেই আমাকে ওটা করতে দিন।

ওস্তাদজী একবার হাসলেন—একটুখানি কাশ্‌লেন তার পরই নীরব।

প্রায় আধ মাইল পেরিয়ে এসেছি। একটা উঁচু নীচু সবুজ মাঠ দেখা গেল। তার মাঝে কয়েকটা ছোট খাটো লতাগুল্মের জঙ্গল।

বেশ কিছুটা দূরে তিনটে হরিণ দেখা যেতেই থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে চেয়ে দেখি গায়কটির অন্তর্দ্ধান। কোথায় চম্পট দিলেন, সে কথা তখন চিন্তা করবার অবসর নেই। তাড়াতাড়ি একটা লতাগুল্মের অন্তরালে গা ঢাকা দিলাম—যাতে হরিণগুলো আমার আগমন বার্ত্তা টের না পায়। তার পরই যেমন ছ' সাত মাসের শিশুরা হামাগুড়ি দেয়—সেই যুগে ফিরে গেলাম।

খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি—মাঝে মাঝে ছোট খাটো ঝোপ থাকায় নিজেকে আড়াল করে রাখবারও বেশ সুবিধে হয়েছিল। এইভাবে কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে দম নেবার জন্যে শুয়ে পড়্‌লাম। সেই ঝোপ থেকে আরো একটু দূরে একটা ঝোপ পর্য্যন্ত বুকে হেঁটেই চলি। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখি হরিণের শিং দেখা যায়।

এ কী হলো? এত করেও কী নিজেকে লুকোতে পারা গেল না? শেষটায় একটা ঝোপের পাশে একটা গাছের তলায় একেবারেই সটান হ'লাম। দৃষ্টি থাক্‌লো—হরিণের শিংএর উপর। সে যে আমাকে দেখতে পাবে—এ সম্ভাবনা ছিল না—তবু যে কিছুটা সন্দেহ তাদের হয়েছে—তাই একপা' একপা' করে তারা এগিয়ে এল—সে বোধহয় ওদের স্বভাবজাত অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির জন্যে। ক্রমেই শিং দুটো আমার চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠে—গোটাটা দেখা যেতেই বুঝলাম এটা একটা Black Buck—বেশ কালো—মাফিক-সই পাক দেওয়া শিং দুটো ঊর্দ্ধে উঠেছে।

একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আমি খুব সন্তর্পণে, হাঁটু গেড়ে বসে গুলি-ভরা বন্দুকটা উঁচিয়েই দেখলাম—তবুও প্রায় সত্তর আশী গজ দূরে। দেখা আর গুলি-ছোঁড়া এক নিমেষেই হয়ে গেল। উঠে দেখি হরিণ তিনটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

তবে কী গুলি লাগ্‌লো না? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে আপনার ভারে বুঝি আবার মাটীতে পড়ে গেল।

সেই বিরাট প্রান্তরের এক কোণে অনেকগুলো গরু চরে বেড়াচ্ছিল। সমগোষ্ঠী না হলেও কাছাকাছি গরু আর হরিণ চরে বেড়ায় এটা আমি আগেও দেখেছি।

ও কী? সমস্ত গরুর পাল শিং নেড়ে যে আমার দিকেই ধেয়ে আসে। তবে কি ডুবিনু গোষ্পদে? মোটা গাছ—ধরে উঠবার যো নেই—গোঁড় সর্দ্দারকে দূরেই ফেলে এসেছি—গো-হত্যার ভয়ে গুলি করবারও উপায় ছিল না—মনটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ দেখি গরুগুলো চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। এ আবার কী?

ইতিমধ্যে গোঁড় সর্দ্দারও ছুটে আমার কাছে উপস্থিত হতেই ব'ল্লাম—

—হরিণকে মেরেছিলাম,—লাগে নি। কিন্তু গরুগুলো আমাকে তেড়ে আসতে গিয়ে এরকম ভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কেন? চল ত', একটু এগিয়ে দেখা যাক!

গোঁড় সর্দ্দার হৈ হৈ করাতে গরুগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার স্থানে চলে গেল। গিয়ে দেখ্‌লাম—একটি বৃহদাকার কৃষ্ণসার হরিণ ধরাশায়ী।

মনে পড়ে গেল একবার নৈনিতাল থেকে মোটরে যখন বেরেলীতে ফিরে আসি, পথে, বেরেলী থেকে মাইল দশেক দূরে, রাস্তার কিছুটা তফাতে বনের ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য—আর তাদের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে আর সব ময়ূর ময়ূরী সেই নাচের বিশিষ্ট দর্শক—ঠিক যেন মানুষেরই মত। সে দৃশ্য এখনও ভুলতে পারি নি। এর থেকেও বেশ বোঝা যায় মানুষও প্রকৃতিকে অনুকরণ করেই তার নিজের জীবন গড়ে তুলেছে।

বন্দুকের শব্দ পেয়ে গরুর রাখালরাও, কী শিকার হয়েছে দেখবার জন্যে ইতিমধ্যেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেখানে ভীড় জমিয়েছে।

গোঁড় সর্দ্দার নিজের ভাষায় তাদের বল্লে—

—তোরা এটাকে নিয়ে মোটরে তুলে দে—পয়সা পাবি।

তারাও সর্দ্দারের হুকুম তামিল করতে উঠে পড়ে লেগে গেল।

টম্বুর মাথায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস ক'ল্লাম—

এ কী রকম?—তিনটে হরিণ দেখেছিলাম—আর সেই তিনটেই ত' ছুটে গেল—আবার একটা ঘায়েল হ'ল কেমন করে—এ কী ভৌতিক কাণ্ড?

টম্বু টাকে হাত দিয়ে জবাব দিলে—চারটেই ছিল—একটা দলছাড়া হয়ে—দূরে—আপনি দেখতে পান নি—বন্দুকের শব্দ হতেই সব একজোট হয়ে ছুট দিয়েছে।

—তাই হবে—তোমাদের চিরাভ্যস্ত চোখ—শিকার দেখা এবং দেখিয়ে বেড়ানোই তোমাদের কাজ—তা ছাড়া আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই যে রকম একপাল গরুর আক্রমণ!—কিন্তু ওস্তাদজী গেল কোথায়? চল ত' একবার দেখি।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম—সেই পথেই সকলের পুনরাবর্ত্তন। কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল, একটা গাছতলায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদজী পদ্মাসনে বসে আছেন—নিমীলিত আঁখি—মুখে ভজন গান—দুই হাঁটুর কাপড় তুলে তার উপরই ডুগডুগি বাজিয়ে চলেছেন।

—কী ওস্তাদজী, মাঝপথেই কেটে পড়্‌লেন যে?

—আপনি তো হাঁটেন না, দৌড় দেন—আমি পেরে উঠ্‌বো কেন? —তাছাড়া, বিড়িটিড়ি না খেলে, জানেনই তো পেটটা কেমন ফেঁপে ওঠে।

পেছনে বয়ে নিয়ে আসা হরিণটাকে দেখিয়ে ব'ল্লাম—

—তাই বুঝি পেটের ফাঁপ গলায় তুলে ভজন জুড়ে দিলেন? আচ্ছা, বলুন তো, আপনাদের দীপক রাগের কোন্ মূর্চ্ছনায় এটা চির মূর্চ্ছিত হ'ল?

ওস্তাদজী তার নিজস্ব কানদুটিকে বিমর্দ্দন করে, আমার কথাটা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার অপরাধে যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন—

—রাগরাগিণী নিয়ে রসিকতা করে না—জানেন—মহাকালের পঞ্চমুখে পঞ্চরাগের জন্ম!

—আহা, সেই জন্যেই তো ওটাকে মহাকালের মুখেই পাঠিয়ে দিলাম।

নরেন্দ্র দেব

(নিবেলুড়দের স্বর্ণাঙ্গুরী)

(পূর্বানুবৃত্তি)

সিগফ্রেডের ব্যবহারে মর্মাহত ক্রুণহাইলদে তার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার ঝোঁকে মহারাজ গান্থারকেই শেষ পর্যন্ত বিবাহ করে ফেললে। ভোজসভায় আনন্দের সঙ্গেই যোগ দিলে। গান্থারের সঙ্গে তার নববিবাহিতা রাণী প্রসন্নমুখেই দিব্য হাস্য-পরিহাস শুরু করে দিলে যদিও তার সমস্ত মন প্রাণ ভিতর থেকে সিগফ্রেডের জন্য হাহাকার করে কাঁদছিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিও তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল অতি প্রবল ভাবে। এ খবর আর কেউ জানুক বা না জানুক, হাগেনের অগোচর ছিল না। সে তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্রুণহাইলদের প্রত্যেকটি কাজ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল।

রাজা গান্থারকে যখন ক্রুণহাইলদে পতিত্বে বরণ করে নিলে, হাগেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো! হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—'রাজদম্পতির জয় হোক! আমাদের নূতন রাণী দীর্ঘ জীবন লাভ করুন!' হাগেনের ষড়যন্ত্র ক্রমেই সফল হয়ে উঠছে দেখে তার আর আনন্দ ধরে না! রাত বাড়ছে। ক্রমে বিবাহ-বাসর শূন্য হল। ভোজ সভাও শেষ হয়ে এল। হাগেন এক সময় ক্রুণহাইলদেকে নিরিবিলিতে পেয়ে তার কাছে সরে এল এবং প্রথমটা তার রূপ গুণের প্রশংসা করে তোষামদে মন ভিজিয়ে, তারপর সিগফ্রেডের কথা পাড়লে।

ক্রুণহাইলদে বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—"ও লোকটার নাম তুমি আর কখনো আমার কাছে মুখে এন না।"

হাগেন মিথ্যা বিস্ময়ের ভাণ করে বললে—"সে কি মহারাণী! সিগফ্রেড্ যে বর্তমান জগতের সব চেয়ে দুঃসাহসী ও সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে স্বীকৃত হয়েছেন!"

"হোন্ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী বীর, আমি তাঁকে তুচ্ছ মনে করি। অমন প্রতারক ও প্রবঞ্চক মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।" ক্রুণহাইলদে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলো!

হাগেন তার রাজার এই নবপরিণীতা রাণীর মুখ থেকে একথা শুনে মনে মনে খুব খুশী হ'ল এবং সিগফ্রেডের প্রতি ক্রুণহাইলদের রাগটা আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্য বোকা সেজে বলতে লাগলে—"অবাক করলেন আমাকে আপনি! আমার ধারণা ছিল লোকটি সৎ এবং মহৎ। তাই তো রাজকুমারী গাদ্রুণের সঙ্গে তার বিবাহে আমরা সানন্দে সম্মতি দিয়েছি। কিন্তু, আপনার মুখে ওর সম্বন্ধে যা শুনলুম এর পর তো ওকে আর এ রাজ্যে বাস করতে দেওয়া নিরাপদ নয়। ওকে তাহলে যত শীঘ্র পারা যায় বিতাড়িত করাই শ্রেয়।"

ক্রুণহাইলদে বললে—"ওকে বিদেয় করতে পারেন যদি,—আমি খুবই খুশী হবো!"

হাগেন হাত জোড় করে রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বললে—"আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য করে নিলুম। লোকটি যে-চরিত্রের মানুষ

সীগমুণ্ড যখন সিগনিন্দিকে পেয়ে দেবরাজ ওটানের আদেশ অবহেলা করে আনন্দে মর্তলোকে বাস করছিল সেই সময় ক্রুণহাইলদেকে ওটান পাঠিয়ে দিলেন পুত্র সীগমুণ্ডকে ধরে আনবার জন্য—(প্রস্তাবনা)

বলছেন, তাতে ওকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেই সকলেরই মঙ্গল হবে মনে হয়, আপনার কি মত?"

ক্রুণহাইলদে অন্যমনস্ক ভাবে এ কথায় সায় দিয়ে বলে ফেললে—"নিশ্চয়!"

তখন সাহস পেয়ে হাগেন একেবারে ক্রণহাইলদের কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে—"মহারাজ আপনার সম্মানের জন্য এবং রাজকুমারী গাড্রুণের বিবাহ উপলক্ষে কাল এক বন-ভোজনের আয়োজন করেছেন। সেখানে কিন্তু আমরা কোনও খাদ্য সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। বনের পশু পক্ষী শিকার ক'রে ভোজ হবে। ধরুন সিগ্‌ফ্রেড যদি সেই বন-ভোজন থেকে আর এ প্রাসাদে ফিরে আসবার সুযোগ না পায়—আপনি খুশী হবেন তো?"

ক্রণহাইলদে বলে ফেললে—"হ্যাঁ।" এই সময় রাজা গান্থারএসে

রাজকুমারী গাড্রুণকে চুপি চুপি হাগেন কুপরামর্শ দিচ্ছে—পানীয়ের সঙ্গে মন্ত্রপূত ওষধি সেবন করিয়ে সিগফ্রেডকে বশীভূত করার জন্য

রাণীকে আদর করে হাত ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর ভগ্নী রাজকুমারী গাড্রুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

হাগেন এই অবকাশে মনে মনে স্থির করে ফেললে—কাল কি ভাবে কি করলে সিগফ্রেডকে আর বন-ভোজন থেকে প্রাসাদে ফিরতে না দেওয়া যায়!

পরের দিন মহাসমারোহে রাজ্যের হোমরা চোমরা সকলেই প্রায় রাজা আর রাজকুমারী উভয়েরই বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেই বন-ভোজন উৎসবে এসে সমবেত হলেন।

হাগেন প্রস্তাব করলে—আমাদের মধ্যে যাঁরা বীরের অভিমান রাখেন—তাঁরা সকলে নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে চলে যান ছুটে যে যেদিকে পারেন। নিয়ে আসুন শিকার করে কে কি আনতে পারেন। কিন্তু ঘড়িতে ঠিক বেলা বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে এখানে ফিরে আসতে হবে। যাঁরা পারবেন তাঁরা প্রচুর পুরস্কৃত হবেন, আর যাঁরা পারবেন না তাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সিগফ্রেড্ এই ব্যাপারে খুব খুশী হয়ে উঠলো। গ্র্যাণীর পিঠে চেপে সে সবার আগে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চক্ষের নিমেষে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে। একটা হরিণকে অনেকক্ষণ তাড়া ক'রে কিন্তু কিছুতেই সিগফ্রেড মারতে পারলে না। তারই পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে এসে পৌছলেন শেষে স্বচ্ছতোয়া রাইন নদীর তীরে। তখন তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত। অনেকটা ছুটে এসে অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে। রাইনের সেই নির্মল জল দেখে ঘোড়া থেকে নেমে এসে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। কাল সারা রাতই প্রায় জেগে আমোদ প্রমোদে কাটিয়েছিলেন। চোখ দুটিতে তাই ঘুম ভরে উঠেছিল। নদীতীরের শ্যামল কোমল তৃণ শয্যায় তিনি বিশ্রামের জন্য একটু শুয়ে পড়লেন।

সবে একটু ঘুম এসেছে এমন সময় তাঁর কানে এল এক অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতের সুমধুর সুর। সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়াতে তিনি উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন—কোথা থেকে এ সঙ্গীত তাঁর কানে ভেসে আসছে! এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো রাইন নদীর বুকে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে তিনটি জলবালা গান করছেন।

সিগফ্রেডকে দেখে তাঁরা কাছে এগিয়ে এলেন। এঁরাই সেই পূর্বোক্ত রাইন-দুহিতার দল। সিগফ্রেড এর আগে এই তটিনী-তরুণীদের আর কখনো দেখেন নি। তবে, দুঃসাহসী পুরুষ সে। জলকন্যাদের দেখে একটুও ভয় পেলে না। বরং হাসিমুখে রসিকতা করে বললে—"নমস্কার! কে গো তোমরা সুন্দরী কুমারীর দল! আমি একজন পথহারা পথিক! একটা হরিণরূপী বেঁটে ভুত আমাকে পথ ভুলিয়ে বিপথে এনেছে। তোমাদের একটু সাহায্য চাই আমি। সেই বদমাস বেঁটে ভুতটা যদি তোমাদের দলের কেউ না হয়, তা হ'লে তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে?"

তিনটি তরুণীই সিগফ্রেডের কথা শুনে খিল্-খিল্ করেহেসেউঠে বললে—"তোমাকে যদি আমরা সাহায্য করি তুমি আমাদের কি দেবে বলো?"

সিগ্‌ফ্রেড তাদের কি দিতে পারে এ কথাটা যখন সে ভাবছে, একটি জলকন্যা সেই সময় সাঁতার কেটে একেবারে তার কাছে এসে বললে—"তোমার আঙুলে দেখছি একটি চমৎকার সোনার আংটি রয়েছে। তুমি যদি ঐ আংটিটি আমাদের দাও তাহ'লে আমরা সেই হরিণরূপী বেঁটে ভুতকে এখনি ধরে এনে দেব।

সিগফ্রেড আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললে—"মনে পড়েছে! মনে পড়েছে! আমি পর্বতগুহাবাসী একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসকে মেরে তারই কাছ থেকে এ আংটি উদ্ধার করি। একটা হরিণরূপী বেঁটে ভুতকে ধরবার জন্য এ অমূল্য আংটি আমি বাজি রাখতে রাজী নই।"

জলবালারা পরিহাস করে বললে—"তুমি তো বড় কৃপণ। দাও দাও! বুদ্ধিমানের মতো আংটিটা আমাদের দিয়ে ফেল।"

তটিনী-তরুণীদের তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যরঙ্গ সিগফ্রেড মহা আনন্দে উপভোগ করছিল। সে মনে মনে স্থির করলে—এরা আর একটু আমার তোষামোদ করুক। এখান থেকে চলে যাবার সময় আংটিটা এদের দিয়ে যাবো।

এবার তিনটি মেয়েই সাঁতরে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মিনতির সুরে বললে—"তুমি একজন ভাল লোক। ও আংটিটা রাইন নদীর সোনায় গড়া অভিশপ্ত আংটি! ও আংটি যে পরে থাকবে তার ভীষণ বিপদ হবে।

সিগ্‌ফ্রেড উল্লসিত হয়ে উঠে বললে—"অভিশপ্ত আংটি? পরলে বিপদ হবে? বেশ? বেশ? তবে ত এ আংটি কাউকেই দেওয়া যাবে না। বিপদ আমি খুব পছন্দ করি। বলোতো শুনি—আমার কি বিপদ হতে পারে?"

তখন জলবালারা তিনজনেই অতি সুমধুর সুরে গান ধরলেন—

সিগ্‌ফ্রেড! সিগ্‌ফ্রেড! সিগ্‌ফ্রেড ভাই;
দুর্দিন আসে তব আভাস যে পাই।
আংটিটা পরে থাকা জেনো ভাই পাপ,
লাগবে তোমার যে হে ঘোর অভিশাপ!
গড়া ওটা রাইনের সোনা করে চুরি
বেঁটে ভুত দেছে ওতে অভিশাপ পুরি!
আংটির জাদু যেই হল তার জানা
ওটা সে পরিতে সবে করে দিল মানা!
কারণ আঙ্‌লে ওটা পরিবে যেজন,
দুর্দিন এসে তার ঘিরিবে জীবন!
তুমি যারে মেরে ওটা নিয়েছিলে হরি'
সে তাদেরই একজন যারা গেছে মরি!
তোমারও বিপদ শুরু হয়েছে হে জানি,
রাইনের ধন দাও রাইনেরে আনি!
নতুবা সবারই মতো তোমারও এ ভ্রমে
সর্বনাশ উপস্থিত হবে জেনো ক্রমে!

সিগফ্রেড বেশ মন দিয়ে রাইন বালাদের গানটি শুনলেন—তারপর হাত থেকে আংটিটি খুলে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে আবার আঙুলে বেশ এঁটে পরে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন—তোমরা বুঝি ভয় দেখিয়ে আমার আংটি নিতে চাও? তোমাদের গানটি মধুর স্বীকার করছি সুন্দরীরা! কিন্তু, আমাকে শোনানো একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, 'ভয়' কাকে বলে আমি জানি না!

রাইনবালারা কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো—"সিগফ্রেড! দোহাই তোমার! সাবধান হও! নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না! তোমার বীরত্বে আমারাও মুগ্ধ, তাই একথা তোমাকে বলে গেলুম।"

বলতে বলতে রাইনবালারা আবার গভীর জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিগ্‌ফ্রেডও হাসিমুখেই সেই ক্রুনহাইলদের দেওয়া ঘোড়া গ্র্যানীর পিঠে চড়ে ফিরে এল বনভোজনের সভায়। রাজার পাশে রাণীর বেশে ক্রুণহাইলদে বসেছিল। সিগফ্রেড ঠিক তার সামনে এসে গাড্রুণকে পাশে নিয়ে বসলো। পানভোজনের মধ্যে সবাই মিলে সিগ্‌ফ্রেডকে অনুরোধ করে তার জীবনের দুঃসাহসিক কাহিনীগুলি বলতে। ধূর্ত হাগেন ইতিমধ্যে করেছে কি—গোপনে সিগ্‌ফ্রেডের সুরাপাত্রে দু'চার ফোঁটা এমন ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল যাতে তার পূর্বস্মৃতি আবার ফিরে আসে।

সিগফ্রেড খুশী হয়ে বলতে শুরু করে দিলে তার সব বীরত্ব কাহিনী। বলতে বলতে সে যখন পর্বতগুহায় রাক্ষস মেরে রাইন সোনার তৈরি সেই দৈব আংটি ও মুকুট পাওয়ার কথা এবং পর্বতচূড়ায় অগ্নিবলয় বেষ্টিত এক স্বর্গ সুন্দরীর সন্ধান মেলার কথা বলছে, হঠাৎ ক্রুণহাইলদের মুখের দিকে

রাইনের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ভেসে এলো তিনটি রূপসী জল-কন্যা; সিগ্‌ফ্রেডকে স্বর্ণাঙ্গুরী ফেরত দেবার জন্য তারা গান গেয়ে মিনতি জানাচ্ছে

চেয়ে মহানন্দে বলে উঠলো—একি! ক্রুণহাইলদে! প্রিয়তমে! তুমি যে এখানে?"

সিগফ্রেড এইবার তাকে চিনতে পেরেছে দেখে ক্রুণহাইলদে আনন্দে অধীর হয়ে যেই দুহাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়েছে অমনি সিগ্‌ফ্রেড একটা আর্ত-চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কারণ কুটিল হাগেন ঠিক সেই সময় পিছন থেকে সিগফ্রেডের পিঠে একটা শাণিত বর্শা সমূলে বিঁধে দিয়েছিল।

মহারাজ গান্থার চিৎকার করে উঠলেন—"এ তুমি কি করলে, হাগেন ?"

রাজকুমারী গাড্রুণ ছুটে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত সিগফ্রেডের মাথাটি কোলের উপর তুলে নিলেন।

হাগেন দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো—"ঠিক করেছি মহারাজ! এক বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করে আমি গর্ব অনুভব করছি। আপনি শুনলেন না, ও বলছিল যে রাজকুমারী গাড্রুণকে বিবাহ করবার আগে ও এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ব্রুণহাইলদেকেই প্রাণদিয়ে ভালবেসেছিল ? আপনার হৃদয়-রাজ্যেশ্বরী মহারাণী ব্রুণহাইলদের হুকুমেই আমি ওকে হত্যা করেছি !"

"না—না ! মিথ্যে কথা ! মিথ্যে কথা !" বলতে বলতে ব্রুণহাইলদেও ছুটে গেল তার অচেতন প্রিয়তমের পাশে। সংজ্ঞাহীন সিগফ্রেডের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলো—"প্রিয়তম ! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ঐ অভিশপ্ত আংটিই আজ আমাদের এই সর্বনাশ করেছে ! তুমি যা করেছ তা না'জেনেই করেছ—এ বিষয়ে আর আমার কোনও দ্বিধা নেই, কোনও সংশয় নেই !"

তাড়াতাড়ি স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সুরভিত শীতল পানীয় জল নিয়ে সিগফ্রেডের শুষ্ক কণ্ঠে ও চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে দিতে সিগফ্রেড চোখ মেলে চেয়ে সামনেই ব্রুণহাইলদেকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—"ব্রুণহাইলদে ! প্রিয়া আমার ! তুমি কোথায় ছিলে এতদিন ? আমি তোমায় কত যে খুঁজেছি—" বলতে বলতে সিগফ্রেডের দুই চোখ আবার মুদিত হল !

"ক্ষমা করো সিগফ্রেড ! তোমার দুর্ভাগিনী ব্রুণহাইলদেকে ক্ষমা করো প্রিয়তম ! এই সবই একটা মারাত্মক ভুলের ফলে ঘটে গেছে ! না না ! আমি তোমায় কিছুতেই মরতে দেব না। তোমাকে বাঁচতেই হবে !" বলতে বলতে ব্রুণহাইলদে সিগফ্রেডের কণ্ঠলগ্ন হয়ে পাগলিনীর মত বারংবার তার মুখচুম্বন করতে করতে বললে "ওঠো তুমি বীর ! এ ধূলিশয্যা কি তোমার সাজে ? চেয়ে দেখ তোমার ব্রুণহাইলদে তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছে। একদিন অনল বেষ্টনে দীর্ঘ সুপ্তা তোমার যে প্রিয়াকে প্রেমের চুম্বনে তুমি সঞ্জীবিত করেছিলে, সে আজ তোমাকে তার প্রেমের প্রগাঢ়চুম্বনে জাগাতে এসেছে ! ওঠো প্রিয়তম ! জাগো, তুমি উজ্জীবিত হও ! আবার তোমার অতুলনীয় বীর্য গৌরবে। তোমার ব্রুণহাইলদেকে একলা ফেলে এমন করে চলে যেওনা প্রিয় ! আমি তোমাকে আর কখনো ছেড়েদেব না।"

বোধকরি পরাণ-প্রিয়ার অন্তরের এই আকুল আকুতি মুহূর্তের জন্ম সিগফ্রেডের আত্মাকে পরলোকের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল !

"ব্রুণহাইলদে ! প্রিয়তমে ! আর আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।"

কথা কটি বলার সঙ্গে সঙ্গে সিগফ্রেডের পার্থিব জীবনের শেষ যবনিকা নেমে এল।

ব্রুণহাইলদে মর্মভেদী হাহাকার করে বলে উঠলো—"মহারাজ ! তোমার আর তোমার ঐ শয়তান ভাই হাগেনের ষড়যন্ত্রে আমার এই মহা সর্বনাশ হয়ে গেল ! তোমাদের এর জন্ম ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে জেনে রেখো। পাপের প্রতিফল পৃথিবীতে কেউ এড়াতে পারে না।"

তারপর ব্রুণহাইলদে রাজার সৈন্যবাহিনীকে রাণীর মতোই আদেশ দিলে—"নিয়ে চলো বহন করে তোমরা এই বীরের শবদেহ বীরোচিত মর্যাদার সঙ্গে শোভাযাত্রা সহ রাইন নদীর তীরে। সেখানে সম্রাটের চিতানলে এদেহ রাজকীয় মর্যাদায় ভস্মীভূত করতে চাই আমি।"

তৎক্ষণাৎ ব্রুণহাইলদের সে আদেশ পালিত হ'ল ! এমন বিপুল সমারোহে ইতিপূর্বে আর কোনও রাজার দেহ কখনো সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

* * * *

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। রাইন নদীকূলে সিগফ্রেডের সুবৃহৎ চিতাও সেই সময় হু হু করে জ্বলে উঠলো। আকাশের দিনান্ত শান্ত অস্তরাগ সেই অগ্নিশিখায় অধিকতর রক্তাভ হয়ে উঠলো।

মৃতের উদ্দেশে সুগন্ধ পুষ্পার্ঘে শেষশ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে দিয়ে ব্রুণহাইলদে এসে তার প্রিয় অশ্ব গ্র্যানীর পিঠে চড়ে বসলো।

মহারাজ গান্থার, রাজকুমারী গাড্রুণ, সমবেত সৈন্যসামন্ত ও রাজ পারিষদগণ এবং বদ্ধহস্তপদ বন্দী হাগেন সবাই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে—যাক্ ! এইবার বোধহয় মহারাণী প্রকৃতিস্থ হয়ে রাজ্যে ফিরবেন—

হাগেন ভাবছিল রাইন নদীর সোনায় গড়া দৈবশক্তিসম্পন্ন আংটি ও মুকুট এইবার একটা স্ত্রীলোককে ভুলিয়ে হস্তগত করা খুব শক্ত হবে না।

অকস্মাৎ সবাই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখলে রাজার নবপরিণীতা রাণী ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করতেই ব্রুণহাইলদেকে পিঠে নিয়ে গ্র্যানী এক লাফে সেই জ্বলন্ত চিতার লেলিহান আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়লো। গগনস্পর্শী সেই চিতানলের ভিতর থেকে ব্রুণহাইলদের প্রেমস্নিগ্ধ সুমধুর কণ্ঠস্বর কানে এল—"সিগফ্রেড ! প্রিয়তম ! চেয়ে দেখ !—তোমার ব্রুণহাইলদে তোমারই কাছে ফিরে এসেছে !"

এমন সময় রাইনবালাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত-ঝংকার দূর থেকে কানে ভেসে এল। সেই সঙ্গে ব্রুণহাইলদের কথাও শোনা গেল—"ফিরিয়ে এনেছি তোমাদের স্বর্ণ সম্পদ ! এস তোমরা নদী-নন্দিনীগণ ! নিয়ে যাও তোমাদের এ অভিশপ্ত অঙ্গুরী ও মুকুট—"

সবাই অবাক হ'য়ে দেখলে রাইনের বুকে বিশাল এক ঢেউ উঠে ক্রমেই তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই তরঙ্গ শীর্ষে তিনটি অপরূপ রূপসী রাইনকুমারী আনন্দে নৃত্যগীত করছে। এসে পড়লো সে প্রলয়ের ঢেউ নদী তীরের বাঁধের উপর। চক্ষের নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই গগনস্পর্শী জ্বলন্ত চিতা ! স্বপ্নের মতো যেন চক্ষের পলকে সব মিলিয়ে গেল !

কোথায় বা মহাবীর সিগফ্রেডের সে বিশাল মৃতদেহ, কোথায় বা তাদের নূতন রাণী, আর কোথায় তাঁর সেই তেজী ঘোড়া গ্র্যানী !

হাগেন চিৎকার করে উঠে হাতেপায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। রাইনের সোনা যে এত কাণ্ড ক'রেও তার হাত ছাড়া হয়ে যায় ! প্রহরীরা অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে ক্ষণেকের জন্ম অসতর্ক হ'য়ে পড়েছিল। সেই ফাঁকে হাগেন তাদের কাছ থেকে পালায়। কিন্তু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্র রাইনের খরস্রোত তাকে নাকানি চোবানি খাওয়াতে খাওয়াতে কোথায় যে কোন অজানা ভীষণ যমালয়ে টেনে নিয়ে গেল—কেউ বুঝতে পারলে না !

সমাপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬

দুয়ার বন্ধ করেও গোলযোগ বন্ধ করা গেল না।

সেই নরুণপেড়ে ধুতিপরা বিধবা—নামটি ওঁর—সৌরভী দুয়োর গোড়ায় এসে ডাকলে—বউদি আছ গো—একবার দোরটি খোল না গো ?

দুয়োর খুলে ভগবতী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একি ব্যাপার ? এ সিধে কিসের ?

আজ যে দোয়াদশীর পারণ—বামুনকে দে, তবে জল মুখে দেব। দাদা আছে তো ?

আছে।

একবার এসতে বল ইদিকে। ওনার পায়ের গোড়ায় নাম্মে দে জন্ম সাথ্থক করি।

কিন্তু উনি যে এসব পছন্দ করেন না। কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিলেন ভগবতী।

কেন ? সুরমার কাছ থেনে জলখাবারের ছাঁদা বাঁধতে পারলেন—সে হ'ল যে ছোট বোন—আর আমি বুঝি বাইরের নোক। আমার তিনকুলে কেউ নেই বলে—

অমরনাথ দুয়োরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, যা দেবার—দিন।

সৌরভী সিধার থালাটি অমরনাথের পায়ের কাছে নামিয়ে সুদীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিলে। ঘোমটার ভিতরে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল অমরনাথের দুই পায়ের উপর। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দুটি পা ; সুগঠিত। গৌরবর্ণের উপর সুকৃষ্ণ রোমরাজি—পুরুষ-সৌন্দর্য্যকে বন্দী করে রেখেছে রোমে আর শিরায়। সৌরভী অবনত হয়ে মাথা রাখলে সেখানে। প্রণাম শেষে ডান হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলে সেই পা দুখানি—সেই হাত ঠেকালে নিজের কপালে, মাথায়। তারপর দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা ঈষৎ হ্রস্ব করে—পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে অমরনাথের পানে।

অমরনাথ সেই দৃষ্টি দেখে চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

ভগবতী পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে বললেন, ওকি, সিধের থালাটি হাতে তুলে নিলে না ?

অমরনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, ও নেয়াই হ'ল। কিন্তু বারণ করে দিও ওঁকে—এরপর আর কিছু দিতে এলে নিতে পারব না।

কেন ?

আজ শুনতে চেয়ো না—আর একদিন বলব সে কথা। —দুয়োরটা বন্ধ করে দাও।

এমনি করে দুয়োর বন্ধ করে আর কতদিন থাকা যায় ? সময়ের স্রোতকে দু'হাতে ঠেলে দেওয়া যেমন কঠিন—সংসারকে অবহেলা করে সংসারে পড়ে থাকা তার চেয়েও কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যাপার।

সন্তুরা ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল। কাছেই ভালমত ইস্কুল পাওয়া গেছে—ছেলেদের হাত ধরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তাঁর রইল না। সকালে পূজাপাঠ, বাজার, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ছেলেদের পড়া বলে দেওয়া—আরও গভীর রাত্রিতে ওরা ঘুমিয়ে পড়লে উপনিষদ ও ভাগবত কথা পাঠ। ভগবতী তখনকার একমাত্র শ্রোতা। সারাদিন খাটুনির পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেই শরীর আলস্যভারে ভারাতুর হয়ে ওঠে—ঘন ঘন হাই তুলেও নিদ্রাকে শাসন করে ভগবতী শোনেন সেই অপূর্ব্ব পাঠ। সুরে ছন্দে উচ্চারণে সে পাঠ অপূর্ব্বই বটে :

অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাসবৃত্রাশ্চ বেদাঃ।
বায়ু প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্ত যাতনা—।

কিন্তু নিশীথ রাত্রির শ্রোতা আরও একজন ছিল—সে কথা কয়েকদিন পরে প্রকাশ পেল।

দুপুরবেলা। কলতলায় বাসন মাজছিলেন ভগবতী—সৌরভী এসে দাঁড়াল পিছনে। খানিকক্ষণ বাসনমাজা দেখে বললে, আচ্ছা বউদি—একটা কথা জিজ্ঞেস করি—বলবে? রাগ করবে নি তো?

ভগবতী সবিস্ময়ে বললেন, কি এমন কথা যে রাগ করব?

না—তাই বলছি। এই গিয়ে, একটী ঢোক গিলে সৌরভী বললে, অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত দাদা শাস্তর থেকে ঠাকুর-দেবতার কতা পড়ে শোনায় তোমায়। কি মিষ্টি করে যে বলেন! আমার ভারি ইচ্ছে হয়—অমনি করে ঠাকুর-দেবতার কতা শুনি। কিন্তু আমাদের ঘরে তো ও পাঠ নেই—খালি শুয়োর পেটে গেলার চিন্তে, আর কিচিকিচি ঝগড়া!

ভগবতী চুপ করে রইলেন।

তা দাদাকে বলবে বউদি—আমায় যদি এট্টুখানি শোনায়। বেশীক্ষণ নয়—এই—

ভগবতী বললেন, কথা শোনানোর ব্যবস্থা হল আলাদা, ও আমরা এমনি আলোচনা করি।

আমি না হয় দোর গোড়ায় বসব—না হয় বাইরে বসব।

অত রাত্তিরে—কেউ কিছু মনে করতে পারে তো। ক্ষীণ আপত্তি তুললেন ভগবতী।

ইস্—কেন আপত্তি! বলে ভাত দেবার ঠাকুর নয়—কিল মারবার গোঁসাই। আমায় কেউ খেতে পরতে দিয়ে তো মাথা কিনছে নি।

তোমার দাদা—

দাদা আমাকে খাওয়ায়? তাহলে আর রক্ষে থাকত নি। আমার সোয়ামী ধানের জমি রেখে যায় নি—তা থেকে বছরে বছরে ট্যাকা আসে নি!

তা ভাই—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাক না কেন?

শ্বশুরবাড়ী! সে মুখে যাবার পথ রেখেছে এরা? ওই ভাই ভাজ—ওদের জন্তেই তো ও পথ বন্ধ হয়ে গেছে ভাই। বিধবা হলাম—বারো তেরো বছর বয়েসে—সোয়ামি কি বস্তু জানিনি—ওরা নে এল এখেনে। বললে, সবই ফাঁকি দে নেবে। বিধবার আপনজন নেই ভূভারতে। সে কত মামলা-মোকদ্দমা। সেখানকার কতক জমি বিক্রী করে—গায়ের সব্বস্ব খুইয়ে তবে ক'বিঘে জমি বার করে নেসতে পেরেছে। তাই থেকে পেটের ভাত—পরণের কাপড়। আর খুড়তুতো দেওর—ভারি ভদ্দরলোক—সেই হাত খরচ দেয় কিছু কিছু—তাই থেকে ঠাকুর-দেবতা—বেরতো পুণ্যি···

অমরনাথ আপিস থেকে এলে বললেন—সব কথা। বললেন, আহা বড় দুঃখী মেয়েটা—যদি একটু শান্তি পায় কথা শুনে—

অমরনাথ বললেন—রাত্রি দুপুরে কথার আসর বসিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়াবো না—তুমি বরঞ্চ এক কাজ করো। দুপুরে মেয়েটিকে ডেকে রাত্তিরে যে গল্প শুনবে—তাই শুনিয়ো।

এ প্রস্তাব শুনে—সৌরভী হাসিমুখে বললে, তাই আসব বউদি—আজই আসব।

যথাসময়ে সৌরভী এল। ঘরে ঢুকে বললে, বাঃ দিব্যি তো গুচ্ছো রেখেছ সব—এইটুকুন ঘর—এত জিনিস—তবু কি সাজানো গোছানো! জলচৌকির ওপর ওই বইগুলো কিসের বউদি? ওইগুলোই দাদা পড়ে!

বইয়ের সামনে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলো। বললে, ঘরে যেন দেবতা রয়েছে।

দেওয়াল ঘেঁষে বসলে সৌরভী। মাথার ওপরে একটা কাঠের আলনাতে জামা কাপড়-গুছানো রয়েছে দেখে বললে, দাদা বুঝি সোয়েটার গায়ে দেয় না—গরম জামাও তো গায়ে দিতে দেখিনি। ওই খদ্দরের আলোয়ানে শীত ভাঙ্গে?

যাদের গরম জামা কাপড় নেই—তারা কি শীত কাটায় না। স্মিত হাস্যে ভগবতী বললেন।

তা উল নেসে ঘরে একটা সোয়েটার বুনে দাও না। এমনি তো সবাই দেয়। আচ্ছা—বুনবার সময় না হয়—আমাকে দিয়ো। বামুন মানুষ পরলে হাতের কাজ সাথক হবে।

আচ্ছা—সে পরে যা হয় হবে—এখন কথা শোন।

কথা শুনতে শুনতে সৌরভীর দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে গেল।

দেয়াল ঠেস দিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। ভগবতী ওকে জাগালেন না। আহা, সারাদিন খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মেয়েটি—একটু ঘুমিয়ে নিক।

মিনিট দশেক পরে দরজায় ঘা পড়িল। ঠাকুরঝি আছ—ঠাকুরঝি?

ভগবতী দুয়োর খুলে চাপা গলায় বললেন, এই মাত্র ঘুমিয়েছেন—খানিক যাক।

ওমা—রাজ্যের কাজ পড়ে—বসে বসে ঘুমুলে চলে। উঁকি মেরে বললেন, মরণ—ঘুমের ঢং দেখ না। আজ আমার ভাই-ভাজ আসবে—তাদের ছেলেমেয়েরা আসবে। সবাই একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব। তাদের জলখাবারের পাট সেরে রাত্তিরের রান্না চুকিয়ে—তবে তো যেতে হবে। এই বেলা উনুনে আঁচ না দিলে···

ওঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে সৌরভী ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, শরীরটা বড় খারাপ···

আমাদের শরীর ভারি ভাল কিনা। আপিসের চাকরিতে ছুটি আছে হপ্তায় একদিন—আমাদের চাকরি অষ্ট প্রহর। পান থেকে চুণ খসবার জো নেই।

উঠি বৌদি—কাল আসব। বলে ক্লান্ত দেহ টেনে সৌরভী উঠে দাঁড়াল।

ভগবতী বেদনা বোধ করলেন। এরা সত্যই অভাগী, এদের জন্য করবার কিছু নেই।

পরের দিন এই সমবেদনা বিরাগে পরিণত হল। অমরনাথ কথা শেষ করে দুয়োর খুলে বেরুতেই—মনে হল অন্ধকারে কে যেন চলে গেল। ডাকলেন ভগবতীকে, হ্যারিকেনটা নিয়ে এস তো!

কি—হলো কি। আলো ধরে শুধোলেন ভগবতী।

মনে হল কে যেন ছুটে পালাল। চোর টোর নয় তো? আলো ধরে বারান্দার এ প্রান্ত ও প্রান্ত দেখলেন অমরনাথ। রাত্রি গভীর হয়েছে—কোন ঘরেই জাগরণের সাড়া নেই। নিদ্রিত মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাসিকা গর্জ্জনের ধ্বনি জীবনের বার্তা প্রচার করছে। এই নিদ্রিত পুরীর মাঝে··· ঐশ্বরিক লীলার মহিমা যেন প্রকটিত হয়ে উঠল। এইমাত্র পড়লেন—আমারই মায়ায় সর্ব্বজীব আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমি চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় সত্তা—যার প্রতিধ্বনি সমগ্র নিখিল বিশ্ব চরাচরে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং
প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।

সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

নিঃশব্দ রাত্রির রূপে তাঁরই বার্ত্তা ফুটে উঠল। আকাশে তারার আসরে সেই পরম বাণীর প্রকাশ। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বাড়ীর নিবিড় বেষ্টনী ভেদ করে আকাশে দৃষ্টি ফেলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঘরের দুয়ার বন্ধ করলেন অমরনাথ।

কথাটা পরের দিন দুপুরে সেনদিদিকে বললেন ভগবতী। বললেন, আলো ধরে দেখি কেউ কোথাও নেই। চোরই হবে হয়তো।

সেনদিদি মুচ্‌কি হেসে বললেন, চোর তো বটেই—তবে সাবধান।

দুয়োর তো দেয়াই থাকে—

বন্ধ দুয়োরে ওই চোরের আনাগোনা বেশী—ওরা সিঁধেল চোর।

ওমা—তাহলে কি হবে!

রাত্তিরে কথা পাঠগুলো বন্ধ রেখো—চোরের উপদ্রব কমে যাবে। মুচ্‌কি হেসে সেনদিদি জবাব দিলেন।

সেনদিদির হাসিতে রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে ভগবতীর দুশ্চিন্তা বাড়ল। বললেন, তাহলে কি হবে দিদি?

আগে চোরের কথা শোন—তারপর উপায় আপনিই বেছে নিয়ো। এই চোরের উৎপাত এই বাড়ীতে নতুন নয়। সেনদিদি গুছিয়ে বসলেন। এই চোর নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরের আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। ভাড়াটে যদি নতুন বর-বউ হয় তো চোরের চোখ থেকেও রাতের নিদ্রে হরে যায়।

ভগবতী বললেন, তুমি ঠাট্টা করছ!

ঠাট্টার কথা হলেও—এর মধ্যে দুঃখুও আছে। সবটা শোনই আগে। প্রথম যখম এলাম—সে প্রায় পনেরো ষোলো বছর হবে, আমিও তো কচি বউটি নয়—চার ছেলের মা। কর্ত্তার বয়স ঢলেছে—আমিও তিরিশে পা দেব-দেব করছি। ওমা—রাত দুপুরে যেই আলো নিবিয়ে শুয়েছি—খুট্‌ করে শব্দ হল জানলায়। কর্ত্তা বললেন, দেখ তো—কেউ যেন জানলার কপাট খুলছে। একলা দেখতে সাহস

হ'ল না—কর্ত্তাও সঙ্গে এলেন। বেরিয়ে দেখি—যেখানে সিঁড়ি উঠেছে ছাদে—ওই দিকে যেন একটা সাদা কাপড় মিলিয়ে গেল। পরের দিন বললাম, মিত্তির বউকে। ও তো হেসেই গড়িয়ে পড়ে। বলে, ভাল করে আঁচলে গেরো বেঁধে রেখো কত্তাকে—নইলে চুরি হয়ে যাবে। ব্যাপার কি! সে আর শুনে কাজ নেই—এ বাড়ীতে একটা পেত্নী আছে, সেটা বিয়ে হতে না-হতে বরকে মেরে ফেলেছে। বরের সঙ্গে সাধ আহ্লাদ করার আকিঞ্চে তার মেটে নি—তাই সারা রাত্তির আড়ি পাতে দুয়োরে দুয়োরে। পরের বরের সোহাগ কুড়িয়ে নিজের আশা আকিঞ্চে পোয়ায়। কে জানে ভাই—কার কপালে কি আছে! উপোসী লোকের সামনে ভাতের থালা নিয়ে বসলে হজম হয় কখনো? তাই দুর দুর করে বুক কাঁপে আমাদের।

ভগবতী বললেন, কে সে?

মনকে শুধোও···জবাব পাবে। সেনদিদি হাসতে লাগলেন।

শিউরে উঠলেন ভগবতী। সৌরভীর কথাই তাঁর মনে হ'ল। পরণে নরুণ পাড় ফরসা ধুতি—গলায় চিক চিক করছে সোনার হার—পানের রসে রাঙানো দুটি ঈষৎ পুরু ওষ্ঠ, দৃষ্টিতে হাঁ—কটাক্ষই বটে। তারই সাক্ষাৎ পেয়ে ভক্তি অর্ঘ্যভরা সিধের থালাটি না ছুঁয়েই অমরনাথ পিছন ফিরেছিলেন। বলেছিলেন—আজ নয়—আর একদিন বলব এর হেতু।

অবশেষে সেনদিদি অভয় দিলেন। ভয় নেই—প্রথম প্রথম ওরকম দৃষ্টি দেবেই—তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যে ঘর পায়নি—সে নতুন ঘর দেখলেই হ্যাংলাপনা করেই। স্বামী পায়নি যারা—তাদেরও ওই দশা।

৭

থই থই জলেভরা গলির ওপাশে—একখানি তিনতলা বাড়ী—এই গলিতে থেকেও যেন গলির আত্মীয় নয়—একটু অভিজাত ধরণের। সামনেটা মেট্রো প্যাটার্ণের বৈদ্যুতিক আলোগুলিতেও হঠাৎ বড়মানুষীর ছাপ লেগেছে। উপরের ঘর গুলির দেওয়াল কম—জানালার সংখ্যা বেশী—কাঁচের সার্সি-লাগানো জানালা—ভিতরে আলো জ্বললে বাইরে থেকে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে ওর গায়ে আঁকা সুন্দর ছবিগুলি। এই বাড়ীর নীচেকার একটা ঘরে পাড়ার ছেলেদের সমিতি-ঘর। এই সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করে না—কেন না তার নানামুখীন উদ্দেশ্যগুলিতে বিধি-বিধান সব স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুঃস্থের দুর্গতিমোচন থেকে আত্মতুষ্টি সাধনোদ্দেশে তাস পাশা দাবা নাটক অভিনয় কোন্‌টা নাই! পরকে বাঁচানোর মহৎ ব্রত এবং নিজেকে বিকশিত করে তোলার আবশ্যিক কর্ত্তব্য—যুগপৎ সম্পন্ন করে চলেছেন সভ্যেরা। কেষ্ট এই সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। স্লোগানবাহী পতাকা দণ্ড বুকের ওপর খাড়া করে পথ দিয়ে অপরিমিতভাবে চেঁচানোর দায়টা সেই বহন করে,—আসন্ন থিয়েটারের উদ্যোগ আয়োজনে শ্রমের যে অংশটুকু সবাই এড়িয়ে যায়—অর্থাৎ বাঁশ পোঁতা তক্তাপোষ বয়ে এনে প্ল্যাটফরম্ তৈরী করা—সিনখাটানো ত্রিপল টাঙানো ইত্যাদি—তাতেই কেষ্টর প্রীতি বেশী। সে চাঁদা দেয় না সমিতিতে—সমিতিতে তার বিশিষ্ট স্থান আছে—সে মান্যবর সভ্য।

কেষ্ট একদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে সন্তুকে টেনে নিয়ে এল ক্লাব ঘরে। বললে, দেখেছিস ঘর—কলকাতার যত বড় বড় লোকের ছেলেরা সব এইখানে আসে। কেউ হেঁটে আসে না—মোটরে চড়ে আসে, ওরা সিগ্রেট বিড়ি খায় না—চুরুট টানে, ওদের জামা জুতো ধুতি থেকে মাথার টুপি পর্য্যন্ত···নিত্যি ধোপাবাড়ী থেকে আসে। আজকের দিনে যারা মন্ত্রী—যারা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, নাম-করা ডাক্তার—সবাই আসে এখানে। রাত আটটার পর দেখবি—এই গলিতে মোটরে মোটরে ছয়লাপ।

রাত্তিরে আসব কি করে ভাই?

কেন—একবারটি এলে কি খারাপ হয়ে যাবি। বড়রা বেশী চাপ দেয় বলেই আমরা খারাপ হয়ে যাই। ইস্কুলে মাস্টার, আবার বাড়ীতেও মাস্টার। বেতমারা উঠে গেছে—ইস্কুল থেকে জানিস?

শাসনের প্রধান অঙ্গই কি বেতমারা? ভয়ে মনের তলায় তলিয়ে যায় যে বোধ—বিদ্যার আকারে প্রকাশ ক্ষমতা তার লোপ পায়—কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানই কত সহজ হয়—কি অবলীলায় তার প্রকাশ ঘটে!

সব সময়ে শাসন কেন সইবে ছেলেরা? ছেলেদের সবই অন্যায়—আর বড়দের কোনই দোষ নেই?

সন্তু বললে, না ভাই—একথা বাবাকে বলতে পারব না।

তাহলে সিনেমা দেখবার কথাও বলতে পারবি নে বল? কেষ্ট বিদ্রূপের হাসি হাসলে।

বাবা যদি নিয়ে যান—

তবেই হয়েছে—ওরা ইচ্ছে করে ছোটদের ছবি দেখাতে নিয়ে যায় বুঝি? বলবে—ইস্‌কুলের ছেলে—ছবি দেখলে পড়ার ক্ষতি হবে।

সে কি মিথ্যে ভাই?

না—খাঁটি সত্যি! ব্যঙ্গ ভরে জবাব দিলে কেষ্ট। সব সাধ ওদেরই যা আছে—আমরা তো সব সাধু সন্ন্যেসী মানুষ। পয়সা চাও ওদের কাছে—বলবে—আজ থাক, কি হাতে নেই। ওরা মিথ্যে কথা তো বলে না—আমাদের ভোলায় শুধু।

সন্তু ভাবতে লাগল—তাই কি সত্যি?

বাড়ী ঢুকতেই কমলার সঙ্গে দেখা। বললে যে,তোর জন্যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি—কিছু উল এনে দেনা ভাই।

উল কি হবে?

সোয়েটার বুনব বাবার জন্যে।

তুই বুনতে পারিস?

শিখিয়ে দেবে একজন। এই নে টাকা।

সন্তু বাড়ীর বার হতেই কেষ্ট বৈঠকখানা থেকে ডাকলে তাকে, শোন—একটা কথা শুনে যা।

বৈঠকখানায় আর একটি লোক রয়েছে। বেশবাস তার সৌখীন—চক্‌চক্ করছে পেছন-ঠেলা চুল—সরু তুলিতে আঁকা গোঁফ—আর গায়ে ভুর ভুর করছে কেমন মিষ্টি গন্ধ।

সে বললে, কেষ্টর মুখে শুনেছি তোমার কথা। তুমি নাকি ভাল ছেলে। বেশ—বেশ—মন দিয়ে পড়াশোনা কর, নাম কেনো। যেমন ছিলেন—বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ, স্যার জগদীশ বসু, পি, সি রায়—

লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল সন্তু।

ভদ্রলোক বললেন, কাল এস এই সময়ে—তোমাকে কয়েকখানা ইংরেজী বই দেব। তার পাতায় পাতায় ছবি—কত গল্প—সমুদ্রের পর্ব্বতের আকাশের এরোপ্লেনের চুম্বক পাহাড়ের—

আচ্ছা আসব।

বই পেয়ে সন্তুর আর আনন্দ ধরে না। বাড়ীর সবাই এল ছবি দেখতে। কমলার চেয়ে একটু বড়—সেনদিদির দুই মেয়ে ইরা মীরা এল, এল মিত্তিরদের ইলা বেলা—বয়সে বড় হ'লেও ভূপতিবাবুর মেয়ে রমাও এল। সবাই মিলে ছবি দেখলে—আনন্দ করলে।

ইরা বললে, যে বই দিয়েছে তার নামও লেখা রয়েছে যে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র। ও দিদি, পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটা নয় তো—যে ছাদে পায়চারি করতে করতে গান গায় সিনেমার?

মীরা বললে, হবে। কিন্তু ভদ্রলোকের গানের গলা ভাল, বইএর সিলেকশান বেশ।

পরের দিন কেষ্টকে ধরলে সবাই। বললে, যে বই দিয়েছে সন্তুকে ওর পুরো নামটি কি রে?

কেন—লেখা নেই বইয়ে? বইগুলি উনি সন্তুকে উপহার দিয়েছেন।

কেন?

যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল তাকে উনি অমনি বই কিনে দেন। নিজে যে এম-এ পড়ছেন। আর এমন সুন্দর বাজাতে পারেন—গাইতে পারেন।···ক্রিকেট খেলেন দারুণ। একবার উইকেট পেলে ওঁকে আউট করার সাধ্যি কারও হয় না।

মীরা বললে, তা এক কাজ করতে পারিস কেষ্ট? ওঁর যদি সময় হয় আমাদের একটু গান বাজনা শেখাবেন?

আচ্ছা—বলব।

মাইনের কথা কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঠিক করে নিবি তার আগে।

মাইনে! উনি মাইনে নেবেন নাকি! যার বাড়ীতে দু'খানা মোটর—সে থোড়াই কেয়ার করে মাইনের।

কেষ্টর মারফৎ যতীনকে ডেকে পাঠালেন—সেনদিদি। নিজের হাতে-বোনা আসনখানায় যত্ন করে বসালেন—অত্যন্ত বিনীতকণ্ঠে বললেন, তোমাকে বলতে সাহস হয় না—কলেজের ছেলে, যদি মীরা ইরাকে একটু গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দাও—

যতীন বললে, এ আর বেশী কথা কি কাকীমা, আমিই দুপুরবেলায় ঘণ্টাখানেক করে শিখিয়ে যাব। রোজ পারব

না, সপ্তাহে তিন দিন। যে কেউ গানের মাস্টার আসুক সপ্তাহে দু'তিন দিনের বেশী শেখাতে পারবে না। আপনার মেয়েরা কই ?

এই যে—ইরা মীরা নমস্কার কর। হারমোনিয়ামটা এনে দে—ছেলে বাজিয়ে দেখুন—ঠকলুম—কি জিতলুম।

অষ্টাদশী ও ষোড়শী মীরা ইরা সলজ্জে এগিয়ে এসে হাত তুলে প্রণাম জানালে। তারপর দুই বোনে ধরাধরি করে নিয়ে এল হারমোনিয়াম।

খানিক আঙুল টিপে রীডগুলি পরীক্ষা করে যতীন রায় দিলে—যন্ত্রটি ভালই।

একটা গান গেয়ে শোনালেও সে। অতি আধুনিক একটা ছবির গান। গলা মিষ্ট—ভালই লাগল সকলের।

যতীন চলে গেলে সেনদিদি বললেন, খাসা ছেলে—কেমন আপন-আপন ভাব।

ইরা বললে, কত মাইনে নেবেন ঠিক করলে না, মা ?

সেনদিদি বললেন, অমন আত্মীয়ো ছেলে—তাকে কোন্ মুখে বলব টাকার কথা! কর্ত্তা আসুন—মাস কাবার হোক—ওঁকে দিয়েই বলাব।

মীরা বললে, মাইনে দিতেই হবে। গুরুদক্ষিণা না দিলে বিদ্যে সম্পূর্ণ হয় না।

ইস—মেয়ের জ্ঞান দেখে আর বাঁচি নে।

সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে ছিল রমা। মুখখানি তার গম্ভীর, থমথমে। ওদের হাসি আনন্দ তার বুকে ভার হয়ে চেপে বসেছে যেন। চোখের কোলটিও যেন ফুলো ফুলো—একটুক চক্‌চকে। কে জানে রমা কাঁদছিল কিনা? মা তখন বেঁচে—আদর করে বাবা কিনে দিয়েছিলেন এই হারমোনিয়ামটা। মা যখন মারা যান তখন বড়ই শোকে কাতর হয়ে পড়েছিল রমা। সেই শোককে ভুললে সংসার নিয়ে—অবসর সময়ের সঙ্গীত নিয়ে। কেউ ওকে শেখায়নি গান! রেকর্ড থেকে—লোকের মুখে শুনে—নিজের মন থেকে ও আয়ত্ত করেছিল এই বিদ্যা। তারপর সৎ মা এলেন। মস্ত একটা আঘাত পেলে রমা—গান পরম আশ্রয় হয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলে। তারপর ওর কুমারী মনের স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি হল এই সঙ্গীতের সুরে রেখার রঙে। সঙ্গীতে রেখা কোথায়, রঙই বা কি? এ প্রশ্ন কেউ করেনি রমাকে—তবু রমা জানে সুরের জালে এখনও ধরা পড়ে। এদের মধ্য দিয়েই তো আসেন স্বপ্নের রাজকুমার নিঃশব্দ পদপঞ্চারে ভরে ওঠে কুমারী মেয়ের মন। কিন্তু বাস্তব জগতে এই রূপ ও রঙের কোন মূল্যই কেউ দিলে না। কেউ দেখলে না কুমারী মনের স্নিগ্ধশ্রী—শুচিস্মিত পরিবেশ। শেষবার পরীক্ষা দিয়ে বিদ্রোহী হল রমা—হারমোনিয়াম বেচে দিয়ে নিজের স্বপ্ন জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হ'লও। তবু স্বপ্ন জগতের রেশ যেন মুছেও মুছতে চায় না। আজ যারা ঐ গানের তরী বেয়ে উপনীত হবে···সার্থক দেশের তীরে—তাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হল কি রমা ?

ইরা রমাকে দেখে বললে, গানের মাস্টার ঠিক হয়ে গেল রমাদি।

বেশ। রমা হাসলে।

তোমার সুবিধা হলে একবার আসবে আমাদের ঘরে। পরদাগুলো চিনিয়ে দেবে। নইলে মাস্টার ভাববে—কি আনাড়ী মেয়ে রে বাবা।

সন্ধ্যের পর আসব।

ভস্‌চাজ্জিগিন্নি ডিঙ্গি মেরে মেরে বারান্দা পার হচ্ছিলেন। বললেন, আজকালকার দিনে সবই আদিখ্যেতা—গান না শিখলে মেয়ের বিয়ে হবে না। বলি—কোন্ রাজার ঘরে পড়বেন যে মেয়েরা জানি না। খাটতে খাটতে বাঁধন ঢিলে হয়ে আসবে—আবার গান। বলি পড়বি তো কেরাণীর ঘরে—না হয় ইস্কুল মাষ্টারের ঘরে—না হয় কলেজের মাষ্টারের হাতে। তার জন্যে এত? চারদিকে এত দেখেও যাদের শিক্ষে হয় না—হে ভগবান, তুমি তাদের বুঝিয়ে দাও। এই যে বারান্দায় খাবার-খাওয়া শালপাতার ঠোঙা—এঁটো জলের ছড়া—খুচু ছেঁড়া ন্যাকড়া এগুলো পরিষ্কার করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।—সারা বারান্দা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে পারে মানুষ। আবার গানের মাষ্টার আসবে—গান শেখাতে। বলে,

কালে কালে কতই হবে,
পিঠে পুলির ন্যাজ বেরুবে!

৮

এটি অমরনাথের ভাল লাগেনি। শহরের এ ফ্যাশান ওঁর ভাল লাগে না। এখানে সত্যিকারের মানুষ যে

পোষাক চাপিয়ে আর কিছু সেজে-বসে আছে। পাড়াগাঁয়েও সাজা মানুষ আছে—তাদের এক আঁচড়ে চেনা যায়। ত্রিপুণ্ড্রক-শিখা-নামাবলীতে সাত্ত্বিক ভাবকে ফুটিয়ে তোলা যায় না—হরিকীর্ত্তনরসে দরবিগলিত ধারা হয়েও বৈষ্ণবের প্রধান গুণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে—সর্ব্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গ তুলেও সংসারের পাঁকে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে আছে এ সব ব্যক্তিও বিরল নয়। এদের নিয়েই সমাজ—এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সমাজকে বিপন্ন করে না। কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের আজ কি অবস্থা। ওরা মাঝখানে আছে বলে—না নামতে পারে অতলে—না পায় ঊর্দ্ধে আশ্রয়। অথচ উপরের সাজ-সজ্জা জীবনযাপনপ্রণালী প্রতিনিয়ত প্রলোভন সৃষ্টি করছে। যে সংসার কাব্য আবৃত্তির সমাদর করবে না, গানের মূল্য দেবে না, নানাবিধ শিল্প-সাধনার সুবিধা যেখানে নাই—সেখানে কেন জমছে এই সব জঞ্জাল। কেন—কলাবতী কন্যা খুঁজে খুঁজে তারা মরীচিকা লুব্ধের মত দিশেহারা হচ্ছে ? উপরের পানে এই তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টি এ শুধু অশান্তি বাড়াচ্ছে ! আর অতলে নামবার পথে প্রচণ্ড অন্তরায় তথাকথিত মানসম্মান। লৌকিকতার বাঁধন খসিয়ে দেনা পাওনা সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকতে পারবে না, খালি পায়ে ঘোমটা ঘুচিয়ে না দিয়ে যেতে পারবে না হেঁটে—শ্রমের অন্ন সংগ্রহ করতে শুদ্ধান্তঃপুর ছেড়ে দাঁড়াতে পারবে না পুরুষের পাশে। নানান বাধা—বাইরের এবং ভিতরের। এমনি করে কতকাল চলবে আর ! সম্পদের ছায়া মূর্ত্তির পিছনে ছুটে সর্ব্বস্ব খোওয়ানো, কিংবা নিচের স্তরকে প্রবল ঘৃণার দ্বারা অস্পৃশ্য করে রাখা ! ভালবাসা নেই—আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই—এমনি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে ভেসে সম্পূর্ণরূপে মুছে যাওয়াই কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভবিতব্য !

চাকরি আমি স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিনি—বাবা বারণ করেছিলেন। কিন্তু সমাজের ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয় ধরেছিল তাকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও তো অর্জ্জন করিনি। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জীবধারণের ধারণাকে দিয়েছে বদলে—অধ্যাপনা যাজন—এ নিয়ে মানুষ বাঁচবে না—তাকে অন্য উপায় নিতেই হবে—এ জানতাম। কিন্তু এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে ভাবিনি।

ভগবতীর কাছে মাঝে মাঝে আক্ষেপোক্তি করেন অমরনাথ।

এতেও বাঁচব না আমরা—তবু যে ক'দিন বাঁচি তারই চেষ্টা।

দেশে ফিরে যাবে ?

দেশ কোথায়। স্ববৃত্তিতে অন্ন উপার্জ্জনের পথ সেখানে খোলা নেই। ঠাকুর দেবতা নিয়ে মানুষের মন ভরে না আজ—পেট তো ভরেই না।

তোমার চাকরি শেষ হলে দেশে ফিরে যাব।

অমরনাথ হাসলেন। চাকরি শেষ হবে—আমরাও শেষ হব, দেশ তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। আগের দিনে প্রত্যেক ঘরে ছিলেন গৃহদেবতা—তাঁরা শুধু দেবতা নন—শক্ত বাঁধনও বটে। সেই বাঁধনের টানে মানুষ ফিরে আসত ঘরে—ফিরে আসত গ্রামে। একটি দেবতাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবার—সে দেবতাকে আমরা কবে হারিয়েছি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন অমরনাথ।

ভগবতী ওঁর কথায় হতাশ হলেন না। ওঁর দৃষ্টি বর্ত্তমানের আলোর মধ্যেই—ভবিষ্যতের ছায়ার স্থান সেখানে নাই। এই তো সেদিন গ্রাম ছেড়েছেন। হেমন্তের শিশির-ভেজা সকাল—সারারাত্রি গাছের পাতায় পাতায় টুপ্‌টাপ্‌ শিশির ঝরে পড়ার শব্দ, সংক্ষিপ্ত দিনের পানে চেয়ে রাত্রির প্রদীপে বেশী করে সলতে পাকানো, সেই প্রদীপের আলোয় বসে রামায়ণ মহাভারত পাঠ—এসব এইমাত্র যেন সারা হয়েছে। সহর বাসের সংক্ষিপ্ত মেয়াদ শেষ হলে পূর্ব্বরূপেই ফিরে পাবেন নিজের গ্রামখানিকে—এই আশ্বাসে পূর্ণ হয়ে আছে মন।

সকালে উঠে কমলা আবৃত্তি করে···

প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণং,
গুণহীন মহেশ গরলাভরণং
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।

সমস্ত অশিবনাশের জন্য মঙ্গলময়কে এই আহ্বানের পিছনে কি আন্তরিকতা নাই ! জনগণের দেবতা শিব—ঐশ্বর্য্য আভরণ কিছুতে তাঁর অভিরুচি নাই। পৃথিবী তাঁর গৃহ—সে গৃহের আচ্ছাদন আকাশ, সর্ব্বদেব পরিত্যক্ত বৃদ্ধ বৃষ তাঁর বাহন, ধুতুরা আর সর্প আর রুদ্রাক্ষ ভূষণে কণ্ঠ, বাহু ও শিরোদেশ সুশোভিত, পরিধানে ব্যাঘ্র

চর্ম্ম, অঙ্গে বিভূতি ; সভ্য দেবতা সমাজে এমন বাহন ও আভরণ—কোন দেবতার ! স্বল্পে তুষ্টি আশুতোষ—গৃহীযোগী মহেশ্বর—এ দেবতার তুলনা নাই।

প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।

এই কল্পতরুর মূলে বসে মেয়েরা শুধুই কি সুন্দর বর কামনা করে ? কামনা করে না—ঐশ্বর্য্য পেয়েও যেন অহঙ্কার জমে না মনে, ভোগের মধ্যেও যেন আসক্তির ক্লেদ সঞ্চিত না হয়, যেন বাক্য মন ক্রোধের অনধীন থাকে—জীবনের সর্ব্বোত্তম আনন্দ স্বল্প তুষ্টিতে আশ্রয় করে সংসার হয় সুখময় !

কিন্তু রাজধানীর কারাগৃহের ইষ্টক প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে এই কামনা কোথায় বিলীন হয়ে যায় ?

কার্ত্তিকের প্রত্যূষে শিউলিতলায় ফুলসংগ্রহ, যমপুকুর পুণ্যিপুকুর সেঁজুতি অর্চ্চনা,—অগ্রহায়ণে ইতু দেবতার জন্তই শীতের মিষ্ট রোদে পিঠ দিয়ে বসে ব্রতকথা শ্রবণ···সে কাল বহু দূর অতীতের ছিল। এখানে শহরের সকাল—কাকের কোলাহলে প্রকাশিত হয়—বাসন মাজার শব্দ—কলঘরের কোন্দল আর ধোঁয়া নষ্ট করে সমস্ত প্রসন্নতাকে। ছোট মেয়ে কমলা—ওর মনেও অপ্রসন্নতা জমে।

এক একদিন বলে, মা—আমরা কবে বাড়ী যাব ?

ওঁর পেনসন হোক—তারপর।

সে কবে ? আপনমনেই জিজ্ঞাসা করে কমলা।

সকালের এই মন-কেমন-করা ভাব বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়। এ-ঘর ও-ঘরের সঙ্গিনীরা আসে—কত বিচিত্র কথা আর গল্প···শহর ভুলিয়ে দেয় কমলাকে।

আজ সিনেমায় যাবি আমাদের সঙ্গে ?

সিনেমা কি।

দূর—কিছুই জানিস না ? ছবি দেখবি কেমন সুন্দর—কথা কয়—গান গায়, নাচে—ঠিক জ্যান্ত মানুষের মত—ইরা বললে।

মা, যাব ওদের সঙ্গে ?

ওঁকে জিজ্ঞাসা করি—পয়সাও চাই তো।

অমরনাথ শুনে কিছু গম্ভীর হলেন। বললেন, একদিন দেখতে পার—কিন্তু রোজ নয়।

কমলা বলে, আমিও যাব ভাই।

যাব বললেই কি এই কাপড়ে যাওয়া চলে ? বিশেষ করে সেজে-গুজে নিতে হবে না ?

ইরা বললে, বেশ ভাল করে সাবান দিয়ে গা ধুয়ে ভাল একখানা শাড়ী পরে নে। সেণ্ট পাউডার না থাকে, আমাদের ঘরে আয়, সাজিয়ে দেব।

ভাল কাপড় যা পাওয়া গেল—তা দেখে ইরা মীরা তো হেসেই আকুল। ওমা, এই শাড়ী—শাদা জমি—ক্যাটকেঁটে পাড়। আমাদের সঙ্গে গিয়ে এই পোষাকে বসলে আমাদেরই মাথা কাটা যাবে লজ্জায় ! ব্লাউজ নেই ? জামা রে ! দেখি নীলার ব্লাউজ যদি তোর গায়ে হয়—কাপড়টা আমিই দিচ্ছি। ওরাই কাপড় দিলে—জামা দিলে—এক জোড়া জুতোও জোগাড় করে দিলে। এ কি পাড়াগাঁয়ের নেমন্তন্ন বাড়ীতে যাওয়া যে—এক গা গহনা আর পুরোনো বেনারসী পরে খালি পায়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ? জুতো হল···বেশবাসের অগ্রশ্রী—অর্থাৎ একখানি প্লেন পাড় শাড়ী পরে একজোড়া যে-সে রকমের চটি জুতো পায়ে দিলে—সভ্য আর শিক্ষিত সমাজে মান সম্মান রক্ষা হয়। এখানে—কিংবা অন্যত্র মানটাই কি মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার মূল্য-মান নয় ?

অনেকক্ষণ লাগল সাজতে। কাপড়-পরা থেকে টিপ-পরা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হ'ল। মুখে পাউডার পাফ্‌টা বুলিয়ে কমলা মাকে সজ্জা দেখাতে এল। ভগবতী মেয়েকে দেখে অবাক—খুসী হলেন মনে মনে। কুঁচিয়ে শাড়ী পরে স্নো-পাউডার মেখে—এ যেন অন্য কোন আধুনিকা এসেছে দেখা করতে। আশ্চর্য্য—ওর মুখের হাসিটি পর্য্যন্ত বদলে গেছে। যে ফুল আগাছার মধ্যে ফুটে গন্ধ বিলোয়—তার শোভাটা রয়ে যায় অগোচরে—সেই ফুল তোড়া বেঁধে টেবিলে এলে অন্যরূপ। সত্যিই কমলা সুন্দরী—এ বাড়ীর যত মেয়ে আছে—সবার চেয়েই সুন্দরী ···ভগবতী মুগ্ধ চোখে মেয়েকে দেখতে লাগলেন।

অনেকেই চলেছে সিনেমা দেখতে। সেনদিদি পর্য্যন্ত। তিনি বললেন, এতগুলি কচি কাঁচাকে সামলে নিয়ে আসতে হবে তো। যে পথঘাট সহরের—একটা কিছু হোক তখন পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।

স-বাহিনী ফিরে এলেন নিরাপদে। কমলাকে দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে হেঁকে বললেন, যে যার সম্পত্তি বুঝে

নাও ভাই—আমি দায়ে খালাস। ধন্যি মেয়ের মন যা হোক—কেঁদে কেঁদে শাড়ীর আঁচল ভিজিয়ে দিলে গা।

রাত সাড়ে আটটা। অমরনাথ বই খুলে পাঠের উদ্যোগ করছিলেন—ভগবতী রান্নার পাট চুকিয়ে সেই মাত্র ঘরে ঢুকেছেন, সন্তুরা ক'ভাই পড়া শেষ করে একটা ছবির বই দেখছে—কমলা ঘরে ঢুকতেই মৃদু পুষ্পসার সৌরভে সকলেই কেমন যেন চমকিত হলেন।

অমরনাথ মেয়ের পানে চেয়ে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে—পাঠ্যবিষয়ের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ভাই বোনগুলি কলরব করতে করতে ছুটে এল—ভগবতী বললেন, এত রাত হল যে ?

ওরা তো বললে দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা লাগে। মা—কি সুন্দর বই। কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখলাম। সত্যিকারের ঝড়—মেঘডাকা—বিদ্যুৎ চমকানো—কমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

মেয়ের আনন্দে মা-ও খুসী হয়ে বললেন, আচ্ছা—কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে নে। তোদের সব একসঙ্গে খেতে দেব।

জ্যেঠিমা—খাবার খাওয়ালেন, মা। ডালমুট—বাদাম ভাজা, আর কচুরি দু'খানা করে। ওরা সব মিষ্টিজল খেলে—আমি খাইনি, বড্ড ঝাঁজ

বেশ করেছ। কাপড়খানা কি এখনই দিয়ে আসবি ?

অমরনাথ মুখ তুলে বললেন, কাকে কাপড় দেবে ?

খুকীকে ওরাই তো সাজিয়েছে—শাড়ী ব্লাউজ জুতো—

হুঁ—। অমরনাথ আরও গম্ভীর হলেন। নিজের যা ছিল তা পরে গেলে কি ক্ষতি হত।

ওরা নিজেরা সখ করে সাজিয়েছে মেয়েটাকে—সে কথা ওরাই জানে।

না মা, ওরা বললে এমন কাপড় পরে কেউ সিনেমা যায় নাকি ? এবার একজোড়া জুতো কিনে দিয়ো মা—না হলে পথে বার হওয়া যায় না।

বেশ তো—পথে বার হয়ো না—গম্ভীর স্বরে অমরনাথ উত্তর দিলেন।

কমলা চমকে উঠল—ভগবতীও। স্বামীর কণ্ঠে এমন গম্ভীর স্বর কদাচিৎ শোনা যায়। উনি নিশ্চয় রাগ করেছেন। কিন্তু রাগের কি এমন ঘটল। যেখানকার যা রেওয়াজ তা পালন করতে হবে তো। শহরের শাড়ী আলাদা—পোষাক আলাদা। দুধের সর মেখে মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি করার দিন আজ আর নাই—কৌটায় ভরে তার চেয়ে ভাল জিনিষ এসেছে। এসেছে পাউডার—ঠোঁট রাঙানো রং। একটি ছোট ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে পথ চলে মেয়েরা—তার মধ্যে যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রী। আয়না চিরুণী থেকে—ক্রীম পাউডার পর্য্যন্ত। মেয়েরা ওরই সাহায্যে সর্ব্বদাই শ্রীমতী থাকে। হয়তো সৌখীনতা—বেশ একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু যে দেশের যা।

অমরনাথ বললেন, আমরা যখন এখানকার নই—তখন নাই বা সাজলাম সং।

ভগবতী ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, সাজলেই বুঝি সং হয়ে যায় মানুষ ?

মানুষ তখন মানুষ থাকে কি ? ভগবান যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট—তার ওপর রং চড়ালে—

ভগবতী বললেন—এখানে তো তাই দেখি। তা যেখানে থাকতে হবে—চলতেও হবে সেখানকার মত। প্রথম যখন বিয়ে হয়ে আসি—দিনভোর ঘোমটা দিয়ে থেকেছি কলাবোয়ের মত, ঘোমটা যদি সরে গেছে একটু অমনি কত নিন্দে···কত ছিছি। এখন অমনি ঘোমটা দিক দেখি কেউ—হাসি ঠাট্টায় কানপাতা ভার হবে।

অমরনাথ হেসে বললেন, কালস্য কুটিলাগতি। আচ্ছা—ওদের খেতে দাও—কাপড় জামা কাল ফিরিয়ে দিয়ো।

খাওয়া শেষ হল সকলের। রাত্রির পাট সেরে ভগবতী এলেন ঘরে।

অমরনাথ বললেন, সত্যি বলছি, শহরের মানুষ দেখলে ভয় পাই। সেকাল বদলে গেছে—তবু একালটা বড় বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে যেন !

ভগবতী বললেন, যেমন করেই আসুক—সইতে হবে।

অমরনাথ বললেন, সে ঠিক। দক্ষিণা যা দিতে হবে তাতে সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে যাই—এই ভয়।

ভগবতী আশ্বাস দিলেন, না গো—অতটা ভয় করো না। তোমাদেরও তো একাল বলে একটা কাল ছিল—সে সময় তো কই—

বাবার সঙ্গে বনল না—শহরে চাকরি নিলাম। দুটি কালের মানুষ নিজেদের মানিয়ে চলতে পারে না।

থাক ওসব কথা—একটু পড়।

ভাল লাগছে না আজ—বড় ক্লান্ত হয়েছি।

ভগবতী সরে এলেন কাছে। অমরনাথের কপালে ডান হাতখানি রেখে—বললেন, একটু মাথা টিপে দেব ?

না—শুয়ে পড়। ভোর থেকে এই পর্য্যন্ত তুমিও তো কম খাটছ না।

কর ও কথার কোমল স্পর্শে দু'টি হৃদয় যেন দ্রবীভূত হয়ে গেল। ফিরে এল বহুদিনের হারাণো মুহূর্ত্তগুলি।

অমরনাথ বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যে মানুষ একদিন পৃথিবীতে থাকবে না—সেও ভাবে তার কালের মর্য্যাদা যেন নষ্ট না হয় কোনদিন। বড় আশ্চর্য্য, নয় ?

ভগবতী বললেন, সংসারে সবাই তাই ভাবে।

ঠিক—ঠিক। বলে অমরনাথ সুর ধরলেন !

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি বুঝিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শিশু-রাজ্যের রাজা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

শিশু-সাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা হিসাবে হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের জগৎজোড়া নাম। ঈশপের গল্প, বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' আর গ্রীসের পরী-উপাখ্যানের মতো হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের গল্পগুলিও নানা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে সারা জগতের শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। শুধু শিশুদেরই বা বলি কেন, বড়রাও এই গল্পগুলির সহজ সরল সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বলা হয় যে পৃথিবীর যেখানেই সেক্সপীয়র পঠিত হয় সেখানেই হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনও পঠিত হয়ে থাকেন।

ডেনমার্ক রাজ্যের একটি ছোট্ট দ্বীপ ফুনেন—তার অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর ওডেন্সা। এই শহরেই ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এক গরীব মুচির ঘরে হ্যানসের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন তাঁর গরীব পিতামাতার একমাত্র সন্তান। গরীব ঘরের ছেলে হলেও, একমাত্র সন্তান বলে হ্যানস্ ছিলেন তাঁর বাপ মায়ের আদরের দুলাল। হ্যানসের শিশুকালে তার বাবা সময় পেলেই হ্যানস্‌কে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথে বা প্রান্তরে বা বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। আর বেড়াবার সময় বালক হ্যানস্‌কে গাছ-লতাপাতা, ফুলফল, পশুপাখী ও প্রকৃতির অন্যান্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত করে দিতেন। হ্যানসকে প্রায়ই পাঠিয়ে দেওয়া হত তাঁর ঠাকুমা'র বাড়ী। ঠাকুমার কাছে তিনি শুনতেন অসংখ্য রূপকথার কাহিনী। শিশুকালের এই স্মৃতিগুলি হ্যানসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর কল্পনা-প্রবণতার সহায়ক হয়েছিল !

কিন্তু হ্যানসের কপালে এই সুখের দিনগুলি বেশী দিন টিক্‌ল না। অকালে বাবা মারা গেলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। মায়ের নূতন স্বামী হ্যানস্‌কে প্রতিপালন করতে নারাজ হলেন। কাজেই অতি অল্প বয়সে হ্যানস্‌কে এই বিপুল বিশ্বে নিজের স্থান করে নেবার ভার গ্রহণ করতে হল। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেও মায়ের প্রাণ ছোট হ্যানসের জন্য আকুল হয়ে উঠল। নিরুপায় মা হ্যানসের হাতে ধরে তাকে নিয়ে এলেন রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে। বিত্তার মূলধন অতি সামান্যই, আর্থিক সংস্থান আরও শোচনীয়। একমাত্র সম্বল সামান্য কিছু অভিনয় নৈপুণ্য। শহরে আসার উদ্দেশ্য, যদি কোন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ছোটখাট অভিনয়ে কিছু রোজগার হয়।

মা ও ছেলে শহরে ঢুকছেন। শহরের প্রবেশ পথে এক বুড়ী বেদেনীর সঙ্গে দেখা। বেদেনীরা ভূত-ভবিষ্যৎ গুণতে পারে। মা বেদেনীকে ছেলের ভবিষ্যত গুণে বলতে অনুরোধ করলেন। বেদেনী ভবিষ্যৎ-বাণী করল—এই ছেলে ভবিষ্যতে খুব নামজাদা লোক হবে। যখন এই ছেলে আবার তার নিজ শহরে ফিরবে সেদিন তাঁর সম্মানে সারা শহর আলোকমালায় সজ্জিত হবে।

একদিন এই বেদেনীর ভবিষ্যৎবাণী হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই সাফল্যলাভের পথটি ছিল দীর্ঘ ও অশেষ দুঃখসঙ্কুল। রাজধানীর বিরাট জনতা গ্রাস করে নিল সেই ছোট বালকটিকে। জীবন সংগ্রামের ফেনিল আবর্তে নিঃসহায়, নিঃসম্বল এই বালকটি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো কোথায় তলিয়ে গেল। পদে পদে বেদনা ও ব্যর্থতা এণ্ডারসনের গতিপথ বিঘ্নিত করে তুলল। কিন্তু তাঁর অন্তরের বহ্নি,—প্রতিভার দীপশিখা স্তিমিত হলেও চিরদিন ছিল অনির্বাণ এবং একদিন এই স্তিমিত ক্ষীণ দীপশিখাই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল ভাস্বর দীপ্তিতে।

দীর্ঘ পর্যটন ও দীর্ঘতর জীবন সংগ্রাম দুইই ঘটেছিল এণ্ডারসনের জীবনে। সাহিত্য ও শিল্প জগত প্রথমেই তাঁর কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেয় নি। কিন্তু ব্যর্থতার তীব্রতা ও জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হয়ে যে মোহন মানস লোকের সন্ধান হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসন পেয়েছিলেন তাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর অজস্র রচনায়—যে রচনার যাদু-

স্পর্শ শিশুমনকে যুগে যুগে আকৃষ্ট, আবিষ্ট করে আসছে। চিনামাটির মেষ-পালিকার সহিত চিনামাটির চিম্‌নি-ঝাড়ুদারের প্রেম, মৎস্য-কন্যা কর্তৃক রাজকুমারের বন্ধনমোচন, নাইটিঙ্গেলের গানে মুমূর্ষু চীনা সম্রাটের চিত্তবিনোদন ইত্যাদি হাজারো রকমের গল্প রচনা করেছিলেন এই প্রতিভাশালী সাহিত্য-স্রষ্টা।

একটা গল্প এখানে বলি। গল্পটার নাম আগ্‌লি ডাক্‌লিং—কুৎসিৎ হাঁসের বাচ্চা।

পাতিহাঁসের খোয়াড়ে পাঁচ ছয়টা ডিম ফুটি ফুটি করছে। এর মধ্যে একটা ডিম অন্যগুলির চাইতে আকারে বেশ বড়। হাঁসীর তাতে কি? কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে সে সবগুলি ডিমের উপরেই সমভাবে তা দিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ডিমগুলি ফুটতে শুরু করল, আর তা থেকে বেরুতে লাগল এক একটা প্যাঁক প্যাঁকে ছানা। ছানাগুলি ভারি সুন্দর—যেমন শাদা তেম্‌নি গোলগাল। বড় ডিমটা থেকে বেরুনো বাচ্চাটা কিন্তু সে রকম হ'ল না—এটার গায়ের রং বিশ্রী ধোঁয়াটে, আর দেখতে কিম্ভুত-কিমাকার বড়। মা হাঁসীটা তার ছোট সুন্দর বাচ্চাটিকে নিয়ে পুকুরে মনের সুখে সাঁতার কাটে। ঐ কুৎসিৎ বাচ্চাটাকে তেমন আমল দেয় না, কাছে এলে ঠোকর মেরে তাড়িয়ে দেয়। অন্য পাতিহাঁসেরা বলে, "হ্যাঁ লা, কোত্থেকে এই বিশ্রী ছানাটাকে আমদানী করলি, তাড়িয়ে দে তাড়িয়ে দে।" হাঁসী বলে, "আমার যেমন কপাল, এটা মলে বাঁচি।" অন্য বাচ্চাগুলির বেজায় দেমাক—রূপের অহঙ্কারে ফেটে পড়ে যেন। কুৎসিৎ বাচ্চাটাকে সবাই মিলে একযোগে তেড়ে আসে, বেচারী পালিয়ে বাঁচে।

দল ছাড়া ঘুরতে ঘুরতে এ-মাঠ সে-মাঠ, এ জলা সে-জলা, হয়ে কুৎসিৎ বাচ্চাটা এসে পড়ল এক বিস্তীর্ণ বিলে। চারদিকে দল-কলমী আর নোনা ঘাস—মাঝে মাঝে জল; কোথাও বা চারদিকে খালি জল যতদূর চোখ যায়। কোথাও ভ্যাপসা ধোঁয়া উঠছে—একটা উগ্র পচা গন্ধ। আশে পাশে ঘরবাড়ী লোকজন কিছু নেই। বিলে আছে সারস, কোরোমণ্ট, বুনো হাঁস ও অন্য কয়েক রকমের জলচর পাখী। এখানে ওখানে বিকট স্বরে ব্যাঙের গোঙানি চলেছে। এখানে এসে "হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল" ভেবেছিল সেই কদাকার হাঁসের বাচ্চাটা। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ রইল না। হঠাৎ সে যে জলাশয়টার ধারে বসে ছিল সেখানে উড়ে এসে বসল কয়েকটা বুনো হাঁস। তাদের চাল-চলন অন্য ধরণের, ভদ্যতার ধার মোটেই ধারে না। বিনা ভূমিকায় ওকে তেড়ে এল। বুনোগুলির গায়ের জোরও বেশী—আর তারা সংখ্যাতেও পাঁচজন, ওদের সঙ্গে ও পারবে কেন। পাশের নল খাগড়ার ঝোঁপে ঢুকে কোন মতে প্রাণ বাঁচাল। এমন সময় হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম—তুমুল গর্জন আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বুনো পাঁচটার তিনটা রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল জলে। লালে লাল হয়ে গেল জল। একটা আহত হয়ে কলমী দামের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যটা ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে মিলিয়ে গেল বুকফাটা আর্তনাদ করতে করতে। যে তিনটি জলে লুটিয়ে পড়েছিল তার দুটো একেবারেই খতম হয়ে গিয়েছে, তৃতীয়টার তখনো ঝটফটানি শেষ হয়নি। ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ—কোথা থেকে সাক্ষাৎ যমদূতের মত দুটো কালো শিকারী কুত্তা সেখানে ছুটে এসেছে। শিকারিদের গুলীতে হাঁসগুলি বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই ডালকুত্তারা ছুটে এসে শিকার কুড়িয়ে নিয়ে যায়। যে হাঁসটা তখনও ছটফট করছিল একটা ডালকুত্তা প্রথমেই সেটার ঘাড়ে কামড়ে ধরল—সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা। বাকি হাঁস দুটোকেও মুখে করে নিয়ে গেল ডালকুত্তারা। ভাগ্যিস নলখাগড়ার ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় নিতে পেরেছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল সেই বিশ্রী বাচ্চাটা, ডালকুত্তাগুলির সামনে পড়লে আর রক্ষা ছিল না।

বিলটাও নিরাপদ নয়। বুনো হাঁস শিকার করতে আসে মাংসলোভী শিকারীরা দলে দলে, তাই আবার শুরু হল পথ চলা। এবারে আশ্রয় মিললো বড় সড়কের ধারে এক বুড়ীর ঘরে। বুড়ী আর তার মেয়ে থাকে

হ্যান্‌স্‌ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসন

সেখানে। বুড়ী বেজায় গরীব, বুড়ীর মেয়েটার আবার তিরিক্ষি মেজাজ। বুড়ীর বাড়ী বলতে একটি মাত্র কুঁড়ে ঘর—একই ঘরে রান্না খাওয়া ও শোয়া। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের বাইরে একটা বেতের ঝুড়িতেই আশ্রয় নিতে হল, কারণ সন্ধ্যা হতে না হতেই বুড়ী আর মেয়ে ঘরের দরজা এঁটে দিয়েছে। ভাগ্যিস সেই ঝুড়িটার মধ্যে ছিল খানিকটা খড়-কুটা বিছানো, নইলে দারুণ শীতে বেচারীর প্রাণে বাঁচাই দায় হত।

ভোর না হতেই বুড়ীর মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে আর দুয়ার খুলে বাইরে এসেই সেই ঝুড়িটা নিয়ে রওনা হয়েছে বাগানের দিকে। ঝুড়িটা ধরতেই হাঁসের বাচ্চাটা প্যাঁক্‌ শব্দ করে উঠেছে। বুড়ীর মেয়ে তখন হাঁসটাকে গলা ধরে তুলে ধরেছে। "আরে কোত্থেকে এল এই বিশ্রী বাচ্চাটা,

দূর হ'য়ে যা, বলেই এক ঝটকা মেরে দিয়েছে সেটাকে এক আছাড়। আছাড় খেয়ে হাঁসটা, প্রাণ ভয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকেছে বুড়ীর ঘরে। সেখানেও কি নিস্তার আছে? বুড়ী দেখতে পেয়েছে সেটাকে আর অমনি লাগিয়েছে এক তাড়া, তাড়ার পর তাড়া খেয়ে বেচারীর মাথা হয়ে গেছে গোলমাল। কি করবে, কোথায় যাবে? দিশেহারা হয়ে দিয়েছে শূন্যে এক লাফ,—আর পড়বি তো পড় এক ময়দার গামলায়। সারা গায়ে পাখায় পালকে লাগল ময়দার গুড়ো। একেই তো যা চেহারা তার উপর ময়দার ছোপ—আহা কি ছিরি! বুড়ী আর বুড়ীর মেয়ে যা-তা বলে গালাগাল দিতে লাগল। গালাগাল আর তাড়া খেয়ে বেচারী পাগলের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছে। এ দুনিয়ায় তার স্থান নেই—তার কদাকার চেহারাটা সকলেরই চক্ষুশূল,—ধিক এই বিড়ম্বিত জীবনে।

বুড়ীর বাড়ী হতে তাড়িত হয়ে হাঁসটা এক শরবনে আশ্রয় নিল। সুখে না হলেও অনেকটা সোয়াস্তিতে কাটল কয়েকটা দিন। কিন্তু সেখানে খায় কি? আহারের অন্বেষণে আবার বেরুতে হল সেই আশ্রয় ছেড়ে। এবার খানিকদূর গিয়েই দেখতে পেল এক ধনীর সুরম্য উপবন। সেই উপবনের মধ্যস্থলে আছে এক প্রশস্ত সরোবর। কাকচক্ষুর মতো নির্মল নিস্তরঙ্গ তার জল। কী মনোরম পরিবেশ। বিরাট উদ্যান চারিদিকেই সুদৃশ্য তরুলতা আর অজস্র রঙীণ ফুলের বাহার। হাঁসটা শেষবারের মতো এখানেই তার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে—মনে মনে স্থির করল। যদি এখানেও আশ্রয় না জোটে তবে এই বিপুল বিশ্বে আর তার স্থান নেই। জীবনের বিড়ম্বনা আর সে সইতে পারবে না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সরোবরের দিকে। ধীরে ধীরে জলে নামল। তীরের আশে পাশে জলজ ঘাস আর শেওলায় খুঁজতে লাগল আহার্য। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তার নজরে পড়ল আর এক দৃশ্য। বিপরীত দিক হতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে ভাসতে ভাসতে দুইটি বৃহদাকার রাজহাঁস। তার মনে হল যেন দুটি সাক্ষাৎ যমদূত। উদ্যত চঞ্চু প্রত্যক্ষ মরণ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আর পালাবার পথ নাই, নিস্তার নাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার এই কদাকার ঘৃণিত দেহটা ওদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে জর্জরিত হবে। এই চরম সঙ্কটে সে হয়ে উঠল মরীয়া। এতদিন বিনা প্রতিবাদে পড়ে পড়ে মারই খেয়েছে—প্রতিপক্ষের সামনা-সামনি দাঁড়াবার মতো ছিল না কোন সাহস। কিন্তু আজ, জীবনে এই প্রথম, তার পৌরুষ জাগ্রত হল,—মরতেই যদি হয় যুঝেই মরব। তাই স্থির হয়ে সে প্রত্যক্ষ মরণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্রমে সেই রাজহাঁস দুটো তার কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু এ কী! আক্রমণ দূরে থাকুক সেই আগন্তুক দুজন তাদের সুঠাম বঙ্কিম গ্রীবা উন্নত করে তাকে জানাল স্বাগত অভিনন্দন—"হে তরুণ সুকান্তি রাজহংস, আজ এই রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে আমরা তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি রাজহংসকুলের সুযোগ্য প্রতিভূ, হে সুন্দর, হে নবীন তুমি প্রবীণের সস্নেহ সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আগামী দিনের সূর্য তোমারি জন্য উদিত হবে। তারুণ্য ও সৌন্দর্যের জয় হউক।"

নিজের কর্ণকেই প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি। "একি সত্যি যা শুনছি—একি স্তুতিবাক্য না প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ!" এইবার হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল নির্মল স্বচ্ছ জলে তার নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি। "এ কী, এ যে স্বপ্ন অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর! কোথায় সেই কুৎসিৎ হাঁসের বাচ্চা! তার পরিবর্তে দুগ্ধশুভ্র, উন্নতগ্রীব, রক্তচঞ্চু মহিমময় এক তরুণ রাজহংস। এও কী সম্ভব! কখন ঘটেছে এই রূপান্তর তার নিজের অজ্ঞাতসারে! দুঃখ, বেদনা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই ঘটেছে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন, এই রোমাঞ্চকর রূপান্তর। ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত জীবনে ঘটেছে মহিমার নব অরুণোদয়।

আজ তার উপলব্ধি হল—পাতিহাঁসের খোঁয়াড়ে জন্ম নিলেও কোন ক্ষতি নেই যদি রাজহংসের ডিম হতে সে জন্ম লাভ হয়। এই হল হানস্ ক্রীশ্চিয়ান এণ্ডারসনের জীবনদর্শনের একটা প্রধান কথা।

চিরসাথী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ইন্দিরা দেবীর সমাধি-শ্রুত মীরা ভজনের অনুবাদ)

জনমে মরণে হে নাথ আমার—দুঃখ সুখের সাথী!
কেমনে জীবন যাপি—তোমা বিনা কোথা আনন্দ ভাতি?
আমারে শোনাবে যে তোমার গান—বন্ধু তারেই কব।
সেই পিতামাতা সন্তান ভাই—দেখাবে যে পথ তব।
কোথায় মিলাবে কে শ্যামলে—তারেখুঁজি আমি দিন রাতি।
জনমে মরণে হে নাথ আমার—দুঃখ সুখের সাথী!

প্রেমের লগন নয় তো খেলার—যে পায় ব্যথা সে জানে।
এ-পথে একেলা চলে বিরহিনী—স্বজনেরে পর মানে।
তোমা বিনা সে কি রয় ঘরে—ওঠে যে মুরলীসুরে মাতি?
জনমে মরণে হে নাথ আমার—দুঃখ সুখের সাথী!
তোমা বিনা কারে গণিব আপন—বাসিব কাহারে ভালো?
তুমি হ'লে বঁধু এ-জগত মধু—তোমা বিনা কোথা আলো?

জনমে জনমে দাসী মীরা গায় নাম তব দিবারাতি।
জনমে মরণে হে নাথ আমার—দুঃখ সুখের সাথী!

সাধন-সঙ্গীত

আছি মা সেই আশা করি।
তোর, অভয় চরণ করে শরণ
সকল গহন যাব তরি ॥

তোর কাছে কি চাইতে হয় মা
তুই যে নিজেই শুভঙ্করী,
না চাইতে যা দিলি আমায়
তাতেই জীবন গেল ভরি ॥

তোর কৃপা মা লভে যে-জন
সে কি রয় আঁধারে পড়ি,
অশিব অসার যা কিছু তার
আপনা হতে যায় মা ঝরি ॥

তোর দেওয়া এ জীবনখানি
তোরই পায়ে দিলাম ধরি,
তারে, তোরই মনের মতন করে
নিপুণ হাতে নে মা গড়ি ॥

কথা—অনিলবরণ রায় ঃ সুর ও স্বরলিপি—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্‌া সা -া রা রমা মজ্ঞরা]

II { রা রজ্ঞমা -মজ্ঞা | রা সা -রা I সনা সা -া | রজ্ঞা -জ্ঞরা -সরা I
{ আ ছি০০ ০ মা সে ই আ শা ০ ক০ ০ ০০

I পা -া -া | -া (পা -া)} I -া -া I মা পা -মা | পা ণা -া I
রি ০ ০ ০ তো র্ } ০ ০ অ ভ য়্ চ র ণ্

I ধা ধণর্স র্ণা -ধণা | ণধা পধা -মা I মা পা -া | পা র্সা -া I
ক রে০০০ ০০ শ র০ ণ্ স ক ল্ গ হ ন

I জ্ঞা জ্ঞা -মা | রা সা -া II
যা ব ০ ত রি ০

II { মা -া পা | পা ণধা -পধা I না -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I
তো র্ কা ছে কি ০ ০ চা ই তে হ য়্ মা

I র্সা -না র্সা | র্রা র্রা -া I র্রা র্সর্রম র্মজ্ঞা -র্রজ্ঞা | জ্ঞর্রা র্সা -া } I
তু ই যে নি জে ০ শু ভ ০ ০ ০ ০ ঙ্ ক রি ০

[পা র্সা না]
I র্সা র্সা -না | র্সা র্রা -া I ধর্সা র্সণা -া | ণধা পধা -মা } I
না চা ই তে যা ০ দি ০ লি ০ আ মা ০ য়্

I মা পধা -ণর্সা | র্সণা ধপা -া I মপা মগা -রগা | গা মা -া II
তা তে ০ ০ ই জী ব ন্ গে ০ ল ০ ০ ভ রি ০

II সা -জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I রমা মজ্ঞা -া | জ্ঞরা সরা -না I
তো র্ রু পা মা ০ ল ০ ভে ০ যে জ ০ ন্

I সা ধা -া | ধা ধা -া I ধা পধা -র্সণা | ণা ণা -া I
সে কি ০ রয়্ আঁ ০ ধা রে ০ ০ ০ প ড়ি ০

I ণা ণধা -র্সা | র্সা র্সা -া I নর্সা -র্রা র্রর্গ র্গর্রা | র্সনা -র্রর্সা -া I
অ শি ০ ব্ অ সা র্ যা ০ ০ কি ০ ০ ছু ০ তা র্

I পা ধা ণর্র র্রর্সা | ণধা র্সণা -ণধা I পধা র্সণা ণধা | পমগা মা -া II
আ প না ০ ০ হ ০ তে ০ যা ০ ০ য়্ মা ঝ ০ রি ০

II মা -া পা | পা ণধা -পধা I না র্সা -া | র্সা র্সা -া I
তো র্ দে ওয়া এ ০ ০ জী ব ন্ খা নি ০

I র্সা র্সা -নর্সা | র্রা র্রা -া I র্রা র্সর্রম র্মজ্ঞা -র্রজ্ঞা | জ্ঞর্রা র্সা -া I
তো রি ০ ০ পা য়ে ০ দি লা ০ ০ ০ ০ ম্ ধ রি ০

I র্সা র্সা -না | র্সা র্রা -া I ধর্সা র্সণা -া | ণধা পা মা I
তো রি ০ ম নে র্ ম ০ ত ন্ ক রে তারে

I পর্সা র্সা -না | র্সা র্রা -া I ধর্সা র্সণা -া | ণধা পধা -মা I
তো ০ রি ০ ম নে র্ ম ০ ত ন্ ক রে ০ ০

I মা পধা -ণর্সা | র্সণা ধপা -া I মপা মগা -রগা | গা মা -া II II
নি পু ০ ০ ণ হা তে ০ নে ০ মা ০ ০ গ ড়ি ০

প্রতিভা-পরিচিতি

পর্য্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হেন্‌রি লেয়ার্ড

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষের কর্মজীবনে তাঁর ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভা যে কখন্ কোন্ পথে বিকাশ লাভ করে সে এক বিচিত্র রহস্য। ছিলেন কবি, হলেন রাজনীতিক, বাল্যকালে যিনি ছবি আঁকতেন, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি হলেন বৈজ্ঞানিক, যিনি ছিলেন মাছি-মারা কেরাণী, উত্তরকালে সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটল—এমনধারা দৃষ্টান্ত জগতে একাধিক পাওয়া গেছে দেশের এবং বিদেশের বহু প্রতিভাবান পুরুষের জীবন চরিতে।

বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হেন্‌রি লেয়ার্ড

বিলাতের বিত্তশালী বনেদী ঘরের ছেলে হেনরি লেয়ার্ড্-এর জীবনও এমনি একটি দৃষ্টান্ত। আইন পাশ ক'রে এটর্নী আপিসের কূট-কচালে কাজের মধ্যেই তাঁর জীবন কাটবার কথা। কিন্তু সেই জীবনের মোহপাশ ছিন্ন ক'রে, অজানাকে জানবার সাধনায়, পৃথিবীর প্রাচীন রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করবার দুঃসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হোয়ে হেন্‌রি লেয়ার্ড যে-জীবনকে বরণ করে নিলেন সে জীবনের ইতিবৃত্ত এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। পথে নামবার আগে তিনি নিজেও বোধ করি কল্পনা করতে পারেন নি, পর্য্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে শেষ পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সঙ্গে সমান আসন লাভ করবেন।

নিনেভের একটি গুহা। দড়ির সাহায্যে কর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক লেয়ার্ডকে সেই গুহার মধ্যে নামিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে। গুহার মধ্যে পাথরের গায়ে ২৫ ফুট উঁচু মূর্ত্তি সকল খোদিত রয়েছে

হেনরি লেয়ার্ড-এর বাল্য-জীবন কেটেছে কখনো দেশে, কখনো বিদেশে ; এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাঁর বাবা মা স্বাস্থ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর সেই সঙ্গে চলেছে তাঁরও দেশভ্রমণ। ১৮১৭ সালের

৫ই মার্চ্চ প্যারিসের এক হোটেলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মা সে-সময় ফরাসী দেশ ভ্রমণ করছিলেন। হেনরির জন্মের পর তাঁরা দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু বিলাতের আবহাওয়া হেনরির বাবার সহ্য হোল না। ডাক্তার হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলেন। তাঁরা গেলেন ইতালীতে এবং ফ্লোরেন্স শহরে বাসা বাঁধলেন। সেইখানেই বালক হেনরির লেখাপড়া শুরু হল। মাতৃভাষা শেখবার আগেই হেনরি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিখে ফেললেন। নিজের আত্ম-জীবনীতে পরবর্তীকালে লেয়ার্ড লিখছেন, "ছেলেবেলায় ইস্কুলে ভাল পড়ুয়া ছিলাম না মোটেই। আলসে, একগুঁয়ে এবং দাঙ্গাবাজ বলে আমার অনেক অখ্যাতি ছিল। চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রতি আমার বাবার প্রবল ঝোঁক ছিল। তাঁর কাছে ব'সে আমি তাঁর ছবি আঁকা দেখতাম, তাঁর সঙ্গে সারাদিন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত

লেয়ার্ড ও তাঁর ভৃত্য সালে। সালের হাতে একটি পিস্তল দেখা যাচ্ছে। এই পিস্তল চালিয়ে সে তার প্রভুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল

আর্ট গ্যালারিগুলিতে ঘুরে বেড়াতাম। শিল্পকাজ ও প্রাচীন সুন্দর জিনিষের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই একটি বিশেষ অনুরাগ জন্মেছিল মনে।"

*   *   *   *

কিছুদিন ফ্লোরেন্সে, কিছুদিন জেনেভায়, কিছুদিন ফরাসী দেশে জীবন অতিবাহিত করবার পর ১৮৩৪ সালে হেনরির খুল্লতাত অস্টেন লেয়ার্ড তাঁকে নিজের কাছে রেখে তাঁকে তাঁর এটর্নী আপিসে শিক্ষানবীশরূপে ভর্ত্তি করে নিলেন। এটর্নীর আপিস, মামলা আর তদ্বির—হেনরি লেয়ার্ডের কাছে সে-সব ছিল অসহনীয় পরিবেশ! কিন্তু উপায় নেই। নির্দ্ধারিত হয়েছে তাঁর জীবন এই পথে। তাঁর বাবা জানিয়ে দিয়েছেন, কোন আপত্তি চলবে না। আত্মজীবনীতে তিনি বলছেন—"আইনজীবীর কারখানা যেন আমাকে অহরহ পিষে মারতে লাগল। পরীক্ষা দেবার জন্তে মোটা মোটা আইনের কেতাব আমায় উপহার দিয়েছেন স্নেহময় খুড়ো। সেগুলিকে প'ড়ে শেষ করতে হবে! খুল্লতাতর বিস্তর পয়সা, প্রভূত প্রতিপত্তি। তাঁর ঘরে বহু গণ্যমান্তের আনাগোনা। আসতেন বেন্‌জামিন ডিস্‌রেলি লাল-ফুল-দেওয়া জুতো পরে, যেন "পানসির বাবু"; লোকটার কী তেজ আর দম্ভই না ছিল! কত কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, অবজ্ঞাভরে অন্যদিকে চেয়ে থাকতেন, উত্তর দিতেন না।"

এই সময় খ্যাতনামা প্রবন্ধ-লেখক হেনরি ক্র্যাব্ রবিন্‌সন্-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। প্রতি রবিবার রবিনসন তাঁর বৈঠকখানায় সাহিত্য মজলিশের আয়োজন করতেন। সেই সব আড্ডায় যোগ দিতেন লেয়ার্ড। নিত্য নতুন কথা শুনতেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ বড় বড় কবিদের সান্নিধ্যলাভ করতেন, রবিনসনের সহস্র-কেতাব পুষ্ট লাইব্রেরীতে তাঁর
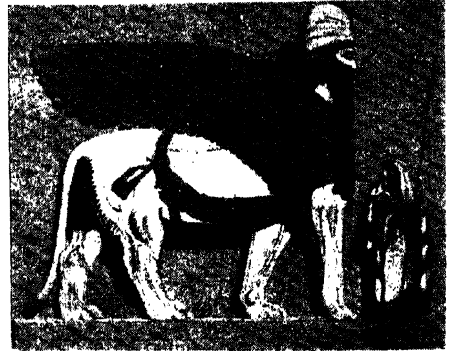
লেয়ার্ডের আবিষ্কৃত একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি। নিমরাড প্রাসাদের একটি তোরণদ্বারে বসানো ছিল

ছিল অবাধ গতিবিধি, সেই লাইব্রেরীতে ব'সে পড়তেন ভ্রমণের বই, পুরাতত্ত্বের কাহিনী, প্রাচ্যদেশের অপূর্ব্ব রহস্যময় অনাবিষ্কৃত দেশগুলি সম্বন্ধে মোহময় বর্ণনা। পড়তে পড়তে তন্ময় হোয়ে যেতেন লেয়ার্ড। ইট কাঠ ঘেরা ঘরের দেওয়াল চোখের সামনে অবলুপ্ত হ'ত, নদী আর সমুদ্র পেরিয়ে চলে যেতো তাঁর মন, উত্তুঙ্গ পাহাড় আর ভয়ঙ্কর মরুভূমির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেন তিনি, বেদুইনের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন অসীম দিগন্তের পানে। দিন গুণতেন, কবে তাঁর সত্যিকারের যাত্রা শুরু হবে।

*   *   *

১৮৩৯ সালে লেয়ার্ড এটর্নীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ে আইনজীবীরূপে নাম লেখালেন। "নেশার আমেজ মনে লেগে আছে, কিন্তু সামনে যে জীবন তার বিধান বড় কঠোর, আইনের প্যাঁচে তা যেমন ঘোরালো তেমনি পঙ্কিল। কিন্তু উপায় নেই, সেই জীবনকেই বরণ ক'রে নিতে হল।"

সেই বছর তাঁর পরিচয় হল এডওয়ার্ড মিটফোর্ড নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে এবং এক মুহূর্ত্তে সেই পরিচয় তাঁর জীবনের গতিকে ঘুরিয়ে দিলে! মিটফোর্ডের ছিল নানাদেশে কফির ব্যবসা। সিংহলে ছিল বড় ঘাঁটি। মিটফোর্ড জানালেন, তিনি স্থলপথে ইউরোপ, মধ্যএসিয়া ও ভারতবর্ষ অতিক্রম ক'রে সিংহল যাবেন মনস্থ করেছেন; লেয়ার্ড যদি ইচ্ছা করেন, তাঁর সঙ্গী হোতে পারেন।

ইচ্ছা করবেন না আবার! এ যে তাঁর জন্মজন্মান্তরের সাধ! লেয়ার্ড পাগলের মতো ব্যস্ত হলেন। নিমেষে বাক্স বিছানা বাঁধা হোয়ে গেল। পড়ে রইল, এটর্নীর আপিস, মক্কেলদের মামলা গেল ভেসে, শেষ রাত্রির অন্ধকারে হেনরি লেয়ার্ড বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর পথে অগ্রসর হলেন। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসের প্রত্যূষে লণ্ডনের বন্দর থেকে তাঁদের ষ্টীমার ছাড়ল।

পাথরের উপর উৎকীর্ণ মৎস দেবতা। ফিলিষ্টাইনরা এ দেবতার পূজা করত এইরূপ অনুমান করা হয়েছে

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দুই দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, কখনো নৌকায়, কখনো ঘোড়ার গাড়ীতে, কখনো বা পায়ে হেঁটে বহুদেশ পার হোয়ে কনষ্টান্টিনোপল্-এ পৌছলেন। পথে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন লেয়ার্ড। সারতে সময় লাগল এক মাস। বন্ধু বললেন—"তুমি বরং ফিরে যাও। অসুস্থ শরীরে পারবে না।" লেয়ার্ড বললেন—"ফেরবার পথ জানা নেই। ফিরবো বলে তো বেরুই নি। সুতরাং তাবু ওঠাও বন্ধু।"

এবার পথ বড় দুর্গম, অতি অপরিচিত। এসিয়া মাইনর নামে ভূখণ্ড তখন বন্য বর্ব্বর জাতিদের দ্বারা সমাকীর্ণ, তারা তুর্কি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও পরোয়া করে না। তাদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। দিনমান কাটতে লাগল পথ পরিক্রমায়, রাত্রি যাপিত হতে লাগল সতর্ক প্রহরায়। প্যালেষ্টাইনে তাঁরা সাক্ষাৎ পেলেন লেডী হেস্‌টার নাম্নী সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়া সমাজ-নেত্রীর। তারপর টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী পার হোয়ে পৌছলেন আরব্য-রজনীর দেশ বাগদাদে।

বাগদাদে দু'জনে স্থির হোয়ে বসলেন কিছুকাল। পরবর্ত্তী ভ্রমণ-তালিকা প্রস্তুত হতে লাগল। ইরাণ হয়ে আফগানিস্তানের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় অতিক্রম করে তাঁরা পৌছবেন ভারতে। তারপর সেখান থেকে সিংহল তো হাতের মুঠোয় ধরা যাবে। বাগদাদে অবস্থানকালে লেয়ার্ড পারসিক ভাষা শিখতে লাগলেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁর দুর্লভ স্বাভাবিক

পার্লামেন্টের সভ্যরূপে স্যর হেনরি লেয়ার্ড

পটুতা ছিল। অল্পদিনেই তিনি আর-একটি দুরূহ বিদেশীভাষা রপ্ত করে নিলেন।

হারুণ-অল-রসিদের রাজধানীতে পৌছেই লেয়ার্ড ব্যাবিলন পরিদর্শন করলেন। ডায়েরীতে লিখলেন—"প্রাচীন ব্যাবিলনের স্তূপগুলি দেখে মনের মধ্যে যে কী প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। নিনেভার পিরামিড দেখে তার ভিতরকার রহস্য জানবার জন্যে অদম্য বাসনা জাগ্‌ল।"

ব্যাবিলনে এসে লেয়ার্ড প্রত্নতত্ত্বের প্রতি যে দুনিবার আকর্ষণ অনুভব করলেন তা তাঁর সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করল। স্থির করলেন, এ ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য আর কোন কাজ নেই। ব্যাবিলন থেকে বাগদাদে ফেরবার সময় সহসা এক চরম বিপদের মুখে পড়লেন তিনি। টাইগ্রিস নদী দিয়ে যে-ষ্টীমারে তাঁর ফেরবার কথা, দূর থেকে দেখলেন, সেই

ষ্টীমারের মাস্তুল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, অর্থাৎ ষ্টীমার এখনি ছাড়বে! সর্ব্বনাশ! জাহাজ থেকে তিনি যে তখন অনেক দূরে! এ-ক'দিন তিনি মরুভূমির প্রান্তে পিরামিডের রহস্য আর সৌন্দর্য্য দেখে সময় অতিবাহিত করছিলেন, ষ্টীমারের কাপ্তেনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন নি! ছুটতে লাগলেন তিনি। এই ষ্টীমার ধরতে না পারলে বাগদাদে ফেরা যাবে না, এই মরুভূমির মধ্যেই তাঁকে দিন রাত কাটাতে হবে! সে বড় ভয়ঙ্কর কথা! নদীর কাছ বরাবর গিয়ে দেখলেন, তীরে যাবার পথ নেই, কাদা জল আর খালে-বিলে স্থানটি দুর্গম। জামা খুলে ফেলে নামলেন সেই এঁদো জলকাদার মধ্যে। হাত উঁচুতে তুলে চীৎকার করতে লাগলেন। ষ্টীমার তখন নোঙর তুলেছে! অনেকক্ষণ পরে যখন আর শরীরে কোন বল নেই, মাথা ঝিমঝিম করছে, হাত পা অবশ হোয়ে আসছে, তখন তিনি জানতে পারলেন, ষ্টীমার থেমেছে এবং একটি ছোট নৌকা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে তিনি ষ্টীমারে গিয়ে উঠ্‌লেন। জাহাজের কাপ্তেন তো তাঁকে দেখে অবাক! তিনি মনে করেছিলেন, লেয়ার্ড হয়ত স্থলপথে অন্য কোন উপায়ে ইতিমধ্যে বাগদাদে চলে গেছেন।

* * * *

ব্যাবিলনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজ স্থগিত রেখে লেয়ার্ড স্থির করলেন, মিটফোর্ড-এর সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবেন প্রথম। পারস্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের তখন মন কষাকষি চলেছে খুব। এই যাত্রার প্রতিপদে তাঁরা পারস্য সরকারের কাছ থেকে বাধা পেতে লাগলেন। ইস্পাহান অভিমুখে গমন কালে তাঁদের আটক করা হল। বলা হল, সাহার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি-পত্র ব্যতীত তাঁদের আর অগ্রসর হোতে দেওয়া হবে না। মাসের পর মাস কেটে গেল। কিন্তু অনুমতি-পত্র আর আসে না। তখন মিট্‌-ফোর্ড বিরক্ত হোয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে পথ-পরিক্রমার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে প্রত্যাবর্ত্তন করবার আয়োজন করলেন। লেয়ার্ড তাঁর ফেরার পথে সঙ্গী হলেন না। দু'জনের ছাড়াছাড়ি হল। লেয়ার্ডের আশা ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তিনি পারস্য সরকারের অনুমতি লাভ করে পারস্য পার হোয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছতে পারবেন।

মিটফোর্ড চলে গেলেন। লেয়ার্ড একাকী তাঁর প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা আর অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হলেন। নানাস্থানে ঘুরে নানা দুর্লভ জিনিষ সংগ্রহ করলেন। আলেকজান্দারের পর কোন মানুষ যেসব স্থানে পদার্পণ করেনি সেই সব দুর্গম জায়গা তিনি ঘুরে এলেন। তিন তিনবার আরব-দস্যুরা তাঁর মালপত্র লুঠ করে নিলে। অবশেষে তিনি যখন বাগদাদে ফিরে সেখানকার ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর পরণের পাৎলুন আর শার্ট ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেই।

তারপর বাগদাদের আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করলেন তিনি। সেই অভিযানগুলি সম্পর্কে তিনি লিখছেন—

"প্রতি পদে বিপদ, আর প্রাণ তো হাতের মুঠোয়……লুঠেরার দল হানা দিয়েছিল আমার শিবিরে, তবে বেশী নয়, একবার! শুস্টারে প্রবেশ করে দেখলাম, বাজারের কাছে রাস্তার পাশে একজন পুরানো বন্ধুর ছিন্ন মস্তক গড়াগড়ি যাচ্ছে……চারিদিকে যেন মৃত্যুর শীতলতা!"

যে সব জিনিষ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি নিয়ে ১৮৪২ সালের ৯ই জুলাই কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌-এ পৌঁছলেন। সেখানকার রাজদূত তখন ভাইকাউণ্ট্ ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড। জবরদস্ত রাজপুরুষ ছিলেন তিনি। লেয়ার্ডকে তিনি নানা ছোটখাটো কূটনৈতিক কাজে নিযুক্ত করলেন।

একটি প্রকাণ্ড আসিরিয় মন্দিরের এক বিরাট প্রকোষ্ঠের অংশগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে লেয়ার্ড উদ্ধার করেন; তারপর সেগুলিকে যথাস্থানে সংস্থাপিত ক'রে প্রকোষ্ঠটিকে পুনঃসজ্জিত করা হয়। লেয়ার্ডের বিস্ময়কর সংগ্রহগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের এক বিশেষ বিভাগে সংরক্ষিত আছে

কিন্তু সে সব কাজে লেয়ার্ডের কোন আনন্দ ছিল না। হাতে পয়সা নেই, কাজে নেই উৎসাহ, জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বিষহ বলে মনে হচ্ছে, এমন সময় তিনি শুনলেন, এম, বোটা নামে একজন ফরাসী নাগরিক খোর্সাবাদে প্রত্ন-তত্ত্বের কাজ চালাবার জন্যে তাঁর দেশের সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই তিনি অনেক জিনিষ আবিষ্কার করেছেন। এই খবর শুনে অস্থির হোয়ে উঠ্‌লেন লেয়ার্ড। তাঁর জীবনের সাধনা কি ব্যর্থ হবে শেষ পর্য্যন্ত! এত দূর এসে কাজ অসমাপ্ত রেখে রিক্ত হস্তেই কি তাঁকে দেশে ফিরতে হবে? উপস্থিত হলেন উপরওয়ালা ষ্ট্র্যাটফোর্ডের কাছে এবং তাঁর কাজের একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন। ভাইকাউণ্ট ষ্ট্র্যাটফোর্ড প্রায় এক কথায় রাজী হলেন। তখন লেয়ার্ডের আনন্দ দেখে কে? চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেই বছরের অক্টোবর মাসেই

তিনি লোকজন নিয়ে তাঁর বিরাট যাত্রা শুরু করলেন। ৯০০ মাইল পথ পার হোয়ে নিমরাড নগরের কাছে গিয়ে তাঁবু পড়ল। আশেপাশে যেসব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল তাদের খননকার্য্য আরম্ভ হল। ১০ই নভেম্বর তিনি লিখলেন—"বর্ত্তমানে যে-স্তূপটি খনন করছি তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ ফুট, প্রস্থ ৯০০ ফুট এবং উচ্চতা ৬০ বা ৭০ ফুট।" ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই অনেক খোদাই-কাজ এবং মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হল; বার হোতে লাগল একটি বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাংশ। ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি লিখলেন—"একটি লুপ্ত সভ্যতা ধীরে ধীরে চোখের সামনে হাজির হচ্ছে এন। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন সংগ্রহ হাতে আসছে। এইমাত্র দুটি চমৎকার সিংহ পেলাম। ১৪ ফুট লম্বা আর ১৬ ফুট উঁচু নীরেট কালো পাথরের উপর তারা খোদাই করা। হাজার বছর ধ'রে তারা মাটির তলায় আত্মগোপন করেছিল, আজ আলো বাতাসের স্পর্শ পেয়ে যেন সজীব হোয়ে উঠেছে।"

* * * * *

তাঁর বিস্ময়কর কার্য্যকলাপের বিবরণ কনস্তান্তিনোপল-এর দূতাবাসের মাধ্যমে ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের লোকের কাছে পৌঁছতে লাগল। নানা দেশের পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখালেখি শুরু হ'ল। এদিকে তিনি আবার বিপদে পড়লেন। স্থানীয় আদিবাসীদের এক বুড়ো সর্দ্দার তাঁর পিছনে লাগ্‌ল। লোকটা রটনা করতে লাগল, সাগর পেরিয়ে এই সাদা-চামড়ার বিধর্ম্মী তাদের দেশের টাকা সোনা মোহর সব লুঠ ক'রে নিতে এসেছে, তার কাছে কাজ করা মানে জাহান্নামে যাওয়া, তার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই। সুতরাং সবাই মিলে তাড়াও তাকে। পশু যুদ্ধ বাধে আর কি? ছোট খাটো প্রকাশ্য আক্রমণও যে দু'একবার না হল, তাও নয়। কয়েকদিন তিনি তাঁর তাঁবু থেকে বেরুতেই পারলেন না। তার উপর বিদেশের গরম জলহাওয়া সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। প্রায়ই জ্বরে পড়ছিলেন। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে তখন। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন হেনরি লেয়ার্ড। ভক্ত ভৃত্য বিদ্রোহ করেছে, এমন কি এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে রিভলভার চালাতেও সে দ্বিধা করেনি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হোয়েছিল। রীতিমতো প্রাণ নিয়ে টানাটানি ব্যাপার! কিন্তু প্রাণ ভয়ে ভাত নন লেয়ার্ড। স্বাস্থ্যকে যদি কায়দা করতে পারেন তিনি তাহলে কাউকেই পরোয়া করেন না। ক্রমে সুস্থ হোয়ে উঠলেন। দেহের এবং মনের বল ফিরে এলো। সঙ্গী, সাথী এবং আদিবাসীদের ডেকে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্থানীয় আদিবাসীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষেই যোগ দিলে। বুড়ো সর্দ্দার দেশ থেকে বহিষ্কৃত হল। আদিবাসীরা লেয়ার্ডকেই তাদের "রাজা" বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে সারা রাত আগুন জ্বেলে ধুমধাম করলে। আবার কাজ আরম্ভ হল পুরোদমে।

১৮৪৭ সালে তাঁর আবিষ্কৃত জিনিষগুলি ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলো। সঙ্গে তিনি নিজেও এলেন। তাঁকে নিয়ে চারিদিকে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। মধ্যএসিয়ার একটা গোটা লুপ্ত প্রাচীন সভ্যতাকে তিনি নাকি খুঁড়ে বার ক'রে কাঁধে ক'রে নিয়ে এসেছেন—দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই খবর প্রচারিত হোতে লাগল। ১৮৪৮ সালে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হল—"নিনেভার আবিষ্কার।" বিদ্বজ্জন সমাজে সেই বই আর তার লেখকের সমাদর হল প্রচুর। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টর" উপাধি দান করলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে নাইট উপাধির দ্বারা সম্মানিত করলেন। ১৮৫১ সালে তাঁর দ্বিতীয়বারের ব্যাবিলন অভিযান সাঙ্গ ক'রে তিনি দেশে ফিরে রাজনীতিতে প্রবেশ ক'রে ১৮৫২ সালে পার্লামেণ্টের উদারপন্থী সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হলেন। তারপর ১৮৮০ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতরূপে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে অবশেষে অবসর গ্রহণ করলেন। ১৮৯৪ সালের ৫ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

শেষ জীবনে দেশের রাজনীতির নানা বিভাগে বিশেষ ক'রে পররাষ্ট্র দপ্তরের কাজে তিনি অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করলেও দেশের কাছে এবং জগতের কাছে তিনি চিরদিন পর্য্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরূপেই স্মরণীয় হোয়ে থাকবেন। অধুনা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতার যে তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা জ্ঞানরাজ্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হোয়েছে, হেনরি লেয়ার্ড কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তারই প্রচলন ক'রে গেছেন। তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত অবলুপ্ত অ্যাসিরিয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটি বিশেষ বিভাগে সংরক্ষিত আছে।

জাগরণ-সঙ্গিনী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

অস্ত-আকাশে ক্লান্ত সূর্য্য কখন গিয়েছে ডুবে,
সন্ধ্যা-আলোকে রাত্রির ছায়া মিশিতেছে ধীরে ধীরে;
একটি তারকা ধূসর আকাশে সুদূরে ডাকিছে পুবে,
কে গো তুমি নারী এ হেন সময় মৃত্যু-সাগর তীরে!
জাগিলাম আমি শুনিনু যে তব ঝংকৃত কিংকিনী,
স্তিমিত আলোকে কুহেলিকাময়, তোমা নাহি চেনা যায়;

চির-নিদ্রার মাঝে কি গো তুমি জাগরণ-সঙ্গিনী,
আসিলে কি তাই শিয়রে আমার অরূপেরি আলো-ছায়া?
সংকেতে তব জীবন ভরিয়া চলিয়াছে দিন-রাত্রি,
রূপ হ'তে রূপে, পথ হ'তে পথে টানিয়া লয়েছে মোরে,
সীমা হ'তে আজ অসীমের পথে আমি শুধু একা যাত্রী,
দেখা দিও মোরে এরূপে আবার নূতন জীবন-ডোরে।

শিল্পাচার্য্য আঁরি মাতিস স্মরণে

শ্রীশম্ভুনাথ শীল

আল্টামিরা শিল্পীর অকুশলী ও অপটু আঙ্গিকের প্রয়াস থেকে য়ুরোপে গথিক যুগ পর্য্যন্ত যে চিত্র রচনা হয়েছিল তার পরিপূর্ণ ও সার্থক সাফল্য giottoর মধ্যে সূত্রপাত হয়। এই সুদীর্ঘ কাল শিল্পী নানা বিচিত্র চিন্তা, ভাবধারা দৃষ্টি সম্মুখে প্রকাশ কর্বার যে সংগ্রাম করে এসেছিল তার যেন এক নোতুন বাতায়ন জিয়োটোর চিত্রে ত্রি-স্তর বিশ্বের মানবপ্রীতির মধ্যে এক অতি বিস্ময়কর উপলব্ধি। চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আপন চিত্র রচনার সমতা তাঁর চিত্রে আছে বলেই প্রচলিত শিল্পকলার তিনি পথিকৃত, পিতামহ। রেনেশাশের চিন্তা আরও অধিক উন্নত মার্জিতরূপে Van Eyck, Vander Weyden, Memline, Pieter Brenghel প্রমুখ শিল্পীদের রেখা, বর্ণের গভীরতা ও ঔজ্জ্বল্য এবং দৃষ্ট বস্তুর সত্য অভিব্যঞ্জনা পরবর্তী যুগের চিত্রে শিল্পসাধনায় এক নোতুন ধারা সৃষ্টি করে। Brenghel-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধ্যযুগের শেষ রেশখানি অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং সমগ্র য়ুরোপব্যাপী সপ্তদশ শতাব্দীর নব্য আবিষ্কারকে বরণ করতে যেন মুখর হয়ে পড়ে। গির্জা এতাবৎ শিল্পীদের স্বীয় প্রচার কর্মে নিয়োগ করত, এবার Venice তার পৌর প্রচারে নোতুন পরিবেশে শিল্পী নিয়োগ করল। এ সময় সমগ্র য়ুরোপে এক নব্য শক্তির আলোড়ন অনুভূত হতে থাকে। Veniceএর শ্রেষ্ঠী-দল আপন শক্তিতে স্বয়ং নির্ভরশীল এবং বাণিজ্য প্রসার ও তার স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্প-তীর্থেরও পরিবর্তন হতে থাকে সে জন্য Venice-বৈশিষ্ট্য এত সুস্পষ্ট। Handers ও Holland য়ুরোপের শিল্প-সাধনার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় তার ধারক ও বাহক ও অভিভাবক রূপে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এ সময়ে Rubens এর চিত্ত যেন মাটির পৃথিবীকে খর্ব করে বিচিত্র মানব-মানবীর লাবণ্য লালিত্যে চিত্রকে মাধুর্য্য মণ্ডিত করলেন। Spainএ শিল্প কেবল মাত্র প্রাসাদ জীবন অবলম্বনে পুষ্টিলাভ করতে থাকে। কিন্তু ডাচ চিত্রের অভিনবত্ব তার সাধারণ স্বদেশজ মানুষের চিত্র—সাধারণ গৃহস্থের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অভিব্যক্তি তার প্রাণ। অতি স্বল্পকাল প্রায় অর্ধশতাব্দী স্থায়ী এই শিল্পধারা য়ুরোপীয় চিত্র-সাধনার এক নোতুন সরণী; চরিত্র চিত্রণে, আঙ্গিকের নব নব বৈচিত্র্যে, আলোক ও ছায়ার সাঙ্গীতিক সজ্জায় এ অভিনব অনির্বচনীয়। বর্ণ-বিন্যাস ও তেজঃদীপ্ত প্রকাশ-ভঙ্গিমায় য়ুরোপের বিশ্বকর্মা রেমব্রাণ্ট আপন সীমিত পরি-প্রেক্ষিতে কল্পনার সীমাহীন প্রসারিকা শক্তিতে আমাদের বিস্মিত করে শিল্প ও সমাজের সম্পর্কের বিবর্তনে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে গে আজ সেজন্য তিনি সনাতন। সমগ্র বিশ্বভুবনে তাঁর যেন তুলনা নে তিনি অদ্বিতীয়। নির্বিত্তের কুটীর, শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায়—অর্থাৎ সমাজের সব ক্ষেত্র হতে তাঁর চিত্রবস্তু আহৃত হয়ে এক অভূতপূর্ব অর্থপূর্ণ ব্য সুস্পষ্ট দেখতে পাই যা ইতিপূর্বে ছিল অব্যক্ত।

এবার শিল্প সাধনার পট পরিবর্তন হল ফ্রাঁসে। ফ্রাঁস আপন ঐশ্ব শিল্পজগতে যেন স্বতন্ত্র। ইতালীর শিল্প-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর না থাকলে ভার্সাইলসের কৃত্রিম জীবনটি যেন তার প্রথম যুগের শিল্পে সুস্পষ্ট সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যোগসূত্র Watteanর চিত্রে দৃষ্ট হলে তাঁর চিত্রে ফরাসী মৌলিকতা দেখি না, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে রূবে এর প্রেরণা বিশেষভাবে অনুভূত হয়, দৃষ্টিও তাঁর তেমন সুদূরপ্রসা নয়—এ সময়ের ফ্রাঁন্স রসোপলব্ধি ও কল্পনার বৈচিত্র্য থেকে সত্যই বঞ্চিত। Wattean (ওয়াতো), Boucher বুসের, Fragonar ফ্রাগনার্দ, Nattier নাতিয়ে এই নিষ্ফল প্রয়াসের সাক্ষ্য। কেব মাত্র সারদঁ (Chardin) জনজীবন হতে তাঁর চিত্রে রসসৃষ্টি করতে সক্ষ হলেও তাতেও যেন Dutch প্রেরণার ইঙ্গিত।

(French) 'ফ্রাঁসে' জাতির বৈশিষ্ট্য তার নীতিকুশলতা ও বা দৃষ্টিভঙ্গী। একারণে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য ও শি যাবতীয় নীতির বা ism-এর আবিষ্কার এদেশে। David-এর Ne classicism—যার সফল পরিণতি Ingro আঁগ্রে; Romanti দেলাক্রোয়া যার পুরোধা: Millet, Corot, Rousseane প্রমু Barbigon শিল্প গোষ্ঠী এঁরা Impressionism এর পূর্ববর্তী। য়ুরো Impressionism একটি বৈপ্লবিক প্রতিবাদ। উনবিংশ শতাব্দী যদিও এর প্রত্যক্ষ পরিচয় তথাপি মাইকেল এঞ্জেলো, টিসিয়ান, টার্ণা কনস্টাবল এর চিত্রে তার প্রচ্ছন্ন পরিচয় দেখি। পূর্বসূরীয়ানের চি থেকে এর পার্থক্য কেবল দৃষ্ট বস্তুর বিশেষতঃ প্রকাশ। বর্ণ, আলো ও তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সূর্য্যালোকের বিক্ষেপ প্রভৃতি অতি সূ বিচার (Monet) মনে, Pissaro সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ কর্লেন, এ অভূতপূর্ব সন্ধানী চিত্তের আবিষ্কারের জন্য তাঁরা আমাদের বরণীয় স্মরণীয়।

এর পরবর্তী সেজান (Cezanne) গর্গা, ভাঁগ্য, পূর্ববর্তীগণের আঙ্গিক অনুসরণ করলেও তাঁরা যেন বিশেষ মৌলিক সৃষ্টি দ্বারা চিত্ররূপ অভিষিক্ত করতে সক্ষম হন, ভাঁগ্য তাঁর হৃদয় দ্বারা প্রেরণা পেয়েছিলেন তার পারিপার্শ্বিক মানুষের ভালবাসায়। তাঁর চিত্রে সেজন্য মস্তিষ্ক অপেক্ষা প্রাণের স্পন্দন অধিক সুস্পষ্ট। প্রকৃতির বিচিত্র রঙ্গভূমি এতদিন শিল্পীদের বিভিন্ন প্রকারে চিত্ত উদ্বেল ক'রে Canvas রোমাঞ্চিত করেছিল তাঁর শেষ অঙ্কের পরিসমাপ্তি ভাঁগ্‌গে। জিওটো থেকে ভাঁগ্য পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৫০০ বৎসরের শিল্প সাধনার ধারাবাহিকতায় যেন যবনিকা পড়ল। এবার নতুন অধ্যায়ের প্রস্তুতি দেখা দিল।

য়ুরোপে বিজ্ঞানের সূত্রপাতের সঙ্গে তার সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এবার মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ যেন স্বীকৃতি পে'ল। ফ্রাঁসে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র অধিকার লাভ করল ; রাষ্ট্র, গির্জা, রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীকুলের পৃষ্ঠপোষকতা-নিরপেক্ষ শিল্পী তখন স্বাবলম্বী, স্বতন্ত্রপন্থী। চিত্রকলায় বিষয়বস্তু প্রকাশে আলোকের obsession impressionist পরবর্তী শিল্পীকে নূতন পথ বিচারে বিভ্রান্ত ক'রে দিল। এঁদের মধ্যে মাতিস (Mattise) তাঁর স্বীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন,—বর্ণের বিচিত্র প্রয়োগ ব্যবহারে—তিনি পূর্ব মহাজনগণের যাবতীয় আঙ্গিকশৈলীর অস্বীকারের আত্মপ্রত্যয়তায় বিষয়বস্তুর ইচ্ছাকৃত পরিবর্ধন, ভাবস্ফূর্তি ও কল্পনার আলঙ্কারিক পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। তাঁর চিত্রে সেজন্য মুক্ত এষণা (free will) এত সুস্পষ্ট। তাঁর চিত্রে নতুন পথ সন্ধানের প্রয়াস এষণার আকুলতা তাঁর সমকালীন সমাজ জীবন ও চিন্তা প্রবাহের সংগ্রামী চরিত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করতে কতদূর সক্ষম হয়েছিল উত্তরকালে তার যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হবে। আমরা জানি মণীষী মাত্রেই যুগোত্তীর্ণ, Giotto তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। মাতিসের যুগের য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন চিন্তার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখিনে, দর্শক, রসিক, শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে পরস্পর প্রীতির সূত্র সেটি আজ বিচ্ছিন্ন। এর বিরুদ্ধে শিল্পীর আপন প্রতিবাদের স্বাক্ষর থাকে, কিন্তু সে যে আপন সীমিত চিত্তের মাঝে ; এর চেয়ে বড় trazedy আর ত নেই কিছু ! Art-এর মধ্যে যে সামাজিক মূল্যবোধ নিহিত আছে তার যেন আর মর্য্যাদা রক্ষা পে'ল না, দর্শক ও শিল্পীর সম্পর্কের মধ্যে এই বিরোধ আত্মস্বাতন্ত্র্যধর্মী চেতনার সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিগত ভাবোদ্দীপক fantasy (ফাঁতেজি) রচনায় যে শিল্পী মনোনিবেশ কর্লেন তা আর্ট পর্য্যায়ভুক্ত কি না জানিনে ; তার মধ্যে হয়ত মানসিক চিন্তার প্রাচুর্য্য থাকতে পারে ; কিন্তু শিল্পকলা বিজ্ঞান বা ন্যায়দর্শন নয়, সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সে মানব চিত্তের প্রীতি সম্পাদন করে। চিত্রের linear pattion, ছন্দ ও তালমান, form, বর্ণ সমুদয়ের সঙ্গতিই সার্থক শিল্প রচনায় সাহায্য ক'রে থাকে। একটি বিশেষ অবলম্বনকে বিশেষত্ব দিলে চিত্রের ভারসাম্য পীড়িত হয়, তাতে চিত্র-বিজ্ঞানের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে। যা রচিত হয়েছে তার পরিবর্ধন, সুপ্রাচীন এই শিল্পসূত্রে আর একটি নতুন কুসুম গাঁথা মাত্র। সমসাময়িক য়ুরোপে এই tradition-এর obsession ব্যাধিতে বিভ্রান্ত। এই ব্যূহ ভেদ করে নতুন আলোকের সন্ধানে মণীষী মাতিস সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী যে কঠোর সংগ্রাম করে গেলেন তাঁর বিচিত্র রস রচনায়, তার মূল্য বিচার সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে নাই বা হল ; কারণ চিত্রকর মাতিসের পরিচয় অপেক্ষা মাতিসের কবি চিত্তের পরিচয় যে আরও মহনীয়—তিনি বলেছেন—"আমি এমন রচনায় বিশ্বাসী যা ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সংসারের প্রতিটি কর্মে নিযুক্ত বিভিন্ন মানুষের প্রীতি উৎপাদন করতে সমর্থ হবে, তার মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য্য সৃষ্টি করবে ; এ যেন ঠিক আরাম-কেদারার মত, সমস্ত শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে চিত্তের প্রশান্তি এনে দেবে।" এর চেয়ে মহত্তর কথা আর কি হ'তে পারে ? তাঁর চিন্তা ও উদ্দেশ্য তাঁর চিত্রে কতটুকু প্রকাশ পেল সে বড় কথা নয়, কারণ মানুষের উপলব্ধির কতটুকুই বা তার শিল্পে, কাব্যে, সঙ্গীতে প্রকাশ হতে পারে ?

ফ্রাঁস ও সমগ্র উরোপে চিত্র-সাধনার এক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাতিসের সুদীর্ঘ জীবনের অবসান সত্যই মর্মান্তিক। নতুন শিল্প-দৃষ্টি সন্ধানের যে প্রয়াস চলছিল তার শেষ রেশটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গেল !

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্য ও বেদ

সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অথচ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার সাংখ্যের আন্তরিক নহে। যে দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার হইত, তাহাই আস্তিক দর্শন বলিয়া প্রাচীন ভারতে গৃহীত হইত। চার্ব্বাক-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া তাহা ঘৃণার পাত্র ছিল। এই জন্যই মহর্ষি কপিল বেদকে অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন; বেদের প্রমাণের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নহে, তাহার প্রমাণ সাংখ্যদর্শনের বহু স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রমাণের আলোচনায় আপ্ত বচন ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে একটি বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে বেদ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্। (সাং সূ ৫।৫১)

অর্থাৎ বেদোক্ত মন্ত্র সকলের অর্থ গ্রহণ করা হউক বা না হউক, যথাবিধি উচ্চারিত হইলে ঔষধের পীড়া আরোগ্য করিবার শক্তির মত, তাহারা উচ্চারণ-কর্ত্তার জ্ঞান-নির্ব্বিশেষে ফল উৎপাদন করে। ইহা দ্বারা বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্য প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই স্বতঃ প্রামাণ্য নাই, তাহাতে ভ্রান্তি সম্ভবপর। সুতরাং বেদকে সাংখ্য-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উচ্চতর আসন প্রদত্ত হইয়াছে, বলা যায়।

বহুসূত্রে সাংখ্য প্রমাণ স্বরূপে বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি উহাকে ন্যায় ও শ্রুতি উভয়েরই বিরোধী বলিয়াছেন।

শ্রুতিন্যায় বিরোধাৎ চ। সাং সূ—১।৩৬

অন্যত্র তিনি শ্রুতি প্রমাণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়াছেন :

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপঃ তৎ প্রত্যক্ষবাধাৎ।

সাং সূ—১।১৪৭

পুরুষের কোনও ধর্ম্ম নাই, ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রুতিতেও আত্মার নির্গুণত্বসিদ্ধ। শ্রুতির অপলাপ কখনও সম্ভবপর হয় না।

ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক পদার্থ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাংখ্য সূত্রে আছে—

আহংকারিকত্ব শ্রুতেঃ ন ভৌতিকানি।

সাং সূ—২।২০

শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়দিগকে অহংকার হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে।

জগতের মূল কারণ প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে পারে না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাংখ্য সূত্রে (১।৭৭) বলা হইয়াছে পরিচ্ছিন্ন যাবতীয় বস্তু উৎপত্তিশীল। উৎপত্তিশীল যাহা তাহা জগতের মূল কারণ হইতে পারে না।

তদুৎপত্তি শ্রুতেশ্চ। সাং সূ—১।৭৭

বেদেতে কর্ম্মাদি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না—১।৮২ সূত্রে বলিয়া পাছে ইহা দ্বারা বেদ বিরোধিতা হয়, এই আশঙ্কায় পর সূত্রে বলিতেছেন—

তত্র প্রাপ্ত-বিবেকস্য অনাবৃত্তি-শ্রুতিঃ। ১।৮৩

শ্রুতিতে যে অনাবৃত্তির কথা আছে, তাহা যাহারা বিবেক-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে আত্মা এক ও অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য মতে আত্মা বা পুরুষ বহু। সুতরাং দৃশ্যতঃ সাংখ্য-মত শ্রুতি-বিরোধী, এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য সাংখ্য বলিয়াছেন :

ন অদ্বৈতশ্রুতি বিরোধো জাতি পরত্বাৎ।

সাং সূ—১।১৫৪

অর্থাৎ আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকার দ্বারা শ্রুতি-বিরোধ হইতেছে না, কেননা শ্রুতিতে যে একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই একত্ব জাতিপর। জাতি শব্দের অর্থ সামান্য বা একরূপতা। সকল পদার্থই আত্মার স-জাতীয়, বিজাতীয় দ্বৈত পদার্থ কিছু নাই, ইহাই শ্রুতির অর্থ।

ইন্দ্রিয়গণের অনিত্যতা প্রমাণের জন্যও শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তদুৎপত্তি-শ্রুতেঃ, বিনাশ দর্শনাৎ চ।

সাং সূ—২।২২

ইন্দ্রিয়গণের যে উৎপত্তি হয়, তাহারা নিত্য নহে, এ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাদের বিনাশ দেখিয়াও ইহা উৎপন্ন হয়।

লিঙ্গদেহের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণের জন্য বলা হইয়াছে :

তদন্নময়ত্ব শ্রুতেশ্চ। ৩।১৫

লিঙ্গদেহ যে অন্নময়, তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। ইহা দ্বারা লিঙ্গ দেহের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় এবং বিভুত্ব অপ্রমাণিত হয়।

জীবন্মুক্ত পুরুষ মধ্য-বিবেক প্রাপ্ত হন এবং প্রারব্ধবশতঃ তাঁহাদের দুঃখভোগ হইয়া থাকে, "জীবন্মুক্তশ্চ" (৩।৭৮) শ্লোকে ইহা বলিয়া, ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতিশ্চ (৩।৮০)

জীবন্মুক্তির সিদ্ধি বিষয়ে শ্রুতিতে প্রমাণ আছে।

ইতর লাভেঽপি আবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নি যোগতঃ জন্মশ্রুতেঃ।

৫।২২

শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ দ্বারা পুনর্জন্মই লাভ হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং অর্চিঃ আদি মার্গে মৃত্যুর পারে গমন হইলেই মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় না।

লিঙ্গ শরীর অণুপরিমাণ প্রমাণ করিবার জন্য শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে—

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ। সাং সূ—৩।১৪

বারংবার শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ দ্বারা সাংখ্য যে বেদের প্রামাণিকতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী তাহা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্য বেদের প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। ঈশ্বর উপনিষদের সর্ব্বত্র গীত হইয়াছেন। ঈশ্বর উপনিষদের আদি, অন্ত, মধ্য। বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহা সাংখ্য কেন বলিলেন, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে চিত্তের অভিনিবেশবশতঃ বিবেকজ্ঞানের বাধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ঈশ্বর অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। ঐ উক্তি যুক্তিসহ নহে। ঈশ্বরকে প্রমাণাসিদ্ধ বলিবার কারণ বৌদ্ধ প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে অস্বীকৃত হইত না, চরক-সংহিতা ও মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যমত তাহার প্রমাণ। সাংখ্যশাস্ত্র যে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, (কালার্কভক্ষিতং) বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যের ভূমিকায় তাহা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ যে সাংখ্য-দর্শনের বহুল ব্যবহার করিয়াছিল, পরমার্থ কর্তৃক চীনা ভাষায় তাহার অনুবাদ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বৌদ্ধগণ কর্তৃক সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

সংসৃতি বা জন্মান্তর

যত দিন বিবেকের উৎপত্তি না হয়, ততদিন জীব দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করে। পুরুষের সহিত এই দেহান্তর-গ্রহণের সম্পর্ক নাই। তাহার অবস্থান্তর নাই, পরিণাম নাই। মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই অষ্টাদশটি লইয়া জীব। পুরুষের আলোকপাতে ইহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যতদিন মোক্ষ না হয়, ততদিন পুরুষের আলোক হইতে ইহা বঞ্চিত হয় না। সাংখ্যদর্শনে জীবের নাম লিঙ্গ।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গং। সাং সূ। ৩।৯

অষ্টাদশ তত্ত্বের সম্মিলনে গঠিত লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের পূর্ব্বেই উৎপন্ন হয়। এই লিঙ্গের সহিত কোনও এক বিশেষ শরীরের সঙ্গ নাই, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বপ্রকার শরীর ধারণেই (দেব, মনুষ্য, তির্য্যক) সমর্থ। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী; যত দিন না মোক্ষ হয়, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। ইহার ভোগ নাই। লিঙ্গদেহ দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না, কেন না তাহা কেবলমাত্র করণশক্তিদিগের সমবায়। ভোগের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, লিঙ্গদেহ সেই অষ্টবিধ সংস্কারের দ্বারা অধিবাসিত। এই লিঙ্গদেহই এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে।

পূর্ব্বোৎপন্নং অসক্তং নিয়তং মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তম্
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গং।

সাং কা—৪০

এই লিঙ্গদেহ আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। প্রাচীর বা পটের আশ্রয় ব্যতীত যেমন চিত্র থাকিতে পারে না,

ছায়া যেমন স্থাণু (খুঁটি) প্রভৃতির আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নিরাশ্রয় লিঙ্গ "বিশেষ" বিনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো যথাচ্ছায়া।

তদ্বদ্বিনাবিশেষৈঃ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্। সাং কা-৪১

লিঙ্গ শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর এক নহে। যে শরীর লইয়া জীব স্বর্গ ও নরকে অবস্থান করে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। তাহা লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। উপরিউক্ত কারিকার সূক্ষ্ম শরীরকে বিশেষ বলা হইয়াছে। সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের ন্যায় ভৌতিক শরীর, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম। তাহা দ্বারাই ভোগ হয়। তন্মাত্রগণ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগ সাধক।*

সূক্ষ্মকরণ শক্তিদিগের সহিত স্থূলশরীরের সম্বন্ধের হেতু তন্মাত্রগণ। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সংযোগ তাহাদের দ্বারাই সাধিত হয়; তন্মাত্রগণ অতি সূক্ষ্ম। তাহাদের দেশব্যাপ্তি এত কম যে নাই বলিলেই চলে। তাহারা কালব্যাপী এবং ক্রিয়াত্মক। তাহাদের অর্দ্ধেক জ্ঞান ও অর্দ্ধেক জ্ঞেয়। তাহারা করণদিগের সহিত এই জন্যই লিঙ্গশরীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। করণ সকল তন্মাত্রের মধ্যে সংগৃহীত।

পুরুষার্থই লিঙ্গদেহের অস্তিত্বের হেতু। প্রথমতঃ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ, দ্বিতীয়তঃ বিবেক লাভ করিয়া বিষয় বর্জ্জন। এই দুইটি ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যই লিঙ্গদেহের নাই। এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব থাকে; উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, তাহা অব্যক্তে বিলীন হয়। কিন্তু পুরুষার্থসাধন লিঙ্গের অভিব্যক্তির প্রধান হেতু হইলেও সহকারী হেতুও আছে। তাহা হইতেছে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের সহিত সহযোগ। পূর্ব্বে যে অষ্টপ্রকার ভাব বা কর্ম্মসংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারাই নিমিত্ত। উক্ত সংস্কারসকল ধারণ করিয়া লিঙ্গদেহ উদ্ভূত হয়। সংস্কার দ্বিবিধ—কর্ম্ম-সংস্কার বা কর্ম্মাশয় এবং সুখ-দুঃখের সংস্কার বা বাসনা। কর্ম্মশক্তি স্বভাবজাত; কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মের উপর যেমন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রভাব আছে, তেমনি পূর্ব্বসংস্কারযুক্ত কর্ম্মশক্তির উপরও নূতন কর্ম্মের প্রভাব আছে। প্রত্যেক জন্মে আচরিত কর্ম্মের সংস্কারকর্ত্তৃক প্রভাবিত কর্ম্মশক্তিকে কর্ম্মাশয় বলে।

* শ্রীমৎ হরিহরারণ্য প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন ৫৫০ ও ৭৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সুখদুঃখের সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত হয়। তাহা স্মৃতিতে উদিত হয়। যে সংস্কারের ফলে তাহা দ্বারা প্রভাবিত বোধ সুখ অথবা দুঃখ রূপে প্রতীত হয়, তাহাই বাসনা। লিঙ্গ-দেহের মধ্যে কর্ম্মাশয় ও বাসনা উভয়ই থাকে। সংস্কারের অভাব হইলে লিঙ্গ লীন হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেহ-ধারণকে নৈমিত্তিক বলে। পুরুষার্থসাধনের জন্য উদ্ভূত লিঙ্গদেহ অষ্টপ্রকার কর্ম্মসংস্কার, কর্ম্মাশয় ও বাসনাকর্ত্তৃক অধিবাসিত হইয়া নটের মতো নানাবিধ শরীর ধারণ করে। প্রকৃতি বিভু বা সর্ব্বগত বলিয়া ইহার সম্ভব হয়।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।

প্রকৃতেঃ বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্।

সাং কা—৪২

লিঙ্গ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ "ভাবের" উদ্ভব হয় না। আবার ভাবসকল না থাকিলে লিঙ্গও থাকিতে পারে না। লিঙ্গ শক্তিরূপ, ধর্ম্মাদি তাহার কার্য্য। এই জন্য লিঙ্গ-নামক ও ভাব-নামক দ্বিবিধ পদার্থের সৃষ্টি হয়।

ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গং, ন বিনা লিঙ্গেন ভাব নির্বৃত্তিঃ।

লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে।

সাং কা—৫২

প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত তত্ত্বসকলের মধ্যে কতকগুলি অবিশেষ (ভেদরহিত), কতকগুলি বিশেষ (ভেদযুক্ত)। সূক্ষ্ম শরীর, মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত স্থূল শরীর এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দ্রব্য—এই ত্রিবিধ বিশেষ। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী; স্থূল শরীর অচিরস্থায়ী।

সূক্ষ্মাঃ, মাতাপিতৃজাঃ, সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধাস্যুঃ বিশেষাঃ।

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা, মাতাপিতৃজা নিবর্ত্ততে। সাং কা—৩৯

সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির আদিতে প্রথম উৎপন্ন হয়। ইহা কার্য্য বস্তু। তাহার কার্য্য সুখদুঃখাদির ভোগ। পরে উৎপন্ন স্থূল শরীরদ্বারা সুখদুঃখের ভোগ হয় না। মৃত শরীরে সুখ-দুঃখের ভোগ নাই।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্য্যত্বং

ভোগাৎ একস্য, নেতরস্য।

সাং সূ—৩।৮

কর্ম্মের ভেদবশতঃ লিঙ্গশরীর নানারূপে প্রকাশিত হয়। স্বর্গের আদিতে যদিও হিরণ্যগর্ভ উপাধিযুক্ত একমাত্র রূপ

উদ্‌ভূত হইয়াছিল, তথাপি তাহার পরে নানা ব্যক্তি-ভেদ উৎপন্ন হয়। যেমন পিতার এক লিঙ্গদেহ পুত্রকন্যাদির লিঙ্গদেহরূপে নানা অংশে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ। ইহার কারণ অন্যান্য জীবের ভোগের হেতু কর্ম্মাদি—অন্যান্য জীবের কর্ম্মজনিত ভোগের জন্য তাহাদের বিভিন্ন লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয়। মনু সংহিতায় আছে—সমষ্টি পুরুষের (হিরণ্যগর্ভের) ছয় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পরে—

তেষাং তু অবয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামমিতৌজসাম্
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।

সেই সমষ্টি পুরুষের অমিততেজঃ ষড়ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অবয়ব সকল স্বকীয় চিদংশ সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়া সকল ভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যত্র আছে—

তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্যধীমতঃ।

তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন করণসকলের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে এক হিরণগর্ভ বা মহৎরূপ সমষ্টি বুদ্ধি হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। মহৎ Cosmic বুদ্ধি, ব্যষ্টি বুদ্ধি নহে।

লিঙ্গের অধিষ্ঠিত তাহার আশ্রয় সূক্ষ্ম আধারকে দেহ বলে; এই জন্যই সূক্ষ্মদেহ যে স্থূলভূত-নির্ম্মিত আধারে অবস্থান করে, তাহাকেও দেহ বলে।

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্‌বাদাৎ তদ্বাদঃ।
সাং সূ—৩।১১

সূক্ষ্ম শরীরকে বলে আতিবাহিক দেহ, স্থূলদেহকে বলে আধিভৌতিক দেহ।

কিন্তু সূক্ষ্মশরীর নামে স্থূলশরীরের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র দেহ যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে নিরাধার ছায়া যেমন থাকিতে পারে না, প্রাচীর ও পট ব্যতিরেকে যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, সেইরূপ স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার পরে লিঙ্গের আধারস্বরূপ দেহান্তরের প্রয়োজন।

লিঙ্গশরীর মূর্ত্ত বস্তু। মূর্ত্ত বায়ু তো আকাশেই অবস্থিত, তাহার অবস্থানের জন্য পরিচ্ছিন্ন কোনও আধারের প্রয়োজন নাই। তবে লিঙ্গশরীরের জন্য স্বতন্ত্র আধারের প্রয়োজন হয় কেন? ইহার উত্তর লিঙ্গশরীর প্রকাশস্বরূপ। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য কিরণ (তরণি) যেমন পার্থিব দ্রব্যের সঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সত্ত্ব-প্রকাশময় লিঙ্গও ভূতের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন, সংঘাত যোগাৎ তরণিবৎ।
সাং সূ—৫।১৩

লিঙ্গশরীর অণুপরিমাণ, কিন্তু অত্যন্ত অণু নহে। কেননা তাহা অবয়বযুক্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে তাহার ক্রিয়া (কৃতি) আছে বলা হইয়াছে। বিভূ হইলে তাহার ক্রিয়া সম্ভব হয় না।

অণু পরিমাণং তৎ, কৃতি শ্রুতেঃ। সাং সূ—৩।১৪

লিঙ্গশরীর অন্নময় বলিয়াও শ্রুতিতে উক্ত আছে। যাহা অন্নময় তাহার বিভুত্ব সম্ভবে না—

অন্নময়ত্ব-শ্রুতেশ্চ। সাং সূ—৩।১৫

রাজার পাচকগণ রাজার ভোগের উদ্দেশ্যে আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করে। লিঙ্গদেহও তেমনি পুরুষের ভোগের জন্যই স্থূলদেহে সঞ্চরণ করে।

পুরুষার্থং সংসৃতিঃ লিঙ্গানাং সূপকারবৎ রাজ্ঞঃ
সাং সূ—৩।১৬

কেহ কেহ বলেন দেহ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিভূতে দেহ নির্ম্মিত। আর কেহ কেহ বলেন এক এক দেহ এক এক ভূতে নির্ম্মিত। মনুষ্যদেহ ক্ষিতিভূতে নির্ম্মিত, সূর্য্য-লোকের অধিবাসীদিগের দেহ তেজঃনির্ম্মিত। দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলা যায় না, কেননা এমন বহু দেহ আছে, যাহাতে সকল ভূত উপাদানরূপে নাই।

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। সাং সূ—৩।১৭
চাতুর্ভৌতিকম্ ইত্যেকে। ৩।১৮
একভৌমিকম্ ইত্যপরে। ৩।১৯
ন পাঞ্চভৌতিকম্ শরীরং বহুনাম্ উপাদানাযোগাৎ
সাং সূ—৫।১০২

ক্ষিতি উপাদান সকল শরীরেই আছে এবং তাহা অন্যান্য উপাদান অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ আছে। অন্যান্য উপাদান ক্ষিতির সহিত সংযুক্ত আছে মাত্র, ক্ষিতিই প্রধান উপাদান।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানম্ অসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ।
সাং সূ—৫।১১২

কেবল যে স্থূলশরীরেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। আতিবাহিক দেহেরও অস্তিত্ব আছে। সূক্ষ্ম শরীরই আতিবাহিক দেহ।

ন স্থূলমিতি নিয়মঃ, আতিবাহিকংদেহস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ।

সাং সূ—৫।১০৩

লিঙ্গদেহকে লোক হইতে লোকান্তরে বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্মদেহকে আতিবাহিক দেহ বলা হয়। লিঙ্গ দেহেই পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; তাহার ফলেই ভোগ হয়। লিঙ্গশরীর সর্ব্বদেহব্যাপী। শ্রুতিতে দেহের অধিবাসী পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র বলা হইয়াছে। এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ লিঙ্গশরীরের আধার সূক্ষ্মশরীর। সর্ব্বশরীর ব্যাপী লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইতে পারে না।

লিঙ্গদেহের মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ই আছে। ইন্দ্রিয়গণ স্থূল চক্ষু, কর্ণাদি নহে। তাহারা ইন্দ্রিয়-শক্তি।

প্রাণ হইতে দেহের আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যবিনা প্রাণের অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তিমাত্র। ইন্দ্রিয়ের বিয়োগ হইলে প্রাণেরও বিয়োগ হয়।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বম্।

ইন্দ্রিয় শক্তিতঃ তৎ সিদ্ধেঃ। সাঃ সূ—৫।১২৩

শরীরে প্রাণ না থাকিলে শরীর পচিয়া যায়। সুতরাং প্রাণ শরীরের পক্ষে আবশ্যক, এবং শরীরের নিমিত্ত কারণও বটে। শরীরে রসসঞ্চারাদি প্রাণেরই কার্য্য। প্রাণ দেহের ধারক। প্রাণীরূপ ভোক্তার অধিষ্ঠান না হইলে ভোগায়তন দেহ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

ভোক্তুঃ অধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তন নির্ম্মাণং।

অন্যথা পূতিভাব প্রসঙ্গাৎ। সঃ সূ—৫।১১৪

কিন্তু যিনি ভোক্তা, তিনি কূটস্থ, তাহার কোনও কার্য্যই নাই। তাহার শরীরে অধিষ্ঠানই বা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? পুরুষ দেহে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত না হইলেও তাহার অধিষ্ঠান ভৃত্যদ্বারা। প্রাণ প্রভৃতি তাহার ভৃত্য। তাহাদের ব্যাপার তাহারই ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়,

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতিঃ, ন একান্তাৎ। সাঃ সূ—৫।১১৫

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি। লিঙ্গদেহও সেই জন্য অনাদি। বিবেক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহার বিনাশ নাই। স্থূল দেহ অচিরকাল স্থায়ী। তাহার বিনাশের পর লিঙ্গদেহই সূক্ষ্ম শরীর সহ অবস্থান করে। লিঙ্গদেহে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ও বাসনা সঞ্চিত থাকে এই সংস্কার ও বাসনার ফলেই পুনরায় ভোগের জন্য আবার স্থূল-দেহ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য নামক যে অষ্টভাবের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা লিঙ্গদেহে অবস্থিত। এই সকল ভাব দ্বিবিধ—প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ মহর্ষি কপিলের ধর্ম্ম জ্ঞানাদির ন্যায় জন্ম-সিদ্ধ, তাহারা প্রাকৃতিক ভাব। আর যে সকল ভাব নূতন চেষ্টার ফলে করণদিগের বিকার হইতে উদ্‌ভূত হয়, তাহারা বৈকৃতিক। এই সকল ভাবই অন্তঃকরণের মধ্যে অবস্থিত। কলল, বুদ্‌বুদ, মাংস, পেশী, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শোণিত প্রভৃতি এবং বাল্য, যৌবন, জরা মরণাদি কার্য্য অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

সাংসিদ্ধিকা ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।

দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ, কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ।

সাং কা—৪৩

ভাবদিগের দ্বারা জীবনের পরিণাম নিয়ন্ত্রিত হয়। লিঙ্গ শক্তিস্বরূপ; ধর্ম্মাদি তাহার কর্ম্মজনিত সংস্কার। সুতরাং কর্ম্ম জীবদিগের বিভিন্ন গতির কারণ। ধর্ম্মের ফলে ঊর্দ্ধগমন, এবং অধর্ম্মের ফলে অধোগমন হয়। জ্ঞানের ফল অপবর্গ, অজ্ঞানের ফল বন্ধ, বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতি লয়, বিষয়ের প্রতি আসক্তি (রাগ) হইতে সংসৃতি বা জন্মান্তর, ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার সফলতা এবং অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয়। (সাং কা ৪৪-৪৫) জন্মান্তরের কারণ আসক্তি। আসক্তিহীন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করাই গীতার উপদেশ। ধর্ম্মের ফলে ঊর্দ্ধগমন—অর্থাৎ স্বর্গবাস, অথবা মনুষ্যের মধ্যে উচ্চতর জন্মলাভ। অধর্ম্মের ফলে অধোগমন অর্থাৎ নরকবাস অথবা মনুষ্যকুলে হীন জন্ম অথবা তির্য্যক যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি।

যে ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধগমন হয়, তাহা হইতেছে দয়া, দান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়। ঈশ্বরপ্রণিধান ও ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই।

কিন্তু ধর্ম্মের ফলে ঊর্দ্ধগমন এবং অধর্ম্মের ফলে অধোগমন

হয় কেন ? সাংখ্য কর্ম্মের ফলদাতা কোনও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি বলেই উর্দ্ধগমন হয়। সুতরাং সাংখ্য জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার (moral order) অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিতে হইবে। জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌কট বলিয়াছেন "জগতের নৈতিক ব্যবস্থাই ঈশ্বর। এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই। জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহার পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না।" *

সাংখ্যের প্রকৃতি নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে পরিচালিত, তাহা অন্ধ জড়শক্তির ক্রীড়াভূমি নহে।

সাংখ্যমতে স্বকীয় কর্ম্মফলে জীব যেমন দেবযোনি লাভ করিতে পারে, তেমনি ইতর যোনিতে এমন কি উদ্ভিদ্ যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। সাংখ্যসূত্রে ত্রিবিধ দেহের কথা আছে। ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা, কর্ম্মদেহ উপভোগদেহ উভয়দেহাঃ। (৫।১২৪) কর্ম্মদেহ, উপভোগদেহ ও উভয়দেহ। ভোগ বর্জ্জন করিয়া যাহারা পুরুষকারের সাধনা করেন, সেই সাধকদিগের দেহ কর্ম্মদেহ। পশুদেহ ও প্রেতদেহ—উপভোগের উপযোগী। তাহারা উপভোগদেহ। মানুষ যেমন ভোগ করে, তেমনি কর্ম্মও করে, মানুষের দেহ উভয়দেহ। মৃত্যুর পরে যে পারলৌকিক দেহ মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা ভোগদেহ। তাহাতে জীবিতকালের কর্ম্ম শরীরের সংস্কার সঞ্চিত থাকে; কোনও ফল প্রসব করে না। স্বপ্নাবস্থায় যেমন কোনও কর্ম্ম নাই, কেবল খেলা হয়, পারলৌকিক দেহেও তদ্রূপ। ভোগ শেষ হইলে জীব স্থূললোকে পতিত হয়। পরে পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া পিতৃদেহে প্রবেশ করে। পরে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু গুণসঙ্গত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগের দেহ এই ত্রিবিধ দেহের কোনটিই নহে।

ন কিঞ্চিদপি অনুশয়িনঃ।

সাং সূ—৫।১২৫

* আমার পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ২য় খণ্ড ; ৩৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্র-মানসদর্পণ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রমানস একখানি সুবিশাল, স্বচ্ছ দর্পণের সহিত তুলনীয়। মানুষের মনে এমন কোনো ভাব নাই, এমন কোনো অনুভূতি নাই যাহা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে নাই। শিশু নারী, যুবাবৃদ্ধ, প্রেমিক-মুমুক্ষু সকলের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন সুবলয়িত সুষমায় রূপায়িত করিতে আর কে পারিয়াছে! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মানুষের রহস্যময় তিমিরগুণ্ঠিত দুর্গম মনোলোকের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত কবিচিত্তের মায়ামুকুরে কিরূপ অবিকল ধরা পড়িয়াছে! রবীন্দ্রমানস শুধু একখানি মুকুর নয়,—মায়ামুকুর—Magic mirror! আমাদের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা, বিরহমিলন, মানঅভিমান কবিহৃদয়ে কল্পনার সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর ছন্দোময় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য আমাদের অস্ফুট ধ্যানধারণা, স্বপ্নসাধের বাঙ্ময় প্রকাশ!

মানুষের হৃদয়ের মত এমন জটিল, কুটিল, দুর্বোধ্য আর কিছুই নাই। জীবনব্যাপী সাধনা এবং অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির বলে মানবমনের দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ্য রহস্যকে অধিগত করা হয়তো সম্ভব, নচেৎ এ রহস্য দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! Shakespeare এর অপূর্ব মানবচরিত্রজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সমালোচক Raleigh বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন—"Where can these amazing secrets of life be learnt?" ধীরচিত্তে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিবার পর ঠিক্ এইরূপ একটা নির্বাক বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বলিতে ইচ্ছা হয়—রবীন্দ্রনাথ আমাদের আর দশজনের মত একজন মানুষ?—না অপর কোনো উন্নততর জগতের শাপভ্রষ্ট অধিবাসী?

মানবচিত্তের কুহরে কুহরে যে এত রহস্য, এত আবেগ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা কে জানিত! কবি যখন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন তখন সেই আবিষ্কারজনিত উল্লাস কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের তুলনায় কম নয়! রবীন্দ্রকাব্যে আমরা আমাদের অজ্ঞাত স্বরূপ ও রহস্যলীন সত্তার সাক্ষাৎ পাই।

সাধারণ মানুষের দুইটিমাত্র চক্ষু এবং তাহাও অত্যন্ত স্থূল।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের অনেক ঊর্দ্ধে,—তিনি সর্ববিষয়ে অসাধারণ। তিনি এরূপ ধ্যান-উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের অধিকারী যাহার সন্ধানী আলোকের অপূর্ব ছটায় জগৎ ও জীবন একটা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, একটা সম্পূর্ণ নবীন তাৎপর্য্য লাভ করিয়াছে। স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি কবিকে আশ্বাস দিয়াছেন,—

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা কিছু সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।

তথাপি কবির এই আক্ষেপ—

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

মানবহৃদয়রহস্য যাঁহার নখদর্পণে সেই মহাকবির নিকট নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীরও পরাজয় অনিবার্য্য। "দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী" অজ্ঞাত রহিয়া গেলেও মানবচিত্তের তলদেশ পর্য্যন্ত খরদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি যে অমূল্য উপাদান সংগৃহীত করিয়াছেন তাহাই তো তাঁহার অমর কবিকীর্ত্তি,—

From these create he can
Forms more real than living man,
Nurslings of immortality.

রবীন্দ্রচিত্তকে দর্পণের সহিত তুলনা করিয়াছি বলিয়া এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, তাহাতে বস্তুর অবিকল স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বস্তুর দুইটি রূপ,—একটি স্থুল এবং অন্যটি ভাবময়। একশ্রেণীর কবিতায় (বলা বাহুল্য তাহাই প্রকৃত কবিতা) বস্তুর যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহা ভাবময় মূর্ত্তি। বস্তু এ ক্ষেত্রে তাহার স্থুলত্ব পরিহার করিয়া একটা সূক্ষ্ম ভাবশরীর পরিগ্রহ করে।

প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিত কন্দলীদলৈঃ
বিভাতি শুক্লেতররত্নবিভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ।

অথবা

করিয়া সমরসাজ ঋতুপতি বর্ষারাজ
অবনীমণ্ডলে উপনীত।
রণস্থল করি' রুদ্ধ ব্যাপিল পৃথিবীশুদ্ধ
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত।

দুইটি বর্ণনার মধ্যেই বর্ষার বাহিরের রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবিচিত্তের সহিত এক্ষেত্রে বর্ষার কোনো নিবিড় সংযোগ নাই। বর্ণনীয় ঋতু এথানে ভাবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু কবি যখন বলেন—

নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে।—

তখন বর্ষা একটা ভাবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের অন্তর্লীন সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে এবং মনে হয় শুধু কবির নয়—আমাদের চোখেও সজল মেঘের নীল অঞ্জন কে যেন কিছুটা মাখাইয়া দিয়াছে!

রবীন্দ্রমানসকে শুধু মুকুরের সহিত তুলনা করিয়া তাহার স্বরূপ ও মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। উপমার সাহায্যে এরূপ অদ্বিতীয় একটি মহাকবিচিত্তের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার দুরাশা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—"তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল!" সৃজনকুতূহলী রবীন্দ্র-হৃদয়কে একটি পরিস্রবণযন্ত্র কিংবা ছাঁকনীর সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। ছাঁকনীর ছিদ্রপথে যেরূপ বস্তুর সূক্ষ্ম অংশটুকু বাহির হইয়া আসে, কবিচিত্তের রন্ধ্রপথে ঠিক সেইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও জীবনের একটি কোমল, সূক্ষ্ম, স্থুলত্ববর্জ্জিত রূপ নির্গত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। এই জন্য রবীন্দ্রকাব্য-জগৎ একটা চিরসৌন্দর্য্যময় অপ্সরোলোক, পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত একটা অপার্থিব লাবণ্যের অলকাপুরী। এই মনোহর ভাবের ভুবনে শুধু "আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।" এখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতেই মাখানো রহিয়াছে "The glory and the freshness of a dream." সাধারণ মানুষের নিকট জগৎ ও জীবনের যে মূর্ত্তিটি প্রকট তাহা স্থুল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাহা স্থুল তাহাই অসুন্দর, যাহা সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াতীত তাহাই সুন্দর, সুঠাম, সুচারু। দুঃখশোক, ব্যথাদৈন্য, জরামৃত্যু শুধু ভয়ঙ্কর নয়,—অসুন্দরও বটে; লাবণ্যময়ী ধরিত্রীর কোমল অঙ্গে এগুলি দুষ্টক্ষতের চিহ্নের মতই অত্যন্ত স্থুল ও প্রকট। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সম্মুখে দুঃখশোক, ব্যথাদৈন্যের তো কথাই নাই,—মৃত্যুর মত এত বড় একটা জাজ্জ্বল্যমান সত্য ও বীভৎস ব্যাপার মধুরায়িত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতজনের নিকট ইহা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কবির তৃতীয়নেত্রবিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় বিশ্বসৃষ্টির যে রূপটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবময় রূপ,—

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

অবশ্য দুঃখশোক ও মৃত্যুকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেই তাহারা মিথ্যা হইয়া যায় এমন কোনো কথা নাই,—এগুলি নগ্ন, প্রত্যক্ষ জীবনসত্য। কিন্তু জীবনসত্য মাত্রেই কাব্যসত্য হইবে এরূপ আশা করাও সঙ্গত নয়। জীবনসত্য এবং কাব্যসত্যের একীভূতি ঘটিলে কাব্য হইত জীবনের অবিকল অনুকৃতি, হুবহু প্রতিচ্ছবি এবং সেক্ষেত্রে কাব্যের মহিমা ও স্বাতন্ত্র্যও অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রকাব্যে জীবনের যে চিত্র দেখিতে পাই তাহা মধুরায়িত চিত্র এবং এই জন্য বাস্তবধর্মী কাব্য বলিতে যাহা বুঝায় রবীন্দ্রকাব্য তাহা নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ, ইহাই আমাদের দুর্গত জাতির পুণ্যফল। তাঁহার কাব্যে বাস্তবধর্মিতার অভাব গোলাপফুলে গাঁদাফুলের গন্ধের অভাবের মতই স্বাভাবিক। কবি যদি দস্তুরমত বাস্তববাদী হইতেন তবে জীবনের একজন উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা কাব্য নিঃসংশয়ে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর হইতে বঞ্চিত হইত। রবীন্দ্রনাথ জীবনের রূপকার—অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, তিনি তাহার ফটোগ্রাফার নহেন। রবীন্দ্র-মানসের একটি বিশিষ্ট ধর্ম—বস্তুকে Idealize করা। এই আদর্শবাদ তাঁহার মজ্জাগত। ইহাকে তিনি কোনোমতেই পরিহার করিতে পারেন নাই। যদি তিনি এরূপ চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার স্বধর্মচ্যুতি ঘটিত এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। একটা মহান্ আদর্শবাদ—Lofty idealism এর দ্বারা নিরন্তর অনুপ্রাণিত হইলেও মাঝে মাঝে কবির খেদোক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহার বাস্তববিমুখিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার—

অথবা—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

কবির এই আক্ষেপ উক্তিকে একটা Pose বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কবিতা একটা বিশেষ Mood এর ব্যাপার; সে Mood যতই ক্ষণস্থায়ীমান হোক তাহাকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারো নাই। যে মুহূর্তে তাহার উদয় ও বিলয়—শাশ্বতকালের জন্য না হইলেও অন্ততঃ সেই মুহূর্তটির জন্য উক্ত Mood কবির নিকট প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত সত্য।

এই 'কষ্টের সংসার'কে দেখিয়া কবিহৃদয় চঞ্চল ও আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই দুঃখজর্জরিত সংসারকে তিনি দেখিয়াছেন কোথা হইতে? নিঃসংশয়ে এ কথার উত্তর—Ivory tower হইতে! দুঃখবেদনার যে নগ্ন, করাল মূর্ত্তি দেখিয়া ইংরেজ কবি আর্ত্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন "Hand to mouth and no to-morrow," মধ্যবিত্তের আশাভরসাহীন প্রাত্যহিক জীবনের এই তীব্র, তীক্ষ্ণ, জীবন্ত অনুভূতি রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া রোমান্টিক কবিমাত্রেরই প্রতি যে পলায়নী মনোবৃত্তি আরোপ করা অধুনা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরূপ মনোবৃত্তি আরোপ করা অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ জগতের দুঃখবেদনার হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় Ivory tower আশ্রয় করেন নাই—Ivory tower এ তিনি আবাল্য লালিত ও পরিবর্দ্ধিত!

জীবনে কুশ্রীতা ও কদর্য্যতার অভাব নাই। দুঃখদারিদ্র্য, জরামৃত্যু মানুষের নিত্যসহচর। সংসারের নোংরা-রাবিশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে স্থান দেন নাই বলিয়া যাহাদের ক্ষোভের অন্ত নাই তাহারা ভুলিয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি,—তিনি এই দুঃসহ জাগতিক জীবনকে আমাদের পক্ষে সুন্দর, শোভন ও সহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা

'গীতরসধারা' সিঞ্চন করিয়া কবি 'সংসারধূলিজাল'কে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমার পঞ্চাশৎ জন্মদিনে

ডাক্তার রামেন্দু দত্ত (ক্যাপ্টেন্)

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" জঙ্গল-যাত্রা সুরু
ছিন্ন-ভিন্ন হৃদয় আমার! বক্ষ দুরু-দুরু॥
সুখ দিল না যে সংসারে, বাঁধ্‌লো সুধু শৃঙ্খলে—
গহন-চারীর অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই জঙ্গলে॥
"জংলা পাখী পোষ না মানে, জংলা পোষা বিষম দায়"
মহাজনের বাক্যটা আজ প্রাণটারে মোর কী দন্ধায়॥
বাঁশ-বনেতে পত্নী, খুড়ি, পেত্নী গেলেন ফিরে আমার—
বন্যা যত কন্যা এলেন, কেউ বা ভদ্র, কেউ চামার!
আকৃতী রূপার খাঁকৃতি এখন, রূপের নাহি চমক, হায়!
রূপসীকে উপোসী রও বল্‌বে যে, সে ধমক্ খায়॥

নেইক যে car, বে-কার এখন, পথে ঘাটেই পথ চলা—
সাম্‌লে চলি—থেঁৎলে যাওয়া নেবুর খোসা, আর কলা!
পোক্ত শরীর, রক্ত চাপে বেজায় কাঁপে; দোক্তা পানে
ঘোরায় মাথা; ভাবায় যা-তা; মন যে কেমন, মন জানে॥

* * * *

কে আনাবে ধূপ-চন্দন, কে জ্বালাবে প্রদীপখানি—
পায়স রেঁধে কে খাওয়াবে, হাসিমুখে ঘোমটা টানি'?
জন্মতিথি কে পালিবে, আজকে আমার জন্ম শেষ—
মৃত্যু আনো; বাঁচাও মোরে; স্রষ্টা আমার! পরমেশ!

শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এবার শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী ও তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ দুঃখের কথা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক্।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে আমি যা দেখেছি এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, তাতে জানি যে, তিনি একজন অত্যন্ত সরল-স্বভাবা, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা মহিলা। তিনি তাঁর জীবন-ভোর পূজা-পার্বণ ও জপতপ নিয়েই আছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স যখন অল্প ছিল, তখন থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের কয়েক বৎসর পরে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই জপতপ ও পূজা-পার্বণের কথা উল্লেখ করে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—"ইনি ত দিন রাত জপতপ পুজো আচ্চা নিয়েই থাকেন।"

প্রমথবাবুর ন্যায় আরও দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটি চিঠিপত্রে তাঁর স্ত্রীর এই ধর্ম-স্বভাবের কথার উল্লেখ দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও তিনি একবার কাশী থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"...এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে, আর এক মুহূর্ত মন টেকে না, এমন হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাসে যাওয়া যায় না। একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর।* শ' দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন। একছত্র লেখা বার হয় না, একি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন কলম নিয়ে বসি, আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি।"

এই চিঠিখানিতে দেখা যায় যে, কাশীতে শরৎচন্দ্রের তখন আর এক মুহূর্ত মন না টিকলেও স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই শুধু তিনি অত অসুবিধা ভোগ করেও চৈত্রমাসটা কাশীতেই কাটিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সকল সময়েই তাঁর স্ত্রীর ধর্মকর্মের জন্য নিজের অসুবিধাকেও স্বীকার করে নিতেন এবং স্ত্রীর এই সব কাজের জন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিতই নিজের সময় ও অর্থ দুই-ই ব্যয় করতেন। এজন্য তিনি আদৌ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর এই সব বারব্রতর ব্যয় ছাড়া, ব্রতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণভোজন করানোর ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের উৎসাহ কম ছিল না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর অন্য কাজকেও পণ্ড করতে আদৌ ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বেহালার জমিদার শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের ৮, ২, ৩২ তারিখের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র লিখছেন—"সরস্বতী পুজোর সময়ে আমার বাড়ীর বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই। কিন্তু এবারে শনিবারে বড়-বোয়ের* একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না। তাই মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।"

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ধর্মকর্মের পথে এইভাবে তাঁর স্বামীর সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে আপন মনে তাঁর যত খুশি বার ব্রত করে যেতেন। হিরণ্ময়ী দেবীর এই ধর্মস্বভাব আজও তাঁর মধ্যে ঠিক তেমনিভাবেই রয়েছে। ছোট ছোট বার ব্রত ছাড়া বড় বড় কাজও তিনি করে থাকেন। কিছুদিন আগে বহু টাকা ব্যয় করে সামতাবেড়েয় তিনি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সেদিনও সামতাবেড়ের পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য হিরণ্ময়ী দেবী হাজার টাকারও বেশী দান করলেন।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে সস্ত্রীক থাকতেন, অনুমান করা যায় যে তখন তাঁরা সেখানে খুব সুখেই ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে মাত্র থাকতেন। আর চাকর-বাকর ও থাকতই। অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের দু'একটি চিঠিতে তাঁদের তখনকার দাম্পত্য-জীবনের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বন্ধুকে রসিকতা করে লিখছেন—"সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে যিনি আছেন, তিনি বলেন 'খেতে পাবে না।'......একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করে ছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। "বরং" লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ "ং" হবে না "ং" হবে?"

বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। বিয়ের পর শরৎচন্দ্র নিজে হিরণ্ময়ী দেবীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখান। তারফলে তিনি সামান্য একটু আধটু লিখতে পড়তে শেখেন।

শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে আর একবার একটি পত্রে লিখেছিলেন—"একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কিনা, তাই নড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব করে নড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেইভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক

* হিরণ্ময়ী দেবীর।

* হিরণ্ময়ী দেবীর।

বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারিনে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা !! সে দিন-রাত যে কি করে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন Dentist এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন—উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বললেন 'ওরে বাপ রে ! একটি দাঁত তুললে সব কটি দাঁত দুদিনে ঝুর্ ঝুর্ করে পড়ে যাবে এবং বেশ একটু scientific ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে—অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চলে আসা গেল, তারপর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না, তার পর দিন তুলে এলাম। সে যা Dentist—প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধরে প্রায় আধ-ওপড়ানো গোছ করে তুলেছিল। যত বলি ওটা না, ওটা না সায়েব থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তার পর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। Dentist বললেন, 'বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।' কথা শোন প্রমথ ! তুই শালা তুলতে জানিস নে—রক্তপড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের।"

হিরণ্ময়ী দেবী খুব স্বামী-সোহাগিনী মহিলা। রেঙ্গুনে থাকার সময় তিনি নিজের হাতে অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিপাটি করে রেঁধে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে যখন থাকতেন, তখনও অনেকদিন পর্যন্ত রান্নাবান্নার যাবতীয় কাজকর্ম হিরণ্ময়ী দেবী নিজের হাতেই করতেন। তারপর শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে, শরৎচন্দ্র স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য রাঁধবার লোকের ব্যবস্থা করে ছিলেন। রাঁধবার লোকের ব্যবস্থা হলেও হিরণ্ময়ী দেবী অনেক সময় নিজেই রাঁধতেন, তাছাড়া সব সময়েই তিনি তাঁর স্বামীর খাওয়ার দিকে নজর রাখতেন। এছাড়া তিনি প্রায়ই এটা ওটা ভাল খাদ্য ঘরে তৈরী করে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন। এদিকে শরৎচন্দ্র কিন্তু আদৌ ভোজন-বিলাসী ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অল্পাহারী। হিরণ্ময়ী দেবী তবুও ছাড়তেন না। তিনি কাছে বসে অনুরোধ উপরোধ করে তাঁর স্বামীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। স্ত্রীর এই খাওয়ানোর জুলুমের কথা নিয়ে রসিকতা করে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—"কোন কালে আমি অম্বলের রুগী নই। এত কম খাই যে, অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে চাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে—আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্‌চে। আমি এ-দেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাই নে—আমার ধাতে ও-অত্যাচার সইবে কেন ? কি বল দিদি, ঠিক না ? কিন্তু বাড়ির লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা কথা বলে গিয়েছেন যে 'অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।' মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনে-ছিলেন। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর-সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি ! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে ! বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি ! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় ত—আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই !"

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিরূপ যত্ন করতেন, এ চিঠিখানি তার একটি প্রধান সাক্ষ্য।

হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য ও সরলস্বভাবা মহিলা। হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত স্বামীসেবাপরায়ণা হলেও অতবড় একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের যোগ্য সহধর্মিণী যে তিনি হ'তে পারেন নি, একথা বলা যেতে পারে। তবুও এই হিরণ্ময়ী দেবীর উপরই নারী-দরদী শরৎচন্দ্রের ভালবাসা অত্যন্ত গভীর ছিল।

হিরণ্ময়ী দেবীর পেটে যখন প্রথম টিউমার দেখা দেয়, তখন ডাক্তার দেখে অপারেশন করবার উপদেশ দেন এবং এ কথাও বলেন যে, অপারেশন না করলে এই টিউমার দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকবে। অপারেশন করাতে গিয়ে পাছে হিরণ্ময়ী দেবীকে হারাতে হয়, এই ভয়ে শরৎচন্দ্র কিছুতেই অপারেশন করতে দিলেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর পেটের সেই টিউমার আজ বৃহদাকার ধারণ করেছে এবং এমন হয়েছে যে, এখন আর অপারেশনের কথাই উঠতে পারে না।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখ বিসুখ করলেই শরৎচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। সামতাবেড়েয় থাকার সময় হিরণ্ময়ী দেবী একবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে শরৎচন্দ্র কিরূপ কাতর হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন—"...কতদিনের কথা, তবুও যেন কত না আমার মনে রয়েছে। হঠাৎ একদিন দাদার একখানা চিঠি পেলাম—লিখেছেন 'মণি, বড় বৌয়ের খুব অসুখ, এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না—পারতো একবার এসো। চিঠি পড়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো, তখনই ছুটে গেলাম। দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে যখন পৌছালাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে...দেখলাম দাদার বাড়ীর একদিকের একতলার নীচের একটি লম্বা খোলা দালানে একখানি ইজিচেয়ারে দাদা শুয়ে আছেন—বাঁদিকের লম্বা হাতলে বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি দিয়ে। পাশেই গড়গড়াতে সাজা তামাক, হাতে নল, কিন্তু টানছেন না। বোধ হোলো চোখ বুজেই আছেন...একটি হ্যারিকেন আলো খানিকটা দূরে টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পায়ের ধুলো নিতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এলো—বুঝলাম এবার যে সত্যিই তিনি চোখ বুজিয়ে কোন ভাবনার রাজ্যে

গিয়েছিলেন। পাশেই একটি ছোট বেতের মোড়া ছিল, বসলাম। বললেন—'মণি, তুমি আজই যে আসবে তা আমি আশা করিনি—তবে আমার চিঠি পেয়ে যে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, এটা আমি সুনিশ্চিত করেই জানতাম। চলো উপরে, খুব করুণভাবেই বললেন, 'বড় বৌয়ের খুব বাড়াবাড়ি মণি, ডবল নিউমোনিয়া—বোধ করি এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। বুকে পিঠে সর্দি বসে গেছে, জ্বরও খুব বেশী—অচৈতন্য অবস্থাতেই রয়েছেন। এখানকার ডাক্তার দেখছেন।' দেখলাম দাদার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, কথাগুলিও যেন ভারী ভারী।"

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখে শরৎচন্দ্র যেমন কাতর হতেন, অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের বেলায় হিরণ্ময়ী দেবীর অবস্থাও ঐ রকমই হোত। হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত ধর্মস্বভাবা বলে তাঁর স্বামীর অসুখ করলে তিনি অনেক সময় তাঁর স্বামীর রোগমুক্তির জন্য ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করতেন। রেঙ্গুনে তাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানকার বাঙ্গালী পল্লীর শীতলা দেবীর কাছে একবার এবং পরে কলকাতায় কালীঘাটের কালীর কাছে আর একবার হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর রোগমুক্তি কামনা করে পাঁঠা মানত করেছিলেন। শরৎচন্দ্র পাঁঠা মানতের কথা দুবারই জানতে পেরে, জীব জন্তুর প্রতি মায়াবশতঃ তিনি দেবীর কাছে পাঁঠার মূল্য ধরে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ফোলা, অর্শ, আমাশয়, জ্বর—একটা না একটা অসুখে প্রায়ই ভুগতেন। ডাক্তার সব সময়ে থাকলেও হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীকে সুস্থ করবার জন্য এর ওর কাছে শুনে কখন কখন নিজে টোটকা চিকিৎসাও করতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দুঃস্থ প্রতিবেশীদের অসুখ করলে নিজে তাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, এমন কি প্রয়োজন হলে কারও কারও পথ্য পর্যন্তও নিজে কিনে দিতেন। এখন শরৎচন্দ্রের এই গরীব প্রতিবেশীদের অসুখে ডাক্তার এলে অনেক সময় হিরণ্ময়ী দেবীই তাদের বাড়ীতে গিয়ে ডাক্তারের ফি দিয়ে আসেন এবং রোগীকে ভাল করে দেখবার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করেন। এছাড়া হিরণ্ময়ী দেবীর আরও কিছু কিছু দানধ্যানও রয়েছে।

এই আত্মপ্রচারের যুগে হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেন নি। তিনি যা করেন, নিজের মনে ও নিজের খেয়ালেই করে থাকেন। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে অনেকে সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্রের বাড়ী ও হিরণ্ময়ী দেবীকে দেখতে যান। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর দর্শনার্থীদের দেখা দেন না। আমি একদিন হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে গিয়েছিলাম। যেতেই তিনি বললেন, কিছু আগেই কলকাতা থেকে একদল লোক তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিল, তাঁরা হিরণ্ময়ী দেবীকে একবার দেখতে চাইলেন, দেখে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁদের দেখা দিলেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর এই ব্যবহারে তাঁরা যাবার সময় তাঁকে অভদ্র ইত্যাদি বলে গেলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী আত্মপ্রচারে এতখানি বিমুখ যে তাঁর একটি ফটো তুলতে দিতেও তিনি নারাজ। হিরণ্ময়ী দেবীর একটিও ফটো নেই। এই ফটোর কথায় মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন—"জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদি, দাদার তো অনেক ছবি আমার কাছে আছে। আপনার ছবি থাকে তো একখানা দিন আমায়, কোথাও তো আপনার ছবি দেখিনি। বৌদিদি একটু হাসলেন, বললেন, মণি, আমার কোন ছবি নেই। তোমার দাদা একবার রেঙ্গুনে একখানা ছবি তোলবার সব ঠিক করেছিলেন—সব ঠিক। ছবিওয়ালাও এসেছেন—ছবি তুলতে তোমার দাদা চেয়ারে বসে, আমি তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা ধরলো, বোধ হয় অম্বলের ব্যথা—আর ছবি তোলা হোলো না ভাই। সেই অবধি আর কোনো ছবি তোলবার চেষ্টা হয় নি।"

এখন অবশ্য আমরা ছবি তুলতে চাইলে তিনি আর ছবি তোলাতে চান না।

হিরণ্ময়ীদেবীর কোন সন্তান হয়নি। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর কন্যা মুকুলমালা এবং পুত্র অমলকুমারকে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী নিজের পুত্র কন্যার ন্যায়ই আদর-যত্ন ও স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর বিয়ে দিয়ে ভাই ও ভ্রাতৃবধূকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন মারা যান তখন মুকুলমালার বয়স প্রায় দশ বৎসর এবং অমলকুমারের বয়স আট বৎসর হয়েছিল। এঁরা ছেলেবেলাতেই এঁদের জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমার স্নেহে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অনেক সময় এঁরা এঁদের বাপমাকে ছেড়েও জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমার কাছে থাকতে ভালবাসতেন। শরৎচন্দ্র আদর করে মুকুলমালা ও অমলকুমারের ছেলেবেলায় তাঁদের নাম রেখেছিলেন, বুড়ি ও বাঘা। বুড়ি অর্থাৎ মুকুলমালার, আর বাঘা অর্থাৎ অমলকুমারের বয়স তখন খুবই কম। সেই সময় এঁদের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"দিন ৪।৫ হোলো ছোটবৌমা বাঘাকে নিয়ে বাপের বাড়ী মুঙ্গেরে গেছেন। কেবল বুড়ী রইল, মামার বাড়ীতে যেতে চাইলে না, বড়বৌও ছেড়ে দিলেন না।"

এই চিঠিখানিতে প্রকাশবাবুর ছেলে-মেয়েদের উপর হিরণ্ময়ী দেবীর স্নেহের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় যে, মুকুলমালা তখন অত্যন্ত বালিকা হলেও, তাঁর মাকে ভুলে তিনি জ্যাঠাইমার কাছেই রয়ে গেলেন। মুকুলমালা দেবী এবং অমলবাবু আজ বড় হয়েছেন। এঁরা আজও এঁদের জ্যাঠাইমাকে ঠিক তেমনি ভাবেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে আসছেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে এঁরা বড়মা বলে ডাকেন এবং ঠিক নিজের মায়ের মতই মান্য করে চলেন। অপর পক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী আজও এঁদের নিজের পুত্রকন্যার ন্যায়ই স্নেহ-যত্ন করে আসছেন।

শরৎচন্দ্রের পরিবারে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী, ছোটভাই প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী এবং প্রকাশবাবুর পুত্র কন্যা—এই ছোট্ট পরিবারের মধ্যে শরৎচন্দ্র খুব শান্তিতেই দিন কাটাতেন। বাড়ীর প্রত্যেকের সুখ সুবিধার দিকে তিনি সবসময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি অসুখে পড়লে, পাছে কোথাও কারো কিছু অসুবিধা হচ্ছে, এই ভেবে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর আগের বছর শরৎচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের

জন্য দেওঘর যান, তখন তিনি ঘন ঘন চিঠিতে বাড়ীর খবর পাবার জন্য তাঁর ভাগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে একখানি বড় করুণ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"হেঁাদল, আজ দশ দিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামিমা তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক, ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোষ্টকার্ড দাও ত কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

অতবড় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্ত্রী চিঠি পর্যন্ত লিখতে জানেন না। অসুস্থ দেহে দূর দেশে থেকে বাড়ীর সংবাদ-সহ স্ত্রীর একখানি পত্র পেলে শরৎচন্দ্র তখন কতই না শান্তি পেতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখতে জানেন না বলে, তাঁর ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের সংবাদ নিয়ে প্রত্যহ একখানি করে চিঠি লিখবার জন্য তিনি অন্যকে অনুরোধ করছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী তো শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখতে পারতেন না। আর শরৎচন্দ্রও হিরণ্ময়ী দেবী পড়তে পারবেন না বলে এবং চিঠির উত্তর দিতে পারবেন না বলে তাঁকে কখনো চিঠি লেখেন নি। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় একবার পরিহাস করে হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে কখনো চিঠিপত্র লিখেছিলেন কিনা? এ সম্পর্কে মণিবাবু নিজে যা লিখেছেন এখানে তাই উদ্ধৃত করছি—"হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদি, দাদা আপনাকে চিঠি পত্তর লিখতেন? মুখখানি একটু ঘুরিয়ে বললেন—তোমার দাদা তো ভাই আমাকে ছেড়ে বড় একটা বেশী দিন থাকতেন না। তাছাড়া আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া তো জানি না। শুধু নামটাই লিখতে পারি—না, চিঠি কখনও লেখেন নি।"

মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে উইল করে দিয়ে গেছেন। তবে উইলে তিনি এ কথাও লিখে গেছেন যে, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

এই শরৎচন্দ্রের বিবাহপ্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখতেই সেদিন সামতাবেড়ে হিরণ্ময়ী দেবীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আমি যখন যাই তার কিছু আগেই শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরে অবস্থান-কালের জনৈক বন্ধু হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি তাঁর বৌদি হিরণ্ময়ী দেবীর জন্য কিছু কমলা নেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে কথা কয়ে চলে আসবার সময় দেখলাম, তিনি উপস্থিত কয়েকজনকে সেই কমলা নেবুগুলো নিয়ে যেতে বলছেন এবং আরও বলছেন যে, তিনি কমলা নেবু খান না।

হিরণ্ময়ী দেবী কমলা নেবু কেন খান না, কৌতূহল বশে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে—জানালাম যে, শরৎচন্দ্র পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যুর পূর্বে কমলা নেবুর রস খেতে চেয়ে খেতে পান নি বলে, শুধু হিরণ্ময়ী দেবীই নয়, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রকাশবাবুও কমলা নেবু খেতেন না। এই কারণেই প্রকাশবাবুর স্ত্রীও কমলা নেবু আর খান না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ২রা মাঘ। বছরের এই দিনটিকে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যু দিন বলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে থাকেন। এই দিনটি তিনি তাঁর স্বামীর ধ্যান ধারণা করেন এবং নিরম্বু উপবাস করে কাটান। আর প্রতি বছর এই ২রা মাঘ তারিখে অথবা এর পরের একটা রবিবারে হিরণ্ময়ী দেবী বহু টাকা খরচ করে সামতাবেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বালক ভোজন করিয়ে থাকেন।

উপসংহারে এই হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে আমার একটি কথা বক্তব্য এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে অল্পদিন-স্থায়ী সাহিত্য-সাধনার পর দীর্ঘদিন যখন সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে দূরে ছিলেন এবং আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে যখন ছন্দহীন জীবন যাপন করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে হিরণ্ময়ী দেবী যদি এসে না দেখা দিতেন, তাহলে সেদিনের সেই শরৎচন্দ্র আজকের শরৎচন্দ্র হতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, সরলা ও অনেক বিষয়ে অবুঝ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মত স্বামী-সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা, কর্তব্যনিষ্ঠাবতী, কোমলহৃদয়া, অহংকার ও অভিমানশূন্যা মহিলা এযুগে খুব কমই আছেন। এই মহীয়সী মহিলা তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের বাঁধনে ভবঘুরে শরৎচন্দ্রকে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলেই, পরে শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য সাধনার পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে হিরণ্ময়ী দেবীর দানই বোধ করি সবার উচ্চে। কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি হিরণ্ময়ী দেবীকে উৎসর্গ করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন—"বৌদি, যৌবনের প্রথম উষায় যে গৃহ-বিরাগী আত্মভোলা উদাসী মানুষটি একদিন সকল বন্ধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ব্যর্থতার নিবিড় বেদনা যাঁকে বাঞ্ছিত সাহিত্য-সাধনা হতে সুদীর্ঘকাল নিবৃত্ত রেখেছিল, দেশ-দেশান্তরে নিরুদ্দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছিল ভবঘুরের মতো—সেদিনের সেই গৃহত্যাগী শ্মশানচারী শিবকে প্রমথ সঙ্গীদলের আবেষ্টন থেকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছিল আপনারই অপরিসীম ভক্তি ও প্রেমের সুকঠোর তপস্যা।"
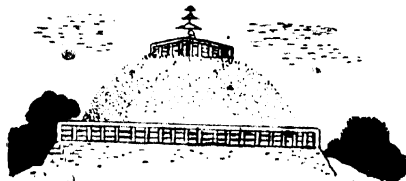
মহাত্মা শুকদেব গোস্বামী

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

(২)

বেলা ১০টার সময় বৃদ্ধ ব্যাসদেবের প্রাণটা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি ধ্যান-জপ ছাড়িয়া আশ্রম কুটীরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন আশ্রমপ্রকৃতি একান্তভাবে বিরহবিধুরা। সূর্যের কিরণ রাহুগ্রস্ত, পবনের গভীর শ্বাস, পক্ষীকুলের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা, লতাবিতানের আশ্চর্য-বিমর্ষতা, বিটপীসমূহের ভাববৈক্লব্য—সমগ্র আশ্রমটাই আজ শোকাভিভূত। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, কণ্বমুনি তাঁহার আশ্রমের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, ব্যাসদেব নিজ আশ্রমের সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন।

"শুক, বাবা শুক, কোথায় তুমি?" কোন সাড়াশব্দ নাই। ব্যাসদেবের প্রশান্তাত্মা একেবারে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিল। তিনি প্রাকৃত-জনের মত ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল নবদ্বীপের শচীমাতার।

"ডাকেন জননী, নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে, 'নাই, নাই, নাই।"

ব্যাসদেব উন্মাদের মত, ভূতাবিষ্টের মত, আশ্রমের বাহিরে ছুট লাগাইলেন এবং পুত্রের পলায়নের সম্ভাব্য দিক লক্ষ্য করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'আত্মা বৈ-জায়তে পুত্রঃ।'

"বৎস, আমার পুত্র শুককে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুর, তিনি উলঙ্গ অবস্থায়, এই পথ ধরে, ঐ—ঐ বনের দিকে চলে গেলেন।"

এক কাঠুরিয়া ব্যাসদেবকে এই সংবাদ দিল। ব্যাস সেই দিকে ছুটিলেন। "বৎসে, একটি উলঙ্গ বালককে এই পথে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুর, একটি ছেলে, গায়ে কাপড় নেই, কি নধরকান্তি? দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমায় বললে, 'একটু জল দাও ত। আমি কলসী হতে জল ঢেলে দিলুম, আর সে আঁচলা ভরে জল খেতে লাগল। জল খেয়ে সে ঐ পাহাড়ের দিকে চলে গেল।"

কক্ষে জলপূর্ণ কলসী লইয়া এক যুবতী কন্যা বনের দিক হইতে আসিতেছিল। সে ব্যাসদেবকে এই সংবাদ দিল। ব্যাস সেদিকে ছুটিলেন।

এইরূপে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে এক মালভূমির উপরে আরোহণ করিয়া, বৃদ্ধ পিতা প্রায় শত হাত দূরে তাহার উন্মাদ পুত্রকে ধীর মন্থর গতিতে গমন করিতে দেখিলেন এবং দিশাহারা হইয়া সেই-দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যে পথ ধরিয়া শুক যাইতেছিলেন সেই পথটি একটি রম্য একপদী। সর্বদাই পুত্রকে দৃষ্টির গোচরে রাখিয়া পিতা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া ব্যাস দেখিতে পাইলেন, সেই পথটী একটী নির্জন সরোবরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর সেই সরোবরে কতিপয় দিব্যাঙ্গনা জলক্রীড়া করিতেছে। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, ঐ সুন্দরী তরুণীরা বা যুবতীরা শুককে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াও বস্ত্র সম্বরণ ত করিলই না, পরন্তু বাহ্যতঃ বেহায়ার মত শুকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, অথচ তাহাদের মানসিক বিকারের কোন লক্ষণই ব্যাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না। এই দারুণ মনস্তাপের মধ্যেও বৃদ্ধ পরম কৌতুক বোধ করিলেন।

সেই একপদী অবলম্বন করিয়া ব্যাসদেবও অল্প সময়ের মধ্যে সরোবরের তীরে আসিয়া পড়িলেন এবং জলক্রীড়ারতা তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কি আশ্চর্য! সেই, 'অঙ্গং গলিতং, পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং, কর-ধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং, মহাস্থবিরকে দেখিবামাত্র সরোবরের ঘাটে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তরুণী ও যুবতীরা লজ্জায় ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অনুচ্চস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, "ওলো, ব্যাসদেব যাচ্ছেন, ওলো কি লজ্জার কথা!" বলিতে বলিতে কেহ সোপানস্থ বস্ত্রখণ্ড লইয়া অসমঞ্জস্যভাবে নিজ গায়ে জড়াইতে লাগিল, কেহবা গামছাখানার একটা খুঁট লইয়া বক্ষ আবরণ করিল, অপরে হাতের কাছে লজ্জা নিবারণী যাহোক-কিছু না পাইয়া হুড়মুড় করিয়া জলের ভিতর নামিয়া গিয়া-গলা বুড়াইয়া বসিয়া রহিল। কি লজ্জার কথা! পুত্র-বিয়োগবিধুর রসরাজ থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। যিনি চিরকাল নর-নারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া হাত পাকাইয়াছেন, তিনি কি এ দৃশ্য দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন? কন্যাদিগকে কতকটা স্বস্থা ও সংবৃতা হইতে দেখিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দন্তবিহীন হাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "বলি, ওগো নাত্‌নিরা, তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এই একটু আগে আমার যুবা পুত্র একপ্রকার নগ্নবেশে এই পথ দিয়ে চলে গেল। তোমরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। আর এই গলিতনখদন্ত, সর্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত জরদ্গবকে দেখে তোমাদের এত লজ্জা—এটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না?"

কন্যাদের মধ্য হইতে একটী অধিকবয়স্কা ও কথঞ্চিৎ মুখরা যুবতী হাসিভরা আননে ব্যাসের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "বড় গোঁসাই! আমাদের ছোট গোঁসাইটী, মানুষ নন্—দেবতা। তিনি নিজের ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পথ বহে চলে যান। কে পুরুষ, কে স্ত্রী, কার গা খোলা, কার গা ঢাকা, সেদিকে তাঁর হুঁসই থাকে না। তাকে দেখে আর লজ্জা করবো কি? আর দাদামশাই! আপনি থুথুড়ে বুড়ো হলেও এখনো আপনার ভিতর স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান রয়েছে। আপনি কাব্য লিখে লিখে কত সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করেছেন, পা, কোমর, বুক, মাথামুণ্ডু কত বর্ণনা

করে, মেয়ে মানুষকে গোল্লায় পাঠিয়েছেন।" এই বলিয়া স্বর্গীয় হাস্যে বাটখানাকে ভরাইয়া দিয়া তরুণীটী জলের মধ্যে গা বুড়াইয়া দিল এবং সকলকে হাসাইতে লাগিল। আর একটী কন্যা উঠিয়া বাকীটুকু বলিল, "তাই আপনাকে দেখে আমাদের এত লজ্জা!" ব্যাসদেব মুখের মত জবাব পাইয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর, "ঠিক বলেছ, নাতনিরা, ঠিক বলেছ," বলিতে বলিতে যে কাজ করিতেছিলেন সেই কাজে মন দিলেন।

শুকদেব অতটা ভাবেন নাই যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার গতি মন্থর। তিনি চলিতে চলিতে যেখানে ভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে প্রকটিত দেখেন সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়ান। তিনি বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, আর প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' উক্তি আওড়াইতেছেন। আর পিতা ভীমবিক্রমে তাঁহার পিছু-পিছু ধাবিয়া আসিতেছেন, সুতরাং শুকদেব শীঘ্রই ধরা পড়িবেন, বুঝিতে হইবে।

এইভাবে বহুগ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া শুকদেব এক বিস্তীর্ণ অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং এই মহাবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় পিতা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া করুণকণ্ঠে 'হা পুত্র!' বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই শুক পিতার কাতর অনুনয় শুনিতে পাইলেন, "পুত্র, আমি তোমার অন্বেষণে এতদূর পদব্রজে এসেছি। বৎস, এখনো তুমি অতি সুকুমার। প্রব্রজ্যা অবলম্বনের বয়স তোমার এখনো হয় নি। বৎস, আমার সহিত আশ্রমে চল।" পিতাকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া শুকদেব পথহীন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পিতাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুত্র যদি ফিরিয়া নাই আসে তবে তিনিও ফিরিবেন না, সর্বদাই পুত্রের কাছে কাছে থাকিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পুত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আর একবার পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি এবার যে একটী আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিলেন তাহাতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—বৃক্ষসকল সহসা আন্দোলিত হইয়া শাখাবাহুর দ্বারা পুত্রকে অভিনন্দন জানাইতেছে। তিনি অন্তঃকর্ণে শুনিতে পাইলেন, বৃক্ষসকল বলিতেছে, "এস, এস, আমাদের চিরসহচর আমাদের কাছে এস। আমাদের আদরের ধন, এস। আমরা তোমায় কাঁধে করে নৃত্য করবো, কোলে করে আদর করবো, এস বৎস এস।" শুকদেবকে কাছে পাইয়া বৃক্ষসকলের উল্লাস দেখিয়া ও তাহাদের অভিনন্দন বাণী শুনিয়া ব্যাসদেব স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চ-কলেবর হইলেন।

সহসা ব্যাসদেবের মত পরিবর্তিত হইল। তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "থাক, যেখানে সুখে থাক সেইখানে থাক্। আমি আর ওর সাধনপথের বিঘ্নস্বরূপ হবো না।' এই বলিয়া তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। হাজার হোক তিনিই ত মানবের আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রবর্তক। তিনিই ত পূর্বে লিখিয়াছেন, 'প্রব্রজ্যা শেষ জীবনের অবলম্বন হইলেও, সাধকের তীব্র বৈরাগ্য দেখা দিলে প্রথম জীবনেই অবলম্ব্য'—সুতরাং শুককে প্রতিনিবৃত্ত করা উচিত নহে। তবে পুত্রের শুভাশুভ সংবাদ জানিবার জন্য তিনি সর্বদাই উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন, আর সেই সংবাদও আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। উত্তর ভারতের সর্বত্রই তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্য ছড়াইয়া আছে, একজন না একজন শুকের সংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল।

এক ঋষি হিমালয় ভ্রমণ করিয়া ব্যাসের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শুকদেবকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু তার শুভ সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। তিনি উত্তেজিতভাবে ব্যাসকে সেই সংবাদ শুনাইতে লাগিলেন।

"উত্তর ভারতের বিখ্যাত জনপদ কুরু-জাঙ্গালে শুকদেব মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কখনো অঙ্গে কটিবাস থাকে, কখনো থাকে না। সমস্ত দেহ দিয়া এমন একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে, যাহা দেখিয়া হিংস্র পশুরাও শত হাত দূরে পলাইয়া যায়। তিনি মধ্যাহ্নে একবার লোকালয়ে আগমন করেন, কোন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হন এবং একটী গরু দুইতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় সেই স্থানে অবস্থান করেন। বাড়ীর মহিলারা, কেহ বা একটু দুধ, কেহ দুটা ফল, কেহ কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া দিলে তাই খাইয়া আবার কোথায় চলিয়া যান। বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীর বালকেরা সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া থাকে এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে খেলা করেন। এমন কি বয়স্থা রমণীরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে।"

ব্যাসদেব—ত্রিগুণাতীত অবস্থা!

শুকদেবের আরো সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তিনি যে গৃহস্থের বাটীতে শুভ পদার্পণ করেন সেইখানেই এক হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়া যায়। বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ ছুটিয়া আসে তাঁহার পদধূলি লইতে। গৃহিণী সোনার থালায় অন্ন আনিয়া শুকের সম্মুখে ধরেন, কিন্তু শুক কারোর সহিত কথাও কন না, আর সেই অন্ন গ্রহণও করেন না। স্বর্ণে ও মৃত্তিকায় তাহার সমজ্ঞান। কিন্তু সকলেই তাহার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। এমন কি যে স্থানে তিনি একবার দণ্ডায়মান থাকেন, সেখানকার মাটী লইতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। সকলে বলে, সাক্ষাৎ দেবতা জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু সকলে দুঃখ করে, এই বলিয়া যে তাঁকে একদণ্ডের বেশী পাওয়া যায় না। একবার দর্শন দিয়া যে কোথায় চলিয়া যান কেহ বলিতে পারেন না। তবে তিনি বালকদের বড় ভাল বাসেন এবং অবোধ শিশুদের শত অত্যাচার সহ্য করেন।"

ব্যাস—মূঢ়ো স্থূঢ় ইবায়তে।

এখানে কথা উঠিতে পারে, যে শুকদেব ঐতিহাসিক চরিত্র। অতএব বাস্তবের সহিত বিচার করিয়া তাঁহার কার্যাবলি গ্রহণ করিতে হইবে। একজন ষোড়শবর্ষীয় যুবক একাকী হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর সিংহ ব্যাঘ্র তাঁহার রক্ত পান করিতেছে না, হস্তী তাহাকে পদদলিত করিতেছে না, সর্প তাহাকে দংশন করিতেছে না, ইহা কি সম্ভব? বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে এ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শুকের কথা স্বতন্ত্র। উত্তর ভারতের সুবিখ্যাত অরণ্য কুরু-জাঙ্গাল। সেই অরণ্যে একাকী বিচরণ করা একেবারে অস্বাভাবিক, কারণ দু'দিনের মধ্যে বিচরণকারীর দেহ নষ্ট হইবেই।

কিন্তু অদৃশ্য হস্তের চালনাও ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। "কৌন্তেয় প্রতিজানাহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।" তাই যদি হয়, তবে অসহায় এই তরুণকে ভগবান যে রক্ষা করেন না, তাহা কে বলিতে পারে! 'বিল্বমঙ্গলের' পাগলিনী যে গানটী গাহিত তাহাই এই সন্দেহ অপনোদনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে!
যেথানে যাই সে যায় পাশে
আমায় বলতে হয়না সাধ করে।'

সত্যি! ভগবানই শুকদেবকে এরূপ অবস্থায় রক্ষা করিতেন। নয় কি?

কিছুদিন পরে আর এক চমকপ্রদ সংবাদ আসিল, যাহা শুনিয়া আশ্রমবাসী সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক ঋষি কোন বৈশ্যের মুখ হইতে এই শুক-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবকে তাহা জানালেন। ঘটনাটী এই—এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থিত একটু খোলা জায়গায় কতিপয় বালক-বালিকা খেলা-ঘর পাতিয়া খেলা করিতেছিল। খেলার বিষয়বস্তু হইতেছে, বর-কনের বিবাহ। কনে পাওয়া গিয়াছে, বর পাওয়া যায় নাই। এমন সময় শুকদেব কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া তাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং আপন মনে হাসিতে লাগিলেন। বালকেরা 'বর এসেছে, বর এসেছে', বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল। দুটি বালিকা, কনের মা ও জ্যেঠাই সাজিয়া, শুকের কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি বর হবে!' ছেলেরা বলিল, "ও বোবা, কালা। কারোর সঙ্গে কথা কয়না। ও বর হলে বেশ মানাবে। ওকে নিয়ে যাও।" সেই বালিকা দুটীর বয়স একটু বেশীই ছিল, তাহাদের শরীরে যৌবনের হাওয়া দিব্যি লাগিয়াছে। তাহারা শুকদেবকে একপ্রকার কোলে করিয়া কনের নিকট লইয়া যাইল এবং কপালে চন্দন মাখাইয়া দিয়া ও একখানি চেলির কাপড় পরাইয়া দিয়া তাহাকে বরের আসনে বসাইয়া দিল। উলু উলু ধ্বনির সহিত বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। বালক-বালিকারা মহা আনন্দে মত্ত। এমন সময় শুকদেব মুখে এক অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং দণ্ডায়মান অবস্থাতেই একেবারে সমাধি-মগ্ন হইয়া পড়িলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি বালক, যতগুলি বালিকা উপস্থিত ছিল, সকলেই নিশ্চল দেহে ভাব-সমাধিতে ডুবিয়া গেল। সে এক অপূর্ব অবস্থা, অপূর্ব দৃশ্য! যে যে-অবস্থায় ছিল—উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান—সেই অবস্থাতেই বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল। প্রত্যেকের চক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে, মুখে মৃদু হাস্য, চক্ষু অর্ধনিমীলিত, যেন নিজ নিজ হৃদয় কন্দরে কি এক দিব্যপুরুষকে দর্শন করিতেছে! এইরূপে বহুক্ষণ থাকিবার পর সকলের একসঙ্গে যখন ধ্যানভঙ্গ হইল, দেখিল তাদের প্রিয় সঙ্গী আর নাই, কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে! সকলে পাগলের মত তাহাদের 'প্রেয়'কে অন্বেষণ করিতে লাগিল। বালকেরা 'সাধুবাবা কোথায় গেলে!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর বালিকারা, 'আমার গোপালি, কোথা গেলে!' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। এইভাবে বহুক্ষণ কাটিবার পর, বালক-বালিকাদের অভিভাবকগণ আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল।

ব্যাসদেব—আহা, তাদের ইহজীবন সফল হলো—মহাপুরুষের কৃপায় আত্মদর্শন লাভ হলো!

ইহার পর আর কিছুদিন শুকদেবের কোন সংবাদই পাওয়া যাইল না, পিতা ভাবিলেন শুক আরো উত্তরে চলিয়া গিয়াছে, হয়ত হিমালয়ের এক নিভৃত-কন্দর বাছিয়া লইয়াছে। সে যে আর লোকালয়ে ফিরিয়া আসিবে এরূপ কোন আশাভরসা অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু এর পরও যে শুভ সংবাদ আসিল তাহাতে বৃদ্ধ পিতার মন আবার পুত্র দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন—হয়তো একদিন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

একজন ঋষি আসিয়া সংবাদ দিলেন, তিনি শুককে খুব নিকটেই দেখিয়াছেন, রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের দশ যোজন দূরে। শুক আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, হয়ত লোকশিক্ষার জন্যে! পিতা এই শুভ সংবাদ পাইয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি যেন মনে মনে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নিমাই সন্ন্যাস' কবিতার শেষ দু' পঙ্‌ক্তি আওড়াইতে লাগিলেন।

"কারে যে কি করো তুমি জান, হরি!
দেখে-শুনে কবি হতবুদ্ধি সার!"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

হ্রদের বুকে

ফটো :—গোপাল বসু

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

র্ণ-মন্দির—অমৃতসর

ফটো —গোপাল বসু

আত্মচরিত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আমি কবি দুর্গত সংসারী
অশ্রুর ব্যাপারী আমি ব্যথার ভাণ্ডারী।
চারিদিকে হট্টগোল কলহের কল কোলাহলে
কৃতাঞ্জলি হয়ে রই শতেকের চরণের তলে,
আর্ত্তনাদ, হাহাকার, অভিযোগ, ভর্ৎসনা, গঞ্জনা,
লোকভয়, ধর্ম্মভয়, শত্রুভয়, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা
নিত্য-সহচর মোর। কঠোর এ জীবন সংগ্রাম
বাঁচাইতে এ সংসার উদয়াস্ত খাটি অবিরাম,
নিজে যে বাঁচিতে হবে সে কথাও ভুলি বারবার
সময় বাঁচাতে লই সংক্ষেপে সারিয়া স্নানাহার।
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, নাহিক বিশ্রাম
নাহি ভোগ-লালসারও নাম।

আমি কবি ভাবিতেও তাই হাসি পায় যে আমার।
মোর পরে আনন্দের আছে পরিবেষণের ভার!
মরুতে কি ফুটে ফুল? পাষাণে কি রস কভু মিলে?
কে আমারে কবি নাম দিলে?
যাহারা বলেনি কবি তাহারাই সত্যদর্শীসুধী
তাদেরে জানাই নতি আমি আঁখি মুদি।
যাহারা বলিয়া কবি দিয়েছে আমারে ভালবাসা,
তাহাদেরে বলি আমি—বৃথাই প্রত্যাশা।

কোথা পাব আনন্দের গান?
কি দিয়ে তুষিব বন্ধু, জুড়াইব কাণ?
জীবনের প্রতি দণ্ডপল
বেদনার অশ্রুভারে করে টলমল।
কি যে ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে বৃশ্চিক দংশন
তিলে তিলে মরণে বরণ,
জানে শুধু মোর মত মায়ামুগ্ধ সংসারী যে জন।
দুঃখ ও শাশ্বত নয়, এক দুঃখ যায়
অন্য দুঃখ সেথা ঠাঁই পায়।

এ জীবন পথ বাহি' চলিয়াছে দুঃখের মিছিল
বিরতি নাহিক এক তিল।
কম্প্র ওষ্ঠাধরে চাপি অশ্রুর প্রবাহ,
রুদ্ধ করি মর্ম্মের প্রদাহ,
স্তব্ধ করি হৃদয়ের ব্যথা
না বলিলে চলে না যে কথা
সেই কথা শুধু ছন্দে বলি
সে কথা শুনিতে বল কেবা কুতূহলী?
বেদনারো গান আছে, গাহিতে চাহিলে সেই গান
আকুলিয়া উঠে সারা প্রাণ,
সব বাণী পরিণত হয় হাহাকারে
গান কেবা বলিবে তাহারে?
পেয়েছিনু ক্ষুদ্র শক্তি, ছিনু আমি কবি
সংসার হরিয়া নিল সবি।
ছিনু কবি, করিনি সাধনা
চিনিতে পরম ধনে, জিনিতে বেদনা,
লভিনিক তপস্যায় আত্মার সে বল,
শোক দুঃখে রহিতে অটল,
মায়া মোহে অন্ধ হয়ে তাই
প্রাকৃত জনেরই মত জীবন গোঁয়াই।

অধ্যাত্ম সাধনা বলে শোকতাপ ভয়
মায়া মোহ ক্লৈব্য দৈন্য করিতে পারেনি যেবা জয়
সে ত শুধু ছন্দঃ শিল্পী। কবি কভু নয়।
পঙ্ক মাঝে পঙ্কজেরে যেইজন পারেনা ফুটাতে,
পায়নি পরম ধন যেজন মুঠাতে,
ব্যথা যেবা করে ভোগ করিতে পারেনা উপভোগ,
বাণীর প্রসাদে যেবা গণেনাক পরমার্থ যোগ,
ভাষা সুর ছন্দ রীতি থাকুক যতই।
তাহারে ত কবি নাহি কই।
মোর কাছে বৃথাই প্রত্যাশা
কবি খ্যাতি সে ত মোর দরদীর দয়া ভালবাসা।

বিদ্যানগরে বৈষ্ণব-সম্মেলন

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

"শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

ভক্তপ্রবর পদকর্ত্তা এই ভরসা দিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ কিন্তু আজও ঠিকমত জানে না—শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি বলিতে কোন্ অঞ্চলটিকে বুঝায়। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরটিকেই সাধারণতঃ লোকে শ্রীধাম নবদ্বীপ বলিয়া জানে।

কিন্তু, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর শ্রীগৌরমণ্ডলের অন্তর্গত হইলেও, বিশাল গৌরমণ্ডলভূমি যে সহর নবদ্বীপের উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া আছে, সাধারণে সে বিষয়ে তেমন সন্ধানই রাখেন নাই।

নবদ্বীপ বলিতে সাধারণতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের সন্ধান রাখেন, তাঁহারা বেশ জানেন যে, নবদ্বীপ বলিতে নয়টি দ্বীপের সমবায়ে গঠিত একটি বিশাল দ্বীপাকৃতি ভূখণ্ড, আর ইহারই উভয়পার্শ্বে অবস্থিত স্থানগুলি লইয়াই পদকর্ত্তা-কীর্ত্তিত শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি বিরাজিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ভূখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়াই নবদ্বীপ নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমা-বিবরণে নয়টি দ্বীপ লইয়া গঠিত নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নদীয় পৃথক্ গ্রাম নয়।
নব দ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥

শুধু এইটুকুমাত্র বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; ঐ নয়টি দ্বীপের এইভাবে পরিচয়ও দিয়া গিয়াছেন—

গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

অর্থাৎ—ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে—(১) অন্তর্দ্বীপ (২) সীমন্তদ্বীপ (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (৪) মধ্যদ্বীপ। আর পশ্চিমপারে (৫) কোলদ্বীপ (৬) ঋতুদ্বীপ (৭) মোদদ্রুমদ্বীপ (৮) জহ্নুদ্বীপ এবং (৯) রুদ্রদ্বীপ। *

উল্লিখিত বর্ণনায় কোন একটি দ্বীপেরও নাম 'নবদ্বীপ' নাই। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত নয়টি দ্বীপের সমন্বয়ে যে বৃহৎ অঞ্চলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, নবদ্বীপ বলিতে তাহাকেই বুঝাইত। শুধু নবদ্বীপ নয়, নদীয়া বা নদীয়ানগর বলিয়াও ইহার উল্লেখ আছে। 'নদীয়া-নগর' নামে নগর হইলেও আসলে কিন্তু এক মহানগরই ছিল। কারণ পূর্ব্বোক্ত সীমন্তদ্বীপ (সিমলিয়া) প্রভৃতি এই নদীয়ারই অন্তর্ভুক্ত এক একটি নগর বিশেষ বলিয়াই উল্লেখ আছে—

নদীযার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥—চৈঃ ভাঃ।

পদকর্ত্তাও গাহিয়াছেন—

মনে করি নদীয়া জুড়ি হৃদয় বিছাই রে।
তাহার উপর নাচাই আমার গৌরাঙ্গ-নিতাই রে॥

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও গাহিয়াছিলেন—

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়?
পথে পথে ঐ নদীয়ায়?

এই নদীয়া বা নবদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরই হইল—শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষাস্থান। বর্ত্তমান নবদ্বীপধাম ষ্টেশন হইতে সোজা দুই মাইল পশ্চিমে এই বিদ্যানগর অবস্থিত হইলেও, রাস্তা দিয়া চারি মাইলের কম নয়। পরিত্যক্ত কাল্না-কাটোয়া রোডের পার্শ্বে এই গ্রামের ধারেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাটবাড়ী। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই দুটি ভাইয়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিরাজমান। পাটবাড়ীর নীচে দিয়া পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবাহিত হইত, তাহার পরিত্যক্ত খাদের চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

সুদীর্ঘ কাল হইতে এই সব গৌরলীলাভূমি পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হইয়াই ছিল। তাহার প্রধান কারণ, এই অঞ্চলটা এখন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ-অনুরাগীদের কেমন যেন তেমন গা নাই। অনেকের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি—তাঁহাদের এমনও আশঙ্কা—

---

* (১) অন্তর্দ্বীপ—বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর, বাবলারি, প্রাচীন মায়াপুর ইত্যাদি। (২) সীমন্তদ্বীপ—নবদ্বীপের উত্তর; সিমুলিয়া, বামুনপুকুর, মিঞাপাড়া, বল্লালদীঘি, কাজীর বাড়া। (৩) গোদ্রুমদ্বীপ—নবদ্বীপের পূর্ব্বে; গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ। (৪) মধ্যদ্বীপ—মাজিদা, ইহাও নবদ্বীপের পূর্ব্ব ও গোদ্রুমদ্বীপের দক্ষিণ; মাজিদা, ভালুকা, পানশীলা ইত্যাদি। (৫) কোলদ্বীপ—নবদ্বীপের দক্ষিণে কোবলা, সমুদ্রগড়, চম্পকহট্ট (চাঁপাহাটি) প্রভৃতি। (৬) ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর (রাতপুর), নবদ্বীপের পশ্চিম, বিদ্যানগর ইহারই অন্তর্গত। (৭) মোদদ্রুমদ্বীপ—মামগাছি, মহৎপুর, ব্রহ্মাণীতলা প্রভৃতি। (৮) জহ্নুদ্বীপ=জাননগর; পারুলিয়া ফুলঠ্, প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত। (৯) রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপের উত্তরে রুদ্রডাঙ্গা; পূর্ব্বস্থলী, শঙ্করপুর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

হয় ত বা বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরটাই নদীয়া জেলার হাতছাড়া হইয়া পড়িবে। অনেকে এমন অনুযোগও করিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান জেলার প্রতি আমার নাড়ীর টান আছে বলিয়া আমি বিদ্যানগর লইয়া এত মাতামাতি করিতেছি।

এই অনুযোগেই বিপদ্ কাটিল না। বর্দ্ধমান জেলার বন্ধুরাও কেমন যেন সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরও আশঙ্কা—প্রাচীন ভাগীরথীর খাত খুঁজিয়া যদি সমুদ্রগড় হইতে পূর্ব্বস্থলী পর্য্যন্ত গৌর-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াই যায়, তাহা হইলে, কে জানে বর্দ্ধমানেরই খানিকটা বা হারাইতে হয়? কিন্তু বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি যে বাঙ্গালার বাহিরে যাইতেছে না—বাঙ্গালারই শ্লাঘাবর্দ্ধন করিবে—দেশ দেশান্তরের প্রেমপিপাসু ভক্তবৃন্দ যে এই পবিত্র লীলাভূমি দর্শনে আসিয়া বাংলাদেশেরই জয়ধ্বনি করিয়া যাইবে—এই দিক্ দিয়া কেহ চিন্তা করিলেন না—ইহা বড় কম পরিতাপের কথা নয়?

শ্রীগৌরভগবান্ এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। কলিকাতার "শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনীর" প্রতিষ্ঠাতা পরম ভক্তিমান্ কবিরাজ শ্রীমান্ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ এম্-এল্-এ মহাশয় বিদ্যানগরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বিদ্যানগর আজ তাঁহারই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্গত। পূর্ব্বস্থলী থানার প্রতিনিধিরূপে থানার এই গৌরবজনক স্থানটিকে পুনরায় ভক্ত-বৃন্দের সমাগমে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দিলেন। বলা বাহুল্য, মুখ্যতঃ তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় এতদঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া না উঠিলে, সহর হইতে দূরে একটি সামান্য পল্লীগ্রামে এতবড় সম্মেলনের অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভবপরই হইত না।

যে কোন ভাল কাজ করিতে গেলেই পদে পদে বাধা। কবিরাজ বিমলানন্দ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়াই বিরোধীপক্ষের বুক কাঁপিয়া উঠিল—তবে তো সম্মেলন আর কোন মতেই আট্‌কাইল না। এখন তো আর শুধু বিদ্যানগর নয়—এখন যে সমুদ্রগড় হইতে পূর্ব্বস্থলী পর্য্যন্ত বিরাট অঞ্চলের ৩০।৪০খানি গ্রামের লোক মাতিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রামপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে বিদ্যানগর হইতে পাঠান্তে স্বগৃহে ফিরিবার সময় বিশ্রাম করিতেন, সেই স্থানটি ঝোঁপে-ঝাড়ে একরূপ অগম্য হইয়াই ছিল। নবদ্বীপ হইতে বিরাট কীর্ত্তনের দল বিদ্যানগর যাইবার পথে এই বিশ্রামতলা হইয়া যাইবেন জানিতে পারিয়া শ্রীরামপুরের অধিবাসীরা বালক বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে একদিনের মধ্যে স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। বৈষ্ণব সেবার জন্য গ্রামে গ্রামে চাউল ও চাঁদা উঠিতে লাগিল—উপেক্ষিত অঞ্চল আবার বৈষ্ণব পদধূলিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—এই আশায় আনন্দে উৎসাহে গ্রামে গ্রামে সে কি উন্মাদনা?

একদিকে এই বিপুল উন্মাদনা, আর অন্যদিকে তখন গুঞ্জন উঠিয়াছে—বিদ্যানগরে শ্রীগৌরাঙ্গ যে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তো কৈ এতদিনে কেহই বলেন নাই, হঠাৎ আজই বা কথাটা উঠিল কেন? বলা বাহুল্য, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসীবৃন্দের মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগাইয়া দেওয়া হইল।

কথাটা কিন্তু ঠিক হঠাৎ উঠে নাই। দশ বার বৎসর পূর্ব্বেই এখানে সামান্যাকারে একটি স্মৃতিরক্ষার সূচনা করা হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপক ৺গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাটবাটীর সংস্কার সাধন ও শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা স্থানের স্মরণে একটি ছোট খাটো পাঠশালা স্থাপন করিয়াই কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। বৈদ্যপুরের জমিদার ৺নৃসিংহ নন্দী-চৌধুরী মহাশয়দের নায়েব এতদুদ্দেশ্যে জমিও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আর সব চাইতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন—শ্রীমান্ গয়ারাম দাস। ইঁহারই অকুণ্ঠদানে সেই পাঠশালাটি আজ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। পরম আনন্দের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষকই শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত। ইঁহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে যে এ অঞ্চলে প্রচারকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত বিদ্যালয়ে সমাহূত এক বিরাট সভায় বিদ্যানগরের প্রাচীন গৌরব-গাথা কতকটা বুঝাইয়া বলিতে পারায়, দেশবাসী সত্যসত্যই মাতিয়া উঠে—সকলেই বুঝিতে পারে, সত্যসত্যই নবদ্বীপের পশ্চিমের এই অঞ্চল একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি ছিল। বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব কিউরেটার সুহৃদ্বর শ্রীনীরদবন্ধু সান্যাল মহাশয় ঘটনাচক্রে আজ নবদ্বীপের অধিবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ আজ এই অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতকে নিজ চরণপ্রান্তে টানিয়া আনিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় এতদঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিদ্যানগরের পরিত্যক্ত ঢিপিগুলিতে যে সব ইষ্টক খণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা সহস্র বৎসরের কম পুরাতন নয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে শচীমাতা যখন ভাগ্যবান্ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে দেন, তখন বিদ্যানগর বিদ্যা-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ। শুধু কাব্য-ব্যাকরণ নহে, সর্ব্বশাস্ত্রেই পঠন-পাঠনার তখন বিদ্যানগরে সুব্যবস্থা রহিয়াছে।

এ বিষয়ে মুরারি গুপ্তের কড়চার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করা যায় না। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে অবস্থান করিয়া স্বয়ং বহু ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা খুবই প্রামাণ্য সন্দেহ নাই।

> ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিতাৎ।
> সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত ঈশান নাগর তাঁহার "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষার ক্রমটি পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ শিক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় সহচর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে তখন তাঁহার * অসাধারণ প্রসিদ্ধি। নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহারই নিকট বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

* শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আসল নাম শ্রীকুবের বেদপঞ্চানন।

কি কি শাস্ত্র পাঠ করিয়া আসিয়াছ? বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ মুখে কিছুই বলিলেন না, পাছে বিদ্যাগর্ব্ব প্রকাশ পায়। সঙ্গী গদাধরই তাঁহার পাঠের পরিচয় দিতেছেন। প্রসঙ্গটি অদ্বৈত প্রকাশ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"গৌর কহে শুন গুরু বেদপঞ্চানন।
বিদ্যানগর হৈতে আইনু তোমার সদন॥
আন্ শাস্ত্র দেখিবারে মন নাহি ভায়।
বেদার্থ শুনিতে মুঞি আইনু হেথায়॥
এত কহি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
মন বুঝি গদাধর কহিতে লাগিলা॥
গদাধর কহে শুন বেদপঞ্চানন।
আদ্য হৈতে কহি গৌরের পাঠ বিবরণ॥
প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈল সমাপনে॥
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য-অলঙ্কার।
তবে গেলা শ্রীমান্ বিষ্ণু মিশ্রের গোচর॥
তাঁহা দুই বর্ষ স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা।
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা॥
তাঁর ঠাঁই ষড়্‌দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে।
তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে॥
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বি বৎসরে।
এবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে॥

মুরারি গুপ্তের সহিত ঈশান নাগরের বিবরণের বিরোধ নাই। বেশ বুঝা যাইতেছে বিদ্যানগর তখন বৃহত্তর নবদ্বীপের বিদ্যাকেন্দ্ররূপেই প্রসিদ্ধ। সর্ব্বশাস্ত্রেরই অধ্যাপকগণের চতুষ্পাঠী এইখানে ছিল। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম শিক্ষার কেন্দ্ররূপে এই বিদ্যানগরকেই যে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিদ্যানগরে এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

প্রথমেই স্থির হইয়াছিল, শ্রীগৌরআনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব তিথি মাকরী সপ্তমীর দিন হইতে মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অষ্টাহব্যাপী মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। শেষ পর্য্যন্ত নানাকারণে ইহা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। ফলে আরম্ভের দিন ঠিকই রহিল। মহাসম্মেলনের শুভ অধিবেশন শুক্রবারে করিয়া শনি ও রবিবার দুইদিনেই অধিবেশন শেষ করা হইবে। বলা বাহুল্য, এই সঙ্কল্প অনুসারেই মহাসম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এবার শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব তিথি ৩০শে জানুয়ারী পড়িয়াছে। এইদিন মহাত্মা গান্ধীজীর তিরোধান তিথি। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারে মহাত্মার অমূল্য অবদানের কথা একাধিক বক্তা এদিন প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় মহাশয়কে এদিন সভাপতি মনোনীত করা সর্ব্বাংশেই শোভন হইয়াছিল। বৈষ্ণববংশের অবতংস সভাপতি মহাশয় এদিন প্রাণ ভরিয়া প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের অপরিহার্য্য প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এদিনের সভায় পরিকল্পনা বিভাগের শ্রীযুত ডি, এন্, গাঙ্গুলী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরলীলা ভূমির এমনই মাহাত্ম্য তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিয়া যান যে, এই অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নতি সাধনে তিনি কোন-না-কোন একটি ব্যবস্থা করিবেনই। বলা বাহুল্য, তাঁহার ন্যায় একজন দায়িত্বসম্পন্ন রাজপুরুষের প্রতিশ্রুতি এতদঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব উল্লাসের সঞ্চার করিয়াছে।

প্রভুপাদ শ্রীযুত প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় গত তিন বৎসর অখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলনের যে অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, এবার তাঁহাদের চতুর্থ অধিবেশন এই বিদ্যানগরেই অনুষ্ঠিত করিতে তাঁহারাও আগ্রহ প্রকাশ করায়, তাঁহাদেরই প্রস্তাব মত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে শুভ অধিবাস এবং পরবর্ত্তী দুইদিনে প্রকাশ্য অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। প্রভুপাদ প্রাণকিশোরই সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হইলেন, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে মনোনীত হইলেন নবদ্বীপ শ্রীবাসঅঙ্গনের প্রভুপাদ শ্রীযুত চৈতন্যচাঁদ গোস্বামী। কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর ইনি সভাপতি। সুতরাং সকল দিক্ দিয়া ভালই হইল। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর শ্রীমান্ রাধারমণ দাস, অনঙ্গমোহন হরিসভার শ্রীমান্ গোপীমোহন পাল ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তনীর শ্রীমান্ বলরাম গোস্বামী, যুগ্ম-সম্পাদকরূপে আমন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিলেন। আর স্থানীয় কর্ম্মীগণের পক্ষে বিদ্যানগর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীমান্ পরেশনাথ গোস্বামীকেই সম্পাদকের প্রকৃত ঝক্কি পোহাইতে হইয়াছে।

কর্ম্মসূচী অনুসারে শুক্রবার সন্ধ্যায় শুভ অধিবাসে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে প্রভু সন্তান ও বৈষ্ণব মোহান্তগণ বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। অধিবাস-কীর্ত্তনে শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি বংশ্য কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় সদলে সমুপস্থিত হওয়ায় সমবেত জনতার আনন্দের আর অবধি ছিল না। অধিবাসান্তে অহোরাত্রব্যাপী নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে কীর্ত্তন সম্প্রদায় চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইতে লাগিল। শ্রীবাস অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শন করিয়া কীর্ত্তন সম্প্রদায়গুলি বিদ্যানগর যাইবার কথা, পথে শ্রীরামপুরে বিশ্রাম। নবদ্বীপ হইতে বিদ্যানগর পর্য্যন্ত এই তিন চার মাইল পথব্যাপী সেদিনকার সেই কীর্ত্তন স্রোত যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মানসপটে শ্রীগৌরাঙ্গের সেই সময়ের জগমঙ্গল সংকীর্ত্তনলীলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শত শত দল কীর্ত্তনে প্রায় আট সহস্র নরনারী মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে সেদিন যেন গৌরমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল।

একদিকে এই বিরাট নগর সংকীর্ত্তনের বিপুল সমারোহ, আর অন্যদিকে সুসজ্জিত বিশাল মণ্ডপে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদির পাঠব্যাখ্যা

চলিয়াছে। শ্রীখণ্ডের সুধাকণ্ঠ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সুপুত্র শ্রীমান্ নিমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের আচার্য্যবর্গ প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের কৃতী পৌত্র শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী যথাক্রমে শ্রীশ্রীচন্দ্রামৃত ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা পরিবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রাণ জুড়াইয়াছেন। আজ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী, শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি। শ্রীলাদ্বৈতবংশ্য শ্রীমান্ মদনগোপাল শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন ব্যাখ্যা করিতেছেন। অদূরে নবদ্বীপ হইতে কীর্ত্তনের দল একে একে আসিয়া বিদ্যানগরে উপনীত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস অনুরণিত হইতে লাগিল—অতি বড় পাষণ্ডীর প্রাণও সেদিন এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে বিগলিত না হইয়া কি পারে ?

কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানেন গোরা রায়। পরিশ্রান্ত দলগুলিকে এইবার মহাপ্রসাদ বিতরণের মহামহোৎসব সুরু হইল। সুশিক্ষিত কংগ্রেস সেবাদলের নেতৃত্বাধীনে পল্লী অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকেরা সেদিন দশ সহস্র নরনারীকে সুশৃঙ্খলায় প্রসাদ পরিবেশন করিয়া সেবা বুদ্ধির যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছিল, তদ্দর্শনে কলিকাতা হইতে আগত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণেরও তাক লাগিয়া গিয়াছিল। গৌর-ভগবান্ এই সব তরুণ দলকে কৃপাবিতরণে কৃতার্থ করুন—ইহাই ঐকান্তিকী কামনা।

বেলা ঠিক দুই ঘটিকার সময় সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইল। সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রভৃতির সহিত সম্মেলনের প্রধান অতিথি পরমভাগবত ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ও আসন গ্রহণ করিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়েরও শুভাগমন পরম আনন্দের বিষয়ই হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করিলে পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলে পর প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ নলিনীরঞ্জনের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির শুভাগমনে বিদ্যানগর সম্মেলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বুঝিতে আর এতটুকুও বাকি ছিল না।

অধ্যাপক শ্রীমান্ জনার্দন চক্রবর্ত্তী অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষাভূমি বিদ্যানগরের মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং নবদ্বীপের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পক্ষে এই বিদ্যানগরই যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রখ্যাপিত করেন। অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীরামদুলেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীরামানুজ দর্শন ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত ভাষণ ও পণ্ডিতবর শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য মহাশয়ের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন বিষয়ক বক্তৃতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভান্তে বরানগর পাটবাটী হইতে আগত শ্রদ্ধেয় শ্রীরজনী দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রেমকণ্ঠ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের ভক্তবৃন্দ সুমধুর নামকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সুপ্রবীণ শ্রীযুগল দাস বাবাজী মহাশয় আজও যে যুবজনোচিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা শ্রীগুরু কৃপারই প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। কীর্ত্তনান্তে কলিকাতার সিকদার বাগান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রীগৌরলীলাভিনয় অপূর্ব্ব আনন্দদান করিয়াছে।

পরদিন রবিবার প্রাতে সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে যাঁহারা সম্মেলনে যোগ দিতে না পারিয়া সহযোগিতা জানাইয়াছেন, সেই সকল তারবার্ত্তা ও পত্রাদি এবং প্রেরিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। অপরাহ্নে শেষ অধিবেশনে নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণবদর্শনাধ্যাপক শ্রীমান্ রাজেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ স্বলিখিত প্রেমধর্ম্ম শিক্ষার ক্রম সম্বন্ধীয় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় প্রমুখ কবি বৃন্দের কবিতা পঠিত হয়। কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। বক্তৃতার মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে সমাগত শ্রীরমারাও ভজনমণ্ডলীর শ্রীশৈলজানন্দজী ও সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে সমাগত শ্রীশ্রী৺মদনমোহনের সেবাইত গোস্বামী মহাশয় পরবর্ত্তী অধিবেশন আহ্বান করিলেন। বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে এই সংবাদ সম্বর্দ্ধিত হয়। পরবর্ত্তী অধিবেশন কোথায় হইবে এখনও তাহা স্থির হয় নাই, কারণ দিল্লীর হরিসভার পক্ষ হইতেও আমন্ত্রণ আসিয়াছে।

সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী প্রস্তাবে স্কুল কলেজ, এমন কি পাঠশালারও পাঠ্যপুস্তকে বৈষ্ণবসাহিত্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের অবদান সম্বন্ধে যাহাতে সবিশেষ আলোচনা থাকে, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর একটী অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব,—বলিতে গেলে এবারকার সম্মেলনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব হইল,—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম শিক্ষার উপযোগী একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। মূলতঃ এ প্রস্তাবটি কিন্তু ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয়ই উত্থাপন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ নাগ নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছেন—মনীষীমণ্ডলী সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম আস্বাদন করিতে ব্যাকুল। এজন্য ডাঃ নাগই প্রস্তাব করেন যে, অনতিবিলম্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাঁহার এই সমীচীন প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী। শ্রীমতী এখন নবদ্বীপের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টের সদস্যা—প্রচুর অর্থ সামর্থ্য তো আছেই, তদুপরি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া সত্যসত্যই প্রাণে প্রচুর আশা ও উৎসাহ জাগিয়াছে।

এইবার লিখিতে অত্যন্ত লজ্জা হয়, এমন একটি কথা লিখিয়াই উপসংহার করিব। বৈষ্ণবেরা যে কতবড় অদোষদরশী এবং কতবড় অমানী-মানদ স্বভাবসম্পন্ন এবারকার সম্মেলন তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা মাদৃশ এক ভক্তিবিন্দুহীন জীবকে "হরিভক্তিসিন্ধু" উপাধি দিয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। এভাবে আমাকে বিড়ম্বিত করা হইতেছে কেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ? সভাপতি মহাশয় মান-পত্রের একটি ছত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—"* * শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ আপনাকে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের আলোক স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইত্যাদি" এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, আপনি কি অখিলভারত বৈষ্ণব সম্মেলনের দান অস্বীকার করিতে পারিবেন ? ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বৈষ্ণবের অযাচিত করুণার দান স্নেহাশীর্ব্বাদরূপেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ্ বলিয়া মনে করিয়াছি। এখন বৈষ্ণবের কৃপা—ভক্তিবিন্দুও যদি লাভ করিতে পারি, ধন্য হইব।

মনের নেশা

[লেখক—এড্গার এলেন্ পো]

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম-এ, ডি-এস-ই, ডি-এস-ডব্লু

সত্যিই, বেজায় ঘাব্ড়ে পড়েছিলাম!

আর, এখনও সেই রকম মনের অবস্থাই রয়েছে। কিন্তু এর জন্য পাঁচজনে আমাকে পাগল ঠাওরাবে কেন? আমার কানে একটা টুঁ শব্দ এড়াবার জো নেই। স্বর্গপুরীর আর বসুন্ধরার কোলাহলের সুর আমার কানে বেজে উঠতে লাগল! নরককুণ্ডের সোরগোল ঘুরে ফিরে কেবলই যাতায়াত আরম্ভ কর্‌লে আমার মনের মধ্যে।

—কি ক'রে এক নম্বরের একটা ভাবনা আমার মগজে প্রথম বাসা বাঁধলে—সেটা বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। যাই হোক, একবার মাথায় ঢুকেছে তো—আমার মনটাকে তুল্‌লে তোলপাড় করে। খাঁটি কথা বল্‌তে গেলে—এমন ভাবে মাথা ঘামাবার আসল কারণই ছিল না।

তেকেলে বাহাত্তুরে এক বুড়োর মোহে গেলাম প'ড়ে। একদিনের জন্যও সে আমার না করেছে অন্যায়, আর না দিয়েছে একটিও গাল্!—এদিকে আমি ভুলেও তার ধন-দৌলত তার নানান্ সামগ্রী—কোন কিছুতেই নজর দিই নাই।

—উঃ, কি তার সর্বনেশে চোখ! একটা চোখ তার অবিকল শকুনির চোখের সামিল। সেটার রং হয়েছিল—ফ্যাকাসে, আর একটা পাতলা পর্দা চোখটার দুকোন দিয়েছিল ঢেকে। সেটা যদি একবার কোন রকমে পড়েছে আমার উপর—আমার কলিজাটা গিয়েছে একেবারে শুকিয়ে!

একটা ধনুক-ভাঙ্গা পণ ক'রে বস্‌লাম—বুড়োকে সাবাড় কর্‌তেই হবে, তা হলেই পাবো ওর চোখ হ'তে রেহাই!··· মস্ত এক মাতব্বরের মতো, নানা রকম মতলব ভেঁজে এ কাজে লাগলাম এগুতে। কেল্লা ফতে কর্‌বার জন্যে উঠে পড়ে গেলাম লেগে। আট-ঘাট বেঁধে—কাজ শুরু করলাম সাবধানে। আমার হুঁসিয়ারীর তারিফ কি!

সপ্তাহখানেক আগে হ'তে বুড়োর উপর আমার দয়ার একটা চরম নিদর্শন দিলাম দেখিয়ে—সে রকমটী আমি কস্মিনকালেও হতে পারি নাই।

রোজ রাত দুপুরের সময়, যখন সব চুপচাপ—একেবারে নিশুতি রাত—জন-মানবের পাত্তা নাই—আমি খুল্‌তাম তার ঘরের দুয়োর; তাও অতি সন্তর্পণে, শ্রেফ শিকারী বেড়াল! তারপর যখন মাথাটা গলিয়ে দেবার মত পথ হতো তখন কর্‌তাম কি, একটা লণ্ঠনকে ঘরের মধ্যে দিতাম রেখে একেবারে ঢাকাঢোকা দিয়ে—পাছে এতটুকু আলোর ছটা পড়ে তার চোখে। ঘরে এত পা টিপে টিপে ঘুরাফেরা কর্‌তাম যে—যদি আমার মূর্তিখানা কারো নজরে পড়তো—সে নিশ্চয়ই হেসে গড়িয়ে যেতো। সারাক্ষণ আমার মনের ভিতর একটা ভয়—পাছে বুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যায়! কিন্তু আমি কি দমে যাবার পাত্র?

বুড়ো শাট্পাট হ'য়ে পড়ে আছে—এ ভাবে তাকে দেখবার জন্যে আমার লাগত পাকা একটী ঘণ্টা। পাগল লোক কি এমন ক'রে বিদ্যে জাহির কর্‌তে পারে? না পারে এমনি ক'রে সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে?

যাক্, আমি সাতদিন ধ'রে চৌপর রাত বুড়োকে দেখ্‌লাম—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সারাক্ষণের জন্য চোখটি তার রইলো বুজে! কাজেই করি কি?···বুড়োকে শেষ করার পালা অভিনয় করা আমার পক্ষে যে দাঁড়ালো অসম্ভব হ'য়ে। তার কারণ বুড়ো নিজে আমার কিছুই

করেনি—তার ঐ সর্বনেশে চোখটাই দিয়েছিল আমার মনটাকে বিগড়িয়ে।

সকাল বেলায় পূবদিক লাল হ'য়ে উঠ্বার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাজির হতাম তার ঘরে—একটা মস্ত বীরের মতো! মনে মনে বার কতক দেবতার নাম জপে কপাল ঠুকে একেবারে তার সামনে। চোখ-মুখ রাঙ্গিয়ে একদমে তাকে খানিক গাল্ দিয়ে—"রাতটা কাট্লো কেমন?"···এই হলো আপ্যায়িতের ভঙ্গিমা! এ যেন চাষার আমোদ কাস্তের আগার ডগে!

আট দিনের দিন।

এ রাত্রে আগেকার হ'তে লাখগুণ সাবধান হলাম বেশী; তারপর গেলাম ঘরের মধ্যে। মিটমিটে আলোয় আমার মাথার ছায়াটা পড়ল দেওয়ালে। আজ আমার হলো জিত—মনে হল আমি সাতরাজার ধন এক মাণিক হাতে পেলাম! বুকখানা আমার লাফিয়ে উঠ্লো ধড়াস্ ক'রে। মনের ভিতর ব'য়ে গেল, একটা আনন্দের হিল্লোল!···যা চেয়েছিলাম, তা পাবার শুভ মুহূর্ত্ত হাজির! স্ফুর্ত্তির চোটে লণ্ঠনে হাতের আঙ্গুল একটা ঠেকে গেল ঠুক করে। বুড়ো উঠলো তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে। এখন বোধহয় লোকে ভাবছে—আমি বুঝি দিলাম পিঠটান! কিন্তু তা নয়!

ঘরটায় একটা জমাট বাঁধা আঁধার। দরজাটা যে আধ-কপাটে রয়েছে বুড়ো তা টেরই পেল না। আমি দাঁড়ালাম দেওয়াল ঘেঁসে—একেবারে মিশিয়ে দিলাম নিজেকে। ঘণ্টা-খানেক ধ'রে প্রায় দম বন্ধ ক'রে চোখের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়ালাম না। কিন্তু এর মধ্যে বুড়ো বিছানায় শুলোও না, তখনও ঠায় বসে। কান দুটো খাড়া ক'রে কি যেন শোন্বার জন্যে—ওতপেতে বসে রইল!

"···যাঃ, কিছু নয়, একটা দমকা হাওয়া হয়তো বা একটা ইঁদুর, কি একটা ঝিঁঝিঁ পোকা সাঙ্গ করল তার চেঁচানি।" সাতপাঁচ ভেবে বুড়ো মন বুঝালে।

—কিন্তু হায়, সবই বৃথা! যমের একটা হাত যে তার প্রায় মাথায়, আর যমের মাথার ছায়াটা ঐ দেওয়ালের উপর। বুড়ো কেমন যেন আঁৎকিয়ে উঠ্লো।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। লণ্ঠনটা একটু উস্কিয়ে দিলাম—সে যে কি রকম আস্তে আস্তে, তা সাধারণ মানুষে পারবে না ধারণায় আন্তে। আলোর ছটাটা একেবারে সেই শকুনি মার্কা চোখের উপর যে—

বুড়ো চোখ মেলেছে! সেটা যেন গ্রাস করার জন্যে ছুটে আস্ছে! বেশ ক'রে এক চোট দেখে নিলাম আশা মিটিয়ে! আর যায় কোথা? তেলে বেগুনে উঠলাম জ্বলে!

···আগে কি আমি বলি নাই? লোকে আমার যে মুদ্রাদোষটাকে আমার পাগলামি ব'লে ভুল করে—সেটা হচ্ছে আমার মনের,—কোন কিছু দেখার বা শোনার অক্ষমতা!

—বুড়োর বুকখানা তড়াক তড়াক ক'রে লাফাচ্ছে···তার কি আওয়াজ! আমি টু শব্দটি করলাম না—লণ্ঠনটা তেমনি ক'রে ধরে—কিন্তু এদিকে যে আমি রেগে কাঁই হয়ে গেলাম!

···একি! নিঝুম রাতে তার বুকখানার ধড়ফড়ানি সারা ঘরখানাকে যে কাঁপিয়ে দিচ্ছে! বাইরে রজনীদেবী বুড়োর শোকে যেন মুহ্যমান!- তার সময় বুঝি এলো ঘনিয়ে!

—ঠিক হয়েছে! বুড়োর ভয় চরমে উঠেছে!

আমি যে থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম—সে কথা আগেই বলেছি। রাত দুপুর—তার উপর আবার এমনটি চুপচাপ, আর এই একটা অদ্ভুত শব্দ—এতে, সত্যিই আমি থ বোনে গেলাম। এমন অবস্থা দাঁড়াল আমার—আর বুঝি, পারি না নিজেকে সামলাতে! মিনিট কতকের জন্যে মোটেই নড়চড়্ করলাম না—একেবারে আড়কাট্ হ'য়ে দিলাম দম বন্ধ করে!

আবার! এ যে ইঞ্জিনের 'হুস' 'হুস' শব্দ···তার বুকখানায় যেন একটা বিরাট শব্দে ছুটেছে!···শব্দের মাত্রা যে ক্রমেই চলেছে বেড়ে! মনে হল, বুকটা বুঝি বা ফাটে···!—পাশের বাড়ীর লোকেরা বোধহয় এবারে শব্দটা শুনে ফেলবে!

—স-জোরে মাত্র একবার উঠ্লো চীৎকার ক'রে। মরণ কান্না? তার হ'য়ে এসেছে—!

লণ্ঠনটা পুরোমাত্রায় দিলাম উস্কিয়ে। একছুটে গিয়ে হাজির হলাম তার খাটিয়ার ধারে—আর একটা হ্যাঁচকা টানে বুড়োকে মেঝের উপর দিলাম ফেলে!—আর করলাম

কি,—বিছানাটা দিলাম তার উপর চাপিয়ে। স্ফূর্ত্তির চোটে একগাল হেসে নিলাম।

—ন্যাটা চুকলো! কাজ ফুরুল। মতলবটা তো আপ্‌সেই হল হাসিল্! বুড়ো পটল তুলেছে···

মেজাজটা হোলো ঠাণ্ডা। তার দেহটাকে দেখ্‌লাম নেড়েচেড়ে! নাড়ীটা একবার টিপলাম···যাক্, সাবাড়!—জন্মের মতো একেবারে তার নজর হ'তে পেলাম রেহাই!

এত লঙ্কাকাণ্ডের পরেও কি লোকে আমায় নেশাখোর ভাবছে?—তার লাসটাকে গুম্ করার জন্যে আমি যে আর এক ফন্দি আঁটলাম—তা শুনে আর লোকে কিছুতেই আমাকে ও-বদ্‌নাম দেবে না।

—এদিকে রাত ফুরিয়ে আস্‌ছে,—কাক-কোকিল ডাকতে আরম্ভ করে আর কি! খুব হাত চালিয়ে কর্‌লাম কিস্তি মাৎ। ঘরের মেঝেটা ছিল পাটাতন করা—তাই তুল্‌লাম খান তিনেক তক্তা; তারপর তালনাহুু পাকানো লোকটাকে কোলে ক'রে শুইয়ে দিলাম আস্তে আস্তে।—তক্তাগুলো যেমনটী ছিল একেবারে তেমনটী ক'রে দিলাম চাপা। মেঝেতে না রইলো কোন চিহ্ন···ধোয়াধুয়ি করার বালাই নেই! অনেককাল ধরে যা মনে মনে ভেঁজে এসেছিলাম—তা নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল খতম্।···একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়্‌লাম!

ওপাড়ার গীর্জার ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে চারটে বেজে গেল।

—একি! বাইরের দুয়োরটায় ধাক্কা দিচ্ছে কে যে? ভয় কিসের? ঠাকুর দেবতার নাম আওড়াতে আওড়াতে গেলাম বেরিয়ে। লাল পাগ্‌ড়ি আর হাতে বড় বড় রুল নিয়ে ঢুকল—তিন শত্রু। বুঝ্‌লাম—এরা থানার লোক।

বুড়োর মরণকালের চীৎকারটা তার কোন পাড়াপড়শী শুনে থাক্‌বে—আর সে খারাপ কিছু সন্দেহ ক'রে থানায় একটা খবর দিয়ে থাকবে। পুলিসেরা যে বাড়ীটা খানা-তল্লাসী কর্‌বে—এটা ঠিক্!

তা'দিকে দেখে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম; আমার ভয় পাবার যে ছিল না কিছুই!

"এখানে মাঝ রাতে চেঁচাচ্ছিলো কে?"—

তাদের মধ্যে একজন কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞেস কর্‌লে।

উত্তর দিলাম—আমি।

—বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?

—এখন নেই···চলে গেছেন।

তারা খানিক ভাবলে। ঘরগুলো সব দেখালাম। বুড়োর আইরণচেষ্টটা তারা খুলে দেখলে—তার পয়সাকড়ি সব ঠিকঠাকই রয়েছে। একটিও ভূতে পর্য্যন্ত ছোঁয় নাই!

তারপর? তাদের জন্যে এনে দিলাম চেয়ার। মশায়-দিকে বল্‌লাম, 'একটু জিরিয়ে নাও তোমরা'। যেখানে আমার দুশমন্‌কে রেখেছিলাম চাপা দিয়ে—তারই উপর বস্‌লাম আমি। আস্পর্দ্ধা বলিহারী আমার!

পুলিসের লোকেরা আমার হাবভাব দেখে খুব খুসী হ'য়ে গেল। আমার সঙ্গে সাতপাঁচ কথা ব'লে চলল।···

—খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই কি রকম যেন হ'য়ে গেলুম! মুখটা গেল শুকিয়ে—জিব দিয়ে আর রা সরে না যে!—ডুবলাম! সব বুঝি বেফাঁস হয়! আরে···! ওরা গেলে যে বাঁচি!—মাথাটা যে ঘুর্‌তে আরম্ভ হলো, আর কান দুটো লাগল ভোঁ ভোঁ কর্‌তে! চোখের সামনে যে ত্রিভুবন ঘুরছে দেখ্‌ছি!

—কিন্তু ওধারে পুলিসের লোক যে আমাকে আর ছাড়ে না—তারা যে আমায় পেয়ে বসেছে! তাদের—এ গল্প—সে গল্প···। তাদের কথা যে অফুরন্ত!—

আমিও তাদের তালে তাল দিয়ে অনর্গল চলেছি ব'কে। কি যে আবোল তাবোল বলি—তার নেই মাথামুণ্ডু!

···আর যে নিশ্বাস নিতে পার্‌ছি না! হাঁপিয়ে উঠলাম—খাবি খাচ্ছি না কি···?—ওরা যে যায় না দেখছি!—কানের মধ্যে একটানা ঝিঝির ডাক শুনছি যে!—শেষ তার চেঁচানিটা একেবারে স্পষ্ট।···করি কি? এধার ওধার করতে লাগলাম।

'প্রভু বাঁচাও'—সব ডুবে গেল···আর রক্ষে নেই!···

পুলিসগুলো এতক্ষণ নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে!

যাক্—এরকমভাবে তিলে তিলে জ্'লে পুড়ে মরার চাইতে যে—জেলে হেজে পচা ভাল! বুঝলাম—হয় কাঁদতে হবে, তা না হ'ল বুকখানা যাবে ফেটে!

কাজেই করি কি?···

"—শুন্‌ছো তোমরা,···এখানেই বামাল আছে—আমিই তার জান্ নিয়েছি···এখন যা হয় করো···"

বিনোবার সঙ্গে ভ্রাম্যমান

মনকুমার সেন

(২)

স্বাগত অনুষ্ঠান শেষ। কিন্তু অভিনন্দন সঙ্গীতের রেশটুকু তখনও মিলাইয়া যায় নাই—ঘুরিয়া ফিরিয়া কানে বাজিতেছে—'মাতৃমন্দির পুণ্যসঙ্গম করো মহোজ্জ্বল আজ হে।' মন্দিরের পুরোহিত তখন অন্যদিকের বারান্দায় একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া আছেন: সম্মুখে শঙ্করাচার্য্যের গীতা ভাষ্য। প্রভাতী রৌদ্রের তাপে ক্রমে শীতের জড়তা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—বিনোবার সর্বাঙ্গে রৌদ্রের সোনালী কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৌনপাঠের মাঝে মাঝে তিনি দিকচক্রবালে পর্বতশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন: দৃষ্টিতে প্রসন্নতা পরিচিত বালক একজন অপরজনের সান্নিধ্যে আসিলে যেমনটি হয়!

'গান্ধী পথে আমি বাংলার ক্রান্তি ও হিমালয়ের শান্তি দুইই পাইলাম'—কথাটির মধ্যে আচার্য বিনোবা যেন তাঁহার দূর অতীত-জীবনকে উন্মোচিত করিলেন…

১৯১০ সাল। বিনোবা—বাপ মায়ের আদরের 'বিন্যা'—পিতার কর্মস্থল বরোদায় উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়িতেছেন। অসাধারণ প্রতিভা। গণিতে অসামান্য কুশলতা—মারাঠী ভাষায় এত অল্প বয়সেই সুপণ্ডিত: পরীক্ষক তাঁহার পরীক্ষার খাতা দেখিয়া অবাক হইয়া যান—একশ' নম্বরে নিরানব্বই দেন—কেননা পুরাপুরি একশ' দেন আর কী করিয়া! স্কুলের পড়া কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ হইল,—বিনোবা কলেজে ভর্তি হইলেন। ১৯১৪ সাল। বিনোবার গণিতের খ্যাতি অধ্যাপকমহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একদিন ক্লাশে একটা অঙ্ক লইয়া মুস্কিল বাধিল, ক্লাশের অধ্যাপক বিনোবাকে মুস্কিল-আসানের জন্য ডাকিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন বিনোবা, দ্বিধাহীনভাবে বলিলেন, আপনার পদ্ধতি এবং উত্তর দুইই ঠিক হইয়াছে—বইয়ের উত্তরই ভুল। ভুলটা কোথায় কিভাবে ঘটিতেছিল তাহাও বোর্ডে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু যত মেধাবীই হউন, শিক্ষিত জীবনে ক্রমেই হাঁপাইয়া উঠেন বিনোবা, গতানুগতিকতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য দিন দিন মন অধীর হইয়া পড়িতেছে। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইয়াছে—বিপ্লবীদলের আন্দোলন জাতির জীবনে এক নব-ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশের নাড়ী ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—বিনোবাও অশান্ত হইয়া উঠেন। পরীক্ষা আসন্ন।—বিনোবার জীবনেও শাহাই! বরোদা হইতে ট্রেণে চলিয়াছেন বোম্বাই সতীর্থ পরীক্ষার্থী-গণসহ। হৃদয়ে যেন সুরাসুরের তাণ্ডব চলিতেছে—উঠিয়াছে প্রচণ্ড ঝড়,—'আমি ভাঙিব পাষাণ কারা'—এই মহাসঙ্গীতের প্রচণ্ড আহ্বানের সঙ্গে বিনোবা সুরাট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। মার জন্য অশ্রু উদ্গত হইয়া উঠে—কিন্তু সামলাইয়া লন,—জানেন, মা তাঁহার একজন সাধারণ রমণী নহেন,—তাঁহার সন্তান সমগ্র বিশ্বের সুসন্তান হইয়া উঠুক ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

আসিলেন বারাণসী। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনপীঠ, পরমতম পুণ্য-তীর্থ কাশী। সেখানে একটি শিক্ষকতা জুটিল—সেই সঙ্গে চলিল গভীর অধ্যয়ন—আসন-প্রাণায়ামও। রাত্রির নীরবতায় গঙ্গাতীরে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন এই ব্রহ্মসন্ধানী তরুণ—ভগবান শঙ্করের জটাজুট হইতে, হিমশীর্ষ হইতে প্রবাহিতা গঙ্গার নির্মল বারিধারা বিমুগ্ধ নেত্রে দেখিতে থাকেন।

কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন, আবার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করিতেছেন—বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে: কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না বিনোবা। ঈশ্বর-সেবা জ্ঞানে দেশের ও দশের সেবা তিনি করিতে চান—খুনাখুনিতে মন উঠে না। এমনি অশান্ত মুহূর্তে যেন এক দৈব যোগাযোগে বিনোবার জীবনের ধ্রুবতারা আত্ম-প্রকাশ করিলেন!

কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হইতেছে: দেশের গণ্যমান্য ও রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সভায় একের পর এক বক্তৃতা চলিতেছে—ইংরাজীতে। নয়নবিমোহন বেশভূষা, আর আড়ম্বর লইয়া দরিদ্র দেশবাসীর জন্য অশ্রুপাতে এ্যারিষ্টোক্রেটগণ কৃপণতা করিতেছেন না। এই সময়ে একজন বক্তা একেবারে বেসুরা গাহিয়া বসিলেন—তাহাও আবার হিন্দীতে! সুদৃঢ়, স্পষ্টভাবে তিনি বলিলেন, প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হীরা-মণিমুক্তাখচিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া দুঃস্থের জন্য শোকপ্রকাশ নির্মম ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নহে। দেশীয় রাজন্যবৃন্দ যদি প্রকৃতই গরীবের দুঃখে দুঃখী—তবে তাঁহাদের বহুমূল্য আভরণ, সঞ্চিত বিপুল ধনৈশ্বর্য তাঁহারা দরিদ্র দেশবাসীর সেবায় বিলাইয়া দিন।" সভায় যেন বজ্রপাত হইল। বক্তা কিন্তু বলিয়া চলিলেন, "ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৭৫ জন কৃষক,—ইহাদের মুক্তি হইলে তবেই ভারতের মুক্তি।" সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতাও ব্যক্ত করিলেন স্পষ্টভাষায়—"আতঙ্ক সৃষ্টির দ্বারা কোন লাভ হইবে না। জয়লাভ করিতে হইলে ভারতকে নির্ভীকতার পথ, অভয়ের পথ বাছিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে কাহাকে ভয়?—রাজা মহারাজকে নয়, ভাইসরয়কে নয়, গুপ্ত পুলিশকে নয়, স্বয়ং পঞ্চম জর্জকেও নয়। সন্ত্রাসবাদীদের দেশ প্রেমের আমি সম্মান করি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—নরহত্যায় কোন্ বাহাদুরি?" এই বেসুরা গায়কটি হইলেন গান্ধী! গান্ধীজীর স্পষ্টোক্তি ধনগর্বীদের বুকে তীব্র কশাঘাতের মত বাজিল,—অপরপক্ষে সংবাদপত্রে উহার

বিবরণ পাঠ করিয়া জন মন স্বাধীনতার বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত হইয়া উঠিল। সেদিন কাশীর সর্বত্র সেই এক কথা, এক আলোচনা। বিনোবাও গান্ধীর ভাষণ পড়িলেন,—পড়িতে পড়িতে অনেক প্রশ্ন মনে ভীড় করিয়া আসিল। উত্তর চাই। লিখিলেন সরাসরি গান্ধীজীকে। জবাব আসিল। আরও প্রশ্ন—তাই আবার লিখিলেন, আবারও জবাব আসিল, সেই সঙ্গে একটি প্রস্তাবও—'দশ পনেরো দিনের জন্য যদি আশ্রমে আস তবে আশ্রমের কাজকর্ম হইতে তোমার প্রশ্নের সমধান পাইবে: কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার সঙ্গে কথাও বলিতে পারিব আমি।" প্রস্তাবটি পছন্দ হইল—১৯১৬ সালের ৭ই জুন বিনোবা গান্ধীর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আকৃষ্ট হইলেন—স্থির করিলেন আশ্রমেই থাকিয়া যাইবেন। 'গান্ধীপদেই বাংলার ক্লান্তি ও হিমালয়ের শান্তির সন্ধান পাইলেন এই পথিক।

* * *

শালতোড়ায় বিনোবাজী সাংবাদিকদের এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, যাহাতে ভূদান-দর্শকের স্বরূপ অনেকাংশে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি আইনের পটভূমিকায় এই রাজ্যে আপনার ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের সফলতার কতটুকু সম্ভাবনা আছে?' উত্তরে বিনোবা বলিলেন—সরকারের কাজ এবং আমাদের কাজ এই দুইয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। সরকার জমি লইবেন আইনের জোরে—আর আমরা লইব প্রেমের জোরে। জমিদার উত্তম জমি নিজ অধিকারে রাখিয়া বাকীটা সরকারকে দিবেন, আর ভূদানে লোকে জমি দেয় প্রেমের সঙ্গে, কাজেই ভাল জমি দেয়। প্রেমের দান বলিয়া হৃদয়ও এই দানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আইনের জোরে জমি আদায় করা হইলে তাহাতে হৃদয়ের যোগ থাকে না। বাংলা সরকারের হিসাব মতে, জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফলে তাঁহারা ভাগে চার লক্ষ একর জমি পাইতে পারেন, আর ভূদানযজ্ঞে আমাদের দাবী জমির এক-ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ প্রায় পঁত্রিশ লক্ষ একর। সরকারকে জমির জন্য ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে, ভূদানের জমিতে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন তো উঠেই না, উপরন্তু দাতার কাছ হইতে সামর্থমত অর্ঘাদি এবং আরও দানের দাবী আমরা করিব। উহার দ্বারা চাষীর চাষে সাহায্য করা হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রেমের যে দান তাহাতে শুধু ভূমিসমস্যারই সমাধান হয় না, জনশক্তিও সংগঠিত হয়। সরকার জমি পাইবেন কেবল সেই অল্প কিছু সংখ্যক লোকের কাছ হইতে—যাহাদের 'সিলিং-এর' (আইন নির্দিষ্ট একজনের অধিকারে রাখার সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির) অতিরিক্ত জমি আছে। আমরা প্রত্যেকের কাছ হইতে লইব,—যাহার বেশী আছে তাহার কাছ হইতে, যাহার কম আছে তাহার কাছ হইতেও। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাঁহাদের উপলব্ধি আনিতে হইবে যে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা অন্যায়। এই বিচারে আমরা গ্রামের সমগ্র জমি দান হিসাবে পাইতে পারি। এ পর্যন্ত এইরূপ ১০০টি সমগ্র গ্রাম পাওয়াও গিয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২টি। এইরূপে গ্রামের সমগ্র জমি আসিতে থাকিলে ভূদান আন্দোলনের ফলে ভূমির গ্রামীকরণ সম্ভব হইবে। সরকারের আজ এইরূপ চিন্তা নাই, তাঁহাদের কল্পনায়ও ইহা আসে না। গ্রাম হইতে ভূমিদানের ফলে গ্রামে পারস্পারিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি পায়—আইন মারফৎ তাহা হয় না। এইভাবে ভূদানযজ্ঞের দ্বারা আমরা গ্রামে আবার সামগ্রিক জীবন প্রবর্তন ও গ্রামরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিব। আইনে এই সমস্ত শক্তি রহিত,—সুতরাং আইনের কাজে আর ভূদানের কাজে কোন তুলনা হয় না।' প্রশ্নকর্তাসহ আর সকলেই উত্তর শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যান। মানবিকতার আবেদন এবং যুক্তির জোর দুইই উহাতে আছে। ভূমিকর্ষণ সম্পর্কেও একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিনোবা। প্রসঙ্গত জানাইলেন—"আমাদের ভূমি প্রাপ্তির পরিমাণ-সীমা পাঁচকোটি একর, তেত্রিশ লক্ষ একর ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে,—তন্মধ্যে ২৩ লক্ষ একর বিহার হইতে। প্রাপ্ত ভূমির কর্ষণও শুরু হইয়াছে। উপসংহারে আরও বলিলেন, "গতকাল বিহারের এক জেলার জমিদারগণ আমাকে কথা দিয়াছেন সমস্ত জমিদারের ষষ্ঠাংশ জমি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। জনমনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে প্রত্যেক জেলার লোকই নিজ নিজ জমির ষষ্ঠাংশ দানে প্রস্তুত থাকিবে। তখন আর জমিকর্ষণ আমাদের করিতে হইবে না, জনসাধারণ নিজেরাই উহা কর্ষণ করিয়া লইবে।"

* * * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য—জন-সমুদ্র বলিলে মোটেই বাড়াইয়া বলা হইবে না। বাংলো সংলগ্ন প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের একান্তে বেদী নির্মিত হইয়াছে—বিনোবাজী বসিবেন। আশে পাশে বসিবেন বাংলার সঙ্গীত-শিল্পীদল ও বিনোবাজীর সঙ্গীরা। নিম্নের সমতল ভূমিতেও সহস্র সহস্র লোক—তন্মধ্যে বহু আদিবাসী ভূমিহীন ক্ষেতমজুর 'বাবার ভাষণ শুনিবার আশায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। অরুণদেব পুরাপুরিই কিরণ বর্ষণ করিতেছেন,—কিন্তু পবনদেবও কিছু বসিয়া নাই,—রৌদ্রতাপ ও কনকনে শীতল হাওয়া মেলিয়া একটু অদ্ভুত আমেজের সৃষ্টি করিয়াছে। দূরে ও নাতি দূরে জোড়া জোড়া তালবৃক্ষ অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ঋজুদেহে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সত্যই-'সমাধি-লাভের যোগ্য স্থান।'

আড়াইটা বাজিতেই 'ভূদান-গাথা'র দ্বারা সভার ভূমিকা রচনা করা হইল: প্রার্থনা-সভার আরম্ভ ঠিক তিনটায়, বিনোবাজীর উপবেশনের সঙ্গে সঙ্গে। 'ভূদান-গাথা'র কথা, সুর এবং মুল্যতঃ পরিচালনাও কাজ নিরুপমা দেবীর। ইনি শিশির সেন মহাশয়ের সহধর্মিণী। সাহেবনগর (নদীয়া) কস্তুরবা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণ ইহারা দুইজন। 'ভূদান-গাথা' পাঁচালী ঢং-এ আচার্য বিনোবার জীবন পুরাণ। সুরে পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষায় আন্তরিক চেষ্টা প্রকট হইয়াছে। উহার ভূমিকায় সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডলের সম্পাদক প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন, 'ভূদান-গাথা' যে একটি হারানো আনন্দের সন্ধান দেবে তাতে সন্দেহ নেই। সত্যই তাই। যুগ যুগান্তের কতশত আঘাতের মুখেও পল্লী-বাংলার এই সুর সম্পদ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই নিঃসন্দেহে ইহা আশার কথা, আনন্দের সংবাদ। এই 'নূতন পুরাণের' আরম্ভটি চমৎকার:

কলিযুগে শোন ভাই নূতন পুরাণ
শ্রীবিনোবা ঘরে ঘরে চাহে ভূমিদান।
রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সবে জানি
ভূমিদান যজ্ঞ এবে বলিব বাখানি।
পাপাচারে ভরা কলি ডুবুডুবু যবে
মরে লোক স্বার্থ-ঘেরা জীবন আহবে।
শান্তি নাই স্বস্তি নাই, স্বার্থ নাহি ছাড়ে
যত পায় তত চায় ক্ষুধা আরো বাড়ে।
তারি মাঝে ঐ ঋষি বলি যায় চলি
ধন দাও, ভূমি দাও, স্বার্থ দাও বলি।
প্রাণ দাও আর দাও এ জীবন দান
সরল সাগরে যেন অমৃত সমান!
(বল রাম রাম রাম শ্রীরাম রাম রাম
শ্রীরাম রাম রাম)

অতঃপর—এই আজীবন ব্রহ্মচারী সত্যবাদী সদাচারী তপোধনের পরিচয়। দেশ স্বাধীন হইতে না হইতেই সূর্য অস্তমিত হইল, বাবুজীর তিরোধানে দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, দুঃখের অথৈ সাগরে মানুষ বিপন্ন। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মিথ্যা স্তোকে জনতাকে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে ক্রুর রাজনীতি-বিলাসীর দল, খুন জখমের তাণ্ডব গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দাবানলের মত ছড়াইতে থাকে। আসে পুলিশ, লাঠি-গোলা-গুলি চলে। দস্যুতার উচ্ছেদকল্পে ততোধিক দস্যুবৃত্তিঃ রাজায় রাজায় যুদ্ধ, মাঝখানে উলুখড়ের প্রাণান্ত। কিষাণ সেই কিষাণ, ভূমিহীন শ্রমিকই থাকিয়া যায়, অবস্থা তখন আরও দুঃসহ। করুণাঘন বিনোবার কর্ণে ইহাদের কাতর আহ্বান পৌছিল—ভারতের কঠিনতম সমস্যার এ ভীষণ রূপ তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ছুটিলেন তিনি তেলেঙ্গানায়। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই জাগে ভূদানযজ্ঞের ভাবনা তাঁহার মনে —

"সেই হতে তপোধন দ্বারে দ্বারে ফেরে—
ঘরে ঘরে পথে পথে কহে মানবেরে—
দেখ এই পঞ্চভূত এরে কেহ পরাভূত
করিতে পারে না,
এই বায়ু এই জল এই তেজ নভোতল
নাহি যায় কেনা।
তবে দেখ সব ছাড়ি ক্ষিতি লয়ে কড়াকড়ি
করা সে কি ঠিক?
অর্থ বলে হায় কেরে করিল যে মানবেরে
জমির মালিক"

ডাকিয়া বলেন তিনি—ভূমির মালিকানা ঘুচাইয়া ফেল। 'সব হি ভূমি গোপাল কী' সব ভূমি তো গোপালের—ভগবানের। তবে উহা লইয়া এত কাড়াকাড়ি মারামারি কেন?

"শ্রমের মালিক হবে ভূমির মালিক
শ্রমিকের হাতে ধনী জমি তুলে দিক্"

এক আঁজলা জল তুলিয়া লও, অমনি সেই শূন্যস্থানটুকু ভরিয়া দিতে ছুটিয়া আসে জলকণাগুলি, নিজেদের উচ্চতাকে অবলীলাক্রমে নামাইয়া দেয়। ভূদানেও এই প্রেমপূর্ণ ত্যাগেরই আহ্বানঃ ভূস্বামী, ধনবান্! —তোমাদের পুঁজিবাদ ভূমির উচ্চতাকে, ধনের উচ্চতাকে নামাইয়া আন, নিঃস্বের অভাব পূরণ করিয়া দাও, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দাও।

একেবারে নিঃশ্চুপ হইয়া গাথার শেষ শব্দটি পর্যন্ত শুনে দশ-সহস্রাধিক শ্রোতা।

তিনটা বাজিতেই বিনোবাজী সভা-বেদীতে আসিয়া বসিলেন। এবার দানপত্র ঘোষণার পালা। চারুবাবু একে একে দাতা ও দত্ত ভূমির পরিমাণ ঘোষণা করেন। ঘোষণান্তে শুরু হয় সায়ংকালীন উপাসনা।

বসন্তে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আবার বসন্ত এলো দিগঞ্চল পীত রৌদ্রে ভরি
নগর-অরণ্য জুড়ে জাগিয়াছে ফুলের উৎসব।
দক্ষিণ সমীরে ভাসে অকস্মাৎ মদির সৌরভ,
শীত-শীর্ণ মরু-মাঠ বিছাইল শ্যামল উত্তরী।

মুঞ্জরিত কুঞ্জমাঝে রহি রহি কলকণ্ঠী পিক,
মধু-মাধবের কোন্ মাঙ্গলিক করে উচ্চারণ!
স্তিমিত কুটজ-শাখে দেখা দিল দুরন্ত যৌবন,
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বুঝি মুখরিত হোল দশ দিক।

ভুবনে বসন্ত এলো, জীবনে বসন্ত কোথা হায়,
ফুটন্ত ফুলের মতো অফুরন্ত কোথা সে উল্লাস?
শীতার্ত যামিনী শুধু পাংশু-চোখে জাগায় সন্ত্রাস,
জীবনের যুদ্ধে মোরা পরাজিত; আছি মৃতপ্রায়।

কোথায় বসন্ত বলো, লাস্যময়ী কোথা বাসন্তিকা,
বসন্তে পড়িছে মনে পুনর্বার নিতে হবে টীকা।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

সাহিত্য-সম্মেলন ও মেয়েরা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ন্দিরে যখন দেবতার আরতি হয়, তখন আশে পাশে দিকে ওদিকে অনেক লোক ও দর্শক জড় হ'ন। কেউবা ধু আরতি দেখতেই আসেন, কেউবা নিজের মানসিক যদি চ্ছু থাকে তার উপচার নিয়ে আসেন, অনেকে বা পূজার আরতির সাজ বা যোগাড়ের কাজে নিযুক্ত হ'ন। াসল বা মূল আরতিটা করেন কিন্তু পুরোহিতই, বাকি কলে দর্শক।

বীণাপাণির মন্দিরের আরতির সময়ও আমরা মেয়েরা নেকদিন ধরে বিশেষ কোনো স্থান পাইনি। অনেক াগে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হ'ত, তখন এত শাখা-্রশাখায় সম্মেলনের অধিবেশন হ'ত না। পৃথক পৃথক াখার সভাপতিও দেখা যেত না। মেয়েদের জন্য তো য়ই। মেয়েরা দর্শিকা হিসেবে তখনো গিয়ে চিকের মাড়ালে বসতেন। কেউ কেউবা বাইরেও বসতেন। য়্নত তখনকার মেয়েদের ক্ষুব্ধভাবে মনেও হ'ত, এটা তাঁদের নিষিদ্ধ ক্ষেত্র।

এর পর ক্রমে নানা বিষয়ের নানা শাখার পৃথক পৃথক সভাপতির ব্যবস্থা হ'ল। তখনো কিন্তু মেয়েদের জন্য কোনো স্থান বা শাখা করা হয় নি।

সহসা দিল্লীর এক অধিবেশনে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সভানেতৃত্বে প্রথম মহিলা শাখার অধিবেশন হ'ল। ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয়ের বাড়ীতে সান্ধ্য-সম্মিলনে অধিবেশন মণ্ডপ হয়। সেবার স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন মূল সভাপতি। অন্যান্য বিভাগে আরো অনেকে ছিলেন। সকলের নাম মনে নেই। এই অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। এর পর প্রতি বৎসরই মেয়েদের শাখার অধিবেশন হয়েছে, প্রায় সর্ব্বত্র সভামণ্ডপেরই কোনো কোনো ঘরে। কিন্তু গত ১৩৬০ সালে জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে এই শাখাটীর সভানেত্রীও কেউ নির্ব্বাচিত হ'ন নি। এবং অধিবেশনও হয় নি। এর কারণ অবশ্য কি—তা কেউ জানেন না। কোনো প্রকাশ্য প্রশ্নও কেউ করেন নি। অনেকেই শুধু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। এই অধিবেশনেও আমি জয়পুরে গিয়েছিলাম। ধরে নেওয়া যেতে পারে—ওটায় কোনো বিশেষত্ব নেই, তাই বাদ দেওয়াতেও ক্ষতি-বৃদ্ধি বোধ হয়, হয় নি কারুর।

কিন্তু মনে মনে আমরা অনেকে ভেবেছিলাম অনেক কথাই, 'নারী এবং শূদ্রের' কোনো যজ্ঞে অধিকার আছে কিনা, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' হ'তে পারে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু আরও প্রশ্ন মনে উঠেছিল—নারী সাহিত্য বা পুরুষ সাহিত্য বলে পৃথক পৃথক কিছু সৃষ্টি হতে পারে কিনা? সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যের রস,সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ও তার আনন্দ উপলব্ধি নরনারী উভয়ের অন্তরেই সমান-ভাবে অনুভূত হয় কিনা। এবং তা যদি হয় তাহলে পৃথক শাখার দরকারই বা কি ছিল? আর তা' যদি নাই হয় তাহলেও তো পৃথক শাখার প্রয়োজন থাকে না। তখন স্বীকার করে নিতেই হয় মেয়েরা পুরুষেতর প্রাণী এক্ষেত্রে।

এই পণ্ডিতী বিষয়ে কিন্তু স্বভাবতঃই মেয়েদের আলোচনা করতে ভরসা থাকে না। হয়ত সেই জন্যই ভয়ে ভয়ে আমাদের মেয়েদের তরফ থেকে কোনো আলোচনাই কেউ কখনো করেন নি। শুধু কয়েক বছর ধরে—তাঁদের একজনকে নির্ব্বাচন করে আহ্বান করা হ'ত, একদিনের জন্য ঐ সম্মেলনের একটী শাখার আসন তিনি অলঙ্কৃত করে বসে যা' হোক কিছু বলতেন। 'সাহিত্য' বলতে যদি 'সঙ্গ' বুঝি তাহলে তা ঠিকই হ'ত, না হলে যদি বুঝি কিছু বিশিষ্ট, কিছু সাহিত্য সৃষ্টির কথা, তাহলে স্বীকার করতেই হয়,—ভূর্জ্জপত্র তালপাতার পুঁথির যুগ থেকে, শ্রুতি স্মৃতি থেকে—এই বিপুল বিশাল কাগজের যুগ অবধি এবং ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস থেকে আধুনিক কালের বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ কবি লেখক সাহিত্যিকদের পাশে দাঁড়াবার মতও মেয়েদের কারুকে দেখলাম না। আর তাঁদের

রচনাই বা কই? দু'চারটী বৈদিক পৌরাণিক মন্ত্রসূত্র রচয়িত্রী বাক, বিশ্বরাজ, অপালা নিয়ে তো ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এখনকার কথা ছেড়েই দিই।

সকৌতুক দুঃখে কমলাকান্তের কথা মনে পড়ে যায়—"স্ত্রীজাতির বিদ্যা কথনো পরিপূর্ণ দেখিলাম না। তাহা নারিকেলের মালার মত আধখানা।"

যাক্। তবু আমরা এই সম্মেলনে আসি—যোগ দিই বৎসরের পর বৎসর। গত বৎসর ঐ আসন খানি কারুর জন্য রাখা হয় নি। তাতে আমরা ক্ষুব্ধ বা আশ্চর্য্য হয়েও যোগ দিয়াছি। এবারে রাখা হয়েছে, তাতেও আমরা রবাহূতের মতই সরস্বতীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে নিজেদের মত যোগ্যাযোগ্য উপচার নিয়ে এসে দাঁড়ালাম।

নিজেদের অকৃতার্থতা মনে মনে মেনে নিয়েও যে এই আসা—এর কারণ খুঁজলে দেখতে পাই এবং ভয়ে ভয়ে বলতেও পারি, সাহিত্য আমাদেরও আনন্দলোকের সন্ধান দেয়,—কল্পলোকে নিয়ে যায়, অতীন্দ্রিয় জগতের কথা মনের কানে কানে গুঞ্জন করে চলে। মন্দিরে দেবতার ঐশ্বর্য্যময় উপচারে আরতির বর্ণ, গন্ধ, রূপ, শ্রীর সম্মুখে উপবিষ্ট আশা আনন্দ মোহ বেদনায় ব্যাকুল চিত্ত দর্পণের মতই—আমরাও দুরাশামুগ্ধ চিত্তে সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপের একপাশে এসে বসে থাকি।

কিন্তু তাতে আমাদের সত্য স্থান, সত্য সৃষ্টি কোথায়?

কেন না, আমরা অনেকেই জানি, আজও হয়ত আমাদের কেউ কেউ বাণীর আরতির জন্য চন্দন ঘষেছেন, তুলসী চয়ন করেছেন, পুষ্প সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আরতি আজো করতে কোনো মেয়েই পারেন নি। যেমন আরতি করতে পারলে মানুষ চরিতার্থ হয়, কৃতকৃতার্থ হয়। যে বিরাট ব্যক্তিত্ব বৃহৎ প্রতিভা পরম আনন্দ-গভীর বেদনাময় সুখ দুঃখের, প্রেমের, বিরহের, ত্যাগের, মোহের অপূর্ব্ব কল্পলোক সৃজন করে, সে কল্পলোক নারীর রচনায় আজো ফুটে ওঠে নি।

কেন নারী-রচিত সাহিত্য তেমন সাহিত্য হ'ল না, কাব্য তেমন কাব্য হ'ল না, কল্পনা বা সৃষ্টি মূর্ত্তিমতী হয় না। কেন নারীর বিশেষ সুখদুঃখ আশা মোহ আনন্দ বেদনা তাঁদের লেখনীতে রূপ ঐশ্বর্য্যময় হয়ে ফুটল না। তাঁর নিজের প্রাণের ভাষাতে আকার ধরলে না—যা পুরুষের রচনায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তা আমাদের মেয়েদের লেখায় আজো ফোটে নি কেন, তা' কারুর জানা নেই।

নারী-প্রকৃতির অথবা মানব-প্রকৃতির যে রহস্য নিয়ে পুরুষ লেখকের সৃষ্টির অন্ত নেই, এই নারী দেবী—এই নারী প্রিয়া—এই নারী মাতা—ঐ নারী নরকস্য দ্বার এবং পুরুষের কামনা বাসনা ত্যাগতপৈশ্বর্য্যময় রূপ সৃষ্টির যে কল্পনার স্রোত বয়ে চলেছে, চিরকালের সেই মহাসৃষ্টির মহাসাগরের স্রোতে নারীর সৃষ্টি আজো নেই কেন কে বলবে?

তবুও আমরা আসি, সমবেত হই সম্মেলন মণ্ডপে। ওঁদেরই অনুপ্রেরণাময় আভাস ইঙ্গিতময় কল্পনায় অভিভূত নিজেদের রচনা 'জলছবি সাহিত্য' নিয়ে আসি, ওঁদেরই ধরণে সভাসমিতিতে পাঠ করি। আর মনে ভাবি, এই সাহিত্য হ'ল, এই সত্য হ'ল, সাধনাও হ'ল, সৃষ্টিও হ'ল। কিন্তু সত্যের প্রদীপ্ত রূপের, কঠোর রূপের কল্যাণের সমগ্র শক্তির, সুন্দরের অপূর্ব্ব মহিমাময় ঐশ্বর্য্য আমাদের লেখায় কই?

প্রত্যেকবারেই সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বানে যোগ দিতে এসে আমরা যা' নিয়ে আসি তাতে যেন মনে সঙ্কোচের সীমা থাকে না। যে মায়া-কুঞ্জিকা দিয়ে নানা কল্পলোকের দুয়ার ওঁরা খোলেন, তার একটি চাবিও কি আমাদের হাতে নেই?

মনে হয়, হয়ত বিধাতা এই বিরাট বিপুল অপরিমেয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েদের দর্শক করেই পাঠিয়েছেন। জননীর অন্তরে যে অমৃতরস আছে, প্রিয়ার হৃদয়ে যে মধুর মদির লীলা সমুদ্র আছে, বহুর, একের, বিশ্বের অন্তর থেকে মন্থন করে দেখবার ক্ষমতা তাঁর নেই?

হয়ত মন্থন করা হৃদয় সমুদ্রের অমৃতের ঐশ্বর্য্যের সন্ধানও তাঁরা পায় নি, বিষপানকারী নীলকণ্ঠের অপরূপ ত্যাগের ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তাও তাঁদের অন্তরে পৌছয়নি।

সংশয় থেকে যায়—তাহলে এই সাহিত্য সম্মেলনের মহিলা শাখা কি সামাজিক মিলনক্ষেত্ররূপেই রয়ে যাবে প্রথম দিনটির মত?

—

ভাঙ্গা নয় গড়া—

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

স্বতই প্রশ্ন জাগে মনে—মেয়েদের কাজ কী? ভাঙ্গা? না? গড়া। যুগ এগিয়ে চলেছে, - নারীসমাজের দিকে তাকালে বেশ উপলব্ধি করা যায় নারীসমাজেরও অগ্রগতি ঘটেছে।

হ্যাঁ অগ্রগতি ঘট্ছে—শিক্ষা, দীক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে বিশেষ অগ্রগতি ঘট্ছে বলে মনে হয় না।

মনের দিক থেকে অর্থাৎ মনের উদারতা ও প্রসারতার দিক থেকে নারীসমাজ এখনও অগ্রসর হতে পারছে না। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা নারীসমাজের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। তাই অনেক সংসারে দেখতে পাওয়া যায়—নারী যেন ভাঙ্গনের প্রতিমূর্তি, তার কাজ যে ভাঙ্গা নয়—তার কাজ গড়ে তোলা—সে কথা তারা ভুলে যায়।

শাশুড়ী ও বধূর—এবং ভাজ ও ননদের বিরোধ সংসারে বহুদিন থেকে চলে আসছে। তাই ননদকে বলা হয় বিষম কাঁটা।

এর মূল লক্ষ্য করলে দেখা যায়—মানুষের প্রতি প্রেমের অভাব, পরশ্রীকাতরতা,—কর্তৃত্ব-ত্যাগের আশঙ্কা। তাই পরের মেয়ে যখন ঘরে আসে তখন তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে না নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাকে নানাভাবে নির্য্যাতীত করা হয়।

এতদিন বধূরা সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে এসেছে,—শুধু তাই নয়, পরবর্তী জীবনে তাদের তারই জের টেনে চল্তে হয়েছে—অনেক বিষফল তারা মাথা পেতে নিয়েছে।

বর্তমানকালে তারই প্রতিক্রিয়া ঘরে ঘরে দেখা যাচ্ছে। বধূরা সংসারে এসে পৃথক সংসার রচনায় মনোনিবেশ করছে। চল্তি কথায় যাকে বলে "পৃথক হওয়া"—বধূরা স্বামী নিয়ে সেই পৃথক হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথক হওয়ার সোজা অর্থ দাঁড়ায়—সংসারকে ভেঙ্গে ফেলা। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, এই—সংসার ভেঙ্গে নূতন সংসার গড়ার প্রতিক্রিয়া শুভ বা সার্থক হয় না।

কিছুদিন হোল একটি পরিবারের মর্মান্তিক ঘটনা জানা গেল—ছেলে ও বধূ পৃথক সংসার রচনা করবার কিছুদিন পর ছেলে রেললাইনে চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে আত্মবলিদান করলো।

মানুষ জীবনে কত বেশী বীতশ্রদ্ধ হ'লে তবে এই ভাবে জীবন বিসর্জন দিতে পারে!

শোনা যায়—সেই তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে শাশুড়ী ও বধূর দ্বন্দ্ব ও বিরোধ—তার পরেই অনর্থের সৃষ্টি শুধু নয়—জীবনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঘট্লো।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়—ছেলে যখন পৃথক সংসার রচনা করেন,বাপের মনে অত্যন্ত বেশীকরে প্রতিক্রিয়া করে—এর জন্যে বাপের শরীর মন পর্য্যন্ত ভেঙ্গে যায়।

এইটেই লক্ষ্য করবার বিষয় মেয়েরাই এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মূলসূত্র বলে তাঁদের মনে এই সংসারের বিচ্ছেদ বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। পুরুষের জীবনেই এর বিষফল ঘটল।

তবে মেয়েদের জানা উচিত—মেয়েদের কাজ ভাঙ্গা নয়—গড়া। তাই শাশুড়ী ও বধূ উভয়েরই আপোষমূলক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। বিদ্বেষ নয়—অসহিষ্ণুতা নয়—প্রেম মমতা মৈত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। নূতন বধূ ঘরে এলে তাকে যথার্থ কন্যা স্নেহে গ্রহণ করতে হবে। নিজের ছেলেদের মধ্যে প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এক প্রকৃতির হয় না। একটী দুটী বেশ শান্ত ও বাধ্য—তৃতীয়টী হোল একটু ডানপিটে ধরণের। অনেকে আবার হয় খামখেয়ালী প্রকৃতির। ছেলেদের এই ধরণের স্বভাবগুলো মায়েরা সচরাচর কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করেন। তেমনি বধূ যদি আসে একটু দুরন্ত প্রকৃতির অথবা ঠিক বাধ্য নয়—তা স্নেহ ও কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তার মনকে জয় করতে হবে। যুগ বদলে যাচ্ছে—মেয়েরা লেখাপড়া ছাড়া আরও অনেক কিছু শিখছে। যেমন গান বাজনা ছবি আঁকা ইত্যাদি। এই সব মেয়েদের বউ করে আন্লে পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে—তারা যাতে এই গানবাজনার চর্চা রাখতে পারে—সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যে সব মেয়েরা সত্যি-কারের গানবাজনা ভালোবাসে—আমি তাদের কথা বলছিলুম। যে সব মেয়েদের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিক প্রতিভা থাকে—তার অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। কত মেয়ের কথা জানি—কত প্রতিভা তাদের মধ্যে থাকে—

অনুশীলনের ব্যর্থতায় তা নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়াও বর্তমানে সুরু হয়েছে—একটী বধূকে জানি—বেশ ভালো গল্প লিখতে পারে,—তারা স্বামী ও স্ত্রী সংসারে তার অনুশীলনের সুযোগ না পেয়ে পৃথক সংসার করবার কল্পনা জল্পনা করছে। অথচ তাদের সংসারের অবস্থা ভালো,—শুধু রয়েছে রক্ষণশীলতা; বধূরা সংসার জীবন ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। যুগ বদ্‌লে যাচ্ছে—রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করতে হবে—তবে প্রগতিশীলতার নাম নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা সে স্থান অধিকার না করে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বৈকি—

তাই বল্‌ছিলুম—বধূ আনার প্রথমেই নিজের পরিবেশের মতই আনা ভালো। গানবাজনা-জানা মেয়ে এনে তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে না রাখাই ভালো। রক্ষণশীলতায় যদি তা সম্ভব না হয়—তবে একটী মেয়ের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানা উচিত নয়।

সকল ক্ষেত্রে যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়—তবে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ উপস্থিত হতে পারে না।

এই কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদন মেয়েদের উপরই নির্ভর করছে। কারণ মেয়েদের উপরই সংসারের দায়িত্ব থাকে।

তাই মেয়েদের মনে রাখা দরকার—তাঁদের কাজ ভাঙ্গা নয়—গড়া। শাশুড়ী ও বধূ উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক।

তবে কিছুসংখ্যক মেয়েদের দেখা যায়—প্রথম থেকেই তাদের পরিকল্পনা থাকে পৃথক সংসার রচনা করবার। শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ নিয়ে এঁরা সংসার বরদাস্ত করতে পারেন না। আমার মনে হয় এই মনোভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল। আমার মনে হয় ইংরেজ স্বভাবের দ্বারা মন্দ দিকটা অনুকরণ করেন—তারা আমাদের "ঐক্যের" আদর্শকে খণ্ডন করেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সংসারে এ আত্ম-কেন্দ্রিকতা আদৌ খাপ খায় না। শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসুর-দেবর পরিবেষ্টিত সংসারই সুখের সংসার হয়। তবে বিরোধ দ্বন্দ্ব যা আসবে মেয়েদেরই তা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমাধান করতে হবে। এর জন্য মানসিক গঠনেই প্রেম ও ঐক্যের প্রয়োজন। সকলকে—সকলে যদি ভালোবাসতে পারে—তবে সব সমস্যার সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে।

অনেক সংসারে দেখা যায় অর্থনৈতিক কারণে বিরোধ উপস্থিত হয়। অর্থের অনটন অশান্তির সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে শাশুড়ী ও বধূ উভয়কেই কিছু ত্যাগ করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। যখন একটু দুধের ভাগ বা মাছের অংশ নিয়ে বিরোধ হয়—তখন তা ত্যাগ ও প্রেম দিয়েই সমাধান করতে হবে। একপো দুধ কে খাবে? একদিন শ্বশুরকে দেওয়া হোক্—একদিন স্বামীকে দেওয়া হোক্। দ্বন্দ্ব বিরোধের সহজ সমাধান তাহলেই হতে পারবে।

আমি দেখেছি পরশ্রীকাতরতা অথবা আত্মদৈন্য থেকে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তা মহা অনর্থ ঘটায় সংসারে। বড়বধূ হয় তো সামান্য শিক্ষিতা, ছোটবধূ এলেন ডিগ্রী নিয়ে—ব্যস্—বড়বধূর আত্মদীনতা কাজ করতে সুরু করলো—আস্তে আস্তে সংসারে ভাঙ্গন ধরলো।

শেষ পর্যন্ত দুটী সংসার ভাগ হয়ে গেল—অনেক ক্ষেত্রে স্বামীরা বলেন, "বউরা আলাদা হোক্—হাঁড়ি পৃথক হোক্—আমরা ভাইরা এক। দুই হাঁড়ি থেকে ভাত আসে—দুই ভাই কিন্তু এক জায়গাতেই বসে খান্। যে পৈত্রিক জায়গাগুলি ভাগ করা যায় না—সেখানেই তারা মিলিত হন। তাই দেখা যাচ্ছে—পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংসার ভাঙ্গার কাজে আগ্রহ বেশী—কিন্তু মেয়েদের কাজ—ভাঙ্গা নয়—গড়া।

ভালোবাসার আদর্শে মেয়েরা যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পারেন সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। মানুষকে দূরে ফেলে দিতে ভালো লাগবে না, কাছে টান্‌তেই অনুরাগ আসবে।

বাংলার নারী—প্রাচীন ও সাম্প্রতিক

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

সন্তান সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ, পারিবারিক শৃঙ্খলা শ্রী ও শ্রী, আনন্দ ও কল্যাণ সব কিছুই গৃহলক্ষ্মীর ওপর নির্ভরশীল। উপযুক্ত কন্যা, উপযুক্ত পত্নী, আর উপযুক্ত মাতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্থান বিশেষে দেশকালপাত্র ভেদে হয়ে ওঠে সংখ্যা বিরল। পাশ্চাত্য নারী-জীবনের সাম্প্রতিক আদর্শ ও গতি প্রকৃতির পরিণতি কোন্ পথে—তা কে জানে? সংযম ও শালীনতার পরিবর্ত্তে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ভয়াবহ

দুরারোগ্য পক্ষাঘাত সমাজ-অঙ্গে সৃষ্টি করছে, তা যেন আমাদের মধ্যে সংক্রামক না হয়ে ওঠে—এর জন্যে নারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ যা আমাদের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার অনুকূল তাই রাষ্ট্র কর্ণধারদের পক্ষে বিধি ব্যবস্থা দ্বারা প্রচলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুদীর্ঘ বছর ধরে নারী ও পুরুষ ইংরাজ আমলে একই ভাবে শিক্ষা পেয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে অবশ্য মেয়েদের জন্যে কিছু অদল বদল করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যদি আজকের দিনের বাঙালী শিক্ষিত সমাজ পূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলে, তাহলে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত দেশের বহু পরিবারেই উঠ্‌বে অশান্তির রোল আর হাহাকার—এদিকে সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বাংলার নারী পরিবারের মধ্যমণি, কিন্তু দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ে যদি তাকে পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়, তা হোলে সংসারধর্ম্ম বলে কিছু থাকে না। অবশ্য প্রাচীন বাংলার পরিবারেও সুখশান্তির প্রাত্যহিক আবর্ত্তনের ধারা বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাবে প্রবাহিত হয়েছে, এরূপ মন্তব্য করাও ভ্রমাত্মক। বাঙালা সমাজে নারী চিরদিনই চোখের জল ফেলে এসেছে, তাই বাঙালীর জাতীয় জীবনের অপমৃত্যু ঘটেছে। যাহোক্, একথাও সত্য আজকের দিনের প্রগতিভাবাপন্ন বাঙালীর মেয়ের মধ্যে জীবনের স্পন্দন হচ্ছে, ধ্বনিত হচ্ছে তার অস্তিত্ব, অভিব্যক্ত হচ্ছে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ—শত বাধাবিপত্তির মধ্যে আর অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয়ের ভেতর; কিন্তু প্রাচীন আমলে তার মুখে কোনদিন ভালো করে হাসি ফুটে ওঠে নি। বাল্য-বিবাহের কুসংস্কারের ফলে সে যেদিন বালবিধবা হোলো, সেদিন থেকে সুরু হোলো তার বিরলে বসে অশ্রুপাতের পালা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—পদে পদে বাধা নিষেধ ডোরে তাকে স্থবিরতার মধ্যে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলো বাঙালা সমাজ—এই তো ছিল সেদিনের অবস্থা! কত অসহায় মেয়েকেই না পেটের দায়ে পরিচারিকা-বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে—এই সব অসহায়া পরিচারিকা রাঁধুনী শ্রেণীর নারীরও সন্তান হয়েছে একদিন দেশবরেণ্য—এই সব অনাথাদেরও সন্তান হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের মত জগৎপূজ্য—থাক্, সে কথা। এখন বাংলার অতীত নারী সমাজের চিত্রটাই এখানে তুলে ধরা যাক্—দশম একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রভাবে বাংলার সমাজ জীবন যে ভাবে গড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় রেখে গেছেন চর্য্যাপদরচয়িতা সহজিয়া সম্প্রদায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী থেকে আমরা যেমন মধ্যযুগের বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস পাই, ঠিক তেমনি পাই প্রাচীন বাংলার বাঙ্গালীর দৈনন্দিন পারিবারিকতার আলেখ্য চর্য্যাপদের আনুকূল্যে। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের বোধন ঘট হচ্ছে এই চর্য্যাপদ। সে সময়ে ব্যভিচার ও যৌন-লিপ্সা নারী পুরুষের অস্থিতে মজ্জায় প্রবেশ করেছিল। তদানীন্তন সমাজ জীবনে মেয়েদের চরিত্র, আচার ব্যবহার ও আচরণ যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা'তে গর্ব্বতো দূরের কথা, লজ্জায় মুখ হেঁট করতে হয়—বাঙালীর বর্ণসঙ্করতাও বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণএর জন্যেই অনেকটা দায়ী। সে সময়ে ঘরের বউ শ্বশুর শাশুড়ী নিয়ে ঘর করতো, এঁরাই ছিলেন সংসারের প্রধান ও প্রধানা আর ভাগ্যনিয়ন্তা। দিনের বেলা বউ গুরুজনদের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাক্‌তো আর কাঁদতো—অবশ্য এরূপ ক্রন্দন ধ্বনি আজও বাংলার বহু বনেদী অন্তঃপুর থেকে ওঠে,—আজও অনেক পরিবারের মধ্যে রীতি আছে অধিক রাত্রে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতাপ বাংলার সমাজ জীবনে চর্য্যাপদের যুগ থেকে সুরু করে একাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে এক টানাই চলে এসেছে। দিনের বেলা সেযুগের বউ ভয়ে কাঁদতো বটে, কিন্তু রাত্রিতে ইন্দ্রিয় তাড়না চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতো কামাতুরা হয়ে—চর্য্যাপদকার বল্‌ছেন—'দিবসই' বহুড়ী কারই ডরে ভা অ। রতি ভইলে কামরু জা এ। বধূ গুরুজন শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির গঞ্জনা বা কলঙ্কের ভয় না করে তার মনের মত প্রেমিকের সঙ্গে গোপন স্থানে মিল্‌বার জন্যে অভিসারে যেতো। প্রাচীনপন্থীরা 'শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌বেন কি করে?'—এইটাই জিজ্ঞাস্য। আজকের দিনে আমাদের সমাজে সুরাপান নিন্দনীয়, সে যুগে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সুরাপান চল্‌তো। সমাজ তখন ছিল তান্ত্রিক ধর্ম্মী—কাপালিকই ছিল উচ্চসাধকরূপে সমাদৃত। তন্ত্রের আধ্যাত্মিক পরকীয়া তত্ত্বটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এনে বিকৃতরূপ দেওয়া হোলো, ফলে সমাজে পরস্ত্রী বা পরপুরুষের সঙ্গে বিহারও ব্যভিচার করাটাই হয়ে উঠলো ধর্ম্মসাধনার প্রতিপাদ্য বিষয়। অবাধ গতিতে চল্‌তে লাগ্‌লো ভৈরবী চক্র—এচক্রে উচ্চ নীচ বংশের মেয়েরাও যোগ দিতেন। চর্য্যাপদে পাওয়া যায়, উপপতি শবর নৈরাত্মার সঙ্গে প্রেমে নৈশযাপনা করছে। সেযুগে পরকীয়া প্রেমের বিশেষ প্রচলন থাকায় নৈতিক আদর্শ বলে কিছু সমাজে ছিল না। সেযুগে মেয়েদের প্রসাধন পরিপাট্য ছিল খুব বেশী। সবার অবস্থাই যে সে সময়ে ভালো ছিল, তা নয়। দরিদ্রের সংখ্যা ছিল খুব বেশী, তারা প্রায়ই উপবাস করতো আর থাক্‌তো টিলার ওপর ঘর বেঁধে। শৈব ধর্ম্ম অর্দ্ধ মৃত হওয়ায় পরবর্ত্তী সময়ে শাক্ত ধর্ম্মের আধিপত্য দেখা গেল খুব বেশী। শিবকে শব করে সুরু হোলো শিবানীর নৃত্য—এঁর সঙ্গে আমরা পেলাম নানা দেবীকে—যেমন চণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি। আর এই সব দেবীর দর্শন ও কৃপালাভ সে সময়ে খুব সহজ হয়ে উঠেছিল। এঁদের নিয়ে গড়ে উঠলো বিরাট সাহিত্য—মঙ্গল কাব্য। ব্যভিচারী যৌনাসক্ত বৌদ্ধ আচার্য্যগণের নানারূপ অলৌকিক বিভূতি ও সাধন-সিদ্ধির কথা ছড়িয়ে পড়্‌লো, আর এঁদের সাধনার কাহিনী নিয়ে রচিত হোলো কত না কাব্য কথা! মেয়েদের ব্রতকথায় আর বারো মাসের তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠানে স্থান পেয়েছেন মঙ্গলচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী নাটাইচণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী প্রভৃতি। কুমারীব্রত, সধবাব্রত প্রভৃতির পশ্চাতে আছে বাংলার মেয়েদের স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য আর তান্ত্রিকতার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন। এদেশে বৈদিক প্রভাব কোন দিনই দানা বাঁধতে পারেনি আর মেয়েরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন যুগে নিজেদের ব্যভিচার-পরায়ণতাকে রেখেছিলেন অবগুণ্ঠিত করে, এর নিদর্শন সেকালের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মেয়েরা বীণা বাজাতেন

তা ছাড়া শিল্পকলায়ও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মেয়েরা নৈতিক আদর্শকে শিথিল করে এইসব কলা-বিদ্যার সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ পেতেন —সহজযানী ও কাপালিক সাধন-সঙ্গিনী হোতেন নিম্ন ও উচ্চবর্ণের নারী। নীচ কুল থেকে কন্যা গ্রহণ কর্‌লেও খুব আপত্তি উঠ্‌তো না, এরূপ ইঙ্গিতও চর্য্যাপদে আছে। দেশে চোর ডাকাতের ভয়, নারীহরণ, নরহত্যা প্রভৃতি সবই ছিল, সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ ছিল না। আর অভাব অনটনও ছিল। আমরা যদি অতীত বাঙালী নারীসমাজ নিয়ে বড়াই কর্‌তে যাই, তাহোলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে কি? পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর আবহাওয়াও ক্রমে দূষিত হয়ে পড়েছিল, তারপর বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা যখন আমাদের সমাজে জগদ্দলের পাথরের মত চেপে বস্‌লো, তখন থেকে উচ্চবর্ণের সমাজের নারীগণের অবস্থা নানাভাবেই শোচনীয় হয়ে উঠলো। মেয়েদের ওপর শাসনাধিক্য দেখিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের ওপর বাঙালী সমাজ এমন কলঙ্ক কালিমা লেপন কর্‌লেন যার ফলে তার শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে নানা জাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে। 'স্ত্রীণাম্ নাস্তি স্বতন্ত্রতা' এই প্রবচনটীকে আঁকড়ে ধরে তদানীন্তন স্মার্ত্তকাররা মেয়েদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন যুগে সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বিশিষ্ট স্থান ছিল বলেই গার্গী, খনা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, শাশ্বতী প্রভৃতির মত বিদুষীর আবির্ভাব সম্ভব হ'য়েছিল, আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী প্রভৃতির মত আদর্শ রমণীর পুণ্যকর স্পর্শে সোনার ভারত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলার প্রাচীনতম সমাজজীবন থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, মেয়েদের স্থান অবহেলার ধূলি সমাচ্ছন্ন স্তরে থেকে এসেছে, বাল্য-বিবাহ প্রচলনের দ্বারা কৈশোরেই স্বামীর সংসারে মেয়েদের স্থান নিতে হয়েছে,—আর সেই সঙ্কীর্ণ অত্যাচারজর্জ্জরিত পরিবেশের মধ্যে দুঃখে বেদনায় মেয়েরা জীবন কাটিয়েছে। সে সময় সতীদাহ প্রচলিত থাকায় মেয়েদের ভাগ্যে বিড়ম্বনা ভোগও কম হয় নি,—কাজেই তারা যদি বিপথে গিয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী তদানীন্তন বাঙ্গালীর সমাজ সংস্কার। নারীর শিক্ষার ধারাও ছিল খুব সঙ্কীর্ণ, এজন্যে নারী সমাজের মধ্যে এসেছে এমন সব কুসংস্কার—যার মূলোচ্ছেদ করা আজও পর্য্যন্ত সম্ভব হোলো না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজ ও জীবন দর্শনে নানা রূপান্তর হচ্ছে—এর সঙ্গে নারীর সামাজিক পরিস্থিতির মাঝেও এসেছে বহুধা পরিবর্ত্তন। উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পেয়ে আজকের দিনের বাঙালী মেয়েরা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির মেয়েদের মত সমান তালে পা ফেলে চলেছে, এটা একদিকে যেমন আনন্দের বিষয়, অন্যদিকে তেমনই তাদের কাছ থেকে সমগ্র দেশ ও জাতি আশা করতে পারে ভারতের বৈদিক সভ্যতার মহান আদর্শ ও বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মেয়েদের জীবন ধারাকে অনুকরণ করে তারা যদি ভ্রান্ত পথে যায়, তাহলে সাম্প্রতিক সভ্যতা, যাকে কৃত্রিম আবরণের ভেতর গুপ্ত রেখেছে, তা আর কোন দিন মুক্ত হবে না। আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষিতা মেয়েরা যেন দেশের চিন্তাকে ফিরিয়ে আনে, দেশের মৃত শিক্ষাকে প্রাণ দিয়ে সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা করে অতীত বৈদিক ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, এ আশা আমরা করতে পারি। যখন মানুষের মধ্যে নৈতিক অবনতি আসে তখনই নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনই সমাজের কাম্য হয়ে ওঠে। তখন প্রেম ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন বাঙালী সমাজে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল বলেই মেয়েরা নানাভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্গতি পেয়ে এসেছে। নারী-প্রেমের মহত্ত্ব ও বিশুদ্ধতা যেখানে অক্ষুণ্ণ, সেখানেই মহাজাতির গঠন সম্ভবপর হয়। সেখানেই নেমে আসে স্বর্গরাজ্য। দ্রৌপদী যখন কুরুদের দাসী ছিলেন, তখন ও তাঁর ওপর পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। নারীর প্রতি মানুষের মত ব্যবহার কর্‌লে, নারীরও মনুষ্যোচিত সাহস হয়, নারী ও আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। প্রাচীন ভারতে বসন্ত-সেনা একজন নর্ত্তকী মাত্র কিন্তু তার মনোভাব, তার কথাবার্ত্তা মহত্ত্বব্যঞ্জক—চারুদত্তের সঙ্গে তার বাক্যালাপ থেকে প্রমাণিত হয় সে কতখানি উচ্চস্তরের নারী। এ থেকে আরও বুঝা যায়, সেযুগে ভারত শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কত সুমহান ছিল, নতুবা এরূপ সম্ভব হোতো না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্ত্তিটা সেইরকম। সে কেবলি যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল...... তখন তাহার স্ত্রী-সমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল, তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মত লোহার ছাঁচে ঢালাই করা যায় না— মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—আমরা সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষিতা নারীর কাছ থেকে সেই সমাজের আদর্শ পেতে চাই। আজ আধুনিক নারীসমাজের কাছ থেকে বঙ্গজননী অনেক আশাই করতে পারেন, কেননা আজকের এই সমাজের চিত্তকে বাধা নিষেধ ভীতিসমাচ্ছন্ন লৌহ প্রাচীর ঘিরে বন্দীশালায় পরিণত করা হয় নি। এদিক থেকে রাষ্ট্রবিধি ব্যবস্থাপকগণ ধন্যবাদার্হ। প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব সংস্কারের ঋতু পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে আধুনিক প্রগতি-ভাবাপন্ন মেয়েরা বিশ্বের নারী সমাজে মহীয়সী হয়ে উঠুক এটাই আমরা অন্তরের কামনা করি। চিত্ত সচেতন হোলে চেতনার স্রোত প্রবাহিত হবে, আর ধীরে ধীরে বহুকালের জড় সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা ক্ষয় করে আপনাকে প্রশস্ত করে তুল্‌বে।

হাতের কাজ

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

এই প্যাটার্ণ দুইটি ব্লাউজের হাতায় অথবা টেবলের ঢাকায় রঙিন সুতা দিয়ে এমব্রয়ডারী করলে দেখতে সুন্দর হবে।

১নং প্যাটার্ণটিতে ইচ্ছে করলে সুধু ডাল সেলাই ব্যবহার করতে পারেন।

২নং প্যাটার্ণটিতে ডাল ও বোতাম ঘর সেলাই দেবেন। ইচ্ছামত এই প্যাটার্ণ দুটিতে ভরাট সেলাই দরকার মত ব্যবহার করতে পারেন।
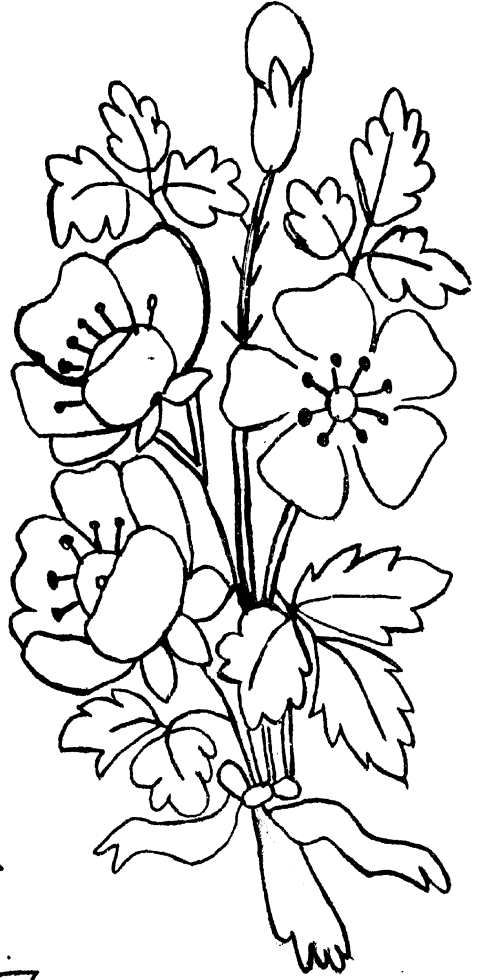
১নং প্যাটার্ণ
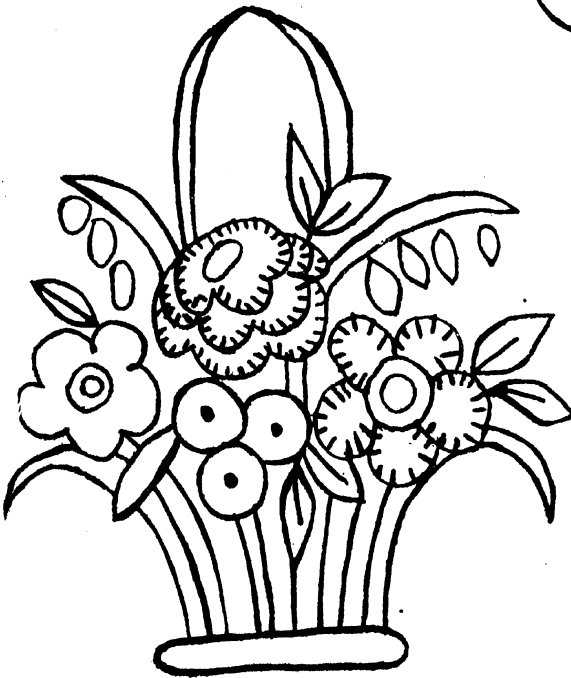
২নং প্যাটার্ণ
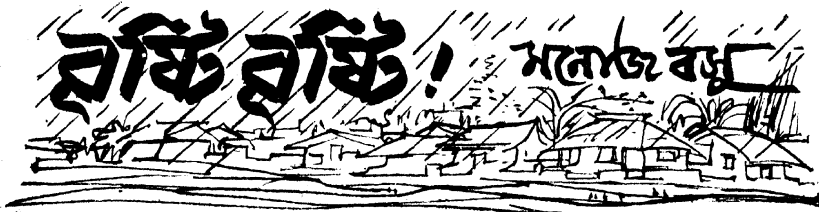
—এক—

বৃষ্টি, বৃষ্টি! মেঘ উঠেছিল অপরাহ্ণ বেলা। বৈশাখ মাস পার হয়ে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি—এতদিনে কালবৈশাখী না[illegible] বুঝি! কালও মেঘ করেছিল, একটু বাতাস উঠে [illegible] উড়িয়ে দিল। আজকে পুরোদস্তুর ঝড়। ঝড় থেমে গেল, তবু আকাশ থমথমে হয়ে রইল মেঘে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ছাতা আনেনি ইরা, নেইও। ছাতা কেনার সময় আসে নি এখনো। কে জানত এমন অবস্থা হবে! তবে তো পড়ানো সেরে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ত। বেরিয়েও থাকে অন্যদিন। আজকে শোভা-দি ঘরে ডাকলেন। তাঁর কয়েকটি বান্ধবী এসেছে, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও গল্পগুজব হল অনেকক্ষণ ধরে। গল্পে মেতে গিয়েছিল, গল্প তার বাপকে নিয়ে। আজকে ভারি এক খবর—বেরিয়ে আসছে, সেই সময় 'যুগচক্র' কাগজটা পেল। ট্রামে উঠে তারপর মোড়ক খুলল। বাবার সম্বর্ধনা হচ্ছে—

কিন্তু কি আশ্চর্য—বিশ্বেশ্বর সরকারের নাম এরা এই প্রথম শুনল। শোভা-দি হেন মানুষ—যাঁর প্রধান কর্ম বছরের পর বছর একটা করে পাশ করে যাওয়া, তিনি অবধি। 'ভারতে ইংরাজ' বইয়ের বাবদে এই সম্বর্ধনা, সে বই চোখেই দেখে নি। দু-একজনে একটু হাঁ-হাঁ করল বটে, কিন্তু সে সব মন-রাখা কথা, আন্দাজি ঢিল ফেলার রকম দেখে বোঝা গেল। ইরা তখন কাগজখানা মেলে ধরল জাঁক করে—বিশ্বেশ্বরের এতকালের সাধনার পুরস্কার দেবার জন্য, দেখ দেখ, দেশের গণ্যমান্যেরা তাঁর জন্মদিনে মিলিত হচ্ছেন। 'যুগচক্র'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় বিশ্বেশ্বরের লেখা থাকে, এবারও আছে—তারই নিচে ফলাও করে খবরটা ছেপেছে। কাগজটা তখন হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সগর্বে ইরা চেয়ে থাকে, পড়ো না খানিকটা—পড়ে বাবার ক্ষমতাটা বোঝ। এ পোড়াদেশের মানুষ নিতান্ত সহজে গুণীর মর্যাদা দিতে আসে না।

আকাশ ওদিকে মেঘের ভরা সাজাচ্ছে, কিন্তু বয়ে গেছে ইরাবতীর ঐ সব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দিতে। তার বাবা কত বড়, এতদিনে মানুষ চিনতে পেরেছে। দেরি হয় হোক না[illegible] এখন বাড়ি নয়, সোজা লাইব্রেরি যাবে এখা[illegible]ক। গিয়ে বলবে, বাবা গো, সাধক মানুষ তুমি—খবরাখবর রাখো না—তোমার 'ভারতে ইংরাজ' নিয়ে দেশের লোক ধন্য ধন্য করছে। এই এক জিনিষ দেখা গেল—কাগজে কাগজে যতই লিখে যাও, বই হয়ে না বেরুলে পাঠক-কানাদের নজরে ধরে না। নিন্দেমন্দ শুনে তো বিশ্বেশ্বর হাসেন, উল্টে উপহাস করেন নিন্দুকদের—প্রশংসায় আজ কি করবেন কে জানে? প্রশংসা কে-ই বা কবে করল তাঁকে, এক ঐ 'যুগচক্রের' স্বার্থপর সম্পাদক কৃতান্ত বিশ্বাস ছাড়া?

বৃষ্টি জোরে এসে গেল। ফাঁকা এদিকটা। লড়াইয়ের সময় মিলিটারির দখলে ছিল, এখন নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। চড়চড় করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু হল। জোরে—আরও জোরে পা চালাও ইরাবতী। দৌড়ও না, কে দেখছে···তা কি হয়েছে যে সোমত্ত মেয়ে দৌড়চ্ছে? নয় তো স্নান হয়ে যাবে একেবারে। দাও ছুট—ছোট্ট বয়সে চোর-পুলিশ খেলো নি?

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আশ্রয় মিলল অবশেষে। মোজেয়িকের থাম-ওয়ালা মস্ত বড় বাড়ি—উপর-নিচে সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, কেমন যেন ছাড়া-বাড়ি বলে মনে হয়। সেই বাড়ির কার্নিশের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। বিষম বাতাস। কাপড় আঁটোসাঁটো করে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, তবু ছাট আসছে।

শীত ধরে গেছে, কাঁপছে ইরা হি-হি করে। বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই। কি করে এই অবস্থায়—মরীয়া হয়ে দিল দরজায় ঘা। মানুষ তো বটে—গৃহস্থ মানুষ, বাঘ-ভালুক নয়—সঙ্কোচের অতএব মানে হয় না। এতক্ষণ

ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে ভিজবার কারণ ছিল না কিছু।

একজন কেউ কি নেই এত বড় বাড়িতে? অন্তত বাড়ি-পাহারার খাতিরে? কলিং-বেল টেপে। বাজছেও ভিতরে মনে হয়। মুখেও ডাকাডাকি করছে, দরজা খুলুন—দরজা খুলুন। শুনছেন, কে আছেন ঘরের ভিতরে?

সাড়াশব্দ নেই। বৃষ্টির জোর আরও বেড়েছে। ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ইরা একেবারে। ঐ প্রান্তের একটা জানলায় শুধুই কাচের শার্সি-আঁটা। ভি[illegible] সেই অবধি গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখে। [illegible]ই মনে হয়। ইজিচেয়ারের উপর চাদর মুড়ি দেওয়া—মানুষই তো! কিন্তু বেঁচে আছে তো বাপু? যা চেঁচানিটা চেঁচিয়েছে, মরা মানুষেরও তো নড়ে উঠবার কথা!

জলের ছাট তীরের ফলার মতো গায়ে বিঁধছে। দু-হাতে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভেঙে পড়বার দাখিল।

এতক্ষণে ভিতরের মানুষটার সাড় হল। কে?—বলে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দরজা খুলে দিতে দড়াম করে দু-পাল্লা দু-দিকের দেয়ালে আঘাত খেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বাতাসেরই ঝাপটায় ইরাবতীই ছিটকে পড়ল ঘরের ভিতরে।

খিল আঁটুন, শিগগির—আঃ, কি করছেন? ঘর ভেসে গেল যে জলে!

আধ-অন্ধকার ঘর, আর এক জোয়ান-যুবা ছেলে। খিল আঁটে ইরা কেমন করে? অন্তত একটা আলো থাকলেও যা হোক হত। ছেলেটা বুঝল। তার ইজিচেয়ারের নাগালের মধ্যে টেবিল-ল্যাম্প—বোতাম টিপে সে আলো জেলে দিল।

আলোয় অবস্থা দেখে শিউরে ওঠে, ইস! এত ভিজে গেছেন—

ইরা উড়িয়ে দিয়ে চায়, না—বেশি আর কি!

একেবারে নেয়ে উঠেছেন, আর বলছেন বেশি নয়?

ইরাবতী কিছু উষ্ণ হয়ে বলে, কি করা যাবে? কতক্ষণ ধরে ডাকছি, কত কড়া নেড়েছি! কাছাকাছি আর ঘর-বাড়ি নেই। থাকলে তো সেখানে যেতে পারতাম।

ছোকরা অপ্রতিভ হয়েছে। আমতা-আমতা করে বলে, বাড়িতে কেউ নেই কিনা—আমি আছি হরিহরকে সম্বল করে। এই আসছি—বলে সে হতভাগা বেরিয়ে পড়ল। বন্ধের পরেই আমার একটা একজামিন, তাই একটু তদ্গত হয়ে পড়াশুনা করছিলাম—

হাসিতে ফেটে পড়ে বুঝি ইরাবতী! অনেক কষ্টে সামলে নিল। পড়ছিলে তদ্গত হয়েই বটে! চাদরের আরামে সর্বদেহ আবৃত করে বৃষ্টির সন্ধ্যায় আলো নিভিয়ে দিয়ে পড়া। ইতি[illegible] এক মোটা বই খোলা—পড়া হচ্ছিল অতএব ইতিহাস। বাবা নেহাৎ মিছা বলেন না—ইতিহাসে এমনি নিষ্ঠা বলেই এত দিগ্‌গজ ঐতিহাসিক পণ্ডিতের সমারোহ।

ছোকরা বলে, জলে-কাদায় কি অবস্থা হয়েছে—দাঁড়ান।

দুমদুম করে দোতলায় উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এলো হাতে একটা ধুতি নিয়ে।

এই ছাড়া পাওয়া গেল না। মা-বাবা দেশে গেছেন, মায়ের শাড়ি-টাড়ি হয় সেই অবধি বয়ে নিয়ে গেছেন, নয় তো আলমারিতে বন্ধ। একটাও খুঁজে পেলাম না। হরিহর থাকলে হয় তো কোন হদিস হত—

আগুন হয়ে উঠে বলল, সেই চারটের সময় কেরোসিন কিনতে বেরিয়েছে। এক পহর রাত হতে চলল, দেখুন দিকি, এখনো সে কেরোসিন কিনে বেড়াচ্ছে।

ইরা বলে, বৃষ্টিতে আটকে গেছে বেচারি—

বৃষ্টির ছুতোয় আড্ডা জমিয়েছে কোথায়। সে যাক গে। মোটে না আসে, তাতেও ডরাই নে। মা'কে তাই বলেছিলাম—সবসুদ্ধ চললে, এটাকেই বা ফেলে যাচ্ছ কেন? কাউকে দরকার নেই। এগজামিনের পড়া যতই থাক, তার ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে নেবো—

সুইস টিপে দালানের আলো জেলে দিয়ে বলে, কেউ নেই—সোজা চলে যান ঐদিকে। কাদাটাদা ধুয়ে কাপড়টা ছেড়ে এসে বসুন। বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে?

শাড়ির যা দশা, না বদলে উপায় নেই সত্যি। হাত পাগুলোও ধোওয়ার দরকার। এই মূর্তিতে বাইরের মানুষটার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, সেই তো এক মহা লজ্জার ব্যাপার।

ফিরে এলো ফিনফিনে নরুন-পাড় ধুতি পরণে। তাতেই অপরূপ দেখাচ্ছে। বৃষ্টিস্নাত যুঁইফুলটি। জানলায় গিয়ে

দাঁড়াল। জল গড়াচ্ছে শার্সির গা বেয়ে। রাস্তা ভেসে গেছে, জলের আবর্ত ছুটেছে নর্দামার দিকে। থামবার লক্ষণ নেই।

ইরা বলে, একটা ছাতা-টাতা পেলে চলে যেতাম—

ছাতা না হয় পেলেন। কিন্তু এত বৃষ্টি ছাতায় মানবে না, আবার ভিজে যাবেন।

ইরা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরি থেকে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যাবো, আমার জন্য বসে রয়েছেন।

ব্যাপার ঠিক তা নয়। বাড়ির কথা হুঁশ থাকে বড় বিশ্বেশ্বরের! ইরাই ডাকাতের মতো গিয়ে পড়ে। গিয়ে হুঙ্কার দেয়, চলো বাবা—। সামনের খোলা বই বন্ধ করে দেয়, খাতাপত্র তুলে ফেলে ব্যাগে। বিশ্বেশ্বর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, রাগ করতে গিয়ে সামলে যান মেয়ের দিকে চেয়ে। ওরে বাবা, ওর সঙ্গে রাগে পারবে কে ত্রিভুবনের ভিতর? সাক্ষাৎ মনসা ঠাকরুণ···

যাও লাইব্রেরিতে, দেখে এসো সেই সাধক মানুষটিকে। চেহারাতেও অবিকল তাই—পাকা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, ছবিতে দেখা নৈমিষারণ্যের মুনিঋষিদের মতন। বাদলায় ইরাবতী গিয়ে পৌছতে পারে নি, ভারি মজা জমেছে আজকে তাঁর। মনের সাধে খেটে যাচ্ছেন। স্তূপীকৃত বই চারিদিকে—এটা খুঁজছেন ওটা খুঁজছেন, ভাবছেন কপাল কুঞ্চিত করে। সহসা উদ্দিষ্ট কিছু পেয়ে লিখতে শুরু করে দিলেন। ছুটল কলম—পাতার পর পাতা শেষ করে চলেছেন, সবটুকু লিখে ফেলে তবে সোয়াস্তি। পুঁথিপত্রের অরণ্যে দিনরাত্রি খুঁজে খুঁজে বেড়ান হীরা-মাণিকের টুকরো। টুকরো সাজিয়ে সাজিয়ে মাল্য-রচনা। তার মধ্যে একটি বিচিত্র মাল্য শেষ করে—কি উপমা দেওয়া যায়?—সেই মাল্য বঙ্গবাণীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন; নাম হল তার 'ভারতে ইংরাজ'। শেষ করে তবু তৃপ্তি নেই—আরও খুঁজছেন, নতুন নতুন বস্তু জুড়ে গেঁথে পুরানোর রদবদল করে আরও কি বাহার বাড়ানো যায়!

বাপের কথায় ইরাবতীর ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি ফুটে ওঠে। এক বাৎসল্যের ভাব। বলে, আমার বাবা ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন। ইতিহাসে এম. এ. দিচ্ছেন অরুণাক্ষবাবু, আপনি নিশ্চয় তাঁকে জানবেন।

অরুণাক্ষ আশ্চর্য হয়ে বলে, নাম কি করে টের পেলেন আমার?

ইরা মুখ টিপে হাসে, জবাব দেয় না।

ও, বইয়ে লেখা আছে নাম। ইতিহাসের ছাত্র—তা-ও টের পেয়েছেন বই থেকে। আমার পরিচয় তবে তো সবই আপনার জানা। বাবার নামও হয়তো জেনে এসেছেন ফটকের নেম-প্লেট থেকে।

ইরা হেসে বলে, নাম বললে আমার বাবাকেও জানবেন। পলাশির যুদ্ধ থেকে স্বাধীন-ভারত এই—দু-শ বছর নিয়ে খুব রিসার্চ করছেন। মাস চারেক হল এক ভল্যুম বই বেরিয়েছে।

বটে! কি নাম বলুন তো আপনার বাবার?

বিশ্বেশ্বর সরকার—জানেন?

অরুণাক্ষ লাফিয়ে ওঠে, জানি বই কি—খুব জানি। থেমে একটু ঢোক গিলে নিয়ে আবার ফলাও করে বলে, মস্ত বড় পণ্ডিত—তাঁকে না জানে কে? আমি তাঁর পরম ভক্ত।

মেয়েটা খুশি হয়েছে, মুখ-ভরা হাসি দেখে বুঝতে দেরি হয় না।

বাবার লেখাও অনেক বেরোয় কাগজে কাগজে। 'যুগচক্রের' প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাবার লেখা থাকে।

অরুণের মুখ কালো হয়ে যায় সহসা। বলে, 'যুগচক্র' যাচ্ছেতাই কাগজ, সম্পাদক পাজি লোক—ও কাগজ আমরা ছুঁই না। তা হলেও ওঁর লেখা বিস্তর পড়েছি। অনেক জিনিষ মুখস্থও বোধ হয় বলতে পারি। বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র যারা—ওঁর যাবতীয় লেখা তাদের নখদর্পণে রাখতে হয়।

বিস্তর বলা হয়েছে—মুখস্থর কথা অবধি। মুখস্থ ধরতে না বসে আবার! ব্যস্ত হয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি না ধরলে যেতে পারছেন না, ভাল হয়ে বসুন। আমি চা করে আনি।

না, না—চায়ের দরকার নেই—

শীতে কাঁপছেন আপনি। নিশ্চয় দরকার। এক্ষুণি আসছি—

হেসে উঠে আবার বলে, সমস্ত পারি আমি। হরিহরকে নিয়ে আছি, বুঝতে পারছেন না, পারতে হয় সমস্ত। হীটার

আছে, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। আপনি বসে বসে কাগজটা দেখুন ততক্ষণ।

বলতে বলতে সরে পড়ল। সরে গিয়ে বাঁচল। খানিক পরে চা করে এনেছে কেটলি ভরে। টেবিলের বই নামিয়ে দিয়ে সামনা-সামনি বসল। একটা কাপে আগে ঢেলে ইরার দিকে এগিয়ে দিল। মুখে না তুলতেই প্রশ্ন, কেমন হয়েছে বলুন—

ভালো।

দেখুন তবে। রান্নাবান্না সমস্ত রপ্ত। হরিহরের জ্বালায় পড়ে এই তিন হপ্তায় আরো ভাল করে শিখে ফেলেছি। মায়েরা দেশে গেছেন। বিস্তর আম-কাঁঠাল হয়েছে, আমাকেও যেতে লিখছেন। কিন্তু এগজামিনের বেশি তো দেরি নেই, এ সময় দেশে পড়ে আড্ডা দেওয়া ঠিক নয়—কি বলেন ?

ইরা মুখ টিপে হেসে বলল, তে তো বটেই ! ফুটবলটাও এবারে বড্ড জমেছে—কি বলেন ?

অরুণ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। আচ্ছা মেয়ে—জ্যোতিষ শাস্ত্রে দখল আছে নাকি, মুখ দেখে যাবতীয় খবর পটাপট বলে দেয়। উঁহু—কাগজের খেলার পাতাটায় দাগ দিয়ে দিয়ে রেখেছে, সেটা নজরে পড়েছে। তা এরা টিকটিকি পুলিশের চাকরি নেয় না কেন, ধাঁ করে উন্নতি হয়ে যাবে।

এবার নিজের কাপ মুখে তুলল। মুখ বিকৃত করে বলে, নোনতা-নোনতা লাগছে না ?

ভালমানুষের ভাবে ইরা বলে, কই—না তো !

হুঁ, নুনই পড়েছে। তাই আপনি খাচ্ছেন না—খালি ঠোঁটে ঠেকাচ্ছেন।

চা রেখে অরুণ ভিতরে গেল। ফিরে এসে বলে, তাই—চিনি ভেবে নুন দিয়েছি। চিনি কোথায় যে রেখে গেছে হতভাগা—হয় তো বা জল ঢেলে শরবৎ করে মেরে দিয়েছে।

ইরা বলল, নুন-চা'রই দরকার ছিল আমার। ঠাণ্ডায় সর্দি লাগবে না।

নাঃ, বদনাম হয়ে গেল আপনার কাছে। কেমন চা করি, দেখাতে পারলাম না। জানেন, হরিহরের জন্ত এক এক সময় ইচ্ছে করে, পড়াশুনো ঘুচিয়ে দিয়ে যেদিকে দু-চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি।

বৃষ্টি চলেছে, এ বৃষ্টি ধরবার লক্ষণ নয়। আটটা বাজে। কথাবার্তায় মন লাগছে না, বাবা সেই কখন গিয়ে বসেছেন, জলটুকুও আর পেটে পড়েনি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে, জোরজার করে শুইয়ে দেবে একটু। ইরা বারবার উঠে জানলার কাছে যায়। তার পরে দরজা খুলে ফেলল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি চলি এবার।

কাদা-মাখা শাড়িটা ধুয়ে নিংড়ে টুলের উপর রেখেছিল। সেদিকে তাকাচ্ছে। অরুণ বুঝে নিয়ে বলল, ওটা থাকুক—লাইব্রেরিতে হাতে করে যাবেন কেমন করে ? হরিহর পৌঁছে দিয়ে আসবে। দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতা দিচ্ছি, খালি মাথায় যাবেন না।

ছাতা মাথায় ইরাবতী যাচ্ছে। ক্ষণপরে তাকিয়ে দেখে, অরুণও আসছে পিছু পিছু। আশ্চর্য হয়ে বলে, এ কি ?

ট্রাম-রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে—

দরকার নেই, একাই বেশ যেতে পারব। ইস, আপনি ভিজে গেলেন একেবারে।

অরুণ বলে, রক্ষে পেলাম ভিজে। সন্ধ্যেবেলা রোজ একবার চান করি। আজকে হয় নি বলে এমন গরম লাগছিল—

না, ফিরুন আপনি। বাদলায় ভিজলে অসুখ করবে।

অরুণ হেসে বলে, নতুন ছাতাটা দিলাম—ছাতা নিয়ে আমার ভারি আতঙ্ক। ধরুন, যদি হারিয়ে ফেলেন—কিম্বা ফেরত দিতে যদি মনে না থাকে ! তাই ভেবেছি, ট্রামে তুলে দিয়ে একেবারে ছাতাটা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরব।

ইরা বলে, শাড়ি রয়ে গেল যে ! ছাতা ফেরত দিতেই হবে। আপনাদের ধুতি আর ছাতা এক সঙ্গে করেও শাড়ি পাল্লায় ঝুঁকবে। ভাল একটা শাড়ি গলায় বেঁধে ফাঁসি যেতেও কোন মেয়ে দৃকপাত করে না জানেন ?

খিলখিল করে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল। হাসি ছড়াতে ছড়াতে চলল যেন। বৃষ্টিজলের মধ্যে অরুণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। এক ছাতায় দু-জনে চলুন যাই—এমন কথাই বা বলা যায় কেমন করে ? কি হয়তো ভেবে বসবে।

(ক্রমশঃ)

পাট ও পাঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

সম্প্রতি কলিকাতার যাদুঘরে সপ্তাহকালব্যাপী চিল্‌ড্রেনস্ লিট্‌ল থিয়েটারের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এতৎসহ শিশু-শিল্পীদের অঙ্কিত ছবির এক প্রদর্শনী হয়। উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় মহোদয়া। চিল্‌ড্রেনস লিট্‌ল থিয়েটারের এই অনুষ্ঠান তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী অতি অল্পকালের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যপাল তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—শিশুদের এসকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করার প্রয়োজন। তিনি আন্তরিকভাবে শিশুদের এ উৎসবকে অনুমোদন করেন। কলিকাতার এই প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে অভিনয় প্রদর্শনকরিতে গেলে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন—গান্ধীজীকে তিনি মর্ম্মরমূর্ত্তি ও পটে-আঁকা ছবির মধ্যে দেখিতে চান না, এই সকল ভবিষ্যৎ বংশধরদের সত্তার মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মশক্তি, আদর্শ ও প্রেরণা নিহিত আছে।

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রতিদিন নূতন নূতন কর্ম্মসূচীর দ্বারা দর্শকদের আকৃষ্ট করে। ‘মিঠুবা’, ‘পিক্‌নিক্’, ‘টুলুর ছবি’ প্রভৃতি নৃত্য নাট্যগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ষষ্ঠদিনের অনুষ্ঠানে ৭ বৎসর বয়স্কা কুমারী মীনাক্ষির নৃত্য সকলকে চমৎকৃত করে।

চিল্‌ড্রেনস্ লিট্‌ল থিয়েটার শিশু রংমহল শুধু অপূর্ব্ব নয়—অভিনব। আমরা এঁদের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

* * *

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের ‘রাণী রাসমণি’ সম্প্রতি শহর ও শহরতলীর কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির জীবন-কাহিনী বাংলা-বাঙ্গালীর ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেবলমাত্র দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকৃষ্ণের অপরিসীম অনুগ্রহলাভই রাণী রাসমণির জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি একাধারে যেমন তেজস্বিনী, অপরদিকে তেমনি রক্ষণশীলা মহিলা ছিলেন। বাঙ্গালী মহিলা সমাজে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন যে পর্দ্দানশীন থাকিয়াও দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করা যাইতে পারে। রাসমণির ধর্ম্মজীবন সাধারণের নিকট প্রকট হইয়া থাকিলেও,

যাদুঘরে অনুষ্ঠিত চিল্‌ড্রেনস্ লিটল থিয়েটারের ষষ্ঠ দিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যা সাক্ষীগোপাল মন্দিরের একটি দৃশ্যে নৃত্যরতা কুমারী মীনাক্ষি

তাঁর পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন একদিকে যেমন মধুর, অপর দিকে তেমনি গৌরবময়! আলোচ্য চিত্রে পারিবারিক, সামাজিক জীবনের পরিবেশ অবশ্য স্বষ্টি করা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা কেবলমাত্র সাধারণ্যে প্রচলিত সেইগুলিই চিত্র-নাট্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা ব্যতীতও বহু নাটকীয় ঘটনা আছে, যাহা আলোচ্য চিত্রে স্থান পায় নাই। রাণী রাসমণির আবির্ভাবকাল বাঙ্গালা-বাঙ্গালীর যুগ সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে দেশের বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়; এই পরিবর্ত্তন ও প্রতিক্রিয়ায় রাণী রাসমণিও অংশভাগিনী

'বীর হাম্বির' কথা চিত্রের নায়িকা নবাগতা শ্রীমতী মিত্রা বিশ্বাস
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন। সে ইতিহাস বড়ই গৌরবময়। আলোচ্য চিত্রের কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এবং চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ। সংলাপের প্রথমাংশ কিঞ্চিৎ বক্তৃতা-বহুল এবং শ্রবণকে পীড়া দেয়। শেষাংশ অবশ্য নাটকীয় স্বষ্টির সহায়ক। কিশোরী রাসমণি হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহ লাভ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত আলোচ্য চিত্রে দেখান হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের যে কাহিনীগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে 'যুগ-দেবতা' কথা-চিত্রে স্থান পাওয়ায় দর্শকদের মনে বৈচিত্র্য আনিতে না পারিলেও শ্রীমান্ গুরুদাসের সুষ্ঠু সুন্দর অভিনয়ে দর্শকদের বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীবিদ্যাপতি ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণবেশী গুরুদাসের চিত্রগ্রহণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার চিত্র গ্রহণ সুষ্ঠু হইয়াছে। শ্রীমতী মলিনা দেবী ইতিপূর্ব্বে বহু চিত্রেই সুঅভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু রাণী রাসমণি তাঁহার অভিনেত্রী জীবনের একটী অপূর্ব্ব স্বষ্টি। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার একান্ত নিষ্ঠার ছাপ সুপরিস্ফুট। ইহা ব্যতীত অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতাংশ ভাল। সঙ্গীতপরিচালক শ্রীঅনিল বাগচী তাঁহার পূর্ব্ব
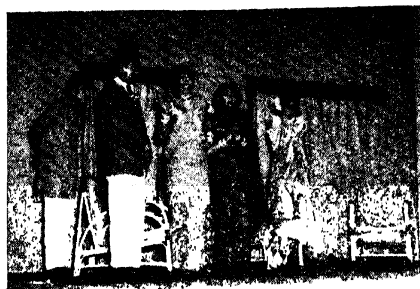
প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব। 'নাই রোশানি' নামক একটি উর্দ্দু নাটকের এক কৌতুক দৃশ্য

খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। যদিও রাসমণির মৃত্যুর পূর্ব্বে Strick shotএর সাহায্য কৃষ্ণ-কালী অভেদ বুঝানর চেষ্টা করা হইয়াছে তথাপি রাসমণির মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মুখ হইতে বার বার 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করান ঠিক হয় নাই। কেননা তোতাপুরীর নিকট দীক্ষালাভের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ—গদাধর।

প্রজোজক ও পরিবেশক শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁ এবং পরিচালক শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ এই চিত্র নির্মাণ ব্যাপারে তাঁহাদের যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

* * *

শ্রীযুক্ত সুনীল জানার 'সূর্য্যগ্রাস' উপন্যাস অবলম্বনে এস, পি, প্রোডাক্সনের নবতম কথাচিত্র 'অনুপমা' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'সূর্য্যগ্রাস' উপন্যাসখানি বাংলা কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাহিনীটি

বর্ত্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। সমস্যা-মূলক এ কাহিনী লইয়া সাধারণ প্রযোজকদের পক্ষে চিত্র-রূপায়ন সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। কেননা, এইরূপ কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করার মধ্যে তাহার সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। সাধারণতঃ এই সকল কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপায়ন হইলেও অর্থাগমের আশা থাকে না। এম্-পি প্রোডাক্সন্স অবশ্য সে ঝক্কি ঘাড়ে করিয়াই এ কাহিনীর চিত্ররূপ দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। নায়িকা কল্যাণী বালবিধবা। বাপ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাই ছেলে অবনীর সঙ্গে কন্যাকেও লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পিতা শিবশঙ্কর ছেলে এবং মেয়েদের শিক্ষা যে সমান-ভাবেই দেওয়া উচিত একথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। কিন্তু শিব-শঙ্করের পত্নী অর্থাৎ কল্যাণীর মা ছিলেন প্রাচীনপন্থী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই মেয়ের লেখাপড়া শেখাকে তিনি যেমন ভাল চক্ষে দেখিতেন না তেমনি পরে শিবশঙ্করের মৃত্যুর পর কল্যাণীর চাকুরী গ্রহণকেও তিনি অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু সংসার যখন সম্পূর্ণ অচল হইয়া উঠিল—ক্ষুধাকাতর ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, ঠিক সেই চরম দুর্দ্দিনে কল্যাণীর চাকুরী জুটিল—শিবশঙ্করের ছাত্র নরেনের সাহায্যে। মা আজ অনন্যোপায়। তাই তাঁর আজ কল্যাণীর চাকুরী গ্রহণে সম্মতি না থাকিলেও—আপত্তিও নাই। কল্যাণীর দাদা অবনী শিক্ষিত অথচ বেকার। অনেকে এই চরিত্রটিকে অবাস্তব বলিয়া মনে করিতে পারেন, আসলে কিন্তু এরূপ চরিত্রও বিরল নয়। চিত্রনাট্য রচনায় এই চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়ায় নায়ক নরেনের চরিত্রসৃষ্টি সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রনাট্য রচনার ত্রুটি সাফল্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ। কল্যাণীর ছোট বোন শান্তার চরিত্রটিকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল। কেন না নাটকীয় গতির পথরোধ করিয়াছে এই শান্তা। এম্-পির ছবির মানদণ্ড সর্ব্বক্ষেত্রেই যথারীতি বজায় আছে, কিন্তু সঙ্গীতাংশ একেবারেই রেখাপাত করিতে পারে নাই। সুধার গানটীর চিত্রগ্রহণ একটু হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে। অবনীর ন্যায় শিক্ষিত ছেলের পক্ষে ঐ ভাবে বাঁশী বাজিয়ে স্ত্রীকে গানে উৎসাহিত করা অশোভন। মনে হয় যেন, কোন সাঁওতাল পল্লীতে চলিয়া গিয়াছি। বিশেষ করিয়া ঐ দৃশ্যে সুধা অর্থাৎ সাবিত্রীর বেশ-বিন্যাসও তদনুরূপ। কল্যাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। এইরূপ এই কঠিন চরিত্রে রূপারোপ করা বড় কম কথা নয়। শ্রীমতী অনুভা আগাগোড়া তাঁহার দরদী শিল্পী-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকা-গুলিও সুঅভিনীত। চিত্রের মানোন্নয়নে যাঁহারা অগ্রণী—এম্-পি প্রোডাকসন্স তাঁহাদের অন্যতম। চিত্রশিল্পের গতানুগতিক ধারায় বর্ত্তমানে যে সকল চিত্র মুক্তিলাভ
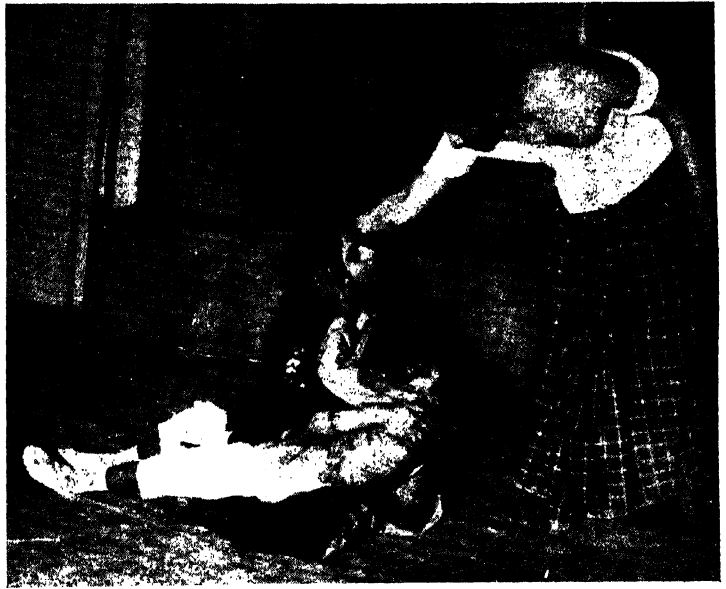
প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে 'ছেঁড়াতার' নামক বাংলা নাটকের একটি দৃশ্য

করিতেছে অগ্রদূত পরিচালিত এম্-পির 'অনুপমা' তাহাদের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

* * * *

সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর উদ্যোগে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ফিল্ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শিল্প-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, শিল্পী ও টেক্‌নিশিয়ানগণ আমন্ত্রিত হইয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—ভারতবর্ষে আজও নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক। কাজেই

প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে 'ওডিপাস্ রেক্স' নামক একটি ইংরেজি নাটকের একটি দৃশ্য

পুস্তক বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাহাদের চিত্তবৃত্তির খোরাক জোগান সম্ভব নয়। ছায়াচিত্রের মাধ্যমে সে সুযোগ তাহাদের দেওয়া যাইতে পারে। কেননা ছায়াছবি একদিকে যেমন চোখে দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি কানে শোনা যায়। কাজেই এই শিল্পের প্রতি সেদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। প্রতিদিন চিত্রগৃহে যে সকল দর্শকের সমাগম হয় তাহার মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং ছায়াচিত্রের মাধ্যমে এমন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশন করা উচিত যাহা দ্বারা এই সমাজের উপকার সাধিত হইতে পারে। পণ্ডিতজীর এ অভিমত যেমন সুচিন্তিত, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিল্পাঞ্চল এলাকার চিত্রগৃহগুলিতে যে সকল কুরুচিপূর্ণ ছবি সাধারণতঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা এই সমাজের পক্ষে শুধু ক্ষতিকর নয়—সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তাহা মনের মাঝে সংক্রামিত হইয়া অধঃপতিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ধরণের চিত্র-

প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত-করবী' নাটকের একটি দৃশ্য

প্রযোজনা হইতে বিরত থাকিলেন। শিল্প যেমন মনের উন্নয়ন করে, অপরদিকে তেমনি সমাজেরও উপকার করা হইবে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন—সৃষ্টিধর্ম্ম শিল্প ফরমায়েস দ্বারা কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য সরকারী বিধিনিষেধ এই সকল শিল্পের প্রতি যতটা শিথিল করা যায় ততই মঙ্গল। তবে জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের প্রয়োজন, গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহা করিবেন।

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এবার ফেরা যাক্ ডালের জলে, রাইনওয়াড়ীর খাল যেখানে গিয়ে পোড়েছে ভাসা বাগানের মাঝে। ভাসা বাগানের কথা পূর্ব্বে বোলেছি। শ্রীনগরের সব্জীর একটা বড় অংশ জন্মে এই সব ক্ষেতে। এগুলি ছাড়িয়েও এগিয়ে যাই। প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর চোখে পোড়ল 'নাগিন লেক'। এখানের স্বচ্ছ শান্ত জলে সাহেবদের আমলে নানা জলক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল—আজও দেশী সাহেবেরা তাদের কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানেও হাউসবোটের একটী বড় আড্ডা আছে—কারণ সহর থেকে দূরে শান্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা অনেকেই এখানে থাকেন। এখানে ছোটখাট বাজার, হোটেল ও তাঁবু ফেলার ময়দান আছে—আর আছে একটী কুষ্ঠাশ্রম। বহুদিন পূর্ব্বে কোন দয়াময়ী ইংরেজ মহিলা এটীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখন রাজ্য সরকার এর ভার নিয়েছেন।

নাগিনলেকের পর পড়ে হজরৎবল, শ্রীনগর থেকে প্রায় ৭ মাইল দূর। এটী মুসলমানদের একটী পরম পবিত্র তীর্থ, কারণ হজরৎ মহম্মদের কেশের কয়েক গাছি এখানের জিয়ারদগায় একটী সোনা-মোড়া শিশিতে রক্ষিত আছে। বছরের একটী বিশেষ দিনে এটী ভক্তদের দেখান হয়, তখন প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান এখানে জমায়েৎ হন। এ'ছাড়া প্রতি শুক্রবারের নমাজেও এখানের বিস্তীর্ণ প্রার্থনা প্রাঙ্গণে বহু ভক্ত যোগ দেন, কাজেই যাঁরা কাশ্মীরের বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের একত্রে দেখতে চান তাঁরা শুক্রবার এখানে এলে ভাল কোরবেন। এখানের মসজিদও মুসলমানদের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

সন্নিকটেই নাসিমবাগ। এ বাগিচায় ফুলের কেয়ারী নাই, ফোয়ারার ফুলঝুরি নাই, শুধু আছে শত শত চেনারের ঘন পক্ষপুটের ছায়াতলে সমতল সবুজ ঘাসের মোটা কার্পেট। সামনেই ডালের স্বচ্ছ চিকণ জলে ফোটে অজস্র পদ্মফুল, তার ওপারে আকাশের কোলজোড়া পাহাড়। শ্রীনগরের কাছে অথচ ডাল, শালিমার, নিশাদ প্রভৃতিও দূর নয় বোলে অনেক সৌন্দর্য্য-পিপাসু এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন।

এর পর ছোট্ট একটী দ্বীপ, তাতে কয়েকটা চেনার আর কিছু আগাছা। দ্বীপটীর নাম 'সোনালঙ্কা'। লম্বা চওড়ায় আন্দাজ ৪০ গজ। অনেকে এখানে নেমে খানিকটা সময় কাটান বা চড়িভাতিও করেন। ছুটীর আনন্দ উপভোগ করার পক্ষে কিংবা কবিত্বময় পরিবেশে প্রেমের মোহময় আবহাওয়া সৃষ্টির শক্তি সোনালঙ্কার আছে মনে হোল।

সোনালঙ্কার মায়া কাটীয়ে বিস্তীর্ণ ডালের বুকে আরও খানিকক্ষণ পাড়ি দিয়ে একটী ছোট্ট খালে ঢুকলো শিকারা। খালটী অপরিসর, অগভীর এবং অপরিচ্ছন্ন—প্রায় মাইল খানেক লম্বা। এরই অপর মাথায় বাঁধান রাস্তার ওপর 'শালিমার বাগ'। শালিমার বাগের মাঝের নালার উদ্বৃত্ত জল সোজা এই খালে পোড়ে ডালের জলে মিশে যায়। শ্রীনগর থেকে এর দূরত্ব ৯ মাইল।

শালিমার বাগ বা 'প্রেমকুঞ্জ' তৈরী করান সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রেয়সী নুরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য ১৬১৯ খৃঃ অব্দে। পাহাড়ের ঠিক কোলে না হোলেও এর চারিদিকে পর্ব্বতের পরিবেশ। হারোয়ানের বিরাট জলাশয় থেকে আসে এখানের ফোয়ারায় জল, কাজেই বর্ত্তমানে তা পরিমিত। শুধু রবিবার ফোয়ারাগুলিতে জল ছাড়া হয় দর্শকদের জন্য—তাও একটু শীত পোড়লে জলাভাবের জন্য বন্ধ থাকে। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে এটী নির্ম্মিত, কাজেই কালের করাল স্পর্শে অতীতের অনেক সৌন্দর্য্যই আজ ম্লান—তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা মনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। ডালের উত্তর পূর্ব্ব কোণে মহাদেব পর্ব্বতের (৯০০০ ফিট) প্রায় কোলে এই বাগানটী, পর পর চারটী ধাপে উঠে গেছে। দু'ধারে প্রবেশ পথ, আর তাদের মাঝ দিয়ে বাগানটীর জল ছোট্ট একটী জলপ্রপাতের আকারে বেরিয়ে সামনের খালে পড়ে। প্রতি চত্বরে সবুজ ঘাসের ওপর সৌরভ শূন্য বর্ণাঢ্য বিভিন্ন বিলাতী ফুল (সিজন্ ফ্লাওয়ার), মাঝে মাঝে সুষ্ঠুভাবে ছাঁটা ঝাউ জাতীয় গাছ। হঠাৎ ঢুকলে ভ্রম হয় বুঝি বহুমূল্য কাশ্মীরী কার্পেটে বাগানটী মোড়া। বাগানটী দৈর্ঘ্যে ৫৯০ গজ—প্রস্থে ২৪০ গজ—এই থেকেই বোঝা যাবে—এর বিশালত্ব। বাগানটীর তিনটী চত্বরের মাঝে তিনটী বিশ্রামাগার

আছে—প্রথমটী থেকে জাহাঙ্গীর প্রজাদের দর্শন দিতেন, দ্বিতীয়টীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিভৃত আলাপ চোলত, আর তৃতীয় এবং বৃহত্তমটী নির্দিষ্ট ছিল সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ও তাঁর সঙ্গিনীদের জন্যে। এই প্রমোদ ভবনটী (বার দোয়ারী) এক বিশেষ ধরণের কালো মার্ব্বেল পাথরের তৈরী,—যার ঔজ্জল্য আজও অম্লান। এর ভেতরে যে সব চিত্র কলা ছিল তার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। এই প্রমোদশালার মাঝের হলটী বেশ বড়, পাশের দুটী অপেক্ষাকৃত ছোট। মেঝের মসৃণতা আজ নাই, দরজায় নাই সোনালী জরীর কাজ করা মস্‌লিন পর্দ্দা, নাই নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ, অথবা কঙ্কনের কিঙ্কণী, নাই ফেনিল পানপাত্রের রিনিঝিনি, মদিরামত্তের উদ্দাম বিলাস উন্মত্ততা। তবু একটু কল্পনার সাহায্য নিলে এখানে বোসে মোগল যুগে ফিরে যেতে কষ্ট হয় না। এটীর চারদিকে দেড় শতটী ফোয়ারা থেকে উছলে উঠত হাজার হাজার জলকণা, আর চারিদিকের চত্বরের ফুলের ফুলঝুরির মাঝ দিয়ে নাচতে নাচতে আসতো চারটী জল-ধারা। ফোয়ারা বসান অগভীর বিরাট এর উ'চু চৌবাচ্চার মাঝখানে এই প্রমোদ ভবন। দাওয়ায় হাজারো কুলঙ্গীর মধ্যে সন্ধ্যায় জ্বোলত অসংখ্য দীপ; সে দীপের আলো প্রতিভাত হোত সামনের জলপ্রপাতে আর ফোয়ারা থেকে ফুল্কি দিয়ে ভেঙ্গে পড়া লক্ষ লক্ষ জলকণায়। শত শত প্রদীপের কম্পমান উজ্জ্বল শিখা সৃষ্টি করত সহস্র ইন্দ্রধনু চারদিকের চলন্ত জলধারায় আর উছলে উঠা সহস্র জল কণায়। প্রদোষের স্তিমিত আলোয় এই বারদোয়ারীতে বোসে চার-দিকের বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝে ফোয়ারাগুলির নৃত্যছন্দের একটানা সুরের মাঝে অনায়াসেই নিজেকে কল্পলোকে হারিয়ে ফেলা যায়। এর মাঝেই হয়ত চঞ্চলা লঘুচারিণী মৃগনয়না মোগল মদালসাদের চাপল্য, মদিরতা, প্রেম, প্রতিহিংসা সবই চোলত। শ্রেষ্ঠা সুন্দরী সম্রাট-মন-হারিণী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান শুধু বিলাসিনী শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন না, সুদক্ষ শাসকও ছিলেন! যাক্ সে কথা। এই প্রমোদ ভবনের মেঝেয় দাঁড়ালে মনে হয় ডাল হ্রদ বুঝি বাগানটীর কোলেই। বাগানের সামনের এক মাইল লম্বা খালটী বাগানের মধ্য নালাটীর সঙ্গে এক সরল রেখায়। সত্যিই এ সব দৃশ্য অবর্ণনীয়, এ শুধু চোখে দেখেই ভোগ করা যায়। শালীমার বা শালিমারকে বর্ত্তমানে মরশুমের সময় রবিবারে বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত করা হয়। বাগানটীর ওপরে প্রাচীরের বাইরে শস্যক্ষেত্র ও আপেলের বাগান। অক্টোবরে এখানে প্রচুর আপেল থাকে।

শালিমারে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে আবার আমরা শীকারায় উঠলাম নিশাদবাগে যাবার জন্যে। যাঁদের সময় ও অর্থ আছে তাঁরা একদিনে একটী কোরে বাগান দেখলে অনেক বেশী আরাম ও আনন্দ পাবেন। এক ঘণ্টায় দেখা হয় বটে তবে উপভোগ করা যায় না। শালিমার থেকে জল-পথে নিশাদবাদ প্রায় দু'মাইল, স্থলপথে প্রায় দেড় মাইল। এই দু'মাইল পথ যেতে আমাদের বেশ সময় লাগলো, কারণ বিকেলের দিকে হ্রদের বুকে হাওয়া উঠলো। দুজন মাঝিতে দাঁড় টেনেও প্রতিকূল হাওয়ার বিরুদ্ধে শীকারাকে এগিয়ে নিতে বেগ পাচ্ছিল। নীচে গভীর জল—তার নীচে পানিফল ও অন্যান্য গাছপালা—এক ভিন্ন জগৎ। শান্ত জল হাওয়ায় অশান্ত হোয়ে উঠলো, ছোট ছোট ঢেউ এসে শীকারার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ ভয় ধরিয়ে দিলে। পুরাতন আমলের একটী রাস্তার সেতুর নীচে দিয়ে শীকারা চোলো নিশাদবাগের দিকে। এই রাস্তাটী দিয়ে জলের এই অংশটীকে যেন বাঁধ দেওয়া হোয়েছে, কাজেই বাইরের অশান্ত আবহাওয়া এখানে অনেকটা শান্ত। ডালের তীরে পাকারাস্তা, তার পরই নিশাদ-বাগের উ'চু প্রাচীর (প্রায় ১২ ফিট উ'চু)। ডালের তীর থেকে পর পর দশটী চত্বর উঠে গেছে পাহাড়ের কোলে। সি'ড়ি বেয়ে উঠতে হয় প্রতিটি চত্বরে। দ্বিতীয় চত্বরটীতে একটী দুতলা কাঠের কারুকার্য্য করা ঘর আছে। এখান থেকে বেগমরা বাগান ও ডালের সৌন্দর্য্য উপভোগ কোরতেন। এর প্রবেশ দ্বারের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে এক মালী—কিছু বক্‌শিস্ দিলে (দু'চার আনা) সে দরজা খুলে ওপরে যেতে দেয়। এর ওপর থেকে বাগানটীর দৃশ্য সত্যিই অনুপম—অবর্ণনীয়। এই বাগানটী তৈরী করান জাহাঙ্গীরের শ্যালক এবং শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁ (১৬৪৫ খৃঃ অঃ)। শ্রীনগর থেকে জলপথে এর দূরত্ব ৬ মাইল, আর স্থলপথে প্রায় ৭½ মাইল। এর দৈর্ঘ্য ৫৯৫ গজ প্রস্থ ৩৬০ গজ, সমস্ত মোগল উদ্যান-গুলির মধ্যে এটীই বৃহত্তম। নিশাদবাগের অর্থ হোল—আনন্দ-উদ্যান—সেদিক থেকে এ উদ্যানটী সার্থক নামা। শালিমারের মত এর জলপ্রণালী চার ধার থেকে আসছে না; ওপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত বাগানটীর মাঝে মাঝে জলধারা, চত্বর থেকে চত্বরে নেমে নেমে চোলেছে ছোট বড় প্রপাতের আকারে ও বহু ফোয়ারার মাঝ দিয়ে। প্রতি চত্বরে জলধারার মাঝে মাঝে ফোয়ারার শ্রেণী, ফোয়ারাগুলির দুধারে আবার থাকে থাকে নেমে গেছে ফুলের গালচে। সীমানায় দেওয়ালের ধারের চত্বরগুলিতে আপেল ও অন্যান্য ফলের গাছ। ফলে ফুলে ভরে আছে সমস্ত বাগানখানি, আর কলকল ছল-ছল কোরে মাঝ দিয়ে ছুটে চোলেছে জল-প্রণালী। তারই বুকে লক্ষধারায় উছলে উঠছে ফোয়ারার ফুনকী; এর চেয়ে সুন্দর কিছু বুঝি কল্পনা করা যায় না, সৃষ্টি করা ত দূরের কথা। যদিও অনেকে শালীমারকে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলেন, আমার কিন্তু নিশাদকেই ভাল লাগছিল বেশী। বর্ত্তমানে শুধু রবিবারে অথবা বিশিষ্ট সরকারী উৎসবের দিনেই এর ফোয়ারাগুলিতে জল ছাড়া হয়, আমরা একদিন জলশূন্য অবস্থায় ও অন্যদিন সজল ফোয়ারা সমেত এর দৃশ্য দেখেছি, তফাৎ প্রায় আকাশ পাতাল। জলের জৌলুস নৃত্য-ছন্দ ও শব্দ বাদ দিলে বাগানটিকে নিরাভরণী সুন্দরী বিধবার মত দেখায়।

ফেরার পথে সন্ধ্যা হোল, ডালের বুকে অস্তগামী সূর্য্যের লাল ও সোনালী আভা এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। দূরে পীরপাঞ্জালের রজত-শুভ্র কিরীট শোভিত শীর্ষে অস্তগামী নিষ্প্রভ সূর্য্য যেন গলিত স্বর্ণের পরশ বুলিয়ে দেয়, আর পশ্চিমের আকাশ বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত হোয়ে ওঠে। কোন অসীম শক্তিমান অদৃশ্য শিল্পী কুশলী তুলিতে নীল আকাশের পটে অবিরত এঁকে চলে অপূর্ব্ব বর্ণের সমন্বয়ে নানা দৃশ্য, আর তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় ডালের নিথর নির্ম্মল জলের মুকুরে। ডালের একধারের সরল পপলারের দীর্ঘ ছায়া, অন্যধারের হরমুখ ও শঙ্করাচারিয়া পর্ব্বতের

বিরাট বপুর ধ্যানগম্ভীর প্রতিচ্ছবি সে সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর কোরে তোলে ; প্রদোষের স্বল্পালোক কল্পলোকের সৃষ্টি করে ডালের বুকে। নীচে গভীর জল, ওপরে অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি—পাহাড়, ঝর্ণা, পপলার, পদ্ম—মাধুর্য্য এই বিরাট সৌন্দর্য্যের মাঝেই বুঝি যোগী বিবেকানন্দ মায়ের অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়েছিলেন। প্রেমিক, কবি, ভাবুক এমন কি ঘোর বিষয়ীও এর মধ্যে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ পাবেন। আরও কিছুদিন আগে পূর্ণিমার রাত্রে অথবা জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায়—যখন চাঁদের মিষ্টি আলোয় সারা পরিবেশটী ঘিরে সৃষ্টি করে এক মায়ালোক, আকাশের অগণিত তারা জলের ছোট ছোট ঢেউ এ অসংখ্য মাণিকের মত ঝকমক করে—সেই অপরূপ অপরিসীম সৌন্দর্য্য লীলার মধ্যে অনায়াসে অনুভব করা যায় বিশ্বস্রষ্টার অসীম শক্তির আভাষ। এর সঙ্গে যোগ দিত অজস্র পদ্মের শোভা ও সৌরভ। আমরা শুধু পদ্মর পাতাগুলি দেখেছিলাম কিন্তু তেমনি পদ্মের শোভার বিনিময়ে পেয়েছিলাম পীরপঞ্জলের তুষারশুভ্র শিখরের সৌন্দর্য্য। অন্ধকারের আবছায়ায় চোল্লাম 'চারচেনার' অথবা 'রূপালঙ্কার' দিকে। 'সোণা-লঙ্কা'র মতই এটী আর একটী ছোট দ্বীপ। এর ও পরে চারধারে আছে চারটী বড় বড় চেনার গাছ, তাই এর চলতি নাম 'চারচেনার'। সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন আর কবুতরখানা ও চশমাসাহী বাগান যাওয়া সম্ভব হোল না। পদ্মপাতার বনের ভেতর দিয়ে শীকারা এল গাগরীবলে। এখানে আর একটী নতুন প্রমোদ উদ্যান তৈরী হোয়েছে বর্ত্তমান সরকারের আমলে ; এর নাম করণ হোয়েছে নেহেরু পার্ক। আসলে এটী সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৌকা চালনা শিক্ষার কেন্দ্র। এর সামনের অংশটী একটী ছোট দ্বীপ, তার পেছনে একটী খালে নৌকাগুলি রাখা হয়। এই খালটীর ওপর দোতলা বাড়ীতে শিক্ষার্থীদের বেশ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা, নৌকার সাজ সরঞ্জাম রাখার এবং আহারের বন্দোবস্ত আছে। জলে নৌকার বাইচ এখানের একটি দ্রষ্টব্যের মধ্যে। নৌকা রাখার খালটির অপর পারেও বেশ সমতল অনেকখানি জমি। হ্রদের জলের দিকের দ্বীপটিই সযত্ন রক্ষিত। সমতল দ্বীপটি সবুজ ঘাসে ভরা ; মাঝে রকমারী রংদার ফুলের কেয়ারী আর বাঁধান পায়ে চলা পথ, জলের ধারে রেলিং দেওয়া ; মাঝে মাঝে বসবার বেঞ্চ। রাত্রে এর শোভা দ্বিগুণিত হয় যখন উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে এই ছোট সাজান দ্বীপটি এবং তার বুকের বিচিত্র বর্ণের আলোর মালাগুলি প্রতিবিম্বিত হয় চারপাশের গভীর কালো জলের আয়নায়। বহু বিদেশী এবং কাশ্মীরবাসী সন্ধ্যায় ডালের বুকে শঙ্করাচারিয়ার পাদমূলে আধুনিক রূপ সজ্জায় সজ্জিত এই নুতন দ্বীপে বেড়াতে আসেন। এমন কি বোর্খা পরিহিতা কাশ্মীর বধূদেরও এখানে বেড়াতে দেখলাম। দ্বীপের মাঝে বিশ্রামের জন্যে একটী মণ্ডপ আছে। সহরের অন্যান্য আলোগুলি ক্ষীণপ্রভ হোলেও নেহেরু-পার্কের আলোগুলি বেশ উজ্জ্বল। কাশ্মীরে 'নেহেরু' অনেক ; এমন কি আলি নেহেরু, মহম্মদ নেহেরু নামও সুপ্রচলিত ; তবে এই নেহেরু পার্ক জহরলাল নেহেরুর সম্মানার্থই সৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এর সামনেই খালের অপর তীরে করণসিং বুলেভার্ড-রাস্তা। এই রাস্তা থেকে ডালের খালগুলিতে নামা ওঠার জন্যে আগে ছিল কাঠের খোলা সিঁড়ি, এখন বেশ পাকাপোক্ত পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ি তৈরী হোয়েছে এবং আরও কতকগুলি হোচ্ছে দেখলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হোয়ে উঠতে আমরা নৌগৃহে ফিরবার জন্যে শীকারায় উঠলাম। অন্ধকার সেদিন প্রায় সূচী-ভেদ্য, খালি ভয় হচ্ছিল হয়ত বা অন্য কোন শীকারা বা বড় নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খাব, কারণ রাত্রে কেউই আলো নিয়ে নৌকায় যাতায়াত করে না। শীকারা এত হালকা এবং জল থেকে এর মাঝখানের উচ্চতা এত কম (বোধ হয় ছ'শাত ইঞ্চি) যে একটু ধাক্কা খেলেই সেই শীতের রাতে শীতল জলে নৌকাডুবি অবশ্যম্ভাবী। গায়ে শীতবস্ত্রের বাহুল্যও এতবেশী যে কোন রকমে জলে পোড়লে তাদের ভারেই আর ভাসার সম্ভাবনা থাকবেনা।

এর পর একদিন টুরিষ্ট বাসে গিয়েছিলাম এইসব বাগানে। তার গতিপথে প্রথমেই পড়ে চসমাসাহী তারপর নিশাদ, শালিমার ও হারওয়ান। ডালের তার ধোরেই এ রাস্তা গেছে। দিনে কয়েকবারই এ যাত্রার বাস ছাড়ে। প্রথমেই বাস যায় এ যাত্রার শেষ প্রান্ত হারওয়ানে। এখানে পাহাড়ের কোলে একটী বিরাট বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী হয়েছে—এর আয়তন প্রায় ১০০০ গজ। পাহাড়ের গা থেকে আসছে হারওয়ান নালা, তার জল এবং প্রায় ২০০ বর্গমাইল ঢালু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এই হ্রদে জল ধরা হয়। ঐ এলাকায় কোন লোকজন জীবজন্তু যেতে দেওয়া হয় না ; জল কলুষিত হবার ভয়ে। গ্রীষ্মে এ জলাধারের জলের গভীরতা হয় প্রায় ৩০ ফিট, শীতে প্রায় শুকিয়ে যায়। সারা শ্রীনগর ও সহরতলীর পানীয় জল সরবরাহ হয় এই হ্রদ থেকে। বাঁধটার ওপর দর্শকরা যেতে পারেন। বাঁধের কোলেই একটী বাগান ; বৈশিষ্ট্য কিছু চোখে পোড়ল না। বাগানটীর বাইরে অনেকগুলি ছেলে বুড়ো কাশ্মীরী মধুচক্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—কারু হাতে ছিল মধু ভরা শিশি। মধুর বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য স্বরূপ এরা চক্র শুদ্ধ বিক্রী করে। পহলগামে এবং সরকারী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ও সরকারী ব্যবসাকেন্দ্রে (State Emporium) কাশ্মীরী মধু টীনে এবং চাকশুদ্ধ বিক্রী হয়। দাম প্রতি পাউণ্ড ৩৲ টাকা, বাজারে ২।২৷৷০ টাকা। জাফরাণ ক্ষেতের আশে পাশের অঞ্চলের মধু জাফরানী রঙের, আর উলার অঞ্চলের মধু চিনির ঘন রসের মত বর্ণহীন। মধুচক্রগুলিও দেখতে সাদা, বাঙ্গালী মৌচাকের মত কালো নয়। বাংলার মধুর মত গন্ধও নেই কাশ্মীরী মধুতে—তাই বিদেশের বাজারে এর কদর আছে। মধু-মক্ষিকা পালন এখানের অনেকের বৃত্তি। বনজঙ্গলে বুনো মৌমাছির তৈরী চাক ভেঙ্গে এরা মধু সংগ্রহ করে না : বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাঠের বাড়ীতে পোষ মানায় কর্ম্মক্ষম ভদ্র মৌমাছিদের। তারা চতুর্দ্দিকের প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে রস সঞ্চয় কোরে তাকে ঘনীভূত কোরে মধুতে পরিণত করে। পালক এদের হত্যা না কোরে মধু সংগ্রহ কোরে, চাকটী আবার ফিরিয়ে দেয় বাক্সের মধ্যে পরবর্ত্তী সঞ্চয়ের জন্যে।

এখান থেকে ফেরার পথে একটু এসেই বাস থামলো ট্রাউট মাছের পালন কেন্দ্রে। এটীর ব্যবস্থা, আয়তন, মাছের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য

সব দিক দিয়েই আচ্ছাবলের মৎস্য পালন কেন্দ্র থেকে নিকৃষ্টতর মনে হোল। দর্শক দেখলেই একজন কুম্ভকার তার চক্রটী নিয়ে এর প্রবেশ পথে বোসে একতাল মাটী নিয়ে নানা রকমের জিনিষ গোড়াতে সুরু করে কিছু বখশিসের আশায়। বিদেশী অথবা স্বদেশী সাহেবেরা অবাক হোয়ে দেখেন—কেমন কোরে একতাল কাদা থেকে মুহূর্ত্তে রূপ নিচ্ছে বিভিন্ন বস্তু একই চক্র থেকে। এখান থেকে শালামার নিশাদ থেকে শ্রীনগরে ফিরবার পথে বাস ডালের তীর ছেড়ে পাশের একটা পাহাড় চড়াই করতে লাগলো, 'চসমা সাহী'তে পৌছাবার জন্যে। চড়াইএ পথে ডাইনে একটু দূরে পাহাড়ের ওপর চোখে পোড়ল অতীতকালের অট্টালিকার কিছু ভগ্নাবশেষ—এরই নাম পরীমহল। পরীর দল কখনও এখানে পাখা মেলে আসতো কিনা জানি না; তবে সৌধটীর পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ যে পরীদের পক্ষেও লোভনীয়তা বলা যায়।—আজ অবশ্য শুধু পোড়ে আছে অতীত ঐশ্বর্য্যের কয়েক খানা কঙ্কাল করাল কালের অট্টহাসির সাক্ষ্যস্বরূপ।

সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাশিকো পিতৃপুরুষদের অনুসরণে হ্রদের ধারে পাহাড়ের কোলে নির্ম্মাণ করান এই পরীমহল, জ্যোতিষ বিদ্যার গবেষণার জন্যে এবং গ্রন্থাগার হিসেবে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ছিল এখানের আলোচ্য, তাই হয়ত জনসমাজে এ পরিচিত হোয়েছে পরীমহল নামে। দারাশিকোর গুরু মুল্লাশা'র তত্ত্বাবধানে এখানে গবেষণা চোলত। কেউ কেউ বলেন—পূর্ব্বে এখানে একটী ঝরণা ছিল, কালক্রমে সেটী যায় শুকিয়ে; তার ফলে এ জায়গাটা বসবাসের অযোগ্য হোয়ে ক্রমশঃ বর্ত্তমানের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোয়েছে। এখানে সাধারণ দর্শকেরা আজ এমনি যেতে পারে না; বনবিভাগের অনুমতি নিতে হয়। এর চারটী চত্বরই আজ বনজঙ্গল ও বিষধর সর্প সমাকুল, কাজেই যাওয়া নিরাপদ নয়। এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটী ঘিরে তাই কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মনে গড়ে উঠেছে নানা অলোকিক কাহিনী, —ভূত, দানা, দৈত্য এবং হুরীপরীর বাসভূমি নাকি আজ এই পরিত্যক্ত পরীমহল। 'আহত-গাজী', থিড গ্রাম এবং চশমাসাহী এই তিনদিক থেকে এখানে যাবার তিনটী পায়ে চলা দুর্গম পথ আছে—কিন্তু দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ এটী এত নগণ্য যে কেউ কষ্ট স্বীকার কোরে এখানে যায় না।

বাস ডালের ধারের প্রধান রাস্তা থেকে দেড় মাইল এসে থামলো চশমাসাহী বাগানের সামনে। ৮০০০ ফিট উঁচু জেবানওয়ান পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট ছবির মত বাগানটী। মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট। এর নির্ম্মাতা জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজাহান (১৬৩২-৩৩ খৃঃ অঃ)। চশমাসাহীর পরিকল্পনায় কিছু নূতনত্ব আছে; প্রথম প্রবেশপথ অনেকখানি উঁচুতে, কাজেই বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, আর সিঁড়ির দুধারে সামনের দেওয়াল পর্য্যন্ত থাকে থাকে উঠে গেছে নানা গাছ ও ফুল। ছোট প্রধান ফটকটী পেরিয়ে পর পর তিনটী চত্বরে বাগান; মাঝ দিয়ে বয়ে আসছে ঝরণার জল। নিশাদবাগের ছোট্ট সংস্করণের মতই এক স্তরথেকে অন্য স্তরে জলধারা ছোট প্রপাতের মত পোড়ছে, মাঝে মাঝে ফোয়ারা। পাহাড়ের গায়ে শেষ চত্বরটীর মাঝে একটী মার্ব্বেল ঘেরা কুণ্ডে অবিরাম জলধারা উৎসারিত হোয়ে বাগানের মাঝ দিয়ে বোয়ে যাচ্ছে। এই জলধারাটীর এই অঞ্চলে অত্যন্ত সুনাম। সোনার চেয়েও মূল্যবান নাকি এর জল। সব রকম বদহজম অম্বল অবিলম্বে আরাম করে এই প্রাকৃতিক রসায়ন। সহরের অনেকেই এখান থেকে পানীয় জল নিয়ে যান, আর যাত্রীরা এর গুণ শুনে শীতেও সুস্বাদু শীতল জল পেট-ভরে পান কোরলেন। দ্বিতীয় চত্বরে একটী কাঠের বারদোয়ারী আছে; সেখান থেকে ওপরে পাহাড়ের কোলে ফোয়ারা সাজান ফুল বাগান, আর নীচে নিথর কালো ডালের জল বড় সুন্দর দেখায়। এই বারদোয়ারীর মাঝ দিয়ে জলের নালাটী গিয়ে বেশ উঁচু থেকে প্রথম চত্বরটীতে পোড়ছে নানাভাবে খোদাই করা পাথরের ওপর দিয়ে। এখানে কোন দোকানপাট নাই, তাই দর্শকেরা নিজেদের চা খাবার সঙ্গে এনে বাগানটীতে খাওয়া দাওয়া করেন। চশমাসাহী শ্রীনগরের সব চেয়ে কাছে (৫½ মাইল) সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাগান, তাই এখানে যাত্রী ও প্রেমিকদের ভীড় একটু বেশী। এখানেই সন্ধ্যা হোল—এখান থেকে ডালের ওপর সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য ভিন্নরকমের। ডালের বুকে বোসে মনে হয় আমি বুঝি এর বিরাটত্বের মধ্যে হারিয়ে গেছি, কিন্তু এখান থেকে দ্রষ্টার মত দূর থেকে স্রষ্টার সে সৌন্দর্য্যলীলা—নীলের বুকে নানা রংএর অপূর্ব্ব আতসবাজী। সেদিন প্রকৃতির এই শান্ত শ্যামল পরিবেশের মধ্যে দেখলাম রুদ্রের তাণ্ডবলীলা। পাশের পাহাড়টীর বুকে কি ভাবে আগুন লেগেছে। দিনের আলোয় দেখেছিলাম শুধু ধোয়ার কুণ্ডলী, সন্ধ্যায় দেখলাম অন্ধকারের কালোবুকে দাবাগ্নির লেলিহান লীলা-জিহ্বার বিরাট বিস্তার। সন্ধ্যার কালো আকাশখানা সেখানে লাল হোয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে গাছ ফাটার আওয়াজ আসছে। পাহাড়ের ওপর এই দাবাগ্নি আপনিই জ্বলে; আপনিই নেবে; কারণ সেই খাড়া পাহাড়ে যান্ত্রিক যানবাহন যাবে না, জলও নাই। অনেক সময় আশেপাশের জঙ্গল কেটে এর বিস্তার বন্ধ কোরতে হয়।

অন্ততঃ মাসখানেক থাকলে কাশ্মীরের সব দ্রষ্টব্য একরকম দেখা যায়। বিভিন্ন ঋতুতে এর বিভিন্নরূপ তা পূর্ব্বেই বোলেছি। কাহিনী বেশ দীর্ঘ হোয়েছে, হয়ত ইতিমধ্যেই অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘোটেছে। প্রধান দ্রষ্টব্যগুলিও বলা শেষ হোয়েছে, কাজেই এবার সমাপ্তির ছেদ টানতে হবে। তার পূর্ব্বে কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজনৈতিক গোলযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমার কি মনে হয় পাঠকদের শুধু সেটা জানিয়ে দিতে চাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পরিচালক—উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যয়ন

ছেলেবেলা থেকে অভিনিবেশে অভ্যস্ত না হোলে, উত্তরকালে কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করা যায় না। এটীও সাধনা-সাপেক্ষ। অনাবিষ্টতা দোষ অত্যন্ত অনিষ্টজনক। বাড়ীতে পড়্বার সময় একাগ্র মনে অধ্যয়ন করা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উপদেশ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাল্যকাল থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত একটানা লেখাপড়া না কর্লে কোন রকমেই মানুষ হওয়া যায় না। জ্ঞান আহরণের জন্যই বিদ্যার্জ্জন—বিদ্যার্জ্জন না হোলে সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে আস্তে হবে, তখন অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে মন ভেঙে পড়্বে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে দুশ্চিন্তায় অকালে প্রাণত্যাগ কর্তে হবে। তাই এ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সংসারে মূর্খ হয়ে থাকার চেয়ে বিড়ম্বনা ভোগ আর কিছুতে নেই। বিদ্বান হবো—যার মনে এরকম দৃঢ় ইচ্ছা আছে, তার পক্ষে শক্তি সঞ্চয় হওয়া সহজসাধ্য। তোমাদের পবিত্র সহচর আর পরম বন্ধু হচ্ছে পুস্তক। গুরুজনের ভয়ে পুস্তকের দিকে দৃষ্টিপাত করা কিম্বা মুখে আবৃত্তি করা, অথচ অন্যদিকে মন রাখা, মনে মনে খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আন্দোলন করা একেবারে গর্হিত—এভাবে দিনরাত পুস্তক নিয়ে থাক্লেও কোনদিন লেখাপড়া হ'তে পারে না, অভিভাবকের চোখে ধূলা দেওয়া যায় মাত্র। একবার কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হোলে হতাশ হয়ে তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। একবারে না হয়, দুইবারে, দুইবারে না হয় তিনবারে চেষ্টা কর্তে কর্তে কৃতকার্য্য হবোই হবো—এই রকম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ইচ্ছাশক্তির সাধনা করা উচিত তা'তে তোমাদের মনের ক্ষমতা বাড়্বে। লেখাপড়ায় যারা উদাসীন, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে সব ছেলে-মেয়ে সারাবছর আমোদ-প্রমোদ করে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে দিনরাত পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকে তাদের শরীর ও মন দুইই ভেঙে যায় আর, পরীক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হবার সময় অসুখে এরূপ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে যে, পরীক্ষা দেবার মত সামর্থ্য আর থাকে না, ফলে লেখাপড়ায় বাধা বিঘ্ন ঘটে। সময় তো আর অপেক্ষা করে না, বয়স হয়ে গেলে তখ অনুতপ্ত হোতে হবে।

অধ্যয়ন বিষয়ে তোমাদের পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম স্মর রাখা কর্ত্তব্য :—

(১) দিনের ভেতর কয়ঘণ্টা পড়্বে, তা আগে থেকে স্থির কর্বে স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তির ওপর এই বিষয়টী নির্ভর করে। অন্ততঃ ঘণ্টা নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করা দরকার।

(২) পড়্বার সময়ে পরস্পর কোন কথা বল্বে না। যা কি বল্বার বা জিজ্ঞাসা কর্বার থাকে, তা পড়া শেষ হয়ে গেলে বল্বে জিজ্ঞাসা কর্বে।

(৩) যা পড়্বে, তা সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত কর্বার চেষ্টা কর্বে। বুঝে মুখস্থ করায় কোন ফল নেই। পড়্বার সময়ে অন্য কথা ভাব্ না বা অন্য দিকে মন দেবে না।

(৪) কোন স্থান দুরূহ বোধ হোলে, সে বিষয়ে কিছুকাল চি কর্বে। এতে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। পাঠ কঠিন হোলে ভয় ক না বা পড়া ছেড়ে উঠো না ; বরং যত কঠিন হবে ততই তা'তে বে মনোযোগ দেবে।

(৫) মুখস্থ কর্বার বিষয়গুলি শুদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে বার বার প কর্বে।

(৬) নূতন অধ্যায় বা বিষয় পাঠ আরম্ভ কর্বার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পঠি অধ্যায়ের বা বিষয়ের একবার পুনরালোচনা কর্বে। এ'তে পঠিত বি উত্তমরূপে স্মরণে থাক্বে। যে বিষয় সহজে স্মরণ থাকে না, তা একবার লিখ্লেই বেশ মনে থাক্বে।

(৭) পঠিত বিষয় নিয়ে সময়ে সময়ে সহপাঠীদের সঙ্গে কথোপক কর্বে। এ'তে বাক্‌পটুতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(৮) একই বিষয় অনেকক্ষণ অধ্যয়ন কর্লে মন ক্লান্ত হয়ে প এরকম অবস্থায় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাই যুক্তিসঙ্গত।

(৯) চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে পঠিত বিষয় নিয়ে সময়ে সময়ে কিছু কিছু লিখ্‌বে। প্রবন্ধ রচনা করা খুব দরকার।

ধর, একটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে করা হোলো—

'দাক্ষিণাত্য ঔরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্র, গৌরবের সমাধিক্ষেত্রও বটে—বুঝিয়ে বলো—' এ প্রশ্নটী তোমাদের চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তির আশা করে। তোমরা জানো ঔরঙ্গজেবের মসনদে বস্‌বার সময় থেকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে দাক্ষিণাত্য নিয়ে কিভাবে বিব্রত হয়ে পড়্‌তে হয়েছিল—শিবাজীর অভ্যুদয়ের ফলে তিনি কিভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর উদগ্রকূটরাজনীতি দাক্ষিণাত্যের ওপর প্রয়োগ করেও তিনি তাকে করায়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি যে সব মস্তিষ্কপ্রসূত কলাকৌশল ও জাল বিস্তার করে ছিলেন, তা তাঁর চরিত্রের ওপর কলঙ্ক কালিমাই লেপন করেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে থেকে ও নিষ্ফল হাহাকারের মধ্যে কালাতিপাত করেছিলেন। দিল্লীর মসনদে বসে কোনদিন নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর জীবনের আয়ুসূর্য্য দাক্ষিণাত্যের পথে অস্ত গিয়েছিল। তোমরা মনোযোগের সঙ্গে যদি ইতিহাস পড়ে থাকো, তাহলে উত্তর দেওয়া সহজ হবে। কারণগুলি একে একে একত্র করে বিশ্লেষণ করবে, আর বিশ্লেষণের পশ্চাতে থাক্‌বে তোমাদের সমালোচনা-দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব ও যুক্তি, তাহলেই তোমরা সাফল্যগৌরব লাভ করতে পার্‌বে। প্রবন্ধ রচনায়ও তোমাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে।

ভালো করে বিষয়বস্তু গুছিয়ে বল্‌বো আর লিখ্‌বো, এই প্রতিজ্ঞা তোমরা প্রতিদিন করবে। প্রত্যেকটী দিন যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া করে কাটাতে পারো, তার জন্যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে। পূর্ব্বেই ইচ্ছাশক্তি কিভাবে অর্জ্জন করা যায় সে সম্বন্ধে তোমাদের কাছে বিস্তৃতভাবে বলেছি—এখন সেই শক্তি কোন্ কোন্ কাজে ভালো করে লাগাতে হবে সেদিকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালী জীবনে ও বাংলার ভাবজীবনে গৌরব অধ্যায় রচনা করে গেছে। সেই বিগত শতাব্দীর প্রাণপুরুষগণের জীবনযাত্রা ও বাংলার সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তোমাদের নিগূঢ় পরিচয় হওয়া দরকার। এজন্য তোমরা বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীর ভাবধারায় অবগাহন করবে, তা'তে তোমরা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবী নূতন বাংলার গৌরবময় ইতিহাসের সৃষ্টি করতে পারবে।

কোন রাজনৈতিক চক্রজালে পড়ে ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি নিয়ে হঠাৎ দেশের ও দশের ক্ষতিকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসোনা। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে—দেশকে গড়্‌বার ভার তোমাদের ওপরই পড়্‌বে। তাই এখন থেকে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী হও। চাকুরির বাজারে সুবিধে নেই, ব্যবসায় মন্দা পড়েছে, চাষবাসে পণ্ডশ্রম, এসব কথার মধ্যে কাণ দিয়ে সময় নষ্ট করো না। তোমরা যদি প্রস্তুত হও, দেশও নিশ্চয়ই শুধু প্রস্তুত হবে না, বহু দূর এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন বা জনসাধারণকে পরিচালনা করেছেন, তাঁরা কেউই নিরক্ষর ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী মানবিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শুধু তাঁরা স্বার্থত্যাগ করেন নি, সর্ব্বস্বদান করে গেছেন। তাঁরা সব কাজেই আন্তরিকতা দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা নামের কাঙাল ছিলেন না—তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। যারা শুধু নামের কাঙাল, তাদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না। আশা করি তোমরা এবিষয়ে ভেবে দেখ্‌বে, আর মানুষের মত মানুষ হবার জন্যে প্রাণমন দিয়ে লেখাপড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

এলো মধুমাস

শ্রীনোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

১

মাঘের রাত্রি হ'ল অবসান
ফাল্গুন এলো শীর্ণ ধরায়,
শালফুল আর আমের মুকুল
সৌরভে তারি বার্ত্তা ছড়ায়।
শীত নেই আর নেই হিমবাস
নীল চোখে চায় সুদূর আকাশ
বিরসপত্র শাখা ভরে ওঠে
চিকণ সবুজ পুষ্প পাতায়,
মাঘের অন্তে এলো ফাল্গুন
দিল সমাচার দখিণ বায়।

২

পূবদিগন্তে হাসে রাঙা রবি
বনবনান্ত জ্যোতিষ্মান,
শিমুল, পলাশ, ফাগ কুঙ্কুমে
দোল খেলে সারাদিবসমান।
বনে বনে জাগে মধুর কূজন,
ফুলে ফুলে জাগে কল গুঞ্জন,
আকাশে বাতাসে বাহিরে ভিতরে
উছলে হর্ষ—মিলন গান,
পূবদিগন্তে সুরু উৎসব,
বনবনান্ত জ্যোতিষ্মান।

৩

কোকিল কুজিছে পাতার আড়ালে
'পিউ-কাঁহা' ডাকে করুণ সুর,
গাছ হতে গাছে ডেকে ডেকে ফেরে
কভু কাছাকাছি, কভু বা দূর।
বাতাসে ভাসিছে কত সৌরভ,
কত হাসি গান, মৃদু কলরব,
বিশ্ব নিখিল আজিকে সহসা
লক্ষ পুলকে হল বিধূর,
কোকিল কুজিছে পাতার আড়ালে
কভু কাছাকাছি, কভু বা দূর।

৪

শীতের অন্তে এলো বসন্ত,
এত চাপল্য তাই ধরার;
দিগঙ্গনার তাই এ সজ্জা,
এত কৌশল মন-হরার।
সারাটি ভুবনে তাই অবিরাম
এত সুর, রঙ্, নয়নাভিরাম!
পুলক ছন্দে আকুল বিবশ
স্বপন বিভল মন সবার।
এলো মধুমাস, তাই ধরণীর
সাধ জাগিয়াছে নবীন হবার॥

—

তথাগতের পাদুকা

শ্রীহরিপদ গুহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুয়াশা তখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমি আমার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলুম। চারদিক যেন ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। মধ্যে মধ্যে এক আধ জন মানুষের দেখা পাচ্ছিলুম। তাদের কাছে পথের কথা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছে—সোজা যাও।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ক্রেভিং বিহারে এসে উপস্থিত হলুম। মুণ্ডিতমস্তক একজন লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি তাঁকে প্রণিপাত করে রাত্রের মত একটু আশ্রয় ভিক্ষা করলুম। তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আসছ? এখানে কি প্রয়োজন? কোথা যাবে?

আমি সবিনয়ে বললুম—বঙ্গদেশ থেকে আসছি, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি। ইচ্ছা আছে যদি মহাত্মা অতীশের সঙ্গে দেখা হয়। তিব্বত দেখে ফিরে যাব। আমার কথা শুনে লামা কিছুক্ষণ কি ভাব্‌লেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—আমার সঙ্গে এসো।

স্বল্পালোকিত কয়েকটা কক্ষ পার হয়ে একটা বড় ঘরের মধ্যে এসে আমরা উপস্থিত হলুম। সেখানে আরও দশ বারজন লামা বসেছিলেন। তিনি তাদের কি বল্‌লেন বুঝ্‌তে পারলুম না। কিন্তু সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি পড়্‌ল আমার উপরে। তাঁরা আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে তাঁকে কি বল্‌লেন—তিনি আমাকে পাশের একটি ছোট কক্ষে নিয়ে এলেন। একখানি কম্বল পাতাই ছিল, আমাকে সেখানে বসতে ইঙ্গিত করে তিনি বাইরে চলে গেলেন। বেশী শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কম্বলের ওপর আরাম করে বসে, পা দুটোকে লম্বা করে ছড়িয়ে দিলুম।

একটু পরেই সেই লামা ঘরে একটা প্রদীপ রেখে চলে গেলেন। সেই আলোকে দেখলুম—ঘরে দু'খানি কম্বল ছাড়া আর কোন জিনিষ নেই। ঘরখানি খুবই ছোট, একজন লোক থাক্‌বার মতই ঘর।

একটু পরেই সেই লামা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটা কাঠের বাটি। বাটিটা তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—পান কর।

আমি হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিয়ে পান করতে লাগলুম। তপ্ত পানীয় পান করে শরীরের অবসন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেল। পূর্ব্বেই এই নোনতা পানীয়ের গুণের কথা বলেছি। পানান্তে একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। হঠাৎ সেই লামার ডাকে ঘুম ভাঙল। লামা একখানি কাঠের থালায় কয়েকখানি রুটি ও একটু তরকারী রেখে আমায় খেতে বলে গেলেন। খিদে খুব পেয়েছিল, গো-গ্রাসে খেতে লাগলুম। সারাদিন

অনাহারের পর ভোজনটা খুব তৃপ্তির সঙ্গেই হয়েছিল। থালাখানা ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিলুম একধারে।

তারপর সেই ঘরে ফিরে এসে শোবার যোগাড় করলুম। কম্বল মুড়ি দিয়ে 'পদ্মনাভ' স্মরণ করে শুয়ে পড়লুম।

এক ঘুমে রাত ভোর হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলুম। এই মঠের সকলেই আমাকে কেমন একটু সন্দেহের চোখে দেখলেন। এখানকার কিছুই আমাকে দেখবার সুযোগ দিলেন না। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা সুরু করলুম।

চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। আমি খুব ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলুম। আজ শীতটা একটু কম। কিছুদূর যাবার পর দু'একজন করে লোকের মুখ দেখতে পেলুম। বুঝলুম—নিকটে কোন গ্রাম আছে। কিছু কিছু কুটীর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। দেখলুম সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত। চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেমন করেই হোক্ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিব্বতের মঠে পৌছুতে হবে।

সেদিন রোদ উঠল না, চারদিকই বেশ পরিষ্কার। নিকটে একটা ঝরণা ছিল, আমি অঞ্জলি ভরে জল পান করলুম। আমি একাই চলেছি, পথে জনমানব নেই। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। এই নির্জ্জনতার মধ্যে মন যেন কেমন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা মঠের সামনে এসে উপস্থিত হলুম। শুনলুম এই মঠের নাম বেজ্জুরী মঠ। তিব্বতে এইটিই নাকি সব চেয়ে বড় মঠ।

উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করতেই একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। আশ্রয় প্রার্থনা করবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে সাদরে আহ্বান করে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তিনি নিজেও আমার পাশে বসলেন। একটু বিশ্রামের পর তিনি আমাকে কাঠের বাটি করে এক বাটি গরম দুধ এনে পান করতে দিলেন। দুধ পান করে আমার শরীরের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেল।

আমাকে বিশ্রাম করতে বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন। আমার তখন বিশ্রামের আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; বেশ সুস্থই ছিলুম। সেই সময়ে সন্ন্যাসী আর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। উভয়ে কম্বলে উপবেশন করলেন। তারপর আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন।

আমি ঐ বৃদ্ধকে প্রণাম করে একধারে সরে বসলুম। বৃদ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে একবার আমাকে ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আসছ?

আমি উত্তর দিলুম—বঙ্গ দেশ থেকে।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—প্রয়োজন?

আমি বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলুম—প্রয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মহাত্মা দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা ছিল, তিনি আমার স্ব-গ্রামবাসী। আমার কথায় বৃদ্ধ দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ব্যাপারটা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলেন—সেখানে তোমার কে কে আছেন? এত দূর দেশে একা এলে?

মহামারীতে কেমন করে আমি সর্ব্বহারা হয়েছি, সংক্ষেপে তা বললুম। ঘরে আর মন টিকল না, তাই একদিন বেরিয়ে পড়লুম পথের ডাকে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—বিয়ে করেছ?

বললুম—না।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত তিনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন—যাও, দেশে ফিরে যাও। বিয়ে করে সংসারী হও। আবার সব হবে।

আমি নিরুত্তর।

তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—কথা দাও, তুমি সংসারী হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—আপনার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করব। খুসীতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—এখানে কিছুদিন থেকে সব দেখে শুনে নাও। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করে সংসারী হও। বেশ খুসী-ভরা মন নিয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন।

রাত্রে বেশ শীত করতে লাগল। আমি একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে একাকী চুপ করে বসে রইলুম। একজন সন্ন্যাসী একবার ঘরে একটি প্রদীপ রেখে গেছে, তারপর অনেকক্ষণ আর কারো দেখা নেই। আপনমনে কত কি

চিন্তা করতে লাগলুম। হঠাৎ সমবেতকণ্ঠে স্তোত্র পাঠের মত একটা ধ্বনি শুনতে পেলুম। কেমন তন্ময় হয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ পরে শব্দটা ক্রমে থেমে গেল। আমি ভগবান তথাগতের চরণ উদ্দেশে ভক্তিভরে মাথা নত করলুম। প্রণাম শেষ করে মাথা তুলতেই দেখি, সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্মিতমুখে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। হেসে বললেন—অনেকক্ষণ একা থাকতে হল। আমরা সব গম্ভীরায় ছিলুম। কাল দিবালোকে সব দেখাবো তোমায়। তারপর তিনি চলে গেলেন।

চারিদিক নীরব। একা বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। অনেকক্ষণ হয় ত ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ সন্ন্যাসীর ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তিনি বললেন—চলো, খেতে চলো।

আমি উঠে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললুম। একটা বেশ বড় লম্বা ঘরে খেতে দেওয়া হয়েছে। শখানেক সন্ন্যাসী আসনে বসে গেছেন। দু'খানি আসন শূন্য ছিল, আমরা দু'জনে গিয়ে সেখানে বসে পড়লুম।

আহারের পর হাতমুখ ধুয়ে আমার ঘরে চলে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে সেই সন্ন্যাসী এসে আমার পাশে বসলেন। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমাকে কপাট বন্ধ করে শুতে বলে গেলেন। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম পদ্মসম্ভব। আর যিনি আমাকে দুধ খাইয়েছিলেন তাঁর নাম মণিবজ্র। এই নাম দুটো আমার কাছে ভারী মিষ্টি লাগল।

তখন শেষ রাত্রি। অনুমান রাত চারটা বা সাড়ে চারটা হবে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমবেত কণ্ঠের একটা মিষ্ট স্তোত্রধ্বনি শুনতে পেলুম। বড় ভাল লাগছিল। আমি উঠে পড়লুম।

চারদিক ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন।

নিকটে কাউকে দেখতে পেলুম না। একটা বড় ঘটিতে জল ছিল, আমি তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এলুম। একটু পরেই মণিবজ্র ঘরে প্রবেশ করলেন। মৃদু হেসে বললেন—রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি তো?

আমি বললুম—না।

তিনি স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—চলো, বাইরে চলো, তোমাকে সব দেখিয়ে আনি।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললুম। বাইরে এসে তিনি আমাকে একপাশে খানতিনেক ঘর দেখিয়ে বললেন—এতে আমরা থাকি। ওপাশে দুখানি ঘর দেখিয়ে বললেন—ঐ দু'খানি পাক ও ভোজন ঘর।

ভোজন ঘরের পাশেই একটা সুড়ঙ্গের মত গহ্বর, সন্ন্যাসী সেই দিকে চললেন। নিকটে যেতেই দেখি একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও নীচে অবতরণ করলুম। আমি মনে করেছিলুম—নীচটা বোধ হয় খুব অন্ধকার হবে। কিন্তু নীচে নেমে দেখা গেল, সেরকম অন্ধকার নয়। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। মাঝের ঘরটাই সব চেয়ে বড়। তিনি আমাকে নিয়ে সেই বড় ঘরটিতে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে ভগবান তথাগতের কষ্টিপাথর নির্ম্মিত মর্ম্মরমূর্ত্তি। তিনি মঙ্গল হস্তে সকলকে অভয় দিচ্ছেন। তাঁর দু'পাশে দুখানি আসনে দু'জোড়া খড়ম রয়েছে। একজোড়া বড় সাধারণ কাষ্ঠ-পাদুকা, আর একজোড়া খুব ছোট, নানা রকম রত্ন খচিত। তার থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পাদুকার চারদিক ফুল দিয়ে সাজান। সামনে দীপ ও ধূপ জ্বলছে। সৌরভে ঘরটি আমোদিত। মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হয়। ভক্তিভরে শির আপনি নত হয়ে আসে ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণ উদ্দেশে।

এই ঘরের নাম গম্ভীরা। কয়েকজন সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। কি সৌম্য সুন্দর তাঁদের সে মূর্ত্তি। তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণিপাত করে মণিবজ্রের সঙ্গে বাইরে চলে এলুম।

অতি নির্জ্জন স্থান, কোথাও কোন শব্দ নেই। বাইরের অন্যান্য ঘরগুলির কপাট বন্ধ। আমি সেই দিকে চাইতেই মণিবজ্র বললেন—এগুলো অন্য সময়ে দেখাবো'খন, এখন উপরে চলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপরে উঠতে লাগলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলুম।

উপরে সন্ন্যাসীদের ঘরে গিয়ে বসলুম—তাঁরা গল্প করছিলেন।

আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলুম—শ্রীজ্ঞান অতীশ এখন কোথায় আছেন?

একজন সন্ন্যাসী অঙ্গুলি সঙ্কেতে আকাশ দেখিয়ে বললেন—স্বর্গে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

দীপঙ্করের মৃত্যুসংবাদ শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কাজেই আঘাতটা খুব লাগল। ধীরকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম—কতদিন হলো তিনি দেহ রেখেছেন?

সন্ন্যাসী বললেন—প্রায় তিন বৎসর হল। তাঁর চিতা-ভস্মের উপর একটি মঠ নির্ম্মিত হয়েছে। এ সংবাদ কি বঙ্গদেশে এখনো পৌঁছয় নি?

আমি জবাব দিলুম—না। আমি নালান্দা হয়ে আস্‌ছি, সেখানেও এ সংবাদ এখন পর্য্যন্ত কেউ জানে না। পূর্ব্বে এ সংবাদ পেলে এতদূর আমি এত ক্লেশ স্বীকার করে আসতুম না।

মণিবজ্র আমার অন্তর বেদনা বুঝতে পেরেই বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনিও অতীশের অনেক গুণ-কীর্ত্তন কর্‌লেন। তিনি যে মঠে ছিলেন তা' এখান থেকে অনেক দূরে, নইলে তিনি আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যেতেন সে কথাও বললেন।

এখানে দেখ্‌লুম—সন্ন্যাসীরা দিবানিদ্রা করেন না। সমস্ত দুপুরটা তাঁরা শাস্ত্রালোচনা করে কাটালেন।

বেলা শেষ হইতেই আলোচনা বন্ধ হলো। পদ্মসম্ভব পুঁথি বেঁধে রাখ্‌লেন। গম্ভীরায় তখন কয়েকটা বাতি জ্বলছিল। পদ্মসম্ভব আসনে বসে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপ-ধুনো দিলেন। একটা পবিত্র গন্ধে ঘরখানি ভরে গেল। রাত্রেও দেখ্‌লুম—রত্নখচিত সেই ছোট পাদুকা হতে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বেরিয়ে স্থানটা উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পদ্মসম্ভব কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর শাঁখে একটি ফুঁ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে স্তব আরম্ভ হল। স্তব শেষে সকলে অমিতাভের চরণ উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন। প্রণামান্তে একে একে সকলে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। গম্ভীরার দ্বার তালাবন্ধ করে পদ্মসম্ভব এলেন সকলের শেষে। চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ভারত ও সিংহলের ধর্ম্ম সম্বন্ধেই নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। পদ্মসম্ভব তিব্বতে থেকেও এতগুলি দেশের ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদই রাখতেন। ধ্যানযোগে জানা ছাড়া কি করে সম্ভব হতে পারে? আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

রাত্রে ঘুমঘোরে একটা স্বপ্ন দেখলুম—সেই ছোট্ট রত্নখচিত পাদুকা দুটি যেন আমার মাথার কাছে রয়েছে, আর তার থেকে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বেরিয়ে ঘরখানিকে আলোকিত করে তুলেছে। আমি একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। পাদুকা দুটি একবার স্পর্শ করবার জন্য আমার প্রবল বাসনা হলো। আমি ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিলুম। কিন্তু ধর্‌বার পূর্ব্বেই সে দুটি দূরে সরে গেল। আমারও জিদ্‌ চেপে বস্‌ল। আমি উঠে গেলুম, কিন্তু স্পর্শ কর্‌বার পূর্ব্বেই সে দুটি ভোজবাজীর মত উবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। একটা দারুণ নৈরাশ্যে আমি কিছুক্ষণ কেমন মুহ্যমান হয়ে রইলুম।

এখানে বেশ শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল। শুধু মাঝে মাঝে পাদুকা দুটির কথা মনে হলেই আমাকে কেমন চঞ্চল করে তুল্‌ত। একাকী বসে থাক্‌লেই পাদুকা দুটি আমার সাম্‌নে ফুটে উঠে কেমন জ্বলজ্বল করত। আমাকে প্রলুব্ধ করত।

সেদিন উষাকালীন প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা উপরে চলে গেলেন। পদ্মসম্ভব ও মণিবজ্র যে কক্ষে শবদেহ আছে সেই ঘরে প্রবেশ করে ভেতর হতে দ্বার বন্ধ করে দিলেন। আমি একাকী মন্দিরে বসে অমিতাভের সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলুম। আমি আর কিছু ভাবতে পার্‌লুম না। আসন থেকে ছোট পাদুকা দুটি তুলে নিয়ে কোমরের কাপড়ের মধ্যে গুঁজে রাখলুম। গম্ভীরা হতে বেরিয়ে উপরে উঠে এলুম। নিজের ঘরে এসেও মনে শান্তি পেলুম না। এক একবার মনে হতে লাগল—এ দিয়ে আমার কি হবে? কোন্ কাজে লাগবে? যথাস্থানে রেখে দিয়ে আস্‌ব কি না ভাবছি। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু আর রাখা হলো না। মঠের বাইরে এলাম। মনের সে কি উদ্বেগ! প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দেখি—সন্ন্যাসীরা সব আমার দিকে ছুটে আসছেন। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সম্মুখ দিকে ছুটে চললুম। সন্ন্যাসীর দলও বেগে আমাকে অনুসরণ করে চল্‌ল। মধ্যে মধ্যে মণিবজ্রের স্বর শুনতে পেলুম—দাঁড়াও, ভয় নেই! কিন্তু ঐ অভয় বাণীতে আমার মনে সাহস পেলুম না। আমি প্রাণপণে ছুটে চললুম। আমার পশ্চাতে সন্ন্যাসীদল তীরবেগে ছুটে আসছে।

এখানকার পথঘাট সবই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত

ছুটতে ছুটতে আমি এমন একস্থানে এসে উপস্থিত হলুম, যেখানে পথ শেষ হয়ে গেছে। এর নীচে একটা ছোট পার্ব্বত্য নদী প্রবলবেগে বয়ে যাচ্ছে। সেখানে পাহাড়ের ঢল নেমেছে।

সন্ন্যাসীদলও আমার অতি নিকটে এসে পড়েছে। এখান থেকে ফেরবার আর কোন উপায় নেই। আত্মসমর্পণ করব কি না মনে মনে তাই ভাবছি। আমার এই জাঁতিকলে-পড়া অবস্থা দেখে কয়েকজন সন্ন্যাসী অট্টহাস্য করে উঠলেন। মুহূর্ত্তে আমি মনস্থির করে ফেললুম। এঁদের হাতে লাঞ্ছনা পেয়ে মৃত্যুর চেয়ে এই হিমশীতল জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন ঢের শ্রেয়। আমি আর কালবিলম্ব না করে সেই উন্মত্ত বারি-রাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তারপর আমার আর জ্ঞান ছিল না।

যখন আমার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এলো, চেয়ে দেখি—আমি ছোট একটী কুটীরে কম্বলশয্যায় শুয়ে আছি। কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইলুম। সমস্ত ঘটনাটা মুহূর্ত্তে আমার মানসপটে ভেসে উঠল। তাঁরা আমাকে কথা বলতে নিষেধ করলেন। হঠাৎ আমার সেই পাদুকার কথা স্মরণ হলো। কোমর হাতড়ে দেখি—পাদুকা নেই সেখানে। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর একজন পুরুষ সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। রমণী তাঁকে কি বললেন। তিনি উঠে গিয়ে খড়ম দুটি এনে আমার পাশে রেখে বললেন—এই দুটি আপনার কোমরে বাঁধা ছিল। আপনার ভেজা কাপড় বদলাবার সময় খুলে নিয়েছি।

খড়ম দুটি আমার বুকের ওপর রেখে চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম। তখন আমার চোখের সামনে অমিতাভের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ভেসে উঠল। আমি যুক্তকরে তাঁকে প্রণাম জানালুম। আমার মনে হলো, তিনি যেন তাঁর অভয় হস্ত দিয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পুরুষটীর কাছে শুনলুম—আমি অজ্ঞান অবস্থায় নদীর বেলাভূমে পড়েছিলুম। তাঁরা দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে এসে অক্লান্ত সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

একটু সুস্থ হতেই আমি এখান থেকে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। কিন্তু এই সদাশয় পাহাড়ীদের অনুরোধ অবহেলা করে যেতে পারি নি। এখানে আমি সাতদিন ছিলুম। কি যত্নই না পেয়েছি এঁদের কাছে।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্য্যন্ত একদিন দেশে এসে উপস্থিত হলুম। পদ্মসম্ভবকে কথা দিয়েছিলুম—সংসারী হবো, সেকথা রেখেছি।

প্রায় এক বছর পরের কথা। তখন গভীর রাত্রি। চারদিক নিঝুম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো—দ্বারে কে যেন মৃদু করাঘাত করছে। আমি ধীরে ধীরে উঠে আলো জ্বালিয়ে বাইরে গিয়ে দ্বার খুলে দিলুম। ভূত দেখলেও বোধ হয় অত বিস্মিত হতুম না। দেখলুম সহাস্যমুখে পদ্মসম্ভব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নত-জানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার মাথায় তাঁর মঙ্গল হস্ত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। কপাট বন্ধ করে তাঁকে নিয়ে পাশের ঘরে বসালুম। তখন আমার বুক ভয়ে দুর দুর করে কাঁপছে। অতিকষ্টে আমি বললুম—আমি অপরাধী, আমাকে আপনি শাস্তি দিন।

তাঁর মুখে মধুর হাসি। তিনি বললেন—ঐ তাঁরই লীলা খেলা। তুমি মহা ভাগ্যবান। তিনি যাকে স্নেহ করেন, তাকে নিয়েই এ'রকম কৌতুক করেন। আজ এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ভগবান তথাগতের আদেশেই আমি তিব্বত থেকে এখানে এসেছি, তাঁর পাদুকা ফিরত নিয়ে যেতে। আজই আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একদিনের মধ্যে তিব্বত হতে আসা এবং সেখানে ফিরে যাওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে!

তিনি হয় তো আমার মনোভাব বুঝে থাকবেন। মৃদু হেসে বললেন—যোগবলে সবই সম্ভব হয়। বিস্মিত হবার কিছু নেই।

আমি উঠে গিয়ে রত্নখচিত খড়ম দুটি এনে আমার মস্তকে স্পর্শ করে তাঁর হাতে তুলে দিলুম। এই পাদুকা অপহরণ করবার পূর্ব্বের অবস্থা আমার যা হয়েছিল, তাঁকে

বল্‌তে যাচ্ছিলুম। তিনি বাধা দিয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন—সবই আমি জানি, কিছু বল্‌তে হবে না।

তাঁর আদেশ মত আমি যে সংসারী হয়েছি সে কথা বল্‌লুম। বল্‌লেন—সবই জানি।

তারপর আরো কয়েক বছর কেটে গেছে। আমি এখন একটি পুত্রের জনক। পুত্রের বয়স কুড়ি বৎসর হলেই আমাকে সংসারের সমস্ত মায়ামমতা ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে হবে। আমি স্বপ্নে সেই গুহাবাসী সন্ন্যাসীর ইঙ্গিত পেয়েছি। আর কয়টা বৎসর পরেই আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে। সেখানে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এক একদিন স্বপ্নে ভেসে ওঠে ভগবান তথাগতের হাসি-মাখা মুখখানি।

কবে সেই শুভদিন আসবে? সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি।

ফাগুনে

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

(কিশোর রচনা)

গুন্ গুন্ গুন
মৌমাছি গান গায়,
প্রজাপতি উড়ে যায়
এসেছে ফাগুন!

ঝিল্ মিল্ ঝিল্
দীঘি-ভরা কালো জল,
সোনা রোদে চঞ্চল
বিশ্ব নিখিল!

সির্ সির্ সির্
মধুর সমীর বয়,
সবুজ ঘাসেতে রয়
হীরক শিশির!

ঘুম ঘুম ঘুম
ফুলেতে আমেজ মাখা,
পলাশের লাল শাখা
যেন কুমকুম্॥

নতুন চীনে শিক্ষা ব্যবস্থা

অশোককুমার গুপ্ত

মহা প্রাচীরের অন্তরালে ঘুমিয়েছিল যে জাতটা এতকাল বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষটায় আজ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।—চীনের প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু বিরাট এক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর নিয়ে আজও অম্লান। শিক্ষায় দীক্ষায় সে জাতটা যে একদিন যথেষ্ট উন্নত ছিল, চীনের প্রাচীন পুঁথি সে সত্যের সাক্ষ্য দিতে আজও বেঁচে আছে। চীনের সভ্যতা এতো প্রাচীন যে, যে সব বিদেশী জাতগুলো পরবর্ত্তীকালে চীনের রক্ত শোষণ করে নিজেদের ফ্যাকাসে দেহের পুষ্টি সাধন করেছিল, তাদের হয়ত তখন সৃষ্টিই হয়নি পৃথিবীর বুকে।

বর্ত্তমান নয়া চীনের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা কিছু বলতে হলে বিগত দিনের খানিকটা ইতিহাস বর্ণনার প্রয়োজন।

ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার পর ইংলণ্ড একটু একটু করে তার শ্বেতহস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল চীনের দিকে। চীনে তখন মাঞ্চু রাজবংশের আধিপত্য। ভারতবর্ষে আফিমের চাষ করে উৎপন্ন সেই আফিম চীনের বাজারে বিক্রী করতে লাগল বিদেশী বণিক। মাঞ্চু সরকারের মৈত্র্যতা সাহায্য করল বরং চীনের বুকে বিদেশী বণিকের ব্যবসার খুঁটি গাড়তে। ধীরে ধীরে আফিম-খোর হয়ে উঠল গোটা চীন মহাদেশটা। জাগ্রত জাতটার ধমনীতে বইতে লাগল নেশার তীব্র হলাহল। কোথায় গেল সেই চীন, শিক্ষা সংস্কার নিয়ে তলিয়ে গেল সে অশিক্ষা-কুশিক্ষার অতলে। কুচক্রী বিদেশীর শীতল হাতের হিমেল স্পর্শে ঘুমিয়ে পোড়া জাতটা সব খুইয়ে। বিদেশীর হাতের পতুল হবার নির্লজ্জ স্বাক্ষর বুকে করে দিন কাটাতে লাগল চীনের অধিবাসীরা অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশার মাঝে।

পুঞ্জীভূত অত্যাচার আর অবমাননার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন সান-ইয়াৎ-সেন। ১৯১১ সালের চীন-বিদ্রোহের মূল নায়ক সান-ইয়াৎ-সেন চাইলেন মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ করে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। মাঞ্চু রাজবংশের অবসান ঘটল। প্রতিষ্ঠিত হোল প্রজাতন্ত্র সরকার। কিন্তু তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই এক আত্মীয় চিয়াংকাইশেক গ্রহণ করলেন গণতান্ত্রিক চীনের দায়িত্ব সর্বময় কর্ত্তারূপে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণিত হোল। দেশের সর্ব্বত্র দেখা দিল অবনতি ও অরাজকতা। শিক্ষার প্রসারত কমে

ব্যাপক পরিকল্পনা সান-ইয়াৎ-সেন করেছিলেন তার মূলে পোড়ল কুঠারাঘাত। উদাসীন চিয়াং কাইশেক বিদেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশীর তোষামদে মেতে উঠলেন। চিয়াংকাইশেকের এই তোষণ নীতির বিরুদ্ধে মাওসেতুং প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সান-ইয়াৎ-সেন প্রবর্ত্তিত প্রজাতন্ত্রের বিলোপ সাধনে প্রবৃত্ত চিয়াংকাইশেকের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন মাওসেতুং নতুন নীতির ধ্বজা হাতে ধরে জাতির পরিত্রাণে। দীর্ঘ-মেয়াদী সংগ্রামের পর ১৯৪৯ সালে চিয়াংকাইশেককে অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই প্রজাতান্ত্রিক চীনের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসলেন। মাওসেতুংকে দেশবাসী বরণ করে নিল পরম সমাদরে। চীনের ইতিহাসে মাওসেতুংএর আবির্ভাব এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হোল চীন মহাদেশে সত্যিকারের প্রজাতন্ত্র।

জাতীয় উন্নতিসাধন করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশের কাজে উপযুক্ত করে তোলা দরকার, মাওসেতুং এসেই এই মহান সত্যটি উপলব্ধি করলেন। চিয়াং কাইশেকের আমলে শিক্ষার প্রসার কল্পে বিশেষ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। শ্রমিক এবং চাষী শ্রেণীর লোকদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবার কোন অধিকারই ছিল না। ফলে দেশের শতকরা ৯০ জন ছিল অশিক্ষিত। শিক্ষিত যুবকদের জীবিকানির্বাহোপযোগী কোন সুবিধা না থাকায় বেশীর ভাগ পাশ করা অথবা ডিগ্রীধারী যুবককে গ্রহণ করতে হোত নিরাশা এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ বেকার জীবন। মাওসেতুং বদ্ধপরিকর হলেন পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতে।

পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন না করে গণশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারতার কথা চিন্তা করাই যায় না। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক চীন তাই উঠে পড়ে লেগেছে পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন পদ্ধতিতে ঢালাই করতে। নতুন চীন গঠনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার সংহতি রেখে নতুন এক শিক্ষা পদ্ধতি কার্য্যকরী করবার জন্য চীন সরকার মনস্থ করেছে। এই যে নতুন প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হোলো শিক্ষাক্ষেত্রে চাষী, মজুর, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বিদ্যালয়ের সর্বস্তরে সকলকে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা। সহর এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে পাঁচ বছর ধরে শিক্ষাগ্রহণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেখানকার শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চাষী মজুরদের ওপর। শিক্ষা যাতে সত্যিকারের গণজাগরণের সহায়তা করতে পারে তার জন্যে সমস্ত বিদ্যালয়ের দরজা শ্রমিক এবং চাষীদের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার্ত্থে উন্মুক্ত। যাতে চাষী মজুরদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের যথাক্রমে শতকরা ৮০জন, ৬০জন এবং ২০জন ছাত্র চাষী এবং মজুর শ্রেণীভুক্ত। চীন দেশের ইতিহাসে এটা অশ্রুতপূর্ব বলা চলে।

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনের ব্যাপারে নয়া চীন-সরকার পুরাতন চীনের শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজক ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে শিক্ষা যাতে প্রকৃত জাতীয় সংগঠনে অধিকতর কার্য্যকরী হতে পারে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। ১৯৪৯ সালে চীন গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় সারা দেশে উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৯১টি এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩০,০০০। প্রায় ৫,২০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২৭০,০০০, এবং ৩৪৬৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৪,২০০,০০০, কিন্তু ১৯৫১ সালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা গড়ে বেড়েছে, যথাক্রমে শতকরা ৭৭,৫৭,৯, এবং ৩৪'৮।

দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার ব্যাপারেও জাতীয় সরকার বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেছে। নব প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিক্ষায়াতনে প্রায় ৯০০০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র অধ্যয়নরত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই ধরণের ছাত্র সংখ্যা ১৯৫১ সাল অপেক্ষা শতকরা ২৭জন বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে শতকরা ৯২জন সংখ্যালঘু কোরীয় সন্তান বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব লিখিত কোন ভাষা নেই। নয়া-চীন সরকার তাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে হস্তাক্ষরের অনুকরণে ছাপার হরপ প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হয়েছে।

ছাত্র এবং শিক্ষকদের অধিকতর সুখ সুবিধা প্রদানের প্রতিও জাতীয় সরকার যথেষ্ট মনঃসংযোগ করেছে। নতুন চীনে যে সকল শিক্ষক দেশের সেবায় আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক সরকার তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন। দেশের কিশোর এবং যুবকদের জাতির আশাভরসা বলে মনে করা হয়। দেশের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের মত তারাও অবাধে জাতির সামাজিক এবং রাজনৈতিকক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন এবং ছাত্রদের ভাতাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫১ সাল অপেক্ষা পরবর্ত্তী বৎসরে উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের বেতনের হার বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ১৮৬, ২৫৫, এবং ৩৭৪। ভাতা স্বরূপ যে টাকা ছাত্রদের দেওয়া হোত তার হারও বর্ত্তমানে যথেষ্ট বেড়েছে। এই ভাতা বৃদ্ধির দরুণ ছাত্ররা শিক্ষা, আহার এবং বাসস্থানের খরচা ছাড়াও সরকারের কাছ থেকে নিজেদের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্য পকেট খরচা বাবদ অর্থ পেয়ে থাকে। মোটামুটি এই হোল ওখানকার বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে চীনে সবে মাত্র ৪১৫ বছর। এরই ভেতরে পুরাতন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে নতুন চীন যে নয়া ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়েছে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। এখন এশিয়ার জাগরণের সময়। কেউ রোধ করতে পারবেনা ঘুম থেকে সদ্য জেগে-ওঠা এশিয়ার বাঁধভাঙা অগ্রগমন। নতুন চীনের জয়যুক্ত হোক এই কামনাই করি।

রাজ্যপালের ভাষণ—

বিধান সভা ও বিধান পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সময় রাজ্যপালের ভাষণ দ্বারা তাহা উদ্বোধন করা হয়। এবারও গত ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিয়াছেন। তাঁহার ভাষণে সরকারী কার্য্যগুলির বিবরণ দেওয়া হয়। ভাষণে তিনি উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার কথা বিবৃত করেন। গত বন্যায় বহু রাস্তা ও রেলপথ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কয় মাস কাল উড়োজাহাজে করিয়া খাদ্য লইয়া গিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থান সমূহে তাহা প্রদান করিতে হইয়াছিল। বন্যায় ৪ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমীর ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে—ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টাকা। ১২ হাজার বাসগৃহ নষ্ট হইয়াছে ও ১৪২ জন মারা গিয়াছে। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা কৃষি-ঋণ, ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা গৃহ নির্মাণ দান এবং ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার এককালীন সাহায্য দান করিয়াছেন। ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা টেষ্ট রিলিফ অর্থাৎ পরিশ্রম করাইয়া দুস্থ লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ৪১ হাজার ৮ শত ৫৪টি কাপড় জামা ও ১১ হাজার ২ শত ৮০টি কম্বল দান করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে হইল বন্যা, আর বর্দ্ধমান বিভাগ ও সুন্দরবনে বৃষ্টির অভাব। অনাবৃষ্টিক্লিষ্টদের জন্যও সরকার ৫০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা কৃষি-ঋণ, ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা গৃহ নির্মাণ দান, ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা নগদ দান, ৪৯ হাজার ৯ শত ৬২টি কাপড় জামা ও ৭ হাজার ৬ শত ২টি কম্বল দান করিয়াছে। শিল্পীদের ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা দাদন দিয়া শিল্পে পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ও ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা শ্রমের বদলে দুস্থদের প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ২ কোটিরও অধিক টাকা সাহায্য বাবদ ব্যয়িত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। ঐ অঞ্চলের নদীগুলির উৎপত্তি স্থান নেপাল, সিকিম বা ভুটানে—সে সকল স্থান এই রাজ্যের বাহিরে। বন্যা তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে ও সদস্যগণ সিকিম দেখিয়া আসিয়াছেন। বন্যা একেবারে বন্ধের ব্যবস্থা করিতে সময় লাগিবে—সে জন্য উত্তরবঙ্গের প্রধান সহরগুলি—জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুর ডুয়ার্স, মাথাভাঙ্গা ও শিলিগুড়ি—রক্ষার জন্য উপায় স্থির করা হইয়াছে—সেজন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। সে কাজ আরম্ভ হইয়াছে—তাহার ফলে বহু গ্রামও রক্ষা পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ করিতেছেন। ১০০ গ্রামের মধ্যে একটি সহর প্রস্তুত করিয়া ঐ অঞ্চলকে উন্নত করা হইবে। ঐরূপ ১১টি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। ৭টি অঞ্চলে নূতন সহর তৈয়ার করিতে হইবে—বাকী ৪টিতে তৈয়ারী সহর পাওয়া গিয়াছে। সহরে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে ও ১০০ বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। অঞ্চলগুলিতে কৃষি, পশুপালন, সেচ, সমবায়, পশু-চিকিৎসা, মৎস্যের চাষ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও গ্রাম্য উন্নতি, শিক্ষা, পথ নির্মাণ, শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করা হইবে। গ্রাম-কর্মীদিগকে শিক্ষা দানের পর তথায় প্রেরণ করা হইবে—কর্মীরা গ্রামে বাস করিয়া সকলকে উন্নত ধরণের কাজ শিক্ষা দিবেন। ১১টি অঞ্চলের জন্য ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। এই সকল কাজে সর্বত্র জনগণের উৎসাহ দেখা যাইতেছে। জনগণ টাকা ও জিনিষপত্রে মোট ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছে। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৫টি অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলে "জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্য" আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐ ভাবে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের একচতুর্থাংশে উন্নয়ন কাজ ৩ বৎসরের মধ্যে শেষ করা হইবে। এই সকল অঞ্চলে সহর থাকিবে না এবং উন্নয়ন কাজের পরিমাণও কম হইবে। ঐ ছোট অঞ্চলগুলি ক্রমে একত্র করিয়া বড় অঞ্চলের ন্যায় করা হইবে। গ্রাম-কর্মীদের শিক্ষা দানের জন্য ইতিমধ্যে ৪টি কেন্দ্রে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলগুলিতে শুধু উন্নয়ন কাজ করা হইবে না—মানুষের মন পরিবর্তন করিয়া তাহাদের উন্নত ধরণের মানুষে পরিণত করা হইবে।

পথ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৫৪৪ মাইল নূতন পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে ও ২৩০০ মাইল পুরাতন রাস্তা উপযুক্তভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সাল শেষ হইবার পূর্বে ৫ হাজার মাইল নূতন পথ ও বহু সংখ্যক পথ পুন নির্মাণ কার্য্য শেষ হইবে।

রাজ্যপাল তাঁহার বক্তৃতায় বহুপ্রকার উন্নয়ন কার্য্যের হিসাব দিয়াছেন। আমরা এস্থলে সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব না। দেশের লোককে আমরা এগুলির কথা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। স্বাধীন দেশে উন্নতির কাজ করিবার জন্য শুধু যেন লোক সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকে। সরকারের সহিত সহযোগিতা দ্বারা তাহাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য দান করিলেই উন্নয়ন প্রচেষ্টা সত্বর সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদ উভয় স্থানেই পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৫-৫৬ সালের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন।

জয়যাত্রার পথে
দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে তাহাদের জীবনের সম্ভাব্য বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া হিন্দুস্থান তাহার জয়যাত্রার পথে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি অর্জন করিয়া সগৌরবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ১৯৫৩ সাল ইহার সাফল্য ও সমৃদ্ধির নবতন পদক্ষেপের পরিচয় দেয়।
নূতন বীমা
১৮,৮৭,১৮,৭০০৲
মোট চলতি বীমা..........৯৩,৬১,১৬,৭৬৮৲
মোট সম্পত্তি..............২৫,২৬,০৫,৬৮৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল...২২,৫০,৫৭,১১৯৲
প্রিমিয়ামের আয়.......... ৪,৩৪,৪৩,০৬১৲
দাবী শোধ (১৯৫৩).........১,০৪,৪৪,৪২৭৲
বোনাস
প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকায়
আজীবন বীমায়..১৭৷৷৹
মেয়াদী বীমায়..১৫৲
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স
সোসাইটি লিমিটেড্।
হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১৩

প্রথমেই তিনি বলেন—১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই রাজ্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন—ঐ দিন খাদ্য রেশনিং প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রাজ্যে বার্ষিক খাদ্যের চাহিদা ৪০ লক্ষ টন—কয় বৎসর খাদ্য উৎপাদন চেষ্টার ফলে ১৯৪৭ সালের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়—পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টন। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে আবার বহু স্থানে অনাবৃষ্টি ও কয়েকটি স্থানে বন্যার ফলে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টন হইয়াছে। তাহাতেও ভয়ের কারণ নাই—কারণ ভারতের সর্বত্র এখন প্রচুর খাদ্য মজুত করা আছে। ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, সুতা ও কাপড় উৎপাদনও খুব বাড়িয়াছে—১৯৫২ সালে যাহার পরিমাণ ১২৮ ছিল, ১৯৫৩তে তাহা ১৩৪ ও ১৯৫৪ সালে ১৪৩ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। পাটও বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। কয়েকটি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি না হইয়া একইরূপ আছে। চিনি, লবণ ও দেশলাইএর উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। অন্য সকল জিনিষের দামও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। গত বৎসর চা-ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে মাল রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ—তাহা ১৯৫৩-৫৪ সালে বাড়িয়া ২৬৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। বিদেশ হইতে মাল আমদানীর মূল্য পূর্ব বৎসরে ছিল ১৫২ কোটি ১৮ লক্ষ—গত বৎসরে কমিয়া হইয়াছে ১১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ। কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্যও ক্রমে কমিয়া গিয়াছে।

১৯৫৪-৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা হাতে লইয়া বর্ষারম্ভে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিক্রয়-কর ও মোটর-তৈল-কর হইতে ৭২ লক্ষ টাকা অধিক আয় হয়—তাহা ছাড়া উন্নয়ন বাবদ ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, পূর্ত কার্য্য বাবদ ৩৪ লক্ষ, স্বাস্থ্য বিভাগ বাবদ ১০ লক্ষ এবং মুদ্রণকার্য্য বাবদ ১০ লক্ষ টাকা খরচ কম হইয়াছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে আয়ের হিসাব ছিল ৩৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা—কিন্তু আয় হইবে ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। এবারও মোটর তৈল এবং বিক্রয়-কর বাবদ ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দানের টাকাও ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে।

১৯৫৪-৫৫ সালে ব্যয়ের হিসাবে ছিল ৫৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা—কিন্তু আসলে ব্যয় হইবে ৫৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িবে ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। কৃষি বাবদ ব্যয় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পড়িবে। কলিকাতা হইতে গো-মহিষের খাটাল সরাইয়া ৩টি অতিরিক্ত দুগ্ধ-কলোনী নির্মাণ ও পশু-খাদ্য চাষের ব্যাপক ব্যবস্থার জন্য এবং সর্বত্র কৃষকদিগকে প্রচুর পরিমাণে সার সরবরাহের জন্য এই খরচ বাড়িয়াছে। উত্তর বঙ্গের বন্যায় সাহায্য দানের জন্য ব্যয় ৭৯ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বেশী হইবে—কিন্তু অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে ১৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। ফলে বর্ষা শেষে (১৯৫৪-৫৫) পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৬৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিবে।

১৯৫১-৫৬ সালের যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছি ১৯৫৪-৫৫ সালে তাহার চতুর্থ বর্ষ শেষ হইবে। ৫ বৎসরে মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল—কিন্তু ঐ টাকার ২২ কো টাকা ঘাটতি ছিল। এখন দেখা যায়—পুরা ৬৯ কোটি ৫ বৎসরে ব হইবেই, ব্যয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মাত্র ৩০ হাজার বর্গ মাইল—তন্মধ্যে মা ২০ হাজার বর্গ মাইল জমী—অর্থাৎ ১২৮ লক্ষ একর চাষের উপযুক্ত জমীর শতকরা ৯২ ভাগে অর্থাৎ ১১৭ লক্ষ একরে চাষ হইয়া থাকে চেষ্টা করিলে ও অর্থ ব্যয় করিলে বাকী ১১ লক্ষ একর জমী চাষের-যোগ করা যাইবে। বেশী জমী চাষের-যোগ্য করিতে গিয়া রাজ্যে জঙ্গলে পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে—জমীর শতকরা ২৫ ভাগ জঙ্গল থাব প্রয়োজন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ জমিতে জঙ্গল আছে সেজন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়া চাষের অযোগ্য জমীগুলি জঙ্গলে পরিণ করা হইতেছে।

১৯৫১ সালের লোক গণনার হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শতক ৫২টি পরিবার অর্থাৎ মোট ৩২ লক্ষ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল ৩২ লক্ষ পরিবারের শতকরা ২১ ভাগ অর্থাৎ মোট ৭ লক্ষ পরিবা ভূমিহীন। বাকী ২৫ লক্ষ পরিবার নিজের জমীতে চাষ করি জীবিকার্জন করে।

একটি কৃষি-পরিবারের জন্য অন্তত ৫ একর জমী প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের মোট ১১৭ লক্ষ একর জমী ৩২ লক্ষ পরিবারকে সমা ভাগে ভাগ করিয়া দিলে প্রতি পরিবার ৩.৭ একর জমী পাইবে তাহাতে তাহাদের খরচ কুলাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমীদার গ্রহণ দ্বারা ভূমি সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে, তা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। ভূমি সমস্যার সহিত কুটীর-শি প্রতিষ্ঠার দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে পুরাতন কুটীর-শিল্প ধ্বংস পাইয়াছে। এখন নূতন ভাবে কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামের লোক কৃষি দ্বারা আ জীবনধারণ করিতে পারে না বলিয়া শিল্পপ্রধান ও কারখানাবহুল স্থা শ্রমিকের কাজ করিতে আসিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে গ্রামগুলি অবনতি হইতেছে ও সহরাঞ্চলেও বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড় গিয়াছে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের সহরগুলিতে মোট সাড়ে ৪ লক্ষ বেকার বা চাকরীপ্রার্থী লোক ছিল। কলিকাতায় কর্মক্ষম শতকর ২৭জন বেকার। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের কর্মদক্ষ শতকর ৪৭জন বেকার।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে; তাহার কারণ—অধিক সংখ্যায় লোক জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুর আগমনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির মু কারণ। দেশে উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কাজেই কৃষি কার্য্যের জন্য অধিকতর সংখ্যায় লোকের প্রয়োজন হইবে

না। কাজেই দেশের বেকার লোকদিগকে কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এ কথা চিন্তা করিয়াই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে মোটামুটি সরকার পক্ষ এই সকল কথা জনগণকে জানাইয়াছেন। তাহা যাহাই কেন হউক না, দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা এখনও ভাল হয় নাই। ধানের দাম কমা প্রয়োজন—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিষের দাম না কমিলে কৃষক কম দামে ধান বিক্রয় করিয়া মরিয়া যাইবে। তাহার তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি কিনিবার পয়সা থাকিবে না। চিনির দাম কমে নাই—সেজন্য কাহারা দায়ী তাহা স্থির করিয়া মূল্য হ্রাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। লবণের দামও এখন পর্য্যন্ত কমে নাই। এ বিষয়ে সরকারী চেষ্টাও দেখা যায় না। সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়াছে—সরিষা পশ্চিমবঙ্গে অধিক উৎপন্ন হয় না—তাহাই কি তৈলের মূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ? এ বিষয়েও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁত-শিল্পকে সাহায্য দিয়া তাঁতের কাপড়ের দাম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু কাপড়ের কলওয়ালাদের অধিক মুনাফা করার ব্যবস্থা বন্ধ হয় নাই—দরিদ্র জনগণের পক্ষে কাপড় এখনও সহজলভ্য হয় নাই। চা-বাগানের মালিকগণ প্রচুর লাভ করিলেও সাধারণ লোককে অধিক মূল্য দিয়া কাঁচা চা ক্রয় করিতে হয়। যে পশ্চিমবঙ্গে বহু চা-বাগান বর্ত্তমান, সেখানে চায়ের দাম না কমার কোন যুক্তি দেখা যায় না। যেমন চাল, আটা ও চিনিকে রেশন মুক্ত করা হইয়াছে, তেমনই কয়লা, সিমেণ্ট প্রভৃতিকেও রেশন মুক্ত করা দরকার—এখনও পশ্চিমবঙ্গে কম মূল্যে প্রচুর পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় না—একদল ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য কয়লা নিয়ন্ত্রণ করার কোন সার্থকতা নাই।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাদে সরকারী খরচ পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িলেও দেশবাসীর চাহিদার অনুপাতে তাহা অত্যন্ত কম। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও তৎকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের অর্থনীতিক সাম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে—তাহার ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক বৃদ্ধি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে সে অভাব সত্বর দূর করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইলেও সর্বত্র তাহা করা হয় নাই—মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও সরকার পক্ষ হইতে উপযুক্ত সাহায্য লাভ করে না। ব্যাপক বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল—তেমনই মাধ্যমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত পরিমাণ ভাতা দিয়া ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের চাহিদা মিটানো একান্ত প্রয়োজন।

আমরা ক্রমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের হিসাবের কথা আলোচনা করিব। সরকারী হিসাবে মোটা অঙ্ক দেখিয়া লোক সন্তুষ্ট হইবে না—মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সরবরাহ ও অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থাই মানুষকে সন্তোষ আনিয়া দিবে। সরকারী কর্মচারীদের সহৃদয় ব্যবহার সরকারী কার্য্যের প্রচারের মূলে থাকিবে। আমরা বিষয়গুলি সকলকে ধীরভাবে চিন্তা করিতে ও সম্ভব হইলে কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করি।

কেন্দ্রীয় বাজেট—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীসি-ডি-দেশমুখ ১৯৫৫-৫৬ সালের আয় ব্যয়ের যে হিসাব পেশ করেন, তাহাতে দেখা যায়—১৯৫৪-৫৫ সালের সংশোধিত হিসাবে আয় ৪৪১ কোটি ৮ ৮ লক্ষ, ব্যয় ৪৪৬ কোটি ৮ লক্ষ—কাজেই ঘাটতি হইবে ৫ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—আয় হইবে ৪৯০ কোটি ৪৬ লক্ষ, ব্যয় হইবে ৪৯৮ কোটি ৯৩ লক্ষ—ঘাটতি হইবে ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ঘাটতির পরিমাণ কমাইবার জন্য উৎপাদন-শুল্ক, আয়-কর ও সমুদ্র শুল্কের হার পরিবর্ত্তন সাধনের ফলে মোট ২১ কোটি ৭০ লক্ষ অতিরিক্ত আয় হইবে। উৎপাদন শুল্কের ক্ষেত্রে চিনি, সুতী ও পশমী বস্ত্র, ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও ফ্যানের শুল্ক বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। আয়-করের ক্ষেত্রে এই প্রথম বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে তারতম্য করিয়া পারিবারিক ভাতা হিসাবে বিবাহিতদের উপর করভার আপেক্ষিকভাবে কম করা হইয়াছে, উচ্চ পর্য্যায়ের আয়ের ক্ষেত্রে করহার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সুপার ট্যাক্সের রেহাই-এর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপড়ের রপ্তানী শুল্ক কমান হইয়াছে এবং চা-এর রপ্তানী শুল্ক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! পাকিস্তানের নিকট দেশ বিভাগ জনিত যে অর্থ পাওনা আছে তাহার মধ্য হইতে ৯ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া পূর্ব্ব বৎসরের বাজেটে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু উহা আদায় হয় নাই। নানা কারণে পাকিস্তানের সহিত আর্থিক দেনা-পাওনা সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই, তবে আলোচনার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই বিরক্তিকর প্রশ্নের মীমাংসা হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। ১৯৫৪ সালে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে। কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছে। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শিল্পায়নের গতিও আশাপ্রদ। সুখের কথা, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। সেজন্য যদি কোথাও সামান্য কর বৃদ্ধি হয়, বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশবাসীর তাহা মানিয়া লওয়া উচিত। খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে ভারত আর পরমুখাপেক্ষী নাই—ইহাই দেশবাসীর সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়। উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য যে বিরাট অর্থব্যয় প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার সঙ্কুলান করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার। ঐ সকল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ও দেশবাসী সেগুলির ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলে দেশবাসীর অভিযোগের কারণ থাকিবে না। স্বাধীনতালাভের পর মাত্র ৭ বৎসর অতীত হইয়াছে। ২১৩টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে তাহার পর দেশবাসী স্বাধীন রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আগামী বর্ষে মাত্র একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হইবে।

তাহার পরবর্ত্তী ৫ বৎসরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদন করা হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী জনগণকে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে দেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বিপথগামী, বিদেশীভাবে ভাবিত দেশকে তাহার স্বস্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য বিষয় নহে—দেশবাসী জনগণকে তাহা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সকল শ্রেণীর মানুষ যদি চিন্তার পর কর্ত্তব্য-পথ স্থির করিয়া লন, তবেই দেশের সামগ্রিক উন্নতি সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা রাষ্ট্রচালকগণের পক্ষে সম্ভব হইবে। সে জন্য আমরা বাজেটের দোষ ত্রুটির আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

কংগ্রেসের প্রস্তাব রূপায়ন—

আবাদী কংগ্রেসের পর গত ৫ই ও ৬ই মার্চ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইয়াছিল। তাহাতে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস ও জাতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক। এইগুলির মধ্য দিয়া কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী সুসম্বদ্ধ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলের জন্য সমান সুযোগ, সমান রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক ভিত্তিতে যে সমবায় ভিত্তিক কমনওয়েলথ গঠন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, তাহাও এই প্রস্তাবগুলির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া এবং অনুমোদন করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই এইরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। বৈষয়িক নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ও সমাজবাদী বৈষয়িক ব্যবস্থার এই জাতীয় আদর্শ পূর্ণতরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব, বিশেষতঃ বৈষয়িক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি জনসাধারণের নিকট সর্বতোভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ওয়ার্কিং কমিটী এই কারণে সকল কংগ্রেস-কর্মীকে এই কাজে ব্রতী হইতে এবং আবাদী কংগ্রেসের বার্তা জনসাধারণের নিকট ও দেশের সকল প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিতে আহ্বান জানাইতেছে। কমিটী আশা করেন যে—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি এই সকল প্রস্তাব ও এই নীতি রূপায়ণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আবাদী কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠানের শক্তিবৃদ্ধি ও বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনার সময় বলা হইয়াছিল যে, প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটী একটি স্থায়ী কমিটী গঠন করিতে পারেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্মীদের সমিতি। ইহা কাহাকেও পদমর্য্যাদা লাভের অথবা একটি মাত্র দল কর্তৃক দেশ শাসনের ফলে যে সব সুবিধা সম্ভব সেগুলি পাওয়ার লোভ দেখাইতে চাহে না। যে খাঁটি কর্মী কংগ্রেসে যোগ দিবেন, তাঁহাকে কংগ্রেস কেবল সম্ভ্রম ও আত্মসম্মানবোধপূর্ণ জনসেবার দ্বারা ভাগ্য গঠনে অংশ লইবার সুযোগ দিতে পারে। কংগ্রেস এই দেশে নিঃস্বার্থ সেবার একটা ভাব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, বলিয়া গর্ববোধ করিতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেসকর্মী ও জনসাধারণের মনে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত উদ্যম সার্থক ও রচনাত্মক পথে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে উৎসাহদান ও উল্লিখিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ওয়ার্কিং কমিটী একটি কমিটী গঠন করিবেন—কমিটীর কাজ হইবে—(ক) কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনীতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আবশ্যক মত রচনাদি প্রণয়ন (খ) কংগ্রেসকর্মীদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন (গ) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে যে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদের ভাব দেখা যায়, তাহা নির্মূল করিবার উপায় উদ্ভাবন ও নির্দেশ (ঘ) নারীরাও সমাজের অন্যান্য যে সকল শাখার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান নাই, সে স্থানে যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন তাহার উপায় উদ্ভাবন (ঙ) কংগ্রেস কমিটীগুলির কর্মদক্ষতার মান উন্নয়ন (চ) গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলী অনুসারে আরও কার্য্যকরীভাবে সক্রিয় সদস্যদের সম্বন্ধে পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন (ছ) প্রতিষ্ঠানের কাজ যাহাতে আরও সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চলে এবং উহার মধ্যে যাহাতে উপদল গড়িয়া না ওঠে তাহার উপায় নির্দ্দেশ।

কংগ্রেসের এই প্রস্তাব দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে ও দেশবাসী এ গুলি গ্রহণ ও অবলম্বনের ব্যবস্থা করিলে ফল অবশ্যই ভাল হইবে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন-ধেবর উহার সভাপতি হইবেন। কমিটীর সদস্য হইবেন—শ্রীজহরলাল নেহরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মৌলানা আজাদ, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ও শ্রীএস-কে পাতিল। পরে একজন মহিলাকে এই কমিটীর সদস্য করা হইবে।

গঠনমূলক কাজের জন্য ওয়ার্কিং কমিটী সারা দেশকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করিয়াছেন। প্রত্যেক অঞ্চলে একজন সংগঠক থাকিবেন। সভাপতি শ্রীধেবর দেশে গঠনমূলক কার্য্য-পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এবং কয়েকজন সংগঠনকর্ম্মী লইয়া একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিবেন। আঞ্চলিক সংগঠন কর্ত্তারা বিভিন্ন এলাকার গঠন কার্য্যের ব্যবস্থা করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী গুলিকে ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির মারফতে জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সাহায্য করিবেন। তাঁহারা গ্রাম-সেবা-সংঘ, খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ড, ভারত সেবক সমাজ, ভূদান কমিটি প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত সংস্থার কর্ম্মীদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যুব ও মহিলা বিভাগের কাজ কর্ম্মসম্বন্ধে ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস নূতন সভাপতির উৎসাহে ও চেষ্টায় কংগ্রেস জনগণের মধ্যে নিজ মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।

ফরোয়ার্ডব্লকের কংগ্রেসে যোগদান—

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ডব্লকের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহকের যুক্ত সভার ২ দিন অধিবেশনের পর ৭ই মার্চ্চ দিল্লীতে
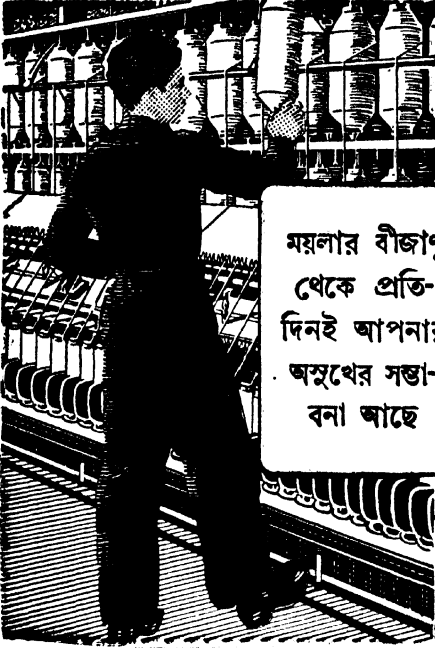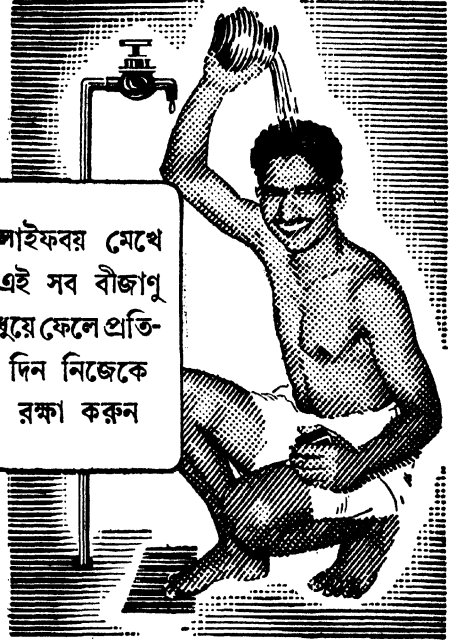
লাইফবয়ের
"রক্ষাকারী
ফেনা" আপ-
নার স্বাস্থ্যকে
নিরাপদে রাখে

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে
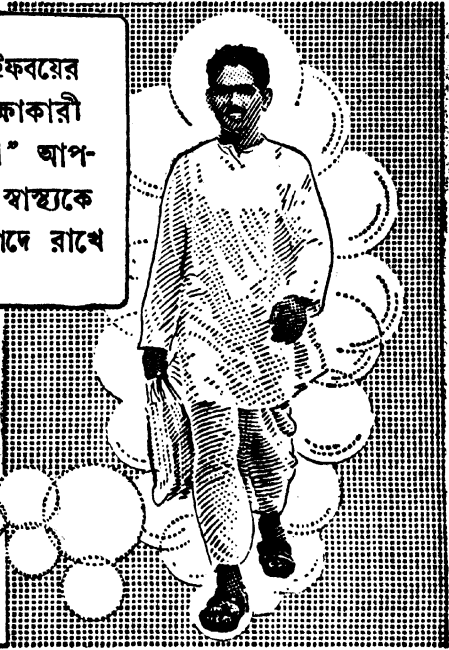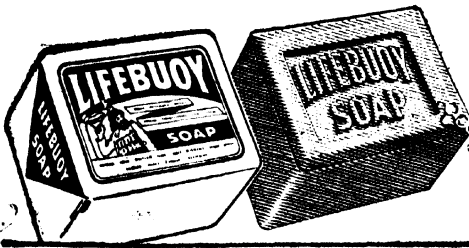
হইয়াছে যে ব্লকের সভাপতি জেনারেল মোহন সিং ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীশীলভদ্র যাজী ভারতীয় কংগ্রেসের সহিত ফরোয়ার্ড ব্লককে সংযুক্ত করিবেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সকল সদস্যকে ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে দিল্লী, পাঞ্জাব, পেপসু, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, মহাকোশল, বিদর্ভ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতির প্রদেশ-ব্লকগুলির সভায় ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীনেহরু ও শ্রীধেবরের নেতৃত্বে কংগ্রেস নূতন কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া নূতন আদর্শ প্রচার করায় কংগ্রেসের বাহিরের বহু রাজনীতিক দল কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছে। এখন সকল দল মিলিত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে দেশের গঠনমূলক কার্য্যসমূহ ও সত্বর সম্পাদিত হইবে।

পরবর্ত্তী কংগ্রেস অধিবেশন—

পরবর্ত্তী কংগ্রেস অধিবেশন ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন এখনও গতানুগতিক ভাবে পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট প্রথায় সম্পাদিত হইতেছে। যাহাতে পরবর্ত্তী কংগ্রেস অধিবেশন নূতনভাবে করিয়া—অধিবেশনে যে অর্থব্যয় হয় তাহা সার্থক ও কার্য্যকরী করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করার জন্য গত ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আলোচনা হইয়াছিল এবং ঐ বিষয়ে পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্য-গণকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—সর্দ্দার শরণ সিং, শ্রীএস-কে পাতিল, শ্রীবলবন্তরায় মেটা, জৈন ইয়ার জং ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ অগ্রবাল (আহ্বানকারী)। আমরা আশা করি, পরবর্ত্তী অধিবেশন এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তাপ্রসূত নূতন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার—

সমগ্র ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বোর্ড নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটী গঠন করিয়াছেন—বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য্য বদ্রীলাল শর্ম্মা, সৌরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী জে-কে-মোদী, শ্রীঅবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার এম-পি, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ জাকির হোসেন, ওয়ার্দ্ধা হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সম্পাদক শ্রীআর্য্যনায়কম্‌, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনারায়ণ অগ্রবাল, শ্রী জি-রামচন্দ্রম্‌, শ্রীঅনাথনাথ বসু। বোর্ড একদল পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যে যাইয়া বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া কমিটীকে রিপোর্ট দিবেন—ঐ দলে শ্রীরামচন্দ্রম্‌, মিঃ ফ্রাঙ্কলীন, শ্রীসৈয়দ আন্সারী, শ্রী জে-সি-বসু, ও শ্রী আর-এস-উপাধ্যায় আছেন। কমিটীর সদস্যগণ ও পরিদর্শকগণ গত ৫ই মার্চ দিল্লীতে মিলিত হইয়া আগামী বর্ষের কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন। বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যাপক প্রবর্তন ব্যবস্থা না হইলে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না।

বুদ্ধদেবের ২৫০০ তম জন্মোৎসব—

১৯৫৬ সালের মে মাসে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ-দেবের ২৫০০ শত জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী-ভক্তরা মে মাসের গরমে বুদ্ধগয়ায় যাইতে কষ্টবোধ করিবেন বলিয়া উৎসব নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত চলিবে। ভারতীয় মহাবোধি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বুদ্ধগয়া মন্দির পরিচালন কমিটীর সদস্য শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন—তিনি বলিয়াছেন উৎসবে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার রাজ্য সরকার ঐ ব্যয়ভার বহন করিবেন। সিংহল সরকার ঐ দিন সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও ব্রহ্ম সরকার তদপেক্ষা অধিক অর্থব্যয়ে উৎসব করিবেন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ভারতের রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করিবেন। ডিসেম্বর মাসের উৎসবে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, জাপান, চীন, কোরিয়া, ভিয়েটনাম ও নেপালের প্রধানমন্ত্রীরা ও তিব্বতের দালাইলামা উপস্থিত হইবেন। ভারত বুদ্ধের জন্মভূমি—ভারতীয়গণের ইহা গৌরবের কথা। উৎসব যাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর সে বিষয় সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

লোকমান্য তিলক জন্ম শতবার্ষিকী—

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ভারতের সর্বত্র লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান করা হইবে বলিয়া গত ৫ই মার্চ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় স্থির হইয়াছে। তিলক মহারাজের জীবনী-লেখার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ঐ উপলক্ষে পোষ্টঅফিস হইতে তাঁহার চিত্রাঙ্কিত বিশেষ ষ্ট্যাম্প রচনা ও প্রচার করা হইবে। ৫২ জন সদস্য লইয়া উক্ত উৎসবের এক কমিটী গঠন করা হইয়াছে—বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কমিটির সভাপতি এবং শ্রী এন-ভি গ্যাডগিল, শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস ও শ্রী কে-পি-মাধবন নায়ার—৩ জন কমিটির সম্পাদক হইয়াছেন। তিলক মহারাজের নাম দেশবাসী ভুলিতে বসিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার রচনার সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে দেশ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিবে।

আবার উদ্বাস্তু সমাগম—

গত ৬ মাসে (সেপ্টেম্বর ৫৪ হইতে ফেব্রুয়ারী ৫৫) পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু ভারতে আসিয়াছে। খুলনা, যশোহর ও ফরিদপুর হইতে পদব্রজে বহু হিন্দু নরনারী নদীয়া ও ২৪পরগণা জেলায় প্রবেশ করিতেছে। ১৯৫৪ সালের শেষ ৪ মাসে ৬২ হাজার ও ১৯৫৫ সালের প্রথম ২ মাসে ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু আগমন করায় পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন বিভাগ তাহাদের লইয়া বিব্রত হইয়াছে ও সমস্যা-সমাধানের উপায় পাইতেছে না। পূর্ববঙ্গবাসী প্রায় ৬০ হাজার হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে চাহিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পত্র দিয়াছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ও পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় এই বিষয়ে পাকিস্তান মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া

ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবেন। পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিক অবস্থা এই উদ্বাস্তু-আগমনের অন্যতম কারণ হইলেও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর ব্যবহার-বৈষম্যই যে ইহার মূল কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে অবহিত না হইলে ইহার পরিণাম ফল কখনই ভাল হইবে না।

বাঙ্গালীর অসাফল্যের কারণ—

ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমাউন কবীর গত ৩রা মার্চ কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছেন—বাঙ্গালী ছাত্ররা অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রদের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে, কিন্তু ত্রুটি-পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই বাঙ্গালী ছাত্ররা প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়িতেছে। এইসব ত্রুটি সংশোধিত হইলে বাঙ্গালী ছাত্ররা তাহাদের মেধার পরিচয় দিতে পারিবে। ইহা আনন্দের কথা যে, ৪০ বৎসর ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকাশ করিয়াছেন যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হইতে ১২ হাজারের বেশী ছাত্র থাকা বাঞ্ছনীয় নহে—অথচ ভারতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ হাজার ছাত্র আছে। ভারতে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধ্যাপক কবীর যে কারণের কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের সকলের চিন্তা করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

স্বর্গত কবির সম্মান—

দিল্লীর কেন্দ্রীয় সাহিত্য একাডেমী এ বৎসর প্রত্যেক ভারতীয় ভাষা হইতে ৩টি করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা চাহিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। প্রকাশ—স্বর্গত কবি জীবনানন্দ দাসের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এ বৎসর বাংলা সাহিত্যের পুরস্কার লাভ করিবে। পরলোকগত কবিকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, কবির জীবদ্দশায় এই সম্মানলাভ ঘটিল না। স্বর্গত কবির এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

শিল্প সংস্থা ও কারখানায় বাঙ্গালী নিয়োগ—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্যতম সদস্য শ্রীবসন্তলাল মুরারকা কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি গত ১লা ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় বক্তৃতাকালে বলেন—পশ্চিমবঙ্গের সকল অফিস ও কারখানায় যাহাতে শতকরা ১০০ বাঙ্গালীকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সেজন্য সকল মালিক ও শিল্পপতির বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত—সে চেষ্টা ফলবতী হইলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আর একটি কথাও তিনি বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সকল কাজ বাঙ্গালা ভাষাই পরিচালিত হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা সকলে ও সদস্যগণ যাহাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, তিনি সেজন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—এগুলি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা—এ ব্যবস্থাগুলিকে প্রাদেশিকতা বলিলে ভুল করা হইবে। আমরা শ্রীযুত মুরারকার এই সৎসাহসের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কাম্বোডিয়ার রাজার সিংহাসন ত্যাগ—

কাম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহানৌক গত ২রা মার্চ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা প্রিন্স সুরমূর্তকে রাজা হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দলগত কলহের ফলে জাতীয় পরিষদ শক্তিহীন হইলে নরোদম রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ভিয়েৎমীন বাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য আগামী এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচন হইবে। নরোদমের বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর—তিনি দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য স্বার্থত্যাগেও কুণ্ঠিত হন না।

নেপালের যুবরাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ—

নেপালে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রীএম-পি-কৈরালা। সম্প্রতি উপদেষ্টা সভায় প্রধান মন্ত্রীর দলের পরাজয় ঘটিলে শ্রীকৈরালা মন্ত্রীর পদত্যাগ করেন। যুবরাজ মহেন্দ্রবিক্রম সাহ ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব সহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সত্বর দেশ-বাসীর বিশ্বাসভাজন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। সকল স্বাধীন দেশই ক্রমে প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করিতেছে।

মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি-রক্ষা—

মধ্য ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপীকৃষ্ণ বিজয়বর্গ দিল্লী রাজ্য-সভায় এক প্রস্তাবে মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি-রক্ষার কথা বলিয়াছেন। কালিদাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ইংলণ্ডের সেক্সপিয়ার রঙ্গমঞ্চের মত 'কালিদাস রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করিয়া কালিদাসের স্মৃতি-রক্ষা করা যায়। তাহা ছাড়া বৎসরের একটি দিন 'কালিদাস-দিবস' ঘোষণা করিয়া ঐ দিন দেশের সর্বত্র কালিদাস-কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। স্বাধীন দেশের মানুষের এইরূপ স্বাধীন চিন্তার সংবাদে সকলেই সুখী হইবেন।

গান্ধীজীর উপদেশ ও পাঠ্যপুস্তক—

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর সংসদ সচিব ডাঃ শ্রীমালী নয়াদিল্লীতে এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে গান্ধীজির উপদেশাবলী অবলম্বনে একটি পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটি কমিটী গঠন করিবেন। ঐ তালিকা-সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক শুধু উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে পড়ান হইবে। গান্ধীজির লেখা জনপ্রিয় করার এই চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়। আশা করি, গভর্ণমেণ্ট সত্বর এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

পুস্তকের উপর বিক্রয় কর—

পুস্তকের উপর বিক্রয় করের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের প্রতিবাদ বহুদিনের। সরকারের রাজস্ব আমদানীর ব্যাপারে বিক্রয় কর একটি উৎকৃষ্ট উৎস সন্দেহ নাই—কিন্তু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তাহার কর নির্ধারণ নীতিও সর্বদা সুনির্দিষ্ট ও জনকল্যাণমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে সকল রাজ্যে বিক্রয় কর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—সে সকল স্থানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক পণ্যগুলিকে বিক্রয় করের কবল হইতে রেহাই দিয়াই কর নির্ধারণের ভিত্তি নির্মিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পণ্য-দ্রব্যগুলির মধ্যেও কোথাও কোথাও আবার গুরুত্ব অনুযায়ী বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া বিলাসদ্রব্যকেই অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে করযোগ্য করা হইয়াছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-যাত্রার ব্যয়ও ইহার ফলে বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ১৯৫২ সালে ভারতীয় আইন-পরিষদে যে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়, তাহাতেও কতকগুলি অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকা দিয়া সেগুলিকে বিক্রয় কর হইতে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পুস্তক উক্ত তালিকায় অত্যাবশ্যক পণ্যের অন্যতম। ঐ আইন চালু হওয়ার পর হইতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত কোন রাজ্যই আর উক্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর ধার্য করিতে পারে না। অবশ্য যে সকল রাজ্যে পূর্ব হইতেই ঐরূপ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর ধার্য আছে, সে সকল রাজ্যের ঐরূপ কর-নির্ধারণ ব্যবস্থা ভারত সরকারের ঐ আইনের দ্বারা ব্যাহত হইবে না। ঐ আইন কার্যকরী হওয়ার পর ভবিষ্যতেও আর ঐরূপ কোন রাজ্যে ঐরূপ দ্রব্যের উপর কর বলবৎ থাকিবে কিনা, তাহা স্থির করিবার ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, ভারত সরকারের ঐ আইন দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে ঐরূপ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর ধার্য হয়, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয় কর প্রবর্তনের প্রথম অবস্থা হইতেই সামান্য কয়েক শ্রেণীর পুস্তক বাদে প্রায় অধিকাংশ পুস্তকের উপরই বিক্রয় কর ধার্য আছে। এমন কি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকগুলিও বিক্রয় কর হইতে রেহাই পায় নাই; অথবা দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া পুস্তকের উপর করের পরিমাণ হ্রাস করা হয় নাই। ভারত-সরকারের আইন কার্যকরী হইবার পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গে পুস্তকের উপর বিক্রয় কর প্রবর্তিত থাকায় এক্ষণে পুস্তককে করমুক্ত করা বা না করার সিদ্ধান্তের ভার সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। মানুষের মানসিক উৎকর্ষ লাভের উপকরণসমূহও কোনও করের অধীন হয়,—ইহা দুঃখের বিষয়। আমরা যতদুর অবগত আছি, তাহাতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এমন কি, ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত বহু রাজ্যেও পুস্তকের উপর বিক্রয় কর প্রচলিত নাই। আমরা সঙ্গতভাবেই আশা করি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শিক্ষার প্রসার বন্ধ না করিয়া সমুদয় পুস্তকের উপর অভিশপ্ত বিক্রয় কর রহিত করিয়া জনসাধারণের বহুদিনের দাবী পূর্ণ করিবেন।

সীতা

শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা

আজ তুমি একা নও অশোকের বনে অসহায়
আমার জননী কাঁদে, কতো নারী কাঁদে বনে বনে
অভিশাপ অশ্রুঝরে গাছের শাখায়—
পাখি কাঁদে; সীতা তুমি একা আর নও।
কতো রাম রাজ্যহারা বনবাসী ক্ষুধায় কাতর,
পাহাড়ে কোথায় এসে থেমে গেছে কুটীরের পথ।
অন্ধকারে ছলনার রথে
আমার জননী হরে অনার্য্য রাবণ।
মহাবীর্য্যবান রাম লোহিত কণায়—
আর্য্যের শোণিত বহে, আগুনের শ্বাসে—
রাতের শ্বাপদ থামে; প্রাণের শিখায়
সেতু বন্ধনের ডাক আসে।
এবার শাসন হবে,—সমুদ্র শাসন,
তোমার উদ্ধার হবে, মৃত্যুবানে অনার্য্য দস্যুর—
লাল শোণিতের স্রোতে ধুয়ে যাবে ধরণী আবার:
আগত দিনের তরে সীতা তুমি থাক প্রতীক্ষায়।

স্মৃতি

শ্রীনীলিমা দাস

যদি দূরে যাবে, ভুল করে কেন
ডাকিলে আমারে প্রিয়,
কেন গো কহিলে, যৌবন-মায়া
নয়নে আঁকিয়া নিও।
আমার জীবনে ছিলে তুমি যবে,
ছিল এ ধরণী প্রেমের গরবে,
ফাল্গুন-রাতে রূপালী চাঁদের
জোছনায় রমণীয়।
যবে ঘন ঘোর শ্রাবণের ধারা
অঝোরে ঝরিয়া যায়
আমারও নয়নে উছলে কাঁদন
স্মরণ-গোধূলি-ছায়।
তাই যদি কভু রাতের স্বপনে
দূর-বন্ধুরে কাছে হয় মনে,
তাহারি স্মৃতিটি এ জীবনে মোর
বেদনায় বরণীয়।
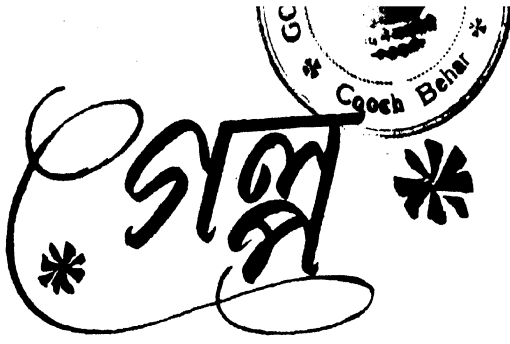
শেষ বসন্ত

শক্তিপদ রাজগুরু

গ্রামের থিয়েটার-ক্লাবে নোতুন থিয়েটার হচ্ছে। বাবুরা বাইরে থাকেন, ছুটি-ছাটায় এসে থিয়েটারের মহড়া দেন। তখন কড়ির আর অবসর থাকে না, সন্ধ্যে থেকে হ্যারিকেন হাতে নিয়ে এ-বাড়ী সে-বাড়ী গিয়ে অভিনেতাদিকে হাঁকডাক করে নিয়ে আসে। কর্তাবাবুরা এলে কাজ আরও বেড়ে যায়। প্রভাকরবাবু সাবডেপুটি হাকিম, কড়ি ঘোষ আলোটা মিটমিটে করে রেখে—বাবুর পা টিপতে থাকে, চোখ কান পড়ে থাকে তার ওই রিহার্সেলের দিকে। শেষ হতে রাত্রি অনেক হয়ে যায়।

"এ্যাই, এ্যাই মালতি' ছুটোবৌ—"

কড়িলালের গলা শুনে ধড়মড় করে উঠে দরজাটা খুলে দেয় মালতী, হ্যারিকেনের ম্লান আভায় ঘরখানা যেন কেমন এক অন্য পরিবেশে রূপান্তরিত হয়েছে। কড়ির তৈরী সিকেটা ঝুলছে, মালতীর ডাগর দুটো চোখে কেমন একটা লজ্জা-বিজড়িত ছায়া। বস্ত্র বিস্রস্ত নিটোল শরীরের লালিত্য আজ কি যেন এক স্বপ্নভরা চোখে কড়ির গাঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

এত দেরী কর কেনে, বড়ো ডর লাগে আমার।

কড়িলালের এই নীরব আমন্ত্রণে সাড়া দেবার লক্ষণই দেখা যায় না।

"ভাতদে—"

দেহের ক্ষিধেটাই তখন প্রধান। মালতী কাপড়চোপড় ছিয়ে নিয়ে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিল। অজ্ঞাতেই তার মনের কোণে গুমরে ওঠে চাপা একটু অভিমান। কড়িলাল ভাত মাখতে মাখতে বলে—

—"দেখবি ইবার কেমন ঠিয়েটার হবেক। গড় গড় করে রথ চলে যাবেক 'এস্‌টেজের উপর। আছে তুদের গাঁয়ে? হাজার হোক আমাদের বামুন কায়েতের গাঁ—আর তুদের?"

মালতী কথা কয় না।

সেদিনগুলোর কথা ভোলে নি মালতী। প্রথম রাত্রিতে কড়ির প্রথম স্পর্শ। সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কেমন যেন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের কলরোল। প্রথম আত্মনিবেদনের স্তব্ধ মিনতি, সেই স্মৃতির অনুরণন আজ উতলা করে তোলে মালতিকে; কিন্তু প্রথম মিলনরাত্রি একটিই, তার আর পুনরাগমন হয় নি তার জীবনে।

দীর্ঘ আট বছরের জীবনস্মৃতি তার একনজরেই পড়া যায়, কোন বিচিত্র রহস্যময় লিপি সেখানে ঠাঁই পায় নি। রোজই সকাল সন্ধ্যা আসে, আসে তারাকিনীর রাত্রির তমসা; কিন্তু জীবনে কোন তারাফুলই ফোটে নি তার—সেই অতলতমসা যে দূর করে দিতে পারে।

ঘুমন্ত কড়ির দেহটা নাড়া দিতে থাকে। বলিষ্ঠ হাতদুটো তার পিষে ফেলতে চায় যেন কড়ি হাঁফিয়ে ওঠে—

"কি হল?"

—"ডর লাগছে" কড়িকে নির্লজ্জের মত জড়িয়ে ধরে মালতী।

নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দেয় কড়ি। "ধ্যাৎ পাগলী, ঘুমো দিকি। ভয় কিসের।"

নারীমনের এই ভয় ব্যাকুলতার উৎস কোনদিনই কড়ি ঘোষের মত জড়মস্তিষ্কের কাছে প্রকাশিত হবে না। মালতী নীরবে পাশ ফিরে শুলো। কানপেতে থাকে কখন শেষ পহরের পাখীর ডাক ভেসে আসবে বাগানের আমগাছ থেকে। বঞ্চিত জীবনের শাখা থেকে একটি রাত্রির শুষ্ক পল্লব খসে পড়বে হতাশায় মর্মরধ্বনি তুলে।

ব্রাহ্মণসজ্জনে কড়ির খুব ভক্তি। সকালবেলাতেই ওপাড়ার দিকে দুধ দিতে গিয়ে ওদিকে প্রণাম না করে এসে জলগ্রহণ করবে না।

চাটুয্যেমশায় রোগা মানুষ। বলেন—"একটু দুধ দিতে পারিস কড়ি।"

চিন্তিত হয়ে পড়ে কড়ি। মাপা রোজের দুধ। মালতী হিসেব করে দিতে পাঠায়, আবার নিজেই পয়সা আদায় করে। কড়ির হাতে ও ভার দিলে দুধের দাম কোনদিনই আর আসবে না। আমতা আমতা করে কড়ি দুধ দিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

মালতীই আসে দাম আদায় করতে। চাটুয্যে হাঁকিয়ে দেয়। "রোজ করেছিলাম নাকি যে দাম দিতে হবে?"

—"বারে! আমরা কুথায় পাবো। ওতেই ত সব।"

চাটুয্যে তিক্ত বিরক্ত হয়ে ট্যাঁক থেকে একটা আধুলি বার করে ছুঁড়ে দেয়, "ওই লিয়ে যা। তুর আবার বেশী। বলেনা কথায় আঁটকুড়োর আটমায়া—বাঁজার ষোলমায়া। এই জন্যেই···তুর এই দশা।"

কথাটা শুনে চমকে ওঠে মালতী। এ যেন মস্ত একটা অপরাধ। আধুলিটা পড়েই রইল, বার হয়ে চলে এল সে। চাটুয্যের বাক্যবান তখনও ছুটছে—"গরবেই যে মলি তুই।"

রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে আসছে মালতী, সারা দেহে মনে কেমন যেন অসহ্য একটা জ্বালা। রাস্তায় ঢোলের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে। নীলপরবের সং বার হয়েছে। পুরোভাগে আসছে মহাদেব সেজে কড়ি ঘোষই। মাথায় শন পাকিয়ে বানিয়েছে ইয়া লম্বা জটা, হাতে ত্রিশূল, কানে ধুতরোর ফুল, বগলে দড়িতে বাঁধা একটা মোষের শিঙ্গ। ঢাকের তালে তালে বেদম নাচছে। চোখদুটো দ্রব্যবিশেষের প্রভাবে বেশ রাঙ্গা। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা মজা পেয়েছে ওইখানেই। কড়ির কোনদিকে নজর নাই, তাণ্ডব নাচে মত্ত।

মালতীর মনের জ্বালা ওর এই নিস্পৃহতায় আরও বেড়ে ওঠে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে কড়িলাল ওই সাজপোষাকেই বাড়ী এসে হাজির হয়। গাঁজাটা মাঝে মাঝে খায়, কিন্তু আজ যেন মাত্রা কেমন ছাড়িয়ে গেছে, মাথাটা ঘুরপাক দিচ্ছে। খিদেও চনচনে হয়ে উঠেছে।

সব কিছু ছাপিয়ে সারা মনে কেমন একটা স্ফূর্তির আমেজ। কতলোকের হাততালি কুড়িয়ে ফিরছে—এর অংশ মালতীরও প্রাপ্য।

উঠোনে পা দিয়েই কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়ে যায় কড়ি। মালতির সারা মুখচোখ থমথমে, গালে শুকনো অশ্রুর ভিজে দাগ। উনুনটা নিভানো।

একনজরেই বুঝতে পারে কড়ি—কি যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। মালতীর কণ্ঠস্বর এমন তীক্ষ্ণ হতে কখনও সে দেখেনি।

"লাজ লাগে না তুমার, ঘরে চাল বাড়ন্ত—আর রোজের পয়সা দিয়ে গাঁজা খেয়ে গাঁময় সং সেজে নেচে বেড়াতে? গলায় দড়ি লাও কেনে।"

গাঁজা খাওয়ার খোঁটা গাঁজার ভক্তরা সইতে পারে না। কড়ি ঘোষত তখন স্বয়ং মহাদেবের সাজে রয়েছে সেই বা পারবে কি করে? গর্জে ওঠে। পুজোর দিন খেয়েছি বেশ করেছি। তুর বাপের পয়সায় ত খাইনি।"

"উপোস দিয়ে থাকো তাহলে। ভাত রাঁধতে আমি লারবো।"

—"আলবৎ পারবি। তুর ঘাড় রাঁধবেক। ওঠ বলছি—"

মহাদেব হাতের ত্রিশূল নিয়েই তেড়ে যায়; মরীয়া হয়ে ওঠে মালতী, মনের জ্বালা যেন ধক্ করে জ্বলে ওঠে। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে—"মারো—মেরেই ফেল আমাকে।"

থেমে গেল কড়ি ঘোষ। হাতের ত্রিশূলটা নামিয়ে বার হয়ে গেল। মালতি তেমনি বসে রইলো।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছিল জানে না মালতী। বাইরে থেকে কার ডাক শুনে এগিয়ে গেল। প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেনি। ফরসা জামা কাপড় পরা একটি জোয়ান। কথা কইল সেই।

—"কিরে মালতি চিনতে পারছিস না নাকি? না অবেলায় কুটম এলাম—চেনা দিবি না। ঘোষ কোথায়?"

বিস্মৃতির যবনিকা সরে যায়। সলজ্জ দুটো চোখ মেলে চাইল মালতী—"রতন। এসো।"

"তবু চিনতে পেরেছিস যাহোক।"

দাওয়াতে একটা খালি বস্তা পেতে দিয়ে হাত পা ধোবার জল তুলে আনলো মালতী।

—সে আজ পরবে মেতেছে, সাঁঝের বেলায় আবার যাত্রা আছে কিনা, আজ তার দেখা পাওয়া ভার।

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক !
, দেখ খুকী
খারাপ না হ'য়ে যায়।
স্কুলে যাচ্ছে
স্কুলে
এস আমরা খেলি !
না, আমার নতুন ফ্রক
তিন মাস পরে
তোমার ফ্রক যে সব ফেঁসে গেছে, খুকী।
আমি ত সাবধান ছিলাম মা !
গ্যারাণ্টি দেওয়া এই ফ্রক দেখুন !
হুঁ…যে কেচেছে এ তারই দোষ !
আমিই কাচি !
…কিন্তু এ আছড়ে কাচার জন্যেই হ'য়েছে, তাতে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে যায়, কলার ও আস্তিনের ফেঁসো বেরিয়ে যায়।
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
মা:
উনি ঠিকই বলেছেন ! এখন আমি সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনায় কাচি, আমার কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে, তাতে পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
Rs 10,000 Reward
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান কাপড়কে আরও টেঁকসই করে

গাঁয়ের খপর বল। ঢেরদিন বাদ দিখা, বিয়ে থা করেছো?"

রতন মুখ তুলে চাইলো। কথার জবাব দিল না। চোখ দুটো কেমন যেন নীরব ব্যথায় টলটলে হয়ে রয়েছে। মালতী ওর চোখের দিকে চেয়েই নামিয়ে নিল ওর চাহনি।

মালতির সঙ্গেই ওর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল। কিন্তু ওর বাবা মালতীর বাবাকে সন্তুষ্ট করবার মত টাকার জোগাড় করতে পারেনি। তাই কড়ি ঘোষই এনেছিল মালতীকে। রতন সেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল ওর মামার বাড়ীতে।

আগেকার সেই স্মৃতিরঙীন দিনগুলোর কথা মালতীর মনে আজ অকারণে ভিড় করে আসে। ওর থেকে রতন বছর পাঁচেকের বড়, কড়ি ঘোষের বয়স আজ পাঁচের কোঠার কাছাকাছি পৌচেছে। রতন আজও যুবক।

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। রতন বলতো।—

"তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না মালতী।"

কিশোরী মালতী আজ যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে অবচেতন মনের ভাণ্ডার থেকে শুকনো স্মৃতির মালায়—কি এক পরম সৌরভের সন্ধান পায়।

"তুই কেমন আছিস, তোর ছেলেপুলে?"

মুখ তুলে একটু হাসবার চেষ্টা করে মালতী সরে গেল—"যাই, ভাতে ভাত চাপিয়ে দিই।"

গুড়ের বাটি আর খাবার জল নামিয়ে দিয়ে সরে গেল সে।

সাজপোষাক খুলে বেনেদের দোকানে তেল মেখে কড়ি ঘোষ চান সেরে ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে পা দিল। গাঁজার নেশা চান করেই ছুটে গেছে। তার উপর লেগেছে খিদে।

উঠোনে পা দিয়েই রতনকে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

—"ওই ঘোষ যে! কি মনে করে? সব খপর ভালো ত।"

রতন উঠে এসে প্রণাম করে।

"হ্যাঁ, সব ভালোই, যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়েই, ভাবলাম একবার খপর লিয়ে যাই।"

মালতী ওদিকে রান্না সেরে এনেছে। রতন চান করতে যেতেই দাওয়াতে জায়গা করে ভাত বাড়তে বসে। এগিয়ে যায় কড়ি।

"সত্যি আমার খুব দোষ হয়ে গেছে ছুটবৌ।"

মালতী কথা কয়না, নীরবে ভাত বাড়তে থাকে কানাউঁচু গয়েশ্বরী থালায়। শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকে কড়ি, "মালতী। এ্যাই।"

মালতী কথা কইল না। আপন মনে কাজই করে যায়। ওদিকে রতনকে ঢুকতে দেখে সরে গেল কড়ি।

বৈকাল গড়িয়ে পড়ে। কড়ি তামুক খেয়ে চলছে, মাঝে মাঝে কাসছে। কাসির ধমকে শিরাগুলো ফুলে ওঠে। দূর থেকে চেয়ে থাকে মালতী ওদের দিকে। রতনের পাশে কড়িকে দেখে কেমন যেন নেহাৎ বেমানান ঠেকে। বুড়ো হয়ে গেছে কড়ি··· অসহায়ের মত ওই কাসি যেন ওর দেহের বার্দ্ধক্যকে প্রকট করে তুলেছে।

রতন যাবার আয়োজন করতে বাধা দেয় কড়ি।

"আজ থেকে যাওহে, দেখ কি রকম যাত্রা হবে আমাদের দলের। তুমাদের হেডামেডার গাঁ লয়, বামুনকায়েতের গাঁ। এল-এ, বি-এ পাশ বাবুরাও কেমন একুটো করবে দেখে যাও।"

—"বাড়ীতে বলে আসিনি কিনা।"

"ধ্যাৎ, কেউ ভাববারও নাই, কইবারও নাই। থেকে যাও।"

কড়ি উঠে পড়ল। যাত্রার আসর বসানোর আয়োজন থেকে—ঢোল তবলা বয়ে আনা, তামুক সাজা—দরকার হলে দূত প্রহরীও সাজা ত তারই কাজ। সুতরাং তার সময় নষ্ট করা চলবে না।

যাবার সময় বলে যায় দেওয়ালের দিকে ফিরে—"যাবি গো তুরা সব।"

বৈকালের পড়ন্ত রোদ নির্জন বাড়ীটার উপর তির্য্যক রেখায় পড়েছে, আমগাছের বুকে একযোড়া ঘুঘু তখনও ডেকে চলেছে একটানা করুণ সুরে।

রতনের সামনে এনে নামিয়ে দিল মালতী এক জামবাটি মুড়ি গুড়, আর খানিকটা দুধ।

রতন চেয়ে থাকে ওর দিকে। গাছের ফাঁক দিয়ে পাতার শাসন এড়িয়ে একঝলক লালচে রোদ ওর চোখে মুখে পড়েছে, ঝলসে দিয়েছে ওর কালো চুলের রাশি। মালতীর দুচোখের দিকে চেয়ে থাকে রতন। অতীতের

দিনগুলোকে খুঁজে মরে ব্যর্থহতাশায়। ঘুঘুর ডাক অপরাহ্নকে বিষাদ করে তুলেছে।—"তুই বদলে গেছিস মাতু।"

চমকে ওঠে মালতী। ওনামে মাত্র একজনই ডাকত তাকে। সে রতন। তার কানের ডগা রাঙ্গা হয়ে ওঠে, সারা শরীরের রক্তপ্রবাহ কেমন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে। মুখ তুলে চাইতে পারে না, চোখের পাতা দুটো কাঁপছে' একি এক অপরিসীম দুর্বলতা।

"খেয়ে নাও, জল নিয়ে আসি আমি।"

কলসীটা তুলে নিয়ে পুকুরের দিকে চলে গেল। আজকের মালতী চমকে উঠেছে—অতীতের সেই কিশোরীর অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখে। এ ভয় না আনন্দ, ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

জল নিয়ে ফিরে এসে দেখে রতন ঠায় বসে আছে, মুড়িতে হাতও দেয় নি।

"খাও নি?"

"একা খাবো না, তুইও বোস।"

রতনের কথায় চমকে ওঠে মালতী। স্বামীর ঘর—ওর সঙ্গে বসে খাবে কি করে?

"শরীরটা যুত নাই—তুমি খেয়ে নাও। অবেলায় খেয়েছি আজ—"

রতন কি ভেবে আর ওকে অনুরোধ জানালো না।

ঘরের কাজকর্ম ঝাঁটপাট সেরে এই সময়টুকু প্রসাধন সারতে বসে মালতী। এতদিন এই পাটটুকু প্রায় তুলেই দিয়েছিল। কড়িই বলতো মাঝে মাঝে—চুল বাঁধিস না কেনে, কেমন মানায় তুর গোরা কপালে কাঁচ পোকার টিপ।

মালতী হাসত—"আমরণ!"

আজও কাঠের আয়নাটা নিয়ে বসে—কুলুঙ্গী থেকে ফিতে, কালো কার, মাথার কাঁটা নিয়ে বসল, বার করল ফুলন তেলের ছোট শিশি। জলটল খেয়ে রতন গাঁয়ে বেড়াতে গেছে। এতবড় বাড়ীখানায় তার মুক্ত গতি ফিরে আসে আবার। কাঁকুইটা দিয়ে লম্বা কোঁকড়ানো চুলগুলোর জট ছাড়াতে থাকে। আজ যেন সাজপোষাক করতে মন যায়। আপনমনে গুণ গুণ করে কেষ্টযাত্রার এককলি গানও গাইতে থাকে।

সন্ধ্যার আবছা আলো নেমে আসে বাগানের বুকে, হাজারো পাখীর কাকলিতে আকাশ বাতাস মুখর। বাঁশ বনটায় আঁধার সবে জমতে সুরু হয়েছে, সন্ধ্যা দেবার সময় হয়ে এল। আয়নার দিকে চেয়ে কপালের টিপটাকে বার বার ঠিক করে বসাবার চেষ্টা করছে মালতী, আঙ্গিনায় কার হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে আদুড় গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করবার চেষ্টা করে। এগিয়ে আসে রতন, "এখন টিপ পরিস মাতু? সত্যি খাসা মানিয়েছে তোকে। বাঃ!"

মালতী কোনরকমে কাপড়-চোপড় গায়ে চাপিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। রতন একটু অপ্রস্তুতই হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বার হয়ে এল মালতী।

"গাঁ দেখে এলে, গানের দেরী কত?"

"ঢের, ঘোষমশাই দেখলাম আসরে সতরঞ্চি পাতচে।"

রতন কি যেন সন্ধানী চোখে মালতীর দিকে চেয়ে রয়েছে। একটা কুণ্ঠা-দীনতায় মালতীর বুক কেঁপে ওঠে। ওকি টের পেয়েছে মালতীর জীবনের ব্যর্থতার! আলোট অস্পষ্ট লালাভ শিখায় জ্বলছে—চারিদিকে নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার···বাইরের কলকোলাহল থেমে গেছে। বাগানের শাখায় শাখায় হাজারো পাখীর চোখে নেমে এসেছে ঘুমের নেশা। চারিদিক জুড়ে একটা অখণ্ড নীরবতা। তারই মাঝে তারা দুজনই যেন জেগে আছে।

—"মাতু।"

মালতীর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যায়—চোখের সামনে কি যেন একটা ঝড়ের মাতন চলেছে। এক স্পর্শ তার সমস্ত দেহমনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

রতন তুলে নেয় তার একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে।

কি এক অগ্নিস্পর্শ। ছাড়াবার ক্ষমতাটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

রতনের দুচোখে কি এক কামনার দুর্বার আগুন জ্বলে উঠেছে, মালতীকে দুহাতে বাঁধনে পিষে ফেলতে চায় সে।

মালতীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেবার আগুন লাগার দৃশ্যটা, সারা ঘরখানাকে গ্রাস করে ফেলতে আসছে ঘিরে ফেলেছে তাকেও, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। তেমনি এক আগুনের মধ্যে সে পড়েছে। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে নিজেকে এক ঝটকায় মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো, হাঁফাচ্ছে রতন মাতু।

গর্জে ওঠে মালতী—"না—না, যাও তুমি। এখান থেকে চলে যাও—এখুনিই যাও।"

রতন ধীরে ধীরে যেন জ্ঞান ফিরে পায়। মাথা নীচু করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার মূর্তিটা। মালতী অপরিসীম অসহায়তায় ভেঙ্গে পড়ে দুর্বার কান্নায়। কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে তার দেহ। মুছে গেল চোখের সযত্নে আঁকা কাজল—কপালে কাঁচপোকার টিপ—মাথার খোঁপা আসে শিথিল হয়ে—অজ্ঞাতেই ঝরে পড়ে একথোকা সাদা বাসক ফুল, কোন খেয়ালে আজ তুলে গুঁজেছিল খোপায়।

কতক্ষণ বসেছিল জানেনা। অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ওঠে। এই নিবিড় আঁধারের বুকে নিজের অন্তর সত্তাকেই কেমন যেন রহস্যময়ী বলে মনে হয়। না হলে যে রতনকে নিজে সে দূর করেছিল বাড়ী থেকে এই রাত্রিতেই, তার জন্যই বা এত সাজপোষাক করা কেন? অন্ধকারে তার ফিরে আসার পায়ের শব্দ শোনাই বা কেন? অজ্ঞাতেই মনটা যেন খুসি হয়ে ওঠে···না রতন নয়—কড়ি ঘোষই।

—"রতন কোথায়।"

—চলে গেছে সাঁঝবেলাতেই, বাড়ীতে কাজ আছে।

কড়ি বিস্মিত হয়ে যায় মালতীর ব্যবহারে। তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে মালতী বলে ওঠে—"তুমি আজ আর যেও না আমাকে ফেলে। বড্ড ভয় করছে।"

বিস্মিত হয়ে যায় কড়ি—সে কি রে? যাত্রা জমে উঠেছে—যা গান গাইল বিবেক—

"হোকগে, তুমি যেও না আর।"

কচি খুকির মত মাথাটা এগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মালতী নিজেকে সঁপে দেয় কড়ির বুকে। আধবোজা চোখে কড়িকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে মালতী "এমনি করে রাতে ভিতে ফেলে যাও, যদি কুনদিন কুন বিপদ ঘটে কি হবেক?"

—"না রে পাগলী! ছাড় গান শেষ করেই চলে আসবো। জাড় করছে গায়ের কাপড়টা লিতে এলম।"

জোর করেই এক রকম নিজেকে ছাড়িয়ে কড়ি বার হয়ে গেল।

একা নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে প্রহর গণনা করবার জন্য পড়ে রইল মালতী। সারা মনে একটা রুদ্ধ আক্রোশ গর্জে ওঠে। নিজেকে বার বার অপমান করাটাও অসহ্য হয়ে ওঠে আজ।

ঘুম আসে না। রাতের বাতাসে ভেসে আসে যাত্রার দলের ঢোলের শব্দ—যুদ্ধের বাজনা বাজছে। চোখের সামনে ভাসে—আসরের এককোণে আধপাকা চুলভর্তি মাথা নাড়িয়ে হুঁকো হাতে কড়ি ঘোষ তারিফ করছে। সারাটা মন বিষিয়ে ওঠে।

খুলে ফেলে মালতী তার নীলাম্বরী শাড়ী—হাতের পৈঁছা, মাথার দীঘল খোপা; ছেঁড়া একটা ময়লা শাড়ী পরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

বাতাসে কোথা থেকে ভেসে আসছে বকুলফুলের তীব্র সুবাস—চোখের সামনে ভেসে ওঠে রতনের ব্যথাকাতর চাহনি, নিজের জীবনের এই বঞ্চনা···

দুচোখ ঠেলে নেমে আসে জলধারা। বালিশটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—রাত্রি নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসে।

একটি সন্ধ্যার অনুরাগ মালতীর বুকে যে রংএর মাতন তুলে গেছে তাকে ভুলতে পারে না। অহরহ তার মনের পরতে ভেসে ওঠে—রতনের সেই ব্যথাকাতর চাহনি। অজ্ঞাতেই তার বুকে বেদনা জাগায়—ততই সে নিজেকে ভুলতে চায়, ডুবিয়ে দিতে চায় কড়ির মধ্যে। কড়ি ঘোষও একটু বিস্মিত হয়।

"কি হ'ল তোর বলদিকি মালতী, হঠাৎ যেন যৌবন ফিরে পেলি।"

মালতী হেসে ওর বুকে মুখ লুকোয়।

"ছেলেপুলে না হলে ঘরদোর যেন সবই ফাঁকা ঠেকে, লয়রে।"

মালতী চমকে ওঠে কড়ির কথায়। চকিতের মধ্যে তার চোখে ভেসে ওঠে কি এক নিঃস্ব চাহনি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়—"বেশ আছি—ঝামেলা নাই।"

কড়ি কথা বলে না—আপনমনে হুঁকোতে টান দিতে থাকে।

কালো গরুর দুধটা কমে আসছে। রোজের দুধ যোগান দিতে গোলমাল সুরু হয়। মিত্তিরদের কচি খোকার দুধটা তাকে যেমন করে হোক দিতেই হবে; মিত্তির গিন্নির তবুও মন ওঠে না। দুধ কম হলেই গজ গজ করে।

—"ছেলেপুলের দুধ, যেমন করে হোক দিতেই হবে।"

—"দিই ত কাকীমা, গরুতে যে দুধ ছেড়ে দিল—"

—"অন্য বাড়ীতে দুধ ত ঠিক দিচ্ছিস? ছেলেপুলের মর্ম বুঝবি কি বল, চিনিস কেবল পয়সা—জল বেচা পয়সা বলেই ত ছেলেপুলে হোল না।"

জল এক আধটু দেয় সত্যিই, কিন্তু এই অপবাদ—এই কথাগুলো মালতীর অসহ্য। সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠে যায়। ফট করে বলে ওঠে—"অন্য জায়গায় দুধের রোজ করো কাকীমা, দুধ যোগান দিতে আমি লারবো।"

এরপর মিত্তিরগিন্নির কথাগুলো আর বাধা মানে না। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে শুনিয়ে দেয়—সাতজন্ম বাঁজা তালগাছ হয়েই থাকবি এই মতির গুণে।

ঘটিটা তুলে নিয়ে নীরবে বার হয়ে আসছে—চোখের পাতায় টলটল করে আসে অশ্রু। মেজবৌ শাশুড়ীর কথাগুলো শুনেছিল, দরজার কাছে ওর হাত দুটো ধরে বলে ওঠে—"বুড়ো মানুষ ওর মেজাজের ঠিক নাই, কিছু মনে করিস না মালতী।"

মালতী মেজবৌএর দিকে ডাগর চোখ দুটো তুলে চাইবার চেষ্টা করে। টপ টপ করে ঝরে পড়ে মেজবৌএর হাতের উপরই সন্তানহীনা নারীর ব্যথাকাতর অশ্রুবিন্দু। নীরবে বার হয়ে এল মালতী।

অন্তরের কামনার একটা বহিঃপ্রকাশ যখন হয়—কামনার তীব্রতাও কমে আসে। সে তিক্তপ্রকাশই হোক, আর সুষ্ঠুপ্রকাশই হোক, কামনার তীব্রতা তাতে কমে। কিন্তু সে সাময়িক। মালতী একটি স্বপ্ন-সন্ধ্যার কল্পনা তাই কোনদিনই তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না, রতনের সে ব্যর্থ দৃষ্টি তার স্বপ্ন-নারীত্বের কাছে বার বার নিস্ফল আবেদন জানিয়ে ফিরে যায় আজও। সেই ঘটনার পর রতন আর এদিকে আসেনি। নিজেকে সেই রাতের প্রবল আকর্ষণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে মালতী যতখানি আত্ম-নির্য্যাতন করে চলেছে এর মূল্য কড়ি কোনদিনই বুঝবে না। তার দামও দেবে না। তবে কার জন্য—কিসের জন্য এই নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহ জানে না মালতী—হয়ত তথাকথিত সংস্কার। তার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শাসনের নাগপাশ কোন অলক্ষ্য থেকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রেখেছে।

রতনেশ্বরের শিবের গাজন শুরু হয়ে গেছে। মালতীও গেছে মেলা দেখতে। হাজারো জনতার ভিড়ে বিশাল জায়গাটায় তিল ধারণের স্থান নাই। মালতীও সেজেগুজে পান গালে দিয়ে অবাক হয়ে নাগরদোলার ঘুর্ণিপাকের দিকে চেয়ে রয়েছে। কড়ি ঘোষ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মেলা ঘুরতে ব্যস্ত।

হঠাৎ ভিড়ের একধারে রতনকে দেখে চমকে ওঠে মালতী। রতনও তাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন না দেখারই ভান করে এগিয়ে যায় অন্যদিকে। হাজার অপরিচিত-মুখের মধ্যে রতনকে দেখে—মালতী স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একটা আমগাছের ছায়ায়।

—"দেখেই যে পালাচ্ছ?" হাসছে মালতী?

রতন জবাব দেয়—"সেদিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলি, আবার মেলাখেলায় পঞ্চজনের সামনে যদি অপমান করিস—সেই ভয়েই পালাচ্ছিলাম।"

মালতীর হাসি মুছে যায়, কম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয় সে "তা বলতে পারো, কিন্তু একধোপেই যে কাপড় ফেটে যায়—তার দাম কি বল। তুমি ত আর কুন খপরই লাও নি।"

রতন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না, ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। হেসে আবহাওয়াটা লঘু করে মালতী—

—"চল মেলা দেখে আসি—"

—"ঘোষ আসে নি?

"কে জানে সী কুথায় ঝাণ্ডির আসরে বসেছে হয়ত। চলো—"

আজ মালতীই ওর একটা হাত ধরে টান দেয়। কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে।

সন্ধ্যার পরে মেলার আলো জ্বলে উঠেছে। সার্কাসের তাঁবুর বাইরে ক্লাউনের নাচ দেখে মালতী হেসেই গড়িয়ে পড়ে রতনের গায়ে—"আমরণ, মিনসে বেহায়ার শেষ!"

রাত্রি হয়ে গেছে, মেলা থেকে বাড়ী মাইল দুয়েক পথ। লোকজন যাতায়াত করছে, কিন্তু মালতীর একা যেতে সাহস হয় না। কড়িও কোথায় জমে গেছে।

"একটু এগিয়ে দাও না কেনে?"

রতনকে নিয়ে বার হ'ল মালতী বাড়ীর দিকে।

নিঝুম—গনগনে রাত, জেগে আছে শুধু দু'একটা

তারা। অন্ধকার ভেদ করে দূর থেকে দেখা যায় মেলার আলোকছটা, সার্কাসদলের ব্যাণ্ডের বাজনা।

গাঁ নিশুতি, ওরা এসে উঠানে পা দিল।

আঁচল থেকে চাবি বার করে ঘর খুলে আলো জাললো মালতী। রতনের পা দুটো টনটন করছে। দাওয়ার উপর বসে পড়ে।

খাবার তৈরী করেই গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি রতনকে আসন করে খেতে দেয়, মুড়ি—মেলাথেকে কিনে আনা তেলেভাজা কয়েকটা বোঁদের মিঠাই, জিলাপী।

রতন একটু বিস্মিত হয়ে যায়—"কি ব্যাপার বল দিকি তুর ?"

হাসে মালতী—"সিদিন না খেয়েই চলে গিয়েছিলা—আজ একটুকুন জল মুখে না দিলে কি চলে ?"

কড়ি বেশ দমভোর টেনে বসেছে জুয়ো খেলার আসরে। ফতুয়ার পকেট থেকে দু'আনি সিকি বার করে—আর কর্কশ কণ্ঠে হেঁকে ওঠে—জাগজ। সঙ্গী নটবর ও তেমনি টলটলায়মান, দেখতে দেখতে কোন ফাঁক দিয়ে পকেটের আঠার আনা পয়সা গলে গেল বুঝতেই পারে না। চেতনা ফেরে তখন।

ঝাণ্ডিয়ালা ভিড় পরিষ্কার করতে চায়—"সরে যাও—না হয় খেল।"

কড়িলাল এতক্ষণ সামনে বসেই খেলেছিল, আর পয়সা নাই সুতরাং সামনে বসবার অধিকারও নাই। কিন্তু দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ঝণ্ডিয়ালার দলবল বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিল।

মারধোর খেয়ে কড়ি ঘোযের খেয়াল হয়—মালতীকে মেলায় নিয়ে এসেছিল। বেশ খানিকক্ষণ খোঁজবার চেষ্টা করে, কিন্তু এত ভিড়ে কোথায় পাবে। তিক্তবিরক্ত হয়ে গ্রামের পথ ধরে। মাথাটা তখনও পাক দিচ্ছে, হাতটায় একটা অসহ্য বেদনা, ঝাণ্ডিয়ালার মারটা হাড়ে হাড়ে মালুম পায়।

বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল কড়ি। আলো জ্বলছে—মালতীর হাসির শব্দ কানে যেতেই একটু বিস্মিত হয়, আর কার সঙ্গে যেন কথা কইছে। চকিতের মধ্যে সমস্ত মাথা ঝাঁঝাঁ করে ওঠে, শিথিল পেশীগুলো সবল হয়ে ওঠে, দৃঢ় পাদবিক্ষেপে বাড়ীতে ঢুকল সন্তর্পণে।

দাওয়াতে বসে খাচ্ছে রতন, এমন করে সাজিয়ে তাকে কোনদিন খেতে দিতে দেখে নি কড়ি, মালতীর সাজ-পোষাক আজ মাদকতাময়, মুখে পড়েছে একঝিলিক আলো, হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে। মাথার কাপড়খানা পড়ে গেছে কাঁধের উপর।

কার পায়ের শব্দে দুজনেই চমকে ওঠে, মালতী মাথার কাপড়খানা তুলে দেয়। এগিয়ে এল কড়ি, দুচোখে তার আগুনভরা দৃষ্টি। একটু বাঁকাসুরেই বলে ওঠে—"রতন যে, মাঝরাতে কি মনে করে ?"

রতনও একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মালতীই বলে ওঠে—"মেলায় কুথায় ফেলে চলে গেলা। আমি ত ভেবে ভয়ে সারা, ভাগ্যি ওর দেখা পেলাম—"

কড়ি বলে ওঠে—"হাঁ, তা আবার লয়, চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম মাটি, সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরীতি। লাজ লাগে না তুর ?"

রতন খাওয়া ফেলে উঠে পড়ে—কি যা তা বলছ ঘোষ ? নেশা করে—

গর্জে ওঠে কড়ি—"ঠিকই বলছি, আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আবার আমাকে গাল দেওয়া ? গাঁয়ে কি মানুষ নাই ? এটা বামুন কায়েতের গাঁ—পুঁতে দোব মাটির তলায়—এ সব নষ্টামী মতলবে ইথানে এলে।"

রতন রুখে দাঁড়ায়—"একবার এগিয়ে দেখ না।"

কড়িলাল ক্ষেপে উঠেছে, চালের বাতা থেকে একটানে পাতাকাটা একটা হেঁসো বার করে ফেলে। এগিয়ে আসে মালতী—রতনের হাত ধরে টেনে নেয়—"চলে যাও তুমি, খামোকাই দুস্থি হয়ো না, আমার বরাতে যা আছে থাক, তুমি চলে যাও।"

বার হয়ে গেল রতন, রাগে ফুলতে ফুলতে। কড়ি হাতের হেঁসোখানা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে এসে মালতীর খোপাটায় টান মেরে লম্বা চুলের রাশ খুলে ফেলে, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে যায় মালতী, কড়ির বৃদ্ধ শরীরে আসে তারুণ্যের উদ্দামতা—কিল চড় লাথি বর্ষণ করে চলেছে ধরাশায়ী অর্দ্ধবিবস্ত্রা মালতীকে। নীরবে মার খেয়ে যায় সে, রাতের অন্ধকার কেমন যেন গাঢ় হয়ে আসে চোখের সামনে, তার পরে আর কিছু মনে নাই।

সকালে বিছানা থেকে উঠতে পারে না মালতী,

কালকের রাত্রির ঘটনাটা তখনও চোখের সামনে আবছা হয়ে ভাসে, সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কড়ির উপর। জীবনের কোন সাধ-কামনাই যেখানে মিটলো না সেখানে এই ব্যবহার অসহ্য। বিনাদোষে ওর আক্রমণটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না মালতী। বাপের বাড়ীই চলে যাবে, তারপর যা থাকে কপালে। একটা হেস্ত নেস্ত সে করবেই। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে অনুভব করে মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা। কপালে হাত দিয়েই হাতটা সরিয়ে নেয়, কাল রাত্রিতে জায়গাটা বেশ খানিকটা কেটে গেছে। ধীরে ধীরে উঠলো সে। আলনা থেকে দুটো শাড়ী নামিয়ে বাঁধতে থাকে একটা পুঁটুলিতে।

কড়ি তামাক খাচ্ছিল—বলে ওঠে—"কি হবে ওতে ?"

"বাপের বাড়ী চলে যাবো, এমনি করে মার খেতে পড়ে থাকবো নাই ইথানে।"

কড়ি জবাব দেয় না। মনে মনে কালকের রাত্রির ঘটনাটা ভাববার চেষ্টা করে। এমন কিছু সে ত দেখে নি, যার জন্য এত বড় একটা কাণ্ড সে বাধিয়েছিল। গাঁজার নেশা আর ঝাণ্ডিয়ালার মার খেয়েই মেজাজটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল—তারপর ঘটে গেল এমনি একটা কাণ্ড।

নীরবে কাস্তেটা তুলে নিয়ে ছাগলের জন্য পাতা কাটতে বার হয়ে গেল।

ঠায় বসে থাকে মালতী, সব স্বপ্ন—মায়া তার কেটে গেছে। ঘর বাঁধতে সেও চেয়েছিল! কিন্তু ব্যর্থতা বঞ্চনা আর অপমানই তার কামনার সব কুসুম ঝরিয়ে দিলে। আজ আর মিছে মায়া তার নাই। সকালের আলো ম্লান হয়ে গেছে, পাখীর ডাক কানে আর আসে না। গরুগুলো জাবনার আশায় চেয়ে রয়েছে তার দিকে; সব অদৃশ্য বন্ধন তার ঘুচে গেছে। তার অজ্ঞাতেই চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

কতক্ষণ এমনি করে বসেছিল জানে না, একটা কোলাহল কানে যেতেই চমকে ওঠে। কারা যেন ধরাধরি করে একটা লোককে তুলে আনছে তাদেরই বাড়ীর দিকে। পিছনে ভিড় করে আছে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা।

মালতী যেন স্বপ্ন দেখছে। কড়ি ঘোষ পাতা কাটতে অশথ গাছে উঠেছিল, উঁচু ডাল থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়েই এই কাণ্ড বাধিয়েছে। বাঁ পাখানা ভেঙ্গে গেছে, সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ। অচেতন দেহটা ওরা দাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে, কে যেন ডাক্তার ডাকতে ছুটল। মালতী নড়বার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছে, কণ্ঠনালী দিয়ে স্বরও বার হয় না তার।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল জানে না। ধীরে ধীরে তার উঠান থেকে ভিড় কমে আসে। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে শুইয়ে দিয়ে গেছে। কে যেন বলে—"একটু দুধ গরম করে খাইয়ে দে ছোটবৌ।"

মালতী দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পা দুটো তার কাঁপছে। কানে আসে ঘরের ভিতর থেকে আহত কড়িলালের অস্ফুট গোঙানির শব্দ।

কার স্পর্শ পেয়ে কড়ি চোখ মেলে চাইল। দুটো ডাগর জলভরা চোখে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। এ যেন আগেকার সেই নোতুন মালতী।

—"খুব লেগেছে লয় ?"

নীরবে চেয়ে থাকে কড়ি তার দিকে, বলবার চেষ্টা করে—"আর বাঁচবো না রে, শুধু শুধু তুর কাছে দোষাই হয়ে রইলাম।"

মালতী সান্ত্বনা দেয়—"না, ডাক্তারবাবু বল্লে সেরে উঠবা, বাবা রতনেশ্বরের কাছে মানত করে আসবো আমি—"

কড়ি জবাব দেয় না, চোখ বুজে সারা মন দিয়ে মালতীর স্পর্শটুকু অনুভব করতে থাকে।

কাজকর্ম সেরে এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে মালতী শিবের মন্দিরের দিকে। জাগ্রত দেবতা—সকলেরই কামনা বাসনা পূর্ণ করেন। কাল রাত্রি থেকেই উপবাসী রয়েছে। বেলা গড়িয়ে পড়েছে, মন্দিরের শত শত জনতার মাঝে সেও স্থির হয়ে বসে থাকে। পূজোর পর প্রসাদী ফুল নিয়ে বার হয়ে এল।

পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে। চলবার সামর্থ্য তার নাই। বাঁধের উপর রতনকে দেখে একটু বিস্মিত হয়। রতনও চেয়ে রয়েছে তার দিকে। পরণে লাল পাটের শাড়ী, ডুব দিয়ে চুল এলো করে একটা গিঁট বেঁধেছে। শাড়ীর খুঁটটা গলায় জড়ানো।

—"ওরে বাস্‌রে—ইযি ভৈরবী সেজেছিস লাগছে।"

কথা কইল না মালতী। নির্জন বাঁধের পাড়ে স—

খাগড়ার বনে বাতাসের আনাগোনা, সোদালফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে মাটির বুকে। এগিয়ে আসে রতন—মালতীর কাছে। ওর কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে—"কাল রাতে মেরেছে এমনি করে? এখনও কিসের মায়ায় পড়ে আছিস তুই ওখানে?"

মালতী ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইল। ডাগর ঢল ঢ'লে দুটো চোখে বাঁধের জলধারার প্রতিবিম্ব। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে মালতী—"একটা কথা রাখবি রতন, বল আমার গা ছুঁয়ে, হাতে আমার পেসাদী ফুল রইছে, কথার মান রাখিস কিন্তু।"

এগিয়ে আসে রতন। দুচোখে তার আশার আলো। সে সুখী করতে চায় মালতীকে। তার কৈশোরের স্বপ্নকে সফল করতে চায়। মালতীর হাতখানা তুলে নেয় রতন—"বল। আমি কথা দিলাম।"

—"আর কুনদিন আমাদের গাঁয়ে আসিস না, তু সঙ্গে যেন দেখা আর না হয়।"

চমকে ওঠে রতন—"মালতী—শোন—শোন।"

মালতী কথা কইল না, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপ এগিয়ে চলে, দু চোখের জলে পথ তার ঝাপসা হয়ে যায় বাতাসের আনাগোনা চলেছে সরবনের মধ্যে। রত পিছনে পড়ে রইল।

কড়ি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মালতীর দিকে। তা মাথায় ফুলগুলো ঠেকিয়ে তুলে রাখে মালতী।

—"কাঁদিস না মালতী, ভাল হয়ে উঠবো আবার।"

মালতীর কান্না থামে না, কড়ির বুকে মাথা রে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, সব পাপ ধুয়ে যাক চোখের জলে ফুলের মত শিশিরস্নাত হয়ে উঠতে চায় সে। কা নীরবে ওর একরাশ চুলে হাত বুলিয়ে চলে।

যজ্ঞ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

বশিষ্ঠের বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বামিত্র হয় ঘূর্ণ্যমান,
দম্ভ হয় অবলুপ্ত ব্রাহ্মণের করুণা-ধারায়;
সে কথা ভুলিনি মোরা—এতদিন এত কথা শুনি—
রাজসূয় অশ্বমেধ, যাহা দেখি' রাজারা ডরায়,
সব হয়ে যায় ক্ষীণ, প্রতীচ্যের দিগন্ত-বিলীন
লালসায়-জিঘাংসার প্রজ্জ্বলিত ধূমাগ্নি-চিতায়।
স্মরণের কোণে জাগে দধীচির দেহাস্থি-বিতান,
শিবি আর শ্যেন দ্বন্দ্বে তুলা-দণ্ডে কে বড় কে হীন।
যজ্ঞ আজ ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের কুশণ্ডিকা-স্থলী—
পূতি-গন্ধে পূর্ণ করে দশদিক পুবে ও পশ্চিমে।
কোথা গেল সে রম্যতা, সে স্নিগ্ধ সুশান্ত পরিবেশ—
মানুষের মেদ নয়, মানুষের আতপ্ত কাকলী?
ভুলে গেলে চলিবে না—এ জীবন-যজ্ঞের আধার,
আহুতি যে সমর্পণে তিলে তিলে আত্ম-বলিদানে।
ফুল হয়ে ফুটে ওঠা, সে কি শুধু ফুলের কারণে?
বেদ হয় পরিবেদ, শূন্যগর্ভ দম্ভের প্রচার।
জ্ঞান-যজ্ঞে ডাকি আজ জগতের সকল মানবে—
সহ-ভুক্তি সহ-তৃপ্তি, সহযজ্ঞ, আমলক-করে
আসিয়াছে দুনিয়ায় বিজ্ঞানের সকল গৌরব,
যজ্ঞ-পূত হোক্ সব, ভুলে যাক্ মরণ-আহবে।

জীবন-দেবতা

শ্রীরঞ্জিতকুমার দেব

রাত্রি হয়েছে বন্ধ্যা
প্রভাতের আনেনা সন্ধান,
নিদ্রালসা তারকারা খুঁজিছে আশ্রয়
আলোর প্রাঙ্গণে;
সমুদ্র শুকায়ে গেছে,
নুনের পাহাড়ে ঘেরা দিগন্তের ধূসর
সীমানা। বুভুক্ষু মানুষ,
ঘোমটার অন্তরাল হতে বধুর ক্রন্দনে,
কীটাণুর মতন জীর্ণ উলঙ্গ শিশুর আর্তনাদে
বিদীর্ণ আকাশ।
চারিদিকে
জীবন ঘুমায়ে আছে শ্মশান-শয্যার
কালোস্তূপে; পাপিয়ারা চলে গেছে জৈব ক্ষুধা নিয়ে
মহাশূন্য পার হয়ে
জীবাণুরে জানাতে আহ্বান।
জীবনদেবতা তুমি খুলে দাও কঠিন বন্ধন!

মুক্তির অঙ্গনতলে তোমার পরশ,
সৃষ্টির মন্দির মাঝে স্পন্দনে স্পন্দনে
জন্মদিক্ পৃথ্বীরে আবার।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতার প্রান্তে জনবিরল পথ—গাছতলা

গঙ্গার ধার

বাউল গান গাহিয়া চলিয়াছে

পথের ঘোরে মলেম ঘুরে পেলাম নাকো ঘরের ঠিকানা।
আকাশ জুড়ে লক্ষ নিশান কোন নিশানে আমার নিশানা?
ও হায় চিনতে নারি—নাই জানা।
কে বলে দেয়, কে ব'লে দেয়, কে ব'লে দেয় গো!
এসে আপন ঘর দুয়ারে
ফিরে গেলেম বারে বারে
ঝাপসা চোখে চিনল নারে অহঙ্কারে করলে মানা
সেই ঘরেরই অঙ্গনেতে
আমার লাগি আসন পেতে
দুখীর বেশে বসে আছে আমার পরম আপন জনা।
ও হায় বুঝতে নারি নাই জানা।
কে বলে দেয়, কে ব'লে দেয়, কে ব'লে দেয় গো!
আমার নিশানা—ঘরের ঠিকানা।
চোখ জুড়ে মোর, ঘুম নেমেছে, পারি না হায় আর পারি না।
আর পারি না গো!

প্রস্থান

সুমিতার প্রবেশ

সুমিতা। চোখ জুড়ে মোর ঘুম নেমেছে, পারি না হায়, আর পারি না গো! কিন্তু ঘুম যে এল না। কি করব?

নেপথ্যে রিক্সার ঘণ্টার শব্দ

নেপথ্যে পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর। জয় কালী! জয় কালী অমৃতময়ী! রোখ—রোখ, ওরে রোখ রে বাবা মাণিক আমার, ওরে কালী বলে চরণ জুড়ি থামারে বেটা পক্ষীরাজের ছানা!

নেপথ্যে রিক্সাওয়ালা। রোখে গা? হিঁ-য়া?

পরমেশ্বর। হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। নামা—নামা। বুড়া বয়সে লাফ্ মারকে নামবার কি তাগদ হ্যায় রে নওজোয়ান? নামা।

সুমিতা চকিত হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল

সুমিতা। কে? দাদু? পরম দাদু!

স্নানার্থী বৃদ্ধ পরমেশ্বরের প্রবেশ

পরম। জয় কালী বলে তোদের এই চরম গুঁতোগুতির মধ্যে পরম ছাড়া আর কোন অভাগা আসবে ভাই? কিন্তু কালী বলে—পাগলী আমার দয়াময়ী—কালী আমার আনন্দময়ী! তোর দেখা পেয়েছি। চল ফিরে চল ভাই!

সুমিতা। না দাদু, ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব। ফিরব বলে আমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চলে আসি নি।

পরম! কিন্তু তোকে ফিরতে হবে।

সুমিতা। না। ও অনুরোধ করবেন না দাদু। আপনি ফিরে যান—আমার পিছনে এমন করে ছুটবেন না।

পরম। তোর পিছনে ছুটি নি ভাই। ছুটেছিলাম সেই পাগলের পিছনে। পাগল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সেই বড় মটরটায় চড়ে আমাকে ফেলে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় চেঁচিয়ে ব'লে গেল—চল্‌লাম দাদু—চল্‌লাম তিলোত্তমার সন্ধানে।

সুমিতা। (হাসিয়া উঠিল) আমি তো তিলোত্তমা নই দাদু—আমি ফিরে গিয়ে কি করব? (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল) তার উপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই দাদু—সেই সঙ্গে পৃথিবীর উপর শ্রদ্ধা আমার চলে গেছে। তাই আমি আগে চলেছি—পুরুষোত্তমের সন্ধানে। আমি ভগবানের পায় আত্মসমর্পণ করতে চলেছি। পিছনে ডেকে—আমায় বাধা দিয়ো না; ফিরে যাও তুমি।

পরম। কালী বলে—ফিরে যাব? ওরে সুমিতা—ওরে আমার কথা শোন—ফিরে চল। তুই মরতে গিয়েছিলি—কিন্তু মা কালী তোকে বাঁচিয়েছে। হয় তো দুঃখ দেবার জন্যে বাঁচিয়েছে সর্ব্বনাশী। তুই আমার সব কথা শুনলি নে ভাই—আগেভাগেই বলে বসলি—আমি তো তিলোত্তমা নই। আগে তুই আমার কথাগুলো শোন কালী ব'লে। সে ছোঁড়া পালাল গাড়ী চ'ড়ে। আমি বুড়ো—রিক্স ক'রে গেলাম তোদের বাড়ীতে। সেখানে উৎকণ্ঠায় সারারাত কাটল। আজ সকালে এ্যাটর্ণি খবর দিলে—সে তার টাকাকড়ি ঘরবাড়ী সব দাতব্য ক'রে আমাকে তার ট্রাষ্টি করে দিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর পুলিশে সেই গাড়ীখানা এনে হাজির করলে, গাড়ীখানা রাস্তার ধারে পড়েছিল। খানিক পর ডাকের চিঠি এল—আমার নামে। এই দেখ—হতভাগা কি লিখেছে।

চিঠি বাড়াইয়া দিল

সুমিতা। (কম্পিত হস্তে চিঠি লইতে হাত বাড়াইল)

পরম। কালী ব'লে সে গোঁয়ারটা কি লিখেছে দেখ—"দাদু তিলোত্তমার ঠিকানা পেলাম—মরণের কালো ঘর আলো করে বাসা বেঁধে বসে আছে, মন বলছে—আমারই জন্যে। সুমিতাকে বলবেন—সে তার পুরুষোত্তমকে খুঁজে পাক। হয় তো তিলোত্তমার পাশের মহলেই তার ঠিকানা।" কালী কালী বল মন—কালী রক্ষা কর মা। কালো ঘুচিয়ে আলো জ্বেলে দে বেটী। সুমি আয় ভাই—আর দেরী করিস নে। তোকে ওর মধ্য থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে তোর কামনার পুরুষোত্তমকে।

সুমিতা। (চীৎকার করিয়া উঠিল) কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজে পাবে দাদু? যে ঠিকানা সে দিয়ে গেছে—

আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। সভয়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল

পরম। কালী বলে কালের কোলে ঝাঁপ দিয়ে সে-ঠিকানায় একনিমেষে মহাকাল পৌঁছে দেয় দিদি। আর সে ঠিকানায় গেলে—কালীর আমার কড়া শাসন—এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা যায় না। ভাবনা কি? সে ঠিকানায় সে যদি গিয়েই থাকে—তবে তুইও যাবি। এখন চল—কালী বলে খেলা ঘরের এ কোণ ও কোণ খুঁজে আগে দেখে নি। আয় আমার সঙ্গে।

সুমিতা। যাব, এক সর্ত্তে।

পরম। কালী বলে বল ভাই কি সর্ত্ত?

সুমিতা। আগে আমার হাতে বিষ এনে দিতে হবে। যদি দেখি—সে আমার উপর প্রতিশোধ নিয়ে বসে আছে—তা হ'লে—

পরম। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল) দেব, তোকে দেব—আমি কালী বলে শপথ করছি ভাই, তাই আমি দেব তোকে। তা হ'লে তোকে লুকোব না দিদি—সঞ্জীবের খাওয়া বিষের অর্দ্ধেকটা পড়েছিল—সেটা আমি তুলে রেখেছি। তোর জন্যে কালী বলে তুলে রেখেছি।

সুমিতা। (চীৎকার করিয়া উঠিল) দাদু!

পরম। কালী বলে বলি তোকে শোন ভাই। ছোঁড়া হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পালাল। আমি কি করব—বাড়ী ফিরলাম। তোদের বাড়ীতেই গেলাম। ছোঁড়া ফিরল রাত্রে। মনে হল মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেছে। ওরে সে কি হৈ হৈ। সে কি হল্লা। সঙ্গে রাশি রাশি ফুল। সেই ফুল দিয়ে তার শোবার ঘর সাজাবার হুকুম দিলে। গান গাইতে পারে না—ছোঁড়া চীৎকার করতে লাগল—দে দোল, দোল; দে দোল দোল।

এ মহাসাগরে তুফান তোল।

বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।

প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয় রোল।

সুমিতা ভাই, পাশের ঘরে শুয়ে কাঁদলাম তোর জন্যে। কালীর উদ্দেশে মাথা খুঁড়ে বললাম—মা, সে তোর কাছে কি দোষ করেছে—যে সে তোর পায়ে আশ্রয় নিতে নিজের বুকে গুলি করতে গেল—সেই গুলি থেকে তাকে বাঁচালি? এইজন্যে বাঁচালি মা? তোকে হাজার আশীর্ব্বাদ করে বললাম—ভাল করেছিস ভাই এ পাষণ্ডের রাজঐশ্বর্য্যে মুখের ভালবাসায় লাথি মেরে তুই পথে বেরিয়েছিস। ভাল হোক, তোর জয় জয়কার হোক। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি কখন। হঠাৎ ঘুম ভাঙল শেষ রাত্রে চাকরদের হাঁকে-ডাকে। দেখি—সঞ্জীব বিষ খেয়েছে—গোঙাচ্ছে। নীল হয়ে গেছে মুখ। তোর ওই ঘটনার পর—পুলিশ বন্দুক পিস্তল সব নিয়ে গেছে। হতভাগা—অন্য বিষ জোগাড় করতে পারে নি—আফিং জোগাড় করে তাই খেয়েছে। মাথার গোড়ায় অর্দ্ধেকটা তখনও পড়ে।

সুমিতা। সে আফিং কোথায়? দাও, আমাকে দাও। দাদু তোমার পায়ে পড়ি।

পরম। ব্যস্ত হস নে। কালী বলে শপথ করেছি তোর কাছে। সঞ্জীব যদি না বাঁচে তোকে দেব। নিজে হাতে তুলে দেব—যদি কম মনে হয়—আমার কৌটো থেকে পূরণ করে দেব। ডাক্তার এসেছে—তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ভাই আমি ছুটে বেরিয়েছিলাম—মায়ের কাছে গিয়েছিলাম—মাথা ঠুঁকে বলে এলাম—বাঁচিয়ে দে মা—মহাকালের বাড়ানো হাত নামে শুধু তোর হুকুমে—কালী ব'লে হুকুম কর বেটী—হুকুম কর পাগলাকে হুকুম কর—হাত নামিয়ে নিক—গুটিয়ে নিক। সেই পথে পথে ফিরছি ভাই। হঠাৎ পথে দেখলাম তোকে। ঠিক চিনতে পারলাম না, মনে হল—যেন তুই। তবু জয় কালী জয় কালী ব'লে চেঁচিয়ে উঠলাম, তুই মুখ ফেরালি—এবার ঠিক চিনলাম। চল ভাই বাড়ী চল। কালী বেটীকে বিশ্বাস নেই—কালী ব'লে ও মেয়ে মর্ম্মান্তিক পরিহাস ক'রে তোকে সঞ্জীবের মরা মুখে দেখাতে পারে। তোর হাতে বিষের বাটী তুলে দিয়ে কালী বলে আমাকে বাধ্য করতে পারে। তবু মনে হচ্ছে—কালী ব'লে কালী আমার—তা করবে না রে। চল—চল। আয়।

হাত ধরিয়া চলিয়া গেল রিক্সার দিকে

চতুর্থ দৃশ্য

সঞ্জীবের নতুন কেনা বাড়ী—সুমিতার বাবা—মিঃ ঘোষালের বাড়ী

কক্ষ। কক্ষে সঞ্জীব শুইয়া আছে। শিয়রে ডাক্তার নার্স ইত্যাদি। সঞ্জীবের জ্ঞান হইয়াছে। সে চোখ বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিয়া আছে। ঘরখানির চারিদিকে ফুল। বিছানার ফুল ছড়াইয়া পড়িয়া আছে মেঝের উপর। তবুও কিছু ফুল তখনও বিছানায় রহিয়াছে।

সঞ্জীব। ডাক্তার—আপনি যান—আপনি যান। আপনার কাজ হয়েছে। আমি বেঁচেছি। আপনি বাঁচিয়েছেন। আপনার কাজ শেষ হয়েছে। আপনি যান।

ডাক্তার। আপনি উত্তেজিত হবেন না।

নার্স একটি পাত্রে পানীয় আনিল

খেয়ে নিন—এটা খেয়ে নিন।

সঞ্জীব। না—না। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি বাঁচতে চাই না। কেন—কেন আপনারা আমাকে বাঁচালেন?

ডাক্তার। খেয়ে নিন এটা, খেয়ে নিন। Mr Mukherjee Please—Please!

সঞ্জীব। (চোখ বন্ধ করিয়াই কথা বলিতেছিল। সে মুদ্রিত চোখেই ঘাড় নাড়িল। মৃত্যুর মধ্যে আমি অমৃত খুঁজতে চেয়েছিলাম। রিক্ত জীবনে মহোৎসবের আসর পেতেছিলাম। বাসর শয্যা পেতেছিলাম ডাক্তার। তিলোত্তমার সঙ্গে বাসর।

দে—দোল—দোল
দে—দোল—দোল।
এ মহাসাগরে তুফান তোল।

জীবনের মহাসাগরে তুফান তুলেছিলাম।

ইহারই মধ্যে প্রবেশ করিল পরমেশ্বর ও সুমিতা। তাহারা দরজার মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল

ডাক্তার। মিঃ মুখার্জ্জী—আপনি আমাকে জোর ক'রে খাওয়াতে বাধ্য করবেন না। মিঃ মুখার্জ্জী।

সঞ্জীব। আমার প্রিয়াকে আমি পেয়েছিলাম, আমার কোল ভরেছিল! ডাক্তার আপনারা তাকে কেড়ে নিলেন—তাড়িয়ে দিলেন।

সুমিতা। (নার্সের কাছে আগাইয়া গেল) দিন—ওটা আমাকে দিন।

পরমেশ্বর। কালী বলে—সঞ্জীব!

সঞ্জীব। পরম দাদু! তুমিও আমার অন্তরটা বুঝবে না? বাঁচতে বলবে? খেতে বলবে?

সুমিতা। (পাত্র হাতে লইয়া আগাইয়া গেল। বিছানায় বসিল।) আমি বলছি—তুমি খাও! ওগো তুমি খাও। তুমি চোখ মেল। তুমি ওঠ। আমাকে নাও। আমি ফিরে এসেছি। ওগো আমি ফিরে এসেছি।

তাহার হাতের পাত্র তুলিয়া ধরিয়াও সে সঞ্জীবের বুকের কাছে মাথা রাখিল। সঞ্জীব চোখ মেলিল

সঞ্জীব। কে? কে? সুমিতা?

সুমিতা। তুমি খাও!

যবনিকা

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তথায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শিয়ালদহ হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রসঙ্গত তিনি ফারাক্কায় গঙ্গাবাঁধের কথা ও বারাসত বসিরহাট রেলের কথাও আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার রায় কয় মাস অসুস্থতার পর এখন পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোক তাঁহার উপর নির্ভরশীল—তিনি আরও বহু বৎসর সুস্থদেহে দেশের সেবা করুন—সকলেই ইহা প্রার্থনা করে।

ভারতে কাগজ উৎপাদন—

ভারতে বর্ত্তমানে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হয়। ভারতে ১৯৫০ সালে ১০৮৯০৭ টন ও ১৯৫৪ সালে ১৫৫৩২৮ টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ভারতে ২৮৭১১০ টন কাগজ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ফলে দেশীয় কাগজের দ্বারাই ভারতের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে। কয়েক শ্রেণীর বিশেষ কাগজ হয় ত এখনও বিদেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন থাকিবে। ভারতীয় কাগজ শিল্পে এখন ২১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে ও ফলে ২৬ হাজার লোক কাজ করিতেছে। শীঘ্রই কাগজ শিল্পে আরও ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিযুক্ত করা হইবে ও ১৯৬০-৬১ সালে মোট ৫৪ হাজার লোক ঐ শিল্পে কাজ পাইবে। ঐ সালে মোট কাগজ উৎপন্ন হইবে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন। বর্ত্তমানে ভারতে ২১টি কাগজের কল চলিতেছে—তন্মধ্যে ৬টি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় অবস্থিত। স্বাধীন ভারতে যে শীঘ্রই আমরা কাগজ সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী থাকিব না—ইহা কম অনন্দের সংবাদ নহে।

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড—

গত ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা পি ১৩ মিশন রো একসটেনসনে হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটী ফণ্ডের বার্ষিক সভায় বেহালা রায়নগরের তরুণ কর্ম্মী শ্রীপ্রভাতকুমার রায় ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। এই ফাণ্ড ১৮৭২

শ্রীপ্রভাতকুমার রায়

সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। প্রভাতকুমার কলিকাতার প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমণীন্দ্র-নাথ রায়ের পুত্র ও বঙ্গীয় আইন সভার প্রাক্তন সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পৌত্র! তিনি নিজে নোটারী পাবলিক।

কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা—

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী আজ ভুলিতে বসিয়াছে। হুগলী জেলার রাজবলহাটের নিকট গুলিটা গ্রামে তাঁহার বাস্তভিটার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার একদিকে যেমন গ্রাম-উন্নয়ন-পরি-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কবি হেমচন্দ্র জাতির মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি তাঁহার গ্রামে উপযুক্ত ভাবে রক্ষার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনায়ক-গণের ও দেশবাসী জনগণের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব্বে গুলিটায় বার্ষিক হেমচন্দ্র উৎসব হইত ও বহু সাহিত্যিক তথায় গমন করিতেন। এখন তাহা হয় কি না জানি না। এ বিষয়ে আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সোদপুর সুবাস্তুতে একটি বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনে রত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

দেবানন্দপুরে শরৎ স্মৃতি—

অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের যে আয়োজন চলিতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। শরৎস্মৃতি সমিতিকে ও ১০ হাজার টাকা দিতে বলায় সমিতির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ হাজার টাকা, উত্তরপাড়ার জমীদার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম শ্রী জে-এন-মজুমদার প্রত্যেকে ১৫ শত টাকা দিবেন। বাকী টাকা সংগ্রহ করা হইবে। পূর্বেই ১ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বহু দিন ধরিয়া শরৎস্মৃতি সৌধের নির্মাণ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। যাঁহাদের চেষ্টায় উহা সম্পূর্ণ হইতেছে, তাঁহারা সকলেই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

১০৫ বৎসরের বৃদ্ধার পরলোকগমন—

স্বর্গীয় ৺হরিদাস দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পুণ্যবতী ও দানশীলা রাখালমণি দাসী ১০৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া গত ১৪ই ফাল্গুন ১৩৬১ সাল শনিবার রাত্রি ১১টার সময়

রাখালমণি দাসী

তাঁহার ৭নং হরিপদ দত্ত লেনস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র—প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত ও শ্রীকার্ত্তিকচরণ দত্ত এবং বহু পৌত্র-পৌত্রী, আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। পল্লীস্থ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিলেন।

ভারত সেবক সমাজ—

গত ১২ই মার্চ নাগপুরে ভারত-সেবক-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হইয়াছিল। তাহাতে সভাপতি হইয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলেন—পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে দেশের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করা

সর্বাধিক প্রয়োজন। সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সকল শক্তি ও বীর্য্যকে নিযুক্ত করিতে হইবে। মন প্রাণ নিয়োগের মধ্য দিয়াই শক্তি আসিতে পারে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক বৈষম্য লইয়া উচ্চ পর্য্যায়ের বিতর্ক চলিতে পারে, কিন্তু দেশগঠনের কার্য্যে কোন ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি এমনই হইয়াছে যে দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট সময় আজ তাঁহাদের নাই।

ভারত-সেবক-সমাজ গঠন করিয়া শ্রীনেহরু দেশের এক দল কর্মীকে শুধু দেশগঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার সঙ্কল্প লইয়াছিলেন। সেবক সমাজ দিন দিন শক্তিশালী হইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বাঁকুড়ায় অপরাধীদের জন্য শিক্ষা—

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র দে চৌধুরী আই-পি বাঁকুড়ায় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় অভাবও যেমন অধিক, অপরাধ-প্রবণতাও তেমনই অধিক। শ্রী দে চৌধুরী সেজন্য পুরাতন অপরাধীদের শাস্তি না দিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাঁহার চেষ্টায় গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় ঐরূপ ২০টি স্কুল খোলা হইয়াছে—তথায় এ পর্য্যন্ত ৫ শত ৫৩ জন অপরাধী শিক্ষালাভ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগ ঐরূপ ২টি বিদ্যালয়ের—(১) গুন্দা থানার পানিসোল গ্রামে (২) সিমলাপাল থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে—পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঁকুড়া সহরে মাসে ১০।১৫টি চুরি হইত—গত জানুয়ারী মাসে সহরে মাত্র একটি চুরি হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে কাঠেরডাঙ্গাতে মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় যে স্কুলের উদ্বোধন করিয়া যান, তথায় বর্তমানে ১৬ জন দণ্ডিত অপরাধী ও অপরাধীদের ৩৩টি শিশু শিক্ষালাভ করিতেছে। ঐ স্কুলের ১০ জন ছাত্রকে—পূর্বে তাহারা অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত—স্থানীয় চাউল-কলে কাজ দেওয়া হইয়াছে—তাহারা সকলেই বয়স্ক মুসলমান। ১৯৫৪ সালের মে মাসে কোতুলপুর থানার মুড়াকাটা গ্রামে প্রদেশ-কংগ্রেস-সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার যে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন, তথায় এখন ৭৬ জন অপরাধী-ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে—তন্মধ্যে ২২ জন সাংঘাতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি। স্থানীয় এম-পি শ্রীজগন্নাথ কোলে ঐ স্কুলের একজন শিক্ষকের বেতন দিয়া থাকেন। পুলিস-সুপার শ্রী দে চৌধুরী অপরাধীদের শিক্ষাদান ও কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইলে

বাঁকুড়ায় অপরাধীদের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধক মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

জেলায় আর চুরি ডাকাতি থাকিবে না। আমরা সকল জেলায় এই আদর্শের অনুকরণ দেখিলে আনন্দিত হইব—দেশও উপকৃত হইবে।

পেনিসিলিন আবিষ্কারকের মৃত্যু—

পেনিসিলিন নামক ঔষধের আবিষ্কারক সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ৭৩ বৎসর বয়সে গত ১১ই মার্চ লণ্ডনে

পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং ঐ ঔষধ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশে ও বিদেশে তিনি বহু সম্মানলাভ করিয়াছিলেন।

পরলোকে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী নীহারবালা—

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেত্রী নীহারবালা গত ৭ই মার্চ সোমবার ৫৬ বৎসর বয়সে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জ্জুন নাটকে নিয়তির ভূমিকায় ও চিরকুমার সভা নাটকে নীরবালার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি মনোমোহন, মিনার্ভা ও শ্রীরঙ্গম্ মঞ্চেও বহু অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর পূর্বে তিনি অবসরগ্রহণ করিয়া তদবধি পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাস করিতেছিলেন এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী নীহারবালা

বিদেশী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনের লোক—

ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে এক হাজার টাকা ও তদপেক্ষা অধিক মাসিক বেতনের কর্মীর সংখ্যা সম্বন্ধে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদেশী কারখানায় ঐ বেতনের কর্মচারী ১৯৪৭ সালে ভারতে ৫০২জন ভারতীয় ও ৫০৮৪জন বিদেশী ছিল। ১৯৫৪ সালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া ৩২৪৮ ভারতীয় ও ৭০০৮ বিদেশী দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে উচ্চ বেতনে আর বিদেশী লোককে নিযুক্ত করা না হয়, সেজন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিও এই নির্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। উপরের সংখ্যাগুলি হইতে সহজেই পার্থক্য ধরা পড়ে। ১৯৪৭ সালে যাহা শতকরা ১০ ছিল, ৭ বৎসর পরে তাহা শতকরা ৩৩ হইয়াছে। পরে এমন দিন আসিবে যখন ভারতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শতকরা মাত্র ১০জনের অধিক বিদেশী থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই চেষ্টার সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন।
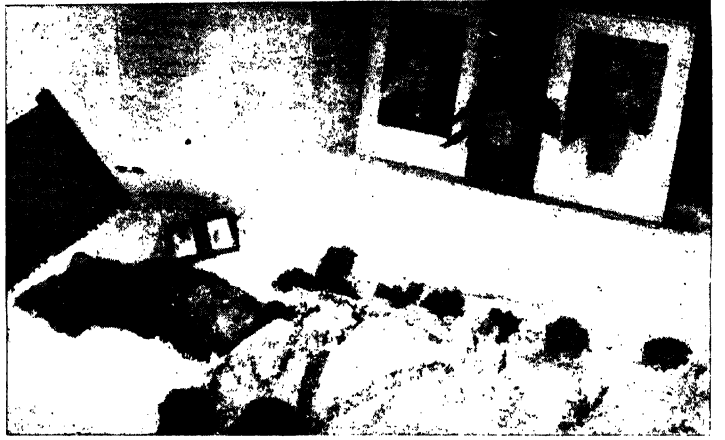
ভারতে সৈনিক প্রস্তুত—

দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৫ বৎসরে "জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল" নামে প্রতি বৎসর ১লক্ষ করিয়া যুবককে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। ২০০ স্থানে কেন্দ্র করিয়া হাজার যুবককে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ৯মাস কাল শিক্ষাদান চলিবে এবং সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা শিক্ষক হইবেন। ১বৎসরে দক্ষিণাঞ্চলে ৮২টি কেন্দ্রের প্রত্যেক স্থানে ৫শত করিয়া যুবক শিক্ষা পাইবে। তথায় ম্যাপ-পাঠ, ব্যায়াম শিক্ষা, দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে শিক্ষা লইতে বলা হইবে। যে সকল স্থানে উন্নয়ন-কেন্দ্র করিয়া কাজ চলিতেছে, প্রথমে সে সকল স্থানের লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। গত বৎসরে যে ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল, তাহাতে মাত্র একসপ্তাহ কাল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল—সে ব্যবস্থায় কেহ সন্তুষ্ট হয় নাই—সেজন্য এবার এক মাস কাল শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশের জনগণ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়া 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দলে' যোগদান করিলে রাষ্ট্র ও জনগণ—উভয় পক্ষেরই লাভ হইবে।

আলু চাষে পুরস্কার দান—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩-৫৪ সালের আলু চাষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ চাষীদিগকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করায় হুগলী জেলার বনমালীপুর নিবাসী শ্রীতুকড়িচরণ ঘোষ প্রথম হইয়া ২৫শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীঘোষ এক একর জমীতে ৬০৬ মণ ৩৬ সের আলু উৎপাদন করেন। দ্বিতীয় পুরস্কার ২ হাজার টাকা পাইয়াছেন হুগলী জেলার মশাটের শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ—তিনি প্রতি একরে ৫৬০ মণ ৮ সের আলু ফলাইয়াছেন। তৃতীয় পুরস্কার এক হাজার টাকা পাইয়াছেন—হুগলী জেলার শ্রীরামপুর গ্রামের শ্রীসুবলচন্দ্র পারুই—তিনি প্রতি এক ৫৩৮ মণ ৩৬ সের আলু উৎপাদন করিয়াছেন। বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া হুগলী ও তাহার সন্নিহিত জেলাসমূহে ভাল করিয়া চাষ করিলে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়—সরকার এইভাবে পুরস্কার দিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহ দান করিলে প্রচুর আলু উৎপন্ন হইবে ও দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে।

গম চাষে উৎসাহ দান—

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩-৫৪ সালে গম-চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মালদহ জেলার আইসপাড়া গ্রামের শ্রীমহেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রতি একরে ৫১ মণ ৩২ সের গম উৎপাদন করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। মালদহ জেলার সুলতানপুরের শ্রীসেখ কুলু প্রতি একরে ৪৯ মণ ২৮ সের গম উৎপন্ন করিয়া দ্বিতীয় পুরস্কার ও মুর্শিদাবাদ জেলার সাবদন নগর গ্রামের শ্রীবিশ্বনাথ বাজপেয়ী প্রতি একরে ৩৯ মণ ২৪ সের গম উৎপাদন করিয়া তৃতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অনেকের ধারণা পশ্চিমবঙ্গে যে গম ব্যবহার হয়, তাহার সমস্তই বিদেশ বা অন্য রাজ্য হইতে আমদানী করা হয়। তাহা যে ভ্রান্ত, উহা উপরের সংবাদে প্রমাণিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভালরূপ চেষ্টা হইলে রাজ্যকে গম বিষয়ে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে।

—

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় এ্যাথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ক'লকাতায় রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২০তম জাতীয় এ্যাথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। গত বছরের দলগত চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল এ বছরও পুরুষ বিভাগে অধিক পয়েণ্টের ব্যবধানে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। সার্ভিসেস দল ১৪৬ পয়েণ্ট পায়। পেপসু দল মাত্র ১৯ পয়েণ্ট পেয়ে ২য় স্থান লাভ করে। প্রতিযোগিতায় ১৫টি রাজ্যের প্রায় ৩০০জন এ্যাথলেটস যোগদান করেন।

রাশিয়ান বনাম মোহনবাগান ক্লাব : খেলার পূর্ব্বে আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্তকে রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফটো : ডি রতন

পুরুষ বিভাগ

পয়েণ্ট হিসাবে প্রতিযোগী প্রদেশগুলির স্থান : ১ম সার্ভিসেস ১৪৬ ; ২য় পেপসু ১৯ ; ৩য় পাঞ্জাব ১৫ ; ৪র্থ বোম্বাই ১৩ ; ৫ম পশ্চিম বাংলা ৯ ; দিল্লী ৯ ; ৬ষ্ঠ মহীশূর ৫ ; ৭ম উত্তর প্রদেশ ৪ ; ৮ম মাদ্রাজ ২ ; উড়িষ্যা ২ ; ৯ম রাজপুতানা ১ ; ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ১।

মহিলা বিভাগ

পয়েণ্ট হিসাবে প্রতিযোগী প্রদেশগুলির স্থান : ১ম বোম্বাই ৪২ ; ২য় মহীশূর ৩ ; ৩য় পশ্চিম বাংলা ১২ ; ৪র্থ উড়িষ্যা ১০ ; ৫ম মধ্যভারত ৬ ; ৬ষ্ঠ উত্তর প্রদেশ ৪ ; ৭ম দিল্লী ২ ; ৮ম মধ্যপ্রদেশ ১।

আলোচ্য জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ২৩টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১৯টিতে প্রথম স্থান লাভ করে। পুরুষ বিভাগের ১৬টি অনুষ্ঠানে যে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয় তার মধ্যে সার্ভিসেস দল ১৪টি নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। মহিলা বিভাগে ২টি নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়। সর্ব্বসমেত আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ১৮টি নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়।

ভারত-পাকিস্তান ষ্টেট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান ঃ ১৮৮ (ওয়াকার হাসান ৪৩। সুভাষ গুপ্তে ৬৩ রানে ৫ উইকেট) ও ১৮২ (ইমতিয়াজ আমেদ ৬৯। মানকড় ৬৪ রানে ৫ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ২৪৫ (উমরীগড় ১০৮। খান মহম্মদ ৭৯ রানে ৪ এবং মামুদ হুসান ৭৮ রানে ২ উইকেট) ও ২৩ (১ উইকেট)

পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের ৪র্থ টেষ্ট খেলা আগের তিনটি টেষ্ট খেলার মতই ড্র গেছে। খেলার ১ম দিনে পাকিস্তানদলের ৬ উইকেটে ১২৯ রান ওঠে। খেলার ২য় দিনে ১৮৮ রানে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস শেষ হয় এবং ঐদিন ভারতবর্ষ ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান করে। উমরীগড় ৯৪ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলার লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ২১০ রান। লাঞ্চের কিছু আগে ভুল বুঝাপড়ার দরুণ উমরীগড় ১০৮ রান ক'রে রান আউট হ'ন। তিনি ২৮৭ মিনিট খেলে ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। ২৪৫ রানে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ৫৭ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষের তিনজন খেলোয়াড়—পি রায়, মঞ্জরেকার এবং উমরীগড় রান আউট হ'ন। মানকড় ৯০ মিনিট খেলে মাত্র ২ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। ঐদিন পাকিস্তান ১ উইকেট হারিয়ে ৪৪ রান করে। খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষদিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস শেষ হয় ১৮২ রানে। লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের স্কোর ছিল ৪ উইকেট প'ড়ে ৭০ রান। অর্থাৎ তারা তখন ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে মাত্র ১৩ রান এগিয়েছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে আশাপ্রদ অবস্থা। চায়ের সময় পাকিস্তানের ৬টা উইকেট পড়ে ১৭৩ রান দাঁড়ায়। চায়ের পর ১৫ মিনিটের মধ্যে বাকি ৪টা উইকেট মাত্র ৯ রানে পড়ে যায়। ইমতিয়াজ আমেদ পাকিস্তানকে পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে দেন।

এক ঘণ্টা খেলার সময় হাতে নিয়ে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলায় জিত্তে ভারতবর্ষের তখন প্রয়োজন ১২৬ রান। এই একঘণ্টার খেলায় তা সংগ্রহ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ এই সময়ের মধ্যে ১টা উইকেট হারিয়ে ২৩ রান করে।

পাকিস্তানঃ ১৬২ (ইমতিয়াজ ৩৭। রামচাঁদ ৪৯ রানে ৬, প্যাটেল ৪৯ রানে ৩) ও **২৪১** (৫ উইকেটে ডিক্লে:। আলিমুদ্দিন নট আউট ১০৩, কারদার ৯৩। উমরীগড় ৬৬ রানে ২, রামচাঁদ ২৭ রানে ১ উই:)

ভারতবর্ষঃ ১৪৫ (পি রায় ৩৭। খান মহম্মদ ৭২ রানে ৫, ফজল মামুদ ৪৯ রানে ৫) ও **৬৯** (২ উইকেটে)

করাচীর ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের ৫ম টেষ্ট খেলাও ড্র যায়। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাই ড্র যাওয়াতে 'রাবার খেতাব' ভারতবর্ষের কাছেই রয়ে গেল। কারণ, ১৯৫২ সালের প্রথম ভারত-পাকিস্তান টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষ 'রাবার খেতাব' লাভ করে। টেষ্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাই ড্র গেছে এমন ঘটনা কোন দেশেরই টেষ্ট সিরিজ ক্রিকেট খেলায় ঘটেনি। সুতরাং একদিক থেকে ভারত-পাকিস্তানের আলোচ্য টেষ্ট সিরিজ বিশ্বরেকর্ড করেছে বলা যায়।

পাকিস্তান টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। আরম্ভ ভাল হয়নি। দলের ২ রানে ১ম, ১৯ রানে ২য়, ৩৭ রানে ৩য়, ৬৬ রানে ৪র্থ এবং ৮৮ রানে ৫ম উইকেট পড়ে যায়। এই দিনের খেলায় সমস্ত গৌরব রামচাঁদ একাই পান। ৪৯ রানে তিনি ৫টা উইকেট নেন্। তাঁর পরই প্যাটেল পান ৩টে ৪৯ রানে। এই দিনেই পাকিস্তান দলের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হ'ত কিন্তু খান মহম্মদ এবং মামুদ হুসেন দৃঢ়তার সঙ্গে উইকেট বাঁচিয়ে রাখেন। প্রথম দিনের খেলায় ৯ উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ১৬২ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিনে আর কোন রান যোগ না হয়েই পাকিস্তানের ১ম ইনিংস শেষ হয়। ভারতীয় দলের লাঞ্চ-স্কোর ছিল

রাশিয়ান বনাম ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব: ইষ্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক ডি ঘোষ একটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করছেন   ফটো: পান্না সেন

২ উইকেটে ৬১। লাঞ্চের পর ভারতীয় দলের দারুণ পতন দেখা দেয়। লাঞ্চ এবং চা পানের মধ্যের ২ ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষ আরও ৪টে উইকেট হারালো ৬২ রান যোগ ক'রে। ২য় দিনের খেলা শেষ হওয়ার ২০ মিনিট আগে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৪৫ রানে শেষ হয়। খান মহম্মদ ৭২ রানে ৫ এবং ফজল মামুদ ৪৯ রানে ৫টা ক'রে উইকেট পান। ঐদিন পাকিস্তান কোন উইকেট না হারিয়ে ১ রান করে।

বৃষ্টির দরুণ ৩য় দিনে ৩ ঘণ্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়। এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দ্ধারিত সময়ে স্কোর বোর্ডে পাকিস্তানের ৬৯ রান ওঠে ১ উইকেট পড়ে।

খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষদিনে পাকিস্তান ৫ উইকেটে

২৪১ রান ক'রে ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। আলিমুদ্দিন নট আউট ১০৩ রান করেন এবং কারদার ৭ রানের জন্যে সেঞ্চুরী নষ্ট করেন। কারদার এবং আলিমুদ্দিনের ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৬৫ রান ওঠে। এই দিন পাকিস্তান দলের আরম্ভটা দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিলো। আধ ঘণ্টার খেলায় ৩টে ভাল উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১২ রানে। দলের তখন ৮১ রান দাঁড়ায়, ৪টে উইকেট পড়ে। খেলার এই পতনের মুখে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক কারদার ৫ম উইকেটে আলিমুদ্দিনের জুটি হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

হাতে ২ ঘণ্টা সময় পেয়ে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৬৯ রান করে ২ উইকেট হারিয়ে।

পাকিস্তান সফরে ভারতীয়দল ১৪টি খেলায় যোগদান করে ৫টিতে জয়ী হয়। বাকি ৯টি খেলা ড্র যায়।

পঞ্চম দিনে ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ৩৭১ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন অষ্ট্রেলিয়ার বোলার রে লিণ্ডওয়াল ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব ১০০ উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বেলীকে বোল্ড আউট ক'রে লিণ্ডওয়াল ১০০ উইকেট পূর্ণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড—১৪১ উইকেট (২৯৪৫ রানে)—এইচ ট্রাম্বল (অষ্ট্রেলিয়া)।

অষ্ট্রেলিয়া ২টো উইকেট খুইয়ে ঐদিন ৮২ রান করে। খেলার ৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষদিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২২১ রানে শেষ হ'লে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। গত ১৭ বছরের টেষ্ট খেলার ইতিহাসে অষ্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করতে হয়নি। ২য় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া ১১৮ রান করে ৬ উইকেটে।

রাশিয়ান এবং মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়বৃন্দ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ফটো : ডি রতন

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৩৭১ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রেভনী ১১১, কম্পটন ৮৪, বেলী ৭২। লিণ্ডওয়াল ৭৭ রানে ৩, জনসন ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২২১ (ম্যাকডোনাল্ড ৭২। ওয়ার্ডলে ৭৯ রানে ৫ উইঃ) ও ১১৮ (৬ উইকেটে। ওয়ার্ডলে ৫১ রানে ৩ উইকেট)

সিডনিতে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। বৃষ্টির দরুণ খেলার নির্দ্ধারিত ৬ দিনের প্রথম তিন দিন কোন খেলা হয়নি। ৪র্থ দিনে খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট ক'রে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান করে। গ্রেভনী এবং মে ২য় উইকেটে জুটি বেঁধে ১৬৩ মিনিট খেলে দলের ১৯২ রান তুলে দেন।

ভারত সফরে রাশিয়ান ফুটবল দল ঃ

রাশিয়ান ফুটবল দল ভারত সফরে এসে জয়লাভের গৌরব নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেছে। সফরের ১২টি খেলাতেই তারা জয়ী হয়েছে। যে একাধিক বৈশিষ্ট্য গুণে রাশিয়ান ফুটবল দল ভারতবর্ষের দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করেছে সে গুলি—খেলোয়াড়দের অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ, অপরিমিত দম, অনায়াসলব্ধ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ক্রীড়া-পদ্ধতি, নিখুঁত বল আদানপ্রদান, খেলার অবস্থা অনুযায়ী স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে খেলার দক্ষতা এবং সমানভাবে পা এবং মাথা দিয়ে বল খেলার পারদর্শিতা। রাশিয়ান ফুটবল দলের খেলা দেখে মনে হবে, খেলার গতিবিধি এবং পরিকল্পনা সমস্তই একটি যন্ত্রের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত।

সাহিত্য সংবাদ

মরণের রণভেরী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ঃ দীনেন্দ্রকুমার রায় ঃ আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভাধর ও বাণীর অগ্র-জাগ্রতদলের অন্যতম। তাঁর বহুধা-বিস্তৃত বিভিন্ন সাহিত্য রচনার মধ্যে ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে তাঁকেই আমরা প্রথম পাই। তাঁর অসংখ্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রহস্যজালে বারে বারে আমরা রবার্ট ব্লেককে পেয়েছি, জড়িত হয়ে রহস্যজাল ভেদ করে রোমাঞ্চকর পরিবেশে ঘটনার তত্ব ও তথ্যকে পাঠক-পাঠিকা সমাজে তুলে ধরতে। এই বিখ্যাত গোয়েন্দাকেও আলোচ্য গ্রন্থের বিশিষ্টাংশে অবতীর্ণ হোতে দেখা গেছে।

গল্পাংশটী যেমন জটিল, তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর। যারা তরুণী মিস্ ফেলিণ্ডারের সঙ্গে একত্রে ভোজন করে দু' একদিন পরেই তাদের মৃত্যু অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের কেরাণী ক্লটার বাকের হত্যাকাণ্ডের পর এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হোলো। এই হত্যার পশ্চাতে কি রহস্য আছে তা নিয়ে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিভিন্ন প্রমাণের তালিকা পাঠ করলেন, শেষ পর্য্যন্ত রবার্ট ব্লেকের সহায়তা ভিন্ন অন্য কোন গত্যন্তর দেখলেন না। ব্লেককে আহ্বান করে এনে যে সময়ে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাঁর হাতে ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্যে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন সে সময়ে হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো টেলিফোন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে কুট্‌স যা অবগত হোলেন তাও বিস্ময়কর। টেলিফোনযোগে কথা বল্‌তে বল্‌তে অভি-যোগকারী দায়ী কর্‌লো ফেলিণ্ডারকে,—'ফেলিণ্ডার বর-ঘাতিনী কনে' এই পর্য্যন্ত বলে তার নীরবতা এলো, কাণে এলো তার মরণের পথে বীভৎস আর্ত্তনাদ। টেলিফোন ছেড়ে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বেরিয়ে পড়্‌লেন টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জের মাধ্যমে ঘটনাস্থলটী আবিষ্কার কর্‌তে। ক্রমে রহস্যের ছায়া সম্পাত হোতে থাকে ঘটনার গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে। তার পর ফেলিণ্ডারের সহিত একত্র ভোজনের পর তৃতীয় যুবকের মৃত্যু হোলে তার মৃতদেহ যেদিন আবিষ্কৃত হোলো, সেদিন সাংঘাতিক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতর উদ্ভব দেখা যায়। রবার্ট ব্লেক নাচের মজলিসে গিয়ে মিস্ ফেলিণ্ডারকে পেলেন। প্রশ্ন উঠ্‌লো—বাস্তবিক কি ফেলিণ্ডার নরঘাতিনী? ক্রমে ঘটনার বিচিত্রতার মধ্যে নানা ঘাতপ্রতিঘাত এলো, চল্‌লো অনুসন্ধান, নূতন ফাঁদ পাতা হোলো, তবু বিপন্নতা অপসারিত হয় না। নরকঙ্কালের বেশধারী লোকটি ব্লেককে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লো। চল্‌লো সংঘর্ষ, ব্লেককে গুম্ করা হোলো। নরকঙ্কাল বেশধারী পিস্তল অথবা ছোরা যাহাই ব্যবহার করুক, অস্ত্রের আঘাতে ব্লেককে হত্যা করা তার অসাধ্য হোতো না—কেন কর্‌লো না সেও একটা লক্ষ্যের বিষয়। সারাসেন হার্ক যত নষ্টের গুরুমশায়—তার মুখোস উন্মোচন হোলো। ফেলিণ্ডারকে পোপ বিপদে ফেল্‌লো। পোপের চাতুর্য্য প্রকাশ পেলো, আর সবার ওপরে দেখা গেল রবার্ট ব্লেক চেটউডের একতলার নীচে গুদাম ঘরে বন্দী হয়ে মৃত্যু গহ্বরে এসেও মুষ্টিযোগ প্রয়োগ কর্‌ছেন। সারাসেন হার্কের দল ভেঙে গেল, শেষ পর্য্যন্ত 'মরণের রণভেরী'র প্রধান নায়ক নিজের ললাট লক্ষ্য করে পিস্তলের ঘোড়া টিপে মৃত্যুকে বরণ কর্‌লো। ব্লেকের কামুকুল্যে ফেলিণ্ডার বিপদমুক্ত হোলো,—বেঁচে গেল। নানারূপ লোমহর্ষণ ঘটনাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উপন্যাসখানির পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো নাটকীয় পরিবেশে। এ গ্রন্থেও দীনেন্দ্রবাবু তাঁর ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থ রচনার বিশিষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া গেছে। এক নিঃশ্বাসে রোমাঞ্চকর ঘটনা এই আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে পড়ে পাঠক-পাঠিকাগণ প্রচুর আনন্দ পাবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।]

ভাগীরথী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর) এম-এ, পি-এচ্-ডি, এফ্., এন, আই

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে তেত্রিশটী কবিতা সাতটী স্তরে সন্নিবেশিত হয়েছে। কথা সাহিত্যে গ্রন্থকার বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, কাব্যক্ষেত্রে তাঁর সাধনার পরিচিতির স্বাক্ষর রয়েছে ভাগীরথীর মধ্যে। গ্রন্থকার রবীন্দ্রযুগের পূর্ব্বসূরীদের পন্থা অনুসরণ করেই কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। ছন্দ-উপমা-উৎপ্রেক্ষার বিশিষ্টতায়, আবেগ-অনুভূতি ও অর্থসঙ্গতির তৎপরতায় অন্তরের গভীর অনুরণনে, রীতি-উপজীব্য বৈচিত্র্যের অনুশীলনে ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবি মনের যে বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল, তা উপভোগ্য। ব্যঞ্জনাগত বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করবার বিষয়।

প্রকৃতি ও মানুষের কথাই এর মধ্যে আছে আর আছে সামাজিকতার ক্ষেত্রে কবির অনুষ্ঠান উৎসবে ব্যক্তিগত সমুন্নতর চেতনার উজ্জীবন। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে গ্রন্থকারের প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত্তি ও হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতার পরিচয় পাওয়া গেল। ভাগীরথী কবিতাটী দীর্ঘ ও ভাষণমুখর। কতকগুলি কবিতায় হাল্‌কা রসের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রন্থের ভিতর যে কবিতাগুলি সোসাইটি ভার্স বা সামাজিক ছড়া, সেগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে। দ্যুতি-দুর্জ্জেয় হয়ে কোন কবিতাই জন্মগ্রহণ করেনি, তড়িৎ-ক্ষিপ্র কল্পনায়ও কোন কবিতাকে রূপায়িত করা হয় নি অথচ শিল্পদক্ষতায় সামান্য বিষয় বস্তুর ওপর রচিত আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। আশা করা যায় কাব্যরসপিপাসু পাঠক সমাজে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করবে।

[গ্রন্থকার কর্তৃক ৯নং সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। ১০১ পৃঃ।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ ঃ শ্রীনিশাকর চৌধুরী

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দের চরিত্র পরিস্ফুটনে লেখক এই গ্রন্থে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানি কেবল শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দের জীবন-চরিত নয়। ইহার মধ্যে স্বামী প্রণবানন্দের পুতজীবনাদর্শ ও তাহার প্রভাব বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগে গুরুবাদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাও আছে। গুরুর সংস্পর্শে এসে লেখকের নিজ অধ্যাত্ম জীবনের কিরূপ বিকাশ ঘটল, সাংসারিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে উচ্চতর জীবনের আদর্শ কেমন করে মিশল, আধুনিক কালের স্বভাব অবিশ্বাসী মন কিভাবে জড়প্রভাব অতিক্রম করে পরম সত্যের সন্ধান পেল,—সেই

চিত্তাকর্ষক কাহিনীটি লেখক সুনিপুণ ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আধুনিক কালে শাস্ত্রের নির্দেশ আন্তরিক ভাবে পালন করেও কেন চিত্তশুদ্ধি ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি ঘটে না, সে প্রসঙ্গও লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

আজকার এই যুদ্ধের উন্মাদনায়, ধ্বংসের লীলায় ও রাজনৈতিক হানাহানিতে উন্মত্ত পৃথিবীতে এ রকম বইএর প্রচার যে বিশেষ কল্যাণকর তাতে সন্দেহ নেই। জড়বাদ ও নাস্তিক্য বুদ্ধির প্রাবল্য আজ হিন্দু-সমাজের চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের ভোগপ্রবণতা, ইহসর্ব্বস্ব ভাব ও উৎকট ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আজ প্রাচ্যের সমাজ জীবনে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আজ আমাদের সমাজ জীবন দুর্ব্বল থেকে দুর্ব্বলতর হচ্ছে। এই ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে অবিশ্বাসের যুগে, ধর্ম্মভাব ও হৃদয়ের প্রেরণা সচেতন রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তাই এরূপ গ্রন্থের প্রচার ও পাঠও আজ একান্ত প্রয়োজনীয়।

[প্রাপ্তিস্থান—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৩॥০]

* * * *

Contributions of Muslims to Sanskrit Learning Vol II—Khan Khanan Abdur Rahim (1557 A. D. to 1630 A. D.) and Contemporary Sanskrit Learning (1551 A. D. to 1560 A. D.) : Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri Ph. D, Kavyatirtha.

হিন্দী সাহিত্যে আবদুর রহিম সুপরিচিত—তাঁর দানও অপরিসীম ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেও যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে তা বোধ হয় খুব অল্প লোকই জানেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশবাসীকে আজ পরিচিত করেছেন কবি আবদুর রহিমের সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির সঙ্গে। মধ্য যুগের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় ভারতীয় সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্প যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি আবদুর রহিমের সংস্কৃত রচনা।

গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত হয়েছে কবির জীবন চরিত, তাঁর রচনাবলীর পরিচয় ও তাঁর কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব। কবি রহিমের মূল রচনা ও তার প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। রুদ্র কবির সংস্কৃতে রচিত রহিম চরিত জাতক পদ্ধতি উদাহরণ এবং নবাব খান খানান চরিতও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত হয়েছে খৃষ্টীয় ১৫৫১ থেকে ১৫৬০ অব্দে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ। সে যুগের সেই অসংখ্য দার্শনিক, নৈয়ায়িক, আলংকারিক, স্মৃতি ও কবির সাধনার আলোকে উদ্ভাসিত ভারতবর্ষের বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

ভারত সরকার এই গ্রন্থের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করে সত্যই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উপকৃত পণ্ডিত সমাজ তথা দেশবাসী মাত্রেই ডাঃ চৌধুরীকে ও ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দেবেন।

[প্রকাশক—প্রাচ্য বাণী মন্দির। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রেমধর্ম

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক-মত ও সাধন-পথকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—একটি জ্ঞানের, আর একটি ভক্তির। জ্ঞানমার্গীরা বলেন, এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই—আমিও নাই, তুমিও নাই, কোনও জীব বা বস্তু নাই; আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তবুও যে আমরা দেখিতেছি আমি আছি, তুমি আছ, অগণিত জীব ও বস্তু আছে, তাহা শুধু মায়ার খেলা। নিরন্তর আত্মানুশীলনের দ্বারা মায়ার আবরণ ছিন্ন হইলে তখন ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে, তখন তুমি বলিয়া উঠিবে "সোঽহং"। এই ব্রহ্ম কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানবাদীরা বলেন, তিনি নির্গুণ ও নিরুপাধিক, সুতরাং নিরাকার। কোনও গুণ, আকার, সীমা বা কালের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। এই মতের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা বহু শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করেন।

অন্যমতাবলম্বীরা বলেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের পৃথক আপেক্ষিক সত্তাও আছে। জীব বা জগৎ কখনই ব্রহ্ম সমকক্ষ নহে। ব্রহ্ম সগুণ, দয়াময় ও অসীমশক্তিসম্পন্ন। ইঁহারাও নিজেদের মতের সমর্থনে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেন।

এই দুই মতের বিবাদের ধারা দেখিয়া মনে হয় যে দুই পরস্পর-বিরোধী মতের সমর্থনে যখন শ্রুতিবচন উদ্ধার করা যায়, তখন বেদ অভ্রান্ত নহে বা বেদ পরস্পর-বিরোধী মতে পূর্ণ।

এই দুইটি মতের যে কোনও একটীর সমর্থনে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া এই দুইটি মত ও পথের মানুষ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান হয় নাই। অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন; তিনি বলিলেন, ব্রহ্ম

একই কালে নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকার। সুতরাং শ্রুতি পরস্পর-বিরোধী উক্তিতে পূর্ণ নহে, বস্তুতঃ উক্তিগুলি পরস্পরের সম্পূরক। বেদ অভ্রান্ত। তবে নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে—বুঝিতে হইলে—কাছে পাইতে হইলে সগুণরূপেই পাইতে হইবে। তত্ত্বকে বুঝিতে হইলে রূপকে আশ্রয় করিতে হইবে। দুই আর দুইএ চারি হয়, ইহা বুঝিতে হইলে দুইটি বস্তুর সঙ্গে দুইটি বস্তুর যোগ করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দোকানদার দিনের কেনা বেচা শেষ হইলে যখন হিসাব নিকাশ করে, তখন খাতায় দুহাজার টাকা জমা আছে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না লোহার সিন্দুক খুলিয়া ঐ পরিমাণ টাকা দেখিতে পায়। তিনি আরও বলিলেন, জীবে ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও শক্তিতে পার্থক্য আছে। বিরাট অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিকণায় যেমন পার্থক্য না থাকিলেও উভয়ের শক্তি সমান নহে। ব্রহ্ম যেমন রসস্বরূপ, জীবও তেমনই স্বভাবতঃ ভালবাসায় ভরা। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" প্রেমের দ্বারাই জীব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। এই প্রেমের অনুশীলন করিতে হইলে ব্রজভূমিতে বা বৃন্দাবনে উপস্থিতি জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের পক্ষেই অপরিহার্য। ব্রহ্ম যেখানে সর্বময় অখণ্ড সত্তা, তিনি চলিবেন কোথায়, তিনি ত চলিতে পারেন না। চলা বলিলে ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া বুঝি, কিন্তু যিনি সর্বস্থানে আছেন তিনি কেমন করিয়া চলিবেন। তাই নির্গুণ ব্রহ্ম "অচলোঽয়ং সনাতনঃ।" ব্রজ্ ধাতু ও বৃন্দ্ ধাতুর অর্থ ভ্রমণ করা। ব্রজের পথ বৃন্দাবনের পথ—এই নিত্য চলার পথ। প্রেমের পথে চলিতে হইলে সেই চলার শেষ নাই। ভক্ত তাই বৃন্দাবনের পথে পথে চিরকাল ঘুরিবে। আর ভগবানকেও প্রেমময়ত্ব দেখাইতে হইলে তাঁহাকেও ঘুরিতে হইবে এই ব্রজের পথে। ক্ষুধার সময় খাদ্য পাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, কিন্তু জীবের যেদিন প্রেমের ক্ষুধা জাগে, সেদিন সেই ক্ষুধার খাদ্য ভগবানকে পাইলেও সে ক্ষুধা থামিবে না, আরও বাড়িবে। এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার শেষ নাই। ভগবানের প্রতি শ্রীমতীর ভালবাসার সীমা নাই—তিনি কৃষ্ণ-প্রেমিকা-শিরোমণি। রাধা-প্রেমা বিভু, বাড়িতে নাই ঠাঁই—তথাপি মুহূর্তে মুহূর্তে এই প্রেম ক্রমেই বাড়িতেছে। ভগবৎ-কৃপালাভের নিমিত্ত যত প্রকার সাধন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকল পদ্ধতিতেই আরম্ভ আছে, শেষও আছে। জ্ঞানের পথে শমদমাদি প্রথমে আশ্রয় করিয়া নির্মলচিত্ত হইতে হইবে। তৎপরে আসিবে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। তাই বেদান্ত সূত্রের প্রথম কথাই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অথ শব্দটির অর্থ তারপর। তারপর মানে শমদমাদি আশ্রয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর। ইহার শেষ সীমা অখণ্ডব্রহ্মানুভূতি। জ্ঞানের সাধন এইখানেই শেষ। ঠিক সেইরূপ যোগের পথেরও আরম্ভ এবং শেষ আছে। বৈরাগ্য অবলম্বন প্রথম সোপান বা আরম্ভ এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ইহার শেষ। কর্মের পথেও তেমনই আরম্ভ আছে এবং শেষ হইল স্বর্গ-প্রাপ্তি। সকল পথেই আরম্ভ আছে, শেষ আছে—কিন্তু প্রেমের পথে আরম্ভও নাই, শেষও নাই,—"পারাপারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু" (চৈতন্যচরিতামৃত)। প্রশ্ন হইবে—আরম্ভ নাই এ আবার কেমন কথা? কিন্তু উত্তর সহজ ও সরল। প্রেম হইতেই জীবের জন্ম—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" জন্ম হইতেই প্রেম, জীবের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ভালবাসিতে হয় কেমন করিয়া, ইহা শিখাইতে হয় না। ভালবাসা স্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমের পথে আরম্ভ নাই। ইহার যে শেষ নাই, তাহা ত আগেই বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রেম, জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ভগবানকে ভালবাসা কি স্বাভাবিক? হাঁ, ইহাও স্বাভাবিক। মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিতে গিয়া এ সম্বন্ধে একটি উপমা দিয়াছেন—

> "ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে
> দৈবজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে।
> তুমি কেন এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন
> তোরে না জানায়ে পিতা ছাড়িল জীবন।
> দৈবজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ
> ঐছে বেদ-পুরাণে কৃষ্ণের উপদেশ।
>
> চৈতন্যচরিতামৃত

মাটির নীচে লুকান ধনের কথা পুত্র জানে না বলিয়া যে ধন নাই একথা বলা যায় না। আত্মবিস্মৃত জীব তেমনই তাহার হৃদয়স্থিত ভগবৎপ্রীতির কথা মায়ামুগ্ধ হইয়া ভুলিয়া থাকে। শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা, সাধু সঙ্গে এবং গুরুকৃপায় এই প্রেমের উদ্বোধন হয়। শাস্ত্রের ভাষায়—হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়। জীবনে প্রেমের প্রকাশ হয়।

অধিকারী ভেদে সকল সাধনা। কিন্তু প্রেমের পথে এ প্রশ্ন উঠে না। যাহার যাহাতে অধিকার আছে, উপযুক্ততা আছে তাহাকে সেই বিদ্যা শিখান হয়, কিন্তু প্রেমে অধিকার সকলেরই আছে। তুমি যদি যোগী হইতে চাও, তবে গুরু প্রথমে দেখিবেন—যোগের পথ অবলম্বন করার মত তোমার দেহ ও মন উপযুক্ত কি না। অসমর্থ শিষ্যকে গুরু কখনও জ্ঞানদান করেন না। কিন্তু প্রেমবস্তু প্রতি জীবের স্বাভাবিক ধন, তবে সে এই ধনের সত্তা সম্বন্ধে সজাগ নাও হইতে পারে। সর্বভূতে নিত্য-বিরাজমান প্রেম বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, কুল-মানের কোনও অপেক্ষা রাখে না। ইতর প্রাণীতেও এই ভালবাসা আছে, শাবকের প্রতি বায়সীরও বাৎসল্য থাকে।

সৃষ্টি-পর্য্যায়ের নিম্নতম স্তর হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত সর্বভূতে প্রেমের নিত্য প্রকাশ। আব্রহ্মস্তম্ব জীব ও জগৎ একই সূত্রে গ্রথিত। ইহাদের মধ্যে প্রকাশের ধারা পৃথক পৃথক মাত্র। মানুষে ইহার পূর্ণ প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই প্রেম আছে; কিন্তু জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা নাই তাহার স্বাধীনতা রজ্জু-বদ্ধ ছাগের স্বাধীনতার মত। ভগবানই একমাত্র স্বরাট্। স্বরাটের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইয়া দেওয়া ছাড়া জীবের উপায় নাই। শরণাগতি ছাড়া, ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পন ব্যতীত উপায় নাই। গঙ্গার স্রোতে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছও অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যায়, কিন্তু মদমত্ত, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল ঐরাবত স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া বিপর্য্যস্ত হয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘরের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলে দম বন্ধ হইয়া আসে, কিন্তু যখন দুয়ার জানালা খুলিয়া বাহিরের বিরাট বায়ু-প্রবাহকে আসিতে দেওয়া হয়, তখন আবার শরীর মন জুড়াইয়া যায়। মানুষ যতদিন কেবলমাত্র নিজের সীমবদ্ধ শক্তির দম্ভে আত্মহারা হইয়া থাকে, ততদিন সে থাকে রুদ্ধশ্বাস ও শান্তিহীন, কিন্তু যেদিন পরমাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে সেইদিনই সে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভ করে।

আসল কথা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সে কথা প্রেমের কথা—ভগবানকে ভালবাসার কথা। বেদে তাঁহাকে একবার বলা হইয়াছে তিনি নির্গুণ ও নিরুপাধিক, আবার বলা হইয়াছে "রসো বৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ—আনন্দময়, প্রেমপূর্ণ। বাহির হইতে দেখিতে গেলে কথাটা পরস্পর-বিরুদ্ধ, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে ইহা abstract ও concrete-এর তফাৎ। দয়া একটা abstract বস্তু, ইহাকে জানিতে হইলে concrete দয়ালুকে জানিতে হইবে। abstractকে আলাদা করিয়া দেখান বা বুঝান যায় না। নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, তিনি যতক্ষণ রসরাজরূপে চোখের সামনে না দাঁড়াইবেন ততক্ষণ তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ হইতে হইলে তাঁহাকে রসের ভূমিতে আসিতে হইবে। কিন্তু একার দ্বারা রসের, আনন্দের, প্রেমের আস্বাদন হয় না। তাই তাঁহাকে আসিতে হয় বৃন্দাবনে, একা নয়, "যুবতী-শতবৃত" হইয়া। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, তখন তিনি নিজকেই বা কেমন করিয়া রসময় বলিয়া জানিবেন? কিন্তু তিনি যখন রসবিলাসী এবং ভক্ত যখন রসপিপাসু কেবল তখনই প্রেমের খেলা চলে। রঙ্গমঞ্চে সর্বোত্তম অভিনেতা একা শূন্য প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে অভিনয় করিতে পারে না, যদি বা করে তখন নিজকেই দর্শকের পর্য্যায়ে আনিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ পাইতে পারে। রসের খেলা খেলিতে যাইয়া তাই ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই প্রয়োজন। পরস্পরকে সামনাসামনি দাঁড়াইতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'একাকী নৈব রমতে'। এই চিরন্তন খেলায় ভক্তেরও প্রয়োজন আছে, আর আছে তাহার মধ্যে রসের পিপাসা, ভালবাসার দুর্নিবার ইচ্ছা। তাহা হইলে কি ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেমলীলা অসম্ভব? অসম্ভব নয়, কারণ প্রেম অন্য-নিরপেক্ষ। প্রথমেই বলা হইয়াছে ইহা প্রতিজীবেই আছে এবং ইহাতে প্রতি জীবেরই অধিকার আছে। তাই ত গুহক, হনুমান, শবরী, জটায়ু ও প্রহ্লাদের আবির্ভাব।

সিদ্ধ বস্তুর জন্য সাধনার কোনও প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ-প্রেম যদি প্রতি জীবের নিতান্ত স্বাভাবিক বস্তু হয়, তবে সেই "নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের" জন্য আবার ভজন-সাধনের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে বৈ কি? প্রেম ত স্থবির নয়, প্রেম নিত্য, গতিশীল—আর গতিশীল বলিয়াই ত বারে বারে বলা হইয়াছে প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন। প্রেমের প্রবাহ চলিতেছে নিরন্তর—প্রবাহের লক্ষণ সামনে বাধা পাইলে, সে চলে ভিন্নপথে। জীবের স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহে বাধা জন্মায় মায়া, তাই সে তখন চলে ভিন্ন পথে। তখন এই মরজগৎকেই মনে করে কৃষ্ণ, সংসারকে ভাবে ব্রজ, অসারকে মনে করে সার, ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের কাছে করে আত্ম-সমর্পণ। এমন করিয়াই ভালবাসাকে ফাঁকি দিতে গিয়া আত্মপ্রবঞ্চিত হয় পদে পদে। তাই পদে পদে অহংকারের চশমাটা খুলিয়া রাখিয়া সাদা চোখে দেখিলেই প্রেমরাজ্যের সবই দেখা যাইবে। আমার সংসার, আমার স্ত্রীপুত্রাদি, আমার ধন সম্পত্তি না ভাবিয়া সকলই কৃষ্ণের মনে করিতে হইবে। নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া অর্জুনের মত বলিতে হইবে—শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। তাহা হইলেই নিত্য আনন্দময় প্রেমরাজ্য বৃন্দাবন নয়নগোচর হইবে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

দুই
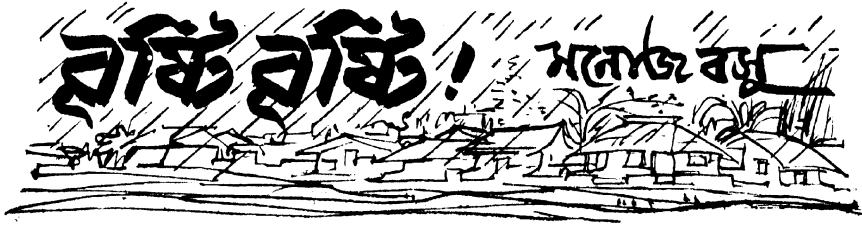
লাইব্রেরির বড় হলে ভিড় বেশি, ওর মধ্যে নয়। পাশের কুঠুরিতে একটা কোণ ঠিক করা আছে, কোন রকমে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে বিশ্বেশ্বর সেইখানে এসে বসেন। বসেন এসে ঠিক সাড়ে-দশটায়। আর উঠবেন ইরাবতী এসে জোরজবরদস্তি করে যখন তুলে নিয়ে যাবে। না যদি আসে কোনদিন ইরা—তা অবশ্য কোনদিন হয় না—কি হবে তাহলে? রাতভোর চলবে নিশ্চয় তাঁর কাজকর্ম লাইব্রেরির লোকজন দোর বন্ধ করবার সময় যদি তুলে না দেয়। আত্মীয়-বন্ধুরা বলে, অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি হল—এ যে আর এক চাকরি। ইরা বলে, সে চাকরিতে আরাম ছিল। এ চাকরির মনিব ভয়ানক কড়া। শীত-গ্রীষ্ম ঝড়-জল ছুটিছাটা বলে রেহাই নেই, ঘাড় তুলে একটা নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ দেয় না।

তাই। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ বিশ্বেশ্বরের কাজকর্ম। চেয়ার-টেবিলে কুলায় না, তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—মেঝের উপরে জাপটে বসেন। লাইব্রেরির কর্তারা তাই একটা সতরঞ্চি দিয়ে দিয়েছেন। গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, পাড়হীন ধুতি পরনে। ধুতিটা হয়তো বেশি রকম ফর্শা জামার তুলনায়—কে খেয়াল রাখে এই সব বাজে বাজে পোষাকের? সামনে ও ডাইনে-বাঁয়ে অসংখ্য বই গাদা-করা। এক-একটার এমন অবস্থা যে খুলতে ভয় করে—বুঝি বা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে। তবে সে আশঙ্কা নেই বিশ্বেশ্বরের হাতে। প্রাণপ্রিয় সন্তানের মুখ তুলে ধরে দেখার মতো অতি-সন্তর্পণে খোলেন পুরাণো বইয়ের এক-একটা পাতা। এটা খুললেন—নোট নিলেন একটুখানি। বন্ধ করে খুললেন আর একটা। কখনো বা দুটো তিনটে একসঙ্গে। খাতাই বা কতগুলো! কখনো এটায় টুকছেন, কখনো ওটায়। এই সব করে যাচ্ছেন অবিরাম, একটি মুহূর্ত নষ্ট হতে দেবেন না। কালস্রোত বয়ে চলেছে খরবেগে—মহামূল্য মানব-জন্মের ঘণ্টা-মিনিটগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হেলায় হারানো হবে না এর মধ্যে সিকি মিনিটও, সময়ের তিলার্ধ অপব্যয় করবেন না—এমনি একটা সতর্ক ব্যস্ততা বিশ্বেশ্বরের চোখে মুখে কাজকর্মের ধরণে।

অপব্যয় তবু একেবারে কিছু না করে উপায় নেই, ছেলেদের হাত এড়ানো যায় না। একটি দুটি নয়—বেশ একটি দল। লাইব্রেরিতে পড়তে আসে—কাজকর্মের অন্তে চলে যাবার মুখে জিজ্ঞাসুর ভাব নিয়ে সতরঞ্চির প্রান্তে বসে পড়ে। বিশ্বেশ্বর শশব্যস্ত হয়ে পড়েন, কি হে—কি বলছ তোমরা?

একজনে তার মধ্যে গম্ভীর ভূমিকা শুরু করে দিল. জোব চার্নক আর হেস্টিংস বন্ধুলোক ছিলেন, অথচ দেখা যাচ্ছে যে—

আর কোথায় যাবে! বিশ্বেশ্বর সপ্তমে চড়ে উঠলেন, সে তো বটেই! ঝান্সীর রাণী আর রাণী ভবানীতে যেমন ছিল বন্ধুত্ব। কিম্বা রামায়ণের লক্ষ্মণ আর মহাভারতের অর্জুনে। বেশ, বেশ! পাহাড় প্রমাণ বিদ্যে তোমাদের—এই বিদ্যের গবেষণা, তাই তো গণেশের ধড়ে হাতির মুণ্ড হরদম চাপান পড়ছে।

গালি শুরু হতেই ছেলেরা হাসি মুখে চোখ টেপাটেপি করে। একটানা খেটেছে এতক্ষণ ধরে; খাটনির পর এইবারে মজা।

পরশু—পরশুদিনই তো এই জোব চার্নকের কথা হল। মাথায় কি তোমাদের? হ্যাঁ, তোমরাই তো সব ছিলে—

বিরক্ত ভাবে বিশ্বেশ্বর আবার নিজের কাজে ঝুঁকে পড়লেন। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে ফল কিবা?

ছেলেরা সাফ বে-কবুল যায়, আজ্ঞে না, আমরা নই। সে আর কাদের বলেছিলেন। আপনার নামে অনেকেই তো এসে জোটে।

বিশ্বেশ্বরও একেবারে নিঃসংশয় নন যে এরাই সে দল। বলবার সময় চোখ বুঁজে আপন মনে বলে যান তিনি, কারা শুনছে সেটা বড় তাকিয়ে দেখেন না। সে কি বলা! সেকালের মানুষগুলো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন, হাত-পা নেড়ে তারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বরঞ্চ আজকের এই কলকাতাই অলীক। চৌরঙ্গিতে কসাড় জঙ্গল, পূবের ভাসা-বাদায় নোনা জলের তফরা খেলছে—গাঙ-খাল আর প্যাচপেচে জলা জায়গা, তারই ভিতর গঙ্গার ধারে ধারে মাদার উপর বসতি। মা-কালীর থান বলে কিছু নামডাক আছে। হালিশহর থেকে চিৎপুর হয়ে একটা জঙ্গলে পথ বড়শে অবধি গেছে—পূজোপার্বণে সেই পথ ধরে কাছাকাছি অঞ্চলের মেয়ে পুরুষ ভবানীপুর গাঁয়ের কালীমন্দিরে আসে, ঠাকুর দেখে গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে পাপক্ষালন করে যায়। হেন জায়গায় কে ভাবতে পারে এক আজব শহরের কথা? জোব চার্নকও ভাবে নি, পালাবার মুখে নেহাৎ দৈববশে এসে জাহাজ বেঁধেছিল।

হুগলি ছেড়ে দলবল নিয়ে তারা পালাচ্ছে। না পালিয়ে উপায় কি? শায়েস্তা খাঁ বড্ড তড়পাচ্ছে—ঘাড় ধরে ইংরেজগুলোকে বে-অব-বেঙ্গলে ছুঁড়ে দেবে; পারে তো সাঁতরে গিয়ে দেশেঘরে উঠুক, তাতে শায়েস্তা খাঁর আপত্তি নেই। দু-মাস ছ-মাস দেরি আছে ওদের এসে পড়বার; ঢাকা থেকে এদ্দূর আসবে তো তোড়জোড় করে! কিন্তু হুগলির দোকানিরা বয়কট করেছে এদিকে, ইংরেজের কাছে কেউ কিছু বেচবে না। উপোস করে মুখ আমশি পারা। মনের দুঃখে চার্নক বাংলাদেশ ছেড়ে চলেছে।

ভাঁটায় নামতে নামতে ফলতার জঙ্গলের ধারে এসে জাহাজ ঠেকল। সর্বনেশে জায়গা রে বাপু! জনমানব নেই, বাঘ হামলা দিচ্ছে। এখানে নামা যায় না, জোয়ার বেলা ভাসিয়ে দিল আবার জাহাজ। যায় যেখানে যাক। সুতোনুটির ঘাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ফিরে এলো সেখানে। জেলে কাঠুরে আর ঘর কয়েক তাঁতির বাস এদিকে-ওদিকে। বাংলাদেশে কাজকারবার বজায় রাখতে হলে আড্ডা একটা চাই। গড়ে নিতে পারলে এ জায়গাটা বোধ হয় মন্দ দাঁড়াবে না।

তারপরে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে—আজ হিজলি, কাল চাটগাঁ, পরশু মাদ্রাজ এমনি করে করে—সুতোনুটির আশপাশেও দু-চারবার চক্কোর দিয়ে শেষটা হাটখোলার কাছে খানকয়েক চালাঘর তুলে বসল। তাঁবু খাটিয়ে আছে কেউ কেউ। আর গঙ্গার ঘাটে নৌকোর মধ্যেও অবরে-সবরে অনেকে রাত কাটায়…

গল্পের ইতি পড়ে দেখে খুনসুড়ির আর এক প্রশ্ন, এই সুতোনুটিতে থাকতেন হেস্টিংস?

বিশ্বেশ্বর খিঁচিয়ে উঠলেন, সুতোনুটির হাটে তাঁতের কাপড় বেচতেন যে—বসাক আর শেঠেরা কিনত। উপায় কি সেখানে না থেকে?

আকাট মূর্খের দল—এদের কাছে ধৈর্য রাখা দায়। আবার ভাবেন, এদের কি দোষ—শুনেছে নিশ্চয় কারো না কারো কাছে। যত হাঁদারাম ইদানীং ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আগে এই লাইনটা নিরুপদ্রব ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর পলিটিক্সে ভিড় বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কলকে না-পাওয়া মানুষেরা নানান দিকে ছিটকে পড়ছে—গবেষণার ব্যাপারেও। বিশ্বেশ্বরের নিজের ক্ষেত্র—তিনি যদি নির্বাক থাকেন কিম্বা গালাগালি দিয়েই দায়িত্ব সারেন, ভুঁইফোড়েরা তবে তো আরও নানান আপ্তবাক্য ছেড়ে মানুষের মাথা খারাপ করে দেবে। বোঝ কাণ্ড! সুতানুটিতে হেস্টিংসের ঘর জেনে বসে রয়েছে, ঐ ছোঁড়ারই বাপ-দাদা হয়তো হেস্টিংস স্ট্রীটে ওয়ারেন হেস্টিংসের আস্তাবল-বাড়িতে দশটা-পাঁচটা অফিস করে ওর পড়া-শুনোর খরচ যোগাচ্ছেন। শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ক'জনই বা খবর রাখে। সেই তখন কত কাণ্ড হয়ে অতএব মুলতুবি থাকুক কাজকর্ম—বিশ্বেশ্বর এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসে আবার হেস্টিংস-পর্ব শুরু করলেন।

হাঁ, জোর করে বলার শক্তি ধরেন বটে তিনি! সার টমাস রো একদিন গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে ভাঁজতে জাহাঙ্গিরের দরবারে ঢুকলেন, সেই পালা সায় হল এসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমলে—ইতিহাসের দূরবিস্তীর্ণ এই দুই সীমানার মধ্যে অতি স্বচ্ছন্দ তাঁর চলাচল। বরঞ্চ পরবর্তী বর্তমানটাকে চেনেন না তিনি ভাল করে, এর ঘোরপ্যাচের

মধ্যে ঢুকতে পারেন না। চারিদিকের জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যেই নিজেকে অসহায় বোধ করেন।

বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠে গেছে, তবু শ্রান্তি নেই। ইরাবতী এসে দাঁড়াল, বিশ্বেশ্বর তখন অন্য লোকে। কেমন কেমন চোখে তাকাচ্ছেন মেয়ের দিকে—এই সব জিজ্ঞাসুদের থেকে আলাদা করে যেন চিনতে পারছেন না।

ইরা ডাক দেয়, চলো বাবা—

চমকে উঠে বিশ্বেশ্বর বলেন, এখন কি রে, এই সন্ধ্যেবেলা—

সন্ধ্যা ছিল তিন ঘণ্টা আগে। দেখ না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

ঘাড় উঁচু করলেই মুক্ত দরজা দিয়ে হলের দেয়াল-ঘড়ি দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ফুরসৎ কোথা অতখানি হাঙ্গামা করবার?

ইরা তাগাদা দেয়, ওঠো—

ছেলেদের একজন বলে, অতি চমৎকার বোঝাচ্ছেন, বিস্তর শিক্ষা হচ্ছে। কথাগুলো শেষ করতে দিন।

ইরা রাগ করে বলে, আর নয়—এখন বাবা বাড়ি যাবেন। প্রশ্নগুলো কাল অবধি যদি মনে থাকে, আবার কাল এসে না হয় বুঝবেন। আমি আসার আগেই সেরে নেবেন।

কৃতান্ত বিশ্বাস এবং 'যুগচক্রের' সহকারী সম্পাদক পঞ্চানন মাইতি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে। রসিদ-বই নিয়ে ঘুরছে। কৃতান্ত বলে উঠল, ভক্তিতে বেসামাল তো ভায়ারা! মুখের বাক্য গবগব করে গিলে খেলেন—বই কেনেন না কেন? তবে তো আর মুখঝামটা খেতে হয় না।

কি বই?

এই দেখুন, নামটাও শোনা নেই; একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। 'ভারতে ইংরাজ'—যা লিখতে লিখতে দাদার কালো দাড়ি সাদা হয়ে গেল। পরের ভল্যুমের লেখা চলছে এখন।

পঞ্চানন ফলাও করে বলে, বৃটিশ আমলের তাবৎ ইতিহাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাবেন। মুফতে মুখে না শুনে এক এক কপি কিনে নিয়ে পড়ুনগে। 'যুগচক্র' কার্যালয় থেকে বেরিয়েছে। মূল্য আট টাকা, এক সঙ্গে তিনখানা কিনলে ডাকমাশুল ফ্রী।

আর এক ছোকরা বলল, ছাপা বইয়ের বাড়তিও বহুৎ দামি জিনিষ থাকে। নাড়া দিয়ে দিয়ে সেই সমস্ত আদায় করছি। বই পড়ি নি, এটা ধরে নিচ্ছেন কেন?

কৃতান্ত হি-হি করে হাসে।

বেশ, বেশ! পড়ে থাকেন, ভালোই। কিনে পড়েন, আরও ভালো। এমন ভক্ত যখন আপনারা, কিছু চাঁদা ছাড়ুন দিকি দাদার সম্বর্ধনা ব্যাপারে। পঞ্চানন, যে যা দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে রশিদ কেটে দেবে। এমন কথা না ওঠে যে দশের পয়সা মেরে দিয়েছে।

এই অমোঘ অস্ত্রে ভক্তেরা রণে ভঙ্গ দিল। বাণ্ডিল খুলে রশিদ-বই বের করতে পঞ্চাননের কিছু সময় লাগে। রসিদ কাটতে গিয়ে দেখা গেল—মুখপাত্র হয়ে একেবারে সামনে ছিল, সেই দু-জন মাত্র—বাকি কারো পাত্তা নেই। দণ্ডস্বরূপ তারাই কিছু কিছু দিয়ে সরে পড়ল।

কৃতান্ত বলে, দাদা আপনার জন্ম দিন পড়েছে বারোই আষাঢ় তো?

বিশ্বেশ্বরের তখনো বোধ হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘোর কাটে নি। প্রশ্নটা পুরোপুরি শোনেন নি—চমক খেয়ে বলে উঠলেন, অ্যাঁ—কার জন্মদিন? কবে?

অর্থাৎ তারিখের হেরফের হলে ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর ক্যাঁক করে টুটি চেপে ধরবেন এক্ষুণি।

পঞ্চানন বলে, জাতিধর্মনির্বিশেষে যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে জন্মদিনে আপনাকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে যে! কাউন্সিলার ভূতনাথ গুঁই মশায়ের পৌরোহিত্যে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে মহতী সভা—

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না বিশ্বেশ্বর, ধাঁধাঁ লেগে গেছে। বললেন, কেন?

বাঃ রে, 'ভারতে ইংরাজ' লিখে দেশের কত বড় কাজ করলেন। স্বাধীন-ভারত স্বাধীন-ভারত করে সবাই তড়পাচ্ছে—এই চিজ কারা কোত্থেকে কোন কায়দায় নিয়ে এলো, সমস্ত একেবারে আপনি জল করে দিয়েছেন।

কৃতান্ত হেসে উঠে বলে, ঐ যে বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই—'যুগচক্রে' খবরটা বেরিয়ে শহরময় হৈ-হৈ পড়ে গেল, আর কেন কি বৃত্তান্ত আপনাকে ধরে ধরে বোঝাই এখন আমরা। একখানা করে কাগজ পাঠাই আপনাকে, তার পাতাটাও উল্টে দেখেন না? লেখকরা অক্ষের লেখা

না পড়ুন, নিজের লেখার কমা-দাঁড়ি নিয়েও আহা-ওহো করেন। আপনার লেখার নিচেই তো সম্বর্ধনার খবর ছেপেছি।

ইরা তাড়াতাড়ি বলে, বাবা বেরিয়ে যাবার পর আপনাদের কাগজ গিয়ে পৌঁচেছে। আমি পড়েছি, ওঁর এখনো হাতে যায় নি।

বাস্তবাগীশ বাপের দিকে মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, অফিসে চাকরির সময় ছুটিছাটা ছিল, দায়-বেদায়ে কামাই করা চলত। এ মনিবের কাছে আধ মিনিট দেরি হবার জো নেই।

বিশ্বেশ্বর একগাল হেসে বললেন, 'ভারতে ইংরাজ' খুব ভাল বলছে বুঝি লোকে?

পঞ্চানন বলে, বলবে না? বাঙালি পাঠক বই না কিনুক, গুণীর কদর বোঝে। দেখবেন, কি পরিমাণ বক্তৃতা ইনিয়েবিনিয়ে অশ্রুগদগদ কত কবিতা লিখে নিয়ে আসবে।

বিশ্বেশ্বর গলে গেলেন।

আমি জানতাম। খাতার পাতে কলম ছুঁইয়েই বুঝতে পারি, কি দরের জিনিষ বেরুবে। তোমরা কিন্তু গোড়ায় ভরসা করতে পারো নি। তা-না না-না করে বিস্তর দিন কাটালে। 'ভারতে ইংরাজ' নইলে দু'-বছর আগে বেরিয়ে এদ্দিনে পুরানো হয়ে যেত।

পঞ্চানন মনে মনে বলে, পুরানো কমা ও ওজন দরে চলে গিয়ে এদ্দিনে গুদাম সাবাড় হত। কৃতান্ত কিন্তু এক কথায় দোষ কবুল করে নেয়, খরচের হিসাব কষে দাদা আগুপিছু করেছি। করপোরেশনের ইলেকসন অবধি সবুর করতে হল। তা দেরি হোক যা-ই হোক, বের করে ফেললাম তো ঢাউশ বই। কোনটা কি দামের বস্তু, কৃতান্ত বিশ্বাসের বুঝতে সিকি মিনিটও লাগে না। কিন্তু দেরি হয় কেন, সে জামার পকেটের তালি দেখে বুঝতে পারেন।

ইরা ঘাড় নেড়ে বলে, তা সত্যি। দেশে কত ধনী-মানী আছেন, গবর্ণমেন্ট আছে, নামজাদা প্রকাশকরা আছে—কাউকে পাওয়া গেল না, আপনিই কেবল এগিয়ে এলেন কাকাবাবু—

কাকা ডেকে বসল আজকে। ধূর্ত ও ঝানু সম্পাদক বলে কৃতান্ত বিশ্বাসের বদনাম। 'যুগচক্রের' নামে অরুণাক্ষ ভ্রূ কুঁচকাল—ঐ মনোভাব সকলেরই। সামনাসামনি বড় কেউ প্রকাশ করে বলে না, ভাল ভাল বিশেষণে তোয়াজও করে অনেকে। কাজ কি ভাই দুর্জনকে চটিয়ে? ভারি ধার কৃতান্তর কলমে, গালিটা বড্ড খোলে।

কিন্তু শুধু ধারে কাগজ চলে না। ভারও চাই। তাই আছেন বিশ্বেশ্বর। পয়লা লেখাটা তাঁর একচেটিয়া। পড়ে না প্রায় কেউ, তা হলেও চাই ওটা। প্রবন্ধের নাম দেখেই লোকে সসম্ভ্রমে বলে, হাঁ—কাগজখানার কদর আছে। 'যুগচক্র' বেরুবার মুখে কৃতান্ত বিশ্বেশ্বরের বাড়ি হানা দিয়ে বিস্তর ভাল ভাল কথা বলে। বিশ্বেশ্বর তার পরে মরীয়া হয়ে লেগে যান লেখা তৈরি করতে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। কিন্তু লেখা ঐ ছাপানো অবধি শেষ, তার অধিক প্রত্যাশা নেই। ইরাবতীও বিরূপ তাই কৃতান্তর উপর—কাগজ চালানোর জন্য তার ভালমানুষ বাপকে খাটিয়ে মারে, খাটনির ফল একলা ফাঁকি দিয়ে খায়। কৃতান্ত বাড়ি গেলে বসতে বলে নি কখনো, কোন-কিছু প্রশ্ন করলে ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিত। কিন্তু দোষ যতই থাক, একটা জিনিষ—বাংলা সাহিত্যকে সে ভালবাসে। সে ভালবাসায় খাদ নেই। বিশ্বেশ্বরের বইটা নিয়েই দেখ না। এ যদি দিকপাল চাটুজ্জে হতেন, প্রকাশকরা হামলা দিয়ে এসে পড়ত। ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প-উপন্যাস লিখে দিকপালের নাম। লিখেই যাচ্ছেন অবিরত—কেন লিখবেন না, বানানো বস্তু, মনের মধ্যে যত কিছু আগডম-বাগডম আসে কাগজের উপর ছড়িয়ে গেলে হল। বিশ্বেশ্বরের মতন নয় যে তারিখটা শনিবার হবে কি সোমবার হবে সাব্যস্ত করতেই লেগে গেল তিনদিন কি তিনমাস কিম্বা তিন বচ্ছর। তবু দেখ, মিথ্যুক ঐ দিকপাল চাটুজ্জের কত খাতির! সভাসমিতি লেগেই আছে। বাড়িতে নাকি পোষা ছাগল আছে—হরবখত দিকপালের গলার মালা খেয়ে খেয়ে সে ছাগল মোষের মতন হয়েছে।

আর ইনি এই কোনটিতে নৈমিষারণ্যের এক তপস্বী পাঁচ-পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিলেন, পাঁচ বছরের সাধনায় বই বেরুল। দিকপাল দাদন নিয়ে বসে থাকেন—দু ফর্দ চার ফর্দ লেখা হলেই প্রকাশকরা ঝেড়ে কুড়ে নিয়ে প্রেসে দেয়। আর কৃতান্ত 'ভারতে ইংরাজের' কপি ঘাড়ে করে সরকারি বেসরকারি কত প্রতিষ্ঠানের দোরে দোরে

ঘুরেছে—জুতোর তলাই ক্ষয়ে গেছে, লাভ কিছু হয় নি। তুত্তোর—বলে শেষটা নিজেই ছাপল।

কৃতান্ত দেমাক করছে, জিনিয চিনি বলেই বই ছাপিয়েছি, আবার এই সম্বর্ধনার যোগাড় করছি। এ তুমি বুঝবে না ইরা মা, সম্বর্ধনা না করে হতভাগা কৃতান্তর উপায় নেই। তাতে বউ-ছেলেপুলের উপোস যাক আর ছাপাখানাই বন্ধক পড়ুক।

পঞ্চানন বিরস মুখে বলে, বিনয় করে বলা নয়। হবে তাই নির্ঘাৎ। ছাপাখানাটা যাবে।

যায় যাকগে। তাতে কৃতান্ত ডরায় না। অ্যাসেম্বলির বড় ইলেকসন সামনে—গেলে আবার ডবল করে হবে। তৈরি থাকবেন দাদা, দ্বিতীয় খণ্ডটা বের করবার মতলব রাখি ঐ অ্যাসেম্বলির মওকায়।

আবার বলে, সে যাক গে। যখনকার ভাবনা তখন। যে জন্যে এসেছি—আপনার সঠিক জন্মতারিখটা বলুন তো দাদা। সেই মতো হল ভাড়া হবে, কার্ড ছাপবো। বারোই আষাঢ় বলে জানি—তাই তো পাকা?

বিশ্বেশ্বর চিন্তিত হলেন, আষাঢ়ে জন্মেছিলাম বটে—তারিখটা বারোই কিনা···তুই বলতে পারিস ইরা? উঁহু, আন্দাজি ঘাড় নাড়া নয়। তোর মা সমস্ত হিসাব রাখে, সে সঠিক বলবে।

কৃতান্ত হেসে ওঠে, সে কি দাদা! যত মরা-মানুষের জন্মমৃত্যুর তারিখ কণ্ঠস্থ, নিজের বেলা গড়বড়?

বিশ্বেশ্বর বলেন, বাজে জিনিষ আমি মাথায় রাখি নে। আমার জন্ম কোন কাজে আসবে শুনি?

কাজে আসবে না তো এদ্দূর এই হাঁটতে হাঁটতে এলাম কেন শুনি? বৌদির কাছেই যাবো, আপনাকে দিয়ে হবে না—

উঠে পড়ল কৃতান্ত। পঞ্চাননকে বলে, সেক্রেটারির কাছে খান দুই রশিদ-বই গছিয়ে দিয়ে যেতে হবে, যদি কিছু তুলে দেন। এঁদেরই তো ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত—এই যখন দাদার সাধন-পীঠ।

পঞ্চানন ইরাবতীকে বলে, সম্বর্ধনা কমীটিতে আপনি আছেন। রবিবারে আমাদের অফিসে কমীটির মীটিং। চিঠি যাবে আপনার কাছে।

কৃতান্ত বলে, মীটিংটা রবিবারে ডাকা হল সকলে যাতে হাজির হতে পারে। সকাল সাড়ে-আটটায়। প্রোগ্রাম ঠি করে ফেলা হবে ঐ দিন। তুমি ভেবে চিন্তে তৈরি হ এসো ইরা মা, পারো তো কাগজে ছকে নিয়ে এসো কাজ সহজ হবে।

ইরা বলে, বাবাকে নিয়ে ব্যাপার। কমীটির ম আমার থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না কাকাবাবু। আ যাবো না।

কৃতান্ত বলে, তোমার হলেন বাবা—আমিও তাঁকে ব ভাই বলে মান্য করি। তবে তো আমারও হাত গুটিয়ে বস হয়। ঘরের মানুষ বলে দামের ঠিক ঠিক আন্দাজ নি পারো না মা—বাংলা-ইতিহাসের যে একটু খবরাখবর রা সে-ই দাদাকে মাথায় তুলে নাচবে। সে হিসাবে দেশে সব মানুষই দাদার আত্মীয়জন। নিজেকেও সেই দলে একটি ভেবে নাও না, তাহলে সঙ্কোচ হবে না।

ইরা না-না—করছে। বিশ্বেশ্বর এক কাণ্ড ক বসলেন সহসা। মেয়েকে বলেন, শুনছিস রে ইরা তোর মা'কে গিয়ে বলবি—সে মোটে বিশ্বাস করে না বলিস সমস্ত—কৃতান্ত যে কথাগুলো বলল। দেশের মানু মাথায় তুলে নাচাবে, হৈ হৈ—মস্ত বড় সভা কর আমায় নিয়ে—

ইরা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। চলো এবারে তুমি কত রাত হয়ে গেছে, ওঠো। তোমার যে ক্ষিধে পে গেল বাবা—

ছেলেমানুষ বাপটিকে নিয়ে এদের সামনে থেকে সর পারলে রক্ষে পেয়ে যায়।

বাপে-মেয়ে চলে গেছে। কৃতান্তরা সেক্রেটারির ঘ গিয়ে বসেছে। আসেন নি তিনি এখনো। কখন আসবে কিম্বা একেবারেই আসবেন কিনা, সঠিক কেউ বলতে পা না। পঞ্চানন বেজার মুখে বলে, শনি তোমায় তাড়ি নিয়ে বেড়াচ্ছে, কিছুতে শিক্ষা হয় না। যা ঐ মুখ দি বেরুল, ছাপাখানাটা নির্ঘাৎ যাবে এবার। পঞ্চাশ কপি ব বিক্রি হল না, তার উপর লেখক-সম্বর্ধনা!

রাগ দেখে কৃতান্ত হাসে।

আরে ভাই, কানে জল ঢুকলে আরও জল ঢুকিয়ে দি বের করতে হয়। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে মগল

খরচ। এ হল সভার নামে হৈ-চৈ করে, পয়সায় কুলালো তো দু-খানা করে সিঙাড়া খাইয়ে নিখরচায় কলমজোড়া বিজ্ঞাপন বাগিয়ে নেওয়া।

নিখরচায় কি বলো! হলের ভাড়াই কত পড়বে দেখো। তার উপর মালা আছে, মাইক আছে—নমো-নমো করে সারলেও পাঁচশ-টাকার ধাক্কা।

কৃতান্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে, সে তো আর আমরা দিতে যাচ্ছি নে। পাবোই বা কোথা ?

কে দেবে তবে ? জাতিধর্মনির্বিশেষে তাবৎ নাগরিক তো সম্বর্ধনা করছে তারা নাকি ? তবেই হয়েছে !

রাগে গরগর করতে করতে পঞ্চানন পকেট থেকে রশিদবই বের করে ফেলল—একটু আগে যার থেকে দু-খানা কেটে দিয়েছে।

এই এই। পরিতোষ হাজরা আট আনা আর দীপক বটব্যাল ছ-আনা। বাহবার জোয়ার বইয়ে দিয়ে শেষ অবধি দুই ভক্তে মিলে পুরো টাকাটাও নয়। হস্টেলে থাকে দেখছি—সিনেমা-সিগারেটে কত উড়ে পুড়ে যায়! এই হল ব্যাপার! ঐ চোদ্দ আনার পয়সা দিয়েই মনে মনে শাপ-শাপান্ত করতে করতে গেছে।

কৃতান্ত বলে, যাকগে যাকগে। যদ্দূর হয় হোক। তার পরে গৌরী সেন রয়েছে। ইনস্টিট্যুটের মতন জায়গায় ভূতনাথ গুঁই সভাপতি হয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে বক্তৃতা করবে। বক্তৃতা লিখে দেবো আমরা। তার উপরে, চাই কি, 'বিদ্যোৎসাহী' 'দানশৌণ্ডি' এমনি গোছের ভারী ভারী সংস্কৃত বিশেষণ ছুঁড়তে থাকব। বই ছাপানোর কাগজ দিয়েছে, বই বিক্রির দায় নিতে আসবে এখন কে ?

পঞ্চানন বলে, কাগজটা দিয়েছিল ইলেকসনের ডামা-ডোল ছিল যে তখন। বিশেষণের বহুৎ দাম দিল। তার উপরে অম্বুজাক্ষর নাম করে তাতিয়ে দেওয়া হল—ডাক্তারবাবু শুধু কাগজ নয়, প্রেস-খরচাও দিতে যাচ্ছেন। ভোটাররা টের পেলে অম্বুজাক্ষের দিকে ঝুঁকবে—ধাপ্পায় ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি টাকা বের করল।

কৃতান্ত হেসে উঠে বলে, ইলেকসন যদি মাসে মাসে হত রে! তাই হওয়া উচিত, জনগণের মত যত ঘনঘন যাচাই হবে, তত দাঁড়াবে খাঁটি গণতন্ত্র। পঞ্চানন, তুমি একখানা জ্বালাময়ী ছাড়ো দিকি আসছে সংখ্যায়। সরকারের সুবুদ্ধি হোক। 'যুগচক্র' আর পিছিয়ে থাকে না তা হলে, হপ্তায় হপ্তায় নিয়মের মধ্যে এনে ফেলা যায়।

হপ্তায় হ'প্তায় কি বলো, দুখানা করে ফি হপ্তায়। সেই সুখস্মৃতির মধ্যে পঞ্চাননও হেসে ফেলল উপস্থিত উদ্বেগ ভুলে। আহা, কি লাট সাহেবি করা গেছে ইলেকসনের সময়টা!

হঠাৎ এরা যেন ঈশ্বরের সমতুল্য হয়ে উঠল। বৈঠক-খানায় বিশ দিন ধর্না দিয়েও যে মহাজনদের সঙ্গে একটা কথা বলার ফুরসৎ পাওয়া যায় না, তাঁরাই সকাল বিকাল লোক পাঠাচ্ছেন, হামেশাই নিমন্ত্রণ করেছেন, নিজেরাও অনেক সময় যুগচক্র-অফিসে এসে ছবির গরুড়-পক্ষীর মতো বসে থাকেন। দু'জন ভাইপো ও দু'টি শালার চাকরি করে দিল কৃতান্ত এই মওকায়। পঞ্চাননের নতুন জুতো পশমি ট্রাউসার ও হাওয়াইয়ান শার্ট হল। প্রেসের পুরানো টাইপ বাতিল হয়ে আনকোরা নতুন টাইপ এলো। আর 'যুগচক্র' কাগজ নামে সাপ্তাহিক, কিন্তু ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বের হয়। পয়লা ভাদ্রের কাগজ হয়তো সাতুই কার্তিক বেরুলো আর সাতুই কার্তিকেরটা বেরুলোই না মোটে। পিছুলে পিছুলে যখন অনেকটা পিছিয়ে যায়, একেবারে পনের-বিশ সংখ্যা বাদ দিয়ে কাগজ প্রকাশ-তারিখের কাছাকাছি নিয়ে আসে। আবার পেছুতে থাকে। বাইশে পৌঁচেছে যুগচক্রের বয়স—টায়ে-টোয়ে আর তিনটে বছর কাটালে রজত-জয়ন্তী। এই বাইশ বছরে বাইশ ইনটু বারো অর্থাৎ মাসে গড়ে একখানা করে বেরিয়েছে কিনা, তাই সন্দেহ।

ইরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, গ্রাহকরা আপত্তি করে না ?

কৃতান্ত মুচকি হেসেছিল, জবাব দেয় নি। গ্রাহক থাকলে তো আপত্তি! সরকার বাহাদুর করুণা করে নিলাম-ইস্তাহার ছাপতে দেন, আর হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি করে কিছু বিজ্ঞাপন জোটায়, তাতেই কায়ক্লেশে কৃতান্ত-পঞ্চাননের খরচটা উঠে আসে।

ইলেকসনের সময়টা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ যেন হঠাৎ। যে কথা পঞ্চানন বলল—হপ্তায় হপ্তায় নিয়মিত সংখ্যা তো বটেই, ওর ফাঁকে বিশেষ সংখ্যা বেরুচ্ছে ঘন ঘন। যার যা পাওনাগণ্ডা ছিল, হাল বকেয়া মিটিয়ে দিল। বিশ্বেশ্বর সর্বপ্রধান লেখক—লেখক তো দপ্তরি-কম্পোজিটার নয় যে

টাকাপয়সার ব্যাপার থাকবে। কিন্তু কৃতান্তর কৃতজ্ঞতা আছে—এই কল্পতরুর দিনে তাঁর বইটা বের করে দিতে হবে। ভূতনাথ গুঁইকে বোঝাল, 'ভারতে ইংরাজ' নামক যুগান্তকারী বই ছাপানোর কাগজটা দিয়ে দিন আপনি। সেকালে বিদ্যোৎসাহী ধনীরা কত কি করতেন—দেশের লোক মাথায় করে রাখত তাঁদের, চিরদিন নাম করত—

দেশের লোক নিয়ে ভূতনাথের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, ভোটারগুলো শুধু পদতলে না থেঁতলায়। বিশেষ করে অম্বুজাক্ষ রায়ের মতন মানুষ যখন বিপক্ষে। টু শব্দটি না করে ভূতনাথ টাকা বের করে দিলেন। কিছু বদনাম হল এই নিয়ে। মন্দ লোকে চোখ টিপে বলে, 'যুগচক্র' দেখ কেমন মৌমাছি হয়ে আজ এ-ফুলে কাল ও-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে। সোমবারের কাগজে অম্বুজাক্ষকে আকাশে তুলে ধরল। ঠিক তার তিন দিন পরে বিষ্যুৎবারের বিশেষ সংখ্যায় লিখছে—'অম্বুজাক্ষ উত্তম বটেন, কিন্তু তাঁহার তুলনায় ভূতনাথ গুঁই বিস্তর দানশীল। উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইলে খদ্যোত ও চাঁদের উপমা মনে আসিবে। অম্বুজাক্ষের, এমন কি, খদ্যোতের দীপ্তিটুকুও আছে কিনা সন্দেহ।'

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? অম্বুজাক্ষ শুধু মুখের খাতিরেই কেল্লা ফতে করতে চান। ভোটের ব্যাপারে নগদ অর্থ ছাড়া নাকি অন্যায়—অপমানকর। এখন বুঝছেন কৃতান্ত বিশ্বাস ক্ষমতা ধরে কিনা দেখ। মুখে যা বলেছিল, কাজেও করল ঠিক তাই। ভূতনাথ হেন গোমুখ্যুর কাছে হেরে অম্বুজাক্ষ—মনে করা গিয়েছিল, সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়-পর্বতে যাবেন। তা গতিকও বটে তাই। ঘন ঘন গ্রামে গিয়ে থাকছেন ইদানীং। কি কাণ্ড! রোগীর দল টাকা পকেটে নিয়ে ফিরে যায়। পল্লী না জাগলে কিছুই হবে না, এমনি সব ভাল ভাল কথা সর্বদা মুখে। এতখানি পল্লীপ্রীতির মূলে কিছু না থেকে যায় না। ক্রমশঃ

যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, যাঁহার প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। বিস্ময় বিমুগ্ধ বাঙ্গালী তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণদ্যুতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগ বাঙ্গালীর আত্ম অনুশীলনের যুগ। রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারবাদ ও ব্রাহ্মবাদ, একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে নূতন পথের সন্ধান দিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন পাণ্ডিত্যাভিমান হিন্দুধর্ম্ম সংহিকাকে ম্লেচ্ছের কবল হইতে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল, তেমনি আবার আর একদিকে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ ধর্ম্ম বোধ হিন্দুকে ধর্ম্মের শান্তি প্রদান করিতেছিল—ঠিক এই রকম এক যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার সৌরকরজাল বিস্তার করিয়া বঙ্গের গগনে আবির্ভূত হইলেন। তখনো বঙ্গালার গগন হইতে জড়তার মেঘ অপসারিত হয় নাই, তখনো বুদ্ধিমান্দ্য পাশ্চাত্যানুকরণশীল বাঙ্গালীকে স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির অবসর দেয় নাই। বঙ্কিম তখন মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাপটু শিক্ষাভিমানী একজন যুবক। কিন্তু না জানি কোন্ ঐশীশক্তির প্রভাবে এই যুবকের অন্তরে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিল। পাশ্চাত্যানুকরণশীল বাঙ্গালীর কথা তিনি নূতন ভাবে ভাবিলেন,—কি ভাবে বাঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিলেন। কিন্তু এই চিন্তাধারাকে কার্য্যকর করিতে হইলে, একটা অবলম্বন প্রয়োজন—যোগ্য গুরু পরম্পরা আবশ্যক। তাই তখনকার প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেই তিনি "গুরু" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই গুরু স্বীকৃতির মধ্যে তিনি জ্ঞান বিস্তার করার সুযোগ পাইলেন। বঙ্কিম বুঝিলেন, সাহিত্য ভিন্ন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। পশ্চিমের সংস্পর্শে বাংলায় যে ভাবতরঙ্গ দেখা দিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে। বঙ্কিম হইলেন সেই সাহিত্যের সূত্রধার। শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্ম-অবিশ্বাসকে কঠোর যুক্তি ও ভাবের আঘাতে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। দেশের যত চিন্তাধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যেন নবনব রূপ পাইল। তাঁহার প্রতিভার দীপ্ত দ্যুতি তখনকার সমসাময়িক বাঙালী আপাততঃ সহ্য করিতে না পারিলেও ক্রমে সেই দীপ্তিময়ী প্রতিভার নিকট বাঙ্গালী নতি স্বীকার করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অন্যকে পরিচালনা করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নেতৃত্ব তাই তাঁহার নিকট সুলভ হইয়াছিল। তখনকার বাঙ্গালী তাঁহাকে "গুরু" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ধন্য হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ স্বীয় প্রতিভার প্রভাবে সাহিত্য গুরু স্থানীয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বীয় সত্যদৃষ্টির প্রভাবে তিনি দেশাত্মবোধের "গুরু" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। বস্তুতঃ বঙ্কিম বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধের আদি নেতা। পরাধীনতার গ্লানি বঙ্কিম মনে মনে অনুভব করিতেন। জীবনের অধিক কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী করিতে হইলেও চাকুরী জীবনের উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ; চাকুরীকে তিনি তাঁহার জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। বিদেশীয়দের হাতে বাঙ্গালীর লাঞ্ছনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তাঁহার একান্ত সুহৃদ্ দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" বাঙ্গালীর মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার করিল। বঙ্কিমও "আনন্দমঠ" রূপ অমর গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাইলেন। পাগল কমলাকান্তের আত্মদর্শনের মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জন্মাইতেছিলেন। কমলাকান্তের স্বপ্ন ঋষির আনন্দমঠে চরম পরিণতিলাভ করিল। বস্তুতঃ "আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, তাঁহার মহিমা "বন্দেমাতরম্ গানে ও মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শনে।" শক্তি প্রতিমাকে কি ভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যায়, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে ভাল বাসিতেন। বাঙ্গালীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গ ভঙ্গের সময়ে যখন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি খাস বাঙ্গালার উপর নিপতিত তখন "বন্দেমাতরম" গান কোটি কোটি বাঙ্গালীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল। বঙ্গ-ভঙ্গে যে সময় ও সুযোগ দেখা দিল। তখন বঙ্কিমের—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম নূতন ভাবে বাঙ্গালার লোক লোচনের গোচর হইল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে দেখাইলেন—মানুষ শারীরিক বলের সাধনা করিতে পারে, কিন্তু নৈতিক বল, সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ী হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানগণ শক্তিশালী সন্ন্যাসী - তাহারা সংসার ত্যাগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালীর প্রাণ মনের উৎকণ্ঠাকে বাণীরূপ দিলেন। বাঙ্গালীর জীবনের গূঢ়তম আকূতি, বাঙ্গালীর অতীত ও ভবিষ্যৎ, তাহার সংশয় ও অবিশ্বাস এবং তাহার সমাধান—এই সকলই তাঁহার সাহিত্যে নানা আকারে নানা ছন্দে প্রতিফলিত হইয়াছে। "আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, নব্য বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগ পর্য্যন্ত তাহার সেইরূপ-বিকাশ, যাহা বিশ্বের দরবারে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার ভিত্তি স্থাপনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রেম ও পৌরুষ সমন্বিত প্রতিভার বিকাশ যথাকালে না হইলে, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় আমরা পাইতাম কিনা সন্দেহ।

বঙ্কিমের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যে সত্য—শিব ও সুন্দরের প্রকাশে বঙ্কিমের পূর্ব্বের বাঙ্গালা শুধু ধর্ম্ম বিতণ্ডার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াইয়াছিল। তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের অপরিণত যুক্তি লইয়া বাঙ্গালীর মনকে বিভ্রান্ত করিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাহিত্যের মাধ্যমে নূতন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শোনাইলেন। বাঙ্গালী—যেভাবে বুঝিতে চায়, যেভাবে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর মন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বাঙ্গালীকে তিনি সেই সেইভাবে ধর্ম্মের গুহ্যতত্ত্ব বুঝাইলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। বৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম-চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন হইতে পারে না বা তাহা মানুষের কল্যাণে আসিতে পারে না। তাঁহার আনন্দমঠের শক্তি, দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল ও সীতারামের জয়ন্তী চিত্তশুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ। বঙ্কিম বিভিন্ন প্রবন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে, কৃষ্ণচরিত্রে ও গীতার ব্যাখ্যায় ও উপন্যাসাদিতে হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সাহিত্য যে ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে না তাহা তিনি পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যাহা সত্য তাহা ধর্ম্ম। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহা উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্ম-মন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বজ্ঞান বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আয়ত্ত করা।"

বঙ্কিম কোন ধর্ম্মকে অনাদর করিতেন না। হিন্দুমুসলমান সকলের প্রতি তিনি সমদর্শী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যভাবেই আছে। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ।"

বঙ্কিম কেবল উচ্চশ্রেণীর লোক লইয়া বিব্রত হন নাই। মূর্খ দীন দরিদ্র স্বদেশীয়দের জন্য যেমন তিনি ভাবিয়াছিলেন, তেমন আর কে ভাবিয়াছে ? "বাঙ্গালার কৃষক" প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালার প্রাণবস্তু কৃষি ও কৃষককুলের বিষয়ে দরদ দিয়া লিখিয়াছেন। তাহার "রামা কৈবর্ত্ত ও হাসিম শেখের" দলের মঙ্গল না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের শ্রীবৃদ্ধি নাই।

আজ আবার নূতন করিয়া সেই যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী স্মরণ করার দিন উপস্থিত হয়েছে। মুমূর্ষু বাঙ্গালীকে আবার সেই ঋষির দেশাত্মবোধে জাগরিত হইতে হইবে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধান তাহাকেই আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঋষির উদাত্ত বাণী বাঙ্গালীকে নূতন চেতনা নূতন প্রেরণা দান করুক। বন্দেমাতরম্।

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইংরেজ ভারত ছাড়ার সঙ্গে কাশ্মীর চেয়েছিল স্বাধীনতা এ বিষয়ে মহারাজা, মুসলিম কনফারেন্স ও ন্যাশান্যাল কনফারেন্স সকলেই প্রায় একমত ছিলেন এবং ভারত বিভাগের পর কাশ্মীরের সকল পক্ষই সেই চেষ্টায় ছিলেন। বিরোধ ছিল শুধু নেতৃত্বের। মহারাজা হরিসিং তাই তাড়াতাড়ি পাকিস্থানের সঙ্গে স্থিতাবদ্ধ চুক্তি কোরে নিজের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। জনাব জিন্নাও তাঁকেই তোয়াজ কোরে বোললেন কাশ্মীর কোনদিকে যোগ দিবে তা মহারাজই স্থির কোরবেন কারণ তিনিই রাজ্যের মালিক, সাধারণ প্রজার এ নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের সভাপতি শেখ মহম্মদ আবদুল্লা খোলাখুলি বল্লেন আমরা ভারত বা পাকিস্থান কার সঙ্গে যোগ দোব অথবা "স্বাধীন থাকব" প্রজাসাধারণই তা ঠিক করবে এবং তাদের সে অধিকার পেতে হোলে আগে মহারাজকে গদিচ্যুত কোরতে হবে ; কাজেই তিনি "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ কোরলেন। এই সময়ে (১৯৪৭ সালের জুন জুলাইএ) কাশ্মীরী পণ্ডিত সম্মেলন দাবী করেন যে কাশ্মীর হিন্দুস্থান গণপরিষদে যোগ দিক ; অমনি মুসলীম কনফারেন্স মহারাজাকে জানান তাহোলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা কোরবে (আবদুল্লা সাহেবের বিরোধীদল হিসেবে এরা তখন কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনে যোগ না দিয়ে মহারাজের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং পাকিস্থানের জন্যে প্রচার চালাচ্ছিল)। তাদের দাবী হোল কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিক, কমপক্ষে "স্বাধীনতা ঘোষণা করুক এবং নিজস্ব গণপরিষদ আহ্বান করুক।" অপর পক্ষে পাকিস্থানকেও খুসী কোরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা আবদুল্লা সাহেবও যথেষ্ট করেন ; তিনিও ঘোষণা করেন "পাকিস্থান যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রজাসাধারণের হাতে থাকিবে, কোন দেশীয় রাজ্য কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকারী জনসাধারণ, তা হোলে আমরা পাকিস্থান রাষ্ট্রে যোগ দোব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা কোরব।" কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আবদুল্লা সাহেব লাহোরে ও শ্রীনগরে পাকিস্থানের প্রধানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে জিন্নাসাহেব হিটলারের ঝঞ্ঝা বাহিনীর অনুকরণে নোঙ্গরবিহীন এই নৌকাটার ওপর ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন। কাশ্মীরের মহারাজের প্রায় পনের হাজার সৈন্য হয়ত বা এ আঘাত সামলাতে পারতো কিন্তু শেখ আবদুল্লার আন্দোলনে তখন সমগ্র মুসলমান সমাজ হিন্দু ডোগরা রাজের ওপর বিরূপ ও বিদ্রোহী হোয়ে উঠেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের এবং পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, আসফ আলি প্রভৃতির সাহায্য ও সহযোগীতায় শাসন ভাঙ্গার নেশা তখন দেশময় ছোড়িয়ে পড়েছে—সে আগুনে ঘৃতাহুতি পোড়ল হিন্দুরাজ ধ্বংসের বিদ্বেষ। "ডোগরা রাজ খতম্ করো" ছিল বিদ্রোহীদের ধ্বনি। দেশব্যাপী এই বিদ্রোহ বহ্নি দমন কোরতে মহারাজের সব শক্তি তখন ব্যস্ত। এমন সময় গান্ধীজী ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে কাশ্মীরে এসে মহারাজের সঙ্গে দেখা কোরে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র কাককে পদচ্যুত কোরতে বলেন। ভারতের ভাগ্য বিধাতা গান্ধীজীর আদেশে প্রধানমন্ত্রীর পদচ্যুতি, বিদ্রোহী নেতা শেখ আবদুল্লার মুক্তি (১৯৪৭, ২৯শে সেপ্টেম্বর), পলাতক নেতা গোলাম মহম্মদ বক্সীর কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তনে অনুমতি ও বিদ্রোহীদের কারা মুক্তির ফলে দেশে রাজশক্তি দুর্ব্বল হোল, আবদুল্লা সাহেবের প্রতিপত্তি বাড়লো। মহারাজা তখনও ভাবছিলেন শেখ আবদুল্লাকে কাজে লাগিয়ে তার কাশ্মীর সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা ভোগ করবে। এই সময় তীব্রবেগে ঝঞ্ঝার মত হানাদারের দল পঞ্চ মজঃফরাবাদ প্রভৃতি এলাকায় আঘাত হানলো। হিন্দু নিধন যজ্ঞ সুরু হোল, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ অবাধে চললো—বহু প্রজা ও মুসলমান পুলিশ এবং সৈন্য এতে যোগ দিলে। ফলে মহারাজার পক্ষে হানাদারদের বাধাদান অসম্ভব হোয়ে পোড়ল, আবদুল্লাও দেখলেন তার স্বপ্ন বুঝি স্বপ্নই থেকে যায়। কাশ্মীরের সার্ব্বভৌমতার স্বপ্ন বর্ব্বরতার বিভীষিকার রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে গেল। পাকিস্থানের কবলে গেলে শেখ আবদুল্লা বা তার ন্যাশন্যাল কনফারেন্স যে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যেতেন একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ মুসলীম লীগের সঙ্গে ছিল তাঁর বিরোধ কাজেই মহারাজা এবং তাঁর বিদ্রোহী প্রজার নেতা শেখ আবদুল্লা একসঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত

সরকারের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব লৌহমানব সর্দ্দার প্যাটেল অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাহায্য এবং সলা-পরামর্শ দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত বোলে স্বীকার কোরে নেন। এই পরিবেশের মধ্যে কাশ্মীরের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হবার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে সে যুক্ত হোল। এর পর হানাদারদের সমতলভূমি থেকে তাড়িয়ে সম্পূর্ণ বিজয় যখন প্রায় মুষ্টিগত তখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পররাজ্য আক্রমণের অভিযোগ এনে সামরিক শক্তি সংযত কোরলে (১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে যুদ্ধ বিরতি হয়)। পাকিস্থান তখন সম্পূর্ণ অস্বীকার কোরলে—তার যোগাযোগ হানাদারদের সঙ্গে, কিন্তু ক্রমে দর কষাকষির সময় দেখা গেল পাকিস্থানই প্রকৃত পক্ষ। গত পাঁচ বছর ধোরে এই দর কষাকষির দৌড় দেশবাসী জানেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হোয়ে চুক্তিতে এক সর্ত্ত জুড়ে দেন যে ভবিষ্যতে কাশ্মীরবাসীরা গণভোটে স্থির কোরবে তারা পাকিস্থান বা ভারতে যোগ দেবে। বলাবাহুল্য দুর্যোগের সেই দুর্দ্দিনে কাশ্মীরের মহারাজা বা আবদুল্লা সাহেবের কোনও সর্ত্ত আরোপ কোরে সাহায্য চাইবার ক্ষমতা ছিল না। পরে প্রকাশ পেয়েছে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কূটকৌশলে নেহেরুজী উদারতার অজুহাতে এই ফাঁদে পা দিয়েছেন। ভারতের সৈন্য ও সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্থানের কবল থেকে ভারতেরই অংশকে রক্ষা কোরে আবার তাকে বলা যে এবার কোন দিকে যাবে ভোট দিয়ে স্থির করো, এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাহাদুরী কুড়োন যেতে পারে, কিন্তু সেটা যে চরম রাজনৈতিক নিবুদ্ধিতা একথা অতি সাধারণ মানুষও বোঝে।

এখন দেখা যাক পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবিত গণভোটই যদি নেওয়া হয় তবে শতকরা ৮০ জন মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্থান কোন দেশে যোগ দেবে। অনেকেরই ধারণা কাশ্মীরের মুসলমান স্বাভাবিক ভাবেই ভোট দেবে পাকিস্থানের পক্ষে। অতীতের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দেয়। কিন্তু আমার ধারণা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীরী মুসলমান পাকিস্থানে যোগ দেবার পক্ষে ভোট দেবে না। অবশ্য ভোটের মুখে ধর্ম্মের জিগীর তুলে মুসলমান একার ধুয়ো তুলে অশিক্ষিত মুসলমান কি কোরবে বলা মুস্কিল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান যদি নষ্ট না হয় তবে কাশ্মীর মুসলমান ভারতের দিকেই থাকবে, তার কারণ ভারত ইতিমধ্যে স্বীকার কোরে নিয়েছে যে (ক) কাশ্মীর কার্য্যতঃ পৃথক রাজ্য, কারণ তার পৃথক পতাকা, পৃথক শাসনতন্ত্র ও পৃথক রাষ্ট্রপ্রধান। (খ) হিন্দু রাজাকে অপসারিত কোরে মুসলমান জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ কোরেছে ভারতবর্ষ। (গ) ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করা সত্ত্বেও ভারতের মত প্রতিপত্তিশালী এক বন্ধু রাষ্ট্র তার আপদ বিপদে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে উদগ্রীব। (ঘ) পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত হোলে কাশ্মীরে বিদেশী যাত্রী আসবে মাত্র করাচী, লাহোর থেকে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে থাকলে তার বহু নগরীর নাগরীক প্রতি বৎসর যাবে এখানে, যার ফলে অধিকতর অর্থাগম হবে কাশ্মীরবাসীদের।

পাকিস্থানে যোগ দেওয়ার অর্থ :—(ক) বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বদলে করাচী থেকে শাসিত হওয়া এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হওয়া। (খ) দরিদ্রতর ও ক্ষুদ্রতর দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বিদেশী অতিথির সংখ্যা হবে স্বল্পতর, ফলে অর্থাগম হবে অল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র হবে অপরিসর। (গ) পাকিস্থানী পরিচালিত আক্রমণে কাশ্মীরের হিন্দু ও মুসলমান রমণী ধর্ম্মনির্ব্বিচারে ধর্ষিতা ও অপমানিতা হোয়েছে, সকলের গৃহই অগ্নিদগ্ধ হোয়েছে, কাজেই পাকিস্থানের মুসলীম্ প্রীতির ওপর কাশ্মীরি মুসলমানদের আর বিশেষ আস্থা নাই। ভারতের সাহায্যে কাশ্মীর তাদেরই একজন মুসলমানকে পেয়েছে প্রধান শাসকরূপে, তাদেরই পূর্ণ প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এর আইন সভা, ডোগরা রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হোয়েছে, পৃথক সত্ত্বার স্বীকৃতি স্বরূপ নিজস্ব পতাকা পেয়েছে, সাধারণ কৃষক অবস্থাপন্ন কৃষকের কাছ থেকে (যারা অধিকাংশই হিন্দু) বিনা খেসারতে কেড়ে নেওয়া জমির মালিক হোয়েছে বিনামূল্যে ; রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সৈন্য বিভাগে হিন্দু ডোগরা রাজপুতদের আধিপত্যের বদলে মুসলমানদের প্রভাবই এখন সর্ব্বাধিক, কাজেই কিসের লোভে কাশ্মীরবাসী ভারতকে ছেড়ে পাকিস্থানে যাবে ? মুসলমানপ্রীতির জন্যে ? ভারতে যোগ দিলেও ত তার হানি হবে না, বরং তাতে সে থাকছে স্বয়ং শাসিত মুসলমান রাজ্য হিসাবে। পাকিস্থানে যোগ দিলে করাচীর কুক্ষীগত হোতে হবে সম্পূর্ণভাবে।

এখন দেখা যাক কাশ্মীরের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল প্রজা পরিষদের আন্দোলনের মূল কথা কি ? প্রজাপরিষদের দাবী ছিল—'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান।' অর্থাৎ বিনাসর্ত্তে ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিন। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোয়েছে এই জন্যেই ভারত কাশ্মীরের রক্ষার জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় কোরছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনানীরা প্রাণ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাক-ভারত বিরোধের সৃষ্টি হোয়েছে—অথচ সেই রাজ্যেই কোন প্রজা বা তাদের দল যদি ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবী জানায় তবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় পুলিশ ও অস্ত্র পাঠিয়ে তাদের সাজা দেন কেন তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। প্রজা-পরিষদ দাবী কোরেছিল যে কাশ্মীরের পৃথক সত্ত্বা থাকতে পারে না, সে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা পূর্ব্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির মতই বিনা সর্ত্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোক, আর ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের প্রধান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন কাশ্মীরের পৃথক গণতন্ত্র, পৃথক পতাকা, পৃথক রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি হোলেন জাতীয়তাবাদী, ভারতের পরম সুহৃদ আর প্রজা-পরিষদ হোল সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিভেদসৃষ্টিকারী। ভারতের অথচ গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত নাগরিকের সাধারণ অধিকার কাশ্মীরবাসী লাভ করুক। এবং ভারতের উচ্চতম আদালত কাশ্মীরের উচ্চতম আদালত বোলে স্বীকৃত হোক এ দাবীও কংগ্রেস সরকারের চোখে অপরাধ এবং এই অপরাধের ফলে সহস্র সহস্র কাশ্মীরবাসীকে নির্য্যাতিত ও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং ভারতের সরকার তাতে সাহায্য করেছিলেন। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! কিন্তু একটা মিথ্যা ঢাকতে যেমন মিথ্যার

শেকল সৃষ্টি করতে হয়, একটা ভুল ঢাকতে তেমনি অনেক ভুল কোরতে হয়। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ বোলে স্বীকার কোরেও তার পুনরুদ্ধার না করা এবং তার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরজায় কান্নাকাটি করা ক্লীব নীতির পরিচায়ক; কিন্তু তা যখন হোয়েই গেছে এবং এই অন্তর্ভুক্তিকে যখন আবার গণভোটের অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হোতেই হবে, তখন কংগ্রেসী সরকারের বর্ত্তমাননীতি ব্যতীত বোধ হয় দ্বিতীয় পথ নাই। পাকিস্থানে গেলে কাশ্মীর যে সুবিধা পেত তার চেয়ে বেশী ঘুস না দিলে সে কেন এদিকে আসবে! এখানে নীতি ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে বাস্তব রাজনীতিক স্বীকার কোরতে হবে অর্থাৎ কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতিকেই শ্রেয় বোলে মানতে হবে। কিন্তু নিজেদের প্রথম ভুল স্বীকার কোরবার সাহস নাই বোলে পরবর্ত্তী ভুলগুলোও সমর্থন কোরতে হোচ্ছে সত্যবাদীদের মিথ্যাবাদী বোলে, জাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রদায়িক বোলে।

প্রজা-পরিষদের আর একটা ভয় এই যে গণভোটে যদি কাশ্মীর মুসলমান পাকিস্থানে যেতে চায় তবে জম্মুও লাডাক প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় লক্ষ হিন্দু ৩৬ হাজার বৌদ্ধ এবং কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ এক লক্ষ হিন্দুদের কি হবে? কাশ্মীরের একতৃতীয়াংশ আজও পাকিস্থানের কবলে এবং সেখানের সব অধিবাসীই আজ মুসলমান, তাদের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার চৌদ্দ লক্ষ মুসলমানের অধিকাংশ যদি পাকিস্থানে যোগ দিতে চায় তবে কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে জম্মু ও লাদাককেও যেতে হবে—পাকিস্থানের কবজায়। ফলে তাদের স্ত্রীপুত্র ও ধর্ম্ম নিয়ে দেশত্যাগী হোতে হবে। তাই এরা দ্বিতীয় দাবী তুলেছিল কাশ্মীর উপত্যকা যদি রাজী না হয়—তাকে বাদ দিয়ে জম্মু ও লাদাক সম্পূর্ণভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। এ আন্দোলনকে আপাতদৃষ্টিতে বিভেদ সৃষ্টি কারী বলা চলে, কিন্তু আন্দোলনের অন্তরালে আছে এই আশঙ্কা যা মোটেই অমূলক নয়। অন্য পক্ষে এ আন্দোলনে কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্প্রদায় যে ক্ষুণ্ণ হবেন এ কথাও সত্যি। কাজেই ভবিষ্যতে গণভোটের দাবী থাকলে সমগ্র সমস্যাটী বড় জটিল এবং এর সমাধান জটিলতর। যে অংশ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত বোলে ভারত ও সে দেশ স্বীকার কোরে নিয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে ভারত তার রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে, সে দেশকে আবার গণভোটে এ বিষয় স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া উদারতার পরিচয় হোলেও রাজনৈতিক অদূর দৃষ্টিতার পরিচায়ক, এর ওপর কাশ্মীরের পৃথক শাসনতন্ত্র ও পতাকা স্বীকার কোরে ঘুষ দেওয়ার যে অপচেষ্টা হোয়েছে তাতে সমস্ত ব্যাপারটী অধিকতর জটিল করা হয়েছে। ভারতের অন্তর্ভুক্ত অংশে কিভাবে পৃথক জাতীয় পতাকা থাকতে পারে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। ৪ঠা-৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের রাজ্যপাল সম্মেলনে কাশ্মীরের রাষ্ট্রপ্রধান সর্দ্দার-ই-রিয়াসৎকে পৃথক ভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হোয়েছিল। এই বিভেদমূলক ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত ঘটনা স্রোতকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই জানেন। প্রজা পরিষদকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হোয়েছে এবং কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশনে হায়দরাবাদে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ও সেখ আবদুল্লা শুধু এ বিষয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরেছেন কিন্তু এদের অপরাধটী কি তা স্পষ্ট কোরে বোলতে পারেন নাই। প্রজা পরিষদেও মুসলমান নাগরিক সভ্য আছেন; হয়ত আবদুল্লা সাহেবের ন্যাশনাল কনফারেন্সে যতজন হিন্দু সভ্য আছেন, তার চেয়ে শতকরা মুসলমান সভ্য এদের বেশী। (স্মরণ রাখা দরকার যে শেখ আবদুল্লা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুর সভ্য হবার অধিকার ছিল না)। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি ভারতে যুক্ত হওয়ার যদি কোন আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি না হোয়ে থাকে তবে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে বিনাসর্ত্তে অন্তর্ভুক্তির দাবীর অপরাধ ও অসুবিধাটা কোথায়? প্রজাপরিষদ ১৯.৩.৫২ তারিখে ভারত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এক স্মারক লিপিতে তাদের দাবী ও অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার দাবী করেন—তা নিষ্ফল হওয়ার পরে সত্যাগ্রহ সুরু হয় নভেম্বর মাসে (১৯৫২)। এই স্মারক লিপিতে শেখ আবদুল্লা সরকারের নামে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে বলা হয় যে—(১) ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকে বর্জ্জন কোরে কাশ্মীরে উর্দ্দু গ্রহণ করা হোয়েছে—সরকারী রাজকর্ম্মও এখন উর্দ্দুতেই করা হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করা হোয়েছে। কাশ্মীরে সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র "সংস্কৃত গবেষণা কেন্দ্র" তুলে দিয়ে আরবী শিক্ষার জন্য 'দার-উল-উলাম্' প্রতিষ্ঠা করা হোয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতদ্বারা হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টা হোয়েছে, (২) সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার বদলে জাতি এখন মাপকাঠি। চাকরীর বিজ্ঞাপনে "কেবলমাত্র মুসলমানরাই আবেদন করিবেন" বোলে বিজ্ঞাপিত থাকে। (৩) হিন্দু এবং জম্মুর অধিবাসীদের কোন দায়িত্ব পূর্ণ সরকারী পদ দেওয়া হয় না, তা'দিকে অপসারিত কোরে কাশ্মীরী মুসলমানদের বসান হোয়েছে। এমন কি পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কমিটীতে ৭জন সদস্যের মধ্যে একজনও জম্মুবাসী গ্রহণ করা হয় নাই। (৪) মহারাজা রণবীর সিং দ্বারা দেব-সম্পত্তি পরিচালনার্থ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মার্থ ট্রাষ্ট তহবিল বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছে। দেব খরচ জন্য ঐ তহবিল থেকে কোন টাকা দেওয়া হয় না। (৫) নয়াকাশ্মীর গঠনের নামে জম্মুর বিভিন্ন জেলায় হিন্দু প্রধান অঞ্চলকে টুকরো টুকরো কোরে এমনভাবে গঠন করা হোয়েছে—যাতে ঐ এলাকায় হিন্দু গরিষ্ঠতা না থাকে। (৬) জম্মুতে ৭ লক্ষ 'কানাল' উর্ব্বর জমি থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের হিন্দু ও শিখ উদ্‌বাস্তুদের জম্মুতে জায়গা দেওয়া হয় নাই এবং ঐ সব জমি প্রিয় পাত্রদের বিলি কোরে সেই টাকা মুসলমান উদ্‌বাস্তু তহবিলে জমা করা হোয়েছে। হিন্দু শিখদের ওপর এমন ব্যবহার করা হয়—যাতে আর্থিক দুর্দ্দশা ও অন্যান্য অসুবিধায় পোড়ে তারা ভূপাল, আলোয়াড়, ভরতপুর প্রভৃতি রাজ্যে চোলে যেতে বাধ্য হোয়েছে। এমনি আরও অনেক অভিযোগের ফিরিস্তি আছে, কিন্তু তার কোন সদুত্তর প্রধান-মন্ত্রীদের কেউ-ই দেন নাই। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীর এক বক্তৃতায় আবদুল্লা সাহেব শুধু বোলেছেন উর্দ্দু মুসলমানদের ভাষা নয় ভারতের একটা প্রধান ভাষা এবং পূর্ব্বে

উর্দ্দুতে রাজকার্য্য চোলত। মুসলমানদের যাবতীয় সুখ সুবিধা হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ কোরে দিলেও সেটা হবে জাতীয়তা আর হিন্দুদের কোন ন্যায্য সুখ সুবিধার কথা বোল্লেই সেটা হবে সাম্প্রদায়িকতা! এই অদ্ভুত জাতীয়তা মার্কা রাজনীতি দ্বারাই আজ ভারতের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি পরিচালিত—অবশ্য একথা ঠিক যে এর ফলেই শেখ আবদুল্লা ভারতের বন্ধু, এর ফলেই পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্যতম আন্তর্জাতিক অপরাধ কোরেও বন্ধু রাষ্ট্ররূপে গণ্য। পাকিস্থানে যোগ না দেবার জন্যে কাশ্মীরে একটী পৃথক ইস্‌লামীস্থান সৃষ্টি করা হোয়েছে—ভারতেরই সৈন্য ও অর্থবল দিয়ে। কিন্তু সত্য স্বতভাস্বর। তাই ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাপন্ন পণ্ডিত নেহেরুর সমস্ত প্রচার শেখ আবদুল্লার সমস্ত ধাপ্পা এবং ধমক ব্যর্থ করে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সত্য প্রকাশিত হোল। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পৃথক রাষ্ট্ররূপে পরিচালিত হতে চলেছে, এই কথা ভারতের জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য বাংলার তেজস্বী সন্তান বাগ্মী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে আন্দোলন আরম্ভ করেন (হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ ও রামরাজ্য পরিষদ সংযুক্ত ভাবে এই আন্দোলন করেন) এই আন্দোলনের ফলে আবদুল্লা সরকার শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বন্দী করেন (১১ই মে) এবং বন্দী দশাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (২২শে জুন)। পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতিয়তাবাদী নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদের বিনা-বিচারে বন্দী অবস্থায় এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের জনমন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, আবদুল্লা সরকারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত দাবী কোরলো কিন্তু বন্ধুবৎসল প্রধান মন্ত্রী রক্তচক্ষু দেখিয়ে সে দাবী উপেক্ষা কোরলেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে মাত্র দেড় মাস পরেই শেখ আবদুল্লার সহকর্মী ও সহচরবর্গ প্রকাশ্যে ঘোষণা কোরতে বাধ্য হলেন যে শেখ আবদুল্লা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং দুর্নীতি স্বজনপোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা দেশের শাসনযন্ত্রের কাঠামো এমন এক জঘন্য অবস্থায় এনেছিলেন যে গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তাই নেহেরুজীর প্রেমপুষ্ট এই কাশ্মিরী ব্যাঘ্রটিকে (শের-ই-কাশ্মীরী) রাতারাতি বন্দী কোরতে বাধ্য হল, (৮ই আগষ্ট) সর্দার-ই-রিয়াসৎ করণ সিং। শেখ আবদুল্লারই অন্তরঙ্গ সহচর বক্সী গোলাম মহম্মদ নূতন কোরে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বাক্সী গোলাম মহম্মদের পরিচালনায় কাশ্মীরে আজ এই মতই প্রবল হয়ে উঠছে যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হোয়েছে, এ নিয়ে আর ভোটাভুটি বা ঝগড়া চলবে না। বর্ত্তমানে অনেক সরকারী ভবনে ভারতীয় পতাকাও তোলা হয় জম্মুর হিন্দু এবং লাদাকের বৌদ্ধরা বক্সী সাহেবকে সমর্থন করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ শের শেখ আবদুল্লা এবং তার অনুচরের দল আজ নখ-দন্তহীন। পাকিস্তানের দাবী কিন্তু আজও ক্ষীণ হয় নাই, গণভোটের প্রতিশ্রুতিতে ভারত আজও আবদ্ধ। দেখা যাক চক্রীর চক্র কাশ্মীরের ভাগ্যচক্রকে কোন পথে চালিত করে।

সমাপ্ত

তোমাকে যা দিতে পারি

আনন্দ বাগচী

মৃত্যুকে শরীর দিই, জীবনের হাতে দিই মন,
কাউকেই শুধু হাতে যায় না ফেরানো অনুক্ষণ;
তাই কান্না পৃথিবীতে, তাই যন্ত্রণায় যুঁই ফোটে
শ্রাবণের অন্ধকারে, রাত্রির কামনাকীর্ণ ঠোঁটে
আমাদের বিষণ্ণতা, আকাশে ঝড়ের স্বরলিপি
শোকের ষড়ঙ্গ অভিসারে কাঁপে। জ্বলে না প্রদীপ-ই।

মৃত্যুকে শরীর দিই শেষ রাতে আকাঙ্ক্ষা যখন
শীতের নদীর মত, জীবনকে সন্ধ্যা লগ্নে মন
সমর্পণ করি এই সময়ের অনন্ত শয্যায়,
যখন দুরন্ত হাতে অন্ধকার বাসর সজ্জায়
মত্ত থাকি নির্ভীক শরীরে
একটি আদিম ঘুম নেমে আসে দুই চক্ষু ঘিরে।

তারপর তুমি আসো আচম্বিত শিশির সকালে
আমার প্রাণের রাঙা যন্ত্রণা তোমার দুটি গালে
লজ্জার সিঁদুর হয়, মৃত্যু নয়, জীবনও তো নয়,
ছাড়িয়ে সবার দাবী তোমার আকাঙ্ক্ষা বড়ো হয়।

তোমাকে কি দেবো আমি, সংসারের প্রচণ্ড তামাসা!
মনে পড়ে প্রেম আছে, ফুরায় নি তীব্র ভালবাসা॥

ভূমিকা

(একাঙ্ক নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

তরুণ নাট্যকার সমীরের ফ্ল্যাটের এক কক্ষ। সমীর কি লিখছে, এমন সময় প্রবেশ করল 'আসতে পারি কি' বলে অভিনেত্রী বাসনা। সমীর যে থিয়েটারের জন্যে নাটক লেখে, সেই থিয়েটারের বহুদিনের অভিনেত্রী বাসনা। বয়স এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ। শ্যামবর্ণা, ঈষৎ স্থূল: সাজসজ্জার পারিপাট্যে বয়সটা ধরা একটু মুস্কিল

সমীর। আসুন, আসুন বাসনাদি।

বাসনা। আপনাকে যে এ সময় বাড়ীতে পাব, এটা আশা করিনি।

সমীর। (হাসিমুখে) বসুন, বাউণ্ডুলে লোক ভেবেছেন বুঝি,—কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই ?

বাসনা একটা চেয়ারে বসল

বাসনা। তা নয়, তবে নাট্যকার মানুষ, সন্ধ্যেবেলা হয় থিয়েটার না হয় কোন ক্লাবে বা সাহিত্যসভায় থাকবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

সমীর। কোনোটারই উপায় নেই এখন। দেখছেন না, দেয়ালে প্ল্যাকার্ড পড়ে গেছে, নতুন নাটক।

বাসনা। তা বটে। সেই জন্যেই তো ছুটে এলুম আপনার কাছে। কি ধরণের পার্ট দিচ্ছেন আমাকে এবার ? বারবার মাসীপিসীর পার্ট ভাল লাগে না কিন্তু।

সমীর। দেবার মালিক কি আমি ?

বাসনা। নাটক লেখা তো আপনার হাতে ? বুড়ীর ভূমিকা বাদ দিয়ে কি নাটক লেখা যায় না ? এমন ভাবে নাটকটা লিখুন না যাতে একটার জায়গায় দুটো নায়িকা থাকে। অনেক বছর পরে আবার নায়িকার ভূমিকায় নেমে দেখাই, এখনো কি অভিনয় করতে পারি আমি। 'তন্ময়া', 'তন্ময়া' করে আপনারা সকলে পাগল হন, দেখলে গা জ্বালা করে আমার।

সমীর। তন্ময়ার উপর প্রযোজকের কি রকম টান দেখেছেন তো ? তাছাড়া তন্ময়া নায়িকা না হলে শঙ্কর অভিনয় করতে চাইবে কিনা, এও এক চিন্তার বিষয়।

বাসনা। ও—অঃ, অভিনয় করতে চাইবে না ! ছেড়ে দেন না, যত বড় না অ্যাক্টার, তার শত বড় চাল।

বাইরে থেকে শঙ্করের গলা : আছ নাকি নাট্যকার ?

সমীর। (একটু জোরে) এস এস শঙ্কর।

৩২।৩৬ বৎসর বয়স্ক সুশ্রী অভিনেতা শঙ্কর প্রবেশ করল

শঙ্কর। এই যে বাসনাদি। কি খবর ? কখন এলেন ?

বাসনা। কই তন্ময়া এল না বড় তোমার সঙ্গে ?

শঙ্কর। (একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে সিগারেটে একটা টান দিয়ে) নিজের খোঁজই রাখতে পারি না, আবার তন্ময়া ! তারপর নাট্যকার, নাটক কতদূর এগোল বল। বাসনাদিও কি নাটক শুনতে নাকি ?

সমীর। (ব্যাপারটা এড়াবার চেষ্টায়) হাঁ, উনি—এই এমনি—

শঙ্কর। বেশ বেশ, তাহলে তো নাটকটা জমবে ভাল। কিন্তু নাট্যকার, নাটক শুনে মন গরম করবার আগে শরীরটা তো একটু গরম করে নেওয়া দরকার। তোমার পঞ্চশর গেল কোথায় ?

বাসনা। (বিস্মিত হয়ে) পঞ্চশর ?

শঙ্কর। 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে'—

কবির একথা শুধু ভাবরূপেই সত্য নয়, মানুষরূপেও সত্য। বাংলা দেশে এমন জায়গা পাবে না, যেখানে পঞ্চশর, ওরফে 'মদন' নামধারী দু চারটে লোক না মেলে। (জোর গলায়) বলি, ওহে মদন ! বাবা মদনদেব !

বাইরে থেকে মদন : যাই আজ্ঞে,

৫২।৫৩ বৎসর বয়স্ক মদন প্রবেশ করল

মদন। ডাকছেন বাবু ?

শঙ্কর। হাঁ ডাকছি বাবা। গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ ! কিছু কি বাড়ীতে আছে ?

সমীর। একটু চা এনে দাও এঁদের।

শঙ্কর। আমাকে একটু কফি দিও কিন্তু, অবশ্য থাকে যদি সেটা অবিবাহিত বৈভবে।

মদন। আছে বাবু।

আমিও যে আছি মদন, বলে প্রবেশ করল
২৭।২৮ বৎসরের সুন্দরী অভিনেত্রী তন্ময়া

বাসনা। তন্ময়ার এতক্ষণে সময় হল?

শঙ্কর। তোমার অপেক্ষায় আমরা চা খেতে পারছি না, নাটক শুনতে পারছি না, কোলাহল করতে পারছি না—কোথায় ছিলে তুমি?

তন্ময়া। আজ তাহলে আমাদের নতুন নাটক নিশ্চয় শোনাচ্ছেন?

সমীর। শোনাব বৈকি, মদন, তুমি চা নিয়ে এস।

মদন। যাই। (চলে গেল)

তন্ময়া। সুন্দর চাকরটি পেয়েছেন কিন্তু।

শঙ্কর। সুন্দরী বাড়ীতে না থাকলেই সুন্দরকে জোটাতে হয়।

সমীর। এবার তাহলে পড়তে সুরু করি?

শঙ্কর। পড়তে সুরু করবে পরে। ততক্ষণ মুখে গল্পটার চুম্বক শোনাও। কফিটা আসুক, খেয়েটেয়ে শরীর গরম করি, তারপর তোমার নাট্যপাঠ শুনব।

চা ও কফির সরঞ্জাম নিয়ে মদন প্রবেশ করল

এনেছ বাবা? নিয়ে এস। তন্ময়া, তুমিই আমাদের এগিয়ে দাও। তোমার নিজের কাপে একটু বেশী করে মিষ্টি দিও, বুঝলে।

সমীর। কেন, তুমি কি একটু কম মিষ্টি খাও নাকি শঙ্করদা?

শঙ্কর। তা নয় ভায়া, শ্রীমতী একেবারে কলকণ্ঠী কিনা—মাঝে মাঝে একটু চিনির ডেলার বাঁধ না দিলে পাছে ভেসে যেতে হয়, এই ভয়।

বাসনা। তুমি তো আমাদের বকর বকর করতেই দেখ শুধু।

তন্ময়া। মদন, তোমাকে একদিনও আমাদের থিয়েটারে দেখতে পাই না কেন বল তো।

মদন। সময় পাইনে দিদি। তাছাড়া এ ফ্যালাট বাড়ী, চাবি দিয়ে সারা রাত্তির বাইরে থাকতে হয়।

বাসনা। থিয়েটার কি আর তোমার যাত্রার মত সারা রাত্তির হয়! থিয়েটার মাত্র ঘণ্টা তিন চার হয়।

তন্ময়া। এবার তোমার দাদাবাবুর লেখা নতুন নাটক হবে, সেও নিশ্চয়।

সকলকে চা কফি এগিয়ে দিল

মদন। তা যদি বললেন দিদি, বাবুর দেশের বাড়ীতে কুমুরষে কানপুরের যে যাত্রা দেখেছি, তারপর আর কিছু চোখে লাগবে নি।

শঙ্কর। হল তো? মদনকে অত সহজে ভোলান যাবে না। নাও হে সমীরকুমার, সুরু কর এবার।

মদন। দাদাবাবু!

সমীর। কি?

মদন। কাল যিনি এসেছিলেন, সেই ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন?

সমীর। কোথায় তিনি?

মদন। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সমীর। পাঠিয়ে দাও তাঁকে।

মদন বেরিয়ে গেল

শঙ্কর। আবার লোকটোক ডেকে রসভঙ্গ কেন বাবা?

সমীর। না হে, দেখ না, এই পথেরই পথিক। নাট্যকার একজন। সুপুরুষও বটে।

শঙ্কর। (তন্ময়ার দিকে আড়চোখে চেয়ে) নাট্যকার শুনলে ভয় নেই, সুপুরুষ শুনলেই ভয় হয়।

বাইরে থেকে মদনের গলা; যান, ভেতরে যান।
৩০।৩২ বৎসর বয়স্ক রত্নসানু প্রবেশ করল

সমীর। আসুন, আসুন। বসুন। আপনার নামটি সুন্দর, ভুলে গেছি কিন্তু। আর একবার বলুন তো।

রত্নসানু। রত্নসানু ঘোষ। (বসল)

সমীর। নাটকটা এনেছেন তো? দেন। (রত্নসানু একটা খাতা দিলে) পরে দেখব এখন।

রত্ন। আমি তাহলে উঠি।

সমীর। বসুন বসুন।

শঙ্কর। হাঁ বসুন, আমাদের নাটকের গল্প শুনুন। দেখেই বুঝতে পারছেন বোধ হয়, আমরা থিয়েটারের লোক? (উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট নিয়ে এগিয়ে ধরে) হবে না? (নিজে ধরিয়ে অনেকটা ধূম উদ্‌গীরণ করে) সমীরবাবুর মতই বেরসিক দেখছি আপনি। সিগারেট না খেলে আর না ছড়ালে থিয়েটারে আপনি নাটক চালাতে পারবেন না মশাই। নাও হে নাট্যকার, আরম্ভ কর এবার।

সামান্য সামান্য পায়চারি সুরু করল

সমীর। হাঁ করি। কলেজে ঢোকা থেকে বি-এ পাশ করা পর্যন্ত সুবিনয়কে অধ্যাপক হেমন্তবাবু বহুভাবে সাহায্য করে এসেছেন। সহপাঠিনী না হলেও—চন্দ্রা দু'শ্রেণী নীচে পড়ত—তাঁর কন্যা চন্দ্রা সুবিনয়কে সব বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে।

বাসনা। চন্দ্রার বয়স কত করেছেন?

তন্ময়া। কি রকম দেখতে বললেন না তো?

শঙ্কর। একেই বলে নারীজনসুলভ অকারণ কৌতূহল। এবার শাড়ীটা কোন রংএর জিজ্ঞেস করো। আরে বাবা, আস্তে আস্তে সুতো খুলতে দাও।

সমীর। দেশে দরিদ্রা বিধবা মা, আর একটি ছোট বোন। বেকার অবস্থায় কিছুদিন খুব কষ্ট পাবার পর একটা পাটকলের অফিসে কাজ জোটালে সুবিনয়। চেহারা অত্যন্ত সুঠাম সুন্দর বলেই প্রবেশলাভ সম্ভব হল কিনা বলা যায়না, তবে ঐ কারণেই মালিক ভূপতিচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ক্ষণিকার মতই দিকভ্রান্তকরা ক্ষণিকার চোখে পড়ে গেল। দরিদ্র সে, তার পক্ষে মালিকের মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যাওয়া একটা অপরাধ, এই বোধ ছিল সুবিনয়ের। তাই সে ক্ষণিকার বাড়ীতে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব, সিনেমা যাওয়ার আহ্বান ও প্রমোদভ্রমণের ডাক—সবগুলোই এড়িয়ে চলত।

শঙ্কর। বল কি হে! প্রস্তাব, আহ্বান, ডাক—সবই এড়িয়ে চলত? বড় বেরসিক তো!

তন্ময়া। ঠিকই করত। তাকে তো চন্দ্রাকে বিয়ে করতে হবে পরে।

শঙ্কর। বিয়েই যদি দাও, তাহলে আমি ওই পার্টে নেই ভায়া। আমার যখন তখন স্টেজে বিয়ে দিচ্ছ বলে আমি আজ পর্যন্ত একটা বৌ জোটাতে পারলুম না।

সমীর। এদিকে যতই বন্ধুত্ব থাকুক না কেন, সুবিনয় কোনোদিন আশা করেনি যে তার মত এক দরিদ্র ছেলের হাতে অধ্যাপক হেমন্তবাবু তাঁর শিক্ষিতা মেয়ে চন্দ্রাকে দেবেন। এই জন্যে মনের শত মিনতি সত্ত্বেও সুবিনয় একদিনও মুখ ফুটে চন্দ্রাকে এ বিষয়ে কিছু বলেনি, বা জিজ্ঞেস করেনি।

তন্ময়া। কিন্তু চন্দ্রার মুখ ফুটে কিছু বলা উচিত ছিল।

বাসনা। না না, তা হতে পারে না। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না মেয়েদের।

শঙ্কর। কবি ঠিকই বলেছেন—

"মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।

বসিয়া থাকি দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখি তারে"—

উঁহু, হল না। তারপর কি নাট্যকার?

রত্নসানু। "দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে আপনারে দিব তায়?

শঙ্কর। ঠিক। "মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে আপনারে দিব তায়?"

সমীর। ধনী কন্যা—সে কি যার উপরে তার দৃষ্টি পড়েছে, তাকে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারে! সহস্র রকমে জাল বিস্তার করতে লাগল ক্ষণিকা। হঠাৎ সুবিনয়ের প্রতি তার ব্যাকুলতা এত প্রবল হয়ে উঠল যে এ ধারণা করবার উপায় রইল না যে কদিন আগেও কমপক্ষে সাত আটটি ধনীর দুলালের হৃদয় সাগরে উত্তাল তরঙ্গ তুলতে তার মুখচন্দ্র ত্রুটি করেনি।

বাসনা। এ পার্টটা কাকে দিচ্ছেন সমীরবাবু?

শঙ্কর। গোটা নাটকের স্ক্রুটা কি এই দুলালীকে দিয়েই ঘোরাবে ভায়া?

সমীর। তার মন-ধাঁধানো রূপে ও চোখ-ঝলসানো বসনভূষণে কোনো তরুণের মন ধরা দিতে চাইবে না, এটায় আহত বোধ করল ক্ষণিকা। কোথায় সুবিনয়ের

মন বাঁধা আছে, এবং থাকলে সেই বাঁধন কাটা যায় কিনা, তার জন্যে লোক লাগাল ক্ষণিকা। হৃদয়শিকারে নিপুণ তীরন্দাজ বলে বেছেও নিলে সে এক অদ্ভুত তীর। সে তীর হচ্ছে তার বাবার মিলেরই দীর্ঘদেহ আয়তলোচন সুপুরুষ কর্মী বিশ্বজিৎ।

শঙ্কর। শরাসনে পঞ্চশরের কোন ফুলশরটি বসাচ্ছ নাট্যকার? পাঁচটি ফুলের নাম মনে আছে তো? বলতো শুনি একবার।

সমীর রত্নসাম্নুর মুখের দিকে চাইলে

রত্নসাম্নু। পাঁচটি ফুল হচ্ছে—অরবিন্দ, রক্তোৎপল, অশোক, নবমল্লিকা, আম্র মুকুল।

শঙ্কর। সাবাস্! চমৎকার শ্লোককে এনেছ হে! তাহলে ওই ফুলশরটা রক্তোৎপল করে দাও, আঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে রক্ত ঝরুক।

তন্ময়া। দেখবেন, বেশী বিয়োগান্ত করবেন না।

বাসনা। সত্যি, দর্শকদের শুধু চোখের জল ফেলানো নয়, নিজেদের চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রাণ যায়।

সমীর। মিলের একজন সামান্য কর্মী হিসেবে বিশ্বজিৎ ক্ষণিকার করপ্রার্থী হবার সাহস করত না, তবে শ্রীমুখের একটু হাসির প্রত্যাশা করত পদোন্নতির আশায়। ক্ষণিকার ইঙ্গিতে গভীর ভাবে মিশে গেল বিশ্বজিৎ সুবিনয়ের সঙ্গে। অফিসের আত্মীয়তা প্রগাঢ় হয়ে নিয়ে এল বিশ্বজিৎকে অধ্যাপকের বাড়ীতে। ক্রমশ বিশ্বজিৎ চন্দ্রারও বন্ধু হয়ে গেল। ঈর্ষা এমনই জিনিস যে কিছুদিন যেতে না যেতেই বিশ্বজিতের সঙ্গে চন্দ্রার সহজ মেলামেশাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল সুবিনয়। সন্দেহ থেকে এল বিরাগ এবং সেই বিরাগ অন্যত্র অনুরাগে রূপান্তরিত হবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

তন্ময়া। বিশ্বজিতের একটু মুস্কিল দেখা যাচ্ছে। কাকে ওই পার্টটা দিতে চান?

শঙ্কর। আর যাই কর, বিরামদাকে ওই পার্টটা দিও না ভাই—মধুর ভাষাগুলো নকল দাঁতে ঠেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বরং (রত্নসাম্নুর পাশে এগিয়ে এসে) এই ভদ্রলোক যদি থিয়েটার করতে চান তো এঁকে নামাও।

বাসনা। কাকে? এঁকে?

শঙ্কর। হাঁ, এই রত্নসাম্নুবাবুকে।

তন্ময়া। তাহলে তো সুন্দর হয়।

শঙ্কর। তন্ময়ে, তুমি আবার তন্ময়া হয়ে পড়ো যেন।

সমীর। কিন্তু ক্ষণিকার দাবী সব সময়েই ষোল আনা, প্রতিদানে সে কআনা দেবে সেটা বিচার্য নয়। তাছাড়া বিশ্বজিতের মারফৎ ক্ষণিকার তো চন্দ্রার সত্যিকার মন জানতে বাকী ছিল না, তাই ক্ষণিকা ভাবলে, একবার নিজেই ধাওয়া করবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর গৃহে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে।

শঙ্কর। এবার আমি একটু বাধা দেব নাট্যকার। আর যাই কর, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রেমিক ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের চুলোচুলিটা দেখিয়ো না। ওটা আমাদের দেশে একান্ত বে-মানান, কি বলেন রত্নবাবু?

রত্নসাম্নু। তা বটে, তবে হয়তো আজকালকার যুগে কিছুই আর অসম্ভব নয়।

সমীর। নিজের গাড়ীতে করে সুবিনয়কে সঙ্গে নিয়ে একদিন ক্ষণিকা এসে উপস্থিত হল চন্দ্রাদের বাড়ীতে। বিশ্বজিৎ ও সুবিনয়ের কাছে তাদের অফিসের গল্প বারবার শুনে ক্ষণিকার একটা প্রায়-স্পষ্ট রূপ নিজের মনে তৈরি করে নিয়েছিল চন্দ্রা, আজ সাক্ষাতে তাকে দেখতে পেয়ে তাই ততটা বিহ্বল হল না চন্দ্রা। মন অন্তর্যামী, তাই ক্ষণিকাকে কেমন এড়িয়ে চলল চন্দ্রা, যতক্ষণ ক্ষণিকা তাদের বাড়ীতে রইল। ক্ষণিকা ক্ষুব্ধ হল তাতে। এর কিছুদিন পর একটা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় এল চন্দ্রার জীবনে। চন্দ্রার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন।

তন্ময়া। সর্বনাশ! মা তো নেই মনে হচ্ছে, নিকট সম্পর্কের কেউ নেই যে দেখাশোনা করে?

বাসনা। এই বয়সে অভিভাবকহীন অবস্থায় ফেলে দিলেন!

শঙ্কর। তোমরাও কম ক্যাপিটালিস্ট নও নাট্যকার। প্রলিটারিয়েটদেরই যত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাও। যে অসহায় দাঁড়াতে পারছে না, তাকে ট্রাম থেকে ফেলে পা ভাঙ্গাও, আর—

রত্নসাম্নু। আর বড়লোক মোটর অ্যাকসিডেণ্ট করলে তাঁর ড্রাইভারটাকে মারো, তিনি অক্ষতদেহে বাঁচেন।

সমীর। হেমন্তবাবু মারা যাওয়ার সাতদিন পরেই আবার চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এল ক্ষণিকা—এবার একা। বন্ধুর মত পাঁচটা পরামর্শ দিলে এবং বললে চাকরী যদি করতেই হয়, ক্ষণিকাদের দেশের মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষিকার পদ খালি আছে; অন্যত্র চেষ্টা করবার আগে চন্দ্রা যেন তাকে একবার খবর দেয়।

তন্ময়া। রূপ পাল্টাচ্ছেন নাকি?

শঙ্কর। হাঁ, কার্যসিদ্ধির জন্যে নানা রূপ ধরতে হয়, কখনও ক্ষেমঙ্করী, কখনও প্রলয়ঙ্করী, আবার কখনও নির্বিকারা।

সমীর। চন্দ্রার অকূল পাথার। বাবা এমন কিছু বেশী রেখে যাননি যে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে কোন কাজ না করেও চলে যাবে—যদিও সে একা মানুষ। কার কাছে পরামর্শ চায়, কি করে! যে দু'একজন নিকটাত্মীয় আছেন, তাঁরা দূরপ্রবাসে চাকরী করেন, তাঁদের কাছে পরামর্শ চাওয়া বৃথা। পিতৃবন্ধু কয়েকজন আছেন বটে, তবে তাঁরা তার জন্যে এতটা মাথা ঘামাবেন, তা মনে হয় না। এতদিনের স্মৃতি-মাখা বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে, কলকাতা ছাড়তে হবে, কত সাধ কল্পনা বিলীন হয়ে যাবে—ভাবতে ভাবতে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে চন্দ্রা।

তন্ময়া। তার নিজের বন্ধু হয়তো কিছু পরামর্শ দিতে পারত, কিন্তু সে তো পলাতক।

শঙ্কর। ওই পলাতকের পার্টটা কি আমাকে লক্ষ্য করেই লিখেছ ভায়া? দর্শকের কাছে গালাগালি ছাড়া আর কি কিছু খেতে দেবে না আমাকে?

সমীর। সুবিনয়ের দেখা পাওয়া ভার হলেও বিশ্বজিতের দেখাটা মিলতে লাগল বরং একটু বেশী করে। বিশ্বজিতের আসল উদ্দেশ্যটা কি, এটা হয়তো চন্দ্রার চোখে পড়েনি বা চোখে দেখেও চন্দ্রা ততটা গ্রাহ্য করেনি। বিশ্বজিৎ সমস্তভাবে চন্দ্রাকে সাহায্য করতে লাগল; খোঁজ খবর করতে লাগল এখানে সেখানে, বদি একটা চাকরী মেলে। সুবিনয়কেও সে মাঝে মাঝে তাগিদ দিতে লাগল।

বাসনা। পাষণ্ড!

শঙ্কর। আমি নাকি বাসনাদি? দেখবেন, এ থেকেই গালাগালি করবেন না।

সমীর। ক্ষণিকার মনেও যেন শান্তি রইল ন অকারণ বিশ্বজিৎকে ডেকে একটু রাগারাগি করে বস শেষে একদিন বিকেলে একান্ত অধৈর্য হয়ে সুবিনয় পাশে বসিয়ে নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরোল। অস্থির ম অস্থির হাত—ঠিক চন্দ্রাদের বাড়ীর সামনে এসে এব ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে লাগল জোর ধাক্ক গাড়ীটা চুরমার হয়ে গেল। ক্ষণিকা ছিটকে পড়ল, সুবি পড়ল গাড়ীর তলায়। ঘণ্টাটাক পড়ে থেকে যখন জ্ঞ ফিরে এল, তখন ক্ষণিকা দেখলে, সে হাঁসপাতালে শু বিশ্বজিৎ ও চন্দ্রা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুবিনয়ের খ জানতে চাইল ক্ষণিকা। বিশ্বজিৎ মুখ ফেরাল, চ চোখে হাত দিল।

চুপ করে গেল সমীর। একটুক্ষণ বিরতি

তন্ময়া। তারপর?

সমীর। তারপর তো কিছু নেই আর।

বাসনা। সে কি! এ কি সমাধান হল?

সমীর। সংসারে সব সমস্যার সমাধান হয় বাসনাদি।

রত্নসানু। হয়তো হয়, কিন্তু সেটা আর এব নাটক।

শঙ্কর। বাসনাদি, কোন পার্টটা নেবে তুমি?

বাসনা। যে পার্টটা দিলে ভাল হয়, সেটাই দাও।

শঙ্কর। তন্ময়া, তুমি বল কোনটা পছন্দ তোমার।

তন্ময়া। যা ভাল হয় কোরো।

শঙ্কর। বড় সেন্টিমেন্টাল তোমরা! নাট্যকা পঞ্চশরের রক্তোৎপল শরটা মিছে নিক্ষেপ করতে বলি দেখছি, একদিকে বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, অপরদি ঝরিয়েছে হৃদয়ের রক্ত—তবে সেটা কটা হৃদয়ের বলতো।

রত্নসানু। সেইটাই সমস্যা।

যবনিকা

বিশ্বসাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

—শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতী কবীশ্বর—

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং উঠছে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব অল্প। কারণ আমরা ইংরিজী ছাড়া আর যে ভাষা শিখি তা হয় ফ্রেঞ্চ, নয় জার্মান, নয় ইটালিয়ান। আজকাল কেউ কেউ রুশ ও চীনে ভাষাও শিখছেন। রাষ্ট্রভাষার খাতিরে হিন্দীর চর্চাও বাড়ছে। কিন্তু তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি খুব কম লোকই শেখেন। উত্তর ভারতে উর্দুর রেওয়াজ এখনও কিছু আছে, তবে রাষ্ট্রভাষার ধাক্কায় কতদিন টিকবে বলা যায় না।

ভারতের এই সব বিভিন্ন ভাষায় কত যে ভাল ভাল বই লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে, আমরা তার খবর রাখি না। কত কবি, নাট্যকার, কথাশিল্পী নানা ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন সে খবরও আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত। আমি এবার একজন বিশিষ্ট তামিল কবির সঙ্গে ভারতবর্ষের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।

কিন্তু, মুস্কিল এই যে, আমিও তামিল ভাষা জানি না। ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে যেমন অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, এ ক্ষেত্রেও সেই উপায়েই আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছে। কলকাতায় 'ভারতী তামিল সঙ্গম্' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধ তামিল কবি ৺সুব্রহ্মণ্য ভারতীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে স্থাপিত হয়েছে। এঁরা স্বর্গতঃ কবি ভারতীর কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার ইংরিজী অনুবাদ "Voice of the poet" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আমার এ প্রবন্ধের অবলম্বন সেই বইখানি।

তামিল কাব্য সাহিত্যে শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতীর স্থান খুব উচ্চে। ইনি "কবীশ্বর" নামে খ্যাত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। সুতরাং, এঁকে কোনও বিশেষ শ্রেণীর কবিদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া একটু কঠিন। এঁর রচনাবলী এমন সরল, সহজ ও স্বতোৎসারিত যে মনে হয় কাব্য ও কবি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

কবির রহস্যময় জীবন কাহিনীর যে সব টুকরো ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় ইনি অনেকটা বিষয়বিমুখ সংসার-বিরাগী সাধুচরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনাবলী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভারতের ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। বেদ, উপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা প্রভৃতি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কাব্য ও পুরাণাদিও তিনি যত্নের সঙ্গে পড়েছিলেন। ভারতের অতীত যুগের ঋষিদের ন্যায় তাঁর চিন্তা ও ভাবনা, তাঁর ধ্যান ধারণা, তাঁর আদর্শ ও কল্পনা সবই ছিল উর্ধ্বলোকের।

কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ছিলেন বিশ্বের জননী আদ্যাশক্তি মহাকালীর ভক্ত

শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতী কবীশ্বর

উপাসক। এই কালীকেই তিনি নিখিল ভুবনের যাবতীয় সৃষ্টির মূলাধার, ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী মহাশক্তি বলে জানতেন। কবির রচনাবলী থেকে তাঁর যেটুকু মনের খবর পাওয়া যায়, তার মধ্যে যেমন আছে দুরন্ত সাহস, তেমনি আছে কবির বিচিত্র অপরূপ কল্পনার মধুর অভিব্যক্তি। তাঁর মহৎ আদর্শ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অসামান্য পরিচয়ের সঙ্গে আছে ভাবের প্রচণ্ড আবেগ, ভক্তি ও প্রীতির অপরিসীম প্রাবল্য এবং দিব্যপ্রেমের অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত বিপুল আনন্দ।

এঁর রচনার যে ইংরিজী অনুবাদ গ্রন্থটি আমার হাতে এসেছে তা পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে যে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাকবি। তাঁর জীবনী পড়ে জানতে পারি, তিনি তামিল সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়ের হৃদয়ই তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি নিতান্ত সহজ সরল হ'লেও তার মধ্যে মহান ও সমুন্নত আদর্শ এবং বিরাটের ধ্যানসমাহিত দৃষ্টির পরিচয় মেলে। এ ছাড়া উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনারও অভাব নেই তার মধ্যে।

শিল্পীর নিজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের একটা দুর্নিবার আকুতি না থাকলে বিরাট ও মহান শিল্প সৃষ্টি জগতে কোনও কালেই সম্ভব হতে পারে না। কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর অন্তরে সেই নিজেকে প্রকাশের বিপুল আকুতি জেগেছিল বলেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি এমন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ভারতী মনে প্রাণে ছিলেন একজন মুক্তিপ্রেমিক স্বাধীনতার পূজারী কবি। জননী জন্মভূমির প্রতি প্রবল অনুরাগে তিনি মায়ের শৃঙ্খল-মোচন কল্পে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে কাব্যধারা প্রথম উৎসারিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার যুগে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এই আন্দোলন শুরু হয়, তারপর অবশ্য তা অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীর চিত্তে গীতার সেই বাণী "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" যেন মন্ত্রের মতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার পুরুষসিংহ দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভারতীয় ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুপ্ত ভারতবাসীকে ডেকে বলেছিলেন—"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধত! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!" এই অভয় আহ্বান, এই ত্যাগ ও বীর্যের অমোঘ ডাক কবি ভারতীর চিত্তকে জাগিয়ে তুলেছিল। বাংলাদেশের পক্ষে এটা খুবই গর্বের কথা যে সুব্রহ্মণ্য ভারতী বাল্যকাল থেকে বাংলাদেশেই মানুষ হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। বিদেশীর অধীনতা পাশ থেকে জননী জন্মভূমিকে উদ্ধার করবার জন্য বিপ্লবের রুদ্র মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন এই বাংলার মাটিতেই।

তার পর, এই বাংলা দেশ থেকে সেই দেশপ্রেমের মশাল নিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করতে শুরু করেন কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে, কথা ও কাহিনীতে। আমার তামিল বন্ধুদের কাছে শুনেছি তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগীতা তামিলভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। স্বদেশ, সমাজ ও ধর্মের উপর তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার উদ্দেশে তিনি অনেক ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। একখানি উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

তিনি কোনও গান বা কবিতা আগে মুখে মুখে রচনা করে নিয়ে, সেটি গেয়ে বা আবৃত্তি করে তারপর কাগজে লিখতেন। কাব্য সাহিত্যে অসাধারণ দক্ষতা না থাকলে এ কাজ সহজসাধ্য নয়। এ থেকে বোঝা যায় কাব্যে ও সঙ্গীতে তাঁর একটা বিধিদত্ত জন্মগত অধিকার ছিল।

কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর রচনাবলী কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—'স্বদেশ সঙ্গীত', বীরত্বগাথা, সমাজ ও ধর্মমূলক সমস্যা নিয়ে রচনা, প্রেম ও প্রণয় কাহিনী মূলক রচনা, লোক সঙ্গীত, গ্রাম্য ছড়া, ঈশ্বর ও প্রকৃতির মহিমাসম্পর্কীয় রচনা, ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রেরণা থেকে উদ্ভূত রচনা এবং রামায়ণ মহাভারতাদি মহাকাব্য থেকে ঘটনা বিশেষের অংশ নিয়ে লেখা খণ্ডকাব্য শ্রেণীর গাথা। তবে, সব কিছু রচনাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর দেশাত্মবোধের রচনাগুলি। সুতরাং, প্রথমেই তাঁর স্বদেশ-প্রেমাত্মক রচনাবলী নিয়েই আলোচনা করা যাক। এই শ্রেণীর অন্তর্গত কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি হল 'মুক্তি'। এই কবিতায় তিনি কেবল বিদেশীর অধীনতা পাশ থেকে দেশ জননীর মুক্তির দাবি করেই ক্ষান্ত হন নি, মুক্তি চেয়েছেন সকল মানুষেরই দাসত্বের বন্ধন থেকে, কুসংস্কারের কঠিন শৃঙ্খল থেকে। সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারে নিষ্পেষিত জনগণের মুক্তির দাবিও তুলেছেন। যে সব মানুষকে আমরা সমাজের নিম্নস্তরে ঘৃণাভরে ঠেলে দিয়ে অশুচি ও অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করি, তিনি তাদেরও মুক্তি চেয়েছেন।

গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে কবি দৃপ্তস্বরে দাবি করেছেন—

"মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!
পারিয়াদের, তেইয়াদের, পালেয়াদের
মুক্তি চাই!
মুক্তি চাই—পরবাদের—কুরবাদের—মারবাদের—
মুক্তি চাই!"

সকলেই জানেন বোধ হয় যে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে এই পারিয়া, তেইয়া, পালেয়া, এই পরবা কুরবা ও মারবা সকলেই সমাজের উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত মানুষ। এদের মুক্তির জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করে বলেছেন, "এস আমরা সকলে আজ সত্যের আলোকে উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হই। আমাদের মধ্যে কেউ যেন উৎপীড়িত না হয়!" তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছেন—"এই পুণ্য ভারত-ভূমিতে যে কেউ জন্মগ্রহণ করুক সেই সম্ভ্রান্ত সেই পুণ্যবান। এসো, আমরা এখানে পরস্পরের সঙ্গে সহোদরের তুল্য সমান অধিকারে বাস করি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন আমাদের সকলের জন্যই সম-সম্মানের আসন নির্দিষ্ট থাকে। নারী ও পুরুষ উভয়েই যেন আমাদের দেশে বেঁচে থাকবার সমান সুযোগ সুবিধা পায়। এস আমরা আমাদের সকল অজ্ঞানতা—সকল মূঢ়তা বর্জন করি। এদেশের প্রতি কোণে কোণে যেন শিক্ষার সম্পদ প্রসারিত হয়। এস আমরা সুখ শান্তির মধ্যে পরমানন্দে বাস করি।"

'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা' ছিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জীবনের মূল মন্ত্র।

'আমাদের পাগলি মা!' কবিতায় তিনি ভারত মাতাকেই সেই পরমাপ্রকৃতি পরমাশক্তিরূপে কল্পনা করেছেন, যিনি সর্বোত্তমা, সকল বলধারিণী ও দুর্নিবার। যিনি ভীষণা ভৈরবী, অনির্বচনীয়া সুন্দরী। প্রচণ্ড যাঁর প্রাণশক্তি। যিনি উন্মাদিনী আবার পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপিণী; দেবাদিদেব মহাদেব নটরাজ শিব তাঁর প্রেমের ভিখারী। যিনি জীবনের জ্যোতির্ময় দীপ্ত প্রভার সমুজ্জ্বল মশাল হাতে নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির মহানন্দে উদ্দাম প্রলয় নাচন নাচছেন। যাঁর নৃত্যের তালে তালে সুর সাগরে সুমধুর সঙ্গীত তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। বিশ্ব জননী সেই উচ্ছ্বসিত সুর তরঙ্গ শীর্ষে আরূঢ়া হবামাত্র আঁধার বনস্থলী আলোকিত হয়ে ওঠে, প্রতি তরুলতায় অজস্র ফুলকলি মধুময় দিব্য সৌরভে বিকশিত হয়ে ওঠে। সৌন্দর্য্য সুধা পানে প্রমত্তা জননী তাঁর দুটি হাতই সেই পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে নিয়ে লঘুপদ সঞ্চারে ক্ষিপ্র গতিতে দুলে দুলে টলে টলে চলেছেন। তাঁর সঙ্গীত ধ্বনিতে বেদগান মুখরিত হয়ে উঠছে! করধৃত ত্রিশূল হেলনে তিনি মৃত্যুকে জয় করে অমৃত স্বরূপিণী হয়ে উঠেছেন!

কবির এই কল্পনা আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও উন্মত্ততা বলে মনে হবে, কিন্তু প্রাচ্যের আধ্যাত্ম মানসিকতার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা বুঝবেন যে এ কেবল রূপকের সাহায্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহাসত্যকেই কবি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কবির রচনাবলীর অতি অল্পসংখ্যক রচনাকেই কেবলমাত্র তাঁর নিজের সম্বন্ধে লেখা ব্যক্তিগত রচনা বলে সনাক্ত করা চলে। "বিশ্বের পরিধি" নামে কবিতাটিতে তিনি কবি-জীবনের আদর্শ চিত্রটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কবি ভারতীর চিন্তাধারা ও রচনাবলীর মধ্যে কোথাও এতটুকু বিদেশী রীতির ছাপ নেই। এঁর অপর একটি কবিতায় আমরা যেন শুনতে পাই, কবি কত শতাব্দীকালের গভীর নিদ্রায় অভিভূত জননীকে জাগাবার জন্য তাঁর কানে কানে মৃদুস্বরে গান করে বলছেন :—

"জাগো মা, প্রভাত হয়েছে।
অমঙ্গলের অন্ধকার ছায়া অপসারিত।
আমাদের অনুতাপানলে সে ধ্বংস হয়ে গেছে।
চেয়ে দেখ ওই আলোর সূর্য।
ধরণীর চতুর্দিকে তার কিশোর স্বর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করছে
সহস্র সহস্র সন্তান তোমার
আজ এখানে সমবেত হয়েছে মায়ের পূজার জন্য :
তোমার নামে তারা জয়ধ্বনি দিতে এসেছে,
তোমার সেবা করতে এসেছে তারা।

কিন্তু, একি অদ্ভুত কাণ্ড তোমার, তুমি এখনও ঘুমঘোরে আবৃত ?
ওঠো মা! জাগো! জাগো!"

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। দেশ জননীকে সচেতন করে তোলবার জন্য কবির আকুতি এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করবার লোভ হয়, কিন্তু স্থানাভাবে সে ইচ্ছা সম্বরণ করা ভিন্ন উপায় নেই।

'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে লেখা তাঁর কবিতাটিতে যদিও কবির কারা-জীবনের ব্যক্তিগত স্মরণিকা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়, তথাপি এরই মধ্যে পাওয়া যায় স্বাধীনতার প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয়। মানুষের আত্মার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখে যে সব কঠোর বন্ধন তার সবগুলি থেকে মুক্তিলাভই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। কবি বলতেন—"মানব জীবনে ধনসম্পদ যশোখ্যাতির কোনোই মূল্য নেই, যদি না সে, স্বাধীন দেশের মুক্তবাতাসে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারে!"

স্বদেশ-প্রেমাত্মক কবিতাগুলির দিক থেকে বিচার করলে মনে হবে সুব্রহ্মণ্য ভারতী যেন এবিষয়ে অদ্বিতীয়!

সমাজনীতি ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীর কয়েকটির মাত্র এখানে উল্লেখ করব। যেমন 'গোপীগীত' 'কুটীরবাসী দম্পতী' 'প্রার্থনা' এবং 'জয়' কবিতাগুলি। এর মধ্যে পাই স্বদেশের দেবদেবীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাস। 'জয়' কবিতায় দেখা যায় কবি তাঁর জীবনযুদ্ধে আত্মজয়ে জয়ী হয়েছেন। 'গোপীগীতে' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীগণের যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, সে কথা তিনি অতি সরল ভাষায় অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

"কুসুমিত কুঞ্জ বনতলে
চম্পক সুরভি সিক্ত প্রাণ;
আঁখি তটে স্বপ্ন রচে প্রেম,
তোমার মোহন হাসি গাঢ়তর মনে হয় যেন!
শাখে শাখে কোকিলের মুখর ঝংকার
তোমারই কণ্ঠের যেন বহে আনে সুমধুর গান!
উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ ঘন নীল এই পারাবার—
চিত্তের চাঞ্চল্য তব কলকণ্ঠে নিত্য কহে মোরে।"

পাঠক মাত্রকেই এ কবিতাটি বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দেয়।

'প্রার্থনা' কবিতায় শক্তিস্বরূপিণী জননীকে আহ্বান করে কবি বলছেন—

"কথা কও! মাগো, কথা কও!
অনন্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধনের জন্য
তুমি কি আমাকে আয়ু ও শক্তি দেবে না?"

কবি তাঁর প্রার্থনায় মহাশক্তির কাছে চেয়েছেন, জীবনের চির-নবীনতা, উৎসাহের আগুন-যার মধ্যে থাকবে নিত্য অনির্বাণ এমন একটি অন্তর যে নিরন্তর তোমারই গুণগান করবে। অগ্নিদাহ তার দেহ দগ্ধ করলেও আপন লক্ষ্যে সে যেন অবিচলিত থাকে!" এ প্রার্থনা শক্তিশালীরই প্রার্থনা।

'কুটীরবাসী দম্পতী' কবিতাটি পড়তে পড়তে আমরা এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রের দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ি। আমাদের কানে ভেসে আসে কুটীরবাসীর কাতর কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে পত্নীকে বলছে "ওগো! এস আমরা জগজ্জননীর চরণে কায়মনে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাই; তিনি

যেন দয়া করে এ দুর্যোগ রাত্রের দুরন্ত প্রলয় তাণ্ডব থেকে আমাদের রক্ষা করেন।"

কুটীরবাসীর পত্নীর ছিল দেবীর শুভ ইচ্ছার'পরে অকপট ও অবিচলিত বিশ্বাস। সে স্বামীর একথা শুনে অতি নিরুদ্বেগ কণ্ঠেই উত্তর দিচ্ছে "ভয় কি? কাল রাত্রে আমরা যে ঘরে রাত কাটিয়েছিলুম ভেবে দেখ তো একবার! আজ এমন সময় যদি সেই ভাঙা ঘরে থাকতুম তবে আমাদের কি দশা হত? নিশ্চিন্ত হও, জেনো—শেষ পর্যন্ত দেবীর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

কুটীরবাসিনীর এই সুদৃঢ় ভগবতবিশ্বাসই ছিল কবির হৃদয়েরও মূল শক্তি।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী প্রেমাত্মক ও প্রণয়মূলক কবিতা রচনাতেও শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন। কারণ, তাঁর প্রণয়ানুরাগ মানবীয় প্রেম উত্তীর্ণ হ'য়ে দিব্যভাবের সমুজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করেছিল। কবির মতে ভগবানই সেই একমাত্র প্রণয়-বিহ্বল সত্তা, যাঁর প্রতি তাঁর পাঠক-পাঠিকারা একটা গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করে।

আবার, দুঃসহ ভাগবত-বিরহবেদনা যখন কবির চিত্তকে তিক্ত বিরক্ত করে তুলতো তখন তিনি সব কিছুই অবিশ্বাস করতেন। কিন্তু, যে মুহূর্তে চিত্তপটে সে পরম প্রেমাস্পদের মূর্তি ভেসে উঠতো, চিত্তকে তা অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলতো। এইভাবে ধীরে ধীরে কবি সেই পরম প্রেমময়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভারতীর "প্রেমের বারতা" শীর্ষক কবিতাটি একেবারে আমাদের মর্মে এসে প্রবেশ করে হৃদয়কে যেন প্রেমাস্পদের জন্য বিমথিত করে তোলে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই একমাত্র এ রস পরিবেশনের পরাকাষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়। কৃষ্ণ বিরহে বিদগ্ধপ্রাণা শ্রীরাধার অন্তরের সকরুণ অশ্রু ও বেদনা যেমন বৈষ্ণব কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি 'ভারতীর' কবিতাতেও দেখতে পাই একটি বিরহিনী তরুণী তার প্রেমের অভিমানে আহত হ'য়ে, লাঞ্ছিত প্রণয় মর্যাদায় কাতর কণ্ঠ নিয়ে সখীকে অনুনয় বিনয় করে অনুরোধ করছেন সেই প্রণয়ীর কাছে যেতে। বলছেন—"তুমি তার অন্তরে প্রবেশ করে জেনে এস সখি, কি দোষে সে আজ আমার প্রতি এমন বিরূপ হয়েছে? এমন করে তার দুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে, এই অপরিসীম দুঃখে ও লজ্জা ভোগ করবার জন্য সে আমায় ত্যাগ করে গেছে কেন?" কবিতাটি শেষ হয়েছে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে তরুণীর ভাগবত কৃপা ভিক্ষায়।

"প্রিয়তমেষু" কবিতাটিতে কবি তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে আপন অন্তরঙ্গতার সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়ে উপসংহারে বলেছেন যে তাঁর যিনি প্রেমাস্পদ, তিনি সেই 'পরম-প্রিয়তম' ভিন্ন অন্য কেউ নয়।

"ওগো কান্নানা প্রিয়তম মোর।" কবিতাটিতে 'প্রিয়তমেষু' কবিতারই পুনরাবৃত্তি কিছু কিছু থাকলেও অনন্তের সঙ্গে প্রিয়তমের রূপের একটা ঐক্য যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

"বিলোল সিন্ধু তরঙ্গ বুকে হেরি আমি তব মুখ
তোমারই শ্রীমুখ বিম্বিত হেরি বিশাল গগন মাঝে
অগণিত যত বুদ্বুদে দেখি ফুটিছে তোমারই মুখ
তোমার অপার করুণাই শুধু হেরি আমি চারিভিতে!"

সুব্রহ্মণ্য ভারতীর এই ধরণের রচনাগুলি থেকেই বোঝা যায়, কবি তাঁর প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে পরম প্রেমময়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন।

কবির 'দিনান্তে' ও 'অভিসার' কবিতা দুটির মধ্যে একটু নূতন সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কবিতা দুটির মধ্যে আছে নিখিলের নারীজাতির প্রতি একটি মর্যাদামণ্ডিত অথচ রস-রভসাসক্ত প্রণয়ানুরাগের অপরূপ অভিব্যক্তি। নারীর কোমল অন্তরের অনুরাগ-উষ্ণ নিভৃত গুহায় গুপ্ত যে রহস্য তাকে আমরা পাই এখানে দেবীর বেশে নয়, মানবীর রূপেই।

ভারতী কবির রচিত গ্রাম্য ছড়া ও পল্লীগীতগুলি যে অশিক্ষিত পটু গ্রাম্যকবিদের রচনার চেয়ে অনেক ভাল একথা বলাই বাহুল্য। 'বৃষ্টি' কবিতাটির মধ্যে তাঁর শব্দের খেলা ও ছন্দের লীলা বিস্ময়কর। এই দেশপ্রেমিক কবি তামিল ভাষাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলে ঘোষণা করে গেছেন। প্রাচীন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে ইনি যে সব অংশ বেছে নিয়ে খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রেই মূলকাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। কারণ, এগুলির মধ্যে ভারতী ব্যবহার করেছেন এ যুগের রুচি ও রসবোধের অনুকূল কলাসম্মত ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য। কাজেই এ রচনাগুলি বর্তমান পাঠকদের বেশি ভাল লাগে। এই ধরণের রচনাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে তাঁর "পাঞ্চালীর শপথ" শীর্ষক কাব্যখানি।

'অগ্নি' শীর্ষক কবিতাটি আমাদের নিয়ে যায় সেই তপোবনের যুগে—যেখানে পুণ্যশ্লোক ঋষিরা যজ্ঞ করতেন অসুরনাশ ও দেব-কৃপালাভের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কবিতাটি একটি রূপক রচনা। এখানে অসুর হল ভারতের বিদেশী শাসকেরা, আর ঋষি হ'লেন ভারতের দেশপ্রেমিক সর্বত্যাগী নেতারা। সুব্রহ্মণ্য ভারতী কবীশ্বর যে অতি শক্তিশালী লেখক ছিলেন একথা পূর্বেই বলেছি। হেন বিষয় নেই যার উপর তিনি কবিতা রচনা করেন নি। তার মধ্যে বহু রহস্যজড়িত মরমী কবিতা, রূপক ও সাংকেতিক কবিতাও সন্নিবেশিত আছে। "পৃথিবীর পরিধি" প্রভৃতি দু'একটি কবিতার মধ্যে কেবল কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু ছবি ফুটে উঠেছে দেখা যায়।

মত্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে একটি অসহায়া বালিকাকে রক্ষা করতে গিয়ে, বালিকা রক্ষা পায়, কিন্তু তিনি সে ক্রুদ্ধ গজের দ্বারা পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এই প্রতিভাবান কবির জীবনাবসান ঘটে। আধুনিক তামিল ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা ও জনক-স্বরূপ তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পূজিত হন এবং চিরদিনই হবেন।

বিনোবাজী সন্দর্শনে বলরামপুরে

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আমাদের কবি বলেছেন—

'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস'।
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো
ধরায় আস॥"

এই সাধক, প্রেমিক, পাগল যাঁরা, তাঁদের নিজের প্রাণের প্রদীপের আলোয় পৃথিবীর মোহ স্বার্থ ক্লেদ-মলিন হয়ে আসে, প্রাণের প্রদীপগুলিকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দিতে আসেন, তেমনি একজন সাধক সন্দর্শনের আহ্বান এলো বন্ধুকবি রাধারাণীর কাছ থেকে।

ভূদান যজ্ঞের কথা অনেকদিন ধরেই পড়ছি, শুনছি, যাঁরা যেমন চোখে দেখছেন তেমনি তার ব্যাখ্যা করছেন, আলোচনা করছেন। মনে মনে যে একটু লোভ আগ্রহ হয় নি যে তা নয়, ঐ যজ্ঞের ঋত্বিককে দেখবার, কিন্তু সুযোগ আর হয় নি। সহসা তাঁর বাংলা দেশে আগমন বার্ত্তা পৌছল। এই আহ্বানে তাকে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর যখন সহসা সত্য চিন্তা, সত্য আদর্শের, ত্যাগের সাধনার—দিকটা একেবারে চাপা পড়েছে দেশ মনে করেছিল, তেমনি সময় ভূদানযজ্ঞের হোতা বা সাধক তার কাছে এক নতুন বার্ত্তা এনে দিলেন, নতুন পথ নির্দ্দেশ করলেন। অবাক হয়ে দেশ যেন দেখল গান্ধীজীর সাধনার উত্তর-সাধকের আবির্ভাব হয়েছে। আর এক নতুনসাধনার পথে কোটী কোটী অন্নহীনের, কর্ম্মহীনের, আশ্রয় হীনের কাছে আশার বাণী এসে পৌছল। বিপ্লবহীন আস্ফালনহীন প্রেমের আবেদন। যেন মনে পড়ে যায় কবির কথাই

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আজি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি,
অনাথ পিণ্ডদ কহিল অম্বুদ নিনাদে।
"ভিক্ষু কহে ডাকি হে নিদ্রিতপুর
দেহ ভিক্ষা মোরে কর নিদ্রা দূর"
"রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন
গৃহী ভাবে, মিছা তুচ্ছ আয়োজন"
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জ্জন
বালিকা।"

এ যেন এমনি এক অপূর্ব্ব আহ্বান। চিরকালই মানুষ যখন এমন আহ্বান শোনে, মহামানবের এমন ডাক শোনে, সে ছুটে বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে। কেউবা তার সর্ব্বস্ব নিয়ে, কেউ বা সামান্য নিয়ে, কেউবা শূন্য হাতেই শুধু বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে এসে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর পথের পাশে দাঁড়ায়। সেদিন যেন ঐ মহামানবের প্রাণের প্রদীপের আলোয় চারি দিকে এক দীপাবলীর উৎসব সৃষ্টি হয়। তারা নিজের নিজের আঙিনায় ক্ষুদ্র দীপগুলি জ্বালাবার চেষ্টা করবে যেন সেই আলো থেকে।

বলরামপুরে আচার্য বিনোবা দর্শনে বাংলার স্বনামধন্য সহিত্য সেবক ও সেবিকাগণ
(বলরামপুর রামকৃষ্ণ সাধন মঠে গৃহীত)

আমরাও পরম-বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রম পরিপূর্ণ মনে এই মহামানবের পিছনে সমবেত মহাজনতার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

*　　*　　*

বলরামপুরে পৌছলাম যখন প্রায় ১২টা বেলা।

পরিচিতের মধ্যে ছিলেন কবি নিরুপমা দেবী। অরুন্ধ কস্তুরবা

গ্রাম সেবিকা কর্ম্মী নিরুপমাই তাঁর এখনকার পরিচয়। তিনি সাহেবনগর গ্রামের (পলাশীর কাছে) গ্রাম সেবিকা।

সহরের পরিবেশ থেকে অনেক দূর বলরামপুর। একেবারে গ্রামের পরিবেশ। খড়্গপুর ষ্টেশন থেকে সাইকেল রিকশায় যাওয়া আসার ব্যবস্থা আছে। সেদিনের জন্য ওখানকার উদ্যোক্তারা মোটর বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। অপরিসর উঁচু নিচু গ্রাম্যপথ অতিক্রম করে আমরা বলরামপুরে এলাম।

একটী তোরণের মাঝদিয়ে আমরা ঐ এলাকায় এসে দাঁড়ালাম।

চমৎকার পরিচ্ছন্ন পথ। একহারা সারি সারি লম্বা দালানের কোলে ১০।১২ খানা করে ঘর নিয়ে এক একটা ছাত্রী নিবাস কিম্বা কর্ম্মী নিবাস। সেই রকমই একখানা ঘরে আমরা ৪ জন সেদিনের মত আশ্রয় পেলাম। লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী, কবি রাধারাণী দেবী, কবি উমা রায়, আর আমি। ঐ ঘরের সারির মাঝে একটা ঘরে নিরুপমা দেবী ছিলেন, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর স্ত্রী ও কন্যা ছিলেন। তার খানিক দূরেই গৈরিক ঘেরা এক দালানে বিনোবাজী ছিলেন— তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ। তারি কাছে একটা কুটীরে ছিলেন লাবণ্যপ্রভা চন্দ, তাঁর নিজের ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে বিনোবাজীর জন্য।

আশে পাশে ঐ ধরণের আরো ঘরের ও দালানের সারি দেখলাম। তাতেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সজনীবাবু, তারাশঙ্করবাবু ও অন্য লেখক দলেরা ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনও ছিলেন। দুজন মেম সাহেবও গিয়ে ছিলেন বিনোবাজী দর্শনে।

ওখানকার নারীকর্ম্মীরা অতি যত্নে সকল অভ্যাগত অতিথির তত্ত্বাবধান করছিলেন—স্নানের জন্য কূয়া থেকে জল তুলে দিয়ে, কার কি অসুবিধা আছে দেখে খোঁজ নিয়ে কাজ করায় তাঁদের যেন শেষ ছিল না। সকলেই নানাবয়সের মেয়ে ছিলেন। যেমন হাসিমুখ তেমনি নিরলস সেবাপরায়ণা। রান্নাও তাঁরাই করেন প্রতিদিনের। তবে এই সময়ের জন্য অন্য ব্যবস্থা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে গ্রামকর্ম্মীরা আমাদের কয়েকখানা কার্য্যসূচী দিয়ে গেলেন। তাতে দেখলাম সাড়ে তিনটায় বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

ঘড়িতে সাড়ে তিনটারও আর দেরী নেই।—আর সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ে দেখি ঘরের পাশের পথ দিয়া একটী ক্ষীণকায় শুভ্রবাস সৌম্যমূর্ত্তি মানুষ চলেছেন সঙ্গে বহু লোক। বুঝতে দেরী হ'ল না, তিনিই বিনোবাজী। হাঁটু অবধি কাপড় পরা, মাথায় একটী সাদা চাদরের বেড় দেওয়া, শান্ত-দৃষ্টি, স্মিত প্রসন্ন-মুখ। নবাগত সাহিত্যিকরা বহু মাননীয় ব্যক্তি থেকে আশপাশের গ্রামের নগণ্য মানুষের দল তাঁর সঙ্গে চলেছেন। তিনি শীঘ্র চলে গেলেন। জনতা তার পিছনে পড়ে রইল কত দূরে।

আমরাও উঠে পড়লাম।

পৌষের বৈকালের রৌদ্র মাঠে তখনো ভরা। গ্রামগ্রামান্তর থেকে আসা নরনারীতে মাঠ ভরে উঠেছে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করে সভায় মঙ্গলাচরণ করা হ'ল।

তারপর বিনোবাজী হিন্দীতে তার ভূদানের আদর্শের কথা বললেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী আশা আর্য্যনায়কম্ সেটী বাংলায় তর্জ্জমা করে জনতাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। নিস্তব্ধ জনতা শ্রদ্ধাভরে তাঁর কথা শুনল। দিতে পারার মত কারো কিছু আছে। তাও বেশীর ভাগ লোকেরই নেই, তবু সাধুবাক্য শোনার মত তাঁরা সকলেই শুনলেন মনে লাগল ঐ শ্রদ্ধার ভাবটাই। দিতে পারা না পারা সে কথা পৃথক শুধু মেয়েরা কেউ কেউ গহনা দিলেন, পুরুষ কেউ ভূমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হয়ত যিনি অনেক দিতে পারতেন তিনি অল্প দিলেন। যাঁর সামান্য আছে তিনি অনেক দিলেন। ভূমি আশানুরূপ পাওয়া হোক বা না হোক, আমরা দেখলাম গীতার ভাষায় এক শ্রদ্ধাময় সাধককে। সাধারণ অসাধারণ সকলেই সমানভাবে শ্রদ্ধা জানালেন।

পরদিন হ'ল সাহিত্যিক-সাংবাদিক লেখকদলের মাঝে বিনোবাজীর ভাষণ। তিনটী চিত্রিত মঙ্গল কলসের পাশে পাশে প্রদীপের মালা জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। নিচের সারিটীতে ছিল এগারোটী প্রদীপ।

বিনোবাজীর প্রথম কথাটী হ'ল এই এগারোটী প্রদীপ দেখে আমার মনে পড়ল একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা।

তারপর বল্লেন লেখকমণ্ডলীর দিকে চেয়ে—আমিও এক সময় কবিতা লিখতাম। তখন আমি কলেজে পড়ি। কিন্তু আমি কখনো লেখা প্রকাশ করিনি। যে লেখাটী আমার খুব বেশী ভাল মনে হ'ত আমি সেটী উনানের আগুনে আহুতি দিতাম। তারপর এক সময় হরিদ্বারে ছিলাম কিছুকাল তখন সেই গঙ্গাজলে সব ভাসাইয়াছিলাম। আশ্চর্য্য হয়ে শুনতে লাগলাম আমরা। মনে হ'ল এত নিরাসক্ত না হলে কি এত বড় সাধক কর্ম্মী হতে পারেন? বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ল, সব ত্যাগ করলেও যশলোভের মোহ কোথায় লুকানো রয়ে যায়। সর্ব্বত্যাগী মানুষ সেই পথে আবার ফিরে আসে সংসারের ভোগের পথে। খ্যাতির মোহহীন সাধক এবারে বল্লেন, নিজের আত্মবিশ্বাসের আত্মনির্ভরতার কথা। 'বিশ্বাস আমি পেয়েছি' আমার মায়ের কাছ থেকে। আমাদের মহারাষ্ট্র ভাষায়—সরল গীতানুবাদ ছিল না। মার ইচ্ছা মারাঠি ভাষায় সরল গীতাপাঠ করেন। মাকে গীতা এনে দিলাম একটী। মা বল্লেন, বিন্যা—তুই গীতার অনুবাদ কর এটা বড় কঠিন। আমি অবাক, আমার তখন কিবা বয়স। আমি গীতার কি বুঝি তখন। কিন্তু মার নির্ব্বন্ধ, মার বিশ্বাস, আমি গীতার ভাল অনুবাদ পারব সরল ভাষায়।

জানি না তাঁর জননী তার রচিত 'গীতা প্রবচন' পড়েছিলেন কিনা সে কথা বল্লেন না কিছু। শুধু বৃদ্ধ নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। 'গীতা প্রবচন' তিনি রচনা করেছেন, সে প্রবচন বা অনুবাদ চমৎকার সরল। আগের দিন আমরা কয়েকজন কিনেছিলাম তাঁর হাতের সই করা বই। শ্লোকের কথানুবাদ নয়, শ্লোকও বলা নেই—শুধু প্রতি অধ্যায়ের ভাষ্য। এবং সঙ্গে তুকারামের 'অভঙ্গ' জ্ঞানদেব প্রমুখ নানা সাধুর কথা উপদেশে ভরা—সে এক চমৎকার সাহিত্য সম্পদ।

তারপর উত্তরীয়ের প্রান্ত দিয়ে চোখ দুটী মুছে ফেল্লেন। শ্রোতারা সসম্ভ্রমে দেখলেন, জননীর কথা বলতে বলতে ঐ বৃদ্ধেরও অতদিন পরে চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল।

মহাত্মা গান্ধী অনেক সময়ে বলেছেন, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। এই কথা প্রায় সকল মহাপুরুষ সম্পর্কেই বলা যায়।

বিনোবাজীর সম্বন্ধেও বলা যায়—তাঁর আদর্শ তাঁর কাজই তাঁর জীবনচরিত, তাঁর আর কোনো জীবনচরিত নেই। তিনি আদর্শ বাণী বল্লেও তার চেয়ে বড় তিনি নিজে। তিনি আদর্শ বাণী বলেনও না।

নিজের উপর পরম বিশ্বাসে তিনি সকলের বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন, গর্জ্জন করে চলেছেন।

আর আমরা সবিস্ময়ে শুনলাম, সেই বিশ্বাসের মূলে আছে তাঁর জননীর বিশ্বাস। বিন্যা তুমি পারবে। প্রায় নিরক্ষর সরল সেই মহিলাটী নিজের স্নেহে নিষিক্ত করে পুত্রের প্রাণের বিশ্বাসের প্রদীপটী জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সেই কিশোর কালে। কিম্বা তাই বা কেন বলি, জন্ম থেকেই মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গেই এই শ্রদ্ধাময় তনু পরিপুষ্ট হয়েছিল।

এরপর বিনোবাজী সাহিত্যের তথা সাহিত্যিকের শক্তির কথা বল্লেন। বল্লেন, সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের শক্তি অসীম। তাঁদের শক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তির সঙ্গে তুলনা করলেন। সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ত্তা নয়—তবু তিনি স্রষ্টা, তাঁর শক্তি কম নয়।...

যিনি নিজের সৃষ্টি, নিজের রচনা—মোহহীন অন্তরে আগুনের শিখায় গঙ্গার স্রোতে অর্পণ করেছিলেন, সেই মানুষ তাঁর কথা—ছোট বড়, মুখে সাহিত্যের সমতায় গণ্যমান্য নগণ্য সাহিত্যিক লেখকগণ নতশিরে আশ্চর্য হয়ে শুনলেন।

এখন তাঁর গীতা প্রচার থেকে দু' একটা উপমা কথা তুলে দিচ্ছি।

নবম অধ্যায়—তাঁর মার কাছে শোনা একটী গল্প বলেছেন। একটী স্ত্রীলোক যা কিছু করত, সবই কৃষ্ণার্পণমস্তু বলে করত। এখন আঙিনা পরিষ্কার করে সেই গোবরও সে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করত। ফলে সেই গোবর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গে গিয়ে লাগত। পূজারী আর পরিষ্কার করে উঠতে পারে না। অবশেষে তার মৃত্যু কাল উপস্থিত, সে মৃত্যুকেই কৃষ্ণার্পণমস্তু বল্লে। মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তার জন্য স্বর্গ থেকে বিমান এলো তাও সে কৃষ্ণকে অর্পণ করলে—সে বিমানও মন্দিরে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হল।

তাৎপর্য্য এই, ভগবানে অর্পণ করা যে কোনো কষ্ট তার একটা পৃথক শক্তি সামর্থ্য জন্মায়। জোয়ারের পীতবর্ণের শস্য দানা আগুনের সংস্পর্শে সাদা খইয়ের আকার ধারণ করে; যাঁতায় কারো গম আটা হয়ে যায়; ঠিক তদ্রূপ হরিস্মরণ রূপ সংস্কারে আমাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মটীও অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে।"

গীতা প্রবচনের সপ্তদশ অধ্যায়ে বিনোবাজী ব্যাখ্যা করেছেন আরেক ভাবে,—মা বাপ গুরু যেন এঁরা সকলে আমাদের জন্য পরিশ্রম করেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্য দানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এই দানের অর্থ পরোপকার নয়। সমাজের নিকট থেকে অপার সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে।—যে দিন পৃথিবীতে আসি দুর্ব্বল অসহায় ছিলাম। সমাজ আমায় বড় করেছে ছোট থেকে। আজকে তাঁর সেবা করা আমার কর্ত্তব্য। কারো কাছে কিছু না নিয়ে সেবা করাকে পর উপকার করা বলে। এক্ষেত্রে আগেই তো সমাজের কাছে ভরপুর সেবা নেওয়া হয়েছে। এই ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য যে সেবা তাকেই দান বলা হয়। এবং সৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য শ্রমকেই যজ্ঞ বলা হয়।

যজ্ঞ দান ও তপস্যায় এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাতেই ভূদান যজ্ঞের ঋত্বিকের সত্য রূপ দেখা যাবে। তাঁর বক্তব্যের সবটাই তাঁর দেব, ঋষি ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ, তাঁর যজ্ঞ ও কর্ম্ম, তাঁর দান ও সেবা তারই জন্য।

কবির কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, তাঁর বাণী দিয়েই শেষ করি,

'শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণা ঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।'

সন্ধিক্ষণ

শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা

ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করি জয়দ্রথ উত্তোলিয়া অসি,
রুধিরাক্ত মহাশিশু অভিমন্যু ব্যথায় দুর্ব্বল,
সপ্তরথী শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন উত্তরা হৃদয়
সুভদ্রার পুত্রস্নেহ সন্তানের রক্তে আজ লাল।
অন্যায়ের রথচক্র অস্ত্রহীন শিশুবক্ষখানি—
নিঃশ্বেসে মিশায়ে দিলো রক্তরাঙ্গা পৃথ্বীর ধূলায়।
দিকে দিকে শুধু আজ জাগে তাই শোকার্ত্তের ধ্বনি
ফেরুপাল যত আজ জয়োৎসব আনন্দে মাতাল।

সুরথ-অর্জুন কোথা? চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?
নারায়ণী মহাসেনা এখনো কি পড়ে নাই রণে,—
সন্তানের আর্ত্তরব শোনে নি কি সব্যসাচী তবু—
তবে কেন স্তব্ধ এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস?

হতাশ হ'য়োনা পার্থ—এখনও দুই দণ্ড বেলা—
ঐ দেখ জয়দ্রথ, অস্ত্রে তার করো রক্তপান।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমতী খেলা গুহ

"নামনামিনোরভেদঃ" "রূপরূপিনোরভেদঃ"—নাম বলতে নামীর প্রকাশ, রূপের সঙ্গে রূপীর সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। "ভারতবর্ষ" উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে ফুটে ওঠে সামরবধ্বনিত ঋষির তপোবন, পুণ্যজলবাহিনী গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরীর অনন্তযাত্রা, দেবতাত্মা নগাধিরাজের উদার গাম্ভীর্য্য ; কানে বেজে ওঠে ব্রহ্ম-সংসারী মৈত্রেয়ীর অদ্ভুত ঘোষণা— "যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্," ব্রহ্মদ্রষ্ট্রী, ঋষিকুমারী বাকের দেবীবন্দনা। সীতার সতীত্ব, পদ্মিনীর বীরত্ব, কালিদাসের কবিত্ব, শঙ্করের পাণ্ডিত্য, শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণব্যাকুলতা, বুদ্ধের বৈরাগ্য, রামকৃষ্ণের মাতৃ-আর্ত্তি—এই সব কিছু একাকার হয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করে তাই আমাদের ভারতবর্ষ। রাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, রঘুমণি, রাঘব, রাজারাম, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মসেতু, প্রজারঞ্জন, বলে যত নামেই আমরা তাঁর বর্ণনা করিনা কেন, তাঁর নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, ভক্তানুরঞ্জিনী মূর্ত্তিই আমাদের পূজা আহরণ করে। ঠিক তেমনই—"রবীন্দ্রনাথ" কথার মধ্যে আমরা এক মহাকবি, শিল্পী, দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সমাজহিতৈষী রবীন্দ্রনাথকে শুধু পেয়েই কি সন্তুষ্ট হতে পারব? না, আরও কিছু আমাদের পেতে হবে? শুধু এইখানেই কি তিনি নিঃশেষ হয়ে গেলেন? এ সব কিছু ছাপিয়ে যে ভক্ত রবীন্দ্রনাথ, সাধক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার নিবেদন করে একবার বলব—তোমার সেই পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপের পরিপূর্ণ দ্বার উদ্ঘাটন কর।

আজ রবীন্দ্রনাথ একটি বিশ্বশব্দ। বিশ্বমানবের হৃদয়-আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাঁর এই সর্ব্বহৃদয়ব্যাপী বিচরণ থেকেই মনে বিস্ময় জাগে, তাঁর ঐ শক্তির উৎস কোন্ গোমুখে। আনন্দই মানবের কাম্য। ভগবান আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দসূত্রেই তিনি প্রাণে প্রাণে গ্রথিত। একমাত্র ঐ সংযোগ পথেই হৃদয়ে হৃদয়ে বিচরণ করা যায়। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মরূপী আনন্দসূত্রে বিশ্ব হৃদয়ে মালাবন্ধন করতে পেরেছেন। ভগবদাশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের মানব-চিত্তে প্রবেশের এই ত কারণ। তাঁর সমগ্র জীবন্ত অখণ্ড কবিত্ব, হিমালয়সদৃশ প্রতিভা, গূঢ় দেশহিতৈষণার মূল উৎসধারায় গভীর ভগবদ্‌প্রেম উৎসারিত। চতুর সাধক রবীন্দ্রনাথের বুঝতে ভুল হয়নি—"অখিলরসামৃত মূর্ত্তির খুঁটী ধরে থাকতে পারলে সকল রসই অবিশ্রান্তধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে— "আমার সকল রসের ধারা, তোমাতে আজ হোক্ না হারা।"

রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেকেই ঋষি বলে থাকি। সে ঋষি উপনিষদের পুত্র। সত্যই উপনিষদের অঙ্কে তিনি পালিত। উপনিষদের গম্ভীর মহিমা তাঁকে আনন্দিত করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু, সে আনন্দ সংযত শান্তির গৌরব। কূলহারা উন্মাদিনীর আনন্দধারায় হাবুডুবু খাওয়ার স্থান সেখানে নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে একদিন অস্থির আনন্দের আঘাত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল—তিনি হর্ষধ্বনি করে উঠলেন— "আমি জানি না ত কী আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।" এটা উপনিষদ্-পুত্রের শান্ত ব্রহ্মানন্দ নয়—এ আনন্দ-চিন্ময়-বিগ্রহ, লীলানরবপু, ভক্তিপ্রিয় ভগবানের ক্রীড়াসঙ্গীর আনন্দোন্মত্ততা। সেখানে ভক্ত রবীন্দ্রনাথ আর ভগবান একই ক্রীড়াভূমির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। কে কাকে হারাবে, কে কাকে নীচে ফেলে উপরে উঠবে, তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি মারামারি।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের পুত্র ঋষি বটেন, কিন্তু তিনি ভাগবতের আনন্দোচ্ছ্বল ভক্তপুরুষ। তাঁর জীবন রসোচ্ছল সমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তাল তরঙ্গ।

মানুষের জীবনে হয়ত এমন অনেক সময় আসে, যখন সে দেখে—সে যা চায় তা পায় না। আশা-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা মরীচিকাই মাত্র—সত্য নয়। কিন্তু তবুও মানুষ ভাবে—তাও কি হয়, আরও কিছুটা এগিয়ে দেখিনা কেন। ওই, ওই যে, আর একটু এগোলেই বাঞ্ছার স্বর্গ পাব। সে চলে, আরও চলে; বুদ্ধি হয় তার পাথেয়, মস্তিষ্ক হয় তার সহচর, জ্ঞান তাকে যোগায় প্রেরণা। এইভাবে চলতে চলতে যাত্রা যখন তার থামে সমাপ্তিতে, তখন হাত বাড়িয়ে সে ধরতে যায় তার আশার ফুলগুলিকে। বেশী দূরে নয় তারা—খুবই কাছে—কিন্তু তবুও অনেক দূরে। পারে না সে কিছুই করতে, পায়না কিছুই। বুদ্ধি তখন অপমানিত হয়ে বলে—"তাই ত।" তার লীলাখেলা থেমে যায়। বুদ্ধির দরজায় সেদিন শিকল পড়ে; তখন ডাক পড়ে মনের। অনেকটা সাহস নিয়ে মন এগিয়ে আসে; তার কাজও চলে অক্লান্তোদ্যমে। হঠাৎ নিরন্ধ্র অন্ধকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে আসে একটি আলোর স্বর্ণরেখা। দিক্ নির্ণয় হয়ে যায়। খনির সন্ধান মেলে। এবার বাকী থাকে খনি খনিত করে হীরা উত্তোলন করা—তাকে কাজে লাগানো। এর পর বিজ্ঞানের কাজ। এ কিন্তু সেই বিজ্ঞান নয়,—যা মানুষকে যন্ত্র বানায়। এ সেই বিজ্ঞান—বা বিশেষ জ্ঞান—যার কল্যাণ প্রসাদ মানুষকে উপঢৌকন দেয় নিগূঢ় ভগবদ্-উপলব্ধি। ভগবদ্-উপলব্ধির কোদাল দিয়ে খনির খনন ভালই চলে। হীরা মানুষকে মুগ্ধ করে, লুব্ধ করে। কিন্তু তাকে একান্ত আপনার বলে আনন্দ করবার শক্তি তার তখনও হয়নি। মানুষ রূপধ্যানে সমাহিত হয়। একদিন কে তাকে ঠেলা দিয়ে বলে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" গভীর হর্ষে মানুষ সেদিন গান গেয়ে উঠে—"পেয়েছি পেয়েছি—একান্ত আমার করেই পেয়েছি।" জগৎ প্রশ্ন করে—"কি পেয়েছিস?" সে বলে আমি "অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার।" সে বলে "আমি জানিনা কী পেয়েছি, কী তার দাম—শুধু জানি—"আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান।" মানব-আত্মার গতির এ

হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সে কিছু পেতে চায়, নিতে চায়। তার চাওয়ার শেষ নেই। পাওয়ারও বিরাম নেই। এই সীমাহীন গতিছন্দে সে চিরচঞ্চল। তাই ভৃগু বরুণের কাছে যে ব্রহ্ম জানতে গিয়েছিলেন, এবং অন্নময় কোষ থেকে সুরু করে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ পার হয়ে যতক্ষণ না আনন্দময় কোষে শেষ হতে পেরেছিলেন—ততক্ষণ ব্রহ্মকে জানার জন্য তপস্যাই করে গিয়েছিলেন—কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলেন, জ্ঞানলাভ করেছিলেন—আনন্দলাভ করেননি। কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ তাঁকে ঘিরে ফেলে তাঁর সকল অঙ্গ অবশ করে দিয়েছিল। তপস্যার প্রচেষ্টা সেখানে নিষ্ফল, প্রয়োজনহীন। মানবমনের এই "মার্গণং" বা অনুসন্ধানমুখী যাত্রাপথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবত—যিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, দেশকালনির্বিচারে এক জনতা-ধর্ম্মের প্রচার করেছেন। স্বল্পায়ু, ক্ষীণমতি, হীনশ্রমা কলি-মানবের ভগবানকে পাওয়ার মার্গ প্রশস্ত করে দিয়েছেন—যে মার্গ এতকাল পাহারা দিয়ে এসেছেন কৃচ্ছ্র তপা, উর্দ্ধমতি যোগীঋষির সমষ্টি। সত্যযুগাশ্রয়ী মানবের শক্তি, প্রভা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের জ্যোতিভাস্বর জীবনসূত্রের প্রোজ্জ্বলতায়, আমাদের জীবনের আলোক খদ্যোতের অতিরিক্ত মহিমা বিকীরণ করতে হয়ত পারে না, কিন্তু, জ্বলবার সেই এক অখণ্ড চেষ্টার বিরাম কোথায়। জ্বলে ওঠাই প্রদীপের ধর্ম্ম। আমাদের আত্মা-প্রদীপ যতই ক্ষুদ্রাধার হোক্, তার তেল সলতে যত অপ্রতুলই হোক্ না কেন, তবুও তাকে প্রদীপ ছাড়া আর কি বলতে পারি। সত্যযুগের সূর্য আর কলিযুগের প্রদীপের উৎস একই। শ্রীমদ্ভাগবত আনন্দের সঙ্গে সেই সংবাদ আমাদের দিলেন—একমাত্র ভগবদভিমুখী ভক্তিই—"জনতাঘবিপ্লবঃ" —জনতার পাপরাশিকে বিপ্লাবিত করে দেয়। কলিযুগের অভিষেককালে শ্রীমদ্ভাগবত যে কথা বলে দিয়েছিলেন তার পূর্ণ একাধিপত্যের সময়ে ভক্ত রবীন্দ্রনাথ অতুল সাহসের সঙ্গে "কলিরাজার" বিরোধিতা করে "রাজদ্রোহী" বলে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। সেই বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আমাদের ক্ষুধার্ত্ত আত্মার তৃপ্তিলাভ হল। যুগধর্ম্মী, যুগাবতার রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ হৃদয় জ্ঞানের উপাস্য, রসহীন বৈরাগ্যের নিধি, নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে প্রেমের ভগবান ভক্ত-হৃদয়-বিহারী লীলা-ঠাকুরে রূপান্তরিত করল। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি নিখুত ছায়াচিত্র রবীন্দ্রনাথ। শ্রীমদ্ভাগবত আত্মা, রবীন্দ্রনাথ দেহ। শ্রীভাগবত মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রোদ্গাতা। ভাগবতের মানুষ ভগবানকে নিয়ে ঘর বাঁধে, সংসার করে। আনে, তার কাছে ভগবান নিজেকে বিলিয়ে দেন—এমনভাবেই দেন যে হার না বলে উপায় থাকে না—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং"—তোমাদের অনবদ্য প্রেমের কাছে আমি পারলাম না—হার মানলাম—রবীন্দ্রনাথের ভক্ত-আত্মা তাই বলছে—

"আমি না হলে ভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে…"

সাধ্যাতীত সুদূর নভোমণ্ডল ভগবান নন—তিনি আমারই হৃদ্-মন্দির বিলাসী। আকাশে দেখতে চাও সেখানে তিনি, হৃদয়-আকাশেও সেই তিনিই। বায়ুর তড়িৎকম্পনে, প্রলয়ের ঝঞ্ঝাজালে, তড়িন্মালার দিগন্ত-উদ্ভাসনে তাঁর যে বিশ্ববিমোহিনী রূপ-দর্শন কর—হৃদয়ের শুভ্র আস্তরণে তাঁকেই উপবেশন করাও—"দেখ দেখ রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম-রাজে।" সেই নিভৃত নিলয়ে কুমুদ-সৌরভের মাঝে কোন অচিন্তিত ক্ষণে তাঁর চরণ-পদ্ম ফুটে ওঠে—"ভক্তানাং হৃদ্ সরোজ আস্সে।" শ্রীচৈতন্যের অনুভূতি—"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" যে হৃদয়ের প্রতি জগৎপ্রভুর এমনই আকর্ষণ, সেই হৃদয়কে কি পথের ধূলায় ফেলে রাখব। ধূলা থেকে কুড়িয়ে এনে একে সাজিয়ে রাখতে হবে যে —"হৃদয়ের নিভৃত নিলয় যতনে করেছি প্রক্ষালন।" তখন জগৎপ্রভুকে লোভ-দেখানো, কত ডাকাডাকি। "অতিশয় নিভৃত এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই।" শ্রীচৈতন্যদেব বললেন—"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্।" ভাগবত বুঝলেন—তিনি "ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদ্সরোজ আস্সে।" যাই করা হোক্ না কেন, ভক্তি দিয়ে হৃদয় মাজাঘষা না হলে ঠাকুর সেখানে পা ফেলতে পারেন না। সে উপায় যেমনই সহজ, তেমনই কঠিন। সেই ভক্তি-ধোয়া পথে ভগবান এসে দাঁড়িয়েছেন শুধু মানুষের মনোরাজ্যে নয় ; ধরণীর ধূলিপথে নূপুরের রুণুরুণু বোল তুলে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি ডাকাডাকি করছেন—আমি যে এসেছি, তোমাদেরই একজন হয়ে আমি এসেছি, তোমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হয়ে আমি যে এসেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত বল্লেন—এ জগৎ তাঁর খেলার প্রান্তর—জগৎক্রীড়নকং, "স্ববিহারতন্ত্রম্"। সেখানে তিনি "ক্রীড়ানরশরীর," "ক্রীড়ামনুজঃ।" এই ক্রীড়ামোদী একাকী থাকতে পারেন না—তাঁর সময় যে কাটে না। উপনিষদে ঝঙ্কৃত হল।

"স বৈ নৈব একাকী রমতে, স দ্বিতীয়ং ঐচ্ছত।"

রবীন্দ্রনাথ প্রতিধ্বনি করলেন—"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।" তাছাড়া "নিত্য নূতন রসে ঢেলে, আপনাকে যে দিচ্ছে মেলে।" আরও "প্রাণেশ আমার লীলাভরে, খেলেন প্রাণের খেলাঘরে।"

মানুষ একমনে কাজ করে যাচ্ছে—ভাবছে সে কি মহাকর্ম্মী। ক্রীড়ালোভী ঠাকুর ক্ষুণ্ণ হলেন—এদের কাজই প্রধান, আমি ত প্রধান নই। আমি যে একাকী, নিঃসঙ্গ। কথা বলব কার সঙ্গে, খেলাই বা করব কাকে নিয়ে ?

আমাদের কর্ম্মপ্রাঙ্গণের ছিদ্রপথে তাঁর ব্যথিত চক্ষের সজল দৃষ্টি এসে পড়ে। তখন—

"দেখি সহসা রথ থেমে যায় আমার কাছে এসে
আমার মুখপানে চেয়ে থামলে তুমি হেসে।
হেনকালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" বলে বাড়িয়ে দিলে হাত।"

"আমায় কিছু দাও গো" বলে তিনি চিরদিনই চেয়ে এসেছেন, চাইতে ভালবেসেছেন। মানুষ লজ্জায় শিউরে উঠে বলেছে—"ছি, ছি,

আমি তোমায় কি দেব, তোমায় দেবার মতন আমার কি বা ধন আছে।" ঠাকুর বলেন "লজ্জা কি, তোমার যা' আছে আমায় তাই-ই দাও—সে খুদকুড়াই হোক্, আর তুষকণাই হোক। আমি ত শুধু রাজাধিরাজ, ঐশ্বর্য্যপ্রভু নই—আমি যে দীন ভিখারী। তোমাদের একটুখানি প্রেম, কিছু ভালবাসা আমায় দাও। তাছাড়া যে আমার দিন চলে না। তোমাদের প্রেমই যে আমার ঐশ্বর্য্য।" মানুষ বলে "আমার যে প্রেম নেই, ভক্তি নেই, আছে কেবল ময়লাভরা এক ভাঙ্গা ঝুড়ি। তাতে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ ছাড়া আর ত কিছুই নেই, তোমায় আমি কি দেব?" ভগবানের হাস্য-প্রসন্ন মুখ দেখা যায়। তিনি বলেন—"ঐ জিনিষই আমায় দাও—শুধু ভক্তি ছুইয়ে দাও, একান্ত বিশ্বাসে দাও, আমি তাইই গ্রহণ করব। তোমার দেওয়া গরল যে আমার স্পর্শে অমৃত হয়ে যাবে। তুমি শুধু একবার দিতে চাও, ত্যাগ করতে চাও আমার উদ্দেশ্যে। ব্রজগোপীদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন—"ন ময্যাবেশিত ধিয়াং কামং কামায় কল্পতে"—আমাতে অবশিষ্ট চিত্তের কাম শক্তি হীন, যেমন ভাজা ও সিদ্ধ ধান পুনরায় বীজ উৎপাদন করতে পারে না—"ভর্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে।"

মানুষের জীর্ণ জীবনের প্রান্তভাগে যে প্রেম-চিপিটক মুষ্টি লুকিয়ে থাকে, যা হয়ত সে নিজেও জানেনা, তা তিনি জোর করে নিয়ে নেন। বলেন—"কিমুপায়ণ মানীতং, ননু এতৎ পরমপ্রীণনং সখে।" মানুষের লুকোনো ক্ষুদ্র প্রেমধন যে তার লোভের উপাদান, জীবন-রসায়ন। দেবতা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রার্থনা করেন—"তৃষ্ণাকাতর পান্থ আমি।" পুলক-বিস্ময়ে মানব-হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তবে কি তাই! আনন্দ-সংশয়ের মাঝে দোলা খেতে খেতে সে প্রশ্ন করে—

"এ কি তবে সবই সত্য
হে আমার চিরভক্ত।
আমার চোখের বিজলি—উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে
এ কি সত্য!
তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া,
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য!
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য!
মোর সুকুমার ললাট ফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য!"

হাঁ। সত্যই বটে, সব থেকে সত্য। সূর্য্য যেমন সত্য, মৃত্যু যেমন নিশ্চিত—এও ঠিক তেমনই। তিনি বলেন ভাগবতে "পুয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণু-ভিঃ"—ভক্তের চরণ-রেণু আমায় পবিত্র করে। মানুষ ঘুরে ফেরে—কর্ম্মচক্র পরিভ্রমণ করে। কিন্তু সে আর শুধু তখন মাটীর মানুষ থাকেনা—দেবত্বের ছোঁয়াচ লাগে তার দেহে, মনে। তার রূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজেকে ছোট বলে অপমান করতে সে সাহস পায়না। আত্ম-ঘৃণার অবকাশ আর থাকেনা। সে যে রাজাধিরাজের সঙ্গী, তাঁর লীলা-সহচর, খেলার খেলুড়ে। নিজেকে সে সাজায়, আপনাকে ভালবাসতে শেখে। দেবতা নীচে নেমে আসবেন, তাকে বরণ করে নেবেন। আর ত দেরী নেই। আগমনী শঙ্খ আকাশে বাতাসে বেজে উঠেছে—

"পথিক হে পথিক হে
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে,
পায়ের ধ্বনি আকাশ-তলে
আমায় তুমি যাও ডেকে।"

মানব-হৃদয়ে কত মনোহরণ বেশে তিনি এসে উপস্থিত হন। 'কত লীলাখেলা রসে পুষ্ট হয় তাঁর কোমল দেহখানি। "ভক্তের ভগবান" "খেলার ঠাকুর", "নিঠুর দরদীকে" আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি। স্তব-স্তুতি পূজা আরাধনার ডালি সাজিয়ে সসম্ভ্রমে বিগ্রহের পায়ে তা আলগোছে ঢেলে দিয়ে যোড় হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে করি বহুমূল্য উপঢৌকন বুঝি তাঁকে সন্তুষ্ট করবে।—"দেবতা বলে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু বলে দুহাত বাড়াইনা।" তাঁর দাস হয়ে আজ্ঞা বহন করি, বিপদে 'রক্ষা কর' বলে কাঁদি আর সম্পদে করি তাঁর বিভূতি রূপ দর্শন। তাঁকে ভয় করি, পূজা করি, সম্ভ্রম করি, কিন্তু ভালবাসিনা, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরি না, বন্ধু বলে দাবী জানাই না, প্রিয়ার অধিকার ফলাই না। আমাদের এই দুর্ব্বল-ভক্তি তাঁকে বাঁধতে পারে না। আমাদের প্রার্থনার বস্তু দূর থেকে ফেলে দিয়ে তিনি অন্তরালে চলে যান। তাঁকে পাই না, তিনি আমার হননা। "অখিলরসামৃত মূর্ত্তির অভিমানপূর্ণ কণ্ঠ শোনা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব্ব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে সে ভক্ত ভজে সেইভাবে।
তারে সে যে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"

বৈকুণ্ঠের দেবতার ভোগরাগে অরুচি হয়। ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ সিংহাসন ছেড়ে এসে ধরণীর ধূলিপথে তিনি মহারথযাত্রা করলেন। হলেন "ভুবিচলচ্চরণারবিন্দম্"। মধু-প্রেমিক, আনন্দ-পাগল রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস।

তুমি কাহার সন্ধানে সকল সুখে আগুন জ্বেলে
বেড়াও কে জানে,
যে তোমারে কাঁদায় তারে ভালবাস।"

তিনি শুধু আসেন না, চুপ করে থাকেন না। একটি বরণ-মালা হাতে নিয়ে খুঁজে বেড়ান তাঁর প্রিয়াকে, ক্রীড়া-সহচরকে। যে তাঁকে বুঝাতে পারবে, চিনতে পারবে, তাঁকে ভালবাসবে, তিরস্কার করবে, আবদার জানাবে, কাঁধে চড়বে, উচ্ছিষ্ট খাওয়াতে পারবে। সৃষ্টি-সমুদ্র মন্থন করে মানব-হৃদয় ভেসে ওঠে। তাঁর আনন্দাশ্রু পতিত হয়। ঐ অপরাজিতা মন্দার-মালা প্রেমীর কণ্ঠে তিনি দুলিয়ে দেন। প্রেমী আকুল হয়ে গান ধরে —

"তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে।
হাতে লয়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে॥"

সৃষ্টি শেষে বিধাতা-পুরুষ বিশ্রাম কামনা করলেন। কিন্তু বিশ্রাম ত শুধু শ্রমের বিরাম নয়—একটা আনন্দমন অবসর, যা হয়ে উঠবে প্রিয়ার আলাপে গুঞ্জরিত। এমনই এক স্নিগ্ধ অবসরে জগৎ-স্বামী কামনা করলেন এক আনন্দ সঙ্গিনী। কিন্তু কোথায় সে। এত সৃষ্টি, কিন্তু প্রাণ কোথায়,—সে প্রাণ তরঙ্গায়িত হয়ে স্বামী চিত্তকে করবে রসাল। সেই প্রাণ-দেবীর সন্ধানে জগৎ-প্রভুর যাত্রা হল সুরু। অবসানে তাঁর নির্বাচন লাভ করল এক ক্ষীণ তনু সুকুমার মূর্ত্তি। কে এ? শক্তি-সমৃদ্ধ প্রবল সৃষ্টিগুলির প্রতি তাঁর এত অবজ্ঞা কেন? তিনি বললেন—"তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া"—মানব-দেহই আমার প্রিয়। তাঁর এই পক্ষপাতিত্বের কারণও অগোচর রইল না। মানব-চিত্ত যে "ব্রহ্মাবলোক-ধিষণং", আর দেহ হল "মুকুন্দ সেবৌপায়িকম্"—মানুষের মন ও দেহ সৃষ্টিকর্ত্তার সেবার আধার—তার থেকেও বেশী—তাঁর কৌতুক ক্রীড়ার রঙ্গভূমি। এই দেহ মন নিয়ে প্রভু কত নাড়াচাড়া করেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, তবুও পুরোনো হয় না, অরুচি হয় না। নিত্য নবীন রং-এর ছোঁয়ায় মানব-হৃদয়ও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। মানব দেহমনের এই সার্থকতার দাবী নিয়ে বীরভক্ত রবীন্দ্রনাথ পুলকাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন :—

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি,
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
ধ্বনিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥"

আমার মধ্যে নিজেকে দান করে আবার সেইখানেই নিজের স্বরূপ দর্শন করা—এই মধুরতম তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণধারা। ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে ভগবানের আনন্দ-ক্রীড়াই রাস। দর্পণের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দর্শন করায় শিশুর যে আনন্দ, মানবের মধ্যে ভগবৎ-ভাবের প্রতিফলন দেখে ভগবানেরও সেই একই আনন্দ। কারণ, মানুষ ভগবানের অংশ; ভগবানের কাছে যেতে পারে, ভগবান হতে পারে। তাই মানুষের শুদ্ধচিত্ত দর্শন করলে ভগবানের নিজেকে যে দেখা হয়ে যায়। রাসলীলা ভক্ত-ভগবানের ঘনিষ্ঠ প্রেম সম্বন্ধের রূপচিত্র সেখানে "রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরিভিঃ যথার্ভক স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।"

ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ প্রকাশ অদ্ভুত সুন্দর। ভগবান যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা, মানুষও আবার ভগবানের জনকজননী। মানুষ না হলে তাঁকে চিনিত কে, জানত কে, ধরত কে, ডাকত কে। জনৈক মহাজন তাই গর্ব্ব করে বলছেন :—

"অনামিক হরি তুমি, নাম তোমার কে রেখেছে
ভক্ত তোমার পিতা মাতা, ভক্ত তোমার নাম রেখেছে।"

ভক্তের ভাব-সরোবরে ভগবৎ-পদ্মের বিকাশ।

ঐ হৃৎপদ্ম সুধা পান করবার জন্য তাঁর বড় তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণা ত আর কিছু পানে মেটেনা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। রবীন্দ্রনাথের মুখে রহস্য-প্রশ্ন মুখর হয়ে উঠল :—

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস, আসি অন্তরে মম
দুখে সুখের লক্ষ ধারায়, পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব।
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া, মুরতি নিত্য নব।
আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভাল, হে জীবননাথ, আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম তোমার বিজনবাসে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্য বাহনে চড়ে, সুখের স্বপ্নরাজ্যে তাঁকে আবাহন করেছেন, তাঁর সঙ্গে প্রেম-রহস্য জমিয়েছেন, তা নয়। জীবনে দুঃখের কালোপর্দ্দা যখন ভালো করে নেমে এসেছে, তখন তার অন্তরালের অভিনয়কে তিনি অভিনয় বলেই স্বীকার করেছেন—বাস্তবতার মর্য্যাদায়

তাকে সম্মানিত করেননি। চিরানন্দ রবীন্দ্রনাথ জীবনে দুঃখের আগমনকে ছদ্মবেশী বহুরূপীর ভয়-দেখানো বলেই মনে করেছেন। দুঃখের কৃষ্ণাবরণের অতীতে জ্যোতির্ময় আলোকধামের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। সব পাওয়ার পাওয়া, সব চাওয়ার চাওয়া আনন্দ-পুরুষে নিবেদন করে দিয়ে তার পুরস্কার লাভ করলেন স্বয়ং আনন্দ-পুরুষকেই। তাঁর জীবনের দ্বারে দুঃখমৃত্যু বারবার আঘাত করেছে, কিন্তু তাদের উপবেশনের জন্য এতটুকু স্থানও তিনি শূন্য রাখেননি। তার আগেই আনন্দ-দেবতার অনুচরগণ সবই যে অধিকার করে ফেলেছে। দুঃখ রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে দুঃখিত হয়ে ফিরে গেল। একদিন অজামিলের মৃত্যুশয্যাশিয়রে যমদূতেরা হানা দিয়েছিল। কিন্তু অজামিল মুখ-নিঃসৃত যম-প্রভু বিষ্ণুর নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র বিষ্ণুদূত সদলে সেস্থানে আবির্ভূত হলেন। যম-ভৃত্যগণ সভয়ে, সসম্ভ্রমে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। প্রভুর আবির্ভাবে ভৃত্যের কর্তৃত্ব নিষ্ফল হয়ে গেল। ঠিক এইভাবেই ভক্ত-জীবনে দুঃখের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। ভক্ত দুঃখকে দুঃখ বলে মানেনা। সে দেখে এর ভিতরে ভগবানের রূপ। সে বোঝে—"দুঃখ সে ধরে দুঃখের রূপ, মৃত্যু হয় সে মৃত্যুর রূপ, তোমা হতে যবে হইয়ে বিরূপ আপনার পানে চাই হে।" পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবীর দুঃখ-প্রার্থনা দুঃখরূপী সুখ ভগবানের আবাহন মন্ত্র। তাঁর জীবন দুঃখ-পরিপূর্ণ। কিন্তু সদা কৃষ্ণলাভের সৌভাগ্যে তাঁর আনন্দ সম্রাটের চেয়েও অধিক। জাগতিক দৃষ্টিতে, ভগবদ্‌বিরোধী জীবনে যা দুঃখ বলে জ্বালা দেয়, ভাগবত-জীবনে তা সুখ বলে আনন্দ পাওয়ায়। সুখ পেয়ে যে সুখী দুঃখ পেয়েও সে মনে করে এ আমার প্রিয়ের হাতের দান। দুঃখকে সে দুঃখ বলে স্বীকার করেনা। সে যে দেখে—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন।" শ্রীভাগবতের কুন্তী দেবীর আকাঙ্ক্ষা—

> বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভব দর্শনম্॥"

একটা নয়, দুটো নয়, সীমা সংখ্যাহীন ভূরি ভূরি বিপদ আমাকে দাও। কেন? কুন্তী বুঝেছিলেন বিপদের জ্বালা তাঁকে ভগবানের স্নিগ্ধ চরণে নিয়ে যাবে, তাই। সেই চরণ দর্শনের অবধারিত ফল হবে শুধু আনন্দ—জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের অনিশ্চিত আশঙ্কা যেখানে স্তব্ধ।

কুন্তী-প্রার্থনাকে আরও ঘন জাল দিয়ে ভাগবত প্রস্তুত করলেন এক ভয়হরণ আশ্রয় মন্ত্র। সে মন্ত্র বলে—

> "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ"

—মানুষের ভয় তখনই হয়, যখনই ভগবদ্ ব্যতিরিক্ত কোন সত্ত্বাকে সে স্বীকার করে আর ভগবানের থেকে দূরে সরে যায়। এই পরমবিপদের হাত থেকে উদ্ধারের পথ পরম-প্রেমাস্পদ জ্ঞানে অনন্যা ভক্তি সহকারে ভগবদ্ ভজনা।

ভক্তরাজ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র গানে কবিতায় দুঃখের অস্বীকৃতি আর আনন্দের জয়ধ্বনি করে গেছেন, যার সামান্য পরিচয়ও বৃহৎ হয়ে পড়ে। যেমন—

> "দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গলালোক
> তবে তাই হোক্।
> মৃত্যু যদি কাছে আনে তব অমৃত লোক
> তবে তাই হোক্।"

মানুষে মানুষে বিভিন্নতার সীমা নেই, ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্ত নেই। অনুভূতিরও সীমা নেই। হিন্দুর ষড়দর্শন, গীতা, অন্যান্য শাস্ত্র জগৎকে দুঃখের আলয় বলেছেন। বৌদ্ধবাদের প্রতিষ্ঠা দুঃখবাদের উপর। "দুঃখস্য আত্যন্তিকী ঐকান্তিকী নিবৃত্তিঃ পরম-পুরুষার্থঃ" বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দুঃখকে পীড়ন কর, দুঃখের ঊর্দ্ধে যেতে হবে, অহোরাত্র তাই বলতে বলতে অজ্ঞাতসারে দুঃখকেই যেন আমরা বড় করে এসেছি। তাকে গুরুত্ব দিয়েছি—ঠিক যেমন কৃষ্ণকে শত্রুরূপে সদা সর্ব্বদা চিন্তা করতে করতে কংসের কৃষ্ণ-তন্ময়তা এসে গিয়েছিল। তখন সর্ব্বত্র তিনি কৃষ্ণকেই দর্শন করতেন। তার মিত্রভাবে ছয় জন্মে ভগবানকে না পেয়ে, শত্রুভাবে তিন জন্মে পাওয়ার তাৎপর্য্য এখানেই। বেদান্তদর্শন বা উপনিষৎ সর্ব্বপ্রথম আনন্দের সন্ধান-সূত্র আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আর শ্রীমদ্ভাগবত দৃঢ়কণ্ঠে দুঃখের অনস্তিত্ব ঘোষণা করে আনন্দকেই জীবনের প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিংশ শতাব্দীর ঋষি সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরলেন—

> "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে।
> তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

একদিন পথ চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন একটি মৃত পশুর অস্থি-অবশেষ। তাঁর মনে হল এ যেন তাঁর প্রতি মরণের অঙ্গুলি সঙ্কেত। তিনি শুনলেন অস্থিরাশি যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলছে—"একদা পশুর যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্তঃ, ভেদ নেই লেশ।" তাঁর মধ্যকার প্রেমী কবি, জ্ঞানী কবির উত্তরে বললেন—

> "আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান
> দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।
> অনন্তে মৌনের বাণী শুনো অন্তরে
> দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে;
> নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস
> অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ।"

দুঃখের বক্ষের মাঝে এইভাবে তিনি আনন্দের সন্ধান করে এসেছেন—তখন "বিশ্ব হয়ে যায় মধুময়।" তখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাঁর আনন্দময় রূপের ছন্দ তরঙ্গায়িত হয়।

মধুময় রবীন্দ্রনাথ জীবন-বৃত্তান্তে বলছেন:—

"কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্য্যকরোদীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি। তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই। তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ গানে বহিয়া গিয়াছে। তখনি একথা আমি বলিতে পারিয়াছি—

"যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা।" ভাগবতের প্রহ্লাদও ঐ মাটীকে মাটী বলে দেখেননি—তার ভিতরে অনুসন্ধান করেছেন কৃষ্ণের।

সংশয় জাগে যদি দুঃখ বলে কিছুই নেই তবে তার ছদ্মবেশটাই বা কেন! ছদ্মবেশ দরকার হল "ক্রীড়ানর-শরীরঃ" নিঠুর দরদীর কৌতুক লীলা পূর্ণ করতে। তিনি যে ক্রীড়া-প্রিয়, তাই এত অভিনয়, এত মুখোস। শ্রীমদ্ভাগবতের "নটো নাট্যধরো যথা" আর রবীন্দ্রনাথের—

"তোমারে যাতে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল
ভিতরে যবে হাসির ঘটা, বাহিরে তবে অশ্রুজল।"

এই সংশয়ের অবসান ঘটায়।

প্রেমিক কবির জীবন আনন্দের মহারণ যাত্রা। তাঁর চরণতলে নিপীড়িত হবার শঙ্কায় দুঃখ দূরে, অতিদূরে পলায়ন করেছে। জীবনের উপর সবার বিশ্বাস। অতি স্নিগ্ধ আশ্বাসের আলিঙ্গনে সে মানুষকে ঘিরে থাকে। জীবনের ক্রোড়ে বসে সব কিছুই সুন্দর মনে হয়। পরম সাহস অদূরাগত বিপদকেও অগ্রাহ্য করবার শক্তি দেয়। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে যিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন তাকে আমরা কি বিশেষণে স্তব করব জানি না। শুধু কি ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি মৃত্যুকে আবাহন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন? তা নয় আনন্দ শঙ্খ বাজিয়ে তাকে বরণ করে নিয়েছেন। আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন:

"ক্ষমা কর ধৈর্য্য ধর হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয় নহে বিচ্ছেদের ভয়, শুধু সমাপন॥
শুধু সুখ হতে স্মৃতি শুধু ব্যথা হতে গীতি তরী হতে তীর।
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি নভ হতে নীড়।"

প্রেমস্নিগ্ধ আলিঙ্গনে শ্যামসম মরণকে তিনি বরণ করলেন। নব সজ্জা হাতে নিয়ে মরণ তাঁকে উৎসববেশে সাজাতে এসেছে। তিনি যেন সেই উৎসব সভার চতুর রূপকার। মরণের আগমন পথ তিনি মালঙ্গিক দিয়ে বিচরণ করলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তের মতন তাঁর আত্মাও "পাঞ্চভৌতিকং পরিত্যক্ত্বা শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং" গ্রহণ করতে উৎসুক। তিনি মরণের আবাহন মন্ত্রে বললেন—

"তুমি উৎসব কর সারারাত তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত নবরক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়োনা দৃক্‌পাত আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

সাপের খোলস ছাড়ার মতন জীর্ণ দেহত্যাগ ভক্তের চোখের সামনেই হয়। একবার কঠিন রোগভোগের অবসন্নতার মাঝে কবির অনুভূতি হয়—তাঁর দেহ যেন আত্মা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মৃত্যুস্রোতে ভেসে যাচ্ছে। সেই অনুভূতি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এই রূপগ্রহণ করল:—

"দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোতবাহি—
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা
চিত্র করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশীখানি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের রাজা পরীক্ষিৎ অনুভব করেছিলেন মৃত্যুসর্প তাঁর দেহকে মাত্র দংশন করেছে—তাঁকে নয়। এমন যিনি, যাঁর কাছে মৃত্যু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, তিনি কে? তিনি পরীক্ষিত, তিনি ভক্ত। সপ্তম দিবসে নিশ্চিত মৃত্যু পরীক্ষিৎকে দংশন করবে, কিন্তু তিনি বললেন—আসুক মৃত্যু, আসুক বিপদ, সে আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমি যে মৃত্যুর অস্পৃশ্য। ঐ দেহটা নিয়েই সে টানাটানি করবে—আমাকে সে পাবে না—"দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা।"

আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা কবি জীবনের পরপারে আনন্দলোকের খোঁজ পেয়েছেন, তাই জীবনমৃত্যুর স্বর্ণসন্ধিসূত্র মৃত্যুও তাঁর অনাদরের বস্তু নয়। মৃত্যুই সে আনন্দরাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার রাজদূত। তিনি গাইলেন:—

"দিন অবসান হোল
আমার আঁখি হতে অস্তরবির
আলোর আড়াল তোলো।
অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো।"

মৃত্যু জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুত নয়—জীবনেরই পরমাত্মীয় সে। জীবনের সঙ্গে তার শত্রুতা নেই, জীবনের শেষ সে নয়—অনন্ত মহাজীবনের দ্বাররক্ষী সে। তার সিংহদ্বার পার হয়ে আমরা ভগবানের সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারব। ভগবানই ত মহাপ্রাণ, মহাজীবন। তাঁর সঙ্গে মিলতে পারলে জীবনের বিচ্ছেদ কোথায়। তখন পরিপূর্ণ জীবন-সাগরে অবগাহন করে আমরা মৃত্যু হতে চিরসমাপ্তি লাভ করব। শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা একদিন কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শন করার লালসায় সব গোপবালক ও গোবৎসকে হরণ করে নিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিক সেই সেই বালক ও বৎসের রূপ ধারণ করে বিহার করতে লাগলেন। নিজেকে তিনি উভয়ায়িত করলেন, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুকে তাঁর মধ্যে একাকার করে দিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:—

"জন্ম মৃত্যু দোঁহে লয়ে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।"

পা-তোলা আর পা-ফেলার মধ্যে যেমন মুহূর্ত্তেরও ছেদ নেই, জীবন ও মৃত্যুও তেমনই অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মার মধ্যে গোপবালক ও বৎসগণের অন্তর্দ্ধানজনিত মৃত্যু আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ মধ্যে ঐ জীবনের প্রোজ্জ্বল বিকাশ জন্মমৃত্যু রহস্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। দেহের মৃত্যুর পরেই হয় ভগবানের মধ্যে জীবনধারণ। সে জীবন সুন্দরতর, সুন্দরতম। তাই ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণরূপী পুত্র বা পুত্ররূপী কৃষ্ণের প্রতি স্নেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি লাভ করল। "ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহপল্ল্যব্দমন্বহং ববৃধে শনৈঃ পরং ব্রহ্ম।" তাই কৃষ্ণময় জগৎ দেখতে হলে ঐ মৃত্যুর সৌন্দর্য্য দর্শন করতে হয়। সেখানে যাবার পথ থেকে দুঃখিত মর্ত্ত্যকে প্রবোধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান ধরলেন:—

"এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙ্গা হল রে
আমার পথ হল সুন্দর।"

ভাগবত বললেন যে এমন এক ধাম যেখানে শোক মুহ্যমান করে না, জরা অবসন্নতা আনেনা, আর্ত্তি পীড়া দেয় না, উদ্বেগ শঙ্কা জন্মায় না—

"ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্ন র্ত্তির্ন চোদ্বেগঃ"

রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে মধুব্রহ্মের উপাসনা করেছেন মরণেও তাঁরই গলায় বরণমালা পরিয়ে দিলেন। যে মহাসাধকের জীবন-মরণ ভগবদ্ রসসিন্ধুতে একাকার হয়ে গেছে, তাঁকে কি বিশেষণ দিয়ে চিহ্নিত করব জানিনা, শুধু বলতে পারি তিনি শুধু কবিগুরু নন, ভক্তগুরুও।

হয়ত মনে হবে যিনি এত ভক্ত, যাঁর মধ্যে জীবন-দর্শন রূপবান হয়ে উঠেছে তাঁর বৈরাগ্যের পরিচয় কোথায়। সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্র সাধন তাঁকে ত বাঁধেনি। পথকে যদি গৌণ করে, লক্ষ্যকে যদি মুখ্য বলে মানি তবেই এই সমস্যার সমাধান মেলে। বাহ্য বৈরাগ্যের মূল্য একমাত্র তখনই যখন অন্তর বৈরাগ্য-ভরা। আর অন্তরই যদি বৈরাগ্যময় হয়ে গেল তাহলে বহির্বৈরাগ্যের প্রয়োজন কোথায়?

জীব ও ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনকেই যদি যোগ বলা হয়ে থাকে, ভক্তরবির সে মিলনে ত কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। ত্যাগ দিয়েই শুধু ঠাকুরের পূজা হয় না, ভোগ দিয়েও তাঁর নৈবেদ্যের ভোগ সাজানো যায়। ভোগ যে তাঁরই। মানুষের ভোগের জন্য পরমশিল্পী কত সাধে, সাধনায় এই পৃথিবীকে রূপে রসে গন্ধে সাজিয়েছেন। কেউ যদি তার রস গ্রহণই না করল, তবে জগৎ পিতারও ত অভিমান হতে পারে। বিত্তশালী প্রভুর দেওয়া সুন্দর উপহার দরিদ্র ভৃত্য যদি ব্যবহার করাকে লজ্জা মনে করে, তবে কি প্রভুকে অসম্মান করা হয় না, প্রভুকে ব্যথা দেওয়া হয় না? প্রভুর হৃদয় প্রদেশের নিকট অধিবাসী রবীন্দ্রনাথ প্রভু প্রদত্ত উপহার সানন্দে ব্যবহার করে প্রভুর দানশীলতার বন্দনা মুখর হয়ে তাঁকে অকাতর আনন্দ দিয়েছেন।

—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥"

ভোগের উপচারে ভগবানের পূজার সার্থকতা আমাদের মনকে তবুও হয়ত সংশয়াচ্ছন্ন করে রাখত, যদি না সাধক শিরোমণি শ্রীরাধা বা আরাধিকা ঐ পথেই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত না হতেন। রাধার প্রেম আখ্যা লাভ করেছে—"সাধ্য শিরোমণি।" তিনি ত কঠোরতার গেরুয়া অঙ্গে ধারণ করেননি। বাহ্য-বৈরাগ্যের তিলক মাটি অঙ্গে লেপন করেননি'—তিনি প্রিয়তমের নয়নরঞ্জনের জন্য ছিলেন সুসজ্জিতা মনোরমা হয়ে। ভগবদ্ মিলনের পথে ভক্তিহীনতাই একমাত্র অন্তরায়। ভক্তিগতচিত্তে ভোগের মালিন্য থাকে না—তা নিকষিত হেমতুল্য বিশুদ্ধ। রাধাপ্রমুখ কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপবালাগণ তাঁদের ঐকান্তিক প্রেমের শক্তি বলে সংসারের সকল কাজ যে হাত দিয়ে সম্পন্ন করেছেন, কৃষ্ণ সেবাও সেই হাতেই করেছেন। তাঁদের সংসার ছিল ভগবানের। সে সংসারে তাঁরা খেটেছেন। পরমহংসদেবের "হরের মা"র মত। কোনও দাবী তাঁদের ছিল না। যেন নটীর নৃত্য—মস্তকে পূর্ণঘট, সঙ্গীতের তাল লয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে নেচে যাচ্ছে। কিন্তু মন তার ডুবে আছে মস্তকস্থ পূর্ণ কুম্ভে। সংসারী সংসারের কাজে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দিয়েও মনকে ভগবদ পদারবিন্দে আকৃষ্ট রাখতে পারে।

মহা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রূপ রস আনন্দের দেবতাকে রূপ রস আনন্দ দিয়েই পূজা করে গেছেন। তাঁর দেওয়া জিনিষ তাঁকেই নিবেদন করে দিয়ে তিনি কামনা করলেন:—

"যত দিতে চাও কাজ দিও যদি তোমারে না দাও ভুলিতে
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল জঞ্জালগুলিতে।"

মহাজ্ঞানী মহাভক্ত শ্রীচৈতন্যের উপদেশটাও মনে আসে। বারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী দাস রঘুনাথ সব ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে যেতে চাইলেন। তখন শিক্ষাগুরুর প্রেম-গম্ভীর উপদেশ শোনা গেল:—

"স্থির হঞা ঘরে যাওনা হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুক্ত অনাসক্ত হৈয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

শ্রীভগবানের মুখমদিরাপূত বাণী আমাদের অভয় মন্ত্র—সংসার কর, আমাতে মন রেখে। ভয় নেই আমাকে প্রাপ্ত হবে। সে সংসার বন্ধনের কারণ না হয়ে, হবে মুক্তির স্বর্গদ্বার—তার থেকেও বড় আনন্দের স্বপ্ন নিকেতন, কারণ, ভক্ত ভগবদ্ আনন্দ ব্যতীত মুক্তিও কামনা করেন না।

পরমহংসদেবের 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল খাওয়া' আর চৈতন্যদেবের 'হাতে কাম মুখে নাম' আমাদের জন্য ঐ মন্ত্রের সহজ অনুবাদ। আরও সহজপাচ্য করে আরও মনোরম পাত্রে রবীন্দ্রনাথ ঐ সত্যকে পরিবেশন করলেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ……
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।"

আনন্দ-ভগবানের পূজারী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সকল পুষ্প চয়ন করে ভক্তিচন্দনের ছিটায় পবিত্র করে দেবতাকে নিবেদন করে দিলেন। তাঁর উদ্যানের পুষ্পগুলি শুধু মনোরম নয়, সৌরভাকুল নয়, কার যেন মধুর পদচিহ্নও তাদের বুকে আঁকা রয়েছে। তিনি প্রণাম করলেন তাদের তাই তিনি স্রষ্টা, তিনি ঋষি, তিনি ভক্তরাজ।

প্রতিভা-পরিচিতি

কূটনীতিবিশারদ বিসমার্ক

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর রাজনীতি আজ এমনই ঘোরালো আর ঘোলাটে যে, তার স্বরূপ নির্ণয় করা রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির কার্য্য-কলাপে আর ঘোষণায় সহজ-সত্য-রাজনীতি অপেক্ষা কুটিল অনৃত কূটনীতির ধূম্রজাল সৃষ্টি হোয়ে আজ সেখানকার মানুষের দৃষ্টিকে ঝাপসা ক'রে দিয়েছে। কূটনীতির চালে যে যত বেশী পারদর্শী ততই তার জয়জয়কার। পাশ্চাত্যের কূটনীতির খেলা আজ যেন চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যাচ্ছে, দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্র সমগ্র পাশ্চাত্ত্য-ভূখণ্ডকে কূটনীতি-খেলার মাঠে পরিণত করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পাশ্চাত্ত্য জগতে এমনি খেলা দেখা গিয়েছিল এবং সে-খেলার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নায়ক ছিলেন অটো ফন্ বিস্‌মার্ক। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধ'রে জার্ম্মাণীর এই দুর্দ্ধর্ষ রাষ্ট্রনায়ক সমগ্র ইয়োরোপকে তার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং প্রবুদ্ধ প্রতিভায় এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলেন, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর শক্তিমত্তা, কূটবুদ্ধি এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার কাহিনী প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে ফিরেছে বহুদিন অবধি। কোন মানুষের কূটনীতি-জ্ঞানকে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দেবার জন্যে "বিসমার্ক" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে দেশে দেশে, জগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত।

বিস্‌মার্কের জীবনের কাহিনী ঊর্দ্ধগামী তারকার মতো অবিচ্ছিন্ন সাফল্য ও গৌরবের এক উজ্জ্বল ইতিবৃত্ত। প্রদীপ্ত যৌবনের আবেগে আর প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ হোয়ে যেদিন থেকে তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করলেন সেদিন থেকে কোন বাধা তাঁর গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি, তাঁর রথচক্রের প্রবল গতিবেগের সামনে প্রচণ্ডতম প্রতিদ্বন্দ্বীও হার মেনে সরে দাঁড়িয়েছে। শিশুকাল থেকেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে তেজ, দার্ঢ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল। নিঃসংশয়ে বোঝা গিয়েছিল, এ-ছেলে সাধারণ নয়, তাকে বশে রাখাও সাধারণের সাধ্য নয়। ১৮১৫ সালের ১লা এপ্রিল প্রুসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ছ'বছর বয়সে লেখাপড়া শেখার জন্যে গ্রামের বাড়ী থেকে তাকে বার্লিনে পাঠানো হয় এবং স্কুলের পড়া শেষ করে ১৮৩২ সালে তিনি গটিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ছাত্রাবস্থায় যেমন ছিলেন দুরন্ত তেমনি দুর্দ্দম। ইংরাজ এবং মার্কিন সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের ভাষা শিখে নিতেও ছিলেন যেমন ওস্তাদ, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হোতেও অকুতোভয় ছিলেন তেমনি। বাজী ধ'রে তিনি ছাব্বিশটি "ডুয়েল" লড়েছিলেন; হেরেছিলেন মাত্র একবার। ১৮৩৫ সালে আইনের "ডক্টর" উপাধি নিয়ে তিনি সিভিল সার্ভিস-এ যোগদান ক'রে এইকস্ প্রদেশের কাছারিতে এক বড় পদ গ্রহণ ক'রে সেখানে স্থানান্তরিত হলেন। সেই প্রদেশের রাজ্যপাল কাউণ্ট অর্নিম ছিলেন বিস্‌মার্ক-

অটো ফন বিস্‌মার্ক

পরিবারের বহুদিনের বন্ধু। পরম সমাদরে তিনি বন্ধু-পুত্রকে গ্রহণ করলেন, উপদেশ দিলেন, উৎসাহ দিলেন। কিন্তু সে সব উপদেশ আর উৎসাহ বিশেষ কাজে লাগল না। বেপরোয়া স্বাধীন জীবন লাভ ক'রে বিস্‌মার্ক মেতে উঠলেন নানা খেলায়, নানা নেশায়। নানা স্থান ঘুরে ইংরাজ ও ফরাসী যুবকদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন এবং অবাধ

আনন্দ আহরণের জন্যে অসুস্থতার অজুহাতে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে প্রমোদ বিহারে মত্ত হলেন। ছুটি মাত্র এক সপ্তাহের। কিন্তু একমাস কেটে গেল, তাঁর পাত্তা নেই। চার মাস পরে বার্ণ থেকে কর্ত্তৃপক্ষকে লিখলেন—"আরও কিছুদিনের ছুটি চাই।" কর্ত্তৃপক্ষ তো রেগে আগুন! জরুরী তার করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠিন তিরস্কারের দ্বারা তাঁকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করলেন।

১৮৩৯ সালে স্নেহময়ী মা মারা গেলেন। প্রচণ্ড শোক পেলেন বিস্‌মার্ক। ১৮৪১ সালে পিতা দুই ছেলের মধ্যে বিষয় ভাগ করে দিয়ে গ্রামের বাড়ীতে অবসর-জীবনযাপন করবার সিদ্ধান্ত করলেন। বড়ভাই বার্ণার্ড রইলেন পমিরেনিয়ায়। অটো দীপফ-সহরে নতুন বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। ভক্ত, স্তাবক এবং বন্ধু জুটতে দেরী হল না। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, শরীরে অমিত শক্তি, তলোয়ার খেলায়, ঘোড়ায় ছুটতে, সাঁতার কাটতে অদ্বিতীয়, বন্ধুবৎসল, পরিহাস-রসিক এবং দরাজ-মনা বিস্‌মার্কের সম্বন্ধে নগরের নানা স্থানে নানা আলোচনা চলতে লাগল। তাঁর বহু অদ্ভুত খেয়াল আর বিচিত্র কার্য্যকলাপের জন্যে আখ্যা পেলেন—"পাগলা বস্ত।" ১৮৪৩ সালে প্যারিস ভ্রমণ করে যখন ফিরে এলেন তখন দেখা গল, তিনি দাড়ি রেখেছেন। তখনকার দিনে দাড়ি ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চিহ্ন। দাড়ির দ্বারা যেন ঘোষণা করলেন, তিনি একজন সামান্য লোক নন। এমনি ছিল তাঁর নানা রকমের খেয়াল।

* * *

১৮১৫ সাল থেকে জার্ম্মাণীর জনগণের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করবার ইচ্ছা এবং প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ১৮৩০ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর জার্ম্মাণীর নানা স্থানে ছোটখাটো আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তারা তেমন ফলপ্রদ হয়নি। ১৮৪০ সালে ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মের প্রসিয়ার সিংহাসন অধিকার করবার সময় প্রজারা ভেবেছিল, নতুন রাজা নিশ্চয়ই এইবার একটি সর্ব্বদলীয় সরকার গঠন করবেন। কিন্তু প্রজাদের দাবীতে তিনি কর্ণপাত করেন নি। ১৮৪৭ সালে তিনি সর্ব্বদলীয় সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করেছিলেন বটে, কিন্তু সে-সভাও আসল উদ্দেশ্যকে সফল করতে সক্ষম হয়নি। ফলে প্রজাদের বিক্ষোভ বেড়েই চলল এবং ১৮৪৮ সালে বার্লিনে বিপ্লব বাধলো। রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। প্রতিপদে প্রজারাই জয়ী হল। দুর্ব্বল রাজা নতি স্বীকার করলেন। ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই তিনি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করবেন। তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রাখা হল। জাতীয় রক্ষীদল রাজার প্রহরায় নিযুক্ত রইল। জনগণের শেষ পর্য্যন্ত জয় হল বুঝি!

বিস্‌মার্ক ছিলেন আজীবন রক্ষণশীল, রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। গ্রামের বাড়ী থেকে তিনি শহরে এলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কিন্তু বড় কড়া পাহারা। রাজপ্রাসাদে ঢোকবার কোন পথ নেই। তখন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে গেলেন। এবং এক ভয়ঙ্কর গোঁড়া বিপ্লবীর ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু ভরসা পেলেন না কিছুই। ভীরু মেরুদণ্ডহীন সম্রাট বিসমার্ককে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারলেন না। বিসমার্ক বুঝলেন রাজা নিজে কিছুই করতে পারবেন না। তাঁকে একাই সব ঝুঁকি নিয়ে রাজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুরু করলেন কাজ। চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়িয়ে রাজার পক্ষে লোক সংগ্রহ করতে লাগলেন। একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তার মাধ্যমে সে রক্ষণশীল মতবাদ প্রচার করবার ফাঁকে এক বিপ্লবী-বিরোধীদল তৈরী করলেন এবং রাজদ্রোহ দমন করবার জন্যে সৈন্যদের প্ররোচিত করতে লাগলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। রাজসৈন্য বার্লিনে প্রবেশ করে বিপ্লবীদের বিতাড়িত করে দিলে। বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে সম্রাট পুনরায় সিংহাসনে বসলেন। কলরব উঠল, নতুন সংবিধান চাই, পুরোপুরী গণতন্ত্র না হোক, বেলজিয়মের মতো শাসনতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক হওয়া চাই। সর্ব্বশক্তি দিয়ে বিস্‌মার্ক নতুন সংবিধানের বিরোধিতা করলেন। বেলজিয়মের সংবিধানের উল্লেখ ক'রে বললেন—"বেলজিয়মের সংবিধানের বয়স মাত্র আঠারো বছর। রমণীদের পক্ষে এ বয়সটি চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু সংবিধানের পক্ষে নয়।" শেষ পর্য্যন্ত যে-শাসনতন্ত্র গঠিত হল তার মধ্যে বিস্‌মার্ক সভ্যরূপে প্রবেশ করলেন। শুরু হল তাঁর কূটনৈতিক কার্য্যক্রম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিস্‌মার্ক প্রতিদিন বিদেশী সংবাদ-পত্রগুলি পাঠ করতেন

তাঁর প্রভাব আর প্রতিপত্তি অতঃপর উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ১৮৪৯ সালে উনচল্লিশটি ছোট ছোট স্বাধীন জার্মানরাজ্যের যে মিলিত সংসদ গঠিত হয়েছিল সেই সংসদে তিনি প্রুসিয়ার প্রতিনিধিরূপে যোগ দিলেন। সংসদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার তখন প্রবল প্রতাপ। জার্মান রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ফ্রাংকফোর্ট তখন হীন ষড়যন্ত্র আর নোংরা কূটনীতির বিষে জর্জ্জরিত। বিসমার্কের সঙ্গে সংসদের অষ্ট্রিয়াবাসী সভাপতির সংঘর্ষ ঘটতে লাগল প্রতি কথায় প্রতি কাজে। সংসদের অধিবেশনে কতকগুলি অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা লক্ষ্য করলেন বিসমার্ক। অধিবেশনের সময় একমাত্র অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধিরা ছাড়া অন্য কেউ ধূমপান করতে পারবে না!! প্রথম অধিবেশনেই বিসমার্ক সর্ব্বাগ্রে ধরালেন লম্বা চুরোট। সভাপতি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শান্ত কণ্ঠে বিসমার্ক বললেন—"ধূমপান না করলে ওঁদের যদি পেট ফোলে, আমারই বা ফুলবে না কেন, আমারও তো চামড়ার পেট।" চুরোটে টান দিয়ে জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। অতঃপর সকলেই চুরোট ধরালো। প্রথম সংঘর্ষেই জয়ী হলেন বিসমার্ক!

রাগে গস্ গস্ করতে করতে সভাপতি সেদিনকার মতো কাজ শেষ করলেন। কয়েকদিন পরে কি একটা কাজে তিনি বিসমার্ককে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে বিসমার্ক দেখলেন, সভাপতি কোট খুলে, সার্ট আলগা করে বসে আছেন। অফিস-কামরায় এ-ভাবে এবং এ-সাজে কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান করা ভদ্রোচিত নয়। চোখের পলকে বিসমার্ক বুঝে নিলেন, সভাপতি তাঁকে হেনস্থা দেখাতে চান। সেকাজে তিনিও পিছপাও নাকি? নিমেষের মধ্যে নিজের গায়ের কোট খুলে ফেললেন; তারপর সার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে বললেন—"আজ বড্ড গরম পড়েছে; নয়?" সভাপতি তখন তাড়াতাড়ি কোট পরে নিলেন। মৃদু হেসে বিসমার্ক বললেন—"পথে আসুন!"

* * * * *

১৮৫৭ সালে বিসমার্ক সেন্ট পিটার্সবার্গে রাজদূত নিযুক্ত হলেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি প্রায়ই প্যারিসে গিয়ে থাকতেন। ১৮৬০ সালে তিনি লণ্ডন ভ্রমণ করেন। সেই সময় ডিজরেলির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ডিজরেলি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—"ওই লোকটিকে সাবধান; ওর প্রতি কথার তাৎপর্য্য আছে।" ১৮৬২ সালে বিসমার্ক ফন রুন-এর স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। সেই সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরও গ্রহণ করলেন। পার্লামেন্টের সকল সদস্য প্রসন্ন মনে তাঁকে মেনে নিলেন না। প্রায়ই বিরোধ ঘটতে লাগল। কিন্তু বিসমার্কের কূটনীতির চালে কোন সংঘর্ষই তেমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারল না। বলতে গেলে, পার্লামেন্ট রাজার বিরুদ্ধে, অধিবেশনে বাজেট পাশ হয় না, কিন্তু বিসমার্ক রাষ্ট্রপরিচালনায় পশ্চাৎপদ নন। খাজনা ঠিকমতোই আদায় হোতে লাগল এবং বিসমার্ক রীতিমতো ডিক্‌টেটরি ধরণে রাজকাজ চালাতে লাগলেন। রাজা হলেন তাঁর হাতে খেলার পুতুল। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ছিল যেমন জবরদস্ত তেমনি কূটকৌশলপূর্ণ। অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্যকে ধীরে ধীরে খর্ব্ব করবার প্রচেষ্টায় তিনি যে অসাধারণ দূরদর্শিতা ও কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসে তার স্বীকৃতি আছে। শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, নিজে রণস্থলে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে অষ্ট্রিয়ার রণশক্তিকে পর্য্যুদস্ত করে বিসমার্ক তাঁর বহু স্বপ্নের ও সাধনার একত্রীভূত বিশাল জার্মাণ সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন। তাঁর সেই বিরাট সাফল্যের জন্য সারা দেশ তাঁর নামে জয়ধ্বনি করল। পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে তাঁর এতদিনের পার্লামেন্ট-অননুমোদিত কার্য্যকলাপকে স্বীকার করে নেওয়া হোল। নানা নতুন খেতাবের দ্বারা তিনি সম্মানিত হলেন।

ঘরে বাইরে জয়ী হলেন বিসমার্ক। কিছুদিনের জন্যে ঘর গুছিয়ে নেবার কাজে ব্যাপৃত রইলেন। তার পর আবার দৃষ্টি দিলেন বাইরে। ফরাসী রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন বড় বাড়াবাড়ি শুরু করছেন। জার্মানীকে অপমান করে তিনি বড় আনন্দ পান!! একাধিকবার বিসমার্ক তার প্রমাণ পেয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন, অস্ত্র প্রয়োগ ভিন্ন এ অপমানের অন্য

ফরাসী রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে বিসমার্ক যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করছেন

উত্তর নেই। কিন্তু ঠিকমতো সুযোগ আর সময় তখনো আসেনি। কাটলো কিছুকাল। কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্ক সহসা এক অদ্ভুত চাল চাললেন। ১৮৭০ সালে স্পেনের রাজা গেলেন মারা। তার কোন বংশধর ছিল না। বিসমার্কের গোপন পরামর্শে উৎসাহিত হোয়ে স্পেনীয় কূটনৈতিক-মহল প্রিন্স লিওপোল্ডকে রাজা হবার জন্যে আহ্বান করলেন। লিওপোল্ড ছিলেন প্রুসিয়া-সম্রাটের দূর-আত্মীয়; স্পেনের রাজবংশের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই নির্ব্বাচনের বিরোধিতা করলেন। বিসমার্ক বললেন—লিওপোল্ডই রাজার আসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবিদার। জার্মান সম্রাট এবং প্রিন্স লিওপোল্ড নিজে এ-ব্যাপারে মাথা গলাতে চান না। কিন্তু বিসমার্ক নাছোড়বান্দা! এ কাজ হাঁসিল করতে না পারলে জার্মানীর মান-মর্য্যাদা সব ধূলিসাৎ হবে। রাজাকে তিনি সেই ভাবে বোঝাতে লাগলেন। প্রত্যহ ঘড়িতে

যেমন দম দেওয়া হয়, বিস্মার্ক তেমনি রাজাকে "দম" দিয়ে তাঁকে সক্রিয় রাখলেন। ফল যা হবার তাই হল। যুদ্ধ বাধলো ফ্রান্সের সঙ্গে।

১৮৭০ সালের ৩১শে জুলাই রাজাকে নিয়ে বিসমার্ক যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল পররাষ্ট্র-দপ্তর এবং বহু অফিসর ও কেরাণী। ফরাসী দেশের মাটিতে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন এবং সেইখান থেকেই রাজকার্য্য পরিচালনা ও সৈন্যচালনা করতে লাগলেন। পাঁচ সপ্তাহ পরে ফ্রান্সের দুর্গে শাদা নিশান উড়লো। একজন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ অবনত মস্তকে বিসমার্কের কাছে উপস্থিত হোয়ে জানালেন, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন সন্ধি প্রার্থনা করছেন। বিসমার্ক উত্তর দিলেন—"বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পন চাই। নতুবা সন্ধির কথা বিবেচনা করা যাবে না।" শেষ পর্যন্ত তাই হোল। ফরাসী সম্রাট আত্মসমর্পন করলেন।

এই সম্বন্ধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিস্মার্ক তাঁর স্ত্রীকে যে পত্র লিখেছিলেন, পৃথিবীর স্মরণীয় পত্রাবলীর মধ্যে সেখানি অন্যতম বলে গণ্য হয়েছে। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :—

যুদ্ধে আহত একজন সেনানীকে বিস্মার্ক তাঁর শেষ চুরোটটি প্রদান করছেন

ভেনড্রেস্, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০

'হৃদয়ের প্রিয়তমা !—গত পরশু ভোরে আমার শিবির থেকে বেরিয়েছিলাম, আজ ফিরলাম। সেডানের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ৩০০০০। অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্য ছত্রভঙ্গ। গত কাল খবর এলো, নেপোলিয়ন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তখনো প্রাতঃরাশ শেষ হয়নি, স্নানও সারা হয়নি, কিন্তু দেরী না করে বেরুলাম। সেডানের প্রান্তে একটি খোলা গাড়ীতে রাস্তার ধারে সম্রাট আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দু'পাশে তিনজন ক'রে দেহরক্ষী ঘোড়সওয়ার। কায়দা মাফিক অভিবাদন করলাম। সম্রাট বললেন, আমার রাজার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। বললাম—"বর্ত্তমানে তা সম্ভব নয়। উপস্থিত আমি যদি ফরাসী সম্রাটের কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে কৃতার্থ বোধ করব।" সম্রাট আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করলেন। বললেন, "কোথায় ব'সে কথাবার্ত্তা হোতে পারে?" উত্তর দিলাম, "কাছে আমার আস্তানা আছে একটা, কিন্তু তা সম্রাটের পদধূলির যোগ্য নয়।" সম্রাট সেই আস্তানায় যেতে স্বীকৃত হলেন। সম্রাটের গাড়ী চলল। আমি রইলাম অশ্বপৃষ্ঠে পিছনে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, আমাদের সেনাপতি ফন মল্টকে খবর দিলাম। তারপর ঘরে এসে বসলাম। ছোট ঘর। আসবাব-পত্রের বালাই নেই। পুরনো কাঠের তক্ত কিচকিচ শব্দ করছে। সম্রাট একটা চেয়ারে বসলেন, দেখলাম তিনি খুব ক্লান্ত। ঈশ্বরের অমোঘ বিধানে প্রবল পরাক্রান্ত এক সম্রাটের আজ কি করুণ অবস্থা !! যথোপযুক্ত সম্মান দেখালাম তাঁকে। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে অটল রইলাম। এই ঘটনা বিশ্ব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে মনে করি। সবিনয়-চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই বিরাট জয়ের জন্যে।...তোমার চিঠি পেয়েছি।...ছেলেদের ভালবাসা দিও। তোমার, ভি. বি।"

* * *

প্যারিসের পতনের পর বিসমার্ক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনে মনোনিবেশ করলেন। ১৮৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারী ব্যাভেরিয়ার রাজার প্রস্তাবক্রমে এক বিরাট অনুষ্ঠানে ভার্সাই নগরের বিখ্যাত "দর্পণ-প্রকোষ্ঠে" জার্ম্মাণীর সমস্ত রাজন্যবর্গের সুমুখে রাজা উইলিয়ম জার্ম্মাণ-সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হলেন। অতঃপর তিনি হলেন 'কাইজার' —সুবিস্তীর্ণ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর! একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিস্মার্ক অদূরে দাঁড়িয়ে গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে সেই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলেন।

যুদ্ধ শেষ হল। দেশ শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হল। বিস্মার্কেরও কাজ ফুরিয়ে এলো, কিন্তু তাহলেও দেশের সর্ব্বাধিনায়করূপে আরও বিশ বৎসর ধ'রে তিনি তাঁর সম্রাটের সঙ্গে শাসন-পরিচালনায় ব্যাপৃত রইলেন। তাঁর জীবনের এই বিশ বৎসরের ইতিহাস আর তাঁর দেশের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জার্ম্মাণী বলতে বিস্মার্ক, বিস্মার্ক বলতে জার্ম্মাণী। ব্যক্তিত্বের এতবড় সর্ব্বময় প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৮৮৮ সালের ৯ই মার্চ্চ তাঁর অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় সম্রাটের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বিস্মার্ক একটি মহৎ জীবনের দীপ-নির্বাণ প্রত্যক্ষ করলেন। প্রথম উইলিয়মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিস্মার্কের মনের জোরও যেন কমে গেল। অত্যন্ত নিরানন্দ আর উদাস বোধ করতে লাগলেন তিনি। সম্রাট ফ্রেডরিক মাত্র নব্বুই দিন রাজত্ব করেছিলেন। তারপর হলেন কুখ্যাত "কাইজার", প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নায়ক।

কাইজার বিসমার্কের সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রসন্নমনে বরদাস্ত করতে পারলেন না। ছোটখাটো মতান্তর পুঞ্জীভূত হোতে লাগল। অবশেষে একদিন যুবক-সম্রাট এবং বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রী মুখোমুখি দাঁড়ালেন, দু'জনের চোখেই চাপা ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। বিসমার্ক বললেন—"সম্রাট! তাহলে আমি কি বুঝবো যে আমি আপনার পথের অন্তরায়?" ঘাড় বেঁকিয়ে সম্রাট জবাব দিলেন—"তাই মনে করি।" আর কোন কথা না বলে বিসমার্ক ঘরে ফিরলেন। পরদিনই পেশ করলেন পদত্যাগ-পত্র। সম্রাট জানালেন, পদত্যাগ-পত্র তো তিনি চান নি, তিনি মাত্র কয়েকটা কথা জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে বিসমার্ক লিখে পাঠালেন, সে সব কথার সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিয়েছেন এবং তারপর চাণক্যের মতো যোগ ক'রে দিলেন, "কৈফিয়ৎ দেবার পর বিসমার্ক আর মন্ত্রীত্ব করে না।"

মন্ত্রীত্ব থেকে বিদায় নেবার দিন রাজ্যের যত বড় বড় খেতাব ছিল তা সব অর্পিত হল বিসমার্কের মাথায়। দেশ বিদেশের কাছে দেখানো হল, বিসমার্কের পদত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত, তার পিছনে কোন রাষ্ট্রীয় তিক্ততা বা সমস্যা নেই। তার কিছুদিন পরে বিসমার্কের অশীতিতম জন্মদিবসে কাইজার তাঁর কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এলেন। ১৮৯৮ সালের ৩১শে জুলাই জার্ম্মাণীর এই অশেষ প্রতিভাধর রাষ্ট্রনায়ক তাঁর নির্জ্জন দেশের বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানে সেই দেশের মাটিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হল।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যের অবিবেক

ও

বেদান্তের অবিদ্যা।

"ন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে।" (সাং সূ-১।১৯)। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষের বন্ধযোগ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না।

"তদ্যোগোঽপি অবিবেকাৎ" (সাং সূ ১।৫৫)। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হয় অবিবেকবশতঃ। এই অবিবেক কি?

"নঞ্" এর নানাবিধ অর্থের মধ্যে অভাব ও বিরোধ দুইটি। সুতরাং অবিবেক শব্দের অর্থ হইতে পারে বিবেকের অভাব অথবা বিবেকের বিরোধী জ্ঞান। প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতা-খ্যাতি বা ভিন্নতার জ্ঞানই বিবেক। পুরুষ বুদ্ধি নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞানই বিবেক। এখানে প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-সাক্ষাৎকারকে অবিবেক বলা যায় না, কেননা সংযোগের পূর্ব্বে তাহা সম্ভবপর নহে। আবার অবিবেকের অর্থ বিবেকের প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব) অথবা অবিবেকাখ্য জ্ঞানবাসনাও হইতে পারে না, কেননা তাহারা বুদ্ধিধর্ম্ম, পুরুষধর্ম্ম নহে। অন্যধর্ম্মী বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ হয় বলিলে অতি-প্রসঙ্গ দোষ হয়। "বাসনা" শব্দের অর্থ সুখ-ও-দুঃখবোধের সংস্কার, অর্থাৎ সুখ ও দুঃখানুভূতির যে চিহ্ন বা দাগ চিত্তে অঙ্কিত হয়, তাহাই। বুদ্ধি ও পুরুষ অভিন্ন এই জ্ঞানের সংস্কারই অবিবেকাখ্য জ্ঞানবাসনা। বিজ্ঞান ভিক্ষু উপরিউক্ত আপত্তির উত্তরে বলেন বিষয়তা-সম্বন্ধে অবিবেক পুরুষ ধর্ম্ম। "প্রকৃতিঃ বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামী পুরুষায় তত্ত্বং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী, স্ববৃত্তি-দর্শনার্থং তদীয় বুদ্ধিরূপেন তত্রৈব পুরুষে সংজয্যতে।" বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি যে স্বামী পুরুষকে স্বীয় তত্ত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, স্বকীয় বৃত্তি-প্রদর্শনের জন্য তাহাতেই সংযুক্ত হন, এই অর্থে অতি-প্রসঙ্গ দোষ হয় না। না হউক, কিন্তু পুরুষের বুদ্ধিরূপে কিরূপে প্রকৃতি পুরুষে সংযুক্ত হইতে পারে, তাহাই তো প্রশ্ন!

যে অবিবেককে ১৫৫ সূত্রে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার ১৫৮ সূত্রে পুরুষের সম্বন্ধে "বাঙমাত্র" বা কথার কথামাত্র বলা হইয়াছে। "বাঙমাত্রং নতু তত্ত্বং, চিত্তস্থিতেঃ।" অবিবেক, বন্ধ প্রভৃতির অবস্থান চিত্তে। পুরুষে তাহারা প্রতিবিম্বমাত্র, তত্ত্ব নহে। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগদ্বারাই অবিবেক বন্ধের কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রলয়ে বন্ধ থাকে না। আবার জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিবেকের নাশ হইলেও দুঃখভোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে

অবিবেক বস্তুতঃ পুরুষের নাই, তাহাই তাহার সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটাইয়া কিরূপে তাহার বন্ধের কারণ হইতে পারে? পুরুষের ভোক্তৃত্ব এবং প্রকৃতির ভোগ্যত্বের নিয়ামক উভয়ের মধ্যে স্ব-স্বামী ভাব বর্ত্তমান। এই স্ব-স্বামী ভাবকে অথবা কর্ম্মকে উভয়ের সংযোগের কারণ না বলিয়া অবিবেককে সংযোগের হেতু বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান ভিক্ষু—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোহস্য সদসৎ যোনিজন্মসু॥"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "এই সূত্রে "সঙ্গ" নামক অভিমানকেই সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে। গুণ-সঙ্গ রূপ অভিমানই অবিবেক। কর্ম্মাদিকে যে বন্ধের কারণ বলা হয় নাই, তাহার কারণ এই, যে কর্ম্মাদির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ পরম্পরা-ক্রমিক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে। পুরুষ অবিবেকের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ছেদন করিতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ ছেদন করিতে হইলে প্রথমে অবিবেককে ছেদন করিতে হয়। এই জন্যই অবিবেককে সংযোগের মুখ্য হেতু বলা হইয়াছে। এই অবিবেক "অগৃহীতাসংসর্গক উভয় জ্ঞান"—অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান "অগৃহীতা-সংসর্গক" (অগৃহীত অ-সংসর্গ যাহাতে—অগৃহীত+অসং-সর্গক), অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সংসর্গ নাই, এই বোধ নাই। এই অবিবেক অবিদ্যার স্থলাভিষিক্ত। বিবেকের অভাবমাত্র নহে। সাংখ্য সূত্রের (৩।২৪) "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ," এবং "বিপর্য্যয়-ভেদাঃ পঞ্চ (৩।৩৭) সূত্রদ্বয়ে বিপর্য্যয় অথবা মিথ্যা জ্ঞান-কেই সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে। পাতঞ্জল সূত্রের—"তস্য হেতুঃ অবিদ্যা" (২।২৪)—সূত্রে অবিদ্যাকে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে। অবিবেক যদি বিবেকের অভাবমাত্র হইত, তাহা হইলে "ধ্বান্তবৎ তদ্-চ্ছিতিঃ (সাং সূ—১।৫৬)—অন্ধকারের মত অবিবেকের উচ্ছেদ হয়, এই বর্ণনা-সঙ্গত হইত না। তাহার হ্রাসবৃদ্ধিও হইতে পারিত না। বাসনাখ্য অবিবেক-সম্বন্ধেই এই বর্ণনা সঙ্গত হইতে পারে। "তস্য হেতুঃ অবিদ্যা" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যেও অবিদ্যা শব্দের অর্থ অবিদ্যা-বীজ বলা হইয়াছে। কেননা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পরে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন "এই জন্য ব্যাস ভাষ্যে অবিদ্যাকে বিদ্যা-বিরোধী জ্ঞানান্তর বলা হইয়াছে। অবিদ্যা ও অবিবেক উভয়ের যোগ-ক্ষেমতাতুল্য বলিয়া অবিবেকও এক প্রকার জ্ঞান।" কিন্তু জ্ঞান যখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পরে উদ্ভূত হয়, তখন এই বিদ্যা-বিরোধী জ্ঞান কিরূপে সংযোগের হেতু হইতে পারে, বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অবিবেক তিন প্রকারে পুরুষের বন্ধের কারণ হইতে পারে—সাক্ষাৎ ভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপাদন দ্বারা এবং রাগাদিদ্বারা।

পাতঞ্জল সূত্রে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের স্বরূপ নিম্ন-লিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে: "স্ব-স্বামি-শক্ত্যোঃ স্বরূপো-পলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ" (২।২৩)। স্ব=দৃশ্য=প্রকৃতি। স্বামী=পুরুষ। "স্বামী (পুরুষ) দৃশ্যের (প্রকৃতির) দর্শনের জন্য তাহার সহিত সংযুক্ত হন। সেই সংযোগবশতঃ দৃশ্যের যে উপলব্ধি, তাহাই "ভোগ"। দ্রষ্টার স্বরূপের যে উপলব্ধি, তাহা অপবর্গ। সংযোগ "দর্শন"-কার্য্যাবসান, অর্থাৎ "দর্শন" নিষ্পন্ন হইলেই সংযোগের অবসান হয়। "দর্শন" সংযোগের অবসানের (বিয়োগের) কারণ। "দর্শনে"র বিপরীত "অদর্শন" সংযোগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "দর্শন" হইতে মোক্ষ হয়। "অদর্শনের অভাব" (দর্শন) হইতে বন্ধের অভাব হয়। বন্ধের অভাবই মোক্ষ। "দর্শনে"র "ভাব" হইতে বন্ধের কারণ "অদর্শনের" "অভাব" বা নাশ হয়, এই জন্য দর্শন জ্ঞানকে কৈবল্যের কারণ বলা হইয়াছে।" (ব্যাস ভাষ্য)। দর্শনই বিবেক জ্ঞান; অদর্শন অবিবেক বা অবিদ্যা। অদর্শনই সংযোগের কারণ॥ ইহাই অবিদ্যা (২।২৪) বা বিপর্য্যয় জ্ঞানবাসনা, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের-সংস্কার। এই সংস্কার বা বাসনার উৎপত্তি হয় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের পরে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি, এবং প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগও যেমন অনাদি, তাহার কারণ অবিবেকও তেমনই অনাদি। তাহা চিরকালই প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বীজ ও অঙ্কুরের মতো অবিবেক ও সংযোগের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলা যায় না। সংযোগের প্রথম উৎপত্তি কেহ দেখে নাই। তাহার উৎপত্তি দেখিয়া তাহার কারণ-নির্ণয় অসম্ভব। কিন্তু বিবেকের উৎপত্তি হইলে এই সংযোগের অবসান হয়। ইহা হইতে বিবেকের বিরোধী অবিদ্যা বা অবিবেকই সংযোগের কারণ বলিয়া অবধারিত

হইয়াছে। কল্পান্তে প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, তখন সৃষ্টি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়, তাহার ধ্বংস হয় না। সকল বুদ্ধি তাহাদের সংস্কারাদি সহ প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত থাকে। প্রলয়াবসানে তাহারা জাগরিত হয়; অবিবেক মস্তক উত্তালন করে; এবং প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ আবার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির উপর পতিত হয়, এবং যখন সংস্কার সহ বুদ্ধি উদ্ভূত হয়, তখন তাহার প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হয়। জীবের ত্রিবিধ দুঃখের পুনরাবৃত্তি হয়। এই খেলাই অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

অবিবেক বা অবিদ্যা অনাদি হইলেও তাহার ধ্বংস হয়, কৈবল্য অবস্থায় তাহার নাশ হয়। সুতরাং তাহাকে সৎ পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে অবিদ্যার নাশ হইলেও অন্যত্র তাহার বিদ্যমানতা থাকে। সুতরাং তাহাকে সম্পূর্ণ অসৎও বলা যায় না। তাহার স্বরূপ অনির্বাচ্য বলিতে হইবে। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের যে অচেতন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহারই বশে প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে গিয়া তাহার আলোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি অহংকারাদিরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, এবং বুদ্ধি বিপর্যায় অথবা অবিবেকের উদ্ভাবন করিতেছে অনাদি কাল হইতে, আবার স্বয়ংই কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবেকের উদ্ভাবন করিতেছে। ইহা বলিলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের একটা ব্যাখ্যা হয়তো হইতে পারিত। কিন্তু সাংখ্যকার তাহা বলেন নাই। তিনি অবিবেককে সংযোগের কারণ বলিয়াছেন; ফলে সংযোগের পরে আবির্ভূত অবিবেক কিরূপে সংযোগের কারণ হইতে পারে, এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

পাতঞ্জল সূত্রে ২।২৩ সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে অদর্শন অথবা অবিদ্যার আট প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হইতেছে, গুণত্রয়ের কার্য্যারম্ভণ-সামর্থ্যই অবিদ্যা (গুণানাম্ অধিকারঃ)। পুরুষ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন অবিদ্যাকে ত্রিগুণের একটি বিভাব (aspect) বলা যাইতে পারে। অবিবেকের অবস্থিতি যে চিত্তে, তাহা সাংখ্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে। সমস্যা এই প্রকৃতির মধ্যস্থিত অবিবেক কিরূপে পুরুষকে আকর্ষণ করিতে পারে, এবং কিরূপে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত তাহার উদ্ভব হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগকে অনাদি বলিয়া ইহার কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হইতে পারে। কিন্তু এত আলোচনা ও ব্যাখ্যার পর সাংখ্যকার যখন বলেন "কোন পুরুষের বন্ধও হয় না, মুক্তিও হয় না, জন্মান্তরও হয় না; প্রকৃতিরই বন্ধ, মুক্তি ও জন্মান্তর হয়" (সাং কা ৬২), এবং "প্রকৃতি সপ্তরূপে আপনিই আপনাকে বন্ধন করে, এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে বিমুক্ত করে (সাং কা ৬৩), তখন এই সকল আলোচনা নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। মনে হয় দূর হইতে পুরুষের আলোক-পাতের ফলে প্রকৃতির মধ্যে এক ভাক্ত পুরুষের উদ্ভব হয়, এবং বন্ধ, মোক্ষ, অবিবেক সকলই এই ভাক্ত পুরুষের বা জীবের। এই জীব অনাদি, ত্রিবিধ দুঃখে অবসন্ন, সে যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার বিনাশ হয়, এবং তাহার দুঃখেরও অবসান হয়। ইহাই সাংখ্যের মুক্তি। পাতঞ্জল দর্শনের মুক্তি অন্য-প্রকার।

বেদান্তের অবিদ্যা বা মায়া এবং সাংখ্যের অবিবেক এক নহে, উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বর্ত্তমান। মোক্ষ-মূলার বেদান্তের অবিদ্যা ও সাংখ্যের অবিবেকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন "বেদান্তের মতে সৃষ্টি অবিদ্যার ফল। সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অস্থায়ী সংযোগের ফল। এই সংযোগও বিবেকের অভাবের ফল, এবং প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে, কেন না বিবেকের উদ্ভবের সঙ্গেই ইহা তিরোহিত হয়।... ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি এবং তাহার মধ্যে আমাদের স্থান বেদান্তের মতে অবিদ্যা সঞ্জাত, এবং সাংখ্যমতে অবিবেক জাত। এই অবিবেককে যোগসূত্রে (২।২৪) "অবিদ্যা"ও বলা হইয়াছে। তবে বিশ্ব-সম্বন্ধে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রকাশের ভেদ আছে সত্য, কিন্তু বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতেই যাহাকে আমরা সৎবস্তু বলি, তাহা একপ্রকার অচিরস্থায়ী ভ্রান্তির ফল, এই ভ্রান্তিকে অবিদ্যা, মায়া, অবিবেক অথবা অন্য যে কোনও নামই দেও না কেন। সুতরাং বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতো দার্শনিকেরা যদি সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই মৌলিক সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয় দর্শন মিশাইয়া ফেলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন এই কথা বলা সঙ্গত নহে।

এই দুই দর্শনের পরবর্ত্তী বিকাশে যদিও তাহাদিগকে বিভিন্নমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উভয়ের একই উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহাদের গতিও কিছুদিন একই দিকে চলিয়াছিল। আত্ম-অনাত্ম বিবেক ছিল বেদান্তীদিগের লক্ষ্য, আর-প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক ছিল সাংখ্য-দিগের লক্ষ্য। তবে আর-পার্থক্য কোথায়?" মোক্ষ-মূলোর অবিদ্যা ও অবিবেকের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন (সাংখ্য সূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে অবিবেকের স্থলে অবিদ্যা শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে—১৩ সূত্র) তাহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। বেদান্তের মতে সৃষ্টি অবিদ্যা-সঞ্জাত, এবং সাংখ্য মতে অবিবেকজাত, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবিদ্যা-সঞ্জাত সৃষ্টি মায়া, তাহা মিথ্যা, কিন্তু অবিবেক-জাত সৃষ্টি মিথ্যা নহে, সত্য। বেদান্তের সৃষ্টি অস্তিত্ববান্ বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যের সৃষ্টি প্রকৃতি পুরুষের অস্থায়ীসংযোগজাত হইলেও, তাহা মায়িক নহে, তাহা প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল, সংযোগের ফলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাত্র। সাংখ্য দর্শন বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার সহিত বেদান্তের সমন্বয় অসম্ভব। বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, জগৎ মিথ্যা। সাংখ্য মতে পুরুষও যেমন সত্য, জগৎও তেমনি সত্য। বেদান্তমতে "অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্ব নিরূপণস্য অশক্যত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।৩ সূত্রের ভাষ্য।) মায়ার স্বরূপ অনির্বার্য্য—ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। কিন্তু ইহা অঘটন ঘটন-পটীয়সী। "লোকেঽপি দেবাদিষু মায়ব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি-সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে। তথা একস্মিন্ অপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ ভবতি (শঙ্কর-ভাষ্য ২।১।২৮) ইন্দ্রজালিক যেমন বিচিত্র হস্তী, অশ্বাদির সৃষ্টি করে, সেইরূপ এক ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়। ইহা একটি সার্ব্বিক বা বৈশ্বিক (Cosmic) ব্যাপার। সাংখ্যের সৃষ্টি প্রকৃতির পরিণাম—কুহকজাল নহে। সাংখ্যমতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের প্রকৃত সংযোগ না হইলেও, সংযোগের মতো একটা কিছু ঘটে। যাহার ফলে অচেতন প্রকৃতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এবং তাহার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়। ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু এই তথাকথিত সংযোগের ফলেই হউক অথবা তাহার পূর্ব্বেই হউক (সংযোগের হেতু স্বরূপে) অথবা প্রকৃতির একটি বিভাবরূপেই হউক প্রকৃতি-পুরুষের যে অভেদ জ্ঞান দৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান অথবা তাহার সংস্কারই অবিবেক। এই অবিবেকের অবস্থিতি প্রকৃতির মধ্যে। "ন অবিদ্যাশক্তি যোগো-নিঃসঙ্গস্য—সাং সূ-৫।১৪ ;" অসঙ্গ পুরুষের সহিত অবিদ্যা-শক্তির যোগ সম্ভবপর নহে। তথাপি প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ার ফলে এক একটী ভোক্তা পুরুষের (জীবের) উদ্ভব হয়, এবং অবিবেক তাহাদিগকে আশ্রয় করার ফলস্বরূপে ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের আত্ম-অনাত্ম-বিবেক প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ-জ্ঞান, যদিও এই জ্ঞান যখন হয় প্রকৃতির অঙ্গীভূত জীবের, তখন তাহার পক্ষে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন মনে করা কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা বোঝা যায় না। বেদান্তের আত্ম-অনাত্ম বিবেক পারমার্থিক অস্তিত্বহীন বস্তু হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞান এবং জীবও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান। বেদান্তের অবিদ্যা ও সাংখ্যের অবিবেককে অভিন্ন বলা যায় না।

"আনো শরণে"

(গান)
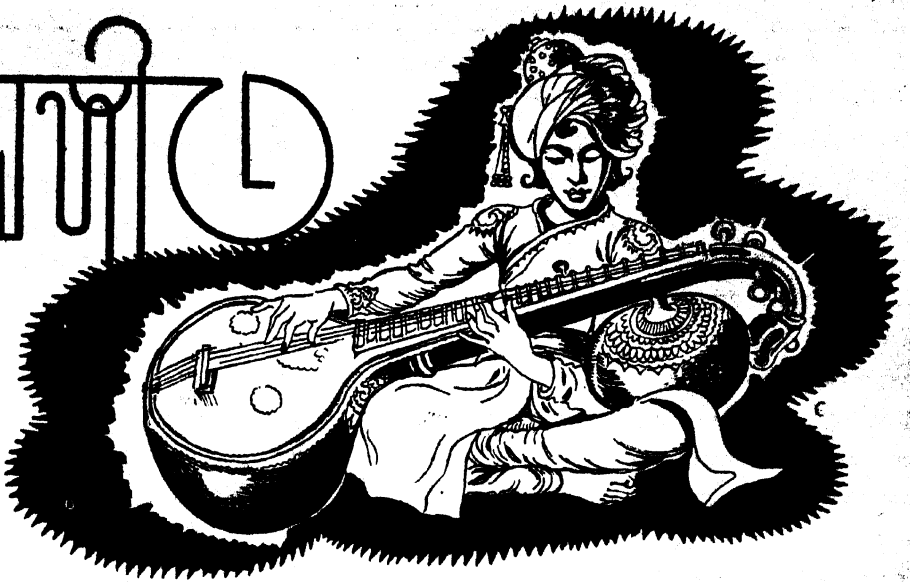
ঝিঁঝিট মিশ্র—দাদ্রা

আনো শরণে—আনো শরণে।
দূরে দূরে আমি
ঘুরে মরি শুধু
মরণ হইতে মরণে!

তব দয়া মম পাথেয়
সেই তো আনিবে শ্রেয়—
সেই কৃপাকণা বরিষণে প্রভু
টেনে আনো তব চরণে।

সাধনা আমার নাই
বল সখা কোথা যাই
ব্যাকুলিত মন কাঁদে নিশিদিন
যাতনা কারে জানাই।

তোমা সম সখা কেবা আছে আর
জীবন-জুড়ানো শান্তি-পাথার
বারে বারে তাই ফিরে ফিরে ডাকি
মোহ-পাপ-তাপ-হরণে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

১´ ০ ১´ ০ ॥
মা মা II মা পা ধধা | -পা মা গা I গমা রগমা মা | -া -া -া I
আ নো শ র ণে০ ০ আ নো শ০ র০০ ণে ০ ০ ০

সা মা মা | মা মা মা I মা পা পা | পা পা পা I
দূ রে দূ রে আ মি ঘু রে ম রি শু ধু

পা ধা -পা | মা গা গা I মা মধা ধা | -া মা মা II
ম র ণ্ হ ই তে ম র০ ণে ০ 'আ নো'

II {মা মা মা | ধা ধা ণা I ণা র্সা র্সা | -া -া -া I
{ত ব দ য়া ম ম পা থে য় ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সা | ণা ধপা ধা I ধা ণা -া | -া -া -া } I
সে ই তো আ নি০ বে শ্রে য় ০ ০ ০ ০ }

ধা -া ধা | ধা ধা ণা I পা পা পা | পা পা পা I
সে ই কৃ পা ক ণা ব রি ষ ণে প্র ভু

সা সা সা | রা গা গা I গমা রগমা মা | -া মা মা I
টে নে আ নো ত ব চ০ র০০ ণে ০ 'আ নো'

II {সা সা সা | ণ্া ণ্া -সা I ধ্া -া -া | -া -া -া I
{সা ধ না আ মা র্ না ০ ০ ০ ই ০

ধ্া ণ্া সা | গা গা মা I মা -া -া | -া -া -া I
ব ল স খা কো থা যা ০ ০ ০ ই ০
মা পা পা | পা প -া I পা ধা পা | মা গা -া I

বা কু লি ত ম ন্ কাঁ দে নি শি দি ন্
মা ধা ধা | ধপা ধা র্সণা I ধা -া -া | -া -া -া } II
যা ত না কা০ রে জা০ না ০ ০ ০ ই ০ }

II {পা পা পা | পা পা পা I ধা র্সা র্সা | র্রা র্রা -া I
{তো মা স ম স খা কে বা আ ছে আ র্

র্সা র্মা র্মা | র্গা র্রা র্রা I র্সা -র্রা র্সা | ণা ধা -া } I
জী ব ন জু ড়া নো শা ন্ তি | পা থা র্ }

মা ধা ধা ধা ধা -মা I মা ধা ধা | ধা ণা ধা I
বা রে বা রে তা ই ফি রে ফি রে ডা কি

পা ধা পা | মা মা মা I মা পা পা | -া -া -া I
মো হ পা প তা প হ র ণে ০ ০ ০

পা র্সা ণা | ণা ধা -া I মা ধা ধা | ধা ণা ধা I
বা রে বা রে তা ই ফি রে ফি রে ডা কি

পা ধা পা | মা মা মা I মা পা পা | -া পা পা I
মো হ পা প তা প হ র ণে ০ 'আ নো

পা ধা পধপা | -া মা গা I গমা রগমা মা | -া -া -া II
শ র ণে০০ ০ আ নো শ০ র০০ ণে' ০ ০ ০

সিঁদকাঠি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আস্তে আস্তে বংশী রাস্তায় এসে উঠল। পাতলা জ্যোৎস্না। মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না। নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, কুকুরের চীৎকার। কাঁঠালি চাঁপার ঝোপের পাশ দিয়ে বংশী এগিয়ে চলল।

বাড়ীটা আগেই নিশানা ক'রে এসেছিল। বামুনপাড়ার একেবারে শেষ বাড়ী। আধলা-ইঁটের গাঁথুনি, টেডটিনের ছাদ। গর্ত করতে বংশীর মিনিট দশেকের বেশী লাগবে না। খোঁজখবর ত সব নেওয়া আছে। বাড়ীতে বুড়ী শাশুড়ী আর কচি বৌ। পুরুষমানুষ বলতে আর কেউ নেই। কোন রকমে ঢুকে বাসনের গোছা বের করে আনতে পারলেই, কাজ ফতে। দিন কুড়ি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে। রাত দুপুরে সিঁদকাঠি পেট কাপড়ে বেঁধে ভিন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

সব ঠিক আছে, কেবল মনের মধ্যে অস্বস্তির খোঁচা। নড়তে চড়তে গেলেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। একে মাসখানেক রোজগারপাতি নেই। কেবল খুদ আর কচু-শাকের তরকারী। তাও সব দিন জোটে নি। তার ওপর বাড়ীর বৌ দিনরাত খচখচ করছে। উঠতে বসতে শাপ-শাপান্তি। এ ব্যবসা ছেড়ে বংশী বরং কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। ইঁটের পাজা রয়েছে, তেলকলের কারখানা। জোয়ান মদ্দ পুরুষের আবার চাকরীর অভাব। দেহে তাগদ থাকলে, ঠিক জুটে যাবে। প্রথম প্রথম বংশী বৌকে অনেক বুঝিয়েছে। শক্তি থাকলেই অমনি চাকরী জোগাড় করা সোজা কিনা। চুপি চুপি বংশী এদিক ওদিক কম চেষ্টা করেছে! সর্দারের চেনাজানা লোক ছাড়া কার সাধ্য কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়ায়। চাকরী খালি হলেই ঠিক পেয়ারের লোকদের ঢুকিয়ে দিয়েছে সর্দারের দল। তেতে পুড়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বংশী ফিরে এসেছে।

চাঁপা কিন্তু কিছুতেই বুঝবে না এসব কথা। উড়ো তর্ক করবে। ভয় দেখাতেও ছাড়বে না। একবার ধরা পড়লে লোকেরা মেরে একেবারে ছাতু ক'রে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে পাঁজর। তারপর হিড় হিড় করে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। আবার একপ্রস্থ মারধোর। হাজত বাস। তেমন তেমন হ'লে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আনাও আশ্চর্য নয়।

কথাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়। মাঝে মাঝে ধরাও পড়েছে বংশী। মারও জুটেছে অদৃষ্টে। দিন পনেরো বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাতে হয়েছে। যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে। চাঁপাকেই তেল মালিশ করতে হয়েছে কিংবা গরম কাপড়ের সেঁক। শুয়ে শুয়ে বংশী নিজের দু কান মলেছে। আর এ পথে নয়। দরকার হ'লে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করবে সেও ভাল, এ ব্যবসা ছেড়ে দেবে। চাঁপার গা ছুঁয়ে বংশী দিব্যি করেছে। মা শেতলার দিব্যি। কিন্তু গায়ের বেদনা মরে যেতেই আবার যে কে সেই। সিঁদকাঠি বুড়ো অশথগাছের তলায় ছুঁইয়ে মাঠ ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা।

দিনকতক অবস্থা চরমে। কথায় বলে, পেটে ভাত জোটে না, বেনারসীর বায়না। চাঁপার হ'য়েছে তাই। পরণের শাড়ী ছিঁড়ে কুচি কুচি, নতুন কাপড় না পেলে ঘাটে যাওয়াই দায়। যেমন ক'রে হক শাড়ী একটা বংশীকে জোগাড় ক'রে দিতেই হবে।

বংশী অনেক বুঝিয়েছে। কোন রকমে সেলাই ফোড়াই ক'রে চাঁপা ইজ্জৎ বাঁচাক। চোরের বৌয়ের আবার সম্মান। সুযোগ সুবিধা হ'লে বংশী ঠিক শাড়ী কিনে নিয়ে আসবে। বলা যায় না, ভগবান সদয় হ'লে চওড়া লালপাড় রঙীন শাড়ীও হ'য়ে যেতে পারে। দু হাত যোড় ক'রে বংশী কপালে ঠেকিয়েছে।

কিন্তু চাঁপা ঘাড় নেড়েছে। ও সব চালাকী তার ঢের দেখা আছে। সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। বংশীর কথার কোন দাম নেই। আজ ছ'মাসের ওপর স্তোকবাক্য দিচ্ছে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। ছ'মাসের মধ্যে গোটা তিনেক কানা ভাঙা থাল। আর একটা টোল খাওয়া বদনা, এই তো বংশীর রোজগারের নমুনা। কোন রকমে দিন চলে গেছে। আধপেটা খেয়ে। বংশীর বরাত। একটা আটপৌরে শাড়ীও নাগালে আসে নি। মানুষজনও যেন সতর্ক হ'য়ে গেছে। উঠানে মেলে দেওয়া দূরে থাক, বাঁশের আলনাতেও শাড়ী জামার খোঁজ মেলে না।

রোদ-লাগা টিনের চালের মতন ক্রমেই চাঁপা তেতে আগুন। একটা কথা বললে দশটা কথা শোনায়। তেড়ে তেড়ে ঝগড়া করে। প্রথম দিকে মুখ বুজে বংশীও সহ্য করেছে। একটি কথা না বলে। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। মানুষের মেজাজ কি আর সবদিন সমান থাকে। মাঝে মাঝে অসহ্য হ'লে চালের বাতা থেকে লাঠি পেড়ে চাঁপার পিঠে ঘা দুয়েক দিয়েছে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। বকুনী কমল তো শুরু হ'ল কান্না। পাড়া মাত করে। কিছুক্ষণ দাওয়ায় ব'সে থেকে বিরক্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়ত বংশী। গাঁ পেরিয়ে খালের ধারে গিয়ে বসে থাকত। রাত জাগা খাটুনী, দিনে একটু না গড়াতে পারলে শরীর ম্যাজ ম্যাজ ক'রে। সন্ধ্যা হ'লেই ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসে। অথচ বাড়ীর বৌয়ের জন্য দুদণ্ড জিরোবার জো আছে!

আজ সকালের ব্যাপারও তাই। ঘুম থেকে উঠেই চাঁপা চেঁচানী শুরু করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা। ভাত কাপড় দেবার মুরোদ নেই যার, তার আবার বিয়ে করার শখ কেন। সোমত্ত পুরুষ লজ্জা করে না পা গুটিয়ে বসে থাকতে?

দাঁতন করতে করতে বংশী চুপচাপ শুনেছে। টুঁ শব্দ করে নি। কিন্তু নরম মাটিতেই বেড়ালের জোর। কচি পাতায় ছাগলের লোভ বেশী। চাঁপা ধাপে ধাপে চড়িয়েছে গলার পর্দা। উদারা, মুদারা, তারা। বংশীকে ছেড়ে তার চোদ্দপুরুষকে আক্রমণ করেছে। নানান কুৎসিত ইঙ্গিত। উঠানে নেমে দাঁড়িয়ে বলেছে, নিমের দাঁতন না ক'রে, নিম গাছে দড়ি বেঁধে গলায় দিয়ে ঝুলুক। যে পুরুষ রোজগার করে না, তার আবার বেঁচে থেকে লাভ কি!

উঠানের ওপরই কঞ্চি পড়েছিল ক'গাছা, তারই একটা তুলে নিয়ে বংশী এলোপাথাড়ী মার শুরু করেছিল। রক্ত দেখে জ্ঞান হ'ল। চাঁপার পিঠের মাঝখানে লম্বা লম্বা আঁচড়। রক্ত ফেটে পড়ছে।

দুপুরের দিকে বংশী দু একবার আদর করতে গিয়েছিল। মিঠে মিঠে কথা দু একটা। আলতো হাত বুলান। কিন্তু চাঁপা খিঁচিয়ে উঠেছে। সরিয়ে দিয়েছে বংশীর হাত। ছেঁড়া আঁচল পেতে মেঝেয় শুয়েছে। উনানে আগুন পড়ে নি। রান্নাবান্নার বালাই নেই। ডেকে ডেকে বংশী হায়রাণ। এক সময়ে বিরক্ত হ'য়ে বংশী বাড়ী ছেড়েছে। সারাটা দুপুর এধার ওধার ঘুরে সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরে দেখে একই অবস্থা। চাঁপা ওঠে নি, শুধু জায়গা বদলেছে। ঘরের এ-পাশ থেকে একেবারে কোণের দিকে গিয়ে শুয়েছে। আপাদ-মস্তক ছেঁড়া আঁচল চাপা দিয়ে।

কাছে বসে বংশী বোঝাবার চেষ্টা করেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে সোহাগের কথা। ফল হয় নি। একটি উত্তরও চাঁপা দেয় নি। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে।......

মজা ডোবার পাশ দিয়ে বাঁশের ঝোপের কাছ বরাবর গিয়ে বংশী একটু দাঁড়াল। এখনও সময় আছে। আর একটু রাত হোক। অঘোরে ঘুমোক মানুষ। গাঁ নিশুতি না হ'লে কাজ শুরু করার সুবিধা হবে না।

একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে বংশী পা মুড়ে বসে পড়ল। দিন কাল পাল্টে গেছে। মনের মানুষও অভাবে অভাবে শুধু পাঁজরই নয়, মনও ফোঁপরা করে দেয়।

বছর দশেকের বেশী নয়। তখন বংশীর মা বেঁচে। নিজে পছন্দ ক'রে চাঁপাকে নিয়ে এসেছিল। মালতীপুরের মেলায় দেখা। ফুটফুটে মেয়ে। নিটোল গড়ন হাত পায়ের। টানা টানা চোখ। বারমুখো ছেলে বংশী। শেকলকাটা টিয়ার মতন খাঁচার ধারে কাছে ঘেঁসে না। কেবল উড়ে বেড়ায় এ-গাছের মাথা থেকে ও-গাছের মাথায়। এ-ডাল থেকে ও-ডালে। এমন এক মেয়ে আনতে পারলে ঘরে মন বসবে বংশীর। মাঝরাতে ঝাঁপ খুলে বাইরে রা

কাটাতে বেরোবে না। মেলাতেই পাকা কথা। তিন কূলে কেউ নেই চাঁপার। দূর সম্পর্কের এক মাসীর কাছে মানুষ। বিদেয় করতে পারলে বেঁচে যায় মাসী। বংশীর মায়ের এক কথাতেই রাজী। পাঁজী পুঁথি দেখবার দরকার নেই। উলু দিয়ে শাঁখের আওয়াজ ক'রে বৌ ঘরে তুললেই হ'ল।

প্রথম প্রথম সত্যিই বংশী বাড়ী ছেড়ে বেরোতো না। বেরোলেও থাকতো ধারে কাছে। বাড়ীর আনাচে কানাচে। ছুতোর মিস্ত্রির কাজ নিয়ে দু পয়সা রোজগারেরও চেষ্টা করতো। কিন্তু দিন কয়েক। তারপরই আবার বদ সঙ্গী জুটলো। বেপাড়ার বদমাইসের দল। দু দিনে বংশীকে দলে টেনে নিল। ছুতোর মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়ে তার বদলে হাতে সিঁদকাঠি তুলে দিল। কানে দিল সর্বনেশে মন্ত্র। হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে দিল। সিঁদ কাটবার কায়দা। ঘরের মানুষকে ঘুম পাড়াবার কৌশল। শব্দ না ক'রে জিনিষ বের ক'রে আনার ফন্দীফিকির!

এরই মধ্যে সুযোগ সুবিধা পেলে শখের জিনিষ তুলে দিয়েছে চাঁপার হাতে। চোরাই মাল কিংবা চোরাই মাল বেচা পয়সায় কোন টুকিটাকি জিনিস। মন মেজাজ ভাল থাকলে আদরও করেছে।

কিন্তু দিন কাল মন্দা হ'তে মন মেজাজও খারাপ হ'য়ে এল। চাঁপার বাঁকা বাঁকা কথায় বংশীর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। চেষ্টা ক'রেও বংশী নিজেকে সামলাতে পারে না। দু বেলা পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নয়, তার ওপর রাতদিন চিল চিৎকারে মানুষের মেজাজ কখনও ঠিক থাকে!

খুট ক'রে আওয়াজ হ'তেই বংশী চমকে উঠে দাঁড়াল। না, লোকজন কেউ নয়, শুকনো নারকোল পাতা খসে পড়ল। তারই শব্দ। কোমরের কসিটা এঁটে নিয়ে বংশী আবার এগোতে শুরু করল। চলতে চলতেই হাত দিয়ে বুকে পিঠের তেলটা মালিশ ক'রে নিল। এ ছাড়া উপায়ও নেই। বলা যায় না বে-কায়দায় কেউ জাপটে ধরতে এলে পিছলে যেতে পারবে পাঁকাল মাছের মতন। একবার লোকের হাত ফসকাতে পারলে আর পায় কে। শিকারী কুকুরের মতন ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। গাঁ না পার হ'য়ে থামবে না।

বামুনপাড়ার কাছাকাছি এসে বংশী চলার গতি কমিয়ে দিল। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলল ঘাসের ওপর দিয়ে। পরনের কাপড় দিয়ে চেপে ধরে খুব আস্তে বাঁশের আগল খুলল। কোনরকম শব্দ না হয়। একেবারে বাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মোটামুটি দেখাই আছে। দিনের বেলা বার তিনেক এ পথ দিয়ে বংশী আনাগোনা করেছে। কোথায় কোন ঘর সব তার নখদর্পণে।

মিনিট দশেক। ঝুর ঝুর ক'রে মাটি খসে পড়ল। পেঁজা তুলোর মতন। মানুষ ঢোকার মতন একটা গর্ত হ'তে আরো মিনিট দশেক। এদিক ওদিক চেয়ে বংশী নিজের পা দুটো খুব সাবধানে ঢুকিয়ে দিল।

দেহটা সম্পূর্ণ চালিয়ে দিয়ে বংশী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসল। জানলা দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোণের দিকে জড় করে রাখা দু একটা কাঁসার বাসন চিক চিক করছে। আবছা আলনায় টাঙানো জামা কাপড়ও দেখা যাচ্ছে।

সেদিকে একটু এগিয়ে বংশী থেমে গেল। তক্তপোশের দিকে নজর পড়তেই আর একটি পাও অগ্রসর হতে পারল না। আশ্চর্য্য এত রাতেও জেগে আছে মানুষ! সারা গাঁ ঘুমে নিথর, অথচ এ দুটো মানুষের চোখে ঘুম নেই! মনে মনে বংশী একটু হিসাব করে নিল। এমনটি তো হবার কথা নয়। শনিবার শনিবার বাড়ীর কর্তা শহর থেকে বাড়ী আসে। এক রাত কাটিয়ে আবার শহরে ফিরে যায়। রবিবার সাড়ে আটটার গাড়ীতে। কিন্তু এমন বে-বারে এসে হাজির যে। শুধু হাজিরই নয়, বৌ নিয়ে রাত জেগে বাড়ী পাহারা দিতে আরম্ভ করেছে।

একেবারে জানলার কোণ ঘেঁষে তক্তপোষ। দেয়ালে হেলান দিয়ে বাবুটি চুপচাপ ব'সে। কোলের ওপর বৌটি শুয়ে রয়েছে চুপচাপ। বৌটির চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বাবুটি আর বৌটি আদর খাচ্ছে। দুজনে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দুজনের দিকে। চোখের পলক নেই। নিঃশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বসে বসে বংশী অনেকক্ষণ ধ'রে দেখল। মশা তাড়াতে গিয়ে একবার হাত নাড়তেই পাশে রাখা বালতির ওপর হাত পড়ল। টুং করে শব্দ হয়। বংশী আস্তে আস্তে পিছিয়ে সিঁদের কাছ বরাবর গিয়ে বসল। বেগতিক দেখলেই

বেরিয়ে আসবে। মানুষজন সজাগ হ'য়ে তাড়া করবার আগেই চোঁচা দৌড়। কেউ নাগাল না পেতে পারে।

কিন্তু সে সব কিছু হ'ল না। দুজনের সাড় নেই। বাবুটি ঝুঁকে পড়ে বৌটিকে ফিস ফিস ক'রে কি বলছে। বৌটিও উত্তর দিচ্ছে আরো আস্তে। বালতি তো বালতি, সারা বাড়ীর বাসন-কোশন ঝন ঝন ক'রে পড়লেও বোধ হয় এদের সাড় হবে না।

দু হাঁটুর ওপর হাত রেখে বংশী চেয়ে চেয়ে দেখল। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। কেমন একটা যন্ত্রণা। ধরা পড়ে চড় চাপড় খেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

সিঁদ কেটে উটকো মানুষ ঘরে ঢুকেছে, তাও খেয়াল নেই। দুজনেই এমন বেহুঁস, এমনি মজগুল।

পাশাপাশি চাঁপার কথাটা মনে পড়ে গেল। ভাল ক'রে খেতে পরতে তো দিতেই পারে নি—ভাল কথা, তাও কতদিন বলে নি। শুধু মারধোর, গালাগাল করার পরে একটু মন রাখা আদর, ইনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি সুরে কথা। কিন্তু এমনভাবে সব ভুলে পেরেছে ভালবাসতে? বাড়ীর জিনিষপত্র বেহাত হ'য়ে গেলেও, যাতে সাড় হয় না। ঠিক এমন করে কোনদিন বুকে জড়িয়ে ধরেছে চাঁপাকে? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে? নিজে সর্বাঙ্গে মার খেয়ে এসে চাঁপার সেবা নিয়েছে, যত্ন নিয়েছে কিন্তু চাঁপার বেদনার দিকে কি নজর দিয়েছে কোনদিন!

ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় সব কেবল গোলমাল হ'য়ে গেল। ফিকে আলোয় থালা বাসনগুলো চকচক করছে বটে, কিন্তু তার চেয়েও চকচক করছে দুজনের চোখ!

খুব আস্তে আস্তে গর্ত দিয়ে বংশী বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তে চাঁপাকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছা করছে। বাসন চুরি করবার এমন সুযোগ হয় তো আরো আসবে জীবনে, কিন্তু চাঁপাকে নিজের করে পাবার এমন শুভলগ্ন বুঝি আর আসবে না।

আসার সময় বংশী পা টিপে টিপে এসেছিল, যাবার সময় কিন্তু জোর পায়ে ঝোপঝাড় পেরিয়ে গেল।

ঝাঁপ তুলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বংশী এক মিনিট দম নিল। এতটা পথ একটানা দৌড়ে এসে হাঁপ ধরে গেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় ঠাওর ক'রে বিছানার দিকে এগিয়ে এল।

চাঁপা, চাঁপা!

মাদুর পাতা আছে, কিন্তু মানুষটা উধাও! বিছানা ছেড়ে বংশী এদিক ওদিক খুঁজল। দাওয়া, উঠান সব। হয় তো মাঠে গেছে, এই ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করল।

কিন্তু এত দেরী তো হবার কথা নয়। জ্যোৎস্নাকে আর বিশ্বাস নেই। হাতড়ে হাতড়ে বংশী তেলের কুপী বার করল। দু একবারের চেষ্টায় আলো জ্বালাল। জ্যোৎস্নায় যা ধরা পড়ে নি, সেটা ধরা পড়ল কেরাসিনের আলোয়।

শুধু মানুষটা নয়, বাঁশের আলনায় রাখা ছেঁড়া কাপড় চোপড়ও উধাও। মায় বংশীর শতছিন্ন গায়ের কাপড়টাও। ছোট্ট টিনের তোরঙ্গটাও নেই। কি মনে হ'তে বংশী ছুটে গিয়ে চালের বাতায় গুঁজে রাখা টিনের কৌটোটার সন্ধান করল। এদিক ওদিক থেকে পাওয়া সামান্য পয়সাকড়ি সব থাকত তাতে। বলতে গেলে বংশীর যথাসর্বস্ব থাকতো। কৌটোটা দাওয়ার কোণে পড়ে আছে। ভিতরের মাল নেই।

ব্যাপারটা আর অস্পষ্ট নয়। দিনের আলোর মতন পরিষ্কার।

কোমরে হাত দিয়ে বংশী এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল। কেবল একটা মস্ত খটকা! বাড়ীর জানলা দরজা ঠিক আছে, কোন ফাঁক নেই কোথাও। জানলা ভাঙা নয়, দেয়ালে সিঁদ নয়, অথচ ঘরের মাল বের ক'রে নিয়ে গেল, গৃহস্থের অগোচরে, কম বাহাদুর চোর নয় তো। নতুন ধরণের সিঁদকাঠির সন্ধান পেল কোথা থেকে, আজ বছর ছয়েক এ লাইনে থেকেও বংশী যার হদিশ পায় নি!

ফ্রাঙ্কফুটের পথে

রাধাভূষণ বসু

বহুদিন থেকে ইচ্ছা ছিল যুদ্ধোত্তর জার্ম্মেনী দেখার। পূর্ব্ব জার্ম্মেনীতে প্রবেশ করার "ভিসা" (visa) বা ছাড়পত্র ছিল না—ইউরোপে থেকে এই ভিসা সংগ্রহ করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। অগত্যা সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণ শেষ ক'রে পশ্চিম জার্ম্মেনী যাওয়াই স্থির করা গেল এবং সুইস্-জার্ম্মান্ সীমান্তে "বাসল্" (Basle)এ পৌঁছে নভেম্বরের মধ্যাহ্নে "ডয়েশ বুন্দেস্ বান্" (Deutsch Bundes Bahn)এর আধুনিকতম লাক্সারী (Luxury) কোচে (coach) উঠে বসলাম—গন্তব্য স্থল আপাততঃ পশ্চিম জার্ম্মেনীর ফ্রাঙ্কফুট্। নতুন গাড়ী—কামরাগুলি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। ট্রেণখানি ডিজেল্—সুতরাং গতি তা'র বেশ স্বচ্ছন্দ এবং অতি দ্রুত। এক কথায় বল্‌তে গেলে এই ট্রেণে ভ্রমণজনিত আনন্দ ভুলে যাওয়ার নয়। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশের রেলওয়ে ট্রেণের মধ্যে একমাত্র সুইস্ ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণ ভিন্ন এত আনন্দদায়ক ট্রেণ অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, সুইস্ রেলওয়ের বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি জার্ম্মেনীরই প্রাপ্য, কারণ সুইজারল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ রেলওয়ে লাইন, ট্রেণ প্রভৃতি জার্ম্মান্ ইঞ্জিনিয়ারেরই তৈরী।

যাই হোক্, খুসী মনে ব'সে আছি একটী কামরায়—সঙ্গে আছেন গৃহিণী। সামনের সীটে কোণে একজন মধ্যবয়স্ক স্বাস্থ্যবান্ ইউরোপীয় ভদ্রলোক খবরের কাগজে মনোনিবেশ ক'রে চলেছেন—কামরায় যাত্রী মাত্র আমরা তিনজনই। বাসল্ ছাড়ার মিনিট সাত-আট পরেই ট্রেণ হঠাৎ একটী ষ্টেশনে থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই সব কামরায় চাবি প'ড়ে গেল—সীমান্ত পুলিশ এবং কাষ্টম্‌স্‌এর পরীক্ষার আভাস। ষ্টেশনটীর নাম দেখলাম বাসল্ বাদ (Basle Bad) জার্ম্মান্ হরফে লেখা—এইখানেই জার্ম্মান্ সীমান্ত। বেশী দেরী কর্‌তে হ'ল না—অল্পক্ষণ পরেই ইউনিফরম্ পরা দুজন বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান অফিসর হাতে পাঞ্চিং (Punching) মেশিন নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। প্রবেশ পথে আমরাই ছিলাম প্রথম—সুতরাং তাঁদের একজন মাতৃভাষায় কি যেন বল্‌লেন আমাদের উদ্দেশ্যে। ভাষা এত শ্রুতিকটু—তার ওপরে আগন্তুকের রাশভারী কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গী—সব মিলিয়ে মনে হ'ল যেন কেউ জোরে হিন্দি আর দ্রাবিড়ী ভাষা মিলিয়ে কথা বল্‌ছে। এ ভাষা যে জার্ম্মান্'সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। অফিসরদ্বয়ের আকৃতি এবং ভাষা শুনে প্রথমটা একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম নিঃসন্দেহ—ভাবছিলাম ইতিপূর্ব্বে ত প্রায় এক ডজন নানা দেশীয় "বর্ডার" পুলিশ এবং কাষ্টম্‌স্ অফিসরকে আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ একরকমে "ম্যানেজ্" (Manage) করেছি—উপস্থিত এদের হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়া যায় কি ক'রে! বললাম, "নো জার্ম্মান্—ইংলিশ প্লীজ্" সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন, "পার্লে ফ্রাঁসে ?" সর্ব্বনাশ! ফ্রান্সেই আমরা "পার্লে ইংলিশ" ছিলাম—সারা পশ্চিম ইউরোপেই "নো, নো, পার্লে ইংলিশ" জবাব দিয়ে এসেছি—শেষে জার্ম্মানীতে "পার্লে ফ্রাঁসে।" তা ছাড়া অফিসরের ফরাসী ভাষা প্রীতি দেখে আশ্চর্য্য বোধ করছিলাম। এই দুটী প্রতিবেশী দেশ ত পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহেই মেতে আছে বহুকাল—সদ্ভাব এদের মধ্যে কখনও ছিল, ইতিহাস একথা লেখে না—বরং ইংরাজের সাথে এদের বন্ধুত্ব মধ্যে মধ্যে স্থায়ী হয়—তবুও এই জার্ম্মান্ অফিসরটীর ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ফ্রেঞ্চের প্রতি এত প্রীতি কেন!

আমাদের কথোপকথন কোণের ইউরোপীয় ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেখি, তিনি খবরের কাগজ হ'তে চোখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি "পার্লে ইংলিশ" বলাতে ভদ্রলোক একটু হেঁসে আমাদের দিকে চেয়ে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন, "May I help you ?" শুনে ত প্রায় চমকিত—বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম,—"নিশ্চয়ই—আমি ত এঁদের কথা বুঝছি নে। অতঃপর ভদ্রলোককে দো-ভাষীর কাজে লাগানো গেল এবং তাঁ'র সাহায্যে ঐ অফিসর দুজনের প্রশ্ন-মালার সন্তোষজনক উত্তর দিলাম। অফিসরের প্রশ্নমালার কয়েকটী হ'তে যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্ম্মেনীর অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম প্রশ্ন—সঙ্গে চা বা কফি কি পরিমাণ আছে। এ দুটী জিনিষই বিদেশ হ'তে আমদানী কর্‌তে হয়। চা আসে প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি দেশ হ'তে—তা'ও সরাসরি আসে না। এই সকল দেশের চা প্রথমে ব্রিটেনে যায় এবং পরে সেখান হ'তে পশ্চিম জার্ম্মেনী যায়। কফি প্রধানতঃ আমেরিকা হ'তে আসে। এদের মধ্যে চা তবুও পশ্চিম জার্ম্মেনীতে কিছু পাওয়া যায়, কারণ এটী "সফ্‌ট্ কারেন্সী (Soft currency) এলাকার জিনিষ ব'লে; কিন্তু কফি "হার্ড কারেন্সী" (Hard currency) এলাকার জিনিষ ব'লে কফি বেশ দুষ্প্রাপ্য এবং দামও আমাদের দেশের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। সেইজন্যে এ দুটী জিনিষের বে-আইনী ব্যবসা জার্ম্মেনীতে বেশ চালু—সুতরাং কাষ্টম্‌স্ অফিসরের অত সতর্কতা। সঙ্গে একটী খোলা টিন "Nescafe" ছিল—দেখালাম—রেহাই পাওয়া গেল। অতঃপর, চুরুট, সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য কি পরিমাণ আছে তা'র পরীক্ষা সুরু হ'ল। কফির মত এগুলিও কেবলমাত্র "হার্ড কারেন্সী" এলাকার জিনিষ ব'লে এত কড়াকড়ি। কিছু সিগারেট ছিল—পরিমাণের অল্পতার জন্যে বোধহয় ছাড়পত্র পাওয়া গেল। এবার প্রশ্ন হ'ল সুইজারল্যাণ্ড ফেরত—ঘড়ি নিশ্চয়ই আছে—ক'টী আছে এবং কত দামের ইত্যাদি। নিজেদের ব্যবহৃত ঘড়ি ছাড়া বন্ধু বান্ধবদের ফরমায়েসী নতুন ঘড়ি চারটী ছিল—সশঙ্কিত চিত্তে দেখালাম—মনে আশা-নিরাশার দোলা—এই বুঝি

আটক করে। এতগুলি ঘড়ি কি হবে—জার্ম্মেনী হ'তে কোথায় যাব ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও দেখি অফিসরের মুখের গম্ভীর ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। শেষ পর্য্যন্ত একটী সবুজ রংএর ফরম্ দিয়ে নির্দ্দেশ হ'ল ঘড়ি ক'টীর সম্পূর্ণ বিবরণ, ক্যামেরার বিবরণ ইত্যাদি তা'তে লিখ্‌তে হবে। এই সবুজ ফরম্ জার্ম্মান্ সীমান্ত ছেড়ে যাওয়ার সময়ে জার্ম্মান্ সীমান্ত পুলিশ এবং কাষ্টমস্ অফিসরেরা পরীক্ষা ক'রে নেবেন এবং দেখবেন ঐ জিনিষগুলি জার্ম্মেনী থাক্‌ল না বিদেশে চ'লে গেল। বলা বাহুল্য, পশ্চিম জার্ম্মেনীতে সুইস্ ঘড়ির বে-আইনী ভাবে প্রবেশ যথেষ্ট রকম ব'লেই এই সাবধানতা। আরও আছে—সঙ্গে কোন্ কোন্ দেশের কারেন্সী অথবা টাকা-পয়সা আছে তা'র ফর্দ্দ। ব্রিটিশ পাউণ্ডের ট্যাভেলার্স চেক্ কয়েক শ' এবং প্রায় দুশ' জার্ম্মান্ মার্ক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—উত্তর দিলাম এবং দেখাতে হ'ল। বাস্‌ল্‌এ টমাস্ কুকের অফিস হ'তে জানা ছিল যে জন প্রতি একশ' মার্ক মাত্র নিয়ে পশ্চিম জার্ম্মেনী প্রবেশ করা যায়—তা'র বেশী নয়। এই রকমের কারণ—জার্ম্মান্ মার্ক অথবা কারেন্সী নিয়েও বে-আইনী ব্যবসা চল্‌ছে এবং সুইজারল্যাণ্ডই তা'র প্রধান কেন্দ্র। এটা সম্ভব হ'য়েছে পশ্চিম জার্ম্মেনীতে অবস্থিত কয়েক লক্ষ আমেরিকান্, বৃটিশ প্রভৃতি Army of Occupation এর দৌলতে। এই সৈন্য-বাহিনীর লোকেরা জার্ম্মেনীতে থাকাকালীন মাহিনা পান জার্ম্মান মার্ক হিসাবে। পাশেই সুইজারল্যাণ্ড—এবং সুইজারল্যাণ্ড সারা পৃথিবীর ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের স্থান। সুতরাং দলে দলে আমেরিকান্, ব্রিটিশ সৈন্যেরা সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণে যান এবং সেখানে তাঁদের অনায়াসলব্ধ জার্ম্মান মার্ক নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন—যার ফলে সুইজারল্যাণ্ডে সুইস্ ফ্রাঙ্কের তুলনায় জার্ম্মান্ মার্কের দাম অনেক কম। সেই কারণে জার্ম্মেনীতে একটী ব্রিটিশ পাউণ্ডের বদলে সরকারীভাবে মাত্র ১২ মার্ক পাওয়া যায় কিন্তু সেই ব্রিটিশ পাউণ্ডের বিনিময়ে সুইজারল্যাণ্ডে ১৪ মার্ক, এমন কি ১৫ মার্ক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রতি ব্রিটিশ পাউণ্ডে দু-তিন মার্ক ফাউ—কম কথা নয়। এই জন্যে ভ্রমণকারীরা পশ্চিম জার্ম্মেনী যাওয়ার পূর্ব্বে সুইজারল্যাণ্ড হ'তে ব্রিটিশ পাউণ্ড ভাঙ্গিয়ে যত পারেন জার্ম্মান্ মার্ক সংগ্রহ করেন। কিন্তু তা'তে পশ্চিম জার্ম্মেনীর অর্থ-নৈতিক সংহতির দিক থেকে ক্ষতি। তা'ই কারেন্সী সম্বন্ধেও কড়া নজর প্রতি জার্ম্মান্ সীমান্তে। কারেন্সীর বিবরণ উপরোক্ত সবুজ ফরমে লিখে সই ক'রে দিতে হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত পাসপোর্ট্ পরীক্ষান্তে মুক্তি পাওয়া গেল। ট্রেণও কিছুক্ষণ পরে চল্‌তে সুরু করল আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে।

সঙ্গী ভদ্রলোকটী ইংরাজী জানেন—সুতরাং তাঁকে আর খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ না দিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপে লাগানো গেল। ভদ্রলোক খাঁটি জার্ম্মান্—নাম, হের্ হায়েন্‌রিখ্ (Herr Hienrich) —পেশা, পূর্ত্ত ইঞ্জিনিয়র। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মান্ পূর্ত্ত বিভাগে ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম হ'তে চরম দিনটী পর্য্যন্ত জার্ম্মান্ স্থলবাহিনীতে সক্রিয় (active) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে উপস্থিত রাইন কমিশনে (Rhine Commission) আছেন। এই রাইন্ কমিশন হ'ল জার্ম্মেনীর প্রাণ-কেন্দ্র রাইন্ নদীর গতিবিধি এবং উন্নতির সহায়ক একটী দপ্তর। রাইন্ কমিশন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু শোনা এবং জানা ছিল, সুতরাং তাঁর পেশা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকল না।

আমাদের সম্বন্ধেও ভদ্রলোকের কিছু কৌতূহল ছিল—ভারতের কোথা হ'তে আসছি—নাম কি—কোথায় যাব—ইত্যাদি প্রাথমিক প্রশ্ন করলেন। বাংলা হ'তে আসছি এবং নাম "বোস্" (জার্ম্মান্ উচ্চারণে "বোজি" বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক নেতাজী সুভাষের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। নেতিবাচক উত্তর দিয়ে জানালাম "বোস্" পদবী বাংলা দেশে সাধারণ। ভদ্রলোক তা'তেও দম্‌বার পাত্র নন—ব'লে চল্‌লেন যে দেশ ও নামের পদবী যখন হের বোজির (নেতাজী) সঙ্গে এক, তখন আমাদের সম্বন্ধে তাঁ'র ধারণা অনেক উচ্চস্তরের ইত্যাদি। একটু গর্ব্বিত বোধ করলাম। অতঃপর তিনি জানালেন যে তিনি নেতাজীকে জার্ম্মেনীতে দেখেছেন—তাঁকে মার্চ্চ পাষ্ট (March past) স্যালুটও (salute) দিয়েছেন—তাঁর চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব ভুলবার নয়।

একটী ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌ল—তিন পেয়ালা কফি নেওয়া গেল—দাম বেশ দিতে হ'ল। ভদ্রলোক কিছুতেই দাম দিতে দেবেন না—বললেন "আপনারা এখন জার্ম্মেনীর অতিথি—বিশেষ ক'রে যখন হের বোজির দেশের লোক—অন্ততঃ ভারত-জার্ম্মান মৈত্রীর দিক দিয়ে দামটা আমাকেই দিতে দিন," ইত্যাদি। ভদ্রলোককে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছা হ'ল না—দামটা তিনিই দিলেন। এই রকম ভদ্রতা ইউরোপীয় কন্টিনেন্টেই সম্ভব—এ যেন পরকে একান্ত ভাবে আপন ক'রে নেওয়া। জিনিসটীকে সাধারণ দৃষ্টিতে এমন কিছু গুরুত্ব দেওয়ার মত হয়তো নেই কিন্তু চলার পথে এই রকম সামান্য ঘটনা মনকে অভিভূত ক'রে ফেলে। কফি খেতে খেতে হেরের সঙ্গে গল্পে মেতে গেলাম এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে বিদেশী এবং অপরিচিত ব'লে যেটুকু দ্বিধা সংকোচ এবং ভয় ছিল তা' যে কোথায় গেল তা' বুঝবার অবকাশ হ'ল না। গল্প যতই চলে ততই মনে হয় এ যেন বহুদিনের পরিচিত অতি প্রিয়জন।

খণ্ডিত জার্ম্মেনীর বিষয় উল্লেখ ক'রে হায়েন্‌রিখ্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মেনী পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার আশা আছে কি না। ভদ্রলোক দেখলাম এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। হের্ বললেন —"মাপ করবেন, আপনাদের দেশে বাংলা এবং পাঞ্জাব যে ভাগ হ'য়েছে তা'র কারণ অন্য রকম—এ ভাগ হ'ল ধর্ম্মগত। ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত মত এবং যেখানে ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব সেখানে মিল হওয়া মুস্কিল। তা' ছাড়া আমি বইতে যতদূর পড়েছি এবং ছবিতে যা দেখেছি তা'তে আপনাদের দুই ধর্ম্মের লোকের খাওয়াখাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদও অনেক অমিল। আমাদের দুই ভাগে ত সেই রকম কোনও ব্যবধান নেই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মেনী ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুর দিক দিয়ে এক। প্রত্যেক ভাগের লোকেদের বহু আত্মীয়-স্বজন অপর ভাগে

আছে। সকলের চেয়ে বড় কথা যে আমরা ত স্বেচ্ছায় বিভক্ত হই নি—বিজেতাদের ইচ্ছায় জোর ক'রে ভাগ করা হ'য়েছে। লোকেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেখানে দেশ ভাগ হয় সেখানে বিভক্ত দেশ বেশী দিন থাকতে পারে না—তা'দের এক হ'তেই হবে।"

ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে নিঃসন্দেহ—একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবুও আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি হেসে বললেন "আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" অতঃপর হের্ পকেট হ'তে দেশালাইএর বাক্স বা'র ক'রে কয়েকটা কাঠি নিয়ে টেবিলের ওপরে দু'টী সম চতুষ্কোণাকারে সাজিয়ে রেখে বল্লেন—

"এই দেখুন বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর অবস্থা—এটী হ'ল পশ্চিম জার্ম্মেনী, আর ওটা হ'ল পূর্ব্ব-জার্ম্মেনী—আর, এটী হ'ল দুটী বিভক্ত অংশের সংযোগ-স্থল।" বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম "গ" চিহ্নিত অংশটী বার্লিন কিনা। হের্ একটু হেঁসে উত্তর দিলেন "সে বিষয়ে কি সংশয় থাকতে পারে! বার্লিনকে বাদ দিয়ে জার্ম্মেনীর কথা ভাবতেও পারা যায় না। আপনি কি জানেন, এই বার্লিনের সংস্কার এবং পুনর্ব্বসতির জন্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে নানাপ্রকার সাহায্য, ট্যাক্স প্রভৃতি দিতে হচ্ছে আমাদের এমন কি প্রতি পোষ্টকার্ড, খাম বা পার্শ্বেলের ডাকমাশুল ছাড়া এক ফেনিং (Hfenning) ক'রে অতিরিক্ত ডাকটিকিট দিতে হয়।" এখনও অবশ্য এ বিষয়ে জানা ছিল না—পরে চিঠি লেখার সময়ে অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। এক ফেনিং আমাদের প্রায় এক পয়সার সমান। ভদ্রলোকের কথায় বিস্ময় বোধ করলাম। তিনি বলে চল্লেন "মূল জার্ম্মেনী এই দু'টী অংশে বিভক্ত হ'য়েছে বিজেতাদের খেয়ালে এবং এই দুই অংশে দু'টী বিভিন্ন রাজনীতি প্রবর্ত্তিত—তা'ও বিজেতাদের খুশীমত—দেশের লোকেদের ইচ্ছায় তা' হয় নি এবং এতে দেশের লোকের অনুমোদনও নেই। এখন যদি এই দুই অংশের লোকেরা চেষ্টা ক'রে এই পার্থক্যের বাধা সরিয়ে দেয় তা' হ'লে তাদের মিলন রোখে কে!" এই পর্য্যন্ত ব'লে ভদ্রলোক ১ ও ৭ নম্বরের কাঠি দুটী ঘুরিয়ে দিলেন যাতে ক'রে সমস্ত কাঠিগুলি মিলে বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান্ স্বস্তিকার আকার ধারণ করল। ঐ দুটী কাঠির স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চমকিত স্বরে ব'লে উঠ্লাম "ও তো, নাৎসি স্বস্তিকার প্রতীক!" "হাঁ—ঠিকই তা'ই। স্বস্তিকার অনুসরণ ক'রে আমাদের পতন হ'য়েছে—অন্ততঃ সকলে তা'ই বলে—স্বস্তিকার সম্মিলিত করার শক্তি ভিন্ন আমাদের উত্থানের কোনও দ্বিতীয় পথ নেই। স্বস্তিকার ক্ষমতা অসীম—এই স্বস্তিকাই আমাদের দুই অংশকে আবার মিলিয়ে দেবে—হয়তো তার প্রতীক অথবা প্রক্রিয়া অন্যরকমের হবে। হায়েন্‌রিখ্ সাহেবের কথা এবং বলার ভঙ্গী রোমাঞ্চকর। এ বিষয়ে আলোচনা করা সমীচিন কিনা ভাবছিলাম। তবুও সাহসে ভর ক'রে মন্তব্য করলাম, "কিন্তু নাৎসি নীতিরও মৃত্যু হ'য়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাৎসি নীতির প্রতীক স্বস্তিকাও সমাধিস্থ—সুতরাং আপনার এই প্রকার চিন্তাধারা ভিত্তিহীন মনে হয়।"

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে হের্ জবাব দিলেন, "আপনি বুঝি মনে করেছেন denazification এর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই রাতারাতি নাৎসি-নীতির বিরুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে! তা' ছাড়া ক' জন লোককেই বা denazification করা সম্ভব! সামান্য পাঁচ-ছ বছরের শিশুটী পর্য্যন্ত যে নাৎসি ছিল—কা'কে বাদ দেবেন! Denazification করতে হ'লে সমস্ত জার্ম্মান্ জাতিটাকে একেবারে ধ্বংস করতে হবে! অবস্থার ফেরে বা কার্য্যগতিকে পথ বদ্‌লে যেতে পারে কিন্তু মত বদলায় না।" ভদ্রলোকের কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—এ তো একেবারে অসম্ভাব্য ব'লে মনে হয় না, অন্ততঃ NATO চুক্তির পরে!

হের্ ব'লে চল্লেন, "আপনার কি মনে হয় এত বড় একটা জাতিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিরকাল এইভাবে বিপর্য্যস্ত ক'রে রাখা সম্ভব! দেশ ভাগ আমরা মেনে নিয়েছি সাময়িকভাবে—আর তা' ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল! কিন্তু তা' চরম সিদ্ধান্ত নয়। হয় তো আমার জীবনে আর সংযুক্ত জার্ম্মেনী দেখা হবে না, কিন্তু পরবর্ত্তী জার্ম্মানদের নিশ্চয়ই তা দেখার সৌভাগ্য হবে।" এই ব'লে তিনি গানের সুরে জার্ম্মান্ ভাষায় দু লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন এবং আমাদের ইংরাজীতে সংক্ষেপে শুধু বল্লেন "Germany will rise again"। তাঁর কণ্ঠে দেশপ্রেমিকের দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুরে ঐ দুলাইন শুনে দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা দু লাইন মনে পড়ল—

"যদিও মা তোর দিব্য আলোক ঢেকে আছে আজি আঁধার ঘোর—
কেটে যাবে মেঘ, নবীনা গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

অতঃপর হিট্‌লার জীবিত কিংবা মৃত—জীবিত থাকলে কোথায় এবং কি ভাবে থাকা সম্ভব কিংবা মৃত হ'লে কি ভাবে মৃত্যু হ'ল ইত্যাদি নিয়ে আলাপ সুরু করা গেল। বলা বাহুল্য, যুদ্ধোত্তর পর্ব্বে কয়েক বছর ধ'রে এ বিষয়ে এত রকম কথাবার্ত্তা, খবর প্রভৃতি শোনা গিয়েছে, তা'তে হিট্‌লারের পরিণতি আমাদের নেতাজীর মত রহস্যাবৃতই র'য়ে গিয়েছে—এ রহস্যের কোনও অকাট্য বা বিশ্বাসযোগ্য সমাধান আজও হয়নি। এ বিষয়ে আমাদের যা শোনা ছিল তা' হায়েন্‌রিখ সাহেবকে সমস্তই ব'ল্লে তাঁর দেশের লোকের এ বিষয়ে কি ধারণা জান্‌তে ইচ্ছা করলাম। ভদ্রলোক পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লে যেতে লাগলেন যে হিট্‌লারের চরিত্র বিচার ক'রে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে তাঁর মত লোক যুদ্ধের পরিণাম ফলের পরে বেঁচে থাকতে পারেন না। যুদ্ধের শেষ পর্ব্বে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচর-বান্ধব-হীন অবস্থায় তার মত লোকের মৃত্যু বরণ করে নেওয়াই উচিত এবং তা' অতি স্বাভাবিক। পরাজয়ের গ্লানির পরে বিজিত শক্তির বিচারের জন্যে হিট্‌লার বেঁচে থাকতে পারেন না।" প্রশ্ন করলাম, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে নিঃসন্দেহ কিন্তু হিট্‌লারের মৃত্যু তা' হ'লে হ'ল কোথায় এবং কি ভাবে?" হের্ উত্তর দিলেন, "যুদ্ধের শেষের কদিন হিট্‌লার ত চান্সেলারীতে ছিলেন চব্বিশ ঘণ্টা—অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। চান্সেলারীর ওপর বহু বোমা বর্ষণ হয়েছে—কয়েকবার

direct hitও হয়েছে। সুতরাং হিট্‌লারের মৃত্যু তাঁর প্রিয় স্থান চান্সেলারীতেই হ'য়েছে সে বিষয়ে আর দ্বি-মত হ'তে পারে না। চান্সেলারী রাশিয়ানরা দখল করার পরে অন্য কেউ ত সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি—সুতরাং আমার ধারণা যে ভ্রান্ত তা'ও বলা যায় না।" ভদ্রলোকের কথায় সায় দিয়ে বললাম যে আমাদেরও তাই মনে হয়—হিট্‌লার বেঁচে থাকতে পারেন না।

অতঃপর হিট্‌লারকে তাঁ'রা এখন কি চোখে দেখেন প্রশ্ন করতে তিনি চোখ বুজে একটু কি যেন ভাবলেন—তা'র পর বলে উঠলেন অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে—"দেখুন, হিট্‌লারের সময়ে আমরা তাঁকে একরকম পূজাই করতাম, কারণ, তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা। বিস্‌মার্কের (Bismarc) কথা ইতিহাস বলে—বিস্‌মার্ককে চোখে দেখিনি। তা'হ'লেও মনে হয় হিট্‌লারের মত দেশপ্রেমিক, জনপ্রিয় এবং সংগঠনশালী নেতা জার্ম্মেনীতে আর জন্মায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অত অল্প সময়ের মধ্যে জার্ম্মান্ জাতিকে আবার সর্ব্ববিষয়ে নিজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে তাঁ'র অবদান অসামান্য। তাঁকে ভোলা যায় না—কিন্তু তা'ই ব'লে এখনও যে আমরা হিট্‌লারকে পূজা করছি তা'ও ঠিক নয়—এখন আমাদের ও সকল কথা ভাববার সময় নেই। পাশা উল্টে গেছে। আমরা ভুলে যাইনে যে আমরা এখন পরাজিত জাতি—আমরা ভুলে যাইনে, আমাদের এখন বিজিত শক্তিপুঞ্জের Army of Occupationএর জন্যে মাসে মাসে কত কোটি মার্ক দণ্ড দিতে হচ্ছে। আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—বিশ্বশক্তিপুঞ্জের মধ্যে জার্ম্মেনী আবার যাতে নিজ আসন দখল করতে পারে তাই এখন আমাদের একমাত্র ধ্যান। আমরা জার্ম্মান্—আমরা বুঝি কাজ—ভাবপ্রবণতা আমাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব নয়। তা' ছাড়া হিট্‌লারকে ভুলব মনে করলেই কি ভোলা যায়! তাঁ'র কীর্ত্তিকলাপ যে চোখের সামনে থেকে দিবারাত্র মনে করিয়ে দেবে তাঁ'র কথা—যেমন ধরুন, রাইনের দু'ধারে এই যে হাজার মাইলব্যাপী সুন্দর রাস্তাগুলি—"ব'লে আঙুল দিয়ে রাইনের ওপারের রাস্তাটার দিকে দেখালেন। ট্রেণ চলেছে রাইনের পশ্চিম তীর দিয়ে—উভয় তীরেই নদীর ধার দিয়ে আছে রেলপথ—তা'র সাথে সাথে সমান্তরালভাবে চলেছে আধুনিক যানবাহনের উপযোগী মনোরম রাজপথ। জল, স্থল এবং রেলপথ—তিনটাই যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত—পরিবহনের এই রকম সুব্যবস্থা সত্যই অসাধারণ। ভদ্রলোকের কথা অতি সত্য—হিট্‌লারের অবসান হ'লেও হিট্‌লারের বহু কীর্ত্তির মধ্যে বহু হাজার মাইল বিস্তৃত এই প্রকার রাজপথ সত্যিই তাঁ'র কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এত রকমারি কথাবার্ত্তার মধ্যে নানা দেশের Army of Occupation সম্বন্ধে তাঁদের কি মনোভাব জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর দিলেন—আমেরিকান্‌দের সঙ্গে আমাদের বেশ খাপ খায়, কারণ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌এর জন্ম ত আর বেশী দিনের নয়! তা'র আগে উত্তর আমেরিকাতে ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতিদের মত জার্ম্মানও বহু ছিল। এখন যা'রা আমেরিকান্ ব'লে পরিচয় দেয় তা'দের অনেকে তিন-চার পুরুষ পূর্ব্বে বিশুদ্ধ জার্ম্মান্ ছিল—অনেকের এখনও জার্ম্মেনীতে নিকট আত্মীয়-স্বজনও আছে। সুতরাং আমেরিকান্‌দের সঙ্গে আমাদের এক রকমে মিলে যায়। ক্যানেডিয়ান্‌দের বেলাতেও ঠিক তা'ই কারণ ক্যানাডাতে এখনও পাঁচ লক্ষের মত জার্ম্মান্ বাস করে—যদিও তা'রা ক্যানেডিয়ান্ এবং ব্রিটিশ প্রজা তাহ'লেও আসলে তা'রা জার্ম্মান্ সুতরাং আমেরিকান্ অথবা ক্যানেডিয়ান্ সৈন্যদের নিয়ে আমাদের বিশেষ কোনও হাঙ্গামা পোহাতে হয় না—তা'রা আমাদের অবস্থা বুঝতে পারে—বিশেষ কোনও গোলমাল করে না। যত হাঙ্গামা আমাদের এই ফরাসী, ডাচ্ এবং বেলজিয়ন্‌দের নিয়ে। এই সকল জাতির সঙ্গে বনিবনা আমাদের কখনও ছিল না—হবেও না—এরাই আমাদের অশান্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা'দের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে করতে আমরা ধৈর্য্যের সীমানায় এসে পড়েছি।

সাহসে ভর ক'রে অতঃপর হের্‌কে কুখ্যাত Concentiation Camp ও সেখানকার নৃশংস কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "দেখুন, পরাজিত জাতির অশেষ দোষ। তা' ছাড়া আপনারা ত একদিকের খবরই রাখেন—ওপক্ষের ত কোনও সংবাদ আপনারা পেতে পারেন না—অপর পক্ষও যে এই জাতীয় দোষ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত তা' কোনও বুদ্ধিমান্ লোকে বিশ্বাস করবে না। আমি জার্ম্মেনীর দোষস্খালনের মনোভাব নিয়ে বলছিনে—নিরপেক্ষভাবেই বলছি—হয়তো আপনারা যা' জেনেছেন বা শুনেছেন তা'র অনেকখানিই ঠিক, কিন্তু জানেন তো রাজনীতি বা যুদ্ধনীতির মধ্যে মনুষ্যত্ব বা মানবতার কোনও স্থান নেই। চাকা যদি ঘুরে যেত তা' হলে আপনারা ঠিক বিপরীত খবরই হয়তো পেতেন—আমরা শুনতে বাধ্য।" উত্তর দেওয়ার কিছু ছিল না কারণ, প্রত্যেকটী কথা যুক্তিপূর্ণ। হয়তো কবির কথাই ঠিক—"তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ—আমি আজ চোর বটে।"

ট্রেণের গতি মন্থর হ'য়ে এলো—ম্যান্‌হাইম্ (Mannheim) ষ্টেশনটীর আলোর মালা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হায়েন্‌রিখ সাহেব এই ম্যান্‌হাইমে নেবে যাবেন। পোর্টফলিওটী খুলে কাগজপত্র রাখতে রাখতে জানালেন "এবার আমি নামব। আপনাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বকে ব'কেছি, কিছু মনে করবেন না। আশা করি পশ্চিম জার্ম্মেনীতে আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার অভাব হবে না এবং কোনও অসুবিধা বোধ করবেন না। আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে—আচ্ছা—শুভরাত্রি—বিদায়"—ব'লে হের্ করিডোরের দিকে চললেন। আমরাও তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে—ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জানিয়ে বললাম যে ফ্রাউ হায়েন্‌রিখকে আমাদের নমস্কার জানাবেন। হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক একটু যেন গম্ভীর হ'য়ে গেলেন—বিষাদ-করুণ হাসি মুখে বললেন, "ফ্রাউ-হায়েন্ রিখ! তা' যদি সম্ভব হ'ত! হায় ভগবান্!" একটু চমকিয়ে গেলাম—"কেন! আপনি ও কথা বলছেন কেন?" ব'লে তাঁ'র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে হের্ বললেন,

শুনবেন! তবে একটু বসি। হিটলারের পরিণতি যেমন রহস্যপূর্ণ, আমার স্ত্রী ও কন্যার অস্তিত্বও ঠিক তাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে পশ্চিম জার্ম্মেনীতে যুদ্ধ চল্‌ছিল ব'লে আমরা সবাই স্ত্রী, পরিবার পূর্ব্ব জার্ম্মেনীতে পাঠিয়ে দেই—অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব'লে। তা'র পর যুদ্ধ যখন পূর্ব্ব সীমান্তে সুরু হ'ল তখন দুই সীমান্তই বিপদজনক ছিল ব'লে তাঁ'রা সেখানেই র'য়ে গিয়েছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের চাকা যখন ঘুরে গেল তখন এই সকল পরিবার পূর্ব্ব সীমান্ত ত্যাগ ক'রে পশ্চিম জার্ম্মেনীর দিকে আসতে লাগলেন, কিন্তু আসেন কি করে! যান-বাহন নেই—যে, যেভাবে পেরেছেন, চেষ্টা ক'রেছেন যা'তে রাশিয়ানরা আমার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব জার্ম্মেনী ত্যাগ ক'রে চলে আসতে পারেন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—আমি যে সেনাদলে ছিলাম সে দলটীও পূর্ব্ব সীমান্তে ছিল। রাশিয়ানদের অগ্রগতি যতই প্রবল হ'য়ে ওঠে পূর্ব্বজার্ম্মেনীর লোকদের পশ্চিমদিকে চ'লে আসার তাড়াও তত প্রবল হয়। যাই হোক, আমার স্ত্রী ও আট বছরের একটি মেয়ে আসছিলেন পূর্ব্ব জার্ম্মেনী হ'তে পশ্চিম জার্ম্মেনীর দিকে। বোধ হয় সামরিক-অফিসরের পরিবার ব'লে তাঁ'রা একটী মিলিটারী ট্রাকে স্থান পেয়েছিলেন—কিন্তু এখন মনে হয় তাঁরা যদি মিলিটারী ট্রাকে না এসে হাঁটা পথে আসতেন! শেষ পর্য্যন্ত তাঁ'রা আর পশ্চিম জার্ম্মেনী এসে পৌঁছতে পারেননি। যতদূর সম্ভব খবর নিয়েছি—জানতে পেরেছি যে ঐ মিলিটারী ট্রাকের কন্‌ভয়ের (Convoy) ওপর রাশিয়ান্ বিমানবাহিনী হানা দেয়, তা'তে বহু ট্রাকই একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। তা'র কিছু পরেই বিজয়ী রাশিয়ান্ সেনা এসে পড়ে—পরিণাম জানিনে—ভাবতেও পারিনে। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁরা যেন মরে গিয়ে থাকেন। তাঁ'রা যে ঐ অবস্থার মধ্যে বেঁচেছিলেন তা' ভাব্‌লে আমি পাগলের মত হ'য়ে যাই। আপনারাই বলুন—ঐ রকম পরিস্থিতির মধ্যে কেউ কি ইচ্ছা করে যে তা'র স্ত্রী-কন্যা বেঁচে থাকুক, আর বিজয়ী সেনার অত্যাচারের আহুতি হোক্!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক থামলেন—বলার কিছু ছিল না। কয়েক সেকেণ্ড কামরার মধ্যে আবহাওয়া যেন থম্‌থমে হ'য়ে গেল। ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়ল মেঝের ওপর—তাড়াতাড়ি পা দিয়ে মুছে দিলেন। তাঁ'র এই মর্ম্মন্তুদ ব্যক্তিগত কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদেরও চোখ বাষ্পাকুল—আস্তে আস্তে বললাম, "এখন তো অবস্থা অনেক স্বাভাবিক হ'য়েছে—পূর্ব্ব জার্ম্মেনীতে খোঁজ করা যায় না!" মুখ নীচু ক'রে উত্তর দিলেন, "সে উপায় তো নেই—পূর্ব্ব জার্ম্মেনীতে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। তা' ছাড়া গভর্ণমেণ্টের মারফত্ এ বিষয়ে নতুন ক'রে খোঁজ নেওয়ার কিছু নেই।"

গার্ড সাহেবের বাঁশী বেজে উঠল। ভদ্রলোক নিদ্রোত্থিতের মত হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"যাক্ ও সকল কথা। মোট কথা এই যে আমার কেউই নেই উপস্থিত—কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও আমার সবই ছিল! এখন আমার একটা পাকাপাকি থাকার আস্তানাও নেই—আমার অবস্থা ঝটিকাবাত্যাবিক্ষুব্ধ তরণীর মত, আমি এখন কেবল কাজের উপলক্ষে ঘুরে বেড়াই—মন্দ নয়! শুভরাত্রি।" ব'লে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। আমরাও "শুভরাত্রি, বিদায়" জানিয়ে চলমান্ হায়েন্‌রিখ্ সাহেবের দিকে চেয়ে থাকলাম অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে। রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটে চল্‌ল ভয়েজ বুন্দেসবানের এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেন—যেন মহাকালের মত। কামরার মধ্যে আমরা মাত্র দুজন ভদ্রলোকের জন্যে সমবেদনায় হতবাক্। মনে হ'ল, এই তো জীবন!

দেবাশিস

শ্রীরঞ্জিতকুমার দেব

ব্যথার ভবনে দেখি আনন্দের কুসুম-বিকাশ,
সৃষ্টির চন্দনে লেপা কালো সর্বনাশ
শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে জাগে মুক্তির আশ্বাস,
ক্রন্দনের পঙ্কতলে হাসির প্রয়াস।
আঁধার-প্রাঙ্গণে মোরা দীপ্ত দীপ জ্বালি
মৃত্যুরে জড়ায়ে কত জীবনের নিত্য কোলাকুলি,
রাত্রির গুণ্ঠন ভেদি দিবস উড়িছে পাখামেলি,
বিরহ ব্যাপিয়া আছে মধুময় মিলনের ডালি।
অতীতের অন্ধকারে ভবিষ্যের অঙ্কুর গজায়,
মাটির প্রান্তরে আসি আকাশের বাণীটি লুটায়,
স্তব্ধতার জাল ছিঁড়ে শব্দের হাওয়ায়,
অস্তাচলে দিবাসূর্য্য উদয়ের বার্তা রেখে যায়।
ভোগের সাগর জলে ত্যাগের ঢেউ ওঠে জাগি
ধরণীর ধূলামাখা তোমার আশিস তাই মাগি।

বেকার

শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

ভোর পাঁচটায় নিয়ম মাফিক ঘুম ভাঙ্গে জেগে উঠি
কোন দাবী নেই মনের আড়ালে হতাশার জাগে ঢেউ—
চাকুরী নেই তো: ছিন্ন সে তারে সুর শুধু কেঁদে মরে
আমার জীবনে আলো নেই কোন ভালতো বাসেনা কেউ।
তোমাকে তো আমি অনেক খুঁজেছি পাইনিকো কোন ফল
তোমাকেই আমি মনেপ্রাণে শুধু চেয়েছি চিরটা কাল
আমার আকাশে সূর্য নেইতো ভস্ম যে পড়ে আছে
আমার কাননে পাখী ডাকে নাকো: নেই এক ফোঁটা জল।
তবুও তো আমি তোমাকেই খুঁজি যুগে যুগে অনিবার
সুনীল আকাশে হঠাৎ কখন যদি কিছু পেয়ে যাই
যদি পেয়ে যাই তোমার হাতের একটু পরশ ছোঁয়া
সুরের শ্রাবণে শুধু বেঁচে থাক জীবনের রোশনাই।
শূন্য পকেট: পেটে ভাত নেই: গৃহিণীর হাহাকার
রুক্ষ আকাশে বেজে ওঠে শুধু মৃত্যুর চীৎকার।

৯

াল দ্রুত বদলাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুত তার গতি। সে গতির র্থ স্পষ্ট হয় না সকলের কাছে—নিজের ছোট ঘরে—নের মধ্যে আপন কালকে ধরে রেখে তারা অস্বীকার রে বৃহৎ জীবনধারাকে। কালের অর্থ কি? কেমন ার রূপ? কোন দিকে বা তার গতি? এই জ্ঞান, দৃষ্টি । অনুভবশক্তি সাধারণের থাকে না। তারা বলে—াহা কি সোনার দিনই ছিল। আমরা ছেলেবেলায় াখেছি টাকায় আটসের দুধ, দু'টাকা মণ চাল—ঘি ড় টাকা সের, তরিতরকারি ওজনে বিক্রী হতো না—ার মাছ…দেহ পোষণের সুলভ উপকরণ ছাড়া এদের াছে কালের অন্যরূপ নাই।

আর দেখেছি মানুষ। প্রতিবেশীকে তারা ভালবাসত ত! আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়ে সেবা—পরের জন্য াণ উৎসর্গ করা। গাছের ফলটি হলে—পাড়ার পাঁচজনকে াগ করে দিয়ে খাওয়া—শুধু আপনাকে নিয়ে জগৎ য়—জগতের মধ্যে সবাই আছে এই জানি। মন-প্রসারে াল এখানে—কল্যাণ-বুদ্ধিতে প্রীতি-ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত।

দেব-দ্বিজে ভক্তি—অতিথি সেবা—ব্রতপালন—ভাগবত-থা শ্রবণ—মন্দির ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা—নিত্য গঙ্গাস্নান—পাল-র্ব্বণে কীর্ত্তন আনন্দ…লোকাচারের অংশ এখানেও ল্যাণের রূপে দেখা দিয়েছে—কিন্তু মন ছেড়ে বাইরে এর সার। আচারবিচারে শুচিতা-জ্ঞানই এই কালকে চ্ছুটা সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে, এখানে দেহের পরিশুদ্ধিতে মের বিচার।

বাইরের বহু ঘটনা—যা ইতিহাসের উপকরণ—রাজ্য-জ্য রাজসিংহাসন—যুদ্ধ বিপ্লব ধ্বংস—ধর্ম্মোন্মাদনা—মোর্গ—যা ক্ষুদ্র সংসার, যা গ্রাম শহর ছাড়িয়ে সমগ্র দেশকে নাড়া দেয়—যার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুভূত—সে ক্রিয়াও কালের। এখানে কালের আবির্ভাব আকস্মিক বলেই যুগ পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

কিন্তু আসলে কালের অর্থ পরিস্ফুট হয় না—রূপ চিহ্নে তাকে চিহ্নিত করা কঠিন—তার গতির দিক্‌নির্ণয় করাও সহজসাধ্য নয়। এসব চলে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে—যেমন অলক্ষ্যে ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটে—অলক্ষ্যে আসে কৌমার যৌবন জরা। এক কালের প্রথা-নিয়ম অন্য কালে তেমনি অলক্ষিতে আসে। যখন পরিবর্ত্তনটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অমনি সে আক্ষেপ করে—আহা কি সোনার দিনই ছিল আগে!

এই বাড়ীতেও আক্ষেপোক্তি সরবে বিঘোষিত হয়—ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর মুখে, কেষ্টর মায়ের মুখে—মঙ্গলা বাড়ী-উলির মুখে।

কেষ্টর মা বলেন, ছেলেরা ধিঙ্গিপনা করে—শোভা পায় —কিন্তু মেয়েদের হলক-নাচুনি ভাল লাগে না। ছেলে-বেলায় মেয়ে আদর করে ছড়া বলতাম :—

ধেয়ে নাচুনি কাঁথা কাচুনি।

এখনকার মেয়েরাও হয়েছে তাই।

পুরুত-গিন্নী বলেন, এযে ঘোর কলিকাল—না হলে নিজেরা দশ হাতে উপায় করছে—হাঁসের গুষ্ঠী পেট পুরে ভালমন্দ খাচ্ছে। খালি ঠাকুর দেবতাকে দিতে হলেই যত সব্বোনাশ। বলে যার দৌলতে এত লপর চপর—তাকেই দেখাচ্ছ ভূ? কতো সইবে ধম্মে!

মঙ্গলা বাড়ী-উলি বলে, ধম্ম যে চোখের মাথা খেয়েছে —না হলে—চার মাস ছ'মাসের ভাড়া মেরে দিয়ে রাতারাতি

সরে পড়ছে। পড়তো অন্য বাড়ীওয়ালার ঠেলায় তো বুঝতো—কত ধানে কত চাল!

পুরুত-গিন্নী বলেন, সত্যি বলব মাসী—তোমারও আস্কারা আছে। বাড়ীর মধ্যে থ্যামটা নাচ বসালে—টুঁ শব্দটি কাড়লে না তুমি।

ভাড়া বাড়ী—আমার কি ক্ষ্যামতা আছে বল তো মা। আমার কাছে সবাই সমান—তুমিও সে—ওরাও সে। একটু গান বাজনা শেখা—এতো সব ঘরেই আছে। তাতে কার কি বলবার আছে বল? হতো রাতবিরেতে—আইন দেখিয়ে বন্ধ করে দিতাম।

আর সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরের আরতি জলপানের সময় গানের র‍্যালা উঠোলে কারও বুঝি অসুবিধে হয় না। ঠাকুর না হয় মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু আখেরে কি ভাল হ'বে?

—ঠিক সন্ধ্যার আগেই যতীন আসে। রোজ নয়—সপ্তাহে মাত্র তিনটি দিন—তু' এক ঘণ্টার জন্য। রবিবার ছুটির দিন বলে আসে না—শনিবারেও নয়। কোন কোন দিন তিন দিনের যতিও ভঙ্গ হয়। মেয়েরা মনোক্ষুণ্ণ হয়ে মাকে অনুযোগ করে—বাবাকে বলে মাইনের ব্যবস্থাটা ঠিক করে নাও মা, না হলে গা ঢালা শিক্ষায় কি ছাই শিখব!

সেন গিন্নী বলেন, মাইনে দিলেই যতীন আমাদের বাধ্য হয়ে যাবে? ওর অভাব কিসের শুনি? ও দয়া করে আসে এই ঢের—তারপর বেশী টানতে গিয়ে না ছিঁড়ে যায়।

মীরা বলে, মাষ্টারের যেন অভাব শহরে! একজন যাবে—দশজন আসবে।

আসবে না কেন—কিন্তু অন্দরমহলে যাকে তাকে তো ঢুকতে দিতে পারি না। একটু থেমে বলেন, গান শেখার চলন হয়েছে আজকাল, তাই—না হলে আমাদের মত গেরস্ত ঘরে—

মীরা ফোঁস করে ওঠে, আমাদের মত গেরস্ত ঘরে মেয়েরা ভাল জামা কাপড় পরে না—স্নো পাউডার মাখে না, সিনেমাতে যায় না, গান গায় না—খালি ঘরে বসে বসে রাঁধে আর কাপড় সেলাই করে।

তাই বললাম আমি। বলে: যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমি কোথায় বাজনা কিনে দিলাম তোরা গান শিখবি বলে—

ইরা বললে, চুপ কর মীরা।—আমরা কেন বলছি জান? উনি এমন গোড়া থেকে আরম্ভ করেছেন—যাতে করে ছ'মাসেও একখানা গান শিখতে পারব কিনা সন্দেহ। বলেন—সারেগাম সাধা হয়ে আগে সুর গলায় বসুক—তারপর গান শেখাব।

কি জানি বাবু গানের আমরা কী-ই বা বুঝি! আচ্ছা রমাকে একবার জিগ্‌গেস করিস তো—চলনসই থান কতক গান শিখতে কদ্দিন যায়!

রমাদি কি কালোয়াত, তাই বলবে! আচ্ছা—আমরা মাষ্টার মশাইকে বলবো।

—পরের দিন যতীন একটু সকালেই এল। তখন মীরা, ইরা কলতলায় গা ধুতে গেছে—তারপর প্রসাধন সেরে ওরা গানের স্বরলিপি নিয়ে বসবে।

সেন গিন্নী বললেন, আজ সকালেই এসেছ বাবা—কোথাও যাবে বুঝি বিকেলে?

না কাকীমা—এবার থেকে মনে করছি কিছু আগেই আসব—ওদের যাতে প্রোগ্রেস হয়—সেই জন্যেই—

বেশ—বেশ—তুমি বসো বাবা—কাপড় কেচেই ওরা আস্‌বে।—এই যে কমলা—ওরে শোন না রে কমলা একটু এখানে—তোর দাদার সঙ্গে গল্প কর—তোর দিদিরা এখুনই এল বলে।

কমলার পানে চেয়ে যতীন মুগ্ধ হয়ে গেল। এ যেন বিদ্যাপতির সেই কৈশোর যৌবন তুঁহু মিলি গেলা। নদী এসে পড়েছে সমুদ্রের মোহানায়।···প্রসার বাড়ছে—বেগ বাড়ছে তরঙ্গের লীলা হয়ে উঠছে বিচিত্র। ধবধবে সাদা রংয়ে—ঈষৎ লাল আভা—চমৎকার গড়ন—সুন্দর মুখশ্রী। কালো চুলের গোছা পিছনে পড়েছে এলিয়ে—ছোট্ট মুখখানিতে সেই কৃষ্ণশ্রীর মধুর আভাস। ছোট্ট একখানি মুখ—চোখ কান নাক কপাল, প্রত্যেকটির সৌন্দর্য্যে হয়তো যথেষ্ট খুঁত রয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে মুখখানি চমৎকার। আয়ত চোখের সরল দৃষ্টি আর ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠ প্রাণ-সৌন্দর্য্য বহন করছে বলেই মেয়েটি বুঝি অসামান্য। অথচ কি সামান্য পোষাকে ও সামনে এল।

তোমার নাম কি—?

কমলা।

সংক্ষিপ্ত—সুষ্ঠু উচ্চারণ। আদি অন্তে বিশেষণের আড়ম্বর নাই।

তোমরা কবে এসেছ এখানে?—কোন গ্রামে তোমাদের বাড়ী?

একে একে সবই জেনে নিলে যতীন।—

গান শিখবে?

না।—ঘাড় নেড়ে কমলা জবাব দিলে।

না—কেন? আমি যদি শেখাই তোমায়—

মাকে জিজ্ঞাসা করে বলব।

ওহো—তুমি যে বালিকা তা ভুলেই গিয়েছিলাম। যতীন পরিহাসের হাসি হাসল।

কমলা অবাক হয়ে বললে, আপনি হাসলেন যে।

এমনি। তোমাকে গান শেখাব আমি—চল তোমার মাকে বলিগে।

বলা আর হল না—প্রসাধনান্তে মীরা ইরা ঘরে ঢুকে বললে, খুব খানিকটা দেরী হয়ে গেল মাষ্টারমশাই। ওহো—কমলার সঙ্গে দিব্যি জমিয়েছেন তো।

ওকে গান শেখাব বলছি—ও বলছে, না। বলে—মাকে জিগ্‌গেস করে বলব।

—হাঁ—ওঁরা খানিকটা পিউরিটান—সেদিন যে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সিনেমায়। বলে খিল খিল করে হেসে উঠল দু'জনে।

কমলা এক পা এক পা করে দুয়ারের দিকে এগোচ্ছিল—যতীন বললে, পালিও না—আজ তোমাকে সারে গাম শেখাবো। বোস।

বস—মাষ্টারমশায় বলছেন।—ইরা আদেশের ভঙ্গীতে বললে।

—গানের আসরে বসে সব ভুলে গেল কমলা। মায়ের কাজে সাহায্য করা—নীচে থেকে কুঁজো ভর্ত্তি করে খাবার জল আনা, মেলা কাপড় তুলে নিয়ে আসা ছাদ থেকে—ঘুঁটে কয়লা কেরোসিন কুপি রান্নার জায়গায় দিয়ে আসা—বাবা আপিস থেকে এসে বিশ্রাম করবেন—তার জন্য মাদুর পেতে রাখা—সব ভুলে গেল। ভগবতী দু'বার উঁকি মেরে দেখে গেলেন। মন ওঁর প্রসন্ন হ'ল। আহা—দু'দণ্ড খেলতে পায় না মেয়েটী—সংসারের এটা ওটা ফায় ফরমাস খাটছেই। বসুক একটু সুস্থির হয়ে—যে গান মানুষের শোক ভুলিয়ে দেয় তারই আশ্রয়ে মেয়েটা প্রাণ খুলে একটু হাসুক—আমোদ করুক। ওর সঙ্গী সাথী নেই—খেলাঘর নেই—পড়াশোনার সুযোগই বা কই এখন থেকে সংসার যদি জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে বুকে—মেয়েটী যে দম আটকে মরে যাবে!

যতীন যাবার সময়ে বললে, সুন্দর গলা তোমার—তুমি গান শিখে ফেল। কাল আসবে—আমি বলব তোমার মাকে।

মীরা ইরা খুসী হয়ে বললো, আমরা কাকীমাকে বলে রাখব'খন!

১০

গানের আসরে আর একটি প্রাণী যোগ দিয়েছে—সকলের অগোচরে।…এ ঘরে যখন সুর-সাধনার আসর বসে—সে তার কাজকর্ম্ম সেরে তারই মাঝখানটিতে চলে আসে। উপস্থিতি তার শরীরী নয়। তার কর্ম্মেন্দ্রিয় অভ্যাসবশতঃ প্রাত্যহিক কাজ সেরে চলে—মন সুর-সৃষ্টির জগতে নিজেকে নূতন করে চেনা-জানার আয়োজন করে। সাধনার অবকাশ সে কোনদিন পায়নি। তার ভুবনে সুর-সৃষ্টির তাগিদ কি কারণে এসেছিল—সে জানে, কিন্তু সেইটেই তো আসল হেতু নয়।—হেতুকে ছাপিয়ে প্রাণ জেগে উঠেছিল—সুরের মোহ রচনা করে—তাকে টেনেছিল গভীরে।…মাষ্টার রাখার সঙ্গতি তার ছিল না—তাই নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করেছে—সস্তা সহজ চটকদার কথা আর সুর। তারপর ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ল—সুর সাধনার অন্তর্নিহিত অর্থ,—সুরের রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন বরণ করে নিলে সে। কিন্তু…এ এক অভিনব রাজ্য, যার সম্পদ নিঃশেষিত হলেও—গৌরব-রশ্মি ম্লান হয়ে পড়ে না—বরং তা দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়। রমা বুঝলে সে ভুল করেছে— ; জীবনের মাঝে সুন্দরের তৃষ্ণাকে—কঠিন হয়েও নিঃশেষ করা সম্ভব নয়।

আর স্বর মাধুর্য্য? সুর সপ্তকে আরোহণ অবরোহণ কালে কি আশ্চর্য্য ভাবে তা বিকশিত হয়। একটি শঙ্খের ধ্বনিতে সমুদ্রের মূর্ত্তি যদি প্রকটিত হয়—কণ্ঠের ধ্বনিতে কেন মানুষটিকে জানা যাবে না? মানুষ দূরের—হলেও ধ্যানের হতে ক্ষতি কি! বরং এইটেই তো

স্বাভাবিক।···যে কাছে আসে না—তার বাসা অন্তরে, যে কাছে আছে—তার মূর্ত্তির চারিধারে ঘন কুয়াশা জাল। ···চোখের দৃষ্টি মানুষকে নানা দিকের ঐশ্বর্য্যে বিভ্রান্ত করে—কিন্তু মনের লক্ষ্য···এক গভীর সাধনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে।···ও ঘরের সুর ধ্বনি—এ ঘরের কাজের উপর বাধা সৃষ্টি করে না—কাজের পারিপাট্যে কিছুটা ব্যাঘাত জন্মায়।···মনের রাজ্যে—মানুষটি তখন অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে।

—কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্যও হল যতীনকে। ···ঠিক—ঠিক। দূরের রাজপুত বুঝি ধূলির রাজত্বে নেমে এল। সুরে ও সৌন্দর্য্যে অনুপম সে মূর্ত্তি। সরু সিঁড়ির—দু'প্রান্তে দু'জন। মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা। উপরে উঠে পালাবার পথ তার খোলাই রয়েছে—সে যেন তা ভুলেই গেছে। অভাবিত সাক্ষাতে সে বেপথুমতী।—লক্ষ্য করে যতীন বললে—আপনি নামুন—আমি সরে যাচ্ছি।

কোথায় সরে যাবে যতীন? যেন আরও কাছে এল। বর্ষার নীল কেশরের শিহরণ লক্ষ্য করেছে যতীন—অস্ত সূর্য্যের রক্তিমাভা?···এ শহরে কোথায় নীলতরু—অট্টালিকা অরণ্যের মাঝে সূর্য্যাস্ত-শোভা কে দেখেছে?

রমা নত মুখে সিঁড়ি বয়ে নেমে এল। এক পাশে দাঁড়িয়েছিল যতীন—তার কাছ দিয়েই চলে গেল পাশের ঘরে। যতীন আর সে দিকে ফিরে চাইল না—সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কি কথা হচ্ছিল এদের গানের মাষ্টারের সঙ্গে? উমা-দেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

কথা! বিস্মিত হল রমা।

না হলে—চায়ের কৌটা আনতে এত দেরী হল! গানের মাষ্টার এই মাত্তর ওপরে উঠেছিল—আবার নেমে এল কিনা!

···শিথিল রসনাকে সংযত করাবার ক্ষমতা রমার জানা নাই।···মানুষের জিভের ধার কত যে তীক্ষ্ণ—তা সে জানে, সে যে কারোর চেষ্টা সত্ত্বেও···পাত্রলাভ করতে পারলে না, সে দোষ কি সম্পূর্ণরূপে তারই? ভগবান যাদের বিত্ত দেন না—রূপে কেন পূরণ করে দেন না সে অভাব?—কিংবা বিদ্যা গ্রহণের সুযোগ দেন না তাদের—যাতে করে··· পরের গঞ্জনার ওপর নির্ভর করতে না হয়? কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য রূপহীনার মনে—সাজনৃত্যের সঙ্গ-সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানে—বিত্তহীনাও চায়···মনের সম্পদ দিয়ে··· সর্ব্ব অভাব পূরণ করতেন। উমাদেবীর কথার কোন উত্তর দিলে না সে।

সিঁড়ি যেন তার তীর্থক্ষেত্র হয়ে রইল। তা সংকীর্ণ সীমায়···একটু পুষ্পসার সুরভি ক্ষণকালের জন্যই বন্দী হয়েছিল, সম্ভ্রমপূর্ণ···উষ্ণ সম্বোধন—যেন প্রাণ-কোরকে উত্তাপ সঞ্চার করে তাকে পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ এনে দিল। ···পাশের ঘরে তারই হারমোনিয়ামে···কণ্ঠের সাধনা চলেছে—

একটি মেয়েকে দেখলাম সিঁড়ির মুখে—মুখখানি তার ···বিষণ্ণ! যতীন বললে।

মীরা বললে, আহা—ওর কথা আর বলবেন না।

মেয়েটির দুঃখ খুব।

ইরা বললে, জানেন মাষ্টার মশাই—এই হারমোনিয়ামটা ওরই ছিল।

তাই নাকি?—মেয়েটি তাহলে গাইতে জানে ভাল।

ভাল না ছাই—খালি সিনেমার গান।

ও—তাই প্রায়ই শুনতে পেতাম—। কি ভেবে যতীন কথার জের টান্‌লে না। ওর সামনে বেপথুমতী ম্লানমুখী মেয়ে—; সে মেয়ে রূপবতী নয়।

এস—আজ সারে গাম সেধে শোনাও তো—কেমন প্রোগ্রেস করলে দেখি। কমলাকে দেখছি না?

হয়তো মায়ের কাজে সাহায্য করছে। ডাকব?

না, থাক। আজ একটি গান তোমাদের দিয়ে যাব—ভাল করে গাইবার চেষ্টা করবে।

···চলে যাবার সময় যতীনের বার বার মনে হল—মেয়েটি সুর-সাধনার-যন্ত্রটি···হস্তান্তর করলো কেন!···

বাড়ীর বাইরে এসে—উপর পানে চাইলে যতীন। ছাদের আলিসায় ভর দিয়ে কে যেন আকাশের পানে চেয়ে কি ভাবছে। সেই মেয়েটি না? ঠিকই তো। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটি যে অত্যন্ত পরিচিত। শুধু আজ নয়—আরও বহুদিন—নিজের বাড়ীর জানালা থেকে ওকে লক্ষ্য করেছে যতীন।···মনে ওর কৌতূহল জেগেছে—নারী সম্বন্ধে পুরুষের মনে যে ধরণের কৌতূহল জাগে।··· এম-এ

ক্লাসের ছেলে—বাপের নাম-ডাক ও অর্থখ্যাতিও আছে: কলেজে কিংবা সমাজে ওর মেয়ে বন্ধুর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। অন্তরঙ্গতা তেমন জমেনি কারও সঙ্গে, মেয়েদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে না যতীন।...

তর্কের উত্তরে বলত, সহজ লভ্য জিনিসে আমার শ্রদ্ধা কম।

তাহলে মেয়েদের বর্জ্জন করে চলতে চাও?

তা কেন—। প্রতিদিন খাই কিন্তু সহজলভ্য বলে ভাত আমাদের পরিত্যাজ্য নয়। জীবনের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন—তাকে গ্রহণ করা স্বভাব ধর্ম্ম, গ্রহণ না করা মূঢ়তা। তার ওপর অহেতুক অনুরাগ প্রকাশ ভাল লাগে না।

ধর কোন মেয়েকে ভালবাসলে,—তাকে পাবার চেষ্টা তাহলে মূঢ়তা?

তাকে পাবার আগে যে সব কাণ্ড করে বসি আমরা—তা মূঢ়তারই নামান্তর বৈকি! কাব্য নাটকে এই নির্ব্বোধ প্রকাশে শুধু কৌতুক বোধ করি।

—কন্যাভারগ্রস্ত বাবা-মায়েরা যতীনের আশা ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু এই মেয়েটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে বহুবার ও দেখেছে। মেয়েটির নির্নিমেষ দৃষ্টি কখনো আকাশে—কখনও ওর জানালায়। তার-সন্ধানী চোখের তারায় কি অসীম কৌতূহল—এক মধুর স্বপ্ন বহন করে মেয়েটি—জানে না। দূর থেকে শুধু মনে হয়েছে—পৃথিবীতে থেকেও মেয়েটি যেন উর্দ্ধলোকের। ওর আকাঙ্ক্ষা আকাশ-বিহার সেরে মাটি পরিক্রমা করে নিত্য—গোধূলি আলোর আধ-রহস্য আবরণে নিজেকে সযত্নে ঢেকে রাখতে চায়।...সুরও কদাচিত কানে এসেছে।—গলার দরদ আছে,—গানের নির্ব্বাচন চমৎকার। তবু কি যেন কোথায় নাই, ওকে নিয়ে সর্ব্বক্ষণ চিন্তাও অসহ্য। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলে—ছুটি উৎসুক নয়নের দৃষ্টি—বিস্ময় কৌতূহলের সৃষ্টি করে সত্য—কিন্তু সারাদিনের পক্ষে সে কতটুকু? সমগ্র জীবনের তুলনায়?

অবশেষে—মেয়েটির সুর সাধনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পেলে।—ইরাকে বললে, তোমাদের রমাদির গলা ভাল—সঙ্গীতের সময় জ্ঞান কম।

ইরা বললে, সঙ্গীতের সময় জ্ঞান? সে আবার কি?

যতীন বললে, সকালে যেমন ইমনের আলাপ মানায় না, দুপুরে তেমনি ভৈরবী। তা ছাড়া—এস কিঞ্চিৎ রাগ পরিচয় করিয়ে দেই। আচ্ছা বলত—ভৈরবীতে—কি কি কোমল পরদা লাগে? রে, গা, ধা, নি।—এখানে মধ্যম বাদী।

মীরা ইরা...অবাক হয়ে এই তত্ত্ব শুনতে লাগল।—কোথায় পরদা টিপে—কয়েকখানা গান গলায় তুলে নেবে—না এই সব দুরূহ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবার চেষ্টা।

ইরা বললে, কাল যে গানখানা দিয়ে গেলেন—দেখুন দেখি—ঠিক মত গলায় বসেছে কি না!

ও—আচ্ছা গাও। যতীন সম্পূর্ণ বাহ্য জগতে ফিরে এল। ভাবলে সহসা সঙ্গীত সম্বন্ধে এই তত্ত্ব উপদেশ কেন দিতে গেল সে? যার ভুল শুধরে দেবার জন্য ওর উপদেশ—সে কি নিকটেই রয়েছে?

সিঁড়িতে নামবার সময়—একেবারে মাঝপথে রমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। অন্যমনস্ক যতীন...হঠাৎ চমকে উঠল। এই অশোভন মুহূর্ত্তকে সহজ করে নেবার চেষ্টায় বললে, এইমাত্র আপনার আলাপ কিছু কানে গেল, যদি কিছু মনে না করেন—দু'একটি কথা বলব।

রমা মাথা নীচু করে রইল।

আচ্ছা—কাল একবার আসবেন—মীরা ইরাদের ঘরে।

না। মাথা নাড়লে রমা।

কেন? যতীনের স্বরে প্রচুর বিস্ময়। আপনি কি ভাল করে গান শিখতে চান না?

মাথা নাড়লে রমা। যতীন কি বোঝে না—ইচ্ছা থাকলেও এই সুযোগ ক'টি মেয়ের ভাগ্যে ঘটে! সামান্য গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা কেন গান শেখার চেষ্টা করে—সেও কি বোঝে না যতীন?

রমার সারাদেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল। যতীনও বুঝলে—এইভাবে সিঁড়ির মধ্যে আলাপ চালানো যুক্তিযুক্ত নয়। পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি সে নেমে গেল। যাবার সময় বললে, আচ্ছা—নমস্কার, আর একদিন এ সম্বন্ধে কথা বলব।

সঙ্কীর্ণ সিঁড়িতে যতক্ষণ পুষ্পসার সুরভি লেগে রইল কণ্ঠের সুর ও পায়ের ধ্বনি জেগে রইল—রমা হতচেতনের

মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এই জগৎ সম্পূর্ণ নূতন তার কাছে—একান্ত অভাবিত।

কি লো—কাঠের মত দাঁড়িয়ে কেন এখানে? কার যেন গলা শুনলাম না?···পুরুত-গিন্নি পিতলের বাসন নিয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করলেন।

রমা কোন উত্তর না দিয়ে উপরে উঠে গেল।

মরণ—, অত অহঙ্কার ভাল নয়। দেবতা বামুনে ভক্তি-ছেদ্দা নেই বলেই তো থুবড়ো হয়ে রয়েছিস এতকাল!

কে গো—বামুনদিদি—কার কথা বলছ?

ওই রমার কথা। কার সঙ্গে ফুসুর ফাসুর করে কথা কচ্ছিল সিঁড়িতে—আমি আসতেই—চুপ।

সে লোকটি কে গো?

যম জানে কে! বলি—কাঠ খেলে আংরা বার হয়—এ বুঝি কেউ জানে না—, ধম্মের ঢাক একদিন আপনিই বেজে ওঠে—। দুম দুম করে পা ফেলে কলতলায় নামলেন তিনি।

সন্ধ্যার মুখে কথাটা পল্লবিত হয়ে সব ঘরেই পৌছল। সেনদিদি বললেন, ওদের ওই ধারা।—রাজ্যি শুদ্ধু সবাইকে সন্দেহ। মেয়ে দুটোকে গান শিখতে দিয়েছি—সর্ব্বক্ষণই ভেবে মরি। জিবের আগায় বিষ থাকলেই ছোবল মারবে—এ আর বেশী কথা কি!

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে "খাম্বাজ-রাগের" স্থান

শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় সংগীতরত্ন

সভ্যতার ইতিহাসে প্রত্যেক জাতিরই এক একটা বিভিন্ন সঙ্গীতের ধারা বর্ত্তমান এবং তার সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সভ্যতার মানের ওপরই নির্ভর করে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ভাণ্ডারে প্রাচীন জাতিপুঞ্জের মধ্যে সব চাইতে উন্নত এবং সভ্য যথা ভারতবর্ষীয়, মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, ব্যাবিলনীয় ইত্যাদি, জাতীয় সঙ্গীতের অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে ফিনিশীয় এশিরীয় ইত্যাদি জাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য হলেও পণ্ডিতদের মতে তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল।

স্যার্ উইলিয়াম জোন্স এর মতে ভারতবর্ষীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তার স্বদেশীয় সঙ্গীতের তুলনায় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিক সত্য মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই রাগসঙ্গীত আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এখানে বলা প্রয়োজন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বলতে বিদেশীর নিকট আজ উচ্চাঙ্গ বা রাগসঙ্গীতই বোঝায়।

'য়ুরোপীয় অনায়াসসাধ্য কবিতা, আবৃত্তিধর্ম্মী গান এবং স্বরান্ত কম্পন, যার অন্ধ অনুকরণ—আজ আমরা আধুনিক নিত্য নূতন বাংলা বা হিন্দী গানে দেখতে পাই এবং যার আয়ু দীর্ঘস্থায়ীও নয়, তার প্লাবন গানের-কবিতার ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে যেন আজ সমস্ত এশিয়া খণ্ড থেকে তা ধুয়েমুছে যেতে বসেছে। প্রতীচ্য জগতেও তার বিশেষ কোন স্থান আছে এমন মনে করবারও কোনও হেতু নেই।

ভারতীয় সঙ্গীতে "খাম্বাজ"রাগের স্থান অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, "রাগ" বলতে একটা বিশেষ সুর বোঝায়। এই রাগ বা সুর উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে খামাজ ঠাট বা "স্কেল্"এর অন্তর্গত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে হরিকাম্বোজী ঠাটের অন্তর্গত। "অভিনব-রাগমঞ্জরী"কারের মতে :

নিশৌ গমৌ পনি সধ সনি ধম পধ মগ,
খামাজো গাংশকো নিত্যং দ্বিতীয়প্রহরে নিশি।"

অর্থাৎ এই রাগে নি কোমল এবং বাকী সব স্বরশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। "গান্ধার" স্বর এর মহত্ত্ব সব চাইতে বেশী হওয়ার দরুণ তাকে "বাদী" করা হয়েছে এবং "নিষাদের" "সম্বাদী" করা হয়েছে। আরোহণে "রেখাব" স্বরকে বর্জ্জন করে "জাতি" ষাড়ব-সম্পূর্ণ করা হয়েছে। নিধ, ম পধ মগ এই কয়টি "পাকড়"-স্বরের মধ্যেই "খাম্বাজরাগ" পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরে এই রাগের সুরের এবং কথার ব্যাকুল মিনতিতে প্রত্যেক শ্রোতাই ব্যক্তিগত স্মৃতির আলোড়নে বিচলিত হন্ এবং চোখ তাঁদের আপনা আপনিই মুদে আসে।

শত শত বৎসর পূর্ব্বেও যে সুর যে কথা "পরদেশবা জিনা যাইওরে" গাওয়া হত সেদিনও যেমন শত শত মানুষেরও প্রণয়ী প্রণয়িণীর মনে সান্ত্বনা যোগাত আজও ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয় ক্ষতি এবং কালের ব্যবধানকে তুচ্ছ করে কালজয়ী অমরত্ব লাভ করে সান্ত্বনা যোগাচ্ছে এবং চিরদিন এমনি যোগাবে।

খাম্বাজ ঠাট থেকে খাম্বাজ ছাড়াও ঝিঞ্ঝ্‌টি, সোরটি, দেশ, খাম্বাবতী, দুর্গা, রাগেশ্বরী, তিলং জয়াবন্তী, গারা, তিলককামোদ এই দশটী রাগের সৃষ্টি হয়েছে—

"খামাজশ্চাথ ঝিঞ্ঝুটী সোরটী দেশ নামকঃ
খাম্বাবতী তথা দুর্গা রাগেশ্বরী তিলংগিকা
জয়াবন্তী তথা গারা কামোদস্তিলকাদ্যকঃ
একাদশ মতা রাগাঃ খমাজাভিধমেলনে।"

অভিনবরাগমঞ্জরী।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র সংগীতে এই রাগের ছায়া প্রায় প্রতি ছবিতেই দৃষ্ট হয় এবং আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত যা রাগসংগীত ভেঙেই তৈরী হয়েছে তা'তেও এ সুর প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়।

যাত্রা এবং "গ্রামোফোন" সংগীতের ইতিহাস রাগসংগীতেরই ইতিহাস এবং প্রণয় সংগীতের আবেদন নরনারীর নিকট বেশী হওয়ার দরুণ খাম্বাজ এখানেও খুব প্রসার লাভ করেছে।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় উপরোক্ত গান বস্তুতঃ কেবল কবিতার আবৃত্তিমাত্র হওয়াতে এবং বাঁধাধরা স্বরলিপি অনুযায়ী প্রতিবারই প্রত্যেক গান একই সুরে গাওয়াতে এবং "খেয়াল" গানের মত সৃষ্টিধর্মী ও তান-আলাপে নিত্য নতুন না হওয়াতে কয়েকবার শোনার পর তা'তে আর কোন বৈচিত্র্য থাকে না, নুতনত্বও থাকে না। তারপর পুরাণ ও অচল গান বলে আর কেউ শোনে না, গায়কের গাইতেও ভালো লাগে না। এমনি ভাবে নিত্য নুতন গান তৈরী হয়। গাওয়া হয় তারপর পুরাণ হয়ে যায়। কয়েকবার যেমন একই কবিতা শোনার পর কবিতা পুরাণ হয়ে যায়। তবে যদি কবিতার সাহিত্যিক মূল্য থাকে তবে কবিতা অমরত্ব লাভ করতে পারে কিন্তু সুর টিকবে না, সংগীত জগতে তার কোন দামই নেই। তাকে সাহিত্যের ছাত্রদের য়ুনিভার্সিটীতে সাহিত্যের ক্লাসে পড়ান যেতে পারে কিন্তু ঘটা করে শেখান বা সংগীত কলেজে কিংবা প্রতিষ্ঠানে শেখান যায় না এবং সে-শিক্ষার কোনও মানেও হয় না; কারণ তার পরমায়ু নেই। শেখাবার একমাস পরেই তার মৃত্যু অনিবার্য। সুরের (বা রাগের) ব্যাকরণ না থাকার দরুণ নতুন স্বর নতুন ঢঙে ব্যবহার করে নিত্য নতুন আবেদন সৃষ্টি করবারও কোনও উপায় নেই এবং ব্যাকরণ রচনা করে নতুন স্বর অর্থাৎ আলাপ তান আমদানি করলেই তা "খেয়াল" গান হয়ে গেল।

ঠিক এই কারণেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে কবিতা আবৃত্তিমূলক অতি সাধারণ গানের কোনও পরমায়ু নেই দেখেই "রাগ" এবং তার ব্যাকরণ রচনা ক'রে পরে তাকে আলাপ তানে মণ্ডিত করা হয়। তা'র পর এল খেয়াল গানের এই খাম্বাজ রাগ, যা অন্যান্য রাগের মত মধ্যযুগী এবং আধুনিক গীতিকবিতার মাধ্যমে মহাকালের নিকট অমর হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

ভারতবর্ষীয় লোকসঙ্গীতে কবিতা আবৃত্তিধর্মী, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও কীর্ত্তন-অভিনয় অতিশয় জনপ্রিয় ও তার সাহিত্যিক মূল্যও আছে। রাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলা গানের মাধ্যমে কৃষ্ণ, সুদাম, বৃন্দা, রাধা, কুব্জা ইত্যাদি রূপসজ্জায় অভিনয় করাই পদাবলী কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য। এই অভিনয়েও "খাম্বাজ"এর ছায়া দৃষ্ট হয়।

নীলউৎপল দাম শ্যামর ধাম ঝামর দেহ
কুসুম শর জর বরিখে ঝর ঝর নয়ন শাঙন মেহ
বিরহ মোচন এতুয়া লোচন কোনে হেরবি কান
রায় চম্পতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভান।

মানবমন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে এক। সেই পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ অভিমান এখানেও এই সুরের ভেতর দিয়ে অপূর্ব্বভাবে প্রকাশলাভ করেছে।

তুমি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তব করুণার অরুণ কিরণ রেখা
লেখা হয়ে আছে আমার জীবন পরে।
ব্যথার বাদলে তাই ডেকে ওঠে কেকা
টুপটাপটুপ জীর্ণ বকুল ঝরে।

মৌন চোখের লাজুক ইশারাখানি
পদ্মরাগের দীপ্তিতে আজো রাজে।
থমকে দাঁড়ায় শেষ-যৌবন রাণী।
ফেলে-আসা সুর মনে রিম ঝিম বাজে।

স্নেহের শিশিরে উষর হৃদয় ভূমি
উর্বর তুমি রেখেছ দিনে ও রাতে।
মাঝে মাঝে মিঠে কড়া কথা কহ তুমি
শাসন মধুর হয় সোহাগের সাথে।

তুমি যেন এক উগ্রগন্ধী নেশা।
কখনো কঠিনে, কখনো মধুরে মেশা।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
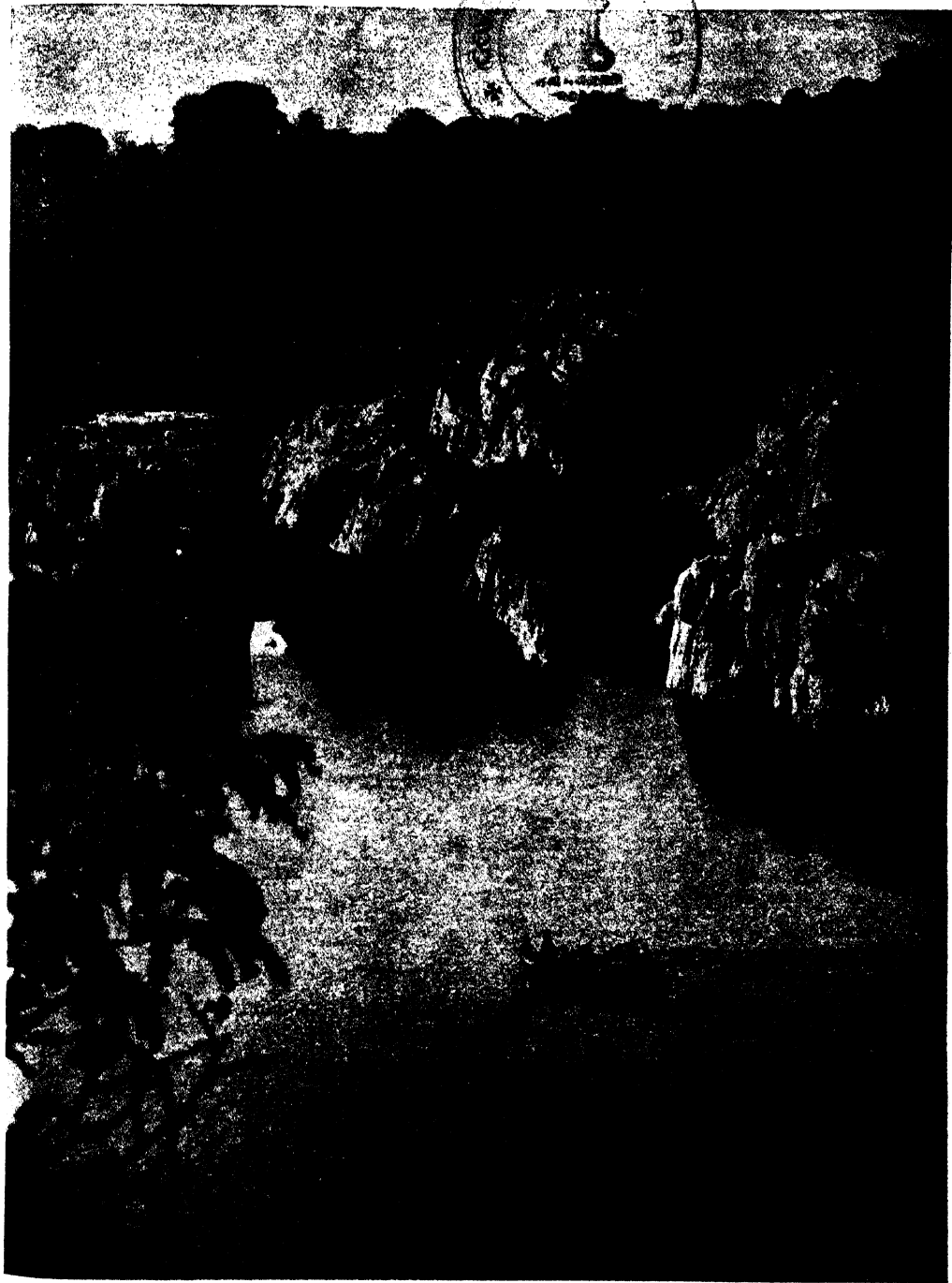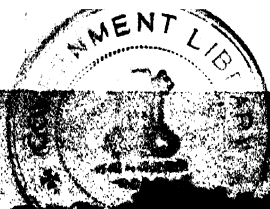
নৌকাবিহার

ফটো :—অজিতকুমার মিত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ শাখা ফটো :—এস্, কে, চ্যাটার্জী

উমার তপস্যা
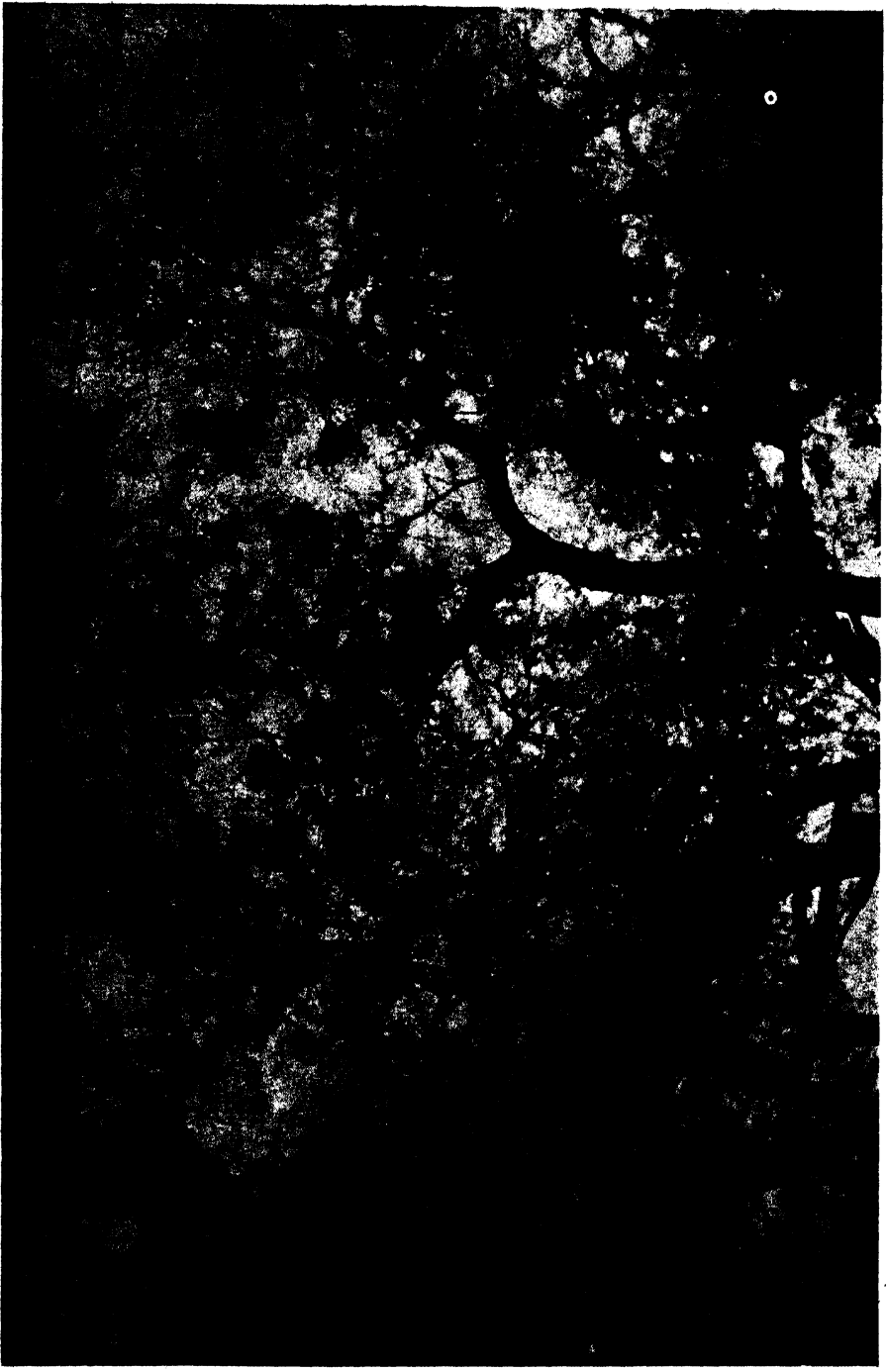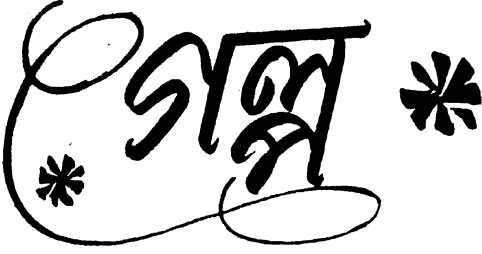
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যায় মহিলা-মহলের আড্ডাটা জমেও জমছিল না। মফঃস্বল সহরের এটা একটা নিজস্ব মার্কামারা প্রতিষ্ঠান। এককালে এর আভিজাত্যই ছিল আলাদা। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট জমিদার বড় চাকুরেদের ও বিত্তশালীদের পত্নী, কন্যাশ্যালিকারাই এর অরূপণ শোভা বর্দ্ধন করতেন। উপরিওয়ালাদের সুপারিশে ও তাঁদের গিন্নীদের তদ্বিরে অনুগত ডেপুটি মুনসেফ চুনোপুঁটি উকীল অধ্যাপক জায়ারাও কালে-ভদ্রে স্থান পেতেন না যে তা নয়। প্রাক্ স্বাধীনতার এক বিগত মহিমান্বিত যুগে এক জাঁদরেল জেলা-অধিকর্ত্তার সুযোগ্যা আলোকপ্রাপ্তা সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে এক মিশনরী মহিলাই নাকি এখানে কুশিক্ষিতা অশিক্ষিতাদের মধ্যে আলোক বিতরণের ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন। ডেমোক্রেসীর বেনো জলে সে সব চাকচিক্য ধুয়ে মুছে গেছে, তা না হলে ট্রেনিং নিতে আসা বাংলা দেশের শ্যামলা স্বল্পবিত্তা শিক্ষিকারাও শেষ পর্য্যন্ত এখানে বেপরোয়া আড্ডা জমায় মেয়ে-কেরাণীদের সঙ্গে—যেখানে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটের পার্টি ফেরত সন্তোষ রোডের লাউঞ্জে ওঠা বসা কেম্ব্রিজ রিভিয়েরা আসা-যাওয়া করা মেয়েরাই পাত্তা পেতো না।

শুধু গল্প নয়, ভাঙা রোমান্সের আভাস পেয়ে ক্লাবের অনেক সদস্যাই ঘিরে বসে মিনতিকে—সত্তর বছরের প্রায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ মিসেস মিলি মিত্তির থেকে সেদিনকার দুধের মেয়ে সন্নতাঙ্গী ষোড়শী শমিতা সেন পর্য্যন্ত। গল্পটা অবশ্য মিনতিকে নিয়ে নয়, তারই বিশেষ বান্ধবী তপতীকে নিয়ে—পরকীয়া, তাই আরো মুখরোচক—সেই আদিম ও অকৃত্রিম আদিরসের কথাই—গ্রীষ্মের ছুটিতে কেদার-বদরী তীর্থ করতে গিয়েছিল মেয়েটা মা-মাসীর সঙ্গে—কিন্তু তার পরে এই চঞ্চলা চটপটে চতুরা মেয়েটির কি যে হোল এই নিয়েই গবেষণা উৎসাহ উদ্দীপনা।

তপতী ছিল সেই ধরণের মেয়ে যারা বাইরে থেকে কিছু অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। এমন কিছু রূপসী নয় যে লোকে দুদণ্ড হাঁ হয়ে চেয়ে থাকবে—সাধারণ সাদামাটা শ্যামলা তবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুঠামদেহ, লিপষ্টিক রুজের সাহায্য না নিয়েও পক্কবিম্বাধরোষ্ঠ। বিদুষীও সে এমন কিছু নয় যে লোকে হতবাক্ হয়ে যাবে তার পাণ্ডিত্যে বা বিদ্যার গৌরবে। টাকাকড়ির কথা না তোলাই ভাল—গরীব কেরাণীর মেয়ে—সে কোন রকমে এম-এ বি-টি পাশ করে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়েছে। তবে তার অসাধারণত্ব প্রকাশ পেয়েছিল মনের এক অদ্ভুত নিষ্ঠায়। সে একমনে প্রচার করতো যে দেশে সুকুমার-বৃত্তির ঘেনঘেনানি যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। গীতশ্রীর আসর আর চারুকলার বাসর নিয়ে মাতামাতি না করলেও চলে। বিয়ের সম্বন্ধে তার মত ছিল অত্যন্ত কঠোর—সে বলতো যে একটা অতি-সাধারণ জৈবিক প্রয়োজনকে সৃষ্টির রহস্যে ঘোরালো করে গৈরিক পতাকা রূপে ব্যবহার করাও যেমন অন্যায় তেমনি তাকে ভাবের অসংযমে প্রেমের রঙীন আচ্ছাদনরূপে মহৎ বলে প্রচার করাও অশোভন। সব কিছু অসংযমের মত ভাবের বা চিন্তার অসংযমও সুস্থতার পরিচায়ক নয়, কল্যাণের ত নয়ই।

সুজাতা বল্লে—যাই বলিস, ব্যাপার সুবিধে নয়, আমি বাজী রাখতে পারি, ডুবেডুবে জল খাচ্চেন আমাদের অতি পিউরিট্যান তপতীদি—

স্মিতা উত্তর দেয়—মনে পড়ে সুজাতা, এম-এ পড়বার সময় তপতীদির এন্টিম্যারেজ লীগ খোলা—ওরে বাবা কি প্রতিজ্ঞাপত্র মুসাবিদা—আমরা নতুন যুগের নবীনারা অকুণ্ঠিতচিত্তে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইব না—নর-নারীর আদিম সম্পর্ককে আমরা মানিনা—বাপ মার প্ররোচন, পুরুষের প্রলোভন, স্থবির সমাজের শাসন, আইনের ভ্রূকুটি, বায়োলজীর দোহাই, সাইকোলজীর

আবদার, দেশের কল্যাণ কিছুতেই আমাদের সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবে না—

ইলা এসে বল্লে—ওমা, এতো, তাতো শুনিনি, তার পর—

তারপর আর কি—তপতীদির প্রতিজ্ঞায় মীনকেতনের কাজের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি—পঞ্চশর শুধু বিশ্ব-মাঝেই ছড়িয়ে পড়লেন না—ঘরে ঘরে হৃদস্পন্দন—পদে পদে পদস্খলন—প্রজাপতির প্রসাদে রঙীন খামে প্রজাপতি আঁকা শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের ঠেলায় সঙ্ঘনেত্রী হাঁ করে রইলেন।

সুজাতা ফোড়ন কাটে—এ হচ্চে প্রকৃতির প্রতিশোধ—

মণিকা বল্লে—তাই বুঝি অরবিন্দ আজকাল ঘনঘন যাতায়াত করছেন মুখারবিন্দের প্রতিশোধ নিতে—

চুপ বলে মুখটা চেপে ধরে সুজাতা।

রেখাদি বল্লেন—থাম্ বাপু তোরা, বড্ড গোলমাল করছিস্, তপতীর কথাটাই শুনতে দেনা—

রেখাদি প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়ে প্রায় বার্দ্ধক্যের দুয়ারে পৌচেছেন। পঞ্চাশোর্দ্ধে ব্যর্থ যৌবনের শোকে হয়ত এখনও তার গোপনে মনে পড়ে যে একদিন তাঁরও জীবনে দুরন্ত বসন্ত এসেছিল কিন্তু তার সুযোগ হারিয়ে গিয়েছিল আলীবর্দ্দী খাঁন, গ্রের এলিজি আর জিরাণ্ডিয়াল ইনফিনিটিভের মর্ম বোঝাতে। তাঁর রূপলোকের সীমানা রসলোকের বেলাভূমিতে কামনাস্নিগ্ধ হয়ে প্রিয়ের বুকে আছাড় খায়নি, উপলমুখর হয়ে ব্যর্থ আক্রোশে মিলিয়ে গিয়েছিল মহাসাগরের সীমাহীনে। তপতীকে তিনি একটু বেশী স্নেহ করতেন—তার মিষ্ট স্বভাব, শুচি রুচি, মনের দাঢ্য ভারী ভালো লাগতো, রেখাদির। তাই সময়ে অসময়ে তাকে কাছে ডেকে উপদেশ দিতেন—এখনও সময় আছে তপতী, শুধরে নে—তোর মত মেয়ে কি অশোকের কটা নীতি আর বিক্রমাদিত্যের কটা হাতি গুণেই যৌবন জল-তরঙ্গ রোধ করবে, ভুল করিসনি তপতী—

তপতী উত্তর দিতো—মাসীমা, বিয়েটা ত জালপাতা নয়, ধরা সহজ, কিন্তু ধরে রাখা শক্ত—তাছাড়া আজ-কালকার পুরুষগুলো যেন অপদার্থ ক্লীব—ঐ মুখোসপরা ভণ্ড মিনমিনে লোকগুলোকে দেখলে আমার গা-জ্বালা করে—মনে হয় হাণ্টার হাতে ওদের চাবকে মানুষ করি—

তুই হাসালি তপতী, বন্ধন আছে বলেই ত মুক্তির এত দাম—পথের সাধনায় না নেমে পতির সন্ধানেই নিজেকে সেধে নে—

—না মাসিমা—নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে দেখি না কয়েকদিন, সহকার-লতিকা নাই বা হলুম্—সব ভাল জিনিষই তপস্যা করে পেতে হয়—বিনা অর্জ্জনে না পাওয়া যায় তাকে বর্জ্জন করা সোজা—মনে মনে এই বর্জ্জনের স্তূপ যে চারদিকেই দেখতে পাচ্চি—সাময়িক মোহ কেটে গেলেই অসন্তোষ আর অশান্তি জমে ওঠে মাসীমা—বিষের মত গলায় আটকে যায়—না পারা যায় গিলতে, না পারা যায় ওগরাতে—নীলকণ্ঠের সাধনা কি সোজা কথা—

ওরে সেই পথভোলা ঘর-ছাড়ার ডাক শুনলে কপালে অনেক দুঃখ জমে ওঠে তপতী—বয়সকাল, খাবি দাবি বেড়াবি, সুখ স্বচ্ছন্দে স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করবি, তা না কি সব আজগুবী ভাবিস জানি না।

তাঁর চোখে জল আসে। চুপি চুপি কানে কানে—সুজাতা সেদিন কাছেই ছিল, হেসে বলেছিল—হাঁগো হাঁ, বেশী বুড়িয়ে গেলে আর রসকস থাকবে না তপতীদি, তখন কেন আপশোস্ করে মরবে রেখাদির মত,—তা প্রেম করেই যদি মাথা মুড়ুতে চাও তাই করনা বাপু—শেষ পর্যন্ত আঙুর টক্ না হলেই হোল—

তপতী হেসে উত্তর দিয়েছিল—তা তুই কেশবতী কন্যে কবে মাথামুণ্ড ছিল বল দিকিন্—ভাল করে উলু দেওয়াটা প্র্যাক্‌টিস্ করে রাখি—

চিমটি কেটে পালিয়ে গিয়েছিল সুজাতা।

সেই তপতীকে নিয়েই আজ আসর সরগরম।

মিনতি বল্লে—তা মাসীমা, তোমরা যখন ছাড়বে না তখন যা জানি তাই বলি—

জয়িতা ফোড়ন কাটলে—মিনুদি, প্রিয় সখির কথা বলতে গিয়ে যেন মনের মাধুরী দিয়ে রং মিশিয়োনা—সত্যি আর মিথ্যের তফাৎটা হোল শুধু এক পোঁচ রংএর প্রভেদ—

মিনতি বলে—কি আর বলবো—শোনো তবে—জানোইত এ বছরে আমার শাশুড়ী তাল তুললেন কেদার-বদরী যাবেন। আমি নেচে উঠলাম। ভাবলাম তপতীকে সঙ্গী করতে পারলে মন্দ হয় না। ওর ত গ্রীষ্মের ছুটি

হাতপা ঝাড়া মানুষ, আমরা না হয়ে স্বামী সংসার নিয়ে হাবুডুবু খাচ্চি—ছেলেবেলা থেকেই আমরা দুজনে জল্পনা-কল্পনা করতুম এক সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যাবো—সেকালের জলধর সেনের হিমালয় আমাদের মনে যে রসলোকের সৃষ্টি করেছিল, একালে প্রবোধ সান্যালের মহাপ্রস্থানের কথা তাতে ইন্ধনই জোগালে। তপতী আর আমি মনে মনে ছবি আঁকতুম হৃষীকেশ লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, যোশীমঠের, নেচে নেচে চলেছে অলকানন্দা মন্দাকিনী হিমালয়ের কথা বলতে বলতে ও কেমন গম্ভীর হয়ে যেতো যেন ওর পূর্ব্বজনমের স্মৃতি ফিরে আসছে বলতো যেমন কঠিন তেমনি শক্ত—এ তুষার ধবলকে পেতে হলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়,—না মিনুদি—, বল্লুম—ওর মনুমাসীকে কেদারবদরী যাবার কথা, লাফিয়ে উঠলেন—এখনি বল্‌ছি মেজদিকে

তপতী ত ছেলেবেলা থেকেই হিমালয় হিমালয় করে মরে রাজী হয়ে গেলেন ওঁরা—তপতীও যাবে। ট্রেণে উঠে অনুমাসী বল্লেন—দিবুও আসছে, দিল্লীতে আছে এখন ভালই হবে—একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকা মন্দ নয়—কি বলিস মিনু—

আমি বলি—হাঁ,

তপতী হাসে।

দিবু নাকি অনুমাসীর আদরের ভাসুর পো, লেখাপড়া খেলাধূলোয় চেহারায় কথাবার্ত্তায় চৌকস্। সম্প্রতি বিলেত থেকে ঘুরে এসে চাকরীর চেষ্টায় দিল্লীতে বসে আছে। তার সঙ্গে তপতীর মারফৎ মীনকেত ঘটিত এক সম্পর্ক ঘটিয়ে দিয়ে আদিরসকে রসাল করবার চেষ্টায় ছিলেন ওর অনুমাসিমা এবং এ বিষয়ে ওর মার নাকি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তা ছাড়া বালবিধবা অনুমাসীমার এ সব বিষয়ে হাতযশ নাকি একেবারে পাকা, আর বিয়ের বাজারে তপতী যে অচলা নয় এ কথাটা ত ঠিক্

ব্র্যাভো—বলে ওঠে সুজাতা

রেখাদি ঝুঁকে শুনছিলেন, বল্লেন—সুজাতা তোর কি আক্কেল কোন দিন হবে না—

আক্কেল দাঁত যে এই বয়সেই পড়ে গেলো মাসীমা,

জয়িতা জবাব দেয়—দন্তহীনা হয়ে ত পুরুষগুলোর মাথা যে রকম মোলায়েম ভাবে চিবিয়ে খাচ্চিস যে সন্দেহ হচ্চে তোর দন্তরুচি কৌমদী—

রেখাদি চটে যান—তোরা থাম্ বাপু—কথাগুলো শুনতে দে—মিনতি আবার আরম্ভ করে—হৃষীকেশে নামবার একদিন পরেই দেখি স্বয়ং ত্রিদিবচন্দ্র ওরফে ওর অনুমাসীমার দিবু, বছর পচিশের নওজোয়ান দিল্লীর লাড্ডু ছেড়ে সশরীরে হাজির। চেহারার মধ্যে মাদকতা না থাকলেও একটা ক্ষুরধার ইঙ্গিত ছিল, তা যে কোন সাধারণ পীনপয়োধরা অর্দ্ধনিমীলিতাক্ষীকে কুক্ষীগত করতে পারতো একটু চেষ্টাতেই। কিন্তু বোঝা গেল যে, না এপারে না ওপারে এ সব বিষয়ে ঝোঁক দেখানোর চেয়ে হকিষ্টিক্ নিয়ে ঘুরতেই সে ভালোবাসতো। তার মনটা ছিল একেবারে সোজা সরলরেখার মত ঋজু, রঙীন শ্যাম্পেনের ক্যাম্পেনে সে হঠাৎ মেতে উঠতো না, তন্বী শ্যামা নিম্ননাভিহরিণীনয়নাদের দিকে তাকিয়ে তেতেও উঠতো না হাউয়ের মত—

এসেই অনুমাসীমাকে বল্লে—এই যে ছোটখুড়ী চট্‌পট্ তীর্থগুলো সেরে নিয়ো কিন্তু আমার একটা ইণ্টারভিউ আছে হপ্তা চারেক পরে—তারপর তপতীর দিকে চেয়ে বল্লে—ও. এই বুঝি তোমার সেই সর্ব্বগুণসম্পন্না ভগিনী কন্যা, এণ্টিম্যারেজ লীগের প্রেসিডেণ্ট—দোহাই আপনার—কিছু মনে করবেন না, আমিও আপনার দলের অর্থাৎ আমারও মত বিয়ে করে যারা—তারা হয় বোকা, না হয় অতি চালাক তপতী কথার ভাবভঙ্গী ও ধরণ দেখে মৃদু হেসে ফেলেছিল। দিবু চলে গেলে আমায় বলেছিল—মিনুদি, ভদ্রলোকটি ত বেশ হাসাতে পারেন, আমার ত ভয়ই হয়েছিল। আমি বলেছিলাম—ভয়ও নেই ভরসাও নেই—ভদ্রলোক শুনেছি নাকি শুধু বড় ইকনমিষ্ট নন্, চমৎকার কবিতা আওড়াতেও পারেন—কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ নাকি কণ্ঠস্থ। তপতী চমকে ওঠে. জিজ্ঞাসা করে—তুই এতো জানিলি কোথা থেকে—

কেন তোর অনুমাসীই ত বল্লে—

চুপ করে যায় তপতী, কারণ জানিত মুখে মুখে কবিতার উচ্ছ্বাসকে সে বাহিরে সকলের সামনে অত্যন্ত অপছন্দ করতো, যদিও আমি জানি অতি গোপনে মনে মনে সে রবীন্দ্রনাথের ছিল পরম ভক্ত।

সেদিন বিকেলে সবাই মিলে চা খাবার উদ্যোগপর্ব্ব চলছে এমন সময় ত্রিদিবচন্দ্র খুড়িমা বলে এসে হাজির।

তপতীর দিকে চেয়ে বল্লে—কি যে ঘরের ভিতর বসে আছেন, চলুন বেড়িয়ে আসি, অনুমাসী উৎসাহ দিয়ে বল্লেন—যা না তপতী ঘুরে আয় না একটু, দিবু বলে—দিল্লী হলে না হয় বলতুম—চলুন জিমখানায় হাল্কা পল্কার সুরে বাহুবন্ধনে বন্দিনী করে একটু যুগল নৃত্য সেরে আসি—

অনুমাসী চেঁচিয়ে ওঠেন—তোর কি মুখের আলগা নেই দিবু, আমাদের তপতী অত ফুরফুরে প্রজাপতি নয়—

দিবু জবাব দেয়—হ্যাঁ ভুলেই গিয়াছিলাম যে তোমার ঐ অতিগুণের বোনঝিটি যুযুৎসুর প্যাঁচও নাকি জানেন। আমার এই রোগা শরীরে 'পপাত-ধরণীতলে' হয়ে আছাড় খাওয়াটা চলবে না—তপতী হেসে বল্লে—ত্রিদিববাবু তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণেক তিষ্ঠ যাবৎ মধু পিবাম্যহম্—তারপর দানবদলন পালাটা সেরে নেবো—তা আপনিও এককাপ তরলিত চন্দ্রিকা পান করুন না—চা খান, তারপর জিমখানা কেন গীতা-ভবন পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি—দিবুও কথায় হারমানবার ছেলে নয়, বল্লে—পুরাকালে দানব বধার্থে অনেক দেবী মহাত্ম্য পড়েছি কিন্তু আমি কি এমনি অধম যে আমার প্রতি উত্তম দৃষ্টি না হোক মধ্যম ও হবে না—

হেসে ফেলি আমরা সবাই, এমন কি তপতীও। দিবু এককলি গানও গেয়ে ফেলে—নাসার বেশর করিয়া ঈষৎ হাসে। খানিকপরে তপতী একটু গম্ভীর হয়ে বলে—দেখুন দেবতাত্মা হিমালয়ে এসেছেন, মা-খুড়ী জেঠাই যাঁরা সঙ্গে রয়েছেন একটু সংযতবাক্ হলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না—

দিবু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর উত্তর দেয়—ভেবেছিলাম মানবশাস্ত্র অনুসারে মানবীদের সঙ্গেই চলেছি। এখন দেখছি দেবীরাই ছাবা পৃথিবী সবিবেশ। তা বেশ যাজ্ঞবল্ক্যকে ডাকবো না মনু অত্রি হারীত লারিত অঙ্গিরিতকে। কিন্তু বলে রাখছি, আমি কবিদের খাস শিষ্য—পরিণত পাত্রের মধ্যেও ফুটন্ত ফুলকে দেখি—সরসিজমনুবিদ্ধ শৈবালের তে কিছুটা। অনুতপ্ত তপতী বলে—শেওলা যে ময়লা—বাইরেটা দেখেই শুধু বিচার করবেন না তপতী দেবী, ওর প্রতিটি কোষ যে জীবনরসে চঞ্চল হয়ে উঠেছে সেটা দেখেন না কেন—সেইটেইত সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি,—কবিরা তাকে প্রাণ বলেন—গতিময়তা—জীবন যেমন কিছুটা মায়া, কিছুটা স্বপ্ন কিছুটা মতিভ্রম তেমনি হার্ডফ্যাক্ট, তাকে অস্বীকার করলে নিজেকেই অস্বীকার করা হয়।

হাসি ঠাট্টার মধ্যেই ওদের যাত্রা হলো শুরু। কর্ণধার স্বয়ং বদরীবিশাল। মানুষ চায় জানা অজানার সন্ধানে এই চলাই হয়ে ওঠে অমৃত। বাইরের পথ হাতছানী দেয় দিগন্ত ভরে ওঠে ইশারায়, কিন্তু মনের অলিগলি, তাদের চড়াই উৎরাই চলার নেশায় সোজা ঋজু হয়ে যায় কি, অস্ত গগনের রক্তিমপ্রান্তে তন্দ্রালসা সন্ধ্যানামে, তুঙ্গী হিমশিখরে জমে ওঠে তুষার শুভ্রনীরবতা জোৎস্নারাতে জ্বল জ্বল করে রজত গিরির মত এক মহাদেবতার রত্নকল্লোজ্জ্বল চারু অঙ্গ, ভোরের আবির ছড়িয়ে পড়ে উদয় দিগ্বলয়ে—আলোর প্রথম ইঙ্গিতে আনে, নতুন দিনের বন্দনা। তপতী ভাবে প্রতিক্ষণে এ কী জ্যোতির্ম্ময় পটপরিবর্ত্তন, তার এতদিনের ধ্যান-ধারণা ভাব চিন্তা সব বুঝি গুলিয়ে যায় মায়াময়ের প্রতি পদক্ষেপে।

ততদিনে পথের নেশায় আপনি তুমির বাঁধন খসে পড়েছে ওদের মধ্যে, হাল্কা হয়ে এসেছে সামাজিক রীতি-নীতি। ত্রিদিব আর সে এক সঙ্গে এগোয়। ত্রিদিব চেঁচিয়ে বলে—ওহে গিরিরাজনন্দিনী ভুলোনা আমরা মাটির ছেলে, ধরণীর অতি কাছাকাছি থাকি, তুমি না হয় গৌরী হৈমবতী, উর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখী, একটুখানি ধীরে বন্ধু ধীরে—

হেসে বসে পড়ে তপতী ঝরণার তলে, বিশাল অর্জ্জুন গাছের নীচে একটা বড় পাথরের উপর—একটা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে হিজিবিজি লেখে আঁকে।

উঠে আসে দিবু—মা মাসীমারা বহু নীচে এ সব গল্প তপতীর কাছেই শোনা—পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে ওরা উঠেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—বাবা, মেয়েগুলোই কি এমনি, এমন বাঁদর নাচানো নাচাবে জানলে কে আসতো, মাথায় থাক্ কেদারবদরী, হিমালয় আর হিমালয় কন্যারা—

তপতী ফস্ করে বলে বসে—যুগে যুগে উমারাই তপস্যা করবে, না, আপনারা শুধু হঠাৎ আলোর ঝলকানীতে পছন্দ করবেন, কিন্তু ধরে রাখতে হলে যে মনের সুইচকে হারালে চলে না—আপনাদের তার যে সব সময়েই ফিউজ—সে কথা বোঝেন ?

তাই তুমি বেতারে মেসেজ পাঠাচ্ছো—পুরাকালে রতি

নারিণীরা ভূর্জ্জপত্রেই প্রেমপত্র রচনা করতেন—বিদূষকরা নিয়ে যেতেন— আমায় না হয় বিদূষকের পদটাই দাও

কেন তার চেয়ে বড় পদের বুঝি ভরসা হয় না এমনই চতুষ্পদ আপনি—

কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা ষটপদের গুঞ্জনে যে প্রাণ গেলো—হুলের জ্বালাও আছে বলুন—

আজকাল আর নিষ্কম্প বৃক্ষং নিভৃতং দ্বিরেফম্ হবার জো নেই—সে মহাদেবতাদেরই চলতো

তারপর গম্ভীর হয়ে ত্রিদিব বলে—জানো তপতী আমার জীবননীতি হচ্ছে—যদি দিতেই হয় 'চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয় রিক্ত হাতে চলিয়ে যেয়ো'। জীবনের কারবারে আমি কিছু বাকী রাখার পক্ষপাতী নই, ধারে কারবার নেই। যেদিন যাবো সেদিন যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে তপতীর—

দিবু বলে চলে—সপ্তপদক্ষেপণ এক সঙ্গে করেছি,আমরা শাস্ত্রমতে সখা হয়েছি, অনেকদিন তুমি হয়ছো সখা মিত্র প্রিয় শিষ্যা, তোমার অনুরত হয়ে তুষারতীর্থে চলেছি, তাই আজ আর তোমার কাছে কোন কথা গোপন করব না

বুকটা আরো গুর্ গুর্ করে। বেশ বুঝতে পারে তপতী বাঁধ ভাঙচে। সে শুধু চুপ করে বসে থাকে জবাব দেয় না, কিন্তু তার সমস্ত তনু উন্মন হয়ে সেই কথামৃত পান করে।

রাতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তপতীর, কিন্তু যেই না হাত পা মেলে লেপ কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়ে অমনি—মরিমরি এক নিমেষে কোথায় চলে যায় ঘুম। রাতের গভীরতম অন্ধকারে নিজেকে নিয়ে পড়তো সে, আমায় বললে জানো মিনুদি, পোড়ামনকে বলতুম ত্রিশ বছর ধরে ওই যে মন্ত্র আওড়ালি, একদিনের একটি কথায় তা মিথ্যা হবে—হতে পারে না—হতে দোব না—কিন্তু আটকাতে পারলুম কই—

ওদিকে নারী সঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে ছোট্ট চটির ততোধিক ছোট্ট বারান্দার এক নিরালা কোণে ছারপোকাপিশুভর্ত্তি চারপাইয়ের উপর কম্বল পেতে শুয়ে থাকে দিবু। বেশ বুঝতে পারি তপতীর মনটা দুলচে—ভাবচে ওকী ঘুমুলো না আধো-তন্দ্রা আধো-জাগরণে কল্পলোকে বিচরণ করছে? ওকী ভাবে কারুর কথা? তপতী নিজেই বলছে ভাবতে ভাবতে তার মাথার শিরা উপশিরা দপদপ করে উঠতো—ঝিমঝিম করতো শরীর, দেহ যেন মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলছে, শীতের রাতেও সে কুলকুল ক'রে ঘেমেছে, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাগ্নিকা মহাপ্রকৃতি হাসছেন, যিনি জায়া জননী সৌম্যাতিসৌম্যা প্রিয়াপ্রিয়তমা, যিনি গ্রহণ করেন ক্ষণিককে নিত্যের মধ্যে, যাঁকে বুঝতে গেলে মহারাত্রি কালরাত্রি মোহরাত্রি পেরিয়ে আসতে হয়।

পরদিন সন্ধ্যায় ঘনঘোমটায় ঢাকা নদীর ধারে এসে একলা দাঁড়ালো তপতী। নীচে কলস্বনা অলকানন্দা মনস্বিনী মেয়ের মত নিজেকে ধূসর জটাজালে মিলিয়ে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা উদ্ধত পাহাড় পথ আটকে, চোখ রাঁঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মত। পাহাড়ের উপর ছোট একটি মন্দির, দেবী তিমিরবরণী, নাম ত্রিপুরসুন্দরী। পূজারিণী এক পাগলিনী ভৈরবী—লোকালয়ে তিনি থাকেন না, সংসারের প্রতি গভীর বিদ্বেষ, পুরুষ দেখলেই গালিগালাজ করেন।

উত্তরাপথের পথে পথে অনেক সন্ন্যাসিনী সাধিকাকে দেখা যায়, কিন্তু এঁর পরিচয় শুনে তপতীর একটু কৌতূহল হয়েছিল তাই সে একাই বেরিয়েছিলো।

গিয়ে দেখে দেবীর সামনে স্তব্ধ ধ্যানে বসে আছেন এক তপস্বিনী—পরণে কাপালিকার রক্ত অম্বর, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সামনে চকচকে ত্রিশূল। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তাকে দেখে পরিষ্কার বাংলায় বল্লেন—কে মা তুমি—

কিছু প্রসাদও দিলেন, ডান হাত বাড়িয়ে নিচ্ছিলো তপতী, বল্লে—দেবতার প্রসাদ দু'হাত ভরে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে হয় মা, গরলও তিনি নিয়ে তুলেছিলেন হেসে। তাই ত নীলকণ্ঠ হলেন শ্রীকণ্ঠ—তা এতো অল্প বয়সে তীর্থে চলেছো কেন—মুখ দেখে ত মনে হচ্চেনা যে অন্তরে কোন দাগা পেয়েছো—

হঠাৎ গুণ গুণ করে গান সুরু করেন তিনি—

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী—

তপতীর মনটা একটা অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরে উঠলো।

রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন গান এমনভাবে এইখানে শুনতে পাবো ভাবেনি সে।

হঠাৎ দেখে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তপতীর দিকে চেয়ে আছেন যেন অপ্রকৃতিস্থের দৃষ্টি, বল্লেন—পুরুষদের এড়িয়ে চলো মা, প্রণম্য কেউ নেই—না দেবতা—না মানুষ, না প্রকৃতি, না রীতি, সব মিথ্যা, একমাত্র সত্য হচ্চে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, মা, মা কি অপরাধ করেছিলুম আমি যে আমার সমস্ত আলো কালোয় ডুবে গেলো—

হঠাৎ তার উত্তেজনা দেখে তপতীর একটু শিহরণ লাগে, কোথায় যেন একটা ক্ষুব্ধতা, ব্যর্থ বেদনার আক্রোশ, তিমিরাভিসারের আভাস। ব্যাপার কি? একটু সন্ত্রস্ত হয়েই সে উঠে আসে—ভৈরবী আপনাতেই আপনি মগ্ন। বাইরে আসতেই দিবুর গলা শুনতে পেয়ে সে একটু আশ্বস্ত হয়। দিবু ডাকছে—ভো ভো তপতী, সেউতি যূথী মালতী যে শুকিয়ে গেলো, বিনতি করি, প্রণতি করি, মিনতি করি, অয়ি অব্জপুত্রী শীঘ্র এসো—আশ্রম মৃগরা যে মরে—কোথায় তুমি, নয়ন-পথগামী হও—

ভৈরবী কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন, কঠোর কণ্ঠে তপতীকে জিজ্ঞাসা করেন—কে সঙ্গে, উনি কে—

জবাব দেয়না তপতী, প্রায় দৌড়েই কাঁপতে কাঁপতে দিবুর কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে—চলো শীগ্‌গির-

কেন?

সে শুধু উপরের দিকে চায়, ভৈরবী অপলকনেত্রে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

দিবু হেসে বলে—কি হোল তোমার, ভৈরবী তুকতাক করলে নাকি? এসো বসা যাক, তুমি যে কাঁপচো—

তারা দুজনে বসে পড়ে একটা পাথরের উপর। আকাশে অরুন্ধতীর ক্ষীণ আভা। দিবুর পাশে বসে থাকতে থাকতে এক আশ্চর্য্য অনুভূতিতে, এক অপূর্ব্ব মমতায় তপতীর নারীসত্তা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রসস্নিগ্ধ করে জেগে ওঠে। পথের শেষে আলো নিভে আসুক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার সন্ধ্যা আর কখনও বন্ধ্যা হবে না—তার দেহমন ভরে আজ অমৃতের স্রোত। সেই অপরূপ মুহূর্ত্তে দিবুও এগিয়ে আসে, তার হাত দুটো তুলে নেয় তার কোলে। সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়ে যায় তপতীর সেই পাণি-গ্রহণে। সৃষ্টি-তৃষাতুর স্বপ্ন-বিভোর হয়ে তারা নামিয়ে দিয়েছে তাদের বোঝা আর খোঁজা। দিবু কানে কানে শুধু একটি কথা বলে—তপতী—

অনলে অনিলে সকল স্নায়ুতে পথের ধূলিতে মধু যেন ঝরে পড়ে।

আর তপতী অতিকষ্টে বলে—তুমি।

হঠাৎ কে যেন একটা তীক্ষ্ণ পাথর ছুড়লে, দূরে মিলিয়ে গেলো কার একটা দ্রুত পদধ্বনি—পেছনে যেন কার অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস।

'কে'—বলে দিবু উঠে দাঁড়ালো—দীর্ঘ সবল পুরুষ, যৌবনবান, মধুমান—যে পুরুষ চিরকাল নারীকে আশ্রয় দিয়েছে বুকের মাঝে, কোমল অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে।

তপতী তাকে বাধা দেবার পূর্ব্বেই সে এগিয়ে গেছে হন্ হন্ করে।

অস্পষ্ট আলোকে স্পষ্ট দেখতে পায় তপতী ভৈরবী এসে দাঁড়িয়েছে ত্রিশূল হাতে। তার বুক গুর গুর করে ওঠে। সে দেখে দিবুর দিকে চেয়ে ভৈরবীর চোখের চাহনীতে নেমে আসছে এক অদ্ভুত আবেশ। তপতীর মনে জেগে ওঠে আদিমা মানবীর ক্ষুব্ধ সংস্কার—বিনা যুদ্ধে দয়িতকে অন্য নারীর হাতে যারা কোন দিন ছেড়ে দেয় না।

দৌড়ে গিয়ে সে বলে—দিবু, দিবু, কি হয়েছে—

ভৈরবী তার চিমটে আর ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসে কুলাঙ্গার, কামুকের দল, অশোধিত কামনা নিয়ে হিমালয়ের পবিত্র স্পর্শকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য করে তুলেছিস, ধিক্ ধিক্—

দিবু কি বলতে যায়।

তপতী তেড়ে গিয়ে বলে—আপনি কে জানিনা, জানতে প্রবৃত্তিও নেই, কিন্তু আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আলাপ করছি, আপনি বাধা দেন কেন?

স্বামী! মূর্খ, কে তোর স্বামী? আমিও তোর মত স্বামীর কোল জুড়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতাম—আমারও সন্তান ছিল, সমাজ ছিল, সংসার ছিল—স্বামীর অঙ্কচ্যুত হয়ে নরাধমের ভোগ্যা হলাম—কৈ তোদের নির্বিষ পুরুষগুলো ত বাঁচাতে পারেনি—কি অপরাধ করেছিলাম আমি, কি পুণ্য করেছিস তোরা—বেরো বেরো সব—সংসার ধ্বংস হবে আমার নিঃশ্বাসে, মা, মা, দে তোর ঐ অসি, নপুংসক ছাগগুলোকে বলি দি—

এগিয়ে এসে সে ত্রিদিবের হাত ধরে। তপতী বাধা দিতে গিয়ে চিমটের আঘাত খেয়ে পড়ে যায়। তারপর বিজয়িনী মূর্ত্তিতে ত্রিদিবকে টেনে নিয়ে যায় রাক্ষসী।

ত্রিদিব—দিবু বলে তপতী চেঁচিয়ে ওঠে—

দিবু শুধু অসহায়ভাবে তাকায়। তাকে যেন কে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। একটা চাপা হাসি শুধু খল খল করে আকাশের উপর ভেসে যায়। নেতিয়ে পড়ে তপতী সেইখানে আচ্ছন্ন হয়ে, চেতনা হারিয়ে। কতক্ষণ পরে ধর্ম্মশালার লোকজনদের নিয়ে আমরা আসি। আলো-লণ্ঠন নিয়ে আসেন অনু-মাসীমা, আরো অনেকে। খুঁজে বার করেন তাকে—কি হলো, কি হলো, দিবু কোথায়—

সে রাত্রিতে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরের দিন সকালে অনেকদূরে এক পাহাড়ের গহ্বরে দিবুকে পড়ে থাকতে দেখা যায় নগ্নদেহে অজ্ঞান হয়ে—কে যেন উন্মত্ত হয়ে, প্রমত্ত হয়ে তাকে মথিত দলিত করে দিয়ে গেছে। ভৈরবীর কোন পাত্তাই নেই।

আমাদের তীর্থে যাওয়া গেলো ঘুরে। অনেক কষ্টে তাকে নামিয়ে নিয়ে এসে দেবপ্রয়াগের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা গেলো। কয়েকদিন পরে একটু সুরাহা হতে তপতী বল্লে—তোমরা তীর্থ করে এসো—আমার সব তীর্থ আজ এইখানে—দিবুর সমস্ত ভার আমি নিলুম্—

আমরা তীর্থে চলে গেলুম। ফিরে এসে দেখি তপতী তাকে নামিয়ে এনেছে—দেরাদুনের বড় হাসপাতালে। দিবু ভাল আছে, কিন্তু তপতীকে সে একেবারেই চিনতে পারে না।

অনুমাসীমা গিয়ে ডাকলেন—দিবু, তপতী যে তোকে সাবিত্রীর মত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো—

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে দিবু। ওদিকে তপতীর বুক কান্নায় ভরে ওঠে।

আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে—মিনুদি, একী হোল আমার—

আমি বলে এলুম—কাঁদিসনি বোন্, তোর ভালবাসা মিথ্যা হবে না, হতে পারে না—তোর প্রেম জয়ী হবেই।

আজ এই তিন মাস দিন রাত্রি তপতী দিবুকে নিয়ে বসে আছে। সামনে ঘন ঘোর কালো এক ফোঁটা আলোও সে দেখতে পাচ্ছে না।

মিনতি চোখ মোছে। জয়িতা সুজাতা রেখাদি সবার চোখেই জল।

জীবন-বীণা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

মোর জীবনের করুণ বীণায়
দু'টি সুর বেজে যায়,
অশ্রু-হাসির বিরহ-মিলন
কাঁদে শুধু নিরালায়।

উদাসী মনের ব্যাকুল ব্যথাতে
আকাশে বাতাসে বেদনা ঘনায়;
সেই বেদনার বাণী ঘুরে ফেরে
ধরণীর আঙিনায়॥

আমি দেখি শুধু মধু-বসন্তে
জাগে তা'রা অনুরাগে,
মাধবীর প্রেমে আধ-ভাঙা চাঁদ
ক্ষণে ক্ষণে বুঝি জাগে।

মধুমাসে মোর আকুল পরাণ
শ্রাবণে জাগে গো বিরহের গান;
সুখের বাসরে কভু দুখ দিয়ে
বিরহ জাগাতে চায়॥

বর্ম্মা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এবার পূজার ছুটিতে প্রাচ্য-এসিয়া ভ্রমণ-পথে রেঙ্গুনে ছিলাম তিনদিন। দু বৎসর পূর্ব্বেও একদিন রেঙ্গুনে ছিলাম। তার পূর্ব্বে কয়েকবার যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল ব্রহ্মদেশে—গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজ শাসনের দিনে।

বলা বাহুল্য যুদ্ধপূর্ব্ব বর্ম্মার বাহ্যিক চাকচিক্য, যানবাহন, বিলাস-বাসন আমোদ-প্রমোদ ছিল যাযাবরের পক্ষে মনোরম। সাধারণ জনগণের কিন্তু বাহিরের চাপে ও বাড়-বাড়ন্ত ছিল শিল্প-প্রধান অনুভূতির ও শান্ত চরিত্রের। আজও সে সঞ্চয় হতে বঞ্চিত নয় বর্ম্মী অনুভূতি। ব্রহ্মবাসীর অর্থাগমের পথে আজ বহু বাধা-বিঘ্ন। কিন্তু তাহ'লে ব্রহ্মদেশের নরনারীর সৌন্দর্য্য-বোধ বা পরিচ্ছন্নতার চাহিদা

প্রার্থনারতা বর্মী মহিলা

চাট খায় নি। মাথার ওপর এক ভিন্ন দেশের লোক শাসক সেজে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা করছে না—এ শুদ্ধ বোধ যেমন ভারতবাসীর অন্তরাত্মাকে মুক্ত করেছে, তেমনি মুক্ত করেছে বর্ম্মীকে। বিদেশী শাসনের দিনের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব নাই বহু ক্ষেত্রে ভারত ও বর্ম্মায়। কিন্তু ভুল-ভ্রান্তি নিজের অনভিজ্ঞতার ফল এ জ্ঞানও বিবেককে করে মোহ-মুক্ত। আমি স্বয়ং গৃহস্বামী—এ ধারণা দারিদ্র্যকে সম্ভ্রম দেয়। প্রেরণা জাগে নিজের উদ্যম এবং আপনার সাধ্যকে সিদ্ধির পথে নিয়ন্ত্রণ করবার। কারণ নিজের কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ।

তাই বাহিরের আচরণ বিচার করলে ইংরাজ-শাসিত বর্ম্মার, রাজধানীর সঙ্গে আজকের বর্ম্মার তুলনা হয় না। গত যুদ্ধের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার ক্ষত-চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে। পথ-ঘাট আজিও অপরিচ্ছন্ন, বিপ… সহরের পরিচায়ক। কিন্তু দু'বছর পূর্ব্বে মলিনতা দেখেছিলাম সেথায়। আজ বহু পরিমাণে সংস্কৃত রাজধানীর পথ-ঘাট। সেদিন শস্তার ট্রাম-গাড়ি ছিল সহর পরিভ্রমণের সহায়ক বিদেশী পর্য্যটকের। যুদ্ধের সময় হ'তে অদ্যাবধি ট্রাম-গাড়ি নাই এবং সহজে যে হবে তারও রেঙ্গুনে পূর্ব্বাভাসের ইঙ্গিত নাই। বাস আছে—কিন্তু দীনতার পরিচায়ক তার আভ্যন্তরিক সুবাসের অভাবে। ট্যাক্সি আছে তার মিটার নাই; কাজেই দরদস্তুরের ব্যাপারে চালক ও পথিকের চাতুরীর যথেষ্ট প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সেগুলা। বর্ম্মা ট্যাট্রুর ফেটন্ গাড়ি ছিল সেদিনের এক নবীন অভিজ্ঞতা ভারতীয়ের। আজ অশ্ব-কুল নির্ম্মূল। আছে সাইকেল রিক্স, দরদস্তুর ক'রে চড়তে পারলে ধীরে ধীরে সহর দেখতে পারা যায়। এক রিক্স-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেটি হতে সুর্লে প্যাগোডা দেখে বাজার হ'য়ে সোয়ে ড্যাগন যাতায়াত কত ভাড়া?"

—ইঙ্গর রূপি। (পাঁচ টাকা)

—ফুং অকো! হ্নিভ্ রূপি। (না ভাই দু টাকা)।

তখন সে অবোধ্য বর্ম্মী ভাষায় বক্তৃতা দিলে। হয়তো গালাগালি অথবা ধর্ম্মের দোহাই, কিম্বা যুক্তিতর্ক। যার ফলে বোঝা গেল সে দু' টাকায় রাজি নয়। তখন বলতে হল—থোন (তিন)। সে বলে—লে (চার)। তখন মাথা নেড়ে একটু এগিয়ে গেলে বল্লে—কম্বাতে (ঠিক হায়)। তখন চিসুটিম্বারে (ধন্যবাদ)—ব'লে আরোহণ করলাম সাইকেল রিক্সা।

বলছিলাম দু'বছরের মধ্যে পথ-ঘাট প্রভূত পরিমাণে পরিমার্জিত হ'য়েছে। তবু পিচ্ পড়েনি সব প্রধান পথে। দোদুল-দোলার দোলায় গাড়ি একটু পতন-অভ্যুত্থানের খটাখটির অত্যাচার হতে পরিত্রাণ অসম্ভব। কিন্তু কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য, মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা ও বিভীষিকার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস-ব্যসন মূল্যবান মোটর্ গাড়ি এবং সাজ-সজ্জিত নর-নারীর পার্থক্যের দৃষ্টিকটুতা নাই রেঙ্গুনে। প্রধান-ম…

বা ধনাঢ্য বর্ম্মার গৃহলক্ষ্মী হ'তে সাধারণ পথ-চারিণী মেছুনী বা ফলওয়ালী পরিচ্ছন্ন লুঙ্গি পরিহিতা, অঙ্গে পরিষ্কার ইঞ্জি। সবার গায়ে রেশম না থাকলেও মলিন বাস ওদেশে খুব কম দেখা যায় বর্ম্মার অধিবাসীদের মধ্যে। আজকাল বহু মহিলা মুখে বিলাতী পাউডার মাখে, বিলাতী প্রসাধনে অধর রাঙায়। কিন্তু অধিকাংশ নারী মুখে মাখে তানাখা বা চন্দনের গুঁড়া। পুরুষ সুবিধা পেলে রেশমের লুঙ্গী পরিধান করে—নিদেন কৃত্রিম রেশমের রঙীন কাপড়ে করে দেহ-সজ্জা।

সমৃদ্ধি দেখলাম—মন্দির প্যাগোডাগুলির। বর্ম্মার বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীইউ নু অতি শ্রদ্ধাবান বুদ্ধভক্ত। মুখে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ব'লে ধর্ম্মপ্রবণতার ভান করেন না। ত্রি-শরণের তিনটি মন্ত্র চরিত্র গড়বার

বালক ভিক্ষু

[illegible]পাদান একথা তিনি বিস্মৃত হন না। আত্মা শুদ্ধ না হ'লে কর্ম্ম হয় না [illegible]ভ। মানুষকে শুদ্ধ করবার একমাত্র উপায় বুদ্ধদেব প্রদর্শিত পথ—[illegible]। তাই তিনি ধর্ম্মের পথে মানস-ভাগীরথীকে প্রবাহিত করবার [illegible]দেশ্যে ধর্ম্ম-মন্দিরগুলির সংস্কারের ভার নিয়েছেন। দু'বছর পূর্ব্বে [illegible]য়ে ডাগন অঙ্গনের বহু মন্দিরের মলিনতা আমাকে ব্যথিত ক'রেছিল। এবার দেখলাম সেই মন্দিরগুলি সোনার বর্ণে হয়েছে দৃষ্টি [illegible]মোহন। বহু অর্থবান বর্মী এদের সংস্কারের ভার নিয়েছেন মনীষী [illegible] নুর নেতৃত্বে। মন্দিরের স্তম্ভ, চূড়া প্রাচীরগাত্র ঝলসিতেছে [illegible] মাধুরীতে।

গত বৎসর বর্ম্মায় বৌদ্ধদের সভা হয়েছিল। সহরের বাহিরে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে এক নূতন সহর। মাঝে প্রকাণ্ড স্তূপ। তার তিনদিকে প্রতিনিধিদের বাসের জন্য বিরাট কয়েকটি অট্টালিকা। আর একদিকে এক কৃত্রিম শৈল ও গুহা। বিশাল গঠন হিসাবে সেটি অভিনব। কিন্তু সে যে বিরাট নয়নাভিরাম, একথা আমি বলতে পারি না। এর নাম শান্তি (গিম্) প্যাগোডা।

রেঙ্গুনের পশুশালা ও লেক এক অপূর্ব্ব সমারোহের ব্যাপার। এরাও যুদ্ধের দিনে অবহেলা ও লাঞ্ছনার তাড়নায় দীনতা ও মলিনতার করালগত হ'য়েছিল। সরোবর এখনও স্থানে স্থানে আবিলতা ও অত্যাচারের ক্ষত বহন করছে অঙ্গে। কিন্তু পশুশালা প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত হয়েছে। এরও মাঝে আছে বৌদ্ধ-নীতির স্ফুরণ—জীবে দয়া। এ প্রসঙ্গে মনে
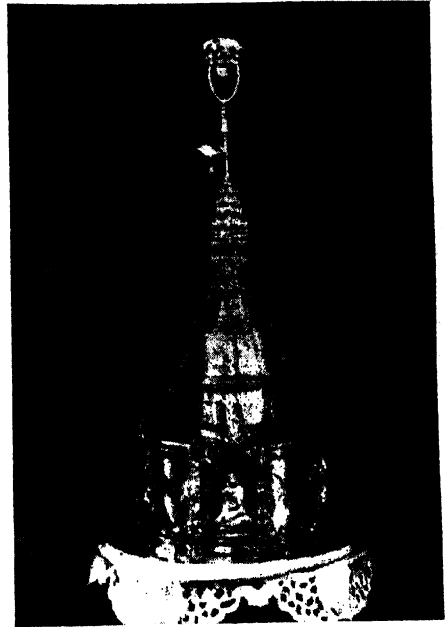
শান্তি প্যাগোডা

পড়ছে একটি বালক ভিক্ষুকে। তারুণ্যের আগ্রহে দেখছে বাঘ ভাল্লুক সাপের খাঁচা, পাখীর খাঁচা। কিন্তু দেহ সজ্জিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৈরিক বসনে। এক একবার প্রাণ নেচে উঠছে হনুমানের নাচের তরঙ্গে—আবার তখনি শান্ত হ'চ্ছে সঙ্ঘের অনুশাসনে। আমার অনুরোধে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো ক্যামেরার সম্মুখে।

মহাবোধি সোসায়িটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক। বহু বর্ম্মী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি পরিচিত। আমি কারও সাথে সাক্ষাৎ করলাম না। তাতে নিজের চোখে দেখতে পাওয়া যায় দেশ এবং ঠিক্ হ'ক্ ভুল হ'ক্ সিদ্ধান্ত করা যায় দেশবাসীর জীবন সম্বন্ধে।

বর্ম্মার লোক শান্ত। সামরিক শিক্ষালাভ করছে তরুণরা। হোটেলে পল্টনের কয়েকটি প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁদের অভিমত যে বর্ম্মী-সেনা শাসন-শৃঙ্খল মানে, কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করে এবং নিজের দশকে ভালবাসে। উপর নিচে দু দল শত্রু স্বাধীনতার দিন হতে ব্রহ্মদেশকে সন্ত্রস্ত করছে। ধীরমতি বৌদ্ধ দেশ-নায়কেরা অতি শান্তভাবে স বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন। ভারতবাসীরও বিশ্বাস—কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা আবার ভাতিবে বর্ম্মার ললাটে।

বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখি আমি সকল দেশে। ব্রহ্মে শিক্ষা খুব অগ্রসর। কয়েকটি মার্কিনী প্রফেসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল জাহাজে। হংকং অবধি ছিলেন তাঁরা আমাদের সহযাত্রী। লঙ্কার রাষ্ট্রদূত সার ও লেডী কুমারস্বামীর সঙ্গেও একত্র ভ্রমণ করলাম। এঁরা সবাই একবাক্যে প্রশংসা করলেন বর্ম্মা চরিত্রের। ছাত্রদের মাঝে উৎসাহের অভাব নাই। কৃষি-শিক্ষাও প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

কিন্তু রেঙ্গুনের আসল সাদৃশ্য কলিকাতার সঙ্গে যে বিষয়ে—তার উল্লেখ আমি করেছি পূর্ব্বে বহুবার। রেঙ্গুন বর্ম্মার সহর। কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী কিন্তু এই উভয় সহরেই ধন-দৌলতের মালিক স্থানীয় লোক নয়। কলিকাতায় বাঙ্গালী সাহিত্য শিল্পবিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছে মা লক্ষ্মীর দান। বর্ম্মার অধিবাসীও নানা কারণে নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে বসে আছে যদি অর্থনীতি দেশের ইষ্টানিষ্ট বিচারের একটা পরিমাপ হয়।

কেরাণীগিরি, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী, ওকালতী ও কতকটা চিকিৎসার কাজ শিক্ষিত বর্ম্মার হাতে। শিল্পী নরনারী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি গড়ে, অতি সুন্দর কাঠের প্যাগোডা রচনা করে, ঘোড়া, গরু, রামছাগল প্রভৃতি খেলনা গড়ে। কিন্তু তাও স্থানীয় বাজারের জন্য। কাপড়, জামা, জুতা বা লুঙ্গির ছোট দোকান চালায় বর্ম্মার লোক।

কিন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রে যেথায় আমদানী, রপ্তানী, বীমা, কল-কারখানা ও ব্যাঙ্কের কাজে লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, সেথায় লক্ষ্মীর বরপুত্র ভারতীয় বা পাকীস্থানী, ইংরাজ, মার্কিনী বা চীনা। অবশ্য বাঙালী নয়। জরবাদী—ভারতীয় ও বর্ম্মী মিশ্র জাতির মুসলমান মোটরগাড়ি চালায়, কাঠের কলে কাজ করে। কাঠের ব্যবসায় কলিকাতার মাড়োয়ারীর হাতে। বড় দোকানের মালিক সিন্ধী। জাহাজী কোম্পানী ইংরাজি, এখন মার্কিন কিছু ভাগ পাচ্ছে। তেলের খনি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ইংরেজের। ব্রহ্মের লোক দেহসজ্জা করে, মহিলারা ভগবানের মন্দিরে প্রার্থনা করে—আর কেহ বা পোয়ে নৃত্যে লোকের তাপিত প্রাণ শীতল করে। আমি হিংসা করছি না তাদের, যারা বাংলা এবং ব্রহ্মদেশ লুণ্ঠন করছে। এ দু দেশের লোক আমোদপ্রিয় ও শ্রম-বিমুখ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বাঙালী অধিকাংশ লোক কাপড়ের দর বৃদ্ধি হতে নিজের ছেলের সর্দ্দি কাশী প্রভৃতির জন্য পণ্ডিত নেহেরু বা ডাক্তার বিধানচন্দ্রের বুদ্ধিহীনতাকে দায়ী করে. বর্ম্মী স্ত্রীর সারং ছিঁড়লে শ্রী ইউ নুকে দায়ী করে কিনা, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে আমি একান্ত অসমর্থ। কিন্তু বর্ম্মা ও বাঙালীর ধনস্থানে শনির নিরন্তর অমোঘ দৃষ্টি, এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

সম্প্রতি বর্ম্মা গবর্ণমেন্টের বিধি অনুসারে দেশের স্থায়ী অধিবাসী ভিন্ন কাকেও বাণিজ্যের লাইসেন্স দেওয়া হবে না। একটি বড় কারবার ব্যবসাদারের উল্লেখ ক'রে এক ভদ্রলোক বল্লেন—এঁর তিন ছেলে একজনের ডমিসাইল ব্রহ্মে, একজনের ভারতে এবং তৃতীয়ের পাকীস্থানে এদের তিন দেশেরই ব্যবসায় বেশ বাড় বাড়ন্ত।

আমাদের দেশে আয়করের চাপ যেমন বাড়ছে—ইংরাজ বণিক তেমনি দেশ থেকে সাঁতারু ও নাচিয়ে ছেলে আমদানী করছে মোটা বেতনে। যে টাকা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য সে টাকায় স্বজাতি-পোষণ চলছে। সেদিন চক্ষে ঠুলি বেঁধে দেশের মুখ গরীবের প্রতি ফিরিয়ে বিবাহ-কর পোষণ করেছে গবর্ণমেন্ট আয় করের বিধানে। কুমারদেব গাঁ পয়সার উপর কর বসিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে সরকার অঙ্ক ক সে সব বড় কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

মোটের উপর ব্রহ্মদেশ উন্নতি করছে। কিন্তু বুকের জমাটি প কতদিনে সরবে সে কথা কে বলতে পারে। ভারত ও ব্রহ্মের ইষ্টা কিন্তু এক সুতায় বাঁধা, একথা সবাই উপলব্ধি করতে পারি।

চাহনি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

তোমার চোখের বিদ্যুৎ-চাহনিতে
একটি ঝলক আগুনের ঝলকানি,
পতঙ্গ-প্রায় মত্ত-আবেগ ভরে—
শুধু পুড়ে মরা কামনার সন্ধানী।
তোমার চাহনি বিস্মৃত অলকার
কমনীয় দেহে মধুলোভী সৌরভ;
ভ্রমরের শত মুখরিত গুঞ্জন
কিন্নর-মনে উন্নীত গৌরব।
জানি, জানি—তাই আজো চাটুকার-বাণী,
যদিও তোমার নয়নে ধূসর-রেখা—
তোমার দেহের মলিন শাড়িটি ঘিরে,
আজো কেন হায়, আমার কবিতা লেখা?

দৃষ্টিভ্রম

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্চর্য—খুব আশ্চর্য! যে দিনই পরিশ্রম বেশী হয়, অতিরিক্ত কথা বলে, বিভিন্ন রোগীর সংস্রবে এসে মনটা একটা ক্লান্তিকর আচ্ছন্নতায় ভরে থাকে—সেই দিনই যেন পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচীর বিশেষ একটি ঘটনা নির্ভুলভাবে সংঘটিত হয় ডাঃ দেবনাথ মিত্রের পার্ক সার্কাসের নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ ফ্ল্যাটে।

দিবসান্তে স্নানাহার শেষ কোরে, সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ কোরে দক্ষিণের বারান্দায় নরম স্নিগ্ধ ডিভানে যখন দেহ এলিয়ে দেয়, মনোযোগ দেয় গভীর মনস্তত্ত্বমূলক কোনও বিদেশী প্রবন্ধে তখনই, এই বিশেষ অলস মুহূর্তটিকে সচকিত কোরে আসে সেই সকাতর আহ্বান—যে আহ্বানকে সে ইচ্ছা করলেই ফিরিয়ে দিতে পারে, করতে পারে অবহেলা—

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!"

"ডাক্তার মিত্র আছেন?"

"দেবনাথবাবু বাড়ী আছেন কি?"

না এই ব্যাকুল আহ্বানকে সে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না।

সোপানশ্রেণী বেয়ে নেমে আসে নীচে, একেবারে বাইরের দরজা উন্মুক্ত কোরে সাড়া দেয়,—"এই যে, আসুন। কি ব্যাপার?"

সেদিনও এল ডাক অমনি এক কর্মমুখর দিনের শেষে, রাত্রের তন্দ্রাবিহ্বল প্রথম যামে, বাতায়নপথে আসা দীপ-রশ্মি যখন প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে।

মাথায় বিস্রস্ত চুল, পরণে মোটা কোট, মোটা ধুতি, লোলচর্ম বৃদ্ধ আকুল হয়ে হাঁপাতে লাগলেন—

"চলুন ডাক্তারবাবু, আজ আর আপনাকে বিরক্ত না কোরে পারলাম না। কিছুতে বাড়ীতে টিকতে দিলে না মেয়ে আমার।"

ডাক্তারীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে যে গৃহদ্বারে এসে থামলেন সেই প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার প্রতি ফ্ল্যাটে ধনী ভাড়াটে। একতলার ফ্ল্যাটটি সম্প্রতি ভরেছে—এটা যেতে আসতে চোখে পড়েছে ডাক্তারের। নিজের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। সারা বাড়ীর কক্ষে কক্ষে কলকাকলি, গুঞ্জরণ, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি। জীবনের চাঞ্চল্য যেন উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে এই প্রাসাদের প্রতিটি গবাক্ষ পথে।

কিন্তু আশ্চর্য নিস্তব্ধ এই নিম্নতম বাসস্থানটি ও তার অভ্যন্তরে যারা দিন কাটাচ্ছে সেই নীরব, মূক অধিবাসিবৃন্দ। কোনও শব্দ নেই, কোনও স্পন্দন অনুভূত হয় না বাইরে থেকে। পর্দায় ঢাকা বাতায়ন পথ মনে হয় যেন কী এক নৈঃশব্দে নির্জীব তন্দ্রাতুর হয়ে আছে—অন্ধকার, মৃত্যুশীতল।

বৃদ্ধ অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলেন, পশ্চাতে ব্যাগ হস্তে ডাক্তার দেবনাথ মিত্র।

করিডর অতিক্রম কোরে, ড্রইংরুম পিছনে ফেলে এলেন একেবারে শেষপ্রান্তে শয়ন কক্ষের মাঝে। প্রবেশ পথে কালো মোটা কম্বলের ভারী পর্দা, জানালায়ও তদ্রূপ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বছর কয়েক পূর্বের নিষ্প্রদীপ রজনীতে কোনও একটি বন্ধঘর হতে এসেছে আহ্বান। ভিতরের আলো যাতে বাইরে বিচ্ছুরিত না হয় তারই জন্য বুঝি এই সতর্কতার প্রয়োজন?

তা নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত বলা যায়। বাইরের আলো যাতে ভিতরে না প্রবেশ করে এত সযত্ন আয়োজন তারই জন্য।

কক্ষটির একটি বাতি গাঢ় নীল, অপরটি উজ্জ্বল, তীব্র। আপাততঃ উজ্জ্বল বাতিতেই সর্বত্র সুস্পষ্ট, আলোকিত।

ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ বত্সরের একটি যুবক শায়িত শয্যায়। কোনও শব্দ নেই, চাঞ্চল্যের নেই এতটুকু ইংগিত। মৃতপ্রায়, নীরব নিথর। চোখ দুটি নিমীলিত। বলিষ্ঠ দেহ সুগঠিত।

শিয়রে বসে মৃদু মৃদু বাতাস কোরছে যে নারী—তার সৌন্দর্য অসামান্য। পদ্মপলাশ আঁখি দুটি যেন মায়াময়, চাহনিতে যেন ভাবহীন মদির-বিহ্বলতা। পালংকের পাশে রাখা টেবিলে একটি জলের গ্লাস, একটি তোয়ালে আর একটি সুদৃশ্য হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্যময় নাতিদীর্ঘ যষ্টি।

"স্বাতী, মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। ডাক্তার মিত্র পাশেই থাকেন।" প্রস্তর প্রতিমায় জাগল সাড়া,—

"এই যে আসুন ডাক্তারবাবু। রূপসী,—চেয়ার দে বাবুকে।" বীণানিন্দিত কণ্ঠে আদেশ করল গৃহকর্ত্রী।

ঝকঝকে পালিশকরা চেয়ার এগিয়ে দিল মার্জিত মাদ্রাজী আয়া, অতি ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে দাঁড়াল যথাস্থানে—বাইরে পর্দার অন্তরালে।

"কি হয়েছে বলুন ত।"—ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে হাত রাখল, বুকে বসাল ষ্টেথিস্কোপ, চোখের মুদিতপত্র উন্মুক্ত কোরে দেখল, গাল দুটি ধরে ঈষৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করল।

"কতক্ষণ এ রকম অজ্ঞান হয়ে আছেন? মাঝে মাঝে কি হয় এই ফিট? কি করছিলেন একটু আগে? কোথায় ছিলেন? কি খেয়েছেন ডিনারের সময়?"

প্রশ্ন ঝরতে লাগল ডাক্তারের মুখ থেকে আর কখনও স্বাতী, কখনও বা তার বৃদ্ধ পিতা জবাব যোগাতে লাগলেন।

উঃ, কি গুমট্ ঘরে। এখন ত বেশী শীত পড়েনি, জানলাগুলি বন্ধ কেন? এত ভারী কালো পর্দা দিয়েছেন কেন শোবার ঘরে? সরিয়ে দিন—আসতে দিন বাইরের নির্মল বিশুদ্ধ বাতাস, আলো।"

হেমন্তের নাতিশীতোষ্ণ রাত্রেও ঘরের মধ্যে ডাক্তার গলদঘর্ম হয়ে উঠল।

"আলো?"—ভাবলেশহীন পদ্মচক্ষু তুলে ধরল মেয়েটি ডাক্তারের মুখের পরে। সে দৃষ্টি আর নামল না, একদৃষ্টে কী যেন লক্ষ্য করল ডাক্তারের মুখপানে।

"আলো উনি সইতে পারেন না, ডাক্তারবাবু। ঘরের উজ্জ্বল আলো না, বাইরের আকাশের আলো, দিনের আলোও নয়। আজকে উনি ঘুমিয়ে পড়ার পর আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেল একটা গ্লাস। বাহাদুর এসে বড় আলোটা জেলে কাঁচের টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ ওঁর ঘুম গেল ভেঙে, "চোখ গেল, মাথা গেল, একি হল" বলতে বলতে উনি জ্ঞান হারালেন—তারপর থেকে এই অবস্থা।"

"এ রকম কতদিন হচ্ছে? অসুখ ত তাহলে ওঁর চোখেরই। ডাক্তার দেখিয়েছেন—কোন চক্ষু চিকিৎসক?

হাঁ, অনেক, অনেক। কত ডাক্তার যে দেখলেন। বিলেত-আমেরিকার বড় বড় চোখের ডাক্তার এসে দেখে গেলেন—কেউ কিছু করতে পারে নি—দিতে পারে নি সারিয়ে। মঠো মঠো অর্থ গেছে—পরিবর্তে চক্ষু জ্বালার কিছুমাত্র আরাম কেউ করতে পারে নি। তারা কি বলে জানেন? তারা—"

সহসা থেমে গেল। কিন্তু পরম বিস্ময় বোধ করল ডাক্তার। চোখে তার ধাঁধা লাগল যেন। দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটি মার্জনা করল। কি যেন অদ্ভুত, অতিশয় অদ্ভুত, অস্বাভাবিক লাগছে। আর এই নারীর চোখের পাতা দুটি ত আশ্চর্য, এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তবুও নিমেষের জন্যও পড়ল না পলক!

একটি সুন্দরী যুবতীর ততোধিক সুন্দর দুটি স্বপ্নালু চক্ষুর সম্মুখে একভাবে বসে থেকে ডাক্তার যেন অস্বস্তি বোধ করল। কী দেখছে এই রমণী ওর মুখে? ডাক্তার নিজের বেশভূষার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পকেট থেকে রুমাল বার কোরে, ললাট, মুখ, ঘাড় বেশ কোরে মুছে নিল।

পুনর্বার স্থির হয়ে তাকাল সম্মুখস্থ চক্ষুতারকা দুটির পানে। সুদীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষছায়ে যে আঁখি তারা—কই সে ত মিথ্যা নয়, ভুল নয়, মনে হল সে ত কম্পিত হল, জীবনের প্রমাণ দিয়ে দিল। সুন্দর দুটি সুনীল তারা! বিমুগ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে পারল না ডাক্তার! হতচেতন স্বামীর সুন্দরী স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে রইল।

কিন্তু অদ্ভুত ভাবে চোখে চোখ রেখে অনারীসুলভ ভাবে তাকিয়ে রইল রোগীপত্নী।

বিস্মৃতপ্রায় প্রশ্নটিকে শুষ্ক তালু ও জিহ্বা দ্বারা সরস করবার চেষ্টা করল ডাক্তার। বহু কষ্টে শুধাল

"হ্যাঁ, বলুন কি বলেন তারা? চোখের অসুখ সারানই গেল না—কি রকম? তাঁদের প্রসঙ্গে কি বলছিলেন থামলেন কেন?"

একটু কুণ্ঠাভরে, শুষ্কস্বরে উত্তর দিল স্বাতী—অথচ চক্ষুপল্লব একটুও না নাবিয়ে—"তারা বলেন রোগটা চোখের নয়। যে অসুখ চোখেরই নয়, তার চিকিৎসা করা তাঁদের সাধ্য নয়।"

ডাক্তার যেন আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হল! স্বামীর অচেতনতা কি তার জীবনসংগিনীকে এনে দিল বাতুলতা? কি বলছে এ? যে লোক আলো সইতে পারে না—ভোরের স্নিগ্ধ আলো, গোধূলির ম্লান আলো, আবার রাত্রির ছায়া-ছায়া আলোও যার চোখে জাগায় প্রদাহ—সূচীবিদ্ধ জ্বালা, তার অসুস্থতা চক্ষুসংক্রান্তই নয়—একি অসংলগ্ন প্রলাপ?

সিরিঞ্জে ঔষধ ভরে ইন্‌জেকশন দিলে রোগীর বাহুমূলে। রোগী দেখতে এসে নিজের মস্তকের মধ্যে যে তাণ্ডব সুরু হল, হৃৎপিণ্ডের কোষে কোষে যে ঝঞ্ঝা বইতে লাগল তা রীতিমত স্নায়ুবৈলক্ষণ্যের লক্ষণ।

"দিন, খুলে দিন পর্দা, বাতাস আসুক, ঝড় বয়ে যাক ঘরে।"

প্রায় ক্ষিপ্তস্বরে বলে উঠল ডাক্তার—রোগীর জন্য নয় একেবারে স্বার্থপরের মত নিজের দম-বন্ধ-হওয়া ভাবটাকে দূর করবার চেষ্টায়। উঃ, সেই পলাশ-লোচনের গভীর শীতল দৃষ্টি এতক্ষণে সরে গেছে! কিন্তু বিস্ময় আরও সঞ্চিত ছিল। ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজে মুখ তুলে দেখল—সুন্দর নিটোল করপল্লবে ধৃত সুচারু হস্তিদন্তের যষ্টীর সাহায্যে প্রতি গবাক্ষের পর্দা তুলে দিচ্ছে স্বাতী, হরিণীর মত চঞ্চল লঘু সঞ্চারণ, সুদৃঢ় পদক্ষেপ!

ওঃ, অন্ধ!—করুণায় বিগলিত হয়ে গেল ডাক্তার—বিস্মিত হবার আর অবকাশ রইল না।

"থাক্, থাক্, আপনি বসুন, আমি দিচ্ছি, আমি খুলে দিচ্ছি।"

উত্থিত ডাক্তারকে বাধা দিয়ে এগিয়ে এলেন অসহায় পিতা, সজল চোখ, কম্পিত ওষ্ঠাধর—

"না না, আপনি বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দিচ্ছি। তুই বোস্ মা মণির কাছে।"

কলের পুতুলের মত স্বস্থানে বসে পড়ল ডাক্তার। সবই অভাবনীয়! এই সম্বলহীন জরাজীর্ণ পিতা, চক্ষুষ্মতী অন্ধ দুহিতা, দৃষ্টিবান্ অন্ধপ্রায় জামাতা—অকল্পনীয়, অনির্বচনীয়! কে যে যথার্থ রোগী সে কথা তলিয়ে ভাবতে গেলে ঘটবে স্নায়ুবিকার। নিজেকে যথাসাধ্য সাম্‌লে নিয়ে অচেতন রোগীর প্রতি মনঃসংযোগ করল।

শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে এসেছে স্বাভাবিক। ধমনীর গতিও অস্বাভাবিক নেই। হার্টের অবস্থা ভালই।

ধীরে—অতি ধীরে চক্ষুপল্লব উন্মীলিত করল—মস্তক সঞ্চালন করল মণিশংকর। ভাবহীন দৃষ্টি মেলে দিল শূন্যে। দুই হস্ত সঞ্চালিত কোরে কাকে খুঁজতে লাগল। অস্ফুটে বলল,

"স্বাতী, কোথায় তুমি? কাছে এস। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

ইতস্তত হস্তচালনা কোরে ডাক্তারের মণিবন্ধ ধরে মুখের পানে তাকিয়ে বলল,

"কে, বাবা? আপনি এখনও শুতে যান নি! যান্ আমার ত আর কোনও কষ্ট নেই। চোখের যাতনাও আর নেই। কি কোরে যেন সব জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কেন বসে আছেন কষ্ট কোরে?"

সপ্রশ্ন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের চোখের দিকে।

অকস্মাৎ অদূরে দণ্ডায়মান পিতা হাউ হাউ কোরে কেঁদে উঠলেন

"ডাক্তারবাবু, অন্ধ, অন্ধ, মণিও আমার অন্ধ হয়ে গেছে। হায় ভগবান, কতদিন বাঁচব এই কষ্ট দেখবার জন্য।"

পালংকের কাষ্ঠফলকে মাথা ঠুকে আক্ষেপ কোরতে লাগলেন।

ক্ষিপ্রগতিতে নিজের অসাড় দেহটাকে বহু কষ্টে উত্তোলন কোরে ডাক্তার বৃদ্ধের নিকটে গেল, দুই হাতে স্কন্ধ ধরে সান্ত্বনার স্বরে বলল,

"কেন ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি দেখছি কি হয়েছে। ওঁর ঘুম বিশেষ দরকার। আপনি দয়া কোরে একটু

পাশের ঘরে যান। আমি এখুনি আসব। অনেক কথা জানবার আছে। বাহাদুর, বাবুকে নিয়ে শুইয়ে দাও। জল দাও, মাথায় বাতাস কর।"

বাহাদুরের সাহায্যে একপ্রকার জোর কোরে ঘরের বাইরে ঠেলে পাঠাল। ফিরে এসে বসল পরিত্যক্ত আসনে। সিরিঞ্জে কোরে পুনরায় রোগীর শরীরে প্রবেশ করাল ঔষধ।

সবটুকুই এত ত্বরিতে ঘটল যে সন্ত-চেতনাপ্রাপ্ত রোগীর পক্ষে চোখে না দেখলে অনুধাবন করা শক্ত।

বাহুতে বেদনা পেয়ে বলে উঠল মণিশংকর—

"কে, ডাক্তার? স্বাতী, ডাক্তারবাবু এসেছেন, কই তুমি আমাকে কিছু বলছ না।"

চোখ দুটি ডাক্তারের দিকে তুলে ধরল—

"ডাক্তারবাবু, আমার চোখের বড় জ্বালা ছিল, আলো সইতে পারি না। কত ডাক্তার দেখেছে—দেশী বিদেশী কেউ আরাম কোরতে পারেনি। দিন দিন যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। আজকে ঘরের জোরালো আলো দেখে এমন জ্বালা বেড়ে গেল যে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, আপনার ওযুধে আমার স-ব জ্বালা দূর হয়েছে—খুব আরাম পাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ঘর কি অন্ধকার? আমার কি জ্ঞান হয়েছে ঠিক? আমি যে কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না? স্বাতী, কাছে এস। ডাক্তারবাবু আপনি কোথায়? নীল বাতিটা জেলে দে বাহাদুর, অন্ধকারে ডাক্তারবাবুর কত অসুবিধা হল। ডাক্তারবাবু আমার এই চোখ দুটো ঠিক আছে ত?—"

পরিপূর্ণ দৃষ্টি! ডাক্তারের ললাটে দেখা দিল স্বেদবিন্দু, বক্ষমাঝে বয়ে গেল তড়িতশিহরণ।

কই, চোখে ত কিছু গরমিল নেই, নেই অস্বাভাবিকতা, কোনও অসুস্থতার লক্ষণ? সম্মুখে উপবিষ্টা প্রস্তরীভূতা অচঞ্চলা সেবিকার মনোহারিণী দুটি চোখের পানে তাকাল—

না—দুটি জোড়া চক্ষুই বেশ সাধারণ, সুস্থ। কারুকে ত দৃষ্টিহীন মনে হচ্ছে না। তবে কি দৃষ্টিভ্রম ঘটল ডাক্তারের?

ঐ যুবতীর ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম অক্ষিপল্লবের স্নিগ্ধছায়ায় যে দুটী সুনীল তারকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অসুস্থ স্বামীর রোগপাণ্ডুর মুখে সে ত অন্ধ নয়—নয় বিকৃত?

আর এই যে সুশ্রী যুবকের ক্ষণপূর্বে নিমীলিত চক্ষুযুগল চেতনা লাভ কোরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—ডাক্তারেরই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে উত্তরের প্রত্যাশায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে—ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠছে কৃষ্ণবিন্দু দুটি—সেও কি অসত্য—অন্ধ?

ডাক্তারের চিন্তাশক্তি লোপ পাবার মত হল। দশ মিনিটের মধ্যেই রোগী হল নিদ্রাভিভূত। ঔষধের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে।

"ঘুমিয়ে পড়েছেন"—ডাক্তার বলল—"সারারাত ঘুমোবেন, চিন্তার কিছু নেই। একটা ওযুধ রেখে যাচ্ছি, জেগে উঠলে এক দাগ খাইয়ে দেবেন আর আমাকে দেবেন সংবাদ।"

"ডাক্তার মিত্র"

দরজার বাইরে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন ডাক্তার—

"ঘরে কি বড় বাতিটা জ্বলছে, না নীল বাতিটা?—" সুমধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করল স্বাতী।

ডাক্তারের যেন সম্বিত ফিরে এল এই প্রশ্নে। তাই ত—এ নারী যে চক্ষুহীনা, একেই কিনা ওযুধ খাওয়াবার নির্দেশ দিয়ে নিশ্চেন্তে চলে যাচ্ছিল সে। নিজের বিচক্ষণতার অভাবে নিজেই বিরক্ত হল। কিন্তু তারই বা দোষ কোথায়? এদের চক্ষুর স্বাভাবিকতা এতই স্পষ্ট যে প্রতিক্ষণে প্রমাদ ঘটায়। ভুলে যেতে হয়—কে দৃষ্টিহীন, আর কে দৃষ্টিবান। সত্যই বিস্ময়কর এদের দৃষ্টিবিভ্রম! চারটি সুস্থ সুন্দর চোখের দৃষ্টিভাণ্ডার যে এতখানি শূন্যতায় ভরে গেছে, এ যদি কোনও সাধারণ ডাক্তারের ধারণার অতীত হয় সে কি খুব দূষণীয়, অভিজ্ঞতার অভাব?

"না, বড় আলোই জ্বলছে। নিবিয়ে দিতে বলব?"

"না, না, থাক্। কিন্তু—কিন্তু, আলো যে উনি সইতে পারেন না একেবারে—একটুও। অথচ এত আলোতেও ওঁর চোখে নেই কোনও কষ্ট, উনি বলছেন বরং ঘর অন্ধকার কেন? এ ত ওঁর কথা নয়—ওঁর স্বাভাবিক চোখের দেখতে পাওয়া নয়। এ যে অন্ধর আঁধারে হাতড়ে মরা,—সে আমি জানি, খু—ব জানি। কি হবে ডাক্তারবাবু? দুজনেই কি বাকী জীবন অন্ধকারে কাটাব? আমার বাবা যখন থাকবে না—তখন কে আমাদের দেখবে, কে ওঁর সেবা করবে? উনি যে আমার জন্য স—ব সুখ

বিসর্জন দিয়েছেন। না, না, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। ওঁকে ভাল করে দিন—ফিরিয়ে দিন ওঁর চোখ। এর চেয়ে যে চোখের যাতনাও ভাল ছিল—সব জ্বালার অবসান হয়ে অন্তর যে জ্বলে পুড়ে থাক্ হয়ে গেল ডাক্তারবাবু?"

তীব্র বেদনায়, অনুশোচনায় বিলাপ করতে লাগল করুণাময়ী পত্নী। নিজের অন্ধতার কথা রইল না মনে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আক্ষেপে ভেঙে পড়তে লাগল স্বামীর এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে। কমলনয়ন থেকে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল মুক্তার অশ্রুবিন্দু।

"কেন ব্যস্ত হচ্ছেন। কালকেই আমি বড় ডাক্তার আনব। আনব বড় চক্ষুবিদ্, মনোবিদ্—নিশ্চয় ভাল হবেন—ফিরে পাবেন দৃষ্টি। অন্ধই হবেন ভাবছেন কেন? তা কি আর হয়? চোখের অসুখ কি সব সময় অন্ধকারের দিকেই ঠেলে দেয়—আনে না কোনও নতুন আলোর আশা? আপনি শুয়ে পড়ুন ত। বিশ্রাম করুন। রোগী আজ আর উঠবে না। আমি আপনার বাবার কাছে বসি। তিনি বড় বিচলিত হয়েছেন। আপনাকে শক্ত হতে হবে। বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা ত আপনিই দেবেন। নিন, ঘুমিয়ে নিন্।"

বৃথাই কতগুলি সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে গেল ভাগ্যহীনাকে। রোগী যে চিকিৎসার বাইরে সে কথা তার চেয়ে আর কে জানে?

কক্ষান্তরে পিতা মুখ গুঁজে পড়েছিলেন বিছানায়, ডাক্তার ডেকে তুলল।

"বলুন সব কথা গোড়া থেকে খুলে—কিছু বাদ দেবেন না, লজ্জা করবেন না—রোগী তাহলে চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে। এত দেহযন্ত্রের কোনও রোগ নয়—কিছু দুর্বলও নয় চক্ষুস্নায়ুগুলি। অসুখ ত মনের—মস্তিষ্কের অপচিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল। কি জন্য কার জন্য এই মানসিক বিকার? স্ত্রী বা স্বামী ত বহু লোকেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধ থাকে—সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগে বহু লোকেই ত দৃষ্টি হারায়—কিন্তু তার জন্য অপরের এত চক্ষুপ্রদাহ, মনোবিকার ত দেখতে পাওয়া যায় না। যার দৃষ্টি আছে, সে যদি বলে দেখতে পাচ্ছি না—তা হলে ডাক্তার সারাবে কি? অসুস্থতাটা আসলে কোথায়, সেইটাই ত জানা বিশেষ প্রয়োজন সর্বাগ্রে।"

"ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু, সকলেই বলে অসুখ চোখের নয় মনের, মাথার। যার চোখ দুটি এত সুস্থ, দৃষ্টি যার এত প্রখর, সে কখনও কম দেখতে পারে না—হতে পারে না চোখের জ্বালা। এই কথাই বলে সবাই। হ্যাঁ ডাক্তারবাবু—সবাই ঠিকই বলেন। জ্বালা ওর মনের। ওর কৃতকর্মের অনুতাপই ওকে দিন দিন এই মিথ্যা অন্ধত্বের পথে ঠেলে দিল। কিন্তু আপনি ভুল বুঝবেন না, মণি আমার বড় ভাল ছেলে—অমন মহৎ প্রাণ দুটি নেই। ভগবান্ এ কি লিখলে, ওর অদৃষ্টে! দয়ার প্রতিদান এই ভাবেই দেবে? এই কি ওর অত মহত্ত্বের পুরস্কার?"

"আর চেপে রাখব না—আপনাকে সব খুলেই বলব। আর এই ভাঙা বুকে ওই আগুন চেপে রাখতে পারছি না। আজ সবই বলতে হবে আমাকে।"

* * * *

বারো বছর আগে জমীদার মণিশংকর বন্ধুর ভগ্নীর বিবাহে কোন এক গ্রামে যায়। দেনাপাওনা নিয়ে কলহ হওয়াতে পাত্র পক্ষ বিদায় নিল। বন্ধুর সম্মান রাখতে মণিশংকরই এগিয়ে গেল। পাণিগ্রহণ করল ঐ অপরূপ রূপবতী কন্যার।

পিতৃমাতৃহীন তরুণ মণিশংকর নিজের জমীদারিতে বধূকে নিয়ে সুখেই বসবাস করে। ইতিমধ্যে বন্ধুর মৃত্যুতে স্বাতীর পিতাকে নিজের গৃহে এনে পিতার স্থানে বসায়—সম্মান দেয় যথোচিত। এইভাবে পরম সুখে কাটে মাসের পর মাস।

সেই বিভীষিকাময়ী কালরাত্রির কথা মনে হলে আজও বৃদ্ধের রোমাঞ্চ হয়। সন্ধ্যা যখন তার ধূসর বর্ণের তারকাখচিত অঞ্চল আকাশের গায়ে বিছিয়ে দিচ্ছিল, গৃহে গৃহে বধূরা জ্বালাচ্ছিল মঙ্গলদীপ তুলসীমূলে, জমীদার-বাড়ীর পূজারী যখন গৃহদেবতার সম্মুখে শংখ ঘণ্টা বাজিয়ে আরতির মন্ত্রপাঠ করছিলেন, পূজার দালানে যুক্তকরে বসেছিল স্বাতী, মূর্তিমতী ভক্তি, ধ্যানাবিষ্টা শুচিস্নিগ্ধা।

অকস্মাৎ ও ছিনিয়ে নিল পূজারীর হস্তধৃত পঞ্চপ্রদীপ, সজোরে নিক্ষেপ করল গৃহবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি উদ্দেশ কোরে। চক্ষের নিমেষে পূজার নৈবেদ্য দুই হস্তে ধরে বিক্ষিপ্ত করল ইতস্ততঃ। পিতা নিরস্ত করতে গেলে, পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন পরিচারিকা ধরতে গেলে অকথ্য

অবোধ্য ভাষায় তিরস্কার করল। ঘর সংসারের যাবতীয় দ্রব্য তছ্‌নছ্‌ কোরে বেড়াল। ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখমণ্ডল যেন কী এক উত্তেজনায় ফেটে পড়তে লাগল। পদ্মের মত নয়নদ্বয় যেন কোন এক অপদেবতার অপদৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগল চতুর্দিকে। এই মহাপ্রলয়ক্ষণে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল মণিশংকর।

স্বাতী, স্বাতী, কি ব্যাপার। কি, হল কি? কে কি কোরেছে? কেন এত রাগ? শোন, দাঁড়াও।"

বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না কোরে রণচণ্ডীর মত তাণ্ডব নৃত্য কোরে ফিরতে লাগল অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী কুলবধূ, বিপর্যস্ত বসন, উত্‌ক্ষিপ্তকেশ, সুরূপা উন্মাদিনী পত্নী।

ডাক্তার এল, দিল ঘুমের ওষুধ, শান্ত হয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল সমস্ত রাত্রি।

পরদিন প্রাতে সকলে ভয়চকিত প্রাণে অপেক্ষা কোরে রইল কি ঘটবে—কি অমঙ্গল নিয়ে প্রভাত হবে রজনী। কোন কুমতির বার্তা শ্রুতিগোচরে গেলে আচম্বিতে জাগ্রত হবে এই স্নেহশীলা ধৈর্যশীলা বধূরাণী—কে জানে? ডাক্তার অপেক্ষায় রইলেন কক্ষান্তরে—সংগে হতভাগা মণিশংকর। একটি রাত্রির দুর্ভাবনার উদ্বেগে তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চক্ষু কোটরগত, সুন্দর মুখশ্রী কালিমাময়।

দাসী এসে সংবাদ দিল শুভ। না, বৌরাণীর ত কিছু অসুখ আর নেই। গাত্রোত্থান কোরে যথারীতি স্নান সেরেছেন। স্নানান্তে পূজাপাঠ সংসারের ক্রিয়াকর্ম, মণিশংকরের তত্ত্বাবধান, বৃদ্ধ পিতার পরিচর্যা, সবই সমাধা করল যথাপূর্ব। ডাক্তারের বিশেষ পরামর্শে কেউ আর উল্লেখ করল না গত রাত্রির সেই স্বপ্নময় পরিস্থিতির কথা।

নাটমন্দিরে প্রবেশ কোরে মদনমোহনের ভগ্নমুকুট ও ছিন্ন বসনের জন্য দাসী চাকর, পুরোহিত সবাইকে তিরস্কার করল। প্রভুর আদেশে সকলে অকৃত অপরাধ শিরোধার্য কোরে নিল—স্বাতী মা যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তাঁর জন্য সবাই প্রাণ দেবে।

কিন্তু হায়, এই আত্মগোপন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হল আকাশের বুকে যখন অস্তরাগের রঙীন আভা ফুটল, মেঘের কোলে কোলে আবছায়া আঁধারে যখন কুলায় ফিরে যেতে লাগল হংসবলাকা, একটি একটি কোরে জ্বলে উঠল সাঁঝের প্রদীপ, সমস্ত জমীদার-বাড়ীর ভিত্তি প্রকম্পিত কোরে জেগে উঠল কোন এক পিশাচীর অট্টহাসি। কী এক ভয়ংকর অশুভ ইংগিত নিয়ে সমগ্র প্রাসাদময় পরিভ্রমণ কোরতে লাগল বিগত নিশীথের সেই রণচণ্ডিকা।

সব ব্যর্থ হল! ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টোট্‌কা, ওঝা, গুণী, সাধু-সন্ন্যাসী। কিছু আর বাকী রইল না। খ্যাতনামা চিকিৎসক এল বিদেশ থেকে, মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী, বহু কঠিন মনঃপীড়াকে আরাম কোরেছেন, নিরানন্দ গৃহে এনেছেন হাসি, অন্ধকার জীবনে জ্বেলেছেন আলো—সব সকলে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, হতাশ হয়ে ফিরে গেল। চিকিৎসা-বিদ্যারও সীমা আছে।

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার আলো ধরার বুকে নেমে আসবার আগেই ঔষধ প্রয়োগে রাখা হত স্বাতীকে নিদ্রামগ্ন কোরে পরদিন সকাল অবধি। তাতে সংসারে শৃংখলা এল—কিন্তু এল না শান্তি। হাসি যেন চিরজীবনের মত বিদায় নিল ওই গৃহ থেকে। মণিশংকরের তৃষিতহৃদয় মথিত কোরে রাতের পর রাত জেগে উঠত অতৃপ্ত হাহাকার।

অবশেষে পিতার সম্মতিক্রমে সেই গৃহবৈদ্যের পরামর্শে মণিশংকর শরণ নিল এক কঠিন চিকিৎসা পদ্ধতির। ধীরে, অতি ধীরে দিনের পর দিন নিদ্রিত অবস্থায় ইনজেকশন দ্বারা স্বাতীর ভুবন ভুলানো সেই চক্ষুর সতেজ স্নায়ুগুলিকে দুর্বল, নিষ্ক্রিয় কোরে দিতে থাকল। একাদিক্রমে চলতে লাগল সর্বসমক্ষে চক্ষু-চিকিৎসার একটি মিথ্যা আয়োজন। এই মারাত্মক পদ্ধতির কথা এ তিন জন ব্যতীত জগতে কেউ জানতে পারল না।

দুর্ধর্ষ রিপুর সঙ্গে লড়তে হলে যে ততোধিক দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের প্রয়োজন মণিশংকর সে নীতির ভালভাবেই অনুসরণ করল। মন চঞ্চল হলেও কঠিন হস্তে বিষপ্রয়োগ করতে লাগল। বহু বিনিদ্র রজনীর শেষে বহু অতৃপ্ত বাসনার অগ্নিদহনে জ্বলে জ্বলে এই দিব্যজ্ঞান লাভ কোরেছে সে।

যে স্বপ্নালু চাহনিতে আত্মহারা হয়ে বিনা দ্বিধায় পরিণয়সূত্রে ধরা দিয়েছিল—আজ এতদিন পরে সেই আঁখি স্বহস্তে উৎপাটিত করল। একটি নারীকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে হলে এই তার একমাত্র উপায়। দৃষ্টি হারাবে—কিন্তু সরল সুখময় জীবন, স্নিগ্ধ রজনীর স্নেহস্পর্শ লাভ করবে।

তাই হল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জ্যোতি, দিবাভাগের সকল আলো, সান্ধ্য-রশ্মির অশুভ সংকেত সব একেবারে নির্বাপিত হয়ে গেল স্বাতীর চোখের 'পরে। চক্ষুযুগলের সুনীল তারকা দুটি রইল অবিকৃত, সুস্থ, শুধু স্নায়ুগুলির দৌর্বল্য ঘটিয়ে দৃষ্টিকে করা হল নিষ্ক্রিয়, জ্যোতিহীন! বিশাল পদ্মপলাশলোচনে আর কোনও দিন দেখা গেল না কৃষ্ণভ্রমরের চাঞ্চল্য, নীলিমার চকিত দ্যুতি!

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে নিতান্তই স্বাভাবিক অসুস্থতা বলে অন্তরের সংগে গ্রহণ করল স্বাতী। নৈশপ্রেত তার মস্তিষ্কে আর কোনও বিকার ঘটাতে পারল না। সে দাসী, আয়া ও যষ্ঠীর সাহায্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল সংসারের মাঝে।

প্রাতঃসূর্য আর শর্বরীর শশধর তার কাছে সমান হয়ে গেল—ঊষারাগ ও অস্তরাগে রইল না কোনও প্রভেদ।

কিন্তু তার বছর দুই পর থেকে অত্যাশ্চর্য এক প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেল মণিশংকরের অবচেতন মনের স্তরে স্তরে। চোখের যাতনায় ভুগে ভুগে ও যখন চিকিৎসার বাইরে চলে গেল তখন প্রখ্যাত মনোবিদ্, সরকারী মেণ্টাল হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তার বিশেষ যত্ন নিয়ে পরীক্ষা কোরে বলে গেলেন রোগী ভুগছে—মনে মনে, মানসিক বিকারে। অসুস্থতা চোখের নয়, মনের, মস্তিষ্কের।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন রিক্ত শূন্যহৃদয় পিতা—

"ভগবান, আমাকে নাও!"

সমস্ত শুনে স্থাণুর মত বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ডাক্তার দেবনাথ মিত্র।

শরীরতত্ত্বের সাথে সাথে মানবমনের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি নিয়ে তিনি দিনের পর দিন যে গবেষণা কোরেছেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অবহেলা কোরেছেন যে রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন মানসে এতদিন পরে এই প্রাসাদের নিম্নতম কক্ষে কি হতে চলেছে তার কঠিন পরীক্ষা, সকল সমস্যার সমাধান?

এডিনবরা আন্তঃজাতীয় সঙ্গীত ও নাটক উৎসব

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ বি-এ, এল-এল-বি, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

দেশবিদেশ থেকে যাহাতে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে অধিকসংখ্যক ভ্রমণকারী ইংলণ্ড বেড়াতে আসেন সেজন্য এখানকার প্রতি সহরে নানারকম উৎসবের আয়োজন করা হয়। লণ্ডন সহরে যে কতরকম উৎসব, অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে—তা বলে শেষ করা যায় না। লণ্ডন কাউণ্টি-কাউন্সিল যাঁদের হাতে, লণ্ডন সহর—কেবলমাত্র সিটি-অব-লণ্ডনের ক্ষুদ্র অংশটিবাদে, সহরতলীর পরিচালনার ভার আছে। তাঁরা লণ্ডনের বিভিন্ন পার্ক ও উদ্যানে নানারকম সঙ্গীত ও বাদ্যের আয়োজন করেছেন, আর তাঁদের বিখ্যাত Festival Hallএ নানারকম সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রদর্শনী ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। টেমস নদীর তীরে নবনির্ম্মিত এই ফেষ্টিভ্যাল হল্ ও তার চমকপ্রদ সাজ সজ্জা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ফেষ্টিভ্যাল হল সংলগ্ন নদীতীরস্থ রেস্তোরাঁতে বসে কর্ম্মব্যস্ত লণ্ডননগরীর শোভা পর্য্যবেক্ষণ করা খুব উপভোগ্য। L. C. C.র কর্তৃত্বাধীনে এখানে ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের অন্য দেশের উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখান হয়। ভিতরে তিন হাজার দর্শকের স্থান আছে। লণ্ডনের ফেষ্টিভ্যাল হলে কয়েকটি অভিনয় দেখলাম, আর্লসকোর্টস্থ অলিম্পিয়াতে পুষ্পপ্রদর্শনী ও ব্রিটিশ খাদ্যমেলা ও আন্তঃজাতীয় রন্ধনশালা প্রদর্শনী দেখলাম। ইতিমধ্যে শুনলাম যে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরাতে উৎসব হচ্ছে। উৎসবের দেশে ইহা এক বিশেষ রকমের উৎসব। কাগজে এই উৎসব নিয়ে অনেক কথা চলেছে। যাঁরা এই উৎসব দেখেছেন শতমুখে প্রশংসা করলেন, এমন কি বললেন যে এই উৎসব দেখতে পাওয়া নাকি ভাগ্যের কথা। ভাবলাম প্রায় ২৫ বছর পরে আবার স্কটল্যাণ্ড বেড়ান হবে, আর তার সঙ্গে এডিনবরা উৎসব দেখা হবে, যোগাযোগ ভাল। অতএব একদা সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন থেকে আমরা মটরকোচে যাত্রা করি। পথে ইংলণ্ডের রমণীয় পল্লীঅঞ্চল দেখলাম, তারপর ইয়র্কসায়ারের বহু-প্রশংসিত পার্ব্বত্য ও লেক অঞ্চল বেড়িয়ে Grasmere এ কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের বাটী Dove Cottage দেখে, শেষে স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চল বেড়িয়ে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যারপর এডিনবরা পৌছলাম। এডিনবরা বড় সহর, স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী, তবে লণ্ডনের তুলনায় কিছু নহে। পৌছে দেখলাম এক তাজ্জব ব্যাপার। সহরের বড় রাস্তায় বাড়ীগুলির উপর নানারঙ্গের পতাকা উড়ছে, আর সর্ব্বত্র আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের চিহ্ন। রাত্রে সহর আলোকিত। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এডিনবরা উৎসব ব্যাপারটা কি, সহরের কোন জায়গায় হচ্ছে, কোন পথ দিয়ে সেখানে

পৌঁছান যায়। শুনলাম উৎসবের পুরা নাম হচ্ছে Edinburgh International Festival of Music and Drama অর্থাৎ—এডিনবরা আন্তর্জাতীয় সঙ্গীত ও নাটক উৎসব। এটা অষ্টম বার্ষিক উৎসব ২২শে আগষ্ট আরম্ভ হয়েছে ও শেষ হবে ১১ই সেপ্টেম্বর। ভেবেছিলাম আমাদের দেশে যেমন হয় উৎসবের জন্য, সহরের প্রান্তে একটা বড় মাঠ ঘিরে নিয়ে ছোট বড় নানারকম প্যাণ্ডাল খাটিয়ে সেখানে বিভিন্ন রকম খেলা, অভিনয়, আমোদ প্রমোদ, প্রদর্শনী, জিনিসপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা, সেই রকম বড়দরের একটা কিছু দেখব। কিন্তু যখন শুনলাম যে উৎসবের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—প্রথমটা কেমন যেন মনে হল। তারপরই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সমস্ত এডিনবরা সহর জুড়ে এই উৎবের ক্ষেত্র, আর প্রতি এডিনবরাবাসীর অন্তরে ইহার স্থান। এই উৎসবের পরিধি স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সীমাবিষ্ট ছিল না। সারা স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে লোক এসে এই উৎসবে মেতেছিলেন আর দেশ বিদেশ থেকে লোক এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। দেখলাম সমস্ত সহরে যত থিয়েটার, সিনেমা ও হল্ আছে সর্ব্বত্র উৎসব উপলক্ষে বিশেষ একটা কিছু দেখান হচ্ছে, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও নাচ, কোথাও নাটক অভিনয় ইত্যাদি। যার গান ভাল লাগে তিনি গানের আসরে যাচ্ছেন, যার নতুন ফিল্ম দেখতে ভাল লাগে তিনি তাহাই দেখছেন। যিনি নাটক পছন্দ করেন তিনি নাটক দেখছেন, কেহবা চিত্রপ্রদর্শনী দেখে বেড়াচ্ছেন। উৎসব-মুখরিত এই সহর ও জাতিকে দেখে বুঝলাম যে ইহা সামান্য জিনিস নহে, ইহা স্কটল্যাণ্ডের অন্যতম জাতীয় উৎসব।

এই উৎসবের আয়োজন করেছেন Edinburgh Festival Society Limited তার সঙ্গে যুক্ত আছেন গ্রেটব্রিটেনের আর্টস কাউন্সিল ব্রিটিশ কাউন্সিল ও এডিনবরা সিটি করপোরেশন। এঁদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন সমস্ত স্কটল্যাণ্ডের লোক। উৎসবের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হচ্ছেন এডিনবরার লর্ড প্রভোষ্ট। এডিনবরার কাস্টল টেরেস Synad Hallএ ইহার বিরাট অফিস আছে। জনসাধারণকে সাহায্য করতে এঁরা সদাই প্রস্তুত। আগে জানালে এঁরা আগন্তুকদের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। বিভিন্ন উৎসব দেখার টিকিটেরও ব্যবস্থা করছেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্ট ও আমোদপ্রমোদের টিকিট বিক্রেতাগণের নিকটও কিনতে পাওয়া যায়। বহু আগে থেকে টিকিট কিনে না রাখলে ভাল নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির টিকিট শেষ মুহূর্ত্তে পাওয়া খুবই শক্ত। অনেকরকম কাগজ ও বই ছাপিয়ে উৎসবের খবর ও কার্য্যসূচি জনসাধারণকে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার বিশ্রামের দিন, প্রায় সবই বন্ধ। উৎসব উপলক্ষে একটা ক্লাবও করা হয়েছে। এটা আমাদের নিকট নূতন বোধ হল এর নাম Festival club ইহাই উৎসবের অভিনবত্ব উৎসবটা যে কত বিরাট তাহা এই ক্লাব থেকেও কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। উৎসব দেখতে যাঁরা আসেন, অথবা অভিনয়াদিতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, এটা তাঁদের সকলেরই মেলামেশার কেন্দ্র ইহাই উৎসবের সামাজিক মিলন কেন্দ্র। সকলকেই তাঁর সভ্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সিজন্ টিকিট কিনে সভ্য হওয়া যায় অথবা আড়াই শিলিং দিয়ে এক দিনের জন্য সভ্য হওয়া যায় ফেষ্টিভ্যাল ক্লাব সহরের মাঝখানে George streetএ অবস্থিত এখানে ভাল রেস্তোঁরা, বিশ্রামগার, টয়লেটস্ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। উৎসব সংক্রান্ত সমস্ত খবর এখানে পাওয়া যায়, সহরের নানা দ্রষ্টব্য বিষয়ের খবরও এরা দিচ্ছেন।

পাহাড়ের উপরে এডিনবরা কাসল্ ও নিম্নে প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট উদ্যান

উৎসবের নাম থেকে এর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে নানারকম সঙ্গীত, নৃত্য, অপেরা, নাটক, ছায়াচিত্র প্রভৃতির অভিনয়ের ব্যবস্থা করা ও উৎকর্ষ সাধন করা।

এইবার উৎসবের প্রধান আকর্ষণীয় জিনিসগুলির কথা লিখছি। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশের বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রা, ব্যালেট্, অপেরা, নাটক প্রভৃতি দেখান হচ্ছে। লণ্ডনের বিখ্যাত Old vic সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মহাকবি সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'A Mid Summer Night's Dream'র অভিনয় হয়েছিল বিখ্যাত Empire Theatreএ, আর Macbeth অভিনয় হয়েছিল Church of Scotlandএর বিরা

Assembly Hallএ। বলাবাহুল্য এ অভিনয়গুলি অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। বিখ্যাত Golden Age Singersদের গানে Free Masonsএ হল মুখরিত হয়েছিল। Parisএর বিখ্যাত Little Singers বা বালক গায়ক দল Lanris ton Hallএ গান করে ছিলেন। Epsworth Hallএ স্পানিস জাতীয় নাচ ও গানের আসর বসেছিল। স্কটিশ কমিউনিটি ড্রামা সম্প্রদায়। Little Theatreএ স্কটিশ জাতীয় নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন নাটক অভিনয়ে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেক সর্বজন পরিচিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা নূতনত্ব দেখলাম যাহা আমাদের দেশে সাধারণ উৎসবে দেখা যায় না। সেটা হচ্ছে ইংলণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক সমিতিরা উৎসব উপলক্ষে এডিনবরা এসে অভিনয় দেখিয়েছিলেন। Oxford University, Player দল (O. U. D. S. নামে খ্যাত) George Heriot Schoolর Senior Hallএ, Edinburgh University Dramatic Society, Buccleuch Hallএ, Durham University Player দল Odd Fellow's Hallএ, আর Oxford Theatre দল Riddles Courtএ অভিনয় করেছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী সেজার (Cezanne) চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল রয়েল স্কটিশ এ্যাকাডেমিতে। সমসাময়িক স্কটিশ চিত্রাবলী দেখান হয়েছিল স্কটিশ গ্যালারীতে। ফুলের ছবি, উৎসবের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবিও অনেক দেখান হয়েছিল। প্রস্তরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য এমন অনেক জিনিসও প্রদর্শনীতে দেখলাম। Religious Sculptures of to-day-দেখান হয়েছিল Canongate Church-এ Personalities in Sculpture দেখান হয়েছিল Art Centreএ। উৎসব উপলক্ষে ছবি দেখতে অনেকেই রয়েল স্কটিশ এ্যাকাডেমি ও ন্যাসন্যাল গ্যালারীতে গেছলেন—সেখানে দেশ বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের ভীড় খুব বেশী। ফরাসী দেশ থেকে অনেক ছাত্রী এসেছিলেন বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনী দেখতে। এডিনবরার ন্যাশন্যাল গ্যালারীতে Rembrandt, Titian, Van gough, Gangin, Vermur, Degas, Elgreco প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরগণের ছবি আছে। ন্যাশন্যাল গ্যালারীতে প্রবেশ মূল্য নাই। উৎসব উপলক্ষে স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় বয়ন ও কারুশিল্পের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা গেল। এডিনবরার প্রিন্সেস ষ্ট্রীট নামক সুরম্য রাজপথে দোকানগুলির শোকেসে চোখঝলসান সুন্দর সুন্দর জিনিস সাজান হয়েছিল। রঙবেরঙের, টারটান্ কাপড়, টাই, স্কার্ফ নানারকম সুভেনির জিনিস প্রচুর বিক্রয় হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসা উল—সেই উলেরও বিরাট সমাবেশ দেখলাম। প্রাচীন স্কটল্যাণ্ডের কেল্টিক আর্ট জুয়েলারীও প্রচুর বিক্রয় হয়েছিল।

স্কটিশ ফোক্ ডানসিং বা জনমৃত্য, গান ও পাইপ বাজনার ব্যবস্থা হয়েছিল। নানাবিধ স্কটিশ হাইল্যাণ্ড-খেলাও কয়েকদিন যাবৎ দেখান হয়েছিল।

মিলিটারী টাটু বা সামরিক ক্রীড়া প্রদর্শনী ছিল এডিনবরা উৎসবের এক প্রাচীন অঙ্গ। উৎসবের সময়, রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাদে, প্রত্যহ রাত্রে Edinbugh Castleর সম্মুখে যে বিরাট মাঠ বা Esplanade আছে সেখানে ফ্লাড্ লাইটে মিলিটারী টাটু বা ক্রীড়া দেখান হয়েছিল। তিন দিকে কাঠের গ্যালারীতে বসে দর্শকরা খেলা দেখেন। ফ্লাড্ লাইটে ও আলোক সজ্জাতে পাহাড়ের উপর এডিনবরা দুর্গ অপরূপ সুন্দর দেখায়। বহুদূর থেকে আলো দেখা যায়, এ দৃশ্য একবার দেখলে ভুলতে পারা যায় না। উৎসবের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে এই উপলক্ষে এডিনবরায় ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হয়। ইহাই গ্রেট-বৃটেনের আন্তঃজাতীয় ছায়াচিত্র উৎসব। অনেক নূতন ফিল্ম প্রথম দেখান হয় এই উৎসবে। শুনলাম যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে বহু ফিল্ম, ফিল্মনির্ম্মাতা ও ছায়াচিত্রামোদীদের সমাবেশ হয়েছিল। এইবার নাকি ৩৬টা নূতন ফিল্ম এসেছিল।

স্যার ওয়ালটার স্কট্ মনুমেণ্ট—এডিনবরা

এডিনবরার বিখ্যাত বাগান প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট গার্ডেনস্ এই উৎসবে

একটা বড় অংশ নিয়েছে। প্রিন্সেস ষ্ট্রীট এখানবার বিখ্যাত রাজপথ, সব বড় দোকান হোটেল, সিনেমা এখানেই, অনেকটা লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের মত বা কলকাতার চৌরঙ্গির মত। এই রাজপথের তলার দিকে পাহাড়ের গায়ে এই বাগান, উপর দিকেই এডিনবরা দুর্গ। বাগানে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ড আছে ও শ্রোতাদের বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা দেখে গর্ব্ববোধ করলাম, এখানে প্রত্যহ স্কটিশ হাইল্যাণ্ড পোষাকে সজ্জিত মিলিটারী পাইপব্যাণ্ড বাজান হয়। দুপুর বেলা হাইল্যাণ্ড পাইপ ব্যাণ্ড বাজিয়ে প্রিন্সেস ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, বড় ভাল লাগত। এই বাগানের ফুলের শোভা অপরূপ। কত বিচিত্র ফুলের যে সমাবেশ দেখলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। এখানে একটি অপূর্ব্ব Floral Clock বা ফুলের ঘড়ি আছে। নানারকম ছোট ছোট ফুলের গাছ ঘড়ির আকারে সাজান হয়েছে, আর ফুলের কাঁটাগুলিও চলছে ও ঠিক সময় দিচ্ছে। যে উদ্যান শিল্পী এই অপূর্ব্ব ফুলের ঘড়ি

এডিনবরার উদ্যানে সস্ত্রীক লেখক

সাজিয়েছেন তিনি যথার্থ কৃতিত্বের অধিকারী। কিছুদিন পরে এই রকম আর একটি সুন্দর ফুলের ঘড়ি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল Switzerlandর Interlaken সহরে।

এডিনবরার আশে পাশে যে সকল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও বাগান আছে উৎসব উপলক্ষে সেগুলি জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, এডিনবরা সহর হতে অল্পদূরে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Glamis castle—সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের প্রধান পটভূমি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সকলেই এডিনবরার বিখ্যাত Castle ও Holywood palan দেখতে যান। এই দুই স্থানই Mary Queen of scotsর স্মৃতিবিজড়িত। উৎসবের অঙ্গহিসাবে ডল্ এক্সিহিবিসন অর্থাৎ অতি প্রাচীন আমল থেকে আধুনিককাল পর্য্যন্ত নানাবিধ পুঁতুলের এক প্রদর্শনী করা হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে দেখান হয়েছিল। পুঁতুলের ভিতর দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্র প্রতিফলিত করা হয়েছিল। এডিনবরা সহরের কানন-গেটে এই প্রদর্শনী হয়েছিল।

এইবার উৎসবের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু লিখছি। সংস্কৃতি ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে আমি এই উপকারিতা লক্ষ্য করেছিলাম।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উৎসবের দান অমূল্য—নানা জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, অর্কেষ্ট্রা, নাটক, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদির দ্বারা অভিনেতা দর্শক সকলেই আনন্দ উপভোগ করছেন, আর সঙ্গীত, চারুশিল্পকলার দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। এই উৎসবে দেশ বিদেশের অনেক থিয়েটার ও সিনেমা ডিরেক্টর আসেন ; নবাগত তরুণ তরুণী—যাদের নাচগান, মঞ্চ ও ছায়াচিত্র অভিনয়ে দক্ষতা আছে অথচ তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা কর্ত্তাদের দৃষ্টিতে পড়ে যেতে পারেন ও ভবিষ্যতে বড় হওয়ার সুযোগ পাবেন। বহু বিশ্ববিখ্যাত কবিও সাহিত্যিকের স্মৃতিবিজড়িত এই এডিনবরা সহর, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে খুব উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত জাতীয় কবি Robert Burns যে বাটীতে তাঁর প্রসিদ্ধ Clarida letters লিখেছিলেন এবং Baxters closeএ যে বাটীতে কবি বাস করতেন সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। Burnsর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখার সময় দুইশতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত তাঁর কয়েকটি সুপরিচিত কবিতার অংশ বিশেষ বারবার মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্কট্ এডিনবরার ৩৯নং ক্যাষ্টল্ ষ্ট্রীট বাটীতে ২৮ বৎসর বাস করেন এবং একটির পর একটি Waverly Novels এখানেই রচনা করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক Robert lovis Slevenson যাঁর ভ্রমণ কাহিনী ও রচনা সর্ব্বদেশের পাঠকদের প্রিয়, তিনিও এডিনবরাবাসী ছিলেন। এঁদের বাসগৃহসকল এখন সর্ব্বজাতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলা যেতে পারে। উৎসব উপলক্ষে আগত জনগণ শ্রদ্ধাভরে এই সকল স্থান দর্শন করেন এবং কত নূতন প্রেরণা লাভ করেন।

এই উৎসবের অর্থনৈতিক মূল্য যথেষ্ট। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন যাবৎ সহরে ব্যবসাবাণিজ্য, জিনিসপত্র কেনাবেচা খুব বেশী হয়েছিল। টুরিষ্ট বা ভ্রমণকারী সংস্থাসমূহ ও হোটেল ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। দেশ বিদেশের লোক এই উৎসব উপলক্ষে স্কটল্যাণ্ড বেড়াতে আসছেন, বিখ্যাত রঙ্গচঙ্গে টারটান কাপড়, টাই, উল, নানাবিধ সুভেনীর দুহাতে কিনছেন। ইহার ফলে সমস্ত স্কটল্যাণ্ডের আর্থিকলাভও কম হচ্ছে না। উৎসব-সম্পাদক জানিয়েছিলেন যে এবৎসর কেবলমাত্র টিকিট বিক্রয় হয়েছিল মোট ১৩৬০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বেশ মোটা টাকা। একটা বড় ব্যবসা যেমন সুষ্ঠুভাবে চালান উচিত উদ্যোক্তাগণ সেই ভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু এতদ্বারা এই উৎসবের জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ১৯৫৮ সালে গ্রেট বৃটেনে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য উৎসব ও প্রদর্শনী হয়েছিল। কিন্তু এডিনবরা উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে যত লোকের আগমন হয়েছিল এত বোধহয় আর কোথাও হয় নাই।

উৎসবের বিভিন্ন স্থানে, সহরের রাস্তায়, মটরকোচে বেড়ানর সময় ইউরোপের নানা ভাষাভাষী লোক দেখতাম। বেশীর ভাগই অল্প বয়সের ছাত্র ও ছাত্রী। সকলেই উৎসব দেখতে এসেছেন, সহরও বেড়াচ্ছেন, স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন। আনন্দ মুখরিত এডিনবরা সহর দেখে মনে হয় ইহা বুঝি চির উৎসবের দেশ। কেহ কেহ বলেন যে এই উৎসব বিশেষ করে যুবজনের উৎসব—অর্থাৎ Festival of youth—ভেবে দেখলে মনে হয় এই বর্ণনা প্রায় ঠিক!

উৎসবের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে এই কথা বললেই হবে যে আগামী বৎসরের উৎসবের তারিখ ও কার্য্যসূচি এখন থেকেই স্থির হয়েছে। ১৯৫৫ সালের ২১শে আগষ্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উৎসব হবে। শুনলাম আগামী উৎসবে প্রাচ্যদেশস্থ জাপানের টোকিওর কাবুকি নর্ত্তক, নর্ত্তকী ও গায়ক সম্প্রদায় প্রথমবার অংশ গ্রহণ করবেন, এযাবৎ ইহা ইউরোপীয় সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আরও বলা হয়েছে যে আগামী উৎসবে বার্লিন ফিলহারমণিক অর্কেষ্ট্রা ও রয়েল ড্যানিস ব্যালেট সম্প্রদায়ের যোগদানেরও সম্ভাবনা আছে। ভারতের মধ্যে সংস্কৃতিরক্ষেত্রে বাংলার স্থান খুব উচ্চে। বাংলা থেকে এক ছোট দল গঠন করে আগামী বৎসর এডিনবরা উৎসবে পাঠান সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চারুকলা শিল্পীদের ও অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

বিবাহে নির্ব্বাচন-সমস্যা

শ্রীসবিতা চৌধুরী

শাস্ত্রে বলে, 'যোগাং যোগোন যুজ্যতে।' সেই 'যোগ্য'কে খুঁজে পাওয়াই ত' সমস্যা। পুরাকালে আমাদের দেশে 'স্বয়ম্বরা' হ'তেন নারী—তা'র জন্য 'স্বয়ম্বর সভার' ব্যবস্থা হ'ত। অবশ্য সে-সব ছিল রাজকন্যা বা ধনী সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য। সাধারণ মেয়েদের জন্য সে-ধরণের কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও পতি-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সেকালে মেয়েদের রূপগুণের বার্ত্তা পেয়ে অসংখ্য পাত্র এসে যোগ দিতেন 'স্বয়ম্বর সভায়'। তাঁরা যে সকলেই নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসতেন তা' নয়। অনেকে স্বেচ্ছায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এসে সেখানে একত্র হ'তেন। কন্যা যাঁর রূপ-গুণ ও বংশ মর্য্যাদায় সন্তুষ্ট হ'তেন তাঁর গলায় বরমালা দিয়ে পতি-নির্ব্বাচন ক'রতেন। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ ক'রে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাক্-বিতণ্ডা হ'য়েছে, অনেকে কন্যার প্রতি বিমুখও হয়েছেন হয়ত, কিন্তু নির্ব্বাচিত পাত্রকে বাদ দিয়ে পুনর্নির্ব্বাচন সম্ভব হয় নি। কন্যা যাঁকে মনোনীত ক'রেছেন তাঁকে অস্বীকার করবার সাধ্য কারও হয় নি। কন্যা সেই স্বামীর সঙ্গে সুখে-দুঃখে, বিপদে সম্পদে হাসি মুখে ঘর ক'রেছেন। কোনও কারণেই তাঁর পতি-নির্ব্বাচন যে ভুল হ'য়েছিল—এরকম অনুতাপ প্রকাশ পাওয়া দূরে থাক্—মনেও তাঁর ঠাঁই পায়নি। পুরাণে এ-ধরণের দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, রাম-সীতা, সত্যবান-সাবিত্রী ইত্যাদি যে-কোনও দম্পতির জীবন পর্য্যালোচনা ক'রলেই দেখতে পাব চিরদিন তাঁদের সুখে কাটেনি, জীবনে কতবার এসেছে দুর্য্যোগ, কতবার এসেছে মারাত্মক সমস্যার অগ্নি-পরীক্ষা। কিন্তু সে-যুগের নারীদের ছিল অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং তেমনি ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা এবং আত্ম-নির্ভরতা। কোনও সময়ের জন্য তাঁরা মনের শক্তি হারান নি—বিপদে তাঁদের বুদ্ধি নষ্ট হয় নি, আঘাতে আরো দৃঢ় হ'য়েছে তাঁদের চিত্ত। সব বিপদকে তাঁরা জয় ক'রেছেন তাঁদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ত দিয়ে। তাই ত আজও তাঁদের চরিত্র আমাদের আদর্শের প্রেরণা আনে, তাই আজও তাঁরা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া।

প্রাচীন সে-প্রথা উঠে গিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনের ভার দাঁড়াল এসে পাত্র-পাত্রীর পিতামাতা এবং গুরুজনদের ওপর। তারা যা' পছন্দ ক'রে আসতেন, ছেলে এবং মেয়েকে তাই মাথা পেতে নিতে হ'ত। এ'র ফল যে সব সময়েই ভাল হত, তা বলা যায় না। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাল হত। দু-একটি ব্যাপারে অশান্তি দেখা গেলেও মোটামুটি সেকালের দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। এই দম্পতিরা বিয়ের সময় হয়ত উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হ'ন নি, কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটাকে তাঁরা একটি পুণ্য-অনুষ্ঠান এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন—কোনও প্রশ্ন তাদের মনে জাগত না। সুতরাং ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে তাঁদের ক্ষোভের কারণ ঘটত না।

ক্রমে ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়ার পর বিয়ে দেওয়া শুরু হ'ল। এজন্য ছেলে বা মেয়ের মতামত প্রকাশের সুযোগ হল। পিতামাতা শিক্ষিত সন্তানদের মতামতকে উপেক্ষা ক'রতে সাহসী হ'ন না, তাই আজকাল অনেক পিতামাতা ছেলে এবং মেয়েকে তাঁদের মনোমত পাত্রী বা পাত্র দেখে নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। এ'তে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবনের সুখ-শান্তির কঠোর দায়িত্ব থেকে পিতামাতা অনেকটা নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

কিন্তু এত সুযোগ পেয়েও বর্ত্তমান বাংলার তরুণ তরুণীরা বিয়ে ক'রতে সাহসী হ'ন না, বা সহজে রাজী

হ'ন না। পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁদের সমস্যা আরও কঠিন হ'য়ে পড়ে। হয়ত পছন্দ হ'য়েছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের নানা চিন্তা এসে উভয়ের মনকে করে তুলল ভীতিগ্রস্ত। পাত্রের মনে আতঙ্ক হ'চ্ছে, বর্ত্তমান অর্থ-সংকটের দিনে তাঁদের অর্জ্জিত আয়ে তাঁর ভাবী বধূ সন্তুষ্ট হ'বেন কিনা! আবার পাত্রীর মনেও জাগছে অনেক দুর্ভাবনা—হয়ত ওমুকের স্বামীর মত হ'ল না রূপে, হয়ত ওমুকের মত চাকরী হ'ল না, কিংবা হয়ত তেমন শিক্ষিত হ'ল না ইত্যাদি নানা তুলনা-মূলক চিন্তায় হয়ত তাঁর মানসিক আনন্দ বা উদ্যম নষ্ট হ'য়ে গেল!

পাঁচটি ভাল পাত্র-পাত্রীর সন্ধান এলে ত কথাই নেই—অবস্থা আরও শোচনীয়—'বাঁশ বনে ডোম কানার' ব্যাপার। কোনটিকে বাদ দিয়ে কোনটিকে পছন্দ ক'রবেন স্থির করতে না পেরে মানসিক অস্বস্তিতে কষ্ট পাবেন।

আজকাল সময়মত ছেলেমেয়েদের বিয়ে হ'চ্ছে না তবু পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপারের গলদের জন্য। তা ছাড়া অর্থসংকটের ব্যাপারও আছে। কিন্তু 'মনের মত' বর বা কণে খুঁজতে খুঁজতে কত জীবন যে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, তা'র ইয়ত্তা নেই! মনের কল্পনা দিয়ে কত ছবিই ত মানুষ আঁকে—কিন্তু বাস্তবের স্পষ্ট আলোয় ছবির সে-সব রংএর ঔজ্জ্বল্য থাকে না! কুমারী-মনে কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র রূপ নিয়ে জাগে এবং সেই আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকে কুমারীর চিত্ত, কিন্তু বিবাহিত জীবনে যা' পাওয়া যায় তার সাথে হয়ত সে-সব কল্পনার অনেক তফাৎ হ'য়ে পড়ে। তবু আনন্দকে এ'র মধ্যেও খুঁজতে হয় এবং খুঁজে পেতে হয়, নইলে মানুষ বাঁচবে কি ক'রে? ভগবানের অস্তিত্ব যেমন সর্ব্বব্যাপী, সব কিছুতেই যেমন তাঁর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, তেমনি তাঁর দেওয়া সব কিছুর ভেতরই আনন্দ আছে, সেই আনন্দকে খুঁজে নিতে হ'বে।

পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে "কোর্ট্ শিপ" প্রথার প্রচলন নেই। দাম্পত্য-জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির বিষয়ে ঐ প্রথা যে খুব কার্য্যকরী হয়, তা বলা যায় না। কারণ, বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও বিবাহিত জীবন সে-দেশের অনেকক্ষেত্রেই শান্তিময় না এবং ফলে দেখা দেয় 'বিবাহ-বিচ্ছেদ'। সে-দেশের নীতি আমাদের দেশে অচল। তবুও যাঁরা জোর ক'রে ঐ ধরণের 'কোর্টশি[illegible] ক'রে বিয়ে করেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ জীবন অশান্তিময় হয়। আমাদের দেশের বিবাহিত জীবন শু[illegible] ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, এ'র ওপর নির্ভর ক[illegible] সমগ্র পরিবারের সুখ এবং শান্তি। এবং সেই জন্য আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে পিতামাতা এবং অন্য তরুণীদের আশীর্ব্বাদ ও সম্মতি না নি[illegible] দাম্পত্য-জীবন শুরু ক'রতে সাহসী হ'ন না।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। কিন্তু এমন অব[illegible] আসে, যখন আকাঙ্ক্ষাকে সংযত ক'রতে হয়। সে সম[illegible] যদি তা' না করা যায়—মানুষের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী মনকে স্থির না করতে পারলে মানুষ হয় অসুখী। আম[illegible] যদি ভবিতব্য বা অদৃষ্টকে খানিকটা মেনে নিই এবং য[illegible] পাইনি সেটুকু বাদ দিয়ে যা' পেয়েছি সেইটুকুকে কে[illegible] ক'রে মনকে সন্তুষ্ট রাখি তবেই ত শান্তি পাব, তবে[illegible] হ'ব সুখী!

পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে যত যত্নশীল বা সাবধানী হ[illegible] না কেন, এই ধরণের চিন্তা না ক'রলে দাম্পত্য-জীবনে শান্তি আসতে পারে না। স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়কেই কি[illegible] কিছু ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হ'বে এবং দু'জনের মধ্যে যা'তে সামঞ্জস্য আসে সেই অনুপাতে নিজেদের মনকে গঠন ক'রে নিতে হ'বে। এই সামঞ্জস্যই মিলনে[illegible] মাধুর্য্য, সেই মাধুর্য্যের প্রভাবেই পারিবারিক সুখ [illegible] শান্তিকে স্থায়ী করে।

চরিত্র গঠনে পরিবেশের প্রভাব

শ্রীআরতি দেব

পরিবেশকে মানুষের চরিত্রের গঠনের ক্ষেত্র বলা যায়, পরিবেশ মানুষে[illegible] চরিত্র স্বভাব সংস্কার গঠনের বিশেষ সহায়ক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে [illegible] যায় মানুষ যে পরিবেশে জন্মায় বড় হয়—তার প্রভাব চরিত্রে সং[illegible] রূপান্তর হয়। আনন্দপূর্ণ সুন্দর আবেষ্টনিতে মানুষ যেমন আনন্দ [illegible] লাভ করে, অস্বাস্থ্যকর দুঃখপূর্ণ পরিবেশে মানুষের জীবন তেমনি [illegible] করে তোলে।

শিশু স্বভাবতঃ অনুকরণশীল, সমগ্র জগৎ সংসার নূতন অভিনব[illegible]

তাদের স্বচ্ছমনে ধরা দেয়। এই সময় খারাপ ভালো তার পরিবেশের মধ্যে যাহা দেখে শোনে, সদ্যো-জাগা মনে তাহা ছাপ রেখে যায়। আবেষ্টনির প্রভাব ছোটদের উপর বেশি কার্য্যকরী, কোন বিখ্যাত কিম্বা কোন কুখ্যাত লোকের জীবন-চরিত যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখতে পাবো তাদের চরিত্রের এই উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী হয় তাদের পরিবেশ। একথা অনেকে হয়তো মানবেন না, তাঁরা বলবেন, "খারাপ ভাল পরিবেশে কিছু আসে যায় না, দেখে অনেকে খারাপ পরিবেশের মধ্যে ভাল, এবং ভাল পরিবেশে খারাপ হয়েছে।" সে কথা ঠিক, দৈব সর্বাপেক্ষা বলবান, একথা অমান্য করি না, কিন্তু আমরা কি পরীক্ষা করে দেখেছি কোন একদল শিশুদের নিয়ে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তাদের মধ্যে কয়েকজন দৈব প্রভাবে খারাপ এবং ভাল হয়।

যদি দু'টি সমবয়সী শিশুকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে রাখা যায় তবে দেখা যাবে, প্রথমটি যখন আনন্দে সজীবতায়পূর্ণ—অপরটি হয়তো বিষাদগ্রস্ত মৃত প্রায়, অনেক সময় গৃহ পরিবেশ ভাল হওয়ায় শিশুকে অসৎ হতে দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে শিশুর সঙ্গীসাথী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দায়ী করা যেতে পারে।

পরিবেশ বলতে কোন বায়বহুল আনন্দপূর্ণ উৎসবের বিলাসিতাপূর্ণ আমোদের উল্লেখ করছি না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত চরিত্র গঠনের জন্য প্রকৃত জ্ঞানী স্নেহময় লোকের সংস্পর্শে রেখে এবং সর্বপ্রকার বিলাসিতা কুসংস্কার হতে দূরে শান্ত আবেষ্টনি গঠনের কথা বলছি, আমাদের দেশে শিশুরা একদল অত্যন্ত বিলাস ব্যসনে মানুষ হয়, অপর দল দরিদ্রতার কঠোর দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভীরু মেধাহীন ভগ্নোৎসাহ আনন্দহীন স্বাস্থ্যহীন মৃতপ্রায়। ভবিষ্যৎ দেশের নাগরিক এবং কর্ণধার গঠন করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাসম্পন্ন শিশু উপযোগী সুন্দর জ্ঞানময় পরিবেশ, গঠন করা প্রয়োজন।

অতীতযুগে আমরা দেখতে পাই, বালক ছাত্রেরা জ্ঞানী শান্ত স্নেহশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের (গুরুর) অধীনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিত, ছাত্রগণ সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন পরিহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত, শিক্ষালাভের জন্য যাহা একান্ত দরকার, শিক্ষালাভের জন্য চাই একাগ্রতা সংযম স্বাস্থ্য, যাহা বর্ত্তমানে খুবই কম, চরিত্র গঠনে সংযমের একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্ব বিষয়ে সংযম থাকলে মানুষ জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয় না, সংযমকে শান্তিলাভের প্রথম সোপান বলা যেতে পারে।

মানুষ গৃহ নীড় রচনা করে শান্তি সুখের আশায়। আমাদের শাস্ত্রে আছে।

বিদ্যাধন যশোধন্মান যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনক্ষাসত্যং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥

অসুবিধাজনক অস্বাস্থ্যকর দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে কত শত প্রতিভা মনের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট হয় তাহার সংখ্যা নেই। আবেষ্টনী সুখ শান্তিময় আনন্দপূর্ণ গঠন করা প্রত্যেক মানুষের কাজ, এই সামান্য কাজটিতে যদি দৃষ্টি দিয়ে থাকি তবে অনেক বড় বড় সমস্যার সহজ সরল সমাধান হতে পারে। ভাল লোক খারাপ পরিবেশে থাকার ফলে খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয়, এবং মন্দ লোক শান্তিপূর্ণ জ্ঞানময় পরিবেশের প্রভাবে ভাল হয়—এর উল্লেখ আমরা অনেক জায়গায় পাই।

গৃহ পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করবার ফলে আমরা বিশ্বকে কল্যাণ-শান্তির পথ নির্দ্দেশ করতে পারবো এবং জগৎ ভয়ংকর ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে; আজ বিশ্বের মূল গৃহের শান্তি কল্যাণ নষ্ট হয়েছে বলেই বিশ্বের এত অশান্তি।

উত্তর ভারতে কয়েক দিন

পারুল ঘোষ

বারোমাস যাঁরা কলকাতা সহরে বাস করেন এবং জীবিকার জন্যে উদয়াস্ত শ্রম করেন, তাঁদের কাছে বাইরের পৃথিবীর রং অনিবার্য্যভাবেই ফিকে হয়ে আসে। বন পাহাড় নদী আকাশ নিয়ে যে বৃহৎ পৃথিবী—বহু বিচিত্র পশু পক্ষী, বিচিত্রতর জনপদ, দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে, তার কথা
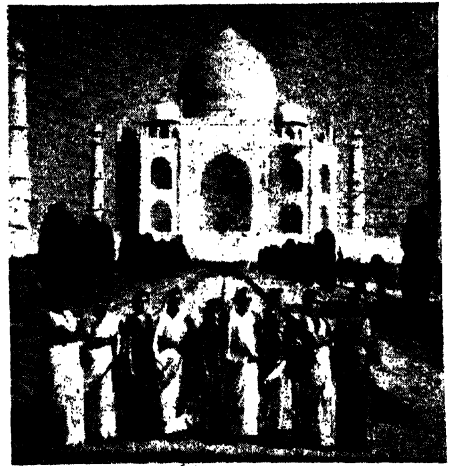
আগ্রা—তাজমহলের চত্বরে লেখিকা ও তাঁর সহযাত্রিণীগণ

মন থেকে প্রায় মুছেই যায়। বাড়ী থেকে কর্ম্মস্থল, সেখান থেকে আবার বাড়ী, এই রুটীন-বাঁধা প্রাত্যহিকতার মধ্যে সামান্য কিছু বৈচিত্র্য ঘটে কোনদিন থিয়েটার বায়স্কোপে অথবা বিয়ে পৈতা উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাওয়ায় আর বড়-জোর ছুটিছাটা উপলক্ষে কাছাকাছি কোথাও এক চক্কর ঘুরে আসায়। এই একঘেয়ে ধারাবাহিকতায় হয়তো কারও মন

হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু অনেকেরই এটা বেশ অভ্যাস হয়ে যায় এবং অভ্যস্ত-তার যা স্বধর্ম্ম, এর জন্যে মন নালিশ করতেও ভুলে যায়।

ঐ যাদের মন মাঝে মাঝে রুটীনের দড়াদড়ি ছিঁড়ে বাইরে ছুটে পালাতে চায়, অল্প কিছুদিন হলেও দৃষ্টি ও চিন্তাকে নূতনত্বের আবেষ্টনীতে ছড়িয়ে দিতে চায়, হিসেবী কাজের লোকরা তাদের বলেন খামখেয়ালী। কিন্তু জীবনধারণ করার সঙ্গেই জীবনকে যারা কিছুটা উপভোগও করতে চায়; হয়তো কিছু কাজের কাজ তাদের হাত দিয়েই নিষ্পন্ন হয়। কাজেই খামখেয়ালী-পণা জিনিষটার একেবারে উপযোগিতা নেই, এমন কথা বলতে পারি না। গত ১৩৬০ সালের পূজোর সময় হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ে উত্তর ভারতের খানিকটা অংশে ঘুরে এলাম—সে এই খামখেয়ালেরই ফল। অবশ্য কাজ ও অকাজের নিরিখ ধরে হিসাব করলে এটা কোন বিভাগে পড়বে, তা বিচক্ষণ লোকেরাই বিচার করবেন।

ভারতবর্ষ যে একটি বিরাট দেশ, ছোটখাট একটি মহাদেশ বললেই চলে, এ পুরানো কথা। কিন্তু এই বিরাট দেশটাকে আদ্যোপান্ত ঘুরে দেখা—এত সমুদ্র, পর্ব্বত, মরুভূমি, অরণ্য, সমতল, রকমারি বৈচিত্র্যের সন্ধান নেওয়া—এর গ্রাম, নগর, বন্দর, তীর্থ ও দেব-দেউলগুলি প্রত্যক্ষ করা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত নয়, ভারতবাসী হয়েও বেশীর ভাগ লোকের কাছেই ভারতবর্ষ তাই মানচিত্র মাত্র হয়ে আছে। এই রেখাময়ী ভারত-বর্ষের আড়ালে যে প্রাণময়ী ভারতমাতা অধিষ্ঠিতা, তাকে দেখা ও জানার প্রয়োজন যে কত, তা বলে বোঝানর দরকার নেই। এই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছাটাই যে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের অনুপ্রেরণা, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনের ইচ্ছাকে কাজে রূপ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন—তার একটা অংশ হলো পুঁজি, আর একটা হল সঙ্গী। এই দুটি দিক একত্র যুক্ত করা, একটু অসুবিধাজনক বলেই অনেক সময় অনেক ইচ্ছা বাস্তবে রূপ পায় না।
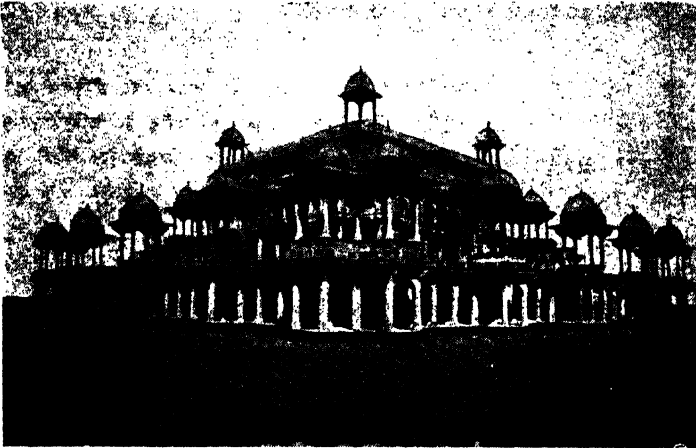
আকবরের সমাধি মন্দির

কিছু কোসিস-কসরতের ফলে এই দুটো দিকেরই ব্যবস্থা হলো। ঠিক হলো আমরা ন'জন—ন'জনই মহিলা—একযোগে অভিযানে বেরুবো। দল তৈরী হলো, দরকার মতো বাক্স প্যাটরা বিছানা বালিস ঘটিবাটি মাল পত্রের এক বিরাট পাহাড় তৈরী হলো—যা দেখে শুভানুধ্যায়ীরা কেউ বললেন—আমাদের উদ্যোগ আয়োজন প্রায় এভারেষ্ট অভিযানের সমতুল হয়েছে, কেউ বা বললেন, এর পনেরো আনাই পথে রেখে রিক্ত হস্তে সোজা কলকাতায় ফিরে আসতে হবে। হয়তো পুরুষের ভ্রমণে লাগেজের ঝামেলা এতটা দরকার হয় না, কিন্তু মেয়েরা তো আর পুরুষ নয়—কোনটা কখন দরকার হতে পারে, কোন সঙ্কটের আসান কিসে তা ভাবতে পারেন বলেই তো মেয়েরা সংসারী বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় চিরদিন পুরুষের ওপরে। যা-ই হোক, এই বিচিত্র লটবহর ও দলবল সহ বেরিয়ে পড়লাম নবমীর রাত্রেই। পূজার উৎসব কলকাতায় পড়ে রইলো—মনের একটা অংশও পড়ে রইলো সেই সঙ্গে, তবু লম্বা পাড়ির আনন্দ কম ভালো লাগলো না।

কলকাতা থেকে এলাহাবাদ এর মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই ঘটে নি। এলাহাবাদে ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা করা ছিল—ষ্টেশন থেকে সোজা এসে উঠলাম। থাকার বন্দোবস্ত চমৎকার। খাওয়া দাওয়ারও সুব্যবস্থা রয়েছে। আমরা রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে রান্না খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিলাম—অবাঙালীর হাতে বাঙালী সুলভ রান্না যেমনই হোক, পরিশ্রান্ত ভ্রমণকারীদের কিন্তু তাতে পরিতৃপ্তি কম হয়নি। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ব্যবহারও চমৎকার, বাংলার বাইরে বাঙালী পরিচালিত এই পরিচ্ছন্ন সুন্দর অতিথিশালার বন্দোবস্ত যাঁরা করেছেন তাঁদের কাছে ভ্রমণকারী মাত্রেই কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।

আমরা যেদিন পৌঁছুলাম, ঠিক সেদিনই প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীও এলাহাবাদে হাজির হলেন। স্বভাবতঃই সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ মহল একযোগে তাঁকে বেষ্টন করে যে সাদর সম্বর্দ্ধনায় মধুচক্র গড়ে তুললেন, তার মধ্যে অখ্যাত ভ্রমণকারীদের মাথা গলানোর কোনও সুযোগ হলো না। উপরন্তু অধ্যাপক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রেণীর জ্ঞানী গুণী যাঁদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে চিঠিপত্র সংগ্রহ করা ছিল, তাঁদেরও দিশা পাওয়া গেল না। কাজেই ভাড়াটে গাড়ী ও পথ প্রদর্শকের সাহায্যে সবাই যা যা দেখে থাকেন—যথা ত্রিবেণী সঙ্গম, কোর্ট, কমলা নেহেরু হাসপাতাল, খসরুবাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির ওপর চোখ বুলিয়ে এই অধ্যায়ের ভ্রমণ পর্ব্ব শেষ করতে হলো, অবশ্য উঁচু মহলেও মানুষদের

না মিললেও সাধারণ মানুষদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য যথেষ্টই পাওয়া গেছে—হয়তো সেই পাওয়াটাই বেশী খাঁটী।

ত্রিবেণী প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পরে এবার এলাহাবাদে কুম্ভমেলা—সে থেকেই তার প্রারম্ভিক তোড়জোড় চলছিল। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলে কি পুণ্য হয়, সপ্তজন্মের পাপ স্খালন হয় কি না জানি না, কিন্তু সম্মিলিত গঙ্গা যমুনা যে এখানে প্রাণময়ী এবং স্নানের যে সর্ব্বোত্তম স্থান, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এলাহাবাদ থেকে আগ্রা এবং আগ্রা থেকে মথুরা ও বৃন্দাবন। এই অংশের ভ্রমণে অকৃত্রিম পথপ্রদর্শকরূপে পেয়েছিলাম আমরা মহারাজা হোটেলের এজেন্ট সহজ সরল চান্দুলালকে। আগ্রার দ্রষ্টব্যের সংখ্যা অনেক—তাজমহল, আগ্রাফোর্ট, ইত্মাদ্দৌলার কবর, দয়ালবাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সেকেন্দ্রা, ফতেপুরসিক্রি ইত্যাদি। তাজমহল ইত্যাদির মহিমায় কবিত্ব রসে আপ্লুত হবার বিশেষ প্রয়োজন হয়তো নেই। কারণ তাজমহলকে দিয়ে কবিত্ব-বোধ, দেখা না দেখার ওপর নির্ভর করে না। আর বৃন্দাবন মথুরায় পদার্পণ মাত্রেই ভক্তিরসে দেহ মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো একথা বলারও কোন অর্থ হয় না। মোটের উপর হিন্দু ও মুসলীম ভারতের পুরা-সংস্কৃতির যে নিদর্শন এই সহরগুলিতে আজও জাগ্রত আছে, তা ভালোই লাগলো। আগ্রা সহর পরিচ্ছন্ন এবং পুরাতনের কাঠামোর ওপর তাতে নূতন নগর বিন্যাসের সুষমা লক্ষ্য করার মতো, বৃন্দাবন ও মথুরা র তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক—তবে অরোমাণ্টিক নয়। বিশেষ করে বৃন্দাবনের পথঘাট ও মথুরার স্বর্ণকলস সমন্বিত মন্দিরগুলি বাস্তবিকই মনোরম।

এর পর দিল্লী। সে সময় শীত পড়েছে, তবে যে রকম শীতের ভয় কলকাতা থেকে সবাই দেখিয়েছিলেন, প্রস্তুতও হয়েছিলাম কম নয়—তার কিছুই তখনও দেখা দেয় নি। এমন কি এলাহাবাদে সহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, ভারত সেবাশ্রমের আধা-গ্রাম্য পরিবেশেও শীতের যে অনুভূতিটুকু লাভ করেছিলাম, দিল্লীতে কিন্তু তারও অভাব। কলকাতিয়া পোষাক পরিচ্ছদেই বেশ চলেছিল।

পুরানো আর নতুন দিল্লীর দুটো অংশে দর্শনীয় বস্তু প্রচুর। পুরানো দিল্লীর মামুলি দর্শনীয় স্থান—কুতুবমিনার, তোগলগাবাদ, হুমায়ুনের কবর, পুরানো কেল্লা, নিজামুদ্দীনের কবর, লোদী কবর, ফিরোজশা কোটলা ইত্যাদি দেখা শেষ করে, নয়াদিল্লী পরিক্রমা সুরু হলো। হিন্দু, মুসলমান, বৃটিশ ও কংগ্রেস—পরের পর এই চার ধাপ মিলিত হয়েছে দিল্লীকে কেন্দ্র করে। আজ কংগ্রেসী আমলে লালকেল্লা ও পার্লামেণ্ট ভবনের গরিমা নিশ্চয়ই সকলের বুক ভরে তোলে, কিন্তু নয়া দিল্লীর পার্ক প্রাসাদ থেকে চলন বলন, আদব কায়দা পর্য্যন্ত সব কিছু ভেদ করেই খদ্দরের আড়ালে বৃটিশের প্যাণ্টকোট উঁকি দেয়। হয়তো ষোল আনা জাতীয়করণ হতে তার দেরী লাগবে—পুরোপুরি হবে কিনা তা-ও বলা যায় না। নয়াদিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারীয়েট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম, ন্যাশন্যাল ষ্টেডিয়াম, ইণ্ডিয়া গেট ইত্যাদি দেখে ভালো লাগবার মতো। এছাড়া বিড়লা মন্দির, কালী মন্দির, পুরাণো যন্তর মন্তর, পুসা এগ্রিকালচারাল ফার্ম ও ডেয়ারী, গবর্ণমেণ্ট নার্সারী, এরোড্রাম, রেডিও অফিস, এসিয়াটিক এ্যাণ্টিকুইটিস মিউজিয়ম প্রভৃতিও দেখা হলো। ইউনাইটেড প্রেসের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার আমাদের ঘোরাফেরা ও দেখাশোনার প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। দেশের বাইরে এই সাংবাদিক ভদ্রলোকের
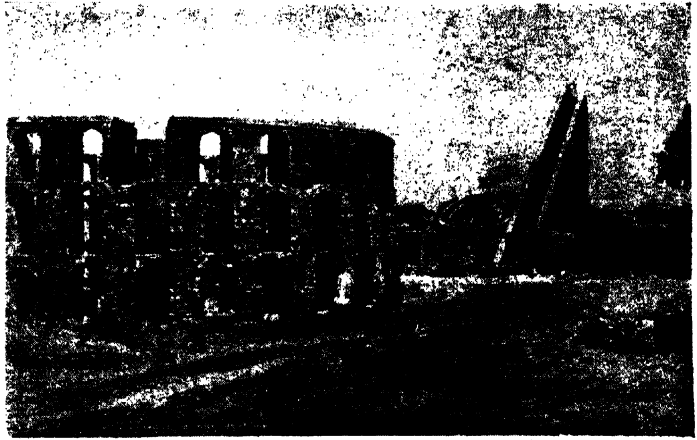
মানমন্দির—দিল্লী

সহায়তা মনে করে রাখবার মতো, সেই সঙ্গেই মনে করে রাখবার মতো দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে সহযাত্রিণীদের আত্মীয়স্বজনদের যাঁদের আতিথ্য ও সৌজন্য নিয়েছিলাম, তাঁদের কথাও।

দিল্লী থেকে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, কঙ্খল ও লছমনঝোলা—সব কটিই পুণ্য স্থান এবং সাধু সজ্জনদের পর্য্যটনধন্য। দিল্লী থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, ভোলানন্দ গিরির গঙ্গাতীরবর্ত্তী অতিথিশালাই হল আমাদের এই অংশ ভ্রমণের আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে থাকা, খাওয়া ও স্নানাদির বন্দোবস্ত বেশ ভালো এবং তত্ত্বাবধায়কদের সহৃদয়তা ও আতিথ্যও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে রাখবার মতো। সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় আশ্রমের বাঙালী-খানার তৃপ্তিপ্রদ আস্বাদ। উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণে হাড়-কাঁপানো শীতের তীব্রতা অনুভব করেছি একমাত্র হরিদ্বারে। হরিদ্বার হৃষিকেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে বিপুলায়তন

পাহাড় আর পাহাড় এবং অবিশ্রান্ত একদিকে বয়ে যাওয়া কলনাদিনী গঙ্গা। এখানকার গঙ্গায় বাস্তবিকই গঙ্গার পতিতোদ্ধারিণী রূপ পরিস্ফুট। লোহা, লক্কড়, ব্রীজ, বয়া ও গাদাবোটে কলকাতার গঙ্গার যে দশা হয়েছে, তা যে সভ্যতার বিপাকমাত্র, সেটা বোঝা যায় এখানে গঙ্গাতীরে দাঁড়ালে, বিখ্যাত হরকী-পেয়ারী ঘাটে স্নান করে অক্ষয় পুণ্য লাভ করতে পারতাম, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে উঠলো না।

এখান থেকে দেরাদুন। নিতান্ত অল্প সময় হাতে ছিল। তাই ফরেষ্ট অফিস, সারভে অফিস প্রভৃতি দুচারটি সরকারী প্রতিষ্ঠান সহ বোটানিক্যাল গার্ডেন, ন্যাশন্যাল একাডেমী, সহস্র ধারা ইত্যাদির ওপর চোখ বুলিয়েই দেরাদুন দেখার পর্ব্ব শেষ করতে হলো। মানবেন্দ্র রায় তখনও জীবিত ছিলেন, দেখা করার প্রবল ইচ্ছাও ছিল, কলকাতা থেকেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু তবু দুর্ভাগ্যক্রমেই সুযোগ ঘটলোনা।

দেরাদুন থেকে ছ' হাজার ফিট উঁচুতে মুসৌরী—বাসে করে মাত্র কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছি। এই সময় মুসৌরীতে ভ্রমণকারীর সংখ্যা দেখলাম বেশী নয়। শীতের মরসুম সুরু হয়েছে, অথচ জানিনা কেন, শীতের তীব্রতা কিছুই বুঝতে পারিনি আমরা। মাঝে মাঝে নভেম্বরের কনকনে একটা হাওয়ার স্পর্শ—পাহাড়িয়া শীতের অনুভূতি লাভ করলাম শুধু এইটুকুই। মুসৌরীতে রিক্সাযোগে স্যাভয় হোটেল, কণোট প্লেস দেখা এবং গানহিলে আরোহণ ···এর বেশী আর কিছুই হয় নি। সমতল মাটীর মানুষ—পাহাড়ে উঠলেই তার চিত্তে রোমান্টিক অনুভূতি জাগে—দুনিয়াকে যেন শৈল পদমূলে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্যের মতো মনে হয়। অল্প শীতের আমেজে গাছপালা ও প্রকৃতির সজীবতার মধ্যে মুসৌরীর শোভা বাস্তবিকই নয়নলোভন।

দেরাদুন থেকে লক্ষ্ণৌ। এতদিন চলেছিল "উর্দ্ধগতি", এবার সুরু হলো "অধোগতি", লক্ষ্ণৌয়ে তখন সুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ। পথঘাট, যানবাহন, আলো টেলিফোন, সব বিকল, বিপর্য্যস্ত—চতুর্দ্দিকে ধর পাকড়, ১৪৪, গুলি, গ্রেপ্তারী, এর ভেতর ভ্রমণ ও দর্শন সম্ভব নয়, সুচিন্তিত ও নয়। তবু ওরই ভেতর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহধর্ম্মিণী অধ্যাপিকা সুরমা দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখাশোনা হলো—তাঁর সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় মুল্লুকে খানিকটা ঘোরাফেরাও করা গেল। এছাড়া বড় ইমামবাড়া, ছোট ইমামবাড়া, পিকচার গ্যালারী, বৃটিশ রেসিডেন্সীও দেখা হলো, খোঁজ নিয়ে জানলাম, ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপকরা অনুপস্থিত, নইলে তাঁদের সঙ্গেও দেখা করতাম। সৌভাগ্য বশতঃ আমরা লক্ষ্ণৌ না ছাড়তেই গণ্ডগোল লক্ষ্ণৌ ছাড়লো। কাজেই ঐ হাঙ্গামার মধ্যে আমাদের লক্ষ্ণৌ আসা নিয়ে যাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন এবং বার বার চিঠিতে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, তাঁদের সমস্ত আশঙ্কা ব্যর্থ করেই আমরা অক্ষত শরীরে লক্ষ্ণৌ থেকে বেরুতে পারলাম।

পুরাতন দুর্গ—দিল্লী

এরপর কাশী। সারনাথের বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বনাথ মন্দির এবং দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি ঘাট দেখা শেষ হতে বেশী সময় লাগলো না। দিন দুয়ের মধ্যেই তালিকা ফুরিয়ে গেলো। এর মধ্যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশালতা ও পরিচ্ছন্নতা মনে করে রাখবার মতো। পণ্ডিত মালব্যের কীর্ত্তি এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের গৌরব-সামগ্রী স্বচক্ষে না দেখলে মূল্যটা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির পটভূমি এবং অতীতের সঙ্গে আজকের মানুষকে সংযুক্ত করার জাগ্রত উপায়রূপে সারনাথের মূল্য কম নয়। জাপানী শিল্পীর নির্মিত নূতন বিহারটি বাস্তবিকই নয়ন লোভন। এছাড়া ভক্তের চোখে বিশ্বনাথ ও কাশীর মহিমা নিশ্চয়ই অনেক। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে কাশীর অপরিসর গলি ঘুঁচী, অপরিচ্ছন্ন পথ ঘাট, ষণ্ড, গুণ্ডা, বিধবা ও ভিখিরী অধ্যুষিত, বস্তিময় মহল্লা বিরক্তি এবং হতাশাই জাগিয়ে তোলে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তজনেরা হয়তো অপ্রসন্ন হবেন, কিন্তু না বলে পারছি না যে দুদিনেই এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। বলা বাহুল্য, নারকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা, তিলজলা, সাহানগর প্রভৃতি কলকাতার অপরিচ্ছন্ন অঞ্চলগুলির সঙ্গে কাশীর উৎকৃষ্ট অঞ্চলগুলির তুলনা করা মোটেই অসমীচীন হয় না। অবশ্য স্থলে যে চিত্তক্ষোভ উৎপন্ন হয়, জলে নামলে অনেকটাই জুড়িয়ে যায় বিখ্যাত মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে তাকালে।

কাশী থেকে সোজা স্বঘর কলকাতা এবং সেখানেই সাড়ে তিন সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণের উপর যবনিকাপাত।

* * *

উত্তর ভারতের উপর দিয়ে এ বিদ্যুৎগতি ভ্রমণটা আমাদের হলো যেন **ঠিক** পরীক্ষার আগের রাত্রে পাঠ্য বিষয়ের ওপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়ার মতো—ওপর ওপর দর্শনই হলো, তলিয়ে অনুধাবন হলো না। তবে সব জায়গারই মামুলী দর্শনীয় জিনিসগুলি ত দেখেছিই, যথাসম্ভব সাধারণ স্তরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার সব জায়গার উল্লেখযোগ্য খাদ্য পানীয় আস্বাদের এবং সর্বোপরি সব জায়গার আচারব্যবহার ও আদব কায়দা উপলব্ধিরও চেষ্টা করেছি। একথা ঠিকই যে আজকের ভারতবর্ষ একটা দেশ এবং আমরা ভারতবাসীরাও একটা জাতি—তবুও 'মিহিদানা ও চাঁপাফুলের' এলাকা শেষ হয়ে 'চা গরম, গোস্ত রুটীর' এলাকা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমতলের শ্যামল মৃত্তিকা যেমন রুক্ষ তাম্রাভ মূর্ত্তি ধরে, নমনীয় কান্ত ভাবাপন্ন ভাষা এবং ভঙ্গীও যেন সঙ্গে সঙ্গে অকারণ অকরুণ হয়ে ওঠে। এই বৈচিত্র্য অস্বীকার করা যায় না।

এই যে পার্থক্য—উত্তরের তুষার-মৌলী হিমালয়াঞ্চল, পূর্ব্বে সমুদ্র-সৈকত ও শ্যামলাস্তীর্ণ সমতল ভূমি, পশ্চিমে রুক্ষ তাম্রাভ রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্রের মরুবিভাগ এবং দক্ষিণের নদীপর্ব্বত ও উপকূলসমাচ্ছন্ন বৃষ্টি ভূমি—এ থেকেই বহু বিচিত্র ভারতবর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, বৈরাগ্যবাদী বৌদ্ধ, ভক্তিবাদী বৈষ্ণব, রুদ্রপন্থী শাক্তশৈব নানা জাতি গোষ্ঠীর ও তাঁদের সাধন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে বহু বিচিত্র আচার ব্যবহার ও ভাষার ঐশ্বর্য্যের। হিন্দু, মুসলমান, বৃটিশ—তিন যুগ পার করে আজও ভারতভূমি তার এই প্রাণগত বৈচিত্র্য বজায় রেখেছে, তাই ভারতভূমি ঠিক সেই অর্থে একটা দেশ এবং ভারতবাসী একটা জাতি নয়, যে অর্থে আমরা দেশ ও জাতি শব্দ ইংল্যাণ্ড, জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবহার করি। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম না করলে ভারতবর্ষের আসল পরিচয় যে পাওয়া হয় না, সাড়ে তিন সপ্তাহের ঝটিকাগতি পর্যটনে এটা ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাটুকুই হলো উদ্বৃত্ত লাভ।

মেরুবাসিনীকে

নবনীতা দেব

ইনগ্রিড, আমি পেয়েছি তোমার পত্র চারু,
লিপিতে রচেছো মেরু-হরিণের চিত্র-কারু।
ভুলেছি তোমারে, ভুল-সন্দেহে দুলেছো তুমি!
তাই তো লিখেছো—"ভুলোনা মোদের নরওয়ে-ভূমি!
স্বর্ণরৌদ্রে উজ্জ্বল তব স্বদেশে ফিরে
গিয়েছো কি ভুলে তুষার-দেশিনী এ সখীটিরে?"
লিখেছো, "ধরার মানচিত্রটি প্রায়ই নিরখি,
খুঁজি বিশ্বের কোন্ কোণে আছো শ্যামলা সখী?
বৃহৎ এসিয়া দেখি ম্যাপ্ জুড়ে বিরাট দেহ!
বহু—বহুদূরে তাহারি প্রান্তে তোমার গেহ।
খুঁজে বার করি যেথা উপদ্বীপ ভারত আছে,
উন্মনা-মন উড়ে চলে যায়—তোমার কাছে!"
ইনগ্রিড!—আমি ভুলিনি তোমায়। যাবোনা ভুলে!
অপরিচয়ের রুদ্ধ দুয়ার দিয়েছো খুলে
আশ্চর্য্য সে রবি-কর-স্নাত মেরুর রাতে,
সহজ হাসিয়া মোর করদুটি ধরিলে হাতে!
দুজনে জানিনা দুজনার নিজ-মাতৃভাষা,
বিদেশী-ভাষায় রচেছি সেদিন এ-ভালোবাসা!
উত্তর-মেরু-প্রদেশের সখি ভুলিনি স্মৃতি।
ভুলিনি হিমের দেশের মেয়ের তপ্ত প্রীতি!

মনে পড়ে সেই তুষাররাজ্যে নিশীথ-রবি!
ফিয়ডকীর্ণ অতি অভিনব সাগর-ছবি!
নীলজল আর নীল আকাশের মাঝারে আছে
ঋজু উন্নত পর্বতমালা মেঘের কাছে।
হিম-গিরি-মূলে তুষার-হ্রদের রূপালি-ছবি,—
জাগ্রতে যেন দেখেছি সেদিন স্বপ্ন সবি।
আগুনের আভা স্ফটিকস্বচ্ছ তুষারে ঝলে',
উত্তাপহীন রক্তিম-রবি নিশীথে জ্বলে;
শিখরে শিখরে শতবরণের চকিত লেখা!—
—সেই রজনীতে তোমাসনে মোর প্রথম দেখা।
নিশীথসূর্য্য-উদয়ের দেশে হে সহচরি!
পরদেশিনীরে বন্ধু বলিয়া নিয়েছো বরি'!
স্বর্ণাভলঘু অলকে তোমার ঢেউয়ের দোলা,
ফিরোজানয়নে নিলীম স্বপ্ন ভুবন-ভোলা!

তব পরিচয় অবিস্মরণী, ভুলিব নাকো,—
দীর্ঘ জীবনে যতই সুদূরে যেথানে থাকো
দুজনে দোঁহার স্মৃতিতে রহিব উজল হয়ে—
—মেরু-তপনের আলোকের সাথে জড়িত রয়ে! *

---

* নরওয়েদেশীয়া সখী Ingierd Husebyর পত্রোত্তরে

কানাইলাল ঘোষের 'শরৎচন্দ্র'

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" "শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে শ্রীকানাইলাল ঘোষের বর্ণিত শরৎচন্দ্রের বিবাহের কাহিনীটিকে একটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা আজগুবি গল্পমাত্র বলেছি। ঐ সঙ্গে ঐ প্রবন্ধের পাদটীকায় বলেছিলাম যে, কানাইবাবু তাঁর "শরৎচন্দ্র" নামক গ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আরও যেসব আজগুবি কাহিনী রচনা করেছেন, সেগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করব।

কানাইবাবুর এই গল্পগুলি সমস্তই তাঁর স্বকপোল-কল্পিত। কানাইবাবু তাঁর এই বানানো গল্পগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে নজীর দেখাবারও ভান করেছেন, এমন কি সাধারণ লোকে তাঁর মিথ্যা কাহিনীকে যাতে সত্য বলে মেনে নেয়, সেজন্য তিনি মিথ্যাকেও এমন জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন যে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। যেমন শরৎচন্দ্রের এই বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়েই কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন। শুধু এটুকু বলেই আমি আমার নিবেদন শেষ করতে চাই যে, হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করতে পারেন নি—তার প্রধান কারণ, তিনি (হিরণ্ময়ী দেবী) প্রথম জীবনে ছিলেন বালবিধবা। তাঁর সংস্কার ছিল, পুনঃ আনুষ্ঠানিক বিবাহে হয়ত তাঁর (শরৎচন্দ্রের) কোন জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে। তিনি বলতেন—অমুক জজের মেয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে পুনরায় বিধবা হয়েছেন সুতরাং আমি প্রথমে কালিঘাটে মায়ের পুজো না দিয়ে কিছুতেই সিঁদুর পরবো না। বর্মা থেকে ফিরে সে কাজ তিনি প্রথমে করেছিলেন, এবং শিবপুরে একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন হাওড়া-নিবাসী শ্রীঅনুরূপ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখনও জীবিত। ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে দেশবাসী তাঁদের কৌতূহল বিদূরিত করতে পারেন।"

এই অনুরূপ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কাশীবাসী। কিছুদিন আগে অনুরূপবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। অনুরূপবাবুকে কানাইবাবুর এই লেখার কথা বললে, তিনি কানাইবাবুর কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন—"শ্রীকানাইলাল ঘোষ তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—'...শিবপুরে একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল। সে বিবাহের পুরোহিত ছিলেন হাওড়া-নিবাসী শ্রীঅনুরূপ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।' কানাইবাবুর এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কোন বিবাহের আয়োজন হয়নি এবং সেরূপ কোন অনুষ্ঠানে আমি পৌরোহিত্যও করি নাই।"

অনুরূপবাবু বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হয়ে ধর্মচর্চা করেই দিন কাটাচ্ছেন। তিনি কানাইবাবুর কাছে এক কথা আবার আমার কাছে আর এক কথা বলছেন বলে মনে হয় না। অনুরূপবাবু কানাইবাবুকে এ সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি বললেন। অবশ্য কানাইবাবুও অনুরূপবাবুর পৌরোহিত্য করার কথা, অনুরূপবাবুর নিজের মুখ থেকে শুনেছেন, একথা লেখেন নি। কানাইবাবু একথা কার কাছ থেকে শুনেছেন তাও বলেন নি। অনুরূপবাবুর ন্যায় বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য প্রতিবেশীরাও—শিবপুরে শরৎচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়েছিল—এরূপ কথা কেউ বলেন না। তাই কানাইবাবু এই কাহিনীটিকে যতই জোরের সহিত প্রকাশ করুন না, এটি যে তাঁর বানানো কথা তা বলা যায়।

এখন কানাইবাবুর বইয়ের কয়েকটি আজগুবি গল্প নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক—

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত বাল্যকালে যখন তাঁর জন্মভূমি দেবানন্দপুর গ্রামে ছিলেন, সেই সময়কার কথায় কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

"গ্রামে শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। খড়ের ছাউনির প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছোট একটি পাঠশালা বসতো। সেখানে পড়তো পাড়ার যত ছোট ছেলেমেয়ে। পণ্ডিত মশায়ের পেশা ছিল যজমানী। তারই ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন, দুবেলা ছেলে মেয়েদের একটু দেখাশুনা করতেন—আর ঘন ঘন তামাক সেবন করতেন।...

শরৎচন্দ্রকেও এখানে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু সে বয়সে তিনি ছিলেন বড় চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির। প্রতিদিন যেরূপ তামাক সাজা থাকে, তেমনি একদিন তামাকের পরিবর্তে ইটকুঁচি দিয়ে তামাক সেজে রাখলেন। পণ্ডিতমশাই যেরূপ আরামে যথারীতি তামাক সেবন করেন, সেইরূপ তামাক সেবনে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কিছুতেই আর ধূমোদ্গার হয় না। প্রাণপণে হুঁকোতে টান দিলেন—তবুও যেই কে সেই! ব্যাপার কি? কলকেটি উপুড় করে দেখেন—তামাকের পরিবর্তে টুকরো ইট! এটি যে ছাত্রদের কীর্তি সেটুকু বুঝতে পণ্ডিত মশায়ের একটি মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না। সুরু হ'ল নির্যাতন।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে ছিল ভীরু প্রকৃতির ছেলে। ভয়ে শরৎচন্দ্রের নাম দিল বলে। শরৎচন্দ্র দেখলেন বেগতিক। পণ্ডিতমশায়ের কাছে আসার পূর্বেই বিনোদকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেন ছুট। ছেলেরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটলো। পণ্ডিত মশায়ের কড়া আদেশ—ধর ওটাকে ধর! বন্ধু হলেও ধরতে এখন হবেই—নইলে মুক্তি নেই কারও—

কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্য ছিল না কারও। সকলেই ঘর্মসিক্ত হয়ে ফিরে এলো। বললো—পণ্ডিতমশায়, ঘাটে বাঁধা জেলেদের ডিঙি খুলে শরৎ পালিয়েছে।

বলিস্ কি রে? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন পণ্ডিতমশায়!

আমরা সবাই দেখে এলাম তো তাই! এক সঙ্গে উত্তর দিল ছাত্রের দল।

ডুবে যাবে না তো? একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তাঁর দুরু দুরু করে কাঁপতে সুরু করলো—সবই যে এর সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড—কি মুশ্‌কিলেই না পড়া গেল! তাড়াতাড়ি ছুটলেন শরৎচন্দ্রের ঠাকুরমাকে খবর দিতে।

শরৎচন্দ্র সেদিন আর বাড়ীমুখো হলেন না। পণ্ডিতমশায়ের যা রাগ—ধরা পড়লে কি আর রক্ষা আছে? সরস্বতী নদীর স্রোতে সোজা ডিঙি ভাসিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। ডিঙি কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ার কাছে গিয়ে ঠেকলো। সেখানেই নিশ্চিন্তে রাতটুকু দিলেন কাটিয়ে।

এপাশে সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল—পাশের গ্রামেও লোক ছুটলো। কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। রাতটা আশঙ্কা ভরে কাটলো। পরদিন সকালে আবার লোক খুঁজতে বেরুলো—অবশেষে দেখা গেল, পরম নিশ্চিন্তে আখড়ায় বসে রাধা-কৃষ্ণের কীর্তন গলাধঃকরণ করছেন শিশু শরৎচন্দ্র।…

…পণ্ডিত মশায়ের ছেলে কাশীনাথ, আর এক যাজক ব্রাহ্মণের ভাগ্নী কালিদাসী ওরফে রাজলক্ষ্মী তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে পড়লো।…

পণ্ডিত মশায়ের আর একটি গুণ ছিল। প্রায়ই আফিং সেবন করতেন বলে নেশায় মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়তেন। শরৎচন্দ্র সেই অবকাশে তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী কালিদাসীকে নিয়ে সরে পড়তেন নিঃশব্দে। অন্য ছেলেরা তাঁকে যথেষ্ট ভয় করতো, মিথ্যে ঘাঁটিয়ে লাভ কি? কখন ঝোপের আড়াল থেকে ইটের টুকরো দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দেবে কে জানে?

কালিদাসী বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। রোগা, পেটমোটা, গায়ের রংটা কিন্তু ঝকঝকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চুলগুলো ছোট ছোট—শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুগত। খেলা ত ছাই, বন থেকে জোগাড় করে আনতে হ'ত বৈঁইচি ফল।

এই বৈঁইচি ফলের প্রতি শিশু শরৎচন্দ্রের লোভ ছিল অসাধারণ। এই অমৃত সংগ্রহে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে কালিদাসীর নির্যাতনের সীমা থাকতো না। মাথার চুলগুলো প্রায় শেষ হওয়ার জোগাড় হ'তো, পিঠে চড়ার ঘা যে পড়তো না এমন কথা নয়, কিন্তু মেয়েটির ছিল সহ্য করার অসম্ভব ক্ষমতা। কোনদিন কিন্তু মুখফুটে এর কোন প্রতিবাদ সে করেনি, বরং অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে গভীর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনতো এই অমূল্য সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের রাগ পড়ে যেতো সঙ্গে সঙ্গে। সস্নেহে তার হাতখানি ধরে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিবুকখানি তুলে আদর মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—খুব লেগেছে নারে কালিদাসী?

কালিদাসীর চোখের পাতাগুলো ঝাপসা হয়ে উঠলো। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে তার চোখের পাতাগুলো মুছে দিলেন ধীরে ধীরে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—এই কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোর গায়ে হাত তুলবো না—বুঝলি?

বৈঁইচি ফলের মালাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—খা।

কালিদাসী জিভ্ বার করে দুহাত পিছিয়ে গেল। বললো, একবার দিয়ে আর কি ফিরিয়ে নিতে আছে? না—না—তুমি খাও।…

দুরন্ত-পনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে শরৎচন্দ্রকে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়া সুরু হল, কিন্তু প্রকৃতির সহজ বিকাশ তাঁর কোন মতেই রুদ্ধ করা গেল না। স্কুল থেকে পালিয়ে এর বাগান, ওর বাগান থেকে আম, কাঁঠাল, আনারস সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার চলতে লাগলো পুরোদমে।"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথা লিখেই কানাইবাবু ঠিক এর পরেই ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর কথা লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, ঐ সময়ে শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কেদারনাথের এক ভাই দীননাথের মৃত্যু হয় এবং আর এক ভাই অমরনাথও মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। এই মুমূর্ষু অমরনাথ মৃত্যুর পূর্বে ভুবনমোহিনীকে (কেদারনাথের কন্যা, শরৎচন্দ্রের মাতা) একবার দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কেদারনাথ নিজেই একদিন কন্যাকে আনতে দেবানন্দপুরে গেলেন। কেদারনাথ দেবানন্দপুরে গিয়ে দেখেন, জামাতার উপার্জনে আদৌ মন নাই, ফলে সংসারে দারুণ অনটন। তাই তিনি কন্যা, জামাতা ও নাতিনাতনীদের সকলকেই সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরে ফিরে এলেন।

এরপর কানাইবাবু আবার লিখছেন—"ভুবনমোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তার কিছুদিন পরেই অমরনাথ গেলেন মারা। কেদারনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক সেই সময় ডিহিরিতে মতিলাল একটি চাকরী পেয়ে গেলেন। সপরিবারে তিনি যাত্রা করলেন ডিহিরিতে, কিন্তু সে চাকরী তাঁর বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। পুনরায় ফিরে এলেন ভাগলপুরে।…

* * *

ভাগলপুরে যখন ফিরে এলেন তখন শরৎচন্দ্রের বয়স হবে প্রায় সাত।"

এবার কানাইবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

শরৎচন্দ্র প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে দেবানন্দপুরে বাঙ্গলা স্কুলে প্রায় একবছর পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী তাঁর "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র" প্রবন্ধে লিখেছেন—"দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার সহপাঠী ও সমবয়স্ক যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ অনুসন্ধানে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।…পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত ৺সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙলা স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন।"

কানাইবাবু বলেছেন—ডিহিরিতে মতিলালের চাকরী বেশি দিন

ছিল না। বেশিদিন ছিল না বলায়, ধরা যেতে পারে—অন্ততঃ মাস ছয়েক ছিল।

কানাইবাবু বলেছেন—মতিলাল ডিহিরির চাকরী ছেড়ে সপরিবারে যখন ভাগলপুরে ফিরে এলেন, তখন শরৎচন্দ্রের বয়স প্রায় সাত। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স যদি সাত হয়, তাহলে ডিহিরির মাস ছয়েক ও বাঙ্গলা স্কুলের বছর খানেক বাদ দিলে পাঠশালায় পড়বার সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল পাঁচ সাড়ে-পাঁচ।

কানাইবাবু শরৎচন্দ্রের পাঠশালা জীবনের যে কাহিনী বলেছেন—অর্থাৎ জেলেদের বাঁধা ডিঙি খুলে সরস্বতী নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ায় চলে যাওয়া এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণের কীর্তন গলাধঃকরণ করে রাত কাটান ইত্যাদি একটি পাঁচ বছর সাড়ে-পাঁচ বছরের ছেলের পক্ষে সম্ভব কি?

কানাইবাবু বলেছেন, কঙ্কেয় ইটকুঁচি দেওয়া শরৎচন্দ্রের কীর্তি, একথা পণ্ডিতমশায় জানতে পেরে অপর ছাত্রদের যখন বললেন, ধর ওটাকে ধর; তখন সব ছাত্রই "বদ্ধ হলেও ধরতে এখন হবেই—নইলে মুক্তি নেই কারও"—বলে শরৎচন্দ্রকে ধরতে গেল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কারও সাধ্য ছিল না। সকলেই ঘর্মসিক্ত হয়ে ফিরে এল।

আচ্ছা, পাঠশালায় 'শির পোড়ো' বা 'সর্দার পোড়ো' নিশ্চ ছিল, আর শরৎচন্দ্রের চেয়ে বেশি বয়সের ছাত্রও নিশ্চয়ই ছিল। বি একটি পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গে ছুটে কেউই পা না। এ কি সম্ভব?

কানাইবাবু বলেছেন—পণ্ডিতমশায় আফিংএর নেশায় মাঝে মা ঝিমিয়ে পড়তেন, সেই ফাঁকে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী কালিদাসী নিয়ে পাঠশালা থেকে সরে পড়তেন। দুজনে কোন একটা বো কাছে চলে যেতেন। সেখানে কালিদাসী গভীর জঙ্গল থেকে শরৎচ জন্য বৈঁইচি ফল তুলে আনত এবং মালা গেঁথে দিত। এদিকে পাঠশা অন্য ছেলেরা শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট ভয় করত বলে কেউই কিছু বলত না।

একটা অত ছোট ছেলেকে পাঠশালার সমস্ত ছেলেই ভয় কর আর পণ্ডিত মশায়ের আফিংএর ঝিম কেটে গেলে, তিনি পাঠশ শরৎচন্দ্র ও কালিদাসীর অনুপস্থিতিটাও টের পাচ্ছেন না—এও কি ক সম্ভব?

এই সব অসঙ্গতির জন্য কানাইবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের বাল্যজীব এই কাহিনীটিকে একটি বানানো গল্প বলেই মনে হয়।

মনোহরণের মনে ছিল যার আশা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্জ্জনে নত নিশীথের বুকে তুমি
চাঁদ হয়ে কবে এসেছিলে ধীরে ধীরে!
শেষ বিদায়ের তৃষিত পাত্র চুমি
রেখে গেলে কারে সাথীহারা আঁখিনীরে?
আশ্রমহারা সে যেন শকুন্তলা,
ধূসর জগত তার পানে চেয়ে থাকে।
স্মরণ মধুর ওই যে বকুলতলা
হৃদয়ের পাখী হোথায় কেবলি ডাকে!

কেন এলে, আর চুপে চুপে চলে গেলে?
প্রেমের পূজায় কামনা হয়েছে ধূলি:
জলে নিরালায় ক্ষণিকের পাখা মেলে
জোনাকির মত জীবনের স্মৃতিগুলি।
সে গেছে মিলায়ে মহামিলনের ঘটে
যে পূজায় ছিল ধ্যানের দেবতা নব;
ভাঁটার টানেতে পড়ে আছে ভাঙা তটে
জোয়ারের বুকে যে ফুল ভেসেছে তব।

বিরলে বিরহে বেপথু হোলো যেদিন,
আয়ুঝরা পাতা উড়ে যায় অনিবার।
সমুখে ঝিমায় প্রান্তর পথহীন
বহিছে বীথিকা ঘন বেদনার ভার।
স্বপনের মত এসেছিল ভালোবাসা,
এঁকে গেছে শুধু অশ্রুসজল রেখা
মনোহরণের মনে ছিল যার আশা,
ফুটিল না তাহা—এমনি বিধির লেখা।

শাখায় শাখায় দোল-খাওয়া মধুমাসে
কত বসন্ত রঙীন হয়েছে প্রেমে;
আজ সব মিছে; তুমি নাহি তার পাশে
গান গাওয়া তার চিরতরে গেছে থেমে।
সাগরের পানে সব নদী ছুটে চলে,
কল্লোল দোলে কত কাকলীর সুরে;
বিধুর ব্রততী ছিন্ন কুসুম তলে
তারে ভুলে আজ তুমি আছ কত দূরে?

আগন্তুক

(লেখক—জিওফ্রি কিনো)

অনুবাদ—হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রাসাদটির বাইরে দাঁড়াল সে। সে যেন স্বপ্নাতুর, অনিশ্চিত যন্ত্রচালিত খেলার পুতুল। শ্রান্তি বোধ হলো তার, পিঠে ব্যথা অনুভূত হলো। এর আগে সে ব্যথা পায়নি কোনদিন, তাই আজকের এই শারীরিক ক্লেশ আকুল করলো তাকে। তার মনে হলো—দীর্ঘদিনের কঠিন জরাক্রান্তের মতো দুর্বলতা ও ঔদাসীন্য এসে গেছে তার।

সে মাথা তুলে প্রাসাদটির পানে চাইলো। বিশাল উঁচু এই প্রাসাদটি অপরিচিত, বাইরে থেকে দেখলে মনে আতঙ্ক জাগে। সে ভেবেই পেলোনা—এখানে সে কেমন করে এলো, কেনই বা এলো? সামনের প্রবেশ পথটির দিকে অগ্রসর হলো সে। বুঝলো—সে ভিতরে যাচ্ছে, না গিয়ে উপায় নেই—যেতেই হবে।

চিন্তিত শঙ্কাকুলভাবে সে উঠলো সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির শেষে দরজাটি স্পর্শ মাত্রেই খুলে গেল।

শাদা পোষাক পরা বেয়ারা চোখ তুলে চেয়ে বলল, সেলাম হুজুর।

সে ভেবেই পেলোনা—কী বলবে তাকে। বেয়ারা উঠে এগিয়ে এলো তার দিকে। বলল, মিঃ জন, না হুজুর? ডাঃ হাউলি ও কমিটির সদস্যেরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।

: দাঁড়াও—আমার নাম হচ্ছে······

: কিছু মনে করবেননা হুজুর। এই ক্লাবের নিয়ম হচ্ছে সুধু নামটাই ব্যবহার করা হয়, পদবীটা নয়। ডাঃ হাউলি আপনাকে সব কথা বলবেন এ সম্বন্ধে। ভিতরে আসুন দয়া করে।

আপত্তি করবার মতো মনোবল বা শক্তি ছিলনা তার। সে বেয়ারার সঙ্গে চললো বিরাট হলটির ভিতর দিয়ে। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা রয়েছে। শঙ্কা জাগলো তার মনে। কেন সে এখানে এলো। পায়ের বুট জোড়া ভিজা, কাদামাখা, কার্পেটে কাদার দাগ লেগে যাচ্ছে।

বেয়ারা একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। মৃদু করাঘাত করলো দরজায়। তারপর দরজা খুলে আগন্তুকের আগমন ঘোষণা করলো। সে দেখলো—একটি চকচকে টেবিলের দুদিকে বসে আছে তিনটি লোক। খর্বাকার লোকটি টেবিল থেকে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলো। সবাই চেয়েছিল তার দিকে। ঘরের ভিতরকার স্তিমিত আলোয় সে দেখলো—তাদের সকলের চোখের ঔৎসুক্য।

: আসুন, মিঃ জন। আমাদের সভায় আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমার নাম হলো হাউলি।

হাত বাড়ালেন তিনি। জন অনুভব করলো ঠাণ্ডা, শুষ্ক তার হাতখানি। করমর্দন সে পছন্দ করেনা। তা ছাড়া লোকটির চেহারার মধ্যে আকর্ষণ কিছু নেই। মুখে প্রসন্নতা আনবার বৃথা চেষ্টা করলো সে। বলল, নমস্কার।

ঘরটির বাইরে দাঁড়িয়ে সে যেন এতক্ষণ নিজেরই প্রতিকৃতি দেখছিল স্বচ্ছ একটি দর্পণে। সুধু এই একটি কথা ছাড়া একটি বাক্যও সে উচ্চারণ করেনি ইতিমধ্যে। সে শুনলো বহু দূর থেকে তার নিজেরই কণ্ঠস্বর; এখানে এসে অবাক হয়ে গেছি আমি। ভুল করেছি নিশ্চয়।

জন তার হাত দুখানি তুললো ক্ষমা প্রার্থনা করবার

উদ্দেশ্যে। স্পষ্ট, আবেগহীন বাণী শুনে এক ব্যক্তি তাকে বলল, নিশ্চয়। দয়া করে বসুন। সে তাকে একখানি চেয়ার দেখিয়ে দিল। জন যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গেল সেদিকে। মৃদু হাসলো লোকটি, সকলেই হাসলো সেই সঙ্গে। সে বলল, আপনার এখানে আগমনের কারণ জানাচ্ছি, আপনিই বরং বলুন না আমাদের।

জন বলল, সে বসে আছে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকের মাঝখানে, তাদের দুজনেরই মুখ যেন তার পরিচিত। ওরা যদি আর একটু আলোর সামনে আসতো। কদিন থেকে বেশি আলোর মধ্যে থাকা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। টেবিলের মাথায় বসেছিলেন ডাঃ হাউলি। তিনি বললেন, মিঃ জন, আমাদের কমিটির বিশেষ অধিবেশনটি আরম্ভ হবার আগে আমি অধিবেশনের দুজন আহ্বায়কের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আপনি তাদের দু'জনের মাঝখানে বসে আছেন, আপনার বাঁদিকে রয়েছেন মিসেস এডিথ্ আর ডানদিকে যিনি আছেন তাঁর নাম হলো মিঃ ফ্রেড্রিক্। ওদের দু'জনের—মানে দুজনের সঙ্গে কিছুদিনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আপনার স্মৃতি উজ্জীবিত করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবো আপনাকে। আপনি কাহিনীটি ঠিক বলে যাবেন। সত্য কথাই বলবেন নিশ্চয়। এখানে সত্য কথা না বলে পারবেন না।

স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরখানি। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে সকলের মুখ দেখবার চেষ্টা করলো। স্মরণ হলো না, ইতিপূর্বে সে এই ক্লাবে যোগদান করেছে কোনদিন। ভাববার চেষ্টা করলো, কিন্তু মনে পড়লো না কিছুই। স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে তার।

তার কল্পনা বাধা পেলো: জন! কিছুদিন আগে আপনি একটা বিপদে পড়েছিলেন। কমিটি আপনার সে কাহিনীটা শুনতে চায়। আচ্ছা, বলুন তো জেনেট ক্রুক্ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন।

নামটি শুনে চমকে উঠ্‌লো জন। কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, সে মারা গেছে।

: আমরা তা জানি, কিন্তু কেমন করে?

: দুর্ঘটনায়—মোটরগাড়িতে ধাক্কা লেগে।

: দুর্ঘটনা? সত্যিই?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি। গাড়িটি রাস্তা থেকে উল্‌টে পড়ে যায়, আর সে তারই ফলে মারা যায়। সত্যিই আমি তাকে খুন করিনি, ও-ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা।

ডাঃ হাউলি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, দেখুন মিঃ জন, আপনার চিন্তার সূত্রটি আমি ধরিয়ে দিয়েছি। এবার আপনি নিজেই আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বলুন।

ডাঃ হাউলির কথা শুনে জনের মনে হলো যেন তার চোখের সামনে থেকে যবনিকা অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার মনে পড়লো সেদিনের স্মৃতি—যেদিন জেনেটের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

: সে আজ দেড় বছর আগেকার কথা। সেদিন আমার স্ত্রী শহরে এসেছিল। শহরে বেশি আসতোনা সে। আমি তার সঙ্গে লাঞ্চ্-এ বেরোলাম। আপিসে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। দেখলাম কয়েকটি জরুরী কাজ এসে গেছে এরই মধ্যে। কাজ শেষ করতে প্রায় সন্ধ্যা হলো। ভাবলাম রাতটা শহরেই কাটাবো। প্রায়ই এমন করতাম। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছিলাম তাই। সাতটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে হেলেন মনে করে নিত—আমি শহরেই রয়েছি।

সন্ধ্যাটি ছিল চমৎকার। খেতে যাচ্ছিলাম। ইচ্ছা হলো একটু মদ খাবো। একটিমাত্র সংকল্পে অতর্কিতে কী পরিবর্তনই না হয় মানুষের জীবনের। দোকানে লোকজন ছিলনা কেউ। সুধু একটি তরুণী হাতের উপর মাথাটি রেখে বসেছিল একটি টেবিলের সামনে। আমি হয়তো তাকে লক্ষ্যই করতাম না যদি না সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। উৎসুক হয়ে তার দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার দুগণ্ড বেয়ে জল ঝরছে। তাকে দেখে দয়া হলো আমার। জিগ্যেস করলাম, তার কোন সাহায্য আমি করতে পারবো কিনা।

করুণ, ভগ্ন অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বললো, যদি অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা থাকে তা'হলে পারবেন, নয়তো নয়।

: না অসাধ্যসাধন আমি করতে পারিনা। তবে এক গেলাস মদ খাইয়ে মনটাকে একটু খুসী করে দিতে পারি—অর্থাৎ, আপনার দুঃখের সামান্য অংশভাগী হতে পারি।

আমার এই মন্তব্যে মৃদু হাসলো সে।

তার জন্য এক গেলাস মদ নিয়ে এলাম। নিজের জন্যও আনলাম।

রাজী হলো সে। দেখলাম, সে তার বাম পাখানি একটি লোহার পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর ফিতেটা বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশের টেবিলে এলো। গেলাস দুটি টেবিলে নিয়ে এলাম আমি।

তীক্ষ্ণ তীব্রকণ্ঠে সে বলল, ওদিকে চেয়ে না-দেখার ভান করবেননা। সেটা বরদাস্ত করতে পারিনা আমি। আমি পঙ্গু। আজই তা' জানলাম। আজীবন আমাকে এমনি পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।

সে তার চোখের জল রোধ করতে পারলোনা। তরুণী সে, রূপসী। ছোটখাটো—বেশি লম্বা নয়, মুখখানিতে অপূর্ব লাবণ্য-মাখা, চিবুকটি মানানসই, ডাগর চোখ দুটি কালো। কালো কেশরাজি সুবিন্যস্ত। গায়ের চামড়া স্বচ্ছ, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখেছে সে। তাছাড়া আর কোন প্রসাধন করেনি সে। তার ঠোঁট দুটিই তার অনিন্দ্য রূপটি নষ্ট করেছে। ঠোঁট দুটি পুরু, তাতে তার মনের খিটখিটে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

: আমার দুঃখের অংশভাগী হতে চেয়েছেন আপনি ?"

—মদের গেলাসটি হাতে তুলে সে বসল। সুডৌল তার হাত দু'খানি। সে বলল, কথা বলতেই হবে আমাকে। এ সবের ভার দিতে হবে একজনকে। এক বছর আগেও নাচে কী সুনামই না ছিল আমার। এখন আমার যা হয়েছে তা' তো অন্য কারো হতে পারতো। কিন্তু হলো আমারই। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হলো। খেয়াল করলাম না বিশেষ। তারপর জানলাম, হাসপাতালে রয়েছি আমি, পঙ্গু হয়ে গিয়েছি। অনেকদিন শুয়ে রইলাম। ওরা বলল, রোগ সেরে যাবে, তবে একটু সময় লাগবে। আমাকে ব্যায়াম করতে দেওয়া হলো, তারপর এই লোহার পা পরানো হলো। আজই ওরা আমায় বলেছে—আমার বাম পা' চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। আমার নাচ গেল নষ্ট হয়ে, এখন মরণই হবে আমার পক্ষে ভাল।

তার দু'চোখে নেমে এলো বাধাহীন অশ্রুধারা। দু'জনে একসঙ্গে বসে পান করতে লাগলাম স্থিরভাবে। আমার সঙ্গে খেতে বললাম তাকে, তারপর নিয়ে গেলাম আমার ফ্ল্যাটে। সেদিনকার সন্ধ্যার জন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো, ব্যস্ত হয়ে উঠলো কী করে খুসী করবে আমায়।

অবাক হয়ে গেলাম তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়।

তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে চেয়ারের উপর শুয়ে প্রায় কানে কানে বলল, আমায় খারাপ ভেবোনা জন। যদি আমার দেহখানিকে ভালবাস, তা'হলে আমি বাধা দেবোনা তোমায়। তবে, আমি তা ঘৃণা করি, এতে নীচু হয়ে যাই আমি।

অবসন্ন শিশুর মতো সে বিছানায় ঘুমাতে গেল। তারপর মোহান্ধ হয়ে পড়লাম। ছোট্ট একটি জীব সে, কিন্তু তার কমনীয়তা ও যৌবন আমায় প্রলুব্ধ করলো, তার প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি, ভাবলাম—তাকে আমার চাই-ই।

আতঙ্কিত হলাম আমার এ আকুলতায়। জানতাম, হেলেন আমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেনা, তবু জেনেটকে ছাড়া আমি আমার অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারলামনা। তাকে ধরে রাখা ব্যয়সাধ্য বিলাস, অর্থাৎ তাকে রাখতে গেলে অর্থব্যয় করতে হবে। আমিই তাকে দেখিয়েছি, জীবনের শ্রেষ্ঠতম চাওয়া সহজেই দাবী করা যায়, আর—আমি যদি তা' দিতে না পারি তাহলে সে আরেকজনকে খুঁজে নেবে। আমার গৃহিণীর উপর কোন মোহই ছিলনা আমার। ভেবে স্থির করলাম—কী করতে হবে। পরিকল্পনাটি ছিল মনের অবচেতনায়। জেনেটই সেটি কার্যকরী করলো। কিছুদিন আগে আমার সন্দেহ হলো তার আর একজন প্রেমিক আছে। তাই সে প্রাপ্তির ভাণ করে, তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে দেয়না আমায়। সে এখন আলাদা একটি ফ্ল্যাটে থাকে, আমিই তার ভাড়া দিই।

সেদিন রাত্রিতে সে আমায় এমনি অজুহাতে ফিরিয়ে দিল! আমি তার কাছ থেকে ফিরে রাস্তা পেরোবার সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিলাম। দেখলাম জেনেটকে। সে একটি যুবকের সঙ্গে একখানি মোটর গাড়ীতে বসে আছে। ট্রাফিক-এর বাতির জন্য তারাও অপেক্ষা করছিল,

দেখলাম—যুবকটি ঝুঁকে পড়ে তাকে চুম্বন করলো, জেনেটের মুখে ফুটে উঠলো বিস্ময়কর শান্ত তৃপ্তির রেখা, এর আগে তাকে এমন প্রফুল্ল প্রশান্ত দেখিনি কোনদিন।

ভয় জাগলো মনে। মনে হলো—তাকে হারালাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে স্থির করলাম, আমার স্ত্রী হেলেনকে মরতেই হবে।······

অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল। জন যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। মনে হলো সে রয়েছে এই অন্ধকার ঘরটির মধ্যে। সে শুনলো: বলে যান মিঃ জন। কথাগুলো শুনে ভয় পেলোনা সে। আবার ঘরটি অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে—চারদিকে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার। জন খুঁজে পেলো তার গল্পের সূত্র।

···হেলেন ও আমার বিবাহ হয়েছে বছর কুড়ি আগে। তবে ভুলবে না, যখন আমাদের বিবাহ হয় তখন প্রেম ছিল আমাদের দুজনেরই মধ্যে, ক্রমশঃ সে প্রেম শুকিয়ে গেল, দুজনের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হলো। কিন্তু তা'তে আর সেদিনের উত্তেজনা রইলনা। আমার ব্যবসায় যেমন তাড়াতাড়ি উন্নত হয়ে উঠলো, ঠিক তেমনি যদি কারো হয়, তা'হলে সেই হারে তার স্ত্রীকেও উন্নত হতে হয়। কিন্তু হেলেন তা হয়নি। হয়তো তার মধ্যে গুণ নেই তেমন। এক অভিজাত মধ্যবিত্ত সাম্প্রদায়ে সে জন্মেছে। সেই পতাকাটিই সে বয়ে চলেছে আজীবন। তা'ছাড়া সে হাঁপানিতে ভুগছে, কাজকর্ম কিছুই করতে পারেনা। ফলে দু'জনের কাছ থেকে দু'জনে দূরে চলে এলাম। হেলেনের বর্ণনা কী দেব আপনাদের কাছে?—স্থূলকায়া, আরামপ্রিয়, গোলগাল অপরিচ্ছন্ন একটি স্ত্রীলোক! তাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু জেনেটের প্রতি আমার অতৃপ্ত আসক্তির বেদীমূলে বলি দিতে হবে তাকে।

হেলেন ও আমি পল্লীগ্রামেই বাস করতাম। তার সেই জীবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত ছিল সে। বলেছি তো, সপ্তাহের মধ্যে একাধিক রাত্রি শহরে যাপন করলেও সে কোন আপত্তি করতোনা। তাই আমার এই দ্বৈত-জীবনে সে রইলো সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ।

সন্তান ছিলনা আমাদের, তবু হেলেন পরিপূর্ণ জীবন যাপন করছিল। সে বাগানে ফুলের টবগুলোর দেখাশুনো করতো, বান্ধবী ছিল তার অনেক, তা'ছাড়া, সমাজসেবা ও তাসের আড্ডা ছিল তার। আমাদের পাড়াপড়শীরা সবাই ভাবতো—আমরাই সর্বাপেক্ষা সুখী দম্পতী সেই অঞ্চলে। জেনেটের সঙ্গে দেখা হবার পর এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল আমার।

কিন্তু এই মহাপাতকের অনুষ্ঠান করবো কেমন করে? অদৃষ্ট যেন সুপ্রসন্ন হলো আমার উপর। হেলেনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো। হাঁপানি রোগীর পক্ষে এ রোগ সাংঘাতিক। ডাক্তার বললেন, একটি নার্স চাই, অনুগত স্বামী হিসাবে আমি তাকে অনুরোধ জানালাম—আমি নিজের হাতে তার সেবা করবো। নিজের কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে রাতের পর রাত আমি জেগে রইলাম শিয়রে।

সে অর্ধসচেতন, প্রবল জ্বর। জানালা খোলা রাখলাম, ওষুধ দিতে ভুলে গেলাম। শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে ফেলে দিলাম—যেন তাকে খাইয়েছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা নিমোনিয়াতে পরিণত হলো, অক্সিজেন বা ইনজেকশান দেবার আগেই সে মারা গেল। ডাক্তার বিনা দ্বিধায় তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। হেলেনকে সমাধিস্থ করা হলো। জেনেটের পাণিগ্রহণের পথ মুক্ত হলো। অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, তবু, উপায় ছিলনা! তাই একপক্ষকাল বাড়িতে বসেই কাটালাম। সবাই ভাবলো, পত্নীকে হারিয়ে হৃদয় ভেঙে গেছে আমার। তারপর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে শোক ভুলবার জন্য আপিসে ফিরে গেলাম। আমার কর্মচারীরা সমবেদনা জানালো আমার পত্নী বিয়োগের বেদনায়।

যেদিন আপিসে গেলাম ঠিক সেইদিনই জেনেটকে টেলিফোন করলাম। সে সাড়া দিল, কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তার ব্যবহারে। কোন আন্তরিকতা নেই, উৎসাহ নেই তার কথায়। তবে, শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে লাঞ্চ-এ যোগদান করতে রাজী হলো। বলল, একটু দেরী হবে, তার কারণ—"সেলুন-এ" গিয়ে ফিরবার পথে সে আসবে। রেস্তোঁরায় এসে রইলাম তার অপেক্ষায়। অধীর হয়ে উঠলাম। প্রায় আধঘণ্টা দেরী করলো সে। সে আমায় দেখে হাসলো—যেন ভয় পেয়েছে। বলল, হ্যালো জন, এত সব হবার পরও তোমাকে তো বেশ স্বাভাবিকই দেখাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বরে কোন আবেগ বা উত্তেজনা ছিলনা। তাকে দেখালো শ্রান্ত।

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 251-X52 BG
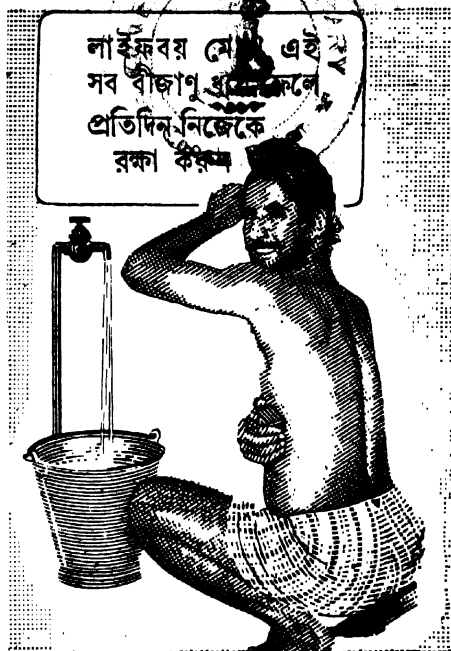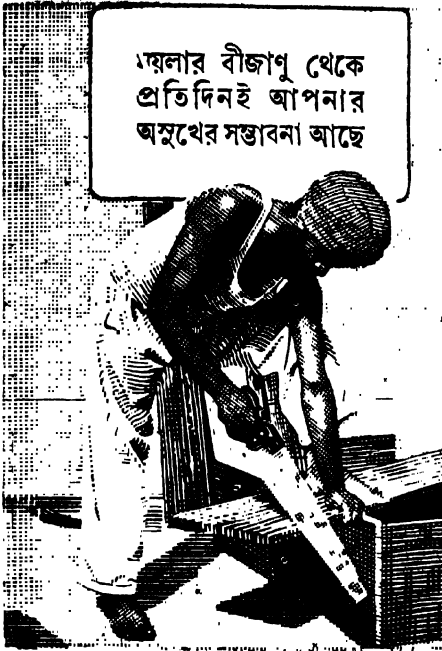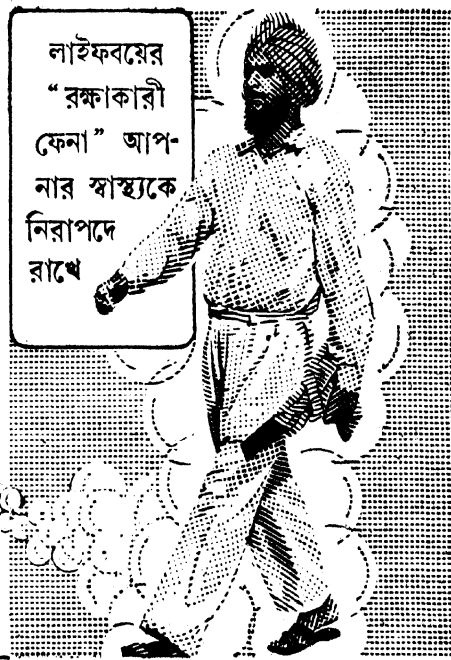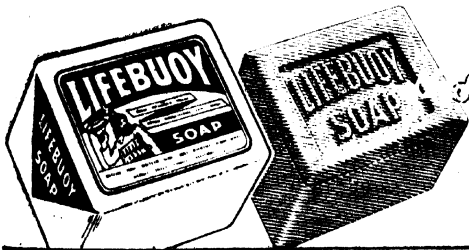
মদের অর্ডার দিলাম। জেনেট বলল, তোমাকে দেখে সত্যিই ভয় করছে আমার। তুমি বড় নিষ্ঠুর। হেলেন মারা যায়নি, কেমন না? তেমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ভেবেই পাচ্ছিনা তাকে কেমন করে সাবাড় করলে তুমি।

আমার দিকে চোখ তুলে সে তাকালোনা। তবু, তার এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারলামনা আমি। জেনেট তার হাতের নখগুলির দিকে চেয়ে রইলো। বলল, তোমার উপর আমার রাগ হচ্ছে, কারণ একটি কাজ করেই যা চাওয়া যায় তা কি পাওয়া যায়? আমি যা চাই, কোন কিছুই তা দিতে পারেনা। আমি যখন এখানে ঢুকি, তখন লোকগুলো সব কেমন করেই না আমার দিকে চেয়ে ছিল। ওরা অনুকম্পাভরে আমায় দেখছিল। শুনতে পেলে না ওরা কি বললো? ওরা বলল, হায়রে অভাগিনী: কী লজ্জা!—আর তুমি এখনই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করছ। উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বলে চলল, তোমাকে ভালবাসলেই ভালো হতো আমার। আমি তোমাকে পছন্দ করি, তুমি আমায় যা' দিয়েছ তারই জন্য। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার প্রণয় নেই। তাছাড়া, এখন তুমি একটি ভয়ানক কাজ করে বসেছ। সেই ভয়ানক কাজটিকে কাজে লাগাবার জন্য আমাকে আবার বিয়ে করতে চাও।

সে চোখ তুলে আমার মুখের পানে তাকালো। বলল, যেমন ছিলাম তেমন থাকলে দোষ ছিল কি? তোমায় তৃপ্তি দিচ্ছিলাম আমি। আমাকে পাবার চেষ্টা কেন তোমার? আমি যাচ্ছি, জন। আমাকে এখান থেকে গিয়ে চিন্তা করতে হবে। ফিরে এসে তোমাকে বলব, কী করবো। কিন্তু, এখন তা'তে কোন লাভ নেই।......

দুজনে নীরবে বসে রইলাম কতক্ষণ জানিনা। কথা বলতে পারছিলাম না মানসিক অসুস্থতায়। সেও যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

অবশেষে জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাবে এখন?

: আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। আমার খোঁজ করোনা, একা থাকতে দাও আমায়।

আমি তাকে একটি গাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। সে যখন গাড়িটি চালাতো তখন প্রফুল্ল দেখাতো তাকে। তার সঙ্গে তাই তর্ক করলামনা, কী যুক্তি আছে আমার? তাকে হারিয়েছি। হেলেনকে খুন করে কোন লাভই হয়নি। কী হলো তারপর?......

জেনেট্ চলে গেছে প্রায় একমাস হলো। ব্যবসায় উপলক্ষে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে "লাঞ্চ্" খাচ্ছিলাম। কথায় কথায় তিনি আমায় বললেন, গত সোমবার আপনার এক বন্ধুকে "ইষ্ট্ চার্চ"এ দেখলাম। আপনার বান্ধবী সেই জেনেট্ ক্রক-এর কথা বলছি। তার চেহারাটি সত্যিই লোভনীয়। কেমন, নয় কি? সে ছিল রাট্লেজের সঙ্গে। রাট্লেজ্‌কে তো আপনি জানেন—রাটলেজ গাড়ির উত্তরাধিকারী।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম: মিথ্যে কথা!

: আহা-হা, রাগ করছেন কেন মশাই? আমার উপর রাগ করে কী লাভ হবে আপনার? জেনেট্ ক্রক তেমনি অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিল। আপনি হলেন চতুর লোক। সেজন্য আপনার দোষ দিচ্ছিনা। জেনেটই অন্য বন্দোবস্ত করছিল। মিঃ রাটলেজ তাঁর প্রস্তাবটি তার কাছে পেশ করবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। তাদের দুজনেরই মুখে বিবাহের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। "এল্‌বিয়ন-"এ বাস করছে ওরা।

লাঞ্চ্-পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। গাড়িতে উঠে ইষ্ট্-চার্চ-এর দিকে ছুটলাম। ডিনারের আগেই সেখানে পৌঁছলাম। জেনেট বসেছিল একটি "বার্-"এ। তার পাশে ছিল একটি যুবক। সে একটি সবুজ "গাউন" পরেছিল। অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। তার কানে ঝুল্‌ছিল গত বড়দিনে আমারই দেওয়া ইয়ারিং জোড়া।

সে ঘাড় ফিরালো। আমায় সে দেখেছে নিশ্চয়। ঠোঁটের কাছে আনা মদের গেলাসটি হাতেই রয়ে গেল। সেই দৃশ্যটি আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে। তার বাম হাতে ছিল গেলাসটি, লাল নখগুলোর উপর পড়েছিল আলো। সেই আলোয় আঙ্গুলের হীরের আঙ্‌টিটি রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, কিন্তু সে রইল অনড়। তার পার্শ্বোপবিষ্ট যুবকটি যেন টের পেলোনা কিছুই।

: পাজি, হারামজাদী! আমার সঙ্গে তোর এই ব্যবহার! এত সাহস তোর!

সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিলাম তার গালের উপর।

সে মাটিতে পড়ে গেল। নড়লোনা সে, একটি শব্দও করলোনা। সুধু আমার দিকে চাইলো পরম ঘৃণাভরে। যুবক উঠে দাঁড়ালো। একবার জেনেটের দিকে চেয়ে বলল, বটে!

সে আমায় ঘুসি মারতে লাগলো। কিন্তু আমার সঙ্গে সে পারবে কেমন করে?

বেয়ারা ও দোকানের মালিক ছুটে এসে আমায় বাইরে নিয়ে এলো। শুনলাম যুবকটি বলছে, চমৎকার মানাতো দু'টিকে। ছিঃ ছিঃ—কী বোকামিই না করেছি!

গাড়িতে উঠে বসলাম। তারপর গাড়ি চালিয়ে দিলাম। সেই রাত্রিতে কোথায় গেলাম জানিনা। কখন আমার গাড়িটি নিয়ে বাড়ির সামনে পৌছলাম বলতে পারছিনা। বাইরে গাড়িতে বসে রইলাম আমি। অসুস্থ বোধ করছিলাম, চোখের জল ঝরতে লাগলো। একটি লোক এসে আমায় জিগ্যেস করলো—আমি "জন গেল্" কিনা। ঘাড় নেড়েছিলাম নিশ্চয়। লোকটি বলল—দেখুন, মিঃ গেল্, আপনি একবার আমার সঙ্গে আসুন। একটি দুর্ঘটনা হয়েছে। আমি একজন পুলিশ অফিসার। একটি তরুণীর মৃতদেহ সনাক্ত করবার জন্য আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই!

বুঝতে পারলামনা তাঁর কথা। হয়তো জিগ্যেস করলাম, ঘটনাটি কি? তাঁর মুখে শুনলাম, আজ সকাল পাঁচটায় ইষ্ট-চার্চ-এর কাছে পাহাড়ের উপর একখানি ভাঙা মোটর গাড়িতে একটি তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এটাকে আমরা ঠিক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারছিনা। কিন্তু তার আগে শবটি সনাক্ত করা দরকার। আমাদের বিশ্বাস, সেই মৃতা তরুণীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল। তার ব্যাগের মধ্যে আপনাকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেছে। তার নাম জেনেট্ ব্রুক্।······

সবই মনে পড়ে গেল। মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। তারপর আমায় জেনেটের মৃতদেহ সনাক্ত করবার জন্য নেওয়া হলো। কয়েকটি প্রশ্নের পর আমায় ছেড়ে দেওয়া হলো।

তারপর কী করছিলাম জানিনা। আমার ফ্ল্যাটেই রইলাম আমি। আমার দৈনন্দিন জীবন চিরাচরিতভাবেই চালাচ্ছিলাম হয়তো। ঠিক ক'দিন পরে জানিনা, একদিন আমার ঘরের "বেল"টি বেজে উঠলো। একটি অপরিচিত লোককে সঙ্গে নিয়ে চাকরটি ঘরে ঢুকলো। বিরক্তি প্রকাশ করলাম আমি। আরও ক'জন লোক অনুসরণ করলো তাদের। একজন বলল, আমি পুলিশ সার্জেণ্ট, জেনেট ব্রুকের হত্যার জন্য আপনাকে গ্রেফ্তার করলাম। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাদের দিকে—কথা বলবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম।······

আমার জনৈক বন্ধু সলিসিটর আমাকে পরামর্শ দিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে আমার। কিন্তু আমি তাতে গা' করলামনা। আমার সেল-এ বসে তিনি আমায় বললেন, তুমি এখন বন্দী। আমায় তুমি সাহায্য কর, নইলে তোমার অপরাধ প্রমাণ হয়ে যাবে, তুমি শাস্তি পাবে। বল, যেদিন সন্ধ্যায় জেনেটের মৃত্যু হয় সেদিন তুমি কোথায় গিয়েছিলে?···তোমার বিরুদ্ধে আত্মঘটিত প্রমাণ রয়েছে। এল্বিয়ন-এ সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি। সেখানে যে ক'জন লোক ছিল তারা সবাই তোমাকে সনাক্ত করতে রাজী। তাছাড়া, জেনেটের ব্যাগের মধ্যে তোমাকে লেখা একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিতে সে লিখেছে, রাট্‌লেজের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। সে তাকে ভালবাসে। সুতরাং তুমি যেন তাকে ছেড়ে যাও। সে লিখেছে—এ খবরটি এর আগে তোমায় জানাতে সাহস করেনি। তাছাড়া—এই রাট্‌লেজ তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানেনা।

সুদীর্ঘ চিঠিখানিতে তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। সুধু তা'ই নয়। ঘটনার দিন তুমি কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে লাঞ্চ্ খেতে বসে তাঁর মুখে জেনেটের কথা শুনে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলে। সেই লোকটিও বর্ণনা দিয়েছে একটি। বলেছে—খুনের সংকল্প নিয়ে তুমি বেরিয়েছিলে—এটা তোমার চেহারার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

তার কথা শুনে জিগ্যেস করলাম, খুন—খুন কেন? সবাই কেন একথা বলছে যে তাকে খুন করা হয়েছে?

: হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয় খুন। সামান্য দু'টি ঘটনা থেকে প্রমাণ হ'চ্ছে এটা দুর্ঘটনা নয়। জেনেট ছিল পঙ্গু। লাঠি ছাড়া চলবার শক্তি ছিলনা তার। গাড়ির মধ্যে কিংবা আশেপাশে কোথাও তার লাঠিটা পাওয়া যায়নি। আর

—সে ছিল খর্বাকার; তাই গাড়ির সিটটি সামনের দিকে টেনে বসতে হতো তাকে। তাকে যখন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তখন "সিট্"টি ঠিক তেমনিভাবেই ছিল। কিন্তু তার লোহার পায়ের ফিতাগুলো বাঁধা ছিল—যদিও সেটা খুলে না নিয়ে বসে গাড়ি চালানো সম্ভব ছিলনা তার পক্ষে। কেউ তাকে গাড়িটির মধ্যে পূরে পাহাড়ের উপর গাড়িটি রেখে এসেছে। এটা খুন ছাড়া আর কিছু হ'তে পারেনা।······

জন-এর সমাধি ভাঙলো যেন।

খুন—খুন—! কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি। তারপর আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলো। আমি জানি, ঠিক শেষ মুহূর্তে আমার দণ্ড মকুব হয়ে যায়। হলপ করে বলতে পারি, আমি হত্যা করিনি। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি জানিনা, কে এই হত্যাকারী। আমার দণ্ড মকুব করা হয়েছে—এই তো আমার নির্দোষিতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ।······

জন কপালে হাত বুলালো একবার।···

হ্যাঁ—এবার তার মনে পড়েছে।

দেখলো—জেলার সাহেব তার সেল-এ এসেছেন। তারপর আর কিছুই মনে পড়ছেনা। কী ভাবে তিনি তাকে তার দণ্ড মকুবের সংবাদটি দিলেন, তার কী প্রতিক্রিয়া হলো—কিছুই স্মরণ করতে পারলোনা সে। জন ভেবে ঠিক করতেই পারলেনা, কী প্রমাণ অবশেষে পাওয়া গেল—যার ফলে সে মুক্তি পেলো।

···হঠাৎ দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌লো তার মনখানি। ঈস্, কী বোকামীই না সে করে ফেলেছে! একটি খুনের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে আর একটি খুনের অপরাধ সে স্বীকার করে ফেলেছে। হেলেনের মৃত্যুর সেই কাহিনীটি—!······

মুখর হয়ে উঠলো সবাই। তারা যেন ভুলে গেছে তার উপস্থিতি। সেই স্ত্রীলোকটি—এডিথ্ বা কে একজন দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, আমি জানি, ডাঃ হাউলি, যে খুনের জন্য জনের বিচার হয়েছিল, তা'তে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ, কিন্তু তবু, তিনি খুনী। সুতরাং তিনি এখানকার সদস্য পদ পেতে পারেন।···

দাঁড়াতে পারছিলনা জন। পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল—দুর্বলতায়। দোহাই আপনাদের, আপনারা সব জানেন—দয়া করে বলুন, আমি এখানে কেন এসেছি, কেন আমার দণ্ড মকুব করা হলো?

সব চুপচাপ। ডাঃ হাউলি চেয়ার থেকে উঠে ছায়াময় ঘরখানির ভেতর দিয়ে তার কাছে এলেন।

: আমাদের সমিতি আপনাকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। আপনাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আলোকিত হয়ে উঠ্‌লো ঘরখানি।

: বলুননা, কী করে আমার দণ্ড মকুব হলো?

: আপনার দণ্ড তো মকুব হয়নি জন, আজ সকালে আপনার ফাঁসি হয়েছে।

ডাঃ হাউলি, মিসেস এডিথ্ থম্পসন ও মিঃ ফ্রেডারিকের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন।

আগন্তুক জনের অভ্যর্থনার জন্য সবাই হাত বাড়িয়ে দিল যুগপৎ।

দুই শার্টের গল্প
বিক্রী — শার্ট ৫ টাকা
রাম ও শ্যাম দুজনে একই রকম শার্ট কিনলেন
এইটা
এইটা
এই নিন, মশায়— একটি ক'রে!
তিন মাস পরে — ময়দানে
ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে গেছে— বাবাকে ডাকি।
রাম ও শ্যামের আবার দেখা হ'লো
আপনার শার্ট এখনও নতুন আছে। আমারটাত প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।
দুই গৃহিণী
এর রহস্য কি?
খুব সোজা। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেই সব ময়লা বের ক'রে দেয়। আছড়ালে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে যায় — আর তা বেশীদিন টেঁকে না।
এ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ!
এ কথা সত্যি! সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেও কাপড়কে সাদা ও ঝকঝকে করে দে'য়। সবই বেশীদিন টেঁকে, আর তাতে পয়সাও বাঁচে!!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়-চোপড়কে আরও টেঁকসই করে
S. 227-X52 BG
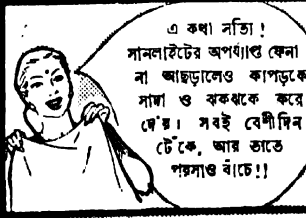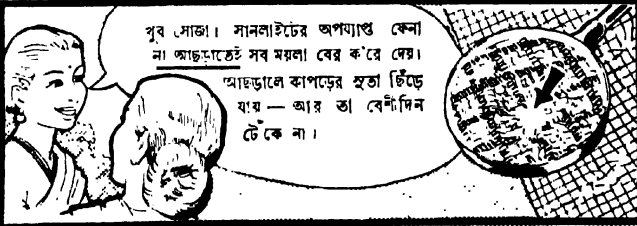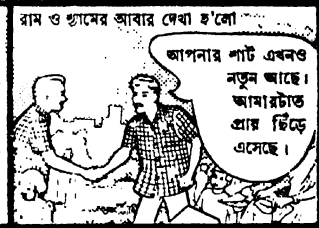
শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ সম্মানিত—

খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদকরূপে কাজ করিতেছেন। গত ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইলে তিনি জানান—বিদেশ হইতে আগত বিজ্ঞাপনের উপর সরকারী বিধি-নিষেধ হইতে ও নিয়ন্ত্রণের ফলে সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্দিনের মধ্যে পড়িয়াছে। আগে সংবাদপত্রগুলি ঐ ধরণের বিজ্ঞাপন হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ পাইত, আজ তাহা শতকরা ১০ ভাগে নামিয়া গিয়াছে। কয়েকটি শিল্প সরকার কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যাও কমিয়াছে। শ্রীযুত ঘোষ সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী—সংবাদপত্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান আছে। তাঁহার নির্বাচনে সেজন্য সংবাদপত্রের নানাবিধ অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান—

পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি কেন্দ্রে পরিণত করিয়া যে অখণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে, স্থির হইয়াছে যে ডাক্তার খান সাহেব তাহার প্রথম প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। মে মাসের শেষে উক্ত নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। মিঃ এস-এ-গুরমানি নূতন রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর হইবেন। ডাক্তার খান সাহেব বহু বৎসর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন। তাঁহার নিয়োগে ভারতবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন। ডাঃ খান সাহেব মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য এবং গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসবান।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলি লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে—পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, করাচী বাহাওয়ালপুর, খয়েরপুর, বাহাওয়ালপুর রাজ্য সংঘ ও উপজাতি এলাকা। তাহাতে ১১টি বিভাগ ও ৫০টি জেলা থাকিবে। ১১টি বিভাগের নাম—পেশোয়ার, ডেরাইসমাইল খাঁ, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, মুলতান, বাহাওয়ালপুর, খয়েরপুর, হায়দারাবাদ, কোয়েটা, কালাত ও করাচী। লাহোরে নূতন রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইবে।

বান্দুং সম্মেলনের প্রধান সমস্যা—

আগামী ১৮ই এপ্রিল হইতে বান্দুংয়ে যে এসিয়া-আফ্রিকা সম্মিলন আরম্ভ হইবে তাহাতে আলোচ্য প্রধান সমস্যা হইবে ইন্দোচীন প্রসঙ্গ। সকলের বিশ্বাস, ইন্দোচীন সমস্যার জটিলতার গ্রন্থি-মোচনে সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইবে এবং জেনেভাযুদ্ধ বিরতি চুক্তির কার্য্যকরী করার পথ প্রশস্ত হইবে। নিম্নলিখিত ঘটনা ইহার কারণ—(১) যুদ্ধাশঙ্কার দিক হইতে বিচার করিলে ইন্দোচীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিক বিপজ্জনক এলাকা—বেসরকারীভাবে এসিয়া-আফ্রিকা সম্মিলন এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করিবেন (২) ইন্দোচীনের সমস্যা মুখ্যতঃ ঔপনিবেশিক শাসন সম্ভূত—বানদুং সম্মিলনে ঔপনিবেশিক শাসন প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। (৩) ইন্দোচীনের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করিবে। ইন্দোচীনের ৪টি রাজ্য ও একত্র হইয়া এই সম্মিলনের মারফত তাহাদের বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিবে। বানদুং সম্মিলন নানা দিক দিয়া এসিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা দ্বারা সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবে।

পূর্ববঙ্গ দিয়া মাল চলাচল—

পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া উত্তর বঙ্গ ও আসাম হইতে ট্রেণে ভারতের অন্যত্র মাল চলাচল ব্যবস্থার কথা গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার কলিকাতায় ভারত ও পাকিস্তানের রেল ও শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এক সম্মিলনে আলোচনা করিয়াছেন এবং সকলে একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে আগামী ১লা মে হইতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ট্রেণে মাল চলাচল সুরু হইবে। শুধু সান্তাহার দিয়া নহে, হলদিবাড়ী দিয়াও মাল চলাচলের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে বহুস্থানের বাণিজ্যের অবস্থা উন্নতি লাভ করিবে।

অন্ধ্র রাজ্যে নূতন মন্ত্রিসভা—

১৯৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর অন্ধ্র রাজ্যে মন্ত্রিসভার পতন হইলে অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। নূতন নির্বাচনের পর কংগ্রেস দল প্রবল হইয়া গত ২৮শে মার্চ শ্রীযুত বি-গোপাল রেড্ডীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। শ্রীবি-গোপাল রেড্ডী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং (১) এন-সঞ্জীব রেড্ডী, (২) কে-চন্দ্র মৌলি (৩) কালা বেঙ্কট রাও (৪) জি-লচ্ছন্না (৫) ভি-সঞ্জীবায়া (৬) এ-বি-নাগেশ্বর রাও এবং (৭) এন-ভি-রাম রাও মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তরাংশ লইয়া যে নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে, তাহাতে এবার স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। আমরা আশা করি, কংগ্রেস-দলের মন্ত্রীরা রাজ্যের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন।

আন্দামানে উদ্বাস্তু প্রেরণ—

গত ১লা এপ্রিল ৯৯টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে মোট ৩৫০টি পরিবার তথায়

পাঠান হইবে। ১৯৪৯ সাল হইতে মোট ৯৬৪টি উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানে গিয়াছে ও তথায় বাস করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারকে কৃষি কার্য্যের যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র এবং গৃহ-নির্মাণ, ৬ মাসের খোরাকী, গো মহিষ ক্রয় প্রভৃতির জন্য ২ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে বহু উদ্বাস্তুকে বাংলার বাহিরে না পাঠাইলে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ—

২রা এপ্রিল লোক সভায় বৈদেশিক ব্যাপারের সহকারী মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৯টি দেশ সুস্পষ্টভাবে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাদের নাম—ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, ভারত, ইন্দোনেসিয়া, লাওস, প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম, যুগোশ্লাভিয়া, ও নেপাল। আশা করা যায়, পরে আরও বহু দেশ এই নীতি গ্রহণ করিয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন।

হাওড়ায় কংগ্রেস সাফল্য—

সম্প্রতি হাওড়া জেলাবোর্ডের সদস্য নির্বাচনে ১৯টি আসনে সবত্রই কংগ্রেসপ্রার্থীরা জয়লাভ করিয়াছেন। হাওড়ায় কংগ্রেস কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহা এই সাফল্য হইতেই বুঝা যায়। ১৩টি আসনে কংগ্রেস সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বামপন্থীদের পরাজিত করিয়াছে—বাকী ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতে কংগ্রেস বিরোধীপক্ষের সমবেত প্রার্থীদের ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে। বাকী ১টি আসনে বিভিন্নদলের প্রার্থীদের অপেক্ষা কংগ্রেস অধিক ভোট পাইয়াছে। ৭টি কেন্দ্রে বামপন্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। মোট ভোটার সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩হাজার—মোট ৭৫ হাজার ভোট প্রদত্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে ৫০ হাজার কংগ্রেস পাইয়াছে। কংগ্রেস যে ভাবে কাজ করিতেছে, তাহাতে সর্বত্র তাহার এইরূপ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি দিল্লীতে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করিয়া আসিয়াছেন। ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া ডাক্তার রায়কে নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের বস্তু কলিকাতা-যাদুঘরটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার যে কথা হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে—এখন স্থির হইয়াছে যে যাদুঘর কলিকাতাতেই থাকিবে। অন্যান্য বহু বিষয়ে ডাক্তার রায় দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিগত প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি বিধানে সর্বদা সাহায্য করিয়া থাকে।

বনমহোৎসবের পুরস্কার—

১৯৫৩ সালে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বনমহোৎসব (বৃক্ষ রোপণ) সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের ভারত সরকার হইতে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার লাক্ষ্যা-প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া "নিখিল ভারত সর্দার পেটেল শীল্ড" পাইয়াছে। তাহা ৬৫৮১৬০ গাছ পুতিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪৪৭২২০টি গাছ জীবিত আছে। ব্যক্তিগতভাবে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানার চিনগুয়ারগবিয়া গ্রামের শ্রীবিজয়ভূষণ বেরা প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন—তিনি ৫৪০৫৬টি বৃক্ষ রোপণ করেন, তন্মধ্যে ৪৩৩১৪টি জীবিত আছে। মিউনিসিপালিটী হিসাবে দার্জিলিং মিউনিসিপালিটী প্রথম পুরস্কার ৪শত টাকা পাইয়াছে—তথায় ৬২৫৬ গাছ পোতা হয় ও ৩৯৭০টি বাঁচিয়া আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে—১০২০টি গাছ পুতিয়া ৭৬১টিকে বাঁচাইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার ৪নং কামারদা ইউনিয়ন প্রথম পুরস্কার ৫শত টাকা পাইয়াছে—তথায় ২৭০১৮৭ গাছ বসাইয়া ২১১৪৬৭ গাছ বাঁচানো হইয়াছে। জলপাইগুড়ি ও নদীয়া জেলার ২টি ইউনিয়ন বোর্ড ও এই কার্য্যে পুরস্কার পাইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ভাবতা মাদ্রাসা, হুগলীর বেলমুড়ি ইউ-পি-স্কুল, হাওড়ার পাঞ্জাবের পল্লী-সেবক সংঘ, ২৪পরগণার গোসাবার হ্যামিলটন স্কুল, বাঁকুড়ার কাকরদাড়া হাই স্কুল, কুচবিহারের বড়মরিচা হাই স্কুল, বর্দ্ধমান গলসী সেওবাই হাই স্কুল প্রভৃতিও বনমহোৎসবের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে ১০০ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে। দেশে আজ বৃক্ষের দারুণ অভাব। এইভাবে পুরস্কার দিয়া মানুষকে বৃক্ষরোপণ কার্য্যে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন ধান, গম, পাট প্রভৃতি ফসল অধিক উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়, তেমনই বৃক্ষ রোপণ ব্যাপারেও যে তাহা করা হইতেছে, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, এই কার্য্যের ফলে ক্রমে দেশে বৃক্ষের সংখ্যা বাড়িবে ও দেশ উন্নত হইবে।

পরলোকে সতীন্দ্রনাথ সেন—

খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা, বরিশাল পটুয়াখালির অধিবাসী সতীন্দ্রনাথ সেন গত ২৫শে মার্চ শুক্রবার রাত্রে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আটক অবস্থায় মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে গভর্ণরের শাসন প্রবর্তনের সঙ্গেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বরিশাল জেলে আটক রাখা হয়। পরে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যায়। ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯১২ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলিকাতা রিপন কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় তিনি কৃষ্ণনগর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ধৃত হন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সারা জীবনই তাঁহাকে প্রায় জেলে আটক থাকিতে হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি বরিশালের অন্যতম.প্রধান নেতা বলিয়া পরিচিত হন। একবার তিনি ৭৩ দিন বরিশাল জেলে অনশনে ছিলেন ও শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে আহার গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের সহিত একত্র থাকার জন্য পূর্ববঙ্গে বাস করাই পছন্দ করেন। তিনি অবিভক্ত বাঙ্গালার ও পূর্ববঙ্গ

বিধানসভার সদস্য ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি নানা রোগে ভুগিতেছিলেন বটে, কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, ইহা কাহারও মনে হয় নাই। তিনি বিবাহ করেন নাই—তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ আছেন। এরূপ সাহসী, বীর, নির্ভীক, ত্যাগী, কর্মদক্ষ নেতা বাংলা দেশে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। অহিংসা সংগ্রামের দ্বারা যে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছিল, তিনি তাহা ভোগ করেন নাই। সারা জীবন নিপীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজিকার দিনে তাঁহার মত বলিষ্ঠ আদর্শবাদী মানুষের আদর্শ দেশবাসী যেন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে, ও সেই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে।

মালদহে মহিলা সম্মিলন—

মালদহে প্রাদেশিক সম্মিলন-মণ্ডপে ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নে যে মহিলা সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে যত অধিক মহিলা-সমাগম হইয়াছিল, সেরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রায় ১০ হাজার মহিলা তথায় সমবেত হন ও পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় সভানেত্রীত্ব করেন। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীধেবর ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঐ সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। তাঁহারা প্রধানতঃ পণপ্রথা ও তাহার ফলাফল, বয়স্ক শিক্ষা ও মহিলাদের সামাজিক উন্নতি বিধায়ক বিষয়গুলি লইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীধেবর জাতীয় স্বার্থে সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য সমবেত মহিলা সমাজকে আহ্বান জানান। শ্রীশাস্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সংযোগ সাধনকারী ফেজুরিয়া-মালদহ সংযোগ পরিকল্পনা রূপায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী এম-পি, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত এম-এল-সি, শ্রীমতী আভা মাইতি এম-এল-এ, শ্রীমতী শান্তি দাস এম-এল-সি প্রভৃতি মহিলা-নেতৃবৃন্দ মহিলা সমাজের উন্নতিবিধানের জন্য বহুবিধ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ছাত্রসমাজের প্রতি কংগ্রেস-সভাপতি—

গত ৩রা এপ্রিল মালদহে প্রাদেশিক সম্মিলনের সহিত অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মিলনে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীইউ এন ধেবর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—চলচ্চিত্র সম্বন্ধে পরীক্ষা গৃহীত হইলে আধুনিক ছাত্রগণ নিঃসন্দেহে প্রথম বিভাগের নম্বর পাইবে। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও একাগ্রতার অভাব অত্যন্ত অধিক—অথচ চিত্রতারকা যে ভাবে হাঁটে, কাপড় পরে বা কথা বলে—ছাত্ররা সেই ভাবেই নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চায়। চিত্রজগৎ সম্পর্কিত পুস্তকই তাহাদের সর্বাধিক প্রিয় এবং পিতার আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহারা মাসে অন্তত একবার চিত্রপ্রদর্শনীতে যাইবে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা সত্বেও বিপুল সংখ্যক ছাত্র এই শ্রেণীতেই পড়ে। শক্তিক্ষয় না করিয়া পাঠে মনোনিয়োগ করার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের সম্পর্কে এই উপদেশ বেশী করিয়া প্রযোজ্য, কারণ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের শিক্ষার মান দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছে।

পরলোকে আর-এস ত্রিবেদী—

বাঙ্গালার অন্যতম আই-সি-এস আর-এস ত্রিবেদী গত ৫ই এপ্রিল রাত্রিতে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা লী রোডস্থ বাসগৃহে দুঃখজনক ভাবে পরলোক গমন করেন। তিনি বর্তমানে কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন অফিসে জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। রাত্রি ১১টার পর নিজ শয্যায় শয়ন করিলে পরদিন ভোরে ঘরের মেজেতে তাঁহার মৃতদেহ দেখা যায়। ২ বৎসর পুর্বে তাঁহার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন—তাহার ১ পুত্র ও ৩ অবিবাহিতা কন্যা বর্তমান। তিনি গুজরাটবাসী হইলেও গত ২৫ বৎসরকাল দক্ষতার সহিত বাংলায় কাজ করিয়াছেন কর্মদক্ষতার জন্য তিনি সর্বত্র প্রিয় ছিলেন।

মুর্শিদাবাদে পরবর্তী অধিবেশন—

মালদহে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে আগামী বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। গত বৎসর ২৪পরগণা-বারাসতে সম্মিলন হইয়াছিল।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের পদত্যাগ—

৮০ বৎসরের বৃদ্ধ বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী সার উইনষ্টন চার্চিল গত ৫ই এপ্রিল বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রাজনীতিক জীবনযাপন করার পর চার্চিল বার্দ্ধক্যের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডের বহু দুর্দিনে বহুবার তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি, তাঁহার কর্মশক্তি চিরদিনই তাঁহাকে জীবনে জয়যুক্ত করিয়াছে।

৬ই এপ্রিল লণ্ডনে সার এন্টনী ইডেন বৃটেনের নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৭ বৎসর হইলেও দীর্ঘকাল রাজনৈতিক জীবনে তিনি কাজ করিতেছেন। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদের যোগ্যতা দান করিয়াছে। বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

কলিকাতায় কংগ্রেস-সভাপতি—

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ধেবর গত ১লা এপ্রিল কলিকাতায় আগমন করিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হইয়াছে। সম্বর্ধনা উত্তরে শ্রীধেবর বলেন—ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশকে উন্নত করিবার জন্য যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, সারা পৃথিবীর লোক তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে। দেশবাসী সেবার মনোভাব লইয়া নিজ দেশের পুনর্গঠনে আজ নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীজহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে জাতিগঠন কার্য চলিতেছে, তাহাতে যোগদান করা ও সাহায্য করা প্রত্যেক দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। আনন্দের কথা কলিকাতা পৌরসভার সদস্যগণ এই কাজে পশ্চাদপদ নাই। কলিকাতা সহরকে সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত করার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, কংগ্রেস সভাপতি তাহার পূর্ণ সাফল্য কামনা করেন। তিনি বর্তমানে দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যিনি যেখানে কোন ভাল কাজ করিতেছেন, শ্রীধেবর তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতে সদা উন্মুখ। বহুদিন পরে কলিকাতায় এই কংগ্রেস-সভাপতি সম্বর্ধনা কলিকাতার নাগরিক জীবনে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার করে।

ঐতিহাসিক ঘটনা—

১৫৬৮ সালে চিতোর দুর্গ মোগলগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলে লোহার সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করেন, স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিবেন না। স্বাধীনতা লাভের পর গত ৬ই এপ্রিল লোহার সম্প্রদায়ের বর্তমান অধিবাসীরা শ্রীজহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় ঐতিহাসিক চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। গিরি দুর্গের পাদমূলে প্রবাহিতা গাম্ভারা নদীর উপরিস্থ সেতুর প্রবেশ মুখে শ্রীনেহরু লোহারদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য স্বাগত সম্ভাষণ জানান। ৩ সহস্র নরনারী শোভাযাত্রা করিয়া দুর্গে প্রবেশ করেন। চিতোরগড়ে রাণা কুম্ভ কর্তৃক নির্মিত বিজয়স্তম্ভ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী মাত্রই ঐ স্তম্ভের চিত্রের সহিত পরিচিত। এই শুভ প্রবেশ একদল ভারতবাসীর মনে নূতন শক্তি দান করিবে। সারা ভারতের লোক মহারাণা প্রতাপ সিংহের বীরত্বকাহিনী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে, সে বীরত্বকাহিনী আজ নূতন করিয়া বুঝিবার দিন আসিল। জনগণের মনে এই ঘটনা যেন বীরত্বের সঞ্চার করে।

পরিচালক—উপানন্দ

কিশোর জীবনের পথ নির্দ্দেশ

আশাবাদী না হোলে ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ স্ফূরণ হয় না। আশা যার নেই, উৎসাহ তার নেই, সন্তোষ যেমন সুখপ্রদ, অসন্তোষ তেমনই দুঃখকর। সৎপথে থেকে সৎসঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করা দরকার, আর মনের বিশ্বাস মত কাজ করে সরলতার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। কর্কশভাষী ও রূঢ়বাদী হয়ে অপরের মনে কষ্ট দিয়ে আত্মঘাতী হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। মিতাচার ও মিতাহারের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, ফলে সুন্দর ভাবে চরিত্র গঠিত হোতে পারে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীনতা ও সময়ের সদ্ব্যবহারে বিমুখতা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করে। বিলাসপরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বিনাশের পথ রচনা করে দেয়। অবস্থার উন্নতি করতে হোলে দীর্ঘসূত্রী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের আশায় কালাতিপাত করাও জীবনগঠনের পক্ষে অনিষ্টপ্রদ। আলস্য নানাদোষের আকর। বাল্যে যে অভ্যাস বদ্ধমূল হয়, তা উত্তরকালে কোনক্রমেই ত্যাগ করা যায় না। স্মরণ রাখা উচিত, মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য কর্ম্ম। কর্ম্ম সময়-সাপেক্ষ, এজন্যে কর্ম্মসাধনে তোমরা যত অধিক সময় নিয়োজিত করতে পারবে, তত অধিক জীবনের ক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। তোমাদের কর্ম্ম হচ্ছে বিদ্যার্জ্জন, এর প্রধান সহায় অধ্যয়ন। অধ্যয়ন বিষয়েও সতর্ক হওয়া উচিত। যাতে সুশিক্ষা ও সৎজ্ঞান লাভ হয় সেই দিকেই যেন তোমাদের চরম লক্ষ্য হয়। ইচ্ছাশক্তিকে বিগ্রহের মত বুকে ধরে প্রত্যহ তোমরা কি ভাবে চলবে, তা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলা, ক্রমাগত অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা আর বাইরের লোকের ওপর একান্ত নির্ভর রাখা আদৌ উচিত নয়, তা'তে মন বিগড়ে যায়, ফলে ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্তাধীন করা যায় না, অপরের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা স্মরণ করে নিজের মনটাকে নির্ম্মম হোতে দেওয়া মানেই নিজের সর্ব্বনাশ টেনে আনা, এ স্বভাব যেন তোমাদের কখন না হয়। জেনে রেখো, মনের মত কিছু যে হয় না, তার প্রধান দোষ মনেরই উপকরণে নয়। যে অক্ষম, সে মনে করে, সুযোগ পায় না বলেই সে অক্ষম, যার ইচ্ছার জোর আছে, সে অল্প একটু সূত্র পেলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলে। ইচ্ছাশক্তি যার দুর্ব্বল, সঙ্কল্প যার অপরিস্ফুট, কর্ত্তব্যপরায়ণতা জ্ঞান যার নেই, তারই দুর্দ্দশা—সংসারে সেই পদে পদে সঙ্কটাপন্ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনসঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়ে চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সঙ্কোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই তাহারা সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।'

তোমরা যদি স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে চাও, নিজেদের ক্ষমতা হারাতে না চাও, তাহোলে ছাত্রজীবন থেকে এমন ভাবে তোমাদের প্রস্তুত হোতে হবে যাতে শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পবাণিজ্যে কৃষিতে, দৈহিক শ্রম ও সামর্থ্যে, চরিত্রে ও স্বদেশ হিতৈষণায় জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারো। সংসারে ঠিক মত চলাতেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায়, সেজন্যে ছেলেবেলা থেকেই চলবার ভঙ্গী আর গতি ও প্রকৃতি যেন উত্তম হয়। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যায়, তোমরাও যেন তেম্নি করে তন্ময় হয়ে বিদ্যাভ্যাসে রত হও। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ও মহৎ কর্ম্মে ভগবান সহায়। ইচ্ছা থাকলে শক্তিও তিনি দিয়ে থাকেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে যদি মানুষ চেষ্টা করে, তাহোলে দুর্গতি যতই হোক্ না কেন, দুঃখ বেদনা যতই আসুক না কেন, রাত পোহালে যেমন প্রাকৃতিক অবস্থা সুন্দর হয়ে ওঠে প্রভাতের আলো পেয়ে, ঠিক তেমনই ভাবে সে সুন্দর হয়ে ওঠে সুখের আলো লাভ করে। বাল্যকালের নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে আর প্রকৃতির তারতম্যে এক একটি মানুষ এক একটী পথের উপযুক্ত হয়। সে হয়তো বিজ্ঞানের সাধনার পথে গেলে আপনাকে সার্থক করে নিতে পারে, অন্য পথে (যেমন, সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে) জোর করে তাকে চালাতে গেলে

সে ব্যর্থ হয়ে যায়। ভগবান বিচিত্র মানুষকে বিচিত্র পথের জন্যে সৃষ্টি করে থাকেন, সেই বিচিত্রতাকে লুপ্ত করে সকলকে এক পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফল শুভ হয় না। এজন্য পথ নির্ব্বাচনে তোমরা যেমন সতর্ক হবে, তোমাদের অভিভাবকদেরও তেমনই তোমাদের রুচি, চালচলন, হাবভাব, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করে তোমাদের চলার পথের নির্ব্বাচনে নির্দ্দেশ দেওয়া ও সহায়তা করা উচিত। দিন রাত্রের মধ্যে ঘুমোতে যাবার সময়ে আর ঘুম থেকে ওঠার সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে, তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করবে, আর প্রার্থনা করবে যাতে তাঁর দয়ায় তোমরা মানুষের মত মানুষ হোতে পারো। ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপ—সত্য, শিব ও সুন্দর। এই তিন স্বরূপ মানবাত্মার তিনটী বৃত্তি দ্বারা জানা যায়—জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেম। জ্ঞান সত্যস্বরূপকে জানে, প্রেম তাঁকে সুন্দর করে প্রকাশ করে, আর ইচ্ছা মঙ্গল ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রত্যহ ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করবে। যেখানে নিজের গুণ প্রকাশ হোলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দোষও প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা, সে রকম সঙ্কট স্থল যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করবে—নিজের আত্মসম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলবে, তা'তে ফল ভালো হবে। গুণীর প্রশংসা করবে, তার মর্য্যাদা রক্ষা করবে, কিন্তু অকারণ তাঁকে তোষামোদ করবে না। তোষামোদের দ্বারা নিজের মানসিক শক্তির অপচয় হয় ও মানসিক অধঃপতন ঘটে। অকলঙ্ক চরিত্র নিয়ে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হোলে, ছেলেবেলা থেকেই এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। তোমরা যতক্ষণ মানুষ থেকেই খুশী, ততক্ষণ অজেয়, যতক্ষণ তোমরা মানুষের চেয়ে নিজেদের বড় মনে করে আসবে, তখনই হয়ে যাবে একেবারে অপটু—তুচ্ছ। বন্ধু নির্ব্বাচনেও বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যে বন্ধু অগোচরে অনিষ্ট করে, আর সুমুখে কথায় খুব আত্মীয়তা জানায়, ওরকম বন্ধুকে পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত ত্যাগ করবে। বিষকুম্ভের ওপর যে দুধ ভাসে, তা পান করলে যেমন প্রাণ বিনাশ ঘটতে পারে, সেই ভাবে ঐরূপ বন্ধুর কথায় কোন কাজ করলেও, অনুরূপ প্রাণনাশক বিপদ ঘটতে পারে। শৈশব, বাল্য ও যৌবনে বন্ধু নির্ব্বাচনে সতর্কতার আবশ্যক, অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় পাঠ্যপুস্তক ভালো করে না পড়াতে। বিষয়বস্তু না বুঝে মুখস্থ করার ফল ভালো হয় না। মুখস্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। ব্যাকরণের ভুল, বানানের ভুল, আর ভাষা শুদ্ধি সম্বন্ধে উদাসীনতার জন্য মারাত্মক ক্ষতি হয়। প্রশ্নপত্র মনোযোগের সঙ্গে না পড়ে, আর প্রশ্নকর্ত্তা কি চান বুঝে সেই মত উত্তর স্থির না করে লিখলে অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ইংরাজীতে বলে—'Writing makes a man perfect' প্রশ্নের উত্তর ভালো করে মুখস্থ বা তৈয়ারী করলেই চলবে না—তা লিখবার অভ্যাস করতে হবে, লেখার ভেতর দিয়ে মানুষের পূর্ণতা ও সাফল্য আসে। অনুবাদে হাতে দেবার আগে অন্ততঃ তিনবার ধীরে ধীরে পড়ে অর্থ বুঝে নিতে হবে। ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করবার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে মূলের ভেতর যে ভাবটী প্রকাশ করা হয়েছে, সে ভাবটী যেন শুদ্ধ সরল ভাষায় রূপ নেয়। বাংলা লেখার সময়ে সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার সংমিশ্রণ করে খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করো না। এটী অত্যন্ত নিন্দনীয়—যেমন, তাহার মুখের দিকে চেয়ে রহিলাম। পরীক্ষার সমস্ত সময়টুকুর শেষ পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে পরীক্ষা দেবে, আর কৃতকার্য্য হবো, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে। তা হোলেই সাফল্য সুনিশ্চিত। আর একথাও সত্য, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হোলেই যে জীবনে সাফল্য এলো, তা নয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী সোপানে উঠে ও স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হবার পরেও চর্চ্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের জ্ঞানার্জ্জন বিশেষভাবে আবশ্যক এই কথাটি মনে রাখবে। জ্ঞানী হোতে গেলে শুধু বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাপই সবটুকু নয়, এ ছাপগুলি চাকরি ক্ষেত্রে মূল্য দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থান করে নিতে গেলে আরও অনুশীলন, চর্চা ও অধ্যয়ন আবশ্যক। আশা করি তোমরা এদিকটা ভেবে দেখবে।

—

নব-বরষের ডাক

শিশির সেনগুপ্ত

নব-বরষের সুন্দর শুভ প্রভাতে
হেরিনু নবীন-তপন মোহিত আভাতে।
নব আশা আর সুখ সাধ নিয়ে বাহিরিনু মোরা আজ,
হাতে হাত মোরা মিলায়েছি সবে লয়ে মঙ্গল কাজ।
নব-বরষের প্রথম দিবসে করিব যাত্রা সুরু
তারি জয়গান মহা গম্ভীরে বাজে ওই গুরু-গুরু।
ঊর্দ্ধ আকাশে আলোর ইসারা কে যেন ডাকিছে মোরে,
বন্দী থাকিতে পারি নাই তাই বাহিরিনু আজ ভোরে।
নয়ন ফিরায়ে দেখিনু পিছনে কে যেন আঁধারে মেশে
ঘোমটায় ঢাকি আনন তাহার চলে গেল পথ শেষে—
ওই গেল চলে গত বছরের যে ছিল সতত সাথী
চলে গেল আজ আঁচলে ঢাকিয়া তাহার হাতের বাতি।
আর আসিবে না অস্ত গিয়াছে বিগত বছর মোর,
নবীন বছর তাই পাশে এসে হেসে বাঁধে প্রেমডোর।
তারি লাল আভা প্রভাত-আলোর হাসিতে ছড়ায়ে পড়ে,
নব-বরষের উদিত সূর্য্যে বরিয়া তুলিনু ঘরে।

—

বিলেতে দু বছর

(কিশোর রচনা)

জয়ন্ত আচার্য

[বড়দের লেখা বিলেতের কথা অনেকেই পড়েছেন ; কিন্তু বালকের লেখা বিলেতের বর্ণনা বিশেষ চোখে পড়ে না। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীমান্ জয়ন্ত ন' বছর বয়সে ইংলণ্ডে যায় এবং সেখানে দুবছর বাস করে দেশে ফিরে তার অভিজ্ঞতা লিখে 'কিশোর জগৎ'এর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছে।

কিশোর বালকের চোখে বিলেত দেশটা কি রকম লাগে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে এই লেখাটির মধ্যে। এই অল্প বয়সেই জয়ন্তের স্মরণশক্তি ও বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় থেকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাঃ সঃ]

জয়ন্ত আচার্য

এক

১৯৫২ সন, আমার বয়স ৯ বছর। অনেক দিন থেকেই শুনছিলাম মা-মণি হয়ত বিলাত যাবে এবং যদি যায় তাহলে আমিও যাব। তারপর একদিন সত্যিই যাওয়া ঠিক হল। একদিন আমি, মা-মণি, মাসী-মণি, দাদা ও জগন্নাথ-মামা বোম্বের ট্রেনে চড়লাম। হাওড়ায় অনেক লোক এসেছিল প্রায় সবারই মুখ গম্ভীর, কেউ কেউ কাঁদছে, মা-মণিতো খুব জোরে জোরে কাঁদতে থাকল। দাদা, মাসী-মণিরা এখনো অত গম্ভীর নয়। বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, কাজেই ওরা দিন পাঁচ ছয় আমাদের সংগে থাকবে।

যাই হোক ট্রেণে দু রাত থাকবার পর আমরা বোম্বেতে এসে পৌঁছোলাম। সেখান থেকে কিছুদূরে মালাড বলে এক জায়গায় মামার বন্ধু শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠলাম। তারপর দুদিন কাটানোর পর তৃতীয় দিন বোম্বে পোর্টে গেলাম। সেখানে অনেক হাংগামা, প্রথমে পাসপোর্ট, তারপর কাষ্টমস্, তারপর আরো কি কি সব, যাই হোক সব কামনা মিটিয়ে জাহাজে উঠলাম। ভিসিটরদের জন্য দুটো পাস পাওয়া গেল, কাজেই দাদা ও জগন্নাথ-মামা আমাদের সংগে জাহাজ দেখতে উঠল। মাসী-মণিকে নীচে থাকতে হয়েছিল। মা-মণি ও মাসী-মণি খুব কাঁদছিল, আমারো খুব কষ্ট হচ্ছিল।

আমাদের কেবিনটা ডেকের পাশে, তবে ডাইনিং হল এবং খেলার ঘর থেকে একটু দূরে। আমাদের জাহাজ খুব ছোটো ছিল, মাত্র ৭ হাজার টন, কিন্তু তার আগে অন্য কোনো জাহাজ দেখিনি বলে ঐটাই আমার কাছে খুব বড় মনে হচ্ছিল। আমাদের জাহাজের নাম জল-জহর। আমরা চারজন ঘুরে ঘুরে বেশ জাহাজ দেখছিলাম হঠাৎ শোনা গেল—অ্যাটেনসন প্লিজ, ভিসিটরস আর রিকুয়েস্টেড টু লিভয়ে দি শিপ ইমিডিয়েটলি, থ্যাংক ইউ। এই শুনে দাদা ও জগন্নাথ-মামা নেমে গেল। জাহাজ আস্তে আস্তে ছাড়ল।

দুই

মা-মণি ও আমি ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বোম্বে সহর ছোট হতে হ[illegible] ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আমরা কেবিনে ফিরে গেলাম। আমা[illegible] খুব খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে অনেক দিনের মধ্যে দাদা কি বাপ[illegible] কাউকে দেখতে পাব না। এমন সময় ষ্টুয়ার্ড এসে বলল ছোটদের খাও[illegible]

পিকাডেলী সার্কাস

সময় হয়ে গিয়েছে। আমি আর মা-মণি নীচে ডাইনিং হলে গেলাম, মা-মণি গেল কারণ খাবারের মেনু ইংরাজীতে, ঐ সব দেখে আমি কিছু বুঝতে পারব না। যাই হোক খেয়ে দেয়ে যখন উঠলাম তখন ১২টা বেজে গিয়েছে। তারপর বড়দের খাওয়ার সময়। মা-মণি আমাকে ডেকে রেখে চলে গেল খেতে। আমি ইতিমধ্যে একটি জিনিস আবিষ্কার করে ফেললাম সেটা হচ্ছে একটা ষ্টীয়ারিং। উপরের ডেকে কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় রয়েছে। সেটা ছুঁতে সাহস হচ্ছিল না, কারণ একভদ্রলোক কিছুদূরে বসেছিলেন। যদিও তিনি অন্যদিকে মুখ করে ছিলেন তবুও এদিক তাকাতে কতক্ষণ! যাইহোক কোনো রকমে সাহস করে কাঠের ছোট্ট বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে ষ্টীয়ারিংটা কয়েকবার ঘোরালাম, আশা করেছিলাম কিছু একটা হবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই হল না। আমি হতাশ হয়ে নীচের ডেকে ফিরে এলাম। ভেবেছিলাম সেখানে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে থাকবে কিন্তু কেউই ছিল না তখন—কেবিনে ফিরে এলাম।

তিন

এরকম করেই চার দিন কেটে গেল। পঞ্চম দিন সকালে জাহাজ এডেনে পৌছোল। মা-মণি একা নামতে সাহস করল না কাজেই সারাদিন জাহাজেই কাটাতে হোল। যাই হোক ক্রমে রেড সী, মেডিটেরানীয়ানসী, পার হয়ে বে অফ বিস্কেতে পড়লাম, শুনেছিলাম ১৪ হাজার থেকে কুড়ি হাজার টনের জাহাজই নাকি ভীষণ দোলে। কাজেই আমাদের ৭ হাজার টন 'জল জহর' এমন দুলতে লাগল যে জাহাজে জল উঠে গেল, প্রত্যেক কেবিনে জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার হোয়ে গেল, প্রত্যেকে বমি করতে শুরু করল। কেউ ডাইনিং হলে খেতে গেল না শুধু মা-মণি, আমিও দু তিন জন ভদ্রলোক ছাড়া।

তবে খেতে গিয়েও কম জ্বালা, নয় প্লেট এক হাত দিয়ে ধরে থাকতে হয় তা নইলে প্লেট পড়ে যাবে। কোনো ক্রমে খাওয়া শেষ করেই কেবিনে ফিরে এলাম শরীর একটু খারাপ লাগছিল। তবে অন্য সবার মতন ঘনঘন বমি মা-মণির হয়নি। আমার তো একবারও হয়নি। এরপর জাহাজের দিন গুলো কেটে গেল।

৩০শে অক্টোবর ভোর বেলা লিভারপুল পৌছোলাম। আমরা আরেক বাঙালী ভদ্রলোকের সংগে নেমেছিলাম। প্রথমে নেমে খুব অবাক লাগছিল এত পরিষ্কার রাস্তা ঘাট দেখে। ষ্টেশনে পৌছে একটা লোককে দেখিয়ে আমি মা-মণিকে জিজ্ঞাসা করলাম—মা-মণি ওকি মিলিটারীর লোক? মা-মণি হেসে বলল ধেৎ! ওতো পোর্টার অর্থাৎ কুলি। আমিতো দেখে শুনে অবাক, কুলির এমন রাজকীয় পোষাক! মা-মণিও অবিশ্যি কম অবাক হয়নি। যাই হোক আমরা তো লণ্ডনের ট্রেণে চড়ে বসলাম। ট্রেণ ছাড়ল। প্রথম দিকে সহর দেখা যাচ্ছিল, তারপর গ্রামের মধ্য দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলল। বিকালের দিকে লণ্ডনের ইউষ্টন ষ্টেশনে নামলাম। নেমেই ছোড়দাকে দেখতে পেলাম, তারপর ট্যাক্সি করে আমাদের বাড়ীর দিকে চললাম।

হাইড পার্কের পাশ দিয়ে যেতে লণ্ডন পুলিশ দেখতে পেলাম। ছফুট লম্বা কালো ওভারকোটে আপাদমস্তক ঢাকা ও মাথায় কালো টুপি।—বাড়ীতে পৌছোলাম। চার তলায় আমাদের ঘর, তিন তলায় খাওয়ার ঘর, রান্না ঘর ইত্যাদি। রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর আরো কয়েক জনের সংগে শেয়ার করতে হয়, তার মধ্যে এক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা থাকেন মিঃ ও মিসেস বোস। মিসেস বোস ৭ দিন হল কলকাতা থেকে এসেছেন, তবে মিঃ বোস এখানে ১৪ বছর আছেন। মা-মণির সংগে মিসেস বোসের খুব আলাপ হয়ে গেল; মা-মণি মিসেস বোসকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। আমি রাণীদি বলতাম, রাণীদি খুব আমুদে কিন্তু মিঃ বোস খুব গম্ভীর এবং কম কথা বলেন।

গ্রীক্ বীর অ্যাকিলিজ্ এর মূর্ত্তি

রাত্তিরে বিলাতে কেমন করে রান্না করা হয় দেখলাম। খুব সুন্দর গ্যাসের উনুন, ধরাতে দু এক সেকেণ্ডের বেশী লাগে না। কিন্তু একি? দেখলাম রাণীদি ভাত চড়াচ্ছেন, আমি ভাবতে পারিনি যে এখানে চাল পাওয়া যায়। কিন্তু পরে দেখলাম এখানে চাল তো পাওয়া যায়ই তার উপর চাল আমাদের দেশের চালের চাইতে অনেক ভাল। চাল দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওজন করিয়ে নিতে হয় না। প্যাকেটে থাকে, চালে একটাও কাঁকর নেই, ডালও সেই রকম। তাছাড়া প্রায় সব রকম মশলাই এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে চকোলেট রেশন যদিও

অনেক, লজেন্স কুপন ছাড়াও পাওয়া যায় তবুও ভাল ভাল চকোলেট র‍্যাশনাইজেশন। সেদিন রাত্রে ছোড়দা মাংস রান্না করেছিল, খেতে ভালই হয়েছিল।

চার

পরদিন সকালে ছোড়দার সংগে বাজারে বেরোলাম। এখানকার দোকানগুলো এত পরিষ্কার দেখে অবাক লাগল। ছোড়দা আমাকে দুটো চকোলেট কিনে দিল। তারপর ডিম, মাংস, বিস্কুট প্রভৃতি কিনে

নিউ এণ্ড স্কুলে

বাড়ী ফিরলাম। একরকম করেই ৫দিন কাটল তারপর আমরা বাড়ী বদলালাম, এবার যে বাড়ীতে গেলাম সেটা একটা গেষ্ট হাউস। মা-মণি ও আমি একটা ঘরে থাকলাম, ছোড়দা অন্য ঘরে। ও বাড়ীতে শনি ও রবিবারে ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ ও ডিনার দিত, অন্যান্য দিন শুধু ব্রেকফাষ্ট ও ডিনার। লাঞ্চ বাইরে খেতে হয়। বাড়ীটা নটিং হিল গেটের কাছে, রাস্তার নাম ব্রেনিম ক্রিসেন্ট, বাড়ীওয়ালী মিসেস ম্যাথারন খুব ভাল, আমাদের অনেক আদর যত্ন করতেন। লণ্ডনে শীতকালে খুব দেরী করে সকাল হয়, আর তিনটে চারটের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যায়। ওখানে ৭টায় ছিল ব্রেকফাষ্ট, ৭টা বাজতে ১৫ মিনিটের সময় মিঃ ম্যাথারন দরজায় জোরে নক করতে করতে চেঁচিয়ে উঠতেন—ব্রেকফাষ্ট প্লিজ। তখন খুব রাগ হত, ৮॥০টার পরেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করেনা লণ্ডনে। যাই হোক ঐ বাড়ীতে খাওয়া থাকার ইত্যাদি নানান অসুবিধাতেও বাড়ী ছাড়তে হল। এবার যে বাড়ীতে গেলাম সেটা হ্যাম্পষ্টেডে। মোট চার তলা বাড়ী, বেসমেন্ট নিয়ে অবশ্য ৫ তলা। আমরা থাকতাম্ বেসমেণ্টে। ঐ বাড়ীতে দুটো বাগান। বেসমেণ্টে শুধু আমাদের জন্য এবং সেটা খুব বড়। সেই বাগানটা আমাদেরই দিল। বাগানে একটা বড় ঢিবি মতন আছে, তার ওদিকে একটা গভীর খাদ সেই খাদে অনেক ঝোপঝাড়। ঐ বাড়ীতে একটা ঘরে কয়লার আগুন, আরেকটায় হীটার। সপ্তাহ

দুয়েক পর আমি স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলাম। দু তিনটে স্কুলে সীট দিল না, শেষে একটা স্কুলে গেলাম, সেটায় সীট দিল, স্কুলটার নাম নিউ এণ্ড স্কুল। স্কুল বিল্ডিংটা খুব ভাল ও নতুন। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস খুব ভাল, তার নাম মিস স্কীপার। একদিন স্কুলে গেলাম, বাঁশী বাজা মাত্র মা-মণি চলে গেল। ক্লাস ঘরে সবাই গিয়ে বোসলাম, ওখানে সব ছেলেদের আলাদা আলাদা ডেস্ক, স্কুল থেকেই বই পত্তর পেনসিল পেন দেয়, ওখানকার কোনো স্কুলে মাইনে নেই।

স্কুল ৯-২০ মিনিটে বসে, শীতকালে ৪টে ও গরমকালে ৪॥০ সময় ছুটী হয়। লাঞ্চ স্কুলেই দেয় তার জন্য ৯ পেনী দিতে হয়। ওখানে এক একটা ক্লাস এক একটা টীচারের। আমাদের টীচারের নাম ছিল মিসেস গেরল।

এবার কয়েকটি ছেলের কথা বলব। ক্রিষ্টোফার অক্সফোর্ড ও ডেভিড চেম্বার ক্লাসের সর্দার, আর জন হিংক্লি ও টনি হচ্ছে তাদের ধামাধরা। আমি কাউকেই পছন্দ করতাম না। আমি পছন্দ করতাম আরেকটি ছেলেকে—তার নাম জনাথন নিকলসন। সে আমার সংগে খুব ভাল ব্যবহার করত। আরেকটি ছেলে ছিল নিকোলাস, সে তোতলা, সে অনেক কিছু জানে। বোধহয় ক্লাসের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল, তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু সে কিছু বলতে গেলেই মিসেস গেরল তাকে বসিয়ে দিতেন; কারণ একটা সেণ্টেনস বলতেই তার লাগত ১ মিনিট। ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছিল পিটার। দশটা বাজতে কুড়ির সময় সবাই হলে গেলাম, আগে প্রেয়ার হল তারপর হেডমিস্ট্রেস অনেক কিছু বললেন—তার মধ্যে বেশীর উপদেশ—প্লে গ্রাউণ্ড নোংরা করবে না, খাবার ঘরে বসে চেঁচাবে না ইত্যাদি। ১০-২০তে ক্লাসে এলাম—তখন ছিল অংক ১১-১৫ পর্যন্ত—তারপর আধ পাইণ্ট দুধ খেয়ে খেলতে গেলাম; একটি ছেলে আমাকে বলল— Where have you come from? আমি বললাম I have come from Calcutta. ছেলেটা বলল Calcutta? O Black boy. বলে চলে গেল। ছেলেটাকে বেশ করে মার দেবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু ইতিমধ্যে হুইসল পড়ে গেল। তারপর গানের ক্লাস। আমাদের ক্লাস ছাড়া আরো দুটো ক্লাস ছিল। সবাই বেঞ্চে বসলাম। গানের টীচার সামনে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। সবাই এক সংগে গান আরম্ভ করল, গানের একটা কথাও আমি বুঝতে পারছিলাম না বলে চুপ করে ছিলাম। আধ ঘন্টা পর ক্লাসে গেলাম—তারপরেও আধ ঘণ্টা ক্লাসের পর খেলতে গেলাম। কয়েকটি ছেলে জিজ্ঞেস করল—কলিকাতা

খেলবে? বললাম হ্যাঁ। তারপর খেলা আরম্ভ হল দুই দলে। আমি ওদের তুলনায় কিছুই খেলতে পারি না! এর কিছু পরে লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল, সবাই যার যার ক্লাসের লাইনে দাঁড়াল। তারপর টীচার এসে যেতে বললেন এক এক লাইনকে।

লণ্ডনে এসে সেই প্রথম আমার কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া। খাবার দিল আলু সেদ্ধ, হ্যাম ও মাংসের ঝোল এবং তার সংগে পুডিং। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ খেলে আবার ক্লাশ। তখন ছিল ইতিহাস; টীচার পড়ে চললেন। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, তাই পেনসিল নিয়ে নাড়ানাড়ি করছিলাম। টীচার তা দেখতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন ষ্টপ ফিজিটিং! আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। টীচার আবার পড়তে শুরু করলেন। তারপর ৩টা বাজতে ১২ মিনিটের সময় খেলতে গেলাম। খেলা শেষ হল তিনটায়। তারপর ছিল নাটক। সবাই সবার সীটেই থাকল, প্রত্যেকে একটা করে বই পেল। টীচার বলে দিলেন, কার কি পার্ট নিতে হবে। অভিনয় হল ৪টে পর্যন্ত—তারপর চোখ বুঁজে প্রার্থনা করে একে একে ক্লোকরুম থেকে ওভার কোট নিয়ে টীচারকে গুড নাইট বলে বেরিয়ে এলাম।

গেটের কাছে মা-মণি, ছোড়দা ও রাণীদি ছিল, বাড়ী এসে পৌছোলাম। বেশ ঠাণ্ডা ও কুয়াশা হয়েছিল। চারজন আগুনের ধারে বসলাম। কিছু পরে রাণীদি চলে গেলেন।

পাঁচ

পরদিন সকালে দেখি ভীষণ কুয়াশা। সেদিন স্কুলে গেলাম না। এত কুয়াশা যে দু ফিট দূরের জিনিষ দেখা যায় না। ছোড়দা অবশ্য আফিস গিয়েছিল। মা-মণির কি একটা কেনার দরকার ছিল কিন্তু বেরিয়ে দেখলাম—এত কুয়াশায় দোকান চেনা অসম্ভব। আমার খুব ভাল লাগছিল কুয়াশা, তাই আমি বাগানে খেলছিলাম। দুপুরে খেয়ে এক ঘুম দিলাম।

বিকালে দেখি কুয়াশা ঠিক সেই রকম আছে। কিন্তু মা-মণিকে নানা কাজে বেরোতে হত, তাই পরদিন দুপুরে খেয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে গেলাম, কুয়াশা আগের দিনের মতন ছিল কিংবা একটু বেড়েছিল, যাই হোক কোনো রকমে তো গেলাম। ইণ্ডিয়া হাউসের বিল্ডিংটা খুব ভাল, বিরাট বাড়ী বেসমেণ্ট নিয়ে ন তলা, দেয়ালে চমৎকার সব ছবি আঁকা। ইণ্ডিয়া হাউস হোবর্ণ টিউব ষ্টেশনের কাছে। ঐ অফিসে বেশীর ভাগই ভারতীয়, তবে ইংরাজও অনেক আছে। তারপর সেখানকার কাজ সেরে আমরা টিউবে করে রাণীদির বাড়ী গেলাম।

রাণীদির বাড়ীতে শুধু একটা ঘর, এছাড়া রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। রাণীদি আমাদের চা খাওয়ালেন। মিঃ বোস তখন বাড়ী ছিলেন না, আফিসে ছিলেন। রাণীদি বললেন, তাঁর এখানে একা একা লাগছে, ভাল লাগছেনা ইত্যাদি।

বিকালে বাড়ী এলাম। কুয়াশায় বাড়ী আসতে খুব অসুবিধা হয়েছিল। ছোড়দা এসে গিয়েছিল। ছোড়দা বলল, কাল আমরা ব্রাইটন যাব ডক্টর স্যাক্‌স্টনের বাড়ী। ডক্টর স্যাক্‌স্টন হচ্ছেন বাপুজীর বন্ধু, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে। তখন আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। ব্রাইটন হচ্ছে লণ্ডনের ৫০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের ধারে। আমরা তিন দিন থেকে আসবো।

ছয়

পরদিন সকালে আমরা একটা সুটকেস হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম। কুয়াশা ছিল ঠিক সেই রকমই। বাসে চড়লাম ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য। বাস বোধহয় ২ মাইল স্পীডে যাচ্ছিল, কিংবা তারও
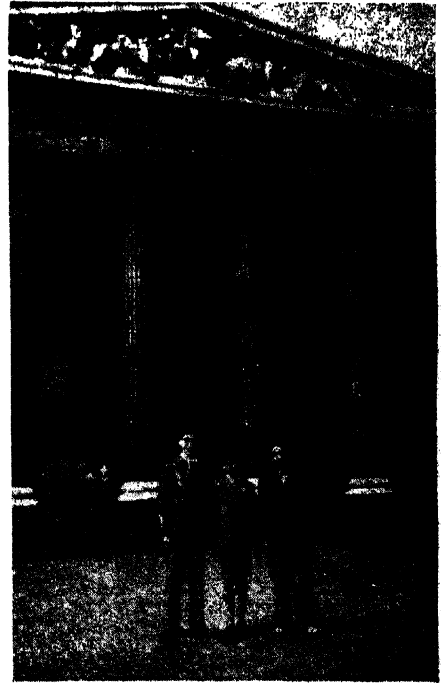
ব্রিটিশ মিউজিয়াম্

কম। বাস খালি হর্ণ বাজাতে বাজাতে চলল। অনেকক্ষণ পরে আমরা ষ্টেশনে পৌছোলাম এবং ট্রেণে চড়লাম। ট্রেণ ছাড়ল। তারপর কুয়াশার মধ্য দিয়ে ট্রেণ ছুটল। লণ্ডন ছেড়ে কয়েকটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলল। গ্রামগুলোয় কিন্তু একটুও কুয়াশা ছিল না, বেশ রোদ্দুর ছিল। চারিপাশের পাহাড় দেখতে দেখতে ব্রাইটনে পৌছোলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে স্যাক্সটনের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীর সামনে বড় একটা বাগান। গেটে লেখা রয়েছে, ডক্টর স্যাক্সটন। বাড়ীর কলিংবেল টিপলাম, স্যাক্সটন ছুটে এলেন। তারপর বসবার ঘরে বসালেন আমাদের। তখন মিসেস স্যাক্সটন এলেন। আমরা হাত

মুখ ধুয়ে এলাম। এরপর ওঁদের পাঁচ বছরের ছেলে ক্রীষ্টোফার এল। তার সংগে আমি পেছন দিককার বাগানে খেলতে লাগলাম। বাগানটা

ব্রাইটনের মিষ্টার ও মিসেস্ স্যাক্সটন

খুব বড়। সেখানে দোলনা, সি-স ইত্যাদি আছে। ক্রীষ্টোফার অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, আমার খুব মজা লাগছিল।

ওখানে দুটো ট্রাই-সাইকেল ছিল। তার একটায় আমি আর একটায় ক্রীষ্টোফার রেস দিতে লাগলাম। আধঘণ্টা পরে মিসেস স্যাক্সটন আমাদের খেতে ডাকলেন, সবাই খাবার টেবিলে বসলাম। খাবার টেবিলের উপর সব সাজান ছিল, যার যা দরকার সে তাই নিচ্ছিল। খাবার
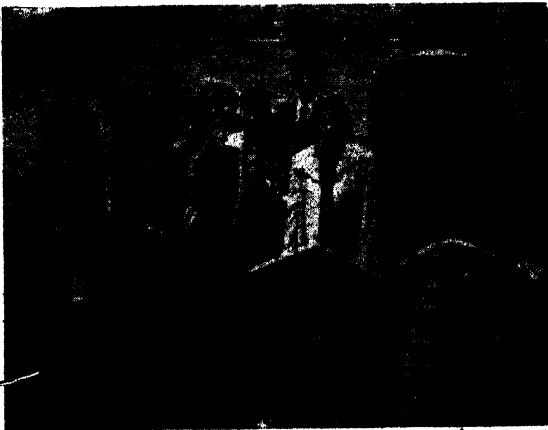
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমাধি

ছিল—আলু সেদ্ধ, হ্যামসেদ্ধ, স্যালাড ও শেষে জেলী ও পুডিং। খেয়ে দেয়ে আমি ও ক্রীষ্টোফার তার নার্সারী রুমে খেলতে গেলাম। সেখানে অনেক ধরণের খেলনা ছিল। একটা সুন্দর রকিং হর্স ছিল, ঘোড়াটার কাল রং, ব্রাউন রঙের লাগাম এবং নীল রঙের গদি আঁটা। আরেকটা খেলার মোটর ছিল। তার মধ্যে দুজন বসা যায়, প্যাডল করে চালাতে হয়। ভেতরে ষ্টীয়ারিং গীয়ার আছে, যদিও গীয়ার কোনো কাজে লাগে না। ভেতরে স্পীড মিটার আঁকা আছে—তার কাঁটা ঘোরানো যায়, হর্ণও আছে। মোটরটা লাল রঙের।

আমরা বিকালে সমুদ্রের ধারে গেলাম। সেখানে একটা জায়গা আছে তার নাম Palace of Fun. সেখানে অনেক মজার খেলা আছে। সেখান থেকে সন্ধ্যায় ফিরে চা খেয়ে ছোড়দা লণ্ডনে চলে গেল। তখন আমরা মনোপলি খেলতে লাগলাম। ক্রীষ্টোফার ৭টার পর ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও নটার পর ঘুমোতে গেলাম।

সাত

পরদিন সকালে উঠে দেখি অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। মুখ ধুয়ে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বাগানে খেলতে লাগলাম। বাগানে অনেক মুরগী আছে। তার পর দিন বিকালে ট্রেনে চড়লাম। স্যাক্সটন তার গাড়ী করে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

লণ্ডনে এসে বাসে করে বাড়ী এলাম। ছোড়দা বাড়ী ছিল। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, চা আর রুটি খেলাম। পরদিন এক চিঠি নিয়ে স্কুলে গেলাম—কেন এই কদিন অনুপস্থিত ছিলাম, তারপর স্কুল চলল অন্যান্য দিনের মত। সেদিন স্কুল ছুটীর পর আমি প্রথম একা দোকানে গিয়ে জিনিষ কিনলাম, জিনিষটা অবশ্য টফি। দোকানে গিয়ে ঢোক গিলে বললাম Have you got any sweet without coupon? লোকটা বলল yes, do you want toffi? আমি বললাম yes বলে তাকে পয়সা দিয়ে টফি নিয়ে গর্ব্বের সংগে বেরিয়ে এলাম। আজ আমি একা টফি কিনেছি। মা-মণিকে বাড়ী গিয়ে বললাম, কথাটা মা-মণি খুব খুসী হল শুনে। এরপর থেকে আমি প্রায়ই চকোলেট, বিস্কুট ইত্যাদি কিনতে যেতাম এবং মাঝে মাঝে চালডালও। ক্রমে আমাদের বড়দিনের ছুটী এল, ছুটী একমাসের উপর। ছুটীর দিনগুলো বাড়ীতে বসে কেটে যেত, মাঝে মাঝে ছোড়দার সংগে রাস্তায় বেরোতাম। ইতিমধ্যে একদিন সারা রাত ধরে স্নো পড়ল। সকালে আমার খুবমজা লাগতে লাগল। বাগানে ঝোপঝাড় সব ঢেকে গিয়েছিল। সমস্ত সাদা। আমি বসে তুষার দিয়ে একটা উঁচু পাহাড় তৈরী করলাম। তারপর খেতে গেলাম। খেয়ে আবার বাগানে গেলাম, দেখলাম পাশের বাড়ীর ছেলেরা একটা সুন্দর Snow man তৈরী করেছে। সেটা ৪ ফুটের কিছু উঁচু হবে। আমি ইতিমধ্যে মা-মণির বারণ সত্ত্বেও খানিকটা স্নো মুখে ভরে দিলাম। কোনই স্বাদ গন্ধ নেই। এর মধ্যে মা-মণি পাশের বাড়ীর ছেলের সংগে আমার ভাব করিয়ে দিল। ছেলেটা আমার চেয়ে

বছর দুয়েকের বড়, নাম ব্রায়ন। তাদের সংগে সেদিন আমি খেলতে পারিনি, কারণ মা-মণির সংগে আমাকে বেরোতে হয়েছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে খুব ভাল লাগছিল—সব সাদা। সেদিন আবার ইণ্ডিয়া হাউসে গেলাম। তারপর যখন বাড়ী ফিরছি, তখন আবার তুষার পড়তে আরম্ভ করল।

আট

ক্রমে বড়দিনের ছুটী ফুরিয়ে এল। আবার স্কুলে গেলাম। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করত না মোটেই। এরপর তিন চার মাস কেটে গেল। একদিন আমাদের বাড়ীওয়ালা বলল যে সে বাগানটা পরিষ্কার করবে ঝোপঝড় কেটে। তারপরদিন থেকে দুজন লোক বাগানের কাজে লেগে গেল। একবার স্কুলে আমার হেলথ এগজামিনেশন হল। ধরা পড়ল আমার চোখ খারাপ। ডাক্তার বললেন—চশমা নিতে হবে, আই ক্লিনিকে যাও—বলে তিনি একটা ঠিকানা দিলেন এবং ১৯:শে মে আমাকে ক্লিনিকে যেতে বললেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে গেলাম কিংসগেট ক্লিনিকে। আমার চোখ দেখে ডাক্তার বললেন—এই ওষুধটা নিয়ে গিয়ে চোখে লাগিও এবং দুই সপ্তাহ পরে আবার এস তখন চশমা দিয়ে দেব। সেদিন বাড়ী চলে এলাম। মা মণি ওষুধটা লাগিয়ে দিল। ঐ ওষুধটা সপ্তাহ দুয়েক লাগানোর পর ছোড়দার সংগে ক্লিনিকে গেলাম। তক্ষুণি তারা আমাকে চশমা দিয়ে দিল।

স্কুলে যখন গেলাম—ছেলেরা সবাই খুব ঠাট্টা করছিল চশমা দেখে। একজন বলল, তোমাকে ডোনাল্ড ডাকয়ের মতন লাগছে দেখতে। আমি তার কথায় কান না দিয়ে সোজা ক্লাসে চলে গেলাম। শুনলাম আজ আমাদের পরীক্ষা। অংক, ভূগোল, ইতিহাস পরীক্ষা হল সেদিন। তার পরের দিনও হল পরীক্ষা। টীচার বললেন এটা হল টেষ্ট। এতে যারা পাশ করবে তারা ফাইনালে উঠবে এবং যারা পারবে না তাদের আবার পনেরো দিন পরে টেষ্ট দিতে হবে এবং তাতেও যদি দেখা যায় কোনো ছেলে ফেল করল, তাহলে সেই ছেলের জন্য আলাদা এক ক্লাস আছে। তাকে বলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড IV-B। সেইটা আমাদের ক্লাসের চেয়ে একটু উচু, কিন্তু টপ ক্লাস অর্থাৎ ফাইনালে পাস করে আমরা যে ক্লাসে যাব তার চেয়ে Low Standard।

আগষ্ট মাসের শেষে টীচার বলে গেলেন কারা কারা পাশ করেছি। ৩৯ জন ছেলের মধ্যে একত্রিশ বত্রিশ জন পাস করেছিল, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে যারা পাস করেনি তাদের আবার পরীক্ষা হল। দুইজন ছাড়া আর সকলেই পাস করল। পিটার ফেল করল। কিছুদিন পর ফাইনাল পরীক্ষা হল, ভাল করেই পাস করলাম। যদিও টীচার বলেছিলেন you are very careless. এইবার এক মাস ছুটি।

(ক্রমশঃ)

দীপুসদাগরের ডিঙা

নরেন চক্রবর্ত্তী

বৃদ্ধ মহাদেব ভট্টাচাযিয় মেসের ভাঙা তক্তাপোষটার ওপর উবু হ'য়ে বসে তামাক টানছে আর ভাবছে তার দেশের কথা। আর মাস সাতেক পরে পেন্‌সন্ হয়ে যাবে তখন তাকে কলকাতার পাট্ উঠিয়ে দিয়ে দেশেই ফিরে যেতে হবে, তাই আজকাল দেশের কথাই তার অনবরত মনে জাগে। পূর্ব্ববঙ্গের সেই পল্লী তাকে যেন সদাই হাতছানি দিয়ে ডাকে—তার কাণে যেন আসে নব তৃণদলের ওপর ভেসে বেড়ানো বাতাসের খস্ খস্ আওয়াজ, তার চোখে ভাসে তাদের গাঁয়ের সেই রায়দীঘির জলে ছল্ ছলানি ঢেউ, মন তার উত্‌লা হয়ে ওঠে, কল্‌কাতায় আর যেন থাকতে চায় না। দেশে আছে তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে আর আছে তার সবচেয়ে স্নেহের নিধি দাদু—তার নবগোপাল। নবগোপাল নাম মহাদেবেরই দেওয়া। পৌত্র নবগোপাল যখন এক বছরের শিশু, হামা দিয়ে দাদুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তখন তার স্ত্রী বল্‌তো—হ্যাঁগা, সব সময় নাতি নিয়ে থাক্‌লেই হবে—ক'দিনের জন্য এসেছ, জায়গা জমি একটু ঘুরে ফিরে দেখনা—নাতি যেন আর কারো হয় না। মহাদেব হেসে বলেছিল—হয় গো হয়, নাতি সকলেরই হতে পারে, কিন্তু অমন গোপাল কজনের ঘরে আছে বল। গোপাল নব কলেবর নিয়ে আমাদের ঘরে এসেছে, দাদু যে আমার নবগোপাল। সেই থেকে নাম হয়ে গেল নবগোপাল।

মহাদেব ভাব্‌ছে সেই নবগোপাল এখন চার বছরে পড়লো। আর এক বছর বাদেই তার হাতে খড়ি দিতে হবে। আর তো মাত্র সাতমাস পরেই দেশে ফিরে যাচ্ছে, তখন নিজেই তার হাতে খড়ি দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করবে, আর শেখাবে জমির কাজ—কি করে বাড়ীর খালি জায়গাতে ঝিঙে উচ্ছে বেগুন কুমড়োর ফসল ফলাতে হয়। ছেলে তার কোন কাজের নয়, জমিদার বাড়ীর চাকরি নিয়েই সে সব সময় ব্যস্ত—জমিজমার ক্ষেত-খামারের দিকে মোটেই নজর দেয় না। গরু ছুটোরও তেমন যত্ন হয় না। সে ভারও সে নিজে নেবে—

আর সঙ্গে থাকবে দাদু। দাদুই তো হবে তার একমাত্র ভরসা।

ভাবতে ভাবতে মহাদেবের মন তার নবগোপালকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু তখনই মনে হয় আর ক'দিনই বা। মাত্র সাতটা মাস বৈ তো নয়—তবু মনটা খচ্ খচ্ করে—সা—ত—মা—স, নেহাৎ কম দিনও নয়। কিন্তু…

মনে মনে মহাদেব আবার মাস গুণ্‌তে আরম্ভ করে।

আর ছ'মাস বাকি। আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি, তার পরই মহাদেব মেসে নোটিশ দিয়ে দেশের দিকে রওনা হবে। কিন্তু পাঁচমাস কাটবার আগেই সারা দেশ জুড়ে লেগে গেল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। মহাদেব খবর পেল তার বাড়ী আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে ছাই হ'য়ে গেছে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—তার স্নেহের দাদু, নবগোপাল।

মহাদেবের মাথায় বজ্রপাত হলো। সে সারাদিন তার মেসের ঘরটা থেকে বাইরে গেল না, মেসের সকলে সান্ত্বনা দিতে এসে দেখে চোখ বুজিয়ে সে বিছানায় পড়ে আছে, তাদের ডাকে সাড়াও দিলে না। সন্ধ্যার সময় মহাদেব অফিসে একখানা দরখাস্ত লিখে ফেল্‌লে—এখনই তার পেনসন্ মঞ্জুর করা হ'ক। তারপর দরখাস্তটি পকেটে পুরে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক রাতে ঘরের মধ্যে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে মেসের লোকেরা এসে দেখলে মহাদেব পেরেক ঠুকে একটি মা কালির ছবি দেওয়ালে টাঙাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গান গাইছে—সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। নবনীবাবু কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাদেবদা, আবার পট টাঙিয়ে ঘরের মায়া বাড়াচ্ছ কেন? সবই যখন গেল—

মহাদেবের হাসি দেখা দিল—সে এক মর্ম্মভেদী হাসি।

মহাদেব জবাব দিল—সবই যখন গেল, তখন এই ঘরখানিই হ'লো আমার একমাত্র আশ্রয়। তিরিশটা বছর এই ঘরটির মধ্যে কাটিয়েছি—বাকি জীবনটাও এই ঘরেই কাটাতে হবে যে ভাই। ঘরের মধ্যে থাকবো আমি আর আমার এই পাষাণী মা। মা আমার নিষ্ঠুরা—মা আমার করুণাময়ী—মায়ের—

মহাদেব কথা শেষ করতে পারলে না—তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো—আবার তার মুখে গান শোনা গেল—

সকলি তোমারি ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তারপর আরো তিন চার বছর কেটে গেছে। মহাদেব এখনও মাঝে মাঝে মা কালির ছবিটির সামনে বসে গান গায়—সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—আর কখনো বা তক্তাপোষটায় উবু হয়ে বসে তামাক টানে। কিন্তু বেলা পড়ে এলে ঘর তাকে আর আটকে রাখ্‌তে পারে না, সে কোন দিন গিয়ে বসে হাজ্‌রা পার্কটার মধ্যে, কোন দিন বা লেকের ধারে একটা বেঞ্চে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, তারা হাস্‌ছে, গল্প করছে, মহাদেব তন্ময় হয়ে তাই দেখে। তার মনে হয় তাদের প্রত্যেকেই যেন তার দাদু—তার নবগোপাল। এক একবার ভাবে তাদের ডেকে একটু আদর করে—কিন্তু সেই চিন্তাতেই মহাদেব শিউরে ওঠে—না—না তার দেহে বোধহয় বিষ আছে—ওদের সে ছোঁবে না—তার স্পর্শে যদি ওদের কিছু অমঙ্গল হয়! মহাদেব তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে তাদের চঞ্চল গতির দিকে—তারা দৌড়চ্ছে ঠিক তার দাদুর মতো—কথা বল্‌ছে ঠিক সেই রকম—হাস্‌ছেও ঠিক সেই রকম।

সেদিন ছেলের দল লেকের ধারে ছুটোছুটি করছে। গোধূলির সোনালি আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে চোখে, লেকে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে সোনালি জলের ঢেউ, মহাদেব লেকের ধারে বেঞ্চে বসে চেয়ে আছে তাদেরই দিকে, মন চলে গেছে হারিয়ে যাওয়া দেশের গ্রামে, সেখানে এমনই সময় ছুটে বেড়াতো তার নবগোপাল, তারও মুখে ছড়িয়ে পড়তো গোধূলির আবির রেণু।

মহাদেব চম্‌কে উঠ্‌লো। একটি বছর ছয়েকের ছেলে দৌড়ে এসে মহাদেবের হাঁটুর ওপর ছোট্ট দুটি হাত রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি কাণ নাচাতে পারো?

মহাদেব তার পিঠে হাত রেখে বল্‌লে—না ভাই, আমি তো কাণ নাচাতে শিখিনি।

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—তুমি কিচ্ছু শেখনি। আমার দাদি কেমন কাণ নাচাতে পারে। দাদি তো তোমারই মতন বড়, দাদি শিখেছে আর তুমি শিখ্‌তে

পারনি! আমি বলি দাদিকে—দাদি, তুমি যদি কাণ না নাচাও, তবে আর আমি তোমাকে দাদি বলে ডাকবো না। দাদি অমনি কাণ নাচায়। একটু থেমে আবার বললে—আচ্ছা তুমি কিচ্ছু শেখনি?

মহাদেব তাকে কোলের কাছে টেনে এনে বললে—কাণ নাচাতে আমি এখনও শিখতে পারিনি দাদু—তবে ঘাড় দোলাতে শিখিছি।

ছেলেটি বললে—ধ্যাৎ, সে তো সবাই পারে। তবে তুমি কি পার? আচ্ছা তুমি নৌকো তৈরি করতে পারো—কাগজের নৌকো?

মহাদেব হেসে বললে—হ্যাঁ, এটা তো আমার শেখা আছে! নৌকো আমি খুব ভাল তৈরি করি।

মাঠ থেকে দৌড়ে একটা কাগজ কুড়িয়ে এনে ছেলেটি বললে—আমাকে একটা ভাল নৌকো করে দাও তো, জলে ভাসাবো।

মহাদেব বললে—নৌকো করে দিলে আমাকে কি দেবে বল!

ছেলেটি বললে—তুমিও তাহলে আমার দাদি হবে, তোমাকে আমি দাদি বলে ডাকবো। কর নৌকো!

মহাদেব লেগে গেল কাগজ মুড়ে নৌকা তৈরি করতে।

এমন সময় ছেলেটির বাড়ির চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে উপস্থিত। ছেলেটির হাত ধরে বললে—তুমি তো ভারি দুষ্টু হয়েছ দীপু, একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আর এর মধ্যে এতদূর ছুটে চলে এসেছ। চল বাড়ী চল, আর বেড়াতে হবে না।

মহাদেব বললে—আহা থাক্ বাপু, আরেকটু থাক্। একটা নৌকো করে দিচ্ছি, একটু খেলা করে বাড়ী যাবে'খন। ছেলেমানুষ তো—

লোকটি বললে—বড্ড দুরন্ত ছেলে বাবু। এত নজরে নজরে রাখি—তবু একটু ফাঁক পেলেই কোথায় যে ছুট দেবে—যদি জলেই পড়ে যায়। আর ওকে এখানে নিয়ে আসবো না।

মহাদেব বললে—কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি রোজ এনে আমার কাছে ছেড়ে দেবে, আমি দেখবো। বালক, একটু দুরন্ত হওয়া ভাল, বুঝলে।

ততক্ষণে একটি ছোট কাগজের নৌকা তৈরি হয়ে গেছে। নৌকাটি দীপুর হাতে দিয়ে মহাদেব বললে—এই নাও দাদু, তোমার নৌকো।

দীপু নৌকাটি হাতে করে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো—খুব ভাল নৌকো করেছ দাদি—খুব ভাল নৌকো।

তারপর তারা দু'জনে চললো লেকের জলে নৌকো ভাসাতে। দীপু হাত তালি দেয়, নাচে, মহাদেব চেয়ে থাকে দীপুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে। কাগজের নৌকা হেলে দুলে লেকের জলে ভেসে চলে।

চাকরটি বললে—দীপু, এইবার বাড়ী চলো, সন্ধ্যে হয়ে এল। বাবু রাগ করবেন।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি বাপু।

চাকরটি জবাব দিলে—আজ্ঞে, হারাধন।

মহাদেব বললে—দেখ বাবা হারাধন, এই চার আনা পয়সা তুমি রাখো, কিছু কিনে খেও। তুমি বড় ভাল লোক। বলে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে তাকে দিল।

হারাধন অবাক হয়ে ভাবে—তাকে হঠাৎ চার আনা পয়সা বাবু কেন দিলে।

মহাদেব বললে—আর দেখ বাবা, রোজ বিকেলে দাদুকে এখানে নিয়ে এস। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না আমি ওকে দেখবো। আমার কাছে দাদু খুব শান্ত হয়ে থাকবে।

যেতে যেতে দীপু মহাদেবকে চুপি চুপি বললে—কাল খুব বড় একটা নৌকো করে দেবে দাদি। হারাধনকে যেন বোলো না।

মহাদেবও চুপি চুপি বললে—একটু সকাল সকাল এসো দাদু, খুব বড় নৌকো করে দেব, এই এ—তো বড়। পাল তুলে জলের ওপর নেচে বেড়াবে।

দীপু মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি বড্ড ভাল দাদি।

অনেকদিন পরে মহাদেবের চোখ আবার জলে চিক্ চিক্ করে উঠলো।

পরের দিন রোদ পড়বার আগেই মহাদেব হাজির হয়েছে লেকের ধারে। তখনও দীপু পৌঁছায় নি, ছেলের দল কেউ-ই আসে নি। ফাঁকা মাঠ। মহাদেব সঙ্গে এনেছে একটা খবরের কাগজ। বেঞ্চে বসে তাই নিয়ে লেগে গেল নৌকা তৈরি করতে।

খানিক পরেই 'দাদি' বলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো দীপু মহাদেবের পিঠের ওপর।

মহাদেব বল্‌লে—এস দাদু—এই দেখ তোমার নৌকো তৈরি হয়ে এল বলে।

হারাধন বল্‌লে—খোকাবাবু তাহ'লে আপনার কাছে রইলো বাবু, আমি কাছেই আছি।

মহাদেব বল্‌লে—হাঁ হারাধন, দাদু আমার কাছে রইলো। সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যেও।

হারাধন চলে গেল। দীপু বল্‌লে—খুব ভাল নৌকো হয়েছে দাদি, খুব বড়।

মহাদেব একগাল হেসে বল্‌লে—দাঁড়াও দাদু, দাঁড়াও, অনেক বাকি এখনও।

তার পর পকেট থেকে বার করলে একটা কাঠি, তার গায়ে লাল কাগজ লাগিয়ে নিশান তৈরি হয়েছে। 'এইটে হবে পাল' বলে কাঠিটা নৌকার সঙ্গে মহাদেব বেঁধে দিলে। তার পর দুজনে লেকের জলে নাম্‌লো নৌকা ভাসাতে।

নৌকা কাঁপতে কাঁপতে ভাস্‌তে লাগলো। মহাদেব দীপুকে কোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—এই চল্‌লো আমার দাদুর ডিঙা, ময়ূরপঙ্খী নাও, দীপু সদাগরের ডিঙা সাতসমুদ্দুর পাড়ি দিতে।

দীপু হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌লো—চল্‌লো আমার ময়ূরপঙ্খী নাও—ওই চল্‌লো।

কাগজের নৌকা পাল তুলে ভাস্‌তে লাগলো লেকের জলে।

... ...

এমনি দাদি আর দাদুর খেলা চলে প্রতিদিন। বিকালে খবর কাগজ হাতে মহাদেব অপেক্ষা করে লেকের ধারের নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে, দীপু ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিঠে, তারপর চলে তাদের নৌকা ভাসানর খেলা। নিশ্চিন্ত হারাধন মহাদেবের দেওয়া পয়সায় দূরে বসে চিনাবাদাম চিবোয়, আর সঙ্গীদের সাথে গল্প করে।

একদিন সকালে হাজরা রোডের মোড়ে এক জায়গায় বেশ ভীড় জমেছে। উঁকি মেরে মহাদেব দেখে একটি লোক এক গাম্‌লা জলে একটা বড় টিনের নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। নৌকাতে একটা আলো জ্বালানো হয়েছে, আর নৌকাটা ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ করে গাম্‌লাটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মহাদেব তাড়াতাড়ি লেগে গেল নৌকার সরঞ্জাম ঠিক করতে। এল একটা এলুমিনমের গাম্‌লা, নৌকার পালে লাগানো হ'লো লাল নিশান—তাতে লেখা হ'লো দীপু সদাগরের ডিঙা। নৌকার খোলে ভরা হ'লো কেরাসিন তেল। তার পর গাম্‌লায় জল ভরে মহাদেব নৌকার পল্‌তেয় আগুন দিয়ে তার ওপর ছেড়ে দিলে। নৌকা ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ করে।

মহাদেব তখন দীপু হয়ে গেছে। চলমান নৌকার দিকে চেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো। তার পর প্রতীক্ষা করতে লাগলো—কখন বিকাল আসে। কিন্তু বিকাল আসবার অনেক আগেই মহাদেব গাম্‌লা আর নৌকা বগলে করে চল্‌লো লেকের ধারে।

ক্রমে বেলা পড়ে এল। ছেলের দল মাঠে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে, কিন্তু তখনো দেখা নেই দীপুর। মহাদেব নৌকাতে তেল পুরে ফেল্‌লে, গাম্‌লায় ভরে নিলে জল, তার পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো দীপুর জন্য। দীপু এলে তখন দেবে নৌকায় পল্‌তেয় আগুন, ছেড়ে দেবে নৌকাকে গাম্‌লার জলের ওপর, নৌকা ছুটে বেড়াবে ঝিক্ ঝিক্। দীপুর তখন কি অবস্থা হবে! মহাদেব কল্পনা করতে লাগলো দীপুর উল্লাস-ভরা মুখ, কল্পনা করলে আনন্দে তার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ে 'দাদি—দাদি' বলে ডাক্‌ছে দীপু।

মহাদেব ডেকে উঠলো—দাদু!

কিন্তু দাদু তখনও আসে নি।

মহাদেব ডাক্‌লে—হারাধন!

হারাধন দীপুকে নিয়ে এসে পৌঁছয় নি।

সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকারে ভরে উঠলো লেকের মাঠ, লেকের জল, ছেলেরা খেলা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেল। মহাদেব তখনও বসে আছে বেঞ্চটার ওপর, সাম্‌নে পড়ে আছে জল-ভরা এলুমিনমের গাম্‌লা, পাশে আছে টিনের নৌকা—তার পাশে নাম লেখা দীপু সদাগরের ডিঙা।

অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠলো। মহাদেব গাম্‌লা আর নৌকা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে চল্‌লো।

কোন মেয়েগুলি সব
চেয়ে সুন্দরী?
আর জিতে
নিন্
প্রবেশমূল্য লাগবে না
টাকা ২০০০০
রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা
শেষ তারিখ- ১৬ই মে, ১৯৫৫ সাল
আপনাকে যা ক'রতে হবে তা হোল, একটী প্রবেশপত্র যোগাড় করা আর তাতে যে নয়টী সুন্দরী মেয়ের ফটো দেওয়া আছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারপর আপনার মত অনুযায়ী এদের সৌন্দর্য্য ও শোভা'র যথাযথ পারম্পর্য্যে বসিয়ে যেতে হবে।
আপনার পছন্দ যদি বিশেষ বিচারকমণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ক্রমের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে আপনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এর কোন প্রবেশমূল্য নেই—কেবল একটী রেক্সোনা সাবানের মোড়ক প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠালেই হোল'।
একটী সাধারণ আকারের রেক্সোনা সাবানের মোড়ক (কিম্বা তিনটী ছোট সাইজ সাবানের মোড়ক) প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠান—একটী বড় সাইজের মোড়ক আপনাকে দুইটী সমাধান পাঠাবার অধিকার দেবে।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
প্রত্যেকেই যোগ দিতে পারেন (বোম্বাই রাজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া)
রেক্সোনা বিক্রেতার কাছ থেকে
একটী প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্।
RP. 129-X52 BG
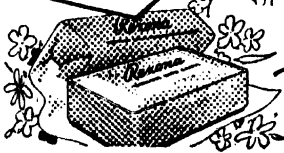
সারারাত মহাদেব বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে, ঘুম আস্‌তে চায় না, যদি বা আসে একটা স্বপ্নের আভাষে তখনি ভেঙে যায়—কানে আসে দীপুর কণ্ঠস্বর—দাদি আমি এসেছি—আমি এসেছি—কই আমায় নৌকো দাও! ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে মহাদেব। চারিদিক চেয়ে আবার চেষ্টা করে। তখন ভোরের আলো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

বিকাল হতেই মহাদেব নৌকা আর গামলা নিয়ে চললো লেকে। নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চটিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো দীপুর জন্য, কিন্তু সেদিনও এল না হারাধন দীপুকে নিয়ে। ছেলের দল যখন খেলা ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেল মহাদেবও আস্তে আস্তে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়লো।

মেসে নৌকা আর গামলা রেখে মহাদেব আবার বেরিয়ে পড়লো। হারাধনের কাছে সে শুনেছিল দীপুর বাবার নাম দত্ত সাহেব, সাদার্ন য্যাভিন্যুতে মস্ত বাড়ী, নামকরা ব্যারিষ্টার। হারাধন চললো সাদার্ন য়্যাভিন্যুতে, বাড়ী খুঁজে বার করতে বেশি দেরী হলো না। কিন্তু বাড়ীর সাম্‌নে এসেই মহাদেব থম্‌কে গেল—সারা বাড়ীখানায় যেন একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করছে। মহাদেব ফটকের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যদি কোন রকমে হারাধনের দেখা পায় তবে জিজ্ঞাসা করবে কেন তার দাদু দু'দিন বেড়াতে যাই নি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর একটা মোটর এসে বাড়ীর সামনে থাম্‌লো। গাড়ী থেকে একজন ডাক্তার নেমে তাড়াতাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মহাদেব গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

খানিক পরেই ডাক্তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন, মহাদেব কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ীতে কার অসুখ ডাক্তারবাবু? কথাটা উচ্চারণ করতে মহাদেবের জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিল—হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার মন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ডাক্তার বললেন—মিঃ দত্তর একমাত্র ছেলে দীপুর। কাল বিকেলে মাঠে বেড়াতে যাবে বলে নীচে নামছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেল, তাইতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। আর জ্ঞান ফেরে না।

মহাদেবের গলা থেকে একটা শব্দ বেরুল—"আমার দাদু!"

ডাক্তার বললেন—আপনাকেই বুঝি 'দাদু' বলে ডাক্‌তো! মিঃ দত্তর মুখে শুনেছি দীপু ওদের চাকর হারাধনকে বেলা চারটা থেকে তাড়া দিচ্ছিল বেড়াতে যাবার জন্য—তার দাদুর কাছে নিয়ে যাবার জন্য।

মহাদেব বললে—আমার দাদুর জ্ঞান ফিরেছে ডাক্তারবাবু। ডাক্তার মহাদেবের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললেন—বললুম তো, জ্ঞান আর ফেরে নি। এইমাত্র সে মারা গেল।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠলেন।

মহাদেবের কানে সব কথা পৌঁছায় নি। তার চোখের সামনে ডাক্তার, মোটর, দত্ত সাহেবের বাড়ী সব যেন এক সঙ্গে মিশে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, আর তার ওপর দাঁড়িয়ে নৌকা হাতে নিয়ে নাচছে দীপু—তার দাদু।

মহাদেব একবার দত্ত সাহেবের বাড়ীর দিকে চাইবার চেষ্টা করলে, তার পর মেসের পথে তার পা দু'টোকে টেনে নিয়ে গেল।

* * *

তারপর দিন বিকাল হ'তেই মহাদেব বগলে নিলে সেই টিনের নৌকা আর এ্যালুমিনমের গামলাটা। গিয়ে বস্‌লো নিত্য দিনের বসা সেই বেঞ্চটাতে। গামলায় ভরলো জল, নৌকার পল্‌তেয় দিলে আগুন। নৌকা পাক্‌ খেতে লাগ্‌লো গামলার জলে—ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক-ঝিক্‌

ছেলের দল তাকে ঘিরে ধরেছে নৌকা ভাসান দেখ্‌তে।

নৌকা চল্‌ছে ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক্‌।

মহাদেব চেঁচিয়ে ওঠে—দাদু, দাদু, দেখ কেমন চলেছে তোমার নৌকো পাল তুলে। আমার দাদুর ডিঙা, দীপু সদাগরের ময়ূরপঙ্খী নাও চলে সাত সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে—আমার দাদুর ডিঙা, দীপু সদাগরের ডিঙা চলে ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক্‌—

ক্রমে রাতের অন্ধকার ছেয়ে ফেল্‌লে লেকের পথ, লেকের জল, ছেয়ে ফেল্‌লে মহাদেবের নৌকাকে, মহাদেবকে। ছেলের দল অনেক আগে বাড়ী চলে গেছে। তখনও দীপু সদাগরের নৌকা চলছে ঝিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক-ঝিক

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

খবর পাওয়া গেছে, ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি পাকিস্থান সরকার কিছু ভারতীয় চিত্র সরবরাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এজন্য নাকি ভারতীয় চিত্র-সরবরাহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাকিস্থান সরকার আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পাকিস্থান কাষ্টমস্-এর কবলে যে সকল ভারতীয় ছবি অদ্যাবধি পড়িয়া আছে তাহার শতকরা ৬০ খানি চিত্রকে ছাড়পত্র দেওয়া হইবে এবং বাকী ৪০ খানি ছবির জন্য নূতন করিয়া আবেদন করিতে হইবে। মেঘ-মুক্তির ইঙ্গিতে সত্যই এ শিল্প-ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার হইতে পারে, আসলে কিন্তু লেনদেনের ব্যাপার না জানা পর্য্যন্ত কোন আশা করা নিরর্থক। শিল্পকে কেবলমাত্র অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।—শিল্পের প্রতি দরদী হইতে হইবে। শিল্পের সহিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইবে।

* * *

মালদহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ইউ, এন, ধেবর তাঁহার ভাষণে ছাত্ররা আজকাল চিত্রতারকাদের অনুকরণ করেন, বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের অনুকরণ না করিয়া ছাত্ররা কেন যে অভিনয়শিল্পীদের অনুকরণ করেন বুঝা দায়। শ্রীধেবর যাহা বলিয়াছেন তাহা আংশিক সত্য হইলেও ছাত্ররা যে কেবলমাত্র অভিনয়শিল্পীদেরই অনুকরণপ্রয়াসী তাহা সত্য নহে। কেন না যে সকল ছাত্র অভিনয় ও অভিনেতাদের অনুকরণ করে তাহারাই আবার উত্তরকালে সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। ছাত্ররাই সমাজের ভবিষ্যৎ। তাহাদের গতিবিধি সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত। কেবলমাত্র শিল্পীদের অনুকরণ শ্রীধেবরের চোখে লাগায়, তিনি যে অনুতাপ করিয়াছেন—তাহা নিরর্থক।

* * *

এ বছর আমেরিকার একাডেমী অব মোশান পিকচার আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স কর্ত্তৃক অস্কার পুরস্কার লাভ করিয়াছে—কলম্বিয়া পিকচার্স-এর 'অন্ দি ওয়াটার ফ্রণ্ট' নামক চিত্রখানি। এ ছাড়া আরো ছয়টি পুরস্কার পরিচালনা, সম্পাদনা, অভিনয়, পার্শ্ব চরিত্র-অভিনয়, কাহিনী ও আলোক চিত্র গ্রহণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

সবার উপরে কথাচিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের অবসরে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও অগ্রদূত প্রধান শ্রীবিভূতি লাহা
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

* * *

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র ইউনিয়নের প্রায় তিনশত কর্ম্মচারী সম্প্রতি বিধানসভা অভিমুখে তাঁহাদের দাবী জানাইয়া অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে। কর্ম্মচারীরা দাবী করেন, তাঁহাদের ৮ ঘণ্টার বেশী কার্য্যকাল যেন না হয়। সপ্তাহে দেড় দিনের ছুটি চাই। প্রভিডেণ্ট, ফাণ্ড ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। কর্ম্মচারীদের দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকারকে একটি কমিশন নিয়োগ করার জন্যও তাঁহারা দাবী করেন।
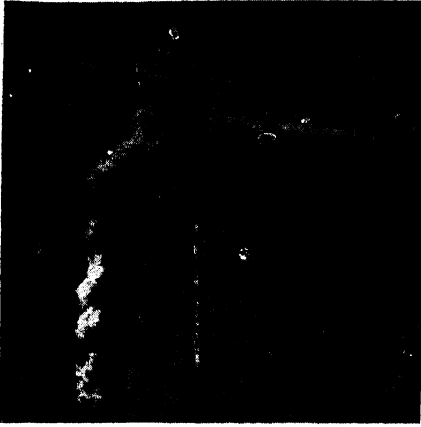
নৃত্যের এক বিশেষ ভঙ্গীমায় শ্রীমতী প্রীতিধারা

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

এম-পির আগতপ্রায় 'সবার উপর' কথা-চিত্রের নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

* * *

হিন্দী চিত্রের জনপ্রিয় অতিকায়-বপু অভিনেতা উল্লাস সম্প্রতি তাঁহার দেহের মেদ কমাইবার জন্য কৃচ্ছসাধনা করিতেছেন। প্রত্যহ তিনি ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা ইতিমধ্যে আধ মণ ওজন কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন। মধ্যে তাঁহার দেহের ওজন প্রায় তিন মণ হইয়াছিল। তিনি দেড় মণ ওজনে তাঁহার দেহটীকে আনার জন্য সচেষ্ট। দেহের মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে নায়ক হইতে পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা তথা রসাভিনেতার পর্য্যায়ে নামিতে হয়। ভবিষ্যতে তিনি পুনরায় নায়ক সাজিতে পারিবেন কিনা সে বিষয় সন্দেহ থাকিলেও প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে উল্লাসের উদ্যম অনুকরণীয়।

* * *

কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড সম্প্রতি বিদেশী ছবিগুলির সেন্সার এক জায়গায় করার মনস্থ করিয়াছেন। যাবতীয় বিদেশী চিত্র কেবলমাত্র বোম্বাই কেন্দ্র হইতে অতঃপর ছাড়পত্র লাভ করিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডএর কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ড সব সময়ে সমস্ত ছবি দেখিয়া উঠিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র বোম্বাই আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের উপর সমস্ত ভার অর্পিত হওয়ায় অন্যান্য আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা বিস্মিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের

ডাল্‌ডা
আমার পক্ষে
ভালো!
DALDA
ডাল্‌ডা

আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের সদস্যেরা এই কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন।

* * *

আগামী ১লা বৈশাখ হইতে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত সংসদের উদ্বোধন হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র ভারতী-ভবনে সংসদের উদ্বোধন করিবেন। এই সংসদ সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যকলা বিষয়ে শিক্ষাদান করিবে। সিনিয়র ও জুনীয়র দুইটী পাঠ্যক্রম সংসদ প্রস্তুত করিয়াছেন। সিনিয়র কোর্সে প্রথম বৎসরে ষাটজন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। সিনিয়র কোর্সের ছাত্রদিগকে আবাসিক হইতে হইবে। জুনিয়র কোর্সেও সমসংখ্যক ছাত্র লওয়া হইবে। কিন্তু তাহাদের আবাসিক হইতে হইবে না। ভারতে তথা বাংলায় নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতকলার যে সকল ধারা প্রচলিত আছে, সংসদ সে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। ইহা ব্যতীত মঞ্চ, ছায়াচিত্র, রেডিওর অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিকল্পনা, আলোক-সম্পাত, মঞ্চ সজ্জা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইবে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী—নাট্য, শ্রীউদয়-

আজ প্রোডাকসনের দস্যু মোহনের নায়িকা শ্রীমতী সুমিত্রা ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর—নৃত্য ও শ্রীরমেশ বন্দোপাধ্যায়—সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা সংসদের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

* * *

১৩ই মার্চ্চ রাজভবনে গীত বিতানের সমাবর্ত্তন উৎসবে মার্গ সঙ্গীতে পারদর্শিতা সহকারে পরীক্ষা পাশ করিয়া কুমারী কৃষ্ণা ঘোষ চৌধুরী "সঙ্গীত-ভারতী" উপাধি লাভ

কৃষ্ণা ঘোষ চৌধুরী

করিয়াছেন। কুমারী কৃষ্ণা পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর কন্যা ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর ছাত্রী। কুমারী কৃষ্ণা স্কটিশচার্চ্চ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

* * *

গত ৩রা এপ্রিল, রবিবার প্রাতে সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ হতে 'রূপমঞ্চ' কার্য্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলার অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন—'বহির্দৃষ্টিতে আমরা যা' দেখি তার লয় আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে যা দৃষ্ট—তার লয় নেই—তাই কৃষ্ণচন্দ্র বহির্দৃষ্টিহীন হয়ে প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে শাশ্বত সুন্দরকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন, একনিষ্ঠ সঙ্গীতসাধনায় সেই সুন্দরেরই উপাসনা করে চলেছেন। অসংখ্য গানের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মানুষকে আনন্দ দান করে নিজের স্থান সবার মনে নিজেই করে নিয়েছেন—তবু এরূপ সম্বর্দ্ধনার প্রয়োজন আছে। পুরাকালে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গুণী গৃহে গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে আসতেন। তাই রূপমঞ্চ সংস্কৃতি পরিষদ আমাদের সকলের

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে—সংগীতাচার্য

পক্ষ হতে সে দায়িত্ব পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছে। লোকসঙ্গীতানুসন্ধিনী পৃথিবী ভ্রমণরতা মিস্ হেলেন্ ডানলপ্ও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে শিল্পী সমাদরের এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিনন্দনের উত্তরে অভিভূত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন—'আমার সঙ্গীত সাধনায় আমার দেশবাসীই আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন। আমি অনুভব করি আমার গান অনেকেরই ভাল লাগে—কিন্তু আমাকেও যে ভাল লাগে—এত লোক এত ভালবাসে তা' বুঝলাম আজ এখানে এসে। এ আনন্দ আমার রাখবার জায়গা নেই।' তারপর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের কয়েকটি গানে সমাগত সকলেই চমৎকৃত হন।

জেমিনীর দো দুলহে চিত্রের একটি দৃশ্য
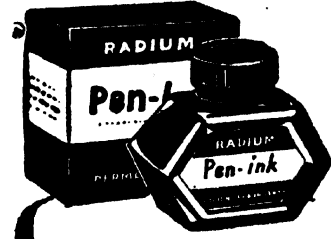
"পথের ভুলে এসেছিলে, পথের ভুলেই পালিয়ে গেলে—"

ডাক্তার রামেন্দু দত্ত (ক্যাপ্টেন)

তুমি এলে পথের ভুলে
গন্ধ যেমন বনের ফুলে
সঙ্গোপনে লহর তুলে
মাতিয়ে আমার মন—
আমি ছিলাম ছন্দ-বিহীন
দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় শ্রীহীন মলিন
করলে রাঙা নয়ন-নলিন
চাইনি যতক্ষণ !
তোমার সেবা, ভালোবাসা,
নীড়-হারারে বাঁধায় বাসা,
জাগায় মনে মধুর আশা,
বধূর প্রয়োজন !
নিলাম গলায় মালার মতন
ক'রে নিলাম মাথার রতন
বুকের মাঝে রাণীর সাজে
দিলাম যে আসন !
তুমি আমার, আমি তোমার,
জগৎ বিসর্জন !

* * * *

মোহের ভুলে আজকে কাঁদি
কি ক'রে যে মনকে বাঁধি
কোথায় তুমি, কোথায় আমি !
কী করি এখন ?
হায় রে আমার চাঁপার কলি
ধূলায় লুটাও আমায় ছলি'
বুকের ব্যথা কা'রেই বলি,
বাঁচবো কতক্ষণ ?
মন হারালাম তোমার মাঝে
পেলাম না ঐ মন !
পথের ভুলে যেমন এলে,
পথের ভুলেই পালিয়ে গেলে,
ধরা ছোঁয়ার সকল আশা
আজকে সমাপন !
ওরে আমার কনকচাঁপা !
মিটু, মাণিক, শোন্ !

আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতন—

গত ১১ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—গত এক বৎসর ধরিয়া আসাম হইতে এই মর্মে সংবাদ আসিতেছে যে আসামের কয়েকটি জেলায় অসমীয়াদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক বাঙ্গালীদের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহারা সীমানির্দ্ধারণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে ও ভীতিপ্রদর্শন করিতেছে। এই আন্দোলনের বিপদজনক সম্ভাবনার প্রতি আসামের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করা হইয়াছে। গত কয় দিনের মধ্যে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। আসামের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার অজুহাতে বাঙ্গালীদের দোকান লুঠ করা হইতেছে, দোকানের সাইন বোর্ড ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালীদের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ করা হইতেছে, বাঙ্গালী মহিলাদের প্রতিও অসদাচরণ করা হইতেছে—মূল কথা—আসামে সম্পূর্ণ অরাজকতা সৃষ্টির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা চলিয়াছে। ইহার ফলে ভীত হইয়া আসামের অধিবাসী শত শত বাঙ্গালী আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নানা কারণে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ঐ তিনটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব এত বাড়িয়াছে যে তিনটি রাজ্যেই বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন চলিতেছে। উড়িষ্যায় বহুদিন এই আন্দোলন হইয়া উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীদিগকে বিব্রত করিয়াছে। বিহারের অবস্থা এখনও শান্ত হয় নাই—বিহারের কয়েকটি জেলায় বাঙ্গালীদের পক্ষে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। তাহার উপর আসামের এই অবস্থা। ইহার প্রতীকারের উপায় কি? রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজে বাধা প্রদানই কি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে? কেন্দ্রীয় সরকার যদি কঠোরতার সহিত এই অরাজকতা দূর করিতে অগ্রসর না হন, তবে ইহার ফলে ৪টি রাষ্ট্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমরা সকল রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম) 'কৃষ্ণকলি প্রভৃতি গল্প' এবং তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরোগ্য নিকেতন' নামক পুস্তকের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পুরস্কারের পরিমাণ ৫,০০০৲ টাকা। বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী এই পুরস্কার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদত্ত হইয়াছে। পরশুরাম ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই বঙ্গ ভারতীর কৃতি সাধক। ইহাদের সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিচারকমণ্ডলী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসা শিক্ষা—

এদেশে হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসার প্রচার অল্প নহে এবং তাহার আরও বহুল প্রচার দেশের লোকের অবস্থা ও হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসার সাফল্য হেতু প্রয়োজন। সেই জন্য বহু চিকিৎসক যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলে ফ্যাকালটী গঠিত ও সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ফ্যাকালটী এদেশে হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি ও মান একইরূপ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা আশা

করি ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া চিকিৎসকগণ সেই সাধু চেষ্টায় বাধা দিবেন না। কলিকাতায় হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসা শিক্ষাগারগুলির সম্মেলন যদি হয়, তবে যে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইয়া লোকের উপকার সাধন করিতে পারিবে এবং সরকারও তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইবেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। যাঁহারা দূরদৃষ্টির অভাবে তাহার বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহারা যে আবশ্যক উন্নতি সাধনের পথ বিঘ্নবহুল করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সকল হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসককে ও সকল প্রতিষ্ঠানকে এবং জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করিতেছি।

পঞ্চশীল নীতি—

এসিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সকল দেশ আজ যে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঐ পঞ্চশীল কি তাহা হয় ত অনেকের জানা নাই। শীল-পঞ্চক নিম্নলিখিত রূপ—(১) পারম্পরিক আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সকলকে মানিয়া লইতে হইবে (২) কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না (৩) কেহ কাহারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না (৪) প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমমর্য্যাদা মানিয়া লইবে ও (৫) পারম্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি ভোগ করিবে। তিব্বত সম্পর্কে সম্পাদিত ভারত-চীন চুক্তি রচনার সময় শান্তি ও স্বাধীনতার এই নূতন সনদ প্রণীত হয়। তখন শুধু ভারত ও চীন এই সনদে স্বাক্ষর করিয়াছিল। সম্প্রতি এসিয়ার ১৪টি দেশ সর্বসম্মতিক্রমে এই সনদ মানিয়া লইয়াছে। ইহার পরই বান্দুং সম্মিলন—তথায় এসিয়া ও আফ্রিকার আরও বহু দেশ এই সনদ মানিয়া লইবে। শ্রীজহরলাল নেহরু ও শ্রীচৌ-এন-লাইএর নেতৃত্বে এই ভাবে আজ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। ইহাই স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অবদান।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ঃ

মাদ্রাজ ঃ ৪৭৮ (সি ডি গোপীনাথ ১৩৩, বালকৃষ্ণাণ ৭৮, কৃপালসিং ৭৫, সরঙ্গপাণি ৭৪। গাইকোয়াদ ১৩৭ রানে ৪, সারভাতে ১১১ রানে ৩ উইঃ) ও **৩১১** (কৃপালসিং ৯১, আলভা ৫২)

হোলকার ঃ ৪১৭ (নিভস্কার ৮৫, মুস্তাকআলী ৫৫, যাদব ৭৭ ; ও **৩২৬** (মুস্তাকআলী ৫১, সারভাতে ৫৬, আর পি সিং ৫৪ ; মুর্গেশ ১১৪ রানে ৫, কৃপালসিং ১১৩ রানে ৪ ইউঃ)

রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে মাদ্রাজ ৪৬ রানে হোলকারকে পরাজিত ক'রে রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ২১ বছরের ইতিহাসে মাদ্রাজ এই প্রথম রঞ্জি ট্রফি পেল। ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজ দু'বার, ১৯৩৬ ও ১৯৪১ সালের ফাইনালে খেলেছিলো। হোলকার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে ১০ বার খেলে ৪বার রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে হোলকার দলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশিবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে খেলার রেকর্ড করেছে। সুতরাং মাদ্রাজ দলের পক্ষে হোলকারদলকে পরাজিত করার কৃতিত্ব কম নয়।

পাঁচদিনের খেলার প্রথম দিনে মাদ্রাজ ৪ উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান করে। ২য় দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর ৪৭৮ রানে মাদ্রাজের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হ'লে ঐদিন হোলকার দলের ১ উইকেট পড়ে ১২২ রান ওঠে। মাদ্রাজ দলের বিরাট রানের বোঝা মাথায় নিয়েও হোলকার দল হতাশায় ভেঙ্গে পড়েনি, সাহসের সঙ্গে খেলে যায়।

তৃতীয় দিনে ৯ উইকেট পড়ে হোলকার দলের ৪১১ রান দাঁড়ায়। খেলার ৪র্থ দিনে পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে মাত্র ৬ রান যোগ হওয়ার পর হোলকার দলের ১ম ইনিংস ৪১৭ রানে শেষ হয়। ফলে মাদ্রাজ ৬১ রানে এগিয়ে যায়। ঐদিন মাদ্রাজ দলের ২য় ইনিংসে ২৯৩ রান ওঠে ৯টা উইকেট পড়ে। ১ম ইনিংসের মত ২য় ইনিংসেও হোলকার দলের ফিল্ডিংয়ে মারাত্মক ভুল ত্রুটি হয়। খারাপ ফিল্ডিংই হোলকার দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ৪র্থ দিনের শেষে দেখা গেল মাদ্রাজ ৩৫৪ রানে এগিয়ে আছে, খেলা শেষ হ'তে আর একটা দিন মাত্র বাকি।

খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষদিন মাদ্রাজ দলের পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে ১৮ রান হয়ে ২য় ইনিংস ৩১১ রানে শেষ হয়। তখন খেলা শেষ হ'তে ২৯০ মিনিট বাকি। এই ২৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩৭৩ রান তুলতে পারলে হোলকার দলের জয়। হোলকার দল জয়লাভের মনোবল নিয়েই পিটিয়ে খেলতে সুরু করে। শেষের দিনের খেলায় হোলকার দল এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। দর্শক সাধারণ ক্রিকেট খেলার আমেজ এবং শিহরণ উপভোগ করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট আগে হোলকার দলের ২য় ইনিংস ৩২৬ রানে শেষ হ'লে মাদ্রাজ ৪৬ রানে জয়ী হয়। শেষ দিনের খেলায় বিজিত হোলকার দল জয়লাভের সমান সম্মান পায়।

অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৫ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ১৩৩, কীথ মিলার ১৫৭, আর্থার মরিস ৬৫, ম্যাকডোনাল্ড ৫০ ; ভ্যালেনটাইন ১১৩ রানে ৩, ওয়ালকট ৫০ রানে ৩) ও **২০** (১ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৫৯ (ওয়ালকট ১০৮) ও **২৭৫** (সি স্মিথ ১০৪, হোল্ট ৬০)

কিংস্টোনের অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ প্রতিযোগিতায় মাদ্রাজ বনাম সার্ভিসেস দলের ফাইনাল খেলা দু'দিন ড্র যায়। ফলে প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে উভয় দলকে রঙ্গস্বামী কাপ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম ফাইনাল খেলায় চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ায়

দুইদল যুগ্মভাবে কাপ পেল। মাদ্রাজের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। গত পাঁচ বছরে সার্ভিসেস্ দল এই নিয়ে চারবার ফাইনাল খেলে ২বার জয়ী হ'ল। প্রথম জয়ী হয় ১৯৫৩ সালে, পাঞ্জাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি।

প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ দু'দিন খেলা ড্র করার পর ৩য় দিনে ১-০ গোলে ভারতীয় রেলদলকে পরাজিত করে।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেস দলও দু'দিন খেলা ড্র ক'রে ৩য় দিনের খেলায় ২-১ গোলে বাংলা দলকে হারায়। বাংলা দলের দুর্ভাগ্য, ৩য় দিনের খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রায় গোড়া থেকে তারা দশজনে খেলতে বাধ্য হয়, দলের সেণ্টার-হাফ পেরীরা রেফারীর এক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে শাস্তিস্বরূপ খেলায় যোগদান করতে পারেননি। অপরদিকে আহত থাকায় নিয়মিত খেলোয়াড় হরিপদ গুহ দলভুক্ত হননি। বাংলা তাদের প্রথম খেলায় ৩-২ গোলে উত্তর প্রদেশকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে যায়। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার—ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব দল ০-২ গোলে ভারতীয় রেলদলের কাছে পরাজিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পাঞ্জাব এ পর্য্যন্ত ১১ বার ফাইনাল খেলে ৭বার জয়ী হয়েছে। পাঞ্জাব ছাড়া অপর কোনদল এত বেশীবার ফাইনালে খেলেনি বা জয়ী হয়নি।

সি এ বি ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট ঃ

সি এ বি পরিচালিত ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে মোহনবাগান ১ম ইনিংসের রান সংখ্যায় এলবার্ট স্পোর্টিংকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি তিন বছর জয়ী হয়েছে। মোহনবাগান ১ম ইনিংসে ৪৩২ রান করে। এলবার্ট স্পোর্টিং করে ১৯৬ রান। কিন্তু এলবার্ট স্পোর্টিং ২য় ইনিংস খেলতে রাজী না হওয়ায় প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংসের রানের ফলাফলের ওপর মোহনবাগান জয়লাভ করে।

টেবল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েসন্ প্রচারিত বাঙ্গলার টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের ১৯৫৪ সালের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় পুরুষদের বিভাগে ই, সলোমন ও বি, এন, লাহিড়ী শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন।

দুইজন খেলোয়াড়কে একই সাথে এক নম্বর অভিহিত না করে ওঁদের মধ্যে একজনকে এভারেজ বা অন্য কোনও বিচারে এক নম্বর ও অন্যজনকে দু নম্বর স্থানে দিলে শোভনীয় হত। নিম্নে খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তালিকা দেওয়া হল ঃ—

ই. সলোমন

বি. এন. লাহিড়ী

পুরুষ

১। ই, সলোমন ও বি, এন, লাহিড়ী
৩। সরোজ ঘোষ
৪। টুন ঘোষ

মহিলা

১। মিস ই, মোসেস
২। „ টি, মিত্র
৩। মিসেস্ আর, ফার্ণানডেজ্

ভলিবল টেষ্ট ঃ

ভারত সফরে আগত রাশিয়ার কিভ-স্পার্টাক ভলিবল দল বনাম ভারতবর্ষের ভলিবল টেষ্ট খেলার ফলাফল ঃ

১ম টেষ্ট, কলিকাতা ঃ ভারতবর্ষ ১৫-১২, ১৭-১৫, ৯-১৫, ১৫-৮ পয়েণ্টে কিভ-স্পার্টাক দলকে পরাজিত করে।

২য় টেষ্ট, ত্রিবান্দ্রাম ঃ কিভ-স্পার্টাক দল ১৫-৩, ১৫-১০, ১৫-৭ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

৩য় টেষ্ট, নিউ দিল্লী ঃ ভারতবর্ষ ১৫-১০, ৫-১৫, ১৫-১২, ০-১৫, ১৫-৯ পয়েণ্টে কিভ-স্পার্টাক দলকে পরাজিত করে।

কিভ-স্পার্টাক দল ভারত সফরে ১৪টি খেলায় যোগদান করে। তাদের খেলার ফলাফল জয় ১৩, হার ২ (১ম ও ৩য় টেষ্ট)

হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগ খেলায় প্রথম বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে আছে—১৫টি খেলায় ৩০ পয়েণ্ট। কোন খেলায় হার বা ড্র হয়নি। মাত্র ৩টে গোল খেয়ে ৪৮টা গোল দিয়েছে। মোহনবাগান দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী কাষ্টমস ১৩টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট পেয়েছে।

পদসঞ্চার ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সার্থক ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। সাহিত্য সম্রাট বংকিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস রচনায় অতি অল্পসংখ্যক লেখকই কৃতকার্য হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এ দৈন্য উচ্চকিত করে তুলেছে এ যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের সৃজনী প্রতিভাকে। তাঁর ধ্যানী দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে কালিকটের জামোরিণের রাজ ঐশ্বর্য, পোর্টো গ্রাণ্ডি চট্টগ্রামের ও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য লক্ষ্মী, যার প্রতি লুব্ধ হয়ে ছুটে এসেছিল পর্তুগীজ ব্যবসায়ী আর হার্মাদ জলদস্যুর দল সুদূর লিসবোয়া থেকে। সারা ভারতের উপকূলে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ বন্দর। বাঙালী তথা ভারতীয় বণিকের সঙ্গে বাণিজ্য চলত মুসলমান ব্যবসায়ীদের। স্বর্ণলুব্ধ আর মসলিন মুগ্ধ পর্তুগীজ বণিকেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এল। প্রতিযোগিতা চলল তাদের মুসলমান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। মুসলমান অধিকৃত ভারতে পর্তুগীজ বণিকদের পদসঞ্চারের পথ কুসুমাস্তৃত ছিল না। এল সংঘর্ষ। কালিকটের বন্দর ধূলিসাৎ হল পর্তুগীজদের কামানের গোলায়। বাংলার বাণিজ্য, শিল্প ও শিল্পীদের জীবনে যে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল, সূচনা হ'ল তার।

বাংলা তথা ভারতের একটা ঘোরতর পরিবর্তনের যুগ। ইসলাম তার উন্মুক্ত বাহু মেলে বৈদিক ব্রাহ্মণের উৎপাতে ক্ষুব্ধ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধদের কোল দিচ্ছে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ আর নারীহরণও চলেছে। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে পর্তুগীজ পাদ্রীদের খৃষ্টান ধর্ম। ঐ ভাঙ্গনের যুগে অবতীর্ণ হলেন প্রেমের ঠাকুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্য। রক্ষা পেল হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা সংখ্যাহীন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও। শক্তিমান্ কথাশিল্পীর লেখনী স্পর্শে একটা যুগ যেন সঞ্জীবিত হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়। তাঁর কাহিনী-সৃষ্টির ক্ষমতাও অনন্য সাধারণ। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সম্মুখে নগ্ন দেবদাসী শম্পার নৃত্য বাঙালী বণিক শংখদত্তকে কি ভাবে সম্মোহিত করল। দেবতার দাসীকে হরণ করল শংখদত্ত। পাড়ি জমাল সমুদ্রে। সর্বস্ব হারাল পর্তুগীজ জলদস্যুর হাতে। আর এক কাহিনী ভয়ংকর চরিত্র চন্দ্রনাথের পূজারী সোমদেবের। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনর্জাগত করার পৈশাচিক অপচেষ্টা তাঁর। আশ্রিত পর্তুগীজ বালক গঞ্জালোকে কালীর কাছে বলি দিতেও তার কুণ্ঠা হয় নি। গঞ্জালোর কাটা মুণ্ড দেখে সোমদেবের শিষ্য রাজশেখরের কন্যা সুপর্ণা উন্মাদ হয়ে গেল। কাহিনীর যাদুকর দুই বিশিষ্ট চরিত্র শংখদত্ত ও সুপর্ণাকে ঘটনার আবর্তে ফেলে টেনে এনেছেন। যুদ্ধ, হানাহানি, সংঘর্ষ ও পশ্বাচারের রোমাঞ্চে প্রেম সঞ্চালিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায় নি। পাঠক মাত্রেই এ কাহিনীর সংক্ষুব্ধ আবর্তে হারিয়ে ফেলবেন বর্তমানকে। পড়া শেষ না করে বই ছেড়ে দিতে বেশ কষ্ট হবে, বলতে পারি।

এতৎসঙ্গে উত্তম ছাপা, বাঁধাই ও মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপটের উল্লেখ না করলে প্রকাশকের প্রতি অবিচার করা হবে।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা]

চরকাশেম ঃ অমরেন্দ্র ঘোষ

কুলংকষা ডাকিনী নদী পদ্মা মেঘনার তীরে মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। বড় অনিশ্চয়তা, শংকা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেখানকার মানুষ বেড়ে উঠে। মৃত্যুর স্রোত আর ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আবার হয়ত ঝড়ের মুখে নৌকা ডুবেই ওদের মৃত্যু হয়। কীর্তিনাশা ওদের ঘর দোর জমিজমা সব ভেঙ্গে নিয়ে যায় আপন কুক্ষি মধ্যে। প্রমত্ত নদীর সন্তান জেলে-জেলেনী ও চাষী চাষীবৌএর জীবন, গ্রাম্য যুবক যুবতীর বাঁধনহারা প্রেমের জীবন্ত ও অমর আলেখ্য—চরকাশেম। পল্লীবালার প্রেম, স্বার্থপরতা, উদারতা, পল্লীযুবকের উদ্দাম প্রেম লেখকের শক্তিমান্ লেখনী স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ফুলমন ও কাশেমের মত চরিত্র পাঠকের মনে দাগ রেখে যাবে সন্দেহ নাই।

[প্রকাশক—বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ ৫, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট কলিকাতা মূল্য সাড়ে তিন টাকা]

পূর্ণিমা ঃ ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

অতি সাধারণ কাহিনী। বিচিত্রতা এর মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। তবু লেখক যে আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতী ডিগ্রীধারীদের দুর্বলতা হীন চরিত্রতার চিত্র লোক চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁকে তার জন্যে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। ডাঃ কালিপদ চট্টোপাধ্যায় পি এইচ ডি অধ্যাপক মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীর সামনে জীবনের আদর্শ তাঁর তুলে ধরা উচিত। কিন্তু তিনি কিনা সাজলেন বক-ধার্মিক, গুপ্ত প্রণয় করলেন গুরু ভগিনী ললিতার সঙ্গে। তারপর আবার তাকে প্রবঞ্চিত করে বিয়ে করতে গেলেন। এমন শিক্ষাব্রতীর সংখ্যা আমাদের সমাজে বড় কম নেই। আমাদের উচিত তাঁদের চিনতে পারা। গ্রন্থে একটা অনবধানতা (?) চোখে পড়ল। এড়িনবরায় হিমাদ্রি, নরেশ ও রেবার আলাপে প্রশান্ত কি ভাবে যোগ দিল তা ঠিক বোঝা গেল না। (১৬৭ পৃষ্ঠার ৩য় লাইন)। আগামী সংস্করণে আশা করি এ সব গোলযোগ থাকবে না।

[৯, সাতোন দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মধুচ্ছন্দা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ঃ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মধুচ্ছন্দা 'কাব্যগ্রন্থ' ১৩৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির যে সকল কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি থেকে চুয়ান্নটি কবিতা নির্ব্বাচন করে আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত 'মধুচ্ছন্দা' কবিতাটির নাম থেকে গ্রন্থখানির নামকরণ হয়েছে। প্রকাশকের নিবেদনে উক্ত হয়েছে—"এই গ্রন্থই কবি

প্রতিভার স্বীকৃতি এনে দেয়—কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে ছোট বড় কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রশংসামুখর স্বাক্ষরের মাধ্যমে···।" আলোচ্য গ্রন্থে ভাব ও রূপকে কবি অদ্বয়ভাবে প্রকাশ করেছেন।

তাই বলেছেন—

"বর্ষা মেদুর রাতি কাঁপে মধুছন্দা
ধারা হিন্দোলে নামে রূপালোক নন্দা

বন্ধু

পথিক বধূ জাগিল কি স্বপ্নে ?
করবীতে ফোটে তার কেয়া নিশি গন্ধা"

জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুভূতি, বস্তুর রস রূপের উপলব্ধির যথার্থ প্রকাশ, ভাবের প্রগাঢ়তা, ব্যঞ্জনার অনন্য-সাধারণতা ও ছন্দো-মাধুর্য্য কবিতাগুলির ভিতর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ছন্দে সুরে শব্দ চয়নের মাধ্যমে ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠ ভাবের প্রগাঢ় পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথের ছত্রচ্ছায়াতলে বসে যে কয়েকজন কবি একদা কাব্যভারতীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, গ্রন্থকার তাঁদেরই অন্যতম। 'মধুছন্দায়' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা কবিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। 'সাহিত্য ভবন' ২১নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজবজ (২৪ পরগণা)—মূল্য আড়াই টাকা]

স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প : প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্প সংগ্রহের প্রারম্ভে লিখেছেন—"সংগ্রহ সংকলনে রসিক পাঠক শুধু লেখা ত' নয়, লেখককেও কিছুটা পড়তে চান, আর লেখককে পড়বার, তথা লেখকের ধরা পড়বার পক্ষে তার নিজের নির্ব্বাচনের চেয়ে ভালো আয়না আর নেই।" অর্থাৎ গল্পের উপর গল্প লেখককেও যদি কোনও রসিক পাঠক বুঝতে চায় তাহলে সেই পাঠককে নির্ভর করতে হবে লেখকের স্ব নির্ব্বাচিত সংগ্রহ সংকলনের উপর,—এই কথাই বলতে চেয়েছেন প্রেমেন্দ্রবাবু। একথা সত্য হলে বলতে হবে প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁর পাঠকদের কাছে ধরা পড়েছেন বা দিয়েছেন তাঁর এই সংগ্রহ-সংকলনের মধ্য দিয়ে।

এই নির্ব্বাচিত সংকলনের প্রায় সব কয়টি কাহিনীই বিষাদময়। ট্র্যাজিক গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর কমেডি জাতিও কাহিনী কয়টিও যেন কান্নার সুরে বাঁধা। 'এক অমানুষিক আত্মত্যাগ'এ নীলিমার দুঃখ, 'পোনাঘাট পেরিয়ে'তে চপলার মর্ম্মদাহ, 'পাশাপাশি' গল্পটিতে কাননবালার দারিদ্র্যই পাঠকের হাসি-উন্মুখ মনের উপর যেন চেপে বসেছে পাথরের মতন। মনে হয় গল্প বলতে গিয়ে যেন পাঠকের মনকে অশ্রু সজল করে তোলবার একটা আকর্ষণ পেয়ে বসেছে লেখককে। 'শুধু কেরাণী' কাহিনীতে কেরাণী ছেলেটির স্ত্রীবিয়োগের দুঃখটাকেই রূপ দিয়েছেন বড় করে। 'বৃষ্টি' গল্পে কার দুঃখটা বেশী, লতিকার না প্রতুলের, তা বলা শক্ত। 'নিশাচর' কাহিনীটি একটি খাঁটি ভূতের গল্প; কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক। 'পটভূমিকা'টি কিসের পটভূমিকা এ জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে রেখেই লেখক বিদায় নিয়েছেন।

ট্র্যাজিক-ধর্ম্মী কাহিনী সৃষ্টিতে লেখকের আগ্রহ পাঠকের কাছে ধরা পড়বেই। লেখকের অন্তর মাঝে কি তবে প্রাণখোলা হাস্যরসের স্থান নেই—স্থান নেই আনন্দোজ্জ্বল প্রেমের? বিষাদ বিধুর কাহিনী সৃষ্টির জন্যই কি তাঁর চিত্ত চির উন্মুখ? এই সংকলন পাঠে লেখক সম্বন্ধে পাঠকের এ সংশয় থেকে যাবে ভয় হয়। লেখক লেখেন নিজের রুচি অনুযায়ী এবং সংকলনও করেন নিজের মত অনুযায়ী। তৃতীয় কেউ এর মধ্যে নেই। সেজন্য স্ব লিখিত গল্পের স্ব নির্ব্বাচিত সংকলন সকলশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনে সব সময় সমর্থ হয় না। তা না হলেও, এ ধরণের সংকলনে শ্রেষ্ঠ লেখকের নিজনির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পের স্থান হয় বলে এর সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য্য এবং এরূপ সংকলনকে অভিনন্দিত না করে থাকা যায় না—যুগের সাহিত্যে এর মূল্য রয়েছে যথেষ্ট।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কানু কহে রাই"—২৸০
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অন্ধকারের দেশে"—৩৷০
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "প্রতাপ-আদিত্য" (১৬শ সং)—২৸০
শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থ "ওমর খৈয়াম" (১৫শ সং)—৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিরাজ-বৌ" (২৫শ সং)—২
শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবন-কাহিনী "ঠাকুর মায়ের গল্প" (২য় সং)—১
সুজিতকুমার নাগ প্রণীত উপন্যাস "জীবন-শিল্পী" (২য় সং)—১
শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্পগ্রন্থ "মিলনের পথে"—২৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীমতী মায়া দাস

পূজারিণী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ !

শ্রীসুধীররঞ্জন সেন পঞ্চতীর্থ

"তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ" গীতা ৮।১৪ —শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে জন অনন্যচেতা হইয়া নিত্য আমায় স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ভগবানে নিত্যযুক্ততার এই অপূর্ব ফল—'তস্যাহং সুলভঃ' তার কাছে আমি সুলভ। সাধক, কত তত্ত্বকথা শুনিয়াছ, কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, কত আত্মশুদ্ধি, আত্ম-সমীক্ষা, আত্মবোধের কথা, কিন্তু এমন আশ্বাসের বাণী কোথায়ও কখনও শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক, তবে শোন, মন-প্রাণ শীতল করা মায়ের মুখে এই অপূর্ব মৃতসঞ্জীবনী বাণী 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'! তোমার মর্মে মর্মে এই অমৃত বাণী উদ্ঘোষিত হউক। হে জন্মমৃত্যু-জর্জরিত জীব, সুখ দুঃখ সংক্ষুব্ধ সন্তান, সে বাণীর উদ্ঘোষণে মৃতদেহে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়, শরীর মনে বিদ্যুদ্বিভাস প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, দুঃখসন্তপ্ত বুকে সুখের সায়র নামিয়া আসে, হৃদয়ে প্রবাহিত হয় অমৃতত্বের অনন্ত নির্ঝর—এই সেই নৈরাশ্যনাশী বাণী 'তস্যাহং সুলভঃ'। সাধক, তোমার জীবন এই নূতন আশার নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, আত্মবীর্যে বীর্যবান্ তুমি, তোমার সমগ্র চেতনা দিয়া এই ভগবদ্বাক্যকে সার্থক করিয়া তোল—'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ!' ইহা জ্ঞানের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নহে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের কোন উদ্ভট সিদ্ধান্ত নহে, সিদ্ধিলাভের কোন অদ্ভুত উপায় নহে, যোগের কোন পরম গুহ্য প্রক্রিয়া বা গুপ্ত কৌশল নহে অতি সহজ, সরল, সাধারণ কথা 'সুলভ'। শ্রীভগবান্ বলিলেন, 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ' হে পার্থ, আমি তাহার সুলভ। সত্যই কি তুমি সুলভ? যে তোমাকে ঋষিগণ সূরিগণ বাক্য মনের অতীত বলিয়া, অবাঙ্মনসোগোচর বলিয়া, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই তুমি নিজেই বলিতেছ, আমি সুলভ। সত্যই কি

এমন জীব আছে, এমন জীব এই অনিত্য, অ-সুখ, অচিৎ ধূলিতে রহিয়াছে, এই অজ্ঞান, অন্ধ, মর্ত্যভূমিতে থাকিতে পারে, যার কাছে তুমি সুলভ? সুলভ তুমি যাহাদের কাছে, তাহারা কি আমাদের মতই সুখ-দুঃখ-চঞ্চল জীব, তাহারা কি আমাদের মতই জনম-মরণধর্ম্মী মানব, তাহারা কি আমাদের মত রক্তমাংসে গড়া মানুষ? কে সেই দুর্লভতম সাধক, যাঁর কাছে তুমি এমন অনায়াসলভ্য, সুলভ? বলিয়া দিবে কি ওগো সাধনার ধন, পরশমণি, পুরুষোত্তম, প্রিয়তম আমার, কোন্ সাধনে, কোন্ সৌভাগ্যে, কোন্ পুণ্যে, গহন কর্ম্মের কোন্ শুভ অনুষ্ঠানের ফলে দুর্য্যোগময় মরজীবনে সুলভ হইয়া তুমি উদয় হও? জয় গুরু!

সত্যই আমি সুলভ তাহাদের কাছে, সতত যাহারা অনন্যচিত্ত হয় আমাতে। যাহাদের চিত্তের সকল গতি, সকল প্রবাহ অনন্য হইয়া আমারই দিকে প্রবাহিত হয়, তাহাদের যে আমি একান্তই সুলভ। প্রীতির সাগর আমাতে যাহারা চিত্তের সকল সোহাগ, সকল আদর অর্পণ করে, আত্মারূপে নিজের ভিতরে আমারই স্বরূপ আস্বাদন করে, আবার বিশ্বরূপে আমারই মহিমা, আমারই প্রজ্ঞা, "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" সর্ব্বত্র, সতত সন্দর্শন করে, তাহাদের কাছে আমি যে নিত্যই সুপ্রকট, নিত্যই সুলভ। "অনন্যচেতাঃ সততং"—সাধক, তোমার চিত্ত ঐ যে অনন্ত বৃত্তিপ্রবাহ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ঐ যে ঐরাবতের মত জাহ্নবীর অতল জলে ভাসিয়া যাইতেছে, সে কেন জান? তুমি আমাতে 'অনন্য' হও নাই বলিয়া। কে তোমার ঐ চঞ্চল চিত্তরূপে অনিত্য নৃত্যভঙ্গিমায় এই অস্থির জগৎ সৃষ্টি করিতেছে জান? আমিই। 'চিতিরেব চিরায়েদং চিত্তং চিমচিমায়তে' (যোগবাশিষ্ঠ) চিতিরূপা মহাশক্তিই চিত্তরূপে সকলের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া একদিকে অনন্ত ভ্রাম্যমান জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, তাই চিত্তবৃত্তিই অনন্ত বিষয় আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার সেই চিত্তই অন্যদিকে 'অনন্য' হইয়া নিত্য আত্মায় সংন্যস্ত। একদিকে চলিতেছে অনন্ত বিষয়োপভোগ রচনা, অন্যদিকে সে অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মপূজায় নিত্য বিভোর। সাধক, ইহাই তোমার অন্তরের ছবি, ইহাই তোমার অন্তরের সংস্থিতি এবং এমনিভাবে অনন্যচিত্ত হইয়া আমাতেই স্থিতিলাভ করিতে পারিলে, আমিও তোমার নিকট সুলভ হইব। 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'।

সত্য বটে, আমি অসীম, অনন্ত ও অব্যক্ত—কিন্তু ইহাই আমার সব কথা নহে, ইহাই আমার চরম সার্থকতা নহে—সীমার মধ্যে ধরা দিয়াই সসীম আমি রূপবান্, অসীম আমার সার্থকতা। অসীম আকাশ ক্ষুদ্র আঙ্গিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, তার মধ্যেই নভোনীলিমার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে, আবার ঐ খণ্ড, বিচ্ছিন্ন আকাশই বিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। তোমার ব্যষ্টি জীবন, ক্ষুদ্র জীবন, ক্ষণিক জীবনও তেমনই আমার অসীম, অনন্ত ও বিশ্বজীবনে বিকশিত হইয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া সার্থকতায় পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। তাইত দুর্লভ আমি সুলভ হইয়া আসি, অশেষ আমি, অপরূপ আমি বিশেষ ভাবে তোমাদের কাছে ধরা দেই। ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যেই বিশ্বাতীত আমি বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন শাশ্বত জীবনের সীমা প্রত্যক্ষ করি সৃষ্টি সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাই না চলিতেছে আমার চিরন্তন লীলা। তাইত আমি তোমাদের কাছে সুলভ—'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ।'

সাধক, যদি এমনি করিয়াই সুলভে আমাকে পাইতে চাও, তবে তোমার জীবনের যে দিকেই তাকাও, আঁখি মেলিয়া শুধু আমাকেই দেখ। আমাকেই দেখ—তোমার সুখে কি দুঃখে, দিবসে কি নিশীথে, হাসিতে কি রোদনে, সম্মুখে কি পশ্চাতে, আমাকেই দেখ, তোমার রোগে কি শোকে, আধিতে কি ব্যাধিতে, আহ্লাদে কি আর্ত্তনাদে, আমাকেই দেখ। তোমার জ্ঞানে কি বিস্মরণে, স্বপ্নে কি অবরোধে, চিন্তনে কি ধ্যানে—এমনি করিয়া অনন্যচেতা হইয়া আমাতেই সংন্যস্ত হও। 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'—তোমার কাছে আমিও সুলভ হইব।

সত্যই ভগবান্ সুলভ, সতত সুপ্রকট, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কিরূপে দুর্লভ হইবেন? দুর্লভ আমাদের সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি নয়নসম্পাতেই নয়নানন্দ শ্রীভগবানের রূপসুধাপানে মগ্ন থাকে। শ্রীগুরুদেব (ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব) বলেন,—

একবার আঁখিপাতেই যারা অখিল আনন্দ শ্রীভগবানের নয়নলোভন, মনোরম রূপ না দেখে, সহস্র নয়ন পাইলেও

তাহারা অন্ধই থাকে। তাই দুর্লভ আমরা, আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাহি না বা দেখি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্॥" চৈ, চঃ

হায়! কৃষ্ণকে না দেখিয়া আমাদের নেত্র বিফল হইতেছে, স্বয়মাগত সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা ভাগ্যহীন হইয়াছি, সুলভ ভগবান আমাদের কাছে দুর্লভ হইয়াছেন। ওরে, ধন রত্ন ও সমুদয় প্রাপ্তির জন্য যতটা চেষ্টা, যতটা সাধনার প্রয়োজন, ভগবানকে পাইতে গেলেও ততটা প্রয়াসেরও প্রয়োজন হয় না—তিনি যে এত সহজ, এত সুলভ, এত সুপ্রকট। সাধক, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ সচ্চিদানন্দময়ী মা আমার সর্বত্র বিরাজমানা—যতই ক্ষুদ্রত্ব, যতই নানাত্ব ও বহুত্ব লইয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করুন না কেন, তাঁর অভয়া মূর্তিরও কখনও ব্যত্যয় হয় না—আনন্দ ত নিত্য অক্ষুণ্ণই থাকে। "ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত-মূর্তিনা" (গীতা) অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া একমাত্র মা-ই যে রহিয়াছেন তুমি তাকে দেখ অনন্যচিত্ত হইয়া অন্তরে ও বাহিরে। 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ!' সেই তোমার আমি সুলভ হইব। আমাকে পাইবার জন্য তোমার কোনরূপ নূতন আয়োজন, নূতন আড়ম্বরের প্রয়োজন হইবে না। যে যেখানে আছ, যেমন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার জীবনধারা চলিতেছে, ঠিক সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই তুমি আমাকে পাইতে পার—অবশ্য যদি সত্য সত্যই চাও। শ্রীগুরুদেব বলেন, "আরে সূর্য্য দেখিবার জন্য কি কেহ লণ্ঠন হাতে করিয়া ছোটে? তিনি নিজেই যে স্বপ্রকাশ। সকল বস্তু যে তাঁরই প্রকাশে প্রকাশময় "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্" তাঁকে দেখতে আবার নূতন আয়োজন কি করিবে? আগে তাঁকে দেখ।" উপনিষদের ঋষি কিন্তু এমনিভাবেই যাহা দেখিতেন, ভগবদ্ভাবে গ্রহণ করিতেন, আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইতেন, তাঁহারা জল দেখিয়া বলিতেন, "আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্দ্ধে দধাতন, মহেরণায় চক্ষসে"। অগ্নি দেখিয়া বলিতেন, "অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈ রজরো দহ" (সামবেদ) বায়ু স্পর্শে বলিতেন, "শং নো বাতঃ পবতাং শং ন স্তপতু সূর্য্যঃ।" ভূমি দেখিয়া সরলপ্রাণ শিশুর মত প্রার্থনা জানাইতেন,—

"যস্তে গন্ধঃ পৃথিবী সংবভূব
যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ
তেন মাং সুরভি কৃণু॥" বেদ

—'হে পৃথিবী, যে গন্ধ তোমার মধ্যে সমুদ্ভূত, তোমার ওষধি, তোমার জল যে গন্ধকে ধারণ করে, তোমার যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে সমাবিষ্ট, তাহা দ্বারা তুমি আমাকে সুরভিত কর।' "সা নো ভূমি বিসৃজতাং মতো পুত্রায় মে পয়ঃ" পুত্রের জন্য মায়ের দুগ্ধধারার মত পৃথিবীর স্নেহধারা আমার জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। "নিত্যের যা জগন্মূর্তিঃ" তাই জগন্মূর্তি মাকে আমার প্রত্যক্ষ কর, মিথ্যা মোহ কালিমা অপনীত করিয়া অনন্যচিত্ত তুমি "এ জগৎ মহা সত্য" এই অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ কর, "সত্যস্য সত্যং" আমি সত্যই তোমার কাছে সুলভ হইব—"তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ।"

সত্যই আমি সুলভ তাহার কাছে, চিত্ত যাহার নিত্যকাল নিত্যস্বরূপ 'ঋত' সত্য' আমাতেই সতত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আমিই যে "নিত্যো নিত্যানন্দ চেতনশ্চেতনানা-মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্"—(শ্বেতাশ্বতর) নিত্যের নিত্যতা সম্পাদক, চেতনেরও চৈতন্যদায়ক। আবার আমি এক হইয়াও বহুর ভোগবিধান করিয়া থাকি। সুধু কি তাই, এই যে সত্যানৃত জগৎ এ যে ঋত—আমারই অনৃত প্রকাশ, নিত্য আমারই অনৃত রূপ, ভূতাত্মা আমারই ভূতমূর্তি! ওরে ঋতের কাঙ্গাল, সত্যের কাঙ্গাল, সুখের কাঙ্গাল জীব, আমার বলিয়া, চিন্ময় বলিয়া, আত্মময় বলিয়া ঐ অনাত্মে দেখ আত্মাকে, অ-সুখে দেখ সুখকে, অনিত্যে দেখ নিত্যকে। এমনি করিয়া নিত্য আমাতে যুক্ত হও, তোমার আমি সুলভ হইব। "যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ" নিরন্তর যে জন আমার স্মরণ করে, সতত এবং সর্বত্র আত্মদর্শনের অনুশীলন করে, সে-ই কেবল আমার এই নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। সাধক, যদি যোগলাভ করিতে চাও, আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া যদি নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে

এই অভ্যাসের পথেই তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (পাতঞ্জল যোগদর্শন) তাহাতে থাকিবার, আত্মাতে বিচরণ করিবার, ব্রহ্মে বিহার করিবার প্রচেষ্টার নাম অভ্যাস। যোগবাশিষ্ঠ বলেন,—

"পৌনঃ পুণ্যেন করণ অভ্যাস ইতি কথ্যতে।
পুরুষার্থঃ স এবেহ তেনাস্তি ন বিনা গতিঃ ॥"

—যো, বা

—পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুশীলনের নামই অভ্যাস। ইহাই পুরুষার্থ এবং ইহা বিনা আর অন্য গতি নাই। সাধক, জগদ্‌ভোগে অভ্যস্ত তোমার মন এই অভ্যাসে, এই "ব্রাহ্মী স্থিতি"র পথে বহুবিধ অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, বার বার তোমাকে এই অচিৎ ধূলায় টানিয়া লইয়া আসিবে, কিন্তু মনের প্রতারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া, তুমি বার বার বলিবে "অয়মেব স ইদমমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বং স্বাহা" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" "বাসুদেবঃ সর্ব্বং"—পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রযত্নের ফলে তুমি "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"-কেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা অতি দুরূহ নহে, সুধু প্রবল আগ্রহ-সাপেক্ষ। এমনি করিয়া সত্যই কি সুলভ আমাকে তুমি পাইতে চাহ না? 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ!'

সত্যই আমাকে পাওয়া, অচ্যুতকে প্রীত করা মোটেই আয়াসসাধ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো
বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং
সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥"

—ভাগবত

তাঁহাকে পাওয়া আয়াসসাধ্য হইবে কেন? তিনি যে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াই আছেন, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁকে দেখ, তাঁর অনুস্মরণ কর। "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" সুতরাং সর্ব্বকালে তুমি আমারই অনুস্মরণ কর এবং এমনিভাবে দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, সতত আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ততার সাধন করিলে, তুমি দেখিবে তোমার কাছেও আমি সুলভ হইয়া গিয়াছি, 'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ।' সাধক, সামবেদের ঋষির সুরে তুমিও তাই তোমার অন্তরের নিত্য জাগ্রত প্রার্থনা এবং সতত তাহার সান্নিধ্য নিত্য প্রত্যক্ষ কর।

"উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥"—সামবেদ

—হে দ্যোতনশীল দিব্য অগ্নি, আমরা দিনে দিনে, দিবসে নিশীথে, অহোরাত্রি ধী-দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এবং আমাদের প্রতিদিনের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও কর্ম্ম দ্বারা তোমাকেই প্রাপ্ত হইতেছি। তোমায় নমস্কার। তুমি এমনিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র কর্ম্মের ভিতর দিয়া নিত্য সন্নিহিত ও প্রত্যক্ষ হও, তুমি আমাদের সুলভ হও এবং আমরাও তোমার সুলভ হই—"তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥"

দুঃখের ফসল

শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ

— ১ —

বাবুরা অফিসে-আদালতে কাজ করে' যে ভাত খায় সেটাই শুধু পরিশ্রমের ভাত নয়। ভিখারীরা ভিক্ষা করে যা' খায় তাও কম পরিশ্রমের নয়,—বিশেষ করে' কেষ্টর।

জমা নেই পুঁজি নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা' মেলে, দিনান্তেই তা' একবারের খাওয়ায় শেষ। কোনদিন আধপেটা, কোনদিন বা ভরপেট। কিন্তু তা'ও যেন আর পারছে না কেষ্ট। যে পা' দু'খানি তা'র একমাত্র সম্বল, তা'ই হ'য়েছে তা'র পথ চলার প্রধান অন্তরায়।

কেষ্টর শরীরের শুধু ওপরের অংশ দেখ্‌লে তা'কে কেউ ভিক্ষা দিতে চায় না। অনেক বাড়ীতে তাই তা'কে অনেক বিদ্রূপ কথা শুনতে হ'য়েছে। বাড়ীর কর্তা অথবা গৃহিণী মুখ করেছে, তুমি কেন ভিক্ষা করে' আর একটী সত্যিকারের ভিক্ষুকের চাল কেড়ে নেও? কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই তা'র মতের পরিবর্তন হ'য়েছে যখন কেষ্টকে দেখেছে আপাদমস্তক!

সত্যি বেমানান এবং বি-সদৃশ এই কেষ্টর চেহারাটা। ওপরের অংশ সরল স্বাস্থ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু মাজার নীচের অংশ যেন ওরই নয়। যেন ভুলে জোড়া লাগান হ'য়েছে ওকে। মাজাটা এক্কেবারে মরা, মরা পা' দুখানা। হাঁটে যখন হাঁটু দুটী একসঙ্গে লেগে যেতে চায়। লিক্‌লিকে সরু পা' দু'খানির ওপর তা'র চওড়া বুকখানা কাঁপতে কাঁপতে নুইয়ে পড়ে সাম্‌নের দিকে। কেষ্ট অম্‌নি তাড়াতাড়ি হাতের লাঠিখানা সাম্‌নে ফেলে সাম্‌লে নেয় নিজেকে।

সেদিন কেষ্টর পরিশ্রমটা একটু বেশী হ'ল। তাড়াতাড়ি শেষ করল ভিক্ষা করা। শরীরের সব রক্তটুকু এর আগে ঘাম হ'য়ে ঝরে পড়েছে কপাল বেয়ে। অবসন্ন দেহটা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে ঠিক মরার মতো! দোশর কেউ নেই যে অবসন্ন দেহে হাত বুলিয়ে অবসাদ দেবে কাটিয়ে, মনের চোখের সাম্‌নে তুলে ধরবে জীবনের আশা! ফুটপাতের জীবন—মানুষের পায়ে চলা পথেই হ'য়ে যাবে শেষ! মাথার ওপরে চাল নেই—আছে কয়েকটা গাছ। গাছের ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায় মিশে তৈরী ক'রে দিয়েছে ওদেরই আশ্রয়ের জন্য মন্দির। ঐ মন্দিরের ঠাকুর তো ওরাই। দরিদ্র নারায়ণ!!

ভিক্ষা শেষ ক'রে সব ভিখারীরা তখনও ফিরে আসেনি। দু'একজন করে আসতে সুরু ক'রেছে সবে। যা'রা এসেছে রাধি তাদের মধ্যে একজন। থলে থেকে চালটা ঢেলে রাখল একখানা ছেঁড়া কাপড়ে। বাছতে হবে। না বেছে খাওয়ার উপায় নেই।

ভাতের হাঁড়িটা ধুয়ে রাধি জল আনতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল কেষ্টকে। মরার মতো পড়ে রয়েছে কেষ্ট। কাছে গিয়ে রাধি বল্ল, কোন নিত্য বাড়ীর গন্ধ পাইছ নাকি?

চোখ বুজে ছিল কেষ্ট। রাধির কথা কানে গেলে পর চোখ দু'টী খুলে গেল তা'র। বল্ল—নারে।

—তয় অমন কইরা শুইয়া রইছো ক্যান?

—গাও বিষ্-বিষ্ করছে। রান্ধতে ইচ্ছা করছি না।

—কি খাবাহানে?

—খামু না।

মুখেই কেষ্ট বল্ল খামু না, কিন্তু তা'র চোখ দু'টীতে পেটের ক্ষুধা জ্বলে উঠ্‌ল।

রাধি বুঝল কেষ্টর মনের ভাষা। ভিখারিণী সে—তবুও তো দয়ামায়ায় ভর্ত্তি হৃদয় বাংলার নারীদের মধ্যে সেও একজন। শুধু ভাগ্য বিপর্যায়ে আজ তা'র এ অবস্থা। নয়তো নারীর স্বাভাবিক কোমলতা রাধির অন্তর থেকে তখনও রাধির ভিখারিণী জীবন মুছে দিতে পারেনি।

নিজের ডান হাতখানার দিকে একবার তাকাল রাধি। তাকিয়ে ও যেন ওর হাতখানাই দেখল না—ক্ষণিকের মধ্যে দেখ্‌ল ওর ছেড়ে-আসা বাড়ীখানা পর্য্যন্ত। ঐ হাতে কতোদিন কতো ক্ষেত মজুরের ভাত রান্না করেছে। সুখ্যাতি পেয়েছে কতো!

এক ভাত রান্নার কথায় আরও কতো কথা মনে উঠল রাধির। চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল সেই সব দৃশ্যগুলো! পাকিস্থান পেয়ে মুসলমানদের সে কি আনন্দ! গোটা পূব বাংলা পূব পাকিস্থান। রাতারাতি হিন্দুরা হ'য়ে গেল বান্দা! তা'দের মান, ইজ্জত, সবই ওদের মর্জ্জির ওপর।

একটা মুসলমান গ্রামের লাগোয়া ছিল ওদের বাড়ী। স্বামী দুখীরাম মণ্ডল জমির চাষী। চাষ-বাস করত মুসলমানদের সঙ্গেই। কয়েক দিন যাবৎ জানা চেনা আহম্মদ, দিলির আর আমিন্নর খুব ঘোরাফেরা করছিল ওদের বাড়ীকে কেন্দ্র করে। খড়ের পালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত সময় অসময়। শিষ দিত রাধাকে দেখে। দুখীরাম দেখেছে সব—বুঝেছেও সব। একদিন তাই নিরুপায় হ'য়ে দুখীরাম গ্রামের মাতব্বর বড়মিঞাকে বল্ল, চাচা! এহানে থাক্‌তে ক্যামন জানি ডর করে। কি করুম কও তো?

কথাটা শুনে বড়মিঞা হেসে বল্ল, পাকিস্থান ভেস্ত। ডর কিসের রে বেটা!

দুখীরাম তখন কথাটা খুলেই বল্ল বড়মিঞার কাছে। শুনে বড়মিঞা জিবে কামড় দিল। রাগে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে বল্ল, কস্‌ কি দুখী! মুই জ্যাতা থাক্‌তেই! হে আল্লা! আচমানের তলে দেহি চিড়াখানা বানাইছো! পরক্ষণেই মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'ল বড়মিঞার। বার্দ্ধক্যের চিহ্ন কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলো আর মুখের পাকা দাড়ি রাগে সিংহের কেশরের মতো উঠল ফুলে। গর্জ্জন করে উঠল আবার,—এত্‌ফর্‌ সাহস ঐ দিলিরের! এমুন গুনা হরবে ঐ হারামজাদা আমিন্নর? আইচ্ছা, তুই ডর করিস্‌ না দুখী! অরা বুঝি মনে করছে মুই বুড়া হইছি?—তা' হই নাই। ত্যাল খাইয়া খাইয়া বুড়া হইছে মোর লাডিহানও। একবার সেই বুড়া লাডির মাথায় পাইলে হয় অগো মাথা—তহন জানাইয়া দিমু।

কিন্তু বড়মিঞার লাঠি ওদের মাথা পেল না। যা' হওয়ার তা' হ'য়ে গেল সেদিন রাতেই। সন্ধ্যার পর—রাতের অন্ধকারে। প্রথম আক্রমণই দুখীরামের বাড়ী, —লক্ষ্য রাধি।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে তখন বিশ্বযুদ্ধ। দুখীরাম একাই একশ'! রাধিকে রক্ষা করতে গায়ে তা'র কতো জোর! চোখের পলকে ধারাল দাথানা বসিয়ে দিল দু'জনকে। কিন্তু একা আর কতো পারে! দম ফুরিয়ে গেল দুখীরামের। তারপরেই ও-যুদ্ধের শেষ। দুখীরামের দায়ের ধার পরীক্ষা হ'ল শেষ পর্য্যন্ত তা'র গায়েই। ঘরের কাঁচা মেঝে তখন তাজা খুনের স্রোত, রাধির কপালের সিঁদুর ধোয়া জলের ধারা!

তখন থেকেই দুঃখের পথে রাধির জীবনযাত্রা। কয়েক মাসের মধ্যেও সূর্য্যের মুখ দেখেনি সে। চারদিকে কড়া পাহারা থাকায় আত্মহত্যার সুযোগও পায়নি কোনদিন।

দাঙ্গা তখনও চলছে। ওরা দল বেধে বেরিয়ে যায় আরও শিকারের আশায়। পাহারায় পড়ে একটু শিথিল-ভাব। রাধির চোখের জল তখন জমা হচ্ছিল সে-বাড়ীর এক বুড়ির পায়ে। দয়া হ'ল তা'র। তা'র দয়াতেই মুক্তি। হাতে কাচের চুড়ি—পরণে আট হাতী জোলার শাড়ী। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল রাধি নয়—যেন এক মুসলমান রমণী!

পথে পা' দিয়ে পথ চেনে না রাধি। আশপাশের গ্রামগুলো তা'র অচেনা। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা'কে। ওখান থেকে তা'দের বাড়ী সোনাকান্দি কতো দূরে? রাধির তখন মাথা ঠিক নেই। সোনাকান্দিতেই বা সে যেতে চাইছে কেন? সোনাকান্দির সোনাই তো নেই। তবে আর কেন—কিসের জন্য সেখানে!—এক বিপদ থেকে এসে পড়ল আরেক বিপদে। যাবে কোথায়? বাপের বাড়ীতে বাবা নেই, মা নেই—নেই একটা ভাই পর্য্যন্ত। স্বামীর ভিটায় প্রদীপ জ্বলছে না। দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন যা'রা আছে তা'দের কাছে এ-পোড়ামুখ নিয়ে কিছুতেই যাবে না সে। হাঁটছে আর এমন সব ভাবছে রাধি। হাঁটল খুব বড় রাস্তা ধরে। সন্ধ্যানাগাদ এসে পৌছাল বরিশাল সহরে। সেখান থেকে স্পেশাল ষ্টীমারে কলকাতা।

শিয়ালদা এসে রাধি দেখে জনসমুদ্র। অপরিচিত

জায়গা। কেউ নেই জানা-চেনা। যাবে কোথায়? অসহায়া সে! কিন্তু সব গিয়েও পেটের ক্ষুধা যায়নি। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে তখন। নিরুপায় রাধির সাম্‌নে তখন ভিক্ষার পথই খোলা। বেঁচে রইল দশ দুয়ারে ভিক্ষা করেই।

রাধি ভেবেছিল একটা পেট কোন রকমে চলে যাবেই। কিন্তু কিছুদিন পর সে বুঝতে পারল—সে একা নয় পেটে তার পাকিস্থানের বিষ। তখনও খালাস হ'তে অনেকমাস বাকী।

হাঁড়ি হাতে কেষ্টর সাম্‌নে দাঁড়ান অবস্থায় ছায়াছবির মতো এ দুঃখময় চিত্রখানি রাধির চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল। যদিও সে ভিখারিণী তবুও অন্য ভিখারিণীদের কাছে তা'র লজ্জা আছে বৈকি! ওদের নিয়েই তো তা'র সমাজ। নিজের দিকে একবার তাকাল সে। তখনও তা'কে দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না,—ঢাকা দেওয়ার সময় আছে তবে। চট্‌ করে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে কেষ্টকে বল্ল, আমার মনে কয় তোমার খিদা আছে।

—তা' তো আছেই।

—তয় প্যাটে ক্ষিদা মুখে লাজ ক্যান। দেও দেহি তোমার চাউলের থইলাডা। আমার চাউল যদি বেক্ষায় নয় হেই সাথে তোমারও হবে।

মনে মনে ভারী খুশী হ'ল কেষ্ট। শোয়া থেকে উঠে চালের থলেটা তুলে দিল রাধির হাতে।

থলের তলায় অল্প কয়েকটা চাল। হাতে নিয়ে রাধি বল্ল, ওমা! এ দেহি খালি থইল্যা! এই কয়ডা চাউলে তোমার হবে নাকি?

—যা' হয়। আমায় অল্প কইরা দিস্‌। বেশী কইরা জল খামুহানে।

থলেটা হাতে নিয়ে রাধি চলে গেল আপন কাজে—রান্না করতে। রান্না আর কি! পাঁচ মেশালী চাল ডালের মধ্যে ফেলে দিল কয়েকটী পচা আলু আর কয়েকটি পেঁয়াজ। পেঁয়াজের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ভিখারীপাড়ার আকাশে।

এলমুনিয়ামের থালাখানাতে রাধি আগেই খেতে দিল কেষ্টকে। এক থালা ভর্ত্তি খিচুড়ী—মাঝে মাঝে উঁচান আলুর মাথা। কেষ্ট থালাখানাকে নিজের সাম্‌নে টেনে নিয়ে বল্ল, আমি তো ভিক্ষায় পাইছিলাম এতডুন চাউল!—আমারে তয় এত ভাত দিলি ক্যান?

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল রাধি, আইজ আমি অনেক চাউল পাইছিলাম।

মিথ্যা কস্‌ না তো? হাড়িডা-দেহি।

হাড়ি থেকে সব ভাত নিজের থালায় ঢেলে রাধি বল্ল, এই দ্যাহো কতো! আমি খাইয়াও ছাড়াইতে পারুম না।

গোগ্রাসে সব খেয়ে থালাখানা পরিষ্কার করে ফেল্ল কেষ্ট। বেশ লাগছিল তা'র খেতে। শুধু ক্ষুধার জ্বালায় নয় আরও অনেক কারণে। নিজের মরুজীবনে এমন আস্বাদ সে কোনদিনই পায়নি।

সারাদিন পরিশ্রমের পর শুইয়ে ঘুমিয়ে পড়ত কেষ্ট। কিন্তু সেদিন হ'ল ব্যতিক্রম। ঘুমাতে পারল না সেদিন রাতে। রাধির যত্নে মনে নাড়া দিয়েছে তার। রান্নাভাত খেয়েছে সে। চিন্তা করল কতো কি! ভিখারী সে, চিন্তা করল লাখ টাকার!

পরের দিন সকালবেলা ভিক্ষায় বেরোবার আগে কেষ্ট রাধিকে ডেকে অনুনয়ের সুরে বল্ল, রাধি! আইজও কাইলকের মতন রান্ধবি?

ক্যান আইজও কি তোমার গাও কিষ করা গেল না?

নারে যায় নাই। মাইরি! আইজ আরও বেশী।

মিথ্যা কথা কইতে আছো তুমি!—মনের কথা খুইল্যা কও—রান্ধাভাত খাইয়া তোমার বুঝি খুব জুইৎ লাগছে?

হেসে দিয়ে কেষ্ট বল্ল, যদি কিছু মনে না করোস্‌ তোরে এট্টা কথা কইতাম রাধি।

কইতে পারো।

—তুই চাউল ভিক্ষায় যা আর আমি যাই বাজারে। আলু পিয়াইজের দোকান দুই এট্টা পচা-ঠচা পামুই। দুইজনের ভালো চইল্যা যাবে। কি কস্‌?

উত্তরের আশায় রাধির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেষ্ট। রাধি তখন নীরব। দু'জনের চোখেই তখন হয়তো ভবিষ্যতের একখানি চিত্র!—দালান-কোঠায় বাস করে' কালিয়া-কোর্ম্মা খাওয়ার নয়। শুধু নিজেদিগকে একে অপরের হ'য়ে এ-পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একখানি আশা। ভাতের সঙ্গে পচা আলু আর কাণা বেগুনের একটু তরকারি! অগণিত লোকের পায়ে-চলা

পথের মাঝে দু'জনে মিলে থাকার জন্য একটু অবহেলিত কোন্।

একটু হেসে রাধি বল্ল, আইচ্ছা।

রাধির মুখ থেকে এই ছোট্ট 'আচ্ছা' কথাটী যেন ভিখারী কেষ্টর হাতে স্বর্গ এনে দিল। খুশীতে ভরে উঠল তা'র মন। তা'র প্রশস্ত বুকখানিতে তখন আনন্দের ঢেউ। কিন্তু মুখে মুখ। স্নান করতে লাগল ভাব-সাগরে।

—তোমার কথা যেমন আমি রাখলাম আমার এট্টা কথাও তোমার রাখতে হবে।

নিচ্চয় রাধি, নিচ্চয়। এট্টা ক্যান তোর সব কথা আমি রাখুম। ক'দেহি কি কথা?

তেমন কিছু না। যা' কমু তা' আমাগো ভালোর জন্যেই। কাইল বেয়ানবেলা চল এহান থিকা আমরা গইড়া যাই। ওহানে নাকি চাউল সস্তা। ভালো ভিক্ষা মেলবে।

—এ তো ভালো কথা রাধি। তাছাড়া তুই যা' ভালো বুঝবি আমি তাইতেই রাজী।

কালীঘাট থেকে গ'ড়ে। পথ কম নয়। কিন্তু কেষ্টর পায়ে তখন নূতন জোর। মনের আনন্দে পথ শেষ হ'য়ে গেল তাড়াতাড়ি! বাসা বাঁধল ওখানে—গ'ড়ে হ'ল বৃন্দাবন। কলিতে দ্বাপর! কদম ওখানে বনে বনে ফোটে না—আছে শুধু বাঁশ ঝাড়। প্রবাহিত যমনার কলসঙ্গীত ওখানে নেই,—আছে মরা গঙ্গার শীর্ণধারা!

পূব পাকিস্থানের উদ্বাস্তু অধ্যুসিত অঞ্চল ওটী। রাধির হ'ল সুবিধা। মুখে তা'র ওখানকার অনেকের মতোই পূব বাংলার গেঁয়ো ভাষা—সহানুভূতিটা পেয়েছে হয়তো সেজন্য আরও বেশী।

সেদিন রাধির ভিক্ষাপাত্র ভরা দেখে কেষ্ট খুশী হ'য়ে বল্ল, এই ত্যাখ্ রাধি! আইজ আমিও কতো কি পাইছি! গেছিলাম গইড়ার হাটে। পেল্লায় ব্যাপার! কতো দোকানী—মেলা আনাজ। চাষী ভাইরা ভালো মাইনসের পো!

এমন করে দিনগুলো কেটে যেতে লাগল বেশ। কয়েকমাস পরে রাধি হয়ে পড়ল অচল। দুয়ারে দুয়ারে যেতে অসুবিধা হ'ল তা'র। তা' লক্ষ্য ক'রে কেষ্ট বল্ল, তোর আর বাইর হইয়া কাজ নাই রাধি। আমি যা' পাই তাই দিয়াই চালামু। তুই খালি বইস্যা থাক্। আমি রাইন্ধা খাওয়ামু তোরে।

তুমি পারবা না। পুরুষ মানুষ—হাতই পোড়াইয়া ফ্যালাবা।

পারুম পারুম,—বলে কেষ্ট। তুই আমার জন্যে এতো করোস্ আর আমি তোর জন্যে পারুম না ক্যান। এই জন্যেই তো মিলামিশ্যা থাকা।

কিন্তু রাধি কেষ্টার কথা শোনেনি। কেষ্ট বেরিয়ে গেলে পর সেও বেরিয়ে পড়েছে। যা' পায়। কয়েকদিনে পেয়েছেও কয়েক সের চাল। রাধির কাছে তখন তাই যথেষ্ট। কেষ্টকে না জানিয়ে রেখেছে দুর্দ্দিনের জন্য। কিন্তু সেদিন বেরোলে পড়ত ধরা সেদিন বেরোয়নি রাধি। বেরোতে পারেনি। কেষ্ট বেরিয়ে যাওয়ার পরই সে পেয়েছিল পাপমুক্তির ইঙ্গিত।

শীত গ্রীষ্ম ভিখারীদের গা' সহা। তবুও সেদিনের শীতটা বেশ কাবু করে ফেল্ল কেষ্টকে। তাড়াতাড়ি ফিরল ভিক্ষা থেকে। ফেরার পথে বুড়ি ভিখারিণী ক্ষিরোদার সঙ্গে তা'র দেখা। এক গাল হেসে ক্ষিরোদা বল্ল, আরে জল্‌দি জল্‌দি যাও কেষ্ট! ছাওয়ালের বাপ হইছো। আমাগো খাওয়াবা তো?

ক্ষিরোদার মুখের হাসি বিদ্যুৎগতিতে এলো কেষ্টর মুখে—বল্ল, খাওয়াম বুড়িদি! নিচ্চয় খাওয়াম। তা' রাধি ভালো আছে তো?

হ ভালো আছে। কিন্তু শোনো, রাধিরে ভাত দিও না। যদি খাইতেই চায় তয় রুডি কইরা দিও। আমি আড়া দিয়া আইছি।

বাকীপথটুকু কেষ্ট হাটল না—দৌড়াল। কাছে এসে থাকল দূরে—দাঁড়াল গাছের আড়ালে ছেলে কোলে রাধিকে দেখতে। একটা কৌতুহল!!

কিন্তু রাধি তখন কেষ্টর কল্পনা-চোখের সে-রাধি নয়। সে তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য হিংস্র বাঘিনী। বাগে পেয়েছে ওকে—ঐ রক্তের দলাটাকে। মেরে ফেলবে ওকেই। গলা টিপে ওর পাকিস্থানের বিষাক্ত প্রাণবায়ুকে মিশিয়ে দেবে সীমাহীন অম্বরে। রাধির চোখে প্রজ্জলিত বহ্নিশিখা! হাতখানা এগিয়ে দিল শিশুটীর গলার ওপর।

কিন্তু পারল না—রক্তের দলার কাছেই পরাজয় হ'ল তা'র। হাতখানা আনল ফিরিয়ে।

রাধি তখন তাকিয়ে রইল ছেলেটার মুখের দিকে—মারবে না রাখবে? কিছুই ঠিক করতে পারছে না রাধি। পরক্ষণেই আবার গর্জ্জন করে উঠ্‌ল মনে মনে—না না আর দেরী করা যায় না।—কা'র ওপর মায়া? কিসের মাতৃত্ব? মনের সবটুকু জোর আনল হাতে। কাল-বৈশাখীর মুখে পাতার মতো রাধির হাতখানা কাঁপছে তর্ তর্ করে। তা' কাঁপুক—সে প্রস্তুত।

কিন্তু পারল না এবারেও। শিশুটা কেঁদে উঠল ওঙা—ওঙা!

বিবেকে লাগল রাধির।—ঐ তো—বুঝি শিশুর প্রথম অস্ফুট মা-মা ডাক! ওর কি দোষ? ভুরু কুঞ্চিত ক'রে রাধি তখন ঐ কচি শিশুর কচি মুখখানিতে খুঁজতে লাগল কা'কে। কিন্তু কই! কা'কেও তো দেখতে পাচ্ছে না! শিশুটা তখন আবার কেঁদে উঠল,—ওঙা—ওঙা!

আঁত্‌কে উঠল রাধি! কলঙ্ক মুছতে পারছে না সে। বারে বারেই বাধা। তবে কি তা'র মনের গোপন ইচ্ছা ঐ কচি শিশুটা বুঝতে পারছে না? তাকাল সামনে। চেয়ে দেখে জোয়ারে গঙ্গার বুকখানি তখন কাণায় কাণায় ভরা। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হ'ল রাধির। যে জোয়ারে সে ছেলেকে দেবে ভাসিয়ে সে-জোয়ারেই তা'র বুকে এনে দিল আরেকটা জোয়ার। এক বেদনায় যা'কে দিয়েছে মুক্তি, তখন তার জন্যই আরেকটা বেদনার পদধ্বনি শুন্‌তে পেল নিজের অন্তরে।

রাধির ও-অবস্থা দেখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না কেষ্ট। ছুটে এসে বল্ল, তোর মাথায় কি বাই চাপ্‌ছে? কচি ছাওয়ালডার গলার ওপর তুই ফিরা ফিরা হাত দিতে আছিলি ক্যান?

কেষ্টর কথায় সম্বিত ফিরে এলো রাধির। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, লজ্জায় আনত চোখ দু'টী কেষ্টর দিকে তুলে ধরে বল্ল, তুমি আবার কি কইতে আছো! আমি অর গলার উপর ফিরা ফিরা হাত দিমু ক্যান? হাঝের আন্ধারে তুমি কোথার থিকা দেখলা কেডা জানে?

আর কথা বাড়াল না কেষ্ট। চল্ল রান্নার কাজে। 'রাধিরে রুটি দিতে হবে তা'কে'—ক্ষিরোদার কথাটা মনে আছে তা'র। রুটীই তৈরী করতে বসল সে আগে।

রাতের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। নীলাম্বর তারার চুম্‌কি। সাদা মস্‌লিনে ঢাকা চারিধার। প্রকৃতির কোলে বসা রাধি,—রাধির কোলে নবজাত শিশু। রুটী তৈরী করতে করতে কেষ্ট মাঝে মাঝে দেখছে আর ভাবছে—তা'র হাতে যেন চাঁদের মেলা! এক চাঁদ আকাশে। এক চাঁদ ঐ রাধির কোলে, আর সেও চাটুতে স্যেক্‌ছে যেন রুটী নয়—এপিট-ওপিঠ করছে চাঁদকেই। বেশ লাগছিল কেষ্টর।

কিন্তু হাড়ভাঙ্গা শীত সে! এমন শীত এবছর আর পড়েনি। আকাশ থেকে যেন বরফ ঝরছে। সন্ধ্যাতেই এমন—বেশী রাতে না-জানি কী শীতটাই নামবে। কি হবে তখন ছেলেটাকে নিয়ে—কি ভাবে গরমে রাখা হবে তাকে? চিন্তায় পড়ল কেষ্ট। এই চিন্তায় যা'তে না পড়তে হয় সেজন্য ভিক্ষার সময় কেষ্ট কখন বাড়িতে তা'দের বাড়ীর ছোট শিশুর ফেলে-রাখা ছেঁড়া গরম জামা চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি। কেউ দয়া করেনি। তা'দের দয়া হয়নি বলে ছেলেটা হয়তো এত শীত সহ্য করতে না পেরে মরেই যাবে।—সময় লাগল কেষ্টর! প্রায় পাগল হ'য়ে গেল সে!—একটা গরম জামার অভাবে একটা প্রাণ নষ্ট হ'য়ে যাবে?

এমন কথা ভাবতে ভাবতে কেষ্ট নিজের অলক্ষ্যে আর একবার তাকাল ছেলের দিকে। নবজাত শিশু তখন আর পথে শুয়ে নয়। সে তখন স্থান পেয়েছে নিরাপদ আশ্রয়—রাধির নিরাবরণ বুকের গরমে। ভিখারিণী রাধি শীতের রাতে ছেলেকে এর চেয়ে দামী গরম পোষাক আর কীইবা দিতে পারে?

অন্ধজনে দেহ আলো

শমু

মুখে যার ভাষা নেই, কানে যে শুনতে পায় না এবং চোখও যার দৃষ্টিহীন, সাধারণতঃ এমন মানুষের কথা কে বা চিন্তা করে? অমন মানুষ যদি বা কখনও কাহারও দৃষ্টিপথে আসে, 'আহা বেচারী' বলে তার বর্ত্তমান ও ভূত-ভবিষ্যৎকে 'কপালের লেখন' বা 'ভগবানের অভিশাপ' ইত্যাদি যুক্তির কাঠামোতে বিচার করবার চেষ্টা হয়। সমাজজীবনে তার স্বাভাবিক স্থান হতে চায় না। সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো পূর্ণজীবন বিকাশপথে থাকে তার অনেক বাধা। অপরের দয়া ও করুণায় তাকে বাঁচতে হয়। জীবনের প্রতিপদে পরনির্ভরশীলতাই তার একমাত্র ভরসা। সারা জীবন

হেলেন কেলার

অপরের করুণা ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকবার তার সার্থকতা কি? সে কি স্বাবলম্বী হতে পারে না? সকল সাধারণ মানুষের যত কিছু গুণাগুণ, জ্ঞান, শিক্ষা বা কর্মবৃত্তির উপর তার কি কোন অধিকারই নেই? এর উত্তর মেলে শ্রীমতী হেলেন কেলারের জীবনে। অপরের দয়া ও করুণায় বেঁচে থাকবার এক জীবন্ত প্রতিবাদ শ্রীমতী হেলেন কেলার। এই বিশ্ব-বিশ্রুতা মহিলার জীবনী পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়—মূক, বধির ও অন্ধ—এই ত্রিবিধ পঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে চলেছে তার সারা জীবনব্যাপী নিরলস দুর্জ্জয় অভিযান। কি পরিমাণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আগ্রহে ঐরূপ পঙ্গুত্বকে অস্বীকার করে জীবনে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন এবং অন্যান্যসাধারণ মানুষের মতোই জ্ঞানে, শিক্ষায় ও কর্মকুশলতায় স্বাবলম্বী হয়েছেন সেকথা জানলে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। তাই বোধহয় বিশ্বের অন্যতম মনীষী লেখক Mark Twain একদিন বলেছিলেন—Helen Keller and Napolean, the wonders of the 19th Century. মূক, বধির ও অন্ধজনের কাছেই শুধু নয়, পৃথিবীর সকল স্তরের মানুষের কাছেই শ্রীমতী হেলেন কেলারের জীবনী অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস।

আনন্দের বিষয় এই মহিয়সী মহিলা ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতি, উপদেশ ও পরামর্শ সমাজকর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং সর্ব্বোপরি এদেশের সকল মূক, বধির ও অন্ধজনদিগকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ নেই। প্রায় বিশ লক্ষ অন্ধের বাস এই ভারতবর্ষে—পৃথিবীর মোট অন্ধের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও আজ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে ৫০টীর বেশী হবে না এবং সেগুলিতেও মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫০০ শতের মত মাত্র। এই বিষয়ে সরকারী উদ্যম নগণ্য, পাঁচশালা বন্দোবস্তেও, দুঃখের বিষয়, কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে সরকারী মনোবৃত্তিও অনেক সময় প্রশংসার যোগ্য হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক Postal Union এর অধিবেশনে প্রস্তাবিত হয় অন্ধদের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল সাহিত্য বিষয়ে ডাক মাশুল তুলে দেবার জন্য। মোট ৯১টী দেশের প্রতিনিধির ভেতর ৭৬ জন প্রতিনিধি ঐ প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু যে ১৫টী দেশ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। আশার কথা শ্রীমতী হেলেন কেলার যখন আজ আমাদের দেশে এসেছেন, ভারত সরকার তাঁর উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মূকবধির অন্ধদের উন্নতিকল্পে দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চয়ই করবেন।

শ্রীমতী হেলেন কেলারের জীবন কাহিনী যেমনই বিচিত্র তেমনই রোমাঞ্চকর, এমন কি অলৌকিক বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হেলেন কেলার আমেরিকার Albahama রাজ্যের উত্তরে এক ক্ষুদ্র সহর Juscambiaতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা সুইশবংশোদ্ভূত। মায়ের কোল আলো করে যখন শিশু হেলেন জন্ম নিল তখন কিন্তু সে মোটেও অন্ধ ছিল না। সকল সাধারণ শিশুর মত শিশু হেলেনও পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সে মাত্র ১৮টী মাস, ১৯ মাস বয়সের সময় হঠাৎ Brain ও Stomachএর গুরুতর দুরারোগ্য রোগে হেলেনের চোখের পাতা আর বন্ধ হ'ল না—দৃষ্টিহীন

আঁখিতে চিরদিনের মত অন্ধকার নেমে এল। শুধু তাই নয় তার শ্রবণেন্দ্রিয় ও অচল হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—কানে সে শুনতে পেল না। তারপর? তারপর আরও শোচনীয় পরিণতি—তিন বছর বয়সের মধ্যেই শিশু হেলেনের কথা বলার শক্তি ও হারিয়ে গেল। ভগবানের ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ ছিল, তাই যে স্বর্গের শিশুটী ৩ বছরে মূকবধির ও অন্ধ হ'ল তাকে আজ দেখতে পাই এক পৃথিবীর সকল মূকবধির ও অন্ধজনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক প্রতিভাময়ী ও জ্যোতির্ময়ী তারকারূপে। হেলেনের পিতা সামরিক বিভাগের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সুতরাং তাঁর অবস্থা একরূপ ভালই ছিল বলতে হবে। তিনি হেলেনের সুচিকিৎসার কোনও ত্রুটীই রাখলেন না, কিন্তু সবই নিষ্ফল হ'ল। অনন্যোপায় হয়ে তিনি নিয়ে গেলেন হেলেনকে Boston সহরে। সেই সহরে Telephone আবিষ্কর্ত্তা Dr. Alexandar Graham Bell হেলেনের পিতার বন্ধু ছিলেন। তাঁর পরামর্শে হেলেনকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই সহরের Perkin's Institution এ। অন্ধদের শিক্ষার জন্য ঐ বিদ্যালয়টী তখন বিখ্যাত ছিল। ঐ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল Michael Anagnosএর পরামর্শে ঠিক হ'ল Miss. Anne Sullivan নাম্নী এক মহিলা হেলেনের সারাদিনের সঙ্গিনী ও শিক্ষায়িত্রীরূপে কাজ করবেন এবং Perkin's বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুযায়ী হেলেনের শিক্ষা বাড়ীতেই হবে। এ্যানি সুলিভান শুধু মাঝে মাঝে হেলেনকে ঐ বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন। হেলেনের সৌভাগ্য, এ্যানি সুলিভানের মতো তিনি একজন স্নেহশীলা ও অনুরাগিনী শিক্ষিকার সাহায্য ও সৌহার্দ পেয়েছিলেন। ৮ বছর বয়সে হেলেনকে এ্যানি সুলিভানের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল।

সেই থেকে দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত এ্যানি সুলিভান হেলেনের Companion বা সহচরী সঙ্গিনীরূপে ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এ্যানি সুলিভানের মৃত্যু হয়। এ্যানি সুলিভানের নিজের জীবনও খুব দুঃখের ছিল। অল্পবয়সে মা হারিয়ে তার ভাগ্যে শুধু ছিল মদ্যপ পিতার কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অবহেলা। শেষ পর্য্যন্ত তাকে স্থান নিতে হয় এক অনাথ আশ্রমে। সেখানে Trachoma রোগে আক্রান্ত হয়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এ্যানি সুলিভান Perkin's বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে থাকাকালীন ১৪ বছর বয়সে চোখে গোটা দুই অস্ত্র-চিকিৎসার পর তার আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। পরবর্ত্তী জীবনে এ্যানি সুলিভান আবার অন্ধ হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্তাও হয়েছিলেন।

এ্যানি সুলিভানের সাথে হেলেনের প্রথম মিলনের দিনটী উভয়ের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। হেলেনের জন্য Perkin's বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটী পুতুল উপহার পাঠায়। সেই পুতুলকে পোষাক পরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাতা ছাত্রী Laura Bridgman, সেই উপহার এ্যানি সুলিভান নিয়ে এসেছেন নিজ হাতে হেলেনকে দেবার জন্য। হেলেনের বাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ী থেকে তিনি নামতেই হেলেন যেন মুহূর্ত্তেই এক বহু পরিচিতা আপনজনার সান্নিধ্য অনুভব করল। সে নবাগতার পোষাকখানি আঁকড়ে ধরল আপন হাতের মুঠোয়। নিজের পরশ দিয়ে সে যেন অনুভব করল তার ভবিষ্যৎএর নিত্যসঙ্গিনীর পরশখানি। এ্যানি সুলিভান হেলেনের হাতে পুতুল উপহারটী তুলে দিলেন। সেটী পেয়ে হেলেন যে ভারী খুসী হল এ্যানি সুলিভান পরিষ্কার বুঝলেন। কিন্তু 'পুতুল' নামক জিনিষটী যেন হেলেনের কাছে, এক দুর্ব্বোধ্য বস্তু। "পুতুল"টা সত্যই কি বস্তু? তার কি 'নাম'? 'নাম'-ই বা কা'কে বলে? ঐ বস্তুটা দিয়ে কি হয়? ওটার তাৎপর্য্যই বা কি? মনের ভেতরে এইরূপ অফুরন্ত 'জিজ্ঞাসা'র উত্তর বুঝিবা হেলেনের কাছে অব্যক্তই থেকে যায়। এ্যানি সুলিভান ছিলেন প্রখরা বুদ্ধিমতী। তাছাড়া নিজেও ছেলেবেলা অন্ধ ছিলেন বলে অন্ধের মনস্তত্ব বা কৌতুহল তাঁর বোধহয় অজানা ছিল না। তাই তিনি হেলেনের এক হাতে পুতুলটা দিয়ে অন্য হাতের তালুতে সযত্নে ধীরে ধীরে লিখে দিলেন D-O-L-L। কয়েকবার ঐ কথাটী লিখে দিতে হেলেন নিজেও তার আঙ্গুল দিয়ে Doll কথাটীর বানান অনুসরণ করতে আরম্ভ করল এবং কয়েকবার

সম্প্রতি মিস্ হেলেন কেলার কলিকাতা অন্ধ ইস্কুল পরিভ্রমণ করেন এবং তথায় অন্ধদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। ছবিতে—মিস্ কেলার, মিস্ পলি টম্পসন এবং শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত—কলিকাতা অন্ধ স্কুলের সেক্রেটারী

চেষ্টার পরে হেলেন তা' শিখে ফেলল। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই সুরু হল হেলেনের জীবনে প্রথম শিক্ষালাভ। হেলেন বানান করতে শিখল Doll, এবং এও বুঝতে শিখ্‌ল হাতের 'বস্তু'টীকেই Doll বলে। সে আরও বুঝতে শিখল যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়—তার একটা "নাম" আছে—যেমন Doll। এই ভাবে আধ ঘন্টার মধ্যে হেলেন প্রায় ৩০টা কথা শিখল। বস্তুর স্পর্শ অনুভব করে হেলেন অঙ্গুলি দিয়ে বানান করে লিখ্‌তে ও বুঝতে শিখল—water, mug, milk, ground, bushes, pump ইত্যাদি। কিন্তু যে সব কথা স্পর্শাতীত অর্থাৎ যার কোন অস্তিত্ব নেই, অথচ সে শুধু চিন্তাশক্তি দ্বারাই অনুধাবনযোগ্য তা বোঝাতে এ্যানি সুলিভানকে ভিন্ন কৌশলের সাহায্য নিতে হল। যেমন একদিন দেখা গেল কোনও শেখা বস্তুকে স্পর্শ করেও

তার নাম হেলেন মনে করে বানান করতে পারছে না। এ্যানি সুলিভান তখন হেলেনের কপালে ক্রমাগত টোকা দিতে লাগলেন এবং হাতের তালুতে লিখতে লাগলেন T-H-I-N-K. কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল হেলেন ভুলে যাওয়া জিনিসটার নাম বানান করতে পেরেছে। সেই সঙ্গে সে আর একটা কথাও শিখেছে Think, যাকে বলে চিন্তা করা এবং যা করলে ভুলে যাওয়া বস্তুর নাম মনে পড়ে। একদিন হয়তো পুতুলটা ভেঙ্গে গেছে বলে হেলেন কাঁদতে আরম্ভ করল। তক্ষুণি এ্যানি সুলিভান হাতে লিখে দিলেন S-o-r-r-y. এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে Right, wrong, good, bad ইত্যাদি abstract Idea-গুলির জ্ঞান হেলেনকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে প্রচণ্ড অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম এবং অফুরন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে হেলেন অল্পদিনেই প্রায় ৮০০ শব্দ ও বাক্যাংশ (idiom) শিখল।

জানবার আগ্রহ হেলেনের ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রতিভার ও অধ্যবসায়এর সাহায্যে হেলেন দ্রুতগতিতে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে লাগল। এ্যানি সুলিভানের সহায়তায় হেলেন ৮ বছর বয়সেই 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে বই পড়বার দক্ষতা অর্জন করে। ব্রেইল উঁচু টাইপে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই হেলেন অন্ধদের জন্য বিশেষ করে লেখা বই Arabian Nights, Pilgrim's progress, lamb's tales from Shakespeare ইত্যাদি বইগুলি পড়ে তার রসগ্রহণে সমর্থ হল। অদম্য উৎসাহ, প্রচণ্ড অধ্যবসায় এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা এই তিনের সমন্বয়ে হেলেনের জ্ঞানের স্পৃহা কিছুতেই ক্ষান্ত হতে চাইলো না। I must know মনের অন্তস্থলে এ কথা কে যেন সর্ব্বক্ষণই আঘাত দিয়ে দিয়ে হেলেনকে নিরন্তর অতৃপ্ত রাখতে চাইতো। একদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেল। হেলেন ৯ বছর বয়সের আগে God বা ভগবানের কথা কিছুই জানতো না বা বুঝতো না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল হেলেন লিখছে— Where was I before I came to mother? What makes the Sun hot? Who made the Earth and the Sea and Everything? May I read the book called the Bible? হেলেনের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব মনের গতি লক্ষ্য করে তাকে Bible শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হ'ল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আরও একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খবর পাওয়া যায় Norwayতে Regnhild Kaata নাম্নী এক অন্ধ বোবা মেয়ে নাকি তার শিক্ষক ইলিয়াস হ্যানসনের কথা বলার সময়ে ওষ্ঠে, মুখে, নাকে হাতের স্পর্শে শিক্ষকের কথার মানে বলে দিতে পারতো। হেলেনও এ খবর পেল—জ্ঞানের ক্ষুধায় অতৃপ্ত বাসনা যার সে কি এ খবরে চুপ থাকতে পারে? একদিন সবাইকে চমক লাগিয়ে হেলেন এ্যানি সুলিভানের হাতে লিখল "I must speak" তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হল Boston সহরের Horace Mann Schoolএ, কথা বলা শেখানোর জন্যে। ঐ স্কুলের প্রিন্সিপাল Miss Savale Fullerএর কাছে হেলেনের শিক্ষাগ্রহণ সুরু হল। মিস্ ফুলার প্রথম হেলেনের হাতখানি নিজের মুখের উপর নিয়ে, মুখের উপর নীচ, জিহ্বা, ত্বক, দাঁত, নাক, চোয়াল ও ওষ্ঠ ইত্যাদির বিভিন্ন অবস্থা গতি ও পরিবর্ত্তন বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে হেলেনের ওষ্ঠ, দাঁত, জিহ্বা, ত্বক ও চোয়ালের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে একটী একটী করে শব্দ উচ্চারণ করা শেখাতে লাগলেন। হেলেনকে জীবনে প্রথম Arm শব্দটী উচ্চারণ করা শেখানো হয়—তারপর Mama ও Papa বলা। এইরূপে মাসখানেকের মধ্যে মাত্র সাতটী পাঠ নিতে না নিতেই হেলেন একদিন বাড়ী ফেরবার পথে সহচরী এ্যানি সুলিভানকে অবাক করে বলে বসল I am not dumb now. Articulation বা উচ্চারণ পদ্ধতিতে দ্রুত উন্নতিলাভ করে হেলেন তারপর গেল নিউইয়র্ক সহরে Wright Humsun স্কুলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। সেখানেও অল্পকাল মধ্যেই অঙ্ক, ইতিহাস, সাহিত্য, ফরাসীভাষা, সঙ্গীত এমন কি বক্তৃতা দেওয়া পর্য্যন্ত তার শেখা হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই হেলেন ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালানো, সাঁতার দেওয়া, নৌকার দাঁড়টানা ইত্যাদি শিখতে বাকী রাখলো না। তারপর তার কলেজের শিক্ষা আরম্ভ হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে র‍্যাডক্লিফের Cambridge School of young ladiesএ। কলেজের পাঠ নেবার সময় এ্যানি সুলিভানও হেলেনের সঙ্গে সাহায্যের জন্য থাকতেন। এইরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করে ২৪ বছর বয়সে হেলেন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ ডিগ্রীলাভ করলেন। মূকবধির ও অন্ধ হেলেন একে একে সকল বাধা অতিক্রম করে প্রভূত যশের অধিকারিণী হলেন। এই সময় তাঁর লেখা বিখ্যাত The story of my life বইখানি প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর আগে থেকেই হেলেনের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অপূর্ব্ব মেধা, প্রতিভা, ও অধ্যবসায়এর কথা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে রাষ্ট্র হ'ল। তাকে নিয়ে বসল ১৮৯[illegible] খৃষ্টাব্দে লেক জর্জে বিশেষজ্ঞদের এক আলোচনা সভা। সেই সভায় প্রিন্সিপাল Miss Fuller ঘোষণা করলেন। I think she is outside the pale of theories. I don't believe there is another child in the world like her," অপর বিশেষজ্ঞ Dr. Phillip G-Gillet বলেন—"The question is whether she is a tray chisld dropped down here from another world." হেলেন পরিবারের বন্ধু Dr. Alexandar Graham Bellতো আগেই বলেছিলেন "We have a lesson to learn from this child." এইভাবে প্রায় সকলেই হেলেনের অপূর্ব্ব প্রতিভাকে অবিশ্বাস্য প্রায় না বললেও অলৌকিক বা ঐশী শক্তির প্রভাবান্বিত বলতে দ্বিমত করলেন না। শ্রীমতী হেলেন কিন্তু নিজে এসব কথা সবিশেষ অস্বীকার করেন। তাই তিনি ঐরূপ বিশেষজ্ঞদের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করে একদিন বলেছিলেন—I wonder if any other individual has been so minutely investigated as I been by my physician, psychologists, physiologists and neurologists তিনি নিজেকে অপরাপর সাধারণ মানুষ

অপেক্ষা পৃথক করে ভাবেন না। তাঁর জীবনে সাফল্যের মূলমন্ত্র হিসেবে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকেই সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়ে থাকেন। এই মত অবশ্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে Columbia Universityর বিখ্যাত Dr. Frederic Jilhey শ্রীমতী হেলেনকে পরীক্ষা করে স্বীকার করেছিলেন :—"that her touch, taste and smell were scarcely better than average." তবে শ্রীমতী হেলেনের জীবনের বিস্ময়কর অবদান বলতে articulation বা উচ্চারণে পারদর্শিতাকেই বলা যেতে পারে। তিনি এ বিষয়ে এতদূর দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন যে ভাবলেও আশ্চর্য্য লাগে। By placing the middle finger on the nose, forefinger on the lips and her thumb on the larynx she can hear and tell what others say"। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম এ্যানি সুলিভানের সহযোগিতায় জনসাধারণের সামনে articulation বা উচ্চারণের দক্ষতার প্রমাণ দেন বক্তৃতা দিয়ে। সেই দিন থেকে আজ অবধি দেশে বিদেশে তিনি বহু বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি অন্ততঃ ৫ বার পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইউরোপ ও জাপানে গিয়েছেন। সকল দেশেই সরকারী বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁর উপদেশ, পরামর্শ ও সাহচর্য্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে থাকেন। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে নিরন্তর চিঠিপত্র আসছে, আমন্ত্রণ আসছে—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর জীবনে বোধ হয় অবসর নেই। দেশ বিদেশের মূক বধির ও অন্ধদের শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতি বিধানই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে জাপান ভ্রমণের সময় তিনি ৩৫,০০০,০০০ কোটি ইয়েন অর্থ সাহায্য তুলে দিয়েছেন সে দেশের অন্ধ মূক ও বধিরদের উন্নতির জন্য। অন্ধ মূক বধিরদের মনস্তত্ত্ব, দুঃখদুর্দ্দশা, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন। সেই সব বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি পৃথিবীর নানা ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'the story of my life ছাড়াও অন্যান্য বইগুলি যথা "the world I live in," 'out of the Dark,' 'My Religion' "Midstream, My latter life," "Let us have faith" সকল দেশেই সমাদৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর আবাল্যসঙ্গিনী এ্যানি সুলিভানের জীবনকাহিনীখানি প্রকাশ করতে পারেন নি—যেহেতু সে বইএর পাণ্ডুলিপিখানি বাড়ীতে একবার আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শ্রীমতী হেলেন কেলার জীবনের ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে পৃথিবীর অনেক মণীষী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিকট সংস্পর্শে এসেছেন। তন্মধ্যে Dr. Alexandar Graham Bell, Mark twain, Franklin D. Roosvelt, জাপান সম্রাট Hirohito এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম পর্য্যন্ত করা যেতে পারে। কবির বিশ্বভ্রমণকালে একবার শ্রীমতী হেলেন কেলার কবিগুরুর ওষ্ঠে ও মুখে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা তাঁর মুখনিঃসৃত কবিতার মর্ম্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। রুজভেল্টের কণ্ঠস্বর তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারতেন। Mark Twainএর নিজের মুখ থেকে বলা বহু হাস্যরসাত্মক গল্প শ্রীমতী হেলেন কেলার articulation-এর সাহায্যে উপভোগ করেছেন। সঙ্গীতের সুর কানে না এলেও তার ঝঙ্কার ও স্পন্দন অনুসরণ করে তিনি গানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ Enricho Carusoএর উদাত্ত কণ্ঠস্বর এবং Feodor Chaliapinএর 'Volga boat song' নামক গানটীর মাধুর্য্য অনুধাবন করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমতী হেলেন কেলার তাঁর সঙ্গিনী শ্রীমতী পলিটমসনকে নিয়ে Connecticutএর অরণ্য প্রদেশ Arcon Rigeএ স্থায়ীভাবে বাস করছেন। বৃদ্ধা হলেও অটুট স্বাস্থ্যবতী শ্রীমতী হেলেন কেলার তাঁর দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজগুলি নিজের হাতেই করে থাকেন। লেখা, সেলাই করা, উলবোনা, টাইপ করা, বাগান করা ইত্যাদিও তিনি নিজে করেন। এমন কি দরকার হলে দাবা, তাস ও চেকার্স'ও তিনি খেলতে পারেন বন্ধুদের সাথে। মাঝে মাঝে শান্ত পরিবেশ বাড়ীর ফুলবাগানে তিনি ঘুরে ঘুরে ফুলের সুবাস একান্তে উপভোগ করেন—সঙ্গে সব সময় থাকে পোষা কুকুর টেরিয়ারটা। দেশে বিদেশে তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন, ডিগ্রী পেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৬ সালে তাঁকে ও এ্যানি সুলিভানকে একত্রে স্বর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিতা করেছেন। এইরূপ যশের অধিকারিণী হয়ে আজও তাঁর বোধ হয় কর্ম্মজীবনে শান্তি নেই, এই বয়সেও বর্ত্তমানে American foundation, for overseas Blindএর International Relation's Officer-রূপে তার কর্ম্মচাঞ্চল্যের এতটুকু বিরাম নেই। তাই তিনি ঘুরে গেলেন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এই দেশে। তাঁর একমাত্র চিন্তা ও সাধনা সকল দেশের অন্ধ মূক ও বধিরদের উন্নতি বিধান। এদের ডাকে তিনি কখনও ঘরে বসে থাকতে পারেন না। ঘরে যখন থাকেন, তখন তিনি হয়ত একটু শান্তি পান জাপান থেকে দেওয়া ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধ মূর্ত্তিটার সামনে খানিক দাঁড়িয়ে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর জীবনে শান্তি আছে? না। কেননা পরমুহূর্ত্তেই তাঁকে দেখা যায় আবার তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ওদেশ থেকেই দেওয়া আরেক পাথরের তৈরী আলোকস্তম্ভের কাছে। তার আলো রাত্রিদিন প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। শ্রীমতী হেলেন কেলারের ইচ্ছানুযায়ী সেই আলো তাঁর জীবদ্দশায় কখনও নিভবে না। হয়ত ঐ আলো স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বাণী—"অন্ধজনে দেহ আলো"।

প্রতিভা-পরিচিতি

ভাস্কর্য্যশিল্পী মিকেলেঞ্জেলো

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছেলেকে নিয়ে তো আর পারা যায় না! মারধর, ঘরে বন্ধ করে রাখা, খেতে না দেওয়া, যত রকমের শাস্তি আছে তাই দিয়ে তাকে শাসন করা হয়- কিন্তু তবুও তাকে বাগ মানানো যায় কৈ?

পাড়ার জনকয়েক মাতব্বর বসেছেন বৈঠকখানায়। মিকেলেঞ্জেলোর বাবা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর বলছেন—

পরিণত বয়সে মিকেলেঞ্জেলো

"ছেলেটাকে নিয়ে আর তো পারা যায় না! কি করব তাকে নিয়ে ভেবে পাচ্ছি না।"

একজন মাতব্বর উপদেশ দিলেন—"আরও কড়া শাসন দরকার। বেত লাগাও দু'বেলা।"

"বেত! অনেক বেত লাগানো হয়েছে।" বললেন মিকেলেঞ্জেলোর বাবা—"মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছি তাকে কতবার। কিন্তু তবুও ফল হয়নি। ছেলেটার বুদ্ধি নেই তা নয়, খুব চট্‌পট্ বুঝতে পারে, মুখস্থ করে ফেলতে পারে, তাই তো তাকে ফ্রানসেস্‌কোর ইস্কুলে পাঠিয়েছিলাম। ফ্লোরেন্স শহরে ফ্রান্‌সেস্‌কোর মত মাষ্টার নেই। ভাবলাম ছেলেটা তাঁর কাছে ভালই লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু ফ্রান্‌সেস্‌কো কি লিখেছে জানো? লিখেছে, লেখাপড়ায় ছেলের একেবারেই মন নেই। ফাঁক পেলেই ইস্কুল পালিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকে পটুয়াদের ঘরে বসে তাদের সঙ্গে

নিজের ষ্টুডিওয় মোজেজ-এর বিরাট মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যে রত মিকেলেঞ্জেলো

ছবি আঁকে, কাদামাটি মেখে কুমোরের কাজ করে!! কি করব এ ছেলেকে নিয়ে!"

পৃথিবী-খ্যাত অমর-ভাস্কর্য্য শিল্পী মিকেলেঞ্জেলো বাল্যজীবন পটুয়াদের পিছনে না দৌড়ে যদি শান্ত সুবোধ বালকরূপে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতেন তাহলে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকরূপে

তিনি গণ্য হতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে পৃথিবীর লোক সর্ব্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পীর কালজয়ী অবদান থেকে বঞ্চিত হত চিরদিনের মত।

১৪৭৫ সালের ৬ই মার্চ্চ ইতালির ক্যাপরিস্ নামক নগরে মিকেলেঞ্জেলো বুয়োনারোটি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর বাবা ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ নগরপাল। কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর নগরপাল নিজের পৈতৃক বাসস্থান ফ্লোরেন্সে ফিরে গেলেন।

ইতালি তখন মধ্যযুগীয় অন্ধ-পরিবেশ থেকে মুক্ত হোয়ে নবজাগরণের আলোকে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। শিল্প নবজন্মলাভ করেছে। শিল্পীরা পুনরায় তাঁদের তুলি আর রং নিয়ে বসেছেন। কবি আবার ছড়া গাঁথতে শুরু করেছেন। নানাস্থানে গান বাজনার আসর আবার নগরবাসীদের আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠেছে। প্রাণ বন্যায় ভেসে চলেছে যেন নিখিল চরাচর। এমনি পরিবেশে বালক মিকেলেঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে মানুষ হোতে লাগলেন।

লেখাপড়ায় যখন কিছুতেই তাঁকে আবদ্ধ রাখা গেল না, তখন নিরুপায় ও হতাশ হোয়ে তাঁর বাবা তাঁকে ডোমেনিচো নামে এক শিল্পীর কাছে তাঁর ছবি-আঁকা-শেখার ব্যবস্থা করে' দিলেন। মিকেলেঞ্জেলোর তখন তেরো বছর বয়স!

চিত্রশিল্প থেকে কেমন করে তিনি ভাস্কর্য্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, সে এক আকস্মিক ইতিবৃত্ত। ফ্লোরেন্স নগরের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বংশ ছিল মেদিচিদের বংশ, সান মার্কো নামক স্থানে তাঁদের একটি বাগান ছিল, যার স্থাপত্য, মর্ম্মরমূর্ত্তি এবং পুষ্পবিথীর শোভা সারা দেশের কাছে বিদিত ছিল। মিকেলেঞ্জেলোর এক বন্ধু গ্রানাক্কি তাঁকে একদিন সেই বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। বাগানের একধারে সাজানো ছিল কয়েকটি প্রাচীন মর্ম্মরমূর্ত্তি এবং স্থাপত্যশিল্পের নমুনা। সেই সংগ্রহগুলির সামনে দাঁড়িয়ে মিকেলেঞ্জেলো স্থানুর মতো নিশ্চল হোয়ে গেলেন। এ কী অপার্থিব সৌন্দর্য্য চারিদিকে! চোখের সামনে, হাতের কাছে কী সব বিস্ময়কর নমুনা! ডোমেনিচোর বন্ধ চিত্রশালা আর প্রকৃতির এই উন্মুক্ত চিত্রশালার মধ্যে কী অকল্পনীয় প্রভেদ। সেইদিন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পের প্রতি মিকেলেঞ্জেলো মনের মধ্যে যে দুর্নিবার প্রেরণা অনুভব করলেন সেই প্রেরণাময় অনুভূতি তাঁর সমগ্র পরবর্ত্তী জীবনকে পরিচালিত করেছিল। সেইদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর জন্মলাভ করল যেন।

বাগানের মধ্যে একটি বস্তু তাঁকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল।—ইতালীতে সে-সময় বহু রকমের পূজা চলত। সেই রকম এক গ্রাম্য দেবতার বৃহদায়তন একটি মাথা বাগানের এক কোণে সাজানো ছিল। মূর্ত্তির মুখে লম্বা দাড়ি, ঠোঁটে সুস্পষ্ট হাসির রেখা। অনেকদিনের পুরানো পাথরের খোদাই—কালের প্রকোপে জীর্ণ হোয়ে পড়েছে। মিকেলেঞ্জেলোর মনে প্রেরণা এলো, আর-একটি পাথর-খণ্ড দিয়ে নকল করে তিনি আর-একটি মাথা তৈরী করবেন। কাছেই ছিল রাজমিস্ত্রির দল। তাদের কাছ থেকে একটি বড় পাথরের চাঁই নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে যে-মূর্ত্তি তৈরী হল, গঠনকারুকার্য্যে তা অপূর্ব্ব বিস্ময়কর। যারা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা অবাক হোয়ে গেল! এ কী অদ্ভুত শিল্পী! এ কী তার ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ?

সেই সময় সেই বাগানে বেড়াতে এসেছিলেন তখনকার দিনের এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইতালীয় নাগরিক। তাঁর নাম মহান লোরেঞ্জো। রেনাসাঁর একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি। তাঁর সভায় নিত্য দেশের বড় বড় কবি, শিল্পী, ভাস্কর, সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটত। শিল্প-সাহিত্যের একজন বড় সমঝদাররূপে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। প্রতিপত্তিও ছিল অগাধ।

ষ্টুডিওয় ব'সে তন্ময়চিত্তে নিজের কাজের প্রতি তাকিয়ে আছেন মিকেলেঞ্জেলো। পিছনকার দরজা দিয়ে একজন পৃষ্ঠপোষক ষ্টুডিওয় প্রবেশ করছেন। কিন্তু সে-খেয়াল তাঁর নেই

বাগানে ঢুকে লোরেঞ্জো শুনলেন, এক ছোকরা-পাথরখোদাইকার বাগানের মধ্যে বসে নাকি আশ্চর্য্য সব জিনিষ তৈরী করছে। লোরেঞ্জো এগিয়ে গেলেন। মিকেলেঞ্জেলোর কাজ দেখলেন। বুঝলেন, একটি অসামান্য প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। শিল্পীকে লক্ষ্য করে বললেন—"কাজটা মন্দ হয়নি! তবে অতদিনের প্রাচীন একটি দেবতা, তার মুখে সব দাঁতগুলো যেন কেমন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। বুড়ো ঠাকুরের এক-আধটা দাঁত নিশ্চয়ই পড়ে গেছল।"

খানিক পরে চলে গেলেন লোরেঞ্জো। পরের দিন যখন কয়েকজন

বন্ধুদের নিয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন তখন দেখা গেল, মূর্ত্তির মুখের উপর একটি দাঁত নেই—এবং শুধু তাই নয়, এমন নিখুঁতভাবে

মিকেলেঞ্জেলো-নির্ম্মিত লোরেঞ্জো-র মর্ম্মর মূর্ত্তি

মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করা হোয়েছে যাতে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল, যে-শিল্পী এ-কাজ করেছে তার হাত যাদু জানে।

ফ্লোরেন্সের আর্টগ্যালারিতে রক্ষিত শিল্পীর মর্ম্মরমূর্ত্তি।

লোরেঞ্জো তরুণ শিল্পীকে কাছে ডাকলেন। বললেন—"তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

বিরাট মর্ম্মরমূর্ত্তি ডেভিড-এর মস্তকভাগ

মিকেলেঞ্জেলো আনন্দিত মনে পিতাকে গিয়ে সংবাদ দিলেন। ব্যাপারটা শুনে তাঁর বাবা খুসী না হোয়ে মহা বিরক্ত হলেন। পাথর খোদাইএর কাজ, সে তো রাজমিস্ত্রির কাজ! তাঁর ছেলে হবে

মিকেলেঞ্জেলোর বহুবিখ্যাত সৃষ্টি : যীশুকে কোলে নিয়ে বিলাপরতা মেরী মাতা

রাজমিস্ত্রি! মিকেলেঞ্জেলোর বন্ধু গ্রানাচ্চি তাঁকে অনেক বোঝালেন। ভাস্কর আর রাজমিস্ত্রি এক দরের কারিগর নয়। ভাস্কর্য্য হ'ল শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে অন্যতম—ইত্যাদি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশেষে অনেক বোঝানোর পর তিনি লোরেঞ্জোর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

বিরাট প্রতিপত্তিসম্পন্ন নাগরিক মহান লোরেঞ্জোর সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের মুখে রা নেই। লোরেঞ্জো বললেন—"আপনার ছেলেটিকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখতে চাই। আপনার আপত্তি আছে?"

আমতা আমতা ক'রে বৃদ্ধ বললেন—"আপত্তি! আমি এবং আমার পরিবারের সকলে আপনার আজ্ঞাবহ। আপনি যা বলবেন তা আমাদের শিরোধার্য্য।"

প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ম্যাডোনা

খুশী হয়ে লোরেঞ্জো বৃদ্ধকে শুল্ক-আপিসে মোটা মাহিনার কাজ জুটিয়ে দিলেন। মিকেলেঞ্জেলো শিখতে লাগলেন ভাস্কর্য্য শিল্পের কাজ। তাঁর জন্যে বিশাল এক ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করে দিলেন লোরেঞ্জো। দামী দামী পাথরের চাঁই, আর উৎকৃষ্ট সব উপকরণ জড়ো হল সেই শিল্পশালায়। সূর্য্যের মধ্যাহ্ন পরিক্রমার মতো মিকেলেঞ্জেলোর প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগল।

* * *

মিকেলেঞ্জেলোর জীবন নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম এবং নিরলস পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। শিল্প সাফল্যের গৌরব একদিকে যেমন তাঁর প্রতিভামণ্ডিত জীবনকে দীপ্তি দিয়েছে—তেমনি আবার পারিবারিক কলহ, বিপক্ষদলের চক্রান্ত এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ের

সিসটাইন গির্জ্জায় আঁকা ফ্রেস্কোর নমুনা

মধ্যে পড়ে তিনি অসীম অশান্তি উৎপীড়ন এবং সময় সময় কঠোর দারিদ্র্য ভোগ করেছেন।

আর একটি ফ্রেস্কোর নমুনা

তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক লোরেঞ্জো সহসা মারা গেলেন। চোখে অন্ধকার দেখলেন মিকেলেঞ্জেলো। লোরেঞ্জোর ছেলে পায়ের ও মেদিচি শিল্পীকে সমাদর করে সকল সুবিধা দিতে লাগলেন বটে, কিন্তু মেদিচিকে ফ্লোরেন্সের লোক বিষ-নজরে দেখতো। তাই তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট শিল্পীও নাগরিকদের বিরাগভাজন হলেন। প্রাণ ভয়ে মিকেলেঞ্জেলো ফ্লোরেন্স ছেড়ে দু'জন সঙ্গী নিয়ে ভিনদেশে চলে গেলেন। নানাস্থানে ঘুরে অবশেষে ১৪৯৬ সালে তিনি রোম সহরে উপস্থিত হলেন।

পোপের আদেশে অতঃপর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মিকেলেঞ্জেলো গির্জায় গির্জায় অনেক কাজ করলেন। যীশুকে কোলে নিয়ে মেরী মাতা শোক করছেন—সেই সময়কার তাঁর সেই অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি এখনো রোমের গির্জায় সংরক্ষিত আছে। সেই ছবিটি এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

নিদারুণ পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে মজুরি পেলেন আশাতীত কম। এদিকে বাড়ী থেকে বাপ এবং ভায়েদের কাছ থেকে অনবরত টাকার তাগাদা আসছে। তিনি নিজে ছিলেন অকৃতদার। পিতা মাতা এবং কতকগুলো অকর্মা ভায়েদের প্রতিপালন করতে তিনি চিরজীবন নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। নিজে ভাল না খেয়ে না প'রে তিনি বরাবর তাদের অর্থসাহায্য করেছেন।

১৫০১ সালে মিকেলেঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে ফিরে গেলেন এবং দু' বৎসর একটানা কাজ করবার পর পৃথিবীর বিস্ময়কর মর্ম্মরশিল্প ডেভিড-এর মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কাজ শেষ করলেন। তখনকার দিনে ঐ মূর্ত্তিকে বলা হ'ত—"আকাশ-ছোঁয়া দৈত্য।" যুদ্ধের সময় বীরের মুখে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় ফুটে ওঠে, মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখের উপর অপরূপ রেখায় শিল্পী সেই অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

মিকেলেঞ্জেলো শুধুই ভাস্কর ছিলেন না। চিত্রশিল্পেও তাঁর যে ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল তাও সাধারণ বা সামান্য নয়। ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে তাঁর আঁকা শিশুসহ ম্যাডোনার যে-ছবি রক্ষিত আছে, পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রের সঙ্গে তা তুলনীয় হ'তে পারে। এই চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে তখনকার দিনের আর-এক প্রতিভাবান শিল্পী লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির সঙ্গে কিছুকাল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল এবং বিলক্ষণ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

কিছুকাল পরে তিনি পোপের কাছ থেকে এক দুঃসাধ্য কাজের আদেশ লাভ করলেন। সমগ্র সিস্টাইন চ্যাপেলকে ফ্রেস্কো কাজের দ্বারা মণ্ডিত করতে হবে। সিস্টাইন চ্যাপেল ছিল এক বিরাট মন্দির। তার সমস্ত দেওয়াল আর কড়িকাঠ-এ ফ্রেসকোর কাজ করা একজনের পক্ষে কি সম্ভব! কোন কথা শুনলেন না পোপ। এ কাজ মিকেলেঞ্জেলোকে করতেই হবে।

নিরুপায় হোয়ে কাজে লাগলেন মিকেলেঞ্জেলো। কয়েকজন সহকারী পাঠিয়ে দিলেন পোপ। তাদের হাঁকিয়ে দিলেন মিকেলেঞ্জেলো। একাই করবেন তিনি সব কাজ। উর্দ্ধমুখ হয়ে কাজ করতে করতে ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল। ক্রমে এমন হল যে ঘাড় আর সোজা করতে পারেন না তিনি। অবশেষে ১৫১২ সালে সেই দুঃসাধ্য কাজ শেষ করলেন মিকেলেঞ্জেলো। ১৪৫টি পৃথক ছবি তৈরী করেছিলেন তিনি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রত্যেক ছবিখানিই বিরাট। একাধিক শিল্পী মিলে সারা জীবন ধ'রে কাজ করেও যা সম্পন্ন করতে পারতো কিনা সন্দেহ, সেই কাজ তিনি একা নিষ্পন্ন করলেন তিন বছরে! একজন শিল্পীর জীবনে এমনধারা পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজের এত বড় দৃষ্টান্ত আর নেই।

শুধু কি ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন আর ফ্রেসকো? শেষ জীবনে তাঁকে যুদ্ধে যোগ দিয়ে নগররক্ষা ব্যাপারে পূর্ত্তবিদের কাজও করতে হয়েছিল। এবং সে কাজেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি। ১৫১৭-১৮ সালে ফ্লোরেন্সে যখন বিদ্রোহ বাধলো তখন পোপ তাঁকে ডেকে নগর রক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বললেন। শিল্পী হলেন ইন্‌জিনীয়ার। নগরের নানা স্থানে পাথরের বেড়া আর দেওয়াল রচনা করতে লাগলেন। খাটতে খাটতে শরীর ভেঙে পড়ল। অবসাদে সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হল। কিন্তু তাঁর কাজ চলছে অবিরাম। যুদ্ধের শেষে—পর পর অনেকগুলি অতুলনীয় ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন তাঁর হাত দিয়ে বেরুলো।

মিকেলেঞ্জেলো বিবাহ করেন নি। জানা যায়, ১৫৩৮ থেকে ১৫৪৭ পর্য্যন্ত তিনি ভিটোরিয়া কলোনা নামে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মহিলাটি ছিলেন এক মার্কুইসের বিধবা। কিন্তু পার্থিব প্রেম অপেক্ষা দু'জনের মধ্যে এক ধর্ম্মময় অতীন্দ্রিয় অনুরাগ দু'জনকেই এক মহৎ মর্য্যাদা দান করেছিল। উপদ্রুত পরিশ্রান্ত শিল্পীর শেষ জীবনে এই মহিলা শান্তি এবং সান্ত্বনার বাণী বহন করে এনেছিলেন। ১৫৪৭ সালে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাভিভূত হয়েছিলেন মিকেলেঞ্জেলো। ১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বহু যুদ্ধ এবং বহু পরিশ্রমের পর বহু মান ও বহু খ্যাতির জয়মালা নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শিল্পী উননব্বই বছর বয়সে মরলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বিবেক জ্ঞানের ফল

প্রকৃতির মধ্যে অন্তস্থ্যত যে অচেতন উদ্দেশ্যকর্তৃক প্রকৃতির অভিব্যক্তি পরিচালিত হয়, তাহা হইতেছে পুরুষের ভোগ-সাধন এবং ভোগসাধনান্তে প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপাদন করিয়া পুরুষের কৈবল্যসাধন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রকৃতি মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত হয় এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যও অনৈশ্বর্য্যরূপ সপ্তরূপে আপনাকে বদ্ধ করে। পরে ভোগ সম্পূর্ণ হইলে পুরুষার্থ অর্থাৎ কৈবল্যসাধনের জন্য এই সপ্ত রূপ বর্জ্জন করিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতিরূপ একটি রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে মুক্ত করে।

রূপৈঃ সপ্তভিরেবং ধধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেক রূপেণ॥

সাং ক—৬৩

পুনঃ পুনঃ তত্ত্বের চিন্তনের ফলে বুদ্ধির বিপর্য্যয়ের বিলোপ হয় এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় অপগত হইলে অজ্ঞান ও সংশয় বর্জিত "কেবল জ্ঞান" উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান অপরিশেষ, কেননা ইহাই চরম জ্ঞান, ইহার পরে জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না। এই জ্ঞানে না আছে "অস্মিতা" (আমি আছি, এই বোধ), না আছে "অহন্তা" (আমি দেহ, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার বোধ), না আছে "মমতা" (আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাকার বোধ)। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে কোনও ব্যাপার ঘটে না। ক্রিয়াবাচক কোনও পদই তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না। আমি জানি, আমি হোম করি প্রভৃতি ক্রিয়াসূচক কোনও বোধই তাহার নাই। বিপর্য্যয় বা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনা অনাদি হইলেও সদ্য-উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান তাহার উচ্ছেদে সমর্থ। কেননা বুদ্ধির স্বভাবই হইতেছে সত্যের প্রতি—বস্তু-যাথার্থ্যের প্রতি—অনুরাগ। (বাচস্পতি)।

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নমে নাহম্ ইত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলং উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥

সাং কা—৬৪

তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরে পুরুষ মনে করেন, "আমার প্রকৃতিকে দেখা শেষ হইয়াছে।" ইহা মনে করিয়া তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন। প্রকৃতিও ভাবেন—"আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে।" ভাবিয়া স্বকার্য্য হইতে বিরত হন। ইহার পরেও প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ যদি থাকে, তবু প্রয়োজনের অভাবে "সর্গ" আর হয় না। বিবেক হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হইতে পারে। সংযোগ তো "যোগ্যতা" ভিন্ন কিছু নহে। পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা এবং প্রকৃতির ভোগ্যত্ব-যোগ্যতাই সংযোগ। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভবের পরেও এই যোগ্যতার তিরোভাব হয় না। সুতরাং প্রয়োজনের অভাবেই সর্গনিবৃত্তি হয়। ভোগে উপেক্ষাবশতঃ সৃষ্টি আর হয় না।

দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একো, দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য।

সাং কা—৬৬

সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তির কারণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না। কুম্ভকার তাহার চক্র হইতে হাত সরাইয়া লইবার পরেও চক্র যেমন কিছুকাল ঘুরিতে থাকে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ সংস্কারবশতঃ কিছুকাল জীবিত থাকে।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃত-শরীরঃ॥ সাং কা—৬৭

তারপরে স্থূল শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে এবং প্রধানের কর্ম্ম-প্রয়োজন শেষ হওয়ার ফলে প্রধান তাহার কার্য্য হইতে বিরত হইলে, পুরুষ ঐকান্তিক অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী এবং আত্যন্তিক অর্থাৎ অবিনাশী কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকং আত্যন্তিকং উভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥

সাং কা—৬৮

এই কৈবল্যই বিবেক জ্ঞানের ফল। ইহার স্বরূপ কি? তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই। ব্যাখ্যা সম্ভবপরও নহে। বিপর্য্যয়হীন বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান কি, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে এবং তাহার ফলও যিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই, তাহার বুঝিবার উপায় নাই। তখন দুঃখ থাকে না, ইহা বোঝা যায়। কিন্তু থাকে কি? সুখ থাকে না, কেন না, সে অবস্থা সুখদুঃখের অতীত। জ্ঞান থাকে কি? "তখন বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান হয়"—ইহা কারিকায় আছে সত্য। কিন্তু জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সে অবস্থায় হওয়া সম্ভবপর কি? জ্ঞানের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে। কিন্তু "কেবল জ্ঞানের" মধ্যে সে ভেদ নাই। "অহং"-বর্জ্জিত চৈতন্যের মধ্যে সে ভেদ থাকা সম্ভবপর নহে। সুখদুঃখের বোধহীন, বিষয়-বিষয়ীর ভেদহীন চৈতন্য আমাদের অজ্ঞাত, তাহার কল্পনাও সম্ভবপর নহে। "কেবল জ্ঞান"কে "অপরিশেষ জ্ঞান" বা জ্ঞানের চরম অবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই জ্ঞানকে উন্নতি মার্গে অগ্রসর ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্ঞানের চরম উন্নত অবস্থা বলিবার উপায় নাই। কেননা শেষোক্ত মার্গে জ্ঞানের গতি সম্মুখের দিকে অগ্রসর, আর "কেবল জ্ঞান" বর্জ্জনশীল, গতিহীন, প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানবর্জিত। যাহা-কিছু সংসারে জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, তাহার কিছুই তাহার মধ্যে নাই। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত অবস্থা দুঃখবর্জিত হইলেও কাম্য কি না, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ আছে।

এই কেবল জ্ঞান কাহার? সাংখ্য বলিতেছেন—
তস্মান্ন বধ্যতে, অদ্ধা ন মুচ্যতে নাপিসংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি, বধ্যতে, মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

সাং কা—৬২

বাস্তবপক্ষে কোনও পুরুষের বন্ধন হয় না, মুক্তিও হয় না। কোনও পুরুষের দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে না। বন্ধ, মুক্তি ও দেহান্তর প্রাপ্ত হয় নানা অবস্থাপন্ন প্রকৃতি! সংসার, বন্ধ ও মুক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই, পুরুষের নহে। তথাপি সংসার, বন্ধ ও মুক্তি আরোপিত হয় পুরুষে। কেন? বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন "যুদ্ধে জয়-পরাজয় প্রকৃতপক্ষে রাজ-ভৃত্যগণের হইলেও, যেমন তাহা তাহাদের প্রভু রাজার জয়-পরাজয় বলিয়া কথিত হয়, কেননা রাজভৃত্যগণ রাজারই আশ্রিত, এবং জয়-পরাজয়ের ফল রাজা ভোগ করেন, তেমনি যদিও ভোগও অপবর্গ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই, তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ তাহা পুরুষেরই"। এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জয়-পরাজয়ের ফল রাজা নিজে ভোগ করেন, সুতরাং জয়-পরাজয় ভৃত্যবর্গের হইলেও, তাহা রাজার বলিতে বাধা নাই। কিন্তু যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোনও সম্বন্ধ তাহার সহিত পুরুষের নাই, তাহার ভোগও অপবর্গ কেন পুরুষের হইবে, তাহার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব প্রকৃতির (বুদ্ধির), পুরুষের নহে। সেই ভেদজ্ঞানও উৎপন্ন হয় প্রকৃতির মধ্যেই, যদিও পুরুষের সান্নিধ্যেই হয়। যে পুরুষে ভেদজ্ঞান নাই, অভেদজ্ঞানও নাই, সে এই অভেদজ্ঞানের ফল ভোগ করিবে কেন? পুরুষ চিরমুক্ত। সুতরাং "কেবল জ্ঞান" যে পুরুষের নহে, তাহা প্রকৃতির—প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এবং পুরুষের চৈতন্যের আলোকপ্রাপ্ত জীবের, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত কারিকাতেও তাহাই বলা হইয়াছে। "দুঃখত্রয়াভিঘাত" জীবের, পুরুষের নহে। দুঃখ হইতে মুক্তিও জীবের, পুরুষের নহে। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির মধ্যে (জীবে) যে দুঃখের অনুভূতি হয়, পুরুষের পক্ষে (তন্মধ্যে বুদ্ধির প্রতিবিম্বপাতবশতঃ) তাহার দ্রষ্টা হওয়া যদিও সম্ভবপর হয়, তথাপি পুরুষ যখন সুখ দুঃখের অতীত, তখন সেই দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখ-মুক্তি জীবের। ৬৩ কারিকায় বলা হইয়াছে, যে প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞান রূপ ধারণ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। জীবই এই মুক্তিলাভ করে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে নূতন এক অসংগতির উদ্ভব হয়। মুক্ত অবস্থায় "নাস্মি ন মে, নাহং ইতি অপরিশেষ জ্ঞান" উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির অংশভূত জীবের মধ্যে আছে বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রও একাদশ ইন্দ্রিয়। তাহার পক্ষে "নাস্মি, ন মে, নাহং" এই জ্ঞানলাভ করার অর্থ, বুদ্ধি ও অহংকার বর্জিত হওয়া অর্থাৎ তাহার জীবত্বের বিনাশ হওয়া। জীবের মুক্তির অর্থ হয়

জীবের বিনাশ। বিনষ্ট জীবের পক্ষে "অপরিশেষ কেবল-জ্ঞান" লাভের কোনও অর্থ ই হয় না। এই অসংগতি দূর করিতে হইলে সাংখ্যকারিকার ৬২ ও ৬৩ কারিকা বর্জন এবং বদ্ধ পুরুষের বাস্তবিকই হয়, এবং "কেবল জ্ঞান" পুরুষের যখন হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

"প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধারণ করে" (সাং কা ৬৩) কিরূপে, তাহা দুর্বোধ্য। "নাস্মি, নাহং, নমে" এই জ্ঞান অহংজ্ঞান-বর্জিত পুরুষে সম্ভবপর নহে, কেন না "নাস্মি," "নমে", "নাহং"—এই জ্ঞানের মধ্যে অহংজ্ঞান বর্তমান। ইহাই যদি "তত্ত্বজ্ঞান" হয়, তাহা হইলে ইহা জীবের পক্ষেও সত্য নহে। কেন না জীব বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি লইয়াই গঠিত। সত্য বটে প্রকৃতির উপর পুরুষের আলোকপাতেই জীবের বুদ্ধি, (ইন্দ্রিয়াদি-সংবলিত অহংকারের) উদ্ভব হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই অহংকার জীবের নহে, বলা যায় না। পুরুষের আলোক-বর্জিত জীবে যখন অহংকার থাকে না, তখন জীবের অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোনও অর্থ ই হয় না।

সুখদুঃখের অনুভূতির জন্য চৈতন্যের প্রয়োজন। এই চৈতন্য জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতনের ফলে। এই দুঃখ সত্য। এই দুঃখ-নাশের জন্য সাংখ্য প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের আলোকপাতের নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অবিনাশী, উভয়ই দেশ কালের অতীত। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ যোগ্যতা-মাত্র। উভয়ের সান্নিধ্য দেশ ও কালগত নহে। সুতরাং এই সংযোগের বিনাশ সম্ভবপর কি না, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও প্রকৃতির ভোগ্যত্ব তাহাদের স্বরূপগত। ইহাদের সহিত আছে অনাদি বিপর্যয় বাসনা। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনার নাশ হয় বলা হইয়াছে। এই বাসনা—পুরুষের। এই বাসনা যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে অনাদিকাল হইতে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযোগে বদ্ধ। কিন্তু বাসনা অনাদি হইলেও অনন্তকাল স্থায়ী নহে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার ধ্বংস হয়। প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা পুরুষের বাসনার ধ্বংস কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান পুরুষেরই বলিতে হইবে, এবং পুরুষ যে অনাদিকাল হইতে বদ্ধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্য যে নির্গুণ পুরুষের কথা বলিয়াছেন, তিনি এই সকল বদ্ধ পুরুষের অতিরিক্ত, তিনি "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ" (পাতঞ্জলদর্শন ১।২৪), তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকল পুরুষই মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধ—সকলেই জীব। ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যের অসংগতি দূর হয় না।

আখ্যায়িকা ও উপমা

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় সাংখ্যদর্শন অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ৭২ কারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকা ও পরবাদ বর্জ্জন করিয়া ষষ্টি তন্ত্রের অবশিষ্ট সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁহার সপ্ততি-সংখ্যককারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাগুলি কয়েকটি উপমাসহ সাংখ্য প্রবচনসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩২টি সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদিগের বর্ণনা করা গেল।

১

আত্মবিস্মৃত রাজপুত্র

আত্মানাত্ম-বিবেক হইতে নিঃশেষে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। এই আত্মানাত্ম-বিবেক তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া উৎপন্ন হইতে পারে।

এক রাজপুত্র অশুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করায় তাহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি এক শবররাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং বাল্যাবধি শবরদিগের সংসর্গে থাকায় আপনাকেও শবর অথবা ব্যাধ বলিয়া মনে করিতেন। রাজার মৃত্যুর পরে রাজামাত্যগণ রাজপুত্রের সন্ধান করিয়া তাহাকে আনয়ন করেন। তখন নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত্র আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হন।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ—সাং সূ ৪।১

২

অন্যকে প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণে মুক্তি

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন এক পিশাচ তাহা শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। অপর

লোককে প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

পিশাচবৎ অন্যার্থোপদেশেঽপি সাং সূ—৪।২

৩

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান

বারংবার উপদেশ শ্রবণ করিবার পরে শ্বেতকেতু প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং তত্ত্বোপদেশ অসকৃৎ শ্রবণ করিবে।

আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ সাং সূ—৪।৩

৪

পিতা পুত্রের দৃষ্টান্তে বৈরাগ্যশিক্ষা

পিতার মৃত্যু হয়, পুত্র থাকে। আবার পুত্র পিতা হয়, পরে পরলোকগমন করে। ইহা হইতে জীবদেহের ভঙ্গুরত্ব এবং বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হয়।

পিতাপুত্রবৎ উভয়ো দৃষ্টত্বাৎ সাং সূ—৩।৭

৫

ত্যাগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ

এক শ্যেনপক্ষী এক খণ্ড মাংস অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল দেখিয়া এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। তখন শ্যেন স্বেচ্ছায় মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-রহিত হইয়াছিল। কিন্তু বলপূর্ব্বক যদি কেহ তাহার কবল হইতে মাংস খণ্ড কাড়িয়া লইত, তাহা হইলে সে দুঃখী হইত।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ সাং সূ—৪।৫

৬

সর্পের নির্ব্বয়নী ত্যাগ

গাত্র চর্ম্ম জীর্ণ হইলে সর্প তাহা ত্যাগ করে। মুমুর্ষু ব্যক্তিও দেহ জীর্ণ হইলে তাহা হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

অহি নির্ব্বয়িনীবৎ সাং। সূ—৪।৬

৭

ছিন্ন হস্তবৎ বর্জ্জনীয়

ছিন্ন হস্ত যেমন পুনরায় কেহ গ্রহণ করে না, প্রকৃতিকেও তেমনি একবার বর্জ্জন করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে না।

ছিন্নহস্তবৎ। সাং সূ—৪।৭

৮

ভরতের বন্ধ

অনাথ হরিণ শিশুকে ধর্ম্মবোধে রক্ষা ও পালন করিতে গিয়া ভরত মোহে পতিত হন এবং পরে হরিণ জন্ম লাভ করেন। যাহা হইতে বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও মুমুষু তাহা অবলম্বন করিবেন না।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ। সাং সূ—৪।৮

৯

কুমারী শঙ্খ

হস্তে একাধিক শাঁখার বালা থাকিলে পরস্পরের সংঘর্ষে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। বহুজন সংসর্গ করিবে না। তাহাতে রাগাদির উৎপত্তি হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। দুই জনের একত্র অবস্থান ও সাধনায় বিঘ্নকর।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারী শঙ্খবৎ সাং সূ—৪।৯

১০

পিঙ্গলার সুখ

পিঙ্গলা নাম্নী নারী প্রিয়তমের আশায় বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে তাহার আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল। সুতরাং কিছুরই আশা করিও না। তাহা হইলেই সুখী হইবে।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। সাং সূ—৪।১১

১১

সর্পের গৃহ

মূষিকের গর্ত্তে সর্প বাস করে। নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করে না। মুনিগণও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হন না।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ। সাং সূ—৪।১২

১২

বহু পুষ্প হইতে ভ্রমরের মধু আহরণ

ভ্রমর বহু পুষ্প হইতে তাহাদের সার মধুই আহরণ করে। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বহু গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে সারই গ্রহণ করিবে।

বহুশাস্ত্র গুরুপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ। সাং সূ—৪।১৩

১৩

ইষুকারের একাগ্রতা

শরনির্ম্মাণে ব্যাপৃত ইষুকার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া মহামান্য

রাজা চলিয়া গেলেও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এইরূপ একচিত্ত হইলে সমাধি হানি হয় না।

ইষুকারবৎ ন একচিন্তস্য সমাধিহানিঃ। সাং সূ—৪।১৪

১৪

নিয়মলঙ্ঘনে অনর্থের উৎপত্তি

চিকিৎসক রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। রোগী ব্যবস্থা অনুসারে চলিল না। ফলে রোগ সারিল না। সেইরূপ যাহার পক্ষে যে নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে অনর্থের উৎপত্তি হয়।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাৎ আনর্থক্যং লোকবৎ। সাং সূ—৪।১৫

১৫

বিহিত নিয়ম বিস্মরণে সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন

মৃগয়ায় বহির্গত এক রাজা অরণ্যে এক কামরূপা সুন্দরী নারী দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নারী কহিল—রাজা যদি তাহাকে কখনও জল প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে সে তাহার ভার্য্যা হইয়া থাকিবে। কিন্তু জল প্রদর্শনমাত্র তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। রাজা সম্মত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে রাজার সহিত ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া রমণী জলপান করিতে চাহিল। রাজা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া জল দিলেন! রমণী তৎক্ষণাৎ ভেকীরূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশ করিল এবং রাজা শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন।

আর্য্যদের পক্ষেও তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া বিহিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ। সাং সূ—৪।১৬

১৬

শ্রবণের সঙ্গে মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন

দৈত্যরাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই উপদেশার্থী হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করেন। প্রজাপতি প্রাথমিক উপদেশ উভয়কেই একসঙ্গে দান করেন। বিরোচন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করে। প্রজাপতির নিকট আর উপদেশের জন্য আসে নাই। ইন্দ্র কিন্তু সেই প্রাথমিক উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বার বার প্রজাপতির নিকট তত্ত্বোপদেশের জন্য গমন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তিনি গুরুবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ শ্রবণেই কৃতকৃত্যতা হয় না। সম্যক মনন ও নিদিধ্যাসন চাই।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।
সাং সূ—৪।১৭।

দৃষ্টস্তয়োঃ ইন্দ্রস্য—সাং সূ—৪।১৮।

১৭

সিদ্ধি বহুকাল সাপেক্ষ

ইন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ প্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য এবং গুরু আরাধনা করিয়া পরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

প্রণতি-ব্রহ্মচর্য্য-উপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধিঃ বহুকালাৎ, তদ্বৎ।
সাং সূ—৪।১৭

১৮

সিদ্ধির নির্দিষ্ট কাল নাই

মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই গুরুপদেশ শ্রবণ করিয়া বামদেব তত্ত্বদশী হইয়াছিলেন। কতদিন সাধন করিলে কাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, তাহার কোনও নিয়ম অবধারিত নাই। কাহারও অল্পকালে হয়, কাহারও দীর্ঘকাল লাগে।

ন কালনিয়মো, বামদেববৎ—সাং সূ—২০

১৯

প্রতীকোপাসনায় সিদ্ধিলাভের সহায়তা হয়

প্রতীকের উপাসনা করিয়া পরম্পরাক্রমে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যজ্ঞ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান লাভে সহায়তা করে। তদ্রূপ প্রতীক উপাসনা দ্বারাও মোক্ষলাভের সহায়তা হয়। কোনও সীমাবদ্ধ বস্তু অথবা মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত বলিয়া তাহার উপাসনা করিলে তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবেকখ্যাতিও মোক্ষ হয় না বটে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা মোক্ষলাভের হেতু হয়।

অধ্যস্ত রূপোপাসিনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপসকানাম্ ইব।
সাং সূ—৪।২১

২০

নির্গুণ উপাসনা ভিন্ন অন্য উপাসনায়
জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি নাই

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে পঞ্চাগ্নিতে হোম করিলে

পুনর্জন্ম হয়। নির্গুণ সাধনা ভিন্ন সগুণ ব্রহ্মাদির উপাসনা দ্বারা যে ব্রহ্মলোকাদি লাভ হয়, তাহা হইতে পুনরায় সংসারে আবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহারই কেবল পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ইতর লাভেঽপি আবৃত্তিঃ, পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ।

সাং সূ—৫।২২

২১

হংসের মত হেয় বর্জ্জন করিয়া উপাদেয় গ্রহণ করিতে হয়।

হংস নীর ত্যাগ করিয়া যেমন ক্ষীর গ্রহণ করে, তেমনি সংসার-বিরক্ত যিনি, তিনি হেয় প্রকৃতিকে বর্জ্জন করিয়া উপাদেয় আত্মাকে গ্রহণ করেন।

বিরক্তস্য হেয়-হানমুপাদেয়োপাদানং হংস ক্ষীর বৎ।

সাং সূ—৪।২৪

সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সঙ্গলাভে হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়ের গ্রহণ হইতে পারে—

লব্ধাতিশয়যোগাৎ বা তদ্বৎ। সাং সূ—৪।২৪

২২

অনিমাদিসিদ্ধি শুক পক্ষীর কণ্ঠস্বরের মতো।

শুকপক্ষীর গুণে (সুন্দর কণ্ঠধ্বনি) আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে আবদ্ধ করে। তেমনি সাধকের অলৌকিক গুণ থাকা প্রকাশিত হইলে, তিনি পুনরায় সংসার-সন্ধনে আবদ্ধ হন। সুতরাং অনিমাদি সিদ্ধি কামনা করিবে না। তাহা লাভ করিলেও গোপন রাখিবে।

গুণযোগাৎ বদ্ধঃ শুকবৎ। সাং সূ—৪।২৬

২৩

অকামচারী শুক

শুকপক্ষী সুন্দর। তাহার রূপলোভে লোকে তাহাকে বন্দী করিবে এই ভয়ে শুক সাবহিত থাকে ও স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করে। বিষয়ানুরাগী লোকের সহবাসে বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। সুতরাং বিষয়ানুরক্ত পুরুষের সঙ্গ ও স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করিবে।

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ। সাং সূ—৪।২৫

বঙ্কিম-উপন্যাসে-বিচিত্ররূপিণী

শ্রীমহাদেব ঘোষ বি-এ, সাহিত্যভারতী

"ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব, কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না, কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল তোমার দাসী।"

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়িকা মতিবিবির এ কথায় স্বামীপ্রীতি তথা প্রেম যে মতিবিবির চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য একথা বোঝা কারো পক্ষে যে সুকঠিন তা মনে হয় না। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কেন, সার্থক যে কোন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার যাঁরা মানব জীবনকে কেন্দ্র করেই এক-একটা কাহিনী রচনা করেন তাঁরা প্রেমকেই এযাবৎ সৃজনমূলক সাহিত্যের চিরকালের স্মরণীয় সম্পদ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন, এবং এই প্রেমকেই স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা নানা নামে অভিহিত করা হয়।

এ কথা শুনে ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বলতে পারেন প্রেমই যখন উপন্যাসের মূল সম্পদ সেখানে এক প্রেমের বিষয়ে যে কেউ সাহিত্য রচনা করতে পারে, তবে সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এবং সাহিত্যে নূতনত্বই বা আসবে কি করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে সাহিত্য হচ্ছে এক ধরণের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর যে কোন সৃষ্টির রূপান্তরের সঙ্গে রূপেরও পরিবর্তন ঘটায় তা চিরকালই মানুষকে আনন্দ দেয়। একই বাষ্প ধানের শীষে শিশিরবিন্দু হয়ে মুক্তোর রূপ নিচ্ছে আবার সেই বাষ্পবিন্দু দিয়ে অসীম রহস্যময় সিন্ধুর সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্যেও সে রকম ভাবে একই প্রেমকে উপজীব্য করে আপন সৃজন ক্ষমতা অনুসারে লেখক চরিত্র চিত্রণ করে যান, কিন্তু লাখে একজনই এ বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন ; কেন না কোন সৃষ্টিই ফরমাশে বা কারো খেয়ালে রচিত হয় না, মহৎ শিল্পীর শুভ্র দৃষ্টির প্রাঞ্জলতায় সৃষ্টি আপন মহিমায় রস রূপ পেয়ে থাকে।

বঙ্কিম উপন্যাসের নারীর বৈশিষ্ট্য যে প্রেম এ বিষয়টার আলোচনার জন্য এতখানি গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হল এর কারণ আর কিছুই নয়,

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে তা মনে হয় না। যাঁরা অতি-আধুনিক, তাঁদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বুর্জোয়া বলে অবজ্ঞা করেন। যাঁদের গুরু জিনিষ হজম করার ক্ষমতা নেই তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে নীতিবাদী বলে একঘরে করেছেন আর যাঁদের বিদ্যে অল্প তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের পাথুরে ভাষার মধ্যে ভাবের অন্তঃশীলা নদীর স্নিগ্ধ সঞ্চরণ উপলব্ধি করতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট মতিবিবির চরিত্রের কথা আলোচনা করলে দেখতে পাই, মতিবিবির জীবনে দ্বন্দ্বের মূলে ছিল প্রেম। কে জানত আগ্রার অন্যতম কুশলী শিল্পী, বিদুষী ও নৃত্যপটিয়সী মতিবিবির জীবনে বাংলার এক সামান্য চটিতে চিত্তবিকার ঘটবে। যে নারী ভারত মহিষী হবার জন্য নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে প্রস্তুত, যে নারী ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভ করেছে, সেই বিলাসিনীর অন্তরে প্রেমের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যে নবকুমারের সাক্ষাতে ঘটল তা বাস্তবিকই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এও হতে পারে—পঞ্চশরের বেদনা যে বিস্ময়কর ও ব্যাকুলকর। দাসী পেশমন মতিবিবির আচরণে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে—"তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?"

লুৎফুন্নেসা—মানস ত বটে! সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি!

পেষমন—তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল—যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লুৎফুন্নেসা—আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পেষমন—ললাট লিখন।

লুৎফুন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল, পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

মতিবিবির অন্তরের "পাষাণ" গলানর বিষয়টা আমাদের বিস্মিত করে; বিস্মিত হই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের পরিচয় পেয়ে এবং প্রেমের ব্যাকুলকর বেদনা কি ভাবে মতিবিবির মত সমাজ-পরিত্যক্তা বহুভোগ্যা নারীর জীবনে চাঞ্চল্য এনেছে তারই প্রকাশ দেখে।

শুধু মতিবিবি কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন নারীর জীবন বৈচিত্র্যময় হয়েছে "পাষাণ"-গলান প্রেমে এবং সেই প্রেমের প্রকাশ লেখক বিভিন্ন নারীর জীবনে বিচিত্র ভাবেই দেখিয়েছেন। শৈবলিনী, প্রফুল্ল, জেবউন্নিসা প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসের নায়িকারা যেন ভিন্ন গোত্রের—প্রেমের ক্ষেত্রে তারা বিচিত্ররূপিণী।

রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকা জেবউন্নিসা মতিবিবির মতই স্বেচ্ছাচারিণী এবং অপ্রতুল বাহ্য সম্পদের সুকঠিন অহংবোধের আবরণের মধ্যে বাস করায় মবারকের প্রতি তার প্রণয় সম্বন্ধে সে নিজেই আত্ম-বিস্মৃত ছিল। জেবউন্নিসা তার গৃহিণী হয় এই ছিল মবারকের জীবনের অন্যতম কামনা-বাসনা, কিন্তু মবারক শাহাজাদা নয় কেবল এই বাহ্য কারণের জন্য জেবউন্নিসা মবারকের নর্মসঙ্গিনী হতে পারত কিন্তু বাদশাহাজাদী জেবউন্নিসা কি করে সামান্য মানুষ মবারকের সহধর্মিণী হয়? এমন কি নিজের অদ্ভুত উৎপীড়ন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মবারকের হত্যার চক্রান্ত জেব-উন্নিসা নিজেই করেছে।

আবার উদয়পুরে সহসা জেব-উন্নিসার "বাদশাহাজাদী ভস্ম হইল" চরম আঘাতে তার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি এই গরীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল—"এত ভাগ্য কি আমার হইবে? বাদশাহাজাদী আর বাদশাহাজাদী নহে, মানুষী মাত্র।"

জেব-উন্নিসা জীবনের এক পরম লগ্নে সহসা প্রেমের দৃষ্টি লাভ করেছিল বলেই জীবনের আনন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অনুরূপ ভাবে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনীর প্রেম বাস্তবিক অভাবনীয় এবং প্রেমের জন্য তার গৃহত্যাগ বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধিকার অভিসারের সঙ্গে তুলনীয়।

যোগবলের প্রভাবে শৈবলিনী গৃহত্যাগের যে কারণ ব্যক্ত করে তা লক্ষণীয়।

চন্দ্রশেখর—তুমি ফষ্টারের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈবলিনী—প্রতাপের জন্য।

আবার জিজ্ঞাসা—আর তুমি ফষ্টারের সঙ্গে বাস করিলে কেন?

শৈবলিনী—বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুর গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গীর নায়িকা মহিনীর চরিত্র ছাড়া প্রেমকে আদর্শ করে জীবনের সব কিছু সংস্কার তুচ্ছ করতে পারে শৈবলিনীর মত এমন কোন বলিষ্ঠ নারী-চরিত্র অঙ্কন করতে অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকরাও সাহস করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোঁড়া হিন্দু সমাজে যে কালে সমুদ্র পার হলে জাতিচ্যুত হতে হত সেই যুগে যে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মত প্রেমিকা নায়িকা সৃষ্টি করতে এবং প্রেমাস্পদ "প্রতাপের জন্য" বিদেশী ফষ্টারের সহায়তায় শৈবলিনীর অভিসারের কল্পনা যে বঙ্কিমচন্দ্র করতে সাহসী হয়েছিলেন তাতে তাঁকে নীতিবাদী ঔপন্যাসিক বলে মনে হয় না; বরং সাহিত্যের আদর্শে শৈবলিনীকে অতি-আধুনিক নারী চরিত্র বলা যায়। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন নারীর জীবনের পরিণতির মূলে কোন নীতি কাজ করেনি, প্রেমই অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করেছে।

এখানেই তর্কবাগীশ কূট সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল ও আনন্দমঠ উপন্যাসের বিভিন্ন তথাকথিত সমাজ-উপেক্ষিত নারী চরিত্রের পতন ও সতী নারীর জয়গানের কথা উল্লেখ করে লেখকের নীতিবাদ-প্রবণতার বিষয় উত্থাপন করতে পারেন।

অবশ্যই এ কথা স্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমের ধারণার মূলে যেন একটা সংযমের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। সে নীতি কিন্তু উপন্যাসের

পতি ও পরিণতির পক্ষে প্রাণকেন্দ্র ছিল না। তলিয়ে বিচার করে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেম সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ দৃষ্টি থাকায় নিছক কামজ প্রেমের জয়গান তিনি কীর্তন করতে পারেন নি। সাহিত্যিক তথা জীবনবেদ রচনাকারী হিসেবে জীবনে কামজ প্রেমের অস্তিত্বকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনে গীতার প্রভাবেই হোক কিম্বা সমাজের পরিবেশের জন্য হোক্ যে চরিত্রে কামনার আগুন প্রেমের ভাস্বর রূপ পেয়েছে সে চরিত্র সমাজ-পরিত্যক্তা হলেও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসন্ন কৃপা অর্জন করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষ্ণকান্তের উইলেররে াহিণীর কথা বলা যায়।

গোবিন্দলাল ও রোহিণীর আকর্ষণের মূলে কামই প্রবল ছিল। ভ্রমরের প্রেমের আলোর উত্তাপে গোবিন্দলালের অন্তরে হৃৎপদ্ম বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু ভ্রমরের রূপ না থাকায় রূপসী রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। রোহিণীও বালবিধবা, প্রবল ছিল তার ভোগস্পৃহা; তাই তার তৃপ্তিহীন ভোগের স্পৃহা মেটাবার জন্য সে গোবিন্দলালকে আকৃষ্ট করেছে,—তার প্রেমে জেব-উন্নিসা কিম্বা মতিবিবির প্রেমের গভীরতা ছিল না। রোহিণীকে হত্যাকালে গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করে—"কেমন মরিতে পারিবে?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল—মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন।...বলিল—"মরিব না, মরিব না, চরণে না রাখ বিদায় দাও।"

মতিবিবি ও জেবউন্নিসা জীবনের চরম মুহূর্তে সম্পদ ত্যাগ করে "দাসী" হতে চেয়েছিল, তাই তারা সমাজের চোখে স্বেচ্ছাচারিণী হলেও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতির প্রসন্নতা লাভ করেছিল। কিন্তু রোহিণীকে পিস্তলের আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হল বঙ্কিমের নীতিবোধের জন্য নয়, সাহিত্যের অপরিহার্য ঘটনাক্রমে।

বিষবৃক্ষের কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রেমের নিত্যস্বরূপও ক্ষণিক স্বরূপের দ্বন্দ্ব উদঘাটনে, কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী ছিল ভ্রষ্টা কিন্তু রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনাথ পুষ্পের মত পবিত্র কুমারী কুন্দনন্দিনীকে হিন্দুধর্মমতে বিয়ে করেছে তবুও নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পরিপূর্ণতা আসেনি। নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দর প্রেম অনেকাংশেই কৃতজ্ঞতা-জাত, আর কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রনাথের প্রেম ছিল না, ছিল রূপ-মোহ। পরিপূর্ণ প্রেমের যে আস্বাদ নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর কাছে পেয়েছিল, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে তার অভাব সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং কুন্দর প্রতি তার ক্ষণিক মোহও ঘুচে যায়। এ দিকে কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের অবজ্ঞায় সীমাহীন আত্ম-অভিমানে আত্মহত্যা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রেমের ধারণা শৈবলিনী ও প্রতাপের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করেন—প্রতাপ কি তোমার জার?

শৈবলিনী—ছি! ছি!

চন্দ্রশেখর—তবে কি?

শৈবলিনী—এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বন মধ্যে ফুটিয়া ছিলাম ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

আবার রামানন্দ স্বামীর কাছে প্রতাপের উক্তি—আমার এ ভালবাসা কে বুঝিবে? আমি এই ষোড়শ বৎসর শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি; পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি, আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা—

এই "জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা" জনিত প্রেম কামনাসর্বস্ব হতে পারে না এবং পরিপূর্ণ প্রেমের স্বরূপই তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই পরিপূর্ণ প্রেমের জয়গানই শোনা যায়। ভারতীয় মহাকবি কালিদাসের পৃথিবীখ্যাত নাটক ও মহাকাব্যে এই ধরণে কামোত্তীর্ণ পরিপূর্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে, বিদেশী নাট্যকার সেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকের ডেসডেমোনাও ওথেলোর জীবনের ব্যর্থতার গোড়ায় অপরিপূর্ণ-প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখায়। নায়ক ওথেলোর চরিত্রের সরলতা এক ডেস্‌ডেমোনার বিষয় inferior complexityর জন্যই ডেসডেমোনার বাহ্য আচরণে তার অন্তর সত্যের পরিচয় ওথেলো উপলব্ধি করতে পারেন নি, —তার নম্র, পতিপ্রাণা ডেসডেমোনাও অভিমানবশে স্বামী স্বেচ্ছাচারকে সদানন্দ মনে মেনে নিয়েছিল।

এই সব দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রেমের বোধ নীতিসর্বস্ব ব্যাপার নয়, ফুলের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে; সুতোর বন্ধনে যখন শিল্পী মালা গাঁথেন তখন আরো এক নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, সুতো ছড়ান ফুলকে মালায় গেঁথেছে মাত্র, সে রয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে এবং তার বন্ধনটাই মালার পক্ষে সর্বস্ব নয়, মালার সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক মাত্র। পরিপূর্ণ প্রেমে সীমাহীন ত্যাগ, কল্যাণ দৃষ্টি মানুষে লাভ করে কিন্তু কামজ প্রেমে আত্ম-ভোগ ও আত্ম-সুখটাই জীবনের প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছিল কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী ও বিষবৃক্ষের হীরার জীবনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে নীতি তথা গীতার প্রভাব সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। তবুও গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যায়—উপন্যাসের প্রধান নারী শ্রীর জীবন ব্যর্থ হয়েছে; কেননা সে জয়ন্তীর নীতিমূলক শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছে বলেই। জয়ন্তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তার স্বামী প্রীতির কথা বলে......" অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার কিনিয়া, পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি তাহাকে খাইতে দিলাম......।" জয়ন্তীর কাছে শিক্ষা পাওয়ায় শ্রীর মনের স্বামী প্রীতির শুষ্কজ্ঞান মরুপথে রুদ্ধ হয়েছিল, সীতারামের কামনা ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা স্থল আদর্শ গৃহিণী শ্রীকে না পেয়ে জয়ন্তীর শিষ্যা শ্রীর রূপান্তরের জন্যই সীতারামের জীবন ট্র্যাজিক হল এবং শ্রীও যে স্বামী নিয়ে মধুময় জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অপরদিকে ভবানী ঠাকুরের শিষ্যা এক শক্তিশালী ডাকাতদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণী জীবনের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বাস্তব ধন ও ক্ষমতার উপরে স্বামী প্রীতিকে একান্ত সাধ্য বস্তু করায় শ্রীর মত তার জীবন ব্যর্থ হয়নি। শ্বশুর হরবল্লভ মিথ্যা অপবাদে তাকে গৃহে স্থান দেন নি, এবং প্রাণ

ধারণের সমস্যা সেটাতেই প্রফুল্ল পথে বেরিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তার বিত্তবৈভবের অভাব মিটেছিল, কিন্তু স্বামী ব্রজেশ্বরের হেঁসেলে ঢোকবার জন্য দেবী চৌধুরাণীর অন্তরের প্রফুল্ল মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। স্বামীকে অর্থ সাহায্য করার পর এক দৃশ্যের বর্ণনায় দেখা যায়—"সোণাদানা, হীরামুক্তা, সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছে। দেবী নৌকার একপাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল…।"

দেবী চৌধুরাণীর এ সপত্নী-বিদ্বেষ নয়, ভবানী ঠাকুরের শিক্ষায় সমুন্নত প্রফুল্ল কি বিদ্বেষের আশ্রয় নিতে পারে? ভবানী ঠাকুরের শিক্ষায়ও প্রফুল্লর স্বামীপ্রীতির তত্ত্ব ও রসের পরমেশ্বর ও পাবর্তীর মিশ্রণ ঘটেছিল বলেই প্রফুল্লর জীবন সার্থক হয়েছিল।

সার্থক প্রেম অন্ধেরও দৃষ্টি বিকাশ ঘটায়। অন্ধ ফুলওয়ালী রমণী জীবনের সব কিছুই প্রেমাস্পদ শচীন্দ্রকে অর্পণ করেছে। শচীন্দ্র যখন তার হাত ধরে তখন তার মনে হয়—এখন আমায় গ্রহণ কর আর না কর,—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী…।

গৃহকর্ত্রী লবঙ্গলতাকে…রজনী সকল কথাই বলিল, বলিয়া বলিল …ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি…?

ললিতলবঙ্গলতাও ভালবাসিতে জানে। সে বলেছে…"যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং মহাদেব হইলেও আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই…।" এবং বিয়ের পর অমরনাথের ব্যঙ্গোক্তিতে বলেছে—"কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই…।"

রজনী ও লবঙ্গলতা উভয়ই প্রেমের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছে—কিন্তু একজন বিয়ের পূর্বেই ভালবেসেছে, অপর জনের কাছে বিয়ের পূর্বে ভালবাসা পাপ বলে প্রতীত হয়েছে, এই দুই নারীচরিত্রের বিষয় চিন্তা করলে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কামনা-বাসনার বিষয়ই চিত্রিত করেছেন,—তা না হলে বিশেষ কোন আদর্শে চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে সবগুলোই type চরিত্র হয়ে যেতো।

বৈচিত্র্যের খাতিরেই অরণ্যপালিতা সরলাবালিকা কপালকুণ্ডলার জীবনে স্বামীপ্রেম কি ভাবে স্থান করে নেয় সে পরিচয় পেয়েছি। প্রকৃতিপ্রীতি কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রবল ছিল, কিন্তু সমাজে ও স্বামীর সঙ্গে বাস করে তার জন্যেও দোলা লেগেছিল। সপত্নী লুৎফুন্নেসা তাকে স্বামী ত্যাগ করতে অনুনয় করে; কপালকুণ্ডলা এতে বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করে—"স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" যে বয়স্কা নারী মাত্র বৎসর দুই পূর্বেও বিবাহ কাহাকে বলে জানত না; সেই বিয়ের পরে স্বামী ত্যাগের কল্পনা করতে পারে না। সে যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়েছিল তার একটি কারণ ছিল প্রকৃতি তাকে বার বার হাত ছানি দিত কিন্তু স্বামী নবকুমার যদি সরলা কপালকুণ্ডলাকে সন্দেহ না করত তার কপালকুণ্ডলা হয়ত নবকুমারের সহধর্মিণীই হয়ে থাকত।

লেখকের মৃণালিনী উপন্যাসটি মনোরমার চরিত্র অঙ্কনের জন্য খ্যাত। মনোরমার আচরণ বিস্ময়কর, যে বিধবা হয়ে প্রেম সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে তা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ—"প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়, পরিশেষে সাগর সঙ্গমে লয়প্রাপ্ত ও সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়—। প্রণয় জন্মিলে তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য…" মনোরমার কথায় মনে হয় তাকে সংসারের প্রয়োজনের কোন বন্ধনে বাঁধা যায় না,—সে হচ্ছে চিরন্তনী নারীর রহস্যময়ী প্রতিমূর্তি। তার বয়স ও রূপের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না, সে যেন বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি পূর্ত হয়েছে।

আনন্দমঠের জীবানন্দ-শান্তি, কল্যাণী-মহেন্দ্রের জীবনের পরিণতিও স্বাভাবিক। শান্তি-জীবানন্দের জীবনের তার ছিল উঁচু সুরে বাঁধা—তাই তারা আনন্দমঠের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর উন্নত জীবনের আদর্শেই শেষ পর্যন্ত এ মর জগতে বাস করতে পারেনি। অপর পক্ষে কল্যাণী-মহেন্দ্রর পক্ষে আবার সংসার করা স্বাভাবিক ছিল বলেই তারা তাদের বসতবাটীতে ফিরে এসেছে।

এইভাবে নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন নারীর জীবনে প্রেমের সঙ্গে অন্য কিছু সংস্কার বা শিক্ষার সংঘাতে জীবনের বিচিত্র সম্ভাব্য পরিণতির বিষয় আবিষ্কার ও প্রকাশ সাহিত্যে ঘটিয়েছেন। নদীর থাকে একটা সাগরাভিমুখী মূল স্রোত কিন্তু নানাকারণে নদীর বুকে নানা বর্ণ সমন্বিত বিচিত্র তরঙ্গ বিক্ষেপ দেখা যায়। মানুষের জীবনের মূল সত্য বা স্রোত প্রেম এবং এই প্রেমের সঙ্গে অন্য কিছুর সংঘাতে মানুষের জীবন দ্বন্দ্বমুখর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, সাহিত্যিকের কাজ এই বিচিত্র মানব জীবনের রসরূপ দান করা এবং বঙ্কিমচন্দ্র তা সার্থকভাবে করেছেন বলে মনে হয় এবং এক উপন্যাসে মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা, রোহিণী-ভ্রমর, কুন্দ-সূর্যমুখী-হীরা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী নারীচরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাসে নূতনত্ব এনেছেন।

আনন্দ-মঠের নিমাইমণি ছাড়া অন্য কোন নারীচরিত্রে বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা বঙ্কিম উপন্যাসে ঘটেনি বলে আমরা তাকে অভিযুক্ত করতে পারি না। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা উচিত যা সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছেন তা রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি কিনা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে—যে বিষয় কোন বিশেষ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি তার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা সৎ-সমালোচকের উচিত নয়।

এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে হলে পাঠককে সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষার বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়,—এর জন্যেও বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা যায় না। রসিক পাঠক মাত্রেই লেখকের সমকালকে কল্পনা করে নেন, যেমন কালিদাসের কাব্যের রস-আস্বাদনকালে উজ্জয়িনীতে মানস যাত্রা করে থাকি। আসল কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে মহৎ এবং উপন্যাসের আবেদন দেশকাল-জয়ী এই বিচারই বোধ হয় বঙ্কিম-সাহিত্যে বিচারের শেষ কথা হওয়া উচিত।

অহিংসা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—ভারতের দান ধর্ম্ম। দান ও তত্ত্বকে শোণিত প্রবাহের উপর দিয়ে বহন করতে হয়না।...উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষ ভরে শান্তভাবে ভাসিয়া আসে। আর এমনই ঘটনা চিরদিন ঘটেছে।

স্বামীজির এ কথা সম্যকরূপে প্রমাণ করেছে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। বহু ইতিবৃত্তকার এ বিষয়ে একমত যে প্রাচীন যুগের মানব-বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি অশোক। তাঁর উপাধি ছিল দেব-প্রিয় ও প্রিয়দর্শী। তাঁর ত্রয়োদশ অনুশাসনে তিনি বলেছিলেন—"নূতন দেশ বিজয়ের সময় হত্যা, মৃত্যু এবং বন্দী করা অবশ্যম্ভাবী। দেবপ্রিয় সে সকল কার্য্য অত্যন্ত শোকাবহ মনে করেন কারণ তথাকার অধিবাসী—ব্রাহ্মণ, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী, ধার্ম্মিক ও গৃহস্থবর্গ যাঁরা মিত্র, সহায়, জ্ঞাতি, দাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যাঁরা দৃঢ় ভক্তি-প্রাণ, তথায় তাঁহারা ক্ষতি, ধ্বংশ এবং প্রিয়জন বিরহ ব্যথা ভোগ করেন।...কোনো ধর্ম্মাবলম্বীই ইহাতে সুখী নহেন।...দেবপ্রিয় ইচ্ছা করেন সর্ব্বজীবই নিরাপদ ও সংযমী হ'ক এবং শান্তি ও আনন্দে কালযাপন করুক।"

মানবের ব্যক্তি-অভিব্যক্তির অনুরূপ জাতীয় অভিব্যক্তি। ভারতের ধর্ম্ম ব্যক্তি-অভিব্যক্তির কারণ নির্দ্দেশ করেছে—জন্ম জন্মান্তরের পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান জীব-জীবনে। কর্মফল এবং পুনর্জন্মবাদের উপর ভারতের সকল ধর্ম-বাদ প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে যুগে যুগে সে কর্ত্তব্য পথ নির্ণীত হয়েছে—অবতার, ঋষি, মহাপুরুষ এবং যুগ-প্রবর্ত্তক নেতৃবৃন্দের সত্যানুসন্ধানের ফলে, তার মূল বিদ্যমান বৈদিক নীতি-বিবৃতিতে। উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য এবং দর্শন সেই সত্যকে রূপ দেবার আয়োজন করেছে চিরদিন। বুদ্ধদেব বা জৈন-তীর্থঙ্করেরা জীবন সম্বন্ধে যে সার সত্য তালিকাবদ্ধ করেছেন অন্যান্য বহু কথা, নানাভাব ও বিভিন্ন ভঙ্গীর সাথে সে সব সত্যের মূল বিদ্যমান শ্রুতিতে। তেমন সার সত্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অহিংসার নীতি।

বেদ সংকলন করেছে বহু প্রার্থনা। মানুষের জীবনের আদর্শ যেমন ধ্বনিত হয় প্রাণ হ'তে স্বতোত্থিত প্রার্থনায়, তেমনি আবার শাস্ত্রে পাওয়া যায় প্রার্থনা-মন্ত্ররূপে যা পথ নির্ণয় করে আদর্শের। বৈদিক প্রার্থনা জীবনের মহা আদর্শ-সূত্র। পরমহংসদেবের শিক্ষার সার—ভগবদ্দর্শনের জন্য প্রাণকে তেমনিভাবে ব্যাকুল করা, যেমন সাংসারিক অনিত্য বস্তু-লাভের প্রত্যাশায় আমরা চিরদিন—দেহি, দেহি শব্দে ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করি ইষ্ট-দেবতার বেদীমূলে। নিষ্ঠার সাথে অর্থ বুঝে যদি আমরা উদ্দীপিত করি হৃদয়-প্রদীপ বৈদিক ও শাস্ত্রের মন্ত্রে—তাদের ভাব ও ভাষা উন্নত করে জীবনকে সুনিশ্চিত।

বলেছি ভারতের আদর্শ—অহিংসা। সে সত্য প্রমাণ করে বৈদিক মন্ত্র। অন্তর হ'তে যদি যজমান যজ্ঞশালায় বলে—

—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব

মা মা হিংসী—

সে নিজের অন্তর হ'তে চিরদিনের তরে বিদায় দিতে সক্ষম হয় হিংসা-রূপ পাপকে। জীবনের মূল আদর্শরূপে অহিংসা নীতিকে প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড। শান্তি ও স্বস্তির প্রার্থনা চিত্তশুদ্ধির কামনা। ঋগ্বেদের স্বস্তি বচন আজিও পবিত্র করে হিন্দুর পূজা-গৃহ, যজ্ঞ-শালা ও প্রার্থনা মন্দির।

"হে বহু প্রশংসিত ইন্দ্র, আমাদের মঙ্গল করুন। অখিল জ্ঞানবান পূষা, আমাদের স্বস্তি করুন। যাঁহার অস্ত্র অহিংসিত সেই গরুড় আমাদের স্বস্তি করুন। বৃহস্পতি আমাদের স্বস্তি করুন।"

এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নির্দ্দেশে মনোনিবেশ করলে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি বৈদিক আদর্শ। আমাদের কল্যাণ পার্থিব অভাব-মুক্তিতে, জ্ঞানে, অহিংসায় ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সাফল্যে। এ ভাব জাগে ইন্দ্র, পূষা, গরুড় ও বৃহস্পতিরূপ ঐশ-শক্তির দ্যোতন-জ্যোতি উপলব্ধির ফলে। তখন সাগ্রহে যে বর প্রার্থনা করি তার মাঝে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাই জীবন-ধারার।

"হে দেবগণ আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বিষয় শুনি। হে যজনীয় দেবগণ আমরা যেন চক্ষের দ্বারা মঙ্গলময় বস্তু দর্শন করতে পারি। আপনাদের স্তবে আমরা যেন স্থির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে দেবতা-নির্দ্দিষ্ট আয়ুলাভ করে বাস করতে পারি।*

এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সহজেই উপলব্ধি হয়। স্বস্তি কিসে? কানে ভদ্র কথা শুনা। অকল্যাণকর বাক্যতো শান্তির পথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা করে না মানুষকে। নিন্দা, বৃথাস্তুতি এবং হিংসাত্মক অশুভ বাক্যের উত্তেজনা হতে চিত্তকে অব্যাহত রাখাই স্বস্তিলাভ। চক্ষু সম্বন্ধেও ঐ শুভনীতি। জীঘাংসায় হতাহত, রোগী, দুঃখ ভোগী, অভাব-গ্রস্ত দৃষ্টি-পথে অবাঞ্ছনীয়। এ প্রার্থনা পরের মঙ্গলের জন্য। বলা হ'য়েছে আমাদের জগত হতে অশুভ বাণী, অশুভ দর্শন লোপ কর দেব-শক্তি মগ্ন পরার্থপরতার আত্ম-নিবেদন। কিন্তু নিজেকে সুস্থ ও সবল না রাখলে তো মানুষ পরের অসুস্থতা ও দুর্বলতার অবসান করতে পারেনা। দানে ও সেবায় দীনতার অরুন্তুদ দৃশ্য প্রতিরোধ করা বৈধ-নীতি। অনাচারে

---

* স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ
সস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি ঃ স্বস্তি নোবৃহস্পতির্দধাতু।
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভি র্বশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।১।৮৯।৬।৮।

ও অত্যাচারে আপনার বা পরের স্বাস্থ্যহানি অনভিপ্রেত। শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের আদি প্রতিষ্ঠান।

তাই ঋগ্বেদ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অদিতি প্রভৃতি পরম-পুরুষের দ্যোতন-শক্তির নিকট মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি মহা-শক্তির অংশ, এ উপলব্ধি শক্তিমান করে জীবকে। পার্থিব-শক্তি উদ্বোধনের যেমন একটা উপায়, আপনাকে শক্তিশালী জাতির অংশ বোধ করে তেমনি সাত্ত্বিক জগতে আমরা উন্নত হ'তে পারি অন্তরে দিব্য-শক্তির আবাহনে। অব্যক্ত অনন্তের বিশালতা আমাদের সঙ্কীর্ণ মনের ও বাক্যের অগোচর। তাই খণ্ড দ্যোতন-শক্তি দেবতার আবাহন করছে আর্য্যশাস্ত্রপ্রার্থনার বেদীতে যজ্ঞ-শালায়। আমরা অস্থ মন্ত্রে শুনি—চন্দ্র ও সূর্য্যের মত আমরা যেন মঙ্গলের সহিত পথ চলিতে পারি। আমরা যেন ইষ্টদাতা অহিংসক পরিচিত বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারি।*

একি মাত্র কবিতা? সূর্য্য চন্দ্রের পথ স্বস্তির পথ। তেমনি মঙ্গল পথে,না চল্‌লে ইষ্টবন্ধুর সাথে মিলিত হ'য়ে প্রসারলাভ কি সম্ভব?

জ্ঞানের পথ, সত্যের পথ, শশীসূর্য্যের আলোক-ধোয়া পথ। সে পথে অন্ধকার নাই। সে স্নিগ্ধ সমুজ্জল পথ অহিংসার ছায়া-তরু সম্পন্ন। বিশুদ্ধ শুভ্র জ্ঞানের অন্তরে বিদ্যমান পরিচিত অনন্ত সত্তা। জমাট আঁধার বিলীন হয় সে পথের সন্ধানলাভ করলে। বিস্মৃতি ও ভ্রান্তি দূর হয় জ্যোৎস্না-প্লাবিত যাত্রার পথে। দীপ্ত চিত্ত-মার্গ জ্ঞান-রবি-করোজ্জ্বল। শান্তি যখন চরমমার্গ সাধনার, তখন হিংসা বর্জ্জন অবিসম্বাদী সাধ্য।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের শান্তিপাঠের শুভছন্দ ও আমাদের চিত্তে জাগায় শান্তির বাণী।

দ্যুলোক শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, জল শান্তি, ওষধি শান্তি, বনস্পতি শান্তি, দেবলোক শান্তি, পরব্রহ্মে যে শান্তি বিরাজিত সে শান্তি আমার হয়।†

বলা হ'য়েছে—আমাকে এমন দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমি যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি আমরা যেন বন্ধু ভাবে পরস্পরকে দর্শন করি।‡

এই মৈত্রীর বাণীই ভারতের সনাতন বাণী। যুগে যুগে ঋষি, মহাপুরুষ, ভক্ত ও অবতার মেঘ-মন্দ্রে এই বাণীই প্রচার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করেছিলেন। কিন্তু সে ইতিহাসে পূর্ণ-দৃষ্টি স্থাপন করলে সন্দেহ থাকবে না—অহিংসার নীতি মূলে ছিল ভগবানের শিক্ষার।

অবশ্য—অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ভগবান বুদ্ধের প্রধান বিশ্ববাণী—কিন্তু তার মূল বিদ্যমান ভারতের বেদ-সঙ্গীতে।

বলা বাহুল্য মৈত্রী ও বৈরিতা একই চিত্তে বাস করতে পারে, না। ভারতের দর্শন বুঝলে প্রতীয়মান হয় সে সত্যের যে মূল নির্দেশ করেছে আর্য্য-দর্শন, তার সহজ পরিণাম বিশ্ব মৈত্রী। মাত্র-জীবে দয়া নয়—সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ফেলতে হবে মনকে মৈত্রীর শান্ত রসে। তাই বেদ-মন্ত্র প্রাণকে উদ্দীপিত করে শান্তি-রথে পরিভ্রমণ করতে—জলে, স্থলে, মরুতে, ব্যোমে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, তারায়। কারণ আর্য্য অনুভূতির সার্থকতা ব্যাপকতায়। আমি-ঘেরা চেতনাকে বিস্তৃত করার আয়োজনই যাগ যজ্ঞ পূজা পাঠ। আর্য্য ঋষিরা বিশ্ব-বাণী শুনিয়েছেন জগতকে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তাই বৈরিতা আপনার সাথে শত্রুতা, জীবহত্যা আত্ম-হত্যা।

প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত, দেবী-সূক্ত প্রভৃতি সকল শ্রুতিই বিশ্বের নিবিড় একতার বাণী প্রচার করেছে। সৃষ্টির বিভেদকে ফুটিয়ে তুলেই মানুষ চরম সত্য-পথ হতে ভ্রষ্ট হয়। ক্ষুদ্র-দৃষ্টি আনন্দধামের অনুভূতি লুপ্ত করে, আমাদের করে পথ-হারা পথিক। তাই জীবনের পথ দুঃখ বহুল, যন্ত্রণার কাঁকর বিছানো। সেই পথকে লক্ষ্য করেই ভগবান বুদ্ধ দুঃখকে আর্য্য সত্য বলেছিলেন এবং তিনি বুঝিয়েছেন দুঃখ নিবৃত্তির পথও আর্য্য-সত্য।

ভারতের বেদোপবৃংহিত সকল স্মৃতি, উপনিষদ, পুরাণও শাস্ত্রের সত্যার্থে আমাদের চিত্ত অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হতে পারে সাম্য দৃষ্টিতে। বিভেদের শত-ভ্রান্ত পথ সৃজন করেছে মানব মনের ভ্রান্তি।

আমি মাত্র অপর একটি বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করব। তা হ'তে সপ্রমাণ হবে, প্রাচীন আর্য্য ঋষি তপোবনের মুক্ত আকাশ তলে, মুক্ত বাতাসে, শান্ত পরিবেশে, শান্তিকে, অহিংসাকে, বিশ্বের প্রত্যক্ষ একানুভূতিকে কি ভাবে উপলব্ধি করতেন। এ মন্ত্র আনন্দের অমৃত-ধারায় বিশ্বকে স্নান-পূত করবার শুভ কল্যাণকর বন্দনা।

পৃথিবী-শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধি-সমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ-শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তিময় হক। এই সব শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তির দ্বারা, যাহা এখানে ঘোর, যাহা এখানে ক্রুর, যাহা এখানে পাপ, তাহা আমরা শান্ত করি, তাহা শান্ত হক, তাহা কল্যাণ হক, সমস্তই আমাদের শুভ হক।*

এই পবিত্র-মন্ত্র বিশ্লেষণ ক'রে, তার অন্তর্নিহিত-অর্থে মনসংযোগ করলে, অহিংসার উপলব্ধি হবে মূর্ত্ত। পৃথিবীতে যত কিছু ঘোর আঁধার

---

* স্বস্তিপন্থামনুচরেম সূর্যচন্দ্রমসাবিব
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি।৫।৫১।১৫

† দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষ শান্তিঃ; পৃথিবী শান্তি রাপো শান্তি রোষধয় শান্তি, বনস্পতয়ঃ শান্তি সর্বং শান্তি শান্তিরেব শান্তি। মা মা শান্তি রেধি।

‡ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তাম মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষ্যামহে।

* "পৃথিবী শান্তি অন্তরীক্ষ শান্তির্দ্যৌঃ শান্তি রাপ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তি বর্ণস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ সর্ব্বে দেবাঃ শান্তি শান্তিঃ শান্তিভিঃ। তাভি শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং। যদিঃ ঘোরং যদিহ ক্রুরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ।

রূপে প্রতিভাত হয় তার উচ্ছেদ হয় শান্তিতে, বৈরিতায় নয়। ক্রুরতা সৃষ্টির এক ধারা। ঋজুতা মুক্তির পথ। যাকে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় ক্রুর, তাকে প্রশমিত করবার সরল পথ হিংসামার্গ নয়। কারণ হিংসার প্রতিক্রিয়া হিংসা। তাই বেদের নিদর্শন—বিশ্ব-শান্তির কল্যাণ কামনা। সে ঐকান্তিক শান্তি মাত্র সম্ভব জলস্থল মরুদ্ব্যোম চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহতারার শান্ত প্রসন্নতা হতে।

পাপ-পুণ্য সম্পর্কবাচক। কর্ম জীব-ধর্ম্ম। কর্ম সাধিত হয় কায়, মন, বাক্যে। যে কর্ম মুক্তির পথে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধক, সে কর্ম পাপ। যে কর্ম অগ্রগতির বাহন, নিয়ামক ও পথ-প্রদর্শক সে কর্ম পুণ্য। কিন্তু পাপের প্রতিহিংসাও পাপ। তার সাথে হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে সংগ্রাম-রত হলে হিংসা অসুর হবে বিজয়ী। পাপ-নিবৃত্তি সম্ভব শান্তিময় অনুষ্ঠানে।

তাই শ্রুতি বিশ্বের ব্যোমপথ মুখরিত করলে শুভ সঙ্গীতে—যা ঘোর, যা ক্রুর, যা পাপ, তা হক শান্ত। তা হলে বিশ্বের সকল শক্তি, সকল ছন্দ, সকল স্পন্দন হবে কল্যাণকর শান্ত।

শুক্ল যজুর্বেদ মানুষকে আহ্বান করেছে নিজের মধ্যে তেজ, বীর্য্য, বল, শক্তি, মানসিক ওজস্বিতা এবং প্রভাবকে উদ্‌বুদ্ধ করতে, কারণ তারা চিরকল্যাণময়ের উপাধি। পশুবল বা হিংসার স্থান নাই আর্য্যকৃষ্টিতে।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ—অপরের নিঃশেষে তাঁর প্রকাশ নয়। কারণ পরা ও অপরা সকলই তাঁর অনন্ত শক্তি হতে স্ফুরিত। তাঁর প্রকাশ আমাদের মাঝে বাণী এবং মনের অভিন্ন একতায়। তার পথ নির্দেশ করেছে উপনিষদ। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সকল প্রকার উপদ্রবের উপশমের কামনায় মন্ত্রে শান্তি শব্দ উচ্চারণ করতে হয় তিন বার—শান্তি শান্তি শান্তি। সাধনার পথে মন এবং বাক্য একত্র প্রতিষ্ঠিত হলে প্রার্থনা হয় মূর্ত্ত—আবিরাবির্ম এধি—হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আমাতে প্রকাশ পাও।

আর্য্যশাস্ত্র পোষণ করেছে অহিংসার নীতি! শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-মার্গে মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র নীতি বর্ণনায় নয়, রস পরিবেশনে। ভক্তি দীপ্ত করে ভক্তের মর্ম্মস্থল। অগ্নির মত শুদ্ধ করে ভক্তি জীবের প্রাণ। আত্ম-নিবেদন মাত্র সেই নরনারীর পক্ষেই সম্ভব যে আপনাকে শুদ্ধ করেছে অহিংস এবং নির্বৈর জীবন যাপন করে। ভগবানের নাম শুদ্ধ করে জীবকে নিঃসন্দেহ। কিন্তু হিংসা-কলুষিত মন তো ডাকার মত ডাকতে পারে না তাঁকে। হিংসার পাত্রও তাঁরই গড়া। হিংসা শান্তির বৈরী। শান্ত চিত্তই মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয় ভগবানের রাজসভায় সিংহাসনের পাদমূলে। তাই ভগবান স্বয়ং বলেছেন—"আমি পদরেণুর দ্বারা সমগ্র জগতকে নিত্য পবিত্র করি, নিরপেক্ষ শান্ত নির্বৈর সমদর্শন মুনির অনুগমন করি।"* এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে নির্বৈর এবং সমদর্শী হ'লে তিনি আমাদের চিত্ত-বৃন্দাবন পবিত্র করেন নিজের পদরেণু বরিষণে। সে পবিত্র ধূলার এক অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেণুকণা পুলক-শিহরণে জীবকে আনন্দলোকের সমাচার দেয়। সে অবস্থা ভক্ত উদ্ধবকে বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

"আমার কথা শ্রবণ করে বাক্‌গদগদ হয়, চিত্ত হয় দ্রবীভূত, কখনো রোদন, কখনো হাস্য, কভু বা লজ্জাশূন্য হয়ে গান গায়, নৃত্য করে—আমার এমন ভক্তিপ্রাণ ভক্ত ত্রি-জগৎ পবিত্র করে।"*

তাই ভারত জানে ভক্তের ভগবান। ভক্তিমান পারে না কাকেও পর ভাবতে; সমদর্শী না হলেও ভক্তিরস সিঞ্চিত করে না প্রাণ ও চেতনা।

আমি পরে বোঝাবার চেষ্টা করব যে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝনঝনার মাঝে গীত হয়েছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভারতের অহিংসার নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, হিংসানলে ইন্ধন জোগাবার জন্য নয়।

আমাদের দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য-পথ সুগম হয় মনের মাঝে ভক্তির প্রদীপ জেলে রাখলে। সাধনা রসহীন নির্মম হয় না প্রেমের স্পর্শে। বহুজনের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিলে শক্তি বাড়ে, আনন্দের ঝরণাধারা প্রবল হয়। ভক্তিই আনন্দ। আনন্দ ভূমায়, বিরাটের, মহানের উপলব্ধি ও সান্নিধ্যবোধে। চিত্তের পটভূমিতে তার মৈত্রী ও করুণার ছায়া যদি থাকে বিদ্যমান, তা হলে সে আপনি ছড়িয়ে পড়ে জগজ্জনের মাঝে।

মহানির্বাণ-তন্ত্র বলেছে—দিব্য ভাব অবলম্বন করতে হ'লে দেবতাগণের ন্যায় সদা শুদ্ধান্তকরণ হ'তে হবে। দ্বন্দ্বাতীত, বীতরাগ, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান এবং ক্ষমাশীল হ'তে হবে।†

জৈন তীর্থঙ্করদের অহিংসা পরমো ধর্ম নীতি সুবিদিত। তাঁরা ছিলেন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী, বহু সামাজিক অনুষ্ঠানের বিপ্লবী। তাঁরা বিশেষরূপে প্রচার করেছিলেন অহিংসা মন্ত্র। জীব জন্তুকে নিয়মমত খাদ্য দান জৈন শিক্ষার অঙ্গ।

ভগবান বুদ্ধ অহিংসা, মৈত্রী ও করুণাকে লোক ধর্মের বিভিন্ন বিধির সঙ্গে মিলিয়েছেন। প্রত্যেক বৌদ্ধকে পঞ্চশীল পাঠ করতে হয়, সকল কর্মের প্রারম্ভে। প্রথম শীল—পানাতিপাত বেরমনি শিক্ষাপদং সমাদীয়ামি।—প্রাণপাত হতে বিরত হবার শিক্ষাপদ আমি সম্পাদন করব।

ধম্মপদের বিশ্ব-বিশ্রুত শ্লোক—
নহি বেরেণ বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেণ চ সম্মান্তি এস ধম্মো সনন্তন।

---

* নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পুণ্যেয়ত্যঙ্ঘ্রি রেণুভিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।১৪।১৬

* বাক্‌গদগদা দ্রবতে যস্যচিত্তং
রুদত্য ভীক্ষ্ণং হসতি কদিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবন পুণাতি॥

† দিব্যশ্চ দেবতাপ্রিয়ঃ শুদ্ধাকরণঃ সদা
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী।১।৫৬

এ শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়।

অবৈরে যে শান্তি লভে, এই ধর্ম্ম কয়।

ধম্মপদ অন্য শ্লোকে বলেছে—প্রাণ-হিংসার দ্বারা আর্য্যপদ লাভ হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা করলে তবে আর্য্যত্বলাভ হয়।*

গৌতম বুদ্ধ নিজ শ্রমণ গণকে সদা অহিংসা-নিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যাদের মন দিবা রাত্রি অহিংসা রত থাকে।†

আমি ধম্মপদের অন্য কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করছি।

"ও ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়েছে, প্রহার করেছে, পরাজয় করেছে, আমার ধন অপহরণ করেছে—এরূপ চিন্তাকে যারা প্রশ্রয় দেয় তাদের ঘৃণা কোনোদিন প্রশমিত হয় না।"

সাহসবর্গে বড় সুন্দরভাবে অহিংসা নীতি মনুষ্যের সংযম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"একজন ব্যক্তি সহস্রবার সংগ্রামে সহস্র ব্যক্তিকে জয় করতে পারে। কিন্তু যিনি আপনাকে জয় করেছেন তিনিই সর্ব্বোত্তম বিজয়ী।"

শ্লোকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে সহস্র সংগ্রামের ব্যর্থতা এবং আত্ম জয়ের প্রচুর সার্থকতা। অন্যত্র বলা হয়েছে—"প্রহার দণ্ডকে ভয় করে সবাই। মৃত্যু ভয়ে সঙ্কিত প্রত্যেকেই। আপনাকে পরের উপমায় কাহাকেও প্রহার করনা, প্রাণহানি করনা।" অন্যত্র—

"আত্মসুখ কামনায় যে সুখকামী ব্যক্তি পরের হিংসা করে না, মরণান্তে সে সুখলাভ করে।"

"নিরস্ত্র নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে মানুষের নিজের দশবিধ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা—দারুণ মর্ম্মপীড়া, ক্ষতি, অঙ্গহানি, কঠিন ব্যাধি, উন্মত্ততা, রাজদণ্ড, দারুণ অপবাদ, ধনহানি বা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা নিজের গৃহদাহ। এমন অজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুর পর নিরয় প্রাপ্ত হয়।"

বলা বাহুল্য বৌদ্ধনীতি অহিংসাকে অতি উচ্চ প্রবৃত্তি জ্ঞান করে। এর সাধনা ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ।

ককচূপম সুত্তে বলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধের নিজের উক্তি।

"ভ্রাতৃবর্গ! যদি কোনো দুর্বৃত্ত দুদিকে হাথলযুক্ত করাত দিয়ে কোনো লোকের নানা অঙ্গ কেটে দেয়, সেই নিপীড়িতও যদি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কোনো প্রকারে সে আমার শিষ্য হ'তে পারে না। এমন অবস্থাতেও আমার প্রকৃত-শিষ্যকে অসীম মৈত্রী ও করুণাকে আয়ত্ত করতে হবে।"

বলা বাহুল্য এ নীতি বিবৃত করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন সেই রাজপুত্র যিনি রাজ্য, ধন, মান, নিজের নির্ব্বাণ উপেক্ষা করে জীবের মোক্ষের সন্ধান পেয়েছিলেন বোধিদ্রুম তলে।

মেত্ত সুত্তের মাত্র একটি সুত্তের উল্লেখ করব।

"ভদ্র শিষ্য কোনো জীবিত প্রাণীর প্রতি যেন বিদ্বেষ পোষণ না করে। দৃষ্ট, অদৃশ্য, নিকটস্থ বা দূরস্থ, জন্মেছে বা পরে জন্মাবে এমন সকলের প্রতি প্রীতি অনুশীলন করুক সে। নিজের জীবনহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও মাতা যেমন তার নিজের পুত্রকে বাঁচায়, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অসীম করুণার অনুশীলন কর।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কলির প্রভাব সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হয়, সে বর্ণনা স্থান বিশেষে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ম্লেচ্ছ রাজার শোষণ কার্য্য অবধি সে চিত্রে অঙ্কিত হ'য়েছে। কিন্তু শাস্ত্রকার আশাবাদ বর্জ্জিত নন। তিনি উপায় দেখিয়েছেন কি ভাবে মানুষ কলির প্রভাব অতিক্রম করতে পারে। বলাবাহুল্য সে উপায়গুলি চিরাচরিত হিন্দু সমাজের আদর্শ। তার মাঝে আমরা দেখি—যাঁহারা হিংসা ও মাৎসর্য্য রহিত, দম্ভ ও দ্বেষ বিবর্জ্জিত, কুলধর্ম্মে যাঁদের নিষ্ঠা, কলি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না।*

অন্যত্র বলা হয়েছে পরোপকার ব্রতী সাধুদের কলি কিঙ্কর। কুলাচার-বিহীন, সতত অসত্যভাষী, পরদ্রোহপর নরসকল কলিকিঙ্কর। অহিংসা, উপাসনা, সত্যে অনুরাগ—সকল শাস্ত্র জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত করেছে আমাদের কর্ণে। তন্ত্র বলেছে—সত্যহীনের পূজা বৃথা। সত্যহীনের বৃথা জপ। ঊষর ভূমিতে বীজবপনের মত সত্যহীনের তপস্যা ব্যর্থ।

বলা বাহুল্য হিন্দু শাস্ত্র পূর্ণ অহিংসা, ঈশ্বরানুরাগ, সত্য প্রভৃতি সদ-গুণের প্রশংসা নিরত।

দর্শন ও অহিংসাকে সাধনার বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত করেছেন। পাতঞ্জল দর্শনের প্রসিদ্ধ সূত্র—

অহিংসায়াং প্রতিষ্ঠায়াং তত্র বৈরাভাব।

বলা বাহুল্য ধর্মগ্রন্থগুলি অহিংসানীতিকে উচ্চস্থান দিয়াছে। মাত্র উদাহরণ স্বরূপ আমি অপর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ শেষ করব।

জৈন দশ বৈকালিক সূত্রে পাই—ধর্ম্মই চরম মঙ্গল। অহিংসা, সংযম এবং তপ ধর্ম্ম। যার ধর্ম্মে মতি দেবতারাও তাকে সম্মান করে।†

ইহাই জ্ঞানীব্যক্তির জ্ঞানের সার। কোন প্রাণীর উপর হিংসা করবো না—বিশেষরূপে জেনো অহিংসার ইহাই পূর্ণ অর্থ।‡

জৈন বৃহৎ শান্তিস্তোত্র—

শ্রীশ্রমনসঙ্ঘের শান্তি হ'ক। শ্রীপৌরলোকের শান্তি হ'ক

শ্রীজনপদের শান্তি হ'ক। শ্রীরাজাধিপগণের শান্তি হ'ক।

শ্রীরাজসন্নিবেশদিগের শান্তি হ'ক। শ্রীসকল গোষ্ঠির শান্তি হ'ক।

* * *

শিবমস্তু সর্ব্বজগতঃ পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূতগণাঃ।

দোষাঃ প্রযান্তু নাশং সর্ব্বত্র সুখী ভবতু লোকঃ।

---

* ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণাণি হিংসতি।
অহিংসা সর্ব্বপাপানাং অরিয়োতি পবুচ্চতি ॥

† যেসং দিবা বা রত্তো চ অহিংসায়, রত্তো মন।

* হিংসামাৎসর্য্য রহিতা দম্ভদ্বেষ বিবর্জ্জিতাঃ
কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে নহি তান বাধতে কলিঃ।৪।৬১

† ধম্মো মঙ্গলমুক্কিঠং অহিংসা সংযমো তবো
দেবাহিতং নমংসন্তি জস্ম ধম্মেসয়া মনো।

‡ এসং খুনানিণো সারং জংন হিংসহ কংচন।
অহিংসা সময়ং চেব এয়াবংতং বিবানিয়া।

সূয়গদং সূত্র ।১, ১১,১০,

১১

কথাটা সুরমার কানেও উঠেছিল। রমাকে ডেকে নিয়ে এল নিজের ঘরে। বললে, একটা গল্প শুনবি ভাই ?

গল্প ! রমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ—সেদিন শুনলাম ওঁর মুখে।—রবিবাবুর নাম শুনেছিস তো—তাঁর লেখা···কবিতাও নিশ্চয় পড়েছিস ছেলেবেলায় ? দশচক্রে তিনিও একবার কি নাকালটা না হয়েছিলেন ! তখন তিনি ছেলেমানুষ, দেখতে সুন্দর-কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—গোলাপ ফুলের মত রঙ, টানাটানা চোখ—তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু—আর নরম গোলগাল চেহারা। ওঁর ভাগনে সত্যপ্রসাদই বুঝি তাঁর নাম—ওঁর একজন সহপাঠীরা মজা দেখবার জন্য বলেছিল—যাকে তোমরা রবি বলে জান—ও আসলে হ'ল গিয়ে···একটা মেয়ে।—নাম ভাঁড়িয়ে ছেলেদের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। সহপাঠী বিশ্বাস করে নিলে—রবীন্দ্রনাথ ছদ্মবেশী মহিলা। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক পরীক্ষা আরম্ভ হলো। রবীন্দ্রনাথ গান করেন, অপূর্ব্ব মিষ্ট-কণ্ঠ, বালকের স্বরের সঙ্গে বালিকার স্বরের তফাৎ ধরবে কে ? ছেলেটি ঠিক করলে—এমন গলা মেয়েছেলের ছাড়া হয় না। তবুও পরীক্ষা চলল।—একদিন রবিকে একটা তক্তাপোষের ওপর উঠিয়ে বলা হ'ল ঝাঁপ খাও তো দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপ খেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঝাঁপ খাবার সময়ে তিনি আগে ফেললেন বাঁ পাখানি। ব্যস, নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হল—তিনি মেয়েছেলেই। মেয়েরাই তো চলবার সময়—বাঁ পাখানি আগে বাড়িয়ে দেয়।

···রমা খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, সত্যি—সুরমাদি ? কেমন করে ওরা ভাবলে এমন কথা !

যা নয়—সেই কথাই তো লোকে ভাবে বেশী করে। ···যে কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে—সে কথা প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে খাটে।···এই অন্ধ বিশ্বাসই—মানুষকে নষ্ট করে।

রমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বললে, সুরমাদি—তোমার গল্প বলার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি।

পারবি বইকি ভাই—তুই তো নির্ব্বোধ নস। যে মিথ্যা নিয়ে সংসার মাতামাতি করে—সে মিথ্যাকে মনে ঠাঁই দেওয়া যে অন্যায়।

তুমি বিশ্বাস কর না সুরমাদি ?

বিশ্বাস কি করে করি বল। আমার সম্বন্ধেও তো ওঁরা কম রটনা করেন নি—সে সব বিশ্বাস করলে এতদিনে আমি কি আর আমি থাকতাম রে !

সুরমার হাসি দেখে রমার চোখে জল এল। বললে, আর সত্যিই যদি হয়—আমি কোন লোকের সঙ্গে কথা বলে থাকি ?

তাতে হ'য়েছে কি ? কথা তো লোকের সঙ্গে বলবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। খিল খিল করে হেসে উঠল সুরমা।

না—সুরমাদি, সত্যিই একজন অনাত্মীয় পুরুষ—

থাম। ধমক দিয়ে উঠল সুরমা। কুমারী মেয়েরা বুঝি আত্মীয় অনাত্মীয় চেনে না ? ভাল মন্দ জ্ঞান তাদের নেই ? বিয়ে হয়ে গেল তো—সব সন্দেহের অতীত হয়ে গেল। ওই নোংরা কথা নিয়ে যদি মন খারাপ করিস তো সত্যি বলছি, তোর ওপর রাগ করব।

সেই মানুষটি কে জানতে চাইলে না তো সুরমাদি ?

আমার অমন অসভ্য কৌতূহল নেই। ভাল সংবাদ জানব—মিষ্টি মোণ্ডার সঙ্গেই—এক তরফা লাভ করব কেন

রে? বলে রমার মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরে হেসে উঠল শব্দ করে।

তুমি হাসছ? সুরমার বুকে মুখ গুঁজে রমা হু-হু করে কেঁদে উঠল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলে সুরমা। মুখে কোন কথা বললে না। ভাষার চেয়ে মৌন স্পর্শ দিয়ে কি পরিমাণ বেদনা মুছে নেওয়া যায় তা সুরমা জানে।

ক্রমে সবই জানলে সুরমা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তোর আশা দুরাশা বলে—তোর স্বপ্ন ভেঙ্গে দেব না। যদি নাই আসে তোর রাজপুত্র—তবু তার আশাতেই দিন গুণতে হবে। মেয়েরা নিজের ভালবাসা দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী করে—যেমন ভক্ত মন দিয়ে তৈরী করে ধ্যানের দেবতাকে। একদিন উনিই যেন বলছিলেন, ভক্ত বলেন—দেবতা মাটি কাঠ কি পাথরে নেই। ভক্তের ভাবের মধ্যে যে মূর্ত্তি তাই মাটি কি পাথরকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। এইভাবেই নাকি মানুষের মধ্যে এসেছেন ভগবান।

রমা চোখের জল মুছে—এই অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী গলাধঃকরণ করলে। মন থেকে একটি ভার নেমে গেল। যাঁরা জীবনকে সত্যের আলোকে যাচাই করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন—জীবনের সত্য অর্থ সম্বন্ধে তাঁরা দু'রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। প্রাণের রাজ্যে যার স্থান শীর্ষদেশে—সে হল ভালবাসা। এই বস্তু যার নাই—

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বললেন, ব্যাপার কি? দু'জনে গম্ভীর হয়ে বসে কার ধ্যান করছ?

পৃথিবীতে ধ্যেয় বস্তুর অভাব কি। কাকে ধ্যান করলে সব ধ্যান পূর্ণ হয়—

বিনয়বাবু বললেন, সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেবতাকে। তারপর রমার কি খবর? পড়ব এই আশ্বাস দিয়ে চলে গেছ আজ তিন মাস হ'ল—সেই আশ্বাসেই এতদিন—

রমা বললে, আমাকে পড়ানো মানে তো লোকসান।

বাঃ রে—লাভ লোকসান জ্ঞান তোমার বেশ পেকে উঠেছে তো?

উপায় কি—পরের সংসারের খবরদারি করতে হয় যে আমায়।

—না—না, ও সব পাকামি ছেড়ে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে নাও। অবশ্য সাংসারিক জ্ঞান তোমাদের যথেষ্টই আছে। তবু—হাতাবেড়ি খুন্তি। পূজা-ব্রত আচার নিয়মের বাইরে আরও একটা রাজত্ব আছে জ্ঞানের—

আজ বুঝি ক্লাসে ছাত্ররা লেক্‌চার শোনেনি? চাপা হাসিতে প্রশ্ন করলে সুরমা।

বিনয় বললেন—যে কাল পড়েছে—তাতে উপদেশ কেউ শোনে?

কিন্তু এই কালে সবাই শোনাতে চায় নিজের কথা। দু' একটি কথা নয়—ঝুড়ি ঝুড়ি কথা—তত্ত্বকথা—হিতকথা—পরামর্শ কথা।

বাঃ রে—তোমারই কণ্ঠে আজ দেখি সরস্বতী বাসা নিয়েছেন! বস না রমা—একটু গল্প করা যাক।

অনেকক্ষণ এসেছি—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

রমা চলে গেলে সুরমা বললে, বাইরের অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে তো লেকচার দাও—হাতের কাছে—ঘরের মধ্যে যে সব সমস্যা রয়েছে সে সব অত্যন্ত ছোট বলে বুঝি নজরে পড়ে না?

বিনয়বাবু বললেন, কি জান—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

এতো আর মিথ্যে নয়!

খুব হয়েছে। জল খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসি চল। অনেক পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।

—দু'জনে এসে বসল কার্জ্জন পার্কে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে—দূরে সৌধনিঃসৃত তীব্র আলো এসে পড়েছে থামের উপর—গাছের মাথায়। অন্ধকারে গাছের জাতি নির্ণয় করা দুষ্কর—সেদিকে অবশ্য কারও লক্ষ্য নাই। মাথার উপরে তারা-ঝলমলে আকাশ—সেদিকেও চেয়ে দেখবার অবকাশ নাই। দুজনে মুখোমুখি বসল।

সুরমা বললে, একটা কথা রাখবে আমার? পার তো এই বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই চল।

কোথায় বাসা ? বিনয় বললে, শুধু বাসা মনের মত হ'লে হবে না—উপার্জ্জন সেই অনুপাতে হওয়া চাই।

কেন—তোমার তো অনেক সময়, পার্ট টাইমের চাকরি নাও না কোথাও।

চাকরিই নিই যদি ভাল বাসা নেওয়ার কোন অর্থ থাকবে না।

কেন ?

কেন বোঝনা ? তখন তো আর হাতে বাড়তি সময় থাকবে না, কার্জ্জন পার্কে হাওয়া খাওয়া চলবে কি ? কাজের চাকা তখন জোরে ঘুরবে—আর একদিকে তুমি আর একদিকে আমি, কেউ কারও সঙ্গই পাব না। সে বিচ্ছেদ সইতে পারবে তো ?

কিন্তু এখানে যে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি। পুরনো ছোট্ট বাড়ী—বাড়ীর মতই নানা মতের সব মানুষ। ওদের এক ফালি মনের মধ্যে হাওয়া নেই—আলো নেই—খালি ধোঁয়া। দম যে বন্ধ হয়ে আসে।

তাই তো কার্জ্জন পার্কে আসি দম নিতে। এখানে আকাশ কত বড়—পৃথিবী কত সুন্দর। এখানকার আলো আর হাওয়া এত বেশী যে—বাড়ীতে ফিরেও তার মধ্যেই থাকি—ফুরিয়ে যাই না আমরা।

রমার জন্য আমার কষ্ট হয়।

বাংলাতে কি ওই একটিই রমা ?

ওকে এখানে নিয়ে এলে কেমন হয় ?

পাগল ! এখানকার হাওয়া তাহলে বিষিয়ে উঠবে।

ওকে আমি এমন কিছু উপায় বলে দিতে পারি না কি —যাতে করে ও কারও গলগ্রহ না হয়ে বেঁচে থাকতে পারে ? সুরমা অত্যন্ত আগ্রহভরে বিনয়ের হাত চেপে ধরলে।

বিনয় বললে, কিছু সাহায্য তুমি করতে পার। তোমার সেলাই-কলটার ঢাকনিতে ধুলো জমছে—সেটা অন্ততঃ দূর করতে পার।

কেমন করে ?

অবসর সময়ে ওকে সেলাই শেখাও। এমন অনেক ভদ্রঘরের মেয়ে সেলাই জানে—উপার্জ্জন করে।

বেশ—তাই শেখাব। আর লেখাপড়া ?

পার তো শিখিও—কিন্তু রমা স্বাধীন নয় এটা মনে রেখো।

আচ্ছা—আমাদের দেশে মেয়েদের এমন অবস্থা কেন ? তাদের সম্মান নেই—সাহস নেই।

ভুল বলছ সু, সব ঘরের মেয়েরা এমন অসহায় নয়। যাও ওপর তলায়—স্বামীর বিত্তে স্বামী অবর্ত্তমানেও মেয়েরা অভাব বোধ করে না। নাম নীচের তলায়—সেখানে স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে করে উপার্জ্জন; একের অভাবে অন্যে অসহায় নয়। শুধু মাঝের তলায় আমরা, যাদের উপরের পরদা টেনে মানসম্ভ্রম বজায় রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা, যারা নীচের খোলাখুলি জীবনকে অত্যন্ত ভয় করে—তারাই সবচেয়ে হতভাগ্য। বাড়ী ছাড়বে ভাবছ, কিন্তু কোথায় নেই এই সব-নিশ্চিহ্ন-হওয়ার খেলা !

আমরা তাহলে এমনিই থাকব ? অত্যন্ত কাতর শোনাল সুরমার কণ্ঠ।

জানি না—মধ্যবিত্তেরা কোথায় যাবে ! দধীচি নিজের অস্থি দিয়ে দেবকুলকে রক্ষা করেছিলেন—স্ব-ইচ্ছায়। আমরা অবশ্য দধীচি নই—তবু নিজেদের নিঃশেষ করেই ভারতবর্ষকে সুন্দর করে তুলেছি। ইতিহাসে কেউ যদি আমাদের কথা লিখে রাখে—থাকব আমরা সেইখানেই ! পৃথিবীর জল হাওয়া কালে কালে বদলে যায়—যারা সেই প্রতিবেশ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না—তারা প্রকৃতির রাজ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। আজ পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী নেই যারা সৃষ্টির প্রথম যুগে ছিল। আমরাও যদি না থাকি—

সুরমা বললে না—তোমার কথাগুলো ঠিক লেকচারের মত শোনাচ্ছে। এ ঠিক বক্তৃতা নয়, প্রাণের বেদনা থেকে উৎসারিত কথা। শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে কে হয়েছে চিরস্থায়ী ? পাকে শেওলায় স্রোত রুদ্ধ হলে নদীর মৃত্যু স্বাভাবিক।

বিনয় বললে, আমরা শিক্ষক, বিদ্যা বিতরণ করি—জ্ঞান দিই মানুষকে। শিক্ষা দিই যাতে মানুষ বাঁচতে পারে তার মর্য্যাদা নিয়ে। একটি মানুষ জ্ঞানে কর্ম্মে বিদ্যায় সম্পূর্ণ হলে দেশের মুখোজ্জ্বল হয়, জাতির সংস্কৃতি সেইখানে, কিন্তু আমরা পাই না খেতে—নানাদিক দিয়ে উঞ্ছবৃত্তি—আমাদের দিয়ে মানুষ তৈরি করা কি এতই সোজা ! একটা গল্প মনে পড়ল শোন। রামকৃষ্ণদেবের গল্প। এক রোগী এসেছিল কবিরাজ বাড়ীতে। কবিরাজ

মশায় ভাল করে পরীক্ষা করে তাকে বললেন, পরশুদিন আসবে—তোমায় ওষুধ দেব, আর বলে দেব কি কি নিয়ম পালন করবে। সেদিন রোগী আসতেই তাকে ওষুধ দিয়ে বললেন—দেখ গুড়টা কেবল খাবে না। রোগী চলে গেলো—কবিরাজের বন্ধু বললেন, হাঁ হে—এ আবার তোমার কি রকম ধারা। রুগীটাকে মিছিমিছি দুটো দিন ভোগালে। সেই দিনই ওষুধ আর ব্যবস্থা দিতে পারতে তো। কবিরাজ হেসে বললে, না ভাই পারতাম না। সেদিন ব্যবস্থা দিলে রোগীর বিশ্বাস হতো না আমার ঔষধে আর ব্যবস্থায়। সেদিন ঘরেতে ছিল দশ বারো কলসী গুড়। আমি যদি বলতাম—গুড় খেয়ো না, তাহলে রোগী ভাবত—উনি মিছে কথা বলছেন। যার ঘরে দশ বারোটা গুড়ের কলসী—তার ব্যবস্থায় গুড় না খাওয়ার ব্যবস্থাটা কেমন-কেমন নয় কি? আজ দেখ ঘরে একটিও কলসী নেই—আমার উপদেশও ভুলবে না।

সুরমা বললে, মাস্টার মশাইরা বুঝি—গল্পের কবিরাজ হতে পারেন না?

পারবেন কি করে। যিনি নিজে সুস্থ নন—তিনি সুস্থ জাতি তৈরী করতে পারেন? শিক্ষককে সুস্থ রাখবার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধাররা কি ব্যবস্থা করেছেন? আধপেটা খেয়ে আদর্শপ্রচারের যুগ আর নেই।

সুরমা বললে, চল ওঠা যাক। তোমার কথা শুনলে মনে যেন হাঁপ ধরে—আমি সহ্য করতে পারি না।

চল।

দুজনে চলতে লাগল। উদ্যানের আবছা অন্ধকার ঠেলে—রাজপথের পরিপূর্ণ আলোয় এসে দাঁড়াল। পথ কি সত্যই আলোময়? ওরা কোনদিকে না চেয়ে আপন আপন চিন্তার ভার নিয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগল।

১১

মাসের শেষে খরচের টাকায় টান ধরে। এঘরের বাসিন্দারা হাত পাতে ওঘরের কাছে—ওঘরের বাসিন্দারা স্থানান্তরে ঋণের বোঝা বাড়ায়। ওরা সবাই হয়তো জানে—পরস্পরের অবস্থা, সবাই চেষ্টা করে পরস্পরের কাছে নিজেকে সম্মানীয় বলে প্রচার করতে।

সেনদিদি বলেন, মাসের শেষে রুই মাছের ছানা আসে না—কপি আর আলু কেনা কমে যায়—আনাজগুলোও কম আর শুকনো পচা। মাসকাবারের মুখে বাজার দেখে গেরস্তর অবস্থা চেনা যায়। কিন্তু ভাই—কেইবা বলবে কাকে—সবই তো দিন-আনা দিন-খাওয়ার দল। মুখের জাঁক তো কমে না কারও।

ভগবতীর হাতও খালি হয়ে এল। শুকনো মুখে অমরনাথকে বললেন, এখন কি হবে? দেশের বাড়ী নয় যে—পুকুরের কলমি—আর পাদাড়ের মানকচু, কি গাছের ডুমুর পেড়ে চালিয়ে দেব। এখানে মাটিটুকু না কিনলে চলে না।

অমরনাথ বললেন, তোমাদের আসায় গাড়ীভাড়া, নতুন বাসা পাতার হাঙ্গামা—ব্যয় বেশীই হয়েছে—একবেলা রান্না না হয় করো না।

সে তুমি আমি না হয় বুঝলাম—কচিগুলো তো বুঝবে না। ওরা 'কি খাব' বলে দাঁড়ালে—যা হোক কিছু ধরে দিতেই হবে।

আমার আংটিটা বাঁধা দিয়ে যদি কোথাও কিছু জোগাড় করতে পার—

আচ্ছা—তোমার আংটি রাখ। একটু ভেবে ভগবতী বললেন, শহরের ব্যাপার যে রকম দেখছি—প্রতি মাসে অনটন বাড়তে পারে। তার চেয়ে তুমি কেন এক কাজ কর না—কিনুর বাবাকে বলে—দু'একজন ছেলে পড়ানোর ব্যবস্থা করে নাও না?

ঠিক বলেছ। কিন্তু এ কথা বলতে আমার লজ্জা করে।

তোমার আপিসেও তো উপরি পাওনা হতে পারে—

না ভগবতী, ন্যায্য শ্রমের যে পাওনা তাই আমার যথেষ্ট। উপরি পাওনার মানে বোঝ?

কেমন করে বুঝব—সবাই বলে উপরি পাওনা—তাই শুনি।

উপরি মানে চুরি। মানে কোম্পানীর মাইনে খেয়ে তাকেই ঠকিয়ে রোজগার করা।

শিউরে উঠলেন ভগবতী। বললেন, বল কি—সবাই চুরি করে?

অমরনাথ হাসলেন, না—না উপরি। যে যত উপায় করতে পারে এই ভাবে—তার মান সম্মান তত বেশী। আজকাল অর্থের সম্মান—

চিরকালই তাই। কথায় বলে, নির্ধনের আবার বুদ্ধিই বা কি—জ্ঞানই বা কি!

অমরনাথ বললেন, আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু বিদ্যারই সম্মান দিয়েছে। ভিখারী শঙ্কর—সব ছেড়েও সকলের পূজ্য। জ্ঞানমূর্ত্তি বলেই তিনি দেবতাদের শ্রেষ্ঠ।

ভগবতী সেনদিদির কাছে গিয়ে বললেন, গোটা কতক টাকা হবে দিদি—মাস কাবারেই—

সেনদিদি বললেন, মাসকাবার যে সকলকারই ভাই। তা এক কাজ কর—মনা স্যাকরার কাছে কিছু গহনা থাকে তো বন্ধক দিয়ে নাও গে। টাকায় এক আনা করে সুদ।

মোনা স্যাকরা কে?

ওই যে বাইরের দিকের ছোট ঘরে পিদীম জ্বালিয়ে ঠুক্‌ঠাক্ করছে। যে অন্ধকার ঘর, পিদীম না জ্বালালে দিনের বেলাতেও মানুষের মুখ দেখা যায় না।

তা আমি তো ওঁকে জানি না দিদি—

জিনিস নিয়ে চল না আমার সঙ্গে—

না—না—সে আমি পারব না—সত্রাসে জবাব দিলেন ভগবতী।

কি জ্বালা—তোমাকেই বা সামনে যেতে হবে কেন—তুমি গলির ভেতরে থাকবে—আমি যাব।

নিজের কানের মাকড়ি দুটি খুলে—সেনদিদির পিছনে পিছনে চললেন ভগবতী। গলির মুখেই ঘর—দরজাটা পথের ধারে একটি ছোট জানালা শুধু গলির দিকে। কিন্তু তা দিয়ে বাইরের আলোকে ঘরে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জানালার শিক দিয়ে দেখলেন ভগবতী—সেই সঙ্কীর্ণ ঘরে—থাক-কাটা দেড়কোর উপর একটি বড় মাটির প্রদীপ জ্বলছে। এক প্রদীপ তেল ও এক গোছা মোটা সলতে তার গর্ভে। শিখাটা লালচে—এবং সাধারণ সন্ধ্যা দেখানোর প্রদীপের চার পাঁচ গুণ বলে আলোটা বেশীই হয়েছে। সেই আলোয় ঘরের স্যাঁতস্যাঁতানি ভাবটি ফুটে উঠছে। একটা জায়গায় দুখানা তক্তা বিছানো—তার উপর ছেঁড়া সতরঞ্চ পাতা। প্রদীপের কাছে—নেহাই গোছের একটা যন্ত্র—তার দেয়ালের দড়িতে টাঙানো রয়েছে নানান আকারের সোন্না, কাঁচি, ব্রাস, হাতুড়ি, ছেনি প্রভৃতি অলঙ্কার নির্ম্মাণের যন্ত্র। ঘরের মধ্যে ছোট মত একটা কাঠের আলমারি রয়েছে—একটা ড্রয়ারওয়ালা ডেস্কের মাথায় পিতলের নিক্তি ও ওজন বাটখারা। তারই সামনে বসে—মনা স্যাক্‌রা থেলো হুঁকোয় তামাক টানছে—ভুড়ুর ভুড়ুর শব্দে। ছোট ক্ষয়া মানুষটি—দেহের মধ্যে সৌষ্ঠব কোথাও নাই, ভুঁড়িতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মাংস জমেছে। মস্তক কেশবিরল—মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি। তবু সেই হাসি-মুখের শোভা না হয়ে ধূর্ত্তামিকেই প্রকাশ করছে যেন। নতুন কেউ এলে মন্মথর হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে ওঠে—বিনয়ে বিগলিত হয়ে ওর প্রকৃতিতে যা হবার নয়—তাই হয়ে যাবার চেষ্টাটা প্রকট হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যেকার গালার তীব্র গন্ধ—জানালা দিয়ে গলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

এই যে আসুন—আসুন দিদি—বসুন।

মন্মথর সামনে দু'খানা বেঁটে গোছের টুল আছে, খরিদ্দার এলে খাতির করে বসায় মন্মথ।

না ভাই বসব না।—দেখতো এই জিনিসটা—, এটি রেখে দশটা টাকা দিতে পার?

হেঁ—হেঁ—তা আর পারব না কেন। আপনারা কি ঠকাবেন আমাকে! দেখি।—মাকড়ি হাতে নিয়ে মন্মথ যেন শিউরে উঠল। ইস্—এ কোত্থেকে গড়িয়েছেন দিদি? ঠেসে পান দিয়েছে—।

ও দেশের স্যাকরার—তৈরী। বাণী কম—

বাণী কম হলে সোনা যে মারবেই দিদি। স্যাকরা তো ঘর থেকে কিছু দেয় না—তার পেট ভরিয়ে রাখলে—খদ্দেরেরই লাভ। তা সেটা আর কজনে বোঝে বল।—হাতে করে মাকড়ি দুটি নাচাতে নাচাতে বললে, হাল্কা ফঙ্‌ফঙে। এ আর কষে দেখব কি—মরা সোনা।—দশটা টাকা যে দেয়া যায় না দিদি।

আসচে মাসেই শোধ হয়ে যাবে তোমার টাকা।

মন্মথ মুখখানি করুণ করে বললে, এই সামান্য সোনা নেড়ে চেড়ে পেট চালাচ্ছি—জানেনই তো সব। পুঁজি কম বলেই আপনাদের সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারিনে দিদি। তার জন্যে দুঃখও তো কম নয়—সংসারের ব্যাপার—ধরুন পাকেচক্রে যদি নাই নিতে পারলেন আসচে মাসে—তাহলে—

তা তুমি কত দিতে পার?

অন্য লোক হলে পাঁচ টাকার একটি পয়সাও বেশী দিতে পারতাম না—আপনাকে কি বলব—একদিনের

কারবার তো নয়—সাতটা টাকা নিয়ে যান। কিন্তু আসচে মাসেই—

আটটা টাকা দাও ভাই—

মন্মথ হুঁকো শুদ্ধ দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে, বললে, গরীব ছাঁপোষা লোক—মারা পড়ব।

অগত্যা সাত টাকা নিয়েই সেনদিদি ফিরে এলেন। বললেন, এর বেশী তো হল না ভাই। লোকটা বড্ড হিসেবি।

ভগবতী হাসিমুখে বললেন, ও-ওতো গরীব মানুষ,—কাজকি ওর লোকসান করে।

লোকসান! স্যাকরারা লোকসান দেয় নাকি! সোনা সরানোই ওদের ব্যবসা—তা যতই বাণী দেও না। দেখতে ছোট্ট ঘুটঘুটে ঘর—আটহাতি ধুতি আর ময়লা ফতুয়া গায়ে লোকটি, সবাই বলে—ও গুণে গুণে বিশ হাজার টাকা দিতে পারে। হাড় কেপ্পন, পেটে খাবে না—পরণে পরবে না—মাগ ছেলেকেও দেবে না। দুনিয়ায় যারা টাকাই চেনে—টাকাও তাদের চেনে। সেনদিদি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন:

সাত টাকায় চালাও তো আপাতক—শেষে দু' একদিন টান ধরে—নিয়ে যেও দু' এক টাকা।

…ফরসা ধুতি পরে—পান চিবুতে চিবুতে সৌরভী নামছিল নীচেয়। ভগবতীকে দেখে বললে, এই যে বউদি আমি তোমায় হেথায় হোথায় খুঁজতে ছিনু—বলি গেল কমনে?

কি খবর?

বলি—কালীঘাটে যাবে নি? সেই যে বলেছিলে সেদিন পোম কালী দেখতে বড় ইচ্ছে করে—

সে তো সকাল বেলায় যাব বলেছিলাম।

কেন বিকালায় আলুতি দেখে আসি গে। সকালায় যা ভিড়—এক হাঁড়ি ভাতে সিম সেদ্ধ!

সেনদিদি বললেন, তোর তো মাস কাবারের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না—

কেন হ্যাংনামাটা কি! এক পিটে দু' আনা করে বাস ভাড়া—টেরামে গেলে আরও কম—ছ' পয়সা। এর আর মাস কাবারের ভয়টা কি! যাবে বৌদি?

আচ্ছা কাল বলব।

হ্যাঁ—দাদার অনুমতিটি নে নিও। নইলে আবার—মুখে কাপড় গুঁজে খিল খিল করে হাসতে হাসতে সৌরভী নেমে গেল।

সেনদিদি বললেন, একদণ্ড যদি স্থির হয়ে বসবে বাড়ীতে। দু' পায়ে যেন পাখনা বাঁধা।

মন্তব্য নীচে থেকে শুনতে পেলে সৌরভী।…চেঁচিয়েই বললে, জ্বালার প্রাণ না হলে জ্বলুনি কেউ বোঝে না দিদি! কেন যে থাকিনে বাড়ীতে সে জানে ওই ওপরের ভগমান—।

উনি তো প্রায়ই দেওর-ঝির বাড়ীতে যান।

দেওর-ঝির বাড়ী না যমের বাড়ী! মুখ-মচকে হাসলেন সেনদিদি।

ওঁর ভাজ তো গল্প করতে দেখলে অনেক কথা বলেন—যখন তখন যে বাইরে যান কিছু তো বলেন না! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবতী।

কেন বলবেন! যে গরু দুধ দেয়—তার চাট কে-না সহ্য করে! যারা বুদ্ধিমান—তারা বুঝেও—চুপ করে যায়। নে বাপু—আর বোকার মত তাকাস নি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে—নষ্ট চরিত্রের মেয়েদের একটু বারটান হয়ই—

ভগবতী দেওয়াল ধরে সামলে নিলেন নিজেকে।…সৌরভীকে মনের মধ্যে যে ভাবে কল্পনা করেছিলেন—তা এমন রূঢ় সত্যে পরিণত হবে ভাবতে পারেন নি। কি করবেন তিনি? কেন এলেন শহরে—কেন এলেন এই ধরণের বাসায়? এখানে দুঃখ কষ্টের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ লুকোনো আছে—কে জানত আগে! পাড়াগাঁয়ে যা ছড়িয়ে থাকে—মাঠের পারে—দূর সীমানায়, এখানে ঘরের কানাচে—গায়ে বাতাস ফেলে…মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে।…দেয়াল ধরেও…মাথা ঝিম্‌ঝিমানি ঠেকানো গেল না।—চোখ বুজলেন—ভগবতী।

চোখ চেয়ে দেখেন সেনদিদির ঘরে—ওঁরই কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। পাশে পাখা আর জলের ঘটি। চুলগুলি থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে।

দিদি।

চুপ করে খানিক শুয়ে থাক।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন ভগবতী। বললেন, কি হয়েছিল আমার?

সেনদিদি বললেন, এমন কিছু না। পুরোণো ফিটের ব্যারাম চাগাড় দিয়েছিল। কতদিন পরে হল?

ফিট?

হয়তো দুর্ব্বলতাই হবে। কতদিন আধপেটা খেয়ে আছ? সংসারের ভাবনা দিনরাত ভাব বুঝি?

মনের ভাবনা মুখে প্রকাশ করার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন সেনদিদি। ভগবতী মাথা নীচু করে—ওঁর অনুযোগ স্বীকার করে নিলে। বললে, না, এমনিই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল—

ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। (ক্রমশঃ)

নববর্ষ
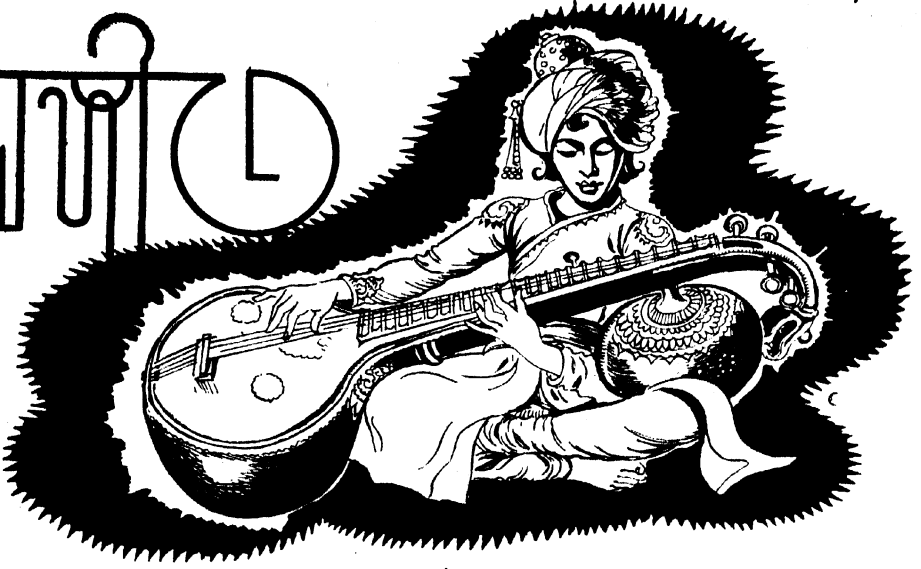
আজি—জাগো সবে এই নববরষের শুভ প্রাতে।
ওই শোনো বাজে অনাহত ধ্বনি—
জননীর সুরে উঠিতেছে রণি'।
সে ধ্বনি মোদের মরমে পশিছে
নবালোকে ধরা উজলি উঠিছে,
নিখিল ধাইছে ফেলি' পুরাতনে সুদূর পশ্চাতে—
আজি—জাগো সবে এই নববরষের শুভ প্রাতে।

এখনো কি তুমি ঘুমায়ে রহিবে,
এ-চলার ক্ষণে পিছনে থাকিবে—
কেন রে, হারাবে এ-শুভ সুযোগে,
বাড়াইবে কেন জীবনের ভোগে,—
ওই দেখ চেয়ে অরুণ উদিছে এ-নব প্রভাতে—
আজি—জাগো সবে এই নববরষের শুভ প্রাতে।

শত বাধা ঠেলি' চল আগুসারে
সতত স্মরিয়া পরম পিতারে।
যাঁহার আশিসে বিজয় লভিবে,
পথের আঁধার অচিরে ঘুচিবে,—
সুগম হইবে চলার সরণি সাধন নিষ্ঠাতে—
আজি—জাগো সবে এই নববরষের শুভ প্রাতে।

ওই যে ভাতিছে নবারুণ-দ্যুতি,
নিখিল গাহিছে পরমের স্তুতি—
এ-ধরার বুকে অভয় নামিছে,
আশার বারতা পবন বহিছে—
জগত-মায়ের জগত-প্লাবিনী করুণা-সম্পাতে—
আজি—জাগো সবে এই
নববরষের শুভ প্রাতে॥

কথা ঃ—রঘুনন্দন দাস

সুর ও স্বরলিপি ঃ—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সা রা II গা পা পা | ধা ধা -র্রা I র্সা ধা পা | ধা পা পা I
আ জি জা গো স বে এ ই ন ব ব র ষে র

গা গা রা | সা -া -া I
শু ভ প্রা তে ০ ০

I পধা র্সা র্সা | র্সা র্সপা ধা I ধা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্সা I
ওং ই শো ন বাং জে অ না হ ত ধ্ব নি

I র্সা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I না র্রা র্রর্সা | না ধা পা I
জ ন নী র সু রে উ ঠি তে ছে র ণি

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I না র্সা র্সনা | ধা না ধপা I
সে ধ্ব নি মো দে র ম র মে প শি ছেং

I পা পা না | ধা ধা না I পা ধা ধপা | মা গা গা I
ন বা লো কে ধ রা উ জ লি উ ঠি ছে

I সা রা গা | গা -া রা I গা পা পা | ধা ধা না I
নি খি ল ধা ই ছে ফে লি পু রা ত নে

I পা পা -না | ধা -না নধা I পা -া -া | -া পা গা I
সু দূ র্ প শ্ চা তে ০ ০ ০ আ জি

I ধা ধা ধা | পধা ধা -র্রা I র্সা ধা পা | ধা পা পা I
জা গো স বে ০ এ ই ন ব ব র ষে র

I গা গা রা | সা সা রা II
শু ভ প্রা তে "আ জি"

II সা মা মা | মা মা মা I গা পা পা | পা পা পা I
এ খ নো কি তু মি ঘু মা য়ে র হি বে

I মা ধা ধা | -া ধা না I র্সা র্রা র্রর্গর্গর্রা | র্সনা র্সা র্সা I
এ চ লা র্ ক্ষ ণে পি ছ নে০০ থাং কি বে

I র্গা র্গা র্রা | র্গা র্মা র্মা I র্গা র্রা র্গা | র্রা র্সা র্সা I
কে ন রে হা রা বে এ শু ভ সু যো গে

I র্গা র্গা -র্রা | র্রা র্সা র্সা I না র্রা র্রর্সা | না ধা পা I
বা ড়া ই বে কে ন জী ব নে র ভো গে

I পা -ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা I না র্রা র্সর্সা | না ধা না I
ও ই দে খ চে য়ে অ রু ণ উ দি ছে

I পা পা না | ধা -না নধা I পা -া -া | -া পা গা I
এ ন ব প্র ০ ভা তে ০ ০ ০ আ জি

I ধা ধা ধা | পধা ধা -র্রা I র্সা ধা পা | ধা পা পা I
জা গো স বে০ এ ই ন ব ব র ষে র

I গা গা রা | সা সা রা II
শু ভ প্রা তে "আ জি"

II সা ধ্ সা | সা সা রা I রা পগা গা | গা গা গা I
শ ত বা ধা ঠে লি চ ল০ আ গু সা রে

I গা ধা ধা | পধা র্সা র্সা I ধা পা ধা | পা গা গা I
স ত ত স্ম০ রি য়া প র ম পি তা রে

I সা রা গা | পা পা পা I গা পা ধা | ধা ধা ধা I
যাঁ হা র আ শি সে বি জ য় ল ভি বে

I পা ধা র্সা | র্রা র্রা -া I র্সা র্রা র্মা | র্মা র্গা র্গা I
প থে র আঁ ধা র্ অ চি রে ঘু চি বে

I র্গা র্গা র্গা | র্রা -া র্রা I না র্রা র্সর্সা | না ধা না I
সু গ ম হ ই বে চ লা র স র ণি

I পা পা না | ধা -না নধা I পা -া -া | -া পা গা I
সা ধ ন নি ০ ষ্ঠা তে ০ ০ ০ আ জি

I ধা ধা ধা | পধা ধা -র্রা I র্সা ধা পা | ধা পা পা I
জা গো স বে০ এ ই ন ব ব র ষে র

I গা গা রা | সা সা রা II
শু ভ প্রা তে "আ জি"

I পা -া গা | পা পা ধা I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
ও ই যে ভা তি ছে ন বা রু ণ দ্যু তি

I র্সা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্গা I র্সা র্রা র্মা | র্মা র্গা র্গা I
নি খি ল গা হি ছে প র মে র স্তু তি

I র্গা র্গা র্গা | -র্মা র্রা র্রা I র্রা র্গা র্গর্রা | র্সা র্সা র্সা I
এ ধ রা র্ বু কে অ ভ য় না মি ছে

I র্গা র্গা -া | র্রা র্সা র্সা I না র্রা র্রর্সা | না ধা পা I
আ শা র্ বা র তা প ব ন ব হি ছে

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I না র্রা র্রর্সা | না ধা না I
জ • গ ত মা য়ে র্ জ গ ত প্লা বি নী

I পা পা না | ধা -না নধা I পা -া -া | -া পা গা I
ক রু ণা স ম্ পা তে ০ ০ ০ আ জি

I ধা ধা ধা | পধা ধা -র্রা I র্সা ধা পা | ধা পা পা I
জা গো স বে০ এ ই ন ব ব র ষে র

I গা গা রা | সা সা রা II II
শু ভ প্রা তে "আ জি"

মহেঞ্জদারোর সভ্যতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে মহেঞ্জদারো ও হরপ্পাতে প্রাগ্ বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, আর্য্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন এই নগরগুলি ধ্বংস করে, নগরের অধিবাসীদিগকে হত্যা করে। তাহারা আরও বলেন যে মহেঞ্জদারোর অধিবাসীগণ সুবৃহৎ নগর নির্মাণ করিতে শিখিয়াছিল, আর্য্যরা তখনও নগর নির্মাণ করিতে শেখে নাই। কিন্তু মহেঞ্জদারোর লোকরা লৌহনির্মাণ করিতে শেখে নাই, আর্য্যরা লৌহ-নির্মাণ করিতে শিখিয়াছিল। মহেঞ্জদারোর লোকরা শিবলিঙ্গের উপাসনা করিত, আর্য্যরা তাহার নিন্দা করিত।

কিন্তু আর্য্যরাও যে নগর নির্মাণ করিতে জানিত তাহা বেদের নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ঋগ্বেদসংহিতা ৪-৩০-২০ ঋকে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র দিবোদাসকে একশত লৌহনির্মিত নগর দিয়া দিলেন। ঋগ্বেদ ৭-৩-৭ ঋকে অগ্নিদেবতার নিকট একশত লৌহময় নগর প্রার্থনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ ৮-১০০-৮ এও লৌহময় নগরের কথা আছে। ঋগ্বেদ ৫-২৭-২এ সুবর্ণ মুদ্রার কথা আছে। ঋগ্বেদ ৫-৩৩-৬এ রজতমুদ্রার কথা আছে। আর্য্যরা সুবর্ণ, রজত ও লৌহ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল কিন্তু নগর নির্মাণ করিতে শিখে নাই ইহা সম্ভব নয়। ঋষিরা হয়ত গ্রাম বা অরণ্যে থাকিতেন। কিন্তু নগরও ছিল।

মহেঞ্জদারোতে লোহা পাওয়া যায় নাই, বেদে লোহার উল্লেখ আছে, এজন্য বেদকে মহেঞ্জদারোর পরবর্ত্তী বলা উচিত নহে। খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসরের উল্কার মধ্যবর্ত্তী লোহা মিশরের কবরে পাওয়া গেছে। অন্য সাধারণ লোহা যাহা পাওয়া গেছে তাহা খৃঃ পূঃ ১৪০০ পরবর্ত্তী। তাহার পূর্ব্বের লোহা অল্পই পাওয়া গেছে। (Gordon childe প্রণীত Man makes himself গ্রন্থ ১২০ পৃঃ) মহেঞ্জদারোর তারিখ খৃঃ পূঃ ৩২৫০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৭৫০। এরূপ মনে করা যায় যে ঐ সময়ে মহেঞ্জদারোতে লোহা ছিল কিন্তু তাহা মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেদে লোহার কথা আছে বলিয়া যে সময়ে সর্বত্র লোহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল ইহা মনে করা ভুল।

মহেঞ্জদারোতে ঘোড়ার মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই, বেদে ঘোড়ার কথা আছে, অতএব বেদ পরবর্ত্তী এ যুক্তিও নির্ভুল মনে হয় না। এই প্রকার যুক্তিতে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় যে বেদ পূর্ববর্ত্তী, কারণ বেদে বাঘের কথা নাই, মহেঞ্জদারোতে বাঘের মূর্ত্তি আছে (Sir John Marshallএর Mahenjo Daro and Indus Valley Civilization প্রথম খণ্ড ৩৪৮ পৃঃ শীলমোহর নং ৩৫০-৩৫৫)। আবার বেদে সিংহের উল্লেখ আছে, মহেঞ্জদারোতে সিংহের মূর্ত্তি নাই, এজন্য বলিতে হয় যে বেদ পরবর্ত্তী। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে যুক্তি করা ভুল। মার্শাল সাহেবের গ্রন্থে ইহাও বলা হইয়াছে যে ঐখানে ঘোড়াও কুকুরের হাড় পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা বলা যায় না তাহা কোন্ তারিখের। তিনি আরও বলিয়াছেন যে একটি মাটির মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তাহা ঘোড়ারও হইতে পারে। সুতরাং ঘোড়ার যুক্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। একথা মার্শাল সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন।

মার্শাল সাহেব আরও বলিয়াছেন যে মহেঞ্জদারোতে বৃষের পূজা ছিল, বেদে গাভীর পূজা দেখা যায়, পরবর্ত্তী যুগেও যখন গাভীর পূজা দেখা যায় তখন বেদকে মহেঞ্জদারোর পরবর্ত্তী বলা উচিত। কিন্তু বৃষের পূজাও গাভীর পূজার মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নয়। যাহারা বৃষের পূজা করে তাহারা গাভীরও পূজা করে এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। মহেঞ্জদারোতে শিব পূজা প্রচলিত ছিল, শিবের বাহন বৃষভ। এজন্যও খালি বৃষের মূর্ত্তি বেশী পাওয়া গিয়াছে এরূপ মনে হয়। ইন্দ্র ও অন্য দেবতাকে বেদে বৃষ বা বৃষভ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ ৮-৪৪-২ এবং ১০-১০২-৭ এ ককুভযুক্ত বৃষের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে বেদে গাভীরই পূজা করা হইয়াছে, বৃষের পূজা করা হয় নাই।

মার্শাল সাহেব বলিয়াছেন যে বেদে বর্ম্মের উল্লেখ আছে কিন্তু মহেঞ্জদারোতে বর্ম পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বেদ পরবর্ত্তী। ঋগ্বেদ ১-৩১-১৫তে বলা হইয়াছে যে বর্ম সূচি দ্বারা সেলাই করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা চামড়ার বর্ম বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদ ১০-১৬-৭এ চামড়ায় বর্ম্মের কথা আছে। ঋগ্বেদ ১-১১৪-৫, ৬-৩৭-৮, ১৯, ৭-৩১-৬, ১০-১০১-৮, ১০-১০৭-৭ এই সকল ঋকে ও বর্ম্মের কথা আছে। কোনও স্থানে বলা হয় নাই যে লৌহ নির্মিত বর্ম। এজন্য এরূপ অনুমান করা যায় যে বেদে চর্ম নির্মিত বর্ম্মের কথাই আছে, লৌহনির্মিত বর্ম্মের কথা নাই, চামড়ার বর্ম মহেঞ্জদারোতেও ছিল, তাহা কালক্রমে মাটিতে পরিণত হইয়াছে। যদি এরূপ প্রশ্ন তোলা হয় যে মহেঞ্জদারোতে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বর্ম নাই কেন, তাহা হইলে বলা যায় যে মূর্ত্তিগুলি প্রায় সবই রমণী মূর্ত্তি (মার্শালের পুস্তক ৩৩৮ পৃঃ) কেবল একটি পুরুষ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (ঐ ৩৩৬ পৃঃ) এজন্য মূর্ত্তিগুলি হইতে ইহা প্রমাণ হয় না যে মহেঞ্জদারোতে বর্ম্মের ব্যবহার ছিল না। যাহাদের সভ্যতা এত অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা যে চর্মের বর্ম প্রস্তুত করিতে পারে নাই ইহা সম্ভব নহে।

মহেঞ্জদারোতে পাথরের বাসন পাওয়া গেছে বলিয়া মার্শেল সাহেব বলিয়াছেন যে মহেঞ্জদারো বেদের পূর্ববর্ত্তী, কারণ বেদে তামা, ব্রঞ্জ এবং লোহার উল্লেখ আছে। কিন্তু মার্শেল সাহেবের পুস্তকের ২৯,৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে যে মহেঞ্জদারোতে তামা, ব্রঞ্জ, সোণা ও রূপা পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে মহেঞ্জদারোকে কিরূপে প্রস্তর যুগের বলা যায়? আজকালও অনেকে পাথরের বাসন ব্যবহার করেন। সেইরূপ মহেঞ্জদারোর সময় তামা, ব্রঞ্জ প্রভৃতি জানা থাকিলেও অনেকে পাথরের বাসন ব্যবহার করিতেন এইরূপ মনে করা উচিত।

মার্শেল সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—কি কি কারণে তিনি মনে করেন যে মহেঞ্জদারো বেদের পূর্ববর্ত্তী। আমরা পূর্ব্বে সে

সকল কারণগুলিই উল্লেখ করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে ঐ সকল কারণ হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে মহেঞ্জদারো বেদের পূর্ববর্ত্তী। অতঃপর আমরা কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করিব যাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা উচিত যে মহেঞ্জদারোর সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই নিদর্শন।

মার্শেল ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে মহেঞ্জদারোতে যে ধর্ম-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা আধুনিক প্রচলিত হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয় না (Preface page VII)। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সকল আচার্য্য বলিয়াছেন যে আধুনিক প্রচলিত হিন্দুধর্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে এই সকল গ্রন্থ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, বা বেদের ব্যাখ্যারূপে লিখিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে মহেঞ্জদারোর ধর্ম ও আধুনিক প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্যের কারণ এই যে উভয় ধর্মই বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন যে আর্য্যগণ মহেঞ্জদারোর সভ্যতা ধ্বংস করিয়া, মহেঞ্জদারোর ধর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা কষ্ট কল্পনা এবং এরূপ কল্পনা করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

বেদের তারিখ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিবিধ মত প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের মতগুলি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। অপরপক্ষে বালগঙ্গাধর তিলক দেখাইয়াছেন যে বেদের একটি বিশিষ্ট মন্ত্রে যে জ্যোতিষ্কের সমাবেশ দেখা যায় তাহা খৃঃ পূঃ ৪৫০০তে হইয়াছিল তাহার পরে আর হয় নাই (তিলক প্রণীত Orion গ্রন্থ পৃঃ ১১৩)। অধ্যাপক জ্যাকবি বেদের অন্য মন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহাতে যে জ্যোতিষ্কের সমাবেশ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা খৃঃ পূঃ ৪০০০ বা ৪৫০০ বৎসরে হইয়াছিল তাহার পরে হয় নাই। এ সব কল্পনার কথা নহে, জ্যোতিষিক ঘটনার কথা। একজন নয়, দুই জন পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন য়ুরোপীয়। উভয়েই এক ফল পাইয়াছেন। তাঁহাদের গণনা কেন পরিবর্জন করা হইবে কোন পণ্ডিত তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান নাই। তথাপি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। এবং বেদের তারিখ অনেক পরবর্ত্তী বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।

জ্যোতিষ্ক গণনার দ্বারা বেদের যে তারিখ পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিলে সহজেই দেখা যায় যে বেদ মহেঞ্জদারোর পূর্ববর্ত্তী, মহেঞ্জদারোর ধর্ম বেদেরই ধর্ম। এবং সেজন্য আধুনিক প্রচলিত ভারতের ধর্মের সহিত মহেঞ্জদারোর এত সাদৃশ্য।

মহেঞ্জদারোতে কতকগুলি শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ স্থানের লোকেরা লিঙ্গ উপাসনা করিত। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে আর্য্যেরা লিঙ্গ উপাসনার বিরোধী ছিল। কারণ বেদে দুই স্থানে "শিশ্নদেব" শব্দ আছে, এবং যাঁহারা শিশ্নদেব তাহাদের নিন্দা আছে (ঋগ্বেদ ৭।২১।৫, এবং ১০।৯৯।৩)। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উক্তিসকল পরস্পর বিরোধী। বেদে লিঙ্গ-উপাসনার নিন্দা আছে, যাহারা লিঙ্গ-উপাসনা করিত বেদে তাহাদিগকে দাস, দস্যু প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, আর্য্যেরা তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তথাপি আর্য্যরা তাহাদের নিকট লিঙ্গ-উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিল—এ সকল কথা পরস্পর বিরোধী। ঋগ্বেদে যে স্থলে "শিশ্ন-দেবের" উল্লেখ আছে সায়ণাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহারা "শিশ্নৈঃ দীব্যন্তি ক্রীড়াও অব্রহ্মচারিণঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি-দিগকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। বেদের বহু স্থানে শিব ও রুদ্র শব্দের উল্লেখ আছে। শিবের উপাসনা বৈদিক। মহেঞ্জদারোতে তাহারই নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রগাঢ় বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন। শিবলিঙ্গের উপাসনা বেদবিরোধী হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না।

হুইলার ও ম্যাক্‌কে লিখিয়াছেন যে আর্য্যরা ভারতে প্রবেশ করিয়া মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার অধিবাসিগণকে বধ করিয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালের ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে পি ভি কানে লিখিয়াছেন যে এই কল্পনা গ্রহণ করা যায় না। কারণ মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা সুবৃহৎ নগর ছিল। লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল, যদি নগরের অধিবাসিগণকে নির্বিচারে বধ করা হইত তাহা হইলে বহু সহস্র কঙ্কাল পাওয়া যাইত, কিন্তু মাত্র ২৬টি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আর এক কথা। মহেঞ্জদারোর তারিখ ত ৩২৫০ খৃঃ পূঃ হইতে ২৭৫০ খৃঃ পূঃ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে আর্য্যরা ১৫০০ খৃঃ পূঃ ভারতে আসিয়াছিল। তাহা হইলে আর্য্যরা কিরূপে মহেঞ্জদারোর অধিবাসিদিগকে হত্যা করিতে পারে?

মহেঞ্জদারোতে কতকগুলি রমণীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মার্শাল সাহেব বলেন দেবীপূজা নাকি বেদে নাই—ইহা প্রাগ্‌বৈদিক। কিন্তু ভারতে প্রচলিত দেবী পূজার মূল বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ১০।১২৫ সূক্তে পরম শক্তিকে স্ত্রীরূপে অভিহিত করা হইয়াছে—তিনিই বিবিধ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ১০-১২৬ সূক্তেও পরমেশ্বরীর উল্লেখ আছে—তিনি বিশ্বজগৎ দর্শন করেন। সুতরাং দেবীপূজা বেদে নাই, আর্য্যগণ অনার্য্যদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে এ মতও যথার্থ নহে।

পুরাণে দেখা যায় শিব দৈত্যদের তিনটি পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। যদি মহেঞ্জদারোর লোকেরা শিবকে পূজা করিতেন এবং আর্য্যরা করিতেন না, তাহা হইলে শিব মহেঞ্জদারো ধ্বংস করিয়াছিলেন ইহা বলা সঙ্গত হইবে না। লিঙ্গ মহাপুরাণে শিবকর্ত্তৃক তিনটি পুরী ধ্বংসের কথা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে ঐ নগর তিনটির অধিবাসিগণ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম পালন করিত। সুতরাং এই নগরগুলিকে অনার্য্য অধ্যুষিত না বলিয়া আর্য্য অধ্যুষিত বলাই সঙ্গত হয়।

মহেঞ্জদারোতে অনেক শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক লিপি আছে। লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু এই লিপি হইতেই ভারতের প্রাচীন লিপি ব্রাহ্মীলিপি উদ্ভূত হইয়াছে। মার্শাল সাহেবের গ্রন্থে ডাঃ ল্যাংডন একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (Vol II chap XXIII)। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মীলিপির ২২টি অক্ষরের সহিত মহেঞ্জদারোর অক্ষরের সহিত খুব সাদৃশ্য আছে। যেহেতু মহেঞ্জদারোর তারিখ খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর, অতএব ডাঃ ল্যাংডনের মতে আর্য্যগণ খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে ভারতে আসিয়াছিল এবং মহেঞ্জদারোর লিপি গ্রহণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ইহা উল্লেখ করা যায় যে মেসপটেমিয়াতে খৃঃ পূঃ ১৭০০ তারিখের একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্যের (অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের) নাম আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারত যাইবার পথে আর্য্যরা খৃঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরে মেসপটেমিয়া অতিক্রম করিয়াছিল। ডাঃ ল্যাংডন বলেন মহেঞ্জদারো আবিষ্কার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই মত ভুল। কারণ দেখা যায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ তারিখে আর্য্যগণ ভারতে ছিল এবং মহেঞ্জদারোর লিপি গ্রহণ করিয়াছিল পুরাণে উল্লেখ আছে কতকগুলি আর্য্য ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ শক যবন প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে পুরাণের এই উক্তির সহিত মেসপটেমিয়াতে খৃঃ পূঃ ১৭০০তে বৈদিক দেবতার উল্লেখের সামঞ্জস্য আছে।

পি, ভি, কানে পূর্ব্বোক্ত সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ মহেঞ্জদারো ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী। আমাদের নিকট এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয়।
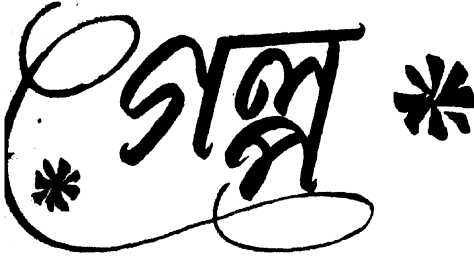
কালো মেম

নারায়ণ মণ্ডল

মাত্র বছর দেড়েক আগেও জনসন সাহেবের বেহালায় খাস বাংলা সুরের কীর্তন বাজত। লোককে দাঁড় করিয়ে রাখত পাথরের মত—হাঁ হয়ে যেত ধর্মতলা মোড়ের অফিস-যাত্রীর দল।

জনসন সাহেব ভিক্ষে করলেও লোকের অনুরোধ ছাড়া হাত পাততো না সে। ছেঁড়া পেন্টুল আর ময়লা সার্ট পরে বেহালায় ছড়ি ঘসবার আগেই লোকের চোখ ফেটে জল আসতো—তারপর ছড়ির টান পড়লেই সেই বিস্মিত চোখগুলোতে দুঃখ আর ভাবের বন্যা উপচে যেত।

আহা, কটা সাহেবকেই বা এমন বেশে দেখেছে বাংলা দেশের বাঙ্গালীরা? রাজার জাতের এই দুরবস্থা দেখে আনন্দের আগেই বুকে একটা খোঁচা খেয়ে নড়ে উঠত সকলের। দু'একটা ট্রাম মিস্ করেও অনেকে বাজনা শুনতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। জনসন এদের আগ্রহ দেখে ধরে দিত খাস পল্লীমাটীর ভাটিয়ালী সুর—লোকে অবাক হয়ে যেত।

বেহালা থামতেই পায়ের নীচে ফুটপাতটায় ফুটো পয়সা থেকে দু'আনি অবধি ছড়িয়ে পড়ত, জনসন সাহেব দাঁড়িয়ে থাকতো রাজার জাতের ভঙ্গিতেই। লোক চলে গেলে পর হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিত পয়সাগুলো—তবুও একবার বসতো না প্রকাশ্য রাজপথে।

ভীড়ের মাঝ থেকে কত লোক কত কথা জিজ্ঞেস করতো, হিন্দি বাংলা পরিষ্কার বুঝতো জনসন—বড় একটা উত্তর দিত না সে, প্রতাপের সংগেই ভিক্ষে করে বেড়াত। কিন্তু 'এংলো ইণ্ডিয়ান' কথাটা কানে গেলেই ফোঁস করে উঠতো সে। ভিখিরীর চোখ মুখ দেখে অনেকেরই মনে পড়ে যেত অফিস সুপারের কথা।

জনসন তাদের বলতো: হামি আংলো নেহি আছে, হামার জন্ম খাস হোম্‌মে—হামার বাড়ী আছে ব্রেড্‌ফোডমে। হামি সাত বরষ-বয়েসমে কল্‌কাত্তা এসেছি—হামায় কেহ আংলো বলিবেন না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতো: কেন, বল্‌লে কি করবে সাহেব?

—না কুছু করিব না, তবে বলিবেন না।

বিকেল হলেই জনসন সাহেব বেহালার তার আলগা করে দিত। আর এক কলিও বাজাত না—কারো অনুরোধেও নয়। সন্ধ্যে হবার সংগে সংগেই বেহালাটা গচ্ছিত রেখে দিত ফুটপাতের একটা ফলওলার দোকানে। তারপর পয়সাগুলো ভালভাবেই একবার গুণে নিয়ে ঢুকে পড়ত একটা রুটীর দোকানে। সেখানে কিছু খেয়ে নিয়েই সোজা মদের দোকানে। সেইখানেই সারাদিনের অবশিষ্ট উপায়ের সবকটিকেই উজাড় করে দিয়ে বেরিয়ে আসতো টলতে টলতে।

টলতে টলতেই আসতো গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাসে আরো খানিকটা নেশা জমিয়ে নিয়ে আসতো ধর্মতলার মোড়ে—গ্রাণ্ডের ঘড়িতে তখন ন'টা বাজত।

ধর্মতলার মোড়ে মোটেই দাঁড়াত না জনসন। রাতের কোলকাতার রূপসী নাগরিকার রূপকে, তার বুজে-আসা রঙ-ধরা চোখের পাতা থেকে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেত সোজা।

কিছুদূর গিয়েই পড়ত টাইগার সিনেমা, সেখানে থমকে পড়ে বাঁয়ে চলতো—মুখে জ্বলতো সস্তা এক পয়সা দামের সিগারেট।

তারপর আরো একটা মোড় ঘুরেই বাঁদিকে দেওয়ালের সংগে আঁটা একটা ফলের দোকান। ফলওলার ফাঁকা চৌকিটাই জনসনের রাতের আস্তানা।

রোজই ঘুম ভাঙত ফলওলার ডাকে। দোকান পাতবার

মালপত্তর নামিয়ে সাহেবকে ঠেলা দিয়ে ফলওলা ডাকতো : সায়েব ওঠ, এই নাও ধর তোমার বেহালাটা।

ঘুম-জড়ান চোখেই জনসন বেহালাটা বাগিয়ে ধরতো বগলে, তারপর হাই তুলতে তুলতে চলে যেত সেই দোকানটায়—ছেলেবেলার ব্রেক্‌ফাষ্ট করার নেশা এখনও ছাড়তে পারেনি সে।

এইভাবেই জনসন সাহেবের জীবনটা কেটে যাচ্ছিল ধর্মতলার মোড়ে, ব্যবসাও চলছিল সগৌরবে। বাঁ হাতে ছড়ি আর ডান কাঁধে বেহালা এই ছিল ল্যাটা সাহেবের সম্বল, আর ছিল সুর—তাল, লয়—বাজনার ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুলের কৌশলের চমৎকার একটা তাল তৈরি করে নিত সব থেকে মোটা তারটায়।

তবুও এই গোটা দশ বছরের জীবিকার ফাঁকে কোনদিন শিল্পী হয়ে ওঠেনি সে, শুধু বাংলার পথে সাহেব-ভিখিরী বলে করুণার পরিবর্তে পেত একটু দৃষ্টি, তবুও সে দৃষ্টি ছিল বিস্ময়ের।

জুন মাসের বাতাস বইল আকাশে।

দিন এলো একটা।

সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে ইংলণ্ডে। ধর্মতলাতেও তার ছায়া পড়েছে বেশ ঘন হয়ে। মদের দোকানগুলোতে বাঙ্গালী সাহেবদের কিউ লেগে গেছে। ভাড়া-করা ট্যাক্সিগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে ছোটা-ছুটিতে—আর অস্থানে বেস্থানে আসর বসে পড়ছে বল-ড্যান্সের। সন্ধ্যা নেমে আসছে, অসংখ্য তারা জ্বলে উঠল আকাশে।

জনসন সাহেবের এখনও জ্বর ছাড়েনি। বেহালার তারগুলোয় ছড়িটা গুজে, গড়ের মাঠে একটা মূর্ত্তির সান-বাঁধানো চাতালে সে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে—কখন বন্ধ হবে ফলওলার দোকান।

শহরে তখন উৎসব চলছে চুণী পান্নার দ্যুতি নিয়ে : মদের পেয়ালা উছলে উঠছে, রাঙা ঠোঁট সাহেব মেমের অকারণ উচ্ছ্বাসে। বেতারে ভেসে আসছে ইংলণ্ডের বাতাস—করোনেশনের বাজনা বাজছে। গিটারের তালে তালে ড্যান্স চলেছে রঙমহলে রঙমহলে। পালিশ করা মেঝেগুলোতে, জোড়া জোড়া পা'গুলো পিছলে চলেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

জনসন মাঠে শুয়ে শুয়ে হিসেব করছিল একটা।

সাত বছরের জনকে নিয়ে বাবা এল ভারতে। ব্রেড্‌ফোর্ট আর পেটিকোটের ব্যবসা গুটিয়ে এনে নতুন করে ফাঁদলো—কোলকাতায়। বাসা বাঁধলো সাহেবপাড়া ছাড়িয়ে—এক মুসলমানপাড়ার একটা ফ্লাটে। তিন বছরের মধ্যেই ব্যবসা ডুবে গেল জনসনের বাবার। ফিরে যাবার জন্যে ধার করেও অন্ততঃ কিছু টাকা পাঠাতে লিখল জনসনের মাকে। জনসনের মা তার নতুন স্বামীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটা চিঠি শিলমোহর করে পাঠিয়ে দিলে এক মাসের মধ্যেই, জনসনের মা এখন আর জনসনের মা নয়—নতুন স্বামীর স্ত্রী।

একবছরের মধ্যেই জনসনের বাবা মারা গেল—সেই মুসলমানি পাড়াটার নীচের তলার একটা ড্যাম্প ঘরে। মৃত্যুর সময় এক জনসন ছাড়া কেউ ছিল না সেখানে, পয়সা দিয়ে ডেকে আনা অতিথি-ডাক্তারও ছিল না একজন। মৃত্যুর আগে জনসনের বাবা তার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এই বেহালাটিই তার হাতে তুলে দিয়েছিল—আর তার মায়ের নতুন যৌবনের একটা ফটো।

জনসন সেটা তার বাবার চোখ বোজার সংগে সংগেই কুচি কুচি করে ফেলেছে। তারপর তার এক সপ্তাহের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল ধর্মতলার দিকে—সভ্যতার রাজপথে অসভ্য জীবিকার শিক্ষানবীশ হয়ে।

প্রথম প্রথম সাহেব দেখলেই সরে পড়ত জনসন, লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে পড়ত আপনা আপনি—ঠিক গোলাপী একটা কাগজকে আগুনে সেঁকার মত। এগারো বছরের জনসন হয়ত সুর জমিয়ে ফেলেছে কোথাও—মাথাগুলোকে দুলিয়ে দিয়েছে দোলন-চাঁপার মত। চলতি পথের এক জোড়া মাতাল সাহেব হয়ত আসছে সেই পথেই, যেমনি একবার গলা বাড়িয়ে দেখা—ব্যাস জনসন আর সেখানে নেই! ভীড় কাটিয়ে রাস্তা টপকে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে মনুমেণ্টের দিকে—সব থেকে ফাঁকা জায়গাটায় লুকোবার একটা আস্তানা খুঁজতে।

সাহেব দু'টো হয়তো চোখ পাকিয়ে হেসে উঠত হো-হো-করে, মুখে বলতো : ন্যাসটি—ব্ল্যাডি—

বাঙ্গালীরা শুধু চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখতো, তাদের রসভঙ্গের মধু কৈটভ কে।

রাত বাড়ছিল মিনিটে মিনিটে। আর কপালটাও একটু একটু করে টেনে ধরছিল জনসনের—মদের নেশা তাকে একদম সোজা করে তুলে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। মনে পড়বার সংগেসংগেই তীব্র আকর্ষণ বাড়তে থাকে জনসনের। কিন্তু উপায়! গোটা তিনটে দিন ছড়িটা একবারও আছাড় খায়নি বেহালাটার বুকে, জনসন ভাবতে থাকে—পথের মানুষের প্রয়োজন কেই বা মিটিয়ে যাবে এই সন্ধ্যারাতে? তবুও সান্ত্বনার প্রশ্ন জাগে না তার মনে, প্রাণে শুধু রব ওঠে—চাই—চাই—চাই!

হঠাৎ মনে পড়ে যায় উৎসবের কথা। ভেসে ওঠে সজ্জিতা নগরীর এক পক্ষের একটা আনন্দ। কিন্তু সেই পক্ষেরই তো জনসন একজন—তারও তো বাড়ী খাস লণ্ডনের ব্রেড্‌ফোর্ডে, আজ তাদেরই রাণীর রাজ্যাভিষেক।

সেখানকার উৎসবের কল্পনা করতে পারে না জনসন, তবে এখানকার ঢেউ দেখেও বিস্মিত হয়ে যায় রীতিমত। কোথায় সজ্জিতা লণ্ডন, আর কোথায় রূপসী কোলকাতা! কিন্তু জনসন নিজে এখনও কি করছে? লগন বয়ে যায় এদিকে, এখনও সে না মদ খেলে, এখনও না একটু আনন্দ করলে—এখনও না একবার নাচলে, নব-অভিষিক্তা মহারাণীর অমঙ্গল হবে। সে যে নিজে এখনও একজন বিশুদ্ধ ইংরেজ।

বেহালাটা হাতের মুঠোয় ঝুলিয়ে মাঠ পার হয়ে যায় জনসন। দূর থেকে চোখে পড়ে, রূপসী মেয়ের শাড়ীর জরী-বসান পাড়ের মত ধর্মতলার রাস্তাটা—জনসনের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। জনসন রাস্তা পার হয়ে এসে ফুটপাতের ওপর দাঁড়ায়। বাঁ হাতে বেহালাটা উঁচু করে ধরে হাঁকে: বেহালা কিন্‌বেন!

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় দু'জন মাড়োয়ারী যুবক, একজন মাথার টুপিটা ভালভাবে বসিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে: কেত্‌না?

জনসন বলে: ফটি রুপিস্—খাস ইতালি মেড্।

—দেখি, বলে একজন বেহালাটা হাতে তুলে নেয়, ছড়ি দিয়ে দু'চার বার ঘসাঘসি করে, তারপর বলে: বিশ রুপেয়া।

হঠাৎ কি মনে হয় জনসনের। বেহালাটা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে বলে: নেহি বেচেগা।

—আচ্ছা লেও পঁচিশ—

জনসন বলে: নেহি।

—তিরিশ্ লেকর দে দেও। দ্বিতীয় যুবকটি দর বাড়িয়ে দেয়। প্রথম যুবকটি করকরে চারখানা নোট বের করে এগিয়ে ধরে: লেও।

জনসন আর দাঁড়ায় না সেখানে, দৌড়তে দৌড়তে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্যদিকে।

দীর্ঘ বারো বছর পরে জনসন আবার ফিরে আসে সাহেব মহলে। বেহালাটা সে বেচবেই—সম্রাজ্ঞীর অভিষেক উৎসবের সে ভাগ নেবেই নেবে। কিন্তু কোন নেটিভের হাতে তুলে দিতে পারবে না—তার পিতার অমর দান। তার প্রাণের শিল্পকে সে খুন করতে প্রস্তুত, মাত্র কয়েক ঢোক মদের জন্য।

খদ্দেরও জুটে যায় আচম্বিতে—মেট্রো সিনেমার শো রুমের মধ্যে। জনসনের বেহালাটার ওপরে ধবধবে পাঁচটা আঙুলের স্পর্শে চমকে ওঠে জনসন। তারপর দু'একটা কথার ভাবেই বিক্রির কথা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, সেই অপরূপা ইংরাজ মহিলাটির সংগে।

কয়েকখানা অশোকস্তম্ভ মার্কা নোটের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়ে যায় জনসনের জীবিকাটি।

জনসন হাওয়ার মত উড়ে চলে জামা কাপড়ের দোকানের দিকে। একখানা নোটকে বাঁচিয়ে বাকী টাকায় সে স্যুট কিনে ফেলে একটা। সেলুনে বসে মুখটা পালিশ করে নেয় উত্তমরূপে—জনসনের মুখে চোখে ক্রমশঃ সফল হয়ে উঠতে থাকে এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক। জনসন এসে ঢোকে মদের দোকানে, এক পেট মদ খেয়ে নেয় বসে বসে—চোখে মুখে উপ্‌চে উঠতে থাকে একটা রঙের আমেজ। জনসন পা টেনে টেনে বেরিয়ে আসছিল পথে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একদম পাথরের মত। তার সামনেই ঝক্‌ঝকে গাউন পরে দাঁড়িয়ে সেই মহিলাটি—যে একটু আগে কিনে নিয়েছে জনসনের বেহালাটা।

কিন্তু বেহালাটা তো নেই তার হাতে, তবে কি সে ফিরে এসে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। জনসন এগিয়ে যায় তার দিকে হাত ধরাধরি করে দু'জনে নেমে পড়ে পথে।

মহিলাটি তাকে নিয়ে আসে জনসনের জীবনের কোন এক নিষিদ্ধ এলাকায়। নাচের আসরে আরো একজোড়া

পা তাল টেনে চলে, আরো দু'জোড়া নির্বাক চোক অপার বিস্ময়ে বিস্মৃত হতে থাকে—এরা নেচে চলে সারারাত। করনেশনের বাজনা বাজতে থাকে—ঘর ভরে যায় ইংলণ্ডের বাতাসে।

ঘুম ভাঙ্গে ফলওলার ঠেলাতেই, কিন্তু বেহালাটা এগিয়ে দিয়ে বলে না : এই নাও সায়েব, ধর।

জড়ান চোখ দুটো দিয়ে সূর্য আর ফলগুলাকে দেখে বিস্ময় জাগে জনসনের—তাইত কি করে সে এখানে এল!

বহুরাত্রের বেহুঁস জনসন ঠিকই পথ চিনে এসেছে এই শোবার ডেরায়, কিন্তু কাল তো সারারাত সে উৎসব পালন করেছে, এখানে শুতে এল কখন? আবু হোসেনের গল্পটা জানা ছিল না জনসনের, থাকলে চমৎকার একটা উপমা পেয়ে যেত বৈকি?

সেদিন থেকেই আর একটা অধ্যায় নেমে এল জনসনের জীবনে। প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভ এলো ধর্মতলার প্রতি। উন্মাদের মত দিন দুই পথে পথে ঘুরে তিনদিনের দিন আর বরদাস্ত করতে পারল না ধর্মতলার ফুটপাতগুলোকে। বুভুক্ষু পেটটাকে নিয়ে সে শেষবারের মত আর একবার ঢুকে পড়ল মদের দোকানে, ধার করে আরো গ্লাস দুই মদ চড়িয়ে নিল খালি পেটটায়, তারপর ধর্মতলা ছেড়ে বাড়িয়ে দিল পা' দু'টোকে।

দুপুর বারোটায় সে হেঁটে হেঁটে এসে পড়ল কালীঘাটে।

আদি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বেশ বিচিত্র লাগল জনসনের—ধর্মতলার রাজত্বে এমন তীর্থও গড়ে রেখেছে বাঙ্গালীরা! সমস্ত কিছুই আশ্চর্য্য লাগে তার, সে গোলাপী চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে—পাণ্ডাদের লোক পটানোর পাণ্ডিত্যের দিকে।

কিন্তু এসবের দিকে বেশীক্ষণ চোখ থাকেনা জনসনের, তার দৃষ্টি এসে থমকে পড়ে সামনের সড়কটায়—যেখানে বাজেআপ্ত জীবনগুলো ভীড় লাগিয়েছে দু' পাশারি। জনসন তাকিয়েই চমকে ওঠে—এত ভিখিরী এখানে!

জনসন এগিয়ে চলে এদের ব্যূহ ভেদ করে—, গলা কাটার পর খোঁড়া, খোঁড়ার পর কানা, কানার পর কুঠে, কুঠের পর হাতকাটা—দগ্‌দগে ঘাওলা, কেউ বা বিকলাঙ্গ —চট পেতে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। এর মধ্যে আবার নারী পুরুষ দুই আছে, আছে সধবা বিধবা—।

জনসন মনের মত জিনিষ পেয়েছে দেখবার, ভারতীয় ভিখিরীর সব কটা রূপই এখানে প্রদর্শনীর মত হাত পেতে বসে দাঁড়িয়ে আছে।

জনসন সাহেব চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একস্থানে, লাল লাল আমেজি চোখ দু'টো নিবদ্ধ হয়ে যায় সেখানে—একটি মেয়ে ভিক্ষে করতে বসেছে। আঠারো কুড়ি বয়েস হবে মেয়েটির, মিস কালো অদ্ভুত মুখ চোখের গড়ন—মজবুত দেহের বাঁধন। তার চুল আর শাড়িখানা ছাড়া দারিদ্র্যের কোন প্রমাণই নেই আর কিছুতে। সাহেব আর পা' তুলতে পারে না—ফুলপ্যান্টের পকেট দু'টোর মধ্যে হাত দু'টো গলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েটার হাত তিনেক দূরেই বসেছে আর এক প্রৌঢ়া রমণী। মেয়েটার চাল পয়সা পড়ার অনুপাতে এর সিকিও পড়েনি, সে ফিস্ ফিস্ করে মেয়েটার উদ্দেশ্যে বলে : সায়েবটা কি দেখছে লো চাঁপী?

চাঁপী অলক্ষে একবার জনসনকে দেখে নিয়ে বলে : কাখে দিবে তাই ভাবছে—গো—। বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে চাঁপী।

রমণীটি বলে : না লো, অন্য মৎলব।

জনসন চাঁপীর হাসি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে তার কাছে, বলে : তুমি ভিক্ষা করিতেছ কেন?

আজ পর্যন্ত চাঁপীকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে একথা, বাবুরা ভিখিরীকে ইনেস্‌পেকশন করছে এই খাতিরেই চাঁপী বলে : খেতে পাইনা বলে।

আমি খাইতে দেব তুমি ভীখ্ ছাড়িয়ে দাও।

পাশের মহিলাটি চাঁপীর গা টিপে দিয়ে বলে : কি বলছিলুম লো, চট করে কিন্তু আমল দিস্‌নি, ব্যাটা বোধহয় মাতাল আছে—দিনমানেই টানাটানি করতে পারে।

জনসন আরো খানিক এগিয়ে এসে জুতোয় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসে; চাঁপী খিঁচিয়ে ওঠে : এই-এই ওঠ—আমার দোকানের মুখ আড়াল হচ্ছে।

—আমার উত্তর?

—উত্তর আবার কিরে মুখপোড়া, তুই খেতে দিলেই আমি তোর ঘরে গিয়ে খাব—এত পেটে আগুন লাগেনি মা কালীর আশীর্ব্বাদে।

—তবে ভীখ্ করিতেছ কেন? জনসন আভিজাত্যের সুরে প্রশ্ন করে। চাঁপী ভীষণ চটে ওঠে: বেশ করছি—তোর বাবার রাজত্বে করছি?

—না আমাডের আর রাজত্ব কোথায় আছে, তবে আমিও ভীখ্ করিতে জানে।

পাশের মহিলাটি খেকিয়ে ওঠে: জানিস তো মুখ ফুটুনি করছিস কেন—করগে যা না ভীখ্।

জনসন আর অপেক্ষা করে না মোটেই, চাঁপীর ডানদিকে খালি জায়গাটুকুতে আধখানা পা'ছড়িয়ে চাঁপীরই গা ঘেঁসে বসে পড়ে, পকেটের রুমালটা বিছিয়ে চাল পয়সা পড়ার নিশানা করে দেয়।

চাঁপীর ভারি আশ্চর্য লাগে, তার থেকেও বেশী লাগে বিরক্ত। গা ঘেঁসে বসার অশোয়াস্তিটাকে দূর করবার জন্যে তার পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা লাগায়।

—এই মুখপোড়া উপি বাঁদর সরে যা—সরে বস্—তোর মত অনেক নাগরই এ নগরে আছে, তারা দেখলে এক্ষুণি গুমখুন করে ফেলবে।

জনসন চাঁপীর মুখের কাছে মুখটা এগিয়ে আনে, বলে: খুনের ভয় আমরা করে না—আমাদের কাছে লুকান পিস্তল আছে।

মহিলাটি চাঁপীকে থামিয়ে দেয় ডান হাতটা দিয়ে: এই চাঁপি ছেড়ে দে, উয়াদের কাছে সব থাকে।

ভিখিরীদের ছুটির সঙ্কেত দিয়ে সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে।

চাঁপী তাড়াতাড়ি দোকান গুছোতে আরম্ভ করে।

জনসনের জ্ঞান হয় এতক্ষণে, সে তার চাল পয়সা সমস্ত কিছু হঠাৎ মিশিয়ে দেয় চাঁপীর চালেতে।

চাঁপী আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে জনসনের দিকে।

জনসন বলে: তুমি আজ আমায় খাইতে দিবে।

মহিলাটি অবস্থা বুঝে আর কথা কাটাকাটি করতে চায় না, চাঁপীকে—দু'একটা উপদেশ দিয়ে মিশে পড়ে ভীড়ের মধ্যে।

চাঁপী নিঃসহায় হয়ে গজগজ করতে করতে ছুটতে থাকে, জনসনও হাওয়ার মত মিশে থাকে চাঁপীর গায়ে গায়ে।

ছেঁচা বেড়ার নিকোন পোঁছান পরিষ্কার একটা ঘর। দাওয়ার কোলেই কাঠকয়লার উনোন পাশাপাশি—চাঁপার যৌবনশ্রীই যেন ফুটে রয়েছে সমস্ত ঘরখানায়, জনসনের কিন্তু খুব ভাল লেগে যায় ঘরখানা, সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দাওয়াটার এককোণে—চাঁপী উনোন জ্বালাতে লেগে পড়ে।

ভাত চাপিয়ে দাওয়ায় চাল পয়সাগুলো ঢেলে, লম্প জ্বালিয়ে বাছতে বসে চাঁপী, বাছতে বাছতে এক সময় বলে: চাড্ডি খেয়েই যাবি তো মুখপোড়া?

জনসন বলে: না।

—খাবি আবার শুবি—পয়সা আছে?

—না।

—তবে বেরো এক্ষুণি, নইলে ঝেঁটিয়ে তাড়াব।

জনসন উত্তর দেয় না, নির্ব্বাক হয়ে শুয়ে থাকে একই ভাবে। চাঁপা আর কথা বলে না, সেও বোধহয় একটা কিছু ভাবতে থাকে।

সাতটা না বাজতে বাজতেই ভাতবাড়া হয়ে যায় চাঁপীর। একথালা ভাত খানিকটা ডাল আর একটা তরকারি দিয়ে ভাত ধরে দেয় জনসনের সামনে। তারপর বলে: খেয়েই মানে মানে কাটো, নইলে ডাকবো এক্ষুণি সবাইকে।

জনসন বলে: ডাকিলে আমি ডুয়েট লড়িব, না হয় মরিব, টবুও যাইবে না—হামি তোমাকে ভালবাসিবে।

—আঃ মল যা, আচ্ছা গেলো এখন—তারপর দেখাচ্ছি তোমায় বাঁদর নাচ।

থালাটা চাঁচপোঁচ করতে মিনিট পাঁচেকের বেশী সময় লাগে না জনসনের। তারপর হাত মুখ ধুয়ে আবার গিয়ে বসে দাওয়াটায়। চাঁপী তখন অবশিষ্ট কটা নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করছে। চাঁপী আঁচিয়ে উঠে একবার ঘরে গেল, দরজা বন্ধ করে পরে নিল একটা মনোহারিণী শাড়ি, মুখে মেখে নিল খানিকটা খড়িগুড়ো আর হিমানী। তারপর বেরিয়ে এল সে এক অন্যবেশে। জনসনের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল চাঁপা: আর এক মিনিটও বসা চলবে না—বেরোও বাড়ী থেকে।

জনসন উঠে দাঁড়াল, বিস্ফারিত চোখ দু'টো দিয়ে যেন গিলে খেতে চাইল চাঁপীকে। চাঁপী একটু সরে গেল। আবার চীৎকার করে উঠল: বেরোও বলছি বেহায়া কুকুর—

কিন্তু তারও আগে জনসন ঝাঁপিয়ে পড়ল চাঁপীর উপর, জড়িয়ে ধরল তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে।

চাঁপী প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল, কিন্তু সে চীৎকার

কানে গেল না জনসনের। তাকে কোলপাজা করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে সে।

সে রাত্রি কাটলে পর, ভিক্ষেয় বেরুবার আগে চাঁপী জনসনকে বললে, তুই যদি চাকরি করে খেটে খাওয়াতে পারিস, তাহলে আমি তোর সংগে থাকবো—নইলে একটা কাণ্ড বাধাবে এই চাঁপী। কথাগুলো বলে হন হন করে বেরিয়ে গেল চাঁপী, পেছন ফিরে একবারও দেখল না। জনসন তার পেছু নিল কিনা।

চাঁপীর ঘরে এক রাত্রি বাস করে জ্ঞান ফিরে গেছে জনসনের। সে শিক্ষা পেয়েছে চাকরি করবার—চাঁপী তাকে বুঝিয়েছে অনেক করে। তাই জনসন আর ভাবে না এক কপৰ্দ্দকও—সেও বেরিয়ে পড়ে পথের উদ্দেশ্যে।

ভিখিরীর ঘরে ভাত ফেলা যায় রাত্রে। জনসনের জন্যে পথ চেয়ে চেয়ে শুয়ে পড়ে চাঁপী, জোর করে এক রাত্রির ভালবাসা আপদের মতই ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে পারে না রাত্রে।

দিন দুই পরে সন্ধ্যে নাগাদ এসে এক অদ্ভুত কথা বলে বসে জনসন: কাঁকনাড়ার জুটমিলে চাকরি পাইয়াছি আমি, তোমায় শুদ্ধু যাইতে হইবে—ঘর ভাড়া লইয়াছি একটা।

শুনে বজ্রাঘাত পড়ে চাঁপীর মাথায়, বলে: তা' আমায় নিয়ে টানাটানি কেন—চাকরি পেয়েছিস্ করগে না না—

—না, তোমায় আমি লইতে আসিয়াছি।

—না, আমি যাবো না, এমন চালু ব্যবসা ছেড়ে আমি একপা কোথাও নড়ব না।

জনসন বলে: আমি জোর করিতে জানে।

এক চোট ঝগড়া-ঝাটি হয়ে যায় দু'জনে, অশ্লীল গালাগালি চলে ঘণ্টাখানেক—প্রতিবেশীরা জড় হয়, কিন্তু কেউই এগোয় না সাহেব দেখে, উপরন্তু উপদেশ দিয়ে যায় চাঁপীকে।

চাঁপী কারো কথা কাণে না তুলে, গাল পেড়ে যায় একতালে। তবুও শেষ রাত্রে জনসনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে কাঁকনাড়ার উদ্দেশ্যে। গাঁটের পয়সা খরচা করে চাঁপীই রিক্সা ভাড়া করে নেয় শিয়ালদা অবধি—তা' না হলে ছ'টায় যোগ দিতে পারবে না জনসন।

জনসন তাকে কথা দিয়েছে খাওয়াবে-দাওয়াবে, আর হপ্তার টাকা থেকে হাত খরচাটা কেটে নিয়ে সবটুকুই তুলে দেবে চাঁপীর হাতে। জনসন হপ্তা পাবে সাতাশ টাকা।

মাস আষ্টেকের মধ্যেই কাঁকনাড়ার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে ফেললো জনসন। পেটে দু'মাসের সন্তান নিয়ে চাঁপী দিন দিন আরো সুন্দরী হয়ে উঠছিল। জামা কাপড়ের আমূল পরিবর্ত্তন এনে ফেলেছিল জনসন, নতুন নতুন শাড়ী পরতে দিয়েছিল চাঁপীকে—কালীঘাট আর ধর্মতলার ভিখিরী ভিখারিণী স্বর্গ রচনা করে ফেলেছিল কাঁকনাড়ায় একটা এক তোলা বাড়ীতে।

চাঁপীর পেটটা ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল বুকের দিকে, জনসন দেখতো আর বলতো: টাকা পয়সা টান করিয়া খরচা করিবে—ভাড়া জুটিলেই আমরা হোমমে চলিয়া যাইবে।

কথা বলেই জনসনের মনে পড়ে যেত ধর্মতলার কথা, ভাড়ার অভাবে তার বাবা বাংলার মাটিতেই শুয়ে রইল।

হঠাৎ একদিন মিলের মধ্যেই খবর পেয়ে গেল জনসন, মেয়ে হয়েছে তার।

ছুটি করেই ছুটতে থাকে জনসন, হাঁসপাতালে দেবার সমস্ত সুবিধে থাকা সত্বেও অসাবধানে প্রসব হয়ে গেছে চাঁপীর। জনসন ছুটে এসেই ধাক্কা লাগায় দরজায়। দরজা খুলে যায়—মাথা ঘুরে ওঠে জনসনের।

নম্র কোমল হাঁসি হেঁসে চাঁপী বলে: কি গো, কি দেখছো, মেম হয়েছে—তবে বড্ড কালো!

জনসনের অন্তরে কাঁপুনি আসে, মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে।

সেই দিন রাত্রেই একটা বেহালা কিনে আনে জনসন। সংগে আরো আনে কয়েকটা শাড়ী আর এক ঠোঙ্গা খাবার।

চাঁপী বলে: ওটা আবার কি আনলে?

জনসন বলে: বাজনা বাজাবে।

রিম্‌ঝিমে রাত্রি নামে শ্রাবণ রাতের মেঘ-ভরা আকাশে। ঘুমিয়ে যায় চাঁপী, কচিটাও নিঃসাড়ে ঘুমোয় মায়ের কোলে। শুধু জনসনের চোখ দুটো জ্বলে, হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বেহালাটা।

নিঃশব্দে দরজা খোলে জনসন, ভেজিয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই। উঠোনে নেমে আসে, গায়ে একটা সার্ট পরণে একটা প্যাণ্ট। হাতের মধ্যে বেহালাটা শক্ত করে ধরে পথে নেমে পড়ে জনসন।

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে শিশুটা,—কালো মেমের কচি গলার কান্না বাতাসে ফুলে ফুলে ওঠে। জনসনের লম্বা লম্বা পায়ের ছাপ পড়ে বি টি রোডের বুকে। আকাশে বৃষ্টি নামে—রিমঝিম।

নমস্কৃতি

রাধারাণী দেবী

যাঁর রচনার প্রতিফলনে
অন্ধবিশ্বাসের ঝাপ্‌সা মালিন্য যায় ঘুচে,—
ঝক্‌ঝকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বুদ্ধির আয়না ;—
মার্জিত পরিহাস-রসের রসায়নে যাঁর
সর্বসাধারণের রসগ্রাহিতা-শক্তি হয়
উজ্জ্বল, পরিস্কৃত, সূক্ষ্ম ,
জীবনকে দেখতে পেয়েছেন যিনি

রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানের অনাবিল নির্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে,—
ভাব-মেঘমেদুর কাব্য কল্পনালোকে
কেমন করে করবো তাঁর অভ্যর্থনা ?

কথা-সৃষ্টির কলা-কৌশল যাঁর—
প্রাচীন ঋষিদের মন্ত্ররচনার গূঢ় আঙ্গিকের মতোই

বৃহৎকে করে পরিমিত,
কঠিনকে সহজ,—আর
নির্ভুল স্বায়ত্ত সত্যের সুস্পষ্ট-প্রকাশ।
যার অঙ্ক ফল,
সামান্যের মধ্যে অসামান্যের অভিব্যক্তি।

বাগাড়ম্বরের অমিতাচারে ভোঁতা হয়নি যাঁর
মসৃণ কলমের সূক্ষ্মাগ্র নিব্‌,
প্রসাধন-অনাসক্ত শিল্প যাঁর
সহজ-আত্মপ্রত্যয়ে এসেছে
সাহিত্যের দরবারে নিরাভরণ ;—
ছন্দের নিক্কণ-তাল, অলংকারের সুমিষ্ট শিঞ্জিনী,
ধ্বনি আর অনুপ্রাসের
কাণ-ভুলোনো ঝংকার দিয়ে
প্রশস্তি-নিবেদনে সংকোচ জাগে সেই কথা-কুশলীকে
যিনি সর্বমোহ-মুক্ত।

অমৃতের আসল-পরিচয় সঞ্জীবনী-শক্তিতে।
স্বাদ-মাধুর্যে যদি হয়ে উঠি উচ্ছ্বসিত, তন্ময়,
বঞ্চিত হবো সঞ্জীবন থেকে।

জানা অজানার আলো আর ছায়ায়
মসী-কর্বুর রেখাঙ্কিত জীবন-অরণ্য।
পদে পদে বিভ্রম ঘটায় পথিকের।
সত্য এখানে প্রতিভাত হয়ে রয়েছে মিথ্যায়,
মিথ্যা প্রতিভাত সত্যে।
বিশেষ-জ্ঞানের সার্থক-অভিজ্ঞতা নিয়ে
যে-তপস্বী
জীবনারণ্যের খাঁটি ও মেকির নির্ভুল যাচাই-ফল
তুলে দিয়েছেন সাহিত্যের ফলকে,
সেই বিশুদ্ধ সত্যদ্রষ্টা—
রসস্রষ্টাকে নিবিড় নমস্কার !

তারাশঙ্কর

নরেন্দ্র দেব

রবি শশী আর অনেক তারায় আকাশ উজ্বল রবে,
কথা কাহিনীর স্রোত বয়ে যায় উচ্ছল কলরবে ;
কাব্যকুঞ্জে বাজে মৃদঙ্গ, ওঠে গীত মূর্চ্ছনা ;
দীপান্বিতার দিগন্তে যেন অতসী স্বরঞ্জনা !

এলে সে মেলার শেষ যামে তুমি নিভৃত পল্লী হ'তে,
মুক্তি সাধক দৃপ্ত যুবক একাকী জন স্রোতে ;
সেদিন দেখেছি বিপ্লবী ধ্বজা কঠিন মুঠিতে তব
কণ্ঠে ধ্বনিত মাতৃমন্ত্রে ওঁকার অভিনব !

দেখেছি সেদিন দুঃসাহসীর শৃঙ্খল-ভাঙা রত,
দুঃশাসনের উচ্ছেদে তব বজ্র সমুদ্যত !
তীর্থ মানিয়া সহাস্যমুখে ছুটেছিলে কারাগারে,
নির্যাতনে কি নির্ভীক জনে শাসনে রাখিতে পারে ?

সেদিন একথা ভাবে নাই কেহ, অদূর ভবিষ্যতে—
হেরিবে তোমারে বরমালা গলে ভারতীর জয়রথে !
এল তব তরী সরস্বতীর খরস্রোতে ঢেউ তুলে
অনুকূল বায়ে ফুলে ওঠে পাল, যাত্রীরা ওঠে দুলে !

তোলে তব নাম মর্মে আমার রোমাঞ্চ বারে বারে,
আদ্যাশক্তি শোভে শিব-হৃদে—সৃষ্টি ও সংহারে !
মানবতা তব ধ্রুব আদর্শ, তুমি যে ব্যথার ব্যথী,
তব দর্শনে অসীম সীমিত, চিন্তা চরৈবেতি !

জন্ম তোমার না-জানি সে কোন তান্ত্রিক অভিচারে ;
বিংশ-শতকী জীর্ণ ভগ্ন অভিজাত পরিবারে।
তোমার রচনা—নহে সে বিলাস অবসর বিনোদনে,
সে যে প্রাণ-ঋক, বোধি ব্রাহ্মণ, শুচি করে হরিজনে !

পঞ্চগ্রামের তুমি মণ্ডল, গাঁয়ের গোয়ার ছেলে
জলসা-ঘরের নেভা-জোলুস দেখালে প্রদীপ জ্বেলে,
গণদেবতার গণেশ মূর্তি মূর্ত তোমার ধ্যানে,
ফিরায়ে এনেছ ধাত্রী মা যারে হারায়েছি অজ্ঞানে !

তোমার মনের মন্দির মাঝে যেন এসে চুপে চুপে,
পল্লী-জননী প্রকাশিত হেরি ষড়ৈশ্বর্য রূপে ;

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ল'য়ে মর্যাদা বংশাভিমান ভূস্বামী ছিল যারা,
তোমার তুলিতে কুল-গৌরবে শেষ দেখা দেছে তারা।

কত জমীদার—প্রজার বেদনা—বিঁধেছে মানসপটে,
কত সাধু আর অসাধু জড়ানো গাঁয়ের অশথ বটে !
কত সামাজিক রীতি নীতি প্রথা পালা পার্বণ ব্রতে
দেখালে ডুবুরী—ডুবেছিল যারা বিস্মরণের স্রোতে !

ক্লান্তি না মানি পল্লীর পথে চলিতে তোমার সনে,
তুমি নিয়ে চলো কতনা অজানা জীবনের অঙ্গনে !
কখনো গিয়েছে ব্রাত্যভূমিতে কলঙ্ক কূলে ল'য়ে
অশ্লীলতার পঙ্কিল ধূলি কৌশলে পার হ'য়ে।

আধুনিকতার বন্যা তোমারে করেনি কেন্দ্রচ্যুত
সত্য ও শিব সুন্দরে তব চিত্ত যে অভিভূত।
যে পথে ছুটছে সাম্যের যুগে উদ্ধত জনমত
তোমার লেখনী লঙ্ঘি তাহারে ধরেছে প্রেমের পথ।

পূর্ব পুরুষে আর উত্তরে বেধেছে যে সংঘাত,
এঁকেছে সেছবি—নাট্যে—কথায়—তোমার নিপুণ হাত!
অতীতের মাঝে ভাবী মানবের কী বীজ রয়েছে বোনা—
তারি সন্ধানে ব্যাকুল হৃদয়ে গ্রামে গ্রামে আনা গোনা!

কোথা কবিয়াল, সুপটু পটুয়া, বাবাজী বৈরাগীরা ?
আউল বাউল, নাগিনী রূপসী, কোথা বেদে বেদিনীরা ?
কোথা সে বেচারা—গুরু মহাশয়? কোথা তাঁর পাঠশালা ?
জাতহারা কত বৈষ্ণবে তুমি পরালে তুলসী-মালা !

সাহিত্যকলা স্বভাব মূল্যে তোমারে করেছে ধনী
অন্তর রসে সিক্ত রচনা চিরদিনই অগ্রণী !
স্বদেশানুরাগে যে আগুন জ্বলে হোমশিখা সম বুকে
স্ফুলিঙ্গ তার বিকীর্ণ হেরি তোমার লেখনী মুখে !

কোন সে রচনা হেথা শাশ্বত—ইতিহাসে অবিনাশী—
জানি না তাহার খবর বন্ধু, যে রচনা ভালবাসি
পেয়েছি তা' খুঁজে তোমার পুঁথিতে মনপ্রাণ গেছে ভ'রে
এনেছি প্রীতির পরম অর্ঘ্য দুটি হাত জোড় করে।

যে বলে বলুক—সৃষ্টি কাহারো স্থায়ী নহে দূর কালে ;
আমরা দেখেছি কাল-জয়ী টিকা উজ্জ্বল তব ভালে !
নহ শুধু কথা-কারু সুনিপুণ, নাট্য-শিল্পী তুমি,
তোমার স্বপ্ন কল্পনা গড়ে আগামী জন্মভূমি !

রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রতিভা তোমার করেছে পুরস্কৃত,
জানি এ তোমার সহজ প্রাপ্য ! এতো নহে আশাতীত !
তব সম্মানে লভি সম্মান আনন্দাশ্রু ধারে—
অগ্রজ আজ অনুজে তাহার বরিছে নমস্কারে !

কানাইলাল ঘোষের 'শরৎচন্দ্র'

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(২)

শরৎচন্দ্রের বয়স যখন ১৫।১৬ তখন তিনি কিভাবে সুরবালা নামে এক সুরূপা যুবতীর এবং এর কিছুদিন পরে সাবিত্রী নামে আর এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তারই কাহিনী কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থের ৫০-৬৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে কাহিনী দু'টি এই—

শরৎচন্দ্র তখন দেবানন্দপুরে। সেই সময় তাঁদের পাশের বাড়ীর বৌ সুরবালা প্রায়ই শরৎচন্দ্রের মা'র কাছে যেতেন। সুরবালার বয়স তখন আঠার-উনিশ। দেখতেও সুরূপা। সুরবালার স্বামী বিদেশে চাকরী করত। বাড়ীতে ছিল এক সরকার, আর সুরবালার কালা শাশুড়ী।

শরৎচন্দ্র এঁকে বৌদি বলতেন। আর বৌদিও শরৎচন্দ্রের যত কিছু আবদার হাসিমুখে যুগিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র একবার পাড়ার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে এক বনভোজনের আয়োজন করেন। একটা বাগানে জুটে সকলে যখন বনভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত, শরৎচন্দ্র তখন তাঁর এই সুরবালা বৌদির কাছে কিছু চাঁদা ও পান সংগ্রহ করতে গেলেন।

সুরবালা ৫৲ টাকা চাঁদা সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করেই দেরি করে পান সাজতে লাগলেন এবং ঐ সময়টায় তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্রের মনটা তখন পড়েছিল বন্ধুবান্ধবের কাছে। তাঁর দেরি সহ্য হচ্ছিল না। বারে বারে তাগিদ দিতে লাগলেন—কই তোমার হ'ল বৌদি ?···

সুরবালা উত্তর দিলেন, একটু দাঁড়াও খিলিগুলো মুড়ে নিই ! শরৎচন্দ্র কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলেন—না তুমি ইচ্ছে করেই দেরি করে দিচ্ছো !

সুরবালা মুখ তুলে হাসলেন। বললেন—তাই তো দিচ্ছি ! এমন জরুরি কাজ সেখানে তোমার কত আছে বল তো ?

শরৎচন্দ্র বললেন—সে তুমি বুঝবে না।

অবশেষে হাসিমুখে সুরবালা সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতের ওপর একটি একটি করে পানের খিলি সাজিয়ে দিলেন। আদর কোরে কোলের কাছে টেনে এনে একটি চুম খেলেন শরৎচন্দ্রের কপালে।

বয়স তখন তাঁর পনোর কি ষোল। সেই আকর্ষণের সন্নিধানে সুপ্ত যৌবন তাঁর সহসা আত্মপ্রকাশ করে বসলো। তিনি অধীর আবেগ ও এক অপূর্ব অনুভূতির তড়িৎ প্লাবনে বন্ধুমহলের কাছে আর ফিরে যেতে পারলেন না। দূরে একটা পড়ো বস্তির নির্জন ঢিবিটার উপর বসে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

একটা অজ্ঞাত লজ্জায় শরৎচন্দ্র কয়েকদিন সুরবালার সম্মুখীন হ'তে পারলেন না। কিন্তু সুরবালা এই ঘটনাকে কোন প্রাধান্যই দিলেন না।

শরৎচন্দ্র এই সময় তাঁর পিতার আর্থিক দুরবস্থার জন্য স্কুলের পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুরবালা একদিন শরৎচন্দ্রের মাকে বললেন—"...যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তো ঠাকুরপো আমার কাছে থেকেই পড়াশোনা করতে পারেন।"

শরৎচন্দ্রের বাপমা সুরবালার কথায় মত দিলে, শরৎচন্দ্র সুরবালার বাড়ীতে থেকে পুনরায় পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন।

এখানে বৌদির (সুরবালার) স্নেহ যত্নের শেষ নেই।

টিফিনের সময় খাবার পাঠিয়ে দেন, সেই খাবার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মিলে ভাগ করে খান।...

শরৎচন্দ্র স্কুল থেকে ফিরলে, সুরবালা আদর করে তাঁকে ঘরে নিয়ে বসালেন। বইগুলো নিজেই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—টিফিনের খাবার সকলের কুলিয়েছিল?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, খুব ভাল হয়েছিল বৌদি! সবাই আমরা পেট ভরে খেয়েছি।

সুরবালা আদরে তাঁর চিবুকখানা দোলা দিয়ে বললেন—এত মিথ্যে কথাও বলতে পারো তুমি! ওইটুকু খাবার—তাও পাঁচজনে—সবার উপর পেট ভরে—বলিহারি তোমার লজ্জা! যাও হাতমুখ ধুয়ে এসো গে।

শরৎচন্দ্র হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলেন। সুরবালা একথালা খাবার নিয়ে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন।

এরপর কানাইবাবু শরৎচন্দ্রের বাল্য-সঙ্গিনী কালিদাসীর প্রসঙ্গ নিয়ে সুরবালা ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে অন্য আর একদিনের এক আলোচনার কথা লিখেছেন: কানাইবাবু লিখেছেন—...বৌদি কাছে ডেকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লঘু পরিহাস করলেন, কালিদাসীকে সত্যই তুমি ভালবেসেছিলে বটে!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র। বললেন, কি যে তুমি বলো বৌদি?

তবে এমন করে গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন দুটো দিন?

এমনি ভাবছি!

বৌদি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, উঁহু—না, অন্য কিছু!

যাঃ! বৌদির কোলে মুখ লুকালেন শরৎচন্দ্র।

বৌদি এই সুযোগই খুঁজছিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তাহলে খাবে চল।

এরপর কানাইবাবু সুরবালা ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আবার লিখছেন—সুরবালা...নিজে পাশে বসে খাওয়ান—নিজেই শয্যা রচনা করে দেন—অবসর সময়ে বসে আবার গল্প করেন দুজনে।...দিন কাটছিল বেশ সুখেই। সহসা সুরবালা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সেবা করতে লাগলেন। ডাক্তারকে খবর পাঠালেন, কিন্তু ডাক্তারের সেদিকে খেয়ালই নেই। এদিকে রোগী জ্বরের ঘোরে ভুল বকছেন। শরৎচন্দ্র নিজে ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। জানিয়ে দিয়ে এলেন—যদি তিন দিনের মধ্যে তাঁর বৌদি সুস্থ না হয়ে ওঠে, তা হলে সশরীরে এ গ্রামে আর তাঁর বাস করা সম্ভব হবে না!

সুরবালা পরদিন থেকেই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বামী প্রতুল-বাবুকে খবর পাঠানো হয়েছিল। তিনিও এসে পড়লেন। সুরবালা বললেন—একি তোমার পাগলামো ঠাকুরপো! একটা প্রাণের জন্যে এত লোককে কষ্ট দিলে?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন। বললেন, এছাড়াও ত উপায় ছিল না বৌদি!

সুরবালা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। স্বামী-সেবায় তিনি সকল সময়ে ব্যস্ত। শরৎচন্দ্র প্রথম উপলব্ধি করলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধুরতম সম্পর্কটা কি বস্তু। চিন্তা ধারায় সহসা তাঁর একটা বিপ্লব ঘটে গেল। তিনি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফেললেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে গভীর রাত্রিতে হাঁটা-পথে পাড়ি দিলেন পুরীর অভিমুখে।

এবার আসছে সাবিত্রীর কাহিনী—

শরৎচন্দ্র হেঁটে পুরী রওনা হয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে অনাহার ও পথশ্রান্তিতে বিশ্রামের জন্য একটা পুকুর পাড়ে বকুল গাছের তলায় বসলেন। বসে শেষে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমন সময় "একটি সুরূপা পূর্ণযৌবনা বিধবা" পথের পাশ দিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল। ঘুমন্ত শরৎচন্দ্র তাঁর চোখে পড়লেন। যুবতী জল নিয়ে ফেরার সময় শরৎচন্দ্রের শুকনো মুখ দেখে জলের কলসী নামিয়ে তাঁকে ঠেলা দিয়ে জাগালেন।

শরৎচন্দ্র চোখ খুলেই দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী।

তারপর যুবতী শরৎচন্দ্রকে—বাড়ী কোথায় গো তোমার? প্রশ্ন করলে, শরৎচন্দ্র আপন পরিচয় গোপন করে শুধু বললেন—জগন্নাথ দেবের দর্শনে চলেছি—মনের যত কিছু পাপ সঁপে দেব বলে।

শুনে যুবতী মুচকী হেসে বললে—তা না হয় হ'ল, কিন্তু এখানে শুয়ে

কেন…গাছতলায় কি ভাল ঘুম হয়? চল ব্যবস্থা করে দিই গে…ভয় নেই গো, বয়সে নিশ্চয় দুএক বছরের বড় হব।

এই সুন্দরী যুবতীটির নাম সাবিত্রী। সংসারে তার এক ভগ্নীপতি ও দূর সম্পর্কের এক দেওর। এরা ছাড়া আর কেউ নেই।

শরৎচন্দ্র কোন প্রতিবাদ না করে যুবতীটির সঙ্গে তার বাড়ীতে এলেন। যুবতী নিজে রেঁধে যত্ন করে শরৎচন্দ্রকে খাওয়ালে। তারপর নিজেই শয্যাটি পরিষ্কার চাদরে ঢাকা দিয়ে বললে—নাও শুয়ে পড়ো।

শরৎচন্দ্র এখানে কদিন রয়েও গেলেন। এই সময় আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সাবিত্রী অক্লান্ত সেবায় তাঁকে সুস্থ করে তুললে।

এদিকে সাবিত্রীকে শরৎচন্দ্রের এমন ভাল লেগে গেল যে, তাকে একটি মুহূর্ত দেখতে না পেলে অন্তরটি তাঁর আকুলি-বিকুলি করে উঠতো।

অপর দিকে আবার সাবিত্রীর ভগ্নীপতি ও তার দেওর তারা প্রত্যেকেই সাবিত্রীকে পাবার জন্য লালায়িত। একদিন রাত্রে তাদের উভয়ের মধ্যে এই বোঝাপড়া নিয়ে তারা দুজনে ভীষণ রক্তারক্তি করে বসল। সাবিত্রী ভয়ে পাশের ঘরে শরৎচন্দ্রের কাছে চলে গেল।

শরৎচন্দ্র তক্তপোষে, সাবিত্রী একটা কম্বল বিছিয়ে শুলো মেঝের ওপর। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ভয় করছে না সাবিত্রী?

সাবিত্রী তেমনি মধুর হাসি হাসলো। বললো—মানুষই পশু—কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন ভয় নেই।

দিন কেটে যায়। ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা শরৎচন্দ্রের আরও একটু বেশি খারাপ হল। সাবিত্রী বিব্রত হয়ে পড়লো। তখন সে গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে শরৎচন্দ্রের চিকিৎসা করালে।

শরৎচন্দ্র ওষুধ খেয়ে শুয়ে আছেন। সাবিত্রী মৃদু হাসি হাসতে হাসতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল! পা টিপে, তামাক সেজে আনলো। শরৎচন্দ্রের মুখে হাসি ফোটাতে সে যে কি করবে ভেবেই স্থির করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র সাবিত্রীর বাড়ীতে থাকেন। সাবিত্রী রেঁধে খাওয়ায়, তামাক সেজে দেয়, কাছে গিয়ে বসে।

কয়েকদিন পরে শরৎচন্দ্র আবার পুরী যাবেন, একথা শোনালেন, শুনে সাবিত্রী বললে—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। জীবনে কোন কিছু পাপ যদি করে থাকি—তোমার মতই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সঁপে দিয়ে আসবো!

শরৎচন্দ্র কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, ভয় করবে না?

সাবিত্রী মাথা দুলিয়ে সহাস্যে উত্তর দিল, ভারী ত পুরুষ।—তাকে আবার ভয়!

এরপর শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে নিয়ে একদিন পুরী রওনা হলেন।

এদিকে সাবিত্রীর ভগ্নীপতি ও তার দেওর, শিকার তাদের হাতছাড়া হয়েছে দেখেই তারা পরস্পর মনোমালিন্য ভুলে এক হয়ে গেল।

সাবিত্রীর ভগ্নীপতি শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে বললে—এত যত্ন, এত আয়াস,—বেইমান শেষে কিনা আমার ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে ভাগলো!

সাবিত্রীর দেওর বললে—যেতে হবে হাঁটাপথে। বাছাধনেরা যাবে কতদূর? দাও তো কিছু টাকা—পাড়ার অপি, অনাদি, সতীশ, মুরারীকে ঠিক করে আসি, তুমি আমি তো রয়েইছি।

কথা ও কাজ সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হয়ে গেল। নেশার উপকরণও যোগাড় করা হ'ল। সুরু হ'ল অভিযান। দল বেঁধে লাঠিসোটা নিয়ে চললো সকলে হৈ-হৈ রৈ রৈ রবে।

এদিকে শরৎচন্দ্র ও সাবিত্রী দীর্ঘ পথ হেঁটে শ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শরৎচন্দ্র তামাক টানছেন। একটু দূরে বসে আহারের ব্যবস্থাতে নিযুক্ত সাবিত্রী।…

শরৎচন্দ্র বললেন—পূর্বজন্ম বলে যদি কোন বস্তু থাকে, তাহলে তুমি ছিলে আমার কোন নিকটতম আত্মীয়া!

সাবিত্রী হাসলো।

সহসা একটু দূরে মিলিত কণ্ঠের হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ ভেসে উঠলো। ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝার পূর্বেই চারপাশ থেকে আক্রমণ সুরু হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রকে তারা উত্তম-মধ্যম দিয়ে সাবিত্রীর মুখ, হাত, পা, বেঁধে কাঁধে করে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিল অন্ধকারে।

অসহায় শরৎচন্দ্র জুল্ জুল্ করে চেয়ে দেখলেন—ডাকাতের দল অপহরণ করে নিয়ে গেল সাবিত্রীকে। নিরুপায়ে তিনি কাতরাতে লাগলেন, সেই গাছের তলায় পড়ে।

পরদিন সকালে শ্রদ্ধেয় কে. পি. বসু তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে; কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে সুস্থ করে তুললেন। কিছুদিন পরে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় অক্ষয় গাঙ্গুলী মশায়ের বাসায়।

কানাইবাবুর বর্ণিত সুরবালা ও সাবিত্রীর কাহিনী দুটি সংক্ষেপে এই। এখন এই কাহিনী দুটির সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা করা যাক্—

কাহিনী দুটি কানাইবাবুর স্বকপোলকল্পিত বানানো গল্প বলেই আমার মনে হয়। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ, কাহিনী দুটি এমনিতেই তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সুরবালার কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে—যুবতী সুরবালা যুবক শরৎচন্দ্রের কপালে চুমু খাচ্ছে, চিবুক ধরে দোলা দিচ্ছে, পাশে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, শয্যা রচনা করে দিচ্ছে, সঙ্গে বসে গল্প করছে, কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লঘু পরিহাস করছে ইত্যাদি। কানাইবাবুর লেখা থেকে একথাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সুরবালার সঙ্গে মেলামেশার সময় শরৎচন্দ্রের মনে একটা বিকৃত ভাবেরও উদয় হয়েছিল। কেন না কানাইবাবুই বলেছেন, শরৎচন্দ্র সুরবালা ও প্রতুলবাবুর মধ্যে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যখন দেখলেন, তখন তিনি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফেললেন।

এখন কথা হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুরবালার এই ধরণের মেলামেশাগুলো কি সুরবালার শাশুড়ীর চোখে পড়ে নি? আর চোখে পড়লে পরের ছেলের সঙ্গে নিজের পুত্রবধূর এই সব ব্যবহার কি তিনি

সহ্য করতেন ? আর তাছাড়া শরৎচন্দ্রের বাপমাও তাঁদের যুবক পুত্রকে ঐরূপ একটি যুবতী মেয়ের কাছে থেকে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন—একি কথন সম্ভব ?

সাবিত্রীর কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে—সুরূপা পূর্ণ-যৌবনা সাবিত্রী বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক শরৎচন্দ্রকে পথ থেকে ধরে এনে তাঁর কত না আদর-যত্ন করছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, পা টিপে দিচ্ছে, তামাক সেজে দিচ্ছে, এমন কি শরৎচন্দ্র সাবিত্রীর বাড়ীতে কিছুদিন থেকে অসুখে পড়লে সাবিত্রী তার গায়ের গহনা বন্ধক দিয়েও শরৎচন্দ্রের চিকিৎসা করাচ্ছে। কোন যুবতী মেয়ে পথ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবককে ধরে এনে এইভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে, একথা আদৌ বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার কোথাও একথা নেই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর ১৫।১৬ বছর বয়সে বাপমার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের প্রতিবেশিনী সুরূপা যুবতী সুরবালার কাছে থেকে লেখাপড়া করেছিলেন, অথবা শরৎচন্দ্র সাবিত্রীনাম্নী কোন পূর্ণ-যৌবনা রমণীকে নিয়ে পুরী যাওয়ার সময় পথে সাবিত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে উত্তম-মধ্যম প্রহার পেয়েছিলেন এবং প্রহার খেয়ে গাছতলায় পড়ে কাতরাতে কাতরাতে অসহায়ভাবে জুল্ জুল্ করে চেয়ে দেখছিলেন কেমন করে তাঁর প্রহারকারীরা সাবিত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল !

কানাইবাবু এই সব গল্প কিভাবে যে রচনা করলেন তা তিনিই জানেন। তবে হাঁ, শুধু এই গল্প দুটিই নয়, তাঁর বইয়ে আরও যে সব আজগুবি গল্প রয়েছে, সে সবই রচনা করতে গিয়ে তিনি বেশ একটা চালাকি করেছেন। সেটা হ'ল এই যে, তিনি গল্প বলার শেষে একটা করে বইয়ের নাম করেছেন, এতে করে তিনি বলতে চেয়েছেন এই যে, ঐ কাহিনীগুলি তাঁর নিজস্ব নয়, ঐগুলি তিনি ঐ সব উল্লিখিত গ্রন্থ থেকেই পেয়েছেন। এইভাবে তিনি সুরবালা ও সাবিত্রীর কাহিনী বলার সময় কাহিনী দুটির শেষে "শরৎ-পরিচয়" সু. না. গ. পৃঃ ১৭৭-১৭৮ ও ৯৯ লিখেছেন। অর্থাৎ কানাইবাবু বলতে চান যে, এই কাহিনী দুটি তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "শরৎ পরিচয়" গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন এবং কাহিনী দুটি ঐ গ্রন্থের ১৭৭-১৭৮ ও ৯৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

এখন দেখা যাক, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে কি আছে ! সুরেনবাবুর গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় কয়েক লাইনে এবং ১৭৮ পৃষ্ঠায় কয়েক লাইনে সুরবালা ও সাবিত্রীর উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু কোন কাহিনীর বর্ণনা নেই। এখানে অবশ্য সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়ার কথাও বলেছেন।

কানাইবাবু সুরেনবাবুর গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠারও উল্লেখ করেছেন। ৯৯ পৃষ্ঠায় সুরেনবাবু লিখেছেন—"দেবানন্দপুরের দারিদ্র্য দুর্দশা সহ্যের সীমানা অতিক্রম করে। স্বনামধন্য সলিসিটর গণেশচন্দ্র চন্দ্র এই সময় একদিন কাশী কি গয়া থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন ! তাঁর প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে একটি বছর বারো চোদ্দ বয়সের ছেলে উঠে পড়ে। পোষাক পরিচ্ছদ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারেন তিনি যে, ছেলেটি অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা চলেছে। স্নেহ-সম্ভাষণের দ্বারা তিনি অবশেষে জানতে পারেন যে, ছেলেটি তাঁর জনৈক বন্ধুর নাতি। অক্ষয়নাথ দেশপ্রেমিক বিপিন বিহারীর পিতৃদেব, তিনি তখন দুর্গা পিথুড়ির গলিতে বাস করতেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি অক্ষয়নাথের বাসায় পাঠিয়ে দেন।

এমন বহু গল্পই প্রচলিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেই সেগুলির উৎপত্তি স্থল।

দারিদ্র্যের নির্দয় পীড়নে শরৎচন্দ্র নাকি যাত্রার দলেও প্রবেশ করেছিলেন। পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়ার গল্পও বহুবার করতে শুনেছি তাঁকে। এগুলির সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়। পুরীতে নাকি তিনি গণিতবিদ্ কে. পি. বসুর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবনী-কারের এই সকল তথ্যের সত্যমিথ্যা নিরূপণের একান্ত প্রয়োজন আছে।"

সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু। সুরেনবাবু ভালভাবেই জানতেন যে, শরৎচন্দ্র অত্যন্ত পরিহাস-প্রিয় ছিলেন। তিনি অনেক সময়ই নিজেকে এবং অপরকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প রচনা করে শোনাতেন। সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের এই স্বভাবের কথা জানতেন বলেই তিনি লিখেছেন—এমন বহু গল্পই প্রচলিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেই সেগুলির উৎপত্তি স্থল।... এগুলি সত্যমিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়।

সুরবালার কথাপ্রসঙ্গে সুরেনবাবু তাঁর গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"সুরবালার কথা তুমি (শরৎচন্দ্র) আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্যমিথ্যার মনোরম রসসংশ্রবে অনেক কিছু বলেছো।"

এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে সুরবালার যে কাহিনী শুনেছেন, তাতেও শরৎচন্দ্র যে মিথ্যার যোগান দিয়েছেন, সুরেনবাবু একথা ধরতে পেরেছেন।

যাই হোক, সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের মুখে যে কাহিনীকে শুনেছেন, বলেছেন এবং যাকে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন নি, সে কাহিনীকে তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখমাত্র করেছেন, কাহিনীর কোন বর্ণনাই দেন নি। কানাইবাবু কিন্তু সুরেনবাবুর গ্রন্থের এই সামান্য উল্লেখিত কথাটিকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে ৫০—৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী মুখরোচক কাহিনী রচনা করেছেন।

সুরেনবাবু লিখেছেন—পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়ার গল্পও বহুবার করতে শুনেছি তাঁকে। এগুলির সত্যমিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়। পুরীতে নাকি তিনি গণিতবিদ্ কে. পি. বসুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন।— সুরেনবাবু যেখানে 'সত্যমিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়' বলছেন, এবং 'নাকি' আশ্রয় পেয়েছিলেন বলছেন—অর্থাৎ তিনি যেখানে সত্যবলে বিশ্বাস করছেন না। কানাইবাবু সেখানে শুধু বিশ্বাসই করেন নি, বানিয়ে কাহিনী রচনা করে শরৎচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করে ছেড়েছেন।

কানাইবাবু লিখেছেন—"মার খেয়ে অসহায় শরৎচন্দ্র জুল্ জুল্ করে

চেয়ে দেখলেন—ডাকাতের দল অপহরণ করে নিয়ে গেল সাবিত্রীকে। নিরুপায়ে তিনি কাতরাতে লাগলেন, সেই গাছের তলায় পড়ে।

পরদিন সকালে শ্রদ্ধেয় কে. পি. বসু তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে, কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে সুস্থ করে তুললেন। কিছুদিন পরে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় অক্ষয় গাঙ্গুলী মশায়ের বাসায়।"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সাবিত্রীর অপরহণকারীরা শরৎচন্দ্রকে এমন মার দিয়েছিল যে, তাঁকে সুস্থ হতে কিছুদিন সময় নিতে হয়েছিল। কানাইবাবু বলেছেন, শরৎচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলে, কে. পি. বসু মশায় লোক সঙ্গে দিয়ে শরৎচন্দ্রকে কলকাতায় অক্ষয় গাঙ্গুলীর বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুরেনবাবু তাঁর গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন—গণেশচন্দ্র চন্দ্র শরৎচন্দ্রকে একবার দেশপ্রেমিক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পিতা অক্ষয় গাঙ্গুলীর বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাও তিনি এই ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন নি। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কানাইবাবু সুরেন-বাবুর গ্রন্থে এই অক্ষয় গাঙ্গুলীর উল্লেখ পেয়েই কে. পি. বসুকে দিয়েও শরৎচন্দ্রকে অক্ষয় গাঙ্গুলীর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বানিয়েছেন।

কানাইবাবু সামান্য উল্লেখমাত্র পেলেই কিভাবে যে গল্প বানাতে পারেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এখানে কানাইবাবু সুরেনবাবুর গ্রন্থে সুরবালা ও সাবিত্রীর উল্লেখ পেয়ে যেমন গল্প বানিয়েছেন, তেমনি তিনি আমার একটি লেখাকে নিয়েও অদ্ভুতভাবে এক গল্প তৈরী করেছেন। এখানে এখন সেই কথাই বলি—

'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' নামে আমার একখানা বই আছে। বইটি কয়েকমাস আগে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হলেও, বইটি পাণ্ডুলিপির আকারে সম্পূর্ণ হয়ে অনেকদিন থেকেই পড়েছিল। এই বইয়ে একটি গল্প আছে "রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি"। সেই গল্পটি এই—

ভারতবর্ষ অফিসে সেদিন শরৎচন্দ্র এসেছেন। ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগের লোকজন ছাড়া আরও কয়েকজন সাহিত্যিক তখন উপস্থিত আছেন। সেই সময় কোন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ অফিসে এলে সকলে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধটি নিয়েই আলোচনা সুরু করলেন। কথায় কথায় একজন বললেন—শরৎদা কবি ঐ প্রবন্ধে আপনাকেও আক্রমণ করেছেন।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন—কবি এই করে আমার কি ক্ষতি করবেন শুনি! আমি তাঁর যে ক্ষতি করে দিয়েছি, সে তুলনায় কিছুই নয়।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সকলেই চমকে উঠলেন এবং তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কি ক্ষতি করেছেন, তা শুনবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। সকলের অনুরোধে শরৎচন্দ্র তখন বললেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বোসের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হয়ে বললেন—এ আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিটা হ'ল কি?

শরৎচন্দ্র বললেন—ক্ষতি হবে না। আচ্ছা তবে শোন, জান যে গিরিজা কি রকম গল্পে লোক! তার উপর আবার কবিতা লেখা ব্যারাম আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ায় এখন দু'বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, আর গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব তো জানই, নিজের শত অসুবিধা হলেও লোককে মুখের উপর কথা বলে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। গিরিজা এখন অনবরত রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে থাকবে। তার ফলে এই হবে যে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না। কেমন? কবি আমার যে ক্ষতি করেছেন, সে তুলনায় আমি তাঁর বেশি ক্ষতি করতে পারি নি?

এই গল্পটি পুস্তক প্রকাশের আগে ১৩৬০ সালের "শারদীয় উত্তরপথ' কাগজেও একবার প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'উত্তরপথ' কাগজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা প্রকাশ করেন নিরঞ্জন নামে একটি সদ্য এম. এ. পাস যুবক আমার কাছ থেকে ঐ গল্পটি তাদের পত্রিকার জন্য নিয়ে যায়। নিরঞ্জন আমার বহু বৎসরের পরিচিত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য। এই নিরঞ্জন আবার কানাইলাল ঘোষেরও বিশেষ পরিচিত। কানাইবাবু নিরঞ্জনের কাছে উত্তরপথে প্রকাশিত আমার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' গ্রন্থের এই রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি গল্পটি দেখেন। এই গল্পটি দেখে কানাইবাবু নিরঞ্জনকে পর্যন্ত জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে গল্প রচনা করেছেন, আবার সেই গল্পের শেষে "শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প" লিখে দিয়েছেন। অর্থাৎ কানাই বাবু বলতে চান যে এই গল্পটি "শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প" গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এখন কানাইবাবু আমার লেখা গল্পটিকে নিয়ে কিভাবে বিকৃত করে বানিয়ে গল্প রচনা করেছেন দেখা যাক। কানাইবাবু যা লিখেছেন সংক্ষেপে তা এই—

একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অনেকেই এসেছেন। শরৎচন্দ্র কথায় কথায় তাদের বললেন—প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, আমার মত নিও। এই কথা শুনে শ্রোতারা উৎসুক হয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কি?

শরৎচন্দ্র তখন বলে যেতে লাগলেন—নিরঞ্জন নামে একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের এম-এ পাস যুবক সাহিত্য শেখার আশায় আমার কাছে প্রায়ই আসত। একদিন তাকে বললাম—রবিবাবুর কাছে একবার গেলে না কেন? যদি যাও তো বল, একটা চিঠি লিখে দিই। সেটা নিয়ে রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করলে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—বলে, ছেলেটি আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তারপর রবিবাবুকে একটা চিঠি লিখলাম—

গুরুদেব, বহুদিন আপনার খোঁজ খবর নিতে পারিনি। আশা করি শারীরিক ও মানসিক কুশলেই আছেন। আমি শ্রীমান নিরঞ্জনকে

আপনার কাছে পাঠালাম—ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, বাড়ীতেও খাওয়া পরার অভাব নেই, তার উপর কাব্যপ্রিয়। ওর খুব ইচ্ছা—আপনার সেবা করে। যদি বেচারীকে পায়ে একটু ঠাঁই দেন—ও কৃতার্থ বোধ করে; আমিও সামান্য একটু গুরুদক্ষিণা দিতে পারি! প্রণাম গ্রহণ করুন। —আপনার শরৎ।

ছেলেটি চিঠি নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেল। চিঠি পেয়ে গুরুদেবের আমার খুশীর অন্ত নেই। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, তার উপর পেট-ভাতায় শ্রীমান নিরঞ্জন কাজ করতে রাজী হয়েছে। নিরঞ্জন কাজ পেল। কিন্তু মাস দুইয়ের মধ্যে কবির প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে একখানি পত্রাঘাত করলেন।

কল্যাণীয়েষু—শরৎ, তুমি যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলে, সেটি যে সর্বগুণে সমন্বিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আমার নেই। লেখাপড়ায় ভাল, সদালাপি এও সত্য—এর উপর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায়ও ভাল, কিন্তু আমার প্রাণপাখী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বললে, কথাটাকে একটু লঘু করে দেওয়া হবে,—সে আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। বোলপুর আমার পথে একটি সোনার কলম নিয়ে এসেছে, লিখতে আমায় দেয় না—কোন কলমই তার পছন্দ নয়, কেবল সেটি এগিয়ে দিয়ে বলে—না গুরুদেব—এটা—এটা—অর্থাৎ তার ধারণা সোনার কলমে না লিখলে, আমার বিশ্বকবিত্ব একেবারে লোপাট হয়ে যাবে! শুধু কি তাই, কোন কিছু করার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই। এমন কি পায়খানা যাওয়াও বন্ধ। সে গাড়ুটাও নিজে বয়ে নিয়ে যাবে—লেখা ত মাথায় উঠেছে, আমার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া প্রায় একই স্তরে নেমে এসেছে। এখন দয়া করে, তুমি তোমার দেওয়া এই রত্নটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আমায় মুক্তি দাও। আশীর্বাদ জেনো। তোমার গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ)।

চিঠিখানা পেয়ে ভারী খুশী হলাম। অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছি এতদিনে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে উত্তর দিলাম—

গুরুদেব, আপনার চিঠিখানা পেয়ে সত্যই মর্মাহত হলাম। বিশেষ করে একজন সাহিত্যিক যদি বেঁচে থেকে কলম ধরতে না পারে—তার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া একই কথায় পর্যবসিত হয়ে থাকে।

কিন্তু গুরুদেব, এই হতভাগ্য শিষ্যের কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমি স্বেচ্ছায় এবং জেনে শুনেই এই রত্নটিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছি!

আপনি যখন বাংলা দেশ তথা সারা ভারতের উদীয়মান সূর্য, তখন ভবঘুরে, আশ্রয়হীন এই ভাগ্যহত শিষ্য আপনার ওই জোড়াসাঁকোর আশে পাশে সাহিত্য-সাধনার আশায় বহুবার ধন্না দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যে তার গুরুর সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি। অতি উৎসাহী ভক্তদের কাছ থেকে অর্ধচন্দ্র খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। অপরাধ নেবেন না গুরুদেব, সেদিন বয়সটা ছিল কাঁচা—রক্তও ছিল তাজা, সহসা প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ আমায় করতেই হবে।

সেদিন জানতাম না কি করে তা সম্ভব। ক্রোধের মাথায় শুধু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মাত্র। ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতিজ্ঞা বোধ করি মাঠেই মারা যায়। কারণ নিয়তির আদালতে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ালো গুরু আর শিষ্য! এটা শুধু মুখের কথা নয়—রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা লাল ও শ্বেত কণিকার মত! অপরিহার্য ও অনবিচ্ছেদ্য।

হয়তো নীলয়গামীই হ'তে হতো—হঠাৎ একটা সুযোগ মিলে গেল। নিরঞ্জন সামনে এসে গেল। যে ক'দিন সে আমার কাছে ছিল, আমি হাড়েমাসে অনুভব করেছিলাম, সে কী প্রকারের জীব। মনে হ'ল, এ বুঝি ভগবানের প্রেরিত দূত। ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতিজ্ঞা রক্ষার একটি দুর্ভেদ্য কবচ। পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। গুরুদেব—আপনি সাগর, আমি নদী, ও এখন সাগরের সন্ধান পেয়েছে, ফিরিয়ে দিলেও ও আসবে না! প্রণাম নেবেন। আপনার শরৎ।"

এইখানেই কানাইবাবুর গল্পের শেষ। কানাইবাবু তাঁর অন্যান্য গল্পের শেষে যেমন এক একটা বইয়ের নাম করেছেন, এখানেও তেমনি এই গল্পটির শেষে "শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্পের" নাম করেছেন। কানাইবাবু যে নিরঞ্জনের মারফৎ মূল গল্পটি পেয়েছিলেন, সেই নিরঞ্জনকে পর্যন্ত জড়িয়ে কি ভাবে যে বিকৃত করে গল্প বানিয়েছেন তা দেখালাম। এই গল্পটি যে কানাইবাবুর বানানো তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, কানাইবাবুর উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলি থেকে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিঠির নকল বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সেখানে কানাইবাবুর উল্লিখিত এই চিঠিগুলি নাই। তাছাড়া চিঠিগুলি যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা নয়, তা বিষয়বস্তু, লিখনভঙ্গী ও ভাষা দেখলেই বলা যায়। কানাইবাবু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাম দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে যে চিঠিগুলি লিখেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে পর্যন্ত খেলো করবার চেষ্টা করেছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে, সামান্য সূত্র পেলেই তা থেকে গল্প রচনা করতে কানাইবাবু ওস্তাদ। কানাইবাবু সুরেনবাবুর গ্রন্থে সুরবালা ও সাবিত্রীর উল্লেখ মাত্র পেয়ে (যদিও সুরেনবাবু সে সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না) তা থেকে বানিয়ে বানিয়ে সুরবালা ও সাবিত্রীর কাহিনী দুটি দীর্ঘ ১৭ পাতা ধরে রচনা করেছেন। আর কানাইবাবু শুধু বানিয়ে গল্পই রচনা করেন নি, শরৎচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্নও করেছেন।

শেষের কবিতার লাবণ্য চরিত্র

প্রশান্তকুমার রায়

বাংলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপম এই উপন্যাস গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচক মহলে যতখানি উত্তেজনা, আলোড়ন ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে সম্ভবতঃ বর্তমান শতাব্দীতে অন্য কোন বাংলা উপন্যাসে ততখানি দেখা দেয়নি। এই উপন্যাস আলোচনায় বিরুদ্ধ ধর্মী দুইপক্ষ কেবল ভিন্ন নয়, একেবারে উল্টো মতামত প্রকাশ করে থাকেন। কারুর মতে এই বইয়ে যুগধর্মের প্রভাববশত বুদ্ধিবাদের ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণিত হয়েছে; কারুর মতে বুদ্ধিমান গৌণ হয়ে প্রচণ্ড আবেগ বইখানিকে বিশেষত্বে মণ্ডিত করেছে। কেউ হয়ত বলবেন, বইখানি আইডিয়ার দ্বন্দ্বে গড়ে-ওঠা একখানি ব্যঞ্জনাময় অভিনয় রূপক উপন্যাস। আবার কোন সমালোচক হয়তো বলবেন, সামাজিক আভিজাত্যের প্রতি একটা দারুণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আলেখ্য বইখানিকে মূল্যবান করেছে। এমন কথাও শোনা যায়, পেয়ে না-পাওয়ার চিরন্তন ট্র্যাজেডী 'শেষের কবিতার' শেষ কথা। কিন্তু এইভাবে এই উপন্যাস বিচার, সবিনয়ে বলা যায়, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত অসম্পূর্ণ; কেননা উল্লিখিত সমস্ত গুণগুলির মিলিত সত্তায় এই উপন্যাসখানি কেবলমাত্র উপন্যাসের স্তরে না থেকে কবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। ভাব, ভাষা, ছন্দের অভিনবত্ব যেমন আছে, ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতের চমৎকৃতি যেমন আছে, ঘটনা, বর্ণনা ও পরিণাম যেমন আছে—তেমনি এসবকে মিলিয়ে মানুষের কামনা বাসনার বর্ণসপ্তক শেষের কবিতাকে পূর্ণশ্রী দান করেছে। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি মানুষের বিচিত্র বাসনার রঙে রাঙা হয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণামে একটা মহা আত্ম-জিজ্ঞাসায় গিয়ে পৌঁচেছে। পাঠক সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বৃথাই শেষের কবিতার অন্ত খুঁজে বেড়ান। কারণ কবিতার কোন শেষ ও স্থির রেখা নেই—রেশের মধ্যেই তার প্রাণ। আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক অমিত রায় একটি অফুরন্ত জীবন সঙ্গীত, যেন স্থির হয়ে কেবল বেজে বেজেই চলেছে, আর বাজিয়ে তুলেছে মানুষের প্রাণের বীণাকে। সে বাজনায় তালভঙ্গ আছে, হয়তো ছেদও আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই। শেষের কবিতার উজ্জ্বলতম নায়িকা লাবণ্য তেমনি একটি বাজিয়ে তোলা বীণা। অমিত যদি জীবন সঙ্গীত হয় তবে লাবণ্য জীবন-বীণা। ঝঙ্কার-মুখর এ জীবন বীণার অনুসরণ পাঠকের হৃদয় তন্ত্রীতে বেজে ওঠে আর মুগ্ধ পাঠক অবাক বিস্ময়ে ভাবে, এ স্পন্দনের শেষ কোথায়—এযে শেষ হ'য়ে হয়নিকো শেষ!

যে অমিট্রে একদা মেয়েদের সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করত কিন্তু কোন বিশেষ মেয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাতনা এবং যে অমিত রায় সময় কাটানোর জন্যে সুনীতি চাটুজ্জের ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করে আনন্দ উপভোগ করত, একদিন যখন সে শিলংয়ের নির্জ্জন বন-ভূমির স্নিগ্ধতায় লাবণ্যের দর্শনলাভ করল সেদিন তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্তে। এই পরিবর্তন যে কোন এক্সিডেন্টের মতই আকস্মিক—বাইরের মোটরের ধাক্কা তার অন্তস্তল পর্য্যন্ত গিয়ে যে আঘাতের সৃষ্টি করল সে আঘাতে গোটা মানুষটারই মন মেজাজ গেল পাল্টে। তখন থেকে সে আর অমিট্রে নয়, একেবারে খাঁটি অমিত রায় হয়ে উঠল এবং চাটুজ্জের দুরূহ ভাষাতত্ত্বের অনুরাগী পাঠক সহসা ডনের কাব্যগ্রন্থ আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে উঠল "For Gods sake, hold your tongue and let me love." শিলংয়ের নির্জন বন-ভূমিতে এসে বাঁধ-ভাঙ্গা ভালোবাসার উৎস আবিষ্কার করল অমিত আপনার মনো ভূমিতে। লাবণ্যর অকস্মাৎ আবির্ভাবে অমিতের দুরন্ত প্রেম শতধারায় উচ্ছলিত হয়ে উঠল কিন্তু উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতাকে সংবরণ করেছে লাবণ্য, তা না হলে অমিত রায় নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো না, প্রেমবৈচিত্র্যে ধন্য হতো না। লাবণ্য অমিত চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু যাকে কেন্দ্র করে অমিতর অ-মিত বাসনা কল্পনার স্বর্ণ স্বপ্ন গড়ে সেই দিকে উধাও হবার স্বপ্ন সাধে মেতেছে। লাবণ্য মুখে যতই বলুক ভালবাসার সৃজনী শক্তিতে অমিত তাকে মনের মতন করে আরোপিত সৌন্দর্য্যে কেবলি বড় করে তুলেছে বস্তুতঃ সে তা নয়, সে সাধারণ—কিন্তু আমরা বুঝি লাবণ্য প্রকৃতির সেই সাধারণত্বই লাবণ্যকে অসাধারণ করে তুলেছে। যা সাধারণ যা স্বাভাবিক যা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহজভাবে মিশে আছে, মানুষ তার উপর পলেস্তারা লাগিয়ে কেবলি স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করে তুলতে চায়। তার ফলে কেতকী মিত্রকে মুখোস পরে সাজতে হয় কেটি মিটার; মানুষের মনের কাছে কেটি মিটারদের আবেদন ক্ষণিকের, কেননা তারা কৃত্রিম; একদিন সে কৃত্রিমতা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে। কৃত্রিমতাকে বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তারই নাম লাবণ্য, অথবা কৃত্রিমতার আবরণ উন্মোচন করলে তবে লাবণ্যর পরিচয়! তাই ব্যক্তি লাবণ্যকে নগর ও সহরের কৃত্রিম সভ্যতার বাইরে এই নির্জন শিলংয়ের পাইন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় অমিত ও পাঠকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক। গ্রন্থে লাবণ্যর প্রথম আবির্ভাব লগ্নটি তাই বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার মত এবং লাবণ্যর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের কবিমানস কল্পনার স্বপ্ন পাপড়ি মেলতে সুরু করল।

এতক্ষণে লাবণ্য চরিত্র আলোচনার সময় এল। অমিত চরিত্রকে যদি তুলনা করা যায় একটি গদ্য কবিতার সঙ্গে, তবে লাবণ্য চরিত্র নিবিড় ঘন গীতি কবিতা যা আপনার মধ্যে আপনি সংযত ও সংহত হয়ে আছে—নিটোল, নিপুণ ও নিখুঁত। বেগের আবেগে গদ্য কবিতার ছুটে চলার মত বলিষ্ঠ অমিত একদিন লাবণ্যকে বন্যার মত দিগন্তপ্লাবী করে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তি লাবণ্য ধীর, স্থির ও ধ্রুব; অমিতর স্পর্শে

চাঞ্চল্য তার মনেও তরঙ্গ তুলেছে কিন্তু মনের পাড় ভেঙ্গে বাইরে তা উচ্ছ্বাস হয়ে দেখা দেয়নি কখনো। লাবণ্য যেমন আপনাকে সংযত করে রেখেছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তেমনি অমিতর উচ্ছ্বাসকেও সে বলয়িত করে রেখেছে তার প্রতিদিনের ব্যবহারের ও সংযমের মধ্য দিয়ে। সহানুভূতি দিয়ে গড়া এক মমতা মাখানো চরিত্র লাবণ্যর। একদিকে সে যেমন অমিতকে কল্পনার রাম-ধনু-রঙ আঁকতে সহায়তা করেছে অন্যদিকে প্রতিশ্রুত অমিতকে তার পূর্ব প্রণয়িনী কেটি মিটারের কাছে ফিরিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। অবশ্য অমিত যার কাছে ফিরে গেল সে আর কেটি মিটার নয়—ছিন্ন মুখোশ চোখের জলের ধোয়া এনামেল-মুক্ত স্বাভাবিক কেতকী মিত্র।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে যতটা সম্ভব কম করে চরিত্র বর্ণনা করেছেন তার কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল চরিত্র গঠন নয়, চরিত্র সৃজন এবং লাবণ্যর মধ্যে চরিত্র গড়ে ওঠার চেয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার অবকাশ সবচেয়ে বেশী স্ফূর্তি লাভ করেছে। তাই লাবণ্য সেই জাতীয় একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে, যাকে গড়া হয়নি বাইরের উপাদানে অথচ ব্যবহারে সে বিশিষ্ট। পরিবেশ ও ঘটনা সংঘাতের চিত্রগুলির প্রতি লেখক কেবলমাত্র ইংগীত করে লাবণ্যকে সামনে পাঠিয়ে তিনি আত্মগোপন করেছেন। যে লাবণ্যময়ী মূর্তিতে পাঠক লাবণ্যকে উপন্যাসের গোড়াতে দেখেছিল, শেষ পর্যন্ত সেই অম্লান মূর্তি স্পষ্ট হ'য়ে পাঠকের হৃদয়ে জাগরিত ছিল। এইখানেই লাবণ্য-চরিত্রের সার্থকতা।

লাবণ্য-চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন সব পাঠককেই বিব্রত করে তোলে—যে প্রশ্নের উত্তর অমিতের মুখ থেকে আমরা গ্রন্থের শেষদিকে শুনতে পাই বটে কিন্তু তৃপ্ত হতে পারিনে—এমন কি অমিতের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির মারপ্যাঁচ সত্ত্বেও না! সেই অতৃপ্ত বেদনায় পাঠক অমিতকে ছেড়ে লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করতে চায়, অমিতের সঙ্গে তার মিলনের বাধাটা ছিল কোথায়, কেন তোমাদের মন দেওয়া-নেওয়ার পরেও বিচ্ছেদের হোমানলে আত্মাহুতি দিতে হয়। এরও ব্যাখ্যা না হলে মন মানেনা। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে, অমিতের উপর কেটির দাবী ঘোষণায় বেচারী লাবণ্য আসন্ন বিয়েটা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল! কিন্তু লাবণ্য চরিত্র আরেকটু বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাবো ওর যৌবনের সূচনাতেই একটা আত্মাভিমান ও ব্যক্তিত্বের বীজ ওর মর্ম্মমূলে নিহিত ছিল এবং যখনই সেই ব্যক্তিত্বে বিন্দুমাত্র আঘাত লেগেছে তখনি তার সত্যদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সত্যদৃষ্টি ও সত্যপ্রীতি লাবণ্য-চরিত্রের আর একটি মঙ্গলময় দিক এবং বোধহয় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম দিক। লাবণ্যর বাবা অবনীশ দত্ত যখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েও কোন এক বিধবা রমণীর ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ল এবং একদিন যখন সে খবর উঠল গিয়ে লাবণ্যর কাণে, লাবণ্য বিনা দ্বিধায় এমন কি উৎসাহের সঙ্গে সৎমায়ের হাতে পিতাকে মিলিয়ে দিয়ে পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দিয়ে স্বোপার্জিত অর্থে জীবন চালনার শপথ নিয়ে অন্যত্র আপনার যোগাস্থান বেছে নিল। জীবন সত্যকে সে অস্বীকার করেনি অথচ তাকে অস্বীকার করতে হয়েছিল সহপাঠী শোভনলালের নীরব নিবিড় প্রেম। কিন্তু সে ততটা অভিমানের জন্যে নয়, যতটা বিদ্যানুশীলনজাত অহং ভাবের জন্যে। আত্মাভিমানের জন্য যদি হত তবে শোভনলালকে কোন কালেই তার মনে পড়ত না। অমিতর সঙ্গে মিলনের শেষ সন্ধ্যায় সেই বিদায়বাণীর মধ্যেও শোভনলালের স্মৃতি লাবণ্যর বুকে জেগে উঠেছিল এবং সে স্মৃতি-সত্যকে অমিতর কাছে সে গোপন করেনি কখনো। সবচেয়ে বড় কথা অমিতকে সে ছলনা করে কখনো ভোলাতে চেষ্টা করেনি। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা অটুট রাখতে যতখানি ব্যক্তিত্বের দরকার লাবণ্যে তা পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর ছিল বলেই যোগমায়ার ঘটকালীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েও লাবণ্যকে ভেবে দেখতে হয়েছে, অমিতর রুচি প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে যে প্রকৃতির কাছে নিজেকে ছোট বলে বারংবার মনে হয়েছে লাবণ্যর। যে স্বপ্ন নিয়ে অমিতর কল্পরাজ্য সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে সে নিত্য নতুন হয়ে ওঠে অমিতর জীবনে সে স্বপ্ন গড়াই সত্য; তাকে বিবাহের বাধাধারা প্রাত্যহিক স্পর্শের মধ্য দিয়ে ম্লান করে দিতে পারল না লাবণ্য। তার ব্যক্তিত্ব তার প্রিয় কবি রবি ঠাকুরকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু তাকে অন্যের উপর জুলুম করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়না; আপন রুচির উপর অন্যের জুলুমও সে মানতে রাজী নয়। তবে অমিতর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অতলান্ত প্রেমের সম্মুখীন হয়ে অনেকবার তাকে হার মানতে হয়েছে ইচ্ছে করেই। এই নমনীয়তা লাবণ্যকে কমনীয়তায় ভরে দিয়েছে। এই হার মানার মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে তা দিগন্ত বিস্তৃত অসীম; এই হার মানার পরে লাবণ্যর পক্ষে এ কথা বলা যেন সহজ হয়ে আসে, 'আমি তোমার, অনন্ত কালের জন্য আমি তোমার'। একদিন যখন কেটি মিত্তির তার আত্মাভিমানে আঘাত করল, সেইদিন তার বাইরের দিকে দৃষ্টি চালনা করবার সুযোগ এল এবং এই সুযোগেই অমিতকে সে নতুন করে—আরেকবার আবিষ্কার করল যেন; যে আত্মাভিমান ও সত্যদৃষ্টি প্রত্যহের মেলামেশায় একটু কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল আবার তা জাগরিত হল, আবার ব্যক্তিত্ব এসে লাবণ্যর হাত ধরে সত্যের পথে পরিচালিত করল। কেটির চোখের জলে দুটো কাজ হয়েছে—একদিকে সে হৃদয়কে মেলে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল, অন্যদিকে ঐ চোখের জলে লাবণ্যর সত্যদৃষ্টির উপরে যে কুয়াশা নেমে আসছিল তা ধুয়ে মুছে অপসারিত হল; দৃষ্টি ফিরে পেল লাবণ্য। নতুন করে বুঝল সে প্রেমের মর্য্যাদা; তার নারীহৃদয় আরেকটি বঞ্চিত হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করল।

অমিতের সঙ্গে যে অদৃশ্য হৃদয় বন্ধন গড়ে তুলছিল সেই বন্ধনকে স্থায়ী করবার জন্যেই যেন সে অমিতের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তার জীবনে বেদনার গীতি-মালা রেখে গেল। সেই গীতি-মাল্যের গন্ধে পাঠকের মুগ্ধমতি মন বলে ওঠে,

> "Our Sweetest Songs are those
> That tell a Saddest Thought"

শেষ অঙ্কের 'Saddest Thought' কখনোই 'Sweetest' হতো না যদি প্রেমের লিপিতে লাবণ্য তার স্বীকৃতি না দিয়ে যেত :—

> "তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান
> গ্রহণ করেছ যতো ঋণী তত করেছ আমায়
> হে বন্ধু, বিদায়॥"

পানের বরজে বাঘ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

সেবার ভীষণ গরম—১১০° ডিগ্রী টেম্পারেচার। বাইরে আগুনের হল্‌কা ছুটছে—মাঠগুলো ফুটিফাটা যেন বুক পেতে এক ফোঁটা জলের জন্যে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

মানুষের অবস্থাও তাই—শুধ্ মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণীজগৎ যেন এই অসহ্য গরম থেকে রেহাই পাওয়ার ফিকির খুঁজে বেড়ায়। দু' একজনের Heat Stroke-এ মৃত্যুর খবরও পেয়েছি। আমিও একতলা ও দোতলার মাঝের ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করে ভিজে খস্ খস্ ঝুলিয়ে দস্তুর মতো একটা Cold Storage বানিয়েছি—তাতেও কী বাইরের গরমকে ফাঁকি দেওয়া যায়। দু' দুটো বৈদ্যুতিক পাখাও বন্ বন্ করে ঘুরে চলে। ঘরের মধ্যে শুধ্ আমি—সঙ্গী হিসেবে বেশ বড় বড় গুটি পাঁচেক "গ্রেট্ ডেন" কুকুর। কিছুদিন আগে মোটা Stibstin সাহেবের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে এক জোড়া গ্রেট্ ডেন কিনেছিলাম—ইয়াকি নয়!—এদেরও দস্তুর মত বংশ মর্য্যাদা আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। কালে বংশ বৃদ্ধি হয়ে এখন পাঁচটিতে দাঁড়িয়েছে। ঠাণ্ডাঘর পেয়ে তারাও আমার খাটের নীচে, আশে পাশে, মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে শুয়ে।

অন্ধকার ঘর। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর শীতলপাটি বিছানো শয্যায় শুয়ে বেড্ সুইচ্ জ্বেলে রাগকল্পদ্রুমের পাতা ওল্টাচ্ছি—বেলা একটা—এমন সময় সিঁড়িতে বাঘের মত থপ্ থপ্ শব্দ শুনেই টের পেলাম—আমাদের বহু পুরণো আমলের ভুঁড়িয়াল চৌবে। তারপরই দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ।

—কে? চৌবে মহারাজ?

—হঁ মহারাজ—হামি। একঠো কিষাণ আইয়েসে।

—কেন—কিসের জন্যে—?

—একঠো বাঘ—রাধাকিহ্‌টোপুরের পানকে বরজমে ঢুকিয়েসে—তেকর খবর লিয়ে—

এদিকে দরজায় টোকা পড়্‌তেই বাঘের পিস্‌তুতো ভাইয়েরা সব এক সঙ্গে বিরাট হাউমাউ করে উঠ্‌লো। তাদের সবাইকে ঠাণ্ডা করে, দরজা খুলে দিলাম—

—কে এসেছে—? পুকারো—

চৌবেজীরও বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো—

—হেই—ইধার আইসো—

একটি দীর্ঘমূর্ত্তি আমার সামনে এসে আদাব জানালে।

—কী হে জয়লাল? এই ভরদুপুরে—? বাইরে এত বরফ পড়্‌ছে—এ সময় তোমার এত পুলক জাগ্‌লো কেন—?

—পানের বরজে ব্যাঘ্র!

চম্‌কে ওঠার কিছু নেই—আমার আগেই জানা ছিল—সে বাঘকে ব্যাঘ্র, মানুষকে মনুষ্য, কাছিমকে কচ্ছপ, এই সব সাধুভাষা মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে থাকে—বিশেষতঃ আমার সামনে।

খবরটা লোভনীয়, সন্দেহ নেই—তবুও একটু বকুনি দিলাম।

আমি না হয় সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম বাঘের খাঁটী খবর যে দেবে, সেই নগদ কুড়ি টাকা পাবে। তাই বলে কি তোমার জানেরও একটা দাম নেই—?

—না হুজুর, হামাদের গরু ভেড়া ছাগল, সব সাব্‌ড়ে দিলে—তাই ছুটে এনু।

দেখ্‌লাম, তার পরণে লুঙ্গি, মাথলটা বগলদাবা—ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা মাথার মধ্যস্থলে ছোটখাটো একটা পুকুর কাটা তদুপরি অঙ্কমলিন গিয়ের পটি বসানো—সপ্তম এডোয়ার্ড প্যাটার্ণ দাড়ি বেয়ে ঘাম ঝরে পড়্‌ছে। গায়ে জড়ানো ভিজে গামছাখানা দিয়ে ঘর্ম্মসিক্ত মুখখানা দু' তিনবার মুছে নিয়ে আবার বল্লে—

—হামাদের কচ্ছপের পরাণ—ধূপকে ডর করলে চল্‌বে ক্যানে?

—বেশ, তবে চল।

চৌবেজীকে বড় ভ্যানটা আর মোটর আন্‌তে বলে দিলাম।

পাত্‌লা খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট যদিই বা পরা গেল—গায়ে আর কোনও জামা দেওয়া যায় না—এমনি অসহ্য গরম। কী করা যায়—আদ্দির ফতুয়াটাই পরে নিলাম। পায়ে কাব্‌লী জুতো। পোষাকটা আদৌ মানান সই হ'ল না—তা' আর কী হবে?—এমনি দিনে বাঘ মারতে যাওয়াটাই কী মানান সই?

সঙ্গে কা'কে নেওয়া যায়? গুর্খা সেপাইদের চিরদিনই এড়িয়ে চলি। একবার ভাবলাম—আমার বডিগার্ড এট্‌কিন্স্‌কে টানা যাক। দিনমান বসে থেকে সেও হয়ত একদিন বেতো-রুগী হ'য়ে পড়্‌বে। আবার ভাবলাম—নাঃ মিছিমিছি এই রোদে বেচারাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?—তা'হলে হাতে থাকে এই চৌবে।

সে ফিরে আস্‌তেই ব'ল্লাম—চৌবেজী, তুমি এই খবরটা দিয়ে সাংঘাতিক অপরাধ করেছ, তোমায় ছাড়্‌বো না, সঙ্গে চল।

চৌবেজীর বক-শুভ্র আয়ত ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।

সে তার বিশাল ভুঁড়ির উপর যুগল করকদলী স্থাপিত করে কাতর কণ্ঠে আপত্তি জানায়—

—পেট্‌মে বহুত্ দরদ্ হুইয়েসে।

—ও কিচ্ছু না—আট দশ সের ঘাম বেরোলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

—তেবে, হামার সোঁটা লে লিই—

—হ্যাঁ, আর একটা লোটাও সঙ্গে নিও—কী জানি, যদি দরকার হয়! জমাদারকে বলে দাও, সেও যেন কুকুরের সঙ্গে যায়।

শিকারে সাধারণতঃ কুকুরদের আমি সঙ্গে নিতাম না—তবে পাখী-শিকারে কখনো কখনো ওরা কিছুতেই আমার পেছন ছাড়তো না। ঝিলে কিম্বা বিলে শিকার হলেই ওরা সাঁতার কেটে পাখীগুলো কুড়িয়ে আনতো। এসব বিষয়ে ওদের ট্রেনিং খুব ভালই ছিল। কিন্তু বাঘ শিকারে আমি নিজস্ব একটা পদ্ধতি মেনে চলতাম। কুকুর সঙ্গে থাকলেই তারা এমন লণ্ডভণ্ড সুরু করে দেয় যে তখন তাদেরই সামলানো একটা বিষম দায়! একবার ওই রকমের একটা পরিস্থিতি হওয়ার পরেই শিকারে ওদের সংশ্রব আমি ত্যাগ করেছিলাম।

এবার ভাবলাম—এদের দিয়েই "বিটারের" কাজটা চালিয়ে নেওয়া যাক।

মোটর ও ভ্যান প্রস্তুত—সারথিদ্বয়ের মুখে বিরক্তির ভাব দেখেই তাদের সান্ত্বনা দিলাম—

—এই ভীষণ গরমে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, জানি—আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখো—তবে শিকার পাই আর না পাই—তোমাদের খুসী করে দেব। আর জমাদার দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কী?—তুমিও বাদ যাবে না।

জমাদার সব কুকুরগুলোকে সামনে নিয়ে ভ্যানে উঠে পড়লো—লক্‌লকে জিভ বের করে ওরা সবাই ধুঁকছে। আমিও মোটরে উঠে বসলাম—পাশেই জলের কুঁজো। চৌবেজীও লোটা সোঁটা নিয়ে সামনের সীটে পদীয়ান হয়ে বসল—জয়নাল আমার পাশে।

সূর্যদেব তাঁর তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর উপর—গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে যায়—মানুষের সাধ্য কী সেই দুরন্ত উত্তাপ সহ্য করে! গরমকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আমি আমার দেড়তলার ঠাণ্ডা ঘরে নিজেকে যেমন লুকিয়ে রেখেছিলাম—তেমনি সেখান থেকে ছিটকে বাইরে এসে মনে হল—প্রচণ্ড মার্তণ্ড এইবার বুঝি সমস্ত আগুন আমার দেহে ছড়িয়ে চক্রবৃদ্ধিহারে তার সুদ সমেত হেসে আদায় করে নিচ্ছেন—এই বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ!

আজ পৃথিবীও জ্বলন্ত বহ্নিধারায় স্নান করে অগ্নিশুদ্ধ হতে চায়। আর আমরাও ঠিক তার উল্টো। গায়ে মুখে জলের ছিটে ফোঁটা দিয়ে ঠাণ্ডা হতে চাই—মাঝে মাঝে বিসর্গযুক্ত উঃ-আঃ-বাবাঃ—শব্দগুলি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—চৌবেজীর মুখেও আহে দাদারেঃ! কিন্তু জয়নালের সহ্য শক্তি অসীম—সে নীরব; কেবল তার গামছাটি অনবরত ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেয়।

আমিও তার দেখাদেখি তোয়ালে ভিজিয়ে ঘাড়ে কানে মাথায় চেপে ধরি। তখুনি সেটা শুকিয়ে যায়—আবার ভিজিয়ে নিই। চৌবেজীও বাদ দেন না—তাঁর সদীর্ঘ টিকি সমন্বিত মুণ্ডিত মস্তকে ভিজে "অঙ্গৌছি" অর্থাৎ গামছা চেপে ধরে চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থাকেন—এইভাবেই আমরা পথ চলি।

রাধাকৃষ্ণপুরে যেতে হ'লে কিছুটা বালির পথ পেরিয়ে যেতে হয়। কথায় আছে, সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী। সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি উল্টে পাল্টে ফিরে এসে সর্ব্বাঙ্গে গরম পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছে—সে এক প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ—কালো চশমার ফাঁক দিয়ে তার প্রভাব চোখের উপর বিস্তার করে চলে—ফলে চক্ষু রক্তবর্ণ—যেন চাইতে পারি না।

এইভাবে জনমানবহীন সাত মাইল পথ অতিক্রম করে শেষটায় রাধাকৃষ্ণপুরে আমরা প্রাণ নিয়ে পৌঁছুলাম। জয়নাল ড্রাইভারকে বল্লে—

—ঐ যে হোথা ঐ স্থানে পানের বরজ—এখানেই থামান জ্যান।

রাস্তার ধারে, খুব কাছেই—হাঁটা পথে প্রায় একশ' পা'ও হবে কিনা সন্দেহ!

মোটর থামতেই আমাদের উপর আবার এক পশলা ধূলোর বৃষ্টি হয়ে গেল। কালো চশমা নামিয়ে, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ধূলি ধূসরিত দেহে নেমে পড়লাম। পেছনের ভ্যান্ থেকে পাঁচ পাঁচটা 'গ্রেট ডেন' লাফিয়ে পড়তেই দেখা গেল, বাছাধনদের কালো ডোরা কাটা চকচকে সোনার অঙ্গে এক কোট ধূলো-গা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নেবার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিলে। এতক্ষণ ভ্যানের মধ্যে গলদ্‌-ঘর্ম অবস্থায় তাদের বিক্রম কিছুটা স্তিমিত হলেও, ছাড়া পেয়েই তারা একজোটে আমাকে ঘিরে লম্ফ ঝম্প লাগিয়ে দিলে। সকলেরই বিরাট মুখব্যাদন—দুর্দ্দান্ত গরমে তাদের লেলিহান জিহ্বা কেঁপে উঠ্‌ছে।

জয়নাল নিজেকে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে, অদূরে, বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট তার ছেলেকে ডাক দিলে—

—ওরে বেট্টা আসগার আলী—ব্যাঘ্র আছে—না—পালাইছে—?

এই গরমে তারও প্রাণ যায় যায়—শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসে—ঠিক আছে বাপজান—এই ধূপে কুথায় যাবে?

জয়নালকে একটু মিঠেকড়া ধমক দিয়ে বল্লাম—বেশ লোক যা হোক—এই রৌদ্রে ছেলেটাকে গাছে বসিয়ে রেখেছে—তোমার আক্কেলকে বলিহারি।

—চাষাভূসার ছেইল্যা—উয়ার কী আছে?—চলেন হুজুর এখন আসল কম্মটা শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলান।

চৌবে মহারাজের গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখে মনে হ'ল তাকে অব্যাহতি দেওয়াই উচিত। আমি জয়নালকে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক বগলে স-কুকুর এগিয়ে গেলাম।—পেছনে জমাদার।

পানের বরজের সামনে গিয়ে দেখা গেল সেটা বেশ লম্বা চওড়া—ঘন পাটকাঠি দিয়ে বেশ শক্ত বাঁধনে চার দিক ঘেরা—উপরের আচ্ছাদনটাও রীতিমত মজবুত করে ছাওয়া। অনেকটা গ্রীণ হাউসের মত—সূর্য্য কিরণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে যেন তাল ঠুকে বলতে চায়—'এইবার এসোনা দেখি কি রকম তোমার তেজটা!' সামনে মাত্র একটা দরজার ফাঁক—কোনো রকমে মাথা নীচু করে তার মধ্যে যাওয়া যায়। ভেতরে একটু ঢুকেই আর এগুনো যায় না—এমনি অন্ধকার। কিন্তু কী ঠাণ্ডা—আঃ গা' যেন জুড়িয়ে যায়। সাধে কী আর বাঘ এসে এই 'এয়ার কণ্ডিশন্' করা কুঞ্জে ঢোকে! শুধু মানুষ নয়, পশু পক্ষী

কীট পতঙ্গ সবাই যেন আজ আপন আপন আরামটুকু খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাগল !

ভেতরে—ঘন জঙ্গল—এগিয়ে যাই কী করে? বাঘটা কোথায় আছে, কে জানে? কিছু দেখবারও উপায় নেই—দু এক পা গিয়েই আবার ফিরে আসতে হোল—অগত্যা পান বরজের দরজার কিছুটা দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমার লাল ফৌজের দল লেলিয়ে দিতেই এক যোটে সবাই অমিত বিক্রমে তেড়ে গেল বরজের মধ্যে—তাদের ঘ্রাণশক্তি নাকি খুবই প্রবল। কিছুক্ষণ পরেই বাঘের নাভিকুণ্ড হতে বেরিয়ে আসা একটা বিকট হুঙ্কার শোনা গেল; তার সঙ্গে আমার পঞ্চ পল্টনেরও ক্রমাগত একটার পর একটা সমান ওজনের পাল্টা জবাব। বাঘটা বেগতিক বুঝে ছুটে বেরিয়ে আসতেই আমিও বন্দুক তুলেই—এক গুলী !

বাঘটা বক্রভঙ্গীতে লাফিয়ে উঠেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার পর আবার উঠবার চেষ্টা করতেই বাঘের ভায়রা ভাই পাঁচ পাঁচটা শিকারী কুকুর তার উপর লাফিয়ে পড়ে যেন ছিঁড়ে খেতে যায়। আর গুলী করা চলে না। তা হলে আমারই কুকুর মারা যায়। প্রয়োজনও ছিল না। গুলী খাওয়ার পর যেটুকু প্রাণ তার ধড়ে ছিল—পাঁচ পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

পেছনে তাকিয়ে দেখি, জমাদার আর জয়নাল সেই বৃক্ষশাখায় আসগর আলীর দুধারে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছেন—এক বৃন্তে দু'টি নয়—যেন তিনটি ফুল। ডাক দিতেই ত্রিমূর্ত্তি নেমে আসে। ওদিকে বাঘের রক্তে পূর্ব্ব পুরুষের সন্ধান পেয়ে কুকুরগুলো মাতাল হয়ে উঠ্‌ল। আমরা সবাই গিয়ে বড় কষ্টে তাদের শান্ত করলাম। তারা সরে যেতেই দেখি—বাঘের নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। বন্দুক তোলার সঙ্গেই সূর্য্য কিরণে নলটা ঝল্‌সে উঠ্‌তে আমার লক্ষ্যটা তার বুকে না লেগে পেটে লেগেছে। দেখলাম বাঘটা বেশ বড় গোছের নাগেশ্বরী চিতা।

বেলা প্রায় তিনটে—রৌদ্রে আমার মুখ পুড়ে ঝল্‌সে যেন আমসী হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বরজের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। জয়নাল কাছে আসতেই বল্লাম—তোমার ব্যাঘ্র ত' খতম—এদিকে আমি যে মারা যাই—কোনো একটা আশ্রয় পাওত' আমাকে নিয়ে চল। বেলা পড়্‌লে বাড়ী যাব। আর এই নাও তোমার বখশীস—কুড়ি টাকা।

আসগর আলীকে ডেকে দশটা টাকা হাতে গুঁজে দিতেই তার বাপজানের চোখ দুটো যেন আনন্দে নেচে উঠল, এবার তাকে ভাল করে হুঁশ' করিয়ে দিলাম—

—এটা তোমার উপরি পাওনা নয়—ছেলে মানুষের হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নিও না—দয়া করে আর একটা কাজ কোরো—যাবার আগে লোকজন ডেকে বাঘটাকে আমার মোটরে তুলে দিও।

কুকুরগুলোও বরজে ঢুকে একেবারে ছুটে ভিতরে চলে গেল। কত আদর করে একটার পর একটার নাম ধরে ডাক দিই—কেউ বেরোতে চায় না।' শেষটায় দুরন্ত ছেলেদের যেমন বাপু বাছা বলে আদর যত্ন করে বোঝাতে হয়, ঠিক তেমনি জমাদারও বহু সাধ্য সাধনায় অবাধ্য কুকুরদের ফিরিয়ে আনলে।

বেরিয়ে আসতেই আমি ওদের গলায় নেকলেশ পরিয়ে প্রত্যেকের মুখে চুমু খেলাম। ওরাইত আজ বিটারের কাজ করেছে—নইলে এই শিকার কখনই সম্ভব হোত না।

জমাদারকে বল্লাম—

—তুমি কুকুর গুলোকে ভ্যানে তুলে নিয়ে বাড়ী যাও। গলার শেকলে টান পড়তেই দেখলাম—কুকুরগুলোই বরং জমাদারকেই টেনে নিয়ে যায়—জমাদারকে আর কষ্ট করে টান্‌তে হয় না। তখন তাদের এমনি বিক্রম। চতুর্দ্দিক খড়খড়ি আঁটা ভ্যানের দরজা খুলতেই দেখি, হরেক রকম তালি দেওয়া তাঁর সাধের নাগরা জুতো জোড়াটা দূরে রেখে, কুকুরের স্থানে চৌবেজী সমাসীন—ময়দা ঠাসার মত তার গোলগাল মাথাটা চাপড়ে ঘন ঘন জলের ঝাপটা দিয়ে চলেছেন—আর সেই জল প্রকাণ্ড এক জোড়া সাদা গোঁফের ডগা দিয়ে তাঁর অঙ্গৌছি-আবৃত বিরাট ভুঁড়ির উপর টপ্ টপ্ করে পড়ছে।

—বলি, বাঘের খবর টবর কিছু মালুম হায়?

হাব ভাবে অপরিসীম ঔদাসীন্য দেখিয়ে চৌবেজীর কণ্ঠ উদারায় বেজে উঠ্‌ল—

—হামি তো হিঁয়াসে সবই দেখিয়েসে—হুজুর যখুন আইয়েসেন—বাঘ তো খতমই হুইয়েসে—

—তবে এখানে বসে কী করা হচ্ছিল?

চৌবেজী বর্ত্তুলাকার পেচক চক্ষু বিস্ফারিত, পেট সমেত বাহু ঊর্দ্ধে উঠে গেল, দোদুল্যমান টিকি নেড়ে উত্তর দিলেন—

—হামি বৈঠে বৈঠে জনো হাথমে লেকে ইহ্‌টো মন্তর জপ করিয়েসি—

—বহুত্ আচ্ছা করিয়েসো—তবে সেটা ঠিক কার জন্যে একবার বুকে হাত দিয়ে বলতো, মহারাজজী!

এবার তাঁর চক্ষু সজল—গদগদ ভাব—খাঁটি দারোয়ানী ঠেট বুলি মুখর হয়ে গেল—

—আকে কে খাতির!—কেত্‌না বাচ্‌পনমে হাজুরকে গোদিমে লেকে খেলাওৎরহলি—কেত্‌না—

থাক্, আর বল্‌তে হবে না, এবার নেমে আসুন—জায়গাটা ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হয়!

ভুঁড়িটা একবার দুলে উঠ্‌ল।

এদিকে জয়নালও তার ছেলেকে পান বরজের দরজার ভেতরে বসিয়ে বাঘটার উপর কড়া নজর রাখতে বলে দিলে।

চৌবেজী, জয়নাল আর আমি যেমন এসেছিলাম—যথাক্রমে আবার তেমনি মোটরে উঠে পড়্‌লাম।

দূরে দেখা যাচ্ছিল—বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে কুটীরের দাওয়ায় অসংখ্য নরমুণ্ড—কিন্তু কেউ আর এই রৌদ্রে ঘর ছেড়ে বেরুতে চায় না। জয়নালের নির্দ্দেশে আমাদের মোটর সেই দিকেই ছুটে চল্‌ল।

কিছুটা দূর থেকে শোনা গেল, হারমোনিয়ামের আওয়াজ। ভাবলাম এত রসের জোয়ার কার এখন জেগে উঠ্‌ল, এই দারুণ গ্রীষ্মেও মল্লার রাগের পর্দ্দায় হাত বুলিয়ে যায়! হবেও বা—এরা বুঝি মেঘকে নামিয়ে আনতে চায়! জিজ্ঞেস করে বস্‌লাম—

—এ সময়ে—এই ভর গরমে কা'র প্রাণে এত গানের সখ উথলে উঠ্‌লো, জয়নাল?

সে আপন মনেই কিছুক্ষণ হেসে নিলে—

—তা বুঝি অবগত নহেন? যাত্রাদল নিয়ে দুই গাঁয়ের মধ্যে খুব কলহ—এমন কি দুই দলে হাতাহাতিও হয়ে যায়। এ গাঁয়ের বড় জোতদার হরিচরণবাবু সায়েব—অনেক ধানী জমী, একশটা লাঙ্গল—অনেক গরু, মহিষ জোত জমা—এই গরমে কেউ আসতে চায় না—তাই তিনি মনুষ্যদের ডেকে এনে ভোজ, ফলার খাইয়ে তবে রিয়েশ্যাল দেওয়ান—পান বিড়ি তামাক, অনেক কিছু গাঁটের কড়ি খরচ করেন কিনা—। উপসংহারে জয়নাল একথাটাও বল্‌তে ছাড়ে না—হামাদের মত গরীব ব্যক্তিকে দু'চার পয়সা দিলে খেয়ে বাঁচি।

—হরিচরণবাবুর নাম আমিও শুনেছি—বড় সৌখীন লোক—তবে তার যে যাত্রা পার্টিরও সখ আছে—তাতো জানতাম না। চল, ওখানেই ওঠা যাক্।

ঘরটি বেশ বড়—মোটা খড়ের ছাউনি—অনেকটা উঁচু—মাটির দেয়াল। মোটর থামতেই হরিচরণবাবু সপারিষদ দাওয়ায় বেরিয়ে এলেন। যাত্রার পালা আপাততঃ ধামাচাপা দিয়ে আমার খাতিরের পালা সুরু হয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই দেখলাম—বেশ ঠাণ্ডা—ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম।

অন্য একটা ঘরে আমার বিশ্রামের আয়োজন কর্‌তেই আপত্তি জানালাম—

—না ভাই—এই ঘরেই এককোণে আমার ব্যবস্থা করে দিন—শুধু একটা খাটিয়া আর চাটিয়া।

নধর পুষ্ট হরিচরণবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্লেন—সে কী হয় কখনো? আজ আমার কী ভাগ্যি!—কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। আপনি আমার এখানে উঠ্‌বেন—এ কখনও কল্পনাও করতে পারি নি।

—সে কী মশাই? কল্পনা শক্তিকে এত খাটো করে ফেল্‌লেন কেন?

জয়নালের মুখে আমার বাঘ শিকারের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনে সকলেরই বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি। তারপর সবার মুখেই আমার জয়জয়কার। সে গাঁয়ে বাঘের অত্যাচারের মাত্রাটা ইদানীং নাকি বড্ডই বেড়ে গিয়েছিল।

হরিচরণবাবু অতিথি-বৎসল। তিনি তখুনি ক্যাম্প খাট আনিয়ে স্বয়ং খাটিয়ার উপর সযত্নে খরের সূক্ষ্ম কাজ করা নরম সুজনী বিছিয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ তাল বৃন্ত ব্যজনেরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

তাড়াতাড়ি পাথরের গ্লাসে ঠাণ্ডা সরবৎ আনতেই বাধা দিয়ে বল্লাম—

—থাক্—থাক্—এখন খাবনা—সর্দ্দিগর্ম্মি হলে আর রক্ষে নেই—হাত মুখ ধুয়ে ও সব পরে হ'বে'খন! এবার আপনাদের মহড়া সুরু করে দিন—কে কী রকম পার্ট করে একবার দেখা যাক।

সকলের মধ্যেই একটা চাঞ্চল্য—একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল।

জয়নাল দায়িত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে করযোড়ে আবেদন জানায়—ড্রেরাই-ভারকে হুকুম দ্যান হুজুর—কলের গাড়ীটা নিয়ে যাই—। মনুষ্য জন ডেকে ব্যাঘ্রটা তুলতে হবে।

—সে কথা আর বল্‌তে?—এক্ষুণি!

খাস পরোয়ানা জারী হয়ে গেল—

—এই বিশ্বাস, জয়নালকে সসম্মানে নিয়ে যাও।

পূর্ণোদ্যমে আবার পাণ্ডব-গৌরবের রিহার্স্যাল জমে উঠ্‌ল। দাড়ি গোঁফ কামানো দ্রৌপদী লাফিয়ে উঠেই, মেয়েলি ঢং-এর একটা বিশেষ প্যাঁচ্ ক'সে তার পৌরুষ-কণ্ঠ যথা সম্ভব বামা কণ্ঠে রূপান্তরের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অনুনাসিক আবৃত্তি করে চলে—সুরে বিশ্ব জোড়া ন্যাকামীর ভঙ্গিমা—

ওই দেখ মধ্যম পাণ্ডব
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে—

আমিও দেখলাম—ঘরের এককোণে কলির ভীম আমাদের চার-পুরুষের চৌবে মহারাজ ভেমী বিক্রমে তার মোটা সেই সোঁটাটা হাতে নিয়ে যেন গদা হস্তে দণ্ডায়মান—অপলক দৃষ্টি মেলে আমার দিকেই চেয়ে আছে—

সেও যে "চিরদিন স্নেহ করে মোরে"—।

তাপসী

প্রিয়বন্ধু ভৌমিক

তুমি কি তাপসী ?
কোথায় সেই
ভারীপায়ে হেঁটে-যাওয়া,
কোথায় সেই
সোণালী সাপের বেণী পিঠের পর
যা' নিজে দুল্‌তো
আর দোলাতো আমাদের
গভীর-মনের সরোবরের
সদ্য-ফোটা
লীলা-কমল ?
কোথায় সেই
রূপের চমক
যা' দেখে
নাম দিয়েছিলাম আমরা
(বহু নামের লটারী করে')
"ক্লিওপেট্রা,
নাইল নয়, জাহ্নবীর সাপ"
আর দায়ী করেছিলাম জাহ্নবীর সাপ
মহাসুন্দরী ক্লিওপেট্রাকে
তিনটি লেকে-ডোবা,
পাঁচটি গলায়-দড়ি,
দশটি আফিং-সেবন,
এবং অন্ততঃ তিনটি রেলে-কাটা :
ভবিষ্যতের এই কয়েকটী
ঐতিহাসিক মহামানবদের
মহা-প্রস্থানের ইতিহাস রচনার জন্যে।
শাসনে শাসনে
কত ঝড় যে তুলেছ তুমি ;
সে ঝড়ে নুয়ে পড়েছে
ধ্বসে পড়েছে তাসের বাসার মত
আমাদের প্রতিবাদের প্রাসাদগুলো ;
কিন্তু তবুও জেগে থাক্‌তো
ঊর্দ্ধমুখ একটি স্তব
তোমার পানে একান্ত হয়ে
আমাদের শুষ্ক-বুকে
সে-শুধু বিজয়িনীর কাছে
হতগৌরবে ধূলোয় লুটিয়ে
একেবারে হেরে গিয়েছি বোলে।
তুমি তাপসী তুমি বলেছিলে
দৃপ্তকণ্ঠে
মুক্ত-ঘোষণায়
যৌবন, বলিষ্ঠ-যৌবন চাই,
শুধু যৌবন থাক এখানে
আর সব চলে যাক্‌
লোকচক্ষু—অগোচরে
মৃত্যু—অভিশাপে
দূর—বনবাসে
চির—নির্ব্বাসনে
তুমি তাপসী তুমি বলেছিলে
বাঁচব সমুদ্রের মত
উচ্ছ্বসিত
উদ্দাম
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উত্তাল
উন্মাদের মত
দুর্য্যোগে দুর্য্যোগে
নাবিকের ত্রাস হ'য়ে
পৃথিবীর পারাবারে।
তুমি তাপসী তুমি বলেছিলে
আর,
তাই-ই যদি হয় কোনোদিন,
যদি সব ভেঙে যায়—
এ জীবন-ও ভেঙে দেবো
এ দুখানি অকম্পিত হাতে ;
আমার বিধাতা আমি
এই ধরাতলে ;
সায়নাইড্‌, সায়নাইড্‌
এক ফোঁটা
এতটুকু
তারপর সমুদ্রের মত
আকাশ-ছোঁওয়া ঢেউ তুলে'
সাগর-তীরে রেখে যাব
তখনও তপ্ত
তখনও নিটোল
তখনও সুন্দর
আমার মৃতদেহ :
ফিরিয়ে দেবো পৃথিবীকে
তাঁর দুরন্ত একটি মেয়ে
আর বিধাতাকে
তাঁর সৃষ্টির প্রথম-বিস্ময়।
সেই তাপসী না তুমি
পার্কের একটি বেঞ্চে
তিনটি কিশোর ছেলেমেয়ে নিয়ে
বসে আছো
এতটুকু হয়ে ?
এত ক্ষুদ্র, এত শীর্ণ ?
সেই তাপসী কি তুমি ?
কেমন করে' সম্ভব হোলো
এ অসম্ভব তাপসী-কঙ্কাল
এখনো জীবন্ত ?
আজ ত্রিশবছর পরে
গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে :
হাঁ, সে-ই, সে-ই,
সেই তাপসী-ই,
সেই দৃপ্ত-গ্রীবাভঙ্গি :
হাসলো একটুখানি
সেই ক্ষুরধার হাসির
স্তিমিত-অবশেষ—
বল্লে,
"হেরে গেলুম
বিধাতার কাছে
শুধু একটা ভুলে,
ভালোবাসায়—"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অমরনাথ

ফটো :— কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬১, ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীঅমরনাথজীর মূর্ত্তি এরূপ হয়েছিল। বৎসরের মধ্যে ঐ একটি দিনে দর্শন করবার জন্য সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হয় ঐ দুর্গম তুষার তীর্থে।)

(পূর্বানুবৃত্তি)

—তিন—
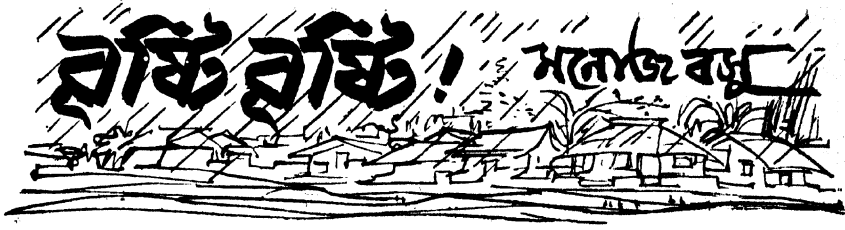
এ হেন প্রবলপ্রতাপ 'যুগচক্র' যেখান থেকে বেরোয়, সেই জায়গা কিন্তু খুঁজে পাওয়া দায়। গলির গলি, তস্য গলি। এমন সঙ্কীর্ণ যে দুটো মানুষের পাশাপাশি চলতে কষ্ট হয়। গলির শেষপ্রান্তে দোতলা মাঠকোঠা। দরজার উপরে সাইন-বোর্ড ঝোলানো। কিন্তু যে মানুষ সন্ধান করে করে হেন স্থানে চলে এসেছে, সাইন-বোর্ড তার কাছে বাহুল্য। রূপকথায় বলে 'সুতোশঙ্খ সাপ'—শাঁখের নির্ঘোষ বেরোয় নাকি লিকলিকে সুতোর মতন এক জীবের কণ্ঠ থেকে। যুগচক্রি-অফিসে গিয়ে বস্তুটার উত্তম আন্দাজ হয়।

নিচের তলায় ছাপাখানা, দোতলায় অফিস। অফিসের জিনিসপত্র নিচের তলায় নামিয়ে দিয়ে ঢালাও সতরঞ্চি পেতে ফরাস হয়েছে। একপাশে খানকয়েক চেয়ার সাজিয়ে রেখেছে, যারা সাহেবি পোষাকে আসবে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। মীটিং আটটায় বসবার কথা—সাড়ে ন'টা হতে চলল, লোক এসেছে গুটিদশেক ছেলে-মেয়ে। 'যুগচক্রে' ওদের লেখা বেরোয়, অথবা লেখা ছাপানোর চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করে। অথচ একশ'র বেশি চিঠি ছেড়েছে ভাল ভাল লোকের নামে। সভাপতি ভূতনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে পঞ্চানন আসবে, তারাও এতক্ষণের মধ্যে এসে পৌছল না।

কৃতান্ত দমে নি। আহা, এই তো ঢের। বেশি লোক এসে পড়লে জায়গা দিতাম কোথায়? এ সমস্ত পাবলিক ব্যাপারে মোটা মোটা নাম দিতে হয়। তাদের নামই শুধু, কাজ করে অন্য লোকে। সেই কাজের লোক ক'টি এসে গেছ তোমরা, তবেই হল। বেশি লোকে গরজ নেই, সভাপতি মশায় এসে পড়লেই আরম্ভ করে দেওয়া যায়।

আরও খানিক পরে পঞ্চানন এলো। একা। ভূতনাথের জন্য বসে বসে এত দেরি। এখন দরের মানুষ ভূতনাথ। সকালবেলা বৈঠকখানা গমগম করে, বড় বড় কথা বলে ভূতনাথ সকলের মাঝখানে বসে। ফরমোজার ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ, বান্দুং কনফারেন্সের তথ্য, জওহরলাল নানা রকম ভুলভ্রান্তি করছেন—তার জন্যে শাসানি। পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্য ছিল এতকাল, সেই লিস্টিতে আর একটি বাড়ল—ভূতনাথ গুঁইর মুখে রাজনীতি। যাচ্ছি যাচ্ছি—করে এক ঘণ্টার উপর পঞ্চাননকে বসিয়ে রেখে শেষটা আর একজনের সঙ্গে করপোরেশনের কোন জরুরি কাজে বেরিয়ে গেল। মীটিঙের সাফল্য-কামনা জানিয়েছে, আর শোন—

কৃতান্তকে এক পাশে টেনে নিয়ে পঞ্চানন একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিল। ভূতনাথের চাঁদা।

কৃতান্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল, মুখে কথা ফোটে না।

পঞ্চানন বলে, কাউন্সিলার হয়ে বিস্তর জায়গায় দিতে হচ্ছে। এর বেশি হয়ে উঠবে না, বলে দিয়েছে।

কৃতান্ত আগুন হয়ে বলে, মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারলে না? পাঁচ টাকাই দেবে তো ওর মতন আকাট মুখ্যুকে সভাপতি করব কেন? বাংলা দেশে জ্ঞানীগুণীর মন্বন্তর হয়েছে?

পঞ্চানন বিরস মুখে বলে, সভাই হচ্ছে না তার সভাপতি! ম্যাও ধরবে কে? ইনস্টিট্যুটের ভাড়া ধরো শ' খানেক। তার উপর—

কৃতান্ত বলে, কাগজে যখন ছাপা হয়ে গেছে, সম্বর্ধনা হবেই। ইলেকসন জিতিয়ে দিয়েছি কিনা—কলির ধর্ম!

এক মাঘে শীত চলে গেল, ভেবেছে তাই। যাকগে, যাকগে। প্রস্তাবগুলো পাশ করে এদের তো ছেড়ে দিই। পরে ভাবব।

একটুখানি গুম হয়ে থেকে এদিকে এলো। শুনছ হে, ভূতনাথ নাকি আসবে না! রক্ষে পেয়ে গেলাম। এসে তো হাঁদার মতো এক এক জবান ছাড়ত, সামলাতে প্রাণান্ত। বুঝতে পেরেছে—এ জায়গায় তোমাদের মাঝখানে জুত হবে না। সেই ভয়ে এলো না। কাউন্সিলার বলে নৈবেদ্যের উপর কলার মতন নামটা রেখে দেওয়া—না এলো তো বয়ে গেল! কিন্তু সভাপতি চাই একজনকে আপাতত—

উপস্থিত সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বয়সে বড্ড কাঁচা। সভাপতির খানিকটা তো ওজনদার হতে হয়! তাই তো, তাই তো—

একটি মেয়ে খোশামুদি সুরে বলে, আপনি থাকতে সভাপতি আবার কে হবে?

মেয়েটা 'যুগচক্রে' কবিতা ছাপানোর উমেদারিতে আছে অনেক দিন। তার দিকে চেয়ে কৃতান্ত ঘাড় নাড়ল, উঁহু, আমি যে হলাম সেক্রেটারি। পঞ্চাননই চালিয়ে দিক আজ—কি আর হবে! যাও হে, বসে পড়ো ঐ গদি-আঁটা চেয়ারে।

পঞ্চাননের পৌরোহিত্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল—'ভারতে ইংরাজ' পুস্তকের লেখককে কলিকাতার যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। মানপত্র রচনা, অর্থ-সংগ্রহ, অভ্যর্থনা, প্রচার এবং উদ্যোগ-আয়োজন বাবদে পাঁচটা সাবকমিটী তৈরি হল। প্রোগ্রামেরও আলোচনা হল মোটামুটি। কি পরিমাণ চাঁদা ওঠে, তার উপর সমস্ত নির্ভর করছে; সেজন্য পাকাপাকি হতে পারল না।

কৃতান্ত বলে, কাগজে দিয়ে এসো পঞ্চানন, আজকের মীটিঙের খবরটা। কালই যেন বেরিয়ে যায়। বিপুল জন-সমাবেশ বলে ছেড়ে দাও, গোণাগুণতির তালে যেও না।

দিন আষ্টেক পরে রাত্রিবেলা কৃতান্ত বিশ্বেশ্বরের বাড়ি এসে হাজির। রাস্তা থেকে যথানিয়মে চেঁচাচ্ছে, দাদা আছেন নাকি—ও দাদা!

ইরা ছাত থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, কে?

রাস্তার আলোয় দেখে বলল, বাবা শুয়ে পড়েছেন কাকাবাবু। সর্দিকাশিতে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, জোরজার করে শুইয়ে দিইছি। দাঁড়ান, দরজা খুলে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে খট করে খিল খোলার শব্দ। সরমা নিচের রান্নাঘরে, তিনি এসে খিল খুলে দিলেন। সামনে যান না, কিন্তু কৃতান্তর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে কয়েকবার। ঢুকেই একটু চাতাল মতো জায়গা—গৌরবে বৈঠকখানা বলা যায়, লোকজন এলে এখানটায় বসে।

সরমা ঘরের ভিতর—কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃতান্ত জমিয়ে বসে পড়ে বলে, শুনেছেন বোধ হয়—দাদার সম্বর্ধনা হবে। কিন্তু বিষম এক ফাঁসাদে পড়লাম বউদি, সেই পরামর্শের জন্য এসেছি।

সরমা প্রমাদ গুণলেন। কৃতান্তর আসা-যাওয়া আজকের নয়—কথার ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে, একটা খরচের ঝুঁকি চাপাতে চায় তাঁদের উপর। এক কথায় কেটে দিয়ে বললেন, দরকার কি ঠাকুরপো এ সমস্ত হাঙ্গামার?

কৃতান্ত শিউরে উঠল। কি বলেন বৌদি! একটা মানুষ বাঁধা-আয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভালমন্দ না ভেবে দুস্তর সাহিত্যপথে এসে নামলেন—

সরমা বাধা দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকে কি বলব ঠাকুরপো, কোন খবরটা আপনি না জানেন! সাত নয় পাঁচ নয়, একটা মেয়ে—পড়াশুনো করছিল, মনে মনে কত সাধ-আহ্লাদ ভাল ঘর-বরে বিয়ে দেবো মেয়ের—সমস্ত ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরছে সে এখন। দু' জায়গায় পড়িয়ে কিছু কিছু এনে দেয় তবে সংসার চলে। ঝট করে চাকরি ছাড়াটা কি বুদ্ধির কাজ হয়েছে, আপনি বলুন—

ইরা ওদিকে বাপের মশারি গুঁজে দিয়ে দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে এসে পড়ল। এসে সে মায়ের কথা লুফে নেয়।

কি বলছিলে মা, কোনটা বুদ্ধির কাজ হয় নি?

সরমা চুপ করে গেলেন। কত দিন এই নিয়ে মা-মেয়েয় কলহ; বাইরের লোকের সামনে সেটা আর হতে দিতে চান না। কিন্তু ছাড়বে কি ইরা! বলে, বুদ্ধির কাজ না হোক, মহত্বের কাজ। রামনিধি সরকারে নাতি—রামনিধি দিব্যি মোক্তারি করছিলেন, ঘাড়ের উপর ভূত চেপে তাঁকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়ে তবে ছাড়ল। নাতিও

তেমনি—নির্ঝঞ্ঝাটের কেরাণীগিরি ছেড়ে দিয়ে সকলের হেনস্থা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এর আনন্দ তুমি বুঝবে না মা।

কৃতান্ত হাঁ-হাঁ করে ওঠে, এত বড় সম্বর্ধনা—এর মধ্যে হেনস্থার কথা মুখে আনছ কেমন করে? শোন, 'ভারতে ইংরাজ' যে পড়ছে সেই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে রোজ আসে আমার কাছে। কোন রকম কিছু না করলে দাদার ভক্তমণ্ডলী মেরেই শেষ করবে আমায়। সেইজন্যে এত ছুটোছুটি—

কৃতান্ত নিজেও তাজ্জব। উঃ, কি মিথ্যেই বানাতে শিখেছে! দিকপালের চেয়ে একতিল কম নয়। এই একটু আগে হিসাব করে এলো, 'ভারতে ইংরাজ' একুনে সাতান্ন কপি বিক্রি হয়েছে। তার মধ্যে খানকয়েক অর্ধেক দামে গছিয়েছে জানাশোনা কয়েকটা লাইব্রেরিতে।

বলল, রোজ আসছে—মেয়ে পুরুষ জোয়ান-বুড়ো নানান ধরণের ভক্ত। কি না, এ বই যিনি লিখেছেন তাঁকে চক্ষে দেখবো। আমি বলি, দেখবে বই কি—দেখা করাবার তালেই আছি। তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করব, সেইদিন দেখো সকলে।

নেপথ্যবাসিনীর উদ্দেশে অনুনয় করে বলে, এত মানুষের সাধে বাদ সাধবেন না বউদি, করজোড়ে বলছি। শুনবোই না আমরা।

ইরা বলে, সম্বর্দ্ধনার জায়গা ঠিক হল কাকাবাবু? কার্ড ছাপিয়েছেন?

কৃতান্ত বিশুষ্ক মুখে বলে, সেই তো মুশকিল হচ্ছে মা। আচ্ছা, দেশের যাবতীয় বড়লোকের জন্ম কি ঐ আষাঢ়ে? আর বারোই আষাঢ় দৈবাৎ রবিবার পড়ায় ঠেলেঠুলে সমস্ত ঐ তারিখে এনে জুটিয়েছে। য়্যুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট ভাড়া হয়ে গেছে; আরও চার-পাঁচটা হলের খবর নিলাম, সব জায়গায় এক অবস্থা। অথচ বারোই হতেই হবে, 'যুগচক্রে' বেরিয়ে গেছে। আমাদের অফিসের দোতলার কথা তুলেছিলাম একবার—তা ভক্তেরা রে-রে করে উঠল।

মনে মনে হাসে কৃতান্ত। আচ্ছা জমানো গেছে যা হোক। ভূতনাথের কাছে বিশুর প্রত্যাশা ছিল—তার ঐ গতিক। আর এ বাজারে জনে জনের হাতে পায়ে ধরেও খুচরো চাঁদা তিরিশ-চল্লিশের বেশি উঠবে না। বড় হলের আশা ছেড়ে দিয়েছে অতএব। আর একদিক দিয়েও ভাবছে। দেদার লিখে যাচ্ছেন অবশ্য বিশ্বেশ্বর—কিন্তু লেখেন ইতিহাস,গল্প-উপন্যাস নয়—লেখক বিশ্বেশ্বরের নামটাই অতি সামান্য জানে। গড়ের মাঠের মতো এক হল ভাড়া করে শেষটা তার মধ্যে দেখ, গোটাকয়েক লোক টিমটিম করছে। সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। আর 'যুগচক্র' অফিসে করাও বিপজ্জনক। চল্লিশ টাকা যদি চাঁদা ওঠে—তার মধ্যে দরজায় ঘট পাতো, ফুলের মালা কেনো, অতিথিসজ্জনদের চা-সিগারেট খাওয়াও—কত দিকের কত খরচ! পঞ্চাননটা আড় হয়ে পড়েছে—ঐ বইয়ের দরুণ প্রেসের হিসাবে এক গাদা পাওনা হয়ে আছে, দপ্তরি এসে দু-বেলা তাগাদা করছে, তার উপরে নতুন লগ্নি কিছুতে সে করতে দেবে না।

বলে, সকলে বলছে কি জানেন বৌদি—গঙ্গার ধারা দেখেই সুখ হয় না, গঙ্গোত্রীও দেখব। দাদার লেখার উদ্গম যে পুণ্যস্থান থেকে। তা বললেই অমনি তো হট করে ঘর-গেরস্থালির মধ্যে নিয়ে আসা যায় না! আর মানুষ বলুন বাড়িই বলুন—সাজগোজ করে পটের ছবি হয়ে একদিন-দুদিন থাকা চলে। বারোমাস তিরিশদিন খুশি-মাফিক ভক্তেরা সব আসা-যাওয়া করবেন, তাই কি হয় কখনো? তাই মতলব খাটিয়েছি একদিনে, তা-ও নয়, একটা বেলায় ঝামেলা চুকিয়ে দেবো। সভা-টভা কি আর—জন্মদিনটা উপলক্ষ করে দাদাকে ঘিরে সকলে মিলে তপোবনের আওতায় বসা।

যে ঘরটায় বিশ্বেশ্বরের লেখাপড়া ও শোওয়াবসা, তার নাম তপোবন। নামকরণ কৃতান্তর; তার উপরে বাপের ঘর সম্বন্ধে ইরার অতিরিক্ত সতর্কতায় নামটা বাড়ির মধ্যেও চালু হয়ে গেছে। এমন কি সরমা বলে ফেলেন কখনো-সখনো। কৃতান্তর কথায় সরমার বজ্রাঘাত হল যেন। কি সর্বনাশ করেছেন উনি এই লেখালেখির তালে গিয়ে! সিকি পয়সার মুনাফা নেই, উল্টে এখন এই বাড়ি বয়ে হামলা। আর কৃতান্ত যা-ই বলুক, আবার এখন চলল এক-নাগাড়। শহরই ছাড়তে হবে শেষ পর্যন্ত; না ছেড়ে উপায় নেই। গাঁয়ে গিয়ে উঠবেন। গাঁয়ের বাড়িতে বছরের ধানটা তবু পাওয়া যায়, এখানে কি ইট কামড়ে পড়ে থাকবেন? চলে যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগে, কিন্তু বাপে-মেয়েয় আড় হয়ে পড়ল—একা সরমার কি সাধ্য

আছে! বাপ যাবেন না লাইব্রেরি ছেড়ে; আর মেয়ে তো 'হ্যাঁ' বলে বসে আছে বাপের মুখ খুলবার আগেই। কোমর বেঁধে তাই চাকরির জোগাড়ে লেগে গেছে। আর মাস মাস ট্যুইশানির টাকা হাতে এনে দিচ্ছে, মেয়ে তো লাটসাহেব এখন।

হলও তাই। আগ বাড়িয়ে ইরা বলে ওঠে, বাবার জন্মদিনে আমরাই সকলকে নেমন্তন্ন করব কাকাবাবু। একটা মুশকিল, এই তো পায়রার খোপের মতন বাড়ি—

কৃতান্ত বলে, তাতে কি হয়েছে! হাটের হাততালি দাদা কখনো চান নি, হাটুরে লোক একটাকেও আনছি নে। যারা খাঁটি ভক্ত, আর ইতিহাসরসিক—

হেসে বলে, সে-ও অবশ্য নেহাৎ কম যায় না। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। তবে অত্যন্ত বেছেগুছে চিঠি পাঠাব—

ইরা বলে, তাই বলছি। এনে তাদের বসতে দেবেন কোথায়?

ছাতের উপরে। পাশেই দাদার তপোবন—তাদের কাছে তীর্থস্থানের সামিল। বড্ড খুশি হবে সকলে। ধন্য হয়ে যাবে।

সরমা শেষ চেষ্টা করেন, বর্ষাকালে বৃষ্টি তো হবেই। তখন?

কৃতান্ত হাসতে হাসতে বলে, পাগলা হাতী হয়ে দাদার তপোবন তছনছ করব, সেই ভয় করছেন বৌদি? বৃষ্টি হলে যাবে সব চিলেকোঠায়, যাবে সিঁড়িতে। নয় তো ভিজবে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের আফিসে দুটো ত্রিপল আছে, তাই না হয় দেবো পাঠিয়ে। অত ভাবনাচিন্তে করতে হবে না বৌদি। তারা সব আপন বলেই বাড়িতে আনতে পারছি। হৈ হৈ-ওয়ালা হলে তুলতাম নিয়ে কোন পাবলিক-হলে।

কথাবার্তা শেষ করে কৃতান্ত উঠল। আবার একটা কথা মনে পড়ায় মুখ ফিরিয়ে বলে, চা দেওয়া হবে সকলকে, সে ভার সম্বর্ধনা-কমিটী নিয়েছে। তোমায় সেইগুলোর বিলিব্যবস্থা করে দিতে হবে ইরা মা।

ইরাবতী রাগ করে, আমাদের বাড়ির অতিথিদের কমিটী খরচপত্র করে চা খাওয়াবেন—আমাদের কি রকমটা মনে হবে বলুন তো?

কৃতান্ত বলে, আমাদেরও মনে লাগে মা, অমন আমরা-আমরা করলে। যেন তোমরাই সব, আমরা একেবারে কিছু না। যে দু-চার টাকা খরচ, যার সুবিধা হয় করুক না! কাজটা ভাল ভাবে হয়ে গেলে হল। এমনি তো দাদা বিস্তর দিচ্ছেন দেশকে। তার উপরে নগদ খরচপত্রের দায়টা আর চাপাতে চাইনে।

ইরা বলে, খরচপত্র বাবার টাকায় হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাইরে থেকে আয়োজন করে এনে খাওয়াবেন, এটা বড় বিশ্রী দেখাবে কাকাবাবু।

কৃতান্ত হেসে ফেলল।

তা বটে! তুমিও যে টাকার লোক হয়েছ, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। তা বেশ—বাপের জন্মদিনে মেয়ে খাওয়াবে, এতে আর কোন মুখে 'না' বলি?

তোফা হল। পঞ্চানন ঘাবড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন দিকেই আর সিকি পয়সার দায় রইল না। কেবল এখন লোক জুটিয়ে আনা। ছাতটুকু তো ভরাট হওয়ার দরকার। নেহাৎ পক্ষে জন পঞ্চাশ না হলে খবরের কাগজেই বা মহতী সভা বলে রিপোর্ট ছাড়া হবে কেমন করে?

কৃতান্ত বলে গেল, জায়গার পাকাপাকি না হওয়ায় এদ্দিন নেমন্তন্নের চিঠি ছাপতে দিতে পারিনি। কালকের মধ্যে ছেপে ফেলছি। তোমায় খান দশেক দিয়ে যাবো, আপনজনদের দিও।

আপনজনদের উপর ইরাবতীর বিতৃষ্ণা লাগে। বিশ্বেশ্বরকে কেউ বলে পাগল; কেউ বা ঠাট্টা করে, এঁটোপাতের ধোঁয়ার স্বর্গে যাবার শখ! বয়ে গেছে ঐ সব আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ি ডেকে আনতে। আবার ভাবে, আনাই তো উচিত। এসে দেখে যাক তার বাপের খাতিরটা—দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরুক।

আত্মীয় না হোক—বাইরের মানুষ ইতিহাসের সেই অতি মনোযোগী পড়ুয়াকে তো দিতেই হবে একখানা চিঠি। শাড়িটা পরের দিন পৌছে দেবার কথা—তা যে রকম এগজামিনের তাড়া দেখে আসা গেল, তার মধ্যে সম্ভবত সামান্য বস্তুটা স্মরণ নেই। শুধু শাড়ির তাগাদায় যেতে লজ্জা করে। নিমন্ত্রণ করতে সেখানে গিয়ে হঠাৎ যেন শাড়ির কথা মনে পড়ে যাবে। নইলে যে বা মানুষ—কোনদিন তার শাড়িটা ফিরে পাবে না।

কৃতান্তদের এখন একটা দায় থাকল, জন পঞ্চাশ মানুষ এনে জোটানো। নিমন্ত্রণ-চিঠি ডাকে পাঠিয়ে ভরসা হয় না, চাঁদা আদায়ের চেষ্টায় গিয়ে বোঝা গেছে কি কঠিন ব্যাপার! ইতিহাসের মহামূল্য গবেষণা—লোকে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে আহা-ওহো—করে উঠবে, কিন্তু আর কিছু কানে নেবে না। কার দায় পড়েছে ডাকের চিঠি পেয়ে গলিঘুজি খুঁজে খুঁজে সম্বর্ধনায় হাজির হওয়া! কৃতান্ত সম্পাদক মানুষ—চিঠি হাতে ঘুরে ঘুরে আসবার জন্য খোশামোদ করে বেড়ানো তার পক্ষে ভাল দেখায় না। ঐ কাজটা পঞ্চানন বেছে নিয়েছে।

কি আশ্চর্য, নিজের পাড়ার মধ্যেও যে চেনে না বিশ্বেশ্বরকে! বয়স্ক মানুষ, রোয়াকে উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিলেন, চিঠির এপিঠ-ওপিঠ উলটে আদ্যন্ত পড়ে বললেন, গলিটা আমাদেরই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর সরকার—চুণোপুকুরে সুপ্রসিদ্ধ লেখক কে মরতে আসবে? বাজে ভাঁওতা মশায়—

পঞ্চানন ঘাড় নেড়ে বলে, সত্যিই আছেন। সাতাশ নম্বরের বাড়ি। আপনারা জানেন না।

সামনের বাড়ির দরজায় এক ছোকরা ওজন কম হওয়ায় আলুওয়ালার সঙ্গে বচসা লাগিয়েছে। তাকে ডেকে বুড়া বললেন, শোন—শোন রে পটলা মজার কথা। জঙ্গল কেটে বসতি পালেদের—ইস্তক ট্যাংরার খাল অবধি নখদর্পণে, গলির মধ্যে লেখক এসে ঘাপটি মেরে রয়েছে, আর আমি নাকি কিছু জানিনে!

পটলা নামধেয় ছোকরাটিকেও পঞ্চানন চিঠি দিল। পটলা প্রণিধান করে বলে, দিনকাল খারাপ জেঠামশাই। লোকনাথ ব্যাকরণরত্ন মশায় সেদিন দেখলাম দুয়োর দিয়ে বসে বসে ঠোঙা বানাচ্ছেন। পেটের দায়ে মানষে হাড়িবৃত্তি চেড়িবৃত্তি করছে, আমরা তার ক'টা খবর রাখি? তা হতেও পারে লেখক

বুড়া বলেন, পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লেখক বেপাড়ার মানুষ এসে সম্বর্ধনা করতে আসছে—না-রাম না-গঙ্গা আমরা কিছু জানলাম না—

কপালের রগ টিপে ভাবতে লাগলেন।

সাতাশ নম্বর—তার মানে হলগে মন্দিরের ডাইনে ভীম ঘোষের গোয়ালবাড়ি ছিল যেটা। হয়েছে, হয়েছে রে পটলা—আমাদের বিশুবাবু। কালেকটরেটে ডেচপ্যাচ-ক্লার্ক ছিলেন—চাকরি ছেড়ে ভেবেছিলাম হরিনাম করছেন। তলে তলে তিনি আবার লেখক হয়ে গেছেন, সভা বসছে তাঁকে নিয়ে—কালে কালে কতই বা দেখব!

পটলার ভারি স্ফূর্তি—তুড়িলাফ দেয় আর কি! বলে, কত জায়গার কত ভাল ভাল মানষের পদধূলি পাড়ার মধ্যে পড়বে, বুক ফুলে উঠছে মশায়। নির্ভাবনায় চলে যান, আমরা ঠিক যাবো।

হেসে বলে, এসব ব্যাপারে লেজুড় স্বরূপ—যাবেন জেঠামশায়—সভা-টভা করে দিব্যি বেশ ঢেকুর তুলতে তুলতে ফেরা যাবে।

ছাত ভরে যাবে, পঞ্চানন এখন নিঃসন্দেহ। ভরে গিয়ে এমন কি উছলেও পড়তে পারে। যা হয় হোকগে—ঐ যে লেজুড়ের কথা বলল,সে ভার পুরোপুরি তো ওরাই নিয়েছে। জনসংখ্যার নিখুঁত হিসাবে কি গরজ তবে আর?

ইরাবতীও ক'খানা চিঠি নিয়ে ঘুরছে। চিঠি নিয়ে সেদিনের সেই থামওয়ালা বাড়ির দরজায় ঘা দিল। ভিতরে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। ধাক্কাধাক্কিতে খুলল অবশেষে দরজা। হরিহর ঘর-পরিষ্কারে লেগে গেছে। ধূলোয় ভূত। খাটাখাটনিতে বুড়ো মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার উপরে এই কাজের ভণ্ডুল। ইরাবতীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলে, নেই—মফস্বলে চলে গেছেন।

কলকাতা শহরেই নেই? তবে আর কি হবে!

বলে ফিরে যাচ্ছিল ইরা। হরিহর বলে, পরশু আসবেন। নাম-ঠিকানা লিখে রেখে যাও, সকলে লিখছে।

নাম লিখতে হবে না। চিঠিটা দিও, তাহলেই হবে।

হরিহর বলে, নাম লিখে যাও—নইলে এসে আমার উপরে রাগ করবেন। যত লোক আসছে, সবাই লিখে লিখে যায়।

খাতা এগিয়ে দিল। বিস্তর নাম, কেউ কেউ রোগের বৃত্তান্তও দিয়েছে। তখন মালুম হল।

ইরা বলে, আমি রোগি নই। ডাক্তারবাবু নয়, অরুণাক্ষবাবুকে চাই আমি।

শ্যামবাজারে চলে গেল। এই এক্ষুণি। কর্তার এক বন্ধু পশ্চিমে থাকেন, কাল তাঁরা এসেছেন, সেখানে গেছে।

ইরা বসে পড়ে বলে, তুমিই হরিহর? দেখেই চিনতে পেরেছি।

হরিহর ইরার আপাদমস্তক তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে, আমি তো কই তোমায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দেখিনি আমিও। না দেখেও চিনি। আর একদিন এসে পড়েছিলাম, তুমি ছিলে না। অরুণাক্ষবাবু ভীষণ প্রশংসা করছিলেন, তোমার মতন মানুষ নাকি হয় না।

হরিহর গদগদভাবে বলে, অনেক কালের লোক আমি কিনা। দাদাবাবুকে প্রায় তো মানুষ করলাম।

তাই বলো, সেইজন্যে অমন করে বলছিলেন—

শাড়ির কথাটা তুলবে নাকি এইবার? ঝাঁট দিয়ে দিয়ে হরিহর ঝুড়িতে আবর্জনা ভরেছে, তার ভিতর থেকে একটা খাতা তুলে নিয়ে ইরা বলে, কলেজের নোট প্রফেসররা দিয়েছেন—এ জিনিষ ঝুড়িতে কেন হরিহর?

হরিহর বলে, দরকারি নাকি? আমি তা জানব কি করে? তাকের নিচে ধূলোর মধ্যে আণ্ডিল হয়ে পড়েছিল, উনুনে দেবো বলে নিয়ে যাচ্ছি।

ইরা হেসে ওঠে, দিলে অবশ্য তোমার দাদাবাবু বেঁচে যান। পড়াশুনোর দায় থাকে না।

হরিহরের অভিমানে লাগে। উঁহু, সে কথাটি বলতে পারবে না। টপাটপ পাশ করে যায় দাদাবাবু, কক্ষণো ফেল হয় নি। বড্ড ভালোছেলে দাদাবাবু, বিস্তর গুণ

ইরা বলে, কেবল এই যা একটু অগোছালো—

হরিহর সায় দেয়, হ্যাঁ—

ঘরের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে ইরা বলল, ভেন্টিলেটারে চড়ুইয়ের বাসা, দেয়ালে মাকড়শার জাল, আলমারির পিছনে আরশুলারা গোঁফ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে—দিব্যি এক চিড়িয়াখানা বানিয়ে আছেন তোমার দাদাবাবু। আর ঐ খবরের কাগজের পাহাড়—ওর মধ্যে বাঘ লুকিয়ে আছে কি না কে জানে?

হরিহর বলে, ঘরে বাঘ আসে কি করে—নেংটি-ইঁদুর আছে।

ইরা বলে, তুমি আছ হরিহর, তাই। নয় তো ইঁদুর আরশুলা মাকড়শায় খুবলে খুবলে তোমার বাবুকে খেয়ে ফেলত।

হরিহর পরম প্রীত হয়ে নালিশ জানায়, দেখ তাই। হুকুম হয়ে গেল, শ্যামবাজারের তারা এসে পড়তে পারে, হরিহর, রান্নাবান্নার আগেই নিচেটা সাফ-সাফাই করে ফেলবি। রাবণ রাজার বিশখানা হাত হলেও তো এইটুকু সময়ে পেরে ওঠা যায় না দিদি।

ইরা বলে, আমি একটু করে দিই—

বলেই ঝুলঝাড়া তুলে নিয়ে মাকড়শার জাল ভাঙতে লাগল। হরিহর হাঁ-হাঁ করে ওঠে, তুমি কেন গো, তোমায় কে করতে বলছে? বললাম বলে নাকি, আমিই পারব—

ইরা বলে, না হয় দিলাম করে একটুখানি। মেয়েদের কাজই এই। তুমি তো জানো না হরিহর-দা কোনটা দরকারি, কোনটা বেদরকারি। অমন করো কেন, এই একটু-আধটু তোমার কাজ এগিয়ে দিলে ক্ষয়ে যাবো না।

হরিহর হঁ-হাঁ করে, জোর করে আর তেমন আপত্তি করে না।

ইরা বলল, সেই যে আর একদিন এসেছিলাম, কাদা-মাখা শাড়ি ফেলে গিয়েছিলাম সেদিন। দাও দিকি সেটা, নিয়ে যাই—

হরিহর বলে, সে বুঝি তোমার শাড়ি? দাদাবাবুর কাণ্ড—বইপত্তোরের গাদার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। মায়ের শাড়ি ভেবে কালকে আমি ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

ঘাস করে রাস্তার উপরে ট্যাক্সি থামল। হুড়মুড় করে ছুটে এলো এক মেয়ে—মাজাঘসা ঝকঝকে মুখ, চটকদার পোষাক। ইরার হাতে ঝাঁটা, আঁচল কোমরে বাঁধা—সেই অবস্থায় মুখোমুখি পড়ে গেছে। ইরাকে বলে, কোথায় তোমাদের বাবু? বাড়ি নেই বুঝি?

ইরা হতভম্ব হয়ে ঘাড় নাড়ল। ঝি ভেবে বসেছে, এ অবস্থায় তা ছাড়া আর কিছু ভাববে ছি-ছি, কি লজ্জার কথা! স্বল্প-পরিচিত পরের বাড়ি এসে ঝাঁটা ধরতে গেল সে কোন বিবেচনায়? এই এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে—নোংরা কোন কিছু দেখলে গা শিরশির করে, তখন আপনপর জ্ঞান থাকে না।

অরুণবাবু এলে বলবে যে সুনন্দা এসেছিল। একবার যেতে বলবে। আর রবিবার রাত্রে খাবেন আমাদের বাড়ি। মনে থাকবে তো?

হরিহর এগিয়ে এসে বলল, তোমাদের বাড়িতেই গেছেন। বসবে না দিদিমণি?

উঁহু, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি ফিরে যাই, তা হলে, সেখানে গিয়ে ধরব।

সেন্টের গন্ধে ঘর মাতিয়ে দিয়ে সুনন্দা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

হরিহর বলে, এই মেয়ের সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে। কর্তাবাবুর খুব ইচ্ছে—মা'র একটু দোমনা ভাব। মা চান আরও ফটফটে বউ।

(ক্রমশঃ)

মালদহে প্রাদেশিক সম্মেলন—

গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল মালদহ সহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেশ বিভাগের পর মালদহ জেলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে উড়োজাহাজে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুর ঘাটে যাইয়া সেখান হইতে মোটরে ৭২ মাইল যাইলে মালদহ। নচেৎ রেলে তিন পাহাড় ও রাজমহল হইয়া প্রায় ২০ মাইল বাসে যাইয়া মালদহে পৌঁছান যায়। এইরূপ দুর্গম স্থানেও এবার সম্মিলনে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীধেবর সম্মিলনের উদ্বোধক-রূপে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্মেলনের সভাপতিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও প্রদেশ কংগ্রেস-সম্পাদক শ্রীবিজয় সিংহ নাহারও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মন, ডাক্তার জীবনরতন ধর, শ্রীরেণুকা রায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীবীজেশ সেন, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহ হইতে দলে দলে কর্মীরা সমবেত হইয়াছিলেন। মালদহনিবাসী শ্রীরামহরি রায় এম-এল-এ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিরাট মাঠে প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তথায় সম্মেলন হইয়াছিল ও তথায় প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা চমৎকার ছিল—নূতন মালদহ সহর ইংরেজবাজার আকারে ছোট—কাজেই সকলেই প্রায় মণ্ডপের কাছাকাছি থাকায় কাহারও কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি প্রধান ছিল। আজ উত্তরবঙ্গের সহিত দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগের কোন উপায় নাই—প্রথমেই আমরা মালদহ যাতায়াতের কথায় তাহা বলিয়াছি। অথচ কলিকাতা হইতে রেলে মালদহ যাওয়া আদৌ কষ্টকর ছিল না। ভারতীয় রাষ্ট্রের এলাকার মধ্য দিয়া ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হইলে লোক অতি সহজে আবার মালদহে যাতায়াত করিতে পারিবে। প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী, শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের স্মৃতি বিজড়িত রামকেলী প্রভৃতি স্থান এই মালদহ জেলার মধ্যে অবস্থিত—প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই সে সকল দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করিয়া কলিকাতার ছাত্র ও যুব সমাজের—দিল্লী আগ্রা দেখিবার পূর্বে মালদহের পুরাকীর্তির যে সব ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্তমান, সেগুলি দেখিয়া আসা উচিত। স্বাধীন ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে খনন করা হইলে আরও বহু প্রাচীন তীর্থ প্রকাশিত হইবে। মালদহের প্রাদেশিক সম্মেলন সকল দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রাদেশিক সম্মেলন—গণসংযোগের একটি প্রধান উপায়। মালদহে এই উপলক্ষ করিয়া লক্ষ লক্ষ অধিবাসী সম্মেলনে আসিয়া কংগ্রেসের কার্য্য ও ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রেল সংযোগ—

গত ১২ই এপ্রিল করাচীতে ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে—উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ৪টি রেল সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হইবে—দেশ বিভাগের পর এই সংযোগগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আগামী ১লা জুনের মধ্যে তিনটি রেলপথ খোলা হইবে—বাকী রেল সংযোগ প্রবর্তনের তারিখ পরে স্থির হইবে। স্থির হইল—১লা মে হইতে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে মালগাড়ী চলাচল করিবে। রাজস্থানের সহিত সিন্ধুর সংযোগ ও ফিরোজপুরের সহিত গণ্ডাসিংওয়ালার সংযোগ—অর্থাৎ উভয় পাঞ্জাবের সংযোগ ১লা জুনের মধ্যে খোলা হইবে। কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত থ্রু ট্রেণ চলাচলের তারিখ পরে স্থির হইবে। আমেদাবাদ ও হায়দ্রাবাদের (সিন্ধু) মধ্যে থ্রু ট্রেণ চলাচলের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইয়াছে। ভারতের পক্ষে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, করাচীস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীসি-সি-দেশাই প্রভৃতি এবং পাকিস্তানের পক্ষে সংযোগ মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রভৃতি সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাড়িবে ও উভয় রাষ্ট্রের জনগণ উপকৃত হইবে। শ্রীযুত খান্না ও ডাক্তার খান সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে।

গো-সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

দিল্লীতে শ্রীপুরুষোত্তম দাস টাণ্ডনের সহিত পত্রালাপে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে—পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইলেও এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে গোহত্যা হয়, তাহা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী গাভী ও গোবৎস সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অবশ্য প্রযোজ্য। শ্রীনেহরু বলেন—ভারতের বিশেষ অবস্থা ও দেশের গো-সম্পদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়াই তিনি জানাইয়াছেন—বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং খাদ্য ও কৃষিদপ্তরকে তিনি ক্রমাগত এই বিষয়ে পত্র দিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও তাহাতে ফলও হইয়াছে। শ্রীনেহরুর এই আশ্বাসে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। শেঠ গোবিন্দদাস এ বিষয়ে

লোকসভায় যে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল হইত না—পরন্তু অসুবিধা সৃষ্ট হইত—ইহাই শ্রীনেহরুর অভিমত। সেজন্য লোকসভায় সে বিল সমর্থিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়—

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০০ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর হইতে ঐ সব সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রতিটির জন্য ১ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্য বা ঋণ মঞ্জুর করা হইবে। বর্তমান স্কুলগুলির মধ্য হইতে কতকগুলিকে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে। প্রয়োজন মত নূতন সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৫টি ঐরূপ বিদ্যালয় খোলার চেষ্টা করা হইতেছে।

সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা—

গত ৯ই এপ্রিল শনিবার কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হইয়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন—আমাদের সংবিধানে সমস্ত নাগরিকের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকারের উল্লেখ আছে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ সমানভাবে উন্মুক্ত রাখিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত যতটা শিক্ষা সম্ভব, তাহার সমস্তটাই দেশের সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শিক্ষাব্রতীদের দলাদলিতে যোগ দেওয়া কর্তব্য নহে। স্কটীশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ টেলর ঐ সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। শিক্ষকগণের মধ্যে প্রায়ই যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা দূর করিতে না পারিলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করা যাইবে না এবং শিক্ষিতগণের মধ্যেও শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না।

দারিয়াপুরে বঙ্কিম-মেলা—

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মধ্যে দারিয়াপুর একটি ছোট গ্রাম—কাঁথি সহর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে। ঐ স্থানের নিকট রসুলপুর নদী ও গঙ্গানদী সাগরে মিশিয়াছে। খড়্গপুর হইতে কাঁথি ৫৮ মাইল মোটরে বা বাসে যাওয়া যায়—কাঁথি হইতে দারিয়াপুর ও মোটরে যাওয়া যায়—তবে সব রাস্তা এখনও পাকা হয় নাই। দারিয়াপুর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল—এখন বহু লোক তথায় যাইয়া চাষ-বাস আরম্ভ করিয়াছে। সমুদ্রের ধার দিয়া যে বিরাট বাঁধ আছে, তাহার উপর দিয়া সাধারণ লোকের যাতায়াতের পথ। ঐ স্থানে পূর্বে একটি ডাক বাংলা ছিল—সাহিত্যসম্রাট ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ডাকবাংলায় বসিয়া তাঁহার অমর-সাহিত্য কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। দারিয়াপুরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে—বিরাট মন্দির—অনাদিলিঙ্গ শিব—কত শত বৎসরের প্রাচীন তাহার কোন স্থিরতা নাই। ঐ স্থানে গত ১৩২৭ সাল হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান দিবসে বঙ্কিম-মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে মেলা সর্বত্রই দেখা যায়—সে সব মেলার সহিত স্থানীয় দেবদেবীদের পূজা হয়। সাহিত্যিকের নামে, জাতীয়তার পুরোহিত ঋষির নামে মেলা আর কোথাও হয় কিনা জানি না। গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই কৃষিজীবী। উচ্চ বিদ্যালয় ৫ মাইল দূরে—যে ডাক বাংলায় বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা রচনা করেন, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই স্থানেই বর্তমানে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়াছে। বিধান সভার সদস্য শ্রীযুত হরিপদ বাগুলী মহাশয়ের আমন্ত্রণে গত ২৫শে চৈত্র তাঁহার সহিত কাঁথি যাইয়া অপর সদস্য উকীল শ্রীনটেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। বাগুলী মহাশয় দারিয়াপুরের অধিবাসী—বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট মনসাদ্বীপে থাকেন। হরিপদবাবুর অগ্রজ শ্রীশিবনারায়ণ বাগুলী দারিয়াপুরেই বাস করেন—তিনি বঙ্কিম মেলার সম্পাদক। হরিপদবাবু ও নটেন্দ্রবাবু ছাড়াও শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস এম-এল-এ আমাদের সহিত দারিয়াপুরে গিয়াছিলেন—অপর এম-এল-এ শ্রীরামেশ্বর পাণ্ডার সহিত কাঁথিতে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তরুণ লেখক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও কলিকাতা হইতে আমাদের সাথী হইয়াছিলেন। মেলার স্থান বিরাট—বহু অস্থায়ী দোকান ঘর নির্মিত হইয়াছে। মধ্যস্থানে প্রকাণ্ড মণ্ডপ,—তথায় সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। যাত্রা, গান, প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যহ লোক আকৃষ্ট করা হয়। সভায় প্রায় এক সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল—গ্রাম্য সভার পক্ষে অসাধারণই বলিতে হয়। ঐ অঞ্চলে বৎসরে এই একটি মাত্র মেলা হয়—কাজেই মেলা স্থানে ক্রয় বিক্রয় ভালই হইয়া থাকে। কয়েক দিন ধরিয়া মেলা হয়। সরকারী কৃষি ও শিল্পবিভাগ তথায় প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ও প্রচার বিভাগ হইতে চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৩৬০ সালের হিসাবে দেখিলাম—মেলার জন্য প্রায় ১৪ শত টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কয়েকটি গ্রামে ২১০ টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। একটি গ্রামে, একজন সাহিত্যিকের স্মৃতিতে এই মেলার অনুষ্ঠান সত্যই সকলের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা। এই ভাবে যাঁহারা গ্রাম্য সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী, তাঁহারা দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা দেশের সর্বত্র এইরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রত্যাশা করি।

নয়া দিল্লীতে এসিয়া সম্মেলন—

গত ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত কয়েক দিন নয়া দিল্লীতে এসিয়ার ১৪টি দেশ হইতে সমাগত প্রায় দুইশত প্রতিনিধি দল-নিরপেক্ষ এসিয়া সম্মেলনে সমবেত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে পঞ্চশীল এসিয়ার শান্তির এক নূতন সনদ। তাঁহারা এসিয়া ও বিশ্বের সমস্ত দেশের গভর্ণমেণ্টসমূহকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন এই নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। শ্রীজহরলাল নেহরুর চেষ্টায় এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহার পর ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম, চীন প্রভৃতির নিমন্ত্রণে বান্দুংয়ে যে সম্মিলন হইল, তাহাতে এসিয়া ও আফ্রিকার

প্রায় সকল দেশ যোগদান করিয়াছেন। বান্দুংয়ের সাফল্য পৃথিবীতে নূতন ভাবধারার প্রচার দ্বারা পৃথিবীকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিল।

রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থার জন্য রুশিয়া ১৯৪২ সালে বৃটেনের সহিত এবং ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। সম্প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রুশিয়া ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে পশ্চিম জার্মানীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় রুশিয়া তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছে। রুশিয়ার এই ব্যবস্থা সমগ্র জগতের অন্যান্য রাজ্য কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ যখন এসিয়া ও আফ্রিকার প্রায় ২৯টি রাজ্য সহ-অস্তিত্বের দাবীতে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণে উৎসুক, তখন রুশিয়া যদি পশ্চিম জার্মানীকে চিরকাল অনুন্নত রাখার কথা চিন্তা করে, তবে কোন সভ্য দেশই রুশিয়ার ব্যবস্থাকে সমর্থন করিবে না। রুশিয়া একাই কি তবে পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইবে?

প্রমথনাথ বসুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ১৩ই বৈশাখ বুধবার কলিকাতা যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বর্গত ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর এক ধাতব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রমথনাথ বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, গ্রন্থকার ও সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি খনিজ দ্রব্য আবিষ্কারে আজীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই টাটা কোম্পানীর বিরাট লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। যাদবপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার মত একজন বিজ্ঞানী সাধকের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্য ব্যক্তিরই পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও আদর্শ বর্তমান যুগের লোকের অনুকরণযোগ্য।

রেল এঞ্জিন বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা—

পশ্চিমবঙ্গে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানায় বহু রেল-এঞ্জিন তৈয়ার হইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিশততম এঞ্জিনখানির নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল। গত ২৭শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ চিত্তরঞ্জনে আসিয়া ঐ এঞ্জিনখানি চালু করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন কারখানায় যে ভাবে নূতন এঞ্জিন নির্মিত হইতেছে তাহার ফলে এঞ্জিন সম্বন্ধে ভারত শীঘ্রই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে এবং ভারত হইতে উন্নত ধরণের এঞ্জিন বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। বিদেশ হইতে রেল-এঞ্জিন আমদানী করিতে ভারতকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইত—এখন বিদেশে এঞ্জিন রপ্তানীর ফলে টাকা দেশে আসিবে। এঞ্জিনের কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পাইবে ও ফলে ভারতের বেকারসমস্যা ক্রমে দূর হইবে।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনমূলক কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করিয়াছেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীপুনাম চাঁদ জৈন ও শ্রীবিজুভাই আঞ্চলিক সংগঠক নিযুক্ত হইয়াছেন। আরও ৩ জন আঞ্চলিক সংগঠক শীঘ্রই নিযুক্ত করা হইবে। তাহা ছাড়া সংসদ সদস্য অধ্যাপক এন-আর-মালকানীর অধীনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দপ্তরে গঠনমূলক কর্ম বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই সকল আঞ্চলিক সংগঠকদের দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য রাজ্য কংগ্রেসসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস সংস্থার 'এখন প্রধান কাজ দেশে গঠনমূলক কার্য্য পরিচালিত করা। সকল কংগ্রেস-নেতা ও কর্মীকে নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর বার বার সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীধেবরের নেতৃত্বে ও নূতন ওয়ার্কিং কমিটীর পরিচালনায় গঠনমূলক কাজ দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিবে ও তাহার ফলে উন্নত হইবে।

কলিকাতার নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২৫শে মার্চ সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কর্পোরেশনের কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। অলডারম্যান ডাঃ অমর নাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হন—উভয়েই কংগ্রেস দলভুক্ত। বিরোধীদল অপর ২ জনের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কিন্তু ভোটাধিক্যে কংগ্রেস প্রার্থীরাই নির্বাচিত হন। মেয়র সতীশবাবু স্কটীশচার্চ কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী, রেজিষ্ট্রার, কলেজ সমূহের ইন্সপেক্টার ও ট্রেজারার ছিলেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৬১ বৎসর। ডেপুটী মেয়র ডাক্তার মুখোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক—বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর। তিনি কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী। তিনি যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারই উৎসাহে কর্পোরেশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও গ্রহণ করিয়াছে। আমরা উভয়ের নির্বাচনে তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই ও কামনা করি তাঁহাদের দ্বারা কলিকাতা সমৃদ্ধতর হউক।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সাহায্য—

১৯৫৫ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ এই তিন মাসে ভারত গভর্ণমেন্টের পুনর্বাসন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী ১২ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পরিবারকে প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিয়াছেন। সহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য ৭ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের ৬৩০ উদ্বাস্তু পরিবার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা পাইয়াছে। সহরাঞ্চলের প্রায় ৩ শত উদ্বাস্তু পরিবার ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ব্যবসা ঋণ পাইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে ৪৪৬৯ উদ্বাস্তু কৃষি পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ৪২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পাইয়াছেন। এই ভাবে বহু অর্থ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বাবদ ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু উদ্বাস্তুর সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের সকল আবেদনকারীকে ঋণ দান করা কোন দিন সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার

কলিকাতায় উপস্থিতির ফলে এখন সত্বর সকল অর্থ ব্যয় করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কলিকাতায় পতিতার সমস্যা—

সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্যগণ সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া পতিতাবৃত্তি, শিশু অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। লেডী রমা রাও ঐ দলের নেত্রী। ডাক্তার মৈত্রেয়াবসু, শ্রীযুক্তা বিমলাবাই দেশমুখ, শ্রী ভি-বি-শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কে-দত্ত (সম্পাদিকা) ঐ কমিটিতে আছেন। বোম্বাই সহরে পতিতার সংখ্যা মোট প্রায় ৯ হাজার। কলিকাতার পুলিস কমিটীকে জানাইয়াছেন—কলিকাতায় ৪২৪৬ জন পতিতা আছে, পতিতা বৃত্তি বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন আইন পরিবর্তন করিয়া নূতন আইন প্রণয়নের জন্যই কমিটী তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিতেছেন। স্বাধীন দেশের পরিচালকগণকে বহু নূতন বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ একটি গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

পরলোকে প্রিন্সিপাল এস-কে-সেন—

কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ডাঃ এস-কে-সেন গত ১৪ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় তাঁহার হাজরা রোডস্থ বাসভবনে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন সেন ১৮৯২ সালে খুলনার সেনহাটীর সেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—১৯১৬ সালে এম-বি পাশ করিয়া ১৯১৮ সালে তিনি আর-জি-কর মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন এবং বিলাতে যাইয়া ডি-পি-এচ ও এল-এম ডিগ্রী লইয়া আসেন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন ক্রীড়ামোদী ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এম্বুলেন্স কোরের সম্পাদক ছিলেন।

শিবচন্দ্র দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ১লা মে রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কোন্নগর (হুগলী) হাইস্কুলে উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত শিবচন্দ্র দেবের আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ডাক্তার রায় তাঁহার ভাষণে বাঙ্গালার পূর্ব গৌরবের বর্ণনা করিয়া বলেন—বর্তমানে বাঙ্গালার গৌরব কিছু কমিলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে বাংলা আবার তাহার পূর্বগৌরব ফিরিয়া পাইবে ও বাংলাদেশে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে শিবচন্দ্র দেবের চিতাভস্ম শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মারফত যথাস্থানে রক্ষা করা হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠার এত শত বৎসর পরে স্কুলে প্রতিষ্ঠাতার মর্মরমূর্তি স্থাপিত হওয়ায় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। বর্তমানে দেশবাসীর তাঁহার জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য।

আইন বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ—

দুস্থ ব্যক্তিদের মামলার ব্যাপারে তাহাদের সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি "লিগাল এড এণ্ড এডভাইস সোসাইটী" আছে। সম্প্রতি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ৬০ হাজার টাকা মূল্যের পাঠাগার ঐ সমিতিকে দান করিয়াছেন। সমিতির কোন নিজস্ব গৃহ নাই। সমিতির কর্মীরা এ বিষয়ে সম্প্রতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত দেখা করিলে তিনি রাজভবনের একটি ঘর ঐ সমিতিকে দিতে সম্মত হইয়াছেন। গত বৎসর সমিতি বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্বামী পরিত্যক্তা হিন্দু স্ত্রীর ভরণপোষণ, গৃহ-উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে বহু দুঃস্থ ব্যক্তির মামলা চালাইয়াছেন। কাজেই সমিতি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা দাবী করেন। সমিতির কথা প্রচারিত হইলে বহু দুঃস্থ ব্যক্তি সমিতির সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

৬০ হাজার টাকা মূল্যের সুপারি—

স্থল শুল্ক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এন-এম-রায় চৌধুরীর পরিচালনায় উক্ত দপ্তরের কর্মচারীরা গত ২১শে এপ্রিল বালী (হাওড়া) রেল ষ্টেশনে ৬০ হাজার টাকা মূল্যের সুপারি পাইয়া তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ঐ মাল বেআইনিভাবে সীমান্ত পার করিয়া বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছিল। এইভাবে বহু মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। গাঁজা, আফিম প্রভৃতি নেশার জিনিষ ত প্রায়ই ধরা পড়ে। কাপড়, সুপারি প্রভৃতি বহু মালও এইভাবে চোরাই কারবারে ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ এইরূপ মালের খবর না দিলে প্রায়ই পুলিসের পক্ষে ধরা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন—

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন প্রচার ও প্রসারের জন্য রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড কাজ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গত ১০ই এপ্রিল ইউনিয়নের বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আগামী বৎসরের জন্য শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি, শ্রীতারাপদ চৌধুরী সহকারী সভাপতি ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কার্য্যকরী সদস্য হইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীদুর্গাপদ চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। বর্তমানে বাঙ্গালাদেশে নূতন করিয়া সমবায়ের কথা প্রচার যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সমবায় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, উপমন্ত্রী শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, সমবায় রেজিষ্ট্রার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের বিশ্বাস, সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্য লাভ করিয়া ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতায় নগর সংকীর্ত্তন—

গত দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মদিবস পালনের জন্য কলিকাতায় বিরাট নগর সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের পরিচালনায় নগর সংকীর্তনের দল কলিকাতা বাগবাজার অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়া উত্তর কলিকাতায় কয়েকটি বড় বড় রাজপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যামস্কোয়ারে গিয়া এক সভায় মিলিত হইয়াছিল। বর্তমান ধর্মহীন যুগে ধর্ম-বিমুখ মানুষকে এইভাবে হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। সেদিন উত্তর কলিকাতার প্রায় সকল অধিবাসী এই বিরাট দলে যোগদান করিয়া কীর্তনের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। তরুণকান্তিও এই অল্প বয়সে দেশের সর্বত্র নগর সংকীর্তনে নেতৃত্ব করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

অমরনাথ দর্শন

শ্রীমহিতকুমার বসু

সেই ছেলেবেলা থেকে কাশ্মীরের কথা এত শুনেছি যে, মনে একটা সাধ হয়েছিল, কাশ্মীর দেখতে হবে—কিন্তু এতদিন সাধ্য ছিল না ; কারণ, কাশ্মীর যাওয়ার খরচ অনেক। এ বার যখন রেলওয়ে থেকে কন্‌সেসন দেবার খবর পেলাম তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম কাশ্মীর যাবই। সহধর্ম্মিণী পিকু শুনে আনন্দে উৎসাহিত। সবে বোনাস্ পেয়েছি আটশো টাকা ; দেখলুম, দু'জনের রিটার্ণ টিকিট কিনে আমাদের থাকবে চারশো আশি টাকা—একমাসের ছুটি নিয়ে ১৩ই জুন তুফান্ এক্সপ্রেসে রওনা হলুন। রিটার্ণ টিকিট তো আছেই, তাই টাকা ফুরিয়ে গেলে কলকাতার পথে ট্রেণে চেপে বসবো। ভাবনা কি? আমাদের টিকিট হচ্ছে দিল্লী হয়ে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ট্রেনে, তার পর আড়াইশো মাইল সরকারী বাসে।

ট্রেণে চলেছি। যত গরম তত ধূলো—নাকে ধূলো ঢুকে হেঁচে হেঁচে প্রাণ অস্থির। তবে কাশ্মীর যাচ্ছি এই আনন্দে ট্রেণ চলার তালে তালে মনও যেন নেচে নেচে উঠছে। পরের দিন বিকেল ৫টায় দিল্লীতে পৌছুলুম। সেখানে স্নান ও রাত্রির আহার সেরে নিয়ে কাশ্মীর মেলে চেপে বসলুম, ট্রেণ ঠিক ৮টায় ছেড়ে দিল—রাত্রিতে ঘুম ভালই হ'ল। ভোর ৬টায় পাঠানকোটে পৌছে গেলুম। ষ্টেশনটি বড়, স্নান করার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে—সেখানে কেলনারে ভাল করে খেয়ে নিয়ে বেলা ৯টায় রওনা হলুম—সরকারী ডিলুক্স বাসে। বাসে ৪৪ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মালের ভাড়া লাগে না, তার উপর মণে ৪ টাকা হিসাবে ভাড়া লাগে—আমাদের মালের জন্য আড়াই টাকা দিতে হল। সুন্দর রাস্তা। আমরা চলেছি। চারিদিকে মিলিটারী ; মনে হচ্ছে, যেন আমরা আবার সেই ১৯৪০-১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এসেছি। মাইল দশ দূরে চেক্ পোষ্ট ; সেখানে বাস থামলো। কাশ্মীরী পুলিস আমাদের 'পারমিট" দেখল। ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হয়ে আমরা বেলা সাড়ে বারোটায় এলুম জম্মু। জম্মু একটি হিন্দুপ্রধান স্থান—সহরটি বেশ বড়। আমাদের বাস সোজা ডাক্‌বাংলোয় গিয়ে থামলো। এখানে খাওয়ার বেশ ভাল বন্দোবস্ত আছে—আমরা গরম ভাত, ডাল, মাংস এবং সঙ্গে যে আম ও মিষ্টি ছিল তাই খেলুম। তা'রপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে বেলা আড়াইটায় রওনা হলুম। এ বার আমরা উঁচুতে উঠছি—রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। খুব ভাল লাগছে। পাশে নিচে ধাপে ধাপে ফেলে আসা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। ৬ হাজার ৮শ' ফিট উঠে "কুদ" বলে এক জায়গায় এলুম—ছোট্ট একখানি গ্রাম কয়েকটি রেষ্টরেণ্ট আছে—শুনলুম, এখানে শেখ আবদুল্লাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। চা খেয়ে আধঘণ্টা পরে রওনা হলুম। এবার আমরা নামতে আরম্ভ করেছি প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট নেমে এলুম। আবার চড়াই—এ বার প্রায় তিন হাজার ফিট উঠে "বানিহাল" (৫ হাজার তিনশ ফিট উঁচু) এলুম রাত্র ৯টায়। সেখানকার ডাক-বাংলোয় ঘর পাওয়া গেল এবং গরম ভাত মাংস সবই পেলুম। এইখানে প্রথম আমরা গরম জামা গায় দিলুম ও রাত্তিরে লেপ গায়ে দিয়ে শুতে হ'ল। পরের দিন সকালে উঠে গরম জলে স্নান ক'রে, "ব্রেকফাষ্ট" খেয়ে পৌনে ৮টায় সেখান থেকে রওনা হলুম। অপূর্ব্ব দৃশ্য চারিধারে। আমরা আবার উঠ্‌ছি ; প্রায় ৯ হাজার ফিট উচ্চতায় এসে সুড়ঙ্গ পেলাম। শ্রীনগরের রাস্তায় এরই উচ্চতা সবচেয়ে বেশী! এখানে এসে প্রথম বরফ দেখতে পেলুম। তারপর আমরা আবার নামতে আরম্ভ করি। বেলা সাড়ে এগারটায় "কাজীগুণ্ড" বলে ছোট্ট একটা চটিতে এসে রুটি মাংস খেয়ে নিলুম। বানিহাল সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আমরা 'ভেরিনাগ' বলে একজায়গায় গিছলুম। সেখানে একটি আটকোনা সরোবর আছে;

অমরনাথের পথে

প্রথম তুষার সেতু—চন্দনবাড়ির পশ্চাৎভাগের দৃশ্য

সেই সরোবর থেকে ঝিলাম নদীর উৎপত্তি।—এখানে সুন্দর বাগান রয়েছে এবং রংবেরং নানা ফুল ফুটে আছে। বেলা আড়াইটের সময় শ্রীনগরের বাসষ্টাণ্ডে পৌঁছে গেলুম—এখানকার উচ্চতা হচ্ছে ৫২০০ ফিট। টাঙ্গা নিয়ে সোজা গেলুম "ভিজিটার ব্যুরো"র অপিসে—সেখানকার ডিরেক্টার আমাদের হাউসবোটে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন—ঝিলাম নদীর উপর।

সুন্দর হাউসবোট—দু'টি শোবার ঘর, একটি ড্রইংরুম ও একটি খাবার ঘর। এখানে ৫ দিন ছিলুম—আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম—দিনের বেলায় একটি গরম সোয়েটার গায়ে দিলেই চলে, আর রাত্তিরে লেপের মধ্যে বেশ আরাম। খাওয়াও প্রচুর; দিশী বিলিতি সবই তৈরি করে। এখানে মাংস ও মুরগী প্রচুর, মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া দুধ মাখন অপর্য্যাপ্ত। এখানকার চাল কি সুন্দর; অথচ—খুবই সস্তা। প্রত্যেক হাউসবোটের সংগে ছোট্ট একটি নৌকা থাকে যাকে ওরা বলে "সিকারা"—তা'তে ঝিলাম নদীর উপর ও "ডাল" লেকে খুব ঘুরেছি। জলের উপর আছি—চারিদিকে পাহাড়—জ্যোৎস্নারাত মনের মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ
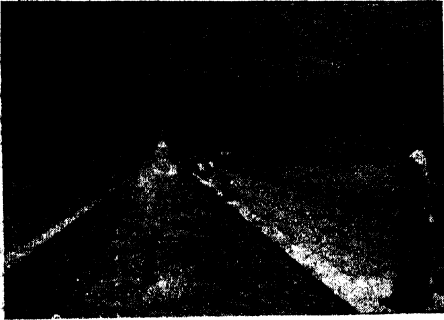
নিশাদবাগ—শ্রীনগর

দিচ্ছে যেন স্বপ্নলোকের মায়াপুরী। শ্রীনগরে সম্প্রতি একটি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেখানে অবৈতনিক পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন বক্তৃতা হয়—যথেষ্ট লোক-সমাগম হয়; ঠাকুরের নামে লোক ত আসবেই। এই পাঁচ দিনে এখানকার যা' যা' দ্রষ্টব্য প্রায় সবই দেখে ফেললুম—যথা—শঙ্করাচার্য্যের মন্দির, ডাল লেক, নেহরু পার্ক, শালিমার বাগ, ইত্যাদি।

শ্রীনগর থেকে ৪০ মাইল দূরে গুলমার্গ। এর উচ্চতা ৯০০০ ফিট। শ্রীনগর থেকে বাসে ট্যান্‌মার্গ পর্য্যন্ত আসতে হয়, তারপর হেঁটে অথবা ঘোড়ায় তিন মাইল পথ চড়াই গেলে গুলমার্গ। আমরা ২১শে জুন সকাল ৯টায় শ্রীনগর ছেড়ে সাড়ে ১০টায় ট্যানমার্গে এলুম; সেখানে ওয়েটিংরুমে গিয়ে পিকুকে শাড়ী ছেড়ে প্যাণ্ট পরতে হ'ল; কারণ, এ বার ঘোড়ায় চড়তে হবে। এক কাপ করে কফি খেয়ে আমরা ঘোড়ায় রওনা হলুম—সে এক নতুন রকম অনুভূতি। এক ঘণ্টা পরে গুলমার্গে "টুরিষ্ট হোটেলে" পৌঁছুলুম। সুন্দর হোটেলটি, ব্যবস্থা চমৎকার—আর দোতলার ঘর থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব্ব। খেয়েই ঘোড়া নিয়ে খিলানমার্গ ঘুরে এলুম—এটি আরও হাজার দুই ফিট উঁচুতে—এখানে তাঁবু খাটিয়ে যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেষ্টুরেণ্ট খোলা হয়েছে। সেখানে চা ও ডিমসিদ্ধ খাওয়া গেল। ফেরার পথে শিলাবৃষ্টি পেলুম—পাথরের রাস্তা—খুব উৎরাই তাই গাছের নিচে দাঁড়াতে হ'ল—যদিও ভেজা থেকে রেহাই পেলুম না। ঠিক হ'ল পরের দিন ভোরে খিলনমার্গ হয়ে আরও উঁচুতে এলাগাথার বলে এক জায়গায় যেতে হ'বে—অবশ্য যদি আবহাওয়া ভাল থাকে। এখানে বরফের হ্রদ আছে। গুলমার্গে রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা ছিল, লেপের উপর কম্বল চাপাতে হয়েছিল।

ঘড়ির alarmএ ভোর সাড়ে ৫টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল—রাত্রিতে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল; তবে সকালটা পরিষ্কার। সঙ্গে একজন Guide অর্থাৎ পথ দেখাবার লোক নিয়ে আমরা বেলা ৮টায় দু'জন দু'টি ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলুম—হোটেল থেকে আমাদের লাঞ্চ খাবারের বাক্স দিয়েছিল, সেটা গাইডেরই হাতে। প্রায় হাজার দশ ফুট উঁচুতে এসে আমাদের ঘোড়া ছেড়ে দিতে হ'ল; কারণ, রাস্তা খুব চড়াই হেঁটে উঠ্‌তে

শেষনাগ—চতুর্দিক তুষারে সমাচ্ছন্ন

হ'বে মাইল তিনেক। এই তিন মাইল উঠ্‌তে প্রাণ যায় আরকি—দম একেবারেই নেই—নিঃশ্বাসের কষ্ট হ'তে লাগল। পিকু বেচারীকে শেষ আধ মাইল Guideএর পিঠে চড়েই উঠতে হয়েছিল। উপরে পৌঁছে দেখি, বিরাট বরফের সরোবর, আর কি দারুণ ঠাণ্ডা আর ঝড়ো হাওয়া—সঙ্গে সঙ্গে কোন রকমে পরোটা, ডিমের ডালনা যা' ছিল, খেয়ে নিয়ে নামতে শুরু করলুম। এই যে বরফের সরোবর এটা হাজার চার ফিট নীচে নেমে গেছে।—এখানে এক মজার ব্যাপার হ'ল। গাইড বল্লে, হেঁটে এতটা পথ নামতে সময় ও সামর্থ্য যথেষ্ট লেগে যা'বে—তার চেয়ে বরং বরফে উবু হয়ে বসে "Ski অথবা "stide" করে মিনিট দশেকের মধ্যে নীচে নেমে যাবো। দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় চেপে গেলো—গাইড গাছের ডাল পাতা দিয়ে দড়ি বেঁধে একটা আসনের মত তৈরী করে তা'র উপর পিকুকে বসিয়ে টানতে লাগ্‌ল, আর আমি ঐ slide করতে গিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে পড়ে নিঃশ্বাসের এত কষ্ট সুরু হ'ল যে কোন রকমে হাত পা বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে আটুকে বসে রইলুম—মনে

হ'ল আর বাঁচবো না। গাইড আমার অবস্থা দেখে বল্ল আর slide করে দরকার নেই। আমরা ধারে এসে পাথরের পথেই নামতে সুরু করলুম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে ঘোড়ার আস্তানায় পৌঁছে যেন ধড়ে প্রাণ এল।—তখন আবার কি মেঘ এসে গেল! সামনে দু'হাত দূরের ঘোড়াকে আর দেখতে পাই না, কিন্তু ঘোড়া ঠিক নিয়ে চলেছে—সাড়ে বারটার সময় আমরা গুলমার্গে পৌঁছে গেলুম। সেখানে হোটেলে এক কাপ চা খেয়ে তক্ষুনি রওনা হয়ে রাত সাড়ে ৮টায় শ্রীনগর ফিরে এলুম।

এবার ঠিক হ'ল, শ্রীনগরে একদিন থেকে পাহালগাম যা'ব। মনে ইচ্ছা, এতদূর যখন এসেছি, যদি অসম্ভব না হয় তা'হলে অমরনাথজী দর্শন করে যা'ব। কিন্তু শ্রীনগরে এসে শুনলুম যে, ৭।৮ই জুলাইয়ের আগে অমরনাথ যাওয়া যাবে না। যাই হ'ক ২৪শে জুন সকাল ৯টায় শ্রীনগর ছেড়ে বেলা সাড়ে ১২টায় আমরা পাহালগামে পৌঁছলুম—এটা হচ্ছে শ্রীনগর থেকে ৫৯ মাইল দূরে আর এর উচ্চতা ৮ হাজার ফিট্।

পাহালগাম

আমরা "পাহালগাম হোটেলে" উঠেছি।—এখানকার দৃশ্য আবার আর এক রকম চমৎকার। চারিদিকে পাহাড় খুবই কাছে—পাহাড়ের চূড়ায় বরফ—কোলে পাইনের বন আর তার নীচে দু'টি নদী—Lidder valley আর Sheshnag গর্জন করতে করতে তীরবেগে ছুটে চলেছে। এখানে দেখলুম, বহু লোকের সমাগম—হোটেলে জায়গার অভাব—তাঁবু ভাড়া ক'রে অনেকে তাঁবুর মধ্যে বাস করছে। এ জায়গাটা শ্রীনগরের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা এবং হোটেলের ভাড়া শ্রীনগরের হোটেল ভাড়ার তুলনায় অনেক বেশী। এখান থেকেই অমরনাথ যেতে হয়—ঘোড়ায় অথবা হেঁটে। এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন, এখনও কেউ অমরনাথ যাচ্ছেন না—অন্ততঃ দিন পনেরো পরে যেতে হ'বে। সাধারণতঃ গুরু পূর্ণিমা (আষাঢ়) থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা এই একমাস যাত্রীদের ভীড় খুব বেশী হয় এবং তখন সরকার যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কিছু বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আমাদের অত দিন থাকা চলবে না—প্রধান কারণ, এখানে এতদিন থাকতে হ'লে খরচ অনেক—ভাবলুম, অমরনাথ দেখা ভাগ্যে নেই।

ওখানকার Visitors' Bureauর অফিসার শ্রীগিরিধারিলালের সঙ্গে দেখা ক'রে বললুম যে, আমাদের বড় সখ অমরনাথজীকে দর্শন করব; আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। তিনি বললেন, আমাদের অমরনাথ যাওয়ার বন্দোবস্ত সব করে দেবেন, তবে আর দিন তিনেক পরে, অন্ততঃ রবিবারের আগে নয়। এর মধ্যে উনি সমস্ত বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। সাধারণতঃ ৫ দিন লাগে ঘোড়ায় যেতে আসতে এবং এই পাঁচদিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। আমরা যা'ব শুনে আরও ক'জন বাঙ্গালীও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ঠিক হ'ল, আমরা ন'জন (আমরা দু'জন, আর একজন সস্ত্রীক ও আরও ৫ জন)—রবিবার ২৭শে জুন সকাল সাড়ে ৭টায় রওনা হ'ব; ন'জন ন'টি ঘোড়ায় আর ২টি ঘোড়া থাকবে মাল নিয়ে যাবার জন্য। জামা-কাপড় প্রচুর গায়ে দিয়ে যেতে হবে—এ ছাড়া বিছানা কম্বল লেপ ইত্যাদি। পথে
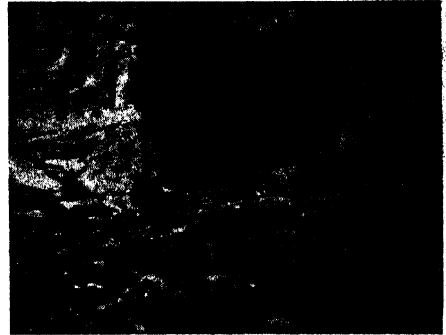
অমরনাথ-পর্ব্বতের গহ্বর (উচ্চতা—১৬৪২৭ ফিট)

জামা কাপড় আর বদলাবার দরকার নেই—তাই সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা নিলুম, প্রচুর পাঁউরুটী, মাখন, আলু সিদ্ধ, ডিম সিদ্ধ, বিস্কুট এবং চা, চিনি ও কনডেনস্ড্ মিল্ক; এ ছাড়া উনুন, কাঠ কয়লা, লণ্ঠন। আবার মাথার টুপি, ওয়াটারপ্রুফ, হাতের দস্তানা সব ভাড়া পাওয়া যায়। হাতে এক একটা লম্বা লাঠি এক ধারে লোহার গোঁজ লাগানো এবং পায়ে ঘাসের জুতা—যেটা চামড়ার জুতোর উপরে পরা যায়। এগুলি বরফের উপরে হাঁটার জন্য প্রয়োজন। চোখে 'গগল্‌স্' এটারও প্রয়োজনীয়তা আছে বরফের দেশে।

ভোর ৫টায় উঠেছি—সুন্দর পরিষ্কার দিন। তবে আজ অমরনাথের পথে যাত্রা করবই। বাক্স বিছানা সব গুছিয়ে ফেললুম—হোটেলের বিল চুকিয়ে ম্যানেজারের জিম্মায় বাক্সগুলি রেখে কেবল বিছানা নিয়ে আমরা "জয় অমরনাথ" বলে বেরিয়ে পড়লুম সকাল সাড়ে ৮টায়। গিরিধারীলাল সকাল থেকে ছোটাছুটি ক'রে সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমাদের রওনা ক'রে দিলেন। প্রথম মাইল দেড়েক সমতল স্থানে রাস্তা,

তারপর চড়াই বেশ উঁচুতে উঠ্‌ছি। ডানদিকে শেষনাগ নদী উদ্দাম-বেগে ছুটে চলেছে, আর বাঁদিকে উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় গাছ।—প্রথমটা রাস্তা বেশ চওড়া, তারপর সরু হয়েছে—এক এক জায়গায় হঠাৎ খুব সরু সেখানে যেতে বেশ ভয় করে! তিন ঘণ্টা অগ্রসর হবার পর এক জায়গায় আমরা বরফ পেলুম—বরফের উপর দিয়ে যেতে হ'বে—ঘোড়া চলার পথ ৭।৮ ইঞ্চি চওড়া, আর ১৫।২০০ গজ লম্বা। এবার এসে পড়লুম চন্দনবাড়ীতে। এখানে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম—এখানে ছোট ছোট কুঁড়ে সব আছে—রাত্রিযাপন করবার মত এবং ৪।৫টা হোটেল আছে সেখানে চা, রুটী, মাংস, সবই পাওয়া যায়। চা ও কিছু ডিম বিস্কুট খেয়ে আমরা রওনা হলুম—এখানেই প্রথম বরফের সেতু, (snow bridge) পেলুম—বিরাট হিমবাহ নেমে এসেছে আর তার তলা দিয়ে জলের স্রোত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এটা বেশ খানিকটা চওড়া, প্রায় ১২৫।১৫০ গজ পেরিয়ে গেলুম। এবার খুব চড়াই উঠ্‌ছি, রাস্তাটা এঁকে বেঁকে উঠে গেছে—প্রায় মাইল দুই এসে একটু সমতল জায়গা পেলুম। সেখানে কিছুক্ষণ

শেষনাগ হ্রদ

বিশ্রাম করা গেল। এখানে বড় বড় গাছ গোটা কয়েক আছে, আর এখান থেকে দূরের দৃশ্য অতি চমৎকার—সারি সারি উঁচু-নিচু পাহাড় আর তার উপর থেকে হিমবাহ (Glacier) নেমে এসেছে।

আমরা এবার নামতে সুরু করলুম—অনেক বরফ পেরিয়ে চলেছি—বরফের উপর দিয়ে যাবার সময় ভয় হয়, পাছে ঘোড়ার পা পিছলে যায়। এক একজায়গায় এত ফাঁপা যে ঘোড়ার পা বসে যায়, হঠাৎ উলটে যাবার দাখিল; এক একজায়গায় রাস্তা বড্ড সরু আর পাশেই দেখতে পাচ্ছি, ৩।৪ হাজার ফিট নীচু খাত, পড়ে গেলে কি অবস্থা! এখন লিখতে বেশ ভাল লাগছে; কিন্তু তখনকার অবস্থা,—ঘোড়ার পিঠে ব'সে আছি এক হাত লাগামে আর এক হাতে জিন ধরে আছি—মাঝে মাঝে চোখ বুজে ফেলছি আর মনে মনে "জয় রামকৃষ্ণ" বলছি। তখন এমন অবস্থা যে স্ত্রী এবং বন্ধুদের কি অবস্থা তা ভাববার উপায় নেই। এবার বিরাট এক জলাশয় দেখতে পেলুম—চাঁই চাঁই বরফ ভাসছে—জলের রং ফিকে সবুজ। পিছনে বিরাট পাহাড় হ'তে হিমবাহ নেমে এসেছে জলের ভিতর। এখান থেকেই শেষনাগের নদীর উৎস যে নদীটা এতক্ষণ দেখে এসেছি। যাক্ আর জলের উদ্দাম স্রোত দেখতে হ'বে না।

আমরা একেবারে বরফের রাজ্যে এসে পড়লুম। এই জায়গাটার নাম শেষনাগ। একে চটি বলাও চলে না; কারণ, কেবল গোটা কতক টিনের ছাতের কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই। পথে আমাদের আর যে সব যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তাঁরাও সব এসে পড়েছেন। আমরা একটা ঘরে ৯জন আস্তানা নিলুম। সেখানে ইতিমধ্যে আরও ৬জনের বিছানা পড়েছে। ঘরটি ১০´×৮´ ফিট এবং কাঠের মেজে। আমরা নিজের নিজের 'বর্ষাতি' বিছিয়ে হোল্ডল পেতে ফেললুম, কোন রকমে গায় গায় শোওয়া হবে এপাশ ওপাশ করা চলবে না। ঘোড়াওয়ালা রমজান তখনই উনুন জ্বালিয়ে চা তৈরী করে দিল—গরম চা ও রুটী মাখন প্রচুর পরিমাণে খাওয়া গেল। তিন চারটে ছোট ছোট চুল্লি (কাংরি) নিয়ে এসেছি; সেগুলিতে কাঠ কয়লার আগুন দিয়ে হাত পা সেঁকতে লাগলুম। ঘরের বাহিরে চারিদিকে বরফ কেবল বরফ। গাছ গাছড়া

অমরনাথজী

কোথাও দেখা যাচ্ছে না—ছোট্ট একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। তারই জল পান করলুম—বরফগলা জলে তৃষ্ণা কিন্তু মিটল না। রাত্রি সাড়ে ৮টায় সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে নামছেন তাঁর লাল আভা বরফের উপর পড়ে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছিল আমার লেখনীর ক্ষমতা নেই যে সে দৃশ্য প্রকাশ করে। সে এক অপরূপ রূপ, ভগবানের বিচিত্র লীলার এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। এবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসে জুতো খুলে সেই পোষাকেই লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। লেপের উপর দু'খানি কম্বল কিন্তু তবুও যেন শীত শানায় না—খুব ঐক-তানে গান চলেছে—উৎসাহ আমাদের প্রচুর—কাল ভোর সাড়ে ৫টায় রওনা হতে হবে।

ভোরে রমজান—ঘোড়ার গাইড ডেকে দিল—চা তৈরী।—মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ঝর্ণার কাছে এসে দেখি, মুখ ধোবার উপায় নেই, সমস্ত জলের ধারা কাচের মত জমে গেছে। ফিরে আসছি; দেখি, পিকু এক মগ গরম জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তা'তেই মুখ ধুয়ে ফেললুম—তখন ৬টা বাজে—দিনের আলো ফুটছে, চারিদিকে সাদা বরফ ঝক্‌মক্ করছে। রুটী মাখন খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম

—সারি বেঁধে এক লাইন ধরে আমাদের ঘোড়া এগিয়ে চলল—সাদা বরফের ওপর দিয়ে। একটু আধটু সবুজ ঘাস এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আর ছোট ছোট নীল ও হলদে ফুলও দেখতে পাচ্ছি—হলদে ফুলগুলি শুনলুম, ভয়ঙ্কর বিষাক্ত, ঘোড়াও তাতে মুখ দেয় না। এক এক জায়গায় বরফে বিরাট ফাটল ধরেছে; তা'র গভীরতা ২৫।৩০ ফিট; আর তা'রই পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। আবার কোথাও দেখছি, জল বয়ে যাচ্ছে বরফের তলা দিয়ে, দেখলে বেশ ভয় করে। প্রায় ১১টা বাজলে বরফের উপরের স্তর গলতে আরম্ভ করল; তাই পথ পিচ্ছিল হয়েছে—ঘোড়া মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছে, কিন্তু নিজেকে ঠিক সামলে নিচ্ছে। এক এক জায়গায় আমাদের নেমে হেঁটে যেতে হচ্ছে। হেঁটে যাওয়া আর এক বিষম ব্যাপার; কোথাও কোথাও ঘোড়াওয়ালার এক হাত দৃঢ়ভাবে ধ'রে আর এক হাতে লাঠি বরফে পুঁতে পুঁতে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হ'ল।

এবার এলুম আমরা পঞ্চতরণী বলে এক জায়গায়—এখানে ৫টা নদী পাশাপাশি বইছে—জল বিশেষ নেই—তবে চওড়া, সবশুদ্ধ প্রায় ৫০০। ৬০০ গজ হবে—ছোট্ট ছোট্ট কাঠের সেতু দু'তিনটের উপরে আছে। নদী পেরিয়ে এসে আমরা আধঘন্টা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করলুম। বেশ রোদ উঠেছে, খুব ভাল লাগছে—এখানে আবার রুটি, মাখন খাওয়া হল। আমরা অনেকটা নেমে এসেছি, এখানে চারিধারে অনেক সবুজ ঘাস আছে। ঠিক হ'ল, ফেরার পথে এখানে রাত কাটান হ'বে এবং ঘোড়াগুলি ঘাস খেতে পাবে। আমরা রওনা হলুম, এবার আবার চড়াই। খানিকদূর গিয়ে আমরা সবাই ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে সুরু করলুম—বরফের উপর দিয়ে উঁচু নীচু পথ হেঁটে চলেছি, দুধারেও উঁচু বরফ, পাশে পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। কোথাও কোথাও দেখছি, বিরাট গর্ত, বরফ নেই—ভিতরে জলের স্রোত—এখানে রাস্তা বলে কোনও পদার্থ নেই,—আমাদেরই পায়ের দাগ পড়েছে বরফের উপর।

প্রায় মাইল দেড়েক দূর থেকে দেখতে পেলুম, অমরনাথের গুহা—মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল, নতুন উৎসাহ এল—যদিও এই দেড়দিনে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বেলা দু'টায় গুহার কাছে পৌঁছে গেলুম, আস্তে আস্তে উপরে উঠে গুহার ভেতরে গিয়ে যা দেখলুম তাতে মন জুড়িয়ে গেল, মনে হল সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পেলুম—মন প্রাণ তৃপ্ত হল, জীবন ধন্য হ'ল। কি অপরূপ জিনিষ দেখছি—বিরাট বরফের শিবলিঙ্গ, তা'র ভিতর থেকে নীলকণ্ঠের নীলাভ আভা ঠিকরে পড়ছে। এখানে মন্দির নাই, পূজারী নাই, পাণ্ডা নাই—চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, বরফ কেবলই বরফ—কোথাও সবুজ ঘাসও দেখা যায় না। গুহার ভিতর ছোট্ট একটা ঝরণা, নাম অমরকুণ্ড—সেখানকার জল পান করলুম। আমাদের সঙ্গে পূজার কোনই উপকরণ ছিল না—ওখানেই দাঁড়িয়ে জপ করে নিলুম। এখান থেকে চলে আসতে মন চায় না, মনে হচ্ছিল, বড্ড আপনার জনের কাছে এসে পড়ছি। কিন্তু এক্ষুণি ফিরতে হবে। এখানে থাকবার কোনও বন্দোবস্ত নেই—রাত্রি হয়ে গেলে পথও চিনতে পারা যা'বে না—তাই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আধঘণ্টা পরেই গুহা থেকে নেমে এলুম—"জয় বাবা অমরনাথ" ব'লে চীৎকার করে উঠলুম। ঘোড়া তৈরী ছিল; তাতে চড়ে বসলুম।

বেলা সাড়ে ৪টার সময় পঞ্চতরণীতে এসে পড়লুম—মনে বিরাট সান্ত্বনা—কাশ্মীর আসা সার্থক হয়েছে। এখানে রাত্রি যাপন করতে হবে—এখানেও গোটাকতক চালা ঘর আছে—ইটের মেঝে, জানালা দরজার কোনও বালাই নেই, সব খোলা—ছাতে করোগেটেড টিন, তা'র খানিকটা উড়ে গেছে। এখানে দেখলুম, অনেক ছাগল ভেড়া চরছে—শুনলুম, পাহালগাম থেকে তিনচার মাসের খাবার নিয়ে কয়েকটা মেষপালক এখানে এসেছে ছাগল ভেড়া নিয়ে—এখানেই তিন চার মাস কাটাবে, তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে। শুনলুম, এই সময় ভেড়ার গায়ে লোম গজায়; তাই এত ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে এসেছে। আমরা ওখানে টাটকা পাঁঠার মাংস কিনলুম, ১৲ টাকা সের—দু' সের কিনে রমজানকে দিয়ে দিলুম, ওর কাছে লবণ মশলা ছিল, আর আমাদের সঙ্গে মাখন। রাত ৮টায় মাংস রান্না হল, আমরা বাইরে ঘাসের উপর (নদীর পারে) বসে তৃপ্তি সহকারে খেলুম। কাছেই বরফ-গলা ঝরণার জল ছিল; তাই পান করলুম। ছোট্ট একটি ঘরে আমরা জন ২৫ লোক শুয়ে পড়লুম—দিল্লী কলেজের ৫ জন ছাত্রছাত্রীও অমরনাথ দর্শন করে ফিরছে। তারাও রাত্রিতে এখানে থাকবে। আমরা ঠিক করলাম, পরদিন (২৯শে) ভোরে উঠে সোজা পাহালগাম যা'ব; রাস্তায় আর কোথাও দাঁড়াব না।

ভোর ৫টার সময় উঠেছি—রাত্রিতে তুষারপাত হয়েছে—আর ঘাসে সব ফ্রষ্ট (frost) জমে রয়েছে—যেখানে যেখানে জল ছিল সব জমে গেছে।—চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম—আগের দিনে ঘোড়ার ক্ষুরে যে রাস্তা তৈরী হয়েছিল সব মুছে গেছে তুষারপাতে।—খানিকটা উঠে ফের নামতে হলো—উৎরাই এত খাড়া যে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি উল্টে পড়লুম—"হোস্ হোস্ সাবধান" ব'লে চীৎকার করে ঘোড়াকে হুঁসিয়ার করছি আর "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়ছি। ঘোড়া ঠিক বিপদ বাঁচিয়ে চলেছে—আমরা সকাল ৯টার মধ্যে "শেষনাগে" পৌঁছে গেলুম। শেষনাগের হ্রদের জলের উপরটা প্রায় সবই জমে গেছে, দেখলুম। আমরা এখানে ১০ মিনিট বিশ্রাম ক'রে আবার চলতে সুরু করলুম; কারণ, আজকের মধ্যেই পাহালগাম পৌঁছতে হ'বে। সকাল থেকে জল কোথাও পাইনি—পিপাসা খুব পেয়েছে—পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি কিন্তু জল নাই—অনবরত বরফ চুষছি, গলা ভিজছে বটে কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না। অনেকটা নেমে এসে বেলা সাড়ে ১১টায় "চন্দন-বাড়ীর" কিছু আগে ঝর্ণার জল পেলুম—তৃষ্ণা মিটল।

১১টায় আমরা "চন্দনবাড়ী" পৌঁছে গেলুম—সেখানে দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম করা হ'ল—গরম গরম রুটী, ডাল ও পনিরের (ছানার) ডালনা খাওয়া গেল—খেতে খুব ভাল লাগলো। আমরা ভয়ের রাস্তাটা প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসেছি—মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে নেমে

চলেছি। বেলা সাড়ে ৩টার সময় নীচে নেমে এলুম—চড়াই অথবা উৎরাই আর নেই। হঠাৎ খুব বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—কোন পরোয়া নেই, ভিজতে ভিজতে চলেছি। বিকেল সাড়ে ৪টার সময় হোটেলে পৌঁছে গেলুম—ঘোড়া থেকে নেমে দেখি, শরীরে আর যেন শক্তি নেই। শ্রীগিরিধারিলাল হোটেলে উপস্থিত—তাঁকে কি ভাবে ধন্যবাদ দেব জানি না—তাঁর জন্যই আমাদের অমরনাথজী দর্শন হ'ল—কাশ্মীর আসা সার্থক হ'ল। "জয় বাবা অমরনাথ।"

দিল্লীতে ফিরে দেখি ব্যাগে আর কিছু নেই—কিন্তু পিকুর ইচ্ছে এতদূর যখন এসেছি তখন মথুরা বৃন্দাবন দেখে যা'ব। অগত্যা ৫০ টাকা ধার করতে হ'ল।—দিল্লীতে যা' যা' দ্রষ্টব্য দেখে, মথুরা বৃন্দাবন হয়ে ১৩ই জুলাই হাওড়ায় পৌঁছলুম। আমরা ঠিক চার সপ্তাহ আগে যাত্রা সুরু করেছিলুম এবং সেই অনুপাতে খরচ খুব বেশী হয়নি। দু'জনের সব শুদ্ধ ৮৫০৲ টাকা।

২১১টা খরচের তালিকা নীচে দিলুম—এ থেকে বোঝা যা'বে যে, যতটা শুনা যায় অমরনাথ দর্শন ততটা ব্যয়বহুল নয়। ঝিলাম নদীর উপরে যে হাউসবোটে আমরা চারজন ছিলুম তা'র দৈনিক চার্জ্জ ছিল ২৪৲ টাকা অর্থাৎ জন প্রতি ৬৲ টাকা—চার বেলা খাওয়া অপর্য্যাপ্ত, এছাড়া স্নানের গরম জল সব সময় পাওয়া যায় এবং ৩ জন চাকর সব সময় হাজির। গুলমার্গে "টুরিষ্ট হোটেলে" এবং "পাহালগাম হোটেলে" জন প্রতি দৈনিক চার্জ্জ হচ্ছে সাড়ে ৮৲ টাকা—অর্থাৎ দু'জনের ১৭৲ টাকা, সুন্দর ঘর, খাওয়া খুব ভাল এবং গরম জল সব সময় পাওয়া যায়। পাহালগাম থেকে অমরনাথ যাওয়া-আসা ঘোড়ার ভাড়া হচ্ছে সাড়ে ১৭৲ টাকা—মালের ঘোড়ারও একই দর। আমাদের দু' জনের ২টা ঘোড়া ও একটা মালের ঘোড়া এবং আনুসাঙ্গিক খরচ (যথা ঃ পথের খাবার, টুপি দস্তানার দাম, বর্ষাতি ভাড়া, বকশিস ইত্যাদি) সব মিলিয়ে হয়েছে ৭০৲ টাকা। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ যেতে হ'লে, বাসে ট্যানমার্গ পর্য্যন্ত জন-প্রতি ১৲ টাকা—ট্যানমার্গ থেকে ঘোড়ায় গুলমার্গ পর্য্যন্ত জনপ্রতি দেড় টাকা। শ্রীনগর থেকে পাহালগাম বাস ভাড়া লোক পিছু ৪৲ টাকা। ওখানে দুধ ও মাখন প্রচুর পাওয়া যায়—দুধের সের ৮ আনা ও মাখন ২৲ টাকা ৪ আনা পাউণ্ড।

অধরা

দিবাকর সেনরায়

কখনো মনে অজানা কোণে হয় তো তুমি এসেছো,
মানস-ঘন অন্ধকারে আলোর হাসি হেসেছো।
তোমাকে পাওয়া দুরূহ বড়ো, তাই—
নিজেরে তুমি লুকিয়ে ফেলো যদি বা খুঁজে পাই!
নীলাচলের সাগর তীরে,
উর্ম্মিমুখর সুনীল নীরে—
অরুণোদয়ের কোমল লালে যবে—
তোমারে খুঁজি, কখন দেখি ভুলেছি তোমা'
নুনিয়াদের সরল কলরবে।

খণ্ডগিরির শিখরে বসে তোমারে কভু চেয়েছি,
স্তব্ধতাকে চকিত করে তোমারি গান গেয়েছি;
হঠাৎ দেখি তুমি তো মনে নেই,
রৌদ্রালোকে দেখ্ ছি শুধু উদয় গিরিকেই!

দেব দেউলের বিশালতায় তোমারে কভু খুঁজেছি,
তুমি যে তখন নিকটে আছো—এটাও যেন বুঝেছি;
কিন্তু দেখি হঠাৎ কখন
তোমার কথা ভুলেছে মন,
বিশালতাই বিস্ময়েতে দেখ্ছে আঁখি চেয়ে—
তাই হলোনা তোমায় পাওয়া নিকটে এতো পেয়ে!
অন্ধকারে বিশাল বনে
এসেছো কভু সঙ্গোপনে,
যেমনি গেছি তোমারে সেথা ধরিতে—
আলোরকণা জোনাকিগুলো দৃষ্টিটাকে নিয়েছে টেনে ত্বরিতে!
বাহিরে তোমা' হলোনা পাওয়া হলোনা,
বিচিত্র এ রূপের মাঝে কেবলি তব ছলনা;
নিরাশ মনে ঘরেতে ফিরি সাঁঝে—
সকৌতুকে হাসিছো দেখি শিশুর হাসি-মাঝে!

নরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন চীন)

শীয়েন-ইয়েন যুগের কথা। ১১২৭ থেকে ১১৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে একটি গল্প-গাথা খুবই প্রচলিত ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। গাথাটির নাম 'যুগল-মুকুর'। এই গাথায় দুটি দম্পতির বিরহ-মিলনের যে করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা' কাল্পনিক নয়। ওয়াং-হো যুগের কুশাসনের ফলে যত দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক এবং শাসকবর্গের চাটুকার দলের হাতে দেশের শাসন রজ্জু গিয়ে পড়েছিল। জনসাধারণের দুঃখের অন্ত ছিলনা।

এই সময় আবার ন্যু-ছেন্ তাতার দলের অভিযান চীনের রাজধানীর বুকে ঝড়ের বেগে এসে পড়ে। সম্রাট হুই আর চীন্ দুজনকেই বন্দী করে তারা উত্তরাঞ্চলে চালান দেয়। কথিত আছে যে উত্তরাঞ্চলের রাজা কাং ও তাতাররা আসছে শুনে আমাদের যবন-আক্রমণ-ভীত রাজা লক্ষ্মণ সেনের মতো রাজ্য ছেড়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়েছিলেন।

রাজধানী ছেড়ে স্বয়ং রাজা যখন শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন তখন প্রজাপুঞ্জ যে নিশ্চিন্ত হয়ে সে রাজ্যে বাস করতে পারেনা একথা বলাই বাহুল্য। উত্তর চীনের রাজধানী কাইফেং থেকেও তাতার আক্রমণের ভয়ে চঞ্চল প্রজার দল পালাতে শুরু করলে রাজারই পদাঙ্ক অনুসরণে।

ইতিহাসের কথা নয়। চৈনিক পুরাণ বলে, মাটির ঘোড়ায় চেপে পলায়নপর রাজা কাং নাকি বিশাল ইয়াংছি নদী পার হয়ে চলে গিয়েছিলেন দক্ষিণে এবং সেখানে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় থেকেই শীয়েন ইয়েন্ যুগের পত্তন হয়। কিন্তু, চার পাঁচ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি মহারাজ কাংয়ের এই নূতন রাজ্য।

তাতার আক্রমণের বিভীষিকায় প্রাণভয়ে ভীত প্রকৃতিপুঞ্জ উত্তর চীন পরিত্যাগ করে রাজার পশ্চাদনুসরণ করেছিল বটে, কিন্তু, সবদিক গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে বেরুতে বিলম্ব হ'য়ে পড়ায় তারা তাতার দস্যুদের প্রায় আক্রমণের মুখে পড়ে গেল। বন্যার মতো ছুটে আসছে তখন তাতার আক্রমণ কারীরা। ঘোড়া ছুটিয়ে তারা পশ্চাদ্ধাবন করলে পলায়নপর প্রজা বর্গের। পথে পথে তারা লুঠ করতে করতে আসছিল। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল।

এই নিষ্ঠুর তাতার দস্যুদের নৃশংস আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় কত পরিবার যে এই সময় পরস্পরের সঙ্গে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন সে মর্মভেদী দুঃখের সকরুণ ইতিহাস সেদিনের চীনা কবিরা অপূর্ব ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। তারই একটি হল এই—'যুগল-মুকুর।'

সে এক ভীষণ দিন গিয়েছে চীনের। মা প্রাণভয়ে ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে ফেলে, ভাই বোনকে ছেড়ে! কে যে কোনদিকে পালালো কেউ তা জানেনা! পিতা পুত্রে হয়ত আর সারা জীবনে দেখা হয়নি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও আর কখন মিলন হয়নি! এই দুঃখের দিনের হৃদয়-বিদারক কাহিনী চীনা কবিদের কল্পনাকে প্রবল আঘাত করেছিল। তারা রেখে গেছেন তাঁদের রচনার মধ্যে সেই দুর্যোগপীড়িত চীনের বিষাদ বেদনাময় অশ্রুসজল শোণিত-সিক্ত কাহিনী।

এই দুর্দিনের মধ্যেও মেঘাবৃত অন্ধকার আকাশে ক্ষণ চপলার বিদ্যুৎ চমকের মতো মাঝে মাঝে মানুষের মহত্ব ফুটে উঠেছে বহু ছোট বড় ঘটনার পটভূমিকায়। কত হারামণি ফিরে পাওয়া গেছে। কত বিরহ-ব্যাথাতুর দম্পতির পুনর্মিলন ঘটে জীবন আবার আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই রকম একজোড়া বিচ্ছিন্ন দম্পতির অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনের কাহিনী অবলম্বনে এক প্রাচীন চীনা কবি এই 'যুগল-মুকুর' কাব্যখানি রচনা করেছিলেন এ রচনা আজও চীনের প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন হ'য়ে রয়েছে। সেদিনের অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

দ্বিতীয়ার চাঁদ অনেক আকাশে ছড়ায় আলো।
কত সুখী, কত বিষাদ-মলিন মুখের পরে।
দম্পতি কেহ সুখ শয্যায় রয়েছে ভালো;
কাহারো আবার বিচ্ছেদ তাপে অশ্রু ঝরে!

কিন্তু, চীনের প্রাচীন কবিরা ছিলেন আশাবাদী। সহস্র দুঃখের বোঝা ঘাড়ে চাপলেও তারা ভেঙে পড়তেন না। এটা চীনেদের জাতীয় চরিত্রেরই একটা বিশেষত্ব। আসুক ঝড়, আসুক ঝঞ্ঝা, অদৃষ্ট বিশ্বাসী চীনা কবি বলেন—

"ছিন্ন বাঁধন মুক্ত বাতাস যুক্ত আবার হবেই হবে,
শিশির ঝরা নিশির মোতি মিলবে পুন হিমের কোলে।
ভাগ্যদেবীর ইচ্ছামতই যা কিছু সব ঘটছে ভবে;
উপরওয়ালার বিচার মতোই মাথায় কারো দণ্ড ঝোলে!

এই প্রাচীন গাথাটির গল্পাংশ হ'ল চেংচাওয়ের অধিবাসী ছু-ছিন একজন সুদক্ষ সৈনিক। বিবাহ করেছিল হুই বংশের একটি সুন্দরী

মেয়েকে। তাদের অবস্থা ভালো। দম্পতি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ঘর সংসার করছিলেন। এমন সময় দেশে ন্যু-ছেন তাতারদের অভিযান শুরু হল। সম্রাটদের তারা বন্দী করে নিয়ে গেছে শুনে সবাই যখন পালাতে শুরু করলে ছু-ছিনও তখন চেংচাওয়ে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে, তাদের যা কিছু মূল্যবান ধনসম্পদ দুটি পুলিন্দায় বেঁধে নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনে কাঁধে ঝুলিয়ে ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দেশ যাত্রায়। অন্যান্য প্রতিবেশিরাও তাদের সঙ্গ নিলে।

চলেছে তারা দিনের পর দিন—রাতের পর রাত। বিশ্রামের অবসর নেই। ক্লান্তি দূর করবার অবকাশ নেই। তাতার দস্যুরা পিছু নিয়েছে। যুচেঙের কাছাকাছি এসে তারা শুনতে পেলে তাদের পিছনে যেন একটা ভীষণ আর্তনাদ উঠ্‌ছে। আগুনের শিখাও দেখা যাচ্ছে। তারা ভাবলে নিশ্চয় তাতারের দল তাদের ধরে ফেলেছে। গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে তারা এদিকে আসছে।

এতক্ষণ বাস্তুত্যাগী পলাতকের দল স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে আসছিল। কিন্তু, পিছন থেকে সেই অগ্নিশিখা দেখে আর সেই মর্মন্তুদ আর্তনাদ তাদের কানে এসে পৌঁছতেই তারা ভীষণ ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যে যেদিকে পারলে চোখ কান বুজিয়ে ছুটে পালাতে শুরু করলে। ফলে, কে যে কোন দিকে ছিটকে পড়লো—কিছুই জানা গেলনা। এই হট্টগোলের মধ্যে ছু-ছিন তার সুন্দরী তরুণী পত্নীটিকে হারিয়ে ফেললে।

পিছনে যে আর্তনাদ তারা শুনেছিল সেটা কিন্তু একেবারেই তাতার আক্রমণের ব্যাপার নয়। রাজ্যের বিধ্বস্ত সৈন্য দল তাতারদের আক্রমণে বাধা দিতে পারবে না জেনে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসছিল। কারণ, দীর্ঘকাল তারা যুদ্ধে অনভ্যস্ত। লড়াই করা ভুলেই গেছে। নিয়মিত কুচ-কাওয়াজ না করার ফলে তারা অপদার্থ ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, যুদ্ধ করতে ভুলে গেলেও তারা নৃশংসতা তাদের সৈনিক সুলভ ভোলেনি। তাতার আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হবার সাহস তাদের না থাকলেও—নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করবার বেলা তাদের উৎসাহ ও সাহস একটুও কম ছিলনা। পালাবার পথে তারা গ্রাম লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়ে তরুণী সুন্দরী মেয়েদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। অগ্রবর্তী যাত্রীরা শুনেছিল সেই অসহায় বিপন্ন নরনারীর কাতর আর্তনাদ।

ছু-ছিন যদিও একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, কিন্তু, সে একা সেই পলায়নপর উন্মত্ত সৈন্য দলের সামনে বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে জেনে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করেছিল। হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে খুজে দেখবার আর অবসর পেলেনা সে। যঃ পলায়তি সজীবতি! আত্মরক্ষার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ছুটে পালালো।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল। হৈ চৈ অনেকটা শান্ত হল। ছু-ছিন স্ত্রীর সন্ধান করতে লাগলো। কিন্তু, তার কোনও উদ্দেশ পেলেনা। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত ছু-ছিন পত্নীর পুনরুদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এগিয়ে চললো।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছু-ছিন্ যখন শুইয়াং নগরে এসে পৌঁছল তখন খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের চেষ্টায় সে একটি সরাইখানায় এসে ঢুকলো।

দেশে তখন অরাজকতা চলেছে। সরাইখানাতেও আহার্য ও পানীয়ের একান্ত অভাব। ছু-ছিন্ যে সরাইখানায় এসে ঢুকলো তার মালিক বললেন, সৌখান খাবার কিছু দিতে পারব না মশাই। পেট ভরাবার মতো মোটা চালের ভাত হ'তে পারে, কিন্তু দামটি আগে জমা দিতে হবে। অনেক পলাতক বাস্তুত্যাগী এখানে খেয়ে দাম না দিয়ে সরে পড়েছে।

ক্ষুধার্ত ছু-ছিন আর দ্বিরুক্তি না করে যখন পয়সা বার করে দিচ্ছে হঠাৎ তার কানে এল একটি নারীকণ্ঠের সকরুণ ক্রন্দন! ছু-ছিন সে কান্নার আওয়াজে চমকে উঠলো! তার মনে হল যেন তার সেই হারানো পত্নীর কণ্ঠস্বর। খাবারের পয়সা গুণে দিতে দিতে সে থেমে গেল। তারপর, কাণ পেতে অল্পক্ষণ সেই রোদনধ্বনি শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেল সেই শব্দ লক্ষ্য করে।

গিয়ে দেখে সত্যিই একটি সুন্দরী তরুণী নারী পথের ধারে পড়ে কাঁদছে। এলোমেলো রুক্ষ তার চুলের গোছা। পরণে শতছিন্ন বসন। ছু-ছিন তাকে দেখে বুঝতে পারলে সে তার সেই হারানো পত্নী নয়। তবে মেয়েটিকে তার স্ত্রীরই সমবয়সী বলে মনে হল। হয়ত' এ তারই পত্নীর মতো অপর কোনো হতভাগিনী নারী স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরুপায়ের মতো পথে পড়ে কাঁদছে। গভীর সমবেদনায় ছু-ছিনের মনটি ভরে উঠলো। ছু-ছিন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে জানতে চাইলে কেন এমন করে সে একলা পথের ধারে বসে কাঁদছে?

মেয়েটি বললে, আমার নাম ওয়াং-চিন-ন্যু। আমার বাড়ী ছিল চেংচাওএ। আমরা তাতার দস্যুদের ভয়ে ঘরবাড়ী ফেলে পালিয়ে আসছিলুম, অকস্মাৎ পথের মধ্যে পলাতক রাজসৈন্যেরা এসে পড়ে আমাদের তাড়া করে। সেই গোলমালে আমার স্বামীকে আমি হারিয়ে ফেলি। কয়েকজন সৈনিক আমাকে একলা পেয়ে ধরে নিয়ে যায়। আমি তাদের মত অবস্থায় সুযোগ নিয়ে কোনও রকমে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসি। দুদিন দুরাত্রি আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে ক্রমাগত ছুটে ছুটে আজ এখানে এসে পৌঁছেচি। কিন্তু, এই দেখ আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে দুই পা টাটিয়ে ফুলে উঠেছে। আমি আর এক পাও হাঁটতে পারছিনি। আমার সঙ্গে যা কিছু ছিল—মায় আমার পরনের কাপড়-চোপড় সব কিছু তারা কেড়ে নিয়েছিল আগেই। আমি এখন একেবারে কপর্দকহীন, অসহায়, একা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। এখানে আমার এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে একটু আশ্রয় নিতে পারি। আমার এখন মরণ হলেই আমি বাঁচি। ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি—।

ছু-ছিন বললে, ভদ্রে! আমারও ঠিক তোমার মতোই অবস্থা—পালাবার পথে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কত যে খুজেছি তাকে কোথাও সন্ধান পাইনি। তবে, তুমি যেমন নিঃসম্বল হয়ে পড়েছো,

আমার সে দুর্ভাগ্য হয়নি। কিছু টাকা-পয়সা আমার সঙ্গে আছে। এই সরাইখানায় এসে উঠেছি। তুমি যদি ইচ্ছে করো কিছুদিন আমার অতিথি হয়ে এই সরাইখানায় বিশ্রাম করতে পারো। আমি আমার স্ত্রীকে খুজে পাবার আশা একেবারে ত্যাগ করি নি। আবার আমি চারদিকে ভাল করে তার সন্ধান করবো, সেই সঙ্গে তোমার স্বামীকেও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো। এখন তোমার কি অভিরুচি বলো।

মেয়েটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছু-ছিনের মুখের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে,—কেন জানি না, আমার মন বলছে—ভগবান আপনাকে আমার উদ্ধারের জন্যই পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। চলুন আমি আপনার সঙ্গেই যাই। একটু ধরতে হবে আমাকে। আমি এখন একেবারে চলৎশক্তিহীন।

ছু-ছিন মেয়েটিকে সযত্নে তুলে ধরে ধীরে ধীরে সরাইখানায় নিয়ে এল। নিজের বোঁচ্‌কা খুলে পত্নীর এক প্রস্থ কাপড় চোপড় বার করে মেয়েটিকে পরতে দিলে। নিজে খাবার এনে জল এনে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করলে। মেয়েটি তাকে অন্তরের প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানালে।

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। ছু-ছিন তার স্ত্রীকে খুজে পেলে না। মেয়েটির স্বামীরও কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

একই ঘরের মাঝখানে পর্দার আড়াল দিয়ে দু' পাশে দু'জনে থাকে। দু'টি দুর্ভাগ্যপীড়িত যুবক যুবতী। এক সঙ্গেই তারা দুবেলা রোজ খায়। বেড়াতে যায়। গল্প করে। চা পান করে। এমনি করে এই দুটি ভাগ্যবিড়ম্বিত নরনারী নিঃসঙ্গ জীবনে নিয়ত উভয়ের সঙ্গ ও সাহচর্যের ফলে পরস্পরের প্রতি একটা প্রীতি ও স্নেহের আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠলো। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললে।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। মেয়েটি এখন বেশ সেরেছে। দিব্যি সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে। দুই গালে আপেলের লালচে আভা আবার দেখা দিয়েছে। ছু-ছিন বললে—এমন করে থেকে আর লাভ কি? চলো আমরা এখান থেকে দক্ষিণের রাজধানী শিয়েনকাঙে যাই। সেখানে আমরা পরস্পরকে বিবাহ করে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করিগে!

মেয়েটি হেসে উঠে প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে—ঠিক এই কথাটাই আমি তোমাকে আজ কদিন ধরে বলবো ভাবছিলুম বন্ধু! কিন্তু, লজ্জায় বলতে পারছিলুম না।

চলে গেল তারা শিয়েনকাঙ্। স্বামী-স্ত্রীরূপে আবার তারা দুটি বাস্তুহারা মিলে সুখের নীড় রচনা করে আনন্দে জীবন যাপন করতে লাগলো।

একদিন বিকেলে দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে ফেরবার পথে ছু-ছিনের নববধূ তৃষ্ণা বোধ করায় পথের ধারে একটি পান্থনিবাসে তারা ঢুকলো চা পান করতে। সেখানে এক ভদ্রলোক বসে চা পান করছিলেন। ছু-ছিনের সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে দেখে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন! তিনি একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তারা যখন বাড়ী ফিরলো ভদ্রলোকটিও তাদের পিছু পিছু এলেন।

ছু-ছিন তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনি কী চান? আমাদের পশ্চাদনুসরণ করছেন কেন?

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললে—কাজটা আমার ঠিক ভদ্রোচিত নয় স্বীকার করছি। কিন্তু, কারণ আছে। একটু যদি আসেন আমার সঙ্গে। নিভৃতে একটু আলোচনা করতে চাই।

ছু-ছিন পত্নীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ভদ্রলোকের কাছে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি কথা আছে চট করে বলুন। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সঙ্গের ঐ মেয়েটি কে?

ছু-ছিন বললে—আমার স্ত্রী উনি।

কতদিন বিবাহ করেছেন?

বছর দুই হল।

ওর নাম কি 'ওয়াঙ্ চিন ম্যু'—ও কি আগে চেংচাওয়ে থাকতো?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

আমি জানবো না মানে? উনি যে আমারই 'স্ত্রী' ছিলেন মাত্র দু'বছর আগে।

তাই নাকি?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ছু'-ছিনের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠলো। ছু-ছিন তখন সেই আগন্তুক ভদ্রলোককে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে জানালে। তারপর কাতরভাবে প্রশ্ন করলে—এখন উপায় কি?

ভদ্রলোক হাসি মুখে বললেন ভয় নেই! আমিও একটি বাস্তুহারা পলাতকা মেয়েকে বিবাহ করে বেশ সুখে আছি। আপনার সুখের সংসারে আর অশান্তি সৃষ্টি করতে চাই নে। তবে, আমার কর্তব্য আমার পূর্ব পত্নীকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া যে কেন আমি পুনরায় বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছি।

ছু-ছিন বললে, বেশত' কাল আপনার নূতন স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে চা খাবেন। আর সেই সময় বুঝিয়ে দেবেন কেন আপনি আবার বিবাহ করেছেন?

ভদ্রলোক ছু'ছিনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে চলে গেলেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

এলবার্ট আইনষ্টাইন

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাধক—বিজ্ঞান-জগতের যুগশ্রেষ্ঠ মণীষী এলবার্ট আইনষ্টাইন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তহিত হয়েছেন। তাঁর তিরোধানে বিজ্ঞান জগতের যে ক্ষতি হ'ল তা সহজে পরিপুরণ হবার নয়।

মানুষের চিন্তারাজ্যে এক মহা বিপ্লব এনে দিয়ে গেছেন আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইনের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মণীষী সচরাচর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। তার মৃত্যুতে পৃথিবীর একটি সুসন্তান বিলুপ্ত হ'ল।

আইনষ্টাইন কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র মানব সমাজের দরদী বন্ধু। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক, অসত্য আর

ডক্টর এলবার্ট আইনষ্টাইন

অত্যাচারের প্রতি ছিল তাঁর ক্ষমাহীন কঠোরতা। এই নিরহঙ্কারী বিনয়ী মানুষটির অন্তর পরিপুরিত ছিল নির্মল ভালোবাসায়। পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির অহমিকা, আত্মপ্রচারের অভীপ্সা কোনো দিন প্রকাশ পায়নি তাঁর চরিত্রের মধ্যে। নিরলস সাধনায় যে-দান৷ তিনি পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন, পৃথিবীর মানুষ চিরদিন তা স্মরণে রাখবে।

একদা—আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে জার্মানীর ব্যাভিরিয়ার অন্তর্গত উল্‌ম নামক একটি ছোট শহরে এক ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন—এই মহা প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। জন্মের পর একটি বছর তিনি জন্মস্থানে ছিলেন। তারপর পিতা মাতার সঙ্গে চলে আসেন মিউনিকে। আইনষ্টাইনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এই মিউনিকেই। মিউনিকের এক ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।

এলবার্টের পিতার নাম ছিল হেরমান আইনষ্টাইন। হেরমান আইন-ষ্টাইনের ছিল একটি ছোট বৈদ্যুত-রাসায়নিক কারখানা। এই কার-খানাটির ওপর নির্ভর করেই তাঁর পরিবার প্রতিপালিত হতো। কিন্তু এখানে ব্যবসায় সুবিধা না হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে হেরমানকে এস্থান ত্যাগ করতে হয়। মিউনিকের ব্যবসায় তুলে হেরমান সপরিবারে ইতালীর মিলান শহরে এসে আস্তানা পাতলেন। কিন্তু এখানেও ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন না, অগত্যা পুনরায় সেখানের বাস উঠিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন পাভিয়ায়। আইনষ্টাইনের বাল্যজীবন এমনিভাবেই অতিবাহিত হতে থাকে—স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে।

ভবিষ্যৎ জীবনে যে ছেলেটি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হ'য়ে বিশ্ব-বাসীর চিন্তার সমুদ্রে নতুন আলোড়ন তুলে চকিত করে দিয়েছিল—সেই ছেলেটি কিন্তু বাল্যকালে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ছেলেটির নিবুদ্ধিতায় তার পিতামাতা এবং শিক্ষককুল চিন্তান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তার অনাগত অন্ধকার ভবিষ্য-জীবনের কথা ভেবে ভীত হ'য়ে পড়েছিলেন তাঁরা। বলাবলি করতেন : ছেলেটার কিছু হবে না। এর ঘটে এতো-টুকুও বুদ্ধির বালাই নেই। কি যে হবে এ ছেলেকে নিয়ে!—কিন্তু কে জানতো—কে বুঝেছিল সেদিন যে এই ছেলেই একদিন সারা পৃথিবীর অন্তর অধিকার করে আপন অনড় আসন বিস্তার করবে?

শিশুকাল থেকেই পৃথিবীতে জানবার তীব্রতর একটা আগ্রহ মনের মধ্যে অনুভব করতেন আইনষ্টাইন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারতেন না আপন মনের কথা। তাই প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন তিনি তাঁর শিক্ষকদের, বিব্রত করে তুলতেন পিতামাতাকে। তাঁর সেই সব দুরূহ জটিল প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া সকল সময়ে সম্ভব হতো না তাঁদের পক্ষে। যদিও ছেলেবেলায় ছাত্র হিসাবে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তাঁর নাম ছিল নিকৃষ্ট ছাত্রদের তালিকায়। তবুও মাঝে মাঝে তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা চমক লাগিয়ে দিত মাস্টারমশাইদের। অবাক করে দিত সহপাঠীদের।…

মাত্র ১৪ বছর বয়েসে এলবার্ট অ্যানাটিকেল জিওমেট্রি, ইন্টিগ্র্যাল, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাশ প্রভৃতি কেবল বই পড়েই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

এরপর আবার স্থানান্তরে যাবার আয়োজন করতে হ'ল। আইন-

ষ্টাইনের পিতা হেরমানের ব্যবসায় পাভিয়াতেও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। সংসারে নানা অনটন দেখা দিলে। তখন আইনষ্টাইনকে বৃত্তিশিক্ষা বেছে নিতে হ'ল। স্থির হ'ল তিনি সুইটসজারল্যাণ্ডের সরকারী শিল্পশিক্ষাগারে ভর্তি হবেন। জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হবার জন্যে আধুনিক ভাষা ও জীববিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হ'ল তাঁকে।

পরীক্ষা ব্যাপারটাকে আইনষ্টাইন কোনোদিন সুনজরে দেখতে পারেন নি। পরীক্ষায় পাশ করাটা তাঁর কাছে খুব একটা কৃতিত্ব বলে প্রতীত হতো না। তাঁর মত ছিল, পরীক্ষা পাশ করাটা জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। যে যতো মুখস্থ করতে পারে, পরীক্ষা তার জন্যে পাশের সম্মান নিয়ে বসে থাকে।

আইনষ্টাইন ১৭ বছর থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত জুরিখে পড়েন এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকের সনদ লাভ করেন। এখানে থাকা-কালীন তিনি সুইস নাগরিক অধিকার পান। নাগরিক অধিকার পাবার পর কিছুকাল তিনি বার্ণের পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট পরীক্ষার কাজে লিপ্ত থাকেন। এই সময় তিনি মিলেভা-মারিচ নাম্নী একটি সহপাঠিনীকে বিবাহ করেন। বিবাহ করেন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। মিলেভা মারিচ গণিত বিজ্ঞানে কৃতী ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে সুখী হননি আইনষ্টাইন। বিবাহের অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যায়। আর তারপর থেকেই আইনষ্টাইন গভীর মনোযোগী হ'য়ে পড়েন তার গবেষণার কাজে। পেটেন্ট অফিসে তাঁর কাজের চাপও তেমন ছিল না, চিন্তা করবার অবসরও ছিল প্রচুর।

১৯০২ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইনষ্টাইন—ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট তত্ত্ব সম্পর্কে গুটিকয়েক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন এবং প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি প্রবন্ধে আপেক্ষিক তত্ত্বের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটি প্রকাশ হয় ১৯০৫ সালে এবং এর পরেই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। অতঃপর বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উপাধ্যায় নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানী হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পান তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। অষ্ট্রিয়ার সালসবুর্গে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান আসে তাঁর। তারপর প্রাগ ও বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। বছর দুই অধ্যাপনার পর তিনি পুনরায় জুরিখে ফিরে আসেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী নার্নষ্ট ও প্লাঙ্কের চেষ্টায় তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভূমি জার্মানে ফিরে যান। এবং ফিরে যান পরিকল্পিত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরূপে। সেই সঙ্গে তিনি প্রাশিয়ান বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় জুরিখে মার্সাল গ্রামানের সহযোগিতায় তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর 'আপেক্ষিক তত্ত্বে'র প্রাথমিক আভাস পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯১৬ সালে তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর বৎসর বিশ্ব ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই তিনি পুনরায় বিবাহ করেন।

এই দ্বিতীয় বিবাহ হয় তাঁর পিতৃব্যকন্যা এলসা আইনষ্টাইনের সঙ্গে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক সাধনা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। আইনষ্টাইন এতো বেশি সংখ্যায় পুরস্কার, পদক আর অনারারি ডিগ্রী পেয়েছিলেন যে, তিনি নিজেই তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারতেন না। যে সকল পদক লাভ করেছিলেন তিনি তার মধ্যে ১৯২৫ সালে প্রাপ্ত রয়াল সোসাইটির কোপলে পদক এবং ১৯৩৫ সালে প্রাপ্ত ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউট পদক সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বার্লিনে ছিলেন আইনষ্টাইন এবং এই সময়ে তিনি প্রায়শই দেশ ভ্রমণে বেরুতেন। তিনি ১৯৩১ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে মাস কয়েক অতিবাহিত করেছিলেন।

আইনষ্টাইন জার্মান পরিত্যাগ করেন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে জার্মান ত্যাগ করতে হয়েছিল—নাৎসীদের ইহুদী বিরোধ নীতির জন্যে। তাঁর নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেওয়া হয়। তাঁকে একাডেমি অব সায়ান্স থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়? তন্ন তন্ন করে তাঁর গৃহ তল্লাসী হয়। অধ্যাপক ও ডিরেক্টরের সম্মান পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়। কেবল মাত্র বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বল ক'রে তিনি তাঁর নির্বাসিত জীবন আরম্ভ করেন।

জার্মানী ত্যাগ করে তিনি ফ্রান্সে যান। তারপরে বেলজিয়ামে এবং তার পরে ইংলণ্ডে গমন করেন। প্রিন্সটনের ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি এই সময় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়—সেখানে আজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে। ১৯৩৩ সালে তিনি প্রিন্সটনে যান। সেই থেকে তিনি সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে এলবার্ট আইন-ষ্টাইন ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রিন্সটন ছেড়ে আর কোথাও যাননি। সেইখানে থেকেই তিনি গাণিতিক তত্ত্বের গবেষণা করতে থাকেন। ১৯০৫ সালে যে সব গাণিতিক তত্ত্বের গবেষণা শুরু করেছিলেন, সেই সব শেষ করবার কাজে প্রতিদিন নিয়মিত কয়েকঘন্টা করে অতিবাহিত করতে লাগলেন। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেছিলেন।

আণবিক শক্তির গবেষণার সঙ্গে আইনষ্টাইন প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বটে, তবে ১৯০৫ সালে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধসূত্রের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাই আণবিক শক্তির প্রয়োগের ব্যাপারে কাজে লাগে। ১৯৪৬ সালে তাঁকে চেয়ারম্যান করে আনবিক বিজ্ঞানী-দের জরুরী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর তাঁকে 'ওয়ান ওয়ার্লড এওয়ার্ড' দেওয়া হয়।

আইনষ্টাইন যতো বই লিখেছেন, তার সমস্তই জার্মান ভাষায় লিখে গেছেন। অবশ্য এই সব বইয়ের অধিকাংশ বই ইংরাজীতে অনুদিত হয়েছে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় পত্নী এলসার মৃত্যু হয় এবং তারপর এই আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকের অন্তর্মুখী মনখানি আরও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে।

সামান্য এতোটুকু প্রবন্ধের মধ্যে আইনষ্টাইনের চরিত্র এবং কার্য-কলাপ বোঝানোও সম্ভব নয় বোঝাও যায় না। তাঁর বিরাট বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার তিনি পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা ধীরে ধীরে তা উপলব্ধি করবে এবং চিরদিন সেই মহা-বিজ্ঞানীকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

আইনষ্টাইন ছিলেন দার্শনিক মতের দিক দিয়ে দার্শনিক স্পিনোজার মতাবলম্বী। তিনি শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি দার্শনিক এবং সুরশিল্পীও ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। সংগীত তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। তাঁর পিতা এক সময়ে তাঁকে একটি বেহালা উপহার দিয়েছিলেন—তখন তিনি খুব ছোট। আর সেই থেকেই তিনি সেই বেহালাটি নিয়ে নির্জনে সুরসাধনা করতেন। পরিণত বয়সেও অবসর সময় যাপন করতেন তিনি তাঁর সেই প্রিয় বেহালাটি নিয়ে। মৃত্যুকালে তিনি সেই বেহালাখানি তার পৌত্রকে দিয়ে গেছেন।

মডেলের কোটিপতি

অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌

অনুবাদক—অমিয় রায়চৌধুরী

ধনী না হলে তার ব্যক্তিত্ব কখনই আকর্ষণীয় হতে পারে না। রোমান্স হচ্ছে ধনীদের একচেটিয়া সামগ্রী, বেকারদের পেশা নয়। গরীবেরা হবে বাস্তববাদী খানিকটা গদ্যময়। তাঁদের পক্ষে কোন কিছুতে মোহগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা থাকা ভালো। বর্তমান জগতের এই ধ্রুব সত্য কিন্তু হুমি আরস্কাইন কখনও উপলব্ধি করে নি। বেচারা হুমি! সত্যি কথা বল্‌তে কি·শ্রী-সম্পন্ন ব্যক্তি রূপে মর্যাদা পাবার মত লোক সে নয়। খুব একটা ভাল কথা সে কোনদিন বলে নি বা খারাপ কোনও কাজও সে জীবনে কোনদিন করে নি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে সে অপূর্ব রূপবান্; কোঁকড়ানো সোনালী চুল, মুখমণ্ডলের তীক্ষ্ণতা এবং সোনালী চোখ তাঁকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। সে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে সমান জনপ্রিয় ছিল এবং একমাত্র টাকা রোজগার করা ছাড়া সব গুণই তাঁর ছিল। পিতার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার সূত্রে একখানা বীরত্বের স্মৃতিবিজড়িত তরোয়াল এবং পনেরো খণ্ডের পেনিনসুলার যুদ্ধের ইতিহাস পেয়েছিল। হুমি প্রথমটা তার আয়নার পাশে ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং দ্বিতীয়টা 'রাফ্‌ গাইড' এবং বেইলি ম্যাগাজিনের মধ্যের শেল্‌ফে রেখেছিল। জীবনে সাফল্য লাভ করার জন্যে সব রকম চেষ্টাই সে করেছিল। ছ'মাস ষ্টক্‌ এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি করেছে কিন্তু একদল ভল্লুক ও ষাঁড়ের মধ্যে একটা প্রজাপতি কি করবে? কিছুদিন সে চায়ের ব্যবসা করেছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে চায়ের গন্ধে হাঁপিয়ে উঠলো, তারপর কিছুদিন স্প্যানিশ মদের কারবার করেছে কিন্তু সেখান থেকেও বিশেষ সুবিধা হোলো না। শেষ পর্যন্ত কিছুই সে করতে পারলো না। মোটকথা তাকে বলা যায় একজন অকৃতকার্য সুন্দর যুবক, সুন্দর তার চেহারা কিন্তু কোন কাজেরই নয়।

কিন্তু ব্যাপার আরও জটিল—কারণ সে প্রেমে পড়েছে। যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে তার নাম লরা মার্টিন, একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের কন্যা। এই অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ভারতবর্ষে তাঁর মেজাজ ও হজমশক্তি দুইই হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং কোনদিন তা' আর ফিরে পান্ নি। লরা তাঁর প্রীতি তাঁকে সমর্পণ করেছিল এবং সে লরার পদরেণু চুম্বন করতেও প্রস্তুত ছিল। তারা ছিল লণ্ডন সহরের সর্বাপেক্ষা সুন্দর জোড়, কিন্তু একটা পেনিও তাদের নিজের বলতে ছিল না। কর্ণেল হুমিকে বেশ খাতির করতেন কিন্তু আসল কাজের কথা কোনদিন বল্‌তেন না। তিনি শুধু বল্‌তেন—"যে দিন দশ হাজার পাউণ্ডের মালিক তুমি হবে সেইদিনই আমার কাছে এসো, তখন আমি বিবেচনা করে দেখবো।" হুমি এই কথা শুনে খুবই নিরাশ হয়ে পড়তো এবং সান্ত্বনা পাবার জন্যে লরার কাছে ছুটে যেত।

একদিন সকালে সে হলাণ্ড পার্কের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাঝপথে সে তার বিখ্যাত বন্ধু এল্যান ট্রেভারের সংগে দেখা করার মানসে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। ট্রেভার হচ্ছে একজন চিত্রকর। সে শুধু চিত্রকর নয় একজন উঁচুদরের শিল্পী, ব্যক্তিগত ভাবে ট্রেভারের চরিত্র রুক্ষ ধরণের। একগাল খোঁচা খোঁচা লাল দাড়িতে মুখখানা সব সময় ভরা থাকে। কিন্তু যখন সে তুলি ধরে তখন সে রীতিমত প্রতিভাবান এবং যে ছবি তার হাত থেকে বেরোয় তার

চাহিদা অসম্ভব। হুমিকে প্রথম দেখেই সে আকৃষ্ট হয়েছিল ; তার কারণ হুমির মধুর ব্যক্তিত্ব। ট্রেভারের ভাষায়—যাঁরা সুন্দর,যাঁদের একটা শিল্পীজনোচিত মন এবং যাঁদের কথাবার্তায় একটা বুদ্ধিদীপ্ত ভাব আছে, একমাত্র এই জাতীয় লোকের সংগে একজন শিল্পীর পরিচয় থাকা উচিত। যে সকল পুরুষের প্রেমিকা আছে এবং যে সকল স্ত্রীলোকের প্রিয়জন আছে তারাই তো জগতের চালক অন্ততঃ তাদেরই চালানো উচিত। যাই হোক্, পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো হুমির প্রতি ট্রেভারের আকর্ষণ ততই বেড়ে যেতে লাগলো এবং হুমিকে তার ষ্টুডিওতে ঢোকার স্থায়ী অনুমতি দিয়ে দিল।

হুমি ষ্টুডিওতে ঢুকে দেখ্‌লো যে ট্রেভার একটা পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রতিকৃতি আঁকা প্রায় শেষ করে এনেছে। যার প্রতিকৃতি আঁকা হচ্ছে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক ষ্টুডিওর এক কোণে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুষ্ক, কৃশ ভিক্ষুকটির মুখটা দেখাচ্ছে যেন মোচড়ানো কাগজের মত এবং ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা কারুণ্যের ম্লানিমা। কাঁধের উপরে রয়েছে একটা শতচ্ছিদ্র তোয়ালে, পায়ে একটা ছেঁড়া মোটা বুট্ জুতো এবং একহাতে একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছে—আর অন্য হাতে রয়েছে ভিক্ষে নেবার জন্যে একটা ভাঙ্গা টুপি।

ট্রেভারের সংগে করমর্দনের সময় হুমি ফিস্ ফিস্ করে বললো—"বাঃ কি চমৎকার মডেল পাওয়া গেছে।"

ট্রেভার চীৎকার করে বললে—চমৎকার মডেল! আমিও তো তাই বলি। এই রকম ভিক্ষুকের দর্শন কি রোজ পাওয়া যায় ?

হুমি—আহা গরীব বেচারা! ওর মুখের অবস্থা কি শোচনীয়। কিন্তু তবু বলতে হবে ওর ওই মুখখানাই ওর সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।

ট্রেভার—নিশ্চয়ই! তুমি কি আশা কর যে একজন ভিক্ষুকের মুখে হাসির চিহ্ন দেখতে পাবে ?

হুমি—আচ্ছা, এঁরা এদের মডেল আঁকতে দেবার জন্যে কত পায় ?

ট্রেভার—ঘণ্টায় এক শিলিং।

হুমি—আর একটা ছবি আঁকার জন্যে তুমি কত পাও ?

ট্রেভার—আমি পাই দু' হাজার—

হুমি—পাউণ্ড ?

ট্রেভার—না, গিনি। চিত্রকর, কবি এবং চিকিৎসকেরা সব সময় গিনিই পেয়ে থাকে।

হুমি—কিন্তু আমার মনে হয় এই মডেলগুলিরও তোমার ছবির দামের একটা অংশ পাওয়া উচিত। কারণ তোমার চেয়ে এদের পরিশ্রমও কম নয়।

ট্রেভার—বাজে কথা। তুমি শুধু আঁকার পরিশ্রম ও দাঁড়িয়ে থাকার পরিশ্রমটাকেই বড় করে দেখ্‌চো কেন। এগুলো তো সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো আর্ট জিনিষটা এক এক সময় কায়িক পরিশ্রমেরই সামিল হয়ে পড়ে। যাই হোক্ তুমি আর বক্ বক্ করোনা, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। চুপ করে একটা সিগারেট্ টান্‌তে থাকো ?

কিছুক্ষণ পর চাকর এসে ট্রেভারকে খবর দিল যে ফ্রেম প্রস্তুতকারক তাঁর সংগে দেখা করতে চায়। 'হুমি চলে যেয়োনা, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি বলে ট্রেভার বাইরে চলে গেল।

বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি ট্রেভারের অনুপস্থিতির সুযোগে বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম নিতে লাগ্‌লো। ওকে এতই রুগ্ন ও জীর্ণ দেখাচ্ছিল যে হুমি ওকে দয়া না করে পারলোনা। সে পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লো টাকা কিছু আছে কিনা। পকেটে একটা সভারেন ও কিছু খুচ্‌রো ছিল। মনে মনে ক্ষণিকের জন্য সে চিন্তা কর্‌লো এবং ভাবলো যে "আমার চেয়েও ওর অভাবটাই বেশী।" পরক্ষণেই সে চেয়ার থেকে উঠে সভারেনটা ওর হাতের উপর ফেলে দিল।

বৃদ্ধের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো—"ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ!"

ট্রেভার যখন ফিরে এল তখন সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল এবং বাকী দিনটা লরার সংগে খোস্ মেজাজে কাটিয়ে দিল।

সেইদিন রাত এগারোটার সময় হুমি একবার প্যালেট ক্লাবে ঢুক্‌লো। ঢুকে দেখে ট্রেভার সেখানে 'হক' এবং 'সেল্টজার' পান করছে। সিগারেট জেলে হুমি ট্রেভারকে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, ছবিটা তুমি ভাল ভাবে শেষ করেছো তো ?

ট্রেভার—হাঁ বন্ধু, শেষ করেছি এবং ফ্রেম আঁটাও হয়ে গেছে। ওঃ, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—ঐ লোকটা তো

তোমার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে। আমি ওকে তোমার পরিচয়, তুমি কি করো, তোমার আয় কতো, তোমার ভবিষ্যৎ কি—ইত্যাদি সব বলেছি।

হুমি—তুমি কেবল ঠাট্টা করছো। লোকটা সত্যিই দুঃস্থ। ওকে অন্ততঃ কিছু সাহায্য করা উচিত। আমার বাড়ীতে অনেকগুলো পুরোনো কাপড় আছে ওর দরকার লাগ্‌বে কি? যে রকম ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে আছে দেখ্‌লে কষ্ট হয়।

ট্রেভার—নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু আমি ওকে কোট্ প্যান্ট পরিয়ে আঁকতাম না। তুমি যাকে ছেঁড়া কম্বল বল্‌ছো আমি তাকে বল্‌বো রোমান্স। তোমার কাছে যা দারিদ্র্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে সেটা এক অপূর্ব দৃশ্য। যাই হোক্ আমি তোমার দানের কথা ওকে জানিয়ে দেব।

হুমি—তোমাদের এই চিত্রকরেরা অত্যন্ত হৃদয়হীন।

ট্রেভার—ওর মুখে রয়েছে একজন শিল্পীর হৃদয়। আর আমাদের কাজ হচ্ছে জগৎকে যে ভাবে দেখি সে ভাবেই উপলব্ধি করা তাকে রূপান্তরিত করে দেখা আমাদের কাজ নয়। এবার বলো লরা কেমন আছে? ঐ বৃদ্ধের মডেল্‌টা নিশ্চয়ই তাঁর খুব পছন্দ হবে।

হুমি—তুমি ঐ লোকটাকে লরার কথা বলেছ নাকি?

ট্রেভার—হ্যাঁ, লরার কথা, কর্ণেল এবং দশহাজার পাউণ্ডের কথা সে জানে।

হুমি বেশ রাগান্বিত হয়ে বল্‌লো—ঐ ভিক্ষুকটাকে তুমি আমার ব্যক্তিগত কথা সব বলেছ?

ট্রেভার হেসে জবাব দিল—ওহে বন্ধু যাকে তুমি বৃদ্ধ ভিক্ষুক বলে উল্লেখ করছো সে হচ্ছে ইউরোপের একজন বিখ্যাত ধনী। ব্যাঙ্ক থেকে উপরি টাকা না তুলেই আগামী কাল সে সমস্ত লণ্ডন সহরটাকে কিনে ফেলতে পারে। প্রায় প্রত্যেক রাজধানীতেই তাঁর বাড়ী আছে, সোনার প্লেটে সে খায় এবং সে ইচ্ছে করলে রাশিয়ার যুদ্ধযাত্রা বন্ধ করে দিতে পারে।

হুমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললো—কার কথা তুমি বল্‌ছো?

ট্রেভার—যে বৃদ্ধ ভিক্ষুককে আজ তুমি আমার ষ্টুডিওতে দেখেছ তার নাম হচ্ছে ব্যারন হস্‌বার্গ। সে একজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার সব ছবিই সেই কেনে। একমাস আগে সে আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছে—তাঁকে একজন ভিক্ষুকরূপে আঁকার জন্যে। আমি তো বল্‌বো তাঁর সাজটা অদ্ভুত হয়েছিল। ঐ পুরোনো পোষাকটা আমি স্পেনে পেয়েছিলাম।

হুমি—ব্যারন হস্‌বার্গ! আমি তো ওকে একটা সভারেন দিয়েছি।

ট্রেভার হেঁসে লুটিয়ে পড়লো—তুমি একটা সভারেন ওকে দান করেছো!

হুমি—আমাকে তোমার এই ভাবে বোকা বানানো উচিত হয়নি।

ট্রেভার—আমার মনে একথা কখনও উদয় হয়নি যে তুমি বেপরোয়াভাবে ভিক্ষে দিতে সুরু করবে। তুমি একটা সুন্দর মডেলকে চুম্বন করতে পারো একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তুমি একটা কদাকার লোককে দয়া করে একটা সভারেন দান করতে পার একথা আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারি না। সত্যি কথা বল্‌তে কি আজ আমি সারাদিন বাড়ী ছিলাম না, আর তুমি যখন এসেছ তখন আমি ঠিক্ করে উঠতে পারিনি যে ব্যারন হস্‌বার্গ তাঁর নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা।

হুমি—ওঃ ওঁর কাছে আমাকে কি বোকাটাই না করেছো।

ট্রেভার—ও রকম কিছুই নয়। তুমি চলে যাবার পর সে মহাআনন্দ অনুভব করেছে। আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে কেন সে তোমার প্রতি এত কৌতূহল পোষণ করছে। এখন বুঝতে পারছি যে সে তোমার সভারেনটাকে খাটাবে এবং ছ'মাস অন্তর তোমাকে সুদ দেবে এবং তারপর একটা বিরাট গল্প তোমায় বল্‌বে।

হুমি—আমি একটা হতভাগ্য উচ্ছৃঙ্খল লোক। আমার আজ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত ছিল। যাই হোক্ ট্রেভার তুমি একথা কাউকে বলো না, তা হোলে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

ট্রেভার—বোকা কোথাকার। এতে তোমার চিত্তের পরহিতৈষণা ব্রতেরই কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখনই চলে যেও না আর একটা সিগারেট খাও এবং যত খুশী লরার কথা বলো।

যাই হোক্ হুমি আর বস্তে পারলো না, বিষণ্ণ মনে সে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। ট্রেভার হাসি চাপতে পারলো না।

পরদিন সকালে চাকর এসে হুমির হাতে একটা কার্ড দিয়ে গেল। কার্ডে লেখা ছিল—'ম'সিয়ে সুস্তাভে নদিন দে লা পার্ত দে এম লে ব্যারন হস্বার্গ'। হুমি মনে মনে বল্লো—বোধহয় আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে এবং চাকরকে বল্লো লোকটিকে উপরে পাঠিয়ে দিতে।

সোনালী চুল এবং চোখে চশমা পরিহিত এক ভদ্রলোক তার ঘরে প্রবেশ করলো এবং একটু ফরাসী কায়দায় বল্লো—আমি মহাশয়কে প্রাতঃপ্রণাম জানাতে পারি কি?

হুমি মাথা নত করে প্রাতঃপ্রণাম জানালো।

আগন্তুক—আমি ব্যারন হস্বার্গের কাছ থেকে আস্ছি।

হুমি তোৎলাতে তোৎলাতে বল্লো—আমার আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা তাঁকে জানাবেন।

আগন্তুক—মৃদু হেসে বল্লো—ব্যারন আমাকে আদেশ করেছেন এই খামখানা আপনাকে দেবার জন্যে। একটা সিল্‌করা খাম তার দিকে এগিয়ে দিল।

খামের উপর লেখা ছিল—হুমি আরস্কাইল এবং লরা মার্টনের বিবাহে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের যৌতুক। খামের ভিতরে ছিল একখানা দশহাজার পাউণ্ডের চেক্।

ওদের বিয়েতে এ্যালান ট্রেভারই সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিল এবং ব্যারন হস্বার্গ বিয়ের উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় একটা বক্তৃতা দিয়েছিল।

ট্রেভার মন্তব্য করলো—কোটিপতির মডেল খুবই বিরল সন্দেহ নেই—কিন্তু মডেলের কোটিপতি বোধহয় একেবারেই দুর্লভ।

মা

(রাইনর মারিয়া রিল্‌কে)

সুনীল বসু

—তুমি বিদায় নিয়েছ, আর আমার সমস্ত
দিনকে দিয়েছ সৌরভে ভরিয়ে—
হারিয়েছ অনন্তকালে,
আমার প্রাণ-প্রদীপ, আমার বৎস।

মন্থর তালে থরথরে হাঁটুতে
আমি হোঁচট্ খেয়ে পড়ি।
সমস্ত সময় আমার হাঁটু দু'টি
এখন বরফ-ঠাণ্ডা
কেননা তুমি চলে গেছ।

আমার অবাক দৃষ্টি দীর্ঘ প্রসারিত : এখন আর তো
কিছুকেই নেই ভালোবাসবার অথবা ঘৃণা করবার।
এমন আকস্মিক কী ক'রে তুমি গেলে?
আমার যাত্রার বিলম্বে রক্তিম হ'য়ে উঠি!

সনেট

(যোয়ান্ উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্ ফন্ গ্যেটে)

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

যবে তার কর-স্পর্শ আচম্বিতে করি অনুভব,
মোর প্রতি স্নায়ু শিরা প্রজ্বলন্ত হ'য়ে যেন উঠে
ব'সে থাকি পাশাপাশি, মুগ্ধ প্রেম পুষ্প সম ফুটে
নির্বাক বিহ্বল তবু বুঝি না অব্যক্ত কলরব।
　　রূপের সে অগ্নি শিখা হ'তে দূরে স'রে যেতে চাই,
　　অদৃশ্য শক্তির টানে নিষ্ফল প্রয়াসে ব'সে থাকি,
　　প্রেমের বেদনা হায় কি ভাবে হৃদয়ে ঢেকে রাখি,
　　পঙ্গু মোর বুদ্ধি-বৃত্তি, বৃথা চিন্তা, উপায় যে নাই!
সে শুধু ডুবিয়া থাকে নির্জ্ঞানের কুহেলিকা তলে,
পারে না বুঝিতে মোরে, জানে শুধু আপমার মন,
প্রণয়ের বহ্নি জ্বালা দগ্ধ করে মোরে অনুক্ষণ,
প্রশান্ত নীরবে তার বক্ষে বুঝি প্রেম-দীপ জ্বলে।
হাতে হাত রাখি যবে প্রিয়া বলে প্রণয়ের ভাষা,
জানে কি অন্তরে মোর কল্পনা-রঙীন কত আশা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ট্রেটিয়াকভ-চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে দেখি, মস্কো-রেডিওর বিশিষ্ট এক তরুণ-কর্ম্মী শ্রীমান্ বোরিশ কার্পুশকিন্ এসে বসে আছেন আমাদের প্রতীক্ষায়—কিঞ্চিৎ বেতার-ভাষণের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সবাইকে সাদর-আহ্বান জানিয়ে তাঁদের বেতার-কেন্দ্রে নিয়ে যাবার দিন-ক্ষণ ঠিক করার উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার পর দেখলুম,—বয়সে তরুণ হলেও, শ্রীমান্ বোরিশ রীতিমতই কৃত-বিদ্য পুরুষ···মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সেই তিনি নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ইংরাজী আর বাঙলা ভাষাতে পরম দক্ষতালাভ করেছেন। দিব্যি ঘরোয়া বাঙলা আর ইংরাজী বুলিতেই তিনি অনায়াসেই আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চালালেন···কোথাও এতটুকু জড়তা বা বাধ-বাধ ভাব নেই! তাঁর ঝরঝরে বাংলা বুলি আর ভারতীয়-প্রথায় আমাদের প্রধান-দলপতি শুভ্র-কেশ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে প্রণাম করার নিখুঁত-ভঙ্গী দেখে রীতিমতই বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম আমরা সবাই। পরে শুনলুম, শ্রীমান্ বোরিস্ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Institute of Foreign Languages' অর্থাৎ 'বৈদেশিক ভাষা শিক্ষায়তনের' বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন···সম্প্রতি মস্কো বেতার-কেন্দ্রের বাঙলা অনুষ্ঠান-প্রচার শাখার অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও জানলুম যে শ্রীমান্ বোরিশের তরুণী-ভার্য্যাও পতির প্রদর্শিত-পথ অনুসরণে অধুনা মস্কোর এই শিক্ষায়তনেই বাঙলা-ভাষার ছাত্রী—বিশ্ব-বিখ্যাত বাঙালী-কবি রবীন্দ্রনাথের অমর-রচনাবলীর রসাস্বাদ গ্রহণ করাই হলো সোভিয়েট রাশিয়ার এই তরুণ-দম্পতির একমাত্র অনুপ্রেরণা—আর ঐকান্তিক অনুরাগের কারণ! বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঙলা-ভাষা এবং ভারতীয় কবির প্রতি এই অপরূপ শ্রদ্ধানুরাগ দেখে—আমাদের সকলেরই মন সেদিন ভরে উঠেছিল এক অপূর্ব্ব দেশাত্মবোধের গৌরবে!

আলাপ-পরিচয়ের ফাঁকে শ্রীমান্ বোরিশ জানিয়ে গেলেন যে আগামী কাল অপরাহ্নে তিনি এসে আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁদের বেতার-কেন্দ্রে—ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের বেতার-ভাষণ সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে! হোটেল থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি আরও জানিয়ে গেলেন যে আজ রাত্রে সোভিয়েট রাজ্যের চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভার ভোজ-আসরে তাঁর সঙ্গে আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে অচিরেই।

শ্রীমান্ বোরিশ বিদায় নেবার পর, আমাদের দলের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তি-অপনোদনের উদ্দেশ্যে যে যার নিজের কামরায় সেঁধুলেন—খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য। শুধু মনোরঞ্জনবাবু, নিমাই আর আমি চললুম মস্কোর ব্রহ্মদেশীয় দূতাবাসে—আমাদের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে!

হোটেলের দরজায় মোতায়েন ছিল সোভিয়েট সরকারের মোটর-যান···গাড়ীতে চড়ে বসতেই শ্রীমতী আলেক্‌জান্দ্রোভা আমাদের পথ-প্রদর্শিকা হয়ে মস্কো-রাজধানীর নানান্ পথ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পৌঁছে দিলেন ব্রহ্মদেশীয় দূতাবাসের দোর গোড়ায়। মস্কো সহরের সুপ্রশস্ত রাজপথের বুকের উপর শাদা-রঙের সুদৃশ্য বিরাট তিনতলা ভবন···ব্রহ্মদেশীয় দূতাবাসটি সদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরোনো আমলের বাড়ীতে। গাড়ী থেকে নামতেই দূতাবাসের কর্ম্মীরা এসে সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলেন ভিতরে···কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যাবার তাড়া থাকায় পথ-সঙ্গিনী আলেক্‌জান্দ্রোভা আমাদের কাছে তখনকার মত বিদায় নিলেন···তবে জানিয়ে গেলেন যে, একটু পরেই আবার গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছেন—আমাদের ফেরবার জন্য।

ব্রহ্মদেশী বন্ধুদের সঙ্গে দূতাবাসের দোতলায় সুসজ্জিত বসবার-ঘরে আসতেই দেখা হলো শ্রীযুত মঙ্ ওন্-এর সঙ্গে! ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত···বয়সে তরুণ হলেও, অপরূপ বুদ্ধি-দীপ্ত তাঁর চেহারা···ভারী সদালাপী লোক···অনুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি আলাপ জমে উঠলো আমাদের সঙ্গে!

অনেক গল্প-আলাপ হলো···কথাবার্ত্তার মাঝে দূতাবাসের ক'জন কর্ম্মী নিজেরাই বয়ে আনলেন—চা আর বৈকালিক জলযোগের বিচিত্র সম্ভার। এত বড় দূতাবাসে পরিচর্য্যার লোকজনের অভাব গোড়ায় ভেবেছিলুম, পরে, শ্রীযুত মঙ্ ওন্-এর মুখে শুনলুম যে, এ-বাড়ীতে তাঁদের দূতাবাসটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে···কাজেই, এখনও না এসেছেন এখানে তাঁদের পরিবারবর্গ, পরিচর্য্যার লোকজন, না হয়েছে এখানকার

কোট খুলে রাখতে লজ্জা করে
মোহন কোট খুলছেনা কেন?
শুনছ! কোট খুলে ফেল!
আমি পারব না!
কেন কি হ'য়েছে?
আমার শার্ট যে ছেঁড়া... আর কেনবার মাত্র ২ মাস পরে!
হুঁঃ! নিশ্চয়ই ঠিক-মত কাচা হয়নি!
কিন্তু আমার স্ত্রী ত যথারীতি আছড়ে কাচে।
যা বলছি শোনো, আছড়ে কাচলে যে কোনও কাপড়েরই সুতা কেটে যায় আর তা ফেঁসে ও ছিঁড়ে যায়। না আছড়ে সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কেচে দেখ, কখনই অত শীগ্‌গির ছিঁড়বে না।
আছড়ে কাচার ফল
বাধিত হলাম, ভাই!
মিসেস মোহন
সানলাইটে সত্যিই না আছড়ালেও কাপড় সাদা ও ঝকঝকে করে কাচা যায়। এখন আমাদের কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন। সানলাইট পয়সা ও পরিশ্রম বাঁচায় বটে!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে
X 52 BG
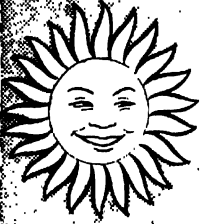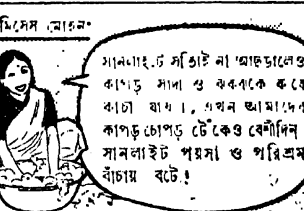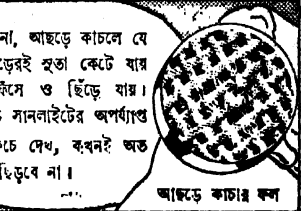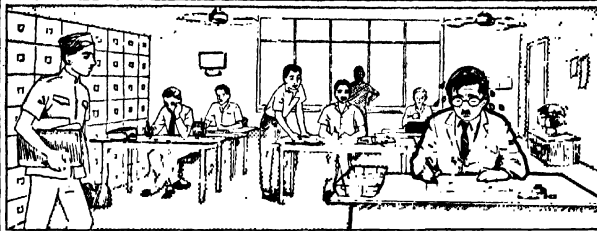
তেমন কোনো গোছগাছ, সুষ্ঠু-ব্যবস্থা···মাত্র যে ক'জন প্রবাসী-কর্ম্মী আপাততঃ এখানে বাস করছেন—তাঁরা নিজেরাই মিলে-মিশে কোনোমতে গোঁজামিল দিয়ে হাতে-হাতে সামাল্ দিয়ে চলেছেন তাঁদের ঘর-কন্নার যা কিছু কাজের ব্যবস্থা! ভারী অমায়িক, সজীব, সুন্দর ব্যবহার—মস্কোর ব্রহ্ম-দূতাবাসের এই ক'টি তরুণ-কর্ম্মীর···অন্তরঙ্গ-আলাপ-সৌজন্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা রীতিমত ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তুললেন আমাদের সঙ্গে। শ্রীযুত মঙ-ওন্ কোলকাতায় বাস করেছেন বহুদিন···কোলকাতা-বাসী আমাদের তিনজনকে পেয়ে তিনি তাঁর পুরোনো-আলাপী বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই খোঁজ-খবর নিলেন। যতদূর সম্ভব—আমরাও তাঁর আগ্রহ-কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করলুম। তবে, মজলিস্ বেশীক্ষণ জমানো সম্ভব হলো না সেদিন—কারণ, আমাদের তাড়া ছিল···আস্তানায় ফিরে বেশ-ভূষা পরিবর্ত্তন করে সন্ধ্যার পরই যাবার কথা—মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'মেট্রোপোল্ হোটেলে' সোভিয়েট-রাজ্যের সরকারী ভোজ-সভায়! কাজেই, কুমারী আলেক্‌জান্দ্রোভা গাড়ী ফেরৎ পাঠানোর খানিকবাদেই তখনকার মত মস্কোর ব্রহ্ম-দূতাবাসের তরুণ-বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিনজন ফিরে এলুম আবার আমাদের স্তাভয় হোটেলে!

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের দলের সঙ্গীরা সবাই তৈরী—ভোজ-সভায় যাবার জন্য! 'সোভ এক্সপোর্ত্ত-ফিল্মের' বন্ধু শ্রীযুত মস্কোভস্কী আর আভিটিসভ এসে বসে আছেন আমাদের সাদরে আহ্বান জানিয়ে সেখানে নিয়ে যাবেন বলে! তাড়াতাড়ি আমরা তিনজন তৈরী হয়ে নিলুম—তারপর রাত আটটা নাগাদ সদলে রওনা হওয়া গেল—'মেট্রোপোল্ হোটেলের' পানে।

'স্তাভয় হোটেল' থেকে পথে বেরুতেই দেখি—বাইরে আবার সুরু হয়েছে ওদেশী হৈমন্তী তুষার-বর্ষণের জের···পথ-ঘাট সব প্যাচপ্যাচ করছে···ঝিরঝিরে তুষার-কণিকা-গলা জল আর রাস্তার ধুলো-বালি-মেশা কাদায়···কনকনে-ঠাণ্ডা বাদুলা-বাতাস বইছে এলোমেলো ঝড়ের বেগে!

ওদেশের ক'খানি সুবৃহৎ সরকারী মোটর-যান মোতায়েন ছিল আমাদের জন্য···তাইতে চড়ে সোভিয়েট-বন্ধু মস্কোভস্কী, আভিটিসভ, আনাতোলী আর আলেক্‌জান্দ্রোভার সঙ্গে আমরা সদলে এলুম 'মেট্রোপোলে'!

সুবিশাল 'মেট্রোপোল্ হোটেলের' দরজায় এসে নামতেই—আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন—সোভিয়েট চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভার অন্যতম বিশিষ্ট কর্ম্মী আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ওদেশী-বন্ধু শ্রীযুত মস্কো-রেডিওর প্রতিনিধি বোরিশ কারপুশকিন্ এবং মস্কোর আরো কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-সেবী। তাঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর, প্রসঙ্গক্রমে, শ্রীযুত আব্রাহামভের মুখে খবর পেলুম যে সোভিয়েট-রাজ্যের চলচ্চিত্র-মন্ত্রী শ্রীযুত বোল্‌শাকভ ও তাঁর সহ-মন্ত্রী শ্রীযুত সিমিয়োনোভ বিশেষ জরুরী সরকারী-কাজে তাঁদের দপ্তরে হঠাৎ আটকে পড়ায় এখনও এসে হাজির হতে পারেননি এখানে···তবে শীগগিরই এসে পড়বেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে।

সমবেত সোভিয়েট-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে করতে হোটেলের দ্বার-প্রান্তে 'পরিচ্ছদ-জিম্মাগার' বা 'ক্লোক্-রুমের' (Clock-room) দিকে এগিয়ে সেখানকার বৃদ্ধ পরিচারকের হাতে সবেমাত্র আমাদের টুপী, ওভারকোট, গলাবন্ধ স্কার্ফ জিম্মা করে দিচ্ছি এমন সময় শ্রীযুত মস্কোভস্কী বলে উঠলেন,—ঐ যে শ্রীযুত সিমিয়োনোভও এসে পড়েছেন। তাঁর কথা শুনে সাগ্রহে হোটেলের প্রবেশ-পথের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখি—নিতান্ত সাধারণ-মানুষের বেশে বর্ষাতি-ওভারকোট গায়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে, পথের জল-কাদা মাড়িয়ে, পায়ে হেঁটে দরজা পার হয়ে বাইরে থেকে ভিতরে এসে ঢুকলেন সসাগরা-সুবিখ্যাত সোভিয়েট-রাজ্যের চলচ্চিত্র-বিভাগের সহ-মন্ত্রী শ্রীযুত সিমিয়োনোভ্! পথ-চলতি সাধারণ-মানুষের মত নিতান্তই সহজ-সরল-অনাড়ম্বর-ভঙ্গীতে তাঁর আগমন···দেশের শ্রদ্ধেয় সহ-মন্ত্রী মশাই আসছেন বলে কোথাও এতটুকু সোরগোল-সমারোহ বা রাজসিক-অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন নেই—রাষ্ট্রের বিশিষ্ট সরকারী-অনুষ্ঠানে তাঁর এমনি জাঁক-জমক-হীনভাবে আসা দেখে কার সাধ্য অনুমান করে যে, তিনি হচ্ছেন দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সুসমৃদ্ধ-রাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট কর্ণধার! অথচ, আমাদের দেশে আজন্মকাল দেখে আসছি যে, কোনো ছোটখাট সরকারী-বৈঠক কিম্বা সামান্য সভা-সমিতির অধিবেশনে যখনই রাষ্ট্রের কোনো মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, এমন কি মহকুমা-হাকিম, পুলিশ-সাহেব কিম্বা নগণ্য সরকারী-কর্ম্মচারীদের শুভাগমন ঘটে, তখন শুধু সভাস্থলেই নয়—আশপাশের এলাকাগুলিতেও যেন রীতিমত সোরগোলের সাড়া পড়ে যায়···তাঁদের অভ্যর্থনার সে কী বিপুল সমারোহ···পাহারার কত-খানি কড়াকড়ি-আয়োজন···খাতির আর স্তুতিবাদের আড়ম্বর···স্বার্থা-ন্বেষী-স্তাবকদের হুড়োহুড়ি···প্রভুর কৃপাদৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধঃস্তনদের মধ্যে যে নির্লজ্জ তোষামুদী আর রেশারেশির হিড়িক জাগে—তা আগাগোড়াই কেমন আদিখ্যেতার অভিনয় বলে মনে হয়। তাই, হোটেলের দরজার বাইরে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি মেলে দিয়েও যখন পথের ধারে কোনো মোটর-গাড়ী বা উর্দ্দি-পরা চাপরাশী-আর্দ্দালী কিম্বা তদ্বিরকারী সরকারী-কর্ম্মচারীদের ভাড় চোখে পড়লো না, তখন সত্যই অবাক হয়ে গেলুম—ও দেশের রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার এই বিচিত্র-অভিনব বৈশিষ্ট্যটুকু দেখে! মনে হলো, আমাদের নব-গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-অধিকর্ত্তারা নিজেদের পদ-মর্য্যাদার অহঙ্কার আর মেকী জাঁকজমক-আড়ম্বরের মোহ ত্যাগ করে এমনি সহজ-সরল-স্বাচ্ছন্দ্যে দেশের সাধারণ-মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে বেড়াতে শিখবেন কবে?···

হোটেলের ভিতরে এসে আমাদের দেখেই স্মিতহাস্যে অভিবাদন জানিয়ে, 'ক্লোক্-রুমে' তাঁর ছাড়া, বর্ষাতি-কোট, স্কার্ফ আর টুপী জমা রেখে, সাদরে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেলেন—দোতলার সুসজ্জিত 'লাউঞ্জে'···সেখানে একরাশ লাল-ভেলভেট্-মোড়া আসনে বসে জমলো আমাদের আসর।

শ্রীযুত সিমিয়োনোভ মজলিশী লোক···অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচিত্র রহস্যালাপে রীতিমত জমিয়ে তুললেন আমাদের মজলিশ। আলাপ-

সালাপের মাঝে লক্ষ্য করলুম—শ্রীযুত সিমিয়োনোভের সঙ্গে ওদেশী লোকজনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা···রাষ্ট্রের সহ-মন্ত্রী হিসাবে তাঁকে শুধু শ্রদ্ধাই করেন না—মন থেকে ভালোও বাসেন···আলাপ-আলোচনাও চালান নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে···তাঁদের এই মেলা মেশার মধ্যে কোথাও ব্যবধানের কোনো আড়ষ্টতা নজরে পড়লো না ! শ্রীযুত সিমিয়োনোভ আর সমবেত সোভিয়েট-বন্ধুদের অনেকেই তাঁদের দেশী-ভাষাতেই কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন আমাদের সঙ্গে···আর আমরা ব্যবহার করছিলুম ইংরাজী ভাষা—কারণ, বোরিশ আর আনাতোলী ছাড়া আমাদের দেশের বাঙলা-হিন্দী ভাষা বোঝবার আর কেউ সমঝদার ছিলেন না সেখানে। হাসি-গল্প, রঙ্গ-রসিকতার ফাঁকে-ফাঁকে ভারত আর সোভিয়েট দেশের নানান্ বিষয়ের নানান্ আলোচনাও চলছিল—এমনসময় হঠাৎ পিছন থেকে বিশুদ্ধ বাঙলায় কে যেন বলে উঠলেন—আসুন, আসুন···মুখুজ্যে-মশাই—এদিকে আসুন···বেশ জমিয়ে বসে আপনাদের দেশের খবরাখবর সব শোনা যাক্ !···

চমকে উঠলুম রীতিমত !···এমন খাঁটি-ঘরোয়া-বাঙলা ভাষায় কে কথা বলে—এই সুদূর বিদেশে ?···ছদ্মবেশী কোন বাঙালী এসেছেন নাকি এ সভায় ?···পরম কৌতূহলী হয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি—কিছু দূরে একটি বড় কৌচের উপর বসে বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক নাতি-দীর্ঘ সৌম্য-মূর্ত্তি রুশ-ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে মুচকে-মুচকে হাসছেন···চোখোচোখি হতেই তাঁর পাশের আসনটি দেখিয়ে তিনি সহাস্যে আহ্বান জানালেন—এখানে আসুন···নিরিবিলি বসে দু'টো বাঙলা কথা কওয়া যাক্···

তাড়াতাড়ি উঠে গেলুম তাঁর কাছে···প্রশ্ন করলুম,—এমন নিখুঁত বাঙলা ভাষা শিখলেন কোথায় ?···

স্মিত-হাস্যে রুশ-ভদ্রলোক জবাব দিলেন—আপনাদের দেশে আমি বাস করেছি অনেক দিন···প্রায় বছর তিনেক !···আমার মেয়েও কিছুদিন পড়াশোনা করে এসেছেন, আপনাদের দেশেরই দার্জ্জিলিঙ সহরের এক নামজাদা ইস্কুলে ! তাছাড়া আপনাদের কোলকাতা আর দিল্লী সহরে বহু পরিচিত-বন্ধু রয়েছেন আমার এখনও···তাঁরা মাঝে-মাঝে চিঠিপত্রও লেখেন আমাকে এখানে···আজও মনে রেখেছেন রীতিমত !

তাঁর জবাব শুনে কৌতূহল আরো বেড়ে গেল···পরিচয় নিয়ে জানলুম—রুশ-ভদ্রলোকের নাম—শ্রীযুত অরিয়েষ্টভ (B. V. Oreastov) ···সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী সংবাদ-পরিবেশন প্রতিষ্ঠান সুপ্রসিদ্ধ 'তাস্'-এর (Tass News Agency) মস্কো-কেন্দ্রের অন্যতম বিশিষ্ট-সাংবাদিক। কিছুকাল আগে ইনি 'তাস্' সংবাদ-পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং আমাদের দেশে সোভিয়েট-রাজ্যের বিবিধ সংবাদ-প্রচারের উদ্দেশ্যে সুপরিচিত 'সোভিয়েট দেশ' পাক্ষিক-পত্রিকাখানি প্রকাশনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এ ছাড়া সোভিয়েট রাজ্যে সম্প্রতি রুশ-ভাষায় লিখিত যে 'বিরাট' 'Encyclopedia' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে—সে-গ্রন্থে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তথ্য-বিবরণাদির সম্বন্ধে রচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রীযুত অরিয়েষ্টভের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি !

ছাত্র-জীবনে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্য ছিল আমার কলেজের বিশেষ পাঠ্য-বিষয়···তাই সোৎসাহে শ্রীযুত অরিয়েষ্টভের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে রীতিমত আলোচনা সুরু করে দিলুম। আমার আগ্রহ দেখে শ্রীযুত অরিয়েষ্টভ পরে তাঁর রচিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবন্ধ সম্বলিত রুশ-ভাষায় মুদ্রিত 'Encyclopedia' গ্রন্থের বিশেষ খণ্ডটি স্বয়ং এসে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর মুখেই শুনেছিলুম সেদিন, সেই রুশ-গ্রন্থে মুদ্রিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির আগাগোড়া মর্ম্ম ! শ্রীযুত অরিয়েষ্টভের রচিত প্রবন্ধটি সুরচিত হলেও, দুঃখের বিষয়, তাতে শোচনীয়ভাবে অপ্রকাশিত রয়ে গেছে এমন বহু প্রাচীন ও আধুনিক কৃতী বাঙলা-সাহিত্যসেবীর নাম—যাঁদের রচনা-গৌরবে আমাদের ভাষা আর সাহিত্য আজ রীতিমত সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁদের নামের বদলে এ-প্রবন্ধে এমন অনেক অপটু-আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ রয়েছে দেখলুম—যাঁদের সাহিত্য-রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠক-পাঠিকারাও আদৌ ওয়াকিবহাল নন ! বলা বাহুল্য, কর্ত্তব্য-হিসাবে প্রবন্ধের এ-ত্রুটির দিকে শ্রীযুত অরিয়েষ্টভের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিতে, আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে তিনি তখন জানিয়েছিলেন যে, এ-বিচ্যুতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দোষী হলেও, পরোক্ষভাবে এর জন্য দায়ী তাঁর ক'জন বাঙালী সাহিত্য-রসিক বন্ধু—যাঁদের দেওয়া তথ্য-বিবরণের উপর ভিত্তি করেই রুশ-ভাষায় এ-প্রবন্ধটি বিশেষভাবে লেখা ! প্রসঙ্গক্রমে, শ্রীযুত অরিয়েষ্টভ তখন আরো জানিয়েছিলেন যে, তাঁর রচনার এ-গলদটুকু তিনি অবিলম্বেই সংশোধন করে দেবেন···তবে জানিনা সে-ত্রুটি আজও সংশোধিত হয়েছে কিনা ! সে-খবরের সঠিক সন্ধান জানাতে পারেন—আমাদের দেশের সেই সব পর্য্যটকেরা—যাঁরা আজকাল সদ্য সোভিয়েট দেশে ঘুরে এসেছেন।

এমনি নানান্ বিচিত্র আলাপ-আলোচনায় জমে উঠেছিল সেদিন আমাদের আসর—সে-আসরে ক্রমে একে-একে এসে হাজির হলেন—সোভিয়েট-রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী তামারা মাকারোভা কোভালিয়োভা, আলিসোভা, ভেরা মারেৎস্কায়া, গালিনা, মঙ্গলোভস্কায়া, নীনা আর্খিপোভা, (এঁদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত International Film Festivalএ এসেছিলেন সোভিয়েট-রাজ্যের চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি দলের বিশিষ্ট-সদস্যা হিসাবে), সম্মানিত চলচ্চিত্রাভিনেতা ভ্লাদিমির্ ব্রাগিন্, বোরিশ চির্কভ, আলেক্-জাণ্ডার রোরিশভ, পাভেল কাদোশনিকভ (শেষোক্ত তিনজন, ভারতে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন—সোভিয়েট-প্রতিনিধি হিসাবে), মিখাইল কুজনেৎসভ, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালিকা ভেরা ষ্ট্রোইভা, চিত্র-নাট্য রচয়িত্রী মারিয়া স্মিরোনাভাইনিও সোভিয়েট চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যাহিসাবে ভারতে এসে-ছিলেন ১৯৫২ সালের আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে যোগ দিতে), সুবিখ্যাত প্রবীণ চিত্র-পরিচালক জোভশেঙ্কো, ব্রাওন্, লিওনিড ভার্লামভ (সোভিয়েট চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি দলের বিশিষ্ট সদস্যরূপে ১৯৫২ সালে ইনিও আমাদের দেশে এসেছিলেন International Film Festivalএ যোগদান

করতে), নবীন-পরিচালক আন্দ্রিউ ফ্রোলফ রাষ্ট্র-সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকর ইভান্ সোকোলনিকভ, আন্দ্রেই সোলোগুবভ, সোভিয়েট চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার বিশিষ্ট পরামর্শদাতা প্রাচ্যভাষাতত্ত্ববিদ নিকোলাই কুলেরিয়াকিন্ (শেষোক্ত তিনজনই ভারত-পর্য্যটনে এসেছিলেন ১৯৫২ সালের আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে সোভিয়েট রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে) প্রভৃতি গণ্যমান্য আরো অনেকেই। এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর সবে গল্প-গুজবে মেতেছি এমন সময় আমাদের আসরে এলেন ওদেশের শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র-মন্ত্রী শ্রীযুত বোল্‌শাকভ তাঁর দপ্তরের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রিগানভ! আমাদের দলের সবাইকার সঙ্গে পরিচয়ের পালা সুরু হতেই শ্রীযুত বোল্‌শাকভ রাষ্ট্রীয় কাজের চাপে তাঁর এই আকস্মিক-বিলম্বের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করে সুমধুর রসালাপে নিতান্ত ঘরোয়াভাবেই আলাপ জুড়ে দিলেন। আলাপ হতে দেখলুম—শ্রীযুত বোল্‌শাকভ রীতিমতই মজলিশী-লোক···বিরাট রাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব আর বিবিধ গুরু-দায়িত্বের চাপে তাঁর সাবলীল-সদালাপী-স্বাভাবিক সত্তার কোথাও এতটুকু চিড় খায়নি···আমাদের আর পাঁচজনের মতো দিব্যি সহজ-সরল সাধারণ-মানুষের ভঙ্গীতেই কথাবার্ত্তা চালালেন তিনি—বিন্দুমাত্র অ-সাধারণত্বের চিহ্ন নেই তাঁর হাবে-ভাবে-আচরণে···অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের নিতান্ত পরিচিত বন্ধু! ইংরাজী ভাষাতে তাঁর বেশ ভালো দখল—কাজেই কথাবার্ত্তারও সুবিধা হলো সবিশেষ।

ওদিকে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রিত ওদেশী চলচ্চিত্র-সেবীদের ভিড়ে আমাদের মজলিশ ক্রমেই ভরপুর হয়ে উঠছে দেখে শ্রীযুত বোল্‌শাকভ অবশেষে প্রস্তাব জানালেন যে—এবার সবাই বরং গাত্রোত্থান করে হোটেলের সুপ্রশস্ত খানা-কামরার টেবিলের ধারে বসে আসর জমানো যাক্! তাঁর প্রস্তাবমত সবাই যখন মেট্রোপোল্ হোটেলের খানা-ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছি—এমন সময় মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ (First Secretary) শ্রীযুত গাণ্ডেভিয়া (ইনি ইদানীং ইউরোপের বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূতরূপে নিয়োজিত রয়েছেন) এসে হাজির হলেন। তাঁর মুখে খবর পেলুম যে সোভিয়েট-রাজ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ শারীরিক-অসুস্থতার জন্য এ ভোজ-সভায় আজ যোগ দিতে পারবেন না। খবর শুনে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হলুম। শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ ছাড়াও সেদিন ওদেশের আরো যে দুজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-সেবীর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য ঘটেনি আমাদের—তাঁরা হলেন, চলচ্চিত্র- শিল্পগুরু-স্বনামধন্য শ্রীযুত পুডোভাকিন্, আর সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েট চিত্র-পরিচালক শ্রীযুত শিয়াউরেলি! শ্রীযুত বোল্‌শাকভের মুখে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলুম যে, শ্রীযুক্ত পুডোভাকিন্ হঠাৎ কঠিন নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী···দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এ-আসরে হাজির হতে না-পারার দরুণ তিনি বিশেষ অনুতপ্ত—তাই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সুন্দর একটি লিখে জানিয়েছেন তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন। ভোজ-আসরের বৈঠকেই শ্রীযুত বোল্‌শাকভ আমাদের সবাইকে পড়ে শোনালেন—শ্রীযুত পুডোভাকিনের সেই লিপিখানির মর্ম্ম! প্রসঙ্গক্রমে, তিনি আরো জানালেন যে, বাৎসরিক-অবকাশ উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে মস্কো-রাজধানীর বাইরে প্রবাসী থাকার দরুণ শ্রীযুত শিয়াউরেলির পক্ষেও আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এঁদের অনুপস্থিতিতে সে-রাত্রে আমাদের মজলিশের আনন্দ যে কতখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল—সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে শ্রীযুত বোল্‌শাকভ, সিমিয়োনোভ আর ওদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-সেবীদের সাদর-আপ্যায়ন, সুমধুর রসালাপ এবং বিচিত্র আন্তরিকতার পরশে সে-অভাবের রেশটুকু শেষ অবধি মুছে গিয়েছিল আমাদের মন থেকে।

বেশ খানিকক্ষণ জমিয়ে গল্প-গুজব করার পর, কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় শ্রীযুত গাণ্ডেভিয়াও অবশেষে বিদায় নিলেন আমাদের আসর থেকে। তবে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে কাজ শেষ করে ফেরার পথে তিনি আবার এসে যোগ দেবেন এ-মজলিশে!

অতঃপর ভোজন-পর্ব্ব!···পর্ব্বই বটে!···মেট্রোপোল্ হোটেলের বিরাট সুসজ্জিত খানা-কামরায় সুপ্রসারিত টেবিলের উপর থরে-থরে সাজানো রয়েছে—পান-ভোজনের পর্য্যাপ্ত-সম্ভার···কত বিচিত্র আহার্য্যের ডালি···প্রায় শ' দেড়েক নিমন্ত্রিতের ভূরি-ভোজের আয়োজন! পরিবেশনের ব্যবস্থাও পরম-পরিপাটি—কোথাও কোনো ত্রুটি নজরে পড়ে না! একে বিদেশী-ব্যাপার, তার উপর রাষ্ট্রীয় ভোজ-সভা···তাই, গোড়ায় আমাদের দলের সবাইকার মনে-মনেই ধারণা ছিল যে, এখানে আদব-কায়দার আড়ম্বর আর কড়াকড়ি থাকবে রীতিমত! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খানা-টেবিলে বসে দেখলুম—সে-সবের বালাই নেই এতটুকু···নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের ব্যবস্থা···পান থেকে চুণ খশলে অপদস্থ হবার আশঙ্কাও ঠাঁই পায় না ওখানে কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে···দিব্যি সহজ, সরল, স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার···মেকী-সামাজিকতা বা আনুষ্ঠানিক-আদিখ্যেতার লেশমাত্রও নজরে পড়ে না!

ওদেশী বন্ধুদের সঙ্গে খানা-টেবিলে বসতেই শ্রীযুত বোল্‌শাকভ সোৎসাহে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের সবাইকে সাদর-অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন করলেন···আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সুদূর ভারত থেকে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের ক'জন চলচ্চিত্র-সেবীর আলাপ-বন্ধুত্বের ফলে, ঐতিহ্য-গরিমায় অপরূপ পৃথিবীর এ দুটি সুপ্রাচীন দেশের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সাংস্কৃতিক ভাবধারা-আদর্শের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, পারস্পরিক শান্তি-সদ্ভাব রক্ষা আর আন্তরিক-সৌহার্দ্দ্য বিনিময়ের যে অভিনব মধুর-সম্পর্কের সূচনা হলো—কালে-কালে ক্রমেই যেন তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ ঘটে। এমনি নিবিড় বন্ধুত্ব আর সাংস্কৃতিক-সৌহার্দ্দ্য বিনিময়ের দরুণ, ভবিষ্যতে হয় তো একদিন সসাগরা-সুবিশাল এই দুই বিদেশী রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক আরো মধুর, আরো উন্নত হয়ে উঠবে···তখন হিংসা-দ্বেষ, হানা-হানি-দ্বন্দ্ব-আতঙ্কের কথা ভুলে এ দুটি বিরাট দেশের মানুষ পরস্পরের হাতে-হাত মিলিয়ে পরম-বন্ধুভাবে নিশ্চিন্ত শান্তি-সুখে এগিয়ে চলবে উন্নততর জাগতিক-কল্যাণের পথে!

শ্রীযুত বোল্‌শাকভের শুভ-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রবীণ

দলপতি 'মহর্ষিও' আবেগময়ী-ওজস্বিনী ভাষায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে ওদেশের চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভার সদস্য আর সোভিয়েট বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন—তাঁদের এই সাদর-নিমন্ত্রণ আর সদয়-আতিথেয়তার জন্য। 'মহর্ষি' বক্তৃতা দিলেন ইংরাজী ভাষায়···পাশেই ছিলেন বোরিশ কারপুশকিন—তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুশ-ভাষাতে তর্জ্জমা করে তার 'মর্ম্মটুকু আগাগোড়া বুঝিয়ে দিলেন—সমবেত সোভিয়েট-বন্ধুদের কাছে।

'মহর্ষির' পরে বক্তৃতা দিতে উঠলেন—ওদেশের সুপ্রসিদ্ধা প্রবীণা চিত্রপরিচালিকা শ্রীমতী স্ট্রোইভা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অতিথি ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করলেন—তাঁর যৌবনের এক অপরূপ স্মৃতির কথা···ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন তখন রাশিয়া পরিভ্রমণে! মস্কোর এক জনাকীর্ণ সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে এবং তাঁর সুমধুর বক্তৃতা শুনে নব-যৌবনা স্ট্রোইভা সেদিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন! বহু বছর সেই রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক—আমাদের ক'জনকে দেখে শ্রীমতী স্ট্রোইভার মনে আবার উদয় হয়েছে আজ অতীতের সেই সব রঙীন স্মৃতি!

খানা-টেবিলে আমার এক পাশে ছিলেন ওদেশী দোভাষী-সহচর-বন্ধু আনাতোলী, আর এক পাশে স্বনামধন্য প্রবীণ সোভিয়েট চিত্রপরিচালক শ্রীযুত জোভশেঙ্কো···রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ শুনে তাঁর মনেও ভেসে এলো কবি-গুরুর রাশিয়া-প্রবাসের পুরোনো স্মৃতি! শ্রীমতী স্ট্রোইভার মতোই রবীন্দ্রনাথকে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীযুত জোভশেঙ্কোরও···তাছাড়া কবি-গুরুর অপরূপ রচনাবলীর সঙ্গেও তাঁর কিছু-কিছু পরিচয়লাভ ঘটেছে—রুশ-ভাষায় অনুদিত বিবিধ তর্জ্জমা-গ্রন্থের মাধ্যমে। শুধু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেই নয়, ভারতের প্রশংসাতেও শ্রীযুত জোভশেঙ্কো দেখলুম রীতিমত পঞ্চমুখ! মনের আবেগে প্রবীণ রুশ-চিত্রপরিচালক বললেন যে, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে জন্মেছিল—ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অনুরাগ! ছাত্রাবস্থায় তিনি গভীর-আগ্রহে শুনতে ভালবাসতেন—সে-দেশের প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের ইতিহাস···নদী-গিরি-বন-জনপদ—বিচিত্র ভৌগলিক-বিবরণ···ফল-ফুল-লতা আর অভিনব প্রাকৃতিক-সম্পদের কথা···সামাজিক রীতি-নীতি, পূজা-পার্ব্বণ আর শিল্প-সাহিত্যের নানান্ অপরূপ কাহিনী! তারপর যৌবনে, চিত্র-পরিচালনার কাজে, রুশ-রাজ্যের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমান্তে সুদূর মঙ্গোলিয়ার গোবি-মরুভূমির প্রান্তে—উজবেকিস্তান্, কাজাক্স্তান্, তুর্কমেনিয়া অঞ্চলের আশপাশে—শিংকিয়াঙ পর্ব্বতমালার কোলে আফগানিস্তান্ আর তিব্বত রাজ্যের সীমা-রেখার ধারে-ধারে পরিব্রাজনাকালে তার অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টির সামনে একে-একে উন্মোচিত হলো—ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা-ইতিহাসের বহু অভিনব-অপরূপ নিদর্শন! অতীত-ভারতের প্রাক্-বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ-যুগের শিল্প-সংস্কৃতির এই সব বিচিত্র নিদর্শন দেখে মন তাঁর অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল—বুদ্ধের অহিংসা-শান্তির মন্ত্রে! রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানগর্ভ-ছন্দোময় রচনাবলী থেকেও শ্রীযুত জোভশেঙ্কো সন্ধান পেয়েছেন ভারতের চিরন্তন ভাবধারা-আদর্শের মৌলিক তথ্যটির!

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত জোভশেঙ্কো কৌতূহলী হয়ে জানাতে চাইলেন যে—রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা আমার? এ কথার উত্তরে, তাঁকে সবিনয়ে জানালুম—শুধু চোখে দেখা নয়, কবি-গুরুর সঙ্গে বাক্যালাপেরও সুযোগ মিলেছে কয়েকবার!

জবাব শুনে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন প্রবীণ জোভ্শেঙ্কো··· তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়নি বটে, তবে তাঁর এক রুশ-প্রবাসী আত্মীয়ের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার বার্লিনে—অনেক বছর আগে! দীর্ঘদিনের না-দেখাশোনার ফলে, বৃদ্ধ বয়সে আজ তাঁর পুরো নামটি সঠিক মনে পড়ছে না বটে, তবে তিনিও ছিলেন কি যেন 'ট্যাগোর্' (Tagore)···দিব্যি গৌরকান্তি, সুশ্রী দীর্ঘকায়—তাঁর চেহারা···রুশ-ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারতেন···ভারী অমায়িক সদালাপী ভদ্রলোক···শিল্প-সাহিত্যেও জ্ঞান ছিল বেশ!

বর্ণনা শুনে, মনে পড়লো শ্রদ্ধেয় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। বহু বছর আগে মস্কোতে আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদীদের বিশেষ বৈঠকের অধিবেশনে যোগদান করতে অন্যতম ভারতীয় সদস্য হিসাবে তিনি গিয়েছিলেন রুশদেশ সফরে। নামোল্লেখ করতেই শ্রীযুক্ত জোভশেঙ্কো অবিলম্বে চিনতে পারলেন তাঁর পুরোনো বন্ধুকে। সোৎসাহে প্রশ্ন করলেন—পরিচয় আছে তাঁর সঙ্গে? জবাব দিলুম—বিলক্ষণ! শুধু পরিচয় নয়···ঘনিষ্ঠতাও আছে রীতিমত। সম্পর্কে তিনি আমার পূজ্যপাদ আত্মীয়! প্রবীণ জোভশেঙ্কো উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন—তাহলে একটি অনুরোধ রাখতে হবে আমার! দেশে ফিরেই তাঁকে আমার কথা বলবেন! বলবেন যে, তাঁর সেই প্রবাসী-দিনের রাশিয়ান-বন্ধু জোভশেঙ্কো আজও এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ-বয়সে তাঁর কথা ভোলে নি!

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট-রাজ্যে সফর সেরে দেশে ফিরে এসেই শ্রদ্ধাস্পদ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রীযুত জোভশেঙ্কোর কথা জানিয়েছিলুম—তিনি অবিলম্বে চিনেছিলেন তাঁর যৌবনের সেই ভারত-অনুরাগী পুরোনো রুশ-বন্ধুটিকে!

এমনিভাবে খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকেই পুরোদমে চলেছিল আমাদের সঙ্গে ওদেশী বন্ধুদের নানান্ আলাপ-আলোচনা আর রঙ্গ-পরিহাস। আনন্দ-উৎসাহের ঝোঁকে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে নানান্ শুভ-সম্ভাষণ জানালেন, সরস-বক্তৃতা দিলেন···অটোগ্রাফের পাতায়, নিমন্ত্রণ-পত্রের উপর, নোট-বুকের কোনে, সিগারেটের বাক্সের ডালায়, ভোজ-সভার খাদ্য-তালিকা অর্থাৎ 'Menu-Card"এর কাগজের পিছনে পরস্পরের শুভেচ্ছা-বাণী আর হাতের সই সংগ্রহ করার ধুম পড়ে গেল! এ-সব অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে শ্রীযুত বোল্শাকভ ১৯৫২ সালে ভারতের আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (International Film Festival) যোগ দিতে সোভিয়েট-দেশ থেকে যে-সব বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-সেবীরা যাবেন—তাঁদের সবাইকার সঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমাদের দলের অন্যতম মহিলা-সদস্যা শ্রীমতী দুর্গা খোটে ভারতীয় মহিলাদের তরফ থেকে সোভিয়েট-দেশের মেয়েদের সাদর 'শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানালেন! এমনি ভাবে চললো পরস্পরের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের পালা! ·দেখলুম, ও দেশের ভোজ-সভায় খানা-পিনার ব্যাপারটা হলো নিতান্তই গৌণ···মুখ্য-উদ্দেশ্য হলো প্রাণ খুলে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব আর মনের আনন্দে মজলিস্ জমানো! তাই কমপক্ষে ঘণ্টা দুই-তিনের আগে ওদেশের কোনো ভোজ-সভাই শেষ হতে দেখা যায় না বড় বিশেষ···মজলিস্ একবার জমে উঠলে ওদেশী লোকজনকে মহানন্দে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, এমন কি, সারা রাত কাটিয়ে দিতে দেখা যায় খানা-টেবিলের সামনে বসে।

কাজেই ওদেশী প্রথামতে, খাওয়া-দাওয়ার পর্ব্ব চুকিয়ে মেট্রোপোল্ হোটেলের ভোজ-সভা থেকে আমাদের আস্তানা হোটেলে যখন ফিরে এলুম—রাত তখন প্রায় আড়াইটে! (ক্রমশঃ)

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রাইকমল' বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই রসাশ্রিত কাহিনীটি একদিকে মধুর ও অপরদিকে কাব্যময়। সম্প্রতি অরোরা ফিল্মস্ কাহিনীটি চিত্ররূপায়িত করিয়া রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ একটি কঠিন

রাইকমলের কমল—শ্রীমতী কাবেরী বসু—সাধারণ বেশে

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

কাহিনী যাহা কেবল অন্তরে গ্রহণীয় ভাবপ্রকাশের অবকাশ কম, তাহাকে চিত্রে রূপায়িত করা সহজসাধ্য নয়। এই দুরূহ কাজ বেশ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন পরিচালক শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র ও তাঁহার শিল্পীগোষ্ঠী। চিত্রনাট্য রচনার দুর্বলতা অবশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অভিনয়ে, গানে, নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনার চমৎকারিত্বে সমগ্র চিত্রটি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেম-মাধুর্য্য যেখানে কাহিনীর সবচেয়ে বড় প্রতিপাদ্য বিষয়, সেখানে কেবলমাত্র তাহাকে প্রকাশ করিয়া যাওয়াই চিত্র-রূপায়ণের প্রধান কাজ। এ কাজ পরিচালক মহাশয় যথারীতি করিয়াছেন—ইহাই সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা।

প্রখ্যাত কাহিনীকার 'রাইকমলে'র কাহিনী যে সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সমাজে কণ্ঠিবদল চলে। মেয়েদের পক্ষে পুনর্বিবাহ চলে, কিন্তু তথাপি তিনি তাহা করেন নাই। তিনি সেই প্রেমকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, যে প্রেম শুদ্ধ, নির্ম্মল, পবিত্র, যে প্রেম বৃন্দাবনের মধুর লীলায় লীলায়িত। তাই, রাইকমলের

বর্তমানে অতিজনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী—শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়

কমলিনী, কৃষ্ণ-বিরহিণী, তপস্বিনী। শুদ্ধা ভক্তি, ভালবাসার মূর্ত্ত-প্রতীক। যাহা ধ্যানের বস্তু, ধারণার বস্তু—তাহার বহিঃপ্রকাশ নাই। তথাপি, মনের তন্ত্রীতে আঘাত হানিয়া ছবির মাধ্যমে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া ধরিবার

চেষ্টা করা হইয়াছে। কাহিনী শেষ হইয়াছে মৌখিক বিবৃতির দ্বারা।

কাব্যরস অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয়। তাহার শেষ নাই। স্রোতস্বিনীর ন্যায় সেও গতিশীল। কাজেই এই গতির মাঝে আড়াল না দিয়া তাহাকে প্রবাহমান রাখাই উচিত। তাই রসিকদাস ছবি শেষ হইবার পূর্ব্বে কমলিনীর জীবন-কাব্য কোন্ দিকে প্রবাহিত হইল তাহা বলিয়া দিয়া ছেদ টানে। কাব্য-ধর্মী কাহিনীর ইহাই—চরম এবং পরম

শ্রীমতী মঞ্জু দে তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের 'উপহার' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

পরিণতি। এই সকল সুষ্ঠু রুচিজ্ঞানের দ্বারায় 'রাইকমল' গুণান্বিত!

অশিক্ষিত সমাজের কাহিনী! কিন্তু বিদগ্ধ-সমাজ তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা দিয়াছেন। কেন?—গতানুগতিক হাল্কা কাহিনী নয়—রাইকমল। শুক্তির মধ্যে মুক্তা লুকিয়ে আছে রাইকমলে। তাই রাইকমল এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সঙ্গীত-বহুল কাহিনী রাইকমল। তাই গান তার প্রাণ-সম্পদ। সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীপঙ্কজ মল্লিক সুর-ধারায় তাহাকে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছেন। সুরের মোহ-মায়ায় তিনি সকলকেই আবিষ্ট রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কমলের ভূমিকায় নবাগতা কাবেরী বসু সুষ্ঠু অভিনয় দ্বারা সকলকেই অভিভূত করিয়াছেন। এই তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম চিত্রাবতরণ। বিখ্যাত কাপ্-ষ্টিক্ যেখানে অভিজ্ঞ শিল্পীদেরও অনেক সময় ভড়কাইয়া দেয়, সেখানে নূতনের পক্ষে দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় সহজ কথা নয়। তাঁহার সঙ্গীতের সহিত মুদ্রা অপূর্ব্ব। বাচনভঙ্গীর অস্পষ্টতা মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও, সব মিলাইয়া তিনি কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নব-জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হউক—এই কামনা করি। অন্যান্য ভূমিকায় উত্তমকুমার, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যথাযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। নিতীশ মুখোপাধ্যায় রসিকদাসকে চিত্রিত করিবার জন্য যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। যদুভট্টের ওস্তাদ ও রাইকমলের রসিকদাস তাঁহার এবছরের উল্লেখযোগ্য অভিনয়। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

কমলকে আগাগোড়া নগ্ন গাত্রে রাখিয়া কানু ও অন্যান্য চরিত্রগুলিকে জামাজোড়া পরান, শুধু বিসদৃশ লাগে নাই—পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষেও ইহা প্রতিকূল হইয়াছে।

* * * *

বর্ত্তমানে সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানপদে বোম্বাই সরকারের অন্যতম বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ মানকালি অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছেন। মিঃ এন্, ভাটনানীও (ফিল্মস্ ডিভিসন) ছুটীতে আছেন। কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যবিভাগের অধীনে আকাশবাণী, ফিল্মস্ ডিভিসন ও সেন্সর বোর্ড এই তিনটী বিভাগেরই প্রধান কর্ম্মসচিবের পদ খালি আছে। অথচ অস্থায়ীভাবে অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা এ কাজ চালান হইতেছে। দেশে যোগ্য ব্যক্তিদের অভাব নাই। সরকার এ বিষয়ে বিজ্ঞাপিত করিলেই অস্থায়ীর পরিবর্ত্তে, স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন।

* * * *

গত ১৯৫৪ সালে ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন ভাষ তোলা ছবির সংখ্যা—২৫০ খানি। পৃথিবীর মধ্যে ছবি উৎপাদন ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানাধিকা

ছিল। বর্ত্তমানে জাপান ৩৭৩ খানি ছবি তুলিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানে ছবির উৎপাদন সংখ্যা যে ভাবে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার, তাহাদের পক্ষে আসন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য পূর্ব্বের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রধান ধারক ও বাহক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রতি বোম্বায়ে স্বর্গত সংগীত-শিল্পী কুন্দনলাল সাইগলের জীবন-কাহিনী চিত্ররূপায়িত করিতেছেন

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

* * * *

ভারতীয় চিত্র-শিল্পের প্রধান দুইটী কেন্দ্রে বোম্বাই ও কলিকাতার প্রযোজক, পরিবেশক, চিত্রগৃহ, রসায়নাগার ও ষ্টুডিওর একটী আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হইল। ইহা হইতে এই ব্যবসায়ে প্রসার, প্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তা অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতীয় চিত্র ব্যবসায়ে আনুমানিক ৪২ কোটী টাকা লগ্নী আছে। ইহার মধ্যে ষ্টুডিও, লেবরেটরী ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ ৬ কোটী টাকা, চিত্রগৃহের জন্য ২৬ কোটী টাকা, প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠানে ১০ কোটী টাকা খাটিতেছে। ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চিত্র-শিল্প দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

আনুমানিক সংখ্যা :—	কলিকাতা	বোম্বাই
পরিবেশক প্রতিষ্ঠান	১১১	৯৩
রসায়নাগার	৮	১৪
প্রযোজক প্রতিষ্ঠান	১৪২	৩০১
ষ্টুডিও	১১	২৬
চিত্রগৃহ	৭৮*	৬৭
কলিকাতা ও বোম্বাই সহর ব্যতীত মফঃস্বলের চিত্রগৃহের সংখ্যা	১৮৭	৩১৭

* কলিকাতা সহর ব্যতীত হাওড়ার চিত্রগৃহের সংখ্যা ১৮

দ্বীপান্তর

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে দিয়েছ তুমিও দ্বীপান্তর,
নীল জলে ঘেরা সাগরের সীমানায়
তুমি নাই সেথা যতদূর চোখ যায়,
আমি জাগি একা—প্রেমহীন প্রান্তর।
আজ বুঝি তব প্রেম হল নিঃশেষ
শেষ হয়ে গেল, ভালোলাগা, ভালোবাসা।

পরাণে নাহি কি আর কিছু অবশেষ ?
চোখের তারায়, জড়ানো কি নেই নেশা ?
এ' বেলা-ভূমি পড়ে আছে নিঝ্‌ঝুম,
ব্যথা জমে রয় প্রাণে শুধু থরে থরে,
বেদনার জল ব্যথার সাগরে গড়ে,
তুমি নাই তাই, চোখে নাহি নামে ঘুম।

পরিচালক—উপানন্দ

শিক্ষা ও মহাপুরুষের বাণী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি—তোমরা পার ;—মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম্ম খাড়া কর ; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য।' মানুষের মধ্যে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরাই মহাপুরুষ।

মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে, এঁরা আসেন লোক শিক্ষার জন্যে, চলে যান লোককে শিক্ষা দিয়ে—এঁদের বাণী জগতে অমর হয়ে আছে। ওঁরা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলেছেন, অসাধ্য সাধন করে মানুষের মত মানুষ হয়ে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। মানুষ যেখানে বলে—পথ চলা আমার অসাধ্য, আমার দ্বারা কঠিন কাজ হবে না, আমি দুর্ব্বল, আমি শ্রান্ত, মহাপুরুষ বলেন—স্থির হয়ে স্থবিরের মত থাকা তোমার অসাধ্য—চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে চলো, কোন কাজই কঠিন নয়—অসম্ভব নয়। তোমার দ্বারা সব কাজ সম্ভব, কেন না তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র—'

এঁদের যা অনুশাসন, তা শুনতে অত্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারলে, মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করা যায়, মানুষের মত মানুষ হয়ে মহত্তম আদর্শের স্পর্শ পাওয়া যায়। আদর্শ ভিন্ন জীবনে সুখ ও উন্নতি হোতে পারে না। যার উন্নত লক্ষ্য নেই, তার জীবনের সুখ কোথায়? উন্নত লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা ও কার্য্যেই সুখ। যিনি উন্নত লক্ষ্য নিয়ে সংসার পথে চলতে থাকেন, তিনি এই পৃথিবীকে সুখময় কার্য্যক্ষেত্র বলে মনে করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিজের উন্নতি সাধন করে যশের মুকুট পরিধান করেন—আর জগতে একজন আদর্শ পুরুষ বলে সমাদর পেয়ে থাকেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস তাঁর একটি দোঁহাতে বলেছেন—

তুলসী যব জগমে আয়ো, জগ হাসে তোম রোয়।
এইসী করনী কর চলো কি তোম হসো জগ রোয় ॥

তুলসী! তুমি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করলে, সে সময়ে পৃথিবী হেসেছিল আর তুমি কেঁদেছিলে, এমন কাজ তুমি করে যাও যার ফলে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো, আর পৃথিবী তোমার জন্যে কাঁদে।

মহাপুরুষেরা মানুষকে দুর্গম পথে ডেকে দুর্ল্লভের সন্ধান দিয়ে থাকেন, এজন্যেই মানুষ এঁদের শ্রদ্ধা করে। কেননা এঁরা মানুষকে শ্রদ্ধা করেন—দীনহীন তুচ্ছ নগণ্য বলে কাউকে অবজ্ঞা করেন না। বাইরে এঁরা মানুষের যত দুর্ব্বলতা, যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন, তবু এঁরা নিশ্চয়ই জানেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ দুর্ব্বল নয়, শক্তিহীন নয়। তার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাইরের জিনিস ; সেইটাই মায়া। এজন্যে মহাপুরুষেরা যখন শ্রদ্ধা করে মানুষকে আদর্শের পথে ডাক দেন, তখন সে তার মায়াকে, তার মূঢ়তাকে ত্যাগ করে সত্যকে চিনতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখতে পায় আর সেই সত্য স্বরূপে বিশ্বাস করা মাত্র সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তার মধ্যে তখন আত্মবিশ্বাস প্রকট হয়। তখন সে বিস্মিত হয়ে দেখে, ভয় তাকে ভয় দেখাচ্ছে না, দুঃখ তাকে দুঃখ দিচ্ছে না, বাধা তাকে পরাজিত করছে না, নিষ্ফলতাও তাকে নিরস্ত করতে পারছে না—সে চলেছে এগিয়ে উৎসাহে আনন্দে শত বাধা ঠেলে। সে হঠাৎ দেখতে পায়—ত্যাগ তার পক্ষে সোজা, ক্লেশ তার পক্ষে আনন্দময়, মৃত্যু তার পক্ষে অমৃতের আস্বাদ। এজন্যেই মহাপুরুষের বাণী উপলব্ধি করবার জন্যে সৎশিক্ষার প্রয়োজন, আর শিক্ষার ওপরই নির্ভর করে মানুষের চরিত্র গঠন। চরিত্রহীনতার জন্য শিক্ষাই দায়ী। আডিংটন ব্রুস বলেছেন, যে সব ছেলেমেয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি লাভ করে, তাদের পিতামাতা শৈশবের শিক্ষাকেই আশ্চর্য্য বুদ্ধি বিকাশের কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন। অনেকে মনে করেন অপ্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণে শিশুদের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সেটী ভুল ধারণা। ডাক্তার বোরিস্ সিডিসের পুত্র এগারো বছর বয়সে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন করে হার্ব্বার্ড কলেজে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। অধ্যাপক লিয়ো উইনারের পুত্র নোবার্ট চৌদ্দ বছর বয়সে টাফ্‌টস কলেজ থেকে উপাধি লাভ

করে, আর তাঁর অন্যান্য সন্তানেরাও এ বিষয়ে নোর্ব্বাটের প্রায় সমকক্ষ হয়ে ওটে। অধ্যাপক নিরো বলেছেন—"শিশুদের কাছে মা বাপের সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা উচিত। প্রথম থেকেই শিশুরা যেন আপনার চারিদিকে তাদের জ্ঞান পিপাসা বাড়িয়ে তুল্‌বার উপকরণ দেখ্‌তে পায়। ইঙ্গিত মাত্র লাভ করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় সুন্দর শিক্ষা হয়। শিশুদের ইঙ্গিতের এইরূপ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া দরকার। চিন্তা করতে শিক্ষা দেওয়াই শিশু শিক্ষার প্রধান কথা। তার শিক্ষার ভিত্তিমূল চিন্তাশক্তির ওপর গঠিত হোলে সে যে কোন বিষয়েই আলোচনা করুক না কেন, তাতেই এই শক্তি নিয়োজিত করে উন্নতি লাভ করবে। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে বুদ্ধি বৃত্তিকে এভাবে ভেতর থেকে ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা করা হয় না, স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে বাইরে থেকে কেবলই তাদের অভাব পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে, সামান্য প্রশ্নের মীমাংসার জন্যেও পরমুখাপেক্ষী হয়, আর এ জন্যেই অর্থ পুস্তকের জন্যে লালায়িত হওয়া ভিন্ন তাদের গত্যন্তর নেই।

সন্তানের শিক্ষা কতকটা পরিমাণে পিতামাতার ওপর নির্ভর করে। মনুষ্যসন্তান বুদ্ধি নিয়েই জন্মায়; তার সেই বুদ্ধিবৃত্তি যদি শিক্ষা দ্বারা বিকশিত না হয়—কিম্বা যদি কুশিক্ষায় তা কুপথে চালিত হয়, তা হোলে শিশুকে যাঁরা লালনপালন করছেন তাঁরাই এর জন্যে দায়ী। পিতা-মাতার একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তাঁদের প্রত্যেক সন্তানেরই বুদ্ধিমান হয়ে গড়ে ওঠ্‌বার শক্তি আছে, অপেক্ষা কেবল তাঁদের যথোচিত চেষ্টার দ্বারা শিশুর সেই সুপ্তবুদ্ধি জাগানোর। সন্তানদের স্বাভাবিক শক্তিগুলি যাতে যথোচিতভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে তার জন্যে সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অভিভাবকগণকে সচেষ্ট হোতে হবে। পরিবারই শিক্ষার প্রথম ক্ষেত্র। পরিবারের ভাব, চিন্তা, রীতিনীতি প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা জ্ঞাতসারেই হোক, অজ্ঞাতসারেই হোক অনুকরণ করে, এজন্যে পরিবার সৎ হওয়া দরকার।

বাল্যকালই শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়টি নষ্ট হোলে, জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। শুধু অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, জ্ঞানলাভ ও চরিত্র সংগঠনও এর মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষায় স্মৃতিশক্তির বিশেষ অনুশীলন হোলেও চিন্তাশক্তির সম্যক বিকাশ হয় না, ফলে অনেক সময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করে না। এর জন্যে ছেলেমেয়েরা দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে সাম্প্রতিক শিক্ষা ব্যবস্থা পদ্ধতির দুর্ব্বল পরিবেশ।

কোমল মৃত্তিকা দিয়ে যেমন ইচ্ছামত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যেতে পারে, শিশুর সুকুমার প্রকৃতিও সেই রকম সহজে শিক্ষিত ও গঠিত করা যেতে পারে। স্যার উইলিয়ম জোন্স বহুভাষায় অদ্ভুত পাণ্ডিত্য লাভ করে-ছিলেন। কথিত আছে, বাল্যকালে যখনই তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হোতেন, তখনই তাঁর জননী বল্‌তেন—'পড়্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে—' এইরূপে বাল্যকাল থেকেই তিনি মায়ের কাছে স্বাবলম্বন শিক্ষা করে ছিলেন। এই স্বাবলম্বন বলেই তিনি উত্তরকালে অসীম বিদ্যাবত্তা লাভ করেছিলেন।

জীবনকে আজ নতুন আলোকে দেখ্‌তে শিখ্‌তে হবে—তোমাদে ছেলেবেলা থেকে নানাভাবে শিক্ষা পেয়ে, আর মহাপুরুষের বাণী অবলম্ব করে। এমনভাবে তোমাদের মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তোমাদের মধ্যে ভদ্রতা, ভব্যতা, বিচারশক্তি, গুরুজনের প্রতি, প্রতিবেশী প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম, সমাজবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এজন্যে ছেলেবেলা থেকেই তোমরা প্রস্তুত হও। শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে মনকে রেখে দিলে হবে না, বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, ভাবতে শিখতে হবে, আর মানুষের মনকে যে-লেখা দোলাবে, সে-লেখা লিখবার উপকরণ সংগ্রহ করবে ভাব ও ভাবনা, পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনার ভেতর দিয়ে নব সৌভাগ্যলব্ধজাতির ভাবী উত্তরাধিকারী তোমরা। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে অনেক দুঃখের মধ্যেও তোমাদের বহু মহত্ত্ব অর্জ্জন করতে হবে। নতুন জীবন-যাপন-বিজ্ঞান আজ যা রচিত হচ্ছে, তার সূত্রগুলি তোমাদের আয়ত্ত করবার জন্যে কঠোর সাধনার দ্বারা রীতিমত শিক্ষা লাভ করতে হবে। উদ্দেশ্যহীন গতিকেই যদি তোমরা প্রাণধর্ম্ম বলে গ্রহণ করো, তা হোলে জাতির অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাবে, দেশও মৃত্যুমুখে অচেতন হবে। এই কথাটা স্মরণ করে তোমাদের জীবনের নূতন যাত্রা পথে এগিয়ে চলো দ্রুতভাবে। তোমরা জেনো পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা সকল রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারে। সমগ্র দেশ তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তোমরা মানুষ হও, তোমরা মহৎ হও।

মিল

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

মিল খুঁজে হয়রান্ ওপাড়ার হারু শীল,
মিলগুলো মগজেতে করে শুধু কিলবিল।
"হীরাঝিলে ঝিক্‌মিক্ করে কেন মৎস্য ?"
শুধায় সে বেমক্কা, "বল দেখি বৎস ?"
"কিল খেয়ে খিল্ খিল্ হাসে কেন শিশুরা,
দরজায় খিল কেন দেয়নাকো বিশুরা ?
চিল খেয়ে চিল দেখো উড়ে যায় আকাশে :
পিল পিলে পিপ্‌ড়েরা কোথা পাবে পাখা সে ?
দিল্ খোলা মানুষের সন্ধান পেতে চাও ?
গিলগিটু বন্দরে সরাসরি চলে যাও !

বিলে বেল নেই কেন? তিলে কেন তৈল?
শিলাবৃষ্টির শিল খায় কেন শৈল?
প্রকৃতি সবুজ দেখো, নভো রয় ঘন নীল,
মিলের জগতে কভু হতে পারে গরমিল?"

—

বিলেতে দু'বছর

(কিশোর রচনা)

জয়ন্ত আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নয়

ছুটির পর নিউ এণ্ড স্কুল ছাড়তে হল। কারণ আমরা বাড়ী বদলালাম। ঐ স্কুল ছাড়ার পর খুব খারাপ লাগছিল। নতুন স্কুল কেমন হবে ভেবে। এইবার যে বাড়ীতে এলাম সেটা Swiss Cottage-এর কাছে N. W. 5. এই বাড়ীটা এক ভারতীয়র, তবে সে বাঙালী নয়। ও বাড়ীতে একটা ছেলে ও মেয়ে ছিল। বাড়ী দেখে আমার পর ছোড়দা এসে বলল বাড়ীটা ভালই—তবে মুশকিল হচ্ছে বাড়ীর উপর বাড়ীওয়ালার সম্পূর্ণ হাত নেই। আমি বললাম কেন? ছোড়দা বলল, বাড়ীওয়ালার ডান হাতটা কোন অ্যাকসিডেন্টে ভেঙে গিয়েছে। যখন ওবাড়ীতে গেলাম তখন দেখলাম সত্যিই তার ডান হাতটা ভাঙা। ওদের বাড়ীর ছেলেটার বয়স সাত আট হবে কিন্তু দেখে পাঁচ বছরের বেশী মনে হয় না।

মে ফ্লাওয়ার স্কুল

মেয়েটার বয়স এগারো, নাম পিলু। বাড়ীওয়ালার নাম মিঃ সারশ। তিনি বললেন, সেন্ট জনস উডের কাছে একটা ভাল স্কুল আছে নাম Barrow Hill School সেখানে আমাকে ভর্ত্তি করালে ভাল হয়। যদিও সেখানে বাসে করে যেতে হবে। পরদিন আমি মামণির সংগে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলাম। সংগে নিউ এণ্ড স্কুলের সার্টিফিকেট ছিল। নিউ এণ্ড স্কুলে যত পড়েছি তার তুলনায় আমার টপ ক্লাসে ভর্ত্তি হবার কথা, কিন্তু সীট ছিল না বলে এক ক্লাস নীচুতে ভর্ত্তি হতে হল। অর্থাৎ নিউ এণ্ড স্কুলে যে ক্লাসে আমি পড়তাম। সোমবার ঐ স্কুলে আমি গেলাম। আমাদের ক্লাসরুম চারতলায়। টীচারের নাম মিসেস নোবল। আমাদের ক্লাস রুমটা খুব পরিষ্কার। সারা দেয়ালে ছেলেদের আঁকা নানা ছবি রয়েছে। একপাশে বিরাট এক টেবিল—তার গায়ে লেখা রয়েছে 'নেচার টেবল'—তার উপর অনেক পাতাটাতা রয়েছে। এছাড়া একটা জারে রয়েছে ছটা লাল নীল মাছ। এক সপ্তাহ ঐ স্কুলে গিয়েই বুঝলাম এই স্কুলটায় ছেলেমেয়েদের অনেক কাজ করতে হয়। প্রত্যেকটি কাজের জন্য দু তিনজন করে মনিটার থাকে এক সপ্তাহ করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি পেণ্ট মনিটার হলাম, অবশ্য শুধু আমি নই আমার সংগে আরো দুজন। আমাদের কাজ সপ্তাহে যে দুদিন আর্ট লেসন থাকে সেই দুদিন আর্ট রুমে গিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা এবং রং, তুলি, কাগজ ইত্যাদি ঠিক করা এবং আর্ট লেসন শেষ হলে সব রং তুলি ধুয়ে তুলে রাখা। কাজটা খুব সহজ ছিল না; কারণ চল্লিশ জন ছেলের রং রাখবার প্লেট তুলি ধুয়ে রাখা সহজ নয়। আমাদের ক্লাসে চারটে রো ছিল। এ, বি, সি ও ডি। এ হচ্ছে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেদের জন্য। বি হচ্ছে যারা খুব ভাল কিন্তু একটু অসাবধানী। সি ও ডি মাঝামাঝি এবং যারা কম জানে তাদের। আমি বি রোতে ছিলাম।

আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল—সাইমন হিল বলে একজন ছেলের সংগে। সে খুব ভাল ছেলে। সাইমন ফ্রেঞ্চ ও ল্যাটিন জানত। সে আমাকে কিছুদিন ল্যাটিন শেখাবার চেষ্টা করেছিল। কিছুদিন একটু একটু করে শিখে হঠাৎ একদিন তার সংগে আমার সামান্য কারণে ঝগড়া হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ী বদলালাম। এলাম গোল্ড হার্ষ্ট টেরাসে। তখন আমরা অনেক জায়গায় বেড়াচ্ছিলাম। এপিং ফরেষ্ট, হ্যাম্পটন কোর্ট, রিচমণ্ড, উইণ্ডসর কাসল ইত্যাদি দেখেছিলাম।

একবার আমরা স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে গেলাম। একদিন সকালে আমি, মামণি, মিঃ বোস, মিসেস বোস ইউষ্টন ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে

নেই, কারণ বিপ্লবের সময় ফরাসীরা সব ভেঙে দিয়েছিল। তবুও জায়গাটা দেখা যাবে।

বারো

পরদিন বেরোলাম নটার সময়। টিউবে করে গেলাম। সেখানে কিছুই নেই, শুধু একটা মনুমেন্ট রয়েছে। জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে হোটেলে ফিরলাম। তারপর লাঞ্চ খেলাম। খেয়ে আবার সীন নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। তখন বাজে দুটো। সেদিন পাঁচটায় ছিল আমাদের ট্রেন লিয়েজের। বেড়িয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বাজে চারটে। ষ্টেশন হোটেল থেকে দূরে নয় বলে সবাই ধীরে সুস্থে চা খাচ্ছি—কিছু পরে হঠাৎ দেখলাম, পাঁচটা বাজতে মাত্র পনেরো মিনিট বাকি রয়েছে। তখন তাড়াহুড়ো করে সব বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আর কি হয়! ষ্টেশনে যখন পৌছোলাম তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। পরের ট্রেণ সাতটা পঁয়তাল্লিশে। কাজেই ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। যথাসময়ে ট্রেন এল। লিয়েজে যখন পৌছোল তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। তখন হল মুস্কিল। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে না, অথচ ক্যাম্প এখান থেকে তিন মাইল দূর। তাই হাঁটতেই হল। তখন খুব বিরক্ত লাগছিল, কারণ খুব ঘুম পেয়েছিল। তাই তিন মাইলকে দশ মাইল মনে হচ্ছিল। অবশেষে পৌছোলাম। তখন আড়াইটে। দেখলাম যেখানে ক্যাম্প পড়েছে, সেই জায়গাটা নদীর ধারে। তক্ষুণি সবাই আফিসে গেলাম। সেখানে কেউ ছিল না। কাজেই খুঁজে পেতে কয়েকজন লোককে বের করলাম। তারা তখন আফিসরুমে গিয়ে আমাদের পাসপোর্ট, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি দিল। পাসপোর্ট লাগবে যদি ক্যাম্পের সীমানার বাইরে যাই। র‍্যাশনকার্ড, খাবার জন্য। তখন আমাদের সবার ক্যাম্প দেখিয়ে দেওয়া হল। আমি ও মামণি একটা ছোট ক্যাম্প পেয়েছিলাম। খড়ের বিছানা, বালিশ নেই। কিন্তু তখন এত ঘুম পেয়েছিল যে ওসব ভুলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তেরো

পরদিন সকালে উঠে মুখ ধুয়ে আমি ও মামণি র‍্যাশন কার্ড নিয়ে ফুড আফিসে গেলাম। তারা খাবার দিল রুটি, প্রচুর মাখন ও দুধ। মাখনটা খুব ভাল। খেয়েদেয়ে আমরা এদিক ওদিক বেড়াতে লাগলাম। জায়গাটা খুব সুন্দর। মাস নদীর ধারে। খানিক দূরে গ্রামের একটা স্কুল। তারপর দলের কয়েকজনের সংগে বেরোলাম।

লিয়েজ জায়গাটা খুব ভাল লাগল। প্রতি রাস্তায় সাইকেল চালানোর আলাদা রাস্তা আছে। রাস্তা লণ্ডনের মতন নির্জ্জন ও পরিষ্কার নয়। লোকেরা রাস্তা দিয়ে হৈচৈ করতে করতে যায়। ওরা ইংরাজদের চেয়ে মিশুক।

সেদিন খেয়েদেয়ে সমস্ত লিয়েজ টাউনটা ঘুরে দেখলাম। মিউজিয়াম পার্ক ইত্যাদি দেখে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন পাঁচটা। শুনলাম সেদিন নাকি একটা জলসা হবে ছটার থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত। সেই

মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মস্থান

জলসা একটা বাড়ীর হলঘরের মধ্যে। সেখানে গেলাম। অনেক দেশের নাচ গান হল। ভারতীয়রাও করেছিল, তবে তাদেরটা বেশী ভাল হয়নি। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, একটি রাশিয়ান নাচ ও সুইডিশ কমিক।

পরদিন সকালে খেয়েদেয়ে দেখি মাস নদীর ধারে এক ভদ্রলোক ও তিনজন ভদ্রমহিলা হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভদ্রলোকের হাতে একটা মেসিন। ভদ্রলোক মামণিকে বললেন—"এক্সকিউস মি" মামণি দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন—আমি এখানকার টেলিভিসন বিভাগের লোক। তা আমাদের এখানে, টেলিভিসনে খুব কমই ইণ্ডিয়ান মেয়ে নেমেছেন। আপনি কি নামবেন? মামণি কি বলতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। এই তিন ভদ্রমহিলা আপনাকে ইণ্ডিয়ার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবেন। আপনি তার উত্তর দিয়ে যাবেন, সেইটা আমি টেলিভাইস করে নেব। মামণির এতে কোনো আপত্তি হল না। ভদ্রলোক আমাকে বললেন তুমিও এরমধ্যে থেকো—তবে তোমাকে কোনো কথা বলতে হবে না। একটা ভাল জায়গা খুঁজে বার করে রিহার্সাল দেওয়া হল। তারপর ভদ্রলোক সবাইকে ঠিক ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে কথা বলতে বললেন। ঐ ভদ্রমহিলারা ভারত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন—সেখানে আমরা কি খাই, সেখানে বাড়ীঘর কি রকম, ইত্যাদি। কাজ হয়ে গেলে ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা চলে এলাম। একজন বললেন—কিছু মনে করবেন না আমরা এমনিই হাসছিলাম। তা আপনি কোথায় যাচ্ছেন? মামণি বলল এই এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভদ্রলোক বললেন আমরাও যাচ্ছি এক গ্রামে, যাঁর বাড়ী যাচ্ছি তিনি মনাকোর কনসাল আজই চলে আসব—আপনি যাবেন? মামণি রাজী হয়ে গেল তখন ট্রেনের টিকিট কেটে সবাই ট্রেনে চড়লাম। এক ঘণ্টা পর সেই গ্রামে পৌছোলাম। ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ী ছিল প্রায় দু মাইল তবু সবাই হেঁটেই চললাম। গ্রামটা খুব সুন্দর অনেক পাহাড় আছে। অবশেষে পৌছোলাম সেই বাড়ীতে। কলিংবেল টেপায় এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। আমাদের সংগীদের ভেতর এক ভদ্রলোক ভাল

ইংরাজী বলতে পারতেন। কনসাল এলে তিনি তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই বাড়ীর কেউ ইংরাজী বলতে পারেন না, তাই আমরা চুপচাপ ছিলাম। এর পর কিছু কেক, চা, ফল, সরবৎ খেয়ে বেড়াতে বেরোলাম। রাস্তায় কাদা জমে রয়েছে প্রায় আমাদের দেশের মতন। রাস্তার দুধারে অনেক চেরী গাছ ছিল, প্রচুর পেয়েছিলাম।

চোদ্দ

এর পর দুদিন কেটে গেল একরকম। আমরা লণ্ডনে ফিরে এলাম। কিছুদিন পর আমাদের টপক্লাসে ওঠার পরীক্ষা হল। পাস করে টপক্লাসে এলাম—এ রোতে মনিটার হয়ে। স্কুল যে রকম চলছিল সেই রকমই চলতে লাগল। আমাদের দেশে ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। চব্বিশে সেপ্টেম্বর আমাদের জাহাজ। আগষ্ট মাসে একবার আমরা লেক ডিষ্ট্রিক্টে বেড়াতে গেলাম! আমি, মামণি ও আর কয়েকজন। একদিন রাত দশটায় প্যাডিংটন ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে বসলাম। উইণ্ডারমেয়ারে পৌছোলাম ভোর ছটায়। ইংল্যাণ্ডের ভোর ছটা, মানে ভারতের শেষ রাত্তিরের মতন। যে হোটেলে আমাদের

ষ্ট্রাটফোর্ড অন্‌-এ্যাভন

উইণ্ডসর কাস্‌ল্‌

থাকার কথা সে হোটেলের লোকেরা তখনও ওঠেনি। কাজেই অনেক ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেলনা—তাই আর সকলকে দরজার সামনে রেখে আমি ও মামণি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম। মিনিট কুড়ি বেড়িয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখনও দরজা খোলেনি। তখন অনেক কষ্টে একটা দরজা পাওয়া গেল সেটা খোলা ছিল। সেটা বাগানের দরজা। সবাই ঢুকলাম বাগানে। খুব বড়। যাইহোক এবার অনেক ডাকাডাকি করতে এক বুড়ী এসে দরজা খুলে দিল—তাকে বাড়ীওয়ালীকে ডেকে দিতে বলা হল। সে বাড়ীওয়ালীকে ডেকে দিল। বাড়ীওয়ালী আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। তারপর হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেলাম ডাইনিং হলে। হোটেলে একটি ছেলের সংগে আলাপ হল। তার নাম ইয়েন। সে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। সে বলেছিল তার ইণ্ডিয়া ইংল্যাণ্ডের চাইতে ভাল লাগে।

দুপুরে সবাই বাসে করে গ্র্যাসমেয়ারে গেলাম। সেখানে কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ারথের বাড়ী। গ্র্যাসমেয়ার জায়গাটা একটা গ্রাম। ওয়ার্ডসওয়ারথের বাড়ী ও মিউজিয়াম দেখে গ্রামটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। হোটেলে যখন গেলাম তখন বাজে চারটে। সেদিন আর কোথাও বেড়াতে গেলাম না। পরদিন ঠিক হল আমরা একটা কোচে লেক ইত্যাদি দেখে বেড়াব।

পনেরো

পরদিন কোচ ছাড়ল। ড্রাইভার জায়গায় জায়গায় থেমে থেমে বলে দিচ্ছিল কোনটা কি। রাস্কিনের বাড়ীর পাশ দিয়ে আমরা চললাম। একটায় কোচ থামল লাঞ্চের জন্য। রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে খেলাম। খাওয়া হয়ে গেলে কোচ ছাড়ল। এইবার অনেক লেক, বাড়ী দেখলাম—তারপর চারটেয় কোচ থামল চায়ের জন্য। হোটেলে যখন ফিরে এলাম তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সেই দিনটা কেটে গেল, এরপর দুদিন এদিক ওদিক ঘুরে একদিন লণ্ডনে ফিরে এলাম। চব্বিশে সেপ্টেম্বর আমাদের জাহাজে যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে একদিন খবর এল মামণি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে। আমিও আমার

স্কুল থেকে সার্টিফিকেট আনলাম। তারপর সব বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন জাহাজে চড়ে বসলাম, জাহাজে চড়বার সময় যেমন আনন্দ হচ্ছিল তেমনি কষ্টও হচ্ছিল। আর কোনোদিন হয়ত এখানে আসা হবে না ভেবে। সন্ধ্যায় জাহাজ ছাড়ল। ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম—দূরে মিলিয়ে গেল সাউদাম্পটন পোর্ট।

প্রথমে পৌছোলাম জিব্রলটারে দুপুর বেলা। আমরা মস্ত এক দল নেমেছিলাম। ওখানকার রাস্তা খুব পরিষ্কার নয়, কিন্তু দোকানগুলো খুব ভাল সাজান। জিব্রলটার দেখে জাহাজে উঠলাম সন্ধ্যায়।

এরপর "পোর্ট-সৈয়দে" জাহাজ থামল। এমন সময় রেডিওয় বলল,—জাহাজ এখানে রাত আটটা পর্য্যন্ত থাকবে। যারা কায়রো দেখতে যাবেনা তাদের এরমধ্যে ফিরে আসতে হবে। যে যাত্রীরা কায়রো দেখতে যাবে তারা সেখানে একদিন থেকে আসতে পারবে। জাহাজ ছেড়ে গিয়ে পরদিন তাদের জন্য সুয়েজ ক্যানালে অপেক্ষা করবে। ঠিক হল আমরা কায়রো দেখতে যাব। দুপুর এগারোটার সময় দুটো কোচ ছাড়ল। অনেকক্ষণ পর কোচদুটো মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলল। কোচ তিনবার পারাপও হয়ে গেল। কাজেই কায়রো পৌছতে দু ঘণ্টার উপর দেরী হয়ে গেল। সাড়ে ছটার পর কায়রো পৌছে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তারপর হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং হলে খেতে গেলাম। খেয়েদেয়ে সবাই বেরোলাম কায়রো দেখতে। জায়গাটা খুব নোংরা। পরদিন সকাল আটটায় দুটো কোচ ছাড়ল। প্রথমে একটা মিউজিয়ামে গেলাম, সেখানে অনেক "মমী" ইত্যাদি দেখে বাসে করে গেলাম এক মরুভূমির কাছে। পিরামিড দেখতে হলে মরুভূমির অনেক ভেতরে যেতে হবে। মরুভূমির মধ্য দিয়ে বাস চলবার পথ নেই, তাই অনেক উট ভাড়া করতে হল। উটে চড়তে আমার খুব ভয় করছিল। মরুভূমির ভেতর দিয়ে চললাম। প্রথমে একটা দুর্গ দেখতে পেলাম, দুর্গটা খুব ছোটো। সেই দুর্গ দেখে পিরামিড ইত্যাদি দেখে আবার উটে করে গেলাম যেখানে বাস দুটো অপেক্ষা করছিল। বাসে করে এবার একটা মিউজিয়ামে গেলাম। এরপর হোটেলে গিয়ে খেয়ে দেয়ে চললাম ফিরে জাহাজে। বাস মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলল। হঠাৎ বাসের এঞ্জিনে কি করে আগুন লেগে গেল, সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর বাস ঠিক হলে চললাম। পৌছোলাম তো সুয়েজ খালে। কথা ছিল জাহাজ আসবে তিনটের সময়, তখন বেলা পাঁচটা কিন্তু তখনও জাহাজ আসেনি। ছটার সময় খোঁজ নিয়ে জানা গেল—জাহাজ পোর্ট সৈয়দ থেকে আসতে আসতে বালিতে আটকে গেছে।

এরপর জাহাজ যখন রাত বারোটার পরও এলো না, তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সুখের বিষয় একটার কিছু আগেই মটর লঞ্চে করে জাহাজে উঠতে গেলাম। চলন্ত জাহাজে মই দিয়ে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল।

এরপর করাচি এডেন ইত্যাদি পার হয়ে ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৪ ভোর পাঁচটার ডেকে গিয়ে দেখলাম ভোরের আলো—আর সেই আলোয় দূরে দেখা যাচ্ছে 'গেট অফ ইণ্ডিয়া'।

অলকানন্দা

(রূপকথা)

শ্রীমতী আশাবরী দেবী বি-এ

সেদিন বসন্ত-পূর্ণিমা। রাজকুমারী অলকানন্দার বিবাহের শুভদিন স্থির হয়েছে আগামী বসন্ত-পূর্ণিমার চির-আনন্দ-দিবসে। চন্দন-শুভ্র পূর্ণিমা চাঁদের আলোর বন্যায় গভীর নিশীথ-সুপ্তি-মগ্ন অবন্তী-রাজ্য ভাসছে। সারাদিনের উৎসব-ক্লান্ত নগরবাসী সুখতন্দ্রায় আচ্ছন্ন। জোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে—রাজপথে—পথে ফাগ তখনো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। পুর-ভবন-দুয়ারে দুয়ারে আমের পল্লব, কুসুম মাল্য দখিণা বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে সোপান-প্রান্তে মঙ্গল-কলসগুলি চন্দ্রালোকে দেখা যায়। সহসা একখানি কালো মেঘের ছায়ায় পূর্ণচাঁদের দীপ্তি মলিন হলো। রুদ্ধ নগর-তোরণের অতন্দ্র দ্বারপাল বুঝি সেই মুহূর্তেই ক্ষণতন্দ্রায় ঢলে পড়েছিলো। নগর-পরিখার সীমানা-প্রাচীরের গা বেয়ে নিঃশব্দে এলো কালো অমঙ্গল মূর্তি, গোপন পদ-সঞ্চারে এসে দাঁড়ালো অবন্তীর রাজপথে। চন্দন, মাল্য ও ফাগের সুরভিতে তখনও প্রশস্ত রাজপথ সমাকীর্ণ। অলিন্দে-অলিন্দে নিভে-আসা উৎসব নিষ্প্রভ আলোয় সে-মূর্তির ভয়াল ভ্রূকুটি তার মুখের ওপরের কালো ঘোমটার ভিতর হ'তে ঝলক দিয়ে উঠলো।

রাজপথ হ'তে দখিণে মন্দির-পথ—কিছুদূরেই পূর্ণচাঁদ চুম্বন কোরে দাঁড়িয়ে আছে নগর-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দ্রাণীর স্বর্ণ-মন্দির। বিকৃত কঠিন-স্বরে উচ্চারিত হলো তার তর্জনীর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে—"তোমার পরাজয় ঘটাবো আমি—দেবো তোমার ঐ দুর্বল মঙ্গল-প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভিয়ে। প্রকৃতির দানবীয়তার অতল তলে তোমার ঐ স্নেহ-করুণার চূড়া যাবে চিরতরে ডুবে—!"

তার পরের বাঁকেই পড়লো রাজোদ্যান—লাখ লাখ ফোটা ফুলের গন্ধ ভারে বাতাস সুরভিত মন্থর হয়ে

উপছে পড়ছে। শত ফোয়ারার সঙ্গীতে মূর্ছনার ব্যাকুলতা স্থির মর্মর-তলে ভেঙে পড়ছে। এর পর সুমুখে কুঞ্জ তোরণ—তার ভিতরে দেখা যায় পদ্মসায়র—হাজারো কমলের দলে সেখানে দোলা লেগেছে বসন্ত-বাতাসে। পদ্মসায়রের বাঁয়ের আকাশে হঠাৎ যেন শুভ্র পাহাড়ের মতো জেগে উঠেছে অবন্তীর বিরাট রাজপ্রাসাদ। বন্য বানরের মতো ক্ষিপ্র হিংস্র গতিতে কালো মূর্তি মুহূর্তে রাজপুরীর উদ্যানসংলগ্ন দক্ষিণা-মহলে প্রবেশ করলো। সাত দুয়ারে সাতটি সোনার শেজ হতে আলো ঝলমল করে। দীর্ঘ দালান বিচিত্র আলপনায় ঢাকা—দুধারে অপরূপ শোভাময় মাঙ্গলিকীর সারি। আর একটু এগিয়েই দক্ষিণা-মহলের উৎসব-মন্দির। বাতায়ন-তলে মণিময় ফুল সাজানো পালঙ্কে সমস্ত ঘরখানি আলো কোরে আধো-তন্দ্রায় শুয়ে আছেন সুবর্ণ-দ্বীপের নবীন রাজা অমরনাথ। একদিকে অপূর্ব কমনীয় সৌন্দর্য, আর একদিকে অনমনীয় বলিষ্ঠতা যেন ঘিরে রয়েছে রাজকুমারের দেহ। আজ বসন্তোৎসবের আনন্দ-পুণ্য সন্ধ্যায় অবন্তীর রাজকুমারী অলকানন্দার সঙ্গে তাঁর শুভ-বিবাহের বাগ্‌দান-উৎসব সম্পন্ন কোরতে বহুদূর—সেই সুবর্ণ-দ্বীপ হ'তে এসেছেন রাজপুত্র। আগামী বসন্ত-পূর্ণিমায় তাঁদের বিবাহ হবে। দ্বারী ও পার্শ্বচরদের সকলকে উৎসবের ছুটি দিয়ে অমরনাথ অবন্তীরাজের এই নিভৃত উদ্যান-প্রাসাদে একাকী আধো-তন্দ্রায় ভাবছেন তাঁর বহু বিচিত্র জীবনের কথা। শৈশব হ'তে মা-হারা পুত্রকে সুবর্ণ-দ্বীপের সম্রাট ত্রিদিবনাথ একাধারে অতন্দ্র পিতৃ-মাতৃ স্নেহ দিয়ে মানুষ কোরেছিলেন। তবু সেই স্নেহের প্লাবনে কোথাও ছিলো না আবিলতা। পিতৃ-স্নেহ দুর্বল হৃদয়, কিন্তু অমরের প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় হয় নি কখনও। তাই বহু বিচিত্র কলাকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয়-প্রকৃতির বীরই হয়ে উঠেছিলেন রাজপুত্র। নিপুণ অসিচালনার সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ রাজ্য-শাসনের মূল-মন্ত্রগুলিও পিতার কাছে লাভ কোরেছিলেন—ন্যায়, ধর্ম ও করুণা।

হঠাৎ একদিন রাজপুত্রের মনে দেশ-ভ্রমণের নেশা জেগে উঠলো—পিতার মিনতি উপেক্ষা কোরেই রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন—কাননে, মরুতে, দেশে-বিদেশে। কতো অজানাকে জানলেন, কতো অচেনা আপন হলো তাঁর। এমনভাবে ভ্রমণ-তৃষ্ণা কিছুটা শান্ত হয়ে এলে প্রায় তিন বৎসর পরে কুমার উজ্জয়িনীপুরে পেলেন হতাশার পাষাণ-ভার। সেদিন পার্বতীব্রত উজ্জয়িনীতে। পার্বতী-মন্দিরে কন্যারা আসেন পূজা দিতে—দেশ-বিদেশ হ'তে। কতো শিবিকা ভোর হ'তে আসে যায়—অমরনাথ দেখেন। মাঝে মাঝে রাজ-শিবিকাও আসে যায়। সন্ধ্যায় দেবী পার্বতীর মন্দির নির্জন হলে কুমার যান পূজা-অর্ঘ্য দিতে। প্রতিমার চরণ-মূলে প্রণত হতেই কুমারের কুঞ্চিত চুলে একগাছি শুভ্র যূথীর মালা জড়িয়ে গেলো। মালাগাছি কোনও প্রণতা কুমারীর কবরী হ'তে খসে পড়েছে—ক্ষুদ্র মালাগাছির সঙ্গে লেগে আছে ছোট্ট একটি অলক-গুচ্ছ! এমন মেঘের মতো কালো, ঢেউতোলা রেশমগুচ্ছের মতো কেশ কি কোনো মানবীর—না পার্বতীর উপাসিকা কোনও ব্রতচারিণী দেববালার? বিহ্বল হয়ে ভাবতে ভাবতে কুমার পথ চলেন—'পাবো কি এই কেশবতীর সন্ধান কোনোদিন? তাহলে পথেই জীবন কাটাই।'—এই ভাবে আবার বৎসর ঘুরে যায় সন্ধানে-সন্ধানে—সহসা একদিন পরিশ্রান্ত ধূলিধূসরিত অশ্বারোহী সুবর্ণদ্বীপের দূত এসে পথ-চলা রোধ করে অমরনাথের—'সম্রাট রোগশয্যায়, ভবিষ্যৎ সম্রাটের হাতে সমর্পণ কোরে দেবার জন্য দুর্বল হাত এখনও ধরে আছে গুরুভার রাজদণ্ড কোনো মতে।" পুত্রকে অল্প কথাই বলেছিলেন সম্রাট ত্রিদিবনাথ—"রাজ কর্তব্য-ভার নিরুদ্বেগ-মনে তোমায় সমর্পণ কোরলেম পুত্র—!" ক্ষণেক থেমে আবার বলেন—"হাঁ, আর একটি কর্তব্যের ধর্ম-বন্ধনে বাঁধা আছি বৎস—দ্বিধাহীন মনে মোচন কোরো আমার এ সত্য-বন্ধন। অবন্তী-রাজরাণী তোমার স্বর্গীয়া মায়ের বাল্যসখী—উভয়ের শপথ ছিলো যে তাঁদের ছেলে মেয়েদের বিবাহ হবে।" কেশবতীর সন্ধানী রাজপুত্রের হৃদয় এই সত্য-পাশ-বেদনায় পলকে চকিত হয়ে উঠে, রুদ্ধস্বরে বলেন, "বাবা—এতো এতদিন জানতেম না—" "হাঁ তোমার অজানাই রেখেছিলেম বৎস—কেন না তোমায় যোগ্য কোরে গড়ে তোলার আগে বিবাহের কথা বলার প্রয়োজন-বোধ করিনি—।" তাই মাসান্তেই অবন্তীর পুরোহিত আসেন মাঙ্গলিকী-উপচার নিয়ে ও উৎসবের সমারোহের মাঝে নবীন সম্রাট আজ এসেছেন অবন্তীর প্রথানুযায়ী বাগ্‌দান দিতে। অশৌচের বৎসর পূর্ণ হয়ে

গেলে আগামী বসন্ত পূর্ণিমায় বিবাহ! আনন্দের জোয়ার লেগেছে যেন চারিদিকে—বাগ্‌দান-উৎসব-শেষে গভীর বিষণ্ণতা নেমে আসে রাজপুত্রের মনে। সেই কেশবতী চিরদিন রইলো অলক্ষ্যে মিলিয়ে।

ক্রমে সুষুপ্তি নেমে আসে রাজপুত্রের দুই চোখে। চাঁদের ওপর মেঘের ছায়া পড়ে—কালো অমঙ্গল-মূর্তি এসে দাঁড়ায় দুয়ারে। আশ্চর্য লাবণ্যের বন্ধনে অপরিমেয় বলিষ্ঠতা—যেন দেবতার মতো মহিমশ্রী দিয়েছে নিদ্রিত নবীন রাজপুত্রের রূপে। রাজার পরণে বরবেশ, ললাটে মঙ্গল-চন্দন-তিলক, কেশে শুভ-আশীর্বাদের তখনো রয়েছে দু-একটী দূর্বাদল। রাজপুত্রের ডানহাতের শিথিল মুষ্টিতে মণিময় কোষ হ'তে অর্ধ-উন্মোচিত তরোয়ালের ঝিলিক দেখা দেয়।—সর্পিল গতিতে নাগিনী রাজপুত্রের শিয়রে এসে দাঁড়ায়—জগতের সকল বীভৎস হিংস্রতায় বৃদ্ধার কুশ্রী মুখের ওপর দুটো চোখ ক্রূরভাবে জ্বলে উঠে—"আমার নাগিনী নাম হবে সার্থক—আমার সাধনা হবে পূর্ণ যেদিন পারবো এইসব স্বর্গনীড় ডুবাতে। বেদেনী আমি—আমার প্রথম জীবনের সাধনা নষ্ট কোরেচে রাজা ত্রিদিব—প্রতিশোধ লবো! হাঃ হাঃ প্রতিশোধ ও কালকূট সাধনার আমার একই সাথে হবে সম্পূর্ণতা-সাধন। ডাকিনী-মন্ত্রে অপরাজেয় দানবী শক্তিতে সিদ্ধির শেষ বলি হবে পরম শত্রু ত্রিদিবনাথের পুত্র এই অমরনাথ।—পৃথিবীতে তখন থাকবে কেবল অতল কালো বিষের সাগর, আর কালকূট-নাগের রাজছত্রের তলে এই বেদেনী নাগিনী—তারপর-তারপর একদিন স্বর্গকেও টেনে অনায়াসে আনবো রসাতলে—" ডাকিনী মূর্তির প্রেতায়িত দীর্ঘছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওঠে—বিষাক্ত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে রাজপুত্রের ললাটে।—"হাঃ হাঃ—কোরবো নাকি দংশন মন্ত্র নাগ হাতে? যেমন কোরেচি দশটি সুকুমারী রাজ-বালিকাকে—!" নাগিনী তির্যক-গতিতে উদ্যত হয়ে ঈষৎ থামে—"সম্রাট ত্রিদিবের সেই ভয়ংকর আগুনহানা তরোয়াল—আর ঐ দেখা যায় ললাটে অবন্তী-রাজ মহিষীর নিত্য পার্বতী-পূজারত হাতের দেওয়া আশীর্বাদ-চিহ্ন।—যদি সাধনার চরমে এসে ভ্রষ্ট হয়ে যাই—এখনও ভয় আছে, এ দেহ এখনও পার্থিব মরণের অধীন—ক্ষণেক প্রতীক্ষা আর—তারপরেই কালকূট বিষের অধীশ্বরীর পায়ে লুটোবে স্বর্গের সৃষ্টি এই পার্থিব নিয়ম—সঙ্গে সঙ্গে লুটোবে সকল দেব-মন্দির-চূড়া—!" বেদেনীর জিহ্বা লকলক কোরে ওঠে—রাজপুত্রের দিকে অভিশাপ সংকেত কোরে বেদেনী ফিরে চলে।

উৎসব-সাজে-সাজা মহলের পর মহল ঝলমল করে—নাগিনী নিঃসাড়ে বেয়ে ওঠে মণিকোঠায়—যেখানে তিনটি হীরকপালঙ্কে ঘুমান অবন্তীরাজ মহীপতি। বামে ঘুমান রাজরাণী পদ্মাবতী কন্যার গায়ে স্নেহ হাতটি রেখে। অপূর্ব রাজকক্ষের কোণে দোলে গজমোতির দীপাধারে সাত-রাজার ধন একটি মণি—তারই দীপ্তি ঘরে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ আলোকে। চারিদিকে হিন্দোলিত হয় পুষ্পমালা—মেঝেয় বিছানো চন্দনআল্‌পনা। দেবপরিবারের মতো সুন্দর রাজ-পরিবারের তিনটি প্রাণীর মুখে স্বর্গের হাসি ও তৃপ্তি খেলা করে—আজ পরমোৎসবদিনের মধুর অবশেষে স্বর্গের আশিসধারার মতো সুপ্তির সিঞ্চন তাঁদের চোখ মুখের সুখক্লান্তি মোছায়। বেদেনীর সাপের মতো দুটো ভীষণ ভয়াল চোখ জ্বলতে থাকে—প্রচণ্ড উল্লাসভরা আত্ম-পরিতৃপ্তি ও কার্যসিদ্ধির কূলে এসে দাঁড়িয়ে সে প্রাণভরা বিষ-নিঃশ্বাস উদ্গীরণ কোরতে থাকে—"প্রথমে ভাঙবো অন্তর—তারপর বাহির—আয়! আয় মন্ত্রনাগ!" মুহূর্তে বৃদ্ধার কলুষিত ডানহাত বেড়ে ফণা উদ্যত করলো কালনাগ—"না না, এখন দংশনের সময় হয়নি—ঐ কুমারী হবে পূজোপকরণ যেমন আর দশটি রাজকুমারী হয়েচে। জীবন্মৃত বাপ-মা এখন জ্বলুক—তারপর সিদ্ধি হলে স্বর্গের সৃষ্টি একসাথে ডোবাবো রসাতলে—দানবীয়তার হবে জয়—" বিদ্যুৎবেগে মন্ত্রনাগ রাজকুমারী অলকানন্দার বিষ-বাষ্পে অচেতন, কুসুম-পেলব দেহ বেড়ে নিয়ে তুলে আনে—দংশনোদ্যত ফণা ধরে থাকে রাজকুমারীর মুখের ওপর।

পূর্ণিমার চাঁদ ডুবে যায়—অন্ধকার ঘিরে আসে। নাগিনী ফিরে চলে—মন্ত্রনাগ—পাশে বন্দিনী অলকাকে পাপ বুকে চেপে থাকে। কোথাও বাধা পায় না—বিষ বাষ্পে আচ্ছন্ন রাজপুরী পড়ে থাকে পিছনে।

পদ্মসায়রের কমল-গন্ধ ব'য়ে আনে স্বচ্ছ দখিনা বাতাসে—রাজোদ্যানের দক্ষিণা-মহল ভরপুর হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ পবিত্র পদ্ম গন্ধে। উৎসব মন্দিরের বিষ বাষ্প কেটে

আসে কোমল ছোঁয়ায়। অমরনাথ কষ্টে চোখ মেলেন—কি যেন ভয়ংকর কাল চলে গেলো। মাথা টলে তবু জোর কোরে উঠে দাঁড়ান তরবারিতে ভর দিয়ে। সহসা কাণে আসে একটানা সাপের গর্জন-ধ্বনি—রাতের বাতাসে দক্ষিণামহলের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। রাজা ত্বরিতে বাতায়ন-তলে এসে দেখেন পদ্মসায়র তোলপাড় হয়ে উঠেছে! পদ্মসায়র হ'তে যে সংকীর্ণ পরিখা চলে গেছে সাগরগামী নদী অভিমুখে সেইদিন লক্ষ্য কোরে, কমল বন লণ্ডভণ্ড কোরে বেয়ে চলেছে এক মহা ভয়ংকর সাপের নৌকা। বিরাট ফণার চাঁদোয়ায় জ্বলছে মণি—সমুখের পথ আলো হ'য়ে উঠেছে আর সাপের বিরাট দেহের উপরের পাটাতনে বসেছে এক কালো ঘোমটা-টানা মহা-অমঙ্গল মূর্তি। বিস্মিত রাজপুত্র হঠাৎ চকিত হয়ে দেখেন সাপের মাথায় মণির আলোয় রাজকুমার অলকানন্দার ক্ষণেক দেখা মূর্তি—বধূবেশে অলকা অচেতন হয়ে পড়ে আছে ডাকিনীর কুৎসিৎ কোলে। পলকে জলের ওপর বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সরীসৃপ নৌকা!

স্তব্ধ অভিভূত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজপুত্র। কি মহা-অমঙ্গলে ছেয়ে এলো অবন্তীরাজ্য! এখনি ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে হাহাকারে ভরে যাবে রাজপুরী—! অবন্তীনগরীর সেই ক্রন্দন-রোল দেখতে দেখতে ছেয়ে যাবে বহুদূরের সেই স্বপ্ননগরী সুবর্ণদ্বীপেরও আকাশ। ভোরের পাখীর কূজন সুরু হয়ে গেলো শাখা নীড়ে নীড়ে। অরুণ রঙের ছোঁয়া লাগে পদ্মসায়রের হাজারো কমলের দলে। অবন্তীরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দ্রাণীর স্বর্ণমন্দির উন্মুক্ত হয়। চোখের অশ্রুবিন্দু মুছে রাজপুত্র প্রণতি জানান দেবীকে। সহসা নবীন রাজার বিস্মৃতি টুটে যায়—মনে পড়ে যায় পিতার দিনলিপিটির কথা। ত্রিদিবনাথ বলেছিলেন—"বৎস যখনই গুরুতর কোনো সমস্যায় পড়বে—খুলে দেখো আমার এই ভ্রমণ-দিন-লিপিটি। বহু অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আমার এই জীবনের বহু সংকট-সমাধানের ইঙ্গিত লাভ কোরবে।"

কোথায় রইলো পড়ে জীবন্মৃত অবন্তীনগরী, কোথায় রইলো প্রতীক্ষারত ব্যাকুল সুবর্ণ দ্বীপ—নবীন রাজার ঘোড়ার ক্ষুর ভোরের আলো ভালো কোরে ফুটে ওঠবার আগেই আবার বেজে উঠলো পথে পথে, কাননে, প্রান্তরে সাগর-বেলায় সন্ধানের সুরে!

অলকানন্দার ব্যর্থ সন্ধানে-সন্ধানে ভবঘুরে রাজপুত্রের কাটে অবসাদ-ভরা দিনের পর দিন। দিকে-দিকে ঘনায় ঘোর অমঙ্গলের ছায়া—প্রকৃতির দানবীয়তা গ্রাস কোরে ফেলবে যেন দেবতার-রচা এই বিশ্ব-সংসার। অমরনাথ সেই ক্রন্দন-রোল শোনেন, আর অস্থির হ'য়ে ওঠেন বেদেনীর ভীষণ-দেখা পাবার জন্য! আবার পিতার ভ্রমণ-পঞ্জী খুলে পড়েন—"ঘোর অমঙ্গল-মূর্তি এক ডাকিনী নারীকে দেখলেম মারণ-সাধনা-রত কৃষ্ণসাগরের উপকূলের বন্য পরিত্যক্ত দ্বীপে। নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এ অমঙ্গল ঘোচাতেই হবে মানব সংসারের প্রান্ত হ'তে।" আর এক জায়গায় পড়েন—"বহু অনুসন্ধানে এক অতি-বৃদ্ধা কাঠুরিয়া নারীর কাছে এই কালকূট-সাধিকা রাক্ষসীর ইতিবৃত্ত শুনে স্তম্ভিত হয়েচি—এ নারী-রূপিণী দানবী জাতে বেদেনী—তার অকারণ হিংস্রতা বিধাতাকেও ছুঁতে চায়, তাই দেবতার সৃষ্টি এই প্রকৃতির স্নেহ-নীড়কে দিতে চায় তার বলি। কালকূট-সাধনায় সে বহুদূর এগিয়েচে—পাচটি রাজবালাকে পূজাবলি দিয়ে সে সৃষ্টি করেচে আপন কেশ হ'তে মন্ত্রনাগ। তাই এ নাগিনী মুণ্ডিত-মাথা—কেন না, মুক্ত কালো কেশ মন্ত্রনাগের প্রকৃতির বিরূপ, তখন সে তার সৃষ্টি-মূলকেই মৃত্যু-চুম্বন হানে।" আর এক জায়গায় ত্রিদিবনাথের লেখা—"গত সন্ধ্যায় আবার দেখি ডাকিনীকে, শুনলেম আরও দুটি রাজবালিকাকে সে দিয়েচে বলি। এর বিনিময়ে সে লাভ করেচে গভীর আঁধার সমুদ্রতলের এক ভয়ঙ্কর সরীসৃপের প্রভুত্ব—এই সরীসৃপের আসনে বসেই তাকে দেখেছি পূজাচার-রত প্রকৃতির আধিভৌতিক অমঙ্গলের নিদানের উদ্দেশ্যে।" অনুসন্ধান কোরে শেষে আবার পিতার লেখা পান অমরনাথ—"শিবব্রত শেষে যাই সেই সংকীর্ণ বালুচর দিয়ে—ধ্যানমগ্না নাগিনীর পূজাসন সেই সরীসৃপকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছি—সমুদ্রতলে তারা অদৃশ্য হয়েছে—জানি না জগৎকে এক মহা সর্বনাশ হতে উদ্ধার কোরতে পারলেম কি না!"

সমুদ্র-কূলে পথের সঙ্গী দুধবর্ণ ঘোড়ার গায়ে ভর রেখে ক্লান্ত রাজা বসে ভাবেন—"ঐ তো আকাশে আবার দেখা দিয়েছে বসন্ত-পঞ্চমীর চাঁদ—বৎসর ঘুরে গেলো—পেলাম

না রাজকুমারীর সন্ধান! বসন্ত-পূর্ণিমার বিবাহ-লগ্ন হবে কি ব্যর্থ?"

সহসা সমুদ্রের এক বিশাল ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে রাজপুত্রের পদপ্রান্তে—জলকণার সঙ্গে ছিটকে এসে রাজপুত্রের বুকে কিসের যেন সুরভিত পেলব স্পর্শ লাগে। চমক ভেঙে অমরনাথ দেখেন সেই বহুদিনের হারানো কেশবতীর ছোট্ট একটি অলকগুচ্ছ!

বিদ্যুতের অতি ক্ষীণ চমকের মতো রাজকুমারীর ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে আসে। ঘোর অন্ধকার অজানা আকাশে ঝকঝক করছে তারা—ঢেউ ভাঙার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ পায়ের কাছে বাজে—রাজকন্যা পড়ে আছেন বালুচরে। সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া হো হো শব্দে অট্টহাস্য করে চলেছে। একটা একটানা মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি শুনে অলকানন্দা দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে অনুভব করেন মাথার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে কঠিন বন্ধন। কষ্টে উঠে বসেন—দেখেন এক টুকরা বন্য পরিত্যক্ত বালুচরের ভগ্ন চড়ার ধারে বসে এক ডাকিনী-মূর্তি মন্ত্রপাঠ করছে—ভয়ংকর এক সামুদ্রিক সরীসৃপ হয়েছে তার পূজার আসন। প্রতি উত্তাল ঢেউ ভাঙার সঙ্গে বেদেনী নিক্ষেপ করছে সমুদ্রের জলে রক্তরাঙা আগুনের ভাঁটা। সাগর জল তোলপাড় হয়ে উঠেছে সেই অমঙ্গল মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে—এখুনি যেন সমুদ্রের অতল আঁধার তল হ'তে সর্বনাশা জলস্তম্ভ জেগে উঠে পৃথিবীর শ্যামল স্নেহের চিহ্নটুকু মুছে নেবে। থর থর কাঁপতে থাকেন রাজকুমারী ঝড়-দোলা কমলিনীর মতো। আতঙ্ক অস্থির পায়ে উঠে দাঁড়াতে যেতেই রাক্ষসীর অট্টহাসি শোনা যায়—মন্ত্রনাগ উদ্যত-ফণায় অলকানন্দার দুই পা শৃংখলিত করে—রাজকুমারীর মূর্চ্ছাহত কাণে বাজতে থাকে বেদেনীর পরিতৃপ্ত পরুষ কুশ্রী কণ্ঠস্বর—"হাঃ হাঃ! পূজার ফুল অলকানন্দা—তুই হবি আমার মারণ-যন্ত্র ত্রিদিবনাথের পুত্রের।" রাজকন্যার অবগুণ্ঠনের বাঁধন আরও কঠিন কোরে বেঁধে দেয় নাগিনী—"ঘোমটা যেন শিথিল হয় না, এতোটুকু তোর কন্যা—তোর ঐ কালো মেঘ-চুলের যেন এতোটুকু না প্রকাশ পায় বাইরে—তাহলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে তোরও চরম সর্বনাশ।"

নাগিনীর বন্দিনী কন্যার দিন কাটে আতঙ্ক-অবসাদের গুরুভারে—মন্ত্রনাগের বেড়ার ভিতরে। বেদেনী তাকে মারণ-মন্ত্র বলতে শেখায়—মন্ত্রনাগ খেলানোর সংকেত দেখায়—"মরণ-বরণের আগে এই শিক্ষাটুকু তোমার লাগবে রাজকুমারী—পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাপ ঘটাতে—তোমার এটুকু শিখতেই হবে—।" ডাকিনীর ভয়াল হাসিতে কন্যার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

এক মুহূর্তও অবগুণ্ঠন খুলতে দেয় না কন্যাকে—বেদেনী সেই ঘোমটা মাথায় রোজ সমুদ্রস্নান করেন অলকানন্দা আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাগিনীর অলক্ষ্যে তাঁর বধূবেশের রাঙাচেলি হ'তে সূতা নিয়ে একটি ছোট্ট অলকগুচ্ছ মনে মনে জগজ্জননী পার্বতীকে স্মরণ কোরে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেন।

এইভাবে যায় দিন—কতো দিন। সেদিন বসন্ত-পঞ্চমী, নাগিনী শেখায় মন্ত্র বলতে রাজকুমারীকে। রাজকন্যার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে যায়—কেঁদে বলেন, "ওগো রাক্ষসী—এ অমঙ্গল-শব্দ যে উচ্চারিত করতে চায় না আমার কণ্ঠ।" কার্যসিদ্ধির সমুখে ডাকিনীর উল্লসিত জিঘাংসা অলকানন্দার জীবন্মৃত করুণ মুখছবি চেয়েও দেখেনা—খালি তর্জন করে—"তোল মারণ-ধ্বনি অমরনাথের নামে কণ্ঠের সকল শক্তি দিয়ে—কাজ আর অল্পই বাকী আমার—।" মন্ত্রনাগ মাঝখানে খেলতে থাকে। বেদেনী রক্ত-তিলক সর্বাঙ্গে এঁকে মুক্ত মুণ্ডিত মাথায় রক্তবসনে সেজে বসে থাকে, আর বেদেনীর পূজাসন বিরাট সরীসৃপ রক্ততিলকে সেজে ঘুমায় তার পদপ্রান্তে বালুচরে। নিবিড় মেঘে আঁধার কোরে ফেলে পঞ্চমী-চাঁদের আলোটুকু। অধৈর্য প্রায় হয়ে নাগিণী প্রচণ্ড নাড়া দেয় মূর্ছিতপ্রায় রাজকুমারীকে কঠিন হাতে জড়িয়ে—"কর উচ্চারণ—কর উচ্চারণ—মৃত্যুর দেরী তোরও নেই—যে আর, হতভাগিনী—!" সহসা রাজকন্যার এলিয়ে-পড়া নত মাথা হ'তে বিপুল আকুল কেশরাশি রাক্ষসীর হাতের প্রচণ্ড নাড়া লেগে অবগুণ্ঠনের বন্ধন ছিঁড়ে মুক্ত প্রবাহিনীর মতো অলকার দেহ ঘিরে ছড়িয়ে পড়লো। পলকমাত্র ঘোর আতঙ্কে মন্ত্রনাগ ভীত গর্জনে লাফিয়ে উঠে নাগিনীর কণ্ঠ পাকে পাকে বেড়ে তীব্র দংশন এঁকে দিলো তার রক্ত চিহ্নিত কপালে—ডাকিনীর অবগুণ্ঠনমুক্ত মুণ্ডিত মাথায় মৃত্যু-চুম্বনের রেখা দিতে দিতে সাপ এলিয়ে পড়লো শুষ্ক বিশীর্ণ হয়ে। "সর্বনাশ! কেন তুই খুলে দিলি

কেশপাশ? আমারই সৃষ্ট মৃত্যু-সাপ শেষে হানলো আমাকেই মৃত্যু-দংশন? ও হো হো! কি ভুল! কেন তোর কেশপাশ, মহাঅজগর সৃষ্টি কোরবার লোভে রেখে দিলাম—ওঃ!” প্রাণান্ত যন্ত্রণায় মহাভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বেদেনীর মুখ—কঠিন শীতল হাতে সে অলকার কেশ ধরে টেনে টলতে টলতে এগোয় তার সরীসৃপের পূজাসনের দিকে—“সিদ্ধি হলো না—ও হো হো! তবু মন্ত্রসাধন কোরে যাবো এই কন্যা বলি দিয়ে—” সহসা ভেসে আসে ব্যথিত ব্যাকুল ধ্বনি—“রাজকুমারী অলকানন্দা—রাণী!” শত প্রাণের স্পর্শে জীবন্মৃতা অলকা যেন মুহূর্তে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন—পলকে মুক্ত করেন কেশ রাক্ষসীর মুষ্টি হ'তে। সংকীর্ণ বালিয়াড়ির গুপ্তপথ দিয়ে দুধবর্ণ উড়ে আসে—ছুটে নেমে আসেন অমরনাথ—পাগলিনীর মতো ছুটে আসেন দুঃখিনী কন্যা—মুক্ত কেশের রাশিতে রাজপুত্রকে ঢেকে দিয়ে কেঁদে ওঠেন—“রাজা! শীঘ্র হানো আঘাত—ভেঙে দাও নাগিনীর পূজার ঐ সরীসৃপ-আসন—চরম সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে রাক্ষসী—!”

অমরনাথের আগুনহানা তরোয়ালের দারুণ আঘাতে কুৎসিৎ সরীসৃপটা দুখণ্ড হয়ে ছটকে পড়ে—বালুচরে রাক্ষসীর অমঙ্গল-মুখ মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেলো। সমুদ্রঅজগরের মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রচণ্ড পুচ্ছ আলোড়নে বালুচর খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বসে পড়লো—কৃষ্ণসাগরের কোন অতল গহ্বরে হলো রাক্ষসীর চির সমাধি। অমনি যেন বেজে উঠলো গগনচারী কোন গন্ধর্বের বীণা—বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয় হ'তে উচ্চারিত হ'তে লাগলো—শান্তি ও স্বস্তি।—মধুর বাতাস এসে লাগলো রাজ-দম্পতির ললাটে। আকাশে চন্দন-শুভ্র চাঁদের আলোয় জাগলো উৎসবের জোয়ার। চাঁদের তরণী অপরূপ ফুলের মালা নিয়ে দ্রুত বেয়ে চললো বসন্ত-পূর্ণিমার সেই চির-আনন্দ দিনের অভিমুখে।

রাজপুত্র দুই স্নেহ-করুণ বলিষ্ঠ বাহুর ঘেরে রাজকুমারীর থরথর দেহ তুলে নিলেন বক্ষপুটে দুধবর্ণ ছুটে চলে আনন্দ-মিলন-ছন্দে ক্ষুরের ধ্বনি তুলে। কন্যার মুক্ত মেঘকেশের তরঙ্গে বাতাস সুরভিত হ'তে লাগলো। অলকার অপরূপ মুখখানি নয়ন ভরে দেখে রাজপুত্র বলেন—“ওগো তুমি আমার চিরদিনের খোঁজা সেই কেশবতী?” দূর-গগন-তটে ‘পার্বতী’-মন্দিরের চূড়া অনন্ত আশীর্বাদ—ভরা মহিমায় রাজা রাণীকে পথ দেখায়।

গঠনমূলক কার্য্যের কর্মসূচি—

১০ই মে বহরমপুরস্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কর্তৃপক্ষ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী সমূহের নিকট নিম্নলিখিত-রূপ ব্যাপক কর্মসূচি প্রেরণ করিয়াছেন—(১) দেশে যে সকল সংস্থা গঠনমূলক কার্য্য করে তাহাদের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সমস্ত সংস্থা কি ধরণের কাজ করে তাহার বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই কাজ করে তাহাদের এই কাজের ফল সম্পর্কেও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলা ও তহশীল কমিটীগুলির মারফত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীসমূহের এই তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুরূপ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক সংগঠকগণ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীসমূহের সাহায্যে নিজ নিজ অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। যে সমস্ত সংস্থা গঠনমূলক কার্য্য করে, তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানাইতে হইবে। বর্তমানে যে সমস্ত কাজ হইতেছে তাহার প্রকৃত বিবরণ জানার জন্য এইরূপ ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দপ্তর চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ তথ্য রাখিবে। (২) নিজ নিজ অঞ্চলের গঠন-মূলক কার্য্য সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিয়া আঞ্চলিক সংগঠকগণ উক্ত সংস্থা ও কর্মিগণকে ত্রুটি দূর করা এবং কাজ দ্রুততর করায় সাহায্য করিবেন। স্থানীয় অবস্থা এবং কর্মিদের যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিয়া ইহা করিতে হইবে। (৩) যে সকল স্থানে কংগ্রেসকর্মীরা পৃথক ভাবে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অনেকটা সৌরাষ্ট্র ধরণের গঠনমূলক কর্মীকমিটী গঠনে সাহায্য করিতে হইবে (৪) প্রত্যেক আঞ্চলিক সংগঠককে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীসমূহকে সর্বসময়ের জন্য একজন কর্মীর তত্ত্বাবধানে গঠনমূলক কর্মদপ্তর খুলিতে সাহায্য করিতে হইবে। বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর গঠনমূলক কার্য্যে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেস-সংস্থা ও কংগ্রেস সরকারের মাধ্যমে গঠনমূলক কার্য্য সম্পাদনে আগ্রহান্বিত। তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই ইহা সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গোয়ালপাড়া ও কংগ্রেস-সভাপতি

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীধেবর ৯ই মে গঞ্জাম-বহরমপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় গোয়ালপাড়ার ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন—"আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় অতীব শোচনীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই ঘটনাবলীর সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর দিকটি এই যে, উক্ত জেলায় কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এমন ব্যাপারে নিজেদের জড়িত করিয়াছিলেন, যাহা জাতীয়তা-বিরোধী অন্দোলন অপেক্ষা ন্যূন নহে। অতীতকালে বিভেদ সৃষ্টি আমাদের একটা পুরাতন ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া আমাদেরই নাগরিকদের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইলে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা বাড়িয়া যাইবে। ভারতের যে কোন অংশে যে কোন নাগরিকের বসবাস করিবার অধিকার রহিয়াছে। তিনি যে কোন ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন এবং যে কোন ভাষায় কথা বলুন না কেন, তাঁহার এ অধিকার অখণ্ডনীয়।" শ্রীধেবরের এই উক্তি আসামবাসী বাঙ্গালীদের মনে সাহসের সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

মালদহে প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরামহরি রায়

কংগ্রেস-সেবীদের দায়িত্ব—

আবাদী কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য কংগ্রেসসেবীদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হইবার ৪টি উপায় স্থির হইয়াছিল। উহার প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গত বহরমপুর শাখায় শ্রীধেবর সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—(১) ১০ বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যার বিলোপ সাধন (২) ১০ বৎসরে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলন (৩) ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করিয়া আমাদের জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা ও (৪) সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমাজ সুযোগের সৃষ্টি করা। এই ৪ দফা কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিলে, আমাদের জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে।

জাতীয় সঙ্গীত ও শ্রীনেহরু—

গত ৯ই মে সোমবার সকালে গঞ্জাম বহরমপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের পূর্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যখন 'জনগণ মন' ও 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হয়, তখন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে বেশ ক্রুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছিল ও তিনি আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলেন—"জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার সময় উপস্থিত সকলকেই উচ্চকণ্ঠে ঐ সঙ্গীতে যোগদান করিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের ছাত্রকে ঐ সকল গান গাহিতে শিক্ষা দিতে হইবে। জনগণের প্রত্যেকের জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান করিয়া গগন পবন মুখরিত করিয়া তোলা উচিত।" তিনি আরও বলেন—"আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা পর্য্যন্ত ঐ সঙ্গীত গীত হইবার সময় সমবেতকণ্ঠে যোগদান করে নাই।" অতীব দুঃখের কথা

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্রী শ্রীমতী দীপালী ও শ্রীপরেশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র প্রসূনের বিবাহোপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু

আমাদের স্বাধীন দেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আজিও জাতীয় সঙ্গীত সকল ছাত্রকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় নাই। আজও বহু বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত গীত না হইয়া অন্য সঙ্গীত গান করা হয়। এ বিষয়ে সরকার নির্দেশ প্রচার করিয়া যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী জাতীয় সঙ্গীত ২টি মুখস্থ করে ও গান করে, তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ১০ কোটি টাকা—

গত নভেম্বর মাস হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৫ মাসে কলিকাতাস্থ ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হইতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কল্পে প্রায় ৯০টি প্রধান পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছে। ঐ সকল পরিকল্পনা বাবদ মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ও মঞ্জুর করা হইয়াছে। ঐ

সময়ের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুদিগকে ঋণ দিবার জন্য ৫ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সত্বর কাজ করিবার জন্য বার বার পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন থাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না তাঁহার দপ্তর কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। শ্রীখান্না এখন স্থির করিয়াছেন—মে মাসের শেষ ভাগে অথবা জুন মাসের প্রথমভাগে তিনি আসাম, বিহার ও উড়িষ্যারাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনাগুলির রূপায়নের অগ্রগতি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত তিনি সর্বদা যোগাযোগ করিবেন। ইহা আশা ও আনন্দের সংবাদ। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা বর্তমানে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে কলিকাতার রাজপথে নগর সংকীর্তন

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সম্মেলন—

গত ৮ই ও ৯ই মে রবিবার ও সোমবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে রাজ্য সমবায় সম্মিলনের দুই দিনব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন—"দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সমাপ্তিকালে ৩২১টি জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিস ব্লক পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইবে। প্রত্যেকটি ব্লকে কৃষকদিগকে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা শস্য ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণদান তদন্ত কমিটী সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ঐ প্রকার ঋণ বণ্টনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের ১৬ হাজার সমবায় সমিতির সভ্য সংখ্যা ১০ লক্ষ এবং উহাদের মোট মূলধন ২১ কোটি টাকা; সুতরাং পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে সমবায় আন্দোলনের স্থান নগণ্য নহে।" প্রধান অতিথি শ্রীদুর্গাপদ চৌধুরী, সমবায় ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমনীষীনাথ বসু প্রভৃতি ও সম্মেলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতিগুলির কার্য্য সুপরিচালনার জন্য এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন।

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব নিবারণ—

পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৭ হাজার গ্রামের মধ্যে ১৮ হাজার গ্রামে পানীয় জলের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। সেজন্য জলকষ্ট-প্রপীড়িত অঞ্চলসমূহে বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৫৫-৫৬) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পানীয় জলাভাব নিবারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে সাত হাজার তিনশতটি নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা শাসকগণকে তাঁহাদের চাহিদা স্থির করার ভার দেওয়া হইয়াছে। গত বৈশাখ মাসের দারুণ জলাভাব আগামী বৎসরে যাহাতে আবার না ভোগ করিতে হয় সেজন্য রাজ্যসরকার বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন—ইহা অবশ্যই আশার কথা।

উদ্বাস্তু ক্ষয়রোগীদের চিকিৎসা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু ক্ষয়রোগীদের জন্য প্রথম দফায় ২৫০টি শয্যা প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। তিন হাজার

শয্যা প্রতিষ্ঠার জন্য রচিত এক বৃহত্তর পরিকল্পনা করা হইয়াছে—ইহা তাহারই অংশ মাত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের উদ্বাস্তু শিক্ষকগণকে উচ্চতর হারে বেতনদান ও শিল্পপতিগণকে আর্থিক সাহায্য দিয়া উদ্বাস্তু পল্লীসমূহে শিল্প-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার উদ্বাস্তু ছাত্রগণের প্রয়োজন মিটাইতে যে ১৫টি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তন্মধ্যে ৬টি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ মঞ্জুর করিতে রাজী হইয়াছেন। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে সর্বপ্রকারে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই সব ব্যবস্থা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। কি ভাবে সকলের চাহিদা মিটানো যাইবে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্র সরকার একযোগে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিতেছেন।

প্রাচ্য বাণী মন্দির—

গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসুর সভাপতিত্বে প্রাচ্য বাণী-মন্দিরের দ্বাদশ বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সভাপতি ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত সভার উদ্বোধনে বলেন—এই মন্দির বহুল ভাবে ভারত সরকার, বঙ্গীয় সরকার ও জনসাধারণের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের যুগ্ম-সম্পাদিকা ডক্টর রমা চৌধুরী বঙ্গদেশে অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ও প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে ডক্টর রমা চৌধুরীর প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। তিনি গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগে সাড়ে ৭ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভান্তে মহাকবি ভাসের সংস্কৃত নাটক 'অভিষেক' অভিনীত হইয়াছিল।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত গুপ্তের ৭০ বৎসর বয়সে রবিবাসর তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।
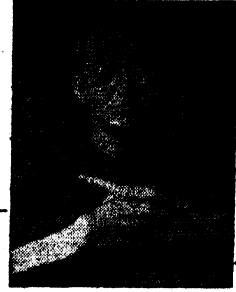
হকি লীগ ঃ

১৯৫৫ সালের ক্যালকাটা হকি লীগের প্রথম বিভাগে মোহনবাগান অপরাজেয় অবস্থায় লীগ-চ্যাম্পিয়ানসাপ লাভ করেছে। এ নিয়ে মোহনবাগান চারবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল—পূর্ব্ববর্ত্তী সাফল্য ঃ ১৯৩৫, ১৯৫১ এবং

যুগ্মভাবে বাইটন কাপ জয়, ইউ পি একাদশ দল

ফটো ঃ পান্না সেন

১৯৫২ সাল। লীগের মোট ১৮টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান উপর্য্যুপরি ১৬টি খেলায় জয়লাভ ক'রে প্রথম পয়েণ্ট নষ্ট করে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাষ্টমসের কাছে খেলা ড্র ক'রে। খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারে নি। মোহনবাগান বনাম কাষ্টমস দলের খেলায় মোহনবাগান এক পয়েণ্ট পেয়ে লীগ জয়ী হয়; আর্মড পুলিশের বিপক্ষে তাদের শেষ খেলায় আর কোন পয়েণ্টের দরকার ছিল না। ফলে শেষ খেলাটার ওপর তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি—একমাত্র অপরাজেয় রেকর্ড বজায় রাখা ছাড়া।

প্রথম বিভাগ হকি লীগে প্রথম চারটি দলের খেলার ফলাফল নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১৮	১৬	২	০	৫৪	৫	৩৪
কাষ্টমস	১৮	১৪	৩	১	২৯	৫	৩১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১২	২	৪	২৮	৯	২৬
ভবানীপুর	১৮	১২	২	৪	২৬	৯	২৬

অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৮২ (উইকস ১৩৯, ওয়ালকট ১২৬ ; লিণ্ডওয়াল ৯৫ রানে ৬ উইকেট) ও **২৭৩** (ওয়ালকট ১১০, উইকস নট আউট ৮৭, আর্চার ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৬০০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ম্যাকডোনাল্ড ১১০, মরিস ১১১, হার্ভে ১৩৩, আর্চার ৮৪, জনসন ৬৬)

পোর্ট অফ্ স্পেনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। ১ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ২য় টেষ্টের ৫ম দিনে চা-পানের পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ২১৮ রান পিছিয়ে থেকে। ঐ দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ১ উইকেট হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪০ রান করে—তখনও অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ১৭৮ রান পেছনে। ৬ষ্ঠ দিনে ওয়ালকট এবং উইকস নির্ভীকভাবে খেলে অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের আশা নির্ম্মূল করেন। ওয়ালকট এবং উইকসের ৩য় উইকেটের জুটিতে মাত্র ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের খেলায় ১২৭ রান ওঠে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১৮২ (উইকস ৮১। বিনড ৫ রানে ৪ উইকেট) ও **২০৭** (ওরেল ৫৬, ওয়ালকট ৭৩। জনসন ৪৪ রানে ৭)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৫৭ (বিনড ৬৮, ম্যাকডোনাল্ড ৬১। এ্যাটকিন্‌সন্ ৮৫ রানে ৩ ও সোবার্স ২০ রানে ৩ উইঃ) ও **১৩৩** (২ উইকেটে)

জর্জ্জ টাউনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩য় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। ২য় টেষ্ট ড্র গেছে। সুতরাং বাকি দুটি টেষ্ট খেলার একটি ড্র করতে পারলেও অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পাবে।

বিশ্ব টেবল টেনিস ঃ

এ বছর হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় গত বছরের পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান জাপান পুনরায় পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে রুমানিয়া।

ভারতবর্ষ এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে শ্রীমতী এ্যাঞ্জেলিকা রোজিয়ানুর জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ নিয়ে উপর্য্যুপরি ছ'বার এই বিভাগে জয়লাভ করলেন। এবছর তিনি মহিলাদের ডাবলস ফাইনালেও জয়লাভ করেন। ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের একমাত্র সাফল্য

যুগ্মভাবে বাইটন কাপ জয়ী ওয়েষ্টার্ণ রেল দল

ফটো : পান্না সেন

পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব। জাপানের প্রতিনিধিরা পুরুষদের ডবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসের সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ান-সীপ)—গতবারের চ্যাম্পিয়ান জাপান ফাইনালে ৫-৩ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দ্বিতীয় বার জয়ী হয়েছে।

কোর্বিলন কাপ (মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ান-সীপ)—রুমানিয়া ফাইনালে ৩-০ খেলায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে।

ইউ পি একাদশ দলের গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেল দলের আক্রমণ
ফটো : পান্না সেন

ব্যক্তিগত বিভাগের ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : টি তানাকা (জাপান) ২১-১২, ২১-৯, ২১-১৪ পয়েণ্টে জার্কো ডোলিনারকে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিসেস এ্যাঞ্জেলিকা রোজিয়ানু ২-১৩, ২১-৫, ২১-৮ পয়েণ্টে মিসেস লিণ্ডে রাম্পলের ওয়ার্টলকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : আইভান এণ্ড্রিয়েডিস এবং এল ষ্টিপেক (চেকো) ২১-১০, ২১-৭, ২১-১৮ পয়েণ্টে জার্কো ডোলিনার এবং ভি হারাঙ্গাজোকে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিসেস রোজিয়ানু এবং ইলা ইলার ২১-১৭,১৬-২১,১৭-২১,২১-১০,২১-১৬ পয়েণ্টে ডায়না এবং রোজালিণ্ড রো যমজ ভগ্নীদ্বয়কে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : কে জেপেসি এবং ইভা কুজিয়ান (হাঙ্গেরী) ১৮-২১, ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৮, ২১-১৬ পয়েণ্টে এ্যাংলো-স্কটিশ জুড়ি এ সিমোন্স এবং হেলেন ইলিয়েটকে পরাজিত করেন।

বোম্বে গোল্ড কাপ হকি :

১৯৫৫ সালের বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে লুসিটানিয়ান্স ২-১ গোলে নাগপুরের ভাগওয়াগার একাদশ দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়।

বাইটন কাপ :

১৯৫৫ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয় নিস্পত্তি হয়নি। ফলে বোম্বের ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং লক্ষ্ণৌর ইউ পি একাদশ দল যুগ্মভাবে বাইটন কাপ জয়ী হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৮ সালেও ইউ পি একাদশ দল পোর্ট কমিশনার্স দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে বাইটন কাপ পেয়েছিলো। এ বছর এক দিকের সেমি-ফাইনালে ইউ পি দল ২-১ গোলে নর্থ ইষ্টার্ণ রেল দলকে (গোরখপুর) পরাজিত করে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ওয়েষ্টার্ণ রেল দল ২-০ গোলে এ বছরের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ফাইনাল খেলাটি ত্থ' দিনই গোলশূন্য ড্র যায়, অতিরিক্ত সময় খেলা সত্বেও।
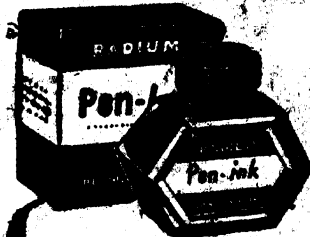
কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা : ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার বর্তমান যুগ প্রচলিত তুলনামূলক সমালোচনা করেন নি। এঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার পরিচয় গ্রন্থখানির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। রচয়িতার ব্যক্তিগত পরিবেশ, রচনাশৈলী ও বক্তব্যবিষয়কে কেন্দ্র করে ইনি যে ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন এরূপভাবে ইতিপূর্ব্বে খুব কম সমালোচকের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরম বিস্ময়। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী সাহিত্যগুরু। তাঁর জীবনের চৌদ্দ বৎসর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্যান্ত যে সব রচনা আমাদের দিয়ে গেছেন তা আমাদের মানসিক ভোগের পরম উপাদেয় উপকরণ হয়ে আছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন, চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও সমাজের কল্যাণ কামনা করেছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যিক জীবনের মধ্যভাগে প্রতিভা উন্মেষের শ্রেষ্ঠক্ষণে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থে উপন্যাসের তুলনামূলক সমালোচনার রীতি বর্জ্জন করে গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবেশ রচনারীতি ও লেখাবস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন আর তাঁর বিশিষ্ট বিদগ্ধতার পরিচয় এর মধ্যে আক্ষরিত হয়েছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষা একটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে ও বিশেষ রীতি অনুসরণ করেছে যা পড়ে বাঙালী ভেবেছে—'এই ত আমাদেরই মুখের ভাষা, আমাদেরই ঘরের ভাষা, এই ভাষাই আমাদের মনের ভাষা,' ঘটনা বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ শিল্পী। গ্রন্থকার বলেছেন—'এই উপন্যাসখানির মধ্যে সাহিত্য-রস সৃষ্টি ব্যতিরেকে অন্য একটি আবেদন রহিয়াছে—সেইটী হইল মানবতার নীতি সমাজের আদর্শ প্রীতি ও চরমে মানুষের ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন।' আলোচ্য গ্রন্থে বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য আলোচিত হয়েছে যেমন গ্রন্থের নামকরণ, সমসাময়িক সমাজ চরিত্র বিশ্লেষণ, প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, মনস্তত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দর্শন ব্যঙ্গচিত্র, উইলের ভাষা। উইলের ভাষায় গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন বিশেষ বিচ্যুতি, দুর্ব্বোধ্য অংশ, ব্যাকরণের অপপ্রয়োগ, গুরুচণ্ডালী ভাষা প্রয়োগ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার—প্রত্যেকটি নিয়ে তিনি যে ভাবে বিশদ আলোচনা করেছেন তা পড়ে সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকপাঠিকাগণের একটা স্পষ্ট ধারণা হোতে পারবে। গ্রন্থখানি পাঠ করে বিশেষ প্রীতিলাভ করা গেল, আশা করা যায় সাহিত্য-সমাজে এর বিশেষ সমাদর হবে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা।]

আচার্য বিনোবা : বিধুভূষণ দাসগুপ্ত

আচার্য বিনোবা জীবনীগ্রন্থ। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আচার্য বিনোবাভাবে ভারত গগনে নূতন জ্যোতিষ্ক। আজ ইনি সমগ্র ভারতের অন্তরের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের পর ইনি জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন আর পথের সন্ধান দিয়েছেন। এঁর ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন আজো চলেছে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। এই মহারাষ্ট্র কর্ম্মযোগীর জীবন গড়ে উঠেছে কিভাবে তা জানবার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই আছে। অনেকে প্রায়ই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর মত ও পথের সমাচার পায় বটে, অনেকে তাঁকে দেখেছে কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই আগ্রহ তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল দিনগুলির সঙ্গে পরিচিত হোতে, গ্রন্থকার সে অভাব মিটিয়েছেন। সরল ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হয়েছে। ভাবী ভারতের যারা উত্তরাধিকারী হবে তাদের প্রত্যেকেরই এরূপ মহান্ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। আমরা গ্রন্থখানি পড়ে খুব তৃপ্তিলাভ করেছি।

[সর্ব্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা—৩২। মূল্য—এক টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নারদীয় ভক্তিসূত্র :
উপনিষদ্ ঈশ-কেন-কঠ : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

ভারতীয় ধর্মপ্রণালীতে ভক্তির স্থান সকলের উর্দ্ধে। ভক্তিই ঈশ্বরপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহা ঋষিগণের নির্দেশ। 'নারদীয় ভক্তিসূত্র'তে সেই পরমসত্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদীয় ভক্তিসূত্রের অনুবাদ, অনুধ্যান ও তৎসহ ভক্তিরহস্য প্রবন্ধ জনসাধারণের নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য সহজবোধ্য করে দিয়েছে বলে সকলে বইটির সমাদর করবে সন্দেহ নেই।

[৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা]

* * * * *

উপনিষদ্ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্তমান যুগের বাস্তবতা দূষিত মানুষের মনে উপনিষদের মন্ত্র পৌঁছে দেওয়ার যে ব্রত লেখক গ্রহণ করেছেন, তার জন্য সমগ্র দেশবাসীর তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন। তৎপ্রকাশিত গ্রন্থাদি পাঠে মানুষ পরমার্থের পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[প্রকাশক—নিউ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯ গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬। মূল্য আট আনা।]

খেয়া (কেবল হাসি বার্ষিকী) : শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের জীবনের বাস্তব ঘটনাপ্রসূত বিভিন্ন ধরণের হাসির কথা ও কাহিনী আলোচ্য পত্রিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি রচনাই উপভোগ্য হয়েছে। বিশেষ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি ঘটনা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উভয়তঃ', বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সম্পাদকের সঙ্কট' 'সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের আতঙ্ক', সুনির্ম্মল বসুর 'সভাপতির দুর্গতি', অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'পৃথিবীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিচিত্র খেয়াল', আশাপূর্ণা দেবীর 'একটি করুণ কাহিনী' উল্লেখযোগ্য। লেখক লেখিকার জীবনের বাস্তব ঘটনাপ্রসূত কাহিনী পাঠের আগ্রহ পাঠক মাত্রেরই আছে। তার উপর যদি তা হাসির হয় তাহলে তার চাহিদা আরও বেড়ে যায়।

লেখার মধ্যে হাসির খোরাক রয়েছে যথেষ্ট। পাঠকরাও তাই আনন্দ পাবেন পড়ে।

[১৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

রোম থেকে রমনা : দেবেশ দাশ

রোম থেকে রমনা—অ—নে—ক দূর।

তবুও দূর নয়, এই ত যেন আমাদের ঘরের দোরে। যমকের যোগা যোগসাজস জড়ানো 'রোম থেকে রমনা' ভ্রাম্যমানের রোজনামচা নয়, সফরনামাও নয়,—গল্প। ভালবাসার গল্প। এ বইয়ের নাম 'প্রেম'ও রাখা চলত। সে নাম কিছু গাঢ়বদ্ধ হলেও, 'রোম' থেকে রমনার আবেদন ও ব্যঞ্জনা ঢের গভীর। বইয়ের নামকরণ আজ আর সামান্য আর্ট নয়, তার নতুনত্বের চমক ও লাস্য কল্পনাকেও হার মানায়। শ্রীদেবেশ দাশ সাম্প্রতিক যুগের একজন নামী লিখিয়ে, তাঁর রচনাবলী সংখ্যায় স্বল্প হলেও, গুণে মোটেই অল্প নয়। ছোটো গল্পের বই বোধহয় এই তাঁর প্রথম।

ভূত ও ভালবাসার গল্প মানুষ মাত্রকেই টানে—মানুষ মাত্রেই তা ভালবাসে। শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্য তাই না ভালবাসার ভূতে পাওয়া, ভালবাসায় উৎসর্গীকৃত। একদা দুমহরা দুমহারা নবীন যৌবনে ভালবাসার ফাঁদে আটকা পড়ে, আমরা হাবুডুবু খাই—সফল বিফল যাই হই না কেন, ভালবাসাকে ভালবাসতে ছাড়িনে। অসার খল সংসারে ভাগ্যবানের কপালেই প্রেম জুটে, আর ইতরজনেরা প্রেমের গল্প শুনেই খুশি হয়। নতুন বয়সকালের চেয়ে, পরিণত বয়সে, পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে সম্যকরূপে ভালবাসাকে আবিষ্কার করা সম্ভব। কাজেই প্রেমে পড়তে, প্রেমে পড়া মানুষ দেখতে প্রেমের গল্প পড়তে-পড়াতে, শুনতে-শুনাতে মানুষ চিরদিনই ভালবাসে।

আলোচ্য বইয়ের ন'টি গল্পের মধ্যে দু'টির পটভূমি দেশের, বাদ বাকি বিদেশের। শেষের গল্পটির পটভূমি বিদেশ হলেও, দেশের মাটির টান ও গৃহকাতরতায় বিধুর। 'বসন্ত সেনা'র আহেল রাজস্থানী কথাবার্তা ও মারবাড়ী গয়নার নাম—অন্য কথায় স্থানীয় ছোঁয়াচ ও রস আমাদের ভাল লেগেছে। ছুটির কোনো উজ্জ্বল দুপুরে, আরাম কেদারায় গা এলিয়ে এক নিশ্বাসে বইখানি পড়ে ফেলা যায়।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭, মূল্য দু' টাকা দশ আনা।]

পরিমল দত্ত

A Critical study of Dara Shikoh's "Samudra Sangama" by Dr. Rama Choudhuri with critical edition of Sanskrit text of Samudra Sangama by Dr. Jatindra Bimal Choudhuri.

মুসলমান রাজ-শক্তির নিষ্পেষণে হিন্দুধর্ম যখন পতনোন্মুখ পরম সন্ত কবীরের আবির্ভাব হ'ল উত্তর ভারতে। তিনি প্রচার করলেন, "রাম রহিম এক হ্যায়, নাম ধরায়া দো।" "কাশী কাবা এক হ্যায়। নাম ধরায়া দো।" সেই মৈত্রী সাধনা সম্রাট আকবরের দীন ইলাহি ধর্ম-প্রচারের ফলে অনেকখানি শক্তি লাভ করেছিল। হিন্দু-মুস্লিম মৈত্রী রচনায় আকবরের প্রয়াসের অন্তরালে ততখানি ধর্ম প্রেরণা ছিল না, যতখানি ছিল রাজনীতি বা কূটনীতি তা' কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন। কিন্তু রাজঋষি দারাশিকোর জীবনে হিন্দু মুস্লিম ধর্মের মধ্যে আপাত বিরোধীভাব খণ্ডনের পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রয়াস "সমুদ্র-সংগম" মোগল বাদশাহগণের অন্যান্য কীর্তির চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে। পণ্ডিত প্রবর অধ্যক্ষ ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ও তদীয় সুযোগ্যা সহধর্মিণী অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরীর মিলিত সাধনায় ভারতের সে মহামূল্য রত্ন লোকচক্ষুর গোচরীভূত হ'ল। আলোকে মাথা তুলে দাঁড়াল হিন্দু-মুস্লিম মৈত্রী সাধনার বিজয় স্তম্ভ অজানা মহান্ধকারের করাল কুক্ষি থেকে।

শাহজাদা দারা মোগল রাজৈশ্বর্য ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হয়েও বিশেষ ধর্মপ্রবণ ছিলেন। সংসারের প্রতি ছিলেন উদাসীন। তিনি নিজেই বলেছেন, "গত কথরতি বীতরাগ বীতশোক সন্দেহে মহম্মদ দারাশিকোহ। রাগ দ্বেষ শোক জয় করেছিলেন ফকির দারাশিকো। ভারতের সিংহাসনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্রও লোভ ছিল না। তাই কুচক্রী ঔরঙ্গজেবের পক্ষে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা অতি সহজেই সম্ভব হয়েছিল। হিন্দু নর-নারীর ভাগ্যাকাশে নেমে এল দুর্যোগের তামসী রাত্রি! কলহায়মান বিভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানের কাছে দারাশিকোর সাধনা লব্ধ আলোক পৌঁছাতে পারল না।

কিন্তু আজ তা' সম্ভব হয়েছে। শত শত বর্ষের অন্ধকার অতিক্রম করে সে আলোক এ যুগের হিন্দু-মুসলমানের কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

দারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, হিন্দু মুসলমানের ধর্মে পার্থক্য শুধু নামের। আসলে উভয়ই একপ্রকারের। হিন্দুর ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরই মুসলমানের জিব্রাইল মিকাইল ইসরাফিল। যে ধর্মান্ধতায় অজ্ঞতায় ভারত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল, তার অবসান সম্ভব হতে পারত দারার মৈত্রী সাধনা-বাণী প্রচারের দ্বারা। চৌধুরী দম্পতির এই সুমহান প্রচেষ্টা এই জন্যই সমগ্র দেশবাসীর অভিনন্দন যোগ্য।

এই গ্রন্থ প্রকাশের অর্ধেক ব্যয়বহন করার জন্য ভারত সরকার সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

[প্রাচ্য বাণীমন্দির কর্তৃক ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। মূল্য বার টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক"—১৸৹
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বড়দিদি" (২৩শ সং)—১৷৹, "মেজদিদি" (১৯শ সং)—১৷৹, "নব বিধান" (১০ম সং)—১৸৹, "দেবদাস" (উপন্যাস—১৯শ সং)—২৲, "দত্তা" (২৬শ সং)—৩৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মন্ত্রশক্তি" (১০ম সং)—৪৷৹
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গৌড়মল্লার" (২য় সং)—৪৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "নূরজাহান" (৮ম সং)—২৷৹, "চন্দ্রগুপ্ত" (২৭শ সং)—২৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬১—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক